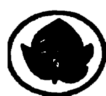
বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়



নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটিড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

।। ঔপন্যাসিক বনফুল ঃ বিচিত্র জীবনের রূপশিল্পী।।

পুর্নিয়া জেলার মণিহারি গ্রামের প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বলাইচাঁদ (জন্ম ১৯ জুলাই, ১৮৯৯) সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাই স্কুলের ছাত্র থাকার সময়েই কবিতা লিখতেন। তখনই, ছাত্রের কাব্যচর্চার প্রতি শিক্ষকদের *অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপের সম্ভাবনায় ছদ্মনামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন নিজের* নাম। 'বনফুল' ছদ্মনামেই অতঃপর বাংলা কথাসাহিত্য-প্রাঙ্গণে অপ্রতিহত জনপ্রিয়তায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যভাগ থেকে নিয়ে সাত্তের দশক পর্যন্ত। এই কিছু-বেশি চল্লিশ বছরে অনেক লিখেছিলেন। কবিতা-নাটক-উপন্যাস-ছোটোগল্প। অতি সংহত রূপাবয়বে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য-ভেদী তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র শিল্প আদর্শই প্রতিষ্ঠা করেছে যেন। ছোটগল্পের সমান্তরালে তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়ও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। জীবনের বিচিত্র বিস্তার, বহু-কৌণিক ঝলক, বহুস্তরীয় বিন্যাস তাঁর উপন্যাসে পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ ও আকর্ষ করে রাখে। বাংলা কথা সাহিত্যের সেই সময়পর্বটি ব্যাপ্ত করে ছিলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী; ঈষৎ পরবর্তী পর্বে বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী; অন্য একটি ধারায় জনপ্রিয় ছিলেন বিমল মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়টাই ছিল বাংলা উপন্যাসের পর্যাপ্ত বিচিত্রতার কাল। অনেকগুলি ধারায় বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস লেখা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বনফুলও ছিলেন নিজস্বতায় সমুজ্জ্বল ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। জীবনকে নিজের মতো করে দেখবার, অনুভব করবার ও সেই উপলব্ধিকে ভাষায় স্বচ্ছন্দ রূপাবযবে মূর্ত করবার সাবলীল দক্ষতা ছিল তাঁর। যে কোনো গল্পই বলতে পারতেন চমৎকার। তাঁর দৃষ্টিকোণ বা মতাদর্শের সঙ্গে যদি পাঠকেব মতের ঐক্য না-ও হয়, তবু পাঠক তাঁর বিবৃত কাহিনীর টান উপেক্ষা করতে পারেন না। জীবন-যাপন সম্পর্কে, সমাজ-নীতি সম্পর্কে বনফুলের নিজস্ব নৈতিকতা যথেষ্টই ছিল। বিশেষত রাজনীতি-সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে খুবই নির্দিষ্ট অভিমত ছিল তাঁর। কিন্তু সেই অভিমতের পরিসীমার মধ্যে জীবন ও মানুষকে সব সময়ে ধরানো যায় না তা-ও জানতেন তিনি। সেখানে তিনি মতাদর্শ দিয়ে মানুষকে মাপেননি। জীবনের বিচিত্রতাকে দিয়েছেন মূল্য। জীবন তাঁকে টান দিয়েছে, তাঁকে মোহিত করেছে তার নিজের অস্তিত্বের জোরে। জীবনের প্রতি সেই মুগ্ধতার তর্পণ তাঁর কথা-সাহিত্য। এই মুগ্ধতা সর্বদা সুন্দরের প্রতি বা মধুর-শোভন-মার্জিত মহত্তের প্রতি নয়। অসুন্দর, বীভৎস, বর্বর, শঠ, হিংস্র, প্রতারক চরিত্র বা অস্তিত্বেরও যে তীব্র আকর্ষণ থাকতে পারে তা তিনি স্বীকার করেছিলেন অকুণ্ঠভাবে। সাহিত্যে তাকে যথোচিত প্রকাশরূপও দিয়েছিলেন। তাই সাধারণ পাঠকের চাহিদার বৃত্ত থেকে কখনই তাঁকে সরে যেতে হয়নি। সেখানে তিনি কেন্দ্রে বিরাজ করেছেন বরাবর।

বনফুলের বিভিন্ন ধরনের পাঁচটি উপন্যাস নিয়ে এই সংকলন। এই উপন্যাসগুচ্ছে আছে সংহত আকারের নভেলেট ধরনের রচনা, আবার দুই পর্বে বিস্তৃত পরিব্যাপ্ত জীবন-অভিজ্ঞতার ধারক সৃষ্টি। আছে আপাত অলৌকিক পদ্ধতির প্রয়োগ, আবার একই রচনায় কাব্যরীতি, গদ্যবিবৃতি ও নাট্যরীতির সংমিশ্রণ। বিষয়বস্তুতে কখনো দেখি এদেশের প্রতাপী জমিদারদের রেষারেষি; কখনো মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণা; কখনো পরাধীন দেশে স্বদেশ-চেতনার বিভিন্ন সম্পাত। একটি খণ্ডের মধ্যেই যেন সেই বিচিত্রের মেলা—যা বনফুলের কথাশিল্প সম্পর্কে এক সমগ্রতাবোধেরই পরিচয় দেবে।

।। ২।।

কালগত ধারাবাহিকতা এই উপন্যাসগুচ্ছের মধ্যে প্রথম হল 'দ্বৈরথ'—একটি নভেলেট। ছোট উপন্যাসের একটি রূপবন্ধ। বনফুল এ-জাতীয় উপন্যাস আরো লিখেছেন কিন্তু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে (বৈশাখ ১৯৪৪ বঙ্গাব্দ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স) প্রকাশিত এই উপন্যাসই তার প্রথম নিদর্শন। অনেকে এটিকে বনফুলের প্রথম সার্থক উপন্যাসও বলে থাকেন।

উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্র—উগ্রমোহন, চন্দ্রকান্ত, বহ্নিকুমারী আর গঙ্গাগোবিন্দকে নিয়ে প্রথমে বনফুল লিখেছিলেন একটি ছোটোগল্প। কিন্তু সেই গল্পের পাণ্ডুলিপি শুনে ভাগলপুর নিবাসী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে গল্পটি প্রসারিত করবার পরামর্শ দেন। বনফুল চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক হবার পর কর্ম জীবনের অধিক অংশ উত্তর বিহারের ভাগলপুরে অতিবাহিত করেছিলেন। ভাগলপুরের সামাজিক জীবনে তাঁর সসম্মান স্থান ছিল। তিনিও সর্বশ্রেণীর মানুষকে মূল্য দিতেন। বনফুল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, উন্নাসিক ছিলেন না। তিনি জানতেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকেরাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান রস-উপভোক্তা। তাই তিনি পাণ্ডুলিপি শোনাতেন স্ত্রী-কে, প্রতিবেশীদের কাউকে কাউকে। শ্রোতাদের অভিমতকে গুরুত্ব দিতেন; কখনো কখনো পরিবর্তনও করতেন পাণ্ডুলিপির। পটলবাবু নামে সমধিক পরিচিত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত শুনে বনফুল সত্যিই ছোটগল্পটিকে একটি ছোট উপন্যাসের আকার দিলেন। লেখা হয়ে গেল একটি চমৎকার নভেলেট।

ছোটো মাপের উপন্যাস মাত্রেই নভেলেট নয়। ঠিক কোন্ জাতীয় রচনাকে নভেলেট বলা যায় তা স্থির করবার আগে 'দ্বৈরথ'-এর কাহিনী-অংশটি জেনে নেওয়া যাক। বনফুল প্রথমে লেখাটির নাম দিয়েছিলেন 'অহি-নকুল'। পরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি শুনে 'দ্বৈরথ' নামটি পছন্দ করে দেন। অর্থটা প্রায় একই—প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক সামন্ততান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প দ্বৈরথ।

সামন্ততন্ত্র হল এই আখ্যানের বাতাবরণ। এই কাহিনী যখন রচিত হয়েছে ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি। জমিদারি প্রথা পুরো মাত্রায় বর্তমান। অকুস্থল কোথায় তা স্পষ্ট করে বলা না হলেও উত্তরবিহার বলে বোঝা যায়। দুই সংলগ্ন জমিদারির দুই জমিদার চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন। তাদের অনুচরেরা মুন্সি, দেওয়ান, নায়েব এবং তাদের নাম সবই মিশির, পাঁড়ে, সিংহ, চৌবে, সিং ইত্যাদি। সেখানে জমিদার নিজের গরুমোষগুলির খবর রাখেন। নিজের হাতে তাদের কিছুটা সেবাও করেন তিনি। বাঙালি জমিদারদের এমন অভ্যাস ছিল না। কিন্তু বিহার-উত্তরপ্রদেশের ভূম্যধিকারীরা এখনও অনেকেই নিজের হাতে

গো-সেবা করতে লজ্জিত হন না। এই শ্রেণীটিকে বনফুল খুব ভালো করে চিনতেন। এদের মধ্যেই বাস করেছিলেন তিনি। দুই জমিদারের রক্ত-জমানো দ্বৈরথের যে আখ্যান তিনি বর্ণনা করেছেন তা মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে একটু অচেনা মনে হলেও যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের আচরণের নিষ্ঠুরতা কত স্বাভাবিক।

চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন সহপাঠী ছিলেন। তাঁদের আর এক সহপাঠী ছিলেন দরিদ্র কিন্তু মেধাবী গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র। চন্দ্রকান্তের বোন বাণী ও গঙ্গাগোবিন্দ পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু বাণী-র সঙ্গে বিবাহ হয় উগ্রমোহনের। আর উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ীর সঙ্গে বিবাহ হয় গঙ্গাগোবিন্দের। বাণী-র নাম বদলে উগ্রমোহন করে দেন বহ্নিকুমারী।

চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের মধ্যে আছে সুগভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নির্দিষ্ট কোনো কারণ দেখানো হয়নি। ভগ্নীপতি ও শ্যালক পরস্পরের দাবা খেলার সঙ্গী। সেখানে দাবার নেশার বাঁধন। কিন্তু সর্বদাই একে অপরকে বিপন্ন করবার সুযোগ খোঁজেন। পরস্পরের লোককে খুন করিয়ে সেই অদৃশ্য রক্ত হাতে মেখে প্রতি সন্ধ্যায় তামাক ও শরবৎ সহযোগে দাবার চাল দেন শ্যেন-চক্ষু দুই জমিদার। এই শীতল নিষ্ঠুরতার চিত্র আর উপলব্ধি চমৎকার ফুটিয়েছেন বনফুল। সামন্ততন্ত্রকে মহিমময় করে দেখাবার চেষ্টা তিনি করেননি। চন্দ্রকান্ত সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমান, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন, মিষ্টভাষী। উগ্রমোহন কিছু স্থূল-স্বভাব, উগ্র, ক্রোধী, অসহিষ্ণু, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাবিহীন, অহংকারী। বহ্নিকুমারী দাদা চন্দ্রকান্তের মতোই সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সঙ্গীতের রসে মগ্ন থাকেন। উগ্রমোহনের সেই শিক্ষা, রুচি ও মেজাজ নেই। ইমন আর পূরবীর পার্থক্য করতে পারেননি বলে বহ্নি-র কাছে কিছু উপহাস শুনেছিলেন তিনি। বহ্নি-কে তিনি ভালোবাসেন। কতটা ভালোবাসেন তা নিজেও জানেন না।

সামন্ততন্ত্রের পাকে শ্বাসরুদ্ধ মানবতার প্রতীক যেন বহ্নিকুমারীর মৃত্যু। সামন্ততন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা ছিল না বনফুলের—তা সত্যই। কিন্তু উগ্রমোহনের কঠোর উগ্রতার অন্তরালে লুকিয়ে ছিল বহ্নিকুমারীর প্রতি নিবেদিত এক হৃদয়। তার প্রতি সমবেদনা বোধ করেছে লেখক। বহ্নিকুমারীর মৃত্যুতেও বন্ধ হয়নি দাবা খেলা। কিন্তু উগ্রমোহন আর সামলাতে পারেন না তার হাতি-ঘোড়া-মন্ত্রী। খেলার মধ্যে হঠাৎ অ-প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি চন্দ্রকান্তকে প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, ইমন আর পূরবীর তফাৎ ধর কি করে তোমরা?"

যে কোনো ছোটো উপন্যাস ও নভেলেট-এর মধ্যে পার্থক্যটি নিহিত আছে উপলব্ধির এককতার টানে। ছোটগল্প একক প্রতীতি-নির্ভর। উপন্যাস বিচিত্র আখ্যানের সমাহার। লক্ষ্য সেখানে সামগ্রিকতা, একক প্রতীতি নয়। নভেলেট-এ অ্যাখানের কিছু বিস্তার থাকে, থাকে একাধিক কথাবৃত্ত। কিন্তু সেখানে জীবনের বহুমুখী বিস্তার নয়, সামগ্রিকতার সন্ধান নয়; সেখানে ছোটোগল্পের মতো 'সিঙ্গল ইম্প্রেশন' এবং উপলব্ধির অব্যাহত কেন্দ্র-টান হয়ে ওঠে রচনাটির প্রধান লক্ষণ। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' ছোট মাপের উপন্যাস; রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' বড় মাপের ছোটগল্প। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' অনেকটাই নভেলেট। কারণ নীরজা-র অধিকার বোধ এই রচনাটির একক কেন্দ্র-টান। যদিও আদিত্য-সরলার কথাবৃত্তটি সামান্য অতিরেক সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন'ও একটি সার্থক নভেলেট। বনফুলের "দ্বৈরথ" অত্যন্ত সার্থক একটি নভেলেট— যেখানে

একতম কেন্দ্র-টান ঐ দ্বৈরথ। এই সামন্ততান্ত্রিক দ্বৈরথকে সর্পকুটিল বিষাক্ততার সঙ্গে তুলনা করতে তাঁর বাঁধেনি।

।। ৩ ।।

বনফুলের জীবন অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত ছিল তা আমরা জানি। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছিল যে পরিবেশে সেখানে শিকার ছিল নিত্যকালীন এক অভিজ্ঞতা। তাঁর বহু উপন্যাসে তাই ঘুরে ঘুরে আসে শিকারের প্রসঙ্গ। 'মৃগয়া' (১৯৪০, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) অবশ্য ঠিক শিকারের গল্প নয়, শিকার যাত্রার গল্প।

'মৃগয়া' উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ তার শিল্পরীতিতে। উপন্যাসটির প্রথম অংশ গদ্য কবিতার ছাঁচে লেখা। দ্বিতীয় অংশ বিবৃতিময় গদ্যে। আর তৃতীয় অংশটি নাট্যরীতিতে। এর ফলে লেখাটিতে সঞ্চারিত হয়েছে রূপ-বৈচিত্র্য। সন্দেহ নেই বেড়েছে পাঠের আকর্ষণ। কিন্তু উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই গল্প- বৈচিত্র্যের অপরিহার্য কোনো যোগ আছে—এমন বলা যায় না। সমস্ত রচনাটি বিবৃতি প্রধানগদ্যে লেখা হলেও তেমন কোনো ক্ষতি হোত না। অথবা লেখা চলত নাট্যরীতিতেও। নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট আছে রচনাটিতে। তবে কবিতার আঙ্গিকটি কোনোভাবে তৎপর্যপূর্ণ হয়নি। গদ্য কবিতা আর বিবৃতময় গদ্যর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য অনুভব করা যায় না। তবু এই কথা বলে শেষ করা যায় যে এই রীতির বিচিত্র বিন্যাস রচনাটির কোনো ক্ষতিও করেনি। পাঠের দিক থেকে এই বৈচিত্র্য যে নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এসেছে তা ভালোই লাগে। অনেক সম্পর্ক এখানে নতুন করে গড়েছে এবং অনেক সম্পর্ক ভেঙেও পড়েছে। এই ভাঙা-গড়ার খেলনাটাই 'মৃগয়া'-উপন্যাসের সমগ্রতা সম্ভব করেছে।

।। ৪ ।।

মানুষ বাস করে তার নিজস্ব পারিবারিক, সামাজিক বৃত্তের মধ্যে। বাস করে তার প্রাত্যহিকতায়, নিজস্ব বর্তমানে। সেই একই মানুষ বাস করে আর্ন্তজাতিক বিশ্বে, মহাবিশ্বে। বাস করে অনন্ত সময়-প্রবাহের ধারাবাহিকতায়। মানবচেতনায় ঘটে এই উভয় উপলব্ধির সংশ্লেষ। তাই মানুষের ভাবনা আর সেই অভিব্যক্তি আবিশ্যিকভাবেই ছুঁয়ে থাকে সময়ধারাকে, ইতিহাসকে।

কিন্তু যাকে বলি ইতিহাসবোধ তা নিছক সময়-চেতনার স্তর থেকে একটু আলাদা। সময়বোধ প্রতিটি মানুষেরই থাকে, ইতিহাসবোধ গড়ে ওঠে সময়বোধের উপাদান থেকেই কিন্তু স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ভাবেই স্রষ্টা মানুষদের, মনীষীদের মননে প্রতিবিম্বিত হয়।

ইতিহাসবোধ বলতে কী বুঝতে চাইছি তা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। যা কিছু অতীতে ঘটেছে আক্ষরিক অর্থে তা-ই ইতিহাস। কিন্তু ওই পার্থিব সংঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে ঘটনার আছে বহু রকমফের। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীতে একই ঘটনা বহু বিচিত্র ফল-পরিমাণ নিয়ে আসতে পারে। প্রজন্ম-বাহিত ঘটনাধারার সমাবেশ থেকে গড়ে ওঠে এক একটি জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশিষ্টতা। সেই অতীতের উপরেই নির্ভর করে

দাঁড়ায় মানুষের বর্তমান, প্রত্যাশিত হয় ভবিষ্যৎ। ইতিহাস মানুষকে দেয় তার নিজস্ব পরিচিতি; বিশ্ব-ভূখণ্ডে তার নিজস্ব অবস্থান স্থিরীকৃত হয় ইতিহাসের গতিতে।

ইতিহাসবোধ বলতে আমরা এই চেতনাটিকেই বুঝি। যে বোধের সাহায্যে একজন মানুষ বিশ্ববৈচিত্র্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিনে নিতে পারে তার নিজস্ব জায়গা এবং সেই বোধ অনুসারে সে অগ্রসর হয়, প্রস্তুত হয় অনাগত ভবিষ্যতের জন্য। একেই বলা যায় ইতিহাসের শিক্ষা। ইতিহাস এক সর্বব্যাপ্ত অস্তিত্ব। অতীত-ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত এই চেতনার প্রসারকেই আমরা ইতিহাসবোধ বলব। এই বোধ মানব-সভ্যতার প্রগতিশীলতা সম্ভব করে।

এমন কোনো বড় লেখক, বড় শিল্পী নেই যিনি ইতিহাসচেতনাকে তাঁর সৃষ্টি পর্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। প্রত্যক্ষভাবে যাঁর লেখায় ইতিহাস-প্রসঙ্গ নেই তাঁরও লেখায় প্রতি মুহূর্তে পুনর্গঠিত হতে থাকে অন্তত, সমাজের ও ব্যক্তিমানুষের ইতিহাস। প্রতিভাবান লেখকের হাতে ইতিহাসবোধ সমৃদ্ধ সৃষ্টি কখনো কখনো কি বিস্ময়করভাবে ফলবান হয়ে ওঠে তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস; প্রমাণ বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক। ইতিহাসবোধ সেখানে জীবন-বীক্ষণেরই অন্য নাম।

বনফুলকে আমরা নির্দ্বিধায় একজন ইতিহাস-মনস্ক ও ইতিহাস-সচেতন লেখক বলব। তবে তাঁর ইতিহাস-ধারণা হয়তো সব সময়েই আমাদের মতের সঙ্গে সবটা মিলবে না। ইতিহাস-পঠন যেহেতু ভৌত বিজ্ঞান-চর্চা নয়, মানবিকী বিদ্যা তাই ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের প্রভেদ থাকবেই সেখানে।

কিন্তু ইতিহাসদৃষ্টি ও ইতিহাসবোধের দিক থেকে যে-উপন্যাসটিকে সর্বাধিক অর্থময় ও স্বচ্ছ বলে গ্রহণ করতে পারি সেটি তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সপ্তর্ষি'। প্রকাশ কাল ১৯৪৫। (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) উপন্যাসটি প্লট গঠনের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। অন্য উপন্যাসগুলিতে লেখকের রাজনৈতিক মত ও ইতিহাসের তত্ত্বে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী না হন, তিনিও পাঠযোগ্য একটি গল্প পাবেন রচনাটিতে। কিন্তু 'সপ্তর্ষি'-তে নিটোল কোনো ঘটনাবৃত্ত নেই। উপন্যাসটির গঠন-পরিকল্পনা কিছু স্বতন্ত্র। একটি পরিবারের দুই ভাই-হংসশুভ্র আর সোমশুভ্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাতাবরণে তাঁদের শিক্ষা ও মানসিক দীক্ষা, পিতৃদত্ত বিত্ত ছিল প্রচুর। ছোট ভাই সোমশুভ্র ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশে প্রথমে কিছু অন্যরকম ও পরে ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন। যাপন করলেন অকৃতদার ও সমাজসেবীর জীবন। হংসশুভ্রের সন্তানদের লেখাপড়া বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে। সকলেই তারা সুশিক্ষিত হয়েছিল। উপন্যাসে কেবল তাঁর প্রথম দুই পুত্র শশাঙ্কশুভ্র ও মৃগাঙ্কশুভ্রের চরিত্রদুটি আছে। অপর তিন পুত্রসন্তান অকালমৃত। জীবিত আছে দুই কন্যা। কুন্দশুভ্রা—যে তার মুসলমান সঙ্গীতশিক্ষকের সঙ্গে চলে গেছে ঘর ছেড়ে। আর ইন্দুশুভ্রা—যে দুবার বিধবা হবার পর পিতার সেবাতেই আপাতভাবে নিবিষ্ট। কঠোর বৈধব্য পালন করে সে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্যা ও পূর্ণ সমর্থক।

শশাঙ্কশুভ্রের তিন পুত্র শঙ্খশুভ্র, রজতশুভ্র আর হীরকশুভ্র উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত। তিন জনেই তরুণ। শঙ্খশুভ্রের প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিনটি উপন্যাসের কালক্রমের শেষ দিন। তখনও ভারতের স্বাধীনতা আসেনি। সময় পর্বটি ১৯৩৬-৩৭ ধরা যেতে পারে। উপন্যাসের

সর্বশেষ পরিচ্ছেদে আছে শশাঙ্কশুভ্রের কনিষ্ঠ পুত্র হীরকশুভ্রের এক পুত্র। জেলে বসে সে চিঠিটি লিখেছে তার মেজদা রজতশুভ্রকে। সেখানে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা-র (১৯২৯-১৯৩৩) উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৯৩৪)। ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের উল্লেখও আছে। বলা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু হীরকের চিঠিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই। এখানে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে এই উপন্যাসের ঘটনাকালবে রাখা হয়েছে।

উপন্যাসটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এক একটি পরিচ্ছেদের কেন্দ্রে আছে এই 'শুভ্র' পরিবারের এক একজন ব্যক্তি। প্রথমে দুটি পরিচ্ছেদে হংসশুভ্র আর সোমশুভ্র—দুই ভাইয়ের চরিত্র প্রতিষ্ঠিত। পরের দুটি পরিচ্ছেদের কেন্দ্রে আছে হংসশুভ্রের দুই পুত্র—শশাঙ্ক আর মৃগাঙ্ক। শেষ তিনটি পরিচ্ছেদে আলো পড়েছে শশাঙ্কর তিন পুত্র শঙ্খ, রজত আর হীরকের উপর। শেষ পরিচ্ছেদটি, আগেই বলেছি, পত্রাকারে উপস্থাপিত। এই সপ্ত-ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই প্রবলভাবে তার পরিমণ্ডল-বৃত্ত, দেশ-কাল-মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের কথায় দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতির প্রসঙ্গ অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়।

সাতটি প্রধান চরিত্রের বিন্যাস থেকে বোঝা যায়—বনফুল পরিকল্পনা করেই এই সাতজনকে নির্বাচন করেছিলেন। এই সাতজন তিন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ফলে বাংলা তথা ভারতের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রায় সত্তর বছর ব্যাপী পরিসরকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন লেখক এই মানুষগুলির বিবরণের ও মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। এই সাতজনের মধ্যে তিন জন—মৃগাঙ্কশুভ্র, রজতশুভ্র একেবারে প্রত্যক্ষত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। সব দিক থেকেই 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসটি আগের উপন্যাসগুলি থেকে কিছু পৃথক। আগের উপন্যাসগুলিতে আমরা পেয়েছি বনফুলের রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক অভিমত, সেই অভিমত ব্যক্ত করবে এমন কিছু চরিত্র এবং একটি আকর্ষক গল্পবৃত্ত । কিন্তু 'সপ্তর্ষি'-তে আলাদা কোনো গল্প নেই। সাতজন মানুষের জীবননির্যাস থেকে একটি যুগের নির্মাণই ঔপন্যাসিকের প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসের লক্ষ্য হল উল্লেখিত সময়-পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি, স্পন্দন ও পরিমণ্ডলকে ফুটিয়ে তোলা। সর্বাধিক তাৎপর্যে প্রথমে রচিত এই 'সপ্তর্ষি'-পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি, স্পন্দন ও পরিমণ্ডলকে ফুটিয়ে তোলা। সর্বাধিক তাৎপর্যে প্রথম রচিত এই 'সপ্তর্ষি'কেই বনফুলের সর্বোত্তম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। প্রকৃত ইতিহাসবিদের নিরপেক্ষতা তিনি এই উপন্যাসটিতে অর্জন করেছিলেন বলে মনে হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বেশ ভাববার মতো একটি মুখবন্ধ লিখেছেন বনফুল এই উপন্যাসটির জন্য। আমরা মুখবন্ধটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি।—

'এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র কাল্পনিক, জীবন্ত রূপ দেবার জন্য সমসাময়িক ইতিহাসের পরিবেশে সন্নিবিষ্ট করেছি। এদের মুখ দিয়ে যে সব নৈতিক বা রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত হয়েছে তাও এদের নিজের আমার নয়। সমসাময়িক ইতিহাস প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সবের যাথার্থ্য যাচাই করবার

যোগ্যতা আমার নেই, প্রয়োজনও বোধ করিনি। কারও যদি কোনও বিষয়ে সন্দেহ হয়, আমাকে জানালে আমি গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম তাঁকে জানিয়ে দেব।'

দেখা যাচ্ছে, বনফুল একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ ব্যবহার করেছিলেন এই উপন্যাস লেখবার সময়ে । তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন সচেতনভাবে। এই উপন্যাসে লেখক রূপে তিনি কিছুটা প্রার্থিত দূরত্বেও অবস্থান করেছেন।

'সপ্তর্ষি' উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৪৫। কিন্তু উপন্যাসের সময় সীমা ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে। কাজেই ঐতিহাসিক সত্যতার দায় যথাযথভাবে রক্ষা করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ নীতি নিয়ে কিছু বলবার অবকাশ গড়ে ওঠেনি উপন্যাসে। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের প্রসঙ্গও লেখক নিয়ে আসার সুযোগ পাননি। উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতায় মধ্য উনিশ শতক থেকে শুরু করে ঠিক ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত ভারতের সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে লেখক সযত্ন পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁর পক্ষপাত অনুভূত হয় না। বিভিন্ন মতাদর্শের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। অথচ উপন্যাসটির রচনাকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দেখেছেন। তবু তাঁর মন কমিউনিস্টদের প্রতি সামগ্রিকভাবে বিরূপ হয়নি-হীরকশুভ্রের খাঁটি চরিত্রটির প্রতি শ্রদ্ধাই তার প্রমাণ। তাকে দিয়েই শেষ হয়েছে উপন্যাস।

॥ ৫ ॥

বনফুল ছিলেন জীবনরসিক। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে যে পৃথিবী মানুষের উপভোগের পরিসীমায় আসে তার রূপ, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ তাঁর মনের পাত্র পূর্ণ করে দিত। সেই পূর্ণ-পরিতৃপ্ত এক মানস-ব্যক্তিত্বও চেনা যায় তাঁর অনেক লেখার ভিতর থেকে। বনফুলের লেখক-চিত্তের আর এক বৈশিষ্ট্য—মনোজগতে বাস্তব ও কল্পমায়াব সহাবস্থান। তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উদ্দাম। অলৌকিকের কল্পনায় তিনি ছিলেন পারঙ্গম। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের সব কটি রসের মিশ্রণ ঘটাতে ভালোবাসতেন। যখন বাস্তবের আখ্যান নির্মাণ করেছেন তখনও কল্পনার রাশ আলগা করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল তাঁর। স্বপ্নে, দিবাস্বপ্নে, চরিত্রগুলির অন্তর্লোকের ভাবনা এবং সাধারণ বর্ণনাতেও বনফুলের স্বাতন্ত্র্য চিনিয়ে দিয়েছে।

যদি বনফুলের লেখক-জীবনের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসটি বেছে নিতে বলা হয় তাহলে সম্ভবত 'উদয়-অস্ত'-কেই প্রথম নির্বাচনের মর্যাদা দিতে হবে। কেন একথা বলছি—সেটুকু বিশদ করবার চেষ্টা করব এখানে।

বনফুল তাঁর অনেক উপন্যাসেই জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যবহার করেছেন। খুব গভীর অর্থে 'আত্মজৈবনিক' তাঁকে বলব না। শিল্পী-চিত্তের ব্যক্তিগত সংকটের ও দ্বিধার দীর্ণতা ও যন্ত্রণা তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্র-বিষয়ক হয়নি। কিন্তু যেখানে তাঁর বাল্য-কৈশোর জীবনের বসবাস ছিল, ছিল, পিতৃপুরুষের বাসভূমি—উত্তরবিহারের সেই অঞ্চলটি, তাঁর পারিবারিক জীবন, পরিবারের আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে যে অভিজ্ঞতার বৃত্তে তিনি বিচরণ করেছিলেন তার অনেকটাই তাঁর একাধিক উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। সীমাবদ্ধ অর্থে

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস সেগুলিকে বলাও যায়। যে-কারণে তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নায়ক একজন ডাক্তার। ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন রোগ ও রোগীর সমস্যা, বিভিন্ন হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাস-সমূহে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সংসারের বৃত্তিজীবী নায়ক তার বাস্তব পরিচয় নিয়ে বনফুলের উপন্যাসেই প্রথম উঠে এসেছিল 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসে ১৯৩৫ সালে।

'উদয়-অস্ত' (প্রথম খণ্ড ১৯৫৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৪; ডি. এম. লাইব্রেরী) উপন্যাসে এই অভিজ্ঞতার বাস্তব পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে এক বৃদ্ধ বাঙালি চিকিৎসক। উত্তরবিহারে সাহেবগঞ্জে ও কাটিহারের অন্তঃবর্তী এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে তাঁর বসবাস ও পশার ছিল। বহুকাল ধরে চিকিৎসা করেছেন সেখানে। তাঁর নাম সূর্যসুন্দর। ঐগ্রাম ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির ধনী জমিদার থেকে শুরু করে দরিদ্র, দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষদেরও চিকিৎসা করেছেন তিনি। প্রচুর উপার্জনও যেমন করেছেন, তেমনি বহু লোকের উপকার করেছেন, দান করেছেন, বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছেন গরিবের। কারো চাকরি করেননি, কোনো জমিদারের প্রজা ছিলেন না, নিজের স্বাধীন উপার্জনে মাথা উঁচু করে চলতে পারতেন বলে তাঁকে আত্মসম্মানও খোয়াতে হয়নি কখনও। দরিদ্র অবস্থা থেকে জীবন শুরু করলেও নিজের পরিশ্রমে বহু জমিজমা, সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তিনি। ছিলেন আদ্যন্ত সততা-পরায়ণ। আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন বলে সন্তানদের সুশিক্ষিত করেছিলেন সবদিক দিয়ে। সেই ডাক্তার সূর্যসুন্দর জরাজনিত অসুস্থতায় শয্যাশায়ী। হয়তো এই শয্যাই শেষ শয্যা তাঁর। এই সংবাদে তাঁর পরিবারের সকলে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসে পড়েছেন। গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিবাসীরা এসে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যহ, প্রতি ঘণ্টায়। বাড়িতে একদিকে এক মৃত্যু-সম্ভাবনা; অন্যদিকে বহু মানুষের আগমনে সেই গৃহ যেন এক উৎসব-গৃহের রূপও ধারণ করেছে। তাঁবু ফেলা হয়েছে মাঠে—দূর দূরান্তের লোকেরা এসে থাকবে বলে। ডাক্তার সূর্যসুন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি প্রচুর। কিন্তু প্রতিবেশী ধনী ব্যক্তিরাও পাঠিয়ে দিচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, আটা, দুধ, ঘি, ফল, মিষ্টি। সব কিছুরই দেখাশোনা করছে সূর্যসুন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার।

এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি যদি আজকের নগরবাসী মানুষের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয় তাহলে বলতে হবে তা তাঁদেরই অভিজ্ঞতার অভাব। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও বিহার উত্তরপ্রদেশের অনেক অঞ্চলে বাঙালি চিকিৎসকের এমনই সম্মান ছিল। যদি তিনি সুচিকিৎসক হওয়া ছাড়াও একজন সৎ ও সহৃদয় মানুষ হতেন তাহলে আক্ষরিক অর্থেই স্থানীয় মানুষদের কাছে 'দেবতার মতো' ভক্তি ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন। এখনও হয়তো তার কিছু অবশেষ কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে।

ঠিক এই অভিজ্ঞতা ছিল বনফুলের নিজের। তাঁর পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে সাহেবগঞ্জের ওপারে মনিহারি গ্রামে প্র্যাকটিস করেন। পরে তিনি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের আধিকারিক রূপেও কাজ করেছেন। স্ব-গ্রামে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন, ভূ-সম্পত্তি করেছিলেন। ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও উদার মনের মানুষ। বনফুল নিজেও ভাগলপুরে ও বিহারের অন্যান্য দু-একটি স্থানে চিকিৎসক রূপে কাজ করছেন। ভাগলপুরে দীর্ঘদিন তাঁর বসবাস ছিল। 'উদয়-

অস্ত' উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র—প্রধান চিকিৎসক সূর্যসুন্দর স্পষ্টতই তাঁর পিতার চরিত্রের আদর্শে গঠিত। সেই সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার অনেক অংশ।

বনফুলের পিতামহ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তান্ত্রিক কালীসাধক, সেই সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞও। এই চরিত্রটিকেও সূর্যসুন্দরের পিতারূপেই উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়েছে। উপন্যাসটির গঠনে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি সময়-স্তর। একটি বর্তমান। এই স্তরে সূর্যসুন্দর রোগশয্যায় শায়িত। তাঁকে ঘিরে অনেক মানুষের আসা-যাওয়া। কিন্তু অতীতের স্তরটি উঠে এসেছে সূর্যসুন্দরের দিনলিপি থেকে। পিতার অসুস্থতার সংবাদ সর্বত্র প্রেরণ করেছে কনিষ্ঠপুত্র কুমার। সে-ই সংসারের পরিচালক। গ্রামের বাড়িতে থেকে সম্পত্তিব দেখাশোনা করে। তার হাতে এসে পড়েছে পিতার দিনলিপি। সারাদিন ও রাত্রে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে সেই ডায়েরি-র পাতা থেকে পিতার বাল্য, কৈশোর, যৌবনের কাহিনী পড়ে চলেছে। তার মনের চোখে ভেসে উঠছে তার পিতার জীবন। এইভাবে সূর্যসুন্দর হয়ে ওঠেন উপন্যাসের অন্যতম সক্রিয় নায়ক। 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসের অর্ধাংশে সূর্যসুন্দর, তথা বনফুলের পিতা-ই নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত। সূর্যসুন্দরের পিতাও সঙ্গীতজ্ঞ, তান্ত্রিক কালীসাধক। সূর্যসুন্দরও, বনফুলের পিতা সত্যচরণের মতোই মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিলেন, যদিও পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত হননি।

বাস্তবের উপাদান যখনই শিল্পের পরিণতি পায় তখনই সেই উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয় শিল্পীর দৃষ্টিকোণ। এই দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্যেই প্রায় সম-উপাদান নিয়ে গঠিত দুটি রচনা হয়ে যায় পৃথক। এই দৃষ্টিকোণ ব্যাপারটিকে আমরা উপন্যাসের বিবৃতিকারের বাচনের সঙ্গে সবসময়ে একীকরণ করতে পারি না। উপন্যাসের কথক হতে পারেন সর্বজ্ঞ লেখক এবং তৃতীয় পুরুষের অবস্থান থেকে তিনি বিবৃত করে যেতে পারেন সব ঘটনা। এই উপন্যাসে কুমারের মুখে বেশি কথা নেই। সে নীরব কর্মী। বাড়ির বিলিব্যবস্থা করে, সব ঝামেলা সামলায়, অতিথি অভাগ্যতের দেখাশুনা করে। বাবার ডায়রি-টি পেয়েছে সে। বাড়ির কাজের ফাঁকে সময় পেলেই সে ডায়রিটি খুলে বসে। যেন সূর্যসুন্দর কথা বলছেন তারই সঙ্গে। কুমারও যেন পড়তে পড়তেই কথা বলছে তাঁর সঙ্গে। ফলত দীর্ঘতা সত্ত্বেও উপন্যাসটি বিবৃতির একস্বরীয় বৈচিত্র্যহীনতায় আক্রান্ত হয় না।

'উদয়-অস্ত' উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ উত্তর-বিহারের একটি গ্রামের পর্ণ চালচিত্র। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ধনী আর দরিদ্র বাস করে পাশাপাশি। এখনও ভারতে গ্রাম-সমাজেরই প্রধান্য। নগরের বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে আবশ্যিক নিকট-সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী-বসবাসে এই দুই শ্রেণীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় কেবলই কর্মসূত্রে। কিন্তু গ্রামে প্রজা, জমিদার, ঘাতক-মহাজন, গোষ্ঠী-প্রতিবেশী সম্পর্ক নানা কারণেই নিবিড়তর। একে অপরের কাছাকাছি আসে অনেক বেশি। সেই সম্পর্কে শোষণের প্রক্রিয়াই প্রায় সর্বাত্মক। কিন্তু এক ধরনের মৈত্রী-সম্পর্কও কোথাও স্থাপিত হয় না, এমন নয়। অবশ্য সেই মৈত্রায়ণ কেবলই উপরিস্তরের। বড়লোক বড়লোক থাকবে আর গরিব গরিব থাকবে—উভয় গোষ্ঠীতেই দৃঢ়মূল এই বিশ্বাসের ভিতে কোনো ফাটল না ধরিয়েই সেই মৈত্রী-সম্পর্ক অনুভূত হয়। সেখানে জমিদার গরিব প্রজার ঋণের বোঝা কিছু লাঘব করে দিলে প্রজা জমিদারের জয়ধ্বনি দেয়। চিকিৎসক বিনা পারিশ্রমিককে একটি লোককে সুস্থ করে তুললে, সেই

লোকটি 'কেনা' হয়ে থাকে। এই মৈত্রী এই দয়া দেখানোর উপরে প্রতিষ্ঠিত; সাম্য ভাবনার কোনো জায়গাই নেই সেখানে।

আমরা এই পরিস্থিতিকে অন্যায্য বলতে পারি কিন্তু তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই গ্রামীণ দেহাতি জনতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধা মজুরনি—মহাজনের কাছে গায়ে খেটে শোধ করে চলেছে দেনা। কেউ নেই তার। কেউ জোগায় না তার পরনের আস্ত কাপড় বা ভরপেট খাবার। তবু সে ডাক্তারবাবুর ছেলে কুমারকে দেখে স্নেহে আপ্লুত হয়ে যায়। সংসারের সকলের খবর জিজ্ঞাসা করে। যেন তারা ভালো থাকলেই পৃথিবীর সব ভালো! ঠিক এই দৃষ্টিকোণটিকেই বলতে চাই উচ্চ ও মধ্যবিত্তের স্বার্থশ্লিষ্ট দৃষ্টিকোণ। অথচ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা এটাই স্বাভাবিক বলে জানে। বনফুলও সেরকমই ভাবতেন।

আসলে বনফুল ছিলেন স্বভাবত আনন্দময় ব্যক্তিত্ব। জীবনকে ভালোবাসতেন খুব বাস্তব অর্থে। ছিলেন সৌন্দর্য-রসিক, খাদ্যরসিক। মানুষের চরিত্র অকলঙ্ক হয় না—তা তিনি যথেষ্ট জানতেন। বিচিত্র মানবচরিত্রে বহুবর্ণাভায় তিনি আকৃষ্টও হয়েছেন। কিন্তু 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসে, যেখানে পিতার চরিত্র রেখেছেন উপন্যাসের কেন্দ্রের—সেখানে তাঁর পরিবারের কোনো জায়গায় কোনো কলঙ্করেখা চিহ্নিত করতে কলম সরেনি তাঁর।

সমগ্র উপন্যাসটিতে তিনি অনুভব করেছেন জীবন, তথা মহাজীবনের এক উৎসব। মৃত্যুও সেখানে সেই জীবনোৎসবেরই এক অংশ। এই উৎসবের উৎস-কেন্দ্র থেকে জেগে ওঠে জরার শান্ত বির্সজন আর নবীনের আনন্দিত আমন্ত্রণ। প্রজন্মবাহিত প্রাণের প্রসার। সেজন্যেই দেখা যায়—উপন্যাসটিতে একসঙ্গে পাঁচ প্রজন্মের মানুষ উপস্থিত। সূর্যসুন্দর নিজে, ডায়রিতে চিত্রিত তাঁর পিতা, সূর্যসুন্দরের পুত্রকন্যারা, জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহস্পতির পুত্র গগন। আর গগনের স্ত্রী চম্পার গর্ভে বংশের পঞ্চম প্রজন্ম প্রাণবান। সূর্যসুন্দরের শেষ যাত্রার মুহূর্তেই ভূমিষ্ঠ হয় সেই সন্তান।

প্রাণের প্রগতিই এই উপন্যাসের কেন্দ্র-কথা। নাম হওয়া উচিত ছিল 'উদয়-অস্ত' নয়—'অস্ত-উদয়'। বনফুল সমাজ-প্রগতিও অনেকখানি দেখিয়েছেন। যদিও, আগেও বলেছি, সেই প্রগতি মূলত, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার ও সমাজের গতিপথই অনুসরণ করেছে। এই উপন্যাসে একটি বিশেষ সময় ও অঞ্চলের এক 'আলোকপ্রাপ্ত', বিত্তবান বাঙালি পরিবারের বীক্ষণে উত্তর বিহারের গ্রাম-সমাজকে উপস্থিত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকা হিসাবে লেখক প্রথম পর্বের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দিয়েছিলেন। সম্পাদনাকালে আমরা মূল পাঠ অবিকৃত রেখেছি।

বনফুলের এই উপন্যাসগুচ্ছ তাঁকে জীবন-বৈচিত্র্যের এক রূপশিল্পী বলেই প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই শিল্প-রূপবোধের সঙ্গে জীবনের প্রতি দায়িত্বশীল বীক্ষণের গভীরতাও মিশে আছে।

সুস্মিতা চক্রবর্তী

দ্বৈরথ

।। এক ।।

কাছারি-বাড়ির সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। আজ সেখানে বহু লোকের জনতা। 'তৌজি'র দিন। জমিদারের কাছারিতে সকলে খাজনা জমা দিতে আসিয়াছে।

প্রবীণ গোমস্তা হরিহর দাস খাতা খুলিয়া কাছারি-বাড়ির বারান্দার এক কোণে বসিয়া এ অঞ্চলের ধনী মহাজন গোলোকচন্দ্র সাহার সহিত চুপিচুপি কি কথাবার্তা কহিতেছেন।

সম্মুখস্থ নিমগাছটার নীচে বসিয়া কয়েকজন প্রজা একটু উত্তেজিতভাবেই কি যেন আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে রুক্ষপ্রকৃতির একটি যুবক বলিতেছিল, ন্যায্য খাজনা দিয়ে থাকব, তার আবার এত ভয়টা কিসের? ভারি তো আমার—! প্রবীণ-গোছের বিশাই মণ্ডল তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অত রক্ত গরম করলে জমিদার-বাড়িতে কাজ হাঁসিল হয় না। একটু ঠাণ্ডা মেজাজে কথাবার্তা কইতে হয়।

যুবকের মেজাজ ঠাণ্ডা নয়; ফলে কলরব বাড়িতেছিল।

আর একটু দূরে একটি যুবতীকে কেন্দ্র করিয়া আর কয়েকজন প্রজাও দাঁড়াইয়া নানারূপ পরামর্শ করিতেছিল। ব্যাপারটা গোপনীয়। তাহাদের মুখে চোখে সে ভাবটা পরিস্ফুট।

নিকটেই একটা আটচালায় কতকগুলি লোক আহারে ব্যস্ত। দধি, চিঁড়া এবং গুড়ের ফলার চলিতেছে। যে আসিবে, সেই খাইতে পাইবে।

মুন্‌শীজী খাওয়া-দাওয়ার তদারক করিতেছেন।

আটচালার দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি প্রজাকে লইয়া রমজান তহশীলদার বেশ জমাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। বক্তৃতার বিষয়টা এই যে, জমিদার তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে। তাঁহার নির্দেশমতই তিনি উত্থান ও উপবেশন করেন, অর্থাৎ ওঠেন বসেন। সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিতে পারিলে প্রজাদের সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই নাই। প্রজারা হাঁ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিল।

মাঠের মধ্যে দু-একটি গরুর গাড়িও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে নানা জাতীয় উৎসুক ও চিন্তাগ্রস্ত লোক মুখ বাহির করিয়া আছে।

এক জায়গায় সারি সারি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া নগ্নগাত্র কতকগুলি লোক বসিয়া ছিল। তাহারা নিতান্তই গরিব প্রজা। তাহাদের আশ্বাস দিবার কিংবা তাহাদের হইয়া কিছু বলিবার কেহ নাই। ইহাদের সংখ্যাই বেশি। তাহারা নিজেদের মধ্যেই চুপিচুপি কথাবার্তা বলিতেছে। চতুর্দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন।

সহসা চতুর্দিক সচকিত করিয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং নিমেষের মধ্যেই বিশাল অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠকায় দীর্ঘদেহ ব্যক্তি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

সমবেত জনমণ্ডলী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল। আগন্তুক গভীরভাবে শির ঈষৎ আনত করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করিলেন এবং সহিসের হাতে লাগাম ও চাবুক দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের অভ্যাগমে সমস্ত কাছারিবাড়িটা গমগম করিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভুর অনুগমন করিলেন।

।। দুই।।

জমিদার উগ্রমোহন সিংহ একটা উঁচু মসনদের মত আসনে বসিয়া ছিলেন। রাখালবাবু— অর্থাৎ দেওয়ানজী, নিকটেই তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর কর্ণগোচরযোগ্য বিষয়গুলি একে একে বলিয়া যাইতেছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে সিংহ মহাশয় সব শুনিতেছিলেন। আদ্যোপান্ত সব শুনিয়া তিনি আদেশ দিলেন, ডাক তাকে।

সেই রুক্ষপ্রকৃতির যুবকটি আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া উগ্রমোহনবাবু পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলবার আছে তোর? বিধবার গায়ে হাত দিয়েছিস কেন?

ছোকরা আমতা-আমতা করিয়া কি খানিকটা বকিয়া গেল।

উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন, জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব, জানিস? এই মহাব্বত খাঁ!

সঙ্গে সঙ্গে সেলাম করিয়া লম্বা-চওড়া চেহারা চাপদাড়িসমন্বিত মহাব্বত খাঁ হাজির হইল।

উগ্রমোহন হুকুম দিলেন, পঁচিশ জুতি লাগাও।

কম্পিত-কলেবর যুবককে লইয়া মহাব্বৎ খাঁ চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন আবার আদেশ করিলেন, ওর বাপ্‌কে ডাক।

বৃদ্ধ বিশাই মণ্ডল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তোমরা আমার জমিদারি ছেড়ে এক মাসের মধ্যে উঠে চলে যাও। আমার জমিদারিতে তোমাদের স্থান নেই।

হুজুর—

কিছু শুনতে চাই না আমি। এক মাসের মধ্যে যদি তোমরা উঠে না যাও, ঘরে তোমাদের আগুন লাগিয়ে দেব। যাও।

বিশাই চলিয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন, ডাক সেই বিধবাকে।

বিধবা আসিল ও তাহার সহিত তাহার দূরসম্পর্কের এক খুল্লতাতও আসিলেন। খুল্লতাত যেমনই শুরু করিলেন, দোহাই হুজুর, আপনি হলেন আমাদের—, অমনই উগ্রমোহন সপদদাপে বলিয়া উঠিলেন, চোপরাও! কে তোমাকে আসতে বলেছে? এই কোন্ হ্যায়?

খুল্লতাত ত্বরিতগতিতে বহির্গমন করিলেন।

উগ্রমোহন তখন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রামে এত মেয়ে থাকতে তোমার গায়েই বা লোকে হাত দেয় কেন? জবাব দাও।

বিধবা মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিধবা মানুষ, তোমার মাথায় অত খোঁপা কেন? দেওয়ানজী!

হুজুর!

এখনই নাপিত ডেকে এর মাথার চুল কামিয়ে দাও। আর ওকে বুঝিয়ে দাও যে, আবার যদি ওর ওপর কেউ নজর দেয়, ওকেই আমি গ্রামছাড়া করব। সব প্রজাদের তো আমি দূর করে দিতে পারি না। যাও।

যে আজ্ঞা।

বিধবাকে লইয়া দেওয়ানজী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দেওয়ানজী ফিরিয়া আসিলে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আর কি কাজ আছে?

আজ্ঞে, কতকগুলি গরিব সাঁওতাল প্রজা এসেছে, তারা নিবেদন করছে যে—

রূঢ়কণ্ঠে উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাদের নিবেদন, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। বুড়ো বয়সে ঘুষ খাচ্ছ নাকি? ডাক তাদের।

সেই নগ্নকায় প্রজার দল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের বক্তব্যটা উগ্রমোহন আগেই কি করিয়া যেন টের পাইয়াছিলেন। তাহাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাজনাপত্তর কিছু আনিস নি তো?

তাহারা কহিল যে, অগ্‌ঘানি ফসলটা ভাল না হওয়ার দরুন তাহারা সম্পূর্ণ খাজনাটা আনিতে পারে নাই, হুজুর যদি অনুগ্রহ করেন এবং ভগবানের যদি কৃপা থাকে, আগামী বৈশাখীতে তাহারা বাকিটা শোধ করিয়া দিবে।

আচ্ছা। এবার কিন্তু যদি শোধ দিতে না পার, তখন আর কিছু শোনা হবে না।

ইহা শুনিয়া একজন বৃদ্ধ-গোছের প্রজা প্রস্তাব করিল যে, যদি তাহারা শোধ না দেয়, তাহা হইলে হুজুর যেন তাহাদের নিকট হইতে সুদ আদায় করিয়া লয়।

উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন, সুদ! বৈশাখীতে যদি না দাও, জুতো মেরে আদায় করে নেব। সুদের হিসেব করবার আমার সময় নেই।

প্রজার দল চলিয়া গেল।

দেওয়ানজীকে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আর বাকি কি আছে?

আজ্ঞে, গোলোক সাকে ডাকতে বলেছিলেন, সে এসেছে।

ডাক তাকে।

গোলোক সার নাম শুনিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখখানা ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল।

গোলোক সাহা আসিল। গোলোক সাহা এই অঞ্চলে তেজারতী কারবার করিয়া থাকে। তাহার নামে লোকের ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায়—এইরূপ জনশ্রুতি। তাহাকে দেখিয়া বোঝা

দুঃসাধ্য যে, সে যে-কোন মুহূর্তে লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। গোলোক সার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখটি গোলোক সদৃশ। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলোক সাহা অত্যন্ত ভক্তিভরে ভূমিতে ললাটদেশ স্পর্শ করাইয়া উগ্রমোহনকে প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন আসিয়া গোলোক সাহার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, খুব বেশি টাকা হয়েছে, না?

গোলোক সা টালটা সামলাইয়া গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

তর্জনী আস্ফালন করিয়া উগ্রমোহন বলিতে লাগিলেন, আজ এই দ্বিতীয়বার তোমাকে বলে দিচ্ছি, চন্দ্রকান্ত রায়কে তুমি টাকা ধার দিতে পারবে না। যদি দাও, মুশকিলে পড়ে যাবে।

গোলোক সা নয়নে অশ্রু আনিয়া বলিল, চন্দ্রকান্তবাবু তো আপনারই সম্বন্ধী হুজুর। কি করে তাঁর আদেশই বা অমান্য করি?

উগ্রমোহন বলিলেন, তুমি আমার জমিদারিতে বাস করে আমার বিপক্ষ জমিদারকে টাকা দিতে পারবে না। তা সে আমার সম্বন্ধীই হোক, আর যেই হোক। বুঝলে? যাও। আবার যদি খবর পাই যে, তুমি চন্দ্রকান্তকে টাকা দিয়েছ—

আর কি দিতে পারি হুজুর?

যাও।

গোলোক সাহা চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্তের নামে সেই ফৌজদারিটা দায়ের করে দিয়েছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আসামী কাকে কাকে করা হয়েছে?

চন্দ্রকান্তবাবু, রামপিরীত, অহঙ্কার পাঁড়ে।

আচ্ছা। আর কিছু কাজ বাকি রইল নাকি?

আজ্ঞে না। গোপাল পাস করে এসেছে। আপনাকে প্রণাম করবে বলে বাইরে অপেক্ষা করছে।

ডাক।

রাখালবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল আসিয়া প্রণাম করিল।

উগ্রমোহনবাবু বলিলেন, বাঃ, বেশ! দেওয়ানজী, গোপালকে আমাদের হাবেলির চিকিৎসক করে বাহাল করে নাও।

গোপাল ডাক্তারি পাস করিয়া আসিয়াছে।

কাজকর্ম শেষ করিয়া জমিদার উগ্রমোহন সিংহ অশ্বারোহণে কাছারি ত্যাগ করিলেন। ধাবমান অশ্বটার দিকে সকলে সভয়ে চাহিয়া রহিল।

প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের দুর্জয় প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত না। তাহার কারণ এই যে, যদিও তাঁহার জমিদারিতে গরু যথেষ্ট ছিল, কিন্তু একটিও বাঘ ছিল না।

।। তিন।।

সন্ধ্যা আসন্ন।

পশ্চিম দিগন্তে মহাসমারোহে সূর্য অস্ত যাইতেছে। ছোট, বড়, কালো, সাদা, স্তর, স্তূপ— সকল প্রকার মেঘেই অস্তগামী সূর্যের দীপ্ত প্রভাব। কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অস্তগামী রবির আলোক-সমুদ্রে যেন তাহারা ছোট ছোট দ্বীপ। বিভিন্ন ভঙ্গীতে সকলেই যেন এই বিরাট দৃশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অস্তালোকচ্ছটার বিচিত্র অভিব্যক্তির ঐকতানে চরাচর সম্মোহিত। প্রান্তর-লক্ষ্মী ক্ষুদ্র নদীটিও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তাহার উর্মিশিহরিত বক্ষেও এই শাশ্বত স্বপ্নের ক্ষণিক উৎসব। তরঙ্গে তরঙ্গে অবর্ণনীয় বর্ণ-বিন্যাস। সে যেন চঞ্চল গতিবেগকে ক্ষণিকের জন্য সংহত করিয়া অস্তগামী সূর্যকে বর্ণ-অভিনন্দন জানাইতে ব্যগ্র।

দিগন্ত-প্রসারী সরিষার ক্ষেত্র, যেন দিগন্ত-প্রসারী একখানি সোনার স্বপ্ন, লক্ষ কোটি ফুলে আত্মহারা।

মাঠের আলের উপর দিয়া অশ্বারোহণে মন্থরগতিতে উগ্রমোহন এই দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সহসা তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া পরিচ্ছদাদি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুগৌর নগ্ন গাত্রে শুভ্র উপবীত মাত্র শোভা পাইতে লাগিল। চক্রবালরেখা-লীন সূর্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে উগ্রমোহন উদাত্ত কণ্ঠে সূর্য-বন্দনা করিলেন। হস্তে জলের অর্ঘ্য—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

উগ্রমোহনের উদ্ধত শির সূর্যপ্রণামে অবনমিত হইল। সূর্যপ্রণাম শেষ করিয়া উগ্রমোহন মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে পশ্চিম-আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সূর্য অস্ত গেল।

*   *   *   *

উগ্রমোহন যখন বাড়ি ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। শিবমন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি তখনও থামিয়া যায় নাই। তিনি অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। শয়ন-কক্ষে গিয়া দেখিলেন, পত্নী রাণী বহ্নিকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছেন।

মৃদুহাস্যসহকারে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, উপস্থিত কার প্রেমে পড়েছ? জগৎসিংহ, না গোবিন্দলাল?

বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের।

সে আবার কে?

জগৎসিংহকে চেন, অথচ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে চেন না?

কি করে চিনব? কখনও পড়িনি, ও নাম দুটো শোনা ছিল।

এইবার বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া ছদ্মবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, এতকাল কি করেছ তা হলে? আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তো এই সেদিন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও পড়নি?

তোমার দাদার মত উপন্যাস, কবিতা, গান, বাজনা নিয়ে থাকব—এত বড় দুর্মতি কোন কালে আমার যেন না হয়। আমার যৌবন কেটেছে কুস্তিগীরে সঙ্গে, ঘোড়ার পিঠে। উপন্যাস হাতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে নয়। তোমাদের অবশ্য ওসব সাজে।

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া উগ্রমোহনের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত আয়তচক্ষু দুইটিতে তীব্র ব্যঙ্গ যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। কানের হীরার দুল দুইটি যেন দুলিয়া দুলিয়া উগ্রমোহনের এই শোচনীয় মূর্খতাকে নীরবে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। উগ্রমোহন এই নীরব ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় অভিভূত হইয়া অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলিয়া ফেলিলেন, দু দিনেই বোঝা যাবে, কে বেশি বুদ্ধিমান—তোমার দাদা, না, আমি!

বলিয়া তিন মাথার পাগড়িটা নামাইয়া, দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আলস্যভরে গা ভাঙিয়া, দুই হাত কোমরে দিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বহ্নিকুমারী বলিলেন, তোমার বুদ্ধিও তো কম নয়। তা না হলে আমার দাদার দেওয়া 'বাণী' নামটাকে বদলে 'বহ্নি' করে দিলে!

নামটা তোমার পছন্দ হয়নি?

বহ্নিকুমারী কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হাসিতে উগ্রমোহনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিলেন। উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তুমি তো আগুন। তোমার নাম কি বাণী মানায়? উঠিলেন, বহ্নিকুমারীই তোমার উপযুক্ত নাম। পছন্দ হয়নি তোমার? আশ্চর্য!

বলিয়া উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি সোফায় উপবেশন করিলেন। বহ্নিকুমারী নির্নিমেষ নেত্রে এতক্ষণ স্বামীর বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামী উপবেশন করিতেই বিনা ভূমিকায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহু দিয়া তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিলেন, তর্ক থাক, ছাদে চল। কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ!

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, ঠিক করে বল তো তোমার কাকে বেশি ভাল লাগে? আমাকে, না, তোমার দাদাকে? কে ভাল? আমি, না, চন্দ্রকান্ত?

বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, সিংহে আর ময়ূরে তুলনা হয় কি? চল, ছাদে যাই।

উভয়ে ছাদে গেলেন।

এই উপমাটায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সুপুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিতে দিতে তাই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, বাঃ, সুন্দর শানাইটা বাজছে তো! চমৎকার পূরবী ধরেছে।

বহ্নি দেবীর চক্ষু দুইটি নীরব হাস্যে আবার প্রখর হইয়া উঠিল।

উগ্রমোহন পত্নীর চক্ষুর এই ভাষাময় বিদ্রূপ বুঝিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, পূরবী নয়?

না, ইমন-কল্যাণ।

শুনিয়া উগ্রমোহন মনে মনে আবার দমিয়া গেলেন। এ বিষয়ে বহ্নি যে সত্যই বেশি সমঝদার এবং বহ্নির মানসিক এই উৎকর্ষের মূলে যে চন্দ্রকান্তের প্রভাব বিদ্যমান, তাহা অনুভব করিয়া উগ্রমোহন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। দূরে নহবৎখানায় ইমনকল্যাণে শানাই বাজিতেছে। জ্যোৎস্না আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা বহ্নি দেবী বলিয়া উঠিলেন, আমারই ভুল হয়েছিল। এ ইমন-কল্যাণ নয়, পূরবীই।

উগ্রমোহন বলিলেন, তাই নাকি?

এমন সময় নীচে শব্দ শোনা গেল, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো।

উগ্রমোহন উঠিলেন। বলিলেন, চন্দ্রকান্তের পালকি এল। যাই, একটু দাবায় বসি।

উভয়ে নীচে নামিয়া গেলেন।

নীচে বৈঠকখানায় একটি গালিচার উপর দাবার ছকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন বসিয়া আছেন, কে বলিবে এই চন্দ্রকান্তকে ফৌজদারী মকদ্দমায় আসামী করিয়া উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে মকদ্দমা দায়ের করিতে হুকুম দিয়া আসিয়াছেন! চন্দ্রকান্তও যে আসিবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে উগ্রমোহনের একটা জলকর লুঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও তাঁহার মুখ দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব।

বহুকালাবধি এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। বৈষয়িক ব্যাপারে একজন আর-একজনকে জব্দ করিবার জন্য অহরহ সচেষ্ট। অথচ প্রত্যহ সন্ধ্যায় দুই শালা-ভগ্নীপতির একত্র বসিয়া দাবা খেলা চাই-ই।

সন্ধ্যায় দাবার ছক লইয়া দুইজনে যখন বসেন, তখন তাঁহারা যেন পরম মিত্র। আজ পর্যন্ত কেহ কখনও সামনা-সামনি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা আদালতে হওয়াই সঙ্গত, বৈঠকখানায় নহে,—যেমন দাবা খেলার আলোচনা বৈঠকখানাতেই শোভন, আদালতে নহে। ইহাই যেন উভয়ের মনোভাব।

চন্দ্রকান্তের ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। গোলাকার মুখে শুকচঞ্চুর মত নাসা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। চোখে মুখে বুদ্ধির জ্যোতি ঝলমল করিতেছে।

একজন চাকর দুইটি রূপার গেলাসে করিয়া সিদ্ধি লইয়া আসিল।

উভয়ে নীরবে তাহা নিঃশেষ করিয়া আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

ভৃত্য গেলাস লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

।। চার।।

সেদিন সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সূর্যের দেখা নাই। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। পথে লোকজন নাই বলিলেই হয়। চন্দ্রকান্ত রায় নিজের খাস-কামরায় বসিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত রায় শৌখিন লোক তাঁহার বসিবার ঘরটি তাঁহার নিজের রুচি অনুযায়ী সাজানো। টেবিল চেয়ার নাই। প্রকাণ্ড ঘরখানা জুড়িয়া একখানি দূর্বাদলশ্যাম মখমলের গালিচা পাতা। তাহার উপর কয়েকটি শুভ্র ওয়াড়-পরানো তাকিয়া। গালিচার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একখানি রূপার পরাত। পরাতের উপর সুদৃশ্য একটি গড়গড়া মীনার কাজ করা। ঘরের কোণে একটি মেহগনি কাষ্ঠের তেপায়া এবং তেপায়ার উপর সোনা-রূপার কাজ-করা একটি বড় ফুলদানি। ফুলদানিতে তিন-চারটি কেয়াফুল দাঁড় করানো রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার চুনকাম করা। একখানিও ছবি নাই। সেতার এস্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র একটি কোণে ঠেসানো রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত তন্ময় হইয়া বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। প্রিয় ওস্তাদ মিশিরজী তানপুরা হস্তে মিয়ামল্লার গান ধরিয়াছেন—

বুঁদন ভিজে মোরি শারী,
অব ঘর জানে দে বনবারি।
এক ঘন গরজে, দুজে পবন বহত,
তিজে ননদী মোসে দেত গারী।।

—কৃষ্ণের কাছে রাধিকার এই মিনতি গানের সুরে সুরে যেন কাঁদিয়া ফিরিতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। গড়গড়ার নল হাতে ধরাই আছে, তাহাতে টান দেওয়া আর হইতেছে না। এই প্রায়ান্ধকার নিবিড় বর্ষা-প্রভাতে তাঁহার সমস্ত অন্তর গানের তানে ভর করিয়া যমুনার কূলে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে তিনি যেন দেখিতেছেন, একটি গৌরী কিশোরী এক শ্যামকান্তি কিশোরের দুইটি হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে, ওগো, আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই বর্ষায় আমার শাড়ি ভিজিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, জোরে বাতাস বহিতেছে। ননদী আমাকে গালি দিবে। এবার আমাকে ছাড়িয়া দাও।

গান বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই নির্বাক। সুরের রেশ তখনও ঘরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, চমৎকার!

মিশিরজী দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন, হুজুরের মেহেরবানি।

দ্বারপ্রান্তে একজন বলিষ্ঠকায় জমাদার আসিয়া সেলাম করিল। চন্দ্রকান্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর ছোটন সিং?

ছোটন সিং বলিল, গতকল্য তাহারা হুজুরের হুকুম অনুযায়ী যে জলকরটি লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুই মণ মৎস্য তাহারা লইয়া আসিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত দেওয়ানজী তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত রায় বলিলেন, দেওয়ানজী যেন সমস্ত মৎস্যই উগ্রমোহনবাবুর নিকট উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

কোনও খুন-জখম হয়েছে?

তেমন বিশেষ কিছু নয়। রামঅওতার সিপাহীর মাথায় একটু চোট লাগিয়াছে, তবে তাহা সাংঘাতিক কিছু নয়।

আচ্ছা, যাও।

ছোটন সিং সেলাম করিয়া যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, গোলোক সাহা আসিয়া কাছারি-বাড়িতে বসিয়া আছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মিশিরজী বলিলেন, হুজুর যদি হুকুম দেন, তা হলে এবার উঠি। আমার স্নানাদি কিছুই এখনও সারা হয়নি। বলিলেন অবশ্য হিন্দীতে।

আচ্ছা।

মিশিরজী উঠিয়া গেলেন। গোলোক সা প্রবেশ করিল এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

সা-জী, বস। তারপর খবর কি?

গোলোক সা সসঙ্কোচে উপবেশন করিয়া বলিল, খবর ভাল নয়।

ওরে ভজনা, তামাক দিয়ে যা।

ভজনা খানসামা আসিয়া কলিকা লইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত গোলোক সার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, খবর ভাল নয় মানে?

গোলোক সা নিম্নস্বরে উত্তর দিল, ও-তরফে আমার ডাক পড়েছিল। উগ্রমোহনবাবু, আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন কিছুতেই আপনাকে টাকা ধার না দিই।

চন্দ্রকান্তের চক্ষু দুইটি ক্ষণিকের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার শান্তভাব ধারণ করিল। তাঁহার টাকার আর দরকার ছিল না। তথাপি তিনি বলিলেন, টাকা যখন চেয়েছি, তখন দিতে হবে বইকি।

ভজনা খানসামা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে দ্বারদেশে দেখা দিল।

চন্দ্রকান্ত অতি ধীরভাবে বলিলেন, আগামী বুধবার, অর্থাৎ পরশুদিন আমার গোমস্তা রাধিকামোহন তোমার কাছে যাবে।

ভজনা কলিকাটা বেশ করিয়া ধরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

গোলোক সা কাতরকণ্ঠে বলিল, আমার অবস্থাটা হুজুর, একবার ভেবে দেখুন। আমার যে ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর গোছ অবস্থা হল।

বেশ, তুমি আমার জমিদারিতে এসে বাস কর। কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। পীরপুর বাজারে আমার নিজের একখানা খাস বাড়ি আছে। ইচ্ছে করলে কালই তুমি তাতে উঠে আসতে পার।

ভজনা খানসামা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া নলটি প্রভুর হাতে দিয়া পিছু হাঁটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গড়গড়ায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা হলে সব ঠিক রইল। পরশুদিন রাধিকামোহন যাবে।

গোলোক সা খানিকক্ষণ বসিয়া মাথা চুলকাইল। পীরপুরের বাসায় আসিবে কি না, তাহাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। কিন্তু সে যখন কথা কহিল, তখন বোঝা গেল, তাহার চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে কহিল, লেখাপড়াটা তা হলে—

রাধিকামোহনকে আমার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেওয়া আছে। তার জন্যে ভাবনা নেই। টাকাটা তুমি মজুত রেখো। —নির্বিকারচিত্তে তিনি তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন।

গোলোক সা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া অবশেষে বলিল, পীরপুরের বাসাটা—

হ্যাঁ, কালই আসতে পার।

গোলোক সা বিদায় লইল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। অম্বুরিতামাকের সুগন্ধে ঘর ভরিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই চন্দ্রকান্ত জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার বন্ধুগণ শিকার করিয়া ফিরিতেছেন। হাতী গেটে ঢুকিল দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বালাপোশ-খানা গায়ে দিয়া বারান্দায় আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইলেন।

হস্তীপৃষ্ঠ হইতেই একজন শিকারী চিৎকার করিয়া বলিলেন, ওহে, ভারি গুড লাক্। একটা ফ্লরিকান পেয়েছি।

হস্তী উপবেশন করিতেই তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, কায়েমও অনেকগুলো পেয়েছ দেখছি।

শিকারীদের মধ্যে আর একজন বলিলেন, চখাও পেয়েছি গোটা তিনেক।

কলরব করিতে করিতে সকলে অতিথি-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিকারীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিলেন। তখনও টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সে বৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করিয়া চন্দ্রকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভজনা খানসামা ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা ছাতা আনিয়া প্রভুর মাথায় ধরিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, থাক্, দরকার নেই।

অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র দেখা গেল, সেখানে অতিথিদের জন্য ধূমায়িত গরম চা প্রস্তুত। তাহার সঙ্গে গরম ফুলকো লুচি এবং গরম গরম মাছ-ভাজা।

তাড়াতাড়ি বেশ-পরিবর্তন করিয়া সকলে প্রাতরাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন শিকারের গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একজন সিপাহী আসিয়া খবর দিল যে, ম্যানেজারবাবু কোন জরুরি দরকারে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

* * *

বাহিরে যাইতেই ম্যানেজারবাবু বলিলেন, রমেশবাবু বেলা তিনটে নাগাদ এন্‌কোয়ারি করতে আসবেন।

আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রমেশবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উগ্রমোহন সিংহ চন্দ্রকান্তবাবুকে আসামী করিয়া যে মকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, তাহারই সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আসিতেছেন। পূর্বেই এ খবর চন্দ্রকান্ত রায় জানিতেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কেহই বলিতে পারিবে না যে, তিনি আত্মরক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন। উপরন্তু তিনি কলিকাতায় নিমাইবাবুকে তার করিয়াছেন, যেন তিনি অবিলম্বে সবান্ধবে আসিয়া উপস্থিত হন, এই সময়টা শিকার ভাল জুটিবে। নিমাইবাবু দুইজন বন্ধু লইয়া গতকল্য আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নিমাইবাবু চন্দ্রকান্তের সহপাঠী। দুইজনে কলিকাতায় এম.এ.পড়িতেন।

আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত তো ভিতরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিমূঢ় ম্যানেজার কমলাক্ষবাবু প্রভুর এতাদৃশ ঔদাসীন্যের কারণ কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া করতল দুইটি উল্টাইয়া চোখমুখের ভঙ্গীতে নৈরাশ্য-মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া কাছারি-বাড়িতে চলিয়া গেলেন।

* * *

বেলা তিনটার সময় রমেশবাবু ডেপুটি আসিলেন।

আসিয়াই তাঁহার নিমাইবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। নিমাইবাবু রমেশের ভগ্নীপতি।

আরে নিমাই যে, তুমি কোথা থেকে?

গল্প জমিয়া উঠিল। চা খাবার গানবাজনা সহযোগে জিনিসটা আরও উপভোগ্য হইল। চন্দ্রকান্তবাবু হাস্যমুখে অতিথি-সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, রমেশবাবু রিপোর্ট দিলেন, চন্দ্রকান্ত রায় সম্পূর্ণ নির্দোষ। উগ্রমোহনের মামলা ফাঁসিয়া গেল।

।। পাঁচ।।

জমিদার উগ্রমোহন সিংহের বজরা বাহিনী-নদীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। বাহিনী একটি অখ্যাতনাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। গঙ্গার সহিত ইহার যোগ থাকাতে বর্ষার গঙ্গাজলে ইহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই সময় নদীটি যে জলসঞ্চয় করিয়া লয়, তাহাতেই তাহার সারা বৎসর চলিয়া যায়। নদীটির বিশেষত্ব এই যে, নদীটি একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিরাট জঙ্গল, নাম যম-জঙ্গল। সত্যই জঙ্গলে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যমালয় বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে। দিনের বেলায় রৌদ্র প্রবেশ করে না, চতুর্দিকে এমন নিবিড় ঘন অন্ধকার।

মধ্যে মধ্যে অবশ্য ফাঁকা জায়গাও আছে। এরূপ একটি ফাঁকা জায়গায় ঘাট। বজরা ঘাটে ভিড়িতেই চারিজন বরকন্দাজ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; বজরা হইতে নামিলেন উগ্রমোহন সিংহ, তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু এবং দুইটি সুন্দরী বালিকা। বালিকা দুইটির বয়ঃক্রম আট-নয় বৎসর এবং তাহারা দেখিতে প্রায় একই প্রকার। নাম রুম্‌নি ও ঝুম্‌নি। ইহাদের সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। উগ্রমোহনবাবুর মৃতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর একমাত্র কন্যা কমলার বিবাহ হইয়াছিল গরিবের গৃহে। কমলা উগ্রমোহনবাবুর খুব প্রিয় ছিল। সুতরাং কমলার বিবাহের পর উগ্রমোহন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, কমলাকে লইয়া গঙ্গাগোবিন্দ গৃহ-জামাতারূপে থাকুন, উগ্রমোহন তাঁহাকে সমাদরে রাখিবেন। কমলার স্বামী গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র সাধারণ গরিব গৃহস্থ হইলেও এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহার প্রবল ছিল। উগ্রমোহন সিংহও প্রবল প্রকৃতির লোক। সুতরাং খিটিমিটি চলিতেছিল। কমলার মুখ চাহিয়া উগ্রমোহন গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ঝুম্‌নিকে প্রসব করিয়া কমলা ইহলোক ত্যাগ করিল। কমলার মৃত্যুকালে উগ্রমোহন উপস্থিত ছিলেন। কমলা তাঁহাকে যাইবার সময় বলিয়া গেল, মামা, আমার মেয়ে দুটি তোমায় দিয়ে গেলাম। তাদের দেখো।

ইহা প্রায় নয় বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। এই নয় বৎসর ধরিয়া উগ্রমোহন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে লইতে পারেন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আর বিবাহ করেন নাই, কন্যা দুইটিকে লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। উগ্রমোহন বহুবার তাহাদের লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি কিন্তু দেন নাই। বিনীতভাবে তিনি একই উত্তর চিরকাল দিয়া আসিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহ-দৃষ্টি থাকিলেই যথেষ্ট। রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে আমি দিতে পারিব না।

গতকল্য কিন্তু উগ্রমোহনের ধৈর্য ভাঙিয়াছে। এতদিন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে শ্বশুরোচিত ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর নয়। কাল তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পালকি পাঠাইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের এত বড় স্পর্ধা, পালকি ফেরত পাঠাইয়া বিনীতভাবে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে কাল সকালে পাঠাইয়া দিব। রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহাদিগকে আর পাঠাইলাম না। আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।

উগ্রমোহনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সকালে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আসিতেই তাহাদের লইয়া বজরাতে তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে ম্যানেজারবাবুকে লইয়াছেন। কেন, কেহ জানে না। আসিবার সময় বাজারের যত মিষ্টান্ন ছিল সমস্ত কিনিয়া আনিয়াছেন। বাড়িতে বলিয়া আসিয়াছেন, বাগান দেখিতে যাইতেছি। যম-জঙ্গলে উগ্রমোহন সিংহের বাগান আছে। প্রায় পাঁচ শত মহিষ তাঁহার এই জঙ্গলে থাকে।

উগ্রমোহন সিংহ নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, পালকি ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। একটিতে উগ্রমোহন, একটিতে অঘোরবাবু এবং আর একটিতে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আরোহণ করিলেন এবং ত্বরিতগতিতে পালকি তিনখানি নিঃশব্দে বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নধরকায় কৃষ্ণকান্তি মহিষগুলিকে উগ্রমোহন সিংহ মিষ্টান্ন খাওয়াইতেছিলেন—সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপি, যে যত খাইতে পারে। মহিষগুলির চিক্কণ মসৃণ গাত্র হইতে সূর্যকিরণ যেন পিছলাইয়া পড়িতেছিল।

অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে তাহারা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া চলিয়াছে। উগ্রমোহন স্বয়ং দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছেন। হঠাৎ তিনি পরিচারক গোয়ালাটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে, মহিষদের গায়ে শিঙে আজ ঘি মাখিয়েছিস তো?

একটু পরে মাখানো হবে হুজুর।

একটু পরে কেন? সকালে মাখাবার কথা!

বড় বাথান থেকে আজ ঘি এসে পৌঁছয়নি এখনও।

উগ্রমোহন সিংহ হাঁকিলেন, মনক্কা পাঁড়ে!

মনক্কা পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তুম্ আভি যা কর্ বড়া বাথানমে খবর লেও, ঘিউ কাহে নৈ য়হা পৌঁছা।

মনক্কা পাঁড়ে চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে এখন কটা মোষ আছে?

পঞ্চাশটা। বাকি সব বড় বাথানে আছে।

উগ্রমোহন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই বাথানে আসন্নপ্রসবা মহিষীগুলি এবং যে সব মহিষীর বাছুর বড় হইয়া দুধ বন্ধ হইয়াছে, তাহারাই থাকে।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, দুশমন কোথা?

নদীতে আছে।—বলিয়া গোয়ালাটি কণ্ঠ হইতে এক বিচিত্র শব্দ করিতে লাগিল, আঁঃ-হা-হা-হা-হা-হা—আঁঃ-হা-হা-হা। একটু পরে দেখা গেল, মৃদু শব্দ করিতে করিতে কর্দমাক্তদেহ এক বিরাট মহিষ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া আসিতেছে।

দুশমন বিরাটকায় পুরুষ মহিষ। উগ্রমোহনের বড় প্রিয়। উগ্রমোহন স্বহস্তে তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন।

খাওয়ানো শেষ হইলে তিনি তাহার গলদেশে আদর করিয়া একটু হাত বুলাইয়া দিতে দুশমন গলিয়া গিয়া আনন্দে গলা বাড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই উগ্রমোহনের সুসজ্জিত অশ্ব আসিল। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি গভীরতর জঙ্গলে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। মুখে গভীর চিন্তার রেখা। এই পথেই কিছুক্ষণ পূর্বে ম্যানেজারবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া গিয়াছেন।

* * *

জঙ্গলের ভিতর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মন্থরগতিতে আসিতে আসিতে উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সম্বন্ধে যাহা করিবেন, ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্রের নিকট আর ফিরিয়া যাইবে না।

উগ্রমোহনের অশ্ব বনজঙ্গল ছাড়াইয়া একটি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই একজন সহিস ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। উগ্রমোহন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সহিসের হস্তে বল্গা চাবুক প্রভৃতি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যানেজারবাবু এসে পৌঁছেছেন?

সহিস উত্তর দিল, হাঁ হুজুর।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি।

হাঁ হুজুর।

কোথায় তারা?

কাছারি-বাড়িতে আছে।

অল্প দূরেই একটি আটচালা ছিল। মাটির ঘর। কিন্তু আয়তনে প্রকাণ্ড। চতুর্দিকে বারাণ্ডা। ইহা উগ্রমোহন সিংহের জংলি-কাছারি নামে পরিচিত। উগ্রমোহন সেই দিকেই পদচালনা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি, তাঁহার ম্যানেজার এবং প্রবীণ জমাদার ভিখন তেওয়ারি সকলেই একটি সদ্যোধৃত বন্য শশককে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির আগ্রহ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। উগ্রমোহন উপস্থিত হইতেই তাহারা উগ্রমোহনকে আসিয়া ধরিল, দাদু আমরা খরগোশ পুষব।

উগ্রমোহন বলিলেন, তোরা তো সিংহ পুষেছিস। খরগোশের শখ কেন? আমার গোঁফ জোড়া পছন্দ হয় না?—বলিয়া তিনি নিজের পুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিলেন। ম্যানেজারবাবু ও ভিখন তেওয়ারি প্রভুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহাকে রসিকতা-প্রবণ দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া আড়ালে গেল। আড়ালে যাওয়াই নিরাপদ। কারণ উগ্রমোহনের সম্মুখে হাসিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই। একবার এক নায়েব হাসিয়া ফেলাতে উগ্রমোহন তাহার কর্ণ-মর্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দেন। উগ্রমোহন রসিক লোক; তিনি তাঁহার নাতনী বা বয়স্য সকলের সঙ্গেই বেশ প্রাণখোলা রসিকতা করেন। কিন্তু ভৃত্য-স্থানীয় কেহ তাহাতে যোগ দিয়া হাসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শিক্ষা দিয়া দেন।

রুম্‌নি কহিল, খরগোশের কান দুটি সুন্দর।

ঝুম্‌নি কহিল, চোখ দুটিও।

উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি মোড়ায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, তোদের পছন্দ অতি বাজে দেখছি। গোঁফ কই?

ওই তো রয়েছে।

আরে, ওটা কি একটা গোঁফ! আমার দেখ্ তো কেমন!

রুম্‌নি কহিল, আপনি যে এত পাখী পুষেছেন, গোঁফ আছে নাকি কারও? তবে পুষেছেন কেন?

পাখি কেমন গান গায়, কথা বলে! খরগোশ পারবে?

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি দেখিল, তর্ক দ্বারা দাদুকে পরাজিত করা তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহারা উভয়ে তখন দাদুর কোলে চড়িয়া আবদারের সুর ধরিল, না দাদু, আমরা পুষব।

উগ্রমোহন বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। আমারও কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে। আমি এখন এইখানে একমাস থাকব। তোমাদেরও থাকতে হবে। থাকতে পারবে তো আমার কাছে? বাবার কাছে যেতে চাইবে না?

বাবা যদি বকেন?

আমার কাছে থাকলে বকবে কেন?

তুমি এখানে থাকবে এক মাস? দিদি কার কাছে থাকবে তা হলে?

আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দিদিকে দেখে আসব।

তখন আমরা কার কাছে থাকব?

হাসিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, কেন খরগোশের কাছে। অঘোরবাবুও থাকবে।

তখন রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সাগ্রহে বলিল, অঘোরবাবু বেশ লোক দাদু, এই দেখ, আমাদের হাতে কেমন মানুষ এঁকে দিয়েছে।

উভয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সত্যই দুইটি মনুষ্য-মুখ আঁকা আছে, উগ্রমোহন দেখিলেন।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আরও বলিল, কাপড় দিয়ে ঘোমটা করে দিলে কেমন বউ হয়! বলিয়া তাহারা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেব উপর অবগুণ্ঠন রচনা করিয়া মহা খুশী হইয়া উঠিল। উগ্রমোহন বুঝিলেন, চতুর ম্যানেজার বালিকা দুইটিকে বশ কবিয়াছে। তিনি খুশী হইলেন।

* * *

এক ঘণ্টা পরে তিনি ম্যানেজারবাবুকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, নিমাইনগরের মৃন্ময় ঠাকুরের নিকট একটি পালকি এবং একজন সিপাহী পাঠাও। অবিলম্বে তাঁর আমি সাক্ষাৎ চাই।

* * *

সন্ধ্যার অনতিকালপূর্বে জংলি-কাছারির একটি কোণের ঘরে পঞ্জিকা-হস্তে উগ্রমোহন সিংহ বসিয়াছিলেন। সম্মুখে শতরঞ্জির উপর মৃন্ময় ঠাকুর। রোগা-গোছের লোকটি, বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হইবে। দক্ষিণ প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য মুখাবয়বের সেই অংশটি কুঞ্চিত এবং দক্ষিণ চক্ষুটি অস্বাভাবিক ভাবে বিস্ফারিত। এই খুঁতটুকু না থাকিলে মৃন্ময় ঠাকুরকে সুশ্রীই বলা চলিত। মৃন্ময় ঠাকুর নিমাইনগরের একজন বর্ধিষ্ণু প্রজা। সহসা উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে পালকি পাঠাইয়া আহ্বান করিলেন কেন, তাহা মৃন্ময় ঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই এবং বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতেছিল। উগ্রমোহনকে তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন।

সহসা উগ্রমোহন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, দেখ মৃন্ময়, এক বিশেষ জরুরি ব্যাপারে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

অনুমতি করুন।

আগামী তেইশে মাঘ দেখছি বিবাহের ভাল দিন আছে। বলিয়া তিনি পঞ্জিকাটি খুলিয়া আর একবার দেখিলেন। হ্যাঁ, তেইশে মাঘ। আমি মনস্থ করেছি, আমার নাতনী দুটির সঙ্গে তোমার ছেলে দুটির উক্ত দিন বিবাহ দেব।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে বোধ হয় মৃন্ময় ঠাকুর এতটা আশ্চর্য হইতেন না। উগ্রমোহনের কথা শুনিয়া মৃন্ময় ঠাকুর একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহার বিস্ফারিত দক্ষিণ চক্ষুটি আরও একটু বিস্ফারিত হইল মাত্র।

উগ্রমোহন মৃন্ময়ের এই ভাবান্তর গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া বলিয়া চলিলেন, কুলে শীলে তুমি গঙ্গাগোবিন্দের সমতুল্য ঘর। বরং তোমার অবস্থা ভাল। অবস্থার জন্য কিছু যায়-আসে না। আমি আমার নাতনীদের যথেষ্টই দেব। তবে একটা কথা আছে। আমার নাতনী কিংবা নাতজামাইদের আমি যখনই দেখতে চাইব, 'না' বলতে পারবে না। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, গঙ্গাগোবিন্দের অমতে আমি এ বিয়ে দেব। আমি নিজেই সম্প্রদান করব। এ নিয়ে যদি মামলা হয়, তার ভার আমার, বুঝলে? কথা বলছ না কেন?

মৃন্ময় ঠাকুর সব কথা ঠিকভাবে বুঝিয়াছিলেন কি না, তিনিই জানেন; কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, হুজুর যখন ঠিক করেছেন, এতে আর আমার আপত্তি কি থাকতে পারে? এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে বাড়িতে একটু জিজ্ঞাসা করলে হত না?

উগ্রমোহন বলিলেন, তাতে লাভ কি? ধর, যদি তোমার গিন্নী আপত্তি করেন, তা হলে তো সত্যি সত্যি তুমি আর বিয়ে উলটে দিতে পারবে না। তার চেয়ে বরং একেবারে খবর দাওগে যে, উগ্রমোহনবাবুর নাতনীদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করে এলাম। ধানদূর্বা সব এইখানেই আছে, আমার নাতনীদের আশীর্বাদ করে একেবারে বাড়ি যাও।

একটু থামিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন, আমিও আজই তোমার ছেলেদের আশীর্বাদ করে তবে বাড়ি ফিরব।

নির্বাক মৃন্ময় ঠাকুরের আর দ্বিরুক্তি করিবার সামর্থ্য রহিল না।

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার পর রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ঘুমাইলে উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিমাইনগরে পৌঁছিয়া মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের আশীর্বাদ করিলেন।

মনে অসীম তৃপ্তি লইয়া যখন তিনি স্বাগ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন এক প্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশে নক্ষত্রের দীপালী, চতুর্দিক অন্ধকার। সহসা পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণা-চতুর্থীর চন্দ্রোদয় হইল। উগ্রমোহন দেখিলেন, স্বাতীনক্ষত্র চাঁদের কাছেই রহিয়াছে। স্বাতী

চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী। সহসা উগ্রমোহন ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেন, অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। উগ্রমোহন ভাবিতে লাগিলেন, বহ্নি না-জানি এতক্ষণ কি করিতেছে!

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেওয়ানজী কাতরমুখে বসিয়া আছেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর, এখনও বাড়ি যাও নি?

রাখালবাবু ভীতমুখে অস্ফুটস্বরে কেবল বলিলেন, হুজুর—

তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

বিস্মিত উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

মরিয়া হইয়া রাখালবাবু বলিয়া ফেলিলেন, বাহারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে! চন্দনদাস কোথা?

তার সুদ্ধ খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

উগ্রমোহন ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পব জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্ত আজ সন্ধ্যের সময় এসেছিল?

আপনি ফিরেছেন কি না খোঁজ নেবার জন্যে একজন সিপাহী এসেছিল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন বলিলেন, পালকি তৈরি করতে বল। চন্দ্রকান্তের কাছে যাব।

রাখালবাবু পালকিব হুকুম দিতে বাহিরে গেলেন।

* * *

উগ্রমোহনের পালকি আসিয়া চন্দ্রকান্তের খাস-কামরার বারান্দার নীচে থামিল। চন্দ্রকান্ত ভিতরে বসিয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। উগ্রমোহন আসিতেই তিনি বলিলেন, আরে, এস এস। ভারি ভাল একটা গান শিখেছি আজ। শুনবে? ওরে ভজনা, তানপুরাটা আন্ তো রে!

উগ্রমোহন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিছু বলিলেন না।

তানপুরা আনিলে সহাস্যমুখে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, শোন এবার। বাহার চৌতাল, সদারঙ্গের গান। বিনা সঙ্গতেই শোন—

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই—

গান শেষ হইলে উগ্রমোহন বলিলেন, আমার বাহারও চুরি গেছে আজ। চন্দনও সরেছে।

ছদ্মবিস্ময়ে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই নাকি?

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, যাক, গরুর শোকে অতটা উতলা হলে কি মানুষের চলে?

বাহার নাম্নী গাভীকে পাঁচ শত টাকা দিয়া উগ্রমোহন খরিদ করিয়াছিলেন। বাহারের বিশেষত্ব ছিল তাহার গায়ের রঙ—ঠিক বাঘের মত। তাহার পরিচর্যার জন্য উগ্রমোহন একটি পৃথক গোয়ালঘর এবং পৃথক পরিচারক চন্দনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

সহসা সেই বাহারের রহস্যময় অন্তর্ধানে উগ্রমোহন দমিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রকান্তের কথায় তিনি বলিলেন, না উতলা হইনি। তোমার বাহার শুনে মনে পড়ল। এস, একদান দাবায় বসা যাক।

উভয়ে তখন দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিলেন। ভজনা খানসামা দুইটি গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া কপাটটা ধীরে ধীরে ভেজাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

।। ছয়।।

গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র যখন শুনিলেন যে, উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া যম-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়াছেন, তখন তিনি একটু চিন্তিত হইলেন; কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চন্দ্রকান্তের নিকট গেলেন। গঙ্গাগোবিন্দ এবং চন্দ্রকান্ত উভয়ে পরম বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ দারিদ্র্যের জন্য বেশিদূর লেখাপড়া করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তির জন্যই বালক চন্দ্রকান্ত একদা যাচিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। সেই আলাপ কালক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং সেই বন্ধুত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধনীলোকের সংস্পর্শ তিনি যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি উগ্রমোহনের অনুগ্রহমূলক প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই, এবং এইজন্যই তিনি অকারণে চন্দ্রকান্তের নিকট বন্ধুত্বের দাবি লইয়া যখন-তখন হাজির হইতেন না। তিনি নিজের স্বল্প আয়ে ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইতেন এবং অবসর-সময়ে স্থানীয় পাঠাগার হইতে পুস্তকাদি লইয়া তাহাতেই অবসর-বিনোদন করিতেন। সুতরাং যদিও দেবী সরস্বতী তাঁহাকে পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেখা দিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু এমন একজন ভক্তকে তিনি বেশিদিন অগ্রাহ্য করিয়াও থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃত শিক্ষার সত্য আলোকে গঙ্গাগোবিন্দ বাণীর বরলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই ইহা জানিতেন এবং মানিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া চন্দ্রকান্তের মত মার্জিতরুচি জমিদারও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মাঝে মাঝে দুঃখ হইত, গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার নিকট আসেন না বলিয়া। এইজন্যই কিন্তু তিনি আবার গঙ্গাগোবিন্দকে বেশি শ্রদ্ধাও করিতেন। বহুকাল পরে গঙ্গাগোবিন্দ অকস্মাৎ আসাতে চন্দ্রকান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তুমি বাণীর কাছে একটা খবর পাঠাতে পার?

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, চন্দ্রকান্ত, তুমি তো সব জান। কেন তবে আবার এ কথা বলছ?

একটু হাসিয়া চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, আচ্ছা, থাক তবে। আজকের দিনটা দেখই না। আজ যদি খবর না পাও, কাল নাগাদ পাবেই। উগ্রমোহন তোমার মেয়েদের এত বেশি ভালবাসে যে, তাদের কোন অনিষ্ট হবে না, এটা ঠিক।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, তা জানি। কিন্তু আমার নিজের কষ্ট হচ্ছে যে। আচ্ছা, এ কি অত্যাচার বল তো।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, উগ্রমোহন এখনও বালক আছে। স্কুলে, মনে নেই, সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি রকম দাপাদাপি করত ও?

চন্দ্রকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ এবং উগ্রমোহন সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু উগ্রমোহন অন্য স্কুলে পড়িতেন এবং নানা বিষয়ে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেন। সরস্বতীপূজা, দোল, দুর্গোৎসব, স্কুলের খেলাধূলা—সকল বিষয়েই উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কাহার প্রতিমা ভাল হইল, দোলের সময় কে কাহাকে কোন্ অভিনব উপায়ে রঙ দিয়া অপ্রস্তুত করিতে পারে, খেলায় কাহার দল জিতিবে—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের রেষারেষির অন্ত ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দ যদিও চন্দ্রকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বাল্যকালে যদিও তাঁহার চন্দ্রকান্তের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি ছিল; কিন্তু তিনি কখনও এই জমিদার-পুত্রদ্বয়ের ক্রীড়া-কৌতুক-কলহের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন নাই। সসঙ্কোচে তিনি বরাবর দূরে সরিয়া থাকিতেন। এই বিনম্র স্বভাবের জন্যই উগ্রমোহনের পিতা বীরমোহনবাবু গঙ্গাগোবিন্দকে স্নেহ করিতেন এবং এত স্নেহ করিতেন যে, অবশেষে তাঁহাকে নাতজামাই-পদে বরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ শেষে যে তাঁহার ভাগনীজামাই হইয়া পড়িবেন, ইহা উগ্রমোহন ভাবিতেও পারেন নাই।

কিন্তু পৃথিবীতে অভাবনীয় ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। উগ্রমোহন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলেন, যখন তাঁহাকে চন্দ্রকান্তের ভগ্নী বাণীকে বিবাহ করিতে হইল। চন্দ্রকান্তের পিতা সূর্যকান্ত রায় বীরমোহনবাবুর পরম মিত্র ছিলেন এবং বাণীর যেদিন জন্ম হয়, সেই দিনই উগ্রমোহনের সহিত বাণীর বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। চন্দ্রকান্তও হয়তো উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ী কমলাকে বিবাহ করিতেন; কিন্তু কোষ্ঠীবিচার করিয়া দেখা গেল যে, চন্দ্রকান্তের কোষ্ঠীতে এমন কয়েকটি গ্রহ পত্নীস্থানে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতাপ কোন হিন্দুই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ কমলাকে বিবাহ করিলেন। বীরমোহন সিংহ মানুষ চিনিতেন। এই নম্র, সুশ্রী, মেধাবী যুবকের হাতে পড়িলে কমলা যে সুখী হইবে, সে বিষয়ে বীরমোহনের সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার বিচার যে নির্ভুল ছিল, তাহা উগ্রমোহন সিংহ না বুঝুন, কমলা বুঝিয়াছিলেন।

বীরমোহন এবং সূর্যকান্ত সেকালের লোক হইলেও আধুনিকমনা ছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে, সূর্যকান্ত নিজ কন্যা বাণীকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে জনৈকা শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। সেই শিক্ষয়িত্রী, বীরমোহন সিংহ এবং সূর্যকান্তকে জড়াইয়া এখনও স্থানীয় বৃদ্ধগণ নিম্নস্বরে যে সব আলোচনা করেন, তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও বিস্ময়ের বস্তু।

* * *

গঙ্গাগোবিন্দ কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কি করা উচিত তা হলে?

এখন কিছু করো না। আমার মনে হয়, কাল নাগাদ একটা খরর পাবেই। ব্যস্ত কি? রুম্‌নি-ঝুম্‌নি তাদের দাদুর কাছে আছে, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? দাদুও যে-সে লোক নয়,—উগ্রমোহন সিংহ।

গঙ্গাগোবিন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া যাইবার পর চন্দ্রকান্ত খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিত এবং দক্ষিণ করতলের উপর গণ্ড বিন্যস্ত করিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে একটা মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া হাঁক দিলেন, ওরে ভজনা!

ভজনা আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে অবিলম্বে ডাকিয়া আনিতে।

সীতারাম পাঁড়ে বৃদ্ধ জমাদার। চন্দ্রকান্তকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। চন্দ্রকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সুতরাং চন্দ্রকান্ত যখন সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উগ্রমোহনের শখের বাহার নাম্নী গাভী কোথায়, কি ভাবে এবং কাহার জিম্মায় আছে, তখনই সীতারাম ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছু বলিল না। চন্দ্রকান্ত যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বৃদ্ধ সীতারাম সহাস্যদৃষ্টিতে মিটিমিটি চন্দ্রকান্তের দিকে তাকাইতে লাগিল। ভাবা যেন, তোমার আবার একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়াছে, বুঝিয়াছি আমি।

চন্দ্রকান্ত অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেরাজ হইতে দুই শত টাকার নোট বাহির করিয়া সীতারামের হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, যা লাগে খরচ করো, আজ সন্ধ্যের আগে বাহারকে বেমালুম সরানো চাই। আমি এর ভেতরে আছি, তা কিছুতেই যেন প্রকাশ না পায়।

প্রত্যেক বারই চন্দ্রকান্ত এই জাতীয় ছোটখাটো কার্যে সীতারামের সহায়তা লন। ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সকলের নিকটই চন্দ্রকান্ত রায় গম্ভীর প্রকৃতির বুদ্ধিমান জমিদার। কিন্তু সীতারামের নিকট তিনি এখনও বালক মাত্র। শুধু তাই নয়, এই শ্যামকান্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের মধ্যে সীতারাম নিজের আরাধ্য দেবতা নবদূর্বাদলশ্যাম রামজীকে যেন দেখিতে পাইত। তাই স্নেহ-ভক্তি-ভয়-মিশ্রিত আগ্রহে প্রভুর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত সে।

অর্থের লোভ দেখাইলে পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে কি না জানি না, খঞ্জ চন্দন-গোয়ালা মাত্র একশত টাকার লোভে ছাপরা জেলায় চলিয়া যাইতে রাজী হইয়া গেল এবং ট্রেন ধরিবার জন্য দশ ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে অবিলম্বে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রক্ষকবিহীন বাহার সীতারামের নিয়োজিত সাঁওতাল মজুর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া উগ্রমোহনের জমিদারি ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সীতারাম আসিয়া প্রভুকে নব্বুই টাকা ফেরত দিয়া কহিল যে, চন্দনদাস ছাপরা জেলায় চলিয়া গিয়াছে। একশত টাকা লইয়া সেখানে সে নিজের ক্ষেত-খামার করিবে। বাহার গাভীকে টালা নামক জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসিবার জন্য দুইজন সাঁওতাল মজুরকে দশ টাকায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

টালা নামক বনকরটি চন্দ্রকান্ত রায়ের জামদারির অন্তর্ভুক্ত। যম-জঙ্গলের মত ইহাও একটি নিবিড় ও দুর্গম বনভূমি।

সীতারাম চলিয়া যাওয়ার পর গোমস্তা রাধিকামোহন আসিয়া প্রণাম করিল। রাধিকামোহন পূর্বনির্দেশমত গোলোক সাহার নিকট টাকা আনিতে গিয়াছিল।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা পেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তহবিলে জমা করে দাও।

গোলোক বলছিল যে, পীরপুরের বাসাটা—

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। আমার কাছে হুকুম নিয়েছে। বাসার চাবি দিয়ে দাও ওকে।

রাধিকামোহন চলিয়া গেলে পুলকিত চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ওরে ভজনা, তামাক দে, আর মিশিরজীকে একবার ডেকে দে তো।

মিশিরজী আসিলে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওস্তাদজী, বাহার একটা শোনান তো।

খালি বাহার, না, বসন্ত-বাহার?

খালি বাহার।

ওস্তাদজী বাহার আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপ করিবার পূর্বে অবশ্য তিনি চন্দ্রকান্তকে বলিলেন যে, বাহারের সম্পূর্ণ জাতি, নি কোমল লাগে এবং ইহাই তাহার ঠাটের বিশেষত্ব। বিবাদী কিছু নাই, মা অর্থাৎ মধ্যম সম্বাদী।

চন্দ্রকান্ত যত্নসহকারে শিক্ষা করিলেন।

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই,
মন্দ মন্দ পবন বহুত বহু বরণ হোয় সুমন।
কোয়েলা পাপিহাঁ বনমে, ধরত নেক নেক তান
ভ্রমর সব গুঞ্জরাত, কহন যা ত রহ লগন।

গানের সুরে সুরে বসন্তের বর্ণনা মূর্ত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এই গান লইয়াই চন্দ্রকান্ত রহিলেন। সন্ধ্যার পর উগ্রমোহন আসিলেই তাঁহাকে গানটা শুনাইয়া দিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে বাহার নাম্নী গাভী হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাহার সুর একবার আয়ত্ত করিলে সহজে পলাইয়া যাইবে না। উগ্রমোহন এতটা বুঝিলেন কি না ভগবানই জানেন, কিন্তু তিনি বাড়ি গিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে রাণী বহ্নি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

।। সাত ।।

উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চন্দ্রকান্তের বাহার আলাপ শুনিয়া অবধি তাঁহার সর্বশরীরে আগুন ছুটিতেছিল। দাবাখেলায় যদিও তিনি জিতিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্রোধ কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার সাধের গাভীকে যে

চন্দ্রকান্তই চক্রান্ত করিয়া সরাইয়াছে, তাহাতে উগ্রমোহনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাহার গাভীকে অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বাহার রাগের আলাপ শুনাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল, তাহা উগ্রমোহনের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর তিনি যখন পালকি হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত মন তিক্ত।

মৃন্ময় ঠাকুরের বাড়ি হইতে ফিরিবার সময় আকাশপটে চন্দ্রের পার্শ্বে স্বাতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে যে কোমলতার সঞ্চার হইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি চাবুক চালনা করিয়া অশ্বের গতিবেগ বাড়াইয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা লোপ পাইয়াছে। দারুণ ক্রোধে তাঁহার সমস্ত অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল। চন্দ্রকান্ত এবং চন্দ্রকান্তের সম্পর্কে যে কেহ আছে, সকলকে আঘাত করিলে তবে যেন তিনি কতকটা শান্তি পাইবেন—মনের এই অবস্থা।

তিনি বাড়ি ফিরিতেই তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ আসিয়া নিবেদন করিল যে, অন্দরমহল হইতে রাণীমা তাঁহার সম্বন্ধে বারংবার খোঁজ করিয়াছেন।

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, রাণী বহ্নিকুমারী তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়া এস্রাজ আলাপ করিতেছেন, সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে। এস্রাজ দেখিয়া উগ্রমোহনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু ভ্রূকুটি করিলেন। বহ্নিকুমারী এস্রাজ সরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আজ 'ঋতু-সংহার'-এর কথা মনে হচ্ছিল, "প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ"। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া পাগড়িটা নামাইয়া রাখিলেন এবং বহ্নিকুমারীর সম্মুখে বসিলেন। এস্রাজটার দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া বহ্নিকুমারী বলিলেন, একখানা দেশের গান বাজাচ্ছিলাম অনেক দিন পরে। শুনবে? গানটা হচ্ছে—

বৈরন, কোয়লিয়া কুহুক ঘরি ঘরি কুহুক—

বলিয়া তিনি বাজাইতে উদ্যত হইলে উগ্রমোহন বলিলেন, দেখি তোমার যন্তরটা।

এস্রাজটা বহ্নিকুমারী উগ্রমোহনের হাতে দিতেই উগ্রমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া সেটি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর সংক্ষেপে বলিলেন, আমি আজ নীচের ঘরে শোব।

বহ্নিকুমারী কিছু বলিলেন না; কিন্তু শুধু চাহিয়া রহিলেন— সেই নিষ্পলক ভাষাময় চাহনি।

উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, গান গায় পাখিতে, মানুষে নয়।

বহ্নিকুমারী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, তোমার গায়ে বেশ জোর আছে তো।

তাঁহার চক্ষু দুইটিতে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন।

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন, নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শয়ন করিলেন না। শয়নকক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এক চিন্তা—চন্দ্রকান্তকে সমুচিত একটা জবাব দিতে হইবে।

একা অন্ধকার রজনীতে নির্জন শয়নকক্ষে উগ্রমোহন সিংহ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কত কথা মনে হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়া দেওয়া কি এতই শক্ত ব্যাপার? সেদিন চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনের একটা জলকর লুণ্ঠন করিয়াছে। চন্দ্রকান্ত কি মনে করে যে, উগ্রমোহন তাহা পারেন না? মাছগুলা আবার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে! সেইদিনই উগ্রমোহনের ইচ্ছা হইয়াছিল যে চন্দ্রকান্তের সমস্ত জলকরগুলা নির্ম্মমভাবে বিধ্বস্ত করেন; কিন্তু কেন জানি না, সে প্রবৃত্তি বেশিক্ষণ থাকে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় রাত্রে লুকাইয়া লুঠ করা তিনি চৌর্যবৃত্তি মনে করিতেন। উগ্রমোহন সিংহ আর যা হউন, তস্কর নহেন। যদি কাহারও কোন জিনিস কাড়িয়া আনিতেই হয়, তাহা অন্ধকারে লুকাইয়া লইয়া আসাটা পুরুষোচিত নহে। যদি লইতেই হয়, দিবালোকে ছিনাইয়া লইতে হইবে, তাহাতে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে। ইহাই তিনি চন্দ্রকান্তকে দেখাইয়া দিতেন; কিন্তু রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ব্যাপারে তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি এদিকে আর মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই। কিন্তু আজ এই বাহার-অপহরণের ব্যাপারটা—বিশেষ করিয়া বাহারের আলাপটা, তাঁহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। ইহার একটা রীতিমত প্রতিবিধান না করিলে উগ্রমোহন সিংহ পাগল হইয়া যাইবেন।

কি করা যায়? উগ্রমোহন গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। তেমন কোন মনোমত উপায় মনে আসিতেছে না। আস্তাবল হইতে চন্দ্রকান্তের ঘোড়াগুলি সরাইয়া দিবেন? প্রস্তাবটা মনে হইতেই উগ্রমোহনের সমস্ত অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ছি, ছি, ঘোড়া চুরি! চন্দ্রকান্ত গরু চুরি করিতে পারে, কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

পায়চারি করিতে করিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সহসা উগ্রমোহন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠিক তো, একথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একগোছা চাবি বাহির করিলেন। আলোর নিকট লইয়া গিয়া সেই চাবির গোছা হইতে মরিচা-পড়া একটা চাবি বাছিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর যাইতেই একজন দীর্ঘকায় আসাসোঁটাধারী লোক আসিয়া উগ্রমোহনকে আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিল। হাবেলির নৈশপ্রহরী। উগ্রমোহন তাহাকে লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সিধা অন্দরমহলের দেউড়ী পার হইয়া খাজাঞ্চিখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। খাজাঞ্চিখানার তোরণেও একজন বন্দুকধারী পাহারা ছিল। এই অসময়ে প্রভুকে দেখিয়া সে সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন খাজাঞ্চিখানার দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। তিনি বাহিরে আসিয়া

প্রহরীকে একটা আলো আনিতে বলিলেন। আলো আসিলে উগ্রমোহন ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। বিস্মিত প্রহরী প্রভুর এই অদ্ভুত আচরণে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ঘণ্টা-ঘরে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

উগ্রমোহন ভিতরে গিয়া বড় লোহার সিন্দুকটা খুলিলেন। সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা বড়-গোছের ক্যাশ-বাক্স বাহির করিয়া নিকটস্থ তক্তাপোশের উপর রাখিলেন। তারপরে ক্যাশ-বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা ছোট রূপার বাক্স বাহির করিলেন। রূপার বাক্সটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উগ্রমোহন সিংহ সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। গোলাপী রঙের একখানি কাগজ। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মন নিমেষের মধ্যে দশ বৎসর পার হইয়া অতীতে ফিরিয়া গেল। তখন চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের সবে যৌবনউন্মেষ হইয়াছে, চিঠি পড়িতে পড়িতে উগ্রমোহন যেন রেশমকে দেখিতে পাইলেন। আজ উগ্রমোহন সিংহ রেশমকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু একদিন এই রেশমের স্বপ্ন উগ্রমোহনের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া

পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া উগ্রমোহনের সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পত্রখানি সযত্নে মেরজাইয়ের পকেটে রক্ষা করিয়া তিনি রূপার বাক্স ক্যাশ-বাক্সের মধ্যে এবং ক্যাশ-বাক্সটি লৌহসিন্দুকে পুনরায় রাখিয়া সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং খাজাঞ্চিখানার দ্বারদেশে যথারীতি তালা লাগাইয়া আবার নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। অজানা ফুলের গন্ধ বহিয়া তীব্র শীতের বাতাস তখন অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন শয়নকক্ষে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ভিন্ন মূর্তিতে। তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রিয়া রেশমও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের বাসন্তী-কুঞ্জে আবার পিক কুহরিয়া উঠিল।

এই গভীর নিশীথে উগ্রমোহনের মানস-পটে ছায়াছবির মত কত কি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কে বলে, অতীত মৃত? অতীত চিরঞ্জীব। অতীতের প্রাণরসের অমৃতধারা পান করিয়া নিত্যপরিবর্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বর্তমান বাঁচিয়া আছে। পরিবর্তনের দাবি মিটাইতে গিয়া বর্তমান মুমূর্ষু। স্মৃতির সুধা পান করিয়া অতীত অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার মৃত্যু নাই।

উগ্রমোহন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রেশম কি আজও বাঁচিয়া আছে? বর্তমানে রেশম বলিয়া হয়তো কেহ বাঁচিয়া নাই, কিন্তু অতীতের রেশম যে জীবন্ত! হাসিতে গেলে তাহার গালে যে টোল খাইয়া যাইত, সেটুকু পর্যন্ত এখনও বাঁচিয়া আছে? চলিয়া যাইবার দিন রেশম যে কাঁদিয়াছিল, তাহার সেই অশ্রুধারা এখনও তো শুকায় নাই। তাহার সাবলীল নৃত্যভঙ্গীর নূপুর-গুঞ্জন এখনও যে উগ্রমোহনের অন্তরলোকে গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে। সবিস্ময়ে উগ্রমোহন দেখিলেন, নানা বেশে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিতে রেশম বাঈজী তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন-লোকে লুকাইয়া ছিল, সহসা যাদুমন্ত্রে বর্তমানের যবনিকা সরিয়া গেল, রেশম বাঈজি সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল—মুখে সেই মৃদু হাসি, সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া সেই সবুজ ওড়না, সুর্মা-মাখানো ডাগর চোখ দুটিতে সেই রহস্যাভাস, অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যচটুল সেই লীলাভঙ্গি। মুগ্ধ উগ্রমোহন দেখিতে লাগিলেন। মনে পড়িল গভীর রাত্রে অশ্বারোহণে সেই উন্মুখ অভিসার। সূর্যোদয়ের পূর্বে সুগোপন প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু রেশম থাকে নাই। ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, উগ্রমোহনের সমস্ত কল্পনা ও স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া। বহুকাল পরে আজ আবার সে ফিরিয়াছে। উগ্রমোহন একদৃষ্টে গোলাপী কাগজটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা মৃদু হাস্য তাঁহার অধরে ফুটিয়া উঠিল। সচ্চরিত্র চন্দ্রকান্তের চরিত্র সৌরভে আজিও সকলে পুলকিত!

রেশম যেদিন চলিয়া যায়, সেদিন এই পত্রখানি উগ্রমোহনকে দিয়া গিয়াছিল। তাহার হাতের স্পর্শ এখনও যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। রেশমের মিনতিভরা চোখ দুইটি মনে পড়িল।— ইহা লইয়া তোমরা দুইজনে ঝগড়া করিও না, আমার অনুরোধ।—বলিয়া সে এই পত্র উগ্রমোহনের হস্তে দিয়াছিল। উর্দুতে লেখা চন্দ্রকান্তের পত্র—প্রেমপত্র। একটি আতর-সুগন্ধি গোলাপী কাগজে কবিত্বময় ভাবে ও ভাষায় চন্দ্রকান্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রেশমকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে। পত্রের মধ্যে একটি ফার্সী বয়েৎও রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছে—হে সুন্দরী, কাননে গোলাপ ফোটে, সে কি কেবল একটি ভ্রমরের জন্য? পূর্ণিমার অপরূপ জ্যোৎস্না কি একটি চকোরের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বিরহী অলিগণের উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে গোলাপ শুকাইয়া যাইত, হতাশ চকোরদের বিরহের কৃষ্ণমেঘে চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইত। যাহা অনবদ্য, যাহা অসাধারণ, তাহা সকলের জন্য। আমার অন্তর পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ অন্তরের সমস্তটা উজাড় করিয়া না দিলে তৃপ্তি পাইতেছি না। তুমি এস। তোমার জন্য উন্মুখ আগ্রহে বসিয়া আছি। সম্রাট শাহজাহানের রচিত একটি বয়েৎ মনে পড়িতেছে—

আগর বে-খবর-ম্ জুদ্ দর আয়ি, চে শাওয়াদ্?
মানন্দ্-এ-নছীম্ এ সহর আয়ি, চে শাওয়াদ্?
হর-চন্দ্ কে বু-এ-গুল্ জে গুল্ আয়েদ পেশ
আর গুল্ তু জে-বু পেশতর, আয়ি, চে শাওয়াদ্?

প্রভাত-সমীরণের মত তুমি কোন খবর না দিয়েই এস। ফুলের গন্ধ ফুলের আগে আগে যায় বটে, কিন্তু ফুলই যদি আগে আসে তাতে ক্ষতি কি?

বিদায়কালে রেশমের চক্ষে যে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছিল, তাহা যেন উগ্রমোহন এখনও দেখিতে পাইতেছেন। চন্দ্রকান্তের পত্র পাইয়াই রেশম চলিয়া গিয়াছিল, আর সে ফিরিয়া আসে নাই। রেশমের বিরহে উগ্রমোহন দশ দিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। এই চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তখন কলহ করার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই। তাহার পর দশ বৎসর ধরিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, কত ঘূর্ণাবর্ত কত কি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, উগ্রমোহন রেশমকে ভুলিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের এই পত্র এতদিন উগ্রমোহনের কাছেই সযত্নে রক্ষিত ছিল। আজ সহসা উগ্রমোহনের এই পত্রখানার কথা মনে পড়িয়াছে। ঠিক করিয়াছেন, পত্রখানাকে এইবার কাজে লাগাইবেন। পত্রখানা প্রকাশ করিয়া দিলে চন্দ্রকান্তের সম্মানের প্রভূত ক্ষতি উগ্রমোহন করিতে পারেন। কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ সিংহই, শৃগাল নহেন। তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

তুমি একদা রেশমকে যে প্রণয়লিপি লিখিয়াছিলে, তাহা এতদিন আমার কাছেই ছিল। পুরাতন বাক্স খুলিয়া অদ্য তাহা বাহির করিলাম। দশ বৎসর পূর্বে ইহা লইয়া আমি ও রেশম বহু হাসাহাসি করিয়াছি। এখন আর ইহাতে হাসিবার কিছু নাই। তাহা ছাড়া, তোমার উচ্ছ্বাস তোমার বাক্সে থাকাই শোভন বিবেচনা করি।

উগ্রমোহন

সীলমোহর করিয়া পত্রটি নৈশ প্রহরীর হস্তে দিয়া আদেশ করিলেন, খুব ভোরেই চিঠিখানি চন্দ্রকান্তবাবুকে দিয়া আসা চাই।

তাহার পর উগ্রমোহন খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সামনের বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রেশমের কথা, রেশমের মুখ, রেশমের ভঙ্গিমা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। কত কথাই না মনে হইল! রেশমের খোঁজ পান নাই। কলিকাতার সেই এক মাস প্রবাসের কথা মনে করিয়া উগ্রমোহনের সর্বদেহ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। এলোমেলো নানা চিন্তা মনে আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ একাকী পদচারণা করিয়া যখন তিনি শুইতে যাইবেন, তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, রেশম নয়,—রাণী বহ্নিকুমারী। উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিতে সহাস্য কৌতুক-দীপ্তি।

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ অস্ত যাইতেছে, স্বাতী পাশটিতেই আছে।

পরদিন প্রভাতে ভৃত্য ব্রজলাল প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিয়া দেখিল যে, উগ্রমোহন অঘোরে ঘুমাইতেছেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একটি ভাঙ্গা এস্রাজ রহিয়াছে।

সে আর ঘুম ভাঙাইতে সাহস করিল না।

।। আট।।

বেলা প্রায় দশটার সময় উগ্রমোহন সিংহ বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। মন বেশ প্রসন্ন। দুইজন প্রজার খাজনা মাফ করিয়াছেন। আর একজন প্রজা তাহার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিয়াছে, তিনি সহানুভূতির সহিতই তাহা শুনিতেছেন। প্রজাটি বলিতেছিল যে, শীঘ্রই তাহার কন্যার বিবাহ হইবে, হাতে টাকা কম, ফসলও যে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে তাহা নয়। তাহা

ছাড়া সম্প্রতি বাজার এমন মন্দা পড়িয়া গিয়াছে যে, ষোল-আনা ফসল হইলেও কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিতে পারে। এ অবস্থায় হুজুর দয়া না করিলে উপায় নাই।

উগ্রমোহন সটকায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া বলিলেন, কবে তোর মেয়ের বিয়ে?

আর দিন কই হুজুর?

আমাকে নেমন্তন্ন করবি না?

দরিদ্র প্রজা একটু থতমত খাইয়া গেল। 'না' বলিতেও তাহার সাহসে কুলায় না, অথচ উগ্রমোহন সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে কি খাইতে দিবে, কোথায় বসিতে দিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, গরিবের কুঁড়েঘরে হুজুরের পায়ের ধুলো যদি পড়ে, সে তো আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করব। করব কেন, করলাম, যাবেন দয়া করে।

কবে তোর মেয়ের বিয়ে? কোন্ তারিখে?

তেইশে মাঘ।

তারিখটা শুনিয়াই তাঁহার রুম্‌নি-ঝুম্‌নির কথা স্মরণ হইল।

দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেওয়ানজী, গঙ্গাগোবিন্দ বাড়িতে আছে কি না, একবার খবর নিন তো।

তাহার পর প্রজাটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোর খাজনা কিছু মাপ করে দিলাম। বকেয়া বাকি যা আছে, তা আর দিতে হবে না। হালের যা বাকি পড়েছে, তাই দিলেই ফারক পাবি। ওহে অক্ষয়!

অক্ষয় নামক গোমস্তাটি আসিয়া দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন, এর মেয়ের বিয়ের দিন আধ মন দই আর আধ মন মাছ এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। তার সঙ্গে এক জোড়া ভাল শাঁখা, রূপোর সিঁদুরকৌটো, ভাল একখানা শাড়ি, কিছু ধান আর দূর্বা পাঠাবাব ব্যবস্থা করে দিও। নানা কাজে আমি ভুলে যেতে পারি।

এমন সময় একজন সিপাহী আসিল—চন্দ্রকান্তের সিপাহী।

সেলাম করিয়া একখানি পত্র সে উগ্রমোহনের হাতে দিল।

পত্র খুলিয়া উগ্রমোহন পড়িলেন—

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া পরম সুখী হইলাম। তোমার যে এমন সূক্ষ্ম রসবোধ এখনও আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি। কিছুদিন পরে সেতারী মীর সাহেবের আসিবার কথা আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একজন ভাল নর্তকীও আনাইব মনস্থ করিয়াছি। পুরাতন প্রসঙ্গ আবার আলোচনা করিবে নাকি? ভাল কথা, সেবার কলিকাতায় গিয়া রক্তদুষ্টির জন্য চিকিৎসাদি করাইয়াছিলে বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহার ব্যবস্থাপত্রগুলি কি করিয়া আমার বাক্সে স্থান পাইয়াছে। এগুলি তোমারই কাছে থাকা সঙ্গত মনে করিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

চন্দ্রকান্ত

পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যদিও তিনি নিজেকে সামলাইয়া সহাস্যমুখে সিপাহীটিকে বলিলেন, আচ্ছা যাও, বাবুজীকো হামারা সেলাম কহনা। কিন্তু তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আত্মসংবরণ করিয়া সেখানে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি খাস-কামরার মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ক্রোধে ক্ষোভে আবার তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কলিকাতা-প্রবাসের কথা তাঁহার মনে পড়িল। যৌবনের উন্মাদনায়, রেশমের বিরহে, হয়তো বা—। নাঃ, এতদিন পরে কার্যকারণের পারম্পর্য ঠিকমত আলোচনা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপিয়া কলিকাতার একটা বীভৎস স্মৃতি পচা পাঁকের মত ভটভট করিতে লাগিল। তাহা কেবল পাঁকই, পঙ্কজ সেখানে নাই—দুঃসহ গ্লানিকর পাঁক। উন্মত্ত আবেগে উগ্রমোহন একদা সেই পঙ্কস্নান করিয়াছিলেন। তাহার ফলভোগও করিয়াছিলেন, অত্যন্ত মোটা রকম দক্ষিণা দিয়া প্রায়শ্চিত্তও তিনি করিয়া আসিয়াছেন। এতদিন সেজন্য তাহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। দুর্দান্ত যৌবনের ক্ষুধিত কামনা মিটাইতে গিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে অপুরুষোচিত বা কাপুরুষোচিত কিছু ছিল না। প্রথমে যখন ঘোড়ায় চড়া শিখিতে যান, তখনও তো পড়িয়া গিয়া কতবার কত আঘাত পাইয়াছেন। শূকর শিকার করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে একটা মানুষকেই তিনি একবার গুলি করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের দুষ্কৃতিগুলিও অনুরূপ ঘটনা।

কিন্তু আজ সহসা এই ব্যবস্থাপত্রগুলি চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে পাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিল। তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র চন্দ্রকান্ত পাইল কি করিয়া? নিষ্ফল আক্রোশে উগ্রমোহন ফুলিতে লাগিলেন। এমন সময় গলার মৃদু আওয়াজ করিয়া কে যেন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল মনে হইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

আজ্ঞে হুজুর, আমি। — বলিয়া একটি খর্বাকৃতি লোক দ্বারদেশে দেখা দিল এবং অতিশয় ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ও, মানিক মণ্ডল! কি খবর? এস, ভেতরে এস।

মানিক মণ্ডল লোকটিকে উগ্রমোহন একটু অনুগ্রহ করেন, তাহার কারণ মানিক মণ্ডল তাঁহার গুপ্তচর—ইংরেজীতে যাহাকে বলে, স্পাই। এ খবর অবশ্য বাহিরের লোকে জানে না।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন নতুন খবর আছে নাকি? মানিক মণ্ডলের সহিত যদি কোন পশুর সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা মূষিকের। ক্ষুদ্র সূচালো মুখ। নাকটি ছোট, কিন্তু তীক্ষ্ণ। চক্ষু দুইটিও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত চঞ্চল। উগ্রমোহনের কথায় সে পীতাভ এক পাটি দাঁত বাহির করিয়া কহিল, নতুন খবরটা কি হুজুরের এখনও কর্ণগোচর হয়নি? আমি কদিন একটু অসুস্থ ছিলাম বলে—

অধীরভাবে উগ্রমোহন বলিলেন, ভণিতা রাখ। খবরটা কি, তাই সোজা করে বল।

গোলোক সা চন্দ্রকান্তবাবুর জমিদারিতে উঠে গিয়ে বাস করছে।

তাই নাকি? চন্দ্রকান্তকে টাকা ধার দিয়েছে, জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বইকি। রাধিকামোহন এসে টাকা নিয়ে গেছে, সে খবরও আমি পেয়েছি।

গোলোক সা কোথায় আছে এখন?

পীরপুরে। চন্দ্রকান্তবাবুরই একটা বাসা ছিল—

রাখালবাবু!—উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন।

গতিক খারাপ দেখিয়া মানিক মণ্ডল কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালবাবু আসিতেই উগ্রমোহন বলিলেন, যম-জঙ্গলে এখন কত সিপাহী মোতায়েন আছে?

পঞ্চাশজন।

এখানে এখন কতজন আছে?

এখানেও জনা-পঞ্চাশেক হবে।

দুধনাথ পাঁড়েকে ডেকে দিন।

রাখালবাবু চলিয়া গেলেন। উগ্রমোহন চক্ষু বুজিয়া খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। দুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন হুকুম দিলেন, কাল সকালে বিশ-পঁচিশজন সিপাহী নিয়ে চন্দ্রকান্তবাবুর জলকর বাঘাড় বিল লুঠ করা চাই। খুন-জখম যা হয় কুছ-পরোয়া নেই। গায়ে পড়ে ঝগড়া করে ফৌজদারী দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে। মোট কথা, বাঘাড় বিলে কাল রক্তের স্রোত বয়ে যাওয়া চাই।

যো হুকুম।—বলিয়া দুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেল। দুধনাথ পাঁড়ের একখানি হাত নাই। জমিদারী ব্যাপারে কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রকান্ত রায়ের সহিত উগ্রমোহনের ভীষণ দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় দুধনাথ পাঁড়ের দক্ষিণ হস্তটি কাটা যায়, এবং সেই দাঙ্গাতেই স্বয়ং উগ্রমোহন একটি দাঁতাল হাতীর দাঁতে বড় বড় দুইটি বাঁশ বাঁধিয়া ডাঙশ মারিতে মারিতে সেই বিপুলকায় হস্তীকে চন্দ্রকান্তের বাহিনীর বিরুদ্ধে চালিত করিয়া যুদ্ধজয় করেন। দুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দিয়া অন্দর-মহলের দিকে চলিয়া গেলেন।

।। নয় ।।

আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর রাখাটা যতদূর হাস্যকর, জাহাজের ব্যাপারীর পক্ষে আদার খবর রাখাটা ততদূর নহে। কাহারও কাহারও নিকট ইহাই হয়তো বিস্ময়ের বস্তু। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লইয়া যাঁহার কারবার, আদা-জাতীয় সামান্য দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইলে আমরা স্বভাবতই তাঁহার প্রতিভার সর্বতোমুখী প্রসার দেখিয়া মুগ্ধ এবং বিস্মিত হই।

চালভাজা খাওয়াটা এমন কোন বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে; কিন্তু যখনই আমরা শুনি, অমুক মহারাজাধিরাজ চালভাজা খাইতে ভালবাসেন কিংবা আমেরিকার অমুক কোটিপতি সুন্দররূপে জুতা বুরুশ করিতে পারেন, অমনই চমৎকৃত হইয়া যাই।

সুতরাং জমিদার উগ্রমোহন সিংহের প্রকাণ্ড জমিদারির সুদক্ষ ম্যানেজার অঘোরবাবুকে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত ছেলেমানুষের মত লুকোচুরি খেলিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন।

অঘোরবাবুর শিশুমনস্তত্ত্বে যে এতখানি পারদর্শিতা ছিল, তাহা বোধ করি তিনি নিজেও জানিতেন না। কিন্তু 'ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে' নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি শিশুমনোরঞ্জনে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োগ করিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জটিল মকদ্দমায় জয়লাভ করিতে হইলে যে ধরনের বুদ্ধিকৌশল প্রয়োজন, শিশুহৃদয় জয় করিতে হইলে সে সবের প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু ইহাতেও কৌশলের প্রয়োজন আছে, যদিও তাহা বিভিন্ন জাতীয়। সুতরাং লুকোচুরি, কানামাছি প্রভৃতি খেলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং ইহাতে তিনি কৃতকার্যও হইয়াছেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে লইয়া সমস্ত দিন হৈ-চৈ করিতেছে।

অঘোরবাবু আয়োজনের কোনও ত্রুটি করেন নাই। সম্মুখস্থ তিনটি বড় বড় বৃক্ষে তিনটি দোলনা টাঙানো হইয়াছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি এবং অঘোরবাবু তিনজনে পাল্লা দিয়া তাহাতে দোল খাইয়া থাকেন। কোথা হইতে একটি বাঁদরছানাও তিনি যোগাড় করিয়াছেন, নিমগাছটার শিকড়ের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধা আছে। এই জীবটির নানাবিধ মুখভঙ্গী রুম্‌নি-ঝুম্‌নির পক্ষে পরম কৌতুকের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। খরগোশটি তো আছেই। তাহার জন্য নূতন একটি খাঁচাও নির্মিত হইয়াছে। দুই জোড়া পারাবতও জুটিয়াছে। তাহাদের বক্‌বকম্‌ ধ্বনিতে কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণ মুখরিত।

অঘোরবাবু লোকটিকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার মধ্যে এতটা তরল মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। ভদ্রলোকের গায়ের বর্ণ ঘোর কালো। মুখখানা লম্বা-গোছের, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, পাথরের তৈয়ারি। অভিব্যক্তিবিহীন মুখের উপর মনের কোন ছাপ নাই। এক জোড়া ঝোলা তামাটে রঙের গোঁফ থাকাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে আরও ভয়ঙ্কর এবং বেরসিক বলিয়া বোধ হয়। অঘোরবাবু একজন তান্ত্রিক কালী-সাধক। এখনও মধ্যে মধ্যে চামাপ্রান্তরস্থিত মহাকালীর মন্দিরে গিয়া অমাবস্যায় তিনি কালীপূজা করেন। কিন্তু তিনি যে এমন নিখুঁতভাবে মোরগের ডাক ডাকিতে পারেন, তাহা এতকাল কেহ জানিত না। শুধু মোরগ কেন, মুখে চাদর ঢাকা দিয়া বিড়াল ও কুকুরের ঝগড়া তিনি এমন সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বাবার কাছে কবে ফিরে যাব, বল না। স্তোকবাক্যে অঘোরবাবু অপটু নহেন, সুতরাং দিন মন্দ কাটিতেছিল না। এত অজস্র আমোদপ্রমোদ রুম্‌নি-ঝুম্‌নির জীবনে এই প্রথম।

সেদিন প্রাতঃকালে কুমীর-কুমীর খেলা হইতেছিল। অঘোরবাবু প্রাঙ্গণের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়া কুম্ভীর সাজিয়া বসিয়া ছিলেন। চক্ষু দুইটি অর্ধমুদিত। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থিত একটি উচ্চ চৌতারাকে ডাঙা কল্পনা করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়া ছিল এবং সুযোগমত কুম্ভীর-রূপী অঘোরবাবুকে খোঁচা দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল। অঘোরবাবুও তাহাদের ধরিতে না পারার ভান করিয়া ছদ্ম-ক্রোধে হাউ-মাউ করিয়া গর্জাইতেছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কলহাস্যে লুটাইয়া পড়িতেছিল। খেলা বেশ জমিয়াছে, এমন সময় ভিখন তেওয়ারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, খরগোশটি পলাইয়াছে, খাঁচার দরজা খোলা ছিল।

অকস্মাৎ এই মর্মান্তিক সংবাদ শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অঘোরবাবু এমন একটা মুখভাব করিলেন, যেন জমিদারির একটা মৌজা বেদখল হইয়া গিয়াছে। তিনজনেই ঘটনাস্থলে অবিলম্বে গেলেন এবং আশেপাশে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রুম্‌নি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এই যে, এই বাক্সটার পেছনে রয়েছে। ওই যা, আবার পালাল!

খরগোশ ঘর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া সোজা ছুট দিল। অঘোরবাবু, ভিখন তেওয়ারী, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সকলেই দৌড়িয়া একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ভিখন তেওয়ারী অভিমত প্রকাশ করিল যে, উহাকে খুঁজিয়া পাওয়া এখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা। মংলু মাঝিকে খবর দিয়া সে মালকাইনদের জন্য আবার খর্‌হা সংগ্রহ করিয়া দিবে। এ জঙ্গলে খরগোশের অভাব নাই। অঘোরবাবুর দিকে ফিরিয়া সে অনুমতি ভিক্ষা করিল যে, হুজুর যদি হুকুম দেন, তাহা হইলে সে এখন ভান্‌সা-ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে ফিরিয়া যায়, কারণ সে অধন্‌ অর্থাৎ ভাতের জল চড়াইয়া আসিয়াছে। অঘোরবাবু অনুমতি দিলেন। ভিখন তেওয়ারী চলিয়া গেলে রুম্‌নি বলিল, ও যাকগে। আমরা আর একটু খুঁজে দেখি চল।

ঝুম্‌নি তৎক্ষণাৎ তাহা সমর্থন করিয়া বলিল, ও নিশ্চয়ই এইখানে কোথাও আছে, অতটুকু বাচ্চা খরগোশ কি আর বেশিদূর দৌড়তে পারবে? নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়ে কাছাকাছি কোন ঝোপেঝাপে লুকিয়ে আছে।

অঘোরবাবু প্রতিবাদ করিলেন না। কহিলেন, যা বলেছ দিদিমণি, আর একটু খুঁজেই দেখা যাক। কুম্ভীর সাজিয়া হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা এ কার্য অধিক মনোরম বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তাঁহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নিবিড় জঙ্গল মনুষ্য-বিরল হইলেও শব্দ-বিরল নহে। বনের নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে। তাহা ছাড়া নানাবিধ পাখির ডাক। ঘুগ্‌-ঘুগ্‌-ঘুগ্‌—অজ্ঞাতনামা এক পাখি অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া আর একটি অজানা পাখি ভিন্ন গ্রামে ডাকিতেছিল, ক্রেকট্‌-ক্রেকট্‌-ক্রেকট্‌। বনের মধ্য হইতে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় আসিতেই তাহারা দেখিল যে, চকিতে এক পক্ষী-দম্পতি দ্রুতধাবনে নিকটস্থ একটা ঝোপে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন, এক জোড়া তিতির।

সহসা ঝুম্‌নি বলিয়া উঠিল, দেখ দেখ, কেমন সুন্দর ফুল!

রুম্‌নিও মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, চমৎকার! কিসের ফুল ওগুলো?

অঘোরবাবু বলিলেন, ও একটা পরগাছার ফুল।

প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ বৃক্ষের উপর একটা দুঃসাহসিনী পরগাছা-লতা উঠিয়া স্তবকে স্তবকে সুন্দর ফুল ফুটাইয়া হাসিতেছে, যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার কাঁধে চাপিয়া অলঙ্কৃতা নাতনী আবদার জুড়িয়া দিয়াছে।

ওখানে একটা সাদা রঙের কি?

বস্তুত একটা সাদা চুনকাম-করা ঘরের দেওয়ালের খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছিল। রুম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি দাদু?

ওটা যম-ঘর।—বলিয়াই অঘোরবাবু বলিলেন, ও এমনই একটা ঘর, বনের মধ্যে করা আছে, ও এমন কিছুই নয়। চল এবার ফেরা যাক।

রুম্‌নি বলিল, চল না, ওটা দেখে আসি।

ঝুম্‌নি বলিল, হাঁ চল।

অঘোরবাবু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন, চল। ওতে দেখবার কি আছে? তার চেয়ে চল, গিয়ে এখন কুমীর-কুমীর খেলিগে।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কিন্তু ছাড়িল না। ঘর তাহাদের দেখাইতেই হইল। সত্যই ঘরটিতে দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না। ঘরের বিশেষত্ব শুধু এই যে, তাহার চারিদিকেই পাকা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, খুব উঁচু দেওয়াল এবং ঘরের যে একটি দ্বার আছে তাহাও লৌহের এবং তালা-বন্ধ। জানালা একটিও নাই।

রুম্‌নি বলিল, এটাতে কি হয়?

কিছু নয়, তোমার দাদুর অমনি শখ হয়েছিল।

অঘোরবাবু এই ঘন জঙ্গলে অবস্থিত ঘরটির ইতিহাস গোপন রাখিলেন। স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ, অঘোরবাবু এবং ভিখন তেওয়ারী ছাড়া যম-ঘরের প্রকৃত পরিচয় কেহ জানিত না। জমিদারির অন্যান্য কর্মচারীগণ মনে করিত, উহাতে বাবুর শিকারের আসবাবপত্রাদি বন্ধ থাকে।

তাহারা তিনজনে ফিরিতেছিল, এমন সময় ভিখন তেওয়ারী আসিয়া খবর দিল যে, মৃন্ময় ঠাকুর আসিয়াছেন এবং অঘোরবাবুর মোলাকাৎ ভিক্ষা করিতেছেন।

।। দশ ।।

অঘোরবাবু আসিয়া মৃন্ময় ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। এতকাল অবশ্য মৃন্ময় ঠাকুরই অঘোরবাবুকে নমস্কার করিয়া আসিয়াছেন। কারণ অঘোরবাবু জমিদারের মহামান্য ম্যানেজার এবং মৃন্ময় ঠাকুর সামান্য একজন প্রজা মাত্র। চাকা কিন্তু ঘুরিয়া গিয়াছে।

উগ্রমোহনবাবুর নাতনীদ্বয়ের সঙ্গে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের বিবাহ হইবে, সুতরাং মৃন্ময় ঠাকুরকে এখন সামান্য প্রজারূপে গণ্য করা চলিবে না। অঘোরবাবু তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়াই শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। ইহার উত্তরে মৃন্ময় ঠাকুর কিন্তু যাহা করিলেন, তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মৃন্ময় ঠাকুর অঘোরবাবুর পাদদেশে দড়াম করিয়া পড়িয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অঘোরবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে ভিতরে যাইতে বলিয়া শশব্যস্তে মৃন্ময় ঠাকুরকে দুই হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, ছি, ছি, এ কি করলেন আপনি!

বাঁচান আমাকে ম্যানেজারবাবু, আর তো বেশিদিন বাকি নেই। কোন উপায় আর ভেবে পাচ্ছি না।

কিসের উপায়?

বাঁচবার। এ বিয়ে আমি দিতে চাই না অঘোরবাবু। আপনি কোন উপায় করে এ থেকে উদ্ধার করুন আমাকে।

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া মৃন্ময় ঠাকুর আশা বা নিরাশা কিছুরই আভাস পাইলেন না।

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন, মালিকের যখন এই অভিপ্রায়, তখন আমি আর কি করতে পারি? এস্টেটের যদি কোন ব্যাপার হত, আমি কিছু হয়তো করতে পারতাম। কিন্তু এসব বিবাহ-ব্যাপারে আমার কোনও কথা চলবে না। আপনার আপত্তিটা কি?

মৃন্ময় ঠাকুর মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত ও অবিস্ফারিত উভয় চক্ষেই সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া অঘোরবাবু আবার বলিলেন, অবশ্য যদি আমাকে বলতে বাধা থাকে, শুনতে চাই না আমি; কিন্তু উগ্রমোহনবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করা কোনও দিক থেকেই তো অবাঞ্ছনীয় মনে করি না।

মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের বংশপরিচয় সব জানেন আপনি? গঙ্গাগোবিন্দ নিজে অবশ্য লোক ভাল, পণ্ডিত সজ্জন লোক; কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ নাকি সমাজে পতিত হয়েছিলেন, তাঁর দুশ্চরিত্রা এক বিধবা মেয়েকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন বলে।

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডল কঠিনতর হইল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, আসল কথাটা কি বলুন? কোথা থেকে এসব গুজব আপনার কানে এল? গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনবাবুর ভাগ্নীজামাই, তা জানেন?

মৃন্ময় ঠাকুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অসহায়ভাবে অঘোরবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

অঘোরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা থেকে এসব বাজে কথা শুনলেন আপনি?

একটা ঢোক গিলিয়া মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, কথাটা বলবেন না যেন উগ্রমোহনবাবুকে। পৃথ্বীশপুরের কালীপদ পুরোহিত আমাকে বলছিলেন। তিনি এদিককার একটা প্রাচীন লোক। তাঁর কথা সহজে অবিশ্বাস করা—

মৃন্ময় ঠাকুর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

অঘোরবাবু মৃন্ময় ঠাকুরকে বলিলেন, আপনি বসুন ওখানে। ভিখন তেওয়ারী।

ভিখন তেওয়ারী আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন, চারিজন সিপাহী এখনই পৃথ্বীশপুরে পাঠাইয়া কালীপদ পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত কর।

ব্যাপারটা যে এতদূর চট করিয়া গড়াইয়া যাইবে, মৃন্ময় ঠাকুর তাহা ভাবেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি অঘোরবাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আহা, পুরোহিত মশাইকে আবার কেন কষ্ট দেবেন এত বেলায়? আমার কথাটা শুনুন শেষ পর্যন্ত।

নিষ্পলক এক জোড়া চক্ষু মৃন্ময়ের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরকণ্ঠে অঘোরবাবু বলিলেন, আপনি বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছেন। বুঝে-সুঝে করবেন।

মৃন্ময় ঠাকুর এইবার তাঁহার শেষ চালটি চালিলেন অর্থাৎ পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া অঘোরবাবুর হাতে দিতে গেলেন।

বিস্মিত অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে কি?

মিনতি করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, অতি দরিদ্র আমি। এর বেশি আর আমার সামর্থ্য নেই। দয়া করে ভেঙে দিন বিয়েটা। আপনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন। উগ্রমোহনবাবু আপনার পরামর্শ কখনও অগ্রাহ্য করেন না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, অঘোর চক্রবর্তী উগ্রমোহন সিংহের সুযোগ্য ম্যানেজার। উগ্রমোহনের আত্মসম্মানলাঘবকারী কোন পরামর্শ আজ পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে দেন নাই। মৃন্ময় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে যে অপমান করলেন, এখনই তার উপযুক্ত জবাবদিহি আপনাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে করতে হত। কিন্তু আপনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির শ্বশুর হবেন, আপনার শারীরিক অপমান আমি করব না। আপনি স্থির হয়ে বলুন দেখি, কি আপত্তি আপনার? সত্যই কি গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ সম্বন্ধে ও-কথা শুনেছিলেন আপনি?

মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বইকি। কালীপদ পুরোহিতের কাছেই শুনেছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আমার আসল আপত্তি তা নয়। আসল আপত্তিটা হচ্ছে গিয়ে যে, আমার ছেলেদের আমি অন্যত্র সম্বন্ধ করেছি, তারা হাজার পাঁচেক টাকা দেবে, গয়নাপত্তর দেবে, তাছাড়া দুশো বিঘে জমি লিখে দেবে বলেছে।

অঘোরবাবু শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, তাঁহার পাথরের মত মুখ পাথরের মত হইয়া রহিল, কোনরূপ ভাবান্তর ঘটিল না। তিনি দক্ষিণ করতল দিয়া কেবল তাঁহার তামাটে গোঁফ জোড়া অকারণে গুছাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে এরূপভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে করিলেন, অঘোরবাবু বুঝি বা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। বিস্ফারিত চক্ষুটিতে আরও একটু মিনতির ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমাদের গরিবের সুখ-দুঃখ বুঝবেন আপনি। উগ্রমোহনবাবুর কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারব না তো আমি। তিনি যা দেবেন আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। অথচ কমলাক্ষবাবু—

কমলাক্ষ? কোন্ কমলাক্ষ? চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার?

তিনটি প্রশ্ন যেন তিনটি গুলির মত অঘোরবাবুর মুখ হইতে বাহির হইল। অন্যমনস্কতার জন্য অসাবধানে কমলাক্ষবাবুর নামটা মৃন্ময় ঠাকুরের মুখ দিয়া ফসকাইয়া বাহির হইয়া পড়াতে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং সামলাইবার জন্য বলিলেন, না না, এ অন্য কমলাক্ষ। অর্থাৎ—

অঘোরবাবু ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে তিনি মাত্র বলিলেন, ও। এবং তাহার পর সস্মিতমুখে মৃন্ময় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, এটা অবশ্য আপনি ওয়াজিব কথাই বলেছেন। মালিকের সঙ্গে দেখা হলে আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। আমার বিশ্বাস টাকার জন্যে আটকাবে না। টাকার জন্যে উগ্রমোহনবাবু কখনও পিছপাও হয়েছেন জানেন?

মৃন্ময় ঠাকুর সভয়ে বলিলেন, না না, অমন কাজও আপনি করবেন না। তাঁর কাছে মরে গেলেও আমি পণের কথা বলতে দেব না আপনাকে। উগ্রমোহনবাবু হলেন জমিদার, পিতৃতুল্য, তাঁর সঙ্গে কি আর পণ নিয়ে দর-কষাকষি করা সাজে আমার? আপনি বরং বাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে মতটা পালটে ফেলুন। বড়লোকের খেয়াল বই তো নয়, খড়ের আগুন, হু-হু করে জ্বলে ওঠে, আবার তখনই নিবে যায়। বুঝলেন? মানে, আপনি যদি মত দেন, তা হলে আমি সেই মেয়ে দুটিকে আজই সন্ধ্যের সময় আশীর্বাদ করি। সেই রকমই কথা আছে কিনা, অর্থাৎ—

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন, আসুন আমার সঙ্গে।

উভয়ে উঠিয়া গেলেন। কাছারি-বাড়ির পিছন দিকে গিয়া অঘোরবাবু একটি ঘরের তালা উন্মোচন করিতে লাগিলেন।

মৃন্ময় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ধারে এলেন যে?

অঘোরবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, গোপনীয় পরামর্শ সব অমন খোলা জায়গায় বসে করা ঠিক নয়। ভেতরে আসুন।

মৃন্ময় ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঘরের ভিতরটায় কেমন যেন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—অনেকদিন অব্যবহৃত মাটির ঘরে সাধারণতঃ যেমন হয়। অঘোরবাবু বলিলেন, আপনি একটু বসুন। আসছি আমি।—বলিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া চট করিয়া শিকলটা লাগাইয়া দিয়া তালা দিতে দিতে বলিলেন, চুপ করে বসে থাকুন। চেঁচাবেন না। মালিক না আসা পর্যন্ত একটু কষ্ট করতে হবে।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অন্ধকারে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল।

।। এগারো ।।

অঘোরবাবু ফিরিয়া আসিতেই রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, ও কে এসেছিল? সেদিন আমাদের আশীর্বাদ করে গেল ওই না? কে বল না দাদু, ও কে?

অঘোরবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, ও শ্বশুর।

খরগোশ, পারাবত প্রভৃতির মত শ্বশুরও ঠিক সমজাতীয় একটি পোষ্য জীব কি না—ইহা বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং ঘর্মাক্তকলেবর ফেনায়িতমুখ একটি অশ্বোপরি উগ্রমোহন সিংহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। অঘোরবাবু প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সঙ্গে যে সহিস আসিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, খেলনা, বাঁশী এসব কোথা রেখেছিস, বার কর। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, কই তোদের চোখ তো ফোলা দেখছি না!

চোখ ফুলবে কেন শুধু শুধু?—বলিয়া তাহারা হাসিয়া ফেলিল। উগ্রমোহনবাবু বিরস-বদনে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি কত আশা করে আসছি যে, গিয়ে দেখব, আমার বিরহে কেঁদে কেঁদে তোদের চোখ ফুলে গেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে—

ভারি বয়ে গেছে আমাদের। নিজে তো বেশ আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গেলেন সেদিন রাত্তিরে।

সহিস কয়েকটি সুদৃশ্য পুতুল, দুইটি বাঁশী প্রভৃতি আনিয়া রাখিতেই রুম্‌নি-ঝুম্‌নি তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং সেই সুযোগে অঘোরবাবু উগ্রমোহনের নিকট নিম্নস্বরে কহিলেন, গোপনীয় কিছু নিবেদন করবার আছে আমার।

কি ব্যাপার?—বলিয়া পিছনের বারান্দার দিকে উগ্রমোহন ও অঘোরবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সমস্ত কথা আনুপূর্বিক শুনিয়া উগ্রমোহন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল এবং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি ম্যানেজরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার হুকুমে তুমি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরকে এত বড় অপমান করবার সাহস করলে?

মৃতা কমলার বৈবাহিকের এই দুর্দশায় তাঁহার নিজেরই যেন আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অঘোরবাবু যেন এইরূপ একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি উগ্রমোহনকে চিনিতেন। তাই মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু ওঁকে অপমান আমি করিনি। ওঁকে আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছি এইজন্যে যে, তা না হলে আজই সন্ধ্যায় উনি কমলাক্ষের নির্বাচিত দুটি পাত্রীকে আশীর্বাদ করে আসতেন। হুজুরই আমাকে হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে, মৃন্ময় ঠাকুর যদি আসেন, তা হলে তাঁর ব্যবহার অনুযায়ী যথোচিত ব্যবহার যেন আমি করি। আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দিয়েছিলেন বলেই—

উগ্রমোহনের যদিও সত্যই কিছু বলিবার ছিল না, তথাপি তিনি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ, যথোচিত ব্যবহারই করেছ দেখছি। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের স্পর্ধায় এবং তাহাতে চন্দ্রকান্তের গন্ধ পাইয়া উগ্রমোহন যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। বিস্ফারিতচক্ষু ওই ব্রাহ্মণটাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিলে যেন তিনি শান্ত হন।

অঘোরবাবুকে বলিলেন, এতই করেছ যখন, তখন বাকিটুকুও সেরে ফেল। ওই শালগাছের গুঁড়িতে ওকে বেঁধে আগাপাছতলা চাবকে দূর করে দাও। ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে দূর করে দাও। ও-রকম অন্ত্যজের ছেলেদের সঙ্গে আমি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিয়ে দেব না।

অঘোরবাবু একবার নিষ্পলকনেত্রে প্রভুর দিকে তাকাইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনি কিন্তু ছেলে দুটিকে আশীর্বাদ করে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন।

এমন সময় রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কলরব করিতে করিতে আসিয়া কহিল, ও দাদু, দেখবে এস, কে এসেছে!

উগ্রমোহন গিয়া দেখিলেন, স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের এই আগমন আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। তাহার কারণ, স্বয়ং উগ্রমোহনই গঙ্গাগোবিন্দকে খবর পাঠাইয়াছিলেন যে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির জন্য চিন্তা নাই, তাহারা যম-জঙ্গলে অঘোরবাবুর কাছে সুখেই আছে। বিবাহের প্রসঙ্গটা অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। শুভকর্ম একেবারে সম্পন্ন করিয়া তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খবর দিবেন, ইহাই স্থির ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনের পদধূলি লইয়া হাসিমুখে কহিল, এরা এখানে বেশ আমোদেই আছে দেখছি। কিন্তু আমার আর একা থাকতে ভাল লাগছে না; এদের আজ নিয়ে যাব ভাবছি।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থ পারাবতগুলিকে খাদ্য বিতরণ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে উগ্রমোহন বলিলেন, হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বইকি। তবে আজ নয়, একেবারে চব্বিশে মাঘ নিয়ে যেও।

গঙ্গাগোবিন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তাহার পর গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, একটা কথা শুনলাম—খুব সম্ভবত গুজব ওটা, কিন্তু শুনলাম যখন, তখন আপনাকে বলাই ভাল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা?

একটু ইতস্তত করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শেষে বলিয়াই ফেলিলেন, শুনলাম আপনি নাকি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ ঠিক করে ফেলেছেন নিমাইনগরের মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে? এটা এতই অসম্ভব ব্যাপার—

তাঁহার কথা শেষ না করিতে দিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, অসম্ভব মোটেই নয়। যা শুনেছ, তা ঠিক। আগামী তেইশে মাঘ বিবাহ হবে। আশীর্বাদ করা হয়ে গেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ কথাগুলি শুনিয়া কি যে বলিবেন, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অসংলগ্নভাবে বলিলেন, আমি কিছু—তার মানে—

উগ্রমোহন শুধু বলিলেন, আমি যা ভাল বুঝেছি, তা করেছি। এখন তুমি যা বোঝ, করতে পার।

গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমার এ বিবাহে অমত আছে।

বেশ। তোমার অমতেই বিবাহ হবে, তার কারণ এতে আমার মত আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের অবস্থা ভাল, তার ছেলে দুটিও ভাল, আমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে এ বিবাহ মঙ্গলেরই হবে।

গঙ্গাগোবিন্দ তবু কিছু বলেন না দেখিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন, মঙ্গলেরই হোক আর অমঙ্গলেরই হোক, যখন কথা দিয়েছি, তখন এ বিবাহ হবেই।

গঙ্গাগোবিন্দ এইবাব কথা বলিলেন, আপনি বেশি বলশালী, আমি দুর্বল। সুতরাং শক্তি সংগ্রহ না করে আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কারণ আপনার একমাত্র যুক্তি দেখছি শক্তি। তা হলে এইবাব আমি উঠি। যদি পারি, আপনার কথার জবাব আর একদিন দেওয়া যাবে।

উগ্রমোহন বলিলেন, তোমাকে যদি এখন যেতে না দেওয়া হয়?

গঙ্গাগোবিন্দের মুখে একটু হাসি ফুটিল। ধীরভাবে তিনি বলিলেন, এই ধরনের একটা কিছু আপনার নিকট প্রত্যাশা করছিলাম। আপনি আমাকে বলপ্রয়োগ করে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমিও যতক্ষণ প্রাণ থাকবে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি দুর্বল, অবশ্য মবে যেতে পারি; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করব এখানে না থাকার।

বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইতে উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, আমার হুকুম, একে যেন কোনক্রমে এখান থেকে যেতে না দেওয়া হয়।

বজ্রাহতের ন্যায় গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং তিনি দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইয়া ধরিলেন।

ঠিক এমনই সময় রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ও দাদু, ও বাবা, দেখবে এস, দুটো পায়রা কেমন মারামারি করছে! কালো পায়রাটা কি ভয়ঙ্কর রাগী!

তাই নাকি?—বলিয়া উগ্রমোহন নাতনীদ্বয়ের সহিত বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তিনি ডাকিলেন, অঘোর, শুনে যাও। অঘোরবাবুও বাহিরে গেলেন।

নিম্নস্বরে অঘোরবাবু একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, মনে করুন, উনি যদি জোর করে চলে যেতে চান, তা হলে—

উগ্রমোহন উত্তর দিলেন, জোর করে তুমি ধরে রাখবে। এখানে পঞ্চাশজন সিপাহী আছে।

অঘোরবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

উগ্রমোহন আরও বলিলেন, ওকে দিয়েই আমি সম্প্রদান করাব।

রুম্‌নি আসিয়া বলিল, দাদু আমাদের খরগোশটা পালিয়ে গেছে, জান?

উগ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, বাঁচা গেছে।

ঝুম্‌নি বলিল, মংলুকে বলে আর একটা আনিয়ে দাও।

উগ্রমোহন বলিলেন, মংলু কে?

অঘোররাবু উত্তর দিলেন, মংলু একজন সাঁওতাল মাঝি। তাকে আর দরকার হবে না, আমাদের সহিসকে বলে দিলেই হবে। এই এখনই বলে দিচ্ছি। ওরে পচ্‌না।

পচ্‌না সহিস আসিয়া সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইতেই অঘোরবাবু বলিলেন, একটা খর্‌হার বাচ্চা চাই। ঘোড়াকে দানাপানি দিয়েছিস

পচ্না সসম্ভ্রমে উত্তর দিল যে, জামাইবাবু ঘোড়া লইয়া এইমাত্র একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ মেধাবী লোক এবং চন্দ্রকান্তের বন্ধু। উগ্রমোহনের অশ্ব লইয়াই সে বনত্যাগ করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়া গিয়াছে, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। অঘোরবাবু ও উগ্রমোহন পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, এইবার তুমি পেন্‌শন নাও। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

অঘোরবাবু কিছুই বলিলেন না। তাঁহার প্রস্তরবৎ মুখ প্রস্তরবৎ রহিল। মনে মনে কিন্তু তিনি গঙ্গাগোবিন্দের এই পলায়নে খুশীই হইলেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

পিতার আকস্মিক অন্তর্ধানে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অবাক হইয়া গেল। অঘোরবাবু তাহাদের বুঝাইলেন যে, একটা জরুরি দরকারে তিনি গিয়াছেন, কাল হয়তো আসিবেন।

ক্রমশ সন্ধ্যা হইল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ঘুমাইল।

উগ্রমোহন তখন বলিলেন, মৃন্ময়কে ডাক, চল, ওই উত্তর দিকের ঘরটায় যাওয়া যাক।

মৃন্ময় ঠাকুর যখন আসিলেন, তখন তিনি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষুতে দরবিগলিত অশ্রুধারা। উগ্রমোহন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যা করেছ, তোমাকে কেটে পুঁতে ফেলা উচিত। তা আমি করব না। যা বলছি, তাই কর।—বলিয়া তিনি অঘোরবাবুকে দোয়াত কলম এবং কাগজ আনিতে বলিলেন। দোয়াত কলম এবং কাগজ আসিলে তিনি বলিলেন, মায়াকান্না ছেড়ে এখন যা বলি, তাই লেখ। জোচ্চোর বদমায়েশ কোথাকার! কলম নাও, লেখ।

মৃন্ময় ঠাকুর লেখনী ধারণ করিয়া উগ্রমোহনের নির্দেশ অনুযায়ী লিখিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বাবা, অজয়, বিজয়, তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবা। অত্র যম-জঙ্গল কাছারিতে আসিয়া আমি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়া বিধায় বাটী ফিরিতে পারি নাই। এখনও চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় আছি। তোমরা অতি শীঘ্র এই পত্রবাহকের সহিত চলিয়া আসিবা। তোমার মাতাঠাকুরাণীর আসিবার দরকার নাই। তোমরা আসিলে আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইব। আসিতে কদাচ অন্যমত করিবা না। আশীর্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্বাদক মৃন্ময় ঠাকুর

পত্র লইয়া আটজন সিপাহী নিমাইনগর যাত্রা করিল।

।। বারো ।।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। সমস্ত বন পূর্ণ করিয়া ঝিল্লিধ্বনি দুই-একটা নিশাচর পাখির ডাক তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফেলিতেছে। ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি শিরীষ-গাছের মাথার উপর দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড। তাহার

চতুর্দিকে কয়েকজন সিপাহী বসিয়া অগ্নি-সেবা করিতেছে। অঘোরবাবু নিজ ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি নিদ্রামগ্ন। মৃন্ময় ঠাকুরের দুর্দশা ঘুচাইয়া উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে উত্তর দিকের ঘরটায় শুইতে দিয়াছেন। ভদ্রভাবে বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, দ্বারে কিন্তু সশস্ত্র প্রহরী। মৃন্ময় ঠাকুর ঘুমাইতেছেন কি না ভগবান জানেন, তাঁহার কিন্তু উভয় চক্ষুই মুদ্রিত।

মাঝের ঘরটায় উগ্রমোহন সিংহ রহিয়াছেন। তাঁহার নগ্নকায়, পরিধানে শুধু কৌপীন। ভিখন তেওয়ারীর সহিত তিনি কুস্তি লড়িতেছিলেন। এই শীতের সন্ধ্যাতেও তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। উগ্রমোহনের ইহা একটি বিলাস। তাঁহার সিপাহীদের মধ্যে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশজন কুস্তিগীর পালোয়ান আছে, এবং তাহারা প্রভুর সহিত কুস্তি লড়িতে পাইলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। অদ্য সন্ধ্যায় তিনি ভিখন তেওয়ারীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। দুইজনে বীরবিক্রমে মল্লযুদ্ধে উন্মত্তপ্রায়। বাহিরে বনানীশীর্ষে শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ অস্তাচলগামী। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উগ্রমোহন ভিখন তেওয়ারীকে চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিত মানেই জিত। ভিখন তেওয়ারী উঠিয়া প্রভুর পদধূলি লইল, উগ্রমোহন তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, সাবাস!

বাহিরে কে মৃদুস্বরে ডাকিল, হুজুর!

উগ্রমোহন গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়া ভিখন তেওয়ারীকে দ্বার খুলিতে আদেশ দিলেন। দ্বার খুলিলে উগ্রমোহন সিংহ দেখিলেন যে, নিমাইনগরে যে আটজন সিপাহী গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়াছে। তাহাদের বার্তা এই, আজ সকাল হইতে মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়কে পাওয়া যাইতেছে না।

সেতারের কানে মোচড় দিতে দিতে হাসিমুখে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর? ছেলে দুটো গিয়ে পালকিতে উঠল?

কমলাক্ষবাবু উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেতারের জুড়ি তার দুইটিতে মেজ্‌রাপের মৃদু আঘাত দিতে দিতে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, আমাদের বিশ্বাসমশাইয়ের ছেলে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা হলে বল?

কমলাক্ষবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কমলাক্ষবাবু লোকটির কমলাক্ষ নাম এই হিসাবে সার্থক যে, তাঁহার চোখ দুইটি রক্তাভ এবং বেশ ভাসা-ভাসা। আঁটসাঁট গড়নের নাতিদীর্ঘ লোকটি। অত্যন্ত স্বল্পভাষী। মামলা-মকদ্দমা করার দিকে একটু ঝোঁক বেশি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়—এই ভাবটি কমলাক্ষবাবুর চোখে মুখে এবং সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কমলাক্ষবাবু কিন্তু চন্দ্রকান্তকে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তের বুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। সেজন্য চন্দ্রকান্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি চন্দ্রকান্তের সকল আদেশ পালন করিতেন, তাঁহার সর্বদা ভয় হইত যে, চন্দ্রকান্ত যেরূপ

বুদ্ধিমান তাহাতে তাঁহার কোন কার্যই হয়তো চন্দ্রকান্তের মনোমত হইতেছে না। ইহা লইয়া চন্দ্রকান্ত অবশ্য কখনও কিছু বলেন নাই। কিন্তু এই ধারণা বদ্ধমূল থাকাতে কমলাক্ষ যখনই কোন কার্য-উপলক্ষ্যে চন্দ্রকান্তের সমীপবর্তী হইতেন, তখনই তাঁহার আচারব্যবহারে কথাবার্তার কেমন যেন একটা ভিজা-বিড়াল-গোছ ভাব ফুটিয়া উঠিত।

ম্যানেজারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের গোমস্তা বিশ্বাস মশায়ের ছেলে—ছেলে দুটোকে রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে দেখাবার নাম করে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখানে তুমি তাদের বল যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি এখানে নেই—যম-জঙ্গলে আছে। তুমি পালকির বন্দোবস্ত করে দেবার প্রস্তাব কর এবং তারা সে প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে তুমি তাদের পালকিতে করে তুলে নিয়ে টাল-জঙ্গলের কাছারিতে চালান করে দিয়েছ। এই তো?

কমলাক্ষ নীরবে মাথা নাড়িলেন। সেতারের ঘরগুলিতে একবার হাত চালাইয়া চন্দ্রকান্তের সন্দেহ হইল, উদারার নি পর্দাটা ঠিক মনোমত আওয়াজ দিতেছে না। তিনি ঘাটটা একটু সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস গোমস্তার ছেলের সঙ্গে যে অজয়-বিজয়ের আলাপ আছে, তুমি জানলে কি করে?

ওরা শ্যামগঞ্জ স্কুলে একসঙ্গে পড়ে কিনা।

ও।

চন্দ্রকান্ত কাফির একটা গৎ আস্তে আস্তে বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ তিনি আদেশ করিলেন, বিশ্বাসকে ডাক।

রাধামাধব বিশ্বাস এই এস্টেটের প্রাচীন কর্মচারী। মলিন ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা বাহিরে ছাড়িয়া আসিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই চন্দকান্ত বলিয়া উঠিলেন, আপনার ছেলে এক কাণ্ড করে বসে আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের দুই ছেলে অজয়-বিজয়ের সঙ্গে আমাদের রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি হচ্ছিল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লুকিয়ে দেখাবে বলে আপনার ছেলে আজ তাদের গঙ্গাগোবিন্দের বাড়িতে এনেছিল। যত সব ছেলেমানুষী বুদ্ধি! তার ওপর কমলাক্ষ করেছে আর এক কাণ্ড। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আছে উগ্রমোহনের বনকর কাছারিতে, কমলাক্ষ ব্যাপারটা ঠিক জানত না, এক পালকি করে দিয়েছে পাঠিয়ে তাদের টালে। দেখুন দিকি কাণ্ড।

কমলাক্ষ এবং বিশ্বাস উভয়েই বিস্মিত হইল।

চন্দ্রকান্ত আবার কাফির গতে মন দিলেন। একটু বাজাইয়া আবার বলিলেন, আপনি এক কাজ করুন বিশ্বাস মশায়। আপনি এখনই কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আর আপনার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টালে রওনা হয়ে যান। ছেলে দুটোর তা না হলে সেখানে কষ্টের অবধি থাকবে না। আর কমলাক্ষ ততক্ষণ তাদের বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিক। গঙ্গাগোবিন্দও আবার বাড়িতে নেই।

বিশ্বাস মহাশয় মনে মনে ছেলের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাহির হইয়া গেলেন। এই সময় টালে যাওয়া কি সোজা কথা!

বিশ্বাস চলিয়া যাইতে কমলাক্ষের ভিজা-বিড়াল-ভাবটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রভুর কথাবার্তা সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। কাফির গৎটা মৃদু মৃদু বাজাইতে বাজাইতে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বিশ্বাসের ছেলেটাকেও টালে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে যে! বুঝলে না চালটা? তুমি এক কাজ কর। মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে তবে তো টালে যেতে হয়? বিশ্বাস মশায় নদী পার হয়ে গেলে তুমি কোন অজুহাতে ঘাটের মাঝি-মাল্লা সবাইকে সদরে তলব করে ডাকিয়ে আনাও, অর্থাৎ আজ রাত্তিরে যেন কেউ মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে ওপারে যেতে না পারে, ওপার থেকে আসতেও না পারে। বুঝলে?

এইবার কমলাক্ষ বুঝিয়াছিলেন। প্রভুর এবং প্রভুর বুদ্ধির পদে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যেন কিছুই হয় নাই। চন্দ্রকান্ত চক্ষু বুজিয়া কাফি গৎ বাজাইতে লাগিলেন। তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। খানিকক্ষণ পরে মৃদু পদশব্দে চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

ভজনা খানসামা আগাইয়া আসিয়া কহিল, ম্যানেজারবাবু বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, এক মিনিটের জন্য দেখা করিবেন কি?

কমলাক্ষ আসিলে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

মোহানিয়া ঘাটে লোক পাঠালাম। আমি ভাবছি, রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে কিড্‌ন্যাপ করার জন্যে এক নম্বর নালিশ ঠুকে দিলে কেমন হয়, গঙ্গাগোবিন্দকে ফরিয়াদী খাড়া করে?

চন্দ্রকান্ত একটু মৃদু হাসিলেন। বলিলেন, তখন তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছলাম। আমার নামে খরচ লিখে তহবিল থেকে শতখানেক টাকা তুমি নিয়ে নাও গিয়ে, বকশিশ দিলাম তোমাকে। তোমার আজকের কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিড্‌ন্যাপের মকদ্দমা এখন থাক, পরে ভেবে দেখা যাবে।

কমলাক্ষবাবু ভিজা বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন, বকশিশ আবার কেন, আপনারই তো খাচ্ছি পরছি। তহবিলে এখন মজুত বেশি নেই, তা ছাড়া কাল শ্রীপঞ্চমী—

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া চন্দ্রকান্ত আবার সেতারে মন দিলেন। কমলাক্ষবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেই সেতার রাখিয়া চন্দ্রকান্ত একটু মুচকি হাসিলেন এবং গা ভাঙিয়া হাঁকিলেন, ওরে ভজনা, তামাক দিয়ে যা, আর মিশিরজীকে একটু খবর দে।

কাফি রাগিণীর গৎ ও গীত সমস্ত আলাপ করিয়া মিশিরজী যখন বিদায় হইলেন, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। রাধাকিষণজীউর মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজিতে শুরু করিয়াছে। নহবৎখানায়

বাঁশীতে পূরবী বাজিতেছে। চন্দ্রকান্তের সমস্ত হৃদয় সহসা কেমন যেন বিষাদময় হইয়া উঠিল। আলবোলার নলটা মুখে দিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়া একা বসিয়া রহিলেন। অকারণে কেন যেন তাঁহার মনে হইল, পৃথিবীতে কিছুরই কোন অর্থ নাই।

অকস্মাৎ বাহিরে মাদলের শব্দ শুনিয়া তাঁহার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল, তিনি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কাছারি-বাড়িতে নাচ-গান জুড়িয়া দিয়াছে। একটি উদগ্র-যৌবনা নারী আধ-ময়লা একটা লাল রঙের ঘাগরা এবং নীল রঙের কাঁচুলি পরিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিয়া সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিলে তিনি ম্যানেজারবাবুকে একবার ডাকিয়া দিতে বলিলেন। ভজনা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেদেনীর নাচ দেখিতে লাগিলেন। মাথায় বাবরি-চুলওয়ালা তাহার দুইজন সঙ্গী মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বিভোর হইয়া মাদল বাজাইতেছে। বেশ নাচে তো মেয়েটি! চমৎকার স্বাস্থ্য!

কমলাক্ষবাবু আসিতেই তিনি বলিলেন, ওই বেদে-বেদেনীর দলকে এখনই গ্রাম তেকে দূর করে দাও।

যে আজ্ঞে।

কমলাক্ষ চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি কমলাক্ষকে ডাকাইয়াছিলেন জানিবার জন্য যে, সমস্ত রাত নাচিলে মেয়েটি কত লইবে। অথচ তিনি এ কি বলিয়া বসিলেন!

ম্যানেজারের আদেশক্রমে বেদে-বেদেনীর দল চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তাহারা যতক্ষণ দৃষ্টি-পথবহির্ভূত না হইয়া গেল, চন্দ্রকান্ত নিমেষহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে হইল। কি বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী! তাঁহার জীবনেও নারী বার কয়েক আসিয়াছিল। অতি বাল্যকালে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ীকে। কিন্তু কোষ্ঠী অন্তরায় হইল। গঙ্গাগোবিন্দের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ক্রমশ তাঁহার যৌবন বিকশিত হইল বটে, কিন্তু চন্দ্রকান্ত লেখাপড়া গান-বাজনা ছবি-আঁকা প্রভৃতি লইয়া এত ব্যস্ত রহিলেন যে, অন্য কিছু ভাবিবারই অবসর পাইলেন না। মূর্খ উগ্রমোহনের ধারণা যে, রেশমকে তিনি লুকাইয়া ভালবাসিয়াছিলেন। যে রমণীর প্রেম রজতমূল্যে ক্রয় করা যায়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত ভালবাসিতে পারেন না। যে পত্রখানা তিনি রেশমকে লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উগ্রমোহন বাহাদুরি করিয়া সেদিন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহা যে একটা ছদ্ম-প্রেমপত্র, তাহা বুঝিবার শক্তি উগ্রমোহনের থাকিলে আর ভাবনা কি ছিল! উগ্রমোহনের প্রণয়লীলায় বিঘ্ন জন্মাইবার জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়া চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন এবং কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। রেশম বাঈজী দুই দিন পরই দেশত্যাগ করিয়াছিল।

চন্দ্রকান্তের অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর অবশ্য জমাটী রকম প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, তাহা কলিকাতায়। তাঁহার এক বন্ধুর ভগ্নীর সহিত। সুজাতা তাহার নাম। সুজাতার পিছনে অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন তিনি, কিন্তু বিলাতী জাহাজ যেই এক ব্যারিস্টার আনিয়া ভারতের তীরে নামাইয়া দিল, অমনই সুজাতার সমস্ত প্রেম উবিয়া গেল। পাড়াগাঁয়ে জমিদারের ছেলে আর বিলাতী-আমদানী ফ্যাশন-দুরস্ত ঝকঝকে ব্যারিস্টার। আকাশ-পাতাল তফাত! সুজাতার নির্বাচনকে দোষ দেওয়া যায় না। মোটের উপর, চন্দ্রকান্ত ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, নারীজাতির সঙ্গে তাঁহার পোষাইবে না। নারীজাতির প্রতি চন্দ্রকান্তের আকর্ষণ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু বিতৃষ্ণাও প্রবল। এত ক্ষুদ্র! টাকা দিয়া কেনা যায়। সত্যই টাকা দিয়া কেনা যায়! কই, এমন স্ত্রীলোক একজনও তো তাঁহার চোখে পড়িল না, যে ঐশ্বর্যের মোহে না মুগ্ধ হয়! দরিদ্র স্বামীর যাহারা সতী স্ত্রী, তাহারাও অপরের ঐশ্বর্য দেখিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, আর স্বামীদের বাক্য-যন্ত্রণা দেয়। নাঃ, অতি নীচ এই স্ত্রীজাতিটা। হায় ভগবান, প্রেমাস্পদা মানসীকে এত হীন অকিঞ্চিৎকর করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? নাঃ, সেতারের সঙ্গে প্রেম করাই ভাল।

ওই বেদেনী মেয়েরাও কি এত নীচ? ভৃত্য ঘরে আলো লইয়া প্রবেশ করাতে চন্দ্রকান্তের চমক ভাঙিল। তিনি বলিলেন, ওরে, জুতো আর ছড়িটা আন্ তো, একটু বেড়াতে বেরুই।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল যে, নৌকা করিয়া সেই বেদের দল নদী পার হইতেছে। ওপারে তাহাদের তাঁবু রহিয়াছে, তাহাও দেখা গেল।

বেড়াইয়া চন্দ্রকান্ত যখন ফিরিলেন, তখন নহবৎখানায় সানাই ইমন ধরিয়াছে।

।। তেরো ।।

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের আকস্মিক অন্তর্ধান-বার্তা শুনিয়া উগ্রমোহন সহসা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মনের মধ্যে তাঁহার রাগ যতই হউক, সিপাহীদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইল। পরাজিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করাটা আত্মসম্মান-হানিকর। উগ্রমোহন ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রের স্ফীতি দেখিয়া অঘোরবাবু তাহা বেশ বুঝিতেছিলেন, অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবির একটি পেশীও বিকম্পিত হইল না। তিনি মৃদুস্বরে উগ্রমোহনকে বলিলেন, মৃন্ময়কে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, সে কিছু জানে কি না!

উগ্রমোহন বলিলেন, আমি আগে চলে যেতে চাই। তুমি মৃন্ময়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করো এবং বলো যে যদি তার ছেলেদের সঙ্গে কোন কারণে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ না হয়, তা হলে সামান্য কুকুরের মত ঠেঙিয়ে তাকে মেরে ফেলব আমি।

তাঁহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। বাহিরে গলার মৃদু শব্দ করিয়া পচ্‌না সহিস ডাকিল, হুজুর।

কে?—অঘোরবাবু গিয়া দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাস তুই?

পচ্‌না উত্তর দিল, ঘোড়াটা হুজুর ফিরে চলে এসেছে। জামাইবাবু আসেননি। কোথাও পড়ে-টড়ে যাননি তো? বলেন তো খোঁজ করি।

বস্তুত উগ্রমোহনের ঘোড়ায় চড়িয়া গঙ্গাগোবিন্দ অধিক দূর যান নাই। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়াটা ফিরিয়াছে শুনিয়া উগ্রমোহনের আনন্দ হইল। তিনি এখনই বাড়ি ফিরিতে চান। এতটা পথ অশ্বারোহণে গিয়া বাড়ি পৌঁছিতে তাঁহার অবশ্য রাত্রি হইয়া যাইবে। তা হউক, তাঁহার বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার। এস্রাজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে বহ্নির সহিত তাঁহার ভাল করিয়া কথাই হয় নাই। বাহিরে বাহিরে তিনি ফিরিতেছিলেন। সন্ধিকামনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মানিক মণ্ডলকে দিয়া ছেলে দুইটার খোঁজখবর করিতে হইবে, বিবাহের আর দিন নাই। তৃতীয়ত, গঙ্গাগোবিন্দ গিয়া পুলিসের শরণাপন্ন হইতে পারে। তাহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাড়ি তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে। পুলিসের কথা মনে হইতেই তিনি অঘোরবাবুকে বলিলেন, আমি এখন চলে যাচ্ছি। যদি পুলিস আসে আজ রাত্রেই, মারপিট করে হাঁকিয়ে দেবে। পঞ্চাশজন সিপাহী তো আছে। আর রাত্রে যদি কোন গোলমাল না হয়, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আর মৃন্ময় ঠাকুরকে কাল ভোরেই এখান থেকে সরিয়ে বাথানে নিয়ে রেখে এসো। ওদের রেখে তুমি ফিরে এসো কিন্তু। কাল তোমার এখানে থাকা চাই। সিপাহীদের সব বাথানে পাঠিয়ে দিও। এক ভিখন তেওয়ারী ছাড়া কারও থাকার দরকার নেই।

অন্ধকারে বন-পথটা সাবধানে পার হইয়া উগ্রমোহন মাঠে পড়িলেন এবং অশ্বের বেগ বাড়াইয়া দিলেন। অন্ধকার ভেদ করিয়া উগ্রমোহনের ঘোড়া ছুটিতে লাগিল।

শীতের নির্মেঘ আকাশে অগণ্য-নক্ষত্র। ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ তীব্র বাতাস বহিতেছে। দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে উগ্রমোহন অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার মনের মধ্যে দুইটি মুখচ্ছবি জাগিতেছে—বহ্নি ও চন্দ্রকান্ত—ভগ্নী ও ভ্রাতা।

উগ্রমোহনের অশ্ব যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন গ্রাম নিষুপ্ত। গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুকুর অকারণে চীৎকার করিতেছে। একদল শৃগাল ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ একযোগে চুপ করিয়া গেল। তারার আলোয় গ্রামপ্রান্তের তালগাছগুলি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কর্কশরবে ডাকিতে ডাকিতে একটা পেচক উড়িয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিল। ঘোড়ার উপর হইতে উগ্রমোহন দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রকান্তের খাস-কামরায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। চন্দ্রকান্ত এখনও জাগিয়া আছে নাকি? একদান দাবা খেলিয়া গেলে কেমন হয়? উগ্রমোহন অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। চন্দ্রকান্তের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন, দেউড়ি

তখনও বন্ধ হয় নাই। উগ্রমোহনের অশ্ব আসিয়া দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে গুর্খা প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্ত কোথায়?

বাবুসাব আভি বাহার নিক্‌লে হেঁ।

সওয়ারি পর?

জী নেহি। পয়দল।

হামারা সেলাম কহ দেনা।

জী হুজুর।—গুর্খা সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন আবার অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। উগ্রমোহনের অশ্ব যখন চন্দ্রকান্তেব বাড়ির সীমানা ছাড়াইতেছে, চন্দ্রকান্ত তখন নিজের বাগানের অর্কিড-হাউসে গোপনে বসিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতেছিলেন। ছদ্মবেশ-গ্রহণে চন্দ্রকান্তের অসাধারণ পারদর্শিতা। সঙ্গীতবিদ্যার মত এই বিদ্যাটিও তিনি বহু কৌশলে ও বহু অর্থব্যয় করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। যখনই সকলের অগোচরে কোন কার্য করার তাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেন। অর্কিড-হাউস হইতে সহজভাবে বাহিরে আসিলেন। গেটে প্রবেশ করিতেই গুর্খা আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল যে, উগ্রমোহনবাবু আসিয়াছিলেন এবং সেলাম জানাইয়া গিয়াছেন। আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহার রাগের শির দুইটা দপদপ করিতেছে। তিনি ওপারে গিয়াছিলেন।

বেদেনীর নাম ফুলকি। সত্যিই আগুনের ফুলকি। ওপারেও সে একদল দর্শকের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল, যেন এক সর্পিণী ফণা বিস্তার করিয়া আবেগে কাঁপিতেছে। তাহার খিলখিল হাসি চন্দ্রকান্ত এখনও যেন শুনিতে পাইতেছেন।

টেবিলের উপর নীল রঙের ডোম-দেওয়া একটি সুদৃশ্য বাতি কমানো আছে। ধূপাধারের ধূপ তখনও পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ক্ষীণ ধূম্ররেখায় অগুরুর গন্ধ তখনও পুড়িয়া পুড়িয়া আপনাকে বিলাইতেছে। চন্দ্রকান্ত এস্রাজটি নামাইয়া কানাড়ায় গান ধরিলেন, আনন্দন আনন্দ ভয়ো—

উগ্রমোহন যখন বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ ছাড়া আর কেহ জাগিয়া ছিল না। ঘোড়া হইতে নামিতেই ব্রজ আসিয়া ঘোড়া ধরিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া সোজা তিনি অন্দর-মহলে চলিয়া গেলেন। নৈশ প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

ভিতরে গিয়া তিনি দেখিলেন, বহ্নির ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। দালানের ঘড়িটা হইতে শুধু টক-টক-টক শব্দ হইতেছে।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে উগ্রমোহন বহ্নি দেবীর ঘরের সম্মুখে উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বার ভেজানো ছিল। ভিতর হইতে কোনও শব্দ নাই। মৃদু করাঘাত করিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। দেখিলেন, বহ্নি দেবী কার্পেটে কি যেন বুনিতেছেন।

উগ্রমোহন কহিলেন, এখনও জেগে আছ দেখছি। বুনছ কি?

জুতো।

লেখাপড়া সঙ্গীত-চর্চা সব ছেড়ে হঠাৎ এ কি?

বহ্নি দেবীর নয়নে একটা ক্ষণিক দীপ্তি ফুটিয়া নিবিয়া গেল। তিনি উত্তর দিলেন, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

উগ্রমোহন পাগড়িটা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে এখন।

বহ্নিকুমারীর গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটি-ফুটি করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে বুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন, কতক্ষণ বুনবে?

বহ্নিকুমারী হাসিয়া কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শব্দ হইল—হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো।

এ কি, চন্দ্রকান্ত এল নাকি?

উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, তুমি গিয়ে ফিরে এসেছ শুনলাম। এস, একদান বসা যাক!

দুইজনে দাবার ছক লইয়া মুখোমুখি বসিলেন।

বহ্নি দেবী অন্দর-মহলে একা বসিয়া বুনিতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখের উদীয়মান হাসিটি নিবিয়া গেল।

।। চোদ্দ ।।

অতি প্রত্যুষেই উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। রাণী বহ্নিকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং দুই ডালা পদ্মফুল লইয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ির উদ্দেশে পালকিযোগে যাত্রা করিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহার পালকি আবৃত করিয়া লাল মখমলের একটি আস্তরণ। তাহার সোনালী ঝালর প্রভাতের স্বর্ণ-কিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। তাঁহার পশ্চাতে একটি সাধারণ পালকিতে তাঁহার দুইজন দাসীও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের বাড়িতে সরস্বতী-পূজার একটু বৈচিত্র্য আছে। চন্দ্রকান্ত রায়ের অন্দর-মহলে এক প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। অনেক রকম ফুল। জাতী, যূথী, জবা, টগর হইতে আরম্ভ করিয়া গোলাপ, রজনীগন্ধা, ক্রিসান্‌থিমান, এমন কি পিটুনিয়া, ডালিয়া, ভায়োলেট, সুইট পি প্রভৃতি বিলাতী মরসুমী ফুলেরও প্রাচুর্য সেখানে। এই বৃহৎ উদ্যানের মধ্যস্থলে বিশাল এক দীর্ঘিকা।

ঘন কালো তাহার জল পদ্মফুলে ভরা। সেই দীঘির মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড একটি মঞ্চ এবং সেই মঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া সুন্দর শ্বেত-মর্মরের প্রকাণ্ড এক পদ্মফুল, তাহার মর্মর-নির্মিত মনোরম মৃণালটি জলের ভিতর হইতে বাঁকিয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের সরস্বতীর প্রতিমা দীর্ঘিকা-মধ্যবর্তী এই মঞ্চে স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরের অনিন্দ্যকান্তি প্রতিমা। কিন্তু পূজার দিন মঞ্চে শুধু প্রতিমাই থাকে না। পৃথিবীর যেখানে যত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্যানুরাগী আছেন বা ছিলেন, সকলেরই ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিকৃতির সমাবেশ সেখানে হয়। তাহা ছাড়া পূজার দিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই মঞ্চের চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ সেতারী, বীণকার, এস্রারী রাগ-রাগিণীর আলাপে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তোলেন। সরস্বতীর পূজারী চন্দ্রকান্ত স্বয়ং। চন্দ্রকান্তের হুকুম, পারতপক্ষে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সেদিন যেন তাঁহাকে বিরক্ত করা না হয়। আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বাণী-অর্চনায় তিনি যাহাকে-তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন না। এই উপলক্ষ্যে বাণীর একনিষ্ঠ সাধকগণকেই তিনি প্রতি বৎসর আহ্বান করিয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেবল গঙ্গাগোবিন্দ এবং রাণী বহ্নিকুমারী নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ নয়। বাণীর সাধনায় সত্যকার আগ্রহের পরিচয় না থাকিলে চন্দ্রকান্তের আয়োজিত বাণীপূজায় নৈবেদ্য সাজাইবার আহ্বান মেলে না।

বাতাসপুর গ্রামের দরিদ্র সারেঙ্গী-বাদককে চন্দ্রকান্ত সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু হাইস্কুলের হেডমাস্টারকে নয়। ইহা লইয়া বহু নিন্দা সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রকান্তের মত পরিবর্তিত হয় নাই।

আজ সকাল হইতে তিন-চারটি ছোট ছোট হালকা পানসি দীঘিতে ভাসিতেছে, অতিথিগণ আসিলে সেই পানসি করিয়া তাঁহাদিগকে পূজামঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহারা অঞ্জলি দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কেহ বা পানসি লইয়া দীঘিতে বেড়াইতেছেন। রাণী বহ্নিকুমারী আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইতেই গঙ্গাগোবিন্দ একখানি পানসি বাহিয়া হাসিমুখে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণী বহ্নিকুমারীও স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আকাশে বাতাসে শ্রীপঞ্চমীর শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধূপ ধুনা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। গঙ্গাগোবিন্দ পানসি বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে লাগিলেন, মহিমময়ী মূর্তিতে বাণী দাঁড়াইয়া আছেন। পট্টবস্ত্রের টকটকে লাল পাড়, সীমন্তে রক্তবর্ণ সিন্দূর, হস্তে কমলকলি। বহ্নিকুমারী ভাবিতেছিলেন, আহা, গঙ্গাগোবিন্দ রোগা হইয়া গিয়াছেন। পানসি ঘাটে লাগাইয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, বাণী এস। বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, বাণী মারা গেছে। আমি এখন বহ্নি।

তোমার নূতন নামটা মনেই থাকে না।

পরস্ত্রীর নাম মনে না থাকাই ভাল।

বহ্নিকুমারীর পানসিতে উঠিলেন। পানসি মঞ্চের দিকে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। গঙ্গাগোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিলেন,-আমাকে কি এখনও ক্ষমা করনি বীণা?

বহ্নিকুমারীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, আজও সে কথা ভোলনি দেখছি! আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি!

না, ভুলিনি।—বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের কাউকেই ভুলতে পারছি না। ভুলতে দিচ্ছ কই তোমরা!

বহ্নিকুমারীর ভ্রূলতা কুঞ্চিত হইল। কানের হীরার দুল দুইটি সূর্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ?

তুমি জান না?

কি জানি না?

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া নীরবে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। তাহার পর বহ্নির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ কথা তোমার তো না জানবার নয় যে, তোমার স্বামী আমার মেয়ে দুটিকে জোর করে নিয়ে গিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এ কথা বহ্নিকুমারী সত্যই শোনেন নাই। স্বামীর এই কার্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত হীন বলিয়া ঠেকিল। তাঁহার আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগিল, গঙ্গাগোবিন্দের কাছে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মুখে তিনি কিন্তু বলিলেন, সবলের কাছে বলই একমাত্র যুক্তি। দুর্বলের যুক্তি ক্রন্দন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, আমি দুর্বল নই, ক্রন্দন আমি করছি না, গল্পটা তোমায় শোনালাম।

বহ্নিকুমারী অকস্মাৎ বলিয়া বসিলেন, এই কি তোমার গল্প শোনানো? আড়লে স্বামীর নিন্দা করে স্ত্রীর কাছে বাহাদুরি নেওয়ার বাসনা! মেয়ের বিয়ে একদিন তোমায় দিতেই হবে। আমার স্বামী সৎপাত্র দেখে সেই বিবাহ ঘটিয়ে দিচ্ছেন, এত বড় তোমার গর্ব যে, তাতে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে তুমি রাগ করছ। স্পর্ধারও সীমা থাকা উচিত।

গঙ্গাগোবিন্দ এই তেজস্বিনীকে চিনিতেন। বাণী যে তাঁহার বাল্যসহচরী। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, রাগ করো না বাণী। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

বহ্নিকুমারী বলিলেন, তুমিও ভেবে দেখ, তিনি আমার স্বামী।

পানসি আসিয়া পূজামঞ্চে ভিড়িল।

বাণী ও গঙ্গাগোবিন্দ নামিয়া অঞ্জলি দিতে গেলেন।

অঞ্জলি দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্ত বিভোর হইয়া সারেঙ্গীর আলাপ শুনিতেছেন। বহ্নিকুমারী পূজা সমাপন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ একা বসিয়া ভাবিতেছেন, বাণীর সহিত কত কাল পরে দেখা! সেই বাণী, যিনি একদিন তাঁহার গলায় জোর করিয়া একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমার বর, সেই বাণী আজ প্রবলপরাক্রান্ত উগ্রমোহনের স্ত্রী রাণী বহ্নিকুমারী। বাণী গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রথ প্রেম।

নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। আজ এতদিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি ঝগড়া করিয়া বসিলেন। ছি ছি, কাজটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। আর জীবনে হয়তো তাঁহার সহিত দেখাই হইবে না। গঙ্গাগোবিন্দও যে বাণীকে ভালবাসেন, তাহা কি বাণী জানেন? কোন দিনও তো তিনি তাহা জানান নাই। বাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বড়লোকের মেয়ে বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ? হঠাৎ গঙ্গাগোবিন্দের চিন্তাধারা ব্যাহত করেন নাই। বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ? হঠাৎ গঙ্গাগোবিন্দের চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। ভজনা খানসামা ঘাটের উপর হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে দেখা গেল। কেন? কি হইল?

পানসি বাহিয়া ঘাটের কাছে গিয়া শুনিলেন যে, বাহিরে কমলাক্ষবাবু বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঘাঢ় বিল জলকর উগ্রমোহনের সিপাহীরা নির্মমভাবে লুণ্ঠন করিতেছে। দশজন লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া চন্দ্রকান্তকে খবর দিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আঃ, আজকের দিনেও জ্বালাবে উগ্রমোহন? থানায় খবর দিতে বল। আমি কি করব?

কমলাক্ষবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন।

।। পনেরো ।।

বাঘাঢ় বিল জঙ্গলে ভীষণ দাঙ্গা। উভয় পক্ষে প্রায় পঁচিশজন আহত হইয়াছে। দুধনাথ পাঁড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; অচেতন অবস্থায় তাহাকে সদর হাসপাতালে ডুলি করিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তের প্রায় পঞ্চাশজন সিপাহী, থানার দারোগা, কনস্টেবল, চৌকিদার—সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত। দাঙ্গা তথাপি চলিতেছে। নানারূপ সত্য মিথ্যা গুজব আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে, উগ্রমোহনবাবু স্বয়ং বর্শা-হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লোকেরই মত যে, সম্পত্তিটা আসলে উগ্রমোহন সিংহেরই পূর্বপুরুষদের ছিল। চন্দ্রকান্তের পিতামহ কি কৌশলে জলকরটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, উগ্রমোহন সিংহ হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাই এই কাণ্ড। তিনি মরদ্‌কা বাচ্চা, ছাড়িবেন কেন? কথাটা হইতেছিল পীরপুরের গোলোক সার বাসায়। গোলোক সা লোকটি নিঃসন্তান। দুই বার বিবাহ করিয়াও সংসার স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার দ্বিতীয়া পত্নীটিও বৎসর দুই আগে মারা গিয়াছে। গোলোক সার থাকিবার মধ্যে আছে তেজারতি-কারবার, তাহা প্রায় লাখ খানেক টাকার। আর আছে এক যমজ ভাই, কিন্তু সেও বহুদিন হইল গোলোকের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছে। অনেকেরই ধারণা, সে মারা গিয়াছে। এখন গোলোক সার চড়া সুদে জমিদারগণকে টাকা ধার দেওয়া জীবিকা। ইহাই তাহার জীবনের বন্ধন এবং কর্মের প্রেরণা। চন্দ্রকান্ত রায়কে টাকা ধার দিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া সে পীরপুরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।

উগ্রমোহন সিংহকে মরদ্‌কা বাচ্চা বলিয়া যে লোকটি সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল, সে বৃন্দাবন মোদক। গোলোক সার বাসার সম্মুখে তাহার মুদীখানার দোকান।

গোলোক সা বলিল, মরদ্‌কা বাচ্চা—তুমি তো ফট্ করে বলে বসলে! কথা বলতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! হোঁৎকা হলেই মরদ্‌কা বাচ্চা হল? বেশ যা হোক!

বৃন্দাবন মোদক গোলোক সাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত। সে উত্তর করিল, মরদ্‌কা বাচ্চা যদি কেউ থাকে এ তল্লাটে সে হচ্ছে উগ্রমোহন সিং। এক কথায় বলে দিলাম তোমায় সা-জী।

গোলোক সা মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল, খালি গোঁয়ারের মত মারামারি করলেই মরদ্‌কা বাচ্চা হয় না, বুঝলে? ওর চেয়ে ঢের বেশি মরদ্‌কা বাচ্চা আমাদের চন্দ্রকান্তবাবু।

বৃন্দাবন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, কিসে আর কিসে, সোনা আর সীসে—একটা কথা আছে না? এ হল গিয়ে তাই। সেতারের টুং-টাং করে বলে হয়তো তুমি ওকে পছন্দ কর, কিন্তু মরদ্‌কা বাচ্চার জাত ও নয়। হেলে কি কখনও কেউটে হতে পারে?—বলিয়া বৃন্দাবন মোদক ফু-ফু করিয়া ধোঁয়াটা ছাড়িল। সে তামাক খাইতেছিল।

গোলোক সা বলিল, দাও, কলকেটা দাও। ভেতরের কথা তুমি তো আর জান না, আমি জানি। আমি বলছি শোন, আসল মরদ্‌কা বাচ্চা চন্দ্রকান্তবাবু।

এমন সময় অকস্মাৎ দশ-বারোজন সশস্ত্র অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল—হাতে খোলা তলোয়ার। বৃন্দাবন ও গোলোক উভয়েরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এ কি কাণ্ড!

বজ্রগর্জনে একজন অশ্বারোহী বলিল, বাঁধো। অমনই তিন-চারিজন লোক আসিয়া গোলোক সাকে ধরিল। তাহার হাত বাঁধিল, পা বাঁধিল, মুখও বাঁধিল এবং পরিশেষে বাঁধা হাত-পায়ের ভিতর দিয়া একটি বংশদণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিল।

আবার আদেশ হইল, চল।

আটজন লোক গোলোক সাকে শূকরের মত টাঙাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন মোদক ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। থানা পুলিস সব বাঘাড় বিলের জঙ্গলে, বাধা দিবার কেহ নাই।

সকল জিনিসেরই একটা শেষ আছে। সুতরাং কিছুক্ষণ কাঁপিয়া বৃন্দাবন মোদকও প্রকৃতিস্থ হইল এবং কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। আশেপাশে আরও দুই-চারিজন লোক এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া জুটিল এবং নানাভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল— কেহ উত্তেজিতভাবে, কেহ মৃদুস্বরে, কেহ সহানুভূতি করিয়া। এ ব্যাপারে যে উগ্রমোহন সিংহের হাত আছে, তাহা কাহারও মাথায় আসিল না। একটি রোগা-গোছের ছোকরা আসিয়া বৃন্দাবন মোদককেই সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল। তাহার যুক্তি এই, বৃন্দাবন মোদক চেঁচাইল না কেন? উত্তেজিত স্বরে যুবকটি বলিতে লাগিল, চেঁচাইলে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়তাম। তা হলে কি আর সা-জীকে অমনধারা তুলে নিয়ে

যেতে পারে? দিন-দুপুরে একটা জলজ্যান্ত লোককে বেঁধে তুলে নিয়ে গেল, আর আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যি বেরুল না!

একজন বৃন্দাবন মোদককে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, লোকগুলো দেখতে কি রকম বল তো?

সবারই চেহারা তো একই রকম, মুখোশ পরে ছিল, হাতে সব খোলা তলোয়ার।

সেই রোগা-গোছের ছোকরাটি হাসিয়া বলিল, ওই তলোয়ার-টলোয়ার দেখেই আপনি ঘাবড়ে গেছেন, বুঝেছি। একবার যদি একটা হাঁক দিতেন, তা হলে—

বৃন্দাবন মোদক এইবার চটিয়াছিল, তুমি থাম তো হে বাপু। সেদিন তো জ্বর থেকে ভুগে উঠলে, পেটে এখনও দিগ্‌গজ পিলে মজুত হয়ে রয়েছে। তোমার এত ফড়ফড়ানি কিসের?

যুবকটি প্রত্যুত্তর দিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হঠাৎ একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে বলিয়া গেল, সাবধান! হঠাৎ একদল ডাকাত এসে চারিদিকে লুঠপাট করছে, উগ্রমোহন সিংহের রতনপুর-কাছারি এইমাত্র লুঠ হয়ে গেল। সাবধান!

আকস্মিক এই বার্তায় প্রথমে সকলে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। বাক্যস্ফূর্তি হইল প্রথমে বৃন্দাবন মোদকের। সে সেই রোগা-গোছের ছোকরাকে বলিল, কই হে বীরপুরুষ, তোমার যে আর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না? যাও, ডাকাতের দলকে ঠেকাও গিয়ে, যাও।

যুবকটি চোখ-মুখের এমন একটা ভাব করিল, যেন সে এখনই রতনপুর অভিমুখেই রওনা হইয়া পড়িবে; কিন্তু নিকটেই যুবকটির মাতুল রামকান্ত থাকিতে বোধ করি তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

রামকান্ত যুবককে ডাকিয়া বলিল, ওরে, তুই বাজে কথা ছেড়ে, একবার বাড়ির ভেতর যা দিকিন, তোর মামীকে গয়না-পত্তর সব সিন্দুকে পুরে ফেলতে বল্, আর দেখ্, শোন্।—বলিয়া সে যুবকটিকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া নিম্নস্বরে কি বলিতে লাগিল।

বৃন্দাবন মোদক দেখিল, রামকান্ত নিজের ঘর সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছে এবং তাহা অনুকরণীয়। সে কোমর হইতে চাবিটা বাহির করিয়া দোকান অভিমুখে পা চালাইয়া দিল।

অন্যান্য সকলেও বুঝিল, এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই উচিত, এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় চতুর্দিক থমথম করিতে লাগিল।

দুই পক্ষ গিয়াই থানায় এজাহার দিল। দুই পক্ষ মানে দুই পক্ষের সিপাহীবৃন্দ। দুধনাথ পাঁড়ে অর্থাৎ উগ্রমোহন সিংহের দল গিয়া বলিল যে, তাহারা প্রভু-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রতনপুর-কাছারি যাইতেছিল। কিন্তু পথে বাঘাড় বিল পড়ায় তাহারা স্নানাদি সারিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেই নিতান্ত ভালমানুষের মতই বিলে নামিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবুর এক সিপাহী রামবৃছ্ সিং তদ্দর্শনে অনর্থক তাহাদের গালিগালাজ করিতে থাকে এবং অকারণে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করে।

ঠিক অকারণেও বলা যায় না। রামকৃষ্ণ সিং কিছুদিন পূর্বে উগ্রমোহন সিংহের নিকট চাকরির আশায় গিয়াছিল, কিন্তু দুধনাথ পাঁড়ের জন্য তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দুধনাথ পাঁড়ের উপর তাই তাহার আক্রোশ ছিল। রামবৃছ্ লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া একটি সিপাহীকে আঘাত করে, ইহাই দাঙ্গার সূত্রপাত। রামবৃছ্ সিং প্রতিবাদ করিয়া কহিল যে, ব্যাপার একেবারে অন্যরূপ। জলকরে মাছ ধরানো হইতেছিল, দুধনাথ পাঁড়ের আদেশক্রমে কয়েকজন সিপাহী গিয়া ধীবরদের জাল ছিঁড়িয়া দেয় এবং রামবৃছ্ সিং তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলে স্বয়ং দুধনাথ পাঁড়ে তাহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। সুতরাং দাঙ্গা হয়।

দারোগা সাহেব উভয় পক্ষের বিবৃতি টুকিয়া লইলেন এবং উভয় পক্ষেরই ধৃত দাঙ্গাকারিগণকে চালান দিলেন।

গোলোক-সাহা-হরণ ব্যাপারটা কতকগুলি দুর্ধর্ষ ডাকাতের কার্য বলিয়াই অনুমিত হইল। উগ্রমোহনের রতনপুরকাছারিতে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াতে এই বিষয়ে দারোগা সাহেবের অন্য সন্দেহ হইল না। তিনি চৌকিদার, দফাদার, কন্‌স্টেবল—সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে বলিয়া ব্যাপারটা সদরে রিপোর্ট করিলেন এবং সেই বেদে-বেদেনীর দলকে গ্রেপ্তার করিলেন।

ফুলকি থানার হাজত-ঘরে গিয়া হাজির হইল।

।। ষোল ।।

উগ্রমোহন সিংহ বাহিনী-নদীর উপর বজরার ছাদে বসিয়া পশ্চিম দিগন্তের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। সূর্য অস্ত যাইতেছে। অস্তরবির কিরণে বন্য স্রোতস্বিনী বাহিনী অপূর্ব শোভায় সাজিয়াছে। নদীর জলে একদল চক্রবাক ভাসিতেছিল। তাহাদের গৈরিক অঙ্গে, বাহিনী-তীরবর্তী শীত-রিক্ত বনশ্রীর পর্ণ-পল্লবে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণারুণরাগ স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিল। চিত্রানিতবৎ বসিয়া উগ্রমোহন এই চিত্র দেখিতেছিলেন। সুদূর আকাশে শুভ্র বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে—যেন সন্ধ্যার কুন্তলে শ্বেত-পুষ্পের একগাছি মালা।

পদশব্দ শুনিয়া উগ্রমোহন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, অঘোরবাবু আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর?

মানিক মণ্ডল এসেছে।

ডেকে আন এখানে।

মানিক মণ্ডল মূষিকবৎ আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খবর পেলে?

আজ্ঞে সঠিক কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাইনি। তবে আমার আন্দাজ, ছেলে দুটি টাল-জঙ্গলেই আছে।

কি করে বুঝলে?

মানিক মণ্ডল চঞ্চল চক্ষু দুইটিতে একটু বুদ্ধির জ্যোতি ফুটাইয়া কহিল, মোহানিয়া ঘাটটা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছেন কি না, মাঝি-মাল্লা কেউ নেই সেখানে।

ঘাট বন্ধ আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উগ্রমোহনের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলী নদী পেরোবার উপায় কি তা হলে? লোক যাচ্ছে কোন্ দিক দিয়ে?

অঘোরবাবু বলিলেন, মোহানিয়া ঘাট দিয়ে এক টাল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। ওটা ও-তরফের খাস-ঘাট, সরকারী নয়। টাল বনকর তো চন্দ্রকান্তবাবু কাউকে বন্দোবস্ত করেন নি, ওটা খাসেই আছে। সেইজন্যে মোহানিয়া ঘাট বন্ধ করলে সাধারণের কোন অসুবিধা নেই। সাধারণত লোকে পাগলী নদী পার হয় ছর্‌রামারি ঘাটে, এখান থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে।

উগ্রমোহন সিংহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াই রহিলেন।

হঠাৎ তিনি বলিলেন, মানিক মণ্ডল, তুমি আজ এখানেই থাক। আমি সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি। সিপাহীর মারফত তোমার বাড়িতেও খবর পাঠাও যে, তুমি আজ ফিরবে না। এখন তুমি নীচে গিয়ে বস।

মানিক মণ্ডল এইরূপ আদেশের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একটু আমতা-আমতা করিয়া কহিল, হুজুর, আমার মেজো ছেলেটার জ্বর দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, তা না হলে—

উগ্রমোহন বলিলেন, তুমি যে খবর এনে দিচ্ছ, তা ঠিক কি না, তা না জানা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না। সিপাহীরা যদি ফিরে এসে বলে যে, মোহানিয়া ঘাট বন্ধ আছে, তা হলে তুমি ছাড়া পাবে, তার আগে নয়। যাও, বিরক্ত করো না।

মানিক মণ্ডল সভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, তুমি বিশজন সিপাহী পাঠাও। তারা প্রথমে মোহানিয়া ঘাটে যাবে। ঘাট যদি বন্ধ থাকে, একজন ফিরে এসে খবর দেবে। বন্ধ যদি না থাকে, তা হলেও এসে খবর দেবে। ঘাট বন্ধ থাকলে ছর্‌রামারি ঘাট দিয়ে পাগলী পেরিয়ে আজ রাত্রেই তারা চন্দ্রকান্তের টাল-কাছারিতে যেন পৌঁছয়। সেখানে যদি মৃন্ময়ের ছেলেরা থাকে, তাদের ছিনিয়ে কেড়ে আনতে হবে। যদি আনতে পারে প্রত্যেককে ভাল করে বকশিশ দেব—বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঘোরবাবু নীচে নামিয়া গেলেন।

উগ্রমোহন পশ্চিম দিগন্তের দিকে আবার চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অস্তরবির আলোক নিবিয়াও যেন নিবে না।

।। সতেরো ।।

মিশিরজী মল্লারে গান ধরিয়াছিলেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে—

একজন তবলায় ঠেকা দিতেছিল। চন্দ্রকান্ত তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত। অঙ্গে একখানি সুকোমল বালাপোশ, হাতে আলবোলার নল। চতুর্দিকে অম্বুরি-তামাকের গন্ধ। চন্দ্রকান্ত মাঝে মাঝে আলবোলায় মৃদু টান দিতেছেন। গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় রসভঙ্গ করা ঠিক হইবে না ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু ম্যানেজার বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। গান যত জমিয়া উঠিতেছে, কমলাক্ষবাবুর অধীরতা ততই বাড়িতেছে। মালিকের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঘাঢ় বিল দাঙ্গা সম্পর্কে উগ্রমোহনবাবুকে আসামী করা সমীচীন কি না, তাহা চন্দ্রকান্তকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। গানটা থামিলেই তিনি কাজটা সারিয়া লইবেন। এদিকে মিশিরজীর গান আর থামে না; তিনি উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়া চলিলেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে
বরণ বরণ বরষণ প্রাণ প্যারে—

চন্দ্রকান্তবাবু চক্ষু বুজিয়া গান শুনিতেছেন, চিন্তাও করিতেছেন। থানার দারোগা বুঝিতে না পারুক, চন্দ্রকান্ত রায় ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, গোলোক সাকে উগ্রমোহনই ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং পুলিসের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইবার জন্য নিজেই নিজের রতনপুর-কাছারি লুণ্ঠন করাইয়াছেন। সাধারণ লোক হইলে চন্দ্রকান্ত রায় ভিতরকার ব্যাপারটা নানা বর্ণসমাবেশ-সহকারে এতদিন পুলিসকে জানাইয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন জাতের মানুষ। প্রসিদ্ধ দাবা-খেলোয়াড়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির অনুসরণ করিয়া এ ব্যাপারের কোন সুরাহা হইতে পারে কি না, তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। টালজঙ্গলে মৃন্ময় ঠাকুরের দুই পুত্রকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদেরও অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দুইটি সমস্যাই জটিল। সুতরাং যদিও মিশিরজী প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিলেন এবং তবলাবাদক নিখুঁতভাবে ঝাঁপতাল বাজাইতেছিল, তথাপি চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ মন দিতে পারিতেছিলেন না। বরং সঙ্গীতের অন্তরালে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গান বন্ধ হইল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা।

কমলাক্ষবাবু ওত পাতিয়া ছিলেন। দ্বারদেশে গলা বাড়াইলেন। গলা বাড়াইতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে একেবারে এস, তোমাকে একবার বেরুতে হবে। বিরিঞ্চিকে হাতীটা কষতে বল। আর দেখ, রাধিকামোহনকে একবার খবর দাও তো। কোথা হইতে কি হইল ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু নির্বাক হইয়া গেলেন।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত মিশিরজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আর একটা হোক মিশিরজী।

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন, জী হুজুর।

তৎপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, তব্ এক সুরদাসী মল্লার শুনিয়ে। গান্ধার-বর্জিত সুরট্। তবলাবাদককে বলিলেন, বাজাও চৌতাল। সুরদাসী মল্লারে মিশিরজী গান ধরিলেন—

আধো মুখ নীলাম্বর সোঁ ঢাকি
বিথুরী অলক কৈসি হৈ।
এক দিশা মানো মকর চাঁদনী
এক দিশা ঘন বিজুরী ঐসে হরি মন মো হৈ।

মিশিরজীর সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিদায় লইলেন। চন্দ্রকান্ত তথাপি এক ভাবেই বসিয়া রহিলেন। রাধিকামোহন আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রকান্ত নিমীলিত নয়নে ধূমপান করিতেছেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াও তিনি চোখ খুলিলেন না দেখিয়া রাধিকামোহন কথা কহিল, হুজুর কি আমায় ডেকেছেন?

চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বস।

রাধিকামোহন উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন, আচ্ছা, সেদিন যখন তুমি গোলোক সার কাছে টাকা আনতে যাও, তখন আর কেউ কি ছিল সেখানে?

কোন্‌খানে?

গোলোক সার বাড়িতে।

আজ্ঞে না।

চন্দ্রকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা হলে কথাটা প্রকাশ পেল কি করে? গোলোক সা কাউকে বলবে বলে তো মনে হয় না।

তখন রাধিকামোহন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কেন, কথাটা কি প্রকাশ পেয়েছে? আমি যখন টাকাটা জমা করি, তখন আমাদের মাধব গোমস্তা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে— কোথা থেকে টাকা এল? তাকে অবশ্য আমি বলেছিলাম। হুজুরের তো কোন নিষেধ ছিল না।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তুমি সেই গোমস্তাকে ডেকে দিয়ে যাও।

একটু পরে মাধব ঘোষাল গোমস্তা আসিল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া চন্দ্রকান্ত জানিতে পারিলেন যে, মানিক মণ্ডলের কাছে সে গল্পটা করিয়াছিল বটে। তাহাকে বিদায় দিয়া চন্দ্রকান্ত আপন মনে একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ—ব্যাপারটা এইবার বোঝা গিয়াছে।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিলেন। তিনি আসিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, তুমি এখনই সোজা টালে চলে গিয়ে ছেলে দুটোকে নিয়ে আমাদের নবিপুর কাছারিতে এনে রাখ আজ রাত্তিরেই। মোহানিয়া ঘাট কি বন্ধ আছে এখনও?

হ্যাঁ।

বেশ, তুমি হাতীসুদ্ধ সাঁতরে ওপারে যাবে। বুঝলে? সেখানে গিয়ে ছেলেদের কাছে বলবে যে, ভুল করে তাদের তুমি টালে পাঠিয়ে দিয়েছিলে বলে লজ্জিত। মাঝির অসুখ করার জন্যে ঘাট দু'দিন বন্ধ ছিল বলে তাদের ফেরবারও বন্দোবস্ত করতে পারনি। এখন তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে হাতী এনেছ। তারপর তারা হাতীতে চড়লে কিছুদূর গিয়ে বলবে যে, মহা মুশকিল, হাতী নবিপুর কাছারির রাস্তা ধরেছে, নিমাইনগরের দিকে কিছুতেই যাবে না। বিরিঞ্চিকে দিয়ে এটা বলাবে। আগে থাকতে শিখিয়ে রেখো তাকে। বিশ্বাস আর তার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠিক পারবে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, হাতী তৈরি হল কি না! হ্যাঁ, আর এক কাজ কর। যাবার সময় তুমি থানা হয়ে যাও। দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে?

আছে।

তা হলে শোন।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত তাঁহার কানে কানে চুপিচুপি কি একটা বলিয়া দিয়া আবার বলিলেন, বেশি কিছু নয়, মানিক মণ্ডলকে যেন একটু কড়কে দেয়।

আচ্ছা।—বলিয়া কমলাক্ষবাবু বিদায় লইলেন। একটু পরে ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রকান্ত রায়ের হস্তী মোহানিয়া ঘাট অভিমুখে চলিয়া গেল।

ম্যানেজার চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত সেতারটা পাড়িয়া একটা বেহাগের গৎ আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর হঠাৎ তিনি বাজনা থামাইয়া হাঁক দিলেন, ওরে ভজনা! ভজনা আসিলে তাহাকে বলিলেন, একটা কাগজ কলম আর দোয়াত নিয়ে আয় তো। ভজনা দপ্তরখানায় কাগজ কলম এবং দোয়াতের সন্ধানে চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত আবার বেহাগে মন দিলেন। ভজনা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, প্রভু তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন। সে সন্তর্পণে কাগজ কলম দোয়াত প্রভুর নিকটে রাখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত জানিতে পর্যন্ত পারিলেন না।

বেহাগ রাগিণীকে নিঙড়াইয়া ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন তিনি সম্মুখে কাগজ কলম এবং দোয়াত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। দুষ্ট বালকের মত তিনি বাম হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া লিখিলেন, গোলোক সাকে ছাড়িয়া না দিলে অজয়-বিজয়কে পাইবে না। চিঠিটা লিখিয়া তিনি আবার ভজনাকে ডাকিলেন। বলিলেন, জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে ডেকে আন্।

বৃদ্ধ জমাদার সীতারাম পাঁড়ে আসিলে তিনি বলিলেন, এই চিঠিখানা উগ্রমোহনবাবুর চাকর ব্রজকে দিয়ে আসতে হবে। অথচ ব্রজ যেন জানতে না পারে যে, চিঠিটা আমি লিখেছি। তুমি

যেও না, অন্য কোন লোক মারফৎ পাঠাও, সে যেন বলে আসে যে, উগ্রমোহনবাবু এলেই যেন চিঠিটা দেওয়া হয়। বুঝলে? সীতারাম পাঁড়ে চন্দ্রকান্তের দিকে মিটিমিটি একবার চাহিয়া হাসিয়া পত্রটি লইয়া প্রস্থান করিল।

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত একাকী বসিয়া রহিলেন। গান-বাজনা আর ভাল লাগিতেছে না। উগ্রমোহন এখনও ফেরেন নাই, দাবা-খেলা বন্ধ। সহসা চন্দ্রকান্তের মনে হইল, উগ্রমোহন না থাকিলে তাঁহাকে এতদিন বোধ হয় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইত। উগ্রমোহনই তাঁহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়—তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা। উগ্রমোহন-রূপ কঠিন প্রস্তরখণ্ডে বারংবার ঘর্ষিত না হইলে চন্দ্রকান্তের বুদ্ধির ছুরিকায় মরিচা ধরিয়া যাইত।

সত্যই চন্দ্রকান্ত পৃথিবীতে একা। পিতা মাতা মারা গিয়াছেন, ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিজে বিবাহ করেন নাই, সুতরাং আপনার বলিতে আর কে আছে? কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড জমিদারি এবং তাহার প্রকাণ্ড আয়োজন। কিন্তু তাহাতে কি অন্তর ভরে? অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যে সুধা প্রয়োজন, তাহা চন্দ্রকান্তের নাই। তাঁহার জীবনে যে কয়জন নারী দেখা দিয়াছিল, সকলেরই মধ্যে তিনি পণ্য-রমণীর মূর্তি দেখিয়াছেন। সকলেই নিজেকে যেন নিলামে বিক্রয় করিতে চায়, যে ক্রেতা বেশি দাম দিবে ইহারা তাহারই। সভ্য-সমাজে তিনি যতটা দেখিয়াছেন, টাকা দিয়া যেমন জামা কেনা যায়, জুতা কেনা যায়, হাতী কেনা যায়, প্রেমও কেনা যায়।

জামা, জুতা, হাতী, প্রেম—কোনটার সম্বন্ধেই তাঁহার আর মোহ নাই। অন্তরলোকের নির্জন মহাশূন্যে তাঁহার নিঃসঙ্গ আত্মা নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতই একা জ্বলিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া চন্দ্রকান্ত ভজনাকে ডাকিলেন। ভজনা আসিল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওরে জুতো আর ছড়িটা আন্ তো।

চন্দ্রকান্ত অন্ধকারে একাকী বাহির হইয়া গেলেন। দেউড়ীর সিপাহী ঢং ঢং করিয়া বারোটার ঘণ্টা বাজাইল।

দিনের পৃথিবী ঘুমে মগ্ন, রাত্রির পৃথিবী জাগিয়াছে। দিনের পৃথিবীর সমস্ত আলোক লইয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে। রাত্রির আকাশে কোটি কোটি সূর্য উঠিয়াছে, অন্ধকার তবু যায় না। রাত্রির পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যাইতেছে, অতি মৃদু অব্যক্ত সে ধ্বনি—শব্দহীন অথচ সুস্পষ্ট। দিবসের পৃথিবীতে মানুষের কোলাহল, পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কত কথাই মনে হইতেছে! কত ভাব মনে আসিতেছে, যাহার ভাষা নাই। যাহার ভাষা আছে, তাহা বলিতে ইচ্ছা করে না। গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া সমস্ত ভাষা স্তব্ধ হইয়া যায়। বিস্মিত অন্তরে শুধু দুইটি কথা জাগে, আমি কত ক্ষুদ্র, আমি কত বৃহৎ।

সহসা অকারণে চন্দ্রকান্তের সুজাতার কথা মনে হইল। সুজাতার চক্ষু দুইটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, নীরব বেদনা তাহা হইতে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রকান্তের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সুজাতা গেল, আসিল কমলা। সেই দুরন্ত হাস্যমুখী কমলা। চন্দ্রকান্তের ক্ষুধিত আত্মা অতীতের অন্ধকারে কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বেহাগের পদটা মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করিতেছে—

শ্যাম মোরি আঁখন বীচ সমায় রহো
লোগ জানে কজরারে!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা। কবির কল্পনা। রাধিকা কল্পনা, কৃষ্ণ কল্পনা, প্রেম কল্পনা। সত্য শুধু কবিত্বটুকু। সত্য শুধু সঙ্গীত, সুরের উন্মাদনা। সেই উন্মাদনায় মাতিয়া পৃথিবীসুদ্ধ লোক রাধার বিরহে কাঁদিয়া মরিতেছে।

মেঘের স্তর ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিল। অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া গেল। রঙ্গমঞ্চে নূতন নট-নটীর সমাগম হইল। স্বচ্ছসলিলা চন্দনা-নদী ও ওপারের শুভ্র বালুচর। ক্ষিপ্রস্রোতা তন্বী চন্দনা যেন কাহার অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছে, ব্যর্থ-প্রেমিক শুভ্র বালুচর স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। বালুচর অনন্ত স্বপ্নে নিমগ্ন। স্বপ্নই তাহার সম্বল। সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে বর্ষার বান আসিবে! কূলের বাঁধন ভাঙ্গিয়া আকুল চন্দনা কবে তাহাকে আবিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিবে! বর্ষা আসে, কিন্তু থাকে না। চন্দনার স্রোতে কত বর্ষা আসিল, কত বর্ষা গেল। বালুচর কতবার ডুবিল, কতবার উঠিল। চন্দনা আজও বহিতেছে, বালুচর আজও জাগিয়া আছে। চিরন্তন কাহিনী।

চন্দ্রকান্ত নদীর ধারে গেলেন। কাছেই একটা জেলেডিঙি হইতে কে গাহিয়া উঠিল—

আধি রাতি রে পাপিহারা
পিয়া পিয়া বোলে—!
পিয়া পিয়া বোলেরে পিয়া
পিয়া গিয়া বিদেশে
কৈসে ভেজু রে সন্দেশ।

সেই চিরন্তন বিরহের গান। আকাশ, বাতাস, নদী, বালুচর, মানব-মানবী—সকলের মনে সেই এক সুর, পাইলাম না। যাহাকে চাই, ঠিক লগ্নটিতে তাহাকে পাইলাম না। সে দূরেই রহিয়া গেল। সহসা চন্দ্রকান্তের ফুলকির কথা মনে পড়িল। মেয়েটির সহিত পরিচয় করিয়া দেখিলে হয়। কিন্তু তখনই আবার তাঁহার সমস্ত অন্তর বলিয়া উঠিল, কাছে যাইও না। কাছে গেলেই মোহ টুটিয়া যাইবে। মোহ টুটিয়া গেলেই ফুলকি নিবিয়া যাইবে। সুজাতার কাছে গিয়াছিলে, লাভ কি হইয়াছে? তাহার বণিকবৃত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছ মাত্র। পৃথিবীসুদ্ধ নারীর মনোবৃত্তি হয়তো ওই। কি হইবে এই সার সংগ্রহ করিয়া? তাহার চেয়ে দূর হইতে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখাই কি ভাল নয়?

ওই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে এবং নিবিতেছে, দাঁড়াইয়া দেখ। পার তো উহাদের লইয়া কবিতা রচনা কর, সুখ পাইবে। কিন্তু জোনাকিকে ধরিয়া যদি বিশ্লেষণ করিতে যাও, দেখিবে উহা কীটমাত্র। কবিত্ব তখন আর থাকিবে না।

খানিকটা আবছা, খানিকটা অন্ধকার প্রয়োজন। অস্পষ্ট অজানাকে লইয়া মন স্বপ্ন-রচনা করিতে চায়। সমস্ত জানিতে চাহিও না। সমস্ত জানিতে পারিবে না। সবজান্তা হইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনটা শুধু বিফল হইয়া যাইবে। কত কথাই চন্দ্রকান্তের মনে হইতে লাগিল। একাকী তিনি অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যখন তিনি বাড়ি ফিরিলেন, তখন রাত্রি আর বেশি বাকি নাই। পূর্বাকাশে অরুণাভাস দেখা যাইতেছে। দ্বিধাভরে দুই-একটা পক্ষী ডাকিয়া আবার থামিয়া যাইতেছে। শুইবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, গেটের ভিতর দিয়া গঙ্গাগোবিন্দ প্রবেশ করিতেছেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ভোরে বেরিয়েছ আজ?

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া একটু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, কিছুদিন আগে উপনিষদে পড়েছিলাম—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো।
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ?

অর্থাৎ, একই অগ্নি দাহ্যবস্তুর রূপভেদে যেমন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, একই অন্তরাত্মা তেমনই বস্তুভেদে নানা মূর্তিতে প্রকাশিত হন। এর সত্যতা আজ উপলব্ধি করছি।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না।

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিলেন। বলিলেন, জাগরণের জগতে যে ব্যক্তি অতি রূঢ়, স্বপ্নের জগতে সে অতি কোমল। আজ তার প্রমাণ পেয়েছি।

কি প্রমাণ?

এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখে উঠে আসছি।

কি স্বপ্ন?

বাণীকে স্বপ্ন দেখলাম, অর্থাৎ রাণী বহ্নিকুমারীকে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই না কি?

।। আঠারো ।।

উগ্রমোহন সিংহ এত বিস্মিত জীবনে আর কখনও হন নাই।

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয় হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। নানাবিধ চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু সাফল্যের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। গতকল্য তাঁহার

সিপাহীগণ আসিয়া খবর দিয়াছে যে, টাল জঙ্গলে কেহ নাই। চন্দ্রকান্তবাবুর একজন সিপাহীর মুখে তাহারা শোনে যে, মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের লইয়া কমলাক্ষবাবু হস্তী-পৃষ্ঠে নিমাইনগরে যাত্রা করিয়াছেন। এই শুনিয়া সিপাহীরা নিমাইনগরে গিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও কেহ নাই।

মৃন্ময় ঠাকুর কিছুক্ষণ পূর্বে দুইজন সিপাহী সমভিব্যাহারে পুত্র-অপহরণের জন্য কমলাক্ষবাবুর নামে নালিশ করিতে থানায় গিয়াছেন। থানার শরণাপন্ন হওয়া উগ্রমোহন সিংহের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে এবং গত্যন্তর না থাকায় অগত্যা তিনি রাজী হইয়াছিলেন।

যম-জঙ্গল কাছারির পার্শ্ববর্তী বনপথে উগ্রমোহন সিংহ তাঁহার প্রাত্যহিক প্রাতঃকালিক ব্যায়ামান্তে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মনে সুখ নাই, মুখে চিন্তার রেখা।

তিন দিন তিনি বাড়ি ফেরেন নাই। বজরায়, অশ্বপৃষ্ঠে, বাথানে, যম-জঙ্গলে ঝটিকার মত তিনি ছুটিয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের নাগাল পান নাই।

অঘোরবাবুরও পরামর্শ তিনি পাইতেছেন না। দিনের বেলা বাথানে অঘোরবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে তাঁহাকে গোলোক সার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। গোলোক সা চামা-প্রান্তরের কালীবাড়িতে বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছে। চামা একটি চারক্রোশব্যাপী বিরাট মাঠ। যতদূর দৃষ্টি যায়, ঊষর প্রান্তর ছাড়া সেখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না, দৃষ্টি চক্রবালরেখায় থামিয়া যায়। চামাপ্রান্তরে লোক-চলাচল নাই। এই মাঠ সম্বন্ধে এমন সব অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে, যাহা শুনিলে যে-কোন সাধারণ লোকেরই হৃৎকম্প হইবার কথা। ভূত, প্রেত, পিশাচ অহরহ নাকি ওই প্রান্তরে ঘুরিফ বেড়ায়! কত লোক পথহারা হইয়া এই প্রান্তরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে! এই প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—মহাকালী। মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে মহাকালীর একটি মন্দির। মন্দিরটি বহু প্রাচীন, মহাকালীর মূর্তিটিও ভীষণদর্শনা। কে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া এই নির্জন প্রান্তরে কালীমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা জানা নাই। চামা-প্রান্তর বর্তমানে উগ্রমোহন সিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-সিপাহী এই মন্দিরের রক্ষক এবং কালীর পূজারী। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি কক্ষে উপাস্থিত গোলোক সা বন্দী অবস্থায় আছে।

উগ্রমোহন সিংহ একাকী বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নানা উদ্ভট ও অসম্ভব কল্পনা জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, যদি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তিনি ওই বিস্ফারিত-চক্ষু মৃন্ময়কে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন মুণ্ডটা চন্দ্রকান্তকে উপহার পাঠাইয়া দিবেন। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইতেছিল, মৃন্ময়ের দোষ কি? তিনি তো কোন আপত্তি আর করিতেছেন না! বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থানায় গিয়াছেন পুত্রদের সন্ধান-কামনায়।

কমলাক্ষ লোকটিকে গুম করিয়া দিলে কেমন হয়? ভিখন তেওয়ারী আসিয়া তাঁহার

চিন্তাধারা বিঘ্নিত করিল। কহিল, চন্দ্রকান্তবাবুর নিকট হইতে এই খত অর্থাৎ চিঠি আসিয়াছে। পত্র পড়িয়া উগ্রমোহন অবাক হইয়া গেলেন। পত্রে আছে—

বন্ধু,

তোমার ভাবী নাতজামাইগণ তোমার নাতিনীদ্বয়কে দেখিবার সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বাড়ি হইতে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনীটা উহাদের মুখেই শুনিতে পাইবে। বিবাহ শুনিয়াছি তেইশে মাঘ। এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই লক্ষ্ণৌ হইতে বাইজী আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। মীর সাহেবও আসিবেন। এই সুযোগে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা মন্দ কি? তুমি কবে ফিরিতেছ? বহুদিন দাবা-খেলা বন্ধ আছে।

চন্দ্রকান্ত

উগ্রমোহন আসিতেই অজয়-বিজয় আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি দেখিলেন, চন্দ্রকান্তের পালকি করিয়া তাহারা আসিয়াছে। বিস্মিত উগ্রমোহন বুঝিতেই পারিলেন না, কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত রায়ও কম বিস্মিত হন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। উহাদের হস্তেই তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে সম্প্রদান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিবার পর অকস্মাৎ তাঁহার মত বদলাইয়া গিয়াছে।

মানুষের মতামত কখন কোন্ কারণে যে কি করিয়া বদলায়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

উগ্রমোহন অজয়-বিজয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহাদের বসাইয়া তিনি চন্দ্রকান্তকে একখানি পত্র লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

অজয়-বিজয় নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে। তাহাদের ভ্রমণকাহিনী আমি জানি। নাচগানের বন্দোবস্ত করিয়া ভালই করিয়াছ। আজই রাত্রে ফিরিব।

উগ্রমোহন

পুনশ্চ। তুমি বাইজী আনাইবার বন্দোবস্ত কর, আমি আসর সাজাইবার ভার লইলাম।

চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সিপাহী ফিরিয়া গেলে পালকি করিয়া অজয়-বিজয়কে তিনি সদরে, অর্থাৎ নিজের বাটিতে পাঠাইলেন। সকলে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন দেহে ও মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

অজয়-বিজয়কে শেষকালে চন্দ্রকান্ত ফিরাইয়া দিল। ভয় খাইয়া, না, অনুগ্রহ করিয়া?—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্বারোহণে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেইদিন রাত্রে উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত দাবা লইয়া বসিলেন। বহুকাল এরূপ খেলা তাঁহারা খেলেন নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দাবার ছকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিস্পন্দভাবে দুই জনে বসিয়া আছেন।

।। উনিশ ।।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দুই পরাক্রান্ত জমিদার উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতা হইতে গোরার বাদ্য, লক্ষ্ণৌ হইতে হাসীনা বাইজী, আগ্রা হইতে সেতারী মীর সাহেব এবং কাশী হইতে কয়েকজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন। দুই জমিদারের এলাকায় যত ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী ও খঞ্জনী ছিল—সব আসিয়া জুটিয়াছে এবং বিচিত্র শব্দসমন্বয়ে চতুর্দিক সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের ঠিক বাহিরে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, তাঁবুতে ভরিয়া গিয়াছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের সম্মানিত অতিথিবর্গ তাঁবুগুলিতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবুতে পৃথকভাবে পাচক, ভৃত্য এবং রন্ধনের বন্দোবস্ত আছে। অতিথিদের অভিরুচিমত স্নানাহারের যেন ত্রুটি না হয়। ভাণ্ডারীগণ প্রয়োজন ও ফরমায়েশ মত প্রতি তাঁবুতে সিধা দিয়া ফিরিতেছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত নিজেরা প্রতি তাঁবুতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ-আপ্যায়ন করিতেছেন। উভয়েরই কাছারি-বাড়িতে প্রকাণ্ড আটচালার নীচে সারি সারি ভিয়ান বসিয়া গিয়াছে। দিবারাত্র আহারের আয়োজন। চতুর্দিকেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। উভয় পক্ষেই নায়েব গোমস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাকর ঠাকুর সকলেরই গলা ভাঙিয়াছে। একদল সাঁওতাল যুবক-যুবতী মহানন্দে নাচ জুড়িয়া দিয়াছে। সারি বাঁধিয়া মাদলের তালে তালে গান গাহিয়া তাহারা একদল অতিথিকে সন্তুষ্ট করিতেছে। কোনখানে আবার মহাসমারোহে ঝুমুর জমিয়া উঠিয়াছে। সেখানেও একদল মুগ্ধ দর্শক। সুখপুর গ্রামের রামলীলার দলও এ সুযোগে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই। হনুমানের অভিনয় সত্যই উপভোগ্য। বহু লোক সেখানে ভিড় করিয়াছে। উগ্রমোহন সিংহ এবং চন্দ্রকান্ত রায়ের সর্বসুদ্ধ ছয়টি হস্তী-হস্তিনী আছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ উপলক্ষ্যে তাহারা বিচিত্র সাজে সাজিয়াছে। কাহারও পিঠে হাওদা, কাহারও পিঠে সোনার কাজ-করা মখমলের বিস্তৃত আস্তরণ দুলিতেছে। কেহ বাজনার তালে তালে গা দোলাইতেছে, কেহ বিশাল দন্ত-গৌরবে সকলকে ভীত-চমৎকৃত করিতেছে। তাহাদের মাথায় কপালে তৈল ও বর্ণ সহযোগে নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছে।

মাহুতগণেরও পোশাকের আজ পারিপাট্য। হেই-ধেৎ-বিরি প্রভৃতি বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহারা কাজে অকাজে হস্তীদলকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নানা বর্ণের বিশালকায় অশ্বগুলি সুসজ্জিত। রামপ্রসাদ নামক সিপাহী একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বিনীপৃষ্ঠে চড়িয়া ব্যাণ্ডবাদকদের নিকট গিয়া নিজের পারদর্শিতা দেখাইতেছে। ব্যাণ্ডের তালে তালে অশ্বিনী গ্রীবাভঙ্গীসহকারে এমন নৃত্য করিতেছে যে, সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে।

উগ্রমোহন সিংহের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে কাশী হইতে সমাগত পালোয়ানবৃন্দ মহা-উৎসাহে কুস্তি শুরু করিয়াছে। দুইজন ভীমকায় পালোয়ান মহাপরাক্রমে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। যুযুধান বীরগণকে ঘিরিয়া একদল বিস্মিত দর্শক।

কিছুদূরে উগ্রমোহন সিংহের নির্দেশমত প্রকাণ্ড একটি সামিয়ানা টাঙাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। অক্ষয় গোমস্তা পনরো-কুড়িজন মজুর লইয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছে। যদিও রাত্রি বারোটার পর এই সামিয়ানাতলে হাসীনা বাইজী অবতীর্ণা হইবে, কিন্তু মালিকের হুকুম যে, সন্ধ্যার মধ্যেই যেন সামিয়ানা টাঙানো শেষ হইয়া যায়। সুতরাং অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রকান্ত টিয়াডাঙ্গার জমিদারের তাঁবুতে বসিয়া আছেন।

টিয়াডাঙ্গার জমিদার গীতবাদ্যের একজন গুণী সমঝদার। সুবিখ্যাত সেতারী মীর সাহেবের সেতারের বৈঠক তাঁহারই তাঁবুতে বসিয়াছে। গ্রামের তবলাবাদক বিষ্ণুপদ বাহাদুরি করিয়া মীর সাহেবের সহিত বাজাইতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে। মীর সাহেব কৃপা-মিশ্রিত হাস্যের সহিত তাহাকে সংশোধন করিয়া লইতেছেন। মীর সাহেবের খাস তবলচী করিম খাঁ বিষ্ণুপদর এতাদৃশ অবস্থাসঙ্কট দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

পার্শ্ববর্তী একটি তাঁবুতে তাস-খেলা চলিতেছে। খেলাত গঞ্জের চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সমাগত তাঁহাদের জামাইবাবুকে তাস-খেলায় কোণঠেসা করিয়া তাঁহারা মহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। একজন খেলোয়াড় একখানা হরতনের আটা চাপড়াইয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, নহলাখানা কেমন আটকাচ্ছেন এবার দেখি— হ্যাঁ, হ্যাঁ—

হাস্যের কলরব উঠিতেছে।

নিকটবর্তী আর একটি তাঁবুতে স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ চিকনহাটির চিকিৎসক বিশ্বম্ভরবাবুর সহিত পাঞ্জা ধরিয়াছেন। বিশ্বম্ভরবাবু নাকি পাঞ্জাতে অজেয়। কেহ কাহাকেও এখনও হারাইতে পারেন নাই। দম বন্ধ করিয়া দুই-চারিজন অতিথি তাহাই দেখিতেছেন।

মিশিরজী আসর জমাইয়াছেন আর একটি তাঁবুতে। সেখানে কাঁটাগাছির জমিদার স্বয়ং তবলা ধরিয়াছেন, এবং তাঁহার মোসাহেব মুরারিমোহন অতিরিক্ত মাত্রায় কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করিতেছে।

বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। দুই জন প্রবল জমিদারের কুটুম্বিতা লাভ করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে মনে মহা খুশী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণের সহিত এক পাটি ছেঁড়া চটিজুতাও দান করিয়া বসিলেন। মৃন্ময় ঠাকুর ব্যাপারটা নাতজামাইদের প্রতি রসিকতা হিসাবে ধরিয়া লইয়া যদিও দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া ফেলিলেন এবং অন্তর্নিহিত তীব্র খোঁচাটাকে লঘু করিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াসটা যে সফল হইল না, তাহা তাঁহার দন্তসর্বস্ব হাসিই প্রকাশ করিয়া দিল।

দ্বিতীয় বার রসভঙ্গ হইল বাইজীর আসরে। আসর সাজাইবার ভার ছিল উগ্রমোহনের উপর। তিনি প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙাইয়াছেন—ঝালর-দেওয়া চমৎকার সামিয়ানা। বংশদণ্ডগুলি রূপালী জরির কাজ-করা লাল কাপড় দিয়া মোড়া। আসরে আতরদান, গোলাপপাশ, ফুলের

তোড়া, পানের দোনা, শাখা-প্রশাখাময় বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন, সুদৃশ্য মকমলের তাকিয়া, সুকোমল গালিচা—কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

কিন্তু বাইজী গান জমাইতে পারিল না। তাহার কারণ, আসরের চারিদিকে উগ্রমোহন পাখী টাঙাইয়া দিয়াছিলেন। উগ্রমোহনের পাখী পোষার প্রচণ্ড শখ। বহু খরচ করিয়া বহুপ্রকার পক্ষী তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এত পাখী আছে যে, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে একজন পাখীর দারোগাই রাখিতে হইয়াছে। সেই সব পাখীকে আজ তিনি আসরের চারিদিকে টাঙাইয়া দিয়াছেন। সুদৃশ্য বহু পিঞ্জর চতুর্দিকে দুলিতেছে। সেই পিঞ্জরের কোনটাতে শ্যামা, কোনটাতে ভিংরাজ, কোনটাতে তোতা, নুরি, হীরামন, কিরকিচ, খাক্‌নুর, কাকাতুয়া, কেনেরি, বুলবুল-হাজার-দস্তা—নানাবিধ পাখী। বাজ্‌ড়ি, ময়না, তিলোরা, লাল, ময়তাবি, মুনিয়া, দোহিয়াল, কোকিল, জরদপিলক— পাখীর হাট। সারেঙ্গী যেই বাজনা শুরু করে, পাখীর দল তখন আর এক পর্দা উচ্চে শিস দিতে থাকে। পাখীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ পর্দা চড়াইতে পারে না। হাসিনা বাইজী একটু হাসিয়া নিবেদন করিল যে, পাখীদের না সরাইলে সে গান গাহিতে পারিবে না। উগ্রমোহন সিংহ জবাব দিলেন, পাখী তো এখন সরানো সম্ভব নয়। হাসীনা বিবি যদি গান গাহিতে অসমর্থা হন, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী পাখীও নহে, বিবিসাহেবাও নহেন। দায়ী আমাদের দূরদৃষ্ট।

হাসিনা বিবি আরও দুই-একবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গান জমিল না। কোকিল, দোহিয়াল, কাকাতুয়া ময়না আসর জমাইয়া রাখিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আজ থাক্ তা হলে। কাল পাখীগুলো সরিয়ে রেখো উগ্রমোহন। পাখী সরিয়ে মহিষগুলো এনে হাজির করো না যেন আবার।

উগ্রমোহন বলিলেন, আমরা ক্ষেপেছি, এই যথেষ্ট চিন্তার কারণ। মহিষগুলোকে সুদ্ধ ক্ষেপিয়ে লাভ হবে না, তা তো বুঝছি।

গান হইল না। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়াছেন ভাবিয়া উগ্রমোহন কিন্তু ভারি সন্তুষ্ট হইলেন।

কন্যা-সম্প্রদান করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ নিজ শয়নগৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিনের উপবাসে দেহ-মন ক্লান্ত।

কমলার মুখখানা তাঁহার বারংবার মনে পড়িতেছে। সে বাঁচিয়া থাকিলে এই বিবাহ হইত কি? রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বয়স এই তো সবে নয় বৎসর। গঙ্গাগোবিন্দ ভাবিতেছিলেন, ইহারই মধ্যে রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে পর করিয়া দিলাম। এত তাড়াতাড়ি বিবাহ দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না তো। সামান্য একটা স্বপ্ন দেখিয়া এই দুর্বলতা প্রকাশ না করিলেই পারিতাম। রাণী বহ্নিকুমারী আমার কে?

রাত্রি পোহাইতেছে। পূর্বাকাশে উষাভাস দেখা যাইতেছে। ক্লান্ত গঙ্গাগোবিন্দ চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিলেন।

ঠিক সেই সময় রাণী বহ্নিকুমারীও একাকিনী অলিন্দে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই বিরাট উৎসবে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন,—কিন্তু অন্তরের সহিত নয়, লৌকিকতার খাতিরে। তাঁহার

অন্তরে যাহা হইতেছিল, তাহা এতই বিচিত্র ও জটিল, এতই মধুর ও তিক্ত যে, তাহা বর্ণনাসাপেক্ষ নহে। বহ্নিকুমারী দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের উদ্যান-মধ্যবর্তী দীর্ঘিকার কালো জলে এক জোড়া রাজহংস ভাসিতেছে। এই হংসদম্পতিকে দেখিয়া তাঁহার হিংসা হইতেছিল। নির্নিমেষনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম এই ধনীরা।

নহবৎখানায় সানাই তখন ভৈরবী ধরিয়াছে।

।। কুড়ি।।

বিরাট উৎসবের পর বিরাট অবসাদ আসে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত উভয়েরই মন অবসন্ন। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। যদিও উগ্রমোহনের জিদই বজায় থাকিয়া গিয়াছে কিন্তু এই জয়লাভের মধ্যে যে চন্দ্রকান্তের অনুগ্রহবর্ষণ আছে—এ কথা উগ্রমোহন কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা নিঃশব্দে বলিয়া উঠিতেছিল, চন্দ্রকান্ত ছেলে দুইটিকে ফিরাইয়া না দিলে এ বিবাহ হইত কি না সন্দেহ। অন্তরাত্মার এই উক্তি উগ্রমোহনের পক্ষে সুখকর নহে।

চন্দ্রকান্তের মনে সুখ ছিল না। তাহার কারণ গোলোক সা। সা-জীর কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছেন না। কমলাক্ষবাবু জমিদারির সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই কর্মেই নিযুক্ত আছেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ গোলোক সাকে মুক্ত করিতে চন্দ্রকান্ত ধর্মত বাধ্য। তাঁহারই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া গোলোক সাহা তাঁহাকে টাকা দিয়া বিপন্ন হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক, লোকটাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত যথারীতি দাবার ছক লইয়া বসিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা চলিতেছে। এমন সময় চন্দ্রকান্তের বাড়ির সম্মুখস্থ পথ দিয়া বাজনা বাজাইয়া একদল লোক যাইতেছে শোনা গেল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাজনা কিসের?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিল।

দেখে আয় তো, কিসের বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে।

ভজনা চলিয়া গেল। উভয়ে আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

একটি বড়ে আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইবার তোমার হয় গজ, না হয় নৌকো—একটা যাবেই—

আচ্ছা, এই নাও। তোমার মন্ত্রীকে সামলাও।

আবার দুইজনে নীরব। ভজনা আসিয়া খবর দিল যে, আনন্দপুরের দোল-পূর্ণিমার মেলায় একদল বাজিকর যাইতেছে, তাহাদেরই বাদ্যভাণ্ড।

উগ্রমোহন বলিলেন, আনন্দপুরে মেলা বসেছে নাকি? গেলে মন্দ হত না।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইবার তোমার মন্ত্রীটি বাঁচাও দেখি।

মুমূর্ষু মন্ত্রীকে উগ্রমোহন একটি ঘোড়া দিয়া বাঁচাইলেন। ঘোড়াটি অবশ্য তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

চন্দ্রকান্ত আবার হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিলে তিনি আদেশ দিলেন, আসব নিয়ে আয় তো। আজ শীতটা একটু বেশি অন্য দিনের চেয়ে।

দুইটি সুদৃশ্য স্ফটিকাধারে করিয়া ভজনা আসব আনিয়া দিল। দুইজনে নিঃশব্দে তাহা পান করিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

খেলা শেষ করিয়া উগ্রমোহন যখন গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন, তখন শুক্লা-একাদশীর চন্দ্র মধ্যগগনে উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন চলিয়া গেলে কমলাক্ষবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে কিছু?

কমলাক্ষবাবু কহিলেন এইটুকু শুধু নিট খবর পেয়েছি যে, গোলোক সা যম-জঙ্গলে কোথাও নেই।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব খবর তুমি সংগ্রহ করছ কি উপায়ে?

প্রশ্ন শুনিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উপায়টা কি তোমার?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমলাক্ষবাবু বলিলেন, আমাদের সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি।

এসব খবর ঠিকমত নেওয়া ওসব ভোজপুরী সিপাহীর কর্ম নয়। দাঙ্গা করতেই ওরা মজবুত, এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার ওদের দ্বারা হবে না। তুমি এক কাজ কর, মানিক মণ্ডলকে লাগাও।

কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়াল-চাহনি চাহিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিয়া চলিলেন, লোকটা খুব কাজের। আমার বিশ্বাস, কিছু টাকা ঢাললেই রাজী হয়ে যাবে। বুঝলে?

কমলাক্ষবাবু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, কার্পণ্য করো না এসব ব্যাপারে। টাকা ঢাল, ঠিক হয়ে যাবে। মানিক মণ্ডলের কাছে লোক পাঠাও আজ। আমি হয়তো দু-এক দিনের জন্যে বেরুতে পারি, আনন্দপুরের মেলায় যাবার ইচ্ছে আছে, ইতিমধ্যে গোলোক সার খবরটা যোগাড় করো।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে তিনি সেতারটা পাড়িয়া বসিলেন এবং মীর সাহেবের কাছে হিন্দোলের যে গৎটা শিখিয়াছিলেন তাহা বাজাইতে লাগিলেন।

পরদিন লোক-লস্কর বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে জমিদার উগ্রমোহন সিংহ আনন্দপুর মেলা অভিমুখে রওনা হইলেন দেখা গেল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহের পর জীবনটা তাঁহার নিতান্তই একঘেয়ে ঠেকিতেছিল। আনন্দপুর মেলায় কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি যাত্রা করিলেন।

দশ ক্রোশ দূরবর্তী আনন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময় একটি প্রকাণ্ড মেলা হয়। আনন্দপুর উগ্রমোহনের বা চন্দ্রকান্তের জমিদারির অন্তর্গত নহে। ক্ষুদ্র জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের ইহা জমিদারি। মেলাটি বেশ বড় মেলা। বহুস্থান হইতে লোকজন দোকানী ব্যবসায়ী এই মেলায় আসিয়া থাকে। অনেক গণ্যমান্য ধনী জমিদারও এই মেলায় পদার্পণ করেন। গরু, ঘোড়া, পাখী পর্যন্ত এই আনন্দপুর মেলায় বিক্রয় হয়—এত বড় এই মেলা। উগ্রমোহনের পশু-পক্ষী কেনার শখ খুব বেশি, তাই প্রতি বৎসর তাঁহার এই মেলায় যাওয়াটা একটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। সুতরাং উগ্রমোহনের পালকি পরদিন আনন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দ্রকান্ত বাতায়ন-পথে দেখিলেন, উগ্রমোহনের পালকি চলিয়া গেল। তিনিও পালকি-যোগে একটু পরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অবশ্য লোকজন বিশেষ কিছু গেল না। আটজন পালকির বেহারা এবং একটি ক্ষুদ্র পেঁটরা তাঁহার সঙ্গী হইল।

।। একুশ ।।

আনন্দপুর মেলায় উগ্রমোহন সিংহের তাঁবু পড়িয়াছে। উগ্রমোহন পৌঁছিবার কিছু পরেই চন্দ্রকান্তের পালকিও আনন্দপুরে পৌঁছিল। নিজের আগমন উগ্রমোহনকে জানাইবার ইচ্ছা চন্দ্রকান্তের ছিল না। সুতরাং প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষতলে পালকিটা তিনি নামাইতে বলিলেন। পালকি হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রকান্ত বেহারাদের বিদায় দিলেন। বলিলেন, তোরাও মেলা দেখ্ গিয়ে, যা।—বলিয়া প্রত্যেক বেহারাকে কিছু অর্থ দিলেন। বেহারাগণ আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল এবং খুশী হইয়া মেলার জনতার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত আবার পালকির ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটু পরে পুনরায় যখন তিনি পালকি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে চেনা শক্ত। সামান্য একজোড়া গোঁফ এবং একটি রঙিন চশমার সহায়তায় চন্দ্রকান্ত একেবারে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন।

ছদ্মবেশ ধারণ করা চন্দ্রকান্ত রায়ের একটি গোপন শখ। এ বিষয়ে বহু পুস্তক তিনি পড়িয়াছেন এবং বহু অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত জীবন-রসের রসিক। তিনি ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এক বেশে জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র প্রাণবস্তুর সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় একা অপারগ। জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় জমিদার-মহলেই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন এবং অভিজাতসম্প্রদায়সুলভ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের পক্ষে বেদের তাঁবুতে গিয়া ফুলকির নৃত্যলীলা দর্শন করা সম্ভব নয়। মানব-সমাজের নানা বিভাগ। এক বিভাগের আচারব্যবহার পোশাকপরিচ্ছদ অন্য বিভাগে অচল। সুতরাং সর্ব-

বিভাগের রসাস্বাদন করিতে হইলে ছদ্মবেশ প্রয়োজন। বৈচিত্র্য পাইতে হইলে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের স্বরূপত্ব মাঝে মাঝে লোপ করিয়া দেওয়া দরকার। গভীর নিশীথে চন্দ্রকান্ত রায় কতবার কত দেশে কত স্থানে গিয়াছেন! এই সেদিনই তো নিজেরই একটা জলকরে ধীবরের বেশে জেলে-ডিঙিতে মাছ ধরিয়া তিনি রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

আজও তাঁহার শখ হইয়াছে—ছদ্মবেশে মেলাটা দেখিবেন। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে—নিকটেই দেখিলেন মেলার জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর মধ্যে নৃত্য-গীতের আয়োজন। চন্দ্রকান্ত সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন।

উগ্রমোহনও মেলায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। মেলার যে অংশে ঘোড়া বিক্রয় হইতেছিল, উগ্রমোহন সেই দিকে গেলেন। একটি ঘোড়া দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়াটি, পায়ের চারটি খুর সাদা, কপালে সাদা তিলক, রেশমের মত কোঁকড়ানো ঘাড়ের চুলগুলি। অশ্ব ঘাড় বাঁকাইয়া আছে। সুন্দর সুলক্ষণ ঘোড়া। উগ্রমোহনের কিনিবার শখ হইল। তিনি তাঁবুতে ফিরিয়া অক্ষয় গোমস্তাকে দরদস্তুর করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অশ্বটি অধিকার করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ক্রীড়নকলুব্ধ বালকের ন্যায় উগ্রমোহন সিংহ নিজে তাঁবুতে অক্ষয়ের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই অক্ষয় ফিরিল এবং কহিল, ঘোড়া তো হুজুর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।

তাই নাকি? কে কিনেছে?

রামপ্রতাপবাবু।

ও।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি রামপ্রতাপবাবুর কাছেই যাও। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে বল যে, ঘোড়াটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, তিনি যদি ঘোড়াটি আমাকে বিক্রী করেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। তিনি যে দামে কিনেছেন, তার চেয়ে দাম আমি বেশি দিতেও রাজী আছি। সঙ্গে টাকা কত আছে?

অক্ষয় সংক্ষেপে কহিল, টাকা আছে। শুনলাম তিন শো পঁচিশ টাকায়—

আচ্ছা, তুমি যাও, গিয়ে বলগে যে, আমি পাঁচ শো পর্যন্ত দিতে রাজী আছি। ঘোড়াটা আমার চাই।

অক্ষয় চলিয়া গেল। অবুঝ বালকের মনোবৃত্তি লইয়া উগ্রমোহন নিজ তাঁবুতে বসিয়া অধীরভাবে গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিতে লাগিলেন।

রামপ্রতাপ চৌবে তরুণবয়স্ক জমিদার। মেলায় একটু স্ফূর্তি করিতে আসিয়াছেন। তিনি উগ্রমোহনের মত ঘোড়ার সমঝদার নহেন; কেবল বাজারের সেরা ঘোড়াটা দেখিয়া কিনিয়া

ফেলিয়াছেন মাত্র। ঘোড়ার অপেক্ষা তাঁহার বাইজীর শখই বেশি। দুইজন সুন্দরী বাইজী ইতিমধ্যে আসিয়া তাঁহার তাঁবুতে আসরও জমাইয়াছে। ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত রামপ্রতাপ চৌবের মোসাহেব সাজিয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। রামপ্রতাপ চৌবে যদি ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রকান্তের আসল পরিচয় জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবশ্য এ রস আর জমিত না। এ অঞ্চলের ছোট বড় সকল জমিদারই চন্দ্রকান্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। শ্রদ্ধাস্পদকে লইয়া আর যাই হোক, বাইজীর আসর জমে না। চন্দ্রকান্ত মতিলাল নামে নিজের পরিচয় দিয়া বেমালুমভাবে দলে ভিড়িয়া গিয়াছেন এবং আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

অক্ষয় যখন আসিয়া হাজির হইল, তখন চৌবেজীর বেশ একটু রসাবিষ্ট ভাব। সিদ্ধির নেশাটি ধরিয়াছে, সম্মুখে সুন্দরী বাইজী গাহিতেছে—

উমড় ঘুমড় ঘন গরজে
মেরো পিয়া পরদেশ—

গান থামিতে অক্ষয় উগ্রমোহনের প্রস্তাব চৌবেজীকে নিবেদন করিল। চৌবেজী প্রথমটা বুঝিতেই পারেন না। ঘোড়া কেনার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, ও, উগ্রমোহনবাবু ঘোড়া নেবেন? বেশ তো।

চকিতের মধ্যে চন্দ্রকান্ত দেখিলেন, একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি চৌবেজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিয়ে দিন ঘোড়া। কিন্তু উগ্রমোহন দাম দিতে চাইছেন, এইটে আমার ভাল লাগছে না। সামান্য একটা ঘোড়ার দাম নেওয়াটা কি হুজুরের ইজ্জতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? ঘোড়া আপনি দিয়ে দিন, দাম নেবেন না।

সিদ্ধির ঝোঁকে চৌবেজী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, দাম নেব না।

ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত তখন অক্ষয়ের দিকে ফিরিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, বাবু সাহেব বলিতেছেন যে, তিনি ঘোড়টিকে বিক্রয় করিবেন না। তবে সিংহ মহাশয়ের যদি এই সামান্য অশ্বটিকে পছন্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সানন্দে ইহা তাঁহাকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন।

অক্ষয় এই বার্তা লইয়া ফিরিয়া গেল।

উগ্রমোহন অধীরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন।

অক্ষয় গিয়া চৌবেজীর বার্তা নিবেদন করিতেই বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল। উগ্রমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি বললে? দান? অর্বাচীনটার স্পর্ধা কম নয় তো। একটা চুনো-পুঁটি পত্তনিদার, তার এত বড় লম্বা কথা! সাড়ে পাঁচ শো টাকা আন। আর হরনন্দন সিপাহীকে ডেকে দাও।

অক্ষয় একটি থলি করিয়া সাড়ে পাঁচশত টাকা আনিয়া প্রভুর হাতে দিল। হরনন্দন সিপাহী আসিলে উগ্রমোহন বলিলেন, তুম লোগ কয় আদ্‌মি হো?

পঁচিশ।

মারপিট করনেকো লিয়ে তৈয়ার রহো। ঔর দো সিপাহী হামরা সাথ চলো।

দুইজন সিপাহী সমভিব্যাহারে উগ্রমোহন সিংহ শঙ্করমাছের হান্টারগাছটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌবেজীর তখন বেশ তন্ময় ভাব। সম্মুখে নৃত্যপরা বাইজী। মতিলাল ওরফে চন্দ্রকান্ত সঙ্গত করিয়া চলিয়াছেন। তবলা সারেং নূপুরের ঐকতানে অপূর্ব রসলোক সৃষ্ট হইয়াছে। এমন সময় মূর্তিমান রস-ভঙ্গের মত উগ্রমোহন আসিয়া উপস্থিত। তিনি সোজা চৌবেজীর কাছে গিয়া সপাসপ ঘা কয়েক চাবুক বসাইয়া দিয়া বলিলেন, উগ্রমোহন সিং কারও দান নেয় না কখনও। মানীর মান রেখে কথা বলতে শিখুন। টাকার তোড়াটা ঝনাৎ করিয়া আসরে ফেলিয়া দিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, ঘোড়া নিয়ে চললাম। সাধ্য থাকে আটকান।

হাল্লা হৈ-হৈ মারামারির মধ্যে সেই রাত্রেই উগ্রমোহন অশ্বপৃষ্ঠে মেলা ত্যাগ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ও আসিয়া পালকিতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মুখে একটি মৃদু হাস্যরেখা। এত সহজে কার্যসিদ্ধি হইবে তিনি ভাবেন নাই। গোলোক সাকে উদ্ধার করিতে হইলে উগ্রমোহনকে অন্য কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া অন্যমনস্ক রাখা দরকার। গতকল্য হইতে চন্দ্রকান্ত চিন্তা করিতেছিলেন, কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে! উগ্রমোহন একটু অন্যমনস্ক না থাকিলে গোলোক সার অনুসন্ধান করা অসম্ভব, অন্তত কমলাক্ষ তাহাই বলিতেছে।

মতিলাল-বেশে আন্দাজে যে দাবার চালটা তিনি চালিয়াছিলেন, তাহা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

।। বাইশ ।।

উক্ত ঘটনার প্রায় পনেরো দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় অঘোর চক্রবর্তী আসিয়া উগ্রমোহনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন।

উগ্রমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল?

অঘোরবাবু শান্তভাবে উত্তর দিলেন, মকদ্দমা ডিসমিস হয়ে গেল।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যাক। ঘোড়াটা চড়ার শখও মিটে গেছে আমার! এবার ওটা চৌবেজীকে ফেরত দিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।

থাম, একটা চিঠিও আমি দিয়ে দেব ওর সঙ্গে।—বলিয়া উগ্রমোহনবাবু নিজে খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। অঘোরবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া নীরবে তামাটে গোঁফ জোড়াটাকে দক্ষিণ করতল দিয়া অকারণে মুছিতে লাগিলেন। যখনই অঘোরবাবু এরূপ করেন তখনই বুঝিতে হইবে, অঘোরবাবু মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিতেছেন। অঘোরবাবুর পরিচ্ছদও আজ একটু অসাধারণ ধরনের। অঙ্গে একটি কালো চাপকান-গোছের লম্বা কোট, গলায় পাকানো সাদা চাদর এবং মাথায় পাগড়ি-জাতীয় শিরস্ত্রাণ। তিনি সদর হইতে ফিরিয়াছেন; আনন্দপুর মেলায় যে দাঙ্গা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে মকদ্দমার তদ্বির করিতে তিনি জিলা-কোর্টে গিয়াছিলেন। এত বড় একটা মকদ্দমা কি উপায়ে যে সহসা ডিসমিস হইয়া গেল, তাহা অঘোরবাবুই জানেন।

উগ্রমোহন সিংহ ঘরে বসিয়া পত্র লিখিলেন—

প্রিয় চৌবেজী,

আমার শখ মিটিয়াছে। এইবার আপনার শখ মিটাইতে পারেন। ঘোড়াটি ফেরত পাঠাইতেছি। মামলা করিয়া কোন সুবিধা হইবে না, তাহা আশা করি বুঝিয়াছেন।

উগ্রমোহন সিংহ

বাহিরে আসিয়া পত্রখানি অঘোরবাবুর হস্তে দিয়া তিনি বলিলেন, এই চিঠির সঙ্গে ঘোড়াটা পাঠিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।—বলিয়া অঘোরবাবু পত্রখানি লইলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, সদরে গিয়ে শুনলাম, শ্যামাঙ্গিনী-দাতব্য-চিকিৎসালয় হচ্ছে। রাণীমার নাম করে সেখানে হাজার খানেক টাকা দান করে এসেছি।

শ্যামাঙ্গিনী কে?

শ্যামাঙ্গিনী দেবী হচ্ছেন বর্তমান সদরালার স্ত্রী। অতি সদাশয় মহিলা ছিলেন তিনি। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্যে চিকিৎসালয় হচ্ছে শুনলাম। অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য একটু হাসির আভাস যেন জাগিয়া মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন, বেশ করেছ।

তাহার পর অঘোরবাবু বলিলেন, গোলোক সা সম্বন্ধে একটা কোন ব্যবস্থা করা দরকার। তাকে এ রকম ভাবে লুকিয়ে আর কতদিন রাখা যাবে?

কোথায় আছে এখন?

কালীর মন্দিরে, চামা মাঠে।

উগ্রমোহন খানিকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা, আগামী কালীপূজার দিন আমি রাত্রে সেখানে যাব। মায়ের পূজার ভাল করে আয়োজন করো।

যে আজ্ঞে।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলোক সার ব্যাপারে একদল নিরীহ বেদে-বেদেনী যে ধরা পড়েছিল শুনেছিলাম, তাদের কোন ব্যবস্থা করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা ছাড়া পেয়ে গেছে। আমাদের সদর নায়েব কুঞ্জবাবু সে বন্দোবস্ত করে এসেছেন।

তাদের কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রত্যেককে দশ টাকা করে নগদ আর একখানা করে কাপড় দেওয়ার হুকুম দিয়েছি।

কি করে ব্যবস্থা হল?

তারা ছাড়া পাবার পর শিয়ালমারি কাছারিতে তাদের নাচ-গান করবার জন্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ম্যানেজারের এতাদৃশ দূরদর্শিতায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সবাই সব পেলে, তুমিই কিছু পেলে না!

অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবি কোন ভাব প্রকাশ করিল না। কেবল কহিলেন, আপনার অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

উগ্রমোহন বলিলেন, আচ্ছা, এখন তা হলে যাও। আগামী কালীপূজার দিন গোলোক সার ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে।

অঘোরবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অঘোরবাবু চলিয়া যাইতেই উগ্রমোহনের মনে হইল, ওদিকের জানালাটার দিক হইতে ঝপ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। উগ্রমোহন বলিলেন, কে?—বলিয়া জানলার দিকে আগাইয়া গেলেন। মনে হইল, অন্ধকারে কে যেন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। আবার তিনি ডাকিলেন, এই, কে?

আজ্ঞে, আমি—বলিয়া মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়া নমস্কার করিল।

মানিক মণ্ডল যে! ওখানে কি করছিলে তুমি?

আজ্ঞে, সিকি আমার একটা পড়ে গিয়েছিল হুজুর, তাই খুঁজছিলাম।

সিকি? ওখানে হঠাৎ সিকি গেল কি করে?

বেলতলাটায় একটা বেল পড়ল কিনা, তাই কুড়োতে গিয়ে সিকিটা গেল পড়ে।

তাই নাকি?

হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো।—চন্দ্রকান্তের পালকি আসিল। উগ্রমোহন সেই দিকে আগাইয়া গেলেন। মানিক মণ্ডল পলাইয়া বাঁচিল।

তাহার পরদিন অঘোরবাবু আসিয়া আবার প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সংবাদ এই যে, শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ চৌবের নিকট যে সিপাহী অশ্বটি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে চৌবেজী অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন এবং ঘোড়াটাকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহাই তিনি জানিতে আসিয়াছেন। অঘোরবাবু ইহাও বলিলেন, কথাটা শুনলাম বলে হুজুরকে জানিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে

বেশি আর ঘাঁটাঘাঁটি করা আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। সিপাহীটা কিন্তু বড় মর্মাহত হয়েছে।

উগ্রমোহনবাবু সংক্ষেপে আদেশ দিলেন, সিপাহীটাকে এখনই দূর করে দাও। বুঝলে?

অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। উগ্রমোহন সিংহ আবার বলিলেন, যে সিপাহী অপমানিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করে না, বাড়িতে ফিরে এসে মর্মাহত হয়, তাকে এখনই বিদেয় কর। ও-রকম পিষ্ট সিপাহী রাখতে চাই না আমি। চৌবেজীকে আর একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। দুধনাথ পাঁড়ের মারফৎ এটা পাঠিও। সে হাজত থেকে খালাস হয়ে এসেছে তো? সে যেন হাতিয়ারবন্দ্ হয়ে যায়।— বলিয়া উগ্রমোহন খাস-কামরায় চিঠি লিখিতে চলিয়া গেলেন। অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া গোঁফের উপর অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন লিখিলেন—

চৌবেজী,

আপনার রামপ্রতাপ নাম সার্থক। সত্যই রামের ন্যায় প্রতাপ আপনার। আপনার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। কথিত আছে, আপনার প্রপিতামহ স্বর্গীয় প্রিয়প্রতাপ চৌবে মহাশয় সুন্দরবন অঞ্চলে বন্য ব্যাঘ্র শিকার করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমার সিপাহীর প্রতি আপনার বিনম্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া দুধনাথ পাঁড়েকে এই পত্রের বাহক-স্বরূপ পাঠাইতেছি। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এই ব্যক্তি একদা একখানি হস্ত বিসর্জন দিয়াছিল। মস্তক বিসর্জন দিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু আত্মসম্মান সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। আশা করি, আপনি সুস্থ হইয়াছেন।

শ্রীউগ্রমোহন সিংহ

কিছুক্ষণ পরে দুধনাথ পাঁড়ে পত্রের জবাব লইয়া আসিল। রামপ্রতাপ চৌবে লিখিয়াছেন—

সিংহ মহাশয়,

এই সামান্য ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আর প্রবৃত্তি নাই। ক্ষেত্রান্তরে আপনার দর্শন লাভের আশায় রহিলাম।

শ্রীরামপ্রতাপ চৌবে

।। তেইশ ।।

রাণী বহ্নিকুমারী একাকিনী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কোলের উপর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' খানি খোলা পড়িয়া ছিল। তিনি মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার মনের মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। প্রমাণ চাহিলে অবশ্য তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তিনি নিঃসংশয়ে ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারই প্রীত্যর্থে গঙ্গাগোবিন্দ রুম্নি-ঝুম্নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ দিয়াছেন।

কথাটা বুঝিয়া অবধি তাঁহার মনে শান্তি নাই। কেন তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে ও-কথা বলিতে গিয়াছিলেন? গঙ্গাগোবিন্দ হয়তো ভাবিয়াছিলেন, স্বামীর হইয়া তিনি ওকালতি করিতেছেন এবং এইজন্যই তিনি হয়তো এই মহানুভবতাটা করিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, বাণী ইহাতে খুশী হইবেন। হায় রে, রমণীরা সত্যই কিসে খুশী হয়, তাহা যদি পুরুষেরা বুঝিত! গঙ্গাগোবিন্দ কি জানেন না যে, তাঁহার খুশীর পথে তিনি নিজেই একদিন অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? দারিদ্র্যের দম্ভ! এই দম্ভের জগদ্দল প্রস্তরের তলায় বাণীর কিশোরী মন যে একদিন তিনি নিজেই গুঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি নিজে জানেন না? আজ তিনি মহানুভবতা দেখাইয়া বাণীকে খুশী করিতে চান? স্পর্ধা তো তাঁহার কম নয়! তিনি কি মনে করেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পান নাই বলিয়া বাণী আজও তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন? তাহা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূর্খ তিনি। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার উগ্রমোহন সিংহের রাণী বহ্নিকুমারী কিশোরী-কালের একটা ভ্রমকে আঁকড়াইয়া আজও বসিয়া নাই। উগ্রমোহন সিংহের যিনি পত্নী, তাঁহার আবার ক্ষোভ কিসের? গঙ্গাগোবিন্দের মত পুঁথির মুখস্থ বুলি আওড়াইতে হয়তো তাঁহার স্বামী পারেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মত পুরুষসিংহ কয়টা আছে এ অঞ্চলে? কয়টা লোকের এমন বিরাট হৃদয়, বিশাল শৌর্য, বিপুল বিক্রম? গঙ্গাগোবিন্দ এই বিবাহ-ব্যাপারে মহত্ত্বটা দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন; তাহা না হইলে উগ্রমোহনের রোষবহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেন তিনি। অন্তঃসারশূন্য দারিদ্র্যের গর্ব লইয়াই লোকটি গেলেন। এত বড় অহঙ্কৃত লোক বহ্নিকুমারী জীবনে আর একটাও দেখেন নাই। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহটাও তিনি ছিলেন শুধু একটা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য। কি আর এমন তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে? কিছুই নয়। এ স্পর্ধা। এ কেবল তাঁহাকে খাটো করিয়া দিবার একটা ফন্দি। গঙ্গাগোবিন্দকে আর কেহ না চিনুক, বাণী ভাল করিয়াই চেনেন। বাণী ভাল করিয়াই জানেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রধান সুর—'কাহারও নিকট খাটো হইব না, চিরকাল মাথা উঁচু করিয়া থাকিব। কাহারও নিকট অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিব না, যতটা পারি অপরকে অনুগ্রহ করিব।' বাণীকে অনুগ্রহ করিয়া তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহে মত দিয়াছেন। তাঁহার এই নীরব অহঙ্কারে বহ্নিকুমারীর সমস্ত হৃদয়টা যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কেহ যদি তাঁহার উঁচু মাথাটা জোর করিয়া হেঁট করিয়া দিতে পারে, তবে যেন তিনি স্বস্তি পান।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' আর পড়া হইল না, তাঁহার সমস্ত হৃদয় গঙ্গাগোবিন্দকে লইয়া অকারণে তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জোর করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যে গঙ্গাগোবিন্দের সমস্ত আচরণের মধ্যেই আত্মশ্লাঘা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা আর কেহ বুঝিতে না পারুক, তিনি বুঝিয়াছেন। তিনি জোর করিয়াই বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্বামীর তুলনায় গঙ্গাগোবিন্দ একটা নগণ্য জীব—অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অত্যন্ত অহঙ্কারী। সমস্ত পুরুষ-জাতিটাই এইরূপ। কেবল স্থান-কাল-পাত্রভেদে একটু ইতরবিশেষ। মহাকবি কালিদাস এই 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের রাজার মুখ দিয়া মালবিকার যে

রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পুরুষ-কবির পক্ষেই সম্ভব—প্রেমের ছদ্মবেশে লালসার উচ্ছ্বাস। বহ্নিকুমারী মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া একাকিনী বসিয়া রহিলেন। এক ঝলক বাতাস চূতমুকুলের গন্ধ বহিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বহ্নি কুমারীর তাহাতে আজ আনন্দ হইল না। গঙ্গাগোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এত বিষের মধ্যেও কি অমৃত ছিল না? ছিল। বায়ুমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত আছি বলিয়া আমরা যেমন বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, অমৃতপরিমণ্ডলে নিমজ্জিত বহ্নিকুমারীর অন্তরাত্মা অমৃত সম্বন্ধে তেমনই সচেতন ছিল না। সচেতন হইল, যখন উগ্রমোহন আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছেড়ে একেবারে চলল।

কোথায়?

কাশী।

কেন?

সংস্কৃত পড়বে বলে। তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। ছোকরার চিরকালই মাথায় একটু ছিট আছে। বলিয়া একখানি পত্র তিনি বহ্নিকুমারীকে দিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

বাণী,

তোমাদের কৃপায় আমার জীবনের সামাজিক দায়িত্ব শেষ হইয়াছে। যে কয়দিন বাঁচিব, লেখাপড়ার চর্চা করিয়াই কাটাইব স্থির করিয়াছি। বহুদিন হইতে বাসনা, ভাল করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। দারিদ্র্যনিবন্ধন এতদিন তাহা পারি নাই। সম্প্রতি কাশী হইতে জনৈক অধ্যাপক আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমি যদি তাঁহার নিকট গিয়া বাস করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করিবেন। এ সুযোগ আমি পরিত্যাগ করিব না। দুই-একদিনের মধ্যেই কাশী যাত্রা করিব এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে কাটাইয়া দিব। যাইবার পূর্বে তোমার সাক্ষাৎ পাইলে সুখী হইতাম। ইতি

গঙ্গাগোবিন্দ

রাণী বহ্নিকুমারীর সমস্ত অন্তরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিল। গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন? আর কখনও ফিরিবেন না? আর কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না তিনি? তাঁহার স্বামী চেষ্টা করিলে কি তাঁহার যাওয়াটা বন্ধ করিতে পারেন না?

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া বলিলেন, সত্যই লোকটা পাগল। এর কাশী যাওয়াটা বন্ধ করতে পার?

অসীম ঔদাসীন্যভরে উগ্রমোহন উত্তর করিলেন, তাতে লাভ কি?

বহ্নিকুমারী মুহূর্তের জন্য উগ্রমোহনের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা বটে।

উগ্রমোহন জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু আসিতেছেন। আগামী পর মহাকালীর মন্দিরে পূজা, তাহার সম্বন্ধেই উপদেশ লইতে আসিতেছেন বোধ হইল।

অঘোর আসছে দেখছি। নীচে যাই। বলিয়া উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী একা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেবউন্নিসা-চরিত্র মনে পড়িল। মবারককে জেবউন্নিসা বিষধর সর্প দিয়া হত্যা করিয়াছিল। তিনিও কি গঙ্গাগোবিন্দকে দেশছাড়া করিলেন? রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ না হইলে তিনি তো চলিয়া যাইতেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বহ্নিকুমারীও জেবউন্নিসার মত ভাবিলেন, যদি চাষার মেয়ে হইতাম!

আবার তখনই তাঁহার মনে হইল, চাষার মেয়ে হইলেই বা করিতাম কি? গঙ্গাগোবিন্দের মত এত বড় একটা অবুঝ লোককে লইয়া কিছুই করা যায় না। নিজের গরিমায় তিনি এমন আত্মমগ্ন যে, অপরের দিকটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার নাই। আলোকের মত দীপ্ত প্রতিভায় তিনি চতুর্দিকে শুধু ছড়াইয়া থাকিবেন। কাহারও বিশেষ সম্পত্তি তিনি হইবেন না, কাহারও সুবিধা-অসুবিধা সুখ-দুঃখ তিনি লক্ষ্য করিবেন না। নিজেকে বিকশিত করিয়া বিকীর্ণ করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বহ্নিকুমারীরই বা তাঁহার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? পৃথিবীতে কাহারও অভাবে কিউ আটকায় না। উগ্রমোহন সিংহের বিশাল জমিদারির মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দের মত একটা সামান্য প্রজা থাকিল, কি গেল, তাহা লইয়া উৎকণ্ঠিত হওয়া রাণী বহ্নিকুমারীর সাজে না। উগ্রমোহনের পত্নী তিনি। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার কে?

।। চব্বিশ ।।

শ্যামলতালেশহীন রুক্ষ চামা-প্রান্তরে সূর্য অস্ত যাইতেছে। চতুর্দিকে একটা নিষ্করুণ রক্তাভা। রক্তাম্বরধারী কাপালিকের মত চামা-প্রান্তর স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার নীরব উদ্ধত গাম্ভীর্যে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। অনুর্বর তাহার বক্ষে সবুজের চিহ্নমাত্র নাই—বৃক্ষ নাই, গুল্ম নাই, তৃণদলও নাই। ছায়াবিহীন দীর্ঘ দিবস তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। প্রখর সূর্যের তীব্রদাহে যুগযুগান্ত ধরিয়া চামা-প্রান্তর এইরূপ প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার কোমলতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু এক বিশাল ব্যাপ্তি। যতদূর দৃষ্টি যায়, শেষ নাই। ঊষর প্রান্তর আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। মনে হয়, যেন একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা মূর্তি ধরিয়াছে।

অঘোরবাবু মহাকালীর মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নিমেষবিহীন নয়নে সূর্যাস্তের পানে চাহিয়া ছিলেন। চামা-প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা মহাকালীর মন্দির তান্ত্রিক-সাধক অঘোরনাথের অতিশয় প্রিয় স্থান। এই চামা-প্রান্তর যেন তাঁহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার ছয় পুত্র আর দুই কন্যার মধ্যে একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। শোকে দুঃখে স্ত্রীও মারা গিয়াছেন। অনেকের ধারণা, তান্ত্রিক সাধনাই অঘোরবাবুর কষ্টের কারণ। যেদিন হইতে তিনি ইহা শুরু করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহার জীবনে পড়িয়াছে। তথাপি তিনি আজিও নিরস্ত হন নাই। তিনি শব-সাধনা করিয়াছেন, নরবলি দিয়াছেন, মহাকালীকে সন্তুষ্ট করিবার বহু চেষ্টা

তিনি বহুপ্রকারে করিয়াছেন; কিন্তু ছলনাময়ী উন্মাদিনী তাঁহাকে দিয়াছেন শুধু দুঃসহ শোক। অঘোরবাবুর ধারণা, পাগলী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন।

তাঁহার দৃঢ় পণ, এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেনই। তাই আজও তিনি একাগ্রমনা শ্যামা-সাধক। এখনও প্রতি অমাবস্যায় এই নির্জন প্রাণহীন শূন্য-প্রান্তরে তিনি মহাকালীর পূজার আয়োজন করেন।

সূর্য অস্ত গেল। অঘোরবাবু নিস্পন্দ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ঘোর অমাবস্যা-রজনীর গাঢ় তমিস্রা চামা প্রান্তরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

অমাবস্যার গভীর রাত্রি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। মহাকালীর মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। অঘোরনাথ কালীপূজা করিতেছেন। পরিধানে তাঁহার রক্তাম্বর, কপালে সিন্দূরের টীকা, গলায় জবাফুলের মালা। চক্ষু দুইটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ, কারণ পান করিয়াছেন। নিকটেই উগ্রমোহন বসিয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত মুখে একটা গম্ভীর প্রশান্ত ভাব। তিনি একাগ্রচিত্তে মহাকালীপূজা দেখিতেছেন। পূজা শেষ হইতে আর দেরি নাই।

গোলোক সাও একটু দূরে বসিয়া আছে। পূজা হইয়া গেলে তাহার বিচার হইবে। অঘোরবাবু মন্ত্রপাঠ করিয়া চলিয়াছেন, একটা আর্ত ছাগশিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। বাহিরে অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার।

পূজা শেষ হইল। বলিদান হইয়া গেল।

উগ্রমোহন তখন গোলোক সার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলবার আছে তোমার? এখন যদি মায়ের সামনে তোমাকে বলিদান হয়, কি করতে পার তুমি?

গোলোক সা কহিল, আমায় ক্ষমা করুন হুজুর।

একবার তো তোমায় ক্ষমা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বার তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। তোমাকে আর ক্ষমা করা যায় না। তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব আমি, যা তুমি জীবনে কখনও ভুলবে না। দুধনাথ পাঁড়ে!

দুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঁচিশ চাবুক। পহলে নাঙ্গা কর লেও।

কম্পিত-কলেবর উলঙ্গ গোলোক সাকে লইয়া দুধনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই গোলোক সার আর্তস্বর অন্ধকার চামা-প্রান্তরে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

উগ্রমোহন বলিলেন, অঘোর মায়ের প্রসাদ একটু দাও তো। অঘোরবাবু একপাত্র কারণ আগাইয়া দিলেন। উগ্রমোহন তাহা নিঃশেষে পান করিয়া বলিলেন, আর একটু দাও। অঘোরবাবু আর-এক পাত্র দিলেন।

গোলোক সাকে লইয়া দুধনাথ পাঁড়ে ফিরিয়া আসিল।

উগ্রমোহন বলিলেন, এখনও শেষ হয়নি। একটু বিশ্রাম করে নাও। আরও চাবুক লাগাব। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আজ চাবকাব তোমায়। তোমার টাকার অত্যন্ত গরম হয়েছে।

উগ্রমোহন আর এক পাত্র কারণ পান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার পিঠের চামড়াখানি আজ ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। বুঝলে? আর সেই চামড়ায় এক জোড়া জুতো বানিয়ে তোমার খাতক চন্দ্রকান্ত রায়কে উপহার দেব। বুঝতে পারছ?

সহসা গোলোক সার চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। নিকটেই একখানা ইট পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া সে সবেগে উগ্রমোহনের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। উগ্রমোহন চকিতে মাথা সরাইয়া লইলেন, ইট সোজা গিয়া প্রতিমার অঙ্গে লাগিল। মহাকালীর হস্তধৃত মুণ্ডুটা চুরমার হইয়া ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যাঘ্রের মতন উগ্রমোহন গোলোক সার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। লাথি, চড়, কিল, জুতা অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করিয়া শেষে তিনি বলিলেন, এর শাস্তি মৃত্যু! বলিদান দাও একে। অঘোর!

প্রতিমার অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে। ঘোরতর অমঙ্গল আশঙ্কায় অঘোরনাথের অন্তরাত্মা কাঁপিতেছিল। মুখে কিন্তু তাঁহার এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। পুরোহিতের আসন হইতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, বলিদানের পশু অক্ষতদেহ হওয়া প্রয়োজন। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সত্যই গোলোক সার নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি ভিজিয়া গিয়াছিল। উগ্রমোহন প্রচুর কারণ পান করিয়াছিলেন। বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, মায়ের গায়ে আঘাত করেছে। প্রাণ দিয়ে ওকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বলিদান না হয়, অন্য ব্যবস্থা কর। ওর মৃত্যু আমি চাই।

অঘোরবাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন, যম-ঘরে পাঠিয়ে দিন তা হলে—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরার তীব্র উন্মাদনায় উগ্রমোহন আবার বলিলেন, হ্যাঁ এখনই নিয়ে যাও। এই দুধনাথ পাঁড়ে! তুম ঔর শুকুল সিং ঔর—

অঘোরবাবু বলিলেন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

কিছুক্ষণ পরে অচেতন গোলোক সাকে লইয়া সিপাহীরা যম-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

সঙ্গে অঘোরবাবুও গেলেন।

মন্দিরের পিছনে মানিক মণ্ডল নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। সেও এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন সিংহ যখন বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দুইটা হইবে। তিনি গিয়া দেখিলেন, রাখালবাবু দেওয়ান চিন্তিত মুখে তাঁর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

কি খবর হে, এত রাত্রে?

আজ্ঞে, বৃন্দাবন থেকে প্রাণমোহন এসেছে। কর্তা-মায়ের ভারি অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।

মায়ের অসুখ? কোথা প্রাণমোহন?

সে তার নিজের বাড়ি গেছে। এখনই ফিরবে।

উগ্রমোহন সিংহের বৃদ্ধা জননী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া উগ্রমোহন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—সওয়ারি ঠিক কর। আমি ভোরেই বেরিয়ে যাব। কিছু টাকা আর জন পাঁচেক লোক সঙ্গে চাই।

রাখালবাবু ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

।। পঁচিশ ।।

উগ্রমোহন বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন। বহ্নিকুমারী সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উগ্রমোহন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না। বহ্নিকুমারী একা পড়িলেন। বহ্নিকুমারী অবশ্য চিরকালই একাকিনী। সাধারণতঃ জমিদার-গৃহিণীগণ সখী-দাসী-পরিবৃতা হইয়া যে-জীবন যাপন করেন, বহ্নিকুমারী তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি বহ্নিকুমারীর মার্জিত মনের সূক্ষ্ম সুখদুঃখের অংশ লইতে পারেন। সখীবেশে যাহারা আসিতেন, তাঁহারা সকলেই চাটুকার। বহ্নিকুমারী তাঁহাদের প্রশ্রয় দিতেন, কারণ অপরের মুখে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করা আভিজাত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু স্তাবককে তিনি অনুগ্রহই করিতে পারেন, তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না, কারণ তাঁহারা নিম্নস্তরের জীব। বহ্নিকুমারীর মন যখন কাদম্বরীর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত বা সাহানার সুরে মোহিত, তখন যাহারা আমসত্ত্ব বা ব্যঞ্জন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে, তাহাদের প্রতি মৃদুহাস্যে কিছু অনুগ্রহ-বর্ষণ করা যাইতে পারে মাত্র, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা চলে না। মানসিক সমতা না থাকিলে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কিছুই জমে না। ইহাদের সহিত সখিত্ব করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বহ্নিকুমারীর ছিল না।

স্বামী উগ্রমোহন বহ্নিকুমারীর অবলম্বন, সঙ্গী নহেন। বিশাল মহীরুহ ব্রততীর সঙ্গী হইতে পারে না, আশ্রয় হইতে পারে। উগ্রমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বহ্নিকুমারী বাঁচিয়া ছিলেন। দুইজনের মধ্যে মিল কিছুমাত্র ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে অধিকাংশ সময় বুঝিতেও হয়তো পারিতেন না, কিন্তু তবু তাঁহাদের মিলনের বাধা ছিল না। মনের নিভৃত জগতে বহ্নিকুমারী পূজা করিতেন উগ্রমোহনকে নয়, উগ্রমোহনের শক্তিকে। উগ্রমোহনের এই শক্তি, এই মহিমা, এই প্রাবল্য বহ্নিকুমারীর দাম্পত্য-জীবনের মেরুদণ্ড। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বহ্নিকুমারীর সমস্ত সত্তা দাঁড়াইয়া ছিল, গঙ্গাগোবিন্দের বিরহে ভূমিসাৎ হইয়া যায় নাই। কিন্তু বহ্নিকুমারীর সঙ্গী কেহ ছিল না। বহ্নিকুমারী চিরকালই একাকিনী—লেখাপড়া আর

সঙ্গীত-চর্চা, প্রসাধন ও কারুশিল্প এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটে। উগ্রমোহন সমস্ত দিন থাকেন অশ্বপৃষ্ঠে, সুতরাং বহ্নিকুমারী তাঁহার মধ্যে সঙ্গী খুঁজিয়া পান নাই। চন্দ্রকান্তের মত তিনিও আপনার কল্পলোকেই বাস করেন। তাঁহার কিশোর মনে গঙ্গাগোবিন্দের যে ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও আছে। যুক্তির ঘর্ষণে তাহা খানিকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার চিত্তাকাশে গঙ্গাগোবিন্দ যেন ক্ষুদ্র একটি তারা, উগ্রমোহন যেন বিশাল একখানা মেঘ। তারা ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু তাহা উজ্জ্বল। মেঘের দ্যুতি নাই, কিন্তু শোভা আছে, বিদ্যুৎ আছে, বজ্র আছে, সলিল-সম্ভারও আছে। তারা আকাশের এক প্রান্তেই স্থির হইয়া থাকে। মেঘ সমস্ত আকাশে নিমেষে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেয়, ক্ষুদ্র নক্ষত্র ঢাকা পড়িয়া যায়। ঢাকা পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু নিবিয়া যায় না। মেঘ সরিয়া গেলে আবার তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আজ প্রায় দশ দিন হইল উগ্রমোহন বৃন্দাবন গিয়াছেন।

বহ্নিকুমারীর একা একা আর ভাল লাগিল না। সন্ধ্যা হইয়াছে, শিবমন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিতেছে। নহবৎখানায় সানাই পুরবী ধরিয়াছে। আর একদিনের কথা মনে পড়িল।

বহ্নিকুমারী ডাকিলেন, কুসুম!

কুসুম নাম্নী দাসী আসিতেই তিনি আদেশ করিলেন, আমার পালকি তৈরি করতে বল্। একবার দাদার কাছে যাব।

।। ছাব্বিশ ।।

চন্দ্রকান্ত তাঁহার খাস-কামরায় একা বসিয়া তাঁহার নব-নির্মিত একটি সেতারের আওয়াজ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বহ্নিকুমারীর পালকি আসিয়া থামিল। উগ্রমোহনের উর্দি-পরা সিপাহী আসিয়া সেলাম করিয়া খবর দিল যে, রাণীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত সেতার রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে, বাণী এসেছে নাকি? কোথা?—বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিলেন। সিপাহীরা সরিয়া গেল এবং বহ্নিকুমারী পালকি হইতে নামিয়া অগ্রজের পদধূলি লইলেন। চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, রাণী বহ্নিকুমারীর আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না যে! আয়, ভেতরে আয়।

ভ্রাতা-ভগ্নী ভিতরে গেলেন।

বহ্নিকুমারী ভিতরে গিয়াই বলিলেন, বাঃ, চমৎকার সেতারটা তো! কোথা থেকে আনলে দাদা?

তৈরী করালাম, এইখানেই। আওয়াজ মন্দ হয়নি।

বহ্নিকুমারী সেতারটা তুলিয়া লইয়া টুং-টাং আওয়াজ করিতে করিতে কহিলেন, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে তো!

চন্দ্রকান্ত উপবেশন করিয়া বলিলেন, একটা কিছু বাজা দেখি। অনেক দিন তোর বাজনা শুনিনি।

বহ্নিকুমারী অগ্রজের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, ভুলে গেছিস নাকি সব? আগে তো তুই আমার চেয়ে ভাল বাজাতিস। বাজা একখানা, শোনা যাক।

কি বাজাব?

যা তোর খুশি।

বহ্নিকুমারী সেতারটা লইয়া একটু নাড়াচড়া করিয়া বলিলেন, তুমি যে সেই জৌনপুরি গৎটা আমায় দিয়েছিলে, সেইটে বাজাই। বাজাব?

এই সন্ধ্যেবেলা জৌনপুরি বাজাবি? আচ্ছা, বাজা।

বহ্নিকুমারী জৌনপুরি বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বাজুবন্ধের দোলক দুলিতে লাগিল। কঙ্কণের শিঞ্জিতের সহিত সেতারের ঝঙ্কার মিলিয়া জৌনপুরি নূতন মূর্তি ধরিল, পুরুষ ওস্তাদের হাতে ইহা সম্ভব নয়। বহ্নিকুমারীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রকান্তের মন অতীতে ফিরিয়া গেল। তখনও বাণী অনূঢ়া, নূতন সেতার বাজাইতে শিখিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দকে বাজনা শুনাইবার জন্য তাহার কি আগ্রহ! নানা ফন্দিতে, নানা ছুতায় গঙ্গাগোবিন্দকে সেতার শুনাইয়া দিবার জন্য বাণী উন্মুখ হইয়া থাকিত। চন্দ্রকান্ত ইহা লইয়া বাণীকে কত বিদ্রূপই না করিয়াছেন!

বহ্নিকুমারী বাজনা শেষ করিয়া বলিলেন, উঃ, যা বড় তোমার সেতার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি একটা বাজাও দাদা এবার।

চন্দ্রকান্ত সেতার লইয়া বলিলেন, শুনেছিস, গঙ্গাগোবিন্দ কাল কাশী চলে যাচ্ছে?

হ্যাঁ। আমাকে চিঠি লিখেছিল একটা। কালই যাবে? এত তাড়াতাড়ি?

ওর মাথায় একটা খেয়াল ঢুকলে তো আর রক্ষে নেই। প্রাকৃত শিখবে ঝোঁক চেপেছিল, শিখে তবে ছেড়েছে। এখন সংস্কৃতের ভূত কাঁধে চেপেছে। দেখা যাক, কোথায় গিয়ে থামে!—বলিয়া চন্দ্রকান্ত সেতারের সুর মিলাইতে লাগিলেন। মিলাইতে মিলাইতে বলিলেন, আমার আবার এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, কেউ ঠেকা না দিলে ভাল বাজাতে পারি না। তুই ঠেকা দিতে পারবি:

না, আমি পারব না।—বলিয়া বহ্নিকুমারী একটু হাসিলেন। আচ্ছা তবে এমনিই শোন। একখানা হাম্বীর বাজাই।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত শুরু করিলেন। বহ্নিকুমারী বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। বহুকাল দাদার বাজনা শোনা হয় নাই। চমৎকার হাত হইয়াছে তো! বহ্নিকুমারীর মনও অতীতে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধ ওস্তাদ আবিদ মিঞাকে মনে পড়িল। বুড়ার হাত কি মিঠা

ছিল। আবিদ মিঞার কাছে বাণীর প্রথম হাতেখড়ি। প্রথম প্রথম মেজ্‌রাপে আঙুলে কত লাগিত, তারে হাত কাটিয়া যাইত। ছাতের ঘরটাতে একা বসিয়া সেই ডা-রা-ডা-রা সাধা। তাহার পর ক্রমশ দুই-একটা গৎ। গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকিয়া গৎ শোনানো। গঙ্গাগোবিন্দ কাল চলিয়া যাইতেছে। বহ্নিকুমারী অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। চন্দ্রকান্তের সেতার থামিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগল হাম্বীর?

বেশ।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উঠিলেন।

এঃ, তুই সব ভুলে গেছিস দেখছি। হাম্বীর বললাম বলেই হাম্বীর? কেদারা, ধরতে পারলি না? এই দেখ্।—বলিয়া আবার একটু বাজাইলেন। বহ্নিকুমারী যে গঙ্গাগোবিন্দের কথা ভাবিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন, অনেক দিন চর্চা নেই।

বাহিরে পদশব্দ হইল।

চন্দ্রকান্ত আছ নাকি? আসতে পারি?—বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দই ঘরে ঢুকিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, এ কি, বাণীও যে এখানে! আমি কাল ভোরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছিলাম।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া পড়িবেন, বহ্নিকুমারী তাহা কল্পনাও করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, কাল সত্যিই যাবে তা হলে?

হ্যাঁ। দেরি করে লাভ কি? স্বল্প তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। বৃন্দাবন থেকে কোনও খবর এল?

না।

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ।

গঙ্গাগোবিন্দই প্রথমে কথা বলিলেন, মনে রেখো তোমরা। নানা ভাবে অনেক বিরক্ত করেছি তোমাদের।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, বিনয় প্রকাশের স্থান-অস্থান আছে। সেটা ভুলে যাও কেন? সংস্কৃত পড়তে যাচ্ছ বলে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, গ্রাম ছাড়বার সময় বুঝতে পারছি, গ্রামের সঙ্গে সত্যিই একটা নাড়ীর যোগ আছে।

চন্দ্রকান্ত কহিলেন, তোমার মেয়ে-জামাইদের সঙ্গে দেখা করে এসেছ? কি বললে তারা?

বিশেষ কিছু নয়। বিয়ে হলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। বাণী যেমন আমাদের পর হয়ে গেছে।

বহ্নিকুমারীর মনে যে উত্তরটা আসিয়াছিল, তাহা না বলিয়া তিনি বলিলেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বটে, সত্যিই পর হয়ে গেছি এবং পরস্পর।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, এইবার উঠি আমি। আমাকে আবার একটু গোছগাছ করতে হবে।—বলিয়া তিনি সত্যসত্যই উঠিয়া পড়িলেন। অতি সাধারণ কথাবার্তার ভিতর দিয়া বিদায়ের পালা শেষ হইয়া গেল। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, ওহে, তোমার ম্যানেজার অনেকক্ষণ থেকে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই নাকি?—আচ্ছা বসুক।

বহ্নিকুমারী বলিলেন, তার দরকার কি? আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে গিয়ে তোমার বই-টইগুলো একটু দেখি।

আচ্ছা, তা হলে ডেকে দিয়ে যাও।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া গেলেন এবং বহ্নিকুমারী উঠিয়া চন্দ্রকান্তের পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলেন।

।। সাতাশ ।।

কমলাক্ষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খবর পেলে?

আজ্ঞে না।

না মানে? মানিক মণ্ডলের খবর তা হলে ভুল?

খবর ভুল নয়। সে শুনে এসেছিল যে, উগ্রমোহনবাবু গোলোক সাকে যম ঘরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন; অথচ যম-ঘর নামে যে ঘর যম-জঙ্গলে আছে, তার ভেতরকার খবর নেওয়া শক্ত—একপ্রকার অসম্ভব।

কেন?

সে ঘরে একটা লোহার দ্বার আছে এবং তা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ঘরে একটাও জানলা নেই। ঘরের দেওয়াল অত্যন্ত উঁচু। সুতরাং গোপনে সে ঘরের সম্বন্ধে কোন খবর সংগ্রহ করা শক্ত। অথচ মানিক মণ্ডলের খবর, সেই ঘরের মধ্যেই গোলোক সা আছে। আজ প্রায় দশ দিন অতীত হয়ে গেল, কোনও খবরই যোগাড় করতে পারলাম না।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অঘোর চক্রবর্তী কোথা?

তাঁর কাছে রামদীন সিপাহীর মারফৎ একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম যে, যম-ঘরের অনুরূপ একটি ঘর টাল-জঙ্গলে করাবেন বলে বাবুর ইচ্ছে হয়েছে, আপনি যদি যম-ঘরটা খুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তা হলে আমরা ভেতরের মাপ-জোপ নিতে পারি।

কি উত্তর দিলেন তিনি?

তিনি বললেন যে, যম-ঘরের চাবি মালিকের কাছে আছে। তিনি বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সে ব্যবস্থা হবে।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর কমলাক্ষকেই বলিলেন, তা হলে এখন কি করা উচিত?

কমলাক্ষ ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিলেন, পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখি না।

পুলিসে খবর দেবে?—বলিয়া চন্দ্রকান্ত আবার খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন।—পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ভেবে পাচ্ছ না?

আজ্ঞে না। আমার মনে হচ্ছে, গোলোক সাকে আমরা যদি দু-একদিনের মধ্যে উদ্ধার না করতে পারি, তা হলে সে বাঁচবে না।

বল কি?

আমার তো সেই রকমই মনে হয়। উগ্রমোহনবাবু তাকে মেরেছেন প্রচুর, তার ওপর আজ দশ দিন ধরে সে ওই যম-ঘরে বন্দী অবস্থায় আছে। এক ফোঁটা জল বা এক দানা খাবার তার পেটে পড়েনি।

কি করে জানলে তুমি?

যম-জঙ্গলে লুকিয়ে লোক মোতায়েন রেখেছিলাম যম-ঘরের ওপর নজর রাখবার জন্যে। দিবারাত্র একজন লোক সেখানে ছিল। আজ থেকে অবশ্য আর নেই। বলিয়া কমলাক্ষ আবার ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

যম-ঘরে গোলোক সা আছে, এ খবর ঠিক তো?

মানিক মণ্ডলের তাই খবর। উগ্রমোহনবাবু এই হুকুম দিয়েছিলেন সে স্বকর্ণে শুনেছে।

চন্দ্রকান্ত নীরবে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে একটি কথাই প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল যে, বিলম্ব করিলে গোলোক সার মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে, এবং মৃত্যু যদি হয়, তাহার জন্য দায়ী তিনি। সুতরাং বিলম্ব করা অনুচিত। পুলিসে খবর দেওয়াটা যদিও তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না, তথাপি তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন, আচ্ছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর তা হলে।

কমলাক্ষ নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেই গঙ্গাগোবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন।—ওহে, মল্লিনাথের টীকা তোমার আছে? ও কি, তুমি অমন করে বসে আছ কেন?

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, মহাবীর উগ্রমোহনের প্রতাপে অস্থির হয়ে গেলাম।

কি রকম?

গোলোক সাকে কোথা এক যম-ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে আজ দশ দিন। লোকটা অনাহারে সেখানে শুকিয়ে মরছে।

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, সিংহ যে, বীরত্ব দেখাবেন বইকি। মল্লিনাথের টীকা আছে তোমার?

ছিল তো সবই। খুঁজে দেখে কাল পাঠিয়ে দেব। গোলোক সার ব্যাপারে মনটা বড় দমে আছে এখন।

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণী চলে গেল কখন? বাণীর জন্যে ভারি কষ্ট হয়। উগ্রমোহনের মত লোকের সহধর্মিণী হওয়া নিশ্চয়ই সুখের নয় ওর পক্ষে।

চন্দ্রকান্ত একটু চোখ টিপিয়া বলিলেন, চুপ কর। পাশের ঘরেই আছে।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, তাই নাকি? শুনতে পায়নি বোধ হয়। আচ্ছা, আমি চললাম। মল্লিনাথটা খুঁজে দেখো।

পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া বহ্নিকুমারী সমস্ত শুনিয়াছিলেন। কমলাক্ষের কাহিনী, চন্দ্রকান্তের উক্তি ও গঙ্গাগোবিন্দের মন্তব্য, কিছুই বাদ যায় নাই। তাঁহার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, ধরণী, দ্বিধা হও। স্বামীর নিন্দা আর শুনিতে পারি না। রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাঁহার মনের যে অবর্ণনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহার আভাস তাঁহার মুখেও যে ফোটে নাই, তাহা নহে। তাঁহার পাতলা ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দ যখন তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল যে, বাহির হইয়া আসিয়া মুখের মতন একটা জবাব দেন। কিন্তু তাহাতে উগ্রমোহন সিংহের পত্নীর সম্মান-লাঘব হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ পুড়িয়া যাইতেছিল। যম-ঘর? যম-জঙ্গল কাছারিতে বনভোজন উপলক্ষ্যে গিয়া তিনি যম-জঙ্গল দেখিয়াছিলেন বটে। তখনও তাহাতে তালা লাগানো ছিল। সে তালার চাবিও বোধ হয় বহ্নিকুমারী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। উগ্রমোহন সিংহের একটা দেরাজের মধ্যে যে চাবির গোছা আছে, তাহার মধ্যে একটা বড় চাবির গায়ে একটা কাগজ আঁটা আছে বটে—যম-ঘর।

চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন, বাণী এখানে খেয়ে যাবি নাকি?

যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে হাসিয়া বহ্নিকুমারী বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, না। আমি এখনই চললাম। আমি তোমার এই বইটা নিয়ে চললাম। সাদীর অনুবাদ।

আচ্ছা।

বহ্নিকুমারী চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বহ্নিকুমারীর পালকি চন্দ্রকান্তের বাড়ির সীমানা ছাড়াইতেই বহ্নিকুমারী আদেশ দিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ি চল! গঙ্গাগোবিন্দ আহারাদি শেষ করিয়া শুইবার যোগাড় করিতেছিলেন, এমন সময় বহ্নিকুমারীর পালকি তাঁহার দ্বারে থামিল। উর্দি-পরা সিপাহী ভিতরে গিয়া নিবেদন করিল, রাণীজী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, এস, বাণী, এস। কি খবর? এলে যে আবার?

বহ্নিকুমারী নামিয়া ভিতরে গেলেন এবং সংক্ষেপে বলিলেন, তোমায় প্রণাম করতে এলাম। তখন ভুলে গিয়েছিলাম। মুখে বিচিত্র হাসি।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, সে কি?

আর দেখা তো নাও হতে পারে।—বলিয়া বহ্নিকুমারী গঙ্গাগোবিন্দের পদধূলি লইলেন।

বিস্মিত গঙ্গাগোবিন্দ সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারী আবার হাসিয়া বলিলেন, আর একটা ভুলও তোমার ভেঙে দিতে এলাম। আমার স্বামী আমার গর্বের বস্তু। তাঁকে পেয়ে আমি যে শুধু সুখী হয়েছি তা নয়, ধন্য হয়েছি। দাদার কাছে তাঁর সম্বন্ধে যা শুনে এলে, তা সমস্ত মিথ্যে কথা। পুলিস গিয়ে কাল সকালেই বুঝতে পারবে যে, গোলোক সাকে সেখানে আটকে রাখা হয়নি, ওটা অল্পবুদ্ধি কমলাক্ষবাবুর বানানো গল্প। তুমি তো কাল থাকবে না, তোমাকে তাই জানিয়ে দিলাম। কাউকে বলো না যেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, না না, আমি কাউকে কিছু বলব না। দরকার কি আমার?

বহ্নিকুমারীর চক্ষে একটা বিদ্যুৎ-দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, চললাম তা হলে।—বলিয়া দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার পর ফিরিয়া বলিলেন, আমার একটা কথা রাখবে?

কি কথা?

কিছুই নয়, শুধু মনে রেখো যে, মানব-জন্মটা শুধু মহত্ত্ব আস্ফালন করবার জন্যেই আমরা পাইনি। দেবতাই পাথরের হয়, মানুষের মধ্যে রক্তমাংসের দুর্বলতা থাকা সব সময় দোষের নয়। মনে রেখো কথাটা। চললাম।—বলিয়া বহ্নিকুমারী বাহিরে গিয়ে একেবারে পালকিতে উঠিয়া বসিলেন। নির্বাক গঙ্গাগোবিন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারীর পালকি চলিয়াছে।

যদি কেহ তখন পালকির দরজা খুলিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, রাণী বহ্নিকুমারী উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

।। আঠাশ ।।

যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে একা বসিয়া রহিলেন। রাণী আজ রাত্রে এখানে খাইয়া গেলে ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু তিনি থাকিলেন না। থাকিবেনই বা কেন? রাণী তাঁহার কে? তাঁহার সহিত কতটুকু অন্তরঙ্গতা চন্দ্রকান্তের আছে? কিছুই তো নাই। রক্তের সম্পর্ক অবশ্যই আছে তাঁহারা ভাই-বোন। কিন্তু আত্মার সম্পর্ক তো নাই। একই মাতৃগর্ভে তাঁহারা জন্মলাভ করিয়াছেন, শৈশবে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়াছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। বিবাহের পর রাণী বহ্নিকুমারী হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকান্তও নিজের খুশীমত নিজের জীবন যাপন করিয়াছেন। নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে

বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। বুধের সহিত নেপচুনের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই; যেটুকু আছে, তাহা নিতান্তই বাহ্যিক। অন্তরঙ্গতার লেশমাত্র নাই; যাহা আছে তাহা স্মৃতি, জীবন্ত কিছু নয়।

গঙ্গাগোবিন্দও ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই একে একে চন্দ্রকান্তকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ সমস্ত জীবনটাই তো এখনও বাকি। এখনও যৌবন শেষ হয় নাই। এই দীর্ঘ জীবন একাই যাপন করিতে হইবে নাকি?

থাকিবার মধ্যে আছেন এক উগ্রমোহন। বাণীর অপেক্ষা উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের বেশী আত্মীয়। এই উগ্রমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই চন্দ্রকান্তের সমস্ত জীবনটা আবর্তিত হইতেছে। চন্দ্রকান্তের আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ সমস্তই উগ্রমোহনকে অবলম্বন করিয়া। উগ্রমোহনের সহিত অহরহ সংঘর্ষে তাঁহার বুদ্ধি, শক্তি ও অর্থ সার্থক হইয়াছে। উগ্রমোহন না থাকিলে চন্দ্রকান্ত করিতেন কি? উগ্রমোহন কয়েকদিন হইল বৃন্দাবন গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন কে জানে! উগ্রমোহনের বিরহে চন্দ্রকান্ত মনে মনে পীড়িত হইতেছিলেন। তাঁহার সহিত আবার বসিয়া দাবা না খেলা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কবে ফিরিবেন তিনি?

একটা কথা সহসা বিদ্যুৎঝলকের মত চন্দ্রকান্তের মনে ঝলসিয়া উঠিল। কমলাক্ষকে তো তিনি থানায় নালিশ করিবার হুকুম দিয়া দিলেন; কিন্তু ইহার ফল যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহা তো তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই!

গোলোক সা যদি সত্যই মরিয়া গিয়া থাকে এবং যম-ঘরে সেই মৃতদেহ যদি পাওয়া যায়! তাহা হইলে আইনের চক্ষে উগ্রমোহন খুনী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন তো! খুনীর শাস্তি যে ফাঁসি! উগ্রমোহনের ফাঁসি হইবে? চন্দ্রকান্তের চক্রান্তে? অসম্ভব। কিছুতেই তাহা হইতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া পড়িলেন। মূর্খের মত এ কি করিয়া বসিয়াছেন তিনি? তাঁহার জীবনের একমাত্র বন্ধনটি ছিন্ন করিবার আয়োজন করিলেন তিনি কি বলিয়া? কমলাক্ষ কি থানায় গিয়াছেন?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিল।

ম্যানেজারবাবু আছেন কি না দেখ্ তো।

ভজনা চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। গভীর আঁধারে একটু যেন আলোর রেখা দেখা দিল। তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন উগ্রমোহন সিংহকে, যেমন করিয়া হউক, বাঁচাইতে হইবে। উগ্রমোহন-বিহীন চন্দ্রকান্তের অস্তিত্ব একান্ত শূন্য ও একান্ত নিরর্থক।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিয়া নমস্কার করিলেন।

আমাকে ডেকেছেন আপনি?

হ্যাঁ। থানায় খবর দিয়েছ না কি?

হ্যাঁ, এইমাত্র তো দিয়ে এলাম।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা হলে এখুনি একবার থানায় যাও আবার। যম-জঙ্গল খোঁজবার আর দরকার নেই। গোলোক সা এখনই এসেছিল আমার কাছে। এইমাত্র গেল। উগ্রমোহন তাকে মারধোর করে ছেড়ে দিয়েছিল। তোমার মানিক মণ্ডলের খবর ভুল।

সমস্ত পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেলেও বোধ করি কমলাক্ষ সরকার এত আশ্চর্য হইতেন না। তিনি নির্বাক বিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, যাও তা হলে, আর দেরী করো না।

কমলাক্ষ চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত একাকী দীর্ঘ বারান্দাটার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে কমলাক্ষ আসিয়া বলিলেন, দারোগাবাবু বললেন যে, গোলোক সা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যায় একবার। কেসটা তিনি ডায়েরিতে টুকে ফেলেছেন কিনা।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আচ্ছা। কটা বেজেছে বল তো?

কমলাক্ষ বলিলেন, তা প্রায় এগারোটা হবে।

এখুনি হাতী কষতে বল। কলকাতা যাব আজ রাত্রে। ট্রেন তো রাত দেড়টায়?

বিস্মিত কমলাক্ষ শুধু বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোলোক সার যমজ ভাইয়ের সন্ধানে চন্দ্রকান্ত সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইলেন। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন।

।। উনত্রিশ ।।

সেই দিনই রাত্রে অঘোরবাবুও খবর পাইলেন যে, চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার দুই-দুইবার থানায় গিয়াছেন এবং দারোগাবাবুর সহিত গোপনে কি সব পরামর্শ করিয়াছেন। সেই দিন রাত্রেই কোন রহস্যময় উপায়ে কমলাক্ষের নালিশের মর্মটিও অঘোরবাবুর কর্ণগোচর হইল। নালিশের মর্ম এই যে, জমিদার উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাদের আশ্রিত প্রজা গোলোকচন্দ্র সাহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং যম-জঙ্গলের যম-ঘরে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। পুলিস অবিলম্বে সাহায্য না করিলে গোলোক সাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। পরদিন যম-জঙ্গল ঘেরাও করিয়া যম-ঘর খানাতল্লাশি করা হইবে, এ খবরও অঘোরবাবু পাইলেন। কিন্তু কমলাক্ষবাবু দ্বিতীয় বার থানায় গমন করিয়া যে খানাতল্লাশি বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন, এ খবরটুকু অঘোরবাবু পাইলেন না। সুতরাং তিনি যথারীতি সাবধান হইলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, কালীপূজার পর দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং পুলিস যম-ঘরে গিয়া

বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবে না। যম-জঙ্গল কাছারিতে ভিখন তেওয়ারী আছে। পুলিস গিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে এবং পুলিসের চাপে ভিখন তেওয়ারী হয়তো ভিতরের কথা প্রকাশ করিয়াও দিতে পারে। ভিখন তেওয়ারী লোকটির উপর অঘোরবাবুর তাদৃশ আস্থা নাই। কিন্তু যেহেতু সে লোকটি কুস্তি করিতে পারে, মালিকের সেজন্য তাহার উপর অসীম অনুগ্রহ।

পুলিস যখন সেখানে যাইবে, তখন ভিখন তেওয়ারীর সেখানে থাকিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

তাহাকে যম-জঙ্গল হইতে সরাইয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া অঘোরবাবু একটি সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন যে, ভিখন তেওয়ারী যম-জঙ্গল কাছারিতে তালা লাগাইয়া দিয়া অবিলম্বে যেন সদরে চলিয়া আসে। যম-জঙ্গলে কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই ব্যবস্থা করিয়া অঘোরবাবু ভাবিতে লাগিলেন যে, এখন তাঁহার থানার দারোগার সহিত দেখা করা সমীচীন হইবে কি না! ভাবিতেছিলেন, এমন সময় হাবেলির জমাদার আসিয়া সেলাম করিয়া নিবেদন করিল যে, রাণীজী তাঁহার সহিত কথা কহিতে চান।

রাণীজী?

হ্যাঁ, হুজুর।

বল গিয়ে, আসছি এখনই।

অঘোরবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন। রাণীজী সহসা তাঁহার সহিত কি কথা বলিবেন এতরাত্রে!

পরদার অন্তরাল হইতে বহ্নিকুমারী প্রশ্ন করিলেন, যম-জঙ্গলের যম-ঘর সম্বন্ধে খবরটা আপনি শুনেছেন?

অঘোরবাবুর পাথরের মত মুখ আরও শক্ত হইয়া গেল। তিনি অবিকম্পিত স্বরে মিথ্যা কথা বলিলেন, না।

সেখানে গোলোক সা বলে একজন প্রজাকে আটকে রাখা হয়েছে নাকি?

কই, না, শুনি নি তো কিছু।

চারিদিকে তা হলে যে রব উঠেছে—

অঘোরবাবু বলিলেন, মিথ্যে গুজব।

নারীজাতির নিকট, তা হউন না তিনি রাণী বহ্নিকুমারী, এসব গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করার কোন অর্থ হয় না, অঘোর চক্রবর্তী তাহা বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই বোধ হয় অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী আবার প্রশ্ন করিলেন, যম-জঙ্গলে কে আছে এখন?

এখন কেউ নেই সেখানে। ভিখন তেওয়ারী ছিল, তাকেও ডেকে পাঠিয়েছি।

কেন?

কাল সেখানে পুলিস যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বহ্নিকুমারী নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন এখন। নানা রকম গুজব আমার কানে এসেছিল বলে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

অঘোরবাবু বিদায় লইলেন।

বহ্নিকুমারী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইলে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, সব সত্য। তাঁহাদের ম্যানেজারও পুলিসের আগমনবার্তা শুনিয়াছেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। নির্দোষ হইলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত না। অঘোরবাবু মিথ্যা কথা বলিয়াও বহ্নিকুমারীকে ঠকাইতে পারেন নাই। গোলোক সা নিশ্চয়ই তাহা হইলে যম-ঘরে বন্দী আছে। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। পুলিসের আগমনবার্তা পাইয়া অঘোরবাবু হয়তো গোলোক সাকে ছাড়িয়াও দিয়াছেন কিংবা মালিকের হুকুম ব্যতীত হয়তো তিনি তাহাও পারিতেছেন না। বহ্নিকুমারী মনে মনে স্থির করিলেন, আমি নিজে গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। উগ্রমোহন সিংহের পত্নী আমি। কাল সকালে পুলিস গিয়া দেখিবে, কেহ নাই। কমলাক্ষ ম্যানেজারের সমস্ত কৌশল পণ্ড হইয়া যাইবে। কথাটা যখন আমার কানে আসিয়াছে, তখন স্বামীর অপমান আমি কিছুতে হইতে দিব না। তাহা ছাড়া স্বামীর ক্রোধে পড়িয়া একটি নিরীহ লোক অনর্থক কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই তো উচিত। গোলোক সাকে যদি যম-ঘরে পুলিসেরা পায়, তাহা হইলে উগ্রমোহনের শুধু যে পরাজয়, তাহা নয়,—ঘোরতর অসম্মান। শত্রু মিত্র সকলে হাসিবে। তাহা সহ্য করা বহ্নিকুমারীর পক্ষে অসম্ভব। নাঃ, নিজহস্তে বহ্নিকুমারী ইহার প্রতিকার আজই করিবেন। বহ্নিকুমারী ডাকিলেন, কুসুম!

কুসুম আসিলে তিনি বলিলেন, বিহঙ্গিনীকে ডেকে দে তো। বিহঙ্গিনী বহ্নিকুমারীর সহচরী-প্রধানা। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বহ্নিকুমারী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিহঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাতলা ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণা একটি যুবতী। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, হাসিতে ও বুদ্ধিতে সমুদ্ভাসিত। বহ্নিকুমারী বলিলেন, বিহঙ্গ, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

কি, বলুন?

আজ রাত্রে সবাই যখন ঘুমুবে, তখন পালকি করে তুমি ও আমি একবার বেরুতে চাই। যম-জঙ্গলে যাব। লুকিয়ে যাব এবং লুকিয়ে ফিরে আসব। বাগানের দিকের খিড়কি-দরজাটা খুলে রেখো। পালকি-বেহারা খিড়কি-দরজার সামনে যে জামগাছটা আছে তারই তলায় যেন আমার অপেক্ষা করে। বাগানের ভেতর দিয়ে গাছের ছায়ায় বেরিয়ে যেতে চাই। কথাটা গোপনীয়। বেহারাদের সে কথা বলে দিও।—বলিয়া বাক্স খুলিয়া কিছু অর্থ তিনি বিহঙ্গিনীকে দিলেন। বলিলেন, তোমার অনেকদিন থেকে পার্সী শাড়ির শখ। ওতেই হবে বোধ হয়। আর এই কটা টাকা বেয়ারাদের দিও।

বিহঙ্গিনী একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। রাণীজীর এই অদ্ভুত খেয়ালে মনে মনে একটু যে

বিস্মিত হইল না, তাহা নয়। রাণীজীর নানারূপ বিচিত্র খেয়ালের সহিত অবশ্য তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু অদ্যকার এই নৈশ-অভিযানটা একটু বেশি রকম খাপছাড়া বলিয়া তাহার ঠেকিল। বিস্ময়কে সে অবশ্য মাত্রা ছাড়াইতে দিল না, কারণ হাতে অনেকগুলা টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং রাণীজীর খেয়ালটা চরিতার্থ করিতে পারিলে একখানা বেনারসী শাড়ি বকশিশ পাওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং মনের বিস্ময় মনেই চাপিয়া বহ্নিকুমারীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সে তৎপর হইয়া উঠিল।

বহ্নিকুমারীর শয়নকক্ষে উগ্রমোহনের একটি তৈলচিত্র টাঙানো ছিল। নির্নিমেষনেত্রে বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। গর্বিত উগ্রমোহন কোষনিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অদম্য পুরুষসিংহ। বহ্নিকুমারী ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে বাগানের খিড়কিদ্বারে পালকি-বেহারা ও বিহঙ্গিনী অপেক্ষা করিতেছিল। বহ্নিকুমারী সন্তর্পণে গিয়া পালকিতে উঠিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ একখানি কালো শালে আপাদমস্তক ঢাকা।

পালকি নিঃশব্দে যম-জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিল। শুক্লা-একাদশীর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত।

যম-জঙ্গল কাছারিতে যখন বহ্নিকুমারীর পালকি পৌঁছিল তখন সেখানে কেহ নাই। শুক্লা-একাদশীর চন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। দুইটি 'চোখ গেল'-পাখী পাল্লা দিয়া সুর চড়াইয়া ডাকিতেছে। বহ্নিকুমারী পালকি হইতে অবতরণ করিলেন। বিহঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা এখানে থাক, আমি এখনই ফিরে আসছি। ঘটিটা আমাকে দাও।

একা যেতে ভয় করবে না আপনার? আমি না হয় আপনার সঙ্গে যাই।

কিছু দরকার হবে না। আমার মানত হচ্ছে যে, একা রাত্রে বাহিনীর জল নিয়ে সিংহবাহিনীর পূজো দেব।

পালকিতে আসিতে আসিতে বহ্নিকুমারী বিহঙ্গিনীকে একটি গল্প বানাইয়া বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই যে, তিনি সন্তান-কামনায় সিংহবাহিনীর একদিন পূজা দিয়াছিলেন। তারপর স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, সিংহবাহিনী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, একা রাত্রে বাহিনী-নদীর জল যম-জঙ্গল থেকে এনে যদি আমার পূজা করতে পারিস, তা হলে তোর কামনা সিদ্ধ হবে।

সুতরাং বিহঙ্গিনী আর কিছু বলিল না। বহ্নিকুমারী একাকিনী বনপথে চলিয়া গেলেন।

কিছুদূর গিয়া সত্যই কিন্তু তাঁহার ভয় করিতে লাগিল। যদিও বনের মধ্যে পথ আছে এবং জ্যোৎস্নায় পথ দেখিতে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু বনের বিরাট গাম্ভীর্য বহ্নিকুমারীর মনে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল।

পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সরসর করিয়া কি যেন সরিয়া গেল। বহ্নিকুমারীর গাটা ছমছম করিয়া উঠিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিলেন, অল্প দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি শৃগাল কোলাহল করিতেছে। তিনি সেদিকে না গিয়া অন্য দিকে অগ্রসর হইলেন। যম-ঘরটা যে ঠিক কোথায় অবস্থিত, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। কিছুদিন আগে দিবালোকে একবার যম-ঘরটা তিনি দেখিয়াছিলেন। দেখিলে তিনি চিনিতে পারিবেন; কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে কোথায় যে ঘরটা আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। কিন্তু বাহির তিনি করিবেনই, তাঁহাকে করিতেই হইবে। যম-ঘরের চাবিটা তিনি শক্ত করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ আবার তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। কাহার যেন ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। শিশুর ক্রন্দন। বহ্নিকুমারীর বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। একটু স্থির হইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, শব্দটা সম্মুখবর্তী বৃহৎ দেবদারুবৃক্ষ হইতে আসিতেছে। তখন তাঁহার মনে পড়িল, কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, শকুনি-শাবকরা ওইরূপ শব্দ করে বটে।

আবার তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। সামনের একটা ঝোপ পার হইয়া দেখিলেন যে, বাহিনী-নদীর তীরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাহিনীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিনী-নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া বিসর্পিতগতিতে যম-জঙ্গলের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার একটা বাঁকের মুখে একটা গাছ হেলিয়া নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে। যেন নক্ষত্রখচিত এক টুকরা অমাবস্যার আকাশ কেহ জ্যোৎস্নার মধ্যে টাঙাইয়া দিয়াছে। বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

টি-ট্রি-হি—টি-ট্রি-হি—টি-ট্রি-হি—

একটি টিট্রিভ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বহ্নিকুমারী চমকাইয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যম-ঘর তো বাহিনীর তীরে নয়—যম-ঘর জঙ্গলের মধ্যে। বুঝিলেন, তিনি পথ ভুল করিয়াছেন। বাহিনীর তীর ত্যাগ করিয়া তিনি আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যম-ঘরে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। গোলোক সা যদি সেখানে থাকে, তাহাক ছাড়িয়া দিতে হইবে। গঙ্গাগোবিন্দকে কিছুতে বুঝিতে দেওয়া হইবে না যে, উগ্রমোহন সিংহ একটা নরঘাতক দস্যু।

বনের মধ্যে একাকিনী বহ্নিকুমারী চলিয়াছেন। চরণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভয়ও তাঁহার আর করিতেছে না। যম-ঘরের চাবিটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া নির্ভীক চিত্তে তিনি চলিয়াছেন।

।। ত্রিশ ।।

বহ্নিকুমারী আর ফিরিলেন না।

যম-ঘরে দুইটি ময়াল সাপ ছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ সংবাদটা যখন শুনিলেন, সহসা বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। বহ্নিকুমারী মরিয়াছেন? বহ্নি কি কখনও নেবে?

।। একত্রিশ ।।

দ্বৈরথ বন্ধ হয় নাই।

আগে যেমন চলিতেছিল, এখনও তেমনই চলিতে লাগিল। উগ্রমোহন কেবল একটু বেশি গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের সঙ্গীতচর্চা আর একটু যেন বাড়িয়াছিল। দাবাখেলা থামে নাই। সবই পূর্ব্বের মত চলিতেছিল। উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের সহিত বহ্নি-সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। কেবল একদিন একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গজটা আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, মন্ত্রী সামলাও।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া উগ্রমোহন খানিকক্ষণ দাবার ছকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে চন্দ্রকান্তকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ইমন আর পূরবীর তফাত ধর কি করে তোমরা?



মৃগয়া

গ্রামে

হিরণপুর গ্রামে জেগেছে সাড়া,
বিপিন ঘোষ, হরু মণ্ডল, জগদেও পাঁড়ে থেকে শুরু করে
ঝাংরু সর্দার, বাদল ডাক্তার, লাহিড়ী, তিনু চাটুজ্জে,
তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো,
এমন কি ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত নিতাই পর্য্যন্ত
উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।
বস্তুত, না হয়ে উপায় নেই।
স্বয়ং জমিদারবাবুরা যখন উৎসাহিত হয়েছেন
এবং নানাভাবে তা প্রকাশ করছেন,
তখন
বাকি সকলকেও
বাধ্য হয়েই
জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে
উৎসাহ-ঐক্যতানে সুর মেলাতে হচ্ছে।
পুষ্করিণী আলোড়িত হলে
পুষ্করিণীবাসী শামুক, গুগলি, পানা, শ্যাওলা,
কমল, কুমুদ, কহ্লার—
সবাইকেই সামলাতে হয় সে আলোড়নের ধাক্কা।
সুতরাং রোগা নিতাই ভাণ করছে বীরত্বের।
বিভিন্ন শিকার-অভিযানে
বিভিন্ন রকম বিপদের সম্মুখবর্তী হয়ে
তার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও
স্বকীয় বীর্যবলেই কেবল
কার্যোদ্ধার করেছে কি করে সে—
শীর্ণ হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত করে
তারই বর্ণনা করছে।

খাজনাপ্রপীড়িত অতিস্থূল ক্ষিপ্রতাবিলাসী তিনু চাটুজ্জে
হয়ে উঠেছেন ক্ষিপ্রতর।

মেদবহুল স্বেদলাঞ্ছিত বপুটি আস্ফালিত করে
ক্ষত্রিয়সুলভ উষ্মাসহকারে বলছেন তিনি,
নিশ্চয়ই,
যেতে হবে বইকি শিকারে,
আলবৎ যেতে হবে।
বাঘকে ভয় করলে মানুষের চলে!
উদাহরণ দিচ্ছেন হিটলার-মুসোলিনির।
কিন্তু তাঁর এই অতিমানবীয় উত্তেজনার অন্তরালে
নিতান্ত-মানবীয় যে মতলবটি ঢাকা আছে,
সেটির খবর জানেন কেবল নীলু দত্ত।

হরিশ খুড়োর কল্পনার
নব-পক্ষোদগম হয়েছে।
খুড়ো জীবনে কখনও বাঘ দেখেছেন কিনা সন্দেহ,
কিন্তু বাঘের থাবার, গোঁফের,
ডোরা ডোরা কালো দাগের
এমন নিখুঁত রকম বর্ণনা করে চলেছেন যে,
টোকন, চাঁপা তো বটেই,
বড়বাবু পর্যন্ত মুগ্ধ।

দু হাতে কেরোসিন তেল মেখে
তালুকদার মশাই সাফ করতে লেগে গেছেন
তাঁর উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া
সাবেককালের গাদা বন্দুকটা।
একনলা বটে,
মরচেও পড়েছে,
কিন্তু আসল 'স্টিল'।
একালে নিতান্তই দুর্লভ।

বাদল ডাক্তার
শব্দ সহকারে কিছু বলছেন না বটে,
কিন্তু ভারী মুখখানাতে

ফুটিয়ে রেখেছেন এমন একখানা হাসি,
যার নীরব মুখরতা
সত্যই শিল্পীজনোচিত।

বুড়ো হরু মণ্ডল বর্শা শানাচ্ছে
এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলছে,
এই বর্শায় ভালুক গেঁথেছি, শূয়োর মেরেছি,
ঘায়েল করেছি ময়াল সাপকে,
পাগলা হাতীর মাথা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করেছি,
মানুষও নিস্তার পায় নি।
বাকি ছিল শুধু বাঘ,
জামাইবাবুর কল্যাণে সেটাও হবে এবার।
হরু মণ্ডলের কুচকুচে কালো রঙ,
প্রশস্ত ছাতি,
রক্তাভ টানা টানা চোখ,
পেশীবহুল দেহসৌষ্ঠব,
পুষ্ট পাকানো ধবধবে সাদা এক জোড়া গোঁফ,
কথায়
চোখে
বলিষ্ঠ পৌরুষ-ভঙ্গিমা।
তার কথায় খুশি হচ্ছিল সবাই,
কেবল একটি লোক ছাড়া,
সে তার তৃতীয় পক্ষের বালিকা বধূ কুসুম।
বড় ভীতু সে।
মসলা বাটতে বাটতে
ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে
সে চেয়ে চেয়ে বর্শা শানানো দেখছিল।
ভাবছিল,
বাপের বাড়িতে সবাই অপয়া বলত তাকে,
জন্ম হবামাত্রই মাকে খেয়েছে,
কিছুদিন পর বাপকে,
ভাইগুলিও নেই।

নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই
বিয়ে করেছে তাকে মণ্ডল।
শেষে কি—
আর সে ভাবতে পারলে না,
বহির্মুখী নিশ্বাসটাকে নিরুদ্ধ করে
সে সবেগে ঘষতে লাগল কঠিন নোড়াটা
লঙ্কামাখা শিলের বুকে।
তার বড় বড় চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি
অবলুপ্ত হয়ে রইল
অবগুণ্ঠনের তলায়।
মুস্কিলে পড়েছে ঝাংরু সর্দার।
সেই চিরন্তন মুস্কিল!
ঝাংরুর চেহারাটিও দেখবার মত—
মাথায় বাবরি চুল,
বেঁটে, বলিষ্ঠ,
কষ্টিপাথরে কোঁদা চেহারা।
রক্তজবার প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ
কানে চুলে সর্বদাই জ্বলজ্বল করছে।
তালরস-রসিক।
কিন্তু ওর সাঁওতালত্ব নিখুঁত থাকতে পায় নি
সভ্যতার আওতায়।
চুকাতে আর তৃপ্তি হয় না,
বিড়ি খেতে হয়,
সিগারেটের প্রতিও মোহ আছে।
বাঁশী, মাদল এখনও বাজায় বটে,
কিন্তু গ্রামোফোন কেনবার শখ আছে প্রচুর,
পয়সা নেই বলেই কিনতে পারে না।
কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে ওকে মোহিনী গোহুম্‌না।
গোহুম্‌না মানে গোখরো সাপ,
গোখরো সাপের সঙ্গে সাদৃশ্যও আছে মেয়েটির।
মেটে মেটে রঙ,
রেগে গেলে

নীল চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত করে
পাত্‌লা কোমরে হাত দিয়ে
গ্রীবা উদ্যত করে যখন দাঁড়ায়,
তখন সত্যিই মনে হয় গোখরো সাপ ফণা ধরেছে।
জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে।
মা খাঁটি মেথরানী,
বাপ খাঁটি সায়েব।
জন্মের সময় আঁতুড়-ঘরে গোখরো সাপ বেরিয়েছিল,
তাই ওর নাম গোহুম্‌না।
নামের মর্যাদা ও রক্ষা করেছে;
ওর বিষদন্তের তীক্ষ্ণ আঘাতে
মারা গেছে এবং জখম হয়েছে
হিরণপুর গ্রামের অনেকে।
জমিদারের বড় ছেলে,
ম্যানেজার,
নায়েব,
জমাদার,
পিয়াদা—
সকলকেই এক আধ বার ছুবলেছে গোহুম্‌না;
কিন্তু ধরা পড়েনি কোথাও।
এমন সময় সাঁওতাল-পরগনার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে
হাজির হল এসে ঝাংরু
ভ্রমরকৃষ্ণ কালো বাবরিতে জবাফুল গুঁজে
হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে
বাবুদের বাড়ির নতুন হাতীটার নতুন মাহুত-রূপে
ধরা পড়ল গোহুম্‌না,
গৃহস্থালীর চুপড়িতে গিয়ে ঢুকল বন্য সর্পিণী
বিষদন্তের বিষ
রূপান্তরিত হল অমৃতে,
জাগল নূতন জগতে,
লাগল নূতন রঙ।
কিন্তু তবু গোহুম্‌না তো,

ফণা তোলা স্বভাবটা গেল না
মাঝে মাঝে ফণা তোলে,
ফোঁস করে ওঠে।
ঝাংরু মনে মনে হাসে,
কিন্তু বাইরে ভাণ করে, ভয় পেয়েছে।
ভাণ না করলে উপায় আছে।
এলিয়ে পড়া মাথার খোঁপাটা দুহাতে জড়াতে জড়াতে
গোহুম্‌না বললে,
আমি যাব না।
যাবি না কেন?
আমি গিয়ে কি করব? শিকারের আমি কি বুঝি?
ঝাংরু হেসে জবাব দিলে,
তোর চেয়ে বড় শিকারী
আছে নাকি আর কেউ হিরণপুরে?
পা পড়ল পুচ্ছে,
ফোঁস করে উঠল গোহুম্‌না,
গ্রীবাভঙ্গি করে বললে, তার মানে?
ঢোঁক গিলে থতমত খেয়ে বললে ঝাংরু,
মানে, মন কেমন করবে।
কদিন থাকতে হবে বাইরে তার ঠিক নেই,
দূর তো কম নয়,
পাকা দশটি ক্রোশ।
কলমিপুরের মাঠ পেরিয়ে,
ময়না নদীর ওপারের সেই জঙ্গলটায় যেতে হবে।
পারব না তোকে ছেড়ে থাকতে এতদিন।
কোমর ঘুরিয়ে বলল গোহুম্‌না,
আমায় নতুন শাড়ি কিনে দে তবে।
এই ময়লা শাড়ি পরে আমি যাব না।
মুস্কিলে পড়ল ঝাংরু।
দুলালচাঁদের দোকানে ধার তো বেড়েই চলেছে।
দমে গেল মনে মনে,
তবু বললে, আচ্ছা দেব, তাই দেব।

আমি যাব কিসে চড়ে?
তুই তো যাবি হাতীতে,
হাতীর পিঠে থাকবে বাবুরা,
আমি কি ন্যাজ ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাব নাকি?
হেসে লুটিয়ে পড়ল গোহুম্না।
ঝাংরু বললে, তার জন্যে ভাবনা কি,
গরুর গাড়ি যাবে পঁচিশখানা।
তাঁবু,
বাসনকোসন,
আসবাবপত্তর—
সব যাবে তো!
তুই তারই একটাতে চড়ে বসিস।
বিরিঞ্চিকে বলে দেব আমি।
নিজে যাবেন হাতীতে,
আমার বেলায় গরুর গাড়ি!
ইস, ভারী আমার—
যে কথাটি দিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করলে গোহুম্না,
ভদ্রসমাজে তা প্রচলিত নয়।
ঝাংরু তখন মোক্ষম অস্ত্রটি হানলে,
গম্ভীর হয়ে গেল।
বার দুই আড়চোখে ঝাংরুর দিকে চেয়ে
ফিক করে হেসে ফেলল গোহুম্না,
বললে,
ইস, পুরুষের রাগ দেখ না!
ঝাংরু তবু গম্ভীর।
যাব, যাব, যাব গো,
তোমার বিরিঞ্চির গাড়িতে চেপেই যাব,
তুমি একটু হাস দিকিনি।
হেসে ফেললে ঝাংরু।

পাঁজির পাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি
বসে ছিলেন নীলাম্বর দত্ত,

ভুরু কুঁচকে।
বার্তা শুভ নয়।
কিন্তু আজকালকার বাবুরা,
বিশেষ করে ওই বিলেত-ফেরত জামাইবাবুটি,
মানবেন না পাঁজির বারণ।
ত্র্যহস্পর্শের তীব্রতা
স্পর্শ করতে পারবে না ওঁদের হৃদয়কে।
যখন ঠিক করেছেন,
তখন নির্ঘাৎ ওই দিনেই বেরুবেন,
এবং নীলু দত্তকেও হতে হবে সহযাত্রী।
নীলু দত্ত শিকারী নন—মুহুরী।
শিকারীরা করবেন শিকার,
নীলু দত্তকে করতে হবে আয়োজন।
লোকও এক আধজন নয়,
সবসুদ্ধ মিলে শতখানেকের কাছাকাছি যাবে।
এত লোকের খাবার আয়োজন,
শোবার আয়োজন,
স্নানের আয়োজন,
তা ছাড়া
বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু, প্রত্যেকের জন্যেই
'বিশেষ' একটু আয়োজন।
করতে হবে গোপনে গোপনে।
সব ভার নীলু দত্তের ওপর।
কিন্তু পাঁজির দিকে চেয়ে
চিন্তিত হয়ে পড়লেন দত্ত মশাই।
একদিন আগেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!
বড়বাবুকে বুঝিয়ে বললে
আপত্তি করবেন না বোধ হয় তিনি!
তাঁবুটাবু গাড়াতে হবে,
মাচান তৈরি করাতে হবে,
যোগাড় করতে হবে একটা মোষের বাচ্চা,
একদিন আগে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

যুক্তির সূর্যকে কিন্তু আবৃত করে রেখেছে
ছোট একখানি মেঘ।
একদিন আগে গেলে
লাহিড়ীটা অব্যাহতভাবে গ্রাস করে থাকবে বড়বাবুকে।
অতিশয় কষ্টদায়ক চিন্তা।
অথচ পাঁজিকেও—
নীলু দত্তের ভুরু আরও কুঁচকে গেল।
পাশের ঘরে ভাইপো দুটো হুড়োহুড়ি করছিল,
রোজই করে,
আজ কিন্তু তা অসহ্য হয়ে উঠল;
উঠে গিয়ে
ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিলেন তাদের।
তারপর হঠাৎ তাক থেকে পাড়লেন
খেরো-বাঁধানো চটি একখানা খাতা,
কি খানিকক্ষণ দেখলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে,
তারপর উঠে পড়লেন;
পায়ে দিলেন ময়লা ক্যাম্বিসের জুতোটা,
তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে করে
বেরিয়ে পড়লেন খাতাটা নিয়ে।
নীলাম্বর এককালে সুদর্শন ছিলেন
এবং সেজন্য গর্বও ছিল তাঁর মনে মনে।
কিন্তু পরিহাস-রসিক বিধাতা
পরিহাস করলেন।
যদিও একটু স্থূলগোছের,
কিন্তু দত্তের পক্ষে মর্মান্তিক।
হঠাৎ মাথায়, দাড়িতে, গোঁফে
খাবছা খাবছা টাক পড়ে গেল।
কামিয়ে ফেলতে হল সব।
বৃহৎ নাকটা বৃহত্তর হয়ে গেল,
স্পষ্টতর হল মুখের বলিরেখা,
অনাবৃত হল মুহুরিয়ানা চোখের দৃষ্টিতে,
শরীরটা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

তবু বাবুরা প্রসন্ন আছেন আজও—
এইটুকুই ভরসা নীলু দত্তের।
বাবুদের অনুগ্রহে সে কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না,
না, লাহিড়ীকেও নয়।
হলই বা সে বড়বাবুর বন্ধুর ভায়রাভাই
এবং এম. এ. পাস।
খেরোর খাতা বগলে ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত
বাবুদের বাড়ির দিকে।
এই শিকার-অভিযানের জন্য যা যা দরকার
এবং কত রকম যে দরকার
এবং কত রকমভাবে তার বন্দোবস্ত করতে হবে,
তা সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি
খেরোর খাতাখানায়।
সেটা বাবুদের দেখাতে হবে বইকি।
দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় করে
ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী
এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন আত্মীয়তার দাবিতে,
কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মোসায়েবের পদবীতে
দিলদরিয়া বড়বাবুর আসরে।
বড়বাবু যে তাঁর জাতি-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়েছিলেন তা নয়,
মদ্য-পিপাসু ব্যক্তিটির স্বরূপ ঠিক চিনেছিলেন তিনি
এবং সেইজন্যেই
অসীম করুণাভরে সহ্য করতেন তাঁকে।
লাহিড়ীর যোগ্যতাও ছিল কিঞ্চিৎ,
শুধু যে সুকান্তি, সকণ্ঠ, সুবিদ্বান তাই নয়,
সুপারিষদও।
গলায় কাপড় দিয়ে, হাতজোড় করে
হেঁ হেঁ করেন না তিনি।
যখন খোশামোদ করেন,
চট করে বোঝা যায় না যে খোশামোদ করছেন।

ভর্ৎসনা, অনুযোগ, বিস্ময়, নীরব হাস্য, আক্ষেপ,
নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর খোশামোদ।
এই শিকার ব্যাপারে।
বড়বাবুর ভগ্ন স্বাস্থ্য,
নিদারুণ গরম,
নতুন হাতীটার বদমেজাজ
এবং আরও অনেক রকম কারণ দেখিয়ে
আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিরুৎসাহিত করছেন সকলকে।
কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বড়বাবু
এই ছদ্মবেশী হিতৈষণার অন্তরালে
প্রত্যক্ষ করছেন অসহায় লাহিড়ীকে—
ষড়রিপুবিধ্বস্ত আদর্শচ্যুত বিদ্বান ব্যক্তিটিকে,
যার শখ আছে, কিন্তু শক্তি নেই,
যে গলগ্রহ হয়েও
প্রাণপণে চেষ্টা করছে আত্মসম্মানের মুখোশটা আঁকড়ে থাকতে,
যার বিকশিত দন্তের অত্যুচ্ছ্বসিত প্রাণহীন হাসি
ঢেকেও ঢাকতে পারছে না অন্তরের অন্তহীন ক্রন্দনকে।
উপভোগ করছেন বড়বাবু
লাহিড়ীর এই হিতোপদেশ-জারিত খোশামোদ।
সেই চিরন্তন খোশামোদ,
যা চিরকাল খুশি করে এসেছে
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মন।

বুড়ো জগদেও পাঁড়ে
এই শিকার ব্যপদেশে
বীরত্ব প্রকাশ করেছে শুধু টৌকনের কাছে,
তাও অতি নিভৃতে।
বুড়ো জগদেও পাঁড়েকে
উর্দিটুর্দি পরলে খানিকটা জমকালো দেখায় বটে,
কিন্তু সাজ-পোশাক খুলে নিলে
পালক ছাড়ানো হাঁসের মত অবস্থা তার।
লিকলিকে রোগা,

নিদারুণ লম্বা,
মুখখানাতেই একটু যা জাঁকজমক আছে এখনও।
দ্বিধা-বিভক্ত পাকা দাড়ি
গুম্ফ সহযোগে
এখনও কর্ণ পরিক্রমা করছে বটে,
কিন্তু সাবেককালের সে জলুস আর নেই।
সেকালের কৃষ্ণকুঞ্চিত বিভীষিকা
রূপান্তরিত হয়েছে
শুভ্র সুন্দর প্রশান্তিতে।
চোখের দৃষ্টিতে যৌবনকালের সিংহসুলভ দীপ্তি আর নেই।
তার বদলে
একটা সকৌতুক ছেলেমানুষি হাসি
চিকমিক করছে সর্বদা।
জগদেও পাঁড়ে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি,
চারদিকে গজিয়েছে এখন সবুজ ঘাস।
কেউ আর মানে না তাকে।
কিন্তু এখনও
এই জগদেও পাঁড়ে
কারও হাত যদি একবার চেপে ধরে,
ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব।
সরু সরু আঙুলগুলোতে এখনও আছে
বজ্রের মত শক্তি।
স্বর্গীয় কর্তা মশাই,
অর্থাৎ বর্তমান বাবুদের পিতাঠাকুর,
বাহাল করেছিলেন জগদওকে।
এ বাড়ির অনেক নিমক ও ধমক
পরিপাক করে
জগদেও বর্তমানে পরিপাক করছে পেন্‌শন।
ওর স্থানে
বড়বাবু
বাহাল করেছেন যে নাবালকটিকে,
তার নানাপ্রকার অপটুতা

অনুকম্পার চক্ষে দেখে জগদেও।
এই কিশোর সিংকেই কাজকর্মে ওয়াকিবহাল করে দেবার ছুতোয়
জগদেও
দেউড়ি আঁকড়ে পড়ে আছে এখনও।
আসলে,
এতকালের পুরোনো দেউড়ি ছেড়ে যেতে প্রাণ চায় না।
প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে
সারা জীবনটাই তো এইখানে কাটল।
চম্পারণ জেলায় কে চেনে তাকে!
আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই,
সব মরে-হেজে গেছে;
এইখানেই শতবন্ধনে সে জড়িয়েছে নিজেকে।
বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু—
তার সামনেই বড় হল সবাই।
ওদের নানা বয়সের
কত দৌরাত্ম্যই না সহ্য করেছে সে।
এই জগদেও পাঁড়েই বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে সকলের।
বহু মায়ীদের পালকির পেছনে পেছনে
সগর্বে এসেছে লম্বা লাঠি ঘাড়ে করে।
তাদের মেয়ে হল, ছেলে হল,
তারাও আবার দৌরাত্ম্য করতে লাগল পাঁড়ের ওপর।
উষা দিদির বিয়েও সে দেখলে।
তারও আবার ছেলে হবে,
সেও হয়তো একদিন এসে চড়বে
জগদেও পাঁড়ের কাঁধে,
টানবে দাড়ি ধরে।
ভারী ভাল লাগে ছোট ছেলেদের।
ভাব তাদের সঙ্গেই,
ছোটবাবুর ছোট ছেলে টোকনের সঙ্গে বিশেষ করে।
তাকেই সে গোপনে বলেছে,
বাঘকে হাতের কাছে পেলে
তার পুছড়ি পাকড়ে

এইসা এক পটকান দেবে
যে, জান নিকলে যাবে বাছাধনের।
টোকন শিশুমহলে
চোখ বড় বড় করে
প্রচার করে বেড়াচ্ছে বার্তাটা।
বিপিন ঘোষ
গ্রামের সরকারী ঠাকুরদা।
আবালবৃদ্ধবনিতা
সকলের সঙ্গেই ইয়ার্কি আদান-প্রদান করেন.
এমন কি স্বকীয় বৃদ্ধা গৃহিণীর সঙ্গেও।
হাজির হলেন তিনি মেজবাবুর বৈঠকখানায়।
বললেন,
তোমাদের জামাই-হিট্‌লারের ভয়ে
ব্যাঘ্রসমাজ চেম্বার্‌লেন পাঠিয়েছেন আমার কাছে।
তোমার ঠানদি বুঝতে পারেন নি বটে,
আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম।
মেজবাবু বললেন, কি রকম?
কাল থেকে
একদম অচেনা একটা রোগা বেড়াল এসে জুটেছে।
ভিজে ভিজে ভাব,
মাঝে মাঝে সকরুণভাবে চাইছে।
আমার বিশ্বাস,
ব্যাঘ্রসমাজের দূত ও,
আমার মারফৎ সন্ধির প্রস্তাব করতে চায়।
তোমাদের জামাইয়ের কাছে।
আমি হয়তো রাজিও হয়ে যেতুম,
কিন্তু কাল একটু ,যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি,
টপ করে মাছটি তুলে নিয়েছে পাত থেকে।
সুতরাং অ-ক্ষম হয়ে পড়েছি,
ও পাষণ্ডদের আর ক্ষমা করতে পারব না।
এমন কি মনস্থ করেছি,
আমিও তোমাদের অভিযানে যোগদান করব।

মেজবাবু বললেন, ঠানদি?
তাঁর জন্যেই যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে।
হেলে দুলে হাসতে হাসতে গেলেন ঠাকুরদা
বড়বাবুর কামরায়।
বললেন,
দেখ ভায়া,
আমিও যাচ্ছি,
কিন্তু হাতীতে, ঘোড়াতে অথবা গরুর গাড়িতে যাব না,
আমার চাই পালকি।
অর্থাৎ তোমার ঠানদিও যেতে চাইছেন,
পতিব্রতা নারীকে ঠেকানো মুস্কিল।
বড়বাবু হেসে বললেন, বেশ তো।
গলার স্বর একটু খাটো করে বললেন ঠাকুরদা,
সুবিধেও হবে।
তোমাদের ঠানদিকে চেনো তো?
রিজার্ভ ফোর্স।
তোমাদের জামাইয়ের বন্দুক ফেল করলেও করতে পারে,
তোমাদের ঠানদি ফেল করবেন না কখনও।
ওইটুকু ছোট্ট মানুষ তো.
কিন্তু একবার গাছকোমর বেঁধে দাঁড়ান যদি,
বাঘেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।
বড়বাবু তাঁব স্বাভাবিক দরাজ কণ্ঠে
অট্টহাস্য করে উঠলেন।
ঠাকুরদা গেলেন তারপর ছোটবাবুর কাছে।
ছোটবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন,
ভায়া,
তোমাদের নীলু দত্তকে বলে দিও,
একটু নিরিমিষ-টিরিমিষের ব্যবস্থাও যেন রাখে।
তোমাদের পাল্লায় পড়ে
বাগান-বাড়িতে লুকিয়ে চুরিয়ে যা-ই করি,
সক্কলের সামনে ম্লেচ্ছাচরণ করতে পারব না।
বিশেষত,

তোমাদের ঠানদিও সঙ্গে যাচ্ছেন যখন
কোশাকুশি তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি নিয়ে।
দেখো ভায়া,
ডুবিও না আমাকে যেন শেষকালে।
ছোটবাবু বললেন,
ঠানদিকেও আমরা দলভুক্ত করে নেব,
ভাবছেন কেন আপনি।
ঠাকুরদা হেসে বললেন,
ঠানদি তোমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন হয়তো,
কিন্তু আমাকে তোমাদের দলভুক্ত দেখলে
খুশি হবেন না একটুও।
বাইরে থেকে আমার দুরবস্থাটা
তোমাদের নয়নগোচর হবে না ভায়া,
কিন্তু গজভুক্ত কপিত্থবৎ
আমার শূন্যতাটা অনুভব করতে থাকব আমিই কেবল।
ছোটবাবু চক্ষু দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত করে বললেন,
এত ভয় করেন আপনি ঠানদিকে?
ঠাকুরদা বললেন,
বিয়ে করেছ তরঙ্গিণীকে,
ক্ষেমঙ্করীর খবর জানবে কি করে, বল?
মোট কথা,
বিপদে ফেলো না আমায় ভাই।
হেলে দুলে চলে গেলেন ঠাকুরদা।
নাতিদীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি,
নগ্নগাত্র,
বুকময় কাঁচাপাকা চুল,
দক্ষিণ বাহুমূলে একটি রুদ্রাক্ষ,
পরনে থান,
পায়ে চটি।
অন্তঃপুরেও চঞ্চলতা জেগেছিল।
বৃদ্ধা গৃহিণী সেকেলে মানুষ,
মনে মনে তিনি সমর্থন করছিলেন না

মেয়েদের এই হুজুক-প্রবণতা।
বর্তমান যুগের মেয়েদের ওপরই
কেমন যেন অপ্রসন্ন তিনি।
তাদের আদিখ্যেতা,
বেহায়াপনা,
তাদের খুরওলা জুতো,
সুরওলা কথা,
তাদের কাঁধকাটা জামা,
নানা ছাঁদের শাড়ি,
অ্যাটাচি কেস, সুট কেস, ব্লাউজ কেস, ভ্যানিটি ব্যাগ,
ক্রীম, স্নো, রুজ, পাউডার,
যখন তখন গুনগুনিয়ে গান গাওয়া,
খুকীপনা,
ন্যাকামি,
ধিঙ্গির মতন ঘুরে বেড়ানো—
কিছুই ভাল লাগে না তাঁর।
সব যেন বদলে যাচ্ছে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল—
সংস্কৃত মন্ত্র, লাল চেলী, পুজো-হোমের আবহাওয়ায়;
একশোটা ঢাকী এসেছিল
একশোটা ঢুলী,
রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, নহবৎ, যাত্রা, ঢপ,
বরযাত্রী কন্যাযাত্রীতে মারামারি হয়েছিল,
লোক খেয়েছিল এক মাস ধরে,
চারটে বড় বড় হাঁড়া,
ছখানা পরাৎ
হারিয়েই গেছল গোলমালে।
এখন সেসব উঠে যাচ্ছে নাকি।
সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা
চুপিচুপি বিয়ে করে আসছে আদালতে নাম সই করে।
কালে কালে কতই যে হবে!
এই তো নিজের নাতনী উষা,

তাকে কলেজেও পড়াতে হল,
বিয়েও দিতে হল এক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল ন বছরে
কুল, গোত্র, কুষ্ঠি বিচার করে।
এর বিয়ে হল উনিশ বছরে
কিচ্ছু বিচার না করেই।
সবাই দেখলে কেবল ছেলের উপার্জন-ক্ষমতাটা।
ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না কেউ,
নিজেরাই সব দেখে শুনে দিতে চায়।
অন্য কিছু দেখে না কিন্তু আজকাল,
দেখে কেবল টাকার দিকটাই।
কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ সবাই দেখছে টাকা,
টাকা না হলে বিয়ে হবে না।
ওই যে উষার কলেজী বন্ধুটি এসেছে,
তার এখনও বিয়ে হয়নি,
অথচ একটা মাগী!
নামেরই বা কি ছিরি
—মীনা!
বীণা হলেও বা মানে বোঝা যেত।
নাতজামাই বাঘ শিকার করতে আসছে,
আসুক না!
গুষ্টিসুদ্ধর মেতে ওঠবার কি আছে তাতে!
আগেও তো কর্তারা শিকারে যেতেন,
বড় বড় বাঘও মেরেছেন কত,
কিন্তু কই,
মেয়েরা কখনও তাঁদের সঙ্গী হতে চায় নি তো!
শিকারে সঙ্গী হওয়া দূরে থাক,
পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত
ঘোমটা খোলবারই সাহস হত না কারও।
মেয়েদের জগতই ছিল আলাদা।
জা, ননদ, শাশুড়ি, ছেলে, মেয়ে,
দূরসম্পর্কের পোষ্য আত্মীয়ের দল,

পাড়াপড়শী,
অতিথি-ভিকিরি,
পুজো-পার্বণ,
এদেরই কেন্দ্র করে জীবন কাটত।
পুরুষদের বার-মহলের খবর
মাঝে মাঝে পৌঁছত এসে বটে অন্তঃপুরে,
কখনও আবছাভাবে,
কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে,
আন্দোলিতও করত মনকে,
কিন্তু ওই পর্যন্তই।
সেকালের মেয়েরা
পুরুষদের সঙ্গে
এমন ঘেঁষাঘেঁষি করে,
এমন লেপটে থাকতে পারত না।
তারা অবলা অশিক্ষিতা ছিল হয়তো,
কিন্তু তাদের এমন একটা মৌন মর্যাদা ছিল,
যা একালের মেয়েদের নেই।
এরা মুখে বাহাদুরি করে বটে,
আমরা তোয়াক্কা করি না পুরুষদের,
আমরা স্বাধীন,
আমরা স্বাবলম্বী;
কিন্তু ওটা যে শুধু ওদের মুখেরই কথামাত্র,
তা ওদের চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে।
ছুং ছুং করে বেড়াচ্ছে যেন সব।
আমাদের কালে
পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ বলে একটা কথা ছিল বটে,
কিন্তু পেটে ক্ষিধে মুখে অক্ষিধের আস্ফালন,
এটা নতুন ব্যাপার।
বৃদ্ধা গৃহিণী
ঠাকুরঘরে বসে বসে
হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে
এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

এমন সময়
ছোট বউ তরঙ্গিণী এসে বললেন,
ও মা, শুনছেন—
সুরেন চিঠি লিখেছে,
আপনাকে সুদ্ধু যেতে হবে শিকারে,
আপনি না গেলে ও যাবেই না লিখেছে,
এই নিন চিঠি।
বৃদ্ধা গৃহিণী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ,
তারপর বললেন,
ক্ষ্যাপা, না পাগল!
সবাই কি ক্ষেপে গেলি নাকি তোরা
আমি বুড়ো মানুষ কোথায় যাব!
তরঙ্গিণী মুখ টিপে একটু হেসে চলে গেলেন।
গৃহিণী বসে বসে ঘোরাতে লাগলেন মালা,
কিন্তু তাঁর অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
ঘুম ভেঙে জেগে উঠল
বেণী-দোলানো এক খুকী
যে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে
বায়না করত নাগরদোলায় চড়বার জন্যে,
মেলায় যাবার জন্যে,
যাত্রা শোনবার সময় আসর ঘেঁষে বসবার জন্যে,
যে নাক বেঁধাতে আপত্তি করেনি নোলক পরবার জন্যে,
যে পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত,
ঝড় উঠলে আমবাগানে ছুটত,
সামান্য পুঁতির জন্যে লালায়িত হত,
পুতুলের সংসার নিয়ে মেতে থাকত,
দাদার সঙ্গে লুকিয়ে আচার চুরি করত—
সেই খুকী।
কোথায় ছিল এ?
বিধবা বৃদ্ধা গৃহিণীর
মরচে-পড়া কড়া-পড়া মনের তলায়
ঘুমিয়ে ছিল বুঝি এতদিন,

কঠিন বীজের ভিতর কচি অঙ্কুরের মত।
অনুকূল আলো-বাতাসে
কচি কচি পাতা দুটি মেলে
আকাশের দিকে তাকাল আজ।
নাত-জামাইয়ের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে
বৃদ্ধা গৃহিণী চেয়ে দেখলেন নিজের মনের দিকে,
কুচকুচে কালো কচি এক জোড়া চোখ
আনন্দে উৎসাহে ভাষাময় হয়ে উঠেছে।
অবাক হয়ে গেলেন তিনি মনের কাণ্ড দেখে,
প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলেন সবেগে
হরিনামের মালাটা।

ছোট বউ তরঙ্গিণী,
সত্যিই যেন তরঙ্গিণী।
কথায়-বার্তায়
হাব-ভাবে
এমন একটা তরল প্রাণোচ্ছলতা বড় দেখা যায় না
হাসিতে গিটকিরি আছে,
হাসতে গেলে গালে টোল পড়ে,
মুখ টিপে মুচকি হাসে যখন,
তখন আরও বেশি করে পড়ে।
চলনে আছে ভঙ্গিমা,
বলনে রঙ্গিমা,
ছিপছিপে দোহারা গড়ন,
টিকোলো নাক মুখ চোখ,
টকটকে রঙ,
মাথায় চওড়া সিঁদুর,
পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি,
ঠোঁট দুটি পানের রঙে টুকটুক করছে সর্বদাই।
পঁচিশ বছর বয়স হল,
তবু এখনও কাঁচপোকার টিপটি পরা চাই।
বছর আষ্টেক আগে টোকন হয়েছিল,

আর ছেলেপিলে হয় নি।
তরঙ্গিণী
মেজ জা হিরণ্ময়ীর মহলে গিয়ে উঁকি দিলেন।
বললেন,
মেজদি, মাকে দিয়ে এলুম খবরটা।
মুখে যদিও আপত্তি করলেন,
কিন্তু মুখ দেখে মনে হল নিমরাজি।
খুব মোক্ষম বুদ্ধিটা বার করেছিলে যা হোক!
ঊষাটাকে কিন্তু সামলে রেখো—
যা বকর বকর করে ও,
সব কথা ফাঁস না করে দেয় শেষকালে!
কলেজে পড়লে কি হবে,
কিচ্ছু বুদ্ধি নেই ওর!
ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারটায় চাবি দিতে দিতে
হিরণ্ময়ী বললেন,
তুই নিজেকে সামলে রাখ দিকি।
ঊষাকে আমার তত ভয় নেই,
যত ভয় তোকে।
ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে
চলে গেলেন তরঙ্গিণী নিজের ঘরে।
ঘরে গিয়ে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
চুলটা একটু ঠিক করে নিতে নিতে
কল্পনায় দেখতে লাগলেন
প্রকাণ্ড একটা মাঠ,
তাতে তাঁবু
তাঁবুর ভেতর আর কেউ নেই,
কেবল—।
মুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে,
টোল পড়ল গালে।
হিরণ্ময়ীর গায়ে অন্যান্য বউদের মত
সোনার গয়না অবশ্য প্রচুর ছিল,

কিন্তু গায়ের রঙে ছিল না সুবর্ণ-দ্যুতি।
হিরণ্ময়ী শ্যামাঙ্গিনী।
চোখ-মুখও যে অসাধারণ রকম সুন্দর
তা নয়,
সাদামাটা।
বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।
ছেলেপিলে হয় নি,
সুতরাং ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনীও।
বড় বনিয়াদী বংশের মেয়ে।
একদা
যে বংশের দৌলতে
রূপের অনটন সত্ত্বেও
এ বাড়ির বধূপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন,
এ যাবৎ তিনি
সে বংশের মর্যাদা
রক্ষা করে এসেছেন সগৌরবে।
এ বাড়ির সকলেরই তিনি মা।
নিজের স্বামীর প্রতিও তাঁর যে স্নেহ
তা অপত্যস্নেহ।
বাড়ির ঝি চাকর থেকে শুরু করে
বড়বাবু পর্যন্ত
সকলেই ত'র দাক্ষিণ্যভোগী।
বড়বাবুর সমস্ত পাঞ্জাবি
মেজমার হাতের তৈরি।
আহারাদির পর
মেজমার হাতের তৈরি খিলি চারেক পান না খেলে
তৃপ্তিই হয় না তাঁর।
বৃদ্ধা গৃহিণীও
মেজ বউয়ের হাতের রান্না খাবার জন্য লোলুপ।
তাঁর মতে এ বাড়িতে
অমন সুক্ত আর কেউ নাকি রাঁধতে পারে না।
বাড়ির যত ছোট ছেলেমেয়ের আশ্রয়

মেজমা।
টোকনকে,
বড় জার ছেলে খোকনকে—
মেজমা-ই মানুষ করেছেন।
খোকন কলকাতায় আইন পড়ছে,
আসবে না সে এখন;
এজন্য মেজমার মন একটু খুঁত খুঁত করছে।
ভেবেছিলেন,
সুরেনকে লিখে দেবেন সঙ্গে করে আনতে,
কিন্তু বড়দির ভয়ে পারেন নি।
বড় কড়া মেজাজের মানুষ বড়দি।

আশ্রিতারূপে
দূরসম্পর্কের এক ননদ এসেছেন বাড়িতে,
বড় মাটো বেচারী।
মেজমা না থাকলে
বড়দির প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করা
অসম্ভব হত তার পক্ষে
তার পাঁচ বছরের ছেলে জিতু
(এখন সে গেছে তার এক মাসীর কাছে)
যখন এখানে থাকে,
মেজমার কাছেই শোয় রাত্তিরে।
বড়দির মেয়ে ঊষার যাবতীয় দুষ্কৃতি
মেজমাই চাপাচুপি দিয়ে এসেছেন এতকাল।
কলকাতায় যখন পড়তে গেল ঊষা,
প্রতি মাসেই তার খরচের অঙ্ক
বরাদ্দ টাকার অঙ্ককে ডিঙিয়ে যেত,
পূরণ করতে হত মেজমাকে
গোপনে গোপনে।
ভাগ্যে বিয়ে হয়েছে
বড়লোকের ছেলে বিলেত ফেরত ব্যারিস্টারের সঙ্গে।
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন মেজমা।

ভাগ্যের কথা বলা তো যায় না,
যদি গরিবের ঘরে পড়ত উষা,
কি দুর্দশাই যে হত ওই খরচে মেয়ের!
সে দুর্ভাবনাটা গেছে বটে,
কিন্তু আর একটা নতুন দুর্ভাবনা জুটেছে।

তরঙ্গিণীর এক দূরসম্পর্কের ভাই—
হীরেন
এসেছে ছুটিতে বেড়াতে।
উষার সম্পর্কে মামা হয়,
কিন্তু বয়স বেশি নয়।
বড় জোর
উষার চেয়ে বছর তিন চার বড় হবে।
ব্যাড্মিন্টন খেলতে গিয়ে
কি যে কাণ্ড করে উষা তার সঙ্গে!
হাসাহাসি, হুড়োহুড়ি, ব্যাট-কাড়াকাড়ি—
বিশ্রী দৃষ্টিকটু ব্যাপার!
দিদি এতদিন এটা লক্ষ্য করেননি,
সেদিন কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে কথাটা,
রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন তিনি।
মেজমাও পছন্দ করেন না এসব,
তবু উষার হয়ে সাফাই গাইতে হল তাঁকে!
ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজটা বন্ধ করে
বেরিয়ে এলেন মজমা,
তাঁর খাস ঝি কাদম্বিনীকে ডেকে বললেন,
কই, কোথায় ময়রা-বউ?
ডেকে দে তাকে।
কালো-কালো ময়রা-বউ এল একটু পরে
সসঙ্কোচে।
তার নাকে প্রচণ্ড নথ,
নথে টানা,—
লাগাম টেনে সামলে রেখেছে যেন নথটাকে।

মেজমা বললেন,
ময়রা-বউ,
আমর জন্যে সের দশেক কাঁচাগোল্লা
তৈরি করে দিতে হবে দুদিনের মধ্যে
আলাদা করে।
তারপর একটু হেসে বললেন
চুপি চুপি,
পারবি তো?
ঘাড় কাত করে ময়রা-বউ জানালে, পারবে।
দাম তোর আগাম দিয়ে দিচ্ছি, নে,
জিনিস কিন্তু ভাল চাই।
সসঙ্কোচে বললে ময়রা বউ,
দাম পরে নোব মেজমা,
জিনিস হোক আগে।
শুনলেন না মেজমা সে কথা,
বললেন,
কি দরকার বাপু তার।
সেবারকার মত
গোলেমালে শেষটা ভুলে যাব আমি,
তোরাও চেয়ে নিবি না মনে করে।
একরকম জোর করেই
দামটা গুঁজে দিলেন তার হাতে।
বলে দিলেন বারবার করে,
জিনিস ভাল হওয়া চাই কিন্তু।
পুলকিত ময়রা-বউ
বেরিয়ে গেল খিড়কি-দুয়ার দিয়ে
টাকা কটি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে।
মেজমা নিশ্চিন্ত হলেন।

·

শিকারে যদি যেতেই হয়,
ওই মাঠের মাঝখানে
নিজের আয়ত্তের মধ্যে কিছু খাবার না থাকলে

কিছুতে স্বস্তি পাবেন না তিনি।
ছেলে-পিলে,
চাকর-বাকর,
দাই-ঝি,
সবাই যাবে;
তা ছাড়া মেজবাবুর মিষ্টি না হলে মুস্কিল,
একটি বেলা চলবার উপায় নেই।
ওখানে পাঁচ ভূতের কাণ্ড,
নিজের সঙ্গে কিছু মিষ্টি না থাকলে চলে?
শিকারে যাবার হুজুকটি তুলেছে
ছোট বউ, ঊষা আর মীনা।
কলমিপুর অঞ্চলে
বাঘ বেরিয়েছে একটা।
ঊষা সেই খববটি দিয়েছে সুরেনকে
(দেবাব মতন আব খবরও পায নি মেয়ে।)
সুরেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে
শিকার করতে হবে বাঘটাকে।
শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, সবাইকে চিঠি লিখেছে,
ঊষাকে লিখেছে তোমাদেরও যেতে হবে।
বিলেতে মেয়েরা
হামেশাই এমন গিয়ে থাকে,
তোমরাই বা যাবে না কেন?
এখন
'তোমরা'—নামক বহুবচন সর্বনামটি
সুরেন গৌরবে ব্যবহার করেছিল কি না,
তা নির্ধারণ না করেই
তরঙ্গিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল
এবং উচ্ছ্বসিত করে তুলল মীনাকে।

মীনা মেয়েটি
একটা চাপা গম্ভীর স্বভাবের,
চট করে চাপল্য প্রকাশ কবে না;

কিন্তু তরঙ্গিণীর তরঙ্গ আঘাতে
সেও বিচলিত হল।
উষা বলতে লাগল,
নিশ্চয়ই,
সব্বাই মিলে যাব আমরা,
যাব না তো কি!
কলমিপুরের মাঠে
মজা করে
তাঁবু ফেলে সব থাকা যাবে একসঙ্গে।
সমস্ত শুনে মেজমা বললেন,
কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে এর মধ্যে।
বড়দি রাজি হলেও হতে পারেন,
জামাইয়ের অনুরোধ
হয়তো গ্রাহ্য করলেও করতে পারেন তিনি
(যদি মেজাজ ঠিক থাকে),
কিন্তু মা কিছুতে রাজি হবেন না।
আর মাকে ফেলে আমাদের যাওয়াটা
ভাল দেখাবে না।
অন্তত
আমি যেতে পারব না।
তরঙ্গিণী আবদারের সুরে বললে,
তোমাকে যেতেই হবে মেজদি,
তুমি না গেলে কেউ যাব না আমরা।
তুমি গিয়ে মাকে একটু বল না,
তোমার কথায় তো উনি ওঠেন বসেন!
স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন মেজমা;
তারপর বললেন,
তা হলে এক কাজ কর তুই উষা,
সুরেনকে লেখ,
মাকে যেন নেমন্তন্ন করে আলাদা করে।
নাতজামাই পীড়াপীড়ি করলে
হয়তো রাজি হয়ে যেতে পারেন।

মা মনে মনে বেশ হুজুকে আছেন এদিকে,
সেবার মনে নেই,
সমস্ত রাত বসে যাত্রা শুনলেন—অভিমন্যুবধ?
বড়দিকেও আলাদা একটা চিঠি লিখতে বলিস।
বড়দিকে রাজি করাও সহজ নয়,
কখন যে কি মেজাজে থাকেন ঠিক নেই,
জামাইয়ের খাতিরেই যদি রাজি হন।
মেজমার কথামত
ঊষা চিঠি লিখলে সুরেনকে,
ঈপ্সিত ফলও ফলল।

বড়দি রাজি হয়েছেন,
মাও নিমরাজি।
মেজমা নীচে নেবে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় পেছন দিক থেকে এসে
জাপটে ধরলে তাঁকে টোকন।
মেজমা, আমাকেও একটা এয়ার-গান কিনে দাও,
আমিও জামাইবাবুর সঙ্গে বাঘ মারব
মাচায় উঠে বসে।
মেজমা বললেন,
তোমার জগদেও পাঁড়ে তো বলেছে,
আছড়ে মারবে বাঘকে,
বন্দুকের আর দরকার কি?
টোকন তার বড় বড় চোখ দুটো
আরও বড় করে বললে,
জান মেজমা,
সমস্ত শুনে-টুনে জগদেও পাঁড়েও ভয় পেয়েছে?
চাঁপা যখন বললে,
বাঘকে আছড়ে মারা সোজা নাকি?
হালুম করে একবার যদি তেড়ে আসে,
পালাতে পথ পাবে না তুমি।
শুনে পাঁড়ের মুখ

ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল।
তারপর আমাকে চুপি চুপি বললে,
চাঁপা যা বলছে তা ঠিক,
একটা বন্দুকই তুমি যোগাড় কর ভেইয়া।
আমাকে একটা বন্দুক কিনে দাও মেজমা,
আঢ্যিদের দোকানে আছে—
আমি দেখে এসেছি।
মেজমা বললেন, আচ্ছা, সে হবে এখন,
আমাকে এখন ছাড় দিকি তুই।
পাঁড়েটার মতিচ্ছন্ন ধরছে যেন দিন দিন!
মেজমা ছদ্ম কোপে গর গর করতে করতে
নেবে গেলেন নীচে।
বাড়ির যিনি বড় বউ,
তাঁর যে এককালে ডাকনাম ছিল অনু,
তা আজকাল প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়েছে,
এমন কি তিনি নিজেও বোধ হয়।
এখন তিনি বড় বউ,
বিকল্পে—বড়দি।
মিষ্টি অনু নামটা হারিয়ে গেছে।
অনু নামটা অবশ্য
গুরু-গম্ভীর অনন্তময়ীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।
কাকতালীয়বৎ
মানুষ মাঝে মাঝে
এমন দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয় যে,
অবাক হতে হয়।
অনুর যেদিন জন্ম হল,
সেদিন পুরোহিত মশাই ওর নামকরণ করিলেন—
অনন্তময়ী।
কারণ
সেদিন ছিল অনন্তচতুর্দশী।
কিন্তু নামটি যে
এমন হুবহু খাপ খেয়ে যাবে

মেয়েটির চরিত্রের সঙ্গে,
তা কেউ তখন ভাবেনি।
অদ্ভুত খাপ খেয়ে গেছে কিন্তু,
বড় বউ সত্যিই অনন্তময়ী।
বয়স চল্লিশের কাছাকাছি,
এই বাড়িতেই কাটল প্রায় পঁচিশ বছর,
কিন্তু কেউ এখনও তাঁর অন্ত পায়নি,
কেউ ধরতে পারেনি তাঁর ঠিক রূপটি কি।
বাইরের রূপ
এখনও যেন ফেটে পড়ছে।
এত বয়সেও লাবণ্য এতটুকু কমেনি।

আবও আশ্চর্য,
একই রূপ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়!
যখন পুজোর ঘরে থাকেন,
তকড় নিষ্ঠাবতী পূজাবিণী,
সেই মানুষই আবার প্রসাধন-কক্ষ থেকে বেরোন যখন,
তখন অভিসারিকা।
আদেশ করেন সম্রাজ্ঞীর মত,
আদেশ পালনও করেন পরিচারিকার মত বিনা বাক্যে।
রেগে গেলে যিনি আগ্নেয়গিরি,
প্রসন্ন হলে তিনিই স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা।
অদ্ভুত অভিনেত্রী।
একই মুখে কমলার কমনীয়তা হওয়া
এবং চামুণ্ডার বিভীষিকা ফোটাতে পারেন।
সুধামুখী নিমেষে রূপান্তরিত হতে পারে
উল্কামুখীতে।
পেলব পুষ্পহার
কখন যে ভুজঙ্গিনী হয়ে উঠবে,
কেউ বলতে পারেনা।
সবাই তাই ভয় করে,
কেবল একজন ছাড়া,
তিনি বড়বাবু।

বড়বাবু বড় বউয়ের দিকে
ভাল করে চেয়ে দেখবার অবসরই পান নি জীবনে,
চেষ্টাও করেননি।
বড় বাবু
দিলদরিয়া জমিদারের
দিলদরিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র।
নানা রঙ্গমঞ্চে তাঁর গতায়াত;
গৃহ-রঙ্গমঞ্চেও যে
প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর আবির্ভাব হতে পারে,
সে খেয়াল করেননি।
বিয়ে করেছেন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী,
সালঙ্কারা বউকে এনে স্থাপন করেছেন গৃহে—
একটা আসবাব
কিম্বা বড় জোর একটা বিগ্রহের মত।
আসবারের তদারকের
অথবা বিগ্রহের সেবার
যথারীতি বন্দোবস্ত করে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।
একটা আসবাব অথবা বিগ্রহ নিয়ে
উন্মত্ত হয়ে ওঠবার মত
হ্যাংলামি ছিল না তাঁর।
বড়বাবুর পরিচিত বহু নরনারীর মধ্যে
বড় বউও একজন,
তার বেশি আর কিছু নয়।
হয়তো বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারতেন বড় বউ,
প্রসাধন-বৈচিত্র্যময়ী অভিনেত্রীর অন্তরালে
হয়তো সত্যিকারের প্রিয়া একদিন দেখা যেত,
কিন্তু ঘটনাচক্রে
ব্যবধানটা আরও বেড়ে গেল।
বাইরে মদ খেয়ে
স্ত্রীর ভয়ে এলাচ লবঙ্গ চিবুতে চিবুতে
চোরের মত অন্দর-মহলে ঢোকেন যাঁরা,
বড়বাবু সে জাতের লোক নন।
যথারীতি
ঈষৎ মত্তভাবেই

প্রবেশ করতেন অন্তঃপুরে।

বড় বউ একদিন আপত্তি জানালেন কুঞ্চিত নাসায়।
বড়বাবু বললেন,
দেখ বড়বউ,
তুমি পান দিয়ে দোক্তা খাও, না জরদা খাও,
কুমড়ো-ডাঁটা অথবা পুঁই-ডাঁটা
কোন্‌টা তোমার প্রিয়তর,
কি ধরনের শাড়ির পাড় তোমার পছন্দ,
তোমার গলায়
হার না চিক
কোন্‌টা ঠিক মানায়,
দোতলার জানলা দিয়ে পর-পুরুষের দিকে চেয়ে থাকতে
তোমার ভাল লাগে, কি লাগে না—
এসব নিয়ে কোন দিন তো মাথা ঘামাইনি আমি।
ইচ্ছেই হয় না।
তোমার হঠাৎ এই নীচ প্রবৃত্তি কেন?
I was given to understand.
তুমি আমার সহধর্মিণী।
কোন উত্তর দিলেন না বড় বউ,
চুপ করে বসে রইলেন নাসা কুঞ্চিত করে।
বড় বউয়ের নাকের পানে
কিছুক্ষণ ঢুলুঢুলু নয়নে চেয়ে থেকে
বড়বাবু বললেন, অল রাইট।
আর মদ খেয়ে তোমার সমীপস্থ হব না।
যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায়
সমীপস্থ হবার রাইট আছে বলেই হব না
I am a gentleman, madam,
অকারণে একজন লেডির নাসারন্ধ্রকে
বিক্ষুব্ধ করতে চাই না।
তুমি তোমার নানা রকম শাড়ির বাণ্ডিল
আর নানা রকম গয়নার বোঝা নিয়ে

সুখে স্বাচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।
সেই দিন থেকে আর মদ খেয়ে
অন্দর-মহলে আসতেন না তিনি।
যখন আসতেন, অত্যন্ত অবিচলিতভাবে আসতেন,
অবিচলিতভাবে থাকতেন,
অবিচলিতভাবে চলে যেতেন।
এবং এই করেই জন্মাল
নীলু দত্তের ভ্রান্ত ধারণাটা।
নীলাম্বর দত্তের বিশ্বাস—
বড়বাবু বাইরে মদ খান
বড় বোয়ের ভয়ে।
হায় রে, নীলু দত্ত,
বড়বাবুর খোসামোদ কর বটে তুমি,
কিন্তু বড়বাবুর সমঝদার তুমি নও।
তাই
লাহিড়ীর কাছে বারম্বার পরাস্ত হচ্ছ।
বড়বাবুর মদ খাওয়ার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল,—
যখন খেতেন,
তখন একটানা দু'তিন দিন খেতেন,
অর্থাৎ 'সেশন্‌স' চলত।
যখন খেতেন না,
তখন খেতেন না।
বড়বাবু যে ইংরেজী জানেন,
তা বোঝা যেত মদ পেটে পড়লে,
এবং তিনি যে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.,
তা কোন কালেই বোঝা যেত না।
শুধু যে স্ত্রীর প্রতিই তাঁর ঔদাসীন্য ছিল তা নয়,
আত্মীয়স্বজন,
বন্ধুবান্ধব,
জমিদারি, কলিয়ারি,
এমন কি ছেলেমেয়ের সম্বন্ধেও
তিনি উদাসীন।

পদ্মপত্রের মত তাঁর মনখানি,
কত শিশিরবিন্দুই যে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে।
নতুন জামাই বাঘ শিকার করতে চেয়েছে?
বেশ তো, আসুক।
জয়দ্রথবধ কিম্বা অভিমন্যুবধ শোনবার জন্যে
যদি সারারাত্রি সামিয়ানার তলায় কাটানো সম্ভব নয়,
শার্দুলবধ উপলক্ষে
কলমিপুরের মাঠেই বা একরাত্রি কাটাতে আপত্তি কি!
ঢালা হুকুম দিয়েছেন নীলু দত্তকে,
চলুক আয়োজন।
বড় বউ কিন্তু উৎসাহিত হয়েছেন অন্য কারণে,
এবং সে কারণটা
আপাতদৃষ্টিতে এত ছেলেমানুষি
এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এত নিগূঢ়
যে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে
পণ্ডিতমহলে হাতাহাতি হবার সম্ভাবনা।
বড় বউ যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন
তাক লাগিযে দিতে চান সকলকে।
এই তাক লাগানো প্রবৃত্তিটা
তাঁর বংশগত।
যে বাড়ির মেয়ে তিনি,
সে বাড়িব সবাই
একটু উদগ্র রকমের আধুনিক।
দুজন ক্রিশ্চান হয়েছেন, দুজন ব্রাহ্ম,
আত্মহত্যা করেছেন একজন,
বাড়িতে শুধু বিলেত-ফেরত নয়,
জাপান-ফেরত লোকও আছেন।
সেকালের হিসেবে একটু বেশি বয়সেই,
অর্থাৎ পনরো বছরে
বিয়ে হয়েছিল অনন্তময়ীর।
কিন্তু ওই পনরো বছরের মধ্যেই
দাদাদের উৎসাহে,

গৃহশিক্ষকের সহায়তায়,
বাংলা ইংরেজী নভেল নাটক পড়বার বিদ্যেটা
আয়ত্ত করেছিলেন তিনি।
আধুনিক অনাধুনিক
সুপাচ্য দুষ্পাচ্য
নানাবিধ উপ এবং রূপ-ন্যাস
একদা ভারাক্রান্ত করেছিল তাঁর মানসিক পাকস্থলীকে।
উদগারের জ্বালায়
আধুনিকমনা দাদারা পর্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন।
কণ্ঠস্বর সত্যিই অনিন্দ্যনীয় ছিল।
প্রাক্‌বিবাহযুগে,
ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে
তাক লাগিয়ে দিতেন সকলের।
কিন্তু ভাগ্যবিধাতাও
তাক লাগাতে কম ওস্তাদ নন।
এই তন্বী আধুনিকাকে বানিয়ে ছাড়লেন
সানতনপন্থী জমিদার-বাড়ির বড় বউ।
সরম-মন্থর পদক্ষেপে
তীক্ষ্ণভাষিণী রাশভারী শাশুড়ীব পদাঙ্ক অনুসরণ করাই
জীবনের লক্ষ্য হল।
তিনি যে আধুনিকা,
সেটা এ বাড়িতে গৌরবের বস্তু হল না,
সেটাকে লজ্জায় চাপা দিতে হল ঘোমটার তলায়।
সনাতনী হিন্দুবাড়ির বড় বধূর ভূমিকাতেও
অনন্তময়ী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।
এমন কি,
মাঝে মাঝে ভুলেও যেতেন যে, অভিনয় করছেন।
এই ভাবেই দিন কাটছিল;
স্তরের ওপর স্তর পড়ে
অবলুপ্ত করে ফেলেছিল
নিত্যনবায়মানা আধুনিকাকে।
সহসা যৌবনের শেষ প্রান্তে

নিজের কলেজে-পড়া নবোদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের সংস্পর্শে এসে
অন্তঃসলিলা ফল্গু উদ্বেল হয়ে উঠল।
বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার জামাই
মেয়েকে নিয়ে শিকারে যেতে চায়।
হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন,
জীবনটা বৃথাই গেছে।
হঠাৎ ঈর্ষা হল—
মেয়ের ওপরই ঈর্ষা হল।
সুরেনের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা কোলের ওপর পড়ে ছিল,
স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন তিনি,
ভাবছিলেন, যাব, কি যাব না;
হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন, যাব, নিশ্চয় যাব,
ওদের তাক লাগিয়ে দিতে হবে।
কলমিপুরের মাঠে
এমন একখানা অভিনয় করতে হবে,
যা শুধু সুরেন উষাকেই নয়,
বড়বাবুকেও বিস্মিত করবে।
চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন তিনি,
কি করবেন,
কোন্ শাড়িখানা পরবেন!
প্রৌঢ়া বড় বউয়ের পক্ষে এ আচরণ অশোভন?
হয়তো।
উষার বয়স যদিও উনিশ হয়েছে,
শরীরে যৌবন সুপরিস্ফুট,
আই. এ. পাস করেছে,
তবু সে এখনও বালিকা—
ছটফটে, আদুরে, অসংসারী।
দাপাদাপি করে বেড়ায়,
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়,
ঠোঁট তো ফুলেই আছে।
একটু ধমক দিয়ে কথা বললে
এখনও চোখ ছলছল করে মেয়ের।

কোথায় কোন্ কথা কি ভাবে বলা উচিত,
অপ্রিয় সত্যকে
কি করে একটু ঘুরিয়ে প্রিয় করতে হয়,
কখন চোখ নামানো উচিত,
কাপড় সামলানো উচিত—
কিচ্ছু জানে না।
অত জোরে কথা কওয়া,
অত চেঁচিয়ে হাসা,
অমন দুমদুমিয়ে চলা যে অশোভন,
সে জ্ঞান হয়নি এখনও ভাল করে।
মন প্রস্তুত হবার আগেই
যৌবনটা এসে গেছে দেহে
অকালবসন্তের মত।
দেহটা যত নিটোল হয়েছে,
মনটা তত নিটোল হয়নি,
মনের এখনও অনেক পুরতে বাকি।
মনের গাম্ভীর্য আসে নি,
নিগূঢ়তা ঘনায়নি,
গোপনলোক আবিষ্কৃত হয়নি।
যা মনে আসে হাউ হাউ করে বলে,
স্বামীর চিঠি সবাইকে দেখায়,
কোন সঙ্কোচ নেই।
কোন কিছু রেখে-ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।
বস্তুত
সে প্রয়োজনই ঘটেনি ওর।
মনের যে পরিণতি হলে
মন গোপনতা-বিলাসী হয়,
সে পরিণতিই হয়নি।
ও যদি আর একটু গম্ভীর হত,
তা হলে এই ব্যাপার নিয়ে
এমন করে পাড়া গাবিয়ে বেড়াত না।
এই শিকার-অভিযানে

ওই যে কেন্দ্রবর্তিনী,
ওর স্বামীই যে এই অভিযানের নেতা—
তা ও নিজেও ভুলছে না,
কাউকে ভুলতেও দিচ্ছে না।
একমুখ পান খেয়ে
পাড়ায় পাড়ায়
নিজের মনের খুশির ঢাকটা পিটিয়ে বেড়াচ্ছে।
বকবকানির চোটে
সাদা কাপড়ে লেগেছে পানের ছোপ খানিকটা,
সাদা গালেও—
তির্যকভাবে,
অসাবধানে ঠোঁট পুঁছতে গিয়ে।

মীনা মেয়েটি,
গাণিতিক নিয়ম অনুসারে
ঊষার সমবয়সী।
কিন্তু আসলে মীনা ঢের বেশি বড়।
তার প্রমাণ—
ওর সন্নত দৃষ্টিতে,
মৃদু কথাবার্তায়,
সংযত গমনভঙ্গিমায়।
নিজেকে বিজ্ঞাপিত করবার কোন চেষ্টা তো নেইই,
অবলুপ্ত করতে পারলে যেন বাঁচে;
এবং সেইজন্যই সম্ভবত
আরও বেশি করে প্রত্যক্ষ-গোচর।

যখন যেখানে থাকে,
চুপ করেই থাকে,
কিন্তু পূর্ণ করে রাখে সমস্ত স্থানটা।
ওর সসঙ্কোচ মৌনতা
মুখরতম বিজ্ঞাপনের চেয়েও আকর্ষক।
অর্থাৎ

মীনা সত্যিই যুবতী।

রূপসী কি না,
সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে,
আছেও।
বিয়ের বাজারে
জ্যামিতি-পরিমিতিজ্ঞ
যেসব রংরেজ সমঝদারেরা
নাকের মাপ, চোখের পরিধি,
ঠোঁটের স্থূলতা, বর্ণের ঘনত্ব মেপে বেড়ান,
তাঁরা
মীনাকে পাস-মার্কা দেননি।
পাঁচ সাত বার
পাঁচ সাত দল লোক দেখে গেছেন,
কেউ পছন্দ করেননি।
বিধাতার এই সৃষ্টিটিতে
নানা রকম খুঁত দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।
কেরানি, ডাক্তার, উকিল, মাস্টার,
দালাল, দোকানদার,
এমন কি বেকার পাত্রেরও
পাণিপীড়ন করবার সামাজিক অনুমতি
মীনা পায় নি।
মাপ-জোকে অনেক খুঁত ধরা পড়েছে।
রঙ কালো,
চোখ ছোট;
নাক খাঁদা,
চুল কম।
শ্রী?
ওটা তো মাপা যায় না,
সেইজন্যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।
তা ছাড়া,
কালো রঙ, ছোট চোখ, খাঁদা নাক, কম চুলকে

অর্থপূর্ণ করতে পারতেন যে অর্থবান পিতা,
তিনিও নেই।
তিনি মীনার বাল্যকালেই মারা গেছেন।
মা লেখাপড়া জানতেন,
তাই
পরের গলগ্রহ হতে হয়নি।
শিক্ষয়িত্রীগিরি করে মানুষ করেছেন মেয়েকে;
স্কুলের কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন,
বি. এ. পাস করলে
মীনাকেও বাহাল করে নেবেন ইস্কুলে।
এই ভবিষ্য জীবনের অনুপাতেই
নিজেকে প্রস্তুত করেছে মীনা।
তার অসংযত আশা
অশোভন মত্ততায়
আকাশচুম্বী হয়ে ওঠেনি কখনও।
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সে সন্তুষ্ট ছিল।

উষার বাড়িতে এসে,
তাদের ঐশ্বর্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে
আরও কেমন যেন বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে সে।
সর্বদাই সশঙ্কিত—
পাছে কেউ কিছু মনে করে;
পাছে কেউ মনে করে,
এ বাড়িতে সে বেমানান আগন্তুক,
এ বাড়ির উঁচু-পর্দায়-বাঁধা চালচলনের সঙ্গে
চলতে পারছে না তাল রেখে,
পাছে তার অনাভিজ্ঞাত আত্মপ্রকাশ করে ফেলে!
তাই,
মনে মনে সশঙ্কিত হয়ে থাকলেও
মীনা বাইরে সপ্রতিভ।
এবং এই সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখবার জন্যেই সে
কৃত্রিম একটা উৎসাহ প্রকাশ করছে

এই শিকার-বিষয়ে।
আসলে সে নির্জনতাপ্রিয়,
ভালবাসে
ঘরের কোণে
চুপ করে একখানা বই নিয়ে পড়ে থাকতে।
হৈ-চৈ ভিড় মোটেই ভালবাসে না।
কিন্তু
কেউ যদি মনে মনে ভাবে,
মাস্টারনীর মেয়ে তো হাজার হোক,
এ সবের মর্ম ও আর কি বুঝবে!
তাই,
অতিশয় মেকি একটা উৎসাহকে
চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে সে—
মর্মান্তিক বেদনাকে ঢাকবার জন্যে
লোকে যেমন হাসে,
অনেকটা তেমনই।

অন্তঃপুরের অন্যান্য পরিজনেরা
খুব যে একটা উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন তা নয়;
করবার কথাও নয়।
বৃদ্ধা পিসীমা হাঁপানি নিয়েই ব্যস্ত,
বুকে পিঠে পুরোনো ঘি মালিশ করে
অতি কষ্টে দাওয়ায় এসে বসেন সকালবেলায়;
পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায়।
গিন্নীর দূরসম্পর্কের বিধবা বোন-ঝি
প্রাণপণে বৈধব্য পালন করেন,
নিয়মের পান থেকে এতটুকু চুন খসবার জো নেই,
মাথার চুল বেটাছেলের মত ছাঁটা,
নানা ওজুহাতে প্রায়ই উপবাস করেন,
একাদশীর উপবাসটা এমন নিদারুণ রকম নির্জলা যে,
নিষ্ঠীবন পর্যন্ত গলা দিয়ে গলতে দেন না,
সারাদিন বসে থুতু ফেলেন।

মাত্র উনত্রিশ বছর বয়স,
কিন্তু কৃচ্ছ্র-ক্লিষ্ট কি কঠোর মুখমণ্ডল!
তিনি এ অভিযানে যোগদান করবেন কি না,
সে প্রশ্নই ওঠে না।

আর একজনের সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে না,
সে শিবুর মা।
বাড়ির অনেক কালের পুরোনো ঝি—
বড়বাবুকে হতে দেখেছে।
সে কক্ষনও কোত্থাও যায় না।
শণের মত সাদা মাথার চুল
পীতাভ হয়ে এসেছে,
জরার প্রকোপে মুখখানা হয়েছে পোড়া বেগুনের মত,
হাতের লোল চর্মের তলায় দেখা যাচ্ছে মোটা মোটা শিরাগুলো,
মাথা কাঁপে,
গলার স্বরও কাঁপে,
কুঁজো হয়ে গেছে,
দু চোখে পিচুটি ভরা।
শিবুর মা কক্ষণও কোত্থাও যায় না,
বলে, একেবারে যমের বাড়ি যাব।
যমও কিন্তু ভুলে আছে।
কত লোকের মরণই যে দেখলে শিবুর মা,
আরও হয়তো কত দেখতে হবে!
অদৃষ্টে যা আছে রোধ করবে কে!
কিন্তু সে ভিটে ছেড়ে কোথাও নড়বে না,
সবাই যেখানে যাবার যাক,
শিবুর মা ভিটে আগলে পড়ে থাকবে
আর বকর বকর করবে আপন মনে।

জিতুর মা,
অর্থাৎ দূরসম্পর্কের সেই মাটো ননদটি
যাবে।

হয়তো যেত না,
(বিধবারা আবার শখ করে কোথায় যায়!)
কিন্তু বুড়ো গিন্নীমা যাবেন,
শুদ্ধাচারে তাঁর রান্নাবান্না করার জন্য
একজন চাই তো!
আজকাল জিতুর মা-ই সব করে।
মাটো স্বভাবের জন্য বকুনি খায় সকলের কাছ থেকে,
কিন্তু বেচারী নীরবেই কাজ করে যায়
চুপটি করে
মুখটি বুজে।
জিতুর মা ছাড়া আর যাবে
তিন বউয়ের তিনজন খাস চাকরানী,
আর তিন বাবুর তিনজন খাস চাকর।
চাকরানীদের মধ্যে
লছমনিয়ারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।
কারণ তার বয়স সবচেয়ে কম।
বড় বউ
নিজের বাপের বাড়ি পাটনা থেকে
আনিয়েছেন লছমনিয়াকে।
ওর স্বামী ভিকুও চাকরি করে এ বাড়িতে,
ছোটবাবুর খানসামা সে।
লছমনিয়া বেহারিনী,
কিন্তু বাংলা বলে চমৎকার,
এত চমৎকার যে ধরা শক্ত।
রঙানো ফুলপাড় পাতলা শাড়িটি পরে
মাথার চুলটি পরিপাটি করে বেঁধে
সর্বদাই ছিমছাম;
ছিপছিপে চেহারা,
ভারী খরখরি;
দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।
ভিকুও যাবে।
ভিকু বেচারী ভালমানুষ গোছের লোক,

লছমনিয়ার মত স্ত্রীকে নিয়ে
সর্বদাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়,
লছমনিয়ার সঙ্গে জোড় মেলেনি।
কিন্তু আপাতদৃষ্টিটাই কি সব?
সব যবনিকাই কি সুভেদ্য?

মেজমার চাকরানী কাদম্বিনী—
সংক্ষেপে কাদু,
এই গ্রামেরই মেয়ে।
চার পাঁচ ছেলের মা,
ভারিক্কি চেহারা,
হাতে কপালে উল্কি,
বাহুমূলে থলথল করছে চর্বি,
সর্বদাই একমুখ হাসি,
ভারী মিষ্টভাষিণী।
প্রত্যহ
প্রকাণ্ড গামলায় করে ভাত,
এক জামবাটি ডাল,
তদুপযুক্ত তরকারি নিয়ে
সে বাড়ি যায় দুপুরে
ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে।
স্বামীটিও অকর্মণ্য,
এককালে গাড়োয়ানি করে কিছু উপার্জন করত,
কিছুদিন থেকে বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছে।
মেজমার দাক্ষিণ্যেই সংসার চলছে।
মেজমার সঙ্গে যেতে হবে শুনে
কাদম্বিনীর চিন্তা হল,
ছেলেমেয়েদের আর স্বামীকে দেখবে কে!
মেজমা বললেন,
তার ব্যবস্থা করবেন তিনি মেজবাবুকে বলে।
করলেনও।

মেজবাবু ছোটবাবুকে বলেছেন
এবং ছোটবাবু আদেশ করেছেন নীলু দত্তকে।
ছোটবাবুর আদেশ শুনে
নীলু দত্তের মনে হল,
আঃ, ফ্যাসাদ এক রকম!
বাইরে অবশ্য অন্য ভাব দেখালেন,
কুঞ্চিত কপাল থেকে ঘামটা মুছে ফেলে বললেন,
ওর জন্যে আর ভাবনা কি,
এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।
বলে দিলেন অতিথিশালার পাচককে,
কাদম্বিনীর বাড়িতে যেন রোজ ভাত দিয়ে আসা হয়।
তবু কাদম্বিনীর মন খুঁতখুঁত করছে—
কোলের ছোট ছেলেটা কি ছেড়ে থাকতে পারবে?
অত দূরে টেঙিয়ে টেঙিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো মুস্কিল।
বড় মেয়ে সদুর কাছেই রেখে যেতে হবে,
তা ছাড়া আর উপায় কি!

তরঙ্গিণীর চাকরানী কালীর মা।
বিধবা,
কৈবর্ত্তের মেয়ে।
বিধবা বলেই যে শ্রীহীন তা নয়,
গড়নই ওই রকম।
লম্বা শুকনো কাঠ-কাঠ চেহারা,
সর্বাঙ্গে
মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশি,
চক্ষু কোটরগত,
হাসলে দাঁতের চেয়ে বেশি দেখা যায় মাড়ি।
কালীর ম্যাকে দেখে
চেষ্টা করেও মুগ্ধ হওয়া শক্ত।
কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে
তরঙ্গিণীর অন্তরঙ্গিণী।
তার কারণ

সে চমৎকার ঘর পুঁছতে পারে,
চমৎকার সাবান কাচে,
পরিষ্কার বাসন মাজে,
বিছানা করে পরিপাটিরূপে—
একটু কোথাও কুঁচকে থাকে না,
টেবিল, দেরাজ, আয়নায় জমতে দেয় না ধুলো।
কালীর মার কল্যাণে
তরঙ্গিণীর ঘর-দোর, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন
তকতকে, ধপধপে, ঝকঝকে।
অথচ মুখে রাটি নেই;
চুরি করে না,
হাতে তুলে যা দাও তাতেই সন্তুষ্ট।
ভগবান রূপের অভাব পূর্ণ করেছেন গুণ দিয়ে।
শিকারে যাবার কথা শুনে
সে আনন্দিত হল, কি দুঃখিত হল, কি বিস্মিত হল,
কিচ্ছু বোঝা গেল না।
কারণ, কথা সে বড় একটা বলে না,
মুখও তার ব্যঞ্জনাবিহীন।

বড়বাবুর খানসামা নীলমণিও নির্বিকার।
বড়বাবুর সঙ্গে সে এত জায়গায় ঘুরেছে
এবং এত জিনিস দেখেছে
যে,
এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটা
সে আত্মমর্যাদাহানিকর বলেই মনে করে।
নীলমণির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,
রঙটি কালো,
জুলপির চুলগুলিতে পাক ধরেছে,
গোঁফও কাঁচাপাকা।
গায়ে পরিষ্কার সাদা ফতুয়া,
কাঁধে একটি ঝাড়ন।
চোখ-মুখে

বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট, কিন্তু নীরব।
সব জানে,
সব বোঝে,
কিছু বলে না।
অকারণে অনাবশ্যকভাবে
কখনও প্রকট করে না নিজেকে,
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কথা বলে না
এবং প্রাণ গেলেও এমন কিছু করে না,
যা বড়বাবুর বিরক্তিকর।
বড়বাবু বাইরে যাবেন শুনে
সে নির্বিকারভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।
মেজবাবুর খানসামা বিশ্বম্ভর
একটু রুদ্রপ্রকৃতির লোক,
কথায় কথায় লোকের মাথা ফাটাতে উদ্যত হয়।
মেজবাবু সর্বদাই তাকে সামলে চলেন।
মেজবাবুর ভাবটা অনেকটা এই রকম—
পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই প্রহারযোগ্য তা জানি,
তুমি যা বলছ তা ঠিকই,
কিন্তু শান্তিতে বাস করাও তো দরকার!
ছুঁচো কি এক আধটা, যে মেরে শেষ করবে!
কাঁহাতক হাত গন্ধ করবে তুমি,
চলে এস।
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে,
ওই একটি মস্ত গুণ তার।
শিকারের কথা শুনে
সে সর্বাগ্রে
তার তৈলপক্ক বাঁশের বেঁটে মোটা লাঠিটা পেড়ে
তেল মাখাতে লাগল তাতে।
মেজবাবু লোকটিও শোনা যায়,
যৌবনকালে পরাক্রান্ত ছিলেন।
খুব হাত চলত,
প্রায়ই লেগে থাকত একটা না একটা ফৌজদারি।

শায়েস্তা করতেন
বড় বড় দুরন্ত ঘোড়া, পাগলা হাতী।
সময় কাটত কুস্তির আখড়ায়।
কিন্তু হঠাৎ একবার পদস্খলিত হয়ে
কেমন যেন মুষড়ে গেছেন।
দুরারোগ্য প্রমেহ ব্যাধিতে,
শারীরিক যতটা না হোক,
মানসিক প্রাবল্যটা লোপ পেয়েছে।
বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা—
শালপ্রাংশুমহাভূজ ব্যক্তি,
নিতান্ত ভালমানুষটি হয়ে গেছেন আজকাল।
নিজের সমস্ত দুষ্কৃতির কথা অকপটে স্বীকার করে
মেজমায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন মেজবাবু,
এবং তাঁরই স্নেহাঞ্চলের ছায়ায়
বাস করছেন নির্বিরোধে।
এই শিকার ব্যপদেশে উৎসাহিত হয়েছেন
মেজমারই উৎসাহে,
সূর্যের আলোকে প্রদীপ্ত চন্দ্রের মতন।

ছোটবাবু কিন্তু
এখনও আছেন বেশ জবরদস্ত।
বড়বাবু খামখেয়ালী উদাসীন,
মেজবাবু নির্বাপিত,
ছোটবাবুই আসলে জমিদার।
দাদাদের মতন বিরাটকায় নন যদিও,
কিন্তু চেহারাটা তাঁর চেয়ে দেখবার মত।
ধপধপে রঙ,
কস্‌মেটিক-লাগানো সূচ্যগ্র কালো কুচকুচে গোঁফ,
চওড়া ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ,
আরক্ত আয়ত চক্ষু দুটি
শ্রী ও শালীনতায় জ্বলজ্বল করছে।
অধরে চিবুকে

শক্তি ও সংযমের সমন্বয়।
সমস্ত মুখমণ্ডলে
অভিজাতসুলভ দর্প প্রদীপ্ত অথচ প্রচ্ছন্ন।
ছোটবাবুকে কেন্দ্র করে
হিরণপুর গ্রামে
নানা গুজব আবর্তিত হয় নানা রসনায়।
চিরকালই হবে।
কারণ,
এমন একটা কন্দর্পকান্তি জমিদারমুত্র
নিষ্কলঙ্কচরিত্র—
বিশ্বাস করা কঠিন।
সুতরাং
কল্পনাকুশল বহু 'প্রত্যক্ষদর্শী'
বহুরকম কাহিনী বিবৃত করেন গোপনে গোপনে।
ভয়ও করেন সকলে ছোটবাবুকে,
চেহারাটা দেখলেই মনে হয় কড়া মেজাজের লোক।
আসলে কিন্তু
অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক তিনি।
দাদাদের পুরোভাগে রেখে
তিনিই পরিচালনা করেন সমস্ত।
প্রাচীন ম্যানেজার সীতানাথবাবু
(প্রশস্ত টাক, পাকা ভুরু)
নির্ভরযোগ্য একজন মনিব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।
নায়েব চৌধুরী
কিন্তু খুশি হননি মোটেই।
ছোটবাবু যতদিন
লেখাপড়া নিয়ে ছিলেন কলকাতায়,
ততদিন মান-খাতির ছিল চৌধুরীর।
দিলদরিয়া বড়বাবু,
শিবতুল্য মেজবাবু
কস্মিনকালেও চৌধুরীর কথার উপর কথা কন নি;
চৌধুরী যা করতেন তাই হত,

সীতানাথবাবুও মানতেন তাঁর কথা
কিন্তু ছোটবাবু আসাতে
বদলে গেল সব।
ছোটবাবু নিজেই মহালে মহালে ঘোরেন,
প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্তা কন,
বিচার-ব্যবস্থা করেন;
সীতানাথবাবুও
অবস্থা বুঝে সায় দেন তাতে।
চৌধুরী হয়ে পড়েছেন কেরানি মাত্র।
তাই
হরিদ্বার-ফেরত কুঞ্জলালের দল
যখন চৌধুরীকে গিয়ে ধরলে,
আমরাও শিকারে যাব নায়েব মশাই;
চৌধুরী বললেন,
আমি কিছু জানি না ভাই,
যাও ছোটবাবুর কাছে।
আজকাল আমাদের কথার মূল্য নেই,
তাই
নিজের মান বাঁচাবার জন্যে
কোন কথাতেই থাকি না আমরা।
কুঞ্জলাল বললে,
ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে বললে কেমন হয়?
চৌধুরী ঈষদুষ্ণ হলেন,
একটু মুখবিকৃতি করে পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা,
ম্যানেজারবাবুকে বললে কি হয়!
যা বললাম তাই করগে যাও।
ম্যানেজারবাবু নেইও এখানে,
দিনাজপুরে গেছেন সাক্ষী দিতে
থাকলেও—হুঁঃ—
সম্পূর্ণ করলেন না তিনি কথাটা,
তবে বোঝা গেল, স্পষ্ট,
স্বয়ং চৌধুরীই যখন অপারক,

তখন ম্যানেজার থাকলেই বা কি করতেন!
কুঞ্জলাল গেল অবশেষে ছোটবাবুর কাছেই,
একটু ভয়ে ভয়ে।
নিশ্ছিদ্র চরিত্রের লোককে সবাই ভয় করে।
ছোটবাবু কিন্তু খুশি হলেন।
বললেন, নিশ্চয়, যাবে বইকি।
হরিদ্বার থেকে ফিরলে কবে সব?
আজ সকালে।
ক'জন আছ তোমরা?
জন পাঁচেক—
হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু, আব আমি।
বেশ, যেও সব,
কাল ভোরেই আমরা বেরুব—
ভোর চারটেয়।
জামাই আজ রাত্রেই এসে পৌঁছবে।
কিন্তু হাতীতে তো কুলোবে না সকলের।
তোমরা—
একটু ইতস্তত করতে লাগলেন ছোটবাবু।
কুঞ্জলাল বললে,
আমরা গরুর গাড়িতেই যাব সবাই,
হেঁটেও যাব খানিকটা।
বেশ, তা হলে তো কথাই নেই।
হৃষ্ট কুঞ্জলাল ছুটল খবর দিতে।
হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু এবং কুঞ্জলাল
সেই বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত,
যা বাংলা দেশে বেকার নামে প্রখ্যাত।
টাকা রোজকার করতে পারে না যদিও,
কিন্তু নির্গুণ নয়।
মাথায় বাবরি,
শ্যামবর্ণ, বেঁটে কুঞ্জলাল
ওস্তাদ বংশীবাদক।
শুধু তাই নয়,

গ্রামের অ্যামেচার থিয়েটার-পার্টিটির
ওই আত্মাস্বরূপ।
নানা অসুবিধার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে থিয়েটারটিকে।
জমিদারবাবুরা সেইজন্যেই বিশেষ করে
স্নেহ করেন কুঞ্জলালকে।
বঙ্কুর হাসাবার ক্ষমতা আছে,
অর্থাৎ লোকে বঙ্কুকে দেখলেই হাসে।
চলিত ভাষায় যাকে বলে গন্না-কাটা,
বঙ্কু তাই।
ইংরেজীতে বলে 'হেয়ার-লিপ'।
অর্থাৎ খরগোসের মতন
ওপর ঠোঁটের মাঝামাঝি
নাকের নীচেই খানিকটা নেই,
এবং সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে
হলদে রঙের গোটা দুই দাঁত।
তালুতেও নাকি একটা ছিদ্র আছে,
চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হয়ে পড়ে তাই কথাগুলো।
বন্ধুদের মনে হাস্যরস সৃষ্টি করবার পক্ষে
বিধাতার এই কারুকার্যটুকুই তো যথেষ্ট ছিল,
এর ওপর বঙ্কু কেন যে
ছাগলের মত খানিকটা দাড়ি
এবং কুৎসিত এক জোড়া গোঁফ রেখেছে,
তা বঙ্কুই জানে।
বঙ্কু পারতপক্ষে কথা বলে না,
হাসে না,
কোথাও যেতে চায় না,
কিন্তু বন্ধুদের দল নাছোড়।
তারা যেখানে যাবে, বঙ্কুকে টেনে নিয়ে যাবেই
এবং চেষ্টা করবে চটিয়ে দিতে।
চটে গেলে বঙ্কু নাকি মূর্তিমান হাস্যরস হয়ে ওঠে।
হাবুলের নানা খ্যাতি।
স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক।
ভাল গোল বাঁচাতে পারে,
'ফিমেল' পার্ট করতে পারে,

পরিবেশন করতে পারে,
মড়া পোড়াতে পারে,
আরও অনেক কিছু পারে।
কিন্তু প্রত্যেক কার্যটি করবার সময়
এমন একটা 'তেরিয়া' ভাব নিয়ে থাকে,
সাদা বাংলায় যার অর্থ—
বেশি ঘাঁটিও না আমায়,
ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।
দুটো মিষ্টি কথা বলে
কাজ আদায় করতে হয় তার কাছ থেকে।

বীরেন হচ্ছে এদের মধ্যে কৃতবিদ্য।
বি. এ. পাস,
নানা রকম খবর জানে,
রাখে,
বিতরণ করে।
গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর নিগূঢ় কারণ কি,
জ্যানেট গেনারের বয়স কত,
আগামী বারে কে মেয়র হবে,
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে কে কত রান করলে,
শরৎবাবু 'প্রবাসীতে কেন লিখতেন না,
আধুনিক কোন্ লেখকের কি কি দোষ,
রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা কেমন,
জাপানীরা জিনিস সস্তা করে কি উপায়ে,
ডি. ভ্যালেরা, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইসাডোর ডান্‌কান,
মাবোয়াড়ীদের পলিসি,
পি. সি. রায়ের উদ্দেশ্য,
হরিজন,
সাফ্রাজেট্‌স,
কো-এডুকেশন,
শিশির ভাদুড়ী—
বীরেনের জ্ঞান-ভাণ্ডারও যেমন অফুরন্ত,

শ্রোতাদের ধৈর্যও তেমনই অফুরন্ত।
বীরেন অবশ্য ঠিক এ দলের উপযুক্ত নয়,
ওর পালক ভিন্ন জাতের।
কিন্তু যতদিন একটা চাকরি না জুটছে
এবং উদারতর আকাশে না পাখা মেলতে পারছে,
ততদিন বক-সমাজেই বাস করতে হচ্ছে হংসকে।
পাঁচু বেচারার প্রদর্শন করবার মত
কোন গুণ নেই যদিও,
কিন্তু ওকে ছাড়া চলবারও উপায় নেই।
ইংরেজীতে যাকে বলে—ইউস্‌ফুল।
বিছানা বাঁধতে বল,
গাড়ি ডাকতে বল,
রাত দুপুরে বিড়ি কিনে আনতে বল,
মশারি খাটাতে বল,
এমন কি পা টিপে দিতে বল,
সবেতেই রাজি।
ফাইফরমাস খাটতে অদ্বিতীয়,
হাসিমুখে
নির্বিচারে
সব করবে।
অর্থাৎ
পাঁচু অলঙ্কার নয়,
অপরিহার্য
কিন্তু বঙ্কুর ও মহাশত্রু।
কাকের পিছনে ফিঙের মতন
সর্বদাই লেগে আছে।

জমিদার-বাড়ির এই মৃগয়া-অভিযানে
যোগদান করতে পেয়ে
উৎফুল্ল হল সবাই।
হরিদ্বারের রেশটা কাটতে না কাটতেই
বাঘ শিকার!
কলমিপুরের মাঠে যেতে হবে!
দূর বলেই মজাটা আরও বেশি।

কলমিপুরের মাঠ কি এখানে?
হিরণপুর ছাড়িয়ে নতুনগঞ্জ,
তারপর চাটুজ্জেদের হাট,
চাটুজ্জেদের হাট পেরিয়ে রতনদীঘি,
রতনদীঘির পর বাতাসপুর
(বিখ্যাত গুড়ের পাটালি হয় যেখানে),
বাতাসপুর ছাড়িয়ে আর একটু গেলেই
বিখ্যাত জলন্ধর বিল।
সেই বিলের ধার দিয়ে দিয়ে
প্রায় ক্রোশখানেক যাবার পর
কালভৈরবের মাঠ
(এককালে মানুষ ঠেঙিয়ে মারত নাকি সেখানে),
মাঠটাও ক্রোশখানেক।
মাঠ পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই
ঘেঁষাঘেঁষি তিনটে গ্রাম।—
প্রথমে নালতে,
নালতের গায়েই শঙ্করা
(বাবুদের একটা কাছারি আছে সেখানে),
তারপর ছাতিমপুর।
ছাতিমপুর ছাড়িয়েই কাঁকন নদীটা,
এখন অবশ্য শুকিয়ে গেছে,
বর্ষাকালে কাঁকন কিন্তু খরস্রোতা।
কাঁকনের পর রাজহাট,
তারপর তপসেডাঙা,
তপসেডাঙার পর কলমিপুর।
কলমিপুর আমের কলমের জন্য বিখ্যাত,
আশেপাশে কেবল আমবাগান।
কলমিপুর গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে
একটা শালবন।
শালবনের ওধারে কলমিপুরের মাঠ,
মাঠের ওপাশ দিয়ে বয়ে গেছে ময়না নদী,
নদীর ওপারে আবার বন,
সেই বনে এসেছে বাঘ।

পথে

।। এক।।

নীলু দত্ত কাজের লোক। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মতে যাহা কর্তব্য, তাহা সর্বাগ্রেই কর্তব্য। শেষ মুহূর্তে অকুল পাথারে পড়িয়া হাঁসফাঁস করে বেকুবেরা। ওই তেপান্তর মাঠে এতগুলি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম চাহিদা মিটাইতে হইলে সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্বাহ্ণেই না করিলে চলে? সুতরাং শুধু ত্র্যহস্পর্শের ভয়েই নয়, দায়িত্বের তাড়াতেই এবং লাহিড়ী সম্পর্কিত খুঁতখুঁতানি সত্ত্বেও দত্ত মহাশয় পনরোখানা গরুর গাড়িতে তাঁবু প্রভৃতি আসবাবপত্র বোঝাই করিয়া সাইক্ল সহযোগে আগের দিনই রওনা হইয়া গিয়াছেন। বাকি দশখানা গরুর গাড়ি আজ যাইতেছে।

এই গাড়িগুলিতে অল্পস্বল্প জিনিসপত্র আছে, লোকজনও আছে। বাড়ির চাকর চাকরানীরা, হরু মণ্ডল, তিনু চাটুজ্জে, তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো, রোগা নিতাই, গোহুমনি, কুঞ্জলালের দল—সকলেই গরুর গাড়িতে চলিয়াছে। হাতী, পালকি, ঘোড়া আগাইয়া গিয়াছে। অগ্রবর্তী গাড়িটি বিরিঞ্চির। সে গাড়িতে গোহুম্‌নি ছাড়া আর কেহ নাই, বিরিঞ্চি আর কাহাকেও বসিতে দেয় নাই। গোহুম্‌নি আপন মনে বসিয়া চিনাবাদাম-ভাজা ছাড়াইয়া খাইতেছে এবং স্মিতমুখে বিরিঞ্চির আবোল-তাবোল শুনিয়া যাইতেছে। নূতন কেনা নীল রঙের শাড়িখানিতে চমৎকার মানাইয়াছে তাহাকে।

দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন স্থূলকায় তিনু এবং রোগা নিতাই। এরূপ বেমানান যোগাযোগের কারণ উভয়েই স্বজাতি এবং তাম্রকুটবিলাসী। স্বভাবের খানিকটা মিল আছে। নিতাই কৃশতাসত্ত্বেও বীরত্বাভিমানী, তিনু স্থূলতা সত্ত্বেও ক্ষিপ্রতাবিলাসী। তিনু কখনও মন্থর গজেন্দ্রগমনে হাঁটেন না, হনহন করিয়া হাঁটাই তাঁহার রীতি। সামনে ছোটখাটো নালা নর্দামা দেখিলে লাফাইয়া পার হইবার চেষ্টা করেন, আমগাছের নীচু ডালের দোদুল্যমান আমটা লাফাইয়া না পাড়িতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ তিনি যে মোটা বলিয়া অকেজো, এ কথা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিবার অবকাশ তিনি কাহাকেও দিতে চান না। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করার পর হইতে তাঁহার চটপটে ভাবটা আরও যেন একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

নিতাই হুঁকাটিতে দীর্ঘ শেষ টানটি দিয়া তাহার মুখটি মুছিয়া তিনুর হাতে দিল।

আছে কিছু অবশিষ্ট?

দেখই না টেনে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনু টান দিলেন। বেশ ধোঁয়া বাহির হইল। ভ্রূ পুনরায় মসৃণ হইয়া গেল, তিনি প্রসন্ন চিত্তে টানিতে লাগিলেন। নিতাই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের এক কোণে স্তূপীকৃত ধোনা তুলোর মত বিরাট একটা স্তূপ মেঘ পড়িয়া আছে। একটা শকুনি বহু ঊর্ধ্বে চক্রাকারে উড়িতেছে।

তৃতীয় গাড়িতে ছিলেন সাদা-বন্দুক-হস্তে তালুকদার মশাই এবং তাঁহার বন্ধু হরিশ খুড়ো। হরিশ খুড়োর গল্প শুনিতে রাজি হইলেই হরিশ খুড়োর সহিত সৌহার্দ জন্মিয়া যায়। তালুকদার তাঁহার গল্প শুনিয়ে বন্ধু। এমন মনোযোগী শ্রোতা হিরণপুরে দুর্লভ। এখন যদিও তালুকদার ঠিক মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি খুড়ো নিরস্ত হন নাই। খুড়ো কল্পনাবান ব্যক্তি। এতক্ষণ নানারূপ বাঘের ভীষণ রূপ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন যে, যেন তিনি বহু বাঘ বহুবার ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, গাদা বন্দুকই ব্যাঘ্র শিকারের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র।

তালুকদারের দৃষ্টি কিন্তু চতুর্থ গাড়িতে নিবদ্ধ।

খুড়ো বলিতেছিলেন, রাইফেল-মাইফেল অনেক রকম বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তোমার ও অস্তরের কাছে কেউ লাগে না। বনেদী ক্ষীরের কাছে কন্‌ডেন্‌সড মিল্ক লাগে কখনও? দাও, একটা বিড়ি দাও।

চতুর্থ গাড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই তালুকদার হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত চালাইয়া বিড়ির কৌটাটি বাহির করিলেন। খুড়োকে একটি দিলেন, নিজেও ধরাইলেন।

তালুকদারের অঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত খাপ না খাইলেও যে পোশাক তিনি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা শিকারেরই উপযোগী। কালো রঙের হাফপ্যাণ্ট, খাকি রঙের হাফশার্ট, বাদামী রঙের বুট। তালুকদারের গলাটা একটু অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও ছিনে বলিয়া শোলার হ্যাটটা তেমন মানায় নাই। তা না মানাক, রোদ ঠিক আটকাইতেছিল। বিড়িটি ধরাইয়া তালুকদার পুনরায় চতুর্থ গাড়ির দিকে চাহিলেন।

চতুর্থ গাড়িতে ছিল লছমনিয়া, কাদম্বিনী, কালীর মা। ভিকুও এই গাড়িটার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া আসিতেছিল। প্রায় শেষের দিকের একখানা গাড়িতে নীলমণিও বিশ্বম্ভরের সহিত বসিয়া কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিল না। অত দূরে কি থাকা যায়!

তালুকদারের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লছমনিয়া মুচকি হাসিয়া কাদম্বিনীর কানে কানে কি যেন বলিল।

কাদম্বিনী ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল, বউ মরে গিয়ে অবধি হ্যাংলা হয়ে উঠেছে মুখপোড়া।

কালীর মা একবার লছমনিয়া এবং একবার তালুকদারের মুখের পানে চাহিল। তাহার মনে কোন ঈর্ষা ঘনাইয়া উঠিল কি না, বোঝা শক্ত। কারণ মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত হইবার মত মুখ তাহার নয়। তবু অকারণে সে তাহার থান কাপড়ের ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া গায়ে কাপড়-চোপড় টানিয়া সরিয়া বসিল।

পঞ্চম গাড়ি জিনিসপত্রে বোঝাই।

ষষ্ঠ গাড়িতে ছিল গোটা দুই বিছানার বাণ্ডিল এবং তাহার উপর বসিয়া ছিল হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে। হরুর মাথায় লাল শালুর প্রকাণ্ড পাগড়ি, দেহ অনাবৃত। তাহার ক্ষীণ কটি, পেশীসমৃদ্ধ উরস্ সত্যই দেখিবার মত বস্তু। পরনের কাপড়খানি পরিষ্কার এবং বেশ আঁটসাঁট

করিয়া পরা। দক্ষিণ-বাহুতে একটা মোটা রূপার তাগা। পাকা পুষ্ট গোঁফজোড়াতে তা দিতে দিতে হরু মণ্ডল গাড়োয়ান রহমনের সহিত চাষবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, আর এক পশলা বৃষ্টি না হলে তো সব গেল হে রহমন!

সে কথা আর বলতে!—রহমন গরু দুইটির পেটের তলায় পা চালাইয়া দিয়া হরু মণ্ডলের মুখের পানে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল।

হরু মণ্ডল তাহার সে হাসি দেখিতে পাইল না। সে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। রৌদ্রের প্রখর তাপে মাটি যেন ফাটিয়া যাইতেছে। সহসা একটা ছোট মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চতুর্দিক স্নিগ্ধ ছায়ায় ভরিয়া উঠিল।

সপ্তম গাড়িও জিনিসপত্রে ভর্তি।

অষ্টম গাড়িতে ছিল নীলমণি ও বিশ্বম্ভর।

আপন আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নীলমণি সম্ভবত চুপ করিয়া একধারে চোখ বুঝিয়া পড়িয়া ছিল। চোখ খুলিয়া থাকিলেই বিশ্বম্ভরটার সহিত বকর বকর করিতে হইবে। ঘুমের ভাণ করাই ভাল। তাহা ছাড়া এক চটকা যদি ঘুমাইয়া লইতে পারা যায়, লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কলমিপুরের মাঠে বড়বাবু সারারাত যে কি কাণ্ড করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। হয়তো সারারাত ঘুমানোই যাইবে না।

বিশ্বম্ভর গাড়োয়ানটার সহিত বচসা বাধাইবার চেষ্টায় ছিল। তখুনি বললাম তোমাকে, এগিয়ে নাও গাড়িখানা! ধুলো খেতে খেতে চলতে হবে এখন সারা পথটা! যেমন গরু, তেমনই গাড়োয়ান! গরুগুলোকে খেতে-টেতে দাও কিছু, না খাটিয়েই চলেছ কেবল দিন-রাত!

দীনু গাড়োয়ান খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। অতিশয় নরম কণ্ঠেই জবাব দিল, খেতে দিই বইকি।

বিশ্বম্ভর উষ্ণতর কণ্ঠে বলিল, খেতে দাও! মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাও নি তুমি? খেতে দিলে গরুর অমন পাঁজরা বেরোয়?

দীনু কোন জবাব দিল না। কারণ বিশ্বম্ভরকে সে চিনিত। এবং নীলমণি দীনুকে চিনিত বলিয়া বিশ্বম্ভরকে লইয়া দীনুর গাড়িটাতেই চড়িয়াছে। নীলমণি একধারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া সব শুনিতেছিল।

শেষ গাড়ি দুইখানা অধিকার করিয়া ছিল কুঞ্জলালের দল।

বীরেন নানা অসুবিধার মধ্যেও আগের দিনের খবরের কাগজখানা পড়িতেছিল। খবরের কাগজ না পড়িলে তাহার চলে না। গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে সে চেকোস্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল।

কুঞ্জ বাজাইতেছিল বাঁশী।

সূর্য মেঘাচ্ছন্ন, চতুর্দিক ছায়াময়। পথে একটা বুড়ী গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারের একটা গাছ হইতে হলুদ রঙের সুন্দর একটা পাখী উড়িয়া গিয়া মাঠের ঘনপত্রাচ্ছাদিত একটা গাছের ভিতর আত্মগোপন করিল।

হাবুল বলিল, কি সুন্দর একটা হলদে পাখী উড়ে গেল, দেখলি?

কি পাখী বল তো ওটা?

বীরেন পাখীটা দেখে নাই; তবু বলিল, দোয়েল।

পাঁচু বলিল, কই, আমি দেখতে পেলাম না তো!

হাবুল হাসিয়া জবাব দিল, তুই বঙ্কুর পানে চেয়েই তন্ময় হয়ে আছিস, অন্য কিছু দেখবার আর কি অবসর আছে তোর?

পাঁচু বঙ্কুর দিকে চাহিয়া বলিল, মাইরি বঙ্কু, তোকে দেখে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করছে—

বঙ্কুবিহারী চলিয়াছে চাপিয়া গরুর গাড়ি,
ফুরফুরে হাওয়াতে উড়িতেছে ছাগল-দাড়ি।

কুঞ্জ বাঁশী থামাইয়া বলিল, দাড়ি কত রকমের আছে জানিস? হিন্দিতে ভারী চমৎকার একটা শ্লোক আছে দাড়ির।

কুঞ্জর মামা মজঃফরপুরে চাকরি করেন। কুঞ্জ সেখানে কিছুদিন ছিলও। সুতরাং তাহার কথার মূল্য আছে।

হাবুল বলিল, কি শ্লোক, শুনি না!

কুঞ্জ বলিল, এক দাড়ি চুটুক পুটুক, এক দাড়ি তক্কো
এক দাড়ি মন্‌মহেশ এক দাড়ি বভ্‌ভো!

এর মানে?

মানে তো সোজা। চটুক পুটুক মানে ছিটেফোঁটা, এখানে একগাছা ওখান একগাছা। তক্কো মানে ছোট্ট ছাগল-দাড়ি, যেমন আমাদের বঙ্কুর। মন্‌মহেশ হচ্ছে—বেশ গালভরা ঘন দাড়ি, কিন্তু বে-এক্তার নয়, আর বভ্‌ভো হচ্ছে একেবারে—

কুঞ্জ ঠিক উপযুক্ত কথাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বীরেন খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিল, এপিক ব্যাপার, অর্থাৎ অ-নাভি।

ঠিক বলেছিস। গোঁফেরও একটা শ্লোক আছে—

দই চপচপ কেলা মোচা
ভঁইসা শিঙ্গা উপর খোঁচা
মধ্যে শূন্য নেয়াপাতি

পাঁচটি প্রকার গোঁফের জাতি।

কুঞ্জ এই শ্লোকটিরও হয়তো বিশদ ব্যাখ্যা করিত, কিন্তু পাঁচুর জ্বালায় হইল না।

সে বলিয়া বসিল. আমার আবার একটা মিল মনে এসেছে।—হে বঙ্কু চক্কো, দাড়ি তব তক্কো।

বঙ্কু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে, কিছুতে চটিবে না। তবু তাহার উপরের অসম্পূর্ণ ঠোঁটটা একটু কুঞ্চিত হইল এবং তাহা দেখিয়া হাবুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন খবরের কাগজের একখানা পাতা উল্টাইয়া বলিল, ওহে, আবার একটা মেয়ে লেকে ডুবেছে।

হাবুল বলিল, এবার কলকাতায় গেলে লেকের জল খানিকটা নিয়ে আসব মাইরি বোতলে পুরে। আমাদের পাড়ার মন্টিটার মাঝে মাঝে ফিট হয়, লেকের জল মাথায় ছিটোলে হয়তো সেরে যেতে পারে।

বীরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, জলে অ্যামোনিয়ার যতটা কন্সেন্‌ট্রেশন হলে ফিট ছাড়ে, লেকের জলে ততটা এখনও হয়নি বোধ হয়। মড়া পচবার তো আর অবসর দিচ্ছে না, তুলে ফেলছে কিম্বা ভেসে উঠছে।

হাবুল কৌতুকটার রাসায়নিক অংশটা ঠিক ধরিতে পারিল না। তবু বলিল, যতটা হয়েছে তাই যথেষ্ট।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

উর্দিটুর্দি পরিয়া জগদেও পাঁড়ে ও কিশোর সিং সকলের পিছনে লাঠি কাঁধে করিয়া আসিতেছিল। উভয়ে নিম্নস্বরে কি কথাবার্তা বলিতেছিল, ঠিক শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু তরুণ যুবক কিশোর সিংয়ের সমস্ত মুখে একটা সশ্রদ্ধ অবহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেন কোন তরুণ ছাত্র প্রবীণ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছে।

সহসা পিছনের গাড়ির গাড়োয়ানটাকে লক্ষ্য করিয়া জগদেও পাঁড়ে আদেশ করিল, গাড়ি বাঁয়ে করো। যানে দো ই লোককো।

কতকগুলি সাঁওতাল ও সাঁওতাল-রমণী যাইতেছিল। একজন সাঁওতালের কাঁধে একটা বাঁক। বাঁকের এক ধারে একটা চুপড়িতে জিনিসপত্র এবং অন্য ধারে একটি ছোট ছেলে। ছেলেটি বেশ নির্ভয়ে বাঁকে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে।

হাবুল কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। দুইটি সাঁওতাল-মেয়ে হাসিতে হাসিতে ছুটিতে আগাইয়া গেল।

বীরেনের হঠাৎ মনে পড়িল, বাদল ডাক্তারকে তো দেখা যাইতেছে না! সে কি তাহা হইলে—

বীরেন কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া পাঁড়েজিকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু কি হাতীতে গেছেন?

জগদেও প্রথমে হিন্দিতেই বলিল, ডাক্‌টারবাবু ফটফটিয়ামে সওয়ার হো কর বাতাসপুর গয়ে হেঁ রোগী দেখনেকে লিয়ে। তাহার পর কি মনে করিয়া বাংলাতে বক্তব্যটা শেষ করিল, সেইখানসে হামাদের সং লিবেন।

বীরেন এই বার্তায় খুশি হইল। সে গরুর গাড়িতে যাইতেছে, অথচ ডাক্তারবাবু হাতীতে গিয়াছেন—এই বার্তা বীরেনের পক্ষে কষ্টকর হইত। তাহার অপেক্ষা অনেক ছোট এক মাসতুতো ভাইয়ের সহপাঠী এই ডাক্তারটি। ডাক্তার বলিয়াই এত প্রতিপত্তি, তাহা না হইলে—

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে বীরেন পুনরায় কাগজে মন দিল।

আকাশের যে মেঘখানা সূর্যকে আবৃত করিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেল, চতুর্দিক আবার রৌদ্রালোকিত হইয়া উঠিল।

।। দুই।।

রতনদীঘির পাড়ে মেজ মায়েব পালকি নামানো হইয়াছে। গিন্নীমা এবং বড়বউ পালকি থামান নাই, সোজা চলিয়া গিয়াছেন। গিন্নীমার সহিত জিতুর মার পালকিটাও গিয়াছে মেজমা কিন্তু পারিলেন না। বেয়ারাগুলিব ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং নিদারুণ রৌদ্র দেখিয়া রতনদীঘির পাড়ে বটগাছটার তলায় পালকিটা নামাইতে বলিলেন। বেচারীরা ঠাণ্ডায় একটু বিশ্রাম করিয়া লউক, এই কাঠফাটা রোদে তাতিয়া পুড়িয়া একেবারে ঝলসাইয়া গিয়াছে যেন সকলে।

রতনদীঘির পানে চাহিয়া মেজমা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রকাণ্ড দীঘি। কাকচক্ষু স্বচ্ছ কালো জল টলমল করিতেছে, চাহিয়া থাকিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ওপারের ঘাটটায একজন বধূ স্নান করিতেছে, ঘাটের উপর চকচকে পিতলের কলসীটি বসানো রহিয়াছে। ওধারের ঢালু সবুজ পাহাড়টায় একদল ছাতারে পাখী কলরব করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইযা আহার সংগ্রহ করিতেছে। আরও ওদিকে ফাঁকা মাঠে রৌদ্রতপ্ত শূন্যটা যেন কাঁপিতেছে, সেতারের তারে জোরে ঝঙ্কার দিলে তারগুলা যেমন কাঁপিতে থাকে, অনেকটা তেমনই।

সহসা মেজমার হুঁশ হইল, টোকনটা কোথায় গেল? গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ওই যে, ছেলে শিকার করিতেছে। ফড়িং শিকার হইতেছে।

বটগাছটার ওধারে ছোট একটু মাঠের মত, সেখানে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানা বিচিত্র রঙের ফড়িং ঠিক ছোট ছোট এরোপ্লেনের মত উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঠটা চোরকাঁটায় ভর্ত্তি শুকনো শুকনো মরা মরা আরও কি যেন অসংখ্য গাছ রহিয়াছে। ফড়িংগুলা তাহাদের ডালে বসিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। এক একটা আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াও থাকিতেছে। কিন্তু কেহই টোকনের নাগালের মধ্যে আসিতেছে না, বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক হইতে না হইতেই উড়িয়া যাইতেছে। টোকন পা টিপিয়া আগাইয়া গিয়া উপবিষ্ট একটা ফড়িংকে টিপ করিতেছিল, এমন সময় মেজমা ডাকিলেন, ওরে, যেখানে সেখানে কাঁটাবনে যাসনি তুই, এদিকে আয়।

টোকনের হাত কাঁপিয়া গেল, ফড়িং উড়িয়া গেল। টোকন বন্দুক-সুদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া মেজমার গলা জড়াইয়া মাটিতে পা ঠুকিতে লাগিল, কেন তুমি ডাকলে, উড়ে গেল ফড়িংটা!

আর রোদে রোদে ঘুরতে হবে না, পালকির ভেতর বস এসে। মেজমা একরূপ জোর করিয়াই টোকনকে টানিয়া ভিতরে বসাইলেন। কি ভীষণ রোদ! এইটুকুর মধ্যেই ছেলের মুখ

লাল হইয়া উঠিয়াছে, টোকনের প্যান্ট হইতে চোরকাঁটাগুলি ছাড়াইয়া দিয়া মেজমা বলিলেন, টোকন, শম্ভু সিংকে জিজ্ঞেস কর তো, বাবুদের হাতী কতক্ষণ আগে চলে গেছে!

শম্ভু সিং নামক বিরাটকায় সশস্ত্র সিপাহীটি পালকির তত্ত্বাবধায়ক-রূপে অশ্বপৃষ্ঠে সঙ্গে আসিয়াছে। প্রত্যেক পালকির সঙ্গেই একজন করিয়া অশ্বারোহী সশস্ত্র সিপাহী আছে। শম্ভু সিং অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জিরাইতেছিল। টোকনের কথা শুনিয়া সে বলিল, এক ঘণ্টা আগে হাতী চলিয়া গিয়াছে। মেজমা একটু চিন্তিত হইলেন। বদ মেজাজী নূতন হাতীটার পিঠে মেজবাবু চড়িয়াছেন। তাঁহার সহিত আবার চাঁপাটাও আছে। হাতীটা মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যায়। কি যে হইল, জানিবার জন্য তাঁহার মনটা উসখুস করিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, বেয়ারাগুলাকে ডাকাইয়া পালকি উঠাইতে বলেন; কিন্তু আবার তখনই মনে হইল, অন্য পালকিগুলি পিছাইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ফেলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে! ভগবান তাঁহাকে তো আর বড়দির মত নিশ্চিন্ত মন দেন নাই! ঊষা, মীনা, তরঙ্গিণী তিনজনই সমান। উহাদের পিছনে ফেলিয়া গিয়া কি মেজমা কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! জামাই এবং হীরেন অবশ্য ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া উহাদের পিছু পিছুই আসিতেছে। কিন্তু উহারাও তো ছেলেমানুষ এবং সব কয়টিই হুজুগে। একটা পালকিতে প্রবীণ ঠাকুরদা এবং ঠানদি আছেন অবশ্য, কিন্তু তাঁহারা কি উহাদের সামলাইতে পারিবেন!

সুতরাং মেজমা চিন্তিত মুখে অপর পালকিগুলির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন।

টোকন আবার বোধ হয় ফড়িং শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দেখ, দেখ মেজমা, ওটা কি?

মেজমা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, বেশ বড় ,কটা বহুরূপী। সমস্ত দেহটা কুচকুচে কালো, কেবল গলার কাছটা টকটকে লাল। একটা ছোট ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সামনেব পায়ে ভর দিয়া গলাটা উঁচু করিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতেছে।

মেজমা বলিলেন, ও গিরগিটি।

টোকন সভয়ে বিস্ময়ে মেজমার কাছ ঘেঁষিয়া জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

কামড়ায়?

না। ফের যাচ্ছিস তুই ওদিকে? না, মারতে হবে না ওকে। টোকনকে টানিয়া পুনরায় তিনি পালকির ভিতর বসাইলেন ও আঁচল দিয়া মুখটা মুছাইয়া দিলেন।

এমন সময় ঠাকুরদা ও ঠানদির পালকি আসিয়া হাজির হইল। পালকি নামাইতেই ঠানদি বাহির হইয়া মেজমার পালকির নিকট আসিয়া বলিলেন, কি ভাই, বসে আছ যে?

আপনাদের অপেক্ষায়। ওরা সব কই?

ওরা কি আর আমাদের মত, আমগাছে উঠেছে ওরা।

আমগাছে, বলেন কি? কে কে উঠেছে?

হীরেন আর ঊষা তো উঠেছে দেখে এলাম, মীনাকে ওঠাবার জন্যে সাধাসাধি করছে।

আর তরঙ্গিণী?

সে খিলখিল করে হাসছে আর আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়।

মেজমা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, সত্যি, এরা যেন সব কি! একটু যদি হস্‌সি-দিগ্‌ঘি জ্ঞান আছে কারুর বাপু!

ঠানদি বলিলেন, ওরা সব আর জন্মে বাঁদর ছিল, এ জন্মে নেজটি খসেছে খালি।

আপনি নিয়ে এলেন না কেন ওদের ধরে?

আমার কথা শুনলে তো! তা ছাড়া আমি একটু তাড়াতাড়িই চলে এলুম রতনদীঘিতে নাইব বলে। একটা ডুব দিয়ে না নিলে মাথা ধরে যাবে আমার। চিরকাল সকালে নাওয়া অভ্যেস তো। ওগো, আমার পুঁটুলিটা কোথা, দাও তো, নেয়ে নিই।

এই যে।

ত্রস্ত ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরদা সকলের কাছে ঠানদিকে যেরূপ ভয়াবহরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন, ঠানদি মোটেই সেরূপ নহেন। ছোটখাটো মানুষটি, চওড়া চওড়া গড়ন, পাড়ার ফাজিল ছেলেমেয়েরা আড়ালে নাম দিয়াছে—গুটকু। ধপধপে ফরসা রঙ, কপালের ঠিক মাঝখানটিতে টিপের আকারে ছোট্ট নীল একটি উলকি। মাথার চুলগুলি যদিও সব পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে এখনও জরার চিহ্ন নাই। ঠানদি এককালে অপরূপ রূপসী ছিলেন; পাকা আমটির মত এখনও যেন টুকটুক করিতেছেন। অথচ বেশ বাশভারী!

পুঁটুলি লইয়া ঠানদি বলিলেন, তেলের শিশিটা দাও।

ঢোক গিলিয়া ঠাকুরদা বলিলেন, তেলের শিশি কি আমাকে দিয়েছিলে?

বাঃ, তোমার হাতে দিলুম না। ফেলে এসেছ নাকি?

ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিলে তিনি দ্বিধা হইবেন না, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া ঠাকুরদা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। বাহিরের বারান্দার তাকটার উপরই যে তেলের শিশিটা রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি ছাড়া আর কে বেশি জানে! তথাপি পালকির ভিতরে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খুঁজিবার ভাণ করিতে লাগিলেন। কিছু তো একটা করিতে হইবে। দৃষ্টিটা তো এড়ানো যাক আপাতত।

পালকির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঠানদি বলিলেন, তোমার হাতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। এতক্কাল ধরে দেখছি তোমায়, তবু আমার জ্ঞান হল না।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর বসিয়া ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে'

রুখু নাইলে তো এখুনি মাথা ধরে যাবে আমার।

মেজমা টোকনকে বলিলেন, শম্ভু সিংকে বল তো ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের হাট থেকে নারকোল-তেল নিয়ে আসুক খানিকটা। এই টাকাটা ভাঙিয়ে দাম দিয়ে দিতে বলিস, কেড়ে কুড়ে না আনে যেন।

ঘোড়া ছুটাইয়া শম্ভু সিং রওনা হইয়া গেল।

ঠানদি মেজমার পালকির নিকট বসিয়া আজ পর্যন্ত ঠাকুরদা কত জিনিস হারাইয়াছেন এবং নষ্ট করিয়াছেন, তাহারই একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজের সম্বন্ধে নানারূপ অত্যুক্তি স্বকর্ণে শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। বরং এমন একটা ভাব ধারণ করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি বধির, কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই শম্ভু সিং তেল আনিয়া হাজির করিল। মাথায় তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঠানদি পালকিটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমিও তেল মেখে চান করে নাও না।

গলাটা বাড়াইয়া ভালমানুষটির মত ঠাকুরদা বলিলেন, আমাকে বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে নয় তো আর কাকে বলব? আমসির মত শুকিয়ে থাকতে ভালও তো লাগে! চান করে নাও।

এই যে নিই।

ঠাকুরদা বাহির হইয়া আসিলেন।

ঠানদি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, খুঁড়িয়ে হাঁটছ যে?

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের গাঁটটায় একটু ব্যথা হয়েছে।— অত্যন্ত সকরুণ দৃষ্টিতে ঠাকুরদা ঠানদির মুখের পানে চাহিলেন। ভাবটা যেন, দোহাই তোমার, আর কিছু বলিও না।

ঠানদি ক্ষণকাল ঠাকুরদার কুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, হবে না! কাল রাত্তিরে পই পই করে মানা করলাম, পূব দিকের জানালাটা খুলে শুয়ো না। বেতো শরীরে কি ওসব সয়? দরকার নেই চান করে।

ঠাকুরদা সুট করিয়া পালকির মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন।

ঠানদি স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় হৈ হৈ করিয়া ঊষা মীনা তরঙ্গিণীর পালকি এবং তাহাদের পিছনে পিছনে অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন হীরেন আসিয়া পড়িল। দুইজনেরই পিঠে বন্দুক বাঁধা এবং পরনে ব্রিচেস প্রভৃতি সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুরেন ছেলেটি প্রিয়দর্শন, কিন্তু কালো। মুখখানি কচি-কচি। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার কামানো থাকাতে আরও কচি দেখায়। তাহার চালচলন কথাবার্তায় সহসা বুঝিবার উপায় নাই যে, সে বিলাতফেরত এবং ব্যারিস্টার। অর্থাৎ সুরেন সেই শ্রেণীর চতুর বিলাতফেরত, যাহারা কথায় কথায় নাসাকে কুঞ্চিত হইতে দেয় না। নাকের উপর রীতিমত 'কন্‌ট্রোল' আছে। তাহার যে কোন চাল নাই, এই প্রশংসনীয় ধারণাটা লোকের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য সে অহরহ সচেষ্ট। তাহার অতিশয় সাদাসিধা দেশী ব্যবহারটা যে স্বাভাবিক নয়, তাহা একটু নজর করিলেই ধরা পড়ে।

যখন তখন যাহার তাহার বাড়িতে গিয়া আড্ডা দেওয়া, মুড়ি মুড়কি গুড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, টোকনের সহিত কারণে অকারণে খুনসুড়ি করা, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, যেখানে সেখানে ধপ করিয়া বসিয়া পড়া, শাশুড়ীদের কাছে ছেলের মত আবদার করা, শ্বশুরদের সম্মুখে সিগারেট না খাওয়া, ঠাকুরঘরে প্রণাম করা এবং ঠাকুমার দেওয়া ষষ্ঠীপূজার টিপটা কপালে ধারণ করিয়া সকলের সম্মুখে উন্নত মস্তকে ঘুরিয়া বেড়ানো প্রভৃতি আধুনিক অব্যারিস্টারসুলভ আচরণ সুরেন সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করে এবং সেইরূপ নিখুঁতভাবে করিতে চেষ্টা করে, যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ও নিখুঁতভাব সে একদা সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার এই চালহীনতাটাও একটা চাল। ব্যারিস্টার সমাজের ডিনার-পার্টিতে যে এই ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে কাঁটা চামচ ধরিয়া নিখুঁত পদ্ধতিতে আহার সমাধা করিতে পারে, অতিশয় ঔদাসীন্যভরে অতিশয় দামী মদ অতিশয় মুখরোচক বুকনি সহযোগে পার করিতে পারে, টাই কলার শার্ট হ্যাট মোজা জুতার অতি-আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে এই ব্যক্তিটিরই নখদর্পণে অর্থাৎ এই ন্যালাক্ষ্যাপা গোছের জামাইটিই যে স্বসমাজে পুরাদস্তুর সাহেব, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তরের, অন্তস্তলে সে সাহেব না বাঙালী, তাহা সে নিজেও বোধ হয় ঠিক জানে না। যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও এখনও ঘটে নাই। যখন যেখানে যাহা মানায়, তাহাই ঠিকভাবে করিয়া যাওয়াটাই এখন জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যান', সুরেন তাহাই। সুরবোধ আছে, বেসুরা অথবা বেফাঁস কিছু করিবার ছেলে সে নয়।

হীরেন ছোকরাটি ঠিক ইহার বিপরীত। অনাবৃত চালিয়াৎ। সুরেনের মত অকারণে একটা আবরণের বোঝা বহিতে সে প্রস্তুত নয়। সে যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., সে যে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সে যে বড়লোকের ছেলে, সে যে রূপবান, সে যে ভাল খেলোয়াড়—অর্থাৎ গল্পের আদর্শ নায়ক হইবার সমস্ত যোগ্যতাই যে তাহার আছে, তাহা অনর্থক লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না। হীরেন যে ঘোড়সওয়ার, তাহা সকলেই অনেক আগে জানিত, কিন্তু সুরেনও যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এবং হীরেনের অপেক্ষা ভাল করিয়া পারে, তাহা জানা গিয়াছে আজ সকালে। সুরেনের হাতীতেই যাইবার কথা ছিল, কিন্তু হীরেন ঘোড়ায় যাইবে শুনিয়া সেও ঘোড়ায় আসিয়াছে। উষার প্রতি হীরেন যে আকৃষ্ট, তাহা লুকানো নাই। কিন্তু উষার প্রতি সুরেনের সত্য মনোভাবটা যে কি, তাহা কেহ ঠিক জানে না, এমন কি উষাও না। যেরূপ সহৃদয় কর্তব্যপরায়ণতার সহিত উষার সর্বপ্রকার শখ ও দাবি সুরেন মিটাইয়া দেয়, তাহাতে অন্য কিছু মনে করা অসম্ভব। তা ছাড়া স্বামীর মনোলোকের নিগূঢ় খবর লইবার মত মননশীলতা উষার এখনও হয় নাই। স্বামীর ঐশ্বর্য ও বাহ্যরূপ লইয়াই উষা মত্ত।

পালকি নামাইতেই উষা, মীনা এবং তরঙ্গিণী আসিয়া মেজমার পালকি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উষার দামী ঢাকাইখানা খোঁচ লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তরঙ্গিণীর কোঁচড়ে এক কোঁচড় আম।

মীনার চোখ মুখ হাস্যপ্রদীপ্ত, কিন্তু তাহার বেশবাস বিস্রস্ত হয় নাই, সুরেনের উৎসাহ সত্ত্বেও সে গাছে চড়ে নাই।

দামী কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ঊষা খুব যে দুঃখিত, তাহা মনে হইতেছে না। বরং খুশিতে তাহার চোখ মুখ ঝলমল করিতেছে। আসিয়াই হাত মুখ নাড়িয়া মেজমাকে বলিতে শুরু করিয়া দিল, উঃ মেজমা, তুমি যদি দেখতে, রাস্তার ধারে একটা গাছে সে কি আম! পেড়ে এনেছি আমরা।

মেজমা চটিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তা ছাড়া সুরেন কাছেই ঘোড়ার উপর রহিয়াছে, হয়তো কি মনে করিবে! তাই তিনি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া বলিলেন, বেশ করেছ! এইবার চল সব, এখনও ঢের দূর যেতে হবে।

তরঙ্গিণী কোঁচড় হইতে আম বাহির করিল। মেজমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেখাইয়া বলিল, কেমন চমৎকার দেখতে দেখ মেজদি, যেন টুকটুক করছে।

মেজমা প্রলুব্ধ হইলেন না, প্রলুব্ধ হইল টোকন। সে দুই হাতে দুইটা আম লইয়া পালকির ওপাশে চলিয়া গেল। সুরেন ঘোড়াটা একটু আগাইয়া লইয়া গিয়া ঠানদির সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিল।

ঠানদি, আপনি চলে এলেন, তা না হলে আরও আম আনতে পারতুম আমরা। বললাম, চড়ুন আপনি গাছে। এসব কি এদের কর্ম, পিঁপড়ের ভয়ে পালিয়ে এল সব।

নিজের দল ভারী হওয়াতে ঠাকুরদা সম্ভবত কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, আমি এর প্রতিবাদ করছি। পিঁপড়েরা পর্যন্ত উপেক্ষা করবে, এতটা নীরস এখনও হননি তোমাদের ঠানদি।

ঠানদি পুঁটুলি হইতে ছোট কাঠের আয়নাটি ও সিঁদুরের কৌটা বাহির করিয়া পাকা চুলে সিঁদুর পরিতেছিলেন। সিঁদুরটি পরিপাটিরূপে পরিয়া সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখন আমার সময় গেছে ভাই, যা খুশি বলে যাও, হাতী দঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়। চল্লিশ বছর আগে যদি আসতে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতুম। এখনও তার সাখী আছে একজন, জিজ্ঞেস কর।

যে ব্যক্তি গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখিয়াছে, গিরিশ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাহার যেমন মুখভাব হয়, ঠানদির যৌবন-প্রসঙ্গে ঠাকুরদাও তেমনই একটা গদ গদ মুখভাব করিয়া স্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

ঊষা আসিয়া বলিল, ঠাকুরদা, আম খাবেন?

উল্লসিত ঠাকুরদা বলিলেন, নিশ্চয়, সেই আশাতেই তো বসে আছি ভাই।

ঠানদি বক্র কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, এখন আবার অসময়ে আম খাওয়া কেন? অত্যেচার কর বলেই তো—

ঠাকুরদা যেন নিবিয়া গেলেন।

আচ্ছা, তবে থাক।

উষা আর মীনার চোখে চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল। উষা সরিয়া পড়িল। সকলেই ইহা জানিয়া ফেলিয়াছে, কোন যুবতী মেয়ের কাছে ঠানদি সহজে ঠাকুরদাকে ঘেঁষিতে দেন না। সম্পর্ক এবং ওজুহাত যাই হোক, কম-বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখিলেই ঠানদির মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

হীরেন ঘোড়া হইতে নামিয়া একটু দূরে ঘোড়ার পিঠের উপর ডান-হাতটা রাখিয়া আপন মনে শিস দিতেছিল এবং উষার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

সুরেন একটু সরিয়া যাওয়াতে মেজমা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরা কি বল দিকি! গাছে চড়েছিলি সব! তোর বয়েস দিন দিন কমছে না বাড়ছে? তুই সম্পর্কে শাশুড়ী না?

তরঙ্গিণী এমন একটা মুখভাব করিল, যেন সে নিরীহতার প্রতিমূর্ত্তি।

আমি তো চড়িনি, আমি তো বরং মানা করলুম ওদের। উষাকে তুমিই আদর দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছ যে, এখন শোনে নাকি কারও কথা? তা ছাড়া সুরেনই তো তুললে হুজুকটি; আমি কি করব?

তোমাকে যেন চিনি না আমি। ছোটবাবুকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও গিয়ে—

বা রে, ওরা চড়ল গাছে আর দোষ হল আমার?

মেজমা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পালকির ওধারে আম্র-ভক্ষণ-নিরত টোকনকে ধমক দিলেন, আমের রসে জামা-টামা সব এক করলে তো!

তরঙ্গিণী পাতলা ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী মেজ জাকে একটু ভেঙাইল। তাহার পর কোঁচড় হইতে মনোমত একটি আম বাছিয়া বাহির করিল এবং বোঁটার উলটা দিকে দাঁত দিয়া ছোট একটি ছিদ্র করিয়া চুষিতে লাগিল।

মীনা মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সে মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কেমন যেন একটা ভাষাহীন অস্বস্তি। তাহার অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল, যখন সুরেন তাহার কাছে আসিয়া বলিল, চল তো, আমরা দুজনে চুপি চুপি দীঘির ওধারটায় গিয়ে দেখে আসি, টুপ টুপ করে ডুব দিচ্ছে ওগুলো পানকৌড়ি, না পাতিহাঁস।

মীনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্য করিল এবং বলিল, যাবার দরকার নেই, ওগুলো পানকৌড়িই। হাঁস হতে বাধা কি?

মীনা উত্তর দিল না, শুধু একটু মুচকি হাসিল।

মেজমা মেজবাবুর জন্য মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পালকি উঠাইতে আদেশ করিলেন।

পানকৌড়ি-হাঁস-সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল।

সকলে আবার যাত্রা শুরু করিলেন।

।। তিন।।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

দীর্ঘ পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত প্রকৃতি আচ্ছন্ন। বড় বউ পালকির মধ্যে একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পালকি-বাহকেরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। গিন্নীমা ও জিতুর মা আগাইয়া গিয়াছেন। বড় বউ একা চলিয়াছেন—একেবারে একা। চারিদিকে কোথাও কেহ নাই। মাঠও জনশূন্য।

বড় বউ জীবনে এতক্ষণ ধরিয়া এমন একা আর কখনও থাকেন নাই। সারা জীবন ভিড়ের মধ্যে কাটিয়াছে, এমন নির্জন অবসর জীবনে আর কখনও আসে নাই। নিজের একক সত্তার নিঃসঙ্গ দৈন্যের পানে চাহিয়া বড় বউ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, কোথায় যাইতেছি আমি, কি করিতে যাইতেছি? অভিনয় করিতে? কাহার সম্মুখে? তাক লাগাইয়া দিব? কাহাকে? কেন? কি লাভ হইবে? অভিনয়-নৈপুণ্যে তাক লাগাইয়া দেওয়াটাই কি জীবনের পরমার্থ? সমস্ত জীবনটাই তো রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে কাটিয়াছে। নিত্যনূতন পাদ-প্রদীপ, নিত্য-নূতন দর্শক, নিত্যনূতন প্রসাধন, নিত্যনূতন ঐক্যতান, নিত্যনূতন ভূমিকা। কি লাভ হইয়াছে? অভিনয় হয়তো সফল হইয়াছে, দর্শকেরা হয়তো বিস্ময় মানিয়াছে, কিন্তু অন্তরবাসিনী ভিখারিণীর শূন্য ভিক্ষাপাত্র আজও তো শূন্য। কবে তাহা পূর্ণ হইবে? কে তাহা পূর্ণ করিবে? এই শূন্যতা আর কতকাল বহন করিতে হইবে?

পালকি-বাহকেরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিতেছে, ভিখারিণীর মত যদি ভিক্ষা করিতে পারিতে, হয়তো তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিত। আত্মসম্মানের ঝুটা অলঙ্কারে সারা জীবন নিজেকে রাজেন্দ্রাণী সাজাইয়া রাখিয়াছ। সকলে বাহবা দিয়াছে, ঈর্ষা করিয়াছে। কেহ ভালবাসে নাই, কেহ করুণা করে নাই। করিবে কি করিয়া? রাজেন্দ্রাণীকে কেহ কখনও করুণা করিবার সাহস করে? ভিখারিণী তো কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। ভিখারিণীর স্বরূপটা অবলুপ্ত করাই যে জীবনের সাধনা ছিল। আবার অভিনয়? আবার তাক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা?

সহসা তাঁহার মনে হইল, তিনি আজীবন উপবাস করিয়া আছেন, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কেন? কিসের অভাব তাঁহার? হাত বাড়াইয়া লইলেই তো হয়। লজ্জা করে? অনাহারে পিপাসায় সমস্ত অন্তর ছারখার হইয়া গেল, তবু লজ্জা? তবু অভিনয়? জীবনের কত পরম লগ্ন আসিল ও চলিয়া গেল। আর কয়টাই বা আসিবে? এখনও অভিনয়?

আবার হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। না, পারিব না। উঁচু মাথাটা ধুলায় লুটাইয়া দিতে কিছুতেই পারিব না। অভিনয়ই করিতে হইবে।

অন্তরদ্বার খুলিয়া দিলেই কি সে সেখানে প্রবেশ করিবে? নিশ্চয়তা কি? দ্বার খুলিয়া বসিয়া বসিয়া যদি রাত পোহাইয়া যায়? সে অপমান, সে লজ্জার অপেক্ষা দ্বার বন্ধ রাখাই ভাল। সত্যই যদি আসে, দ্বারে করাঘাত করুক।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে রিক্তশস্য শূন্য মাঠ ধু ধু করিতেছে। প্রখর রৌদ্র নির্মম হইয়া উঠিয়াছে। দূরে, অতি দূরে কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডাকিতেছে।

অতি সকরুণ মিনতি।

কাহাকে মিনতি করিতেছে?

বড় বউ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

।। চার।।

গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে।

প্রথমেই গোহুম্‌নিকে লইয়া বিরিঞ্চির গাড়িখানা আসিতেছিল। কিন্তু এখন প্রথমে যে গাড়িখানা আছে, তাহা বিরিঞ্চির নয়। দ্বিতীয় গাড়িখানিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কড়া রোদ উঠাতে স্থূলকায় তিনুর কষ্ট হইতেছে। তিনি ছাতা খুলিয়াছেন, একটি ভিজানো লাল গামছা টাকের উপর রাখিয়াছেন এবং এতৎসত্ত্বেও নিদারুণ রকম ঘামিতেছেন। মাথা হইতে গামছা নামাইয়া বারম্বার মুখ মুছিতে হইতেছে, কিন্তু মোছার সঙ্গে সঙ্গেই কপালে নাকে চিবুকে পুনরায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিতেছে। রোগা নিতাই ঘাড়টাকে একটু বাঁকাইয়া তিনুর ছাতার তলায় আশ্রয় লইয়াছে।

মুখটা গামছা দিয়া আর একবার মুছিয়া লইয়া স্থূলকায় তিনু বলিলেন, গাড়িতে চড়াই আমাদের দুর্বুদ্ধি হয়েছে। হেঁটে গেলেই হত। এ দশ ক্রোশ ইচ্ছে করলে ঘণ্টা চারেকে কাবার করে দেওয়া যায়। টিকিস টিকিস করে কতক্ষণে যে পৌঁছব!

নিতাই বলিল, তোমার বোধ হয় চার ঘণ্টাও লাগে না।

তিনু মনে মনে হৃষ্ট হইলেন। বলিলেন, আজকাল আর অতটা স্পীড নেই ভায়া। বয়স তো হচ্ছে।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, নিতাই ইহার প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু নিতাই একেবারে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

শিকার-টিকারের ব্যবস্থাটা কি রকম হয়েছে, শুনেছ? নীলু দত্ত তো আমাদের কিছু করতে দেবে না, নিজেই হামবাই হয়ে সব করছে।

তিনু মুখ মুছিয়া বলিলেন, মরুকগে।

আমার ইচ্ছে ছিল, মাচা-টাচাগুলো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাব। মাচা মজবুত না হলে মহা বিপদে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। বাঘ নিয়ে কারবার, বুঝছ না?

তিনু হয়তো বুঝিলেন, কিন্তু উদ্বিগ্ন হইলেন না। বলিলেন, তামাক সাজ আর এক ছিলিম।

কলিকায় তামাক ভরিতে ভরিতে নিতাই অবার বলিল, সেবারে সিঙ্গি বাবুদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। মধ্যম বাবু আর আমি ছিলাম একটি মাচাতে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। মধ্যম বাবু কি রকম ভারী ওজনের লোক জান তো? মাচাই গেল ভেঙে। দুজনায় ঠিক পড়লাম একেবারে বাঘের মুখটিতে। মধ্যম বাবুর তো একেবারে ফিট। ভাগ্যে আমি ছিলাম, টক করে উঠে মাটিতে দাঁড়িয়েই দিলাম দেগে এক গুলি বাছাধনের বুকে। বিকট গর্জন করে পড়লেন নালাটার ওপর উলটে।

নিতাইয়ের এসব কথা তিনু চাটুজ্জে কখনও বিশ্বাস করেন না, এখনও করিলেন না। মধ্যম বাবুর স্থূলতার উল্লেখে মনে মনে একটু চটিলেনও। নিজে কাঠির মত রোগা কিনা, তাই স্বাস্থ্যবান লোক দেখিলে মোটা বলিয়া ঠাট্টা করা হয়! বাঘের মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন, অথচ বাঘ উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে! দিতেও পারে, খাইবার মত উহার শরীরে কিই বা আছে! বড় জোর খড়কে হইতে পারে।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছু বলিলেন না, আর একবার মুখ মুছিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

নিতাই টিকা ধরাইতে ধরাইতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, নীলু দত্ত কি রকম ব্যবস্থা করেছে, শুনেছ কিছু?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনু অবশেষে বলিলেন, গোটা তিনেক মাচা তৈরি করাবে আর একটা মোষের বাচ্চাও নাকি বেঁধে রাখবে, এই তো বলেছিল আমাকে।

নাও, ধরাও।

তিনুর হাতে হুঁকাটা দিয়া চিন্তিত মুখে নিতাই বলিল, গেলেই হত নীলুর সঙ্গে। আনাড়ি লোক তো, কি করতে, কি করে বসে আছে হয়তো!

সম্মুখের মাঠটার উপর এক ঝাঁক টিয়াপাখী চক্রাকারে উড়িয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া তিনু চাটুজ্জে নীরবে তাম্রকূট সেবা করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। তিনি মাচা লইয়া মোটেই মাথা ঘামাইতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন বাকি খাজনাটার কথা। এতগুলা টাকা কি ছোটবাবু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইবেন? আগে চৌধুরীটাকে দুই চারি টাকা দিলেই কাজ হইয়া যাইত। এখন ছোটবাবুর আমলে সেসব হইবার উপায় নাই। ছোটবাবুকে কোন রকমে তোয়াজ করিবার জন্য শিকারে আসা। অকারণে এই

ছেলে-ছোকরাদের দলে মিশিয়া হৈ হৈ করিতে কোন দিনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষত আজকালকার ছোঁড়াগুলার রকম-সকমই বেয়াড়া ধরনের। মানীর মান রাখিয়া চলিতে জানে না। হয়তো ফস ফস করিয়া নাকের সামনে সিগারেটই টানিয়া দিবে। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর। দুশো বাহান্ন টাকা এগারো আনা—সহজ কথা নয় তো! নীলু দত্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই হুজুকের মুখে ছোটবাবু আইনের কঠিন গ্রন্থি হয়তো একটু শিথিল করিতে পারেন, এবং কলমিপুরের মাঠে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া ধরিলে হয়তো কাজটা হাঁসিল হইয়া যাইতে পারে। নীলু দত্তের আর একটা কথা মনে পড়াতে তিনু চাটুজ্জে ঘাড় বাঁকাইয়া তৃতীয় গাড়িটার দিকে একবার নজর করিলেন। হাঁ, ওই গাড়িতেই তো লছমনিয়া ছুঁড়িটা রহিয়াছে। নীলু দত্তের কথা সত্য হইলে ওই ছুঁড়িটাকে হাত করিতে পারিলেও কার্যোদ্ধার হইতে পারে। নীলুর মতে, উহার স্বামী ভিকুকে গভীর উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি ছোটবাবু খানসামা-পদে বাহাল করিয়াছেন। টাক হইতে গামছা নামাইয়া চাটুজ্জে মশাই আর একবার মুখ ও বগল মুছিলেন, আর একবার আড়চোখে (হুঁকায় মুখ রাখিয়া) লছমনিয়াকে দেখিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, সহজভাবে যদি কার্যোদ্ধার না হয়, শেষটা বাঁকা পথই ধরিতে হইবে। মেয়েটাকে গোটা দশেক টাকা খাওয়াইলেই চলিবে বোধ হয়।

দশটা টাকা কিছু নয়, কিন্তু ওসব নোংরামির মধ্যে যাইতেই কেমন গা-ঘিনঘিন করে চাটুজ্জে মশাইয়ের। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর।

নিতাই ভাবিতেছিল, মাচা তিনটায় কে কে বসিবে?

একটাতে জামাই, আর একটাতে হীরেন, আর একটাতে? তালুকদারটা তো বন্দুক উচাইয়া সঙ্গে আসিয়াছে, ওই নিশ্চয় বসিতে চাহিবে। কিন্তু শিকারের কি জানে ও? গাদা বন্দুকটার অহঙ্কারে গেল লোকটা। হয়তো উহারই সহিত তৃতীয় মাচাটায় বসিতে হইবে আমাকে। বসিব, কিন্তু অসহ্য।

এখন যে গাড়িটা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে তালুকদার বেশ একটু চিন্তিত হইয়াই বসিয়া ছিলেন। যদিও তিনি তৃতীয় গাড়িতেই বেশি নজর রাখিতেছিলেন এবং লছমনিয়ার হলুদ রঙের শাড়িখানার প্রতি ভাঁজটি প্রায় আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, গোহুম্‌নি সম্বন্ধেও তিনু উদাসীন ছিলেন না। গোহুম্‌নিকে লইয়া বিরিঞ্চিটা মাঠ ভাঙিয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হইল? বলিয়া গেল বটে, মাঠটার ওপারেই দৌলতপুরে তাহার বাড়ি এবং সে বাড়ি হইতে নিজের কাপড় গামছা আনিতে যাইতেছে। কিন্তু বিরিঞ্চিকে কে না চেনে! ও ব্যাটার অসাধ্য তো কিছুই নাই। তালুকদার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আর একবার লছমনিয়ারই পানে চাহিলেন।

কল্পনাবান হরিশ-খুড়োর হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান ছিল না। আবার তিনি বাঘের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তালুকদার তাঁহার গল্প শুনিতেছিল কি না, তাহাও আর তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন না। এইবার তিনি নানা রকম অসাধারণ বাঘের প্রসঙ্গ পড়িয়াছিলেন। বাঘ অনেক সময় আবার সাধক হয়, তা জানো তো? মানে মানুষকেও হার মানিয়ে দেয়।

একটি বাঘের কথা জানি আমি, কনখল অঞ্চলে আছে সেটি, অদ্ভুত সে বাঘ। বাইরের চেহারাতেই বাঘ, কিন্তু ভেতরে সে পরমহংস। দুটি বেলা গঙ্গায় নেমে আহ্নিক করে, থাবা তুলে জপ করে, মাছ মাংস খায় না, এক্কেবারে বিশুদ্ধ ফলাহারী। একবার হয়েছে কি, বাঘটা গঙ্গায় নেমে সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাবায় করে জল তুলে তুলে অর্ঘ্য দিচ্ছে, এমন সময় তা পুলিশসায়েবের নজরে পড়ে গেল। আর কথা আছে! বন্দুক তুলেই দিলেন ফায়ার করে। সায়েবের লক্ষ্য অব্যর্থ, গুলিও গিয়ে ঠিক বিঁধল মাথায়, কিন্তু বাঘ পড়ল না। ঠিক সামনে বসে বসে অর্ঘ্য দিয়ে যেতে লাগল। সায়েব তো অবাক। বাঘ অর্ঘ্য দেওয়া শেষ করে দুটি থাবা জুড়ে সূর্যপ্রণাম করলে, তারপর সায়েবের দিকে এক নজর চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল। পাণ্ডা ব্যাটারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, এতক্ষণ কিছু বলেনি। বাঘটা চলে গেলে সায়েবকে সব কথা খুলে বললে। সমস্ত কথা শুনে সায়েব হ্যাট তুলে বাঘের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালেন। আসল সায়েব-বাচ্চা কিনা, গুণের কদর জানে।

খুড়ো চুপ করিলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, কোন শাপভ্রষ্ট যোগী-টোগী সম্ভবত। তালুকদার একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন, লছমনিয়াটা তাঁহার দিকে অমন করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল কেন? খুড়ো একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বিড়িতে একটা টান দিয়া পুনরায় শুরু করিলেন, আর এক প্রকার বাঘ আছে, বুঝেছ তালুকদার?

হ্যাঁ বল, সব শুনে যাচ্ছি আমি।

আর এক প্রকার বাঘ আছে, যারা বহুরূপী। যখন যা ইচ্ছে রূপ ধারণ করতে পারে। সে বড় সঙিন ব্যাপার, বুঝেছ।

লছমনিয়া আবার ফিরিয়া বসিল।

তালুকদার নির্নিমেষ হইয়া গেলেন, খুড়োর কথায় সায় পর্যন্ত দিতে পারিলেন না। কিন্তু খুড়োর এখন এমন অবস্থা, কোন কিছুর আর অপেক্ষা রাখেন না তিনি। তিনি বলিয়া চলিলেন, সে বড় সঙিন ব্যাপার হে! মানুষের রূপ ধরে দিনের বেলা লোকালয়ে আসে, কিচ্ছু চেনবার জো নেই, একেবারে হুবহু মানুষ। কিন্তু নিশুতি রাত যেই হল, অমনই নিজমূর্তি ধারণ করলেন। সামনে যাকে পেলেন, ক্যাঁক করে ধরলেন, মট করে ঘাড়টি মুচড়ে আহারটি সমাধা করলেন, আবার দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধরে সাফ বেরিয়ে গেলেন। ধরবার-ছোঁবার জো নেই, বুঝলে?

বলে যাও না, সব শুনছি আমি।

মাঝে মাঝে মানুষ ছাগল গরু ভেড়া যে না-পাত্তা হয়ে যায়, আমার মনে হয়, এইই তার কারণ। অথচ পুলিশ এর কিছুই খবর রাখে না, জানেই না।

খুড়ো বিড়িতে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, আর এক রকম বাঘ আছে, যারা কীটের রূপ ধারণ করে বেড়ায়। ইংরিজীতে ছারপোকাকে তো বাঘ বলে জানই, কিন্তু ছারপোকাই যে শুধু বাঘ, তা নয়। মশা, এঁটুলি, উকুন, জোঁক— সব বাঘ। তা ছাড়া আরও কত আছে, বাঘের মহিমার কি শেষ আছে!

খুড়ো বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়া পুনরায় কল্পনায় তা দিতে লাগিলেন।

লছমনিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছিল। এদিকে ভিকু, ওদিকে তালুকদার। ভিকুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে লজ্জা করে, তালুকদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসা তো আরও অসম্ভব। মুখপোড়ার ড্যাবডেবে চোখ দুইটা যেন গিলিতে আসিতেছে।

কাদম্বিনী ঢুলিতেছিল।

কালীর মা আধ-ঘোমটা টানিয়া নির্বিকারভাবে পিছনের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

ইহার পরের গাড়িটা মালপত্রে বোঝাই।

তাহার ছোকরা গাড়োয়ানটা হয়তো লছমনিয়া কর্তৃক অভিভূত হইয়াই অসময়ে গলা ছাড়িয়া একটা হোলির গান ধরিয়াছে। তাহার পরের গাড়ি অর্থাৎ পঞ্চম গাড়িতে হরু মণ্ডল বর্শা হস্তে উন্নত মস্তকে সিধা বসিয়াছিল। মেরুদণ্ড এতটুকু বাঁকিয়া যায় নাই, সুগঠিত দেহটির কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নাই। সামান্য লাল শালুর পাগড়িটা রৌদ্রকিরণে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম গাড়িতে নীলমণি একাই শুইয়া ছিল।

দীনু গাড়োয়ানকে কিছুতেই উত্তেজিত করিতে না পারিয়া বিরক্ত বিশ্বম্ভর অবশেষে গাড়ি হইতে নামিয়া গিয়াছে। চুপচাপ নিরুত্তেজিতভাবে মন্থরগতি গরুর গাড়িতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা রোদে হাঁটিয়া যাওয়া ঢের ভাল। তবু খানিকটা গরম হওয়া যায়। ওই দীনুটা কি মানুষ! ওটাও গরু।

কুঞ্জলালের দল কিন্তু জমাইতেছিল।

নিদারুণ রৌদ্র সত্ত্বেও কুঞ্জলাল বাজাইতেছিল—মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে। বঙ্কু ছাড়া বাকি সকলেই কোবাসে গান ধরিয়াছিল, এমন কি গম্ভীর প্রকৃতির বীরেন পর্যন্ত। বঙ্কু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু সুরের মোহিনী-শক্তি আছে, বঙ্কু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ মাথা নাড়িয়া অন্যমনস্কভাবে মুখভঙ্গি করিতে করিতে হাঁটুতে তবলা বাজাইতে শুরু করিয়া দিল। হাবুল আর পাঁচুর চোখে চোখে একটা ইশারা হইয়া গেল, এবং সহসা সকলে একযোগে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বঙ্কু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেল।

জগদেও পাঁড়েও গানটা উপভোগ করিতেছিল। হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়াতে সে ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, বোন্, কোরলেন কেন? ফিনসে সুরু করুন।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

হাবুল বলিল, এই বঙ্কা, ফের বাজা।

রাগে বঙ্কুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে ঠিক করিয়াছে কিছুতে রাগিবে না। তাই মুখ গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ হাবুল বলিল, দেখ দেখ।

সকলে দেখিল, একদল পল্লীবধূ কোমরে কলসী লইয়া দূরের আলপথটা ধরিয়া মাঠের মাঝখানে একটা পুকুরের দিকে চলিয়াছে। তাহাদের পিছন পিছন একদল বাজনদার বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে।

পাঁচু বলিল, জল সইতে যাচ্ছে সব, বিয়ে বোধ হয় কারও বাড়িতে।

কুঞ্জলাল বলিল, হ্যাঁ রে বঙ্কা, তোর বিয়েতেও জল সইতে গেছল সব এমনি করে?

বিস্ময়ের সুরে হাবুল প্রশ্ন করিল, এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে? বঙ্কা বিয়ে করছে বলে জল সইতে যাবে না কেউ? কি যে বলিস তার ঠিক নেই!

পাঁচু মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতেছিল।

বঙ্কু চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চোখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

পাঁচ।।

ফাঁকা মাঠ।

বিরিঞ্চির গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাল তেজী বয়েল ঘোড়ার মতন ছুটিতেছে। গোহুম্‌নি তখনও নির্বিকারভাবে চিনাবাদাম চিবাইতেছিল, একটি কথা বলে নাই। শেষ চিনাবাদামটি পরিপাটিরূপে ছাড়াইয়া এবং সেটি মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গোহুম্‌নি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরিঞ্চির দিকে চাহিল। বিরিঞ্চি দেখিতে পাইল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে গরু দুইটাকে হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

গোহুম্‌নি চিনাবাদামটি সম্পূর্ণরূপে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, এইবার বল দেখি, কোথায় চলেছিস তুই? কাপড়-গামছার কথা যে মিছে, তা তো গোড়াতেই বুঝেছি। গাড়ির ঝুলিতে তোর কাপড় গামছা রয়েছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। মতলব কি তোর?

বিরিঞ্চি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া গোহুম্‌নির দিকে চাহিল, কোন উত্তর দিল না। কেবল একটু ঝুঁকিয়া গরু দুইটার শিরদাঁড়ার উপর দুই হাত দিয়া সুড়সুড়ি দিয়া তাহাদের গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

জবাব দিচ্ছিস না যে?

বিরিঞ্চি আর একবার হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, জবাব দিল না।

গোহুম্‌নি তখন একটু আগাইয়া গিয়া বিরিঞ্চির পিছনের দিকের চুল ধরিয়া এক টান দিল।

শিগগির বল, কোথা নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?

বিরিঞ্চি এবারও কোন জবাব দিল না। কেবল প্রাণপণে বলদ দুইটাকে হাঁকাইতে লাগিল।

রৌদ্রতপ্ত নির্জন মাঠে হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, গোহুম্‌নির নীল শাড়ির আঁচলখানা হাওয়ায় উড়িতেছে, তেজী বলদ দুইটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, বিরিঞ্চি উন্মাদের মত তাহাদের হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

।। ছয় ।।

জলন্ধর বিলের ধার দিযা যে রাস্তাটা কালভৈরবেব মাঠ পার হইয়া নালতে গ্রামে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই রাস্তায় মোটর-বাইক হাঁকাইয়া ফট ফট ফট ফট শব্দ করিতে করিতে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া বাদল ডাক্তার চলিয়াছেন। বাতাসপুর হইতে রোগী দেখিয়া তিনি ফিরিতেছেন। সকলের সঙ্গে ভোরবেলা ডাক্তারবাবু বাহির হইতে পারেন নাই। বাতাসপুরের রোগীই অবশ্য তাহার একমাত্র কারণ নহে, আরও একটা নিগূঢ় কারণ ছিল—সকালের ডাকটা। সকালের ডাকটা কিছুদিন হইতে ডাক্তারবাবুর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ডাকটা না দেখিয়া বাহির হইলে কিছুতে স্বস্তি পান না। ডাকটা দেখিয়া কিন্তু তাঁহার অস্বস্তি আজ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যে চিঠিটা নিশ্চয় আসিবে মনে করিয়াছিলেন, সেইখানাই আসে নাই। আসিযাছে কতকগুলো বাজে বিজ্ঞাপন আর পিসীমার একখানা চিঠি। মায়াব চিঠি আসে নাই।

মায়া নাম্নী মেয়েটি (এখন অবশ্য মহিলাটি, কাবণ তিনি এম. এ. পাস এবং কিছুদিন হইতে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন) বাদল ডাক্তারের মামাতো দাদার বড় শালী। দাদার শালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সামাজিক অধিকার সকল ভ্রাতারই আছে এবং সে অধিকারের সুযোগ লইতে বাদল ডাক্তার কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু অধিকাবমদে মত্ত হইয়া একটি প্রয়োজনীয় সত্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নিদারুণ বজ্রাঘাতের মত সে সত্যটি সহসা একদিন তাঁহার সচেতন সত্তার নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। উভয়েরই গোত্র এক। দুইজনেই মুখোপাধ্যায় বংশসম্ভূত। পঞ্চবাণের পাঁচটা বাণই ভোঁতা হইয়া গেল।

গোত্র সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অবধি মায়ার মনও কেমন যেন গুটাইয়া গিয়াছে। বিপদের সম্ভাবনায় শামুক অথবা কাছিম যেমন মুখ গুটাইয়া লয়, অনেকটা তেমনই। নিকটে থাকিলে সংযত, শোভন এবং অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মায়া আজকাল আর বলে না। আগেও যে খুব বেশি বলিত, তাহা নয়; তবুও যাহা বলিত, তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রঙ থাকিত। আজকাল সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ফ্যাকাসে ধরনের হইয়া গিয়াছে। চিঠিপত্র যাহা লেখে, তাহা না লিখিলেও চলিত। অর্থাৎ মায়ার বঁড়শিতে যে মাছটি ধরা পড়িয়াছিল, শাস্ত্রে তাহা খাইতে মানা। সুতরাং বঁড়শিটি খুলিয়া সে মাছটিকে আবার জলে ছাড়িযা দিয়াছে। মাছ কিন্তু বঁড়শিটাকে ভুলিতে পারিতেছে না। মারাত্মক ক্ষতটা এখনও জ্বালা করিতেছে।

মায়ার অতি সাধারণ আমি-ভাল-আছি-আপনি-কেমন-আছেন গোছ চিঠির জন্যই বাদল ডাক্তার এখনও সমুৎসুক। বাদল ডাক্তারের চরিত্রে আর একটি মহৎ দোষ আছে। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখেন। নিতান্ত মন্দ লেখেন না, অন্তত মায়াকে মুগ্ধ করিয়া দিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ভাল।

জলন্ধর বিল প্রকাণ্ড বিল। খানিকটা শুকাইয়া এখন ডাঙা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এটুকুও ডুবিয়া যায়। ডাঙাব উপর গরু ভেড়া ছাগল শালিক একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে কয়েকটি হনুমানও একটা গাছে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। একটা নিভৃত অংশে কয়েকটি বক নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছে। বিলে মাছ খুব, মাঝে মাঝে দুই একটা লাফাইয়া উঠিতেছে। ওপারে একজোড়া মাণিকজোড় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর এক অংশে সারস-জাতীয় প্রকাণ্ড একটা পাখী এক পায়ের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক তাহার মাথার উপরে একটা শঙ্খচিল উড়িয়া বেড়াইতেছে, সে দিকে তাহার খেয়াল নাই। বিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কুমীর গা ভাসাইয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; না জানিলে মনে হইবে, একটা কাঠ ভাসিতেছে বুঝি। ঠিক তাহারই পাশে ভাসিতেছে প্রকাণ্ড সাদা একটা মেঘের ছায়া। দূরে জেলেদের জাল শুকাইতেছে। ছোট ছোট মাছ ধরিবার জন্য এক জায়গায় সারি সারি আড়া পাতা। তাহার কাছে জেলেরা নিজেদের প্রয়োজনে সারি সারি কয়েকটা বাঁশ পুঁতিয়াছে। তাহার একটাতে একটা ফিঙা এবং আর একটাতে একটা মাছরাঙা পাখী বসিয়া আছে।

নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রাখর্য্য জলন্ধর বিলে একটু যেন প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে। কোথায় যেন একটা চিল ডাকিতেছে। আর ডাকিতেছে ফটিক-জল—ফটি—ক জল। পাখীটিকে দেখা যায় না, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিয়াছে। বিশালকায় জলন্ধর বিলের বিচিত্র সৌন্দর্য কিন্তু বাদল ডাক্তরকে মোটেই আকৃষ্ট করিতেছে না। এইমাত্র যে মুমূর্ষু রোগীটি তিনি দেখিয়া আসিলেন, তাহার কথাও তাঁহার মনে নাই। বাদল ডাক্তার ভাবিতেছিলেন, এবার মায়াকে কবিতায় একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়? হয়তো উত্তর দিতে পারে। বেশ সরস ছোট্ট একটি কবিতা। কবিতার প্রথম লাইনটা কি হইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ফোঁস্‌স—

কল্পলোক হইতে সহসা কঠিন বাস্তবলোকে বাদল ডাক্তারকে নামিয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটা সাপ পাশের একটা ঝোপ হইতে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জলন্ধর বিলকে উপেক্ষা করিয়া অন্যমনস্ক লোকটা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া জলন্ধর বিলের আহত আত্মমর্যাদা যেন সক্রোধ গর্জন করিয়া উঠিয়াছে।

বাইকের গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া ঝড়ের মতন বেগে বাদল ডাক্তার জলন্ধর বিল পার হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তার বলিষ্ঠ লোক। প্রচুর খাইয়া এবং দুপুরে ঘুমাইয়া যদিও একটু মোটা হইয়াছেন, কিন্তু একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়েন নাই। ঢিলা-হাতা লংক্লথের পাঞ্জাবি পরিতে ভালবাসেন। এখনও তাহাই পরিয়া আছেন। পাঞ্জাবিতে হাওয়া ঢুকিয়া পিছন দিকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাদল ডাক্তার দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। আহা, এ সময় পাশে যদি মায়া থাকিত! 'সাইড্‌কার'-টা খালিই রহিয়াছে।

জলন্ধর বিল পার হইলেই কালভৈরবের মাঠ, মাঠটা পার হইলেই নালতে গ্রাম। নালতে গ্রামে হরিচরণ মাস্টার আছে, তাহার নিকট হইতে কাগজ যোগাড় করিতে হইবে। ফাউন্‌টেন পেন সঙ্গেই আছে।

।। সাত ।।

বিরিঞ্চির গাড়ি যখন নালতে গ্রামে ঢুকিল, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঢুকিতেই যে ডোবাটা আছে, তাহাতে গোটা কয়েক মহিষ কাদা মাখিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তীরে গোটা দুই রাখাল বালক ডাং-গুলি খেলিতেছে। নালতে গ্রামের বিলুবাগ্দী কাঁধে জাল ফেলিয়া জলন্ধর বিলে মাছ ধরিতে যাইতেছিল, সে বিরিঞ্চিকে চিনিত, তাহারই মুখে বিরিঞ্চি শুনিল যে, বাবুরা ঠিক ইহার পরের গ্রাম শঙ্করাতে অবস্থান করিতেছেন। জম্‌জম নামক বদমেজাজি হাতীটার নাকি সত্যসত্যই মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঝাংরু গ্রামের পুষ্করিণীতে হাতীটাকে নামাইয়া স্নান করাইতেছে। মেজবাবুকে নামিতে হইয়াছে। শঙ্করা-কাছারিতে ছোটবাবুর কাজ ছিল, তিনিও নামিয়াছেন। ভাইদের পিছনে ফেলিয়া বড়বাবু একা যাইতে রাজি হন নাই বলিযা তিনিও নামিয়া পড়িয়াছেন।

পোদ্দারের দোকানটা খোলা আছে হে?

বিলু বলিল, আছে।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইয়া নালতে গ্রামের বিলাস পোদ্দারের দোকান অভিমুখে যাত্রা করিল। বিলু চলিয়া গেল।

গোহুম্‌না চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

তাহার ডান গালটা রোদ লাগিয়াই সম্ভবত লাল হইয়া উঠিয়াছে। বেশবাস বিস্রস্ত। নীল চোখ দুইটা জ্বলিতেছে।

বিলু চলিয়া গেলে বিরিঞ্চি ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ঝাংরুকে কিছু বলিস না, কেমন? তোর চুড়ি আমি কিনে দিচ্ছি এখানেই। বলবি না তো?

গোহুম্‌না নীরব।

বিরিঞ্চি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, কটা চুড়ি ভেঙেছে তোর?

চারটে।

এখুনি কিনে দিচ্ছি আমি, ওই যে পোদ্দারের দোকান খোলাই আছে দেখছি।

আর একটু আগাইয়া রাস্তার পাশের ছোট মনিহারি দোকানটার সামনা-সামনি গিয়া বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইল।

গোহুম্‌নির হাতে যে চুড়িগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহা দেখাইয়া বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, এমনি ধারা চুড়ি তোমার আছে নাকি হে পোদ্দার?

পোদ্দার বিরিঞ্চির বন্ধুলোক। গোহুম্‌নির দিকে এক নজর চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, আছে বই কি, কত চাই?

বেশি নয়, গোটা চারেক।

পোদ্দার হাসিমুখে দুই তিন রকম মাপের লাল রেশমী চুড়ি বাহির করিল। গোহুম্‌না তাহার ভিতর হইতে চারটি বাছিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হাতে পরিয়া ফেলিল। ডান হাতে তিনটি এবং বাঁ হাতে একটি চুড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বিরিঞ্চি বলল, দাম কত?

দাম!

বিলাস পোদ্দার সম্মুখের সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া এবং আর একবার গোহুম্‌নার পানে চাহিয়া বলিল, ও চারগাছা চুড়ির আর কি দাম নোব তোমার সেঙাতনীর কাছ থেকে? সেটা কি ভাল দেখায়, কি বল তুমি?

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, তবে নিও না। তাহলে এবার চলি আমি।

আরে ভাই, একটু তামুক-টামুক খেয়ে যাও, নামই না!

না ভাই, বড় দেরী হয়ে গেছে। ফিরবার পথে নামব।

ভুলো না কিন্তুক।

আচ্ছা।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল।

গোহুম্‌না নীরবে বসিয়া রহিল।

নালতে গ্রাম পার হইয়া ছোট একটা মাঠ, তাহার পরই শঙ্করা গ্রাম। নালতে গ্রামের সীমান্তে কয়েকটা বড় বড় আমগাছ পথটাকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। গাছের তলায় তলায় বিরিঞ্চির গাড়ি চলিয়াছে। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

হঠাৎ গোহুম্‌না বলিল, গাড়ি থামা, নামব আমি।

কেন?

জল পিপাসা লেগেছে আমার।

গোহুম্‌না গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল।

বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইয়া বলিল, এখানে জল পাবি কোথা?

তুই একটুকু দাঁড়া, আমি গাঁয়ের ভেতর থেকে এক ছুটে খেয়ে আসি। পালাস না যেন!

পালাব কেন?

না, পালাবি না! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি। দেখি তোর গামছাখানা।

বিস্মিত বিরিঞ্চি বলিল, কেন?

দেখি না।

বিরিঞ্চি কোমর হইতে গামছাখানা খুলিয়া দিল।

এইবার তোর হাত দুটো দেখি।

বিরিঞ্চিকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া গোহুম্‌নি গামছা দিয়া বিরিঞ্চির হাত দুইখানা বাঁধিয়া ফেলিল।

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, এ কি?

আমার নিজের গামছা দিয়ে তোর পা দুটোও বাঁধব। পুরুষ লোককে বিশ্বাস আছে? চোখের আড়াল হলেই পালিয়ে যায়।—বলিয়া সে সত্যসত্যই নিজের ছোট পুঁটুলিটি

খুলিয়া গামছা বাহির করিল এবং বিরিঞ্চিকে আদেশের সুরে বলিল, নে, পা দুটো জড়ো কর শিগগিরি!

বিরিঞ্চির মজা লাগিতেছিল। সে হাসিয়া পা দুইটাও একসঙ্গে জড়ো করিয়া বসিল। গোহুম্না বেশ করিয়া তাহার পা দুইটাও বাঁধিল।

উঃ উঃ, লাগছে যে, কত জোরে বাঁধছিস?

বেশ করিয়া গেরোর উপর গেরো দিয়া গোহুম্না বলিল, বসে থাক চুপ করে।

তাহার নীল চক্ষু দুইটি সাপের চক্ষুর মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে।

বিরিঞ্চি বলিল, এমনি করে বসে থাকব নাকি?

থাক না, মজা পাবি—বলিয়া গোহুম্না একটা ইঁট কুড়াইল এবং সেটা সজোরে গাছের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিযা পলাইয়া গেল।

গাছে প্রকাণ্ড একটা ভীমরুলের চাক ছিল।

শঙ্করা গ্রামের কাজল দীঘি পুকুরে ঝাংরু জম্‌জমকে নামাইয়াছিল। কয়েক দিন স্নান করানো হয় নাই বলিয়াই হাতীটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘণ্টাখানেক জলে পড়িয়া থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। ঝংরু হাতীর কাঁধ হইতে নামে নাই। সে ডাঙশ লইয়া নিজের স্থানটিতে ঠিক বসিয়া ছিল। ঘাড়ে সওয়ার হইয়া থাকিলে হাতীর বাবার সাধ্য আছে তাহাকে ফেলিয়া দেয়! এঁটুলি যেমন করিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, ঝাংরু ঠিক তেমনিই ভাবে তাহার ঘাড়ে বসিয়া ছিল। হাতী ডুবিয়া যাইবার মত জল কাজল দীঘিতে ছিল না। জম্‌জম শুঁড়ে করিয়া জল লইয়া নিজের মাথায় এবং ঝাংরুর সর্বাঙ্গে ছিটাইতেছিল। তাহার ফোঁসফোঁসানি যদিও এখনও কমে নাই, কিন্তু জলে নামিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়াছে। মজা দেখিবার জন্য তীরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু ভিড় দেখিলে জম্‌জম পাছে আবার ক্ষেপিয়া উঠে, এইজন্য ঝাংরু তীরে কাহাকেও দাঁড়াইতে দেয় নাই। ঝাংরুর মানা সত্ত্বেও দুই চারিটা ছোঁড়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন মজার সন্ধান না পাইয়া তাহারাও একে একে সরিয়া পড়িয়াছে। তীর এখন নির্জন। অদূরে সারি সারি কয়েকটা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া সশব্দে তাহাদের পাতাগুলিকে নাড়া দিয়া যাইতেছে। পাশের একটা ঝোপ হইতে একটা নেউল বাহির হইল, এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল আবার ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাহির হইল এবং সেটাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েকটা বড় বড় প্রজাপতি ওধারের ঘেঁটুবনটায় উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। জলের ধারে কতকগুলি ঘল্‌ঘসে ফুলের গাছ। শুঁড়ের মতন বাঁকানো ডালের উপর সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ঠিক তাহাদেরই কাছে ঘাস পাতার জঙ্গলে জাল পাতিয়া একটি বিচিত্র রঙের মাকড়সা শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া আছে।

অদূরে জীর্ণ শিবমন্দিরটার দুয়ার বন্ধ। কেহ কোথাও নাই। জম্‌জম ক্রমাগত শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া তুলিযা মাথায় ঢালিতেছে। ঝাংরু তাহার কানে ডাঙশটা ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তাহার মাথাটা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে এবং হস্তীবোধ্য ভাষায় তাহার সহিত কি কথা বলিতেছে।

জম্‌জম সহসা খুব জোরে ফোঁস করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোহুম্‌নি পিছন দিক হইতে ঝাংরুকে জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোহুম্‌নি জলে নামিয়া পিছন দিক হইতে চুপিচুপি কখন হাতীতে চড়িয়াছে, ঝাংরু বুঝিতেও পারে নাই।

এ কি, তুই কোথা থেকে এলি?

পালিয়ে এলাম।

কোথা থেকে?

বিরিঞ্চির গাড়ি থেকে।

কেন?

বাবা রে বাবা, যে ভীমরুল সেখানে!

ভীমরুল!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভীমরুল। নালতে পেরিয়ে একটা আমগাছের তলা দিয়ে আসছি আমরা, এমন সময় তোমাব বিরিঞ্চি লাঠি তুলে যেই তার গরুকে হাঁকাতে যাবে, কি লাঠি গিয়ে লাগল এক ভীমরুলের চাকে, গাছের নীচু ডালটায় বাসা ছিল তাদের।

তোর গালে কিসের দাগ?

আমার গালে একটা বসেছিল এসে, আর একটু হলেই হুলটা ফুটিয়ে দিত।

ঝাংরু চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, তুই বিরিঞ্চি বেচারাকে অমন বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে এলি? আচ্ছা লোক তো তুই!

ভীমরুলকে আমি বড্ড ডরাই বাপু।

গোহুম্‌নি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ঝাংরুও হাসিল।

জম্‌জম আর একবার ফোঁস করিয়া উঠিল।

।। আট ।।

শঙ্করা-কাছারিতে যে কাজটির জন্য ছোটবাবু নামিয়াছিলেন, সে কাজটি বেশ একটু জটিলগোছের। কিছুদিন পূর্বে জগাই ক্ষ্যাপা নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ শঙ্করা গ্রামে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন। এমন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, শঙ্করা-কাছারির গোমস্তা দ্বারিক ঘোষাল সংবাদটা সদরে দাখিল না করিয়া পারেন নাই।

ছোটবাবু খবর পাঠাইয়াছিলেন যে, কলমিপুরে যাইবার মুখে তিনি শঙ্করায় নামিবেন এবং উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া যথোচিত বন্দোবস্ত করিবেন।

সিদ্ধ পুরুষটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল খাড়া হইয়াছে। এক দলের মতে, সিদ্ধপুরুষ সত্যই সিদ্ধ-পুরুষ, নানারূপ গন্ধ বাহির করিয়া, ভবিষ্যৎবাণী করিয়া এবং আরও নানা রকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করিয়া তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন; সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিপক্ষ দলে গ্রামের সমস্ত যুবকবৃন্দ জুটিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, পুরুষটি হাফ-বয়েল্‌ড বা হার্ড-বয়েল্‌ড যাহাই হউন, উহার মতলব সুবিধার নয়। মেয়েদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিবার হেতুটা কি! বাছিয়া বাছিয়া যুবতী মেয়েদের দ্বারাই গা হাত পা টিপাইবার আধ্যাত্মিক অর্থ তো তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। বুঝিতে চাহেও না। জমিদারবাবুরা যদি ইহার একটা বিহিত না করেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই ইহার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। মারের চোটে সিদ্ধপুরুষকে একেবারে 'ন্যাকোট' করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

সমস্যা গুরুতর! দ্বারিক ঘোষালের মুখে যাহা শুনা যাইতেছে, তাহাতে সিদ্ধপুরুটি সত্যই একটু বিচিত্র ধরনের লোক। কুচকুচে কালো রঙ, ষণ্ডামার্কা চেহারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের মত পোশাক পরিয়া থাকেন। মাথায় লম্বা চুল, নাকে নোলক, কাছা নাই, বুকে সর্বদাই আঁচল টানিতেছেন। সখী ভাব! যুবকেরা ইহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ প্রাচীন মাতব্বর ব্যক্তিই ইহার স্বপক্ষে। এমন কি ছাতিমপুর গ্রামের নামজাদা ঘুষখোর দারোগাটি পর্যন্ত ভক্তিতে গদগদ। সমস্ত শুনিয়া ছোটবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। যদিও তিনি যাহা করিবেন. তাহার বিরুদ্ধে বড়বাবু, মেজবাবু কেহই একটি কথা বলিবেন না, তবু নিজের দায়িত্বে চট করিয়া একটা হুকুম তিনি দিতে পারিলেন না। ঘটনাটা বড়বাবুর গোছের করিলেন।

বড়বাবু সটকায় একটা টান দিয়া বলিলেন, কারও স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ওই হিজড়ে-মার্কা সিদ্ধপুরুষ যদি এখানে থেকে সুখ পায় থাকুক, কেউ যদি স্বেচ্ছায় ওকে বাড়িতে স্থান দেয় দিক, কোন মেয়ে যদি ওর পা টিপে সুখ পায় পাক, আর ছোকরারা যদি সে জন্যে ওকে ধবে পিটতে চায় পিটুক, আর তুমিও যদি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাও কর। আমার কাছে সবই সমান।—এই বলিয়া তিনি সটকায় পুনরায় একটা টান দিলেন।

নিকটেই লাহিড়ী বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভোট নাও। এই ডেমোক্র্যাসির যুগে সবই তো ভোট দিয়ে ঠিক হচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন, ভোট! খুব সহজ বুদ্ধি বাতলালে তো! গাঁ-সুদ্ধ লোকের ভোট নিয়ে বেড়াতে হবে এখন! তখুনি তোমাকে বললুম দু পেগ চড়িয়ে নাও, কি রকম যেন মিইয়ে পড়েছ আজ সকাল থেকে।

লাহিড়ী এই কথায় এমন একটা হাসি হাসিলেন, যাহার অর্থ—আপনি যে এ কথা বলিবেন, তাহা আগেই জানিতাম এবং আপনি ছাড়া এমন কথা কেই বা আর বলিতে পারে!

মুখে কিন্তু তিনি বলিলেন, সহজ বুদ্ধি একটা বাতলান তা হলে। আমাদের ছোটবাবু যে ফাঁপরে পড়েছেন।

সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ব্যাপারটা ছোটবাবুর হাতেই ছেড়ে দেওয়া।

বড়বাবু আবার সটকা তুলিয়া লইলেন। ছোটবাবু একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গেলেন মেজবাবুর কাছে। মেজবাবু কাছারিবাড়ির শীতলতম ছোট ঘরটিতে তাকিয়া ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। কোলের কাছে টোকনের বান্ধবী এবং হরিশ খুড়োর নাতনী চাঁপা বসিয়া ছিল। এই ফুটফুটে মেয়েটি মেজবাবুর বড় প্রিয়। তাঁহার সহিত হাতীতে চড়িয়া আসিয়াছে। টোকনও আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মেজমা ওই দুরন্ত ছেলেকে হাতীর পিঠে আসিতে দেন নাই। মেজবাবু মুস্কিলে পড়িয়াছেন, চাঁপা টোকনের জন্য ছটফট করিতেছে। কাছে থাকিলে যদিও দুইজনে ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কিছুই করে না, কিন্তু ছাড়াছাড়ি হইবারও উপায় নাই। এ বিপদ যে ঘটিবে, তাহা মেজবাবু জানিতেন। সেইজন্য টোকনকেও হাতীতে লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মেজ গিন্নির কথার উপর—

ছোটবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আনুপূর্বিক সমস্ত শুনিয়া মেজবাবুর যৌবনকালের মেজাজটা ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি তাকিয়া ছাড়িয়া বিরাট দেহ লইয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, দ্বারিককে বল হাঁকিয়ে দিক ব্যাটাকে। ওসব বুজরুকি ফুজরুকি চলবে না এখানে। গোঁপের ওপর নোলক দুলিয়ে ধর্মের নামে ভেলকি দেখাবার জায়গা এ নয়। দূর করে দাও ব্যাটাকে।

ছোটবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, মেজবাবু আবার ডাকিলেন, শোন শোন। তুমিই যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর গিয়ে! যত সব জোচ্চরের আড্ডা এখানে!

ছোটবাবু চলিয়া গেলেন।

চাঁপা পুনরায় প্রশ্ন করিল, টোকন এখনও আসছে না কেন?

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেজবাবু বলিলেন, এই এসে পড়ল বলে।

এত স্নিগ্ধকণ্ঠে যে, কে বলিবে এই লোকটারই মেজাজ একটু আগে সপ্তমে চড়িয়াছিল!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ছোটবাবু শেষে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। দ্বারিক ঘোষালকে বলিলেন, এক কাজ কর তুমি, সিদ্ধ পুরুষটিকে আমাদের সদরে নাটমন্দিরে চালান করে দাও। সেখানে ভাল থাকবেন উনি। একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে কালই পাঠিয়ে দাও সেখানে। ওঁকে গিয়ে বল যে, আমরা ওঁর খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছি এবং দেখা করতে চেয়েছি। এ কথা শুনলে উনি যেতে আপত্তি করবেন না। কলমিপুর থেকে ফিরে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আমি চক্রবর্তী মশাইকেও বলে দিচ্ছি।

বাহিরের বারান্দাতে প্রবীণদলের মুখপাত্র চক্রবর্তী মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছোটবাবু তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, আমাদের সকলেরই ইচ্ছে যে, আমাদের নাটমন্দিরে বাবা একবার পদধূলি দেন। এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ঘটল না, দ্বারিককে তাই বলে দিলাম, আমাদের ওখানে যাবার সব ব্যবস্থা যেন ও করে দেয়।

নাটমন্দিরে থাকবার কোন অসুবিধে হবে না। আমাদের নায়েব চৌধুরীও মহা ভক্ত লোক। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে ওঁর। কালই একবার পাঠিয়ে দেবেন ওঁকে দয়া করে।

চক্রবর্তী সোৎসাহে বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, মহাপুরুষ লোক উনি, নিয়ে যাবেন বই কি আপনারা। মানী না হলে মানীর মান রাখবে কে?

চক্রবর্তী ছাতা ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেলেন এবং নিজের দলকে গিয়া খবর দিলেন, বাবুরা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন ওঁকে নিজেদের নাটমন্দিরে।

বিপরীত দিকের বারান্দায় ছোকরাদের মুখপাত্র বিপনে অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র আস্তিন গুটাইয়া ছিল। ছোটবাবু তাহাকে গিয়া বলিলেন, কালই ও গ্রাম থেকে চলে যাবে, সে ব্যবস্থা করেছি। তোমরা আর কিছু বল না ওকে।

যে আজ্ঞে।

পুলকিত বিপিনও নিজের দলে গিয়া বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল, ছোটবাবু বললেন, কালই ব্যাটাকে কান ধরে গ্রাম থেকে বার করে দেবেন।

হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো—

মেজমা, তরঙ্গিণী, ঊষা, ঠানদি, ঠাকুরদা সকলের পালকি আসিয়া পড়িল। অশ্বপৃষ্ঠে হীরেনও আসিল। কিন্তু সুরেনের আর মীনার পাত্তা নাই। পালকির শব্দ পাইয়া মেজবাবু ও ছোটবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁপা ছুটিয়া গিয়া টোকনের গলা জড়াইয়া ধরিল। মেজমা মেজবাবুকে নিরাপদ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হাসলেন। তরঙ্গিণী ছোটবাবুর প্রতি একবার আড়চোখে চাহিয়া একটু হাসিয়া পালকির অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। ছোটবাবুর মুখে নয়, চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মেজমা মেজবাবুকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু সুরেন মীনার জন্য পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হীরেন বলিল, কালভৈরবের মাঠে একটা খরগোস দেখে সুরেন তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে। সে এসে পড়বে এখুনি।

ঊষা বলিল, মীনাও এল বলে। ভয় কি, তার সঙ্গে তো নেহাল সিং আছে।

মেজমা চিন্তিত মুখে বলিলেন, পরের মেয়ে, ভালয় ভালয় এসে পৌঁছলে বাঁচি। যা রোদ উঠেছে, বেয়ারাগুলো হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে আসছে।

ছোটবাবু ছদ্ম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা সত্যি, বড় কষ্ট বেচারাদের! বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বেয়ারাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এক দল পাংখা-বরদার ঠিক করলেই হত, বেযারাগুলোকে হাওয়া করতে করতে আসত।

মেজমা কোপ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, নিজেদের যদি বইতে হত কাঁধে করে, ঠাট্টা করা বেরিয়ে যেত তা হলে।

ছোটবাবু কাছারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ঊষা পালকি হইতে বাহির হইয়া হীরেনের সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

মেজবাবু ঠাকুরদার পালকির নিকট গিয়া বলিলেন, ঠাকুরদা, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে যেন!

আমার মতন অবস্থায় পড়লে তোমাকেও দেখাত।

কেন, কি হল?

আমার একমাত্র গৃহিণীর একমাত্র কোমর বিপন্ন।

মেজবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, এর ভেতরেও আপনি ঠানদির কোমর তদারক করবার অবসর পেয়েছেন? আশ্চর্য!

ঠানদি হাসিয়া বলিলেন, তার চেয়েও আশ্চর্য যে, তোমরা এতদিনেও তোমাদের ঠাকুরদাটিকে চিনতে পারলে না!

মেজবাবু বলিলেন, হল কি আপনার কোমরে?

পালকিতে বসে বসে কোমরে খিল ধরে গেছে ভাই। কোমরের সে জোর কি আর আছে?

তার জন্যে ভাবনা কি, আমাদের দ্বারিকও বেতো মানুষ, ওর কাছে নিশ্চয় মহামাস-টাস কিছু একটা আছে। দিচ্ছি যোগাড় করে দাঁড়ান।

ঠাকুরদা ব্যগ্রতার ভান করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ দাও তো ভাই, কলমিপুরের মাঠে গিয়ে একটু মালিশ করে দোব না হয়।

মেজবাবু হাসিয়া কাছারির দিকে চলিয়া গেলেন।

ছোটবাবু পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং আড়চোখে একবার মেজমায়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন।

মেজমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, বড়দিরা কি চলে গেছেন?

হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগেই গেলেন তাঁরা। মা তো রাস্তায় জলগ্রহণ করবেন না, সেখানে গিয়ে ময়না নদীতে নেয়ে আহ্নিক করে তবে খাবেন কিছু। সেইজন্যে ওদের আর আটকালাম না। ওই যে গরুর গাড়িগুলোও এসে গেল দেখছি।

দূরে রাস্তায় গরুর গাড়ির দেখা গেল। বিবিঞ্চির গাড়ি ছাড়া বাকি নয়খানা গাড়ি আসিতেছে।

মেজমা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, নতুন হাতীটা রাস্তায় কোন বদমায়েসি করেনি তো?

মেজবাবু বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই জবাব দিলেন, করেছিল একটু আধটু। ঝাংরু সেটাকে নাওয়াতে নিয়ে গেছে কাজল দীঘিতে। মাথায় জল-টল পড়লেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বোধ হয়।

ছোটবাবু বলিলেন, তবু ওতে আর তোমার যাওয়া চলবে না, তুমি আমার হাতীতেই এস। চাঁপা না হয় কোন একটা পালকিতে উঠুক।

মেজমা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন।

মেজবাবু কোনদিন ছোটবাবুর কথার প্রতিবাদ করেন না, নির্বিকারভাবে বলিলেন, বেশ।

মেজমা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, টোকন নাই।

টোকন কোথা গেল?

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওই যে কাঠবেড়ালি-শিকার হচ্ছে।

কাছারি বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছটায় অসংখ্য কাঠবিড়ালি লেজ ফুলাইয়া কিচ কিচ শব্দ করিতে করিতে পরস্পরকে তাড়া করিতেছিল। তাহারই একটাকে টোকন এয়ারগান দিয়া লক্ষ্য করিতেছে। নিকটেই চাঁপা পাকা গিন্নীর মত ওষ্ঠ-ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভাবটা যেন—তুমি যা মারিতে পারিবে, তা আমি জানি। বরং বন্দুকটা আমায় দাও, কি করিয়া টিপ করিতে হয় দেখাইয়া দিতেছি।

মেজমা হাসিয়া বলিলেন, তোমার শিকারী ছেলের জ্বালায় গেলাম বাবু।

ইহার উত্তরে ছোটবাবু কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ঝড়ঝড়ে বাইকে চড়িয়া ব্যস্তসমস্তভাবে নীলু দত্ত আসিয়া হাজির।

মেজমা ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া পালকির ভিতর অন্তর্হিতা হইলেন।

নীলু দত্ত বলিলেন, ভারী ভুল হয়ে গেছে একটা, লণ্ঠনের কথা মনেই ছিল না। দ্বারিক কোথা?

দত্ত মহাশয় বাইক হইতে নামিয়া বাইকটা ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বারিকবাবুর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কি দাঁড়াইবার অবসর আছে! একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এখানে আছে গোটাচারেক লণ্ঠন, ছাতিমপুরেও গোটা দুই পেয়েছি, দেখি নালতেতে যদি পাই কয়েকটা।

নীলাম্বর পুনরায় বাইকে সওয়ার হইতেছিলেন এমন সময় ছোটবাবু বলিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

নীলাম্বর দাঁড়াইলেন!

ওখানকার আর সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কটা তাঁবু গাড়লে সবসুদ্ধ?

নটা। আপনাদের তিনটে, গিন্নীমার একটা, জামাইবাবুর একটা, হীরেনবাবুর একটা, চাকরানিদের একটা—

চাকরানিদের তাঁবুটার উল্লেখ করিয়া নীলু দত্ত চকিতে একবার ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন এবং বলিতে চাহিলেন, চাকরানিদের তাঁবুটা তাঁহার তাঁবুর কাছেই দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কি মনে করিয়া আবার চাপিয়া গেলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, মোষের বাচ্চাটার কি হল?

সেটাকে মেরেছে।

অ্যাঁ, বল কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকজন পাহারা বসিয়ে দিয়েছি সেখানে। মাচানও বাঁধিয়েছি তিনটে। আমি এবার যাই বাবু, অনেক কাজ বাকি এখনও—

ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি বাইকে উঠিয়া পড়িলেন।

দুই দিন কামানো হয় নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। মাথায় মুখে খাবছা খাবছা চুল উঠিয়া টাকটা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। রোদে সমস্ত মুখখানা যেন

পুড়িয়া গিয়াছে। নিদারুণ পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনিয়মে একদিনেই যেন নীলু দত্ত আরও দশ বৎসরের বুড়া হইয়া গিয়াছেন। খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, এ দিকে লাহিড়ীটা দিব্যি বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া ইয়ার্কি দিতেছে! লোকটার লজ্জাও নাই! মনে মনে লাহিড়ীর চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে নীলু দত্ত সবেগে নালতে অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। অন্তত আরও গোটা চারেক লণ্ঠন যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার ভিতরই ফিরিতে হইবে।

খানিকক্ষণ পরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না।

অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন এবং মীনা!

দুইটি পা একদিকে ঝুলাইয়া সঙ্কুচিত মুখে মীনা সামনে বসিয়া রহিয়াছে এবং সুরেনের বাম বাহুটি পিছনের দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। নিকটে আসিয়াই মীনা নামিয়া পড়িল। সুরেনও নামিল। সহিসের হাতে লাগামটা দিয়া সুরেন আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে এই যুগল আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা দিল, তাহাতে সকলেই খুশি হইলেন। ধাবমান শশকের পশ্চাতে কিছুদূর ছুটিয়া সুরেনকে অবশেষে হার মানিতে হইয়াছিল। কালভৈরবের মাঠে শশকটা মরীচিকার মত কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহা সুরেন ধরিতেই পারে নাই।

সুরেন বলিতে লাগিল, ফিরছি, কিছুদূর এসে ওই আপনাদের নালতে গ্রামটা পেরিয়েই কতকগুলো আমগাছ আছে, তার তলায় দেখি, মীনার পালকি। কাছে একটা গরুর গাড়িও রয়েছে। শুনলাম, গাছে নাকি একটা ভীমরুলের চাক ছিল, কি করে তাতে খোঁচা লেগেছে, গাড়ির গাড়োয়ানটাকে কামড়েছে, মীনার পালকির দুজন বেয়ারাকেও কামড়েছে।

ছোটবাবু বলিলেন, বল কি? নেহাল সিং কোথা?

সে বেচারা ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে সরে গেছল বলে বেঁচে গেছে, তাকে কামড়াতে পারেনি। সে আসছে পেছু পেছু।

মেজবাবু বলিলেন, তারপর?

আমি এসে দেখি এই অবস্থা। গাড়ির গাড়োয়ানটা তো অজ্ঞান-প্রায়, বেয়ারা দুটো ছটফট করছে, মীনা পালকির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছে।

মেজমা বলিলেন, কি বিপদ দেখ দিকি!

সুরেন বলিতে লাগিল, ভাগ্যিস আমি গিয়ে পড়লুম, তা না হলে মহা মুস্কিলে পড়ত মীনা। তাও আবার ঘোড়ায় উঠতে চায় না কিছুতে। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তবে নিয়ে এলাম।

সুরেন হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে মীনার পানে চাহিল। মীনা সঙ্কুচিত হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া ছিল, আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

ঊষা এবং হীরেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্বামীর এই কৃতিত্বে ঊষা যেন অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মীনার দিকে চাহিয়া বলিল, ঘোড়ায় চড়তে ভয় করে নাকি তোর? আচ্ছা ভীতু তো! আমাদের ও ঘোড়াটা খুব ট্রেন্‌ড়্, টোকন পর্যন্ত চড়ে ওর পিঠে।

মেজমা প্রশ্ন করিলেন, গাড়োয়ানটার আর বেয়ারাগুলোর কি হল?

সুরেন বলিল, তারা আসছে। গাড়ির পেছনের দিকে পালকিটায় চড়িয়া দিয়েছি, গাড়োয়ানটা তারই ভেতর শুয়ে পড়েছে। সে বেচারাকে ভয়ানক কামড়েছে। একজন বেয়ারাই গাড়িটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাকি বেয়ারাগুলো হেঁটেই আসছে, নেহাল সিং সঙ্গে আছে।

মেজমা বলিলেন, আহা বেচারিরা!

ছোটবাবু তাড়া দিলেন, যাক সে, যা হবার হয়েছে, চল, এইবার আমরা বেড়িয়ে পড়ি। মিছে দেরি করে আর লাভ কি?

তাহার পর সুরেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ওহে, তোমার 'কিল' হয়ে গেছে। এখুনি খবর পেলুম।

সুরেন সোৎসাহে বলিল, তাই নাকি?

সকলে কলমিপুর মাঠের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মীনা আর ঊষা একটা পালকির ভিতর ঢুকিল।

।। নয়।।

নালতে গ্রামে বন্ধু হরিচরণ মাস্টারের বাসায় বাদল ডাক্তার সত্যই একটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।—

নিদারুণ গ্রীষ্মকালে, আকাশেতে জ্বলিতেছে চিতা,
ঘর্মাক্ত-কলেবরা হে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দেবি,
ঘূর্ণ্যমান পাংখাতলে, জানি আমি, তুমি নিপীড়িতা
কঠিন কর্মের ভারে অথবা মর্মের ভারে may be!
ক্লাস, ঘণ্টা, ছাত্রী, ফোন, মিটিং, রুটিন, সেক্রেটারি,
পরীক্ষার প্রশ্নাবলী, গার্জেনরা, কেরানি, চাপরাশি
রুদ্ধ করি মুক্ত বায়ু দাঁড়াইয়া আছে সারি সারি;
ভিড় বাড়াইতে, দেবি, নাহি ইচ্ছা তার মাঝে আসি।
আমিও ঘর্মাক্ত-দেহ, আর্দ্র ভুঁড়ি শ্লথ্ নীবিবাস,
ঘর্ম-বিচচ্চিকাগুলি চুলকাইয়া কাটাই দিবস;
তথাপি চিন্তিত আমি—(নহে, দেবি, নহে পরিহাস)
না পাইয়া কোন বার্তা চিত্ত মম সত্যই বিবশ।
চতুষ্পার্শ্বে জানি তব নানা কর্ম করে গিজগিজ,
তবু ক্ষুদ্র অনুরোধ, দু লাইন চিঠি লিখো—Please!

নিকটেই হরিচরণ উবু হইয়া বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। গ্রামের মাইনর স্কুলের মাস্টার তিনি, অর্থাৎ সেই জাতীয় লোক, যাঁহারা স্কুলপাঠ্য জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য-সন্দর্ভ জাতীয় বই এবং স্কুলের ইন্সপেক্টর, সেক্রেটারি জাতীয় লোক ছাড়া আর বিশেষ কোন কিছুর খবর রাখিবার অবসর পান না।

হরিচরণ নিরীহ ভালমানুষ লোক। বাদল ডাক্তার বিনা পয়সায় তাঁহার বাড়িতে চিকিৎসা করেন বলিয়া বাদল ডাক্তারের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার মনের খবরটিও জানেন। বাদল ডাক্তারের মনের খবর দুইজন লোক জানেন,—হরিচরণ মাস্টার এবং ছোটবাবু।

হরিচরণ কবিতাটি শুনিয়া গিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন, খাসা হয়েছে।

তাহার পর হুঁকাটি কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিলেন, ওরে মেধো, কোথা গেলি তুই? আঃ, একটা নেবু আনতে যুগ কাটাচ্ছে!

হরিচরণ বাহির হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তারকে শরবৎ না খাওয়াইয়া কিছুতেই তিনি ছাড়িবেন না। কিছুক্ষণ পরে দুই গ্লাসে শরবৎ ঢালাঢালি করিতে করিতে তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন। মেধো নামক ছাত্রটিও পিছনে পিছনে লেবু-হস্তে প্রবেশ করিল। শরবৎ পান করিয়া বাদল ডাক্তার নিজের হাত-ঘড়িটা একবার দেখিলেন। কি সর্বনাশ, চারিটা যে বাজে! আর তো বসিয়া থাকা চলে না। সন্ধ্যা নাগাদ কলমিপুরের মাঠে না পৌঁছিতে পারিলে ছোটবাবু কি মনে করিবেন!

হরি, তোমার কাছে একটা খাম আছে ভাই!

আছে।

দাও তো, এইখানেই পোস্ট করে দিই চিঠিটা।

খামের উপর মায়ার ঠিকানাটা লিখিয়া বাদল সযত্নে কবিতাটি তাহার মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেন। যাইবার সময় পোস্ট-অপিসে স্বহস্তে পোস্ট করিয়া যাইতে হইবে। অবিলম্বে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

।। দশ ।।

সন্ধ্যা হয় হয়।

সমস্ত দিনের গরমের পর ঝির ঝির করিয়া স্নিগ্ধ একটা হাওয়া উঠিয়াছে। নির্মল নীল আকাশ। ঝাংরু গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে জমজমকে লইয়া কাঁকন নদী পার হইতেছে। পাগলা ঠাণ্ডা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে 'কাঁক' করিয়া শব্দ করিয়া গানের তালে তালে ঠিক তাল দিতেছে। গোহুম্‌নি ঝাংরুর পিছনে বসিয়া তাহার পিঠে গাল রাখিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার সুরে সুর মিলাইয়া দুই এক কলি গানও গাহিতেছে। মুখে অতি মৃদুমধুর একটি হাসি, চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত।

পূর্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

প্রান্তরে

প্রথম দৃশ্য

[কলমিপুরের মাঠে বড়বাবুর তাঁবু। তাঁবুটি বেশ বড়। দুইটি কক্ষ আছে, কক্ষ দুইটির মধ্যবর্তী দ্বার পর্দাবৃত। বড়বাবু যে কক্ষটিতে বসিয়া আছেন, তাহাতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। গোটা দুই ক্যাম্প-চেয়ার, প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া, দুইটি তেপায়া। একটি তেপায়ার উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক কোণে গোটা তিনেক সুটকেস আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। তাঁবুর সম্মুখের দরজাটা এবং দক্ষিণ দিকের বড় বড় বাতায়ন তিনটি উন্মুক্ত। দরজা দিয়া জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর খানিকটা অংশ, কিছু দূরে দুইটি তাঁবু এবং আরও খানিকটা দূরে একটা জটলার মত দেখা যাইতেছে। বেহারা, মাহুত, গাড়োয়ান প্রভৃতি ভৃত্যগণ সেখানে গোল হইয়া বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছে। মাদলের আওয়াজ ও বাঁশির সুর ভাসিয়া আসিতেছে। বড়বাবু কেমন যেন একটু উন্মনা হইয়া একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি কার্পেটের উপর বসিয়া লাহিড়ী হার্মোনিয়াম সহযোগে "আমার দখিন দুয়ার খোলা"—গানটি আবেগভরে গাহিতেছেন। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল এবং গড়গড়াব মাথায় কলিকাটি বসাইয়া নলটি বাবুর হাতে ধরাইয়া দিয়া নীরবে বাহিব হইয়া গেল। বড়বাবু গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্কভাবে একটা টান দিলেন। কুঞ্চিত-ভ্রূ নীলু দত্ত দ্বারপ্রান্তে সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

লাহিড়ীর গান ক্রমে শেষ হইয়া আসিল]

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা ঠেলিয়া দিয়া] নাঃ, এখন বিটোফেনের মুন্‌লাইট সোনাটা ছাড়া আর কিছুতে জমবে না। অর্গানটা আনলেই হত।

[বড়বাবু গড়গড়াতে কয়েকটা টান দিলেন]

বড়বাবু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, খাঁটি দুধ প্রচুর রয়েছে, কেবল মুন্‌লাইট সোনাটা নামক দম্বলটির অভাব?

[বড়বাবু কথাটাকে এভাবে লইবেন, তাহা লাহিড়ী বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, মুন্‌লাইট সোনাটা বড়বাবুর প্রিয় জিনিস, সেইজন্যই কথাটা বলিয়াছিলেন। বড়বাবুর মন্তব্য শুনিয়া বুঝিলেন, কথাটা এখন বেফাঁস হইয়াছে।

সারিয়া লইবার জন্য সবজান্তাগোছ একটা হাসি হাসিলেন।]

লাহিড়ী। খাঁটি জিনিস থাকলে আর ভাবনা কি? তেঁতুল দিয়েও জমিয়ে দেওয়া যায় তা হলে।

[বড়বাবু গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন]

বড়বাবু। খাঁটি জল জমাবার প্রক্রিয়া কিন্তু অন্য রকম শুনেছি।

[লাহিড়ী চকিতে একবার বড়বাবুর মুখের পানে চহিলেন। বড়বাবুর কথাবার্তা আজ কেমন যেন বাঁকা বাঁকা ধরনের মনে হইতেছে।]

লাহিড়ী। [সহাস্যে] ঠিক ধরেছেন আপনি। সমাজ বলুন, পলিটিক্স বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই জলে জলময়।

বড়বাবু। [সহসা] বিটোফেন কালা এবং মিল্টন অন্ধ হয়ে গেছলেন, কেন জান?

[এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য লাহিড়ী প্রস্তুত ছিলেন না। কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বড়বাবু নিজেই উত্তর দিলেন]

ভগবান ওঁদের সহায় ছিলেন।

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া] এবার কি গাইব, বলুন? রবিবাবু তো হল, নিধুবাবু ধরব একটা?

বড়বাবু। ও ভদ্রলোককে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

লাহিড়ী। তা হলে—

বড়বাবু। এই ফাঁকা মাঠে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় একটা প্যাঁকপেঁকে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বস্তাপচা কতকগুলো গান গাওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করবার ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তো ওই কার্য করে চলেছ, এখানেও ওই কববে?

লাহিড়ী। [স্মিতমুখে] সবই তো বুঝি, কিন্তু কি করব বলুন?

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] ও, কি কববে—তাও আমাকে বাতলে দিতে হবে! স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে অভিনব ধরনে আনন্দপ্রকাশ করবার তাকত তোমার নিজের নেই!

[লাহিড়ী চমৎকার একটি সঙ্কুচিত ধরনের হাসি হাসিলেন। ভাবটা— সত্যই নয় বড়বাবু বলিয়া চলিলেন]

মেতে ওঠ। এই বিশাল মাঠে, অনাবিল জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে যাও। একটি ফোঁটা মদ না খেয়েও নেশায় চুর হয়ে পড়, তবে আমি বুঝব, জ্যোৎস্না-রসিক তুমি। এমন সময় তাঁবুর ভেতর বসে হার্মোনিয়াম প্যাঁক প্যাঁক করার কোন মানে হয় তোমাদের বয়সে—অমন ফাঁকা মাঠ থাকতে?

[ইহার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিয়া লাহিড়ী উঠিয়া পড়িলেন এবং বড়বাবু ঠিক যেন তাঁহার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছেন, এমনই একটা মুখভঙ্গি করিলেন।]

লাহিড়ী। আমিও এতক্ষণ জাস্ট ওই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, যা ইচ্ছে করে, সব সময়ে তা করা যায় না, লজ্জা করে।

বড়বাবু। কি ইচ্ছে করছে তোমার? উলঙ্গ হতে? হও না।

লাহিড়ী। [সমস্ত দন্ত বিকশিত করিয়া] ঠিক তা নয়। ময়না নদীতে নৌকো বাইলে হত। মানে—

বড়বাবু। বেশ তো, যাও না। নৌকো তো আছে শুনেছি একটা।

লাহিড়ী। [উল্লসিত হইয়া] আপনি আসছেন?

বড়বাবু। না। আমারও একটা স্বতন্ত্র যা-খুশি আছে এবং তা জল-বিহার করতে রাজি নয় আজ। তুমি যেতে চাও যাও।

[একটু হাসিয়া লাহিড়ী চলিযা গেলেন। লাহিড়ী যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলু দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন বাহিরে ওত পাতিয়া ছিলেন]

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] পেছন দিকের ছোট তাঁবুটায় সব ঠিক আছে।

বড়বাবু। কি ঠিক আছে?

নীলু দত্ত। [অপর কক্ষের পর্দাটার পানে সচকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রায় চুপিচুপি] আমি আসবার সময় বাইকের পেছনে বেঁধে কয়েকটা শ্যাম্‌পেন এনেছিলাম। ভাবলাম—

বড়বাবু। ও। আচ্ছা, নীলমণিকে বল, এইখানেই নিয়ে আসুক।

নীলু দত্ত। [আর একবার পর্দাটাব পানে চাহিযা] এইখানেই?

বড়বাবু। হ্যাঁ।

[বিস্মিত নীলু দত্ত চলিযা যাইতেছিলেন, বড়বাবু তাঁহাকে ডাকিলেন]

শোন, ক বোতল এনেছ?

নীলু দত্ত। তা আছে কযেক বোতল—গোটা ছযেক।

বড়বাবু। লাহিড়ীকে ডেকে এক বোতল দিয়ে দাও। ময়না নদীর দিকে বেড়াতে গেছে ওরা।

[নীলু দত্ত স্তম্ভিত হইযা দাঁড়াইযা রহিলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় দু একটা টান দিযা স্বগতোক্তি কবিলেন।]

নিছক জ্যোৎস্নায় ওব কিছু হবে বলে মনে হয় না। অথচ সে কথা বলবার সাহস নেই।

নীলু দত্ত। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হুজুর কি লাহিড়ীকে এক বোতল দিতে বলছেন?

বড়বাবু। হ্যাঁ, দাও ওকে একটা বোতল।

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] মানে, কাল দুপুর পর্যন্ত তো এখানে থাকতে হবে। বেশি তো আনিনি, মাত্র ছটি বোতল।

[বড়বাবু গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া নীলু দত্তের পানে একবার চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ নীলু দত্তের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া তিনি বলিলেন]

যে আজ্ঞে, দিয়ে দিচ্ছি তা হলে।

[অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ত্রস্ত নীলু দত্ত চলিয়া গেলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় আরও দু একটা টান দিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। দুই কক্ষের মধ্যবর্তী পর্দাটা সরাইয়া লছমনিয়া উঁকি দিল। বড়বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণ-পরেই পর্দা সরাইয়া বড় বউ প্রবেশ করিলেন। সাজসজ্জাবিলাসিনী বড় বউয়ের এই আবির্ভাবে বড়বাবুর মুখে একটু বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। আজ বড় বউয়ের সাজসজ্জা একটু নূতন ধরনের। পরনে অতিসাধারণ সুতির একখানা শাড়ি। অঙ্গে সোনার অলঙ্কার একখানিও নাই। হাতে সোনার

চুড়ির বদলে লোহা এবং মোটা মোটা শাঁখা। গলাতেও শাঁখের হার। হাতে একটা পানের ডিবা, সেটি অবশ্য রূপার এবং কারুকার্যখচিত। বড় বউ প্রবেশ করিয়া আর এক খিলি পান এবং আব একটু জরদা মুখে দিলেন। বড়বাবু নীরব বিস্ময়ে বড় বউকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।]

বড় বউ। [আর একটু জরদা মুখে দিয়া] লছমনিয়া, জামাইবাবুর তাঁবুতে গিয়ে খবর দে আসছি আমি এখুনি।

[লছমনিয়া বাহিব হইয়া গেল]

বড়বাবু। [বড় বউয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হঠাৎ ঢাকনাটা খুললে যে?

বড় বউ। কিসের ঢাকনা?

বড়বাবু। তোমার নিজের। এতদিন গয়না-কাপড়ের তলায় যেন চাপা পড়েছিলে, দেখতেই পাইনি তোমায়!

[বড় বউ কোন উত্তব দিলেন না। বড়বাবু আবার বলিলেন]

তোমাব যে এত রূপ ছিল, চোখেই পড়েনি তা এতদিন!

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] তোমার চোখের বাহাদুরি সেটা।

বড়বাবু। বুঝতে পারলাম না।

বড় বউ। রূপ তো চোখে পড়বার জন্যে অহবহ উন্মুখ, রূপ চোখে পড়বার জন্যেই সৃষ্টি কবেছেন ভগবান; চোখ যদি এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে চলে থাকে, সেটা তার বাহাদুরি বইকি! [ঈষৎ হাসিয়া]

আজ তা হলে তো মুস্কিল হল, রূপটা চোখে পড়ে গেল! করকর করছে নাকি? জল এনে দোব একটু, ধুয়ে ফেলবে?

বড়বাবু। [হাসিয়া] সব জিনিস কি আর জল দিয়ে ধোওয়া যায়?

বড় বউ। ও, ভুলে গেছলাম। নির্জলা জিনিস নিয়েই যে তোমার কারবার।

[বড়বাবু স্মিতমুখে কিছুক্ষণ বড় বউয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন]

বড়বাবু। তোমার এ কথায় আমার চটে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই চটতে পারছি না তো!

[উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। চাকরেরা যেখানে জটলা করিতেছিল, সেখানকার বাঁশীর আওয়াজটা সহসা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু—]

বড় বউ। যাই এবার আমি।

বড়বাবু। জামাইয়ের তাঁবুতে যাচ্ছ কেন?

বড় বউ। যদি নিয়ে যায় আমাকে, আমিও গিয়ে মাচাতে বসব। হীরেন শুনছি যাবে না, সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে রোদ্দুরে এসে তার শরীরটা খারাপ হয়েছে। তার মাচাটা খালি আছে, তার বন্দুকটাও পাব।

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] তুমি বন্দুক চালাতে পার নাকি?

বড় বউ। পারি একটু একটু, অন্তত পারতাম এককালে। ছেলেবেলায় দাদাদের সঙ্গে

শিকারে গেছি অনেক বার, তখন আমার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। [মুচকি হাসিয়া] উড়ন্ত পাখীও মারতে পারতাম।

বড়বাবু। শুনি নি তো এখনও এ কথা। [একটু থামিয়া] প্রমাণও পাইনি।

বড় বউ। [বিস্ময়ের ভান করিয়া] এ বাড়িতে তার প্রমাণ দোব কি করে? লাউ-কুমড়ো-শশা-সিমের জন্যে তো বন্দুকের দরকার নেই।

[বড়বাবু ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন, এ কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঈষৎ-বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময়, কৌতুক মূর্ত হইয়া উঠিল।]

বড়বাবু। ও, এ বাড়িতে টিপ করবার মত আমিষ কোন কিছু পড়েনি বুঝি তোমার চোখে! ভারী দুঃখের বিষয় তো!

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] শুধু চোখে পড়লে কি হবে, রেন্‌জের মধ্যেও পড়া চাই।

বড়বাবু। বড় বড় শিকারীদের শুনেছি বন্দুকের রেন্‌জও বড়। বাঘ সিংহ মারতে হলে পাখী-মারা বন্দুকে চলে না তাদের।

বড় বউ। আমার বাঘ সিংহ মারতে ইচ্ছে করে না কোন কালে, পুষতে ইচ্ছে করে।

বড়বাবু। পুষলেই পার, সে আর বিচিত্র কি?

বড় বউ। পাই কোথায়?

[আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। আবার বাঁশীর আওয়াজটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু তু তুতুর তুয়া তু— । বড় বউ আর এক খিলি পান ও আর একটু জরদা মুখে দিলেন।]

বড় বউ। এবার যাই আমি।

বড়বাবু। এখুনি বললে, বাঘ মারতে ইচ্ছা করে না তোমার, অথচ রাইফেল নিয়ে মাচানে বসতে যাচ্ছ, ব্যাপার কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড় বউ। নিজের হাতে বাঘ মারতে প্রবৃত্তি নেই, বন্দুকটা নিচ্ছি আত্মরক্ষার জন্যে কিন্তু বাঘ-শিকার দেখবার একটা কৌতূহল আছে। বলিষ্ঠ হিংস্র জানোয়ারটা গুলি খেয়ে কেমন শেষ আর্তনাদটা করে ওঠে, সেইটে শোনবার লোভ আছে। আর কিছু নয়।

[বড়বাবু নীরবে কিছুক্ষণ বড় বউকে নিরীক্ষণ করিলেন।]

বড়বাবু। তোমার যদি ছেলেমেয়ে না হত তা হলে তোমার নারীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করতাম।

বড় বউ। ঝান্সির রাণী, রিজিয়া, এলিজাবেথ, ক্লিওপেট্রা—এদের কি তুমি নারী বলে মনে কর না?

[বড়বাবু কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে নীলমণি গলাখাঁকারি দিল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। নীলমণি একটি কাঠের ট্রেতে এক বোতল শ্যাম্‌পেন, কয়েকটি ছোট কাচের গ্লাস প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল এবং ট্রেটি তেপায়ার উপর রাখিয়া বড়বাবুর মুখের পানে চাহিল।]

বড়বাবু। থাক, এখন দরকার নেই।

[নীলমণি নীরবে বাহিরে চলিয়া গেল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন]

মাচানে বসে শিকার করতে যাচ্ছ, অথচ নীলমণিকে দেখে লজ্জা।

বড় বউ। অনাবশ্যকভাবে আমি কখনও আত্মপ্রকাশ করি না কারও কাছে।

[অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে ঊষা আসিয়া প্রবেশ করিল]

ঊষা। বাবা, নীলুকাকা কোথায়?

বড়বাবু। একটু আগে তো এসেছিল এখানে, কেন?

ঊষা। ওই বটগাছটায় দোলনা টাঙিয়ে দেবে।

বড়বাবু। দোলনা এখানে পাবে কোথা সে?

ঊষা। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিলেই তো হবে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] বেশ বুদ্ধি বার করেছিস তো।

বড় বউ। সুরেন কি করছে?

ঊষা। জানি না।

বড় বউ। শিকারে যাবি না তুই?

ঊষা। না।

বড় বউ। চল না, একসঙ্গে সবাই গিয়ে একটা মাচায় বসা যাক। মীনা কোথা?

ঊষা। কি জানি, নদীর ধারে না কোথায় বেড়াচ্ছে। আমি শিকারে যাব না। ওতে আর মজা কি? সারারাত মাচায় মুখটি বুজে চুপটি করে বসে থাক। তার চেয়ে নীলুকাকাকে বলে ওই বটগাছটায় একটা দোলনা টাঙাই গিয়ে। বেশ মজা করে দোলা যাবে। নীলুকাকা কোথা?

বড়বাবু। এই বাইরেই কোথাও আছে, দেখ না।

[প্রায় ছুটিয়া ঊষা বাহির হইয়া গেল]

বড়বাবু। [হাসিয়া] ঊষা ঊষাই রয়ে গেল দেখছি, সকাল আর হল না।

বড় বউ। আমিও যাই তা হলে।

বড়বাবু। যাও।

বড় বউ। আমাকে বাঘের মুখে পাঠিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করছ না তো?

বড়বাবু। [হাসিয়া] ইতস্তত করে তোমার গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

বড় বউ। তুমি কি বলতে চাও, আজীবন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমি চলেছি?

বড়বাবু। তাই বা বলি কি করে। অন্তত আজকের রাত্রে সে কথা বলা চলে না।

বড় বউ। মানে?

বড়বাবু। মানে, তোমার চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়নার বোঝাগুলো আজ আমারই পছন্দ অনুসারে সরিয়ে রেখেছ—এই ভেবে চিত্ত আমার খানিকটা বিনোদিত হচ্ছে। ধারণাটা যদি ভুলও হয়, ভেঙে দিও না সেটা।

বড় বউ। চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়না যে তুমি পছন্দ কর না, তা তো বলনি কোন দিন মুখ ফুটে!

বড়বাবু। মুখ ফুটে যেখানে বলতে হয়, সেখানে না বলাই ভাল। তা ছাড়া সত্যিকারের আভিজাত্য যার আছে, সে মুখ ফুটে কখনও কিছু চায় না। [কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন] কিন্তু আজ জ্যোৎস্না মনোহারিণী, তোমাকেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, আভিজাত্যের আগলটা তাই একটু আলগা হয়ে গেল হঠাৎ।

[বড় বউ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন]

বড়বাবু। বসলে যে?

[বড় বউ নির্নিমেষ নেত্রে বড়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।
কোন উত্তর দিলেন না।]

বসলে যে, যাবে না?

বড় বউ [গাঢ় স্বরে] না। [একটু পরে] চল, আমারও উষার মত একটা দোলনা টাঙিয়ে দুলি গিয়ে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] সে আর হয় না বড় বউ। অপরাহ্ন হাজার চেষ্টা করলেও আর উষা হতে পারে না।

[একটু চুপ করিয়া রহিলেন]

কিন্তু অপরাহ্ণেরও একটা সৌন্দর্য আছে। আমাদের স্থান এখন ভিড়ের মধ্যে নয়, নিভৃতে। একান্তে বসে রোমন্থন করাও কম বিলাস? এখানে বসতে যদি চাও, চেয়ারটা আর একটু টেনে আন, আলোটা নিবিয়ে দাও।

[বড় বউ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আলোটা নিবাইয়া দিলেন।
একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া উভয়ের কোলের উপর পড়িল। দুইজনে নীরবে
পাশাপাশি বসিয়া রহিলেন। দূরে বাঁশী বাজিতে লাগিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলমিপুর মাঠের একটি অংশ। এই স্থানটি তাঁবুগুলি হইতে বেশ একটু দূরে, এখান হইতে ময়না নদী দেখা যায় না। যতদূর দেখা যায়, ধূ ধূ করিতেছে মাঠ। কেবল খানিকটা দূরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত বিরাট একটা বটগাছ অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই কাছে হাতী তিনটাও বাঁধা আছে। হাতীগুলি বটগাছের ডাল ভাঙিয়া ভাঙ্গিয়া খাইতেছে, ডাল ভাঙার মটমট শব্দ পাওয়া যাইতেছে।

জ্যোৎস্নালোকে বিরাটকায় দাঁতাল হাতীটার প্রকাণ্ড দাঁত দুইটা অদ্ভুত দেখাইতেছে

এই অংশে একটি সুপরিসর শতরঞ্জি বিছানো, কয়েকখানা টিনের চেয়ারও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটি চেয়ারে বসিয়া নীলু দত্ত তামাক খাইতেছেন। সম্মুখের একটা

প্রস্তরখণ্ডের উপর তিনি একটা পা তুলিয়া দিয়াছেন। নিকটেই অপর একটি চেয়ারে স্থূলকায় তিনু চাটুজ্জেও বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তেও হুঁকা। গোলগাল মুখমণ্ডল চিন্তাকুল। বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদটি তুলিয়া দিয়া পায়ের পাতাটি তিনি ঘন ঘন নাড়িতেছেন। সুন্দর হাওয়া বহিতেছে, চতুর্দিক জ্যোৎস্নাবিষ্ট]

তিনু। দাও হে এবার কলকেটা।

নীলু। দাঁড়াও হে বাপু, সমস্ত দিনের মধ্যে কি আর তামাক খেতে পেয়েছি, না পা মুড়ে বসতে পেয়েছি! এই তো একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি কেবল।

[গোটা কয়েক টান দিলেন]

তাও আবার ঊষা ঠাকরুণ দোলনা টাঙাবার এক ফরমাস দিয়েছেন।

তিনু। দোলনা? দোলনা এনেছ নাকি?

নীলু। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিতে বলছে বটগাছে। বুদ্ধিও জোটে এদের মাথায়!

তিনু। [আঙুল দিয়া দেখাইয়া] ওই বটগাছটায়? ওখানে তো হাতী বাঁধা রয়েছে দেখছি।

নীলু। আরে না না, ওখানে নয়, ওদিক পানে আর একটা ছোটগোছের বটগাছ আছে। কিন্তু কাকে বলি এখন বল তো! [কয়েকটা টান দিয়া] চাকরবাকরগুলো সব মাদল নিয়ে মেতেছে, গোহুম্নি ছুঁড়িটা নাচছে। এখন কাউকে বললে কি নড়বে সেখান থেকে কেউ!

[বেশ জোরে আরও গোটা দুই টান দিলেন]

ভিকুটা বোকাসোকা গোছের আছে, দেখি, যদি সে ব্যাটাকে রাজি করতে পারি। এই নাও।

[তিনুকে কলিকাটা দিলেন এবং পা সরাইয়া হুঁকাটা পাথরের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিলেন]

তিনু। [কলিকাটি হুঁকায় বসাইতে বসাইতে] আজকাল ছোটলোকেরাই সুখেতে আছে ভাই, বোয়েছ? ভদ্দরলোকদের আর ভদ্রস্থ নেই।

[যেন অত্যন্ত মূল্যবান একটি উক্তি করিয়াছেন—এইরূপ মুখভাব করিয়া তিনি হুঁকায় একটি টান দিলেন]

নীলু। ভদ্দরলোকই বা কটা আছে আজকাল? সব শালাই চামার। [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] ওই লাহিড়ীটাকে তুমি ভদ্দরলোক বল? তুই বেটা যে বড়বাবুর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে শ্যাম্‌পেন খেতে চাস, এর আগে শ্যাম্‌পেন দেখেছিলি কখনও বাপের জম্মে?

[তিনুর হুঁকায় ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন]

তিনু। অ্যাঁ, বল কি, শ্যাম্‌পেন খেতে চাইছে।

নীলু। চেয়েছে নিশ্চয়ই, তা না হলে বড়বাবু দিতে বললেন কেন? কেউ কিছু চাইলে বড়বাবু 'না' বলতে পারেন না, এ কথা তো সবাই জানে। তাই বলে সব জিনিস চাইতে হবে?

[তিনু পুনরায় হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন]

নিজেরও তো আক্কেল থাকা উচিত একটা! তোর পেটে বোমা মারলে পান্তাভাত পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি বেরিয়ে পড়বে, তুই চাইলি শ্যাম্পেন খেতে!

[তিনু চক্ষু বুজিয়া তন্ময় হইয়া তামাক টানিতেছিলেন, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন]

তিনু। বোঝ।

[উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ]

নীলু। আমাদের বড়বাবুর যে রকম দরাজ হাত, ছোটবাবুর হাতে জমিদারি না পড়লে উনি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অমন কাছাখোলা হলে জমিদারি থাকে!

[তিনু চক্ষু খুলিলেন]

তিনু। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করেছ ভাই। আমি এসে থেকে তক্কে তক্কে ঘুরছি, কিন্তু ছোটবাবুর নাগাল তো পাচ্ছি না! বড়বাবুকেই ধরব নাকি শেষ অবধি গিয়ে?

নীলু। সে পথও বন্ধ। বড়বাবু আজ রাত্রে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না—হুকুম দিয়েছেন। তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিং কিরিচ বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তিনু। বড় ফ্যাসাদে পড়লাম তো তা হলে হে! শেষ পর্যন্ত তা হলে কি লছমনিয়াটাকেই তোয়াজ করতে হবে না কি? সে ছুঁড়িরও তো কোন পাত্তা পেলাম না। এই একটু আগেই দেখলাম, সে বড়বাবুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে জামাইবাবুর তাঁবুর দিকে গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ছোটবাবুর তাঁবুর কাছে গিয়ে কি একটু ঘুজঘুজ করলে, তারপর এল এইদিক পানে। আমিও পেছু পেছু এলাম। কি করি, কাজের নাম বাবাঠাকুর। ভাবলাম, আড়ালে একটু আভাস দিয়ে রাখি কথাটার। কিন্তু এখানে এসে ফট করে কোথায় যে গাঢাকা দিলে, ধরতে পারলাম না। ওই তো এক ফোঁটা ছেলেমানুষ মেয়ে, দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল!

[হুঁকায় টান দিলেন। ধোঁয়া বাহির হইল না। কলিকায় ফুঁ দিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন]

নীলু। [বিজ্ঞভাবে হাসিয়া] ছেলেমানুষ হলে কি হয় ভায়া, মেয়েমানুষ তো! সংস্কৃত শোলোকে আছে—দেবা না বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা! এই ধর না, এতকাল ধরে এই স্টেটে চাকরি করে চুল পাকিয়ে যে ধারণাটি পাকা-পোক্ত করে রেখেছিলুম, আজ এখানে এসে সেটি বিসর্জন দিতে হল। দেখলাম, সবই ভুয়ো।

তিনু। কি রকম?

নীলু। এতকাল ধারণা ছিল, বড়বাবু বড়বউকে লুকিয়ে মদ খান। বড় বউ কড়া মেজাজের লোক, ওসব পছন্দ করেন না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, বড়বাবু বড় বউয়ের সামনেই মদ নিয়ে যেতে বললেন, বড় বউ ছাড়া আর সকলকে, এমন কি নীলমণিকে পর্যন্ত, তাঁবু থেকে বার করে দিলেন এবং হুকুম দিলেন তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিংকে পাহারা দিতে, যেন আর কেউ না যায় সেখানে। অথচ বড়বাবু যাতে একটু গোপনে মদ খেতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে আমাকে কি কম নাকালটা হতে হয়েছে!

তিনু। [হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া] এর মানে কি?

নীলু। মানে আবার কি, বড় বউয়ের লীলা! ওই যে বললাম—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা। মেজবাবু-ছোটবাবুর সম্বন্ধে ঠিক একই ধরনের ঘা খেতে হল আমাকে।

তিনু। কি রকম?

[হুঁকাতে গোঁটা দুই টান দিলেন, ধোয়া বাহির হইল না]

নীলু। মেজবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা এক গেলাস করে সিদ্ধি খান। বিশ্বম্ভরটা চিরকাল বৈঠকখানায় তৈরি করে, মেজবাবুও চিরকাল বৈঠকখানায় বসেই খান। আমার ধারণা ছিল, বুঝি মেজমাকে লুকিয়েই খান। এখানেও সেই রকম ব্যবস্থাই রেখেছিলাম আমি। ওমা, এখানে এসে মেজমা-ই সিদ্ধির সরঞ্জাম চেয়ে পাঠালেন! কাদম্বিনী এসে বললে, মেজমা শিল, নোড়া, সিদ্ধি, বাদাম, পেস্তা, গোলাপ-জল—সব চাইছেন, নিজের হাতেই আজ সিদ্ধি তৈরি করবেন তিনি। বোঝ একবার কাণ্ডটা, নিজের হাতেই তৈরি করে দেবেন!

[তিনু ধোঁয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।
হঠাৎ দূরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল]

তিনু। কে যেন আসছে হে এদিকে!

[নীলুও চাহিয়া দেখিলেন]

নীলু। তালুকদার বোধ হয়।

তিনু। আর ছোটবাবুর সম্বন্ধে কি জানলে?

নীলু। ছোটবাবুর তাঁবুর সামনাসামনি চাকরানীদের তাঁবুটা দিয়েছিলাম, কারণ আমার জানা ছিল—

তিনু। হ্যাঁ, সে তো জানি।

নীলু। ছোটবাবু এসেই আমাকে প্রচণ্ড এক ধমক। আমার তাঁবুর সামনে চাকরানীদের তাঁবু কেন? ওদের অন্য তাঁবুতে দাও, ঠাকুরদা ঠানদি ওখানে থাকবেন, আর ঠিক পাশের তাঁবুটায় থাকবেন বাদল ডাক্তার। [চোখ বড় বড় করিয়া] যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

তিনু। আসল ব্যাপারটা তা হলে কি? এ যে দেখি, সবই গোলমাল করে দিলে তুমি!

[খুব জোরে জোরে টান দিয়াও যখন আর ধোঁয়া বাহির করিতে পারিলেন না, তখন
বিরক্ত মুখে হুঁকাটি নামাইয়া পাথরে ঠেসাইয়া রাখিলেন]

নীলু। খুব সম্ভবত কিছু খিটিরমিটির হয়েছে ছুঁড়িটার সঙ্গে। মেয়েমানুষের ব্যাপার—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা!

তিনু। ওর সঙ্গে খিটিরমিটির হলে আমি যে অকুল পাথারে পড়লাম হে! তা হলে—

[এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত তালুকদার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।
তাঁহার হাতে গাদা-বন্দুক, পরনে শিকারীর বেশ]

নীলু। তুমি এখনও যাওনি যে?

[তালুকদার ঘাড় ফিরাইয়া চতুর্দিকটা একবার দেখিয়া লইলেন।
তাহার পর উত্তর দিলেন]

তালুকদার। না, যাইনি এখনও, মানে—[সহসা] আচ্ছা, লছমনিয়াটা এসেছে এদিকে, দেখেছ?

তিনু। তোমারও খাজনা বাকি নাকি?

তালুকদার। খাজনা বাকি মানে?

নীলু। কেন, লছমনিয়াকে কি দবকার তোমার?

তালুকদার। মানে, গরুর গাড়িতে আসবার সময় আমার বন্দুকের খোলটা পড়ে গেছল, সে নাকি কুড়িয়ে রেখেছে। একবার খোঁজ করলে হত।

নীলু। সে কাল সকালে খোঁজ কর। এখন বন্দুকের খোলের কি দরকার?

তালুকদার। না, মানে—

[তালুকদার আবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন]

নীলু। শিকারে যেতে চাও তো এখুনি বেরিয়ে পড়।

তালুকদার। তাই যাই। কিন্তু- -, আচ্ছা থাক, পরে হবে।

[ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি চলিয়াই গেলেন]

তিনু। জামাই কি শিকারে বেরিয়ে গেছেন?

নীলু। বন্দুক কাঁধে করে তো বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন ভগবানই জানেন।

তিনু। আর কে কে গেল?

নীলু। নিতাই আর হরু মণ্ডল আর বিলটা গেছে। তালুকদারও যাচ্ছে।

তিনু। বিলটা আবার কে?

নীলু। ও আমাদের এখানকারই একজন প্রজা, শিকারে ভারী ঝোঁক। ওকে একটা বন্দুক দিয়েছি, দেবদারুগাছে গিয়ে চড়েছে সে। [হাসিলেন] কিন্তু যেখানে 'কিল' হয়েছে সেখানে বসেনি। ময়না নদীর চরের দিকে যে দেবদারুগাছটা আছে, সেইখানে বসেছে। ও বলছে, বাঘ আসবার ওইটেই রাস্তা।

তিনু। নিতাই বন্দুক পেলে কোথা? ওর নিজের তো এক মুখ ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। মুখেই রাজা উজির বাঘ গণ্ডার মারছে। কিন্তু সত্যিকার বাঘ তো আর মুখ দিয়ে মারা যাবে না!

নীলু। এস্টেটেরই বন্দুক দিলাম ওকেও একটা। অত উৎসাহ করে এসেছে বেচারী। তবে নিতাইই বল, তালুকদারই বল, আর জামাইবাবুই বল, বাঘ মারতে পারবেন না কেউ। যদি কেউ পারে, ওই হরু মণ্ডলই পারবে। মাচান বন্দুক কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না সে। নিজের চকচকে বর্শাটি নিয়ে সোজা গিয়ে শিমুলগাছে উঠে বসেছে। বাঘও আবার একটা নয় শুনছি, এখানকার সাঁওতালগুলো বলছিল, একজোড়া আছে। একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী।

তিনু। ওরে বাবা! এ অঞ্চলে এসে পড়বে না তো হে একটা ছিটকে মিটকে?

নীলু। [হাসিয়া] তোমার আর ভয় কি, সাতটা বাঘেও তোমার কিছু করতে পারবে না।

তিনু। কেন, আমি মোটা বলে বলছ? [একটু চুপ করিয়া রহিলেন] ছুটতে পার আমার সঙ্গে তুমি? এই কলমিপুরের মাঠটা আমি এক দমে এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারি, তা জান?

[নীলু দত্ত কিছু বলিলেন না, স্মিত মুখে নিজের মাথার টাকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দূরে শোনা গেল, কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে।]

তাহাদের গান ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল—

জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে
তখন স্মরণে বাজে কাহার মৃদুল মধুর বাণী
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

নীলু। পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ।

তিনু। তা বটে।

[কুঞ্জলালের দল নিকটবর্তী হইতেই তিনু চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িলেন এবং কাপড়ের কসিটা গুঁজিলেন]

তিনু। আমি চললাম ভাই। ওসব ছেলেছোকরাদের কাছ থেকে সরে থাকাই ভাল। নিজের মান নিজের কাছে।

নীলু। হ্যাঁ চল, আমিও যাই। আমাকে আবার দোলনাটা টাঙাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাসাদ কি এক রকম!

[উভয়ে চলিয়া গেলেন। কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া পড়িল। এবং গান থামাইয়া কেহ চেয়ারে কেহ শতরঞ্জিতে বসিয়া পড়িল। বঙ্কু শতরঞ্জির উপরই একটু দূরে গিয়া বসিল]

হাবুল। আর গান নয় মাইরি, প্রচুর চেঁচানো হয়েছে।

বীরেন। কি জিনিস লক্ষ্য করলি?

কুঞ্জ। কি?

বীরেন। আমরা আসতেই তিনু চাটুজ্জে আর নীলু দত্ত উঠে গেল।

কুঞ্জ। ভারী বয়ে গেল আমাদের।

বীরেন। তা তো বটেই, সে কথা বলছি না; কিন্তু এই খোলা মাঠে এসেও সবাই মিলে মিশে যে একটু ফুর্তি করবে, সে মেন্টালিটি কারও নয়। এখানেও সবাই নিজের নিজের গণ্ডি আঁকড়ে পড়ে আছেন। আমাদের ডাক্তারবাবুটিও তাঁবুতে ঢুকেছেন।

পাঁচু। ইচ্ছে করলে আমারও একটা তাঁবু পেতে পারতাম। চাকররা যে তাঁবুটা নিয়েছে, ছোটবাবুকে বললে ওটা ঠিক আমাদেরই দিয়ে দিতেন।

বীরেন। ও রকম তাঁবু পাওয়ার চেয়ে খোলা মাঠে পড়ে থাকা ঢের ভাল।

[শতরঞ্জির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল]

কুঞ্জ। নিশ্চয়।

হাবুল। আচ্ছা বীরেন, সূর্যের আলো গায়ে লাগলে সেদিন তুই বলছিলি কি যেন—

বীরেন। আল্‌ট্রাভায়োলেট রে।

হাবুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্‌ট্রাভায়োলেট রে নাকি শরীরের খুব উপকার করে? চাঁদের আলোতে সে রকম কিছু নেই? যদি থাকে তো বল, গেঞ্জিটা খুলে বসি।

হীরেন। তুই আলট্রা-ইডিয়ট, তাই এ কথা জিজ্ঞেস করলি। চাঁদের কি নিজের কোন আলো আছে?

হাবুল। ও, নেই নাকি? থাক, তা হলে গেঞ্জিটা আর খুলব না

পাঁচু। চাঁদের নিজের আলো থাক আর নাই থাক, ফিনিক ফুটিয়ে ছেড়েছে কিন্তু মাইরি।

হাবুল। কুঞ্জ, তুই তোব বাঁশীটা বাব করে সেই ভীমপলশ্রীখানা আলাপ কর, বেড়ে জমবে এখন।

পাঁচু। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস, এইখানেই সব জমায়েত হয়ে বসা যাক মাইরি, অন্য কোথাও আমাদের ঠিক খাপ খাচ্ছে না। চাকর বাকরদের ভেতরেও গিয়ে বসা যায় না, বাবুদের তাঁবুতেও ঢোকা যায় না, এইখানেই ভাল। জায়গাটিও বেশ নিরিবিলি আছে।

হাবুল। বীরেন রাজি হল না, কিন্তু চাকরবাকরদের মধ্যে বসলে সময়টা কাটত ভাল। গোহুম্‌নিটা যা নাচছে, দারুণ।

বীরেন। বড় ভাল্‌গার টেস্ট হয়ে গেছে তোর হেবলো।

[হাবুল দন্ত বিকশিত কবিয়া হাসিল]

পাঁচু। দেখ দেখ, বঙ্কা কেমন মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে, চেয়ে আছে!

কুঞ্জ। বেচারীর বউয়ের জন্যে মন কেমন করছে বোধ হয়।

পাঁচু। [আবৃত্তির সুরে]

হে বঙ্কু, আকাশে চেয়ে ভাবিতেছে কি তাকে?
পায়ে যার লাল আলতা, নোলক দোলে নাকে?

[বঙ্কু পাঁচুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হাসিয়া হানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল]

হাবুল। এই পাঁচা, বিরক্ত করছিস কেন ওকে? না না বঙ্কা, তুই ভাব। কুঞ্জ তুই শুরু কর।

[পাঁচু মুখে কাপড় দিয়া খিক খিক করিয়া হাসিতে লাগিল। কুঞ্জ বাঁশীতে ফুঁ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীমপলশ্রী জমিয়া উঠিল, সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল।]

হাবুল। [সহসা] ওটা কি বল তো— দেখ দেখ?

পাঁচু। কই?

হাবুল। ওই যে রে বটগাছের কাছটায়—ওই আবার ঢুকে পড়ল।

বীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বল দেখি ওটা?

[কুঞ্জ মুখ হইতে বাঁশী নামাইল।]

কুঞ্জ। বটগাছের ভেতর ঢুকে পড়ল, বলিস কি?

হাবুল। মাইরি বলছি, কি যেন একটা সাদাগোছের!

কুঞ্জ। ভূত-টুত নয় তো? এই বঙ্কা, এদিকে সরে এসে বস। মাত্র সেদিন বিয়ে করেছিস তুই, তোর কিছু হলে মনস্তাপের সীমা থাকবে না আমাদের। এদিকে সরে আয়।

হাবুল। ঠাট্টা নয় মাইরি, সত্যি আমি দেখলাম, কি যেন একটা ঢুকে পড়ল।

বীরেন। আমিও দেখেছি।

পাঁচু। আমি দেখতে পেলাম না মাইরি, গিয়ে দেখে আসব?

হাবুল। [ভ্যাঙাইয়া] গিয়ে দেখে আসব! হুজুকে কোথাকার!

কুঞ্জ। যাক না, দেখে আসুক না ব্যাপারটা কি?

পাঁচু। যাই। হাবুল, তুই সুদ্ধু চ ভাই।

হাবুল। আমাকে ঘাঁটিও না বলে দিচ্ছি।

বীরেন। তুই একাই যা না। তুই তো সব পারিস।

[পাঁচু উঠিয়া পড়িল এবং যাইবার মুখে বঙ্কুর মাথায় একটা ঠোক্কর দিয়ে বটগাছটার দিকে আগাইয়া গেল। সকলে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। একটু পরেই পাঁচুকে আর দেখা গেল না, গাছটার নিকটে গিয়া অন্ধকারে সে অদৃশ্য হইয়া গেল]

বীরেন। অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ!

কুঞ্জ। চমৎকার!

হাবুল। দেখছিস না, বঙ্কা পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে! বঙ্কুকে ঘায়েল করা একটু আধটু জ্যোৎস্নার কর্ম নয়।

বীরেন। কুঞ্জ, তুই বাজা, থামলি কেন?

কুঞ্জ। কি বাজাব, ফের ভীমপলশ্রী?

বীরেন। না। "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজা।

[কুঞ্জ "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজাইতে শুরু করিল। একটু পরে এমন জমিয়া উঠিল যে, হাবুল মুখ সূচালো করিয়া শিস দিতে লাগিল, বঙ্কুর ঈষৎ-কুঞ্চিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সেও গানটা মনে মনে গাহিতেছে। বীরেন গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে উন্মনাভাবে সুদূরপ্রসারী মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক স্বপ্নাতুর। পাঁচুর কথা সকলে যখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, এমন সময় দূরে পাঁচুকে দেখা গেল, সে বেশ দ্রুতপদেই আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল]

পাঁচু। ওরে, ও গানটা নয়, "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস" বাজা।

[কুঞ্জ বাঁশী থামাইল]

কুঞ্জ। কিছু দেখতে পেলি?

হাবুল। কি দেখলি?

পাঁচু। [হাবুলের প্রতি] এখন 'কি দেখলি', বলব কেন তোকে? তখন ডাকলাম,

আসা হল না!

হাবুল। দেখ পাঁচা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

[পাঁচু হঠাৎ বন্ধুকে আবেগভরে দুই হাতে জড়াইয়া
শতরঞ্জির উপর বসিয়া পড়িল]

পাঁচু। উঃ, মাইরি মাইরি, বন্ধু রে, তুই যদি দেখতিস!

কুঞ্জ। কি দেখলি, বল না?

পাঁচু। বটগাছের ঝুরির ভেতর ফুলঝুরি।

কুঞ্জ। ভূত নয়?

পাঁচু। ভিকু আর লছমনিয়া।

হাবুল। বলিস কি?

পাঁচু। মাইরি বলছি।

[এমন সময় ঝড়ঝড়ে বাইক করিয়া নীলু দত্ত হঠাৎ আসিয়া হাজির হইলেন]

নীলু। ভিকু চাকরটা এদিকে এসেছে? দেখেছ তোমরা কেউ?

পাঁচু। আজ্ঞে না।

নীলু। কোথা গেল ব্যাটা তা হলে?

কুঞ্জ। এই খানিক আগে সে তো ছোটবাবুর তাঁবুর দিকে গেল দেখলাম।

নীলু। আরে, সেইখান থেকেই তো আসছি আমি।

কুঞ্জ। আমি কিন্তু দেখলাম, সে ওই দিকেই গেল।

নীলু। ঠিক দেখেছ তুমি?

কুঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলু। পাগল করে মারলে ব্যাটারা আমাকে! এই দিগন্ত মাঠে কে যে কোথায় সরে পড়েছে, ধরতেই পারছি না কাউকে।

[নীলু দত্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাইক করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি একটু দূরে
গেলে সকলে সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[মেজবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও বড়বাবুর তাঁবুর মত দুই কক্ষবিশিষ্ট। ইহার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া শুধু জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীটাই নয়, নদীর উপর পালতোলা ছোট একখানি নৌকাও দেখা যাইতেছে। চাকরেরা যেখানে জটলা করিতেছে, সে অংশটা অপেক্ষাকৃত নিকটতর হইলেও দেখা যাইতেছে না। কারণ সেদিকের বাতায়নগুলি সমস্ত বন্ধ। তথাপি নাচের মাদলের এবং বাঁশীর আওয়াজ বেশ শোনা যাইতেছে। শ্রোতাদের কলরবগুঞ্জনও কিছু

কিছু ভাসিয়া আসিতেছে। তাঁবুর ভিতর মেজমা একটি ছোট টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া একটি শ্বেত পাথরের গ্লাসে সিদ্ধি ঢালিতেছেন। টেবিলে একটি চকচকে পানের বাটা, একটি প্লেটে অনেকগুলি সন্দেশ এবং একটি গ্লাস-ঢাকা ছোট কুজা রহিয়াছে। অপর কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা টাঙানো। পিছনের একটা দ্বার দিয়া তোয়ালেতে মাথা মুছিতে মুছিতে মেজবাবু প্রবেশ করিলেন। এইমাত্র তিনি স্নান সমাপন করিয়াছেন]

মেজবাবু। কই, আমার গেঞ্জিটা দাও।

মেজমা। [চেয়ারের হাতল হইতে গেঞ্জিটা লইয়া দিলেন] এই যে, নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, পর না এখন, পিঠময় যে জল, মুছিয়ে দিই।

[মেজবাবুর হাত হইতে তোয়ালেটা লইয়া পিঠ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং মেজবাবু পিঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

নাও এইবার।

[মেজবাবু গেঞ্জিটা পরিলেন ও একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন]

মেজবাবু। আঃ, চান করে বাঁচা গেল! কি প্রচণ্ড গরমই ছিল আজ!

[মেজমা একটি অ্যাটাচি কেস হইতে চিরুনি বাহির করিলেন ও মেজবাবুর চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন। মেজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন]

মেজমা। গরম বলে গরম, সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে গেছে আজ! তার ওপর তুমি এসেছ হাতীতে!

[মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। মেজমা পরিপাটীরূপে মাথাটি আঁচড়াইয়া দিয়া টেবিলের নিকটে গেলেন ও সিদ্ধির গ্লাসটি আনিয়া হাতে দিলেন]

খেয়ে দেখ দিকি, তোমার বিশ্বম্ভরের মত পেরেছি কি না?

মেজবাবু। [এক চুমুক পান করিয়া] চমৎকার! ওর চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।

মেজমা। [সহাস্যে] আর যাই কর, বুড়ো বয়সে মিছে কথাটা আর বল না।

মেজবাবু। না না, সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

[ঢকঢক করিয়া সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন]

মেজমা। [তোয়ালেটা আগাইয়া দিয়া] মুখটা মোছ।

[মেজবাবু মুখটা মুছিলেন, গোঁফজোড়াতে তা দিলেন এবং মেজমার মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন]

নাও, এইবার এগুলো খেয়ে ফেল।

[সন্দেশের প্লেটটা আগাইয়া দিলেন]

মেজবাবু। অতগুলো পারব না, পাগল নাকি!

মেজমা। খেতে কত রাত হবে তার ঠিক আছে! এখনও পোলাও চড়েনি।

মেজবাবু। তা না চড়ুক, তবু অতগুলো পারব না।

মেজমা। যা পার খাও না, কটাই বা আছে ওতে!

[মেজবাবু আর প্রতিবাদ না করিয়া খাইতে শুরু করিলেন]

ওরে কাদু!

[পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া কদম্বিনী বাহির হইল]

ঊষা, টোকন আর চাঁপাকে ডেকে নিয়ে আয়।

[কাদম্বিনী চলিয়া গেল, মেজবাবু নীরবে আহার করিতে লাগিলেন, মেজমা চুপ করিয়া রহিলেন। বাহিরে নাচের শব্দটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। গোহম্‌নির পায়ের ঘুঙুর বাজিতেছে—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম। মাদল এবং বাঁশীও পুরাদমে চলিয়াছে]

মেজমা। উঃ, কি গুলতানিই করছে ওরা!

[মেজবাবু স্মিত মুখে মেজমার মুখের পানে চাহিলেন]

মেজবাবু। চল, আমরাও কিছু একটা করি।

মেজমা। কি করবে?

[মেজবাবু একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া মেজমার মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, যেন মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়াছে]

মেজমা। বলছ না যে?

মেজবাবু। চল, দুজনে জমজমের পিঠে চড়ে একটা চক্কোর দিয়ে আসি।

মেজমা। পাগল নাকি, আমি হাতীতে চড়তে পারব না।

মেজবাবু। হাতীতে চড়া কি আর এমন মুস্কিল, সিঁড়ি দিয়ে তো হাওদায় চড়বে!

মেজমা। না না, ছি, সে কি হয়! মা, বটঠাকুর—এঁরা সব রয়েছেন, জানতে পারলে কি বলবেন!

[এইরূপ উত্তরই যে মেজবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, মুখভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন ও আর একটি সন্দেশ মুখে ফেলিলেন। মেজমা কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া মেজবাবুর নিকট রাখিলেন এবং পানের বাটা খুলিয়া পান সাজিতে লাগিলেন। বাহিরের আনন্দকলরব আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল]

মেজমা। হাতীতে যে চড়তে বলছ, মাহুতরা তো সব হুল্লোড় করছে, নিয়ে যাবে কে?

মেজবাবু। কেন, আমি। এ অঞ্চলে আমার চেয়ে ভাল মাহুত আর কেউ আছে নাকি? ভুলে গেলে সব?

মেজমা। ভুলেছি বইকি!

[তিনি সস্নেহে বিরাটকায় বলিষ্ঠদেহ মেজবাবুর দিকে হাসিমুখে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন]

তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্য কি কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু এ বয়েসে আর ওসব নয়।

[মেজবাবু কিছু বলিলেন না, আর একটি সন্দেশ তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন]

তা ছাড়া ও পাগলা হাতীর পিঠে কে চড়বে বাপু?

মেজবাবু। পাগলা বলেই তো মজাটা আরও বেশি। ভাব তো একবার, বিরাট মাঠে বিরাট জ্যোৎস্নায় বিরাট জমজমের পিঠে চড়ে চলেছি দুজনে। তোমার সর্বদাই ভয় করছে, এই বুঝি ক্ষেপল, আমি নির্বিকার বসে আছি, কারণ আমি জানি পাগলা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মেজমা। পাগলা বুঝি আবার ঠাণ্ডা হয়?

মেজবাবু। হয় না? প্রমাণ পাওনি তুমি তার?

[স্নিগ্ধ হাসিতে মেজমার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল]

মেজমা। না, দরকার নেই। বড় ভয় করে আমার।

[কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল]

কাদম্বিনী। ওরা কেউ আসছে না মা, ঊষাদিদি আর হীরেনবাবু দোলনাতে দুলছেন, টোকন আর চাঁপা জগদেও পাঁড়ের কাঁধে চেপে কোথায় বেড়াতে গেল, কিছুতেই এল না।

মেজমা। [সক্রোধে] পাঁড়েটার কি রকম আক্কেল, ওদের না খাইয়ে নিয়ে চলে গেল বেড়াতে! তুই আবার যা, উষাকে আর হীরেনকে ডেকে নিয়ে আয়, বল গে, মেজমা ভয়ানক রাগ করছেন।

[কাদম্বিনী চলিয়া গেল]

অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, না আছে লজ্জা, না আছে সরম। মা যা বলেন, তা ঠিকই। তরঙ্গিণীর ভাইটিও জুটেছে তেমনই।

[মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে একটির পর একটি সন্দেশ গম্ভীরভাবে আহার করিতে করিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, প্লেটে আর একটিও সন্দেশ নাই। গম্ভীর মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। প্লেটটি সরাইয়া দিয়া মেজমার মুখের পানে চাহিলেন। প্লেট শূন্য দেখিয়া মেজমার মুখখানিও প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল]

এই যে বললে, খেতে পারব না?

মেজবাবু। তোমাকে খুশি করবার জন্যে না পারি কি?

[জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ বাহিরের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল। ঘুঙুর, বাঁশী এবং মাদলের শব্দ ছাপাইয়া একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মেজবাবু গ্লাস হাতেই উঠিয়া পড়িলেন ও জানালার পর্দাটা সরাইয়া দিলেন। দূরে জ্যোৎস্নালোকে নৃত্যপরা গোহম্‌নাকে দেখা গেল। এক হাত কোমরে এবং এক হাত মাথায় দিয়া নাচিতেছে। খোঁপার বেলফুলের মালাটা যে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে খেয়াল নাই, তাহার ডান দিকে ভিড়ের মধ্যে যে বিশ্বম্ভর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সেদিকেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বিশ্বম্ভর কিন্তু খুব চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিতেছে এবং চার পাঁচ জন তাহাকে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। মেজবাবু বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিলেন]

এই বিশ্বম্ভর, এদিকে আয়।

[পর্দাটা ফেলিয়া দিলেন ও একনিশ্বাসে জলটা পান করিয়া ফেলিলেন।
ওদিক দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বম্ভর আসিয়া প্রবেশ করিল]

ওখানে কি করছিলি?

বিশ্বম্ভর। গোহুম্‌নি ছুঁড়িটা হুজুর, আমাকে ভেংচে দিলে। মেরে ধুনে দোব ওকে আমি।

মেজবাবু। চুপ করে বসে থাক বাইরে। সব জায়গায় গুণ্ডামি!

[বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ নিরীহ ভালমানুষটির মত বাহিরের দরজার পাশে চুপ করিয়া বসিল]

মেজমা। এই নে, একটু সন্দেশ খা, কেন যে গোঁয়ার্তুমি করিস।

[খানিকটা সন্দেশ তাহাকে দিলেন, সে হাত পাতিয়া লইল ও কোণের
দিকে মুখ ফিবাইয়া খাইতে লাগিল]

মেজমা। পর্দাটা ফেলে দিলে কেন? তুলে দাও, দেখি ওদের নাচ। এই নাও পান।

[বাটা হইতে পান বাহির করিয়া মেজবাবুকে দিলেন, মেজবাবু পানটা মুখে ফেলিয়া দিয়া পর্দাটা তুলিয়া দিলেন। গোহুম্‌নি আত্মহারা হইযা নাচিতেছে। তাহার ঘুঙুরের ঝমর ঝম ঝমর ঝম ঝমর ঝম, মাদলের ধিতাং তিনা, ধিতাং তিনা, এবং বাঁশীর তুতুর তুয়া সমস্ত জ্যোৎস্নাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। মেজমা চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মেজবাবু একটা ক্যাম্প-চেয়ার টানিয়া তাহাতে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। দ্বারপথে দেখা গেল, উষা ও হীরেন আসিতেছে, পিছনে কাদম্বিনী। হীরেন হাতের সিগারেটটায় গোটা দুই টান মারিয়া সেটা ফেলিয়া দিল। নাচ, বাঁশী ও মাদলের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। একটু পরেই উষা, হীরেন ও কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল।
কাদম্বিনী আসিয়াই পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেল]

উষা। মেজমা, ডাকছ তুমি আমাদের?

মেজমা। [ফিরিয়া] হঁ্যা, দয়া করে খেয়ে আমাকে রেহাই দাও মা।

[আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হীরেনকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন]

উষা। এখন খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

মেজমা। না ইচ্ছে করলেও খাও, তোমার আবার কবে খেতে ইচ্ছে করে! [হীরেনের প্রতি] তুমিও তাই, খাও দুটো।

হীরেন। [স্মিত মুখে] দিন।

উষা। যখনই মেজমা সন্দেশের হাঁড়ি এনেছেন, তখনই জানি, না শেষ হওয়া পর্যন্ত কারও নিস্তার নেই।

মেজমা। (সন্দেশ বাহির করিতে করিতে) বেশ বেশ, তোকে খেতে হবে না, তুই যা।

উষা। বারে, আমি খাব না বললাম বুঝি, আমি তো শুধু বললাম, খেতে ইচ্ছে করছে না।

[উষা ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেজমা তাহার পানে রোষকটাক্ষে একবার চাহিয়া এক
প্লেট সন্দেশ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। হীরেনকেও এক প্লেট দিলেন। উষা গপগপ
করিয়া নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিল এবং হীরেনকেও তাড়া দিল]

শিগগির খেয়ে নিন। দোলনা খালি পেলে কেউ না কেউ দখল করে বসবে। ছোটমা একবার খবর পেলে হয়!

মেজমা। কাদু!

[কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিল]

ছোটবাবুর তাঁবুতে দিয়ে আয় কিছু মিষ্টি, এই নে।

[একটি প্লেটে করিয়া মিষ্টি দিলেন, কাদম্বিনী তাহা লইয়া চলিয়া গেল]

হীরেন। (প্লেটটা নামাইয়া দিয়া) এ দুটো আর পারব না মেজদি, অনেক দিয়েছিলেন।

মেজমা। সুরেন কি শিকারে বেরিয়ে গেছে?

হীরেন। এখনও ঠিক মাচানে গিয়ে ওঠেনি বোধ হয়। ওই যে, ওই নৌকোটায় বেড়াচ্ছে ওরা।

[নদীবক্ষে যে পাল-তোলা পানসিটা ভাসিতেছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল মেজমা।]

ওরা মানে, কে কে?

হীরেন। মীনাও আছে। সুরেন তো ঊষাকেও নিতে চাইলে, কিন্তু ঊষা কিছুতে গেল না।

ঊষা। নৌকোয় চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে বুঝি? তার চেয়ে দোলনা ঢের ভাল।

হীরেন। মীনাকে একটু ঘুরিয়ে নামিয়ে দিয়ে তারপর সুরেন মাচানে গিয়ে বসবে বোধ হয়। ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা তো সব চলে গেছে। এখুনি একটু আগে তালুকদার মশাইও গেলেন।

মেজমা। তুমি যাবে না?

হীরেন। আমার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। দেখি, এক কাপ কফি খেয়ে যদি ভাল লাগে, যাব। বাঃ, এখানে এরা বেশ জমিয়েছে তো!

[খোলা জানালাটার কাছে আগাইয়া গিয়া নাচ দেখিতে লাগিল।
মেজমাও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন]

ঊষা। (মেজবাবুর গায়ে হাত দিয়া) মেজকা, ঘুমোচ্ছ?

মেজবাবু। (চোখ খুলিয়া, স্মিত হাস্য সহকারে) না।

ঊষা। চমৎকার দোলনা টাঙিয়েছি আমরা।

[মেজবাবু আর একটু হাসিলেন। ঊষা হীরেনের হাত ধরিয়া
হিড় হিড় করিয়া টানিতে লাগিল]

কই আপনি চলুন এখানেই যে দাঁড়িয়ে পড়লেন!

হীরেন। দাঁড়াও না, একটু দেখে নিই।

ঊষা। তবে আপনি থাকুন, আমি যাই।

[রাগে গরগর করিতে করিতে ঊষা চলিয়া গেল। ঊষা চলিয়া গেলে একটু হাসিয়া হীরেনও তাহার অনুসরণ করিল। মেজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া চেয়ারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। মেজমা তাঁহার দিকে চকিতে একবার চাহিয়া আবার জানালায় দাঁড়াইয়া গোহমনির

নাচ দেখিতে লাগিলেন। নাচ, বাঁশী এবং মাদল উদ্দাম দুনে চড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মেজমা আর একবার মেজবাবুর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন।

মেজবাবু ঠিক তেমনই ভাবে শুইয়া আছেন]

মেজমা। কই, হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

[মেজবাবু নীরব]

ঘুমোচ্ছ নাকি?

মেজবাবু। না ঘুমোইনি।

মেজমা। হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

মেজবাবু। তোমার যখন ইচ্ছে নেই, তখন থাক।

মেজমা। বেশ তো, চল না, যাই।

মেজবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গেল

মেজবাবু। এই বিশ্বম্ভর, জমজমের পিঠে হাওদা দিয়ে নিয়ে আসতে বল। সিঁড়ি আনতে বলিস, আর ঝংরুকে বল তার ডাঙশটা আমাকে দিয়ে যেতে। আমিই চালাব। তুইও লাঠিটা নিয়ে সঙ্গে চল।

বিশ্বম্ভর। যে আজ্ঞে।

[সোৎসাহে উঠিয়া চলিয়া গেল]

মেজবাবু। আমি জানতাম, তুমি ঠিক রাজি হবে।

[আদুরে আবদেরে ছেলের অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিয়া জননী যেমন প্রসন্ন মুখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, মেজমা ঠিক তেমনই করিয়া মেজবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

[ময়না নদীর তীরে প্রস্তরাকীর্ণ একটা অংশ। ছোট বড় নানা আকারের কালো কালো পাথর ইতস্তত ছড়ানো আছে। প্রকাণ্ড চ্যাটালো চওড়া একখানা পাথর ঠিক ময়না নদীর উপরই রহিয়াছে। ময়না নদীর স্রোত ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তাহাতে লাগিতেছে। হরিশ খুড়ো একাকী নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নদীর বাঁকের মুখে জ্যোৎস্নাকিরণ অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছে। সেই দিকেই চাহিয়া খুড়ো তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বন্ধু তালুকদার শিকারে চলিয়া যাওয়াতে তাহার গল্প শুনিবার লোক কেহ নাই। তাই তিনি আপন মনে একা নদীর তীরে বসিয়া কল্পনার জাল বুনিতেছেন। এমন সময় জগদেও পাঁড়েকে দেখা গেল। তাহার এক কাঁধে টোকন এবং আর এক কাঁধে চাঁপা।

পাঁড়ে উচ্চৈস্বরে ভজন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে]

হরি দরশনকি পিয়াসী (আঁখিয়া)
দেখন চাহত কমল নয়ন
নিশরাতদিন উদাসী—(আঁখিয়া)

কেশর তিলক মোতিয়নকি মালা
বৃন্দাবনকে বাসী (আঁখিয়া)
সুর শ্যাম প্রভু আশ চরণকি
লইহো করবট কাশী (আঁখিয়া)
কেউ কা মন হায় কেউ না জানতু
লোগনকে মন হাসি (আঁখিয়া)

[পাঁড়ে হরিশ খুড়োকে দেখিয়া থামিল এবং চাঁপা ও টোকনকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া নিকটবর্তী একটা পাথরে উপবেশন করিল]

পাঁড়ে। খুড়াজি, এখান এস্কারা কি হোচ্ছে?

হরিশ। চুপচাপ বসে আছি ভাই।

চাঁপা। (টোকনকে জনান্তিকে) দাদু খুব ভাল গপ্পো বলতে পারে। তুই গিয়ে বল না, তুই বললে ঠিক বলবে, আমি বললে ধমক দেবে।

[টোকন আগাইয়া গেল]

টোকন। একটা গপ্পো বল না দাদু!

চাঁপা। (আগাইয়া আসিয়া) দাদুকে বিরক্ত করছিস কেন? দেখেছ দাদু, টোকনের স্বভাব?

পাঁড়ে। হাঁ হাঁ, ছোড়েন একঠো মজেদার গপসপ।

চাঁপা। দাদুর যদি ইচ্ছে হয়, তবে দাদু বলবে, কি বল দাদু?

আঙুলে কাপড়ের আঁচলটা জড়াইতে জড়াইতে আড়চোখে দাদুর দিকে চাহিতে লাগিল

হরিশ। (স্মিত মুখে) গল্প? কিসের গল্প?

পাঁড়ে। বাঘ, ভাল, রাছস—আপনি তো কেতো জানেন, ছোড়েন কোই একঠো।

[হরিশ জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন]

হরিশ। আচ্ছা, শোন তবে। ভাল করে বস সব।

[সকলে হরিশ খুড়োকে ঘিরিয়া উদগ্রীব হইয়া বসিল]

হরিশ। অনেক অনে—ক দিন আগে এক দেশে এক রাজকন্যে ছিল। রাজকন্যে তো রাজকন্যে! কি তার রূপ! টুকটুকে রঙ, কুচকুচে কালো একমাথা চুল, ছোট ছোট সাদা মুক্তোর মত দাঁত, পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা টানা চোখ—

চাঁপা। কি নাম ছিল তার?

হরিশ। তবেই তো বিপদে ফেললে দিদি, নাম তো ঠিক মনে নেই।

টোকন। নাম নিয়ে কি হবে, রাজকন্যে নামই তো বেশ নাম।

চাঁপা। (হাসিয়া উঠিল) রাজকন্যে বুঝি আবার নাম হয় কারও? কিচ্ছু বুদ্ধি নেই টোকনটার, দেখছেন দাদু?

হরিশ। তা তো দেখছি, নাম তার ছিলও একটা, দাঁড়াও ভাবি; (ভাবিয়া) মনে পড়েছে, নাম ছিল তার চম্পাবতী।

টোকন। তারপর?

হরিশ। তারপর—দাঁড়াও, বিড়িটা ধরাই আগে।

[বিড়ি ধরাইলেন]

পাঁড়ে। দিন হামাকে ভি একঠো।

[হরিশ খুড়ো জগদেওকেও একটা বিড়ি দিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া দিলেন]

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। তারপর একদিন হল এক কাণ্ড!

টোকন। কি?

হরিশ। রাজকন্যে চম্পাবতী ভোরবেলা উঠে নিজের বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, আর ঠিক সেই সময় পুব দিক বাঙা করে সূর্যদেব উঠছেন। দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। সূর্যদেব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, কি আশ্চর্য, মানুষেরও এমন রূপ হয়, এমন দুধে আলতায় গোলা রঙ, এমন টুকটুকে, এমন ফুটফুটে চমৎকার তো! ভাব করতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন ডিউটির সময়, আকাশ থেকে নেবে আসা মুস্কিল।

[হরিশ খুড়ো খুব চিন্তিত মুখে বিড়িতে একটি টান দিলেন]

টোকন। সূর্যদেব আকাশ থেকে নাববে কি করে, সিঁড়ি দিয়ে?

[চাঁপা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

চাঁপা। টোকনটার বুদ্ধি দেখেছেন দাদু, আকাশ থেকে নাবতে দেবতাদের বুঝি সিঁড়ির দরকার হয়!

টোকন। না হলে নাববে কি করে?

পাঁড়ে। দেওতারা সব কুছ পারে ভাই।

টোকন। তারপর?

হরিশ। তারপর সেদিন সমস্ত দিন তো কেটে গেল, সূর্যদেব আকাশ থেকে নাবতে পারলেন না। কিন্তু মনটি পড়ে রইল তাঁর পৃথিবীর দিকে। রাত্তিরে করলেন এক মজার কাণ্ড।

চাঁপা। কি?

[হরিশ বিড়িতে আবার একটি টান দিলেন]

হরিশ। রাত্তিরে রাজকন্যে চম্পাবতী দুধের মত সাদা ধপধপে বিছানাটিতে শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে ছিল। সেদিন ঠিক এই আজকের মত জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় দশ দিক ভেসে যাচ্ছে। বাগানের প্রকাণ্ড পুকুরটায় অসংখ্য কুমুদফুল ফুটেছে, জানলার নীচে জুঁইফুলের ঝাড়টায় ফুলের সে কি ভিড়! হঠাৎ চম্পাবতীর মনে হল, ভয়ানক গরম লাগছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় এত গরম কেন? ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী।

টোকন। [রুদ্ধশ্বাসে] কেন?

চাঁপা। আঃ, চুপ কর না তুই।

পাঁড়ে। হাল্লা মৎ মাচাও ভাই, শুনো না।

[হরিশ খুড়ো চিন্তিত মুখে বিড়িতে টান দিলেন]

হরিশ। ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী। পশ্চিম দিকের জানালাটায় টাঙানো ছিল নীল রেশমের একা পর্দা, আর ঠিক সেইখানটাতেই জ্বলছিল সোনার পিলসুজে স্ফটিকের একটা প্রদীপ। চম্পাবতী দেখলে, প্রদীপের লম্বা শিখাটা হয়ে গেছে পয়সার মত গোল, আর তার থেকে বেরুচ্ছে টকটকে লাল জ্যোতি—ঠিক যেন নীল পর্দাটার গায়ে ছোট্ট একটা সূর্য উঠেছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল চম্পাবতী।

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। তারপর সূর্যদেব কথা কইলেন। বললেন, ভয় পেও না রাজকন্যে চম্পাবতী, আমি আকাশের সূর্য, তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। চম্পাবতী বললে, তুমি সূর্য। তা হলে অতটুকু কেন? সূর্য তো অনেক বড়। সূর্য বললে—

ছোট্ট তুমি চম্পাবতী রাজকন্যে লো
ছোট্ট হয়ে তাই এসেছি তোর জন্যে লো।

এস, দুজনে ভাব করি। আমিও টুকটুকে তুমিও টুকটুকে। চম্পাবতী বললে, তোমার সঙ্গে ভাব করব না। সূর্য বললে, কেন? চম্পাবতী বললে, তুমি এলেই জ্যোৎস্না চলে যায়, জ্যোৎস্না আমার ভারী ভাল লাগে। এখন কেমন বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। তুমি এলেই তো সব ফুরিয়ে যাবে। তুমি এস না, এখন তুমি যাও।

টোকন। রাজকন্যেটা তো ভারী দুষ্টু।

চাঁপা। বারে, দুষ্টু কেন হতে যাবে? ওর যদি ওর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে না হয়, জোর করে ভাব করতে হবে তবু? কি বলেন দাদু?

পাঁড়ে। আরে শুনো না ভাই চুপসে সব। খালি কলর বলর কলর বলর!

হরিশ। সূর্যও বললে, ও কথা বলতে নেই রাজকন্যে চম্পাবতী, অতিথিকে অমন করে তাড়িয়ে দিতে আছে! ছি! চম্পাবতী একটু ভাবলে, তারপর বললে, বেশ, তা হলে আমাদের অতিথিশালায় চল তুমি, অতিথিরা সেইখানে থাকেন। সূর্য বললে, তোমার পুতুলরা যেইখানে আছে, সেইখানে নিয়ে চল না আমায়। চম্পাবতী বললে, তা হলেই হয়েছে, তুমি গেলেই তো সব উঠে পড়বে, যা কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি ওদের। সূর্য তখন বললে, বেশ, তা হলে অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে চল আমাকে। তোমাদের অতিথিশালায় যাব না, সেখানে কত দেশের রাজা-রাজড়া অতিথি রয়েছেন, হোমরা-চোমরা লোক দেখলে বড্ড ভয় করে আমার।

টোকন। তারপর?

[হরিশ বিড়িতে একটি টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন]

হরিশ। তারপর চম্পাবতীর মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। বললে বেশ, খুব নিরিবিলি জায়গাতেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, চল। এই না বলে রাজকন্যে চম্পাবতী স্ফটিকের প্রদীপটি তুলে নিয়ে নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলের আড়ালে ঢেকে এক চোর-কুঠরিতে গিয়ে ঢুকল। চোরকুঠরির কোণে প্রদীপটি রেখে বললে, তুমি এইখানে থাক, আমি আসছি

এক্ষুণি। এই বলে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে শেকল তুলে চোরকুঠরিটি বন্ধ করে দিলে। সূর্যদেব হয়ে রইলেন বন্দী।

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। রাত আর পোয়ায় না। রাজকন্যে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

টোকন। তারপর।

হরিশ। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

পাঁড়ে। উস্‌কা বাদ কি হোলো?

হরিশ। তারপর ওই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না। ওই যে, দেখ না!

[হরিশ খুড়ো আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—দূরে ময়না নদীর বুকে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে]

চাঁপা। রাজকন্যে চম্পাবতী কই?

হরিশ। চোখ বুজে ফেল, তা হলেই দেখতে পাবে।

[হরিশ খুড়ো চোখ বুজিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন]

রাজকন্যে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

[টোকন, চাঁপা, জগদেও তিনজনেই চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল]

পঞ্চম দৃশ্য

[ছোটবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও অন্য তাঁবুগুলির মত। গোহম্‌নিদের নাচের আসর এ তাঁবুটির আরও কাছে। এখন নাচ গান থামাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছে। মৃদু কলরব ছাড়া আর কিছু শোনা যাইতেছে না। সমস্ত জানালাগুলি, এমন কি তাঁবুর দ্বার পর্যন্ত বন্ধ বলিয়া বাহিরের কিছু দেখাও যাইতেছে না। এ তাঁবুতেও আসবাবপত্র অন্য তাঁবুগুলির মত, প্রচুর নয়, তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আছে। টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলিতেছে, বেশ একটু জোরেই জ্বলিতেছে। তরঙ্গিণী একটা টিনের চেয়ারের উপর পা দুইটি তুলিয়া একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার চোখে মুখে চাপা হাসি। ছোটবাবু মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, ঘরে আর কেহ নাই]

তরঙ্গিণী। পায়ে হাত দিচ্ছ, পাপ হবে আমার কিন্তু।

ছোটবাবু। হোক গে, কিছু কিছু পাপ হওয়া ভাল।

তরঙ্গিণী। কেন?

ছোটবাবু। আমি তো নির্ঘাত নরকে যাব জানি। নরকে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে যাব, তোমাকে যদি না পাই সেখানে। গোড়ালিটা তোল।

[তরঙ্গিণী গোড়ালি তুলিলেন]

তোমার নীলাম্বরী শাড়িখানা এনেছ তো?

তরঙ্গিণী। এনেছি। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

ছোটবাবু। আজ নিজের হাতে তোমাকে সাজাব।

তরঙ্গিণী। তারপর?

ছোটবাবু। দেখব।

তরঙ্গিণী। তারপর?

[মুখ টিপিয়া হাসিলেন, গালে টোল পড়িল]

ছোটবাবু। [তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া] তারপর কি করব আর ভাবতে পারছি না। গোড়ালিটা তোল না ভাল করে!

তরঙ্গিণী। আর কত তুলব! এই তো তুলেছি।

[গোড়ালিটা আর একটু তুলিলেন, ছোটবাবু ঘাড়টা আরও নীচু করিয়া গোড়ালিতে আলতা পরাইয়া দিতে লাগিলেন]

ছোটবাবু। এর পর কি করব, সত্যিই সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

তরঙ্গিণী। চল না, বেড়াইগে দুজনে।

ছোটবাবু। পায়ে হেঁটে?

তরঙ্গিণী। সবাই তো বেড়াচ্ছে।

ছোটবাবু। তুমি কি আর সবাইয়ের মত?

তরঙ্গিণী। আহা!

ছোটবাবু। বেড়াতে হলে ঘোড়া নিয়ে বেরোতে হয়। ধূ ধূ মাঠে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি দুজনে দুটো ঘোড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি!

তরঙ্গিণী। ঘোড়ায় চড়তে যে জানি না।

ছোটবাবু। তবে আর বেড়াবার শখ কেন? পায়ে হেঁটে হোঁচট খেতে খেতে বেড়ানোর কোন মানে হয় এমন রাতে? এমন রাতে বেড়াতে হলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে হয়। কানের পাশ দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে যাবে—

[তরঙ্গিণী হঠাৎ পা দুইটা গুটাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন]

ও কি?

তরঙ্গিণী। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি?

তরঙ্গিণী। বাদল ডাক্তারের মোটর-বাইকটা নিয়ে চল যাই। ওর তো সাইড-কারও আছে।

ছোটবাবু। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু ওর যা ফট ফট আওয়াজ, গাঁ সুদ্ধু লোক জেনে যাবে—ছোটবাবু ছোট বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

তরঙ্গিণী। জানলেই বা।

ছোটবাবু। তোমার মত স্ত্রীকে নিয়ে ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় বেরোনোটা উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করারই সামিল তো! সেটা ভদ্রতায় বাধে।

তরঙ্গিণী। তা হলে আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি?

তরঙ্গিণী। ব্যাটাছেলের পোশাক পরে নিলে কি হয়? ধুতি, পাঞ্জাবি আর মাথায় পাগড়ি? কেউ চিনতে পারবে না!

ছোটবাবু। বাঃ, চমৎকার হয় তা হলে! তাই চল, যাওয়া যাক। আমার পাঞ্জাবি কি তোমার গায়ে হবে?

তরঙ্গিণী। পাঞ্জাবি একটু ঢিলে হলে কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া একটু ঢিলেও দরকার।

মুচকি হাসিলেন, গালে টোল পড়িল

ছোটবাবু। কই, বার কর তো দেখি একটা পাঞ্জাবি।

তরঙ্গিণী। ওমা, আমাদের সুটকেসটা আবার মায়ের তাঁবুতে দিয়ে দিয়েছে ভুল করে। আনতে বলব বলব করে ভুলে গেলাম। তুমি তো কালীর মা, ভিকু সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলে, এখন আনে কে গিয়ে?

ছোটবাবু। আমি না হয় নিয়ে আসি।

তরঙ্গিণী। আহা!

[মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তরঙ্গিণী চলিয়া গেলে ছোটবাবু তাঁবুর দরজাটা ফাঁক করিয়া বাদল ডাক্তারকে ডাকিলেন। পাশেই তাঁহার তাঁবু]

ছোটবাবু। ওহে ডাক্তার!

[নেপথ্যে বাদল] কি বলছেন?

ছোটবাবু। তোমার মোটর-বাইকটা নিয়ে একবার বেরুতে চাই।

নেপথ্যে বাদল। স্বচ্ছন্দে।

ছোটবাবু। তেল আছে তো?

নেপথ্যে বাদল। প্রচুর।

ছোটবাবু। কি করছ? মনে হচ্ছে যেন—

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, লিখছি।

ছোটবাবু। সেম থীম?

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, মিকস্‌ড উইথ মুন-লাইট।

ছোটবাবু। মুন-লাইট, না মুন-শাইন?

নেপথ্যে বাদল। দুইই।

ছোটবাবু। সাবাস! লেখ লেখ, বিরক্ত করব না তা হলে। একি, ঠানদি যে! আসুন আসুন।

[ঠানদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পরনে চওড়া লাল আঁশ-পেড়ে একখানি ঢাকাই]

ঠানদি। তোমার ঠাকুরদা এখানে এসেছিলেন?

ছোটবাবু। কই, না।

ঠানদি। কোথায় গেলেন তা হলে?

ছোটবাবু। এ সময় আপনাকে ছেড়ে যাওয়া তো অন্যায়।

ঠানদি। দেখ তো ভাই।

ছোটবাবু। কতক্ষণ থেকে পাচ্ছেন না?

ঠানদি। অনেকক্ষণ থেকে।

ছোটবাবু। তা হলে তো চিন্তার কথা। কলমিপুরের মাঠে ময়না নদীর ধারে ধারে পরীরা নাবে শুনেছি। কেউ উড়িয়ে-টুড়িয়ে নিয়ে গেল না তো!

ঠানদি। শুধু পরী নয়, কিন্নরও নাবে শুনেছি। তোমার পরীটি গেলেন কোথা, দেখতে পাচ্ছি না যে?

ছোটবাবু। মায়ের তাঁবুতে গেছে।

ঠানদি। দেখো, উড়ে না যায়, তোমাদেরই ভয় বেশি। আমাদের বুড়ো হাবড়াকে কে আর পছন্দ করবে বল? এখানে আসেননি তা হলে?

ছোটবাবু। না।

[ঠানদি চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিলেন]

ঠানদি। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল, আমাদের তিনু চাটুজ্জে একটু আগে এসে ধরেছিল আমাকে, তার খাজনা নাকি সুদে আসলে দাঁড়িয়েছে অনেক, তোমাকে বলে কয়ে মাপ করিয়ে দিতে হবে।

ছোটবাবু। আপনি যদি হুকুম করেন, আমার সাধ্য আছে অমান্য করি?

ঠানদি। (হাসিয়া) হুকুম করব কেন ভাই, তোমাদের জমিদারি ব্যাপারে আমাদের কথা কইতে যাওয়াই অন্যায়। তবে তিনু চাটুজ্জে ছাপোষা মানুষ, প্রথম পক্ষেরই চারটি মেয়ে পাঁচটি ছেলে, তার ওপর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, আবার বিয়ে করে মরেছে; এ বউটারও নাকি ছেলে হবে আসছে মাসে।

ছোটবাবু। তা হলে তো করিৎকর্মা লোক।

ঠানদি। তোমরা সবাই এক জাতের, দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে।

ছোটবাবু। আপনার মুখে এ কথা সাজে না ঠানদি। ঠাকুরদার তো আপনিই ধ্যান জ্ঞান।

ঠানদি। সব জানি গো, সব জানি। এখন তিনুকে কি বলব, বল?

ছোটবাবু। আপনি যখন ওর পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন মাপ করতেই হবে। বলে দোব আমি চৌধুরীকে।

ঠানদি। আহা, বড় উপকার হয় তা হলে ব্রাহ্মণের। এবার তা হলে যাই ভাই দেখি, আমার কিন্নরটি কার পাল্লায় গিয়ে পড়লেন!

[ঠানদি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর একটি জানালার পর্দা একটু সরিয়া গেল এবং তাহার ফাঁক দিয়া ঠাকুরদা সন্তর্পণে বাহির হইতে মুণ্ড বাড়াইলেন]

ছোটবাবু। (সবিস্ময়ে) একি, ঠাকুরদা যে!

ঠাকুরদা। (চুপি চুপি) তোমার ঠানদির গলার আওয়াজ পেলাম বলে মনে হল!

ছোটবাবু। হ্যাঁ, তিনি আপনাকেই তো খুঁজছেন। ওখানে কি করছেন আপনি?

ঠাকুরদা। তোমার তাঁবুর আড়ালে আত্মগোপন করে একটু নাচ দেখছি। ফাঁস করে দিও না যেন। তোমাদের গোপন পরামর্শটিও শুনে ফেলেছি।

[হাসিলেন]

ছোটবাবু। ফাঁস করে দেবেন না যেন।

ঠাকুরদা। পাগল! ওই আবার কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি!

[ঠাকুরদা মুণ্ড টানিয়া লইলেন। পাঞ্জাবি প্রভৃতি লইয়া তরঙ্গিণী প্রবেশ করিলেন]

তরঙ্গিণী। ভারী একটা মজার জিনিস দেখে এলাম।

ছোটবাবু। (চুপি চুপি) যা বলবে, আস্তে বল। ঠিক পাশেই ঠাকুরদা আড়ি পেতে বসে আছেন।

তরঙ্গিণী। (নিম্নকণ্ঠে) তাই নাকি? গিয়ে দেখি, জিতুর মা অঘোরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মা তাঁবুর জানালাটি খুলে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছেন আর মালা ঘোরাচ্ছেন। আমি গিয়ে সুটকেস খুলে এই সব বার করলাম, টেরও পেলেন না। পা টিপে টিপে কাছে গেলাম, কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না, একেবারে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন জ্যোৎস্নার দিকে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, যে মালাটা ঘোরাচ্ছেন, সেটা হরিনামের মালা নয় একটা শুকনো ফুলের মালা।

ছোটবাবু। সেকি?

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ, টোকন আসবার সময় যে মালাটা পরে এসেছিল সকাল-বেলায়, সেইটে বোধ হয় মায়ের তাঁবুতে ফেলে এসেছে। মা হরিনামের মালার বদলে সেইটে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন বসে বসে।

বাহিরে গোহমনি গান গাহিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী এবং মাদলও শুরু হইয়া গেল

ছোটবাবু। এস, ওগুলো পরিয়ে দিই তোমায়।

তরঙ্গিণী। থাম, আগে একটু দেখি।

ছোটবাবু। ও জানলাটা খুলো না, ঠিক ওর তলাতেই ঠাকুরদা বসে আছেন।

[মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরঙ্গিণী আর একটি জানালার
পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিলেন]

তরঙ্গিণী। কোমরে হাত দিয়া গা দুলিয়ে নাচের কি বাহার মেয়ের—দেখ দেখ।

[ছোটবাবুও উঠিয়া আসিয়া ফাঁক দিয়া উঁকি দিলেন]

আ মলো বিরিঞ্চিটাও এসে ওখানে বসেছে দেখছি যে। মুখ ফুলে তো ঢোল হয়েছে। ওমা, দেখ দেখ, গোহমনি নাচতে নাচতে ওর থুতনিতে হাত দিয়ে দিয়ে আদর করছে! আচ্ছা, কি বেহায়া বাপু মেয়েটা।

ছোটবাবু। ওসব থাক এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল, তোমাকে ওগুলো আগে পরিয়ে দিই।

তরঙ্গিণী। ইস, তোমাকে পরাতে দোব বইকি, আমি নিজে পরব। পর্দা সরাইয়া পাশের কক্ষে চলিয়া গেলেন। ছোটবাবু মুচকি হাসিয়া ক্যাম্পচেয়ারটায় উপবেশন করিলেন। বাহিরে বাঁশী ও মাদল খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গোহম্‌নির গান স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল—

একা নাহি যাব যমুনায় লো—
যাইতে যমুনা জলে
শ্রীরাধা সখীরে বলে
কদমতলায়
কালিয়া দাঁড়ায় লো,
একা নাহি যাব যমুনায় লো।

বাদল ডাক্তার। [নেপথ্য হইতে] আসতে পারি?

ছোটবাবু। এস এস।

[পর্দা ঠেলিয়া বাদল ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। গায়ে ধপধপে ফরসা একটি গেঞ্জি, বাঁ হাতের কব্জিতে একটি সাদা রুমাল বাঁধা, কাপড় ঢিলাধরনে মালকোঁচা মারিয়া পরা। সর্বদাই বাইকে চড়িতে হয় বলিয়া এই ভাবে তিনি কাপড় পরিয়া থাকেন। পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডাল। ভারী মুখখানাতে বুদ্ধিদীপ্ত স্মিত হাসি]

বাদল। আপনি কি একাই বেরুবেন?

ছোটবাবু। না, ঠিক একা নয়।

বাদল। আর কে?

ছোটবাবু। আমার একটি গুজরাটি বন্ধু এসে হাজির হয়েছে কলকাতা থেকে। হিরণপুরে এসে আমাকে না পেয়ে একটা বাইক করে এইখানে এসে পড়েছে। তাকেই নিয়ে ঘুরব একটু।

বাদল। ও!

ছোটবাবু। কবিতা লেখা হয়ে গেল?

বাদল। [সহাস্যে] একটা সনেট হল।

ছোটবাবু। সেই একই ধরনের ইংরেজী বাংলা মিশানো?

বাদল। হ্যাঁ।

ছোটবাবু। কই দেখি?

বাদল। শুনবেন?

ছোটবাবু। নিশ্চয়ই।

বাদল। নিয়ে আসি তা হলে।

[বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী উঁকি দিল। চোখ মুখ হইতে হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে।]

তরঙ্গিণী। গুজরাটি বন্ধু!

ছোটবাবু। তা ছাড়া আর উপায় কি?

তরঙ্গিণী। আমি বুঝি গুজরাটির মতন দেখতে

ছোটবাবু। চুপ চুপ, ডাক্তার আসছে।

[তরঙ্গিণী পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। বাদল ডাক্তার কবিতা লইয়া প্রবেশ করিলেন]

বাদল। মহা মুস্কিলে পড়া গেছে!

ছোটবাবু। কি?

বাদল। লাহিড়ীটা শ্যাম্‌পেন খেয়ে আমার বিছানায় এসে চিত হয়ে পড়েছে।

ছোটবাবু। থাক না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি এসে আমার তাঁবুটায় থাক ততক্ষণ।

বাদল। আপনার স্ত্রী?

ছোটবাবু। তার শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাকে মায়ের তাঁবুতে চালান করে দিয়েছি।

বাদল। কি হল তাঁর?

ছোটবাবু। পেট ব্যথা করছে।

বাদল। তাই নাকি? ওষুধ দোব নাকি এক ডোজ? আমার ব্যাগে ওষুধ আছে।

ছোটবাবু। থাক তার দরকার নেই। কবিতাটা পড়, শুনি।

বাদল ডাক্তার কাবুলী স্যাণ্ডাল সুদ্ধ বলিষ্ঠ একখানা পা টিনের চেয়ারের উপর রাখিয়া টেবিলে ভর দিয়া বসিলেন এবং একটু গলা-খাঁকারি দিয়া পড়িতে শুরু করিলেন

নির্জন প্রান্তরে বসি তব রূপ হেরি নির্নিমেষে,
কল্পনার কারাগারে করিয়াছি তোমারে বন্দিনী,
অলীক আলেয়া তুমি? মরীচিকাসম নাকি they say,
যুগে যুগে মানবেরে ভুলায়েছ হে ইভা-নন্দিনী?
Granted.—কিন্তু তুমি বন্দী মম মস্তিষ্কের খোপে,
যখন যতটা খুশি নেহারিব তোমার মাধুরী,
অনুভব করি যথা প্রতিদিন মোর Stethoscope-এ
পঞ্জর-পিঞ্জরে বন্দী হৃদয়ের চাপল্য চাতুরী।
হে বন্দিনী, তোল মুখ, খোল আঁখি, কথা বল বল,
ক্ষমা কর হই যদি অনিবার্য, ক্ষিপ্ত নিরঙ্কুশ,
সুনীল আকাশ-পাত্রে জ্যোৎস্না-বিষ করে টলমল,
তাহারই প্রভাবে সখি, হয়তো কিছু loose!
কিন্তু হায়, ক্ষোভ শুধু, যেই জ্যোৎস্না বিষবৎ to me,
হয়তো সে জ্যোৎস্নালোকে অতীব আনন্দে আছ তুমি।

[বাদল ডাক্তার চুপ করিলেন। ছোটবাবুও কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নীরব রহিলেন।
বাহিরে বাজিতে লাগিল—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম]

ছোটবাবু। চমৎকার হয়েছে!

[আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন]

বাদল। আমি তা হলে বাইকটা ঠিক করি গিয়ে?

ছোটবাবু। হ্যাঁ।

[বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পাঞ্জাবি পরিয়াছেন, পাগড়িটা অর্ধেক বাঁধা হইয়াছে, বাকি অর্ধেকটা কাঁধ হইতে ঝুলিতেছে। কাপড়টাও ঠিকমত পরা হয় নাই]

তরঙ্গিণী। ঠিক হচ্ছে না আমার, কাছা কোঁচা ঠিক করতে পারছি না।

ছোটবাবু [হাসিয়া] বললাম, তুমি পারবে না। চল, ঠিক করে দিই। উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। অস্ফুটভাবে শোনা গেল, তরঙ্গিণী বলিতেছেন—আঃ আঃ, ও কি হচ্ছে! বাহিরে গোহুম্‌নির নৃত্য উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ময়না নদীর ওপাবে জঙ্গলের একটি অংশ। সারি সারি তিনটি মাচা দেখা যাইতেছে, দুইটি খালি। তৃতীয়টিতে তালুকদার ও রোগা নিতাই বন্দুক হস্তে বসিয়া আছে। তালুকদার ঢুলিতেছে। অদূরে একটি প্রকাণ্ড শিমুলগাছের উপর বলিষ্ঠ হরু মণ্ডল বর্শা হস্তে বসিয়া আছে। ভোর হইতেছে। দূরে বনানীশীর্ষে চন্দ্র অস্তোন্মুখ। অস্তোন্মুখ চন্দ্রের কিরণ হরু মণ্ডলের বর্শাফলকে পড়িয়া চকচক কবিতেছে।]

নিতাই। [তালুকদারকে ঠেলা দিয়া] ক্রমাগত ঢুলছ যে হে!

তালুকদার। [হাসিয়া] কি আর করি!

নিতাই। জামাইবাবু, হীরেনবাবু, কেউ তো এল না হে!

তালুকদার। (হাই তুলিয়া) বাঘও তো এল না!

নিতাই। আশ্চর্য! অথচ মাঝরাত্রে বাঘের ডাকও শোনা গেল। শোননি তুমি?

তালুকদার। শুনেছি বইকি।

নিতাই। অথচ এল না কেন বল তো?

তালুকদার। কি জানি।

নিতাই। এ দিকে ফরসাও তো হয়ে এল, শুকতারা উঠছে। সারারাত মশার কামড় ভোগ করাই সার হল আমাদের।

তালুকদার। আমি কিন্তু ঢুলতে ঢুলতে বেশ মজার একটা স্বপ্ন দেখলাম। আচ্ছা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়, বলে না লোকে?

নিতাই। স্বপ্নটাই কি, শুনি না!

তালুকদার। স্বপ্ন দেখলাম, ছিপছিপে গড়নের একটা বাঘ ঠিক আমার মাচার সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেই বন্দুক তুলে গুলি করতে যাব, অমনই সে ফিক করে হেসে বললে, চোখের মাথা খেয়েছ তুমি, দেখতে পাচ্ছ না, আমি যে লছমনিয়া। এ স্বপ্নের মানে কি ভাই?

নিতাই। [সবিস্ময়ে] নেশা-ভাঙ করেছ নাকি কিছু?

তালুকদার। আরে না না, নেশা-ভাঙ করতে যাব কেন?

নিতাই। [নীচের দিকে চাহিয়া] বিলটাও নেমে আসছে দেখছি।

[বন্দুক ঘাড়ে বিলটা আসিয়া প্রবেশ করিল]

তালুকদার। কি হে, তুমি নেমে এলে যে?

বিলটা। [সহাস্য মুখে] আপনারাও নামুন।

তালুকদার। কেন?

বিলটা। বাঘ আজ আর আসবে না।

নিতাই। কি করে জানলে তুমি?

বিলটা। বাঘিনী এসেছে যে একটা। বাঘ আর বাঘিনীটা চর পেরিয়ে চলে গেল দেখলাম হু-ই দিক পানে।

নিতাই। সেকি?

বিলটা। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেবদারুগাছের মগডালে বসে সব দেখেছি আমি। প্রথমে এল বাঘটা, নদীর চরের ওপর বসল, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলে খানিক, তারপর দিলে এক হাঁকাড়। শোনেন নাই আপনারা?

তালুকদার। শুনেছি বইকি। তারপর?

বিলটা। তারপর এল বাঘিনীটা। ইয়া লম্বা-চওড়া দুলদুলে এক বাঘিনী! সেও এসে বসল বাঘটার কাছে, বসে তার গা চাটতে লাগল। বাঘটা ঘোরাতে লাগল তার ল্যাজটা পাক দিয়ে দিয়ে—সে এক কাণ্ড!

নিতাই। তারপর?

বিলটা। তারপর দুজনে খানিক চাটাচাটি করে উঠে পড়ল, চাঁদের আলোয় হেলতে দুলতে চলে গেল চর পেরিয়ে। নিজের চক্ষে দেখলাম।

তালুকদার। সত্যি?

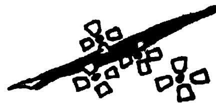
বিলটা। সত্যি নয় তো কি মিছে বলছি আমি?

নিতাই। [সক্ষোভে] বাঘটা দেখলে তুমি, অথচ গুলি করলে না?

বিলটা। কি বিপদ, আমার রেঞ্জের মধ্যে থাকলে কি আমি ছেড়ে দিই? তারা ছিল হু-ই চরের মাঝে, আমার নাগালের বাইরে।

নিতাই। আশ্চর্য কাণ্ড!

[অস্তোন্মুখ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবিচলিত হরু মণ্ডল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল]



সপ্তর্ষি

হংস-শুভ্র

।। এক ।।

শ্রীযুক্ত হংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায় চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বিরক্ত হলে তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন। বিরক্তি প্রকাশ করাটা, তাঁর মতে, হার-স্বীকার করারই নামান্তর। কার সাধ্য তাঁকে বিচলিত করতে পারে? তাঁকে, যাঁকে মহাকালের নিষ্ঠুর প্রহার পর্যন্ত একচুল বিচলিত করতে পারেনি, তিন-তিনজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করেছেন—একফোঁটা চোখের জল না ফেলে, এত বড় পরিবারের এত বিভিন্ন রকম বিপর্যয় যিনি অবিচলিত হয়ে সহ্য করছেন, ধৈর্য হারাননি ক্ষণকালের জন্য, সারা জীবনের আদর্শ চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েও যাঁকে কাবু করতে পারেনি—হঠাৎ কুন্দর মুখখানা মনে পড়ল তাঁর, গড়গড়ার ডাক বন্ধ হয়ে গেল, গম্ভীরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন তিনি।

সত্যি, বেশ বড় পরিবার তাঁর—এ অঞ্চলে শুভ্র-পরিবার নামে খ্যাত। পিতামহ যোগীশ্বর মুখোপাধ্যায় শুদ্ধ শান্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন বলেই বোধ হয় একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন শিব-শুভ্র। তারপর থেকেই এ বংশের সকলের নামের সঙ্গে 'শুভ্র' শব্দটি যুক্ত হয়ে আসছে, এমনকি মেয়েদের নামের সঙ্গেও আ-কার যোগ দিয়ে—কুন্দ-শুভ্রা, ইন্দু-শুভ্রা, শুক্তি-শুভ্রা, মুক্তা-শুভ্রা ইত্যাদি।

শিব-শুভ্র ভদ্রলোক ছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক শিব-প্রকৃতির ছিলেন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি মৃত্যুকালে নগদ বিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর দুই পুত্র—হংস-শুভ্র ও সোম শুভ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক যোগীশ্বরের পুত্র কি উপায়ে এত বড় সম্পত্তি হস্তগত করলেন, তার ইতিহাস এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে যেসব কৃতী পুরুষ এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের যোগ স্থাপনের মধ্যবর্তিতা করে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র—হংস এবং সোম, সে-যুগের লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে-যুগীয় প্রভাব পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাহেব মাস্টারের কাছে সাহেবী কেতায় কেবল ইংরেজী লেখাপড়াই শেখেননি, পণ্ডিতের কাছে শিখেছিলেন সংস্কৃত, ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন গান-বাজনা, পালোয়ানের কাছে শিখেছিলেন কুস্তি, গুরুজনদের কাছে শিখেছিলেন সহবত এবং সে-যুগের 'ইয়ংবেঙ্গল'-দের সাহচর্যে শিখেছিলেন সে-যুগের রাজনীতি-চর্চা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হংস-শুভ্রকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্জেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস-শুভ্র এড়াতে পারেননি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মন এসব ব্যাপারে সাড়া দিত। আই. সি. এস.

সুরেন বাঁড়ুজ্জের যখন চাকরি গেল (আইনত যদিও সেটা তাঁর নিজের ত্রুটির জন্যই), তখন তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে যে ক্ষোভ মথিত হয়ে উঠেছিল, কিশোর হংস-শুভ্রের মনেও ছাপ পড়েছিল তার। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল সে অপরাধ হামেশাই সকলে করে থাকে, তিনি শাস্তি পেলেন স্বাধীনচেতা বাঙালী বলে। কিন্তু এ নিয়ে আইনসঙ্গত আন্দোলন করেও যখন কোনও ফল হল না, তখন হংস-শুভ্রের মনে ধারণা হয়েছিল যে, দোষটা বোধ হয় সুরেনবাবুরই বেশি, কারণ বিলেতের সাহেবেরাও যখন সব শুনে এর কোনও প্রতিকার করলেন না, এমনকি ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি দিলেন না তাঁকে, তখন অপরাধটা লঘু নয় নিশ্চয়ই। সাহেবদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কল্পনাই কেউ করত না তখন। পরে এই সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে-(তাঁর কাছে ফ্রী চার্চ কলেজে পড়েছিলেন তিনি)--তাঁর বাগ্মিতা-বিদ্যাবত্তা-স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা আজও যদিও তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে; কিন্তু একজন খাঁটি সাহেবের তুলনায় যে তিনি নিম্নতর স্তরের জীব—এ বোধের জন্য লজ্জিত হননি তিনি তখন, কারণ দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনায় দেবতাকে উচ্চতর স্থান দিতে কারও লজ্জা হয় না। সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ তখন। তখন রামগোপাল, রাধানাথ, রসিকমোহনরাই সকলের আদর্শ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত লোকেরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রদীপ্ত প্রতিভায় জ্বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান। রাধাকান্তদেব, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল শিক্ষিতসমাজে উপহাসেরই খোরাক যোগাতেন তখন। স্বয়ং সুরেনবাবুই মনেপ্রাণে সাহেব ছিলেন, তাঁর বন্ধু রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসুও। তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজের উন্মুখ মনোবৃত্তিকে রূপ দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেছিলেন, তাতেও যেসব বক্তৃতা হত তা ইংরেজী কেতায়, ইংরেজী ভাষায়। তখনকার দেশপ্রেমের নিদর্শন ছিলেন রাণা প্রতাপ নয়, ম্যাৎসিনি। তাঁর বিপ্লববাদকে গ্রহণ করবার কল্পনাও কেউ করত না অবশ্য--তাঁর স্বদেশ-প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন সবাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলেই যে তাঁরা প্রত্যেকে ইংরেজের দাসখত লেখা গোলাম ছিলেন, ঠিক তা নয়। বস্তুত একটা জাগরণের সাড়াই জেগেছিল তখন দেশে—প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আতপ্ত আবহাওয়ায় একটা অস্পষ্ট অধীরতাই যেন অনুভব করছিল সকলে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশও করে ফেলেছিল তা। সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলের উত্তেজনাটা আজও ভোলেননি হংস-শুভ্র। মারকুইস অব সলস্‌বেরি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বয়স বাইশ থেকে কমিয়ে উনিশ করে দিয়েছিলেন কেবল ভারতীয়দের জন্য। তখনকার কালে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল--রাজ সরকারের অধিক-সংখ্যক চাকরি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করা। সলস্‌বেরির এই ব্যবহারে দেশের লোক ক্ষেপে উঠলেন যেন। সিভিল-সার্ভিস-বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়ালকে দেশব্যাপী আন্দোলন করে তুললেন। কংগ্রেস হবার বহুপূর্বে এই আন্দোলনেই সর্বপ্রথম নিখিল ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই সূত্রে হংস-শুভ্র প্রথমে, নাম শুনেছিলেন পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাঝিটিয়ার, পণ্ডিত রামনারায়ণের, ডাক্তার সূরযবলের, উকিল কালীপ্রসন্ন রায়ের। সেদিনকার সার সৈয়দ আহমেদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, রাজা আমীর

হোসেন, বাবু ঐশ্বর্যনারায়ণ, বাবু হরিশ্চন্দ্র, রামকালী চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক, কাশীনাথ তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডে-কে এখনও দেশের লোক মনে করে রেখেছে কি না হংস-শুভ্র জানেন না; কিন্তু তখন এঁরাই ছিলেন দেশের অগ্রণী এবং এঁরা সবাই সেদিন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করে যেভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তা হংস-শুভ্রের অন্তরে আজও স্পন্দন তোলে। আজকালকার বাঙালী-বেহারী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত কুৎসিত জিনিস তখনকার দিনে ছিল না—সার সৈয়দ অহম্মদ যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র ছিলেন এবং বিশেষ করে মুসলমানদেরই উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতেন, তবু তিনি সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলে সই করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদ করেছিল ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের। এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ভারতেই নিবদ্ধ থাকেনি কেবল। লালমোহন ঘোষ এ নিয়ে বিলেত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। টাকা দিয়েছিলেন মহারানী স্বর্ণময়ী। ব্রিটিশ গর্ভমেন্ট দেশের দাবি মেনে নিয়ে উনিশ বছর কেটে যখন বাইশ বছর করলেন, তখন ইংরেজদের ন্যায়পরতার ওপর বিশ্বাস আরও অগাধ হয়ে উঠল সকলের। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত-সমাজের প্রথম বাঙ্ময় বিদ্রোহ যে কর্তৃপক্ষের ভাল লাগেনি, তার প্রমাণ মিলল অবশ্য কিছুদিন পরেই। সলস্‌বেরি কিছুদিন পরেই পাঠালেন লর্ড লিটনকে, দুটি সাংঘাতিক 'অ্যাক্ট' তাঁর হাতে দিয়ে—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্ম্‌স অ্যাক্ট। সাধারণী', 'সমাজ দর্পণ', 'সোমপ্রকাশ', 'হিন্দু হিতৈষিণী' উঠে গেল। পুলিস সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিলে। হংস-শুভ্রের বাড়িতে যতগুলো বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত হল। দেশী ইংরেজী কাগজগুলোতে কড়া-মিঠে মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন সবাই। কিন্তু দেশের শিক্ষিত-সমাজের মনে ইংরেজ-ভক্তি তখনও অটুট। হংস-শুভ্রেরও মনে হল যে, যে-ইংরেজ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেনি, তারা নিশ্চয়ই অকারণে ভারতবাসীকে এমন নিরস্ত্র ও নির্বাক করে রাখবে না। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন একটা কারণ আছে, হয়তো আফগান-যুদ্ধ, হয়তো দাক্ষিণাত্যের কৃষক-বিদ্রোহ বা ওই রকম একটা কিছু। ওপরে 'মুভ' করলেই যথাকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মুভ' করাও হল। এই সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছিল, দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। জমিদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একেবারে চুপ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গভর্ণমেন্টের পক্ষে ভোট দিয়ে এলেন। কাউন্সিলে তখন জনসাধারণের ভোট নিয়ে সভ্য নির্বাচিত হত না, গভর্ণমেণ্ট যাঁকে মনোনীত করতেন তিনিই সভ্য হতেন। এ রকম সভ্য যে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করবেন, এ আশা দুরাশা হলেও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি। হংস-শুভ্রের কাছে ওই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি আজও পূজ্য হয়ে আছেন। তাঁর মত ইংরেজীনবিশ অথচ ভারতীয়, তাঁর মত স্পষ্টবক্তা অথচ মিষ্টভাষী, তাঁর মত বিধর্মী অথচ ধর্মপ্রাণ লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না হংস-শুভ্রের। তখন যদিও পলিটিকাল সভা রাজদ্রোহসূচক বলে গণ্য হত না, তবু ইনি এবং রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড থাকাতে সবাই যেন নির্ভয় হয়েছিল—তা ছাড়া এই দুজন গণ্যমান্য খ্রীষ্টান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়াতে প্রতিবাদের মূল্যও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। টাউন-হলে যে সভা হয়েছিল, তার ছবিটা এখনও মনে পড়ে হংস-শুভ্রের। তিলধারণের স্থান

ছিল না। তখন সবাই, এমনকি রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। সি আই. ডি বলে কিছু ছিল না। সেদিনকার সভার ভিড়ে আর উত্তেজনায় হংস-শুভ্র সোনার ঘড়ি, ঘড়ির-চেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনকে। চিঠি মুসাবিদা করেছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, সংশোধন করেছিলেন কে. এম. ব্যানার্জি। স্বয়ং গ্ল্যাডস্টোনকে চিঠি লিখতে পারাটাই মস্ত বড় একটা পৌরুষ বলে মনে হয়েছিল সেদিন এবং তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশে যে উত্তেজনা জেগেছিল, আজকালকার সস্তা ওপেন লেটারের ছড়াছড়ির দিনে সে উত্তেজনার মূল্য কেউ বুঝবে না। ফল ফলেছিল, সে চিঠির, কিন্তু আংশিকভাবে। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর 'মিড্‌লোথিয়ান ক্যাম্পেনে' দুটো অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই যদিও বক্তৃতা করেছিলেন, কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার গ্লাডস্টোন একটা অ্যাক্টকেই বাতিল করেছেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট উঠে গেল, আর্মস্‌ অ্যাক্ট উঠল না। রিপন সাহেব এই শুভ-বার্তাটি নিয়ে এলেন। এই উপলক্ষ্যে যেসব কৃতজ্ঞত-গদগদ সভাসমিতি হল, তাতে হংস-শুভ্র খুব প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে পারেননি! আর্মস অ্যাক্টটা থেকে যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি। ক্ষোভ কিন্তু বেশিদিন রইল না। লর্ড রিপনের মত বড়লাটকে বেশিদিন অগ্রাহ্য করে থাকা সম্ভব ছিল না। সত্যিই তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল লোকাল সেল্‌ফ্‌-গভর্নমেণ্ট। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার ধুম পড়ে গেল। সুরেনবাবু এই নিয়ে মেতে উঠলেন একেবারে। স্বায়ত্তশাসনের কিঞ্চিৎ অধিকার পেয়ে শিক্ষিত-সমাজ আকাশের চাঁদই হাতে পেল যেন। হংস-শুভ্রকেও এই সময় একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার্‌ম্যানগিরি করতে হল দিনকতক। প্রথম প্রথম তাঁরও মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতার পথে কিছুটা এগোলাম বুঝি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। লোকাল সেল্‌ফ্‌-গভর্নমেণ্টের ওপর নয়, দেশের লোকের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে যে জঘন্য দলাদলি স্বার্থপরতা নীচতা শঠতা অসাধুতা কুৎসিত আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তা আরও বেশি করে তাঁর ইংরেজ-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল যেন। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে নেটিভদের অযোগ্যতাই যেন তিনি দেখতে পেলেন প্রতি পদে। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক ত্যাগই করলেন। তাঁর ধারণা হল, এমন সুযোগ পেয়েও যখন দেশের লোক কিছু করতে পারলে না, তখন এদের কোন আশা নেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজ হবার। মাঝে মাঝে দু-একটা বদখত ইংরেজ তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিত অবশ্য। একটা নীলকর সাহেব এবং দুর্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের জ্বালাতেই নিজের জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি; কিন্তু ইংরেজ-ভক্তি কমেনি তাঁর। কারণ আদালতে মকদ্দমা করে উক্ত নীলকর সাহেবের কাছে তিনি খেসারত আদায় করে ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও বদলি করিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপর ভক্তি অচলা ছিল তাঁর। সে ভক্তিও অবশ্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিল সুরেন বাঁড়ুজ্জের কোর্ট-কন্‌টেম্‌প্‌ট কেসে। কিন্তু সেটাকেও ব্যক্তিবিশেষের দোষ বলেই মনে হয়েছিল—ইংরেজ জাতের ওপর চটবার কোন কারণ ঘটেনি। বরং এ নিয়ে আন্দোলন করলে যে ফল হবে, এও তাঁর আশা ছিল। আন্দোলন হয়েওছিল খুব। শালগ্রাম-শিলার ওপর যে খুব একটা ভক্তি ছিল তা নয়, কিন্তু জাস্টিস নরিস সেটাকে আদালতে নিতে বাধ্য করাতে সকলের আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছিল। সুরেনবাবু তা নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী'তে

যখন বেশ কড়ারকম একটা 'লিডারেট' লিখলেন, তখন সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অপরাধে তাঁর দু মাস জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল একটা। যেদিন তাঁর বিচার হয়, আদালত-প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কলেজের সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল, হংস-শুভ্রও ছিলেন সে ভিড়ের মধ্যে। যখন রায় বার হল, তখন সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! আদালতের জানলার একটি কাচও অক্ষত থাকেনি। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও সাড়া জেগেছিল। সুরেনবাবুর অপমান সারা ভারতেরই অপমান বলে গণ্য হয়েছিল সেদিন। জাতীয়তাবোধ জাগছিল ধীরে ধীরে। জেল থেকে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরও জাগিয়ে তুললেন সেটাকে। কিছুদিন আগে থেকে ইলবার্ট বিল নিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী একটা গাত্রদাহ ছিলই—এ সম্পর্কে অ্যালবার্ট হলে সুরেনবাবুর বক্তৃতা ভোলবার নয়, এই সুরেনবাবুর অপমানে সারা দেশ যেন জেগে উঠল। সুরেনবাবু আর একবার ঘুরে এলেন ভারতের নানা স্থানে, ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্যে টাকা উঠল। জাস্টিস নরিসের বিশেষ কিছু হল না যদিও, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে দেশের লোকের আত্মসম্মানবোধ প্রবুদ্ধ হল যেন। ঠিক এর পরই বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স। সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু। এ ঠিক বিদ্রোহীর সভা নয়, উপযুক্ত পুত্র পিতার কাছে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকার দাবি করে যে ভাষায়, ভারতবাসীরাও ঠিক তেমনই করে অধিকার দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে। দাবি করেছিলেন---শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবার, স্বায়ত্তশাসনের, শিক্ষাবিস্তারের, শাসনকর্তা ও বিচারকের কর্তব্য পৃথক পৃথক লোকের হাতে দেওয়ার এবং অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করবার। এর কিছুদিন পরে যা ঘটল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ইংরেজরা সত্যিই যে এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। কিছুদিন আগে রিপন সাহেব চলে গেছেন, এসেছেন লর্ড ডাফরিন। তাঁর আনুকূল্যে এবং হিউম সাহেবের প্রেরণায় বম্বেতে বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ডব্লিউ. সি বনার্জি হলেন তার সভাপতি, এবং ইংরেজী ভাষায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে-বিষয়ে যা বললেন, তাই তখনকার দিনে কাম্য ছিল--ইংরেজ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতকে সভ্য করা। এই-ই সকলে তখন চাইত এবং হবে বলে বিশ্বাস করত। হংস-শুভ্রেরও ধারণা ছিল, ভারতের উন্নতি-সৌধ উঠবে রাজভক্তির বনিয়াদের ওপর এবং সে সৌধ অলঙ্কৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে। হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বৎসর তিনিও নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে এই বার্ষিক পিকনিকে যোগ দিতে যেতেন এবং রাজভক্তির সঙ্গে দেশভক্তি 'পাঞ্চ' করে যে বক্তৃতা-সুরা প্রস্তুত হত তারই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন সারাটা বছর। এ নেশাও কিন্তু ছুটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। লর্ড ডাফ্‌রিন যাবার সময় কংগ্রেসকে ঠাট্টাই করে গেলেন; শিক্ষিত সমাজকে বলে গেলেন--'মাইক্রসকপিক মাইনরিটি'। দিন কতক পরে এক সারকুলারে গভর্নমেণ্ট-অফিসারদের কংগ্রেস যোগ দিতে মানা করা হল। এলাহাবাদে কংগ্রেস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল প্রায়--তাঁবু গাড়বার জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু এঁরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। ইংরেজদের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর আস্থা রেখে তাঁদের কন্‌স্টিট্যুশনাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন মোলায়েম ভাষায় এবং

এর ফলেই সম্ভবত শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্বাচিত জনকয়েক দেশী সভ্যের স্থান হল, শিক্ষারও বিস্তার হল কিছু। কিন্তু কিছু দিন পরেই এলেন লর্ড কার্জন, তারপর ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং তারই পিঠোপিঠি বেঙ্গল পার্টিশন। হংস-শুভ্রের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ। তিনি আরও হতাশ হলেন পরবর্তী নেতাদের সুর শুনে। তিলক নিজেকে 'ন্যাশনাল' বলে ঘোষণা করলেন এবং যে 'নেটিভ' কুপ্রথাগুলোকে এতকাল তাঁরা বিদ্রূপ করে এসেছেন, সেইগুলোকে আস্ফালন করেই 'ন্যাশনালিজ্ম' জাগাতে চাইলেন সকলে। তিনি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে কন্‌সেণ্ট-বিলের বিরোধিতা করলেন, গো-হত্যা-নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, গণেশ-পূজা নিয়ে মাতলেন, এবং ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, নেল্‌সন, নেপলিয়নকে ছেড়ে শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব। বাংলা দেশেও ধর্ম-বাই জেগেছিল কিছুদিন আগে—ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল অনেকে, পরমহংসকে নিয়ে নরেন দত্তর দল হৈ-হৈ করছিল। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেরা সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করছিলেন। এসব জিনিস হাসির খোরাক যোগাত হংস-শুভ্রের বিলিতী মদের আড্ডায়। কিন্তু এই সব জিনিসেরই পলিটিকাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হল, এই সব কুসংস্কারই যেন নূতন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে অরন্ধন আর রাখীবন্ধনের হিড়িকে, কালীপূজো করবার আর 'সন্তান' হবার আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, সাময়িকভাবে বিদেশী জিনিস বয়কট করবার চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে পিসিমা সাজতে প্রস্তুত ছিলেন না, মোটেই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে আর্যামি আত্মপ্রকাশ করছিল, তা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। তখনকার স্বদেশী সভা, সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে পুলিসের বলপ্রয়োগ, রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান, পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা, সেকালের 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', ফুলার সাহেবের হুমকি, সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা তাঁর দেশভক্তিকে খুবই উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, যে স্বদেশী তখন বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে, যে স্বদেশীতে তাঁর নিজের বন্ধুরা মেতেছেন, সে স্বদেশীকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেননি—কিন্তু প্রথম যৌবনে যে কব্‌ডেন ডিজ্‌রেলি বার্ক শেরিডন, যে শেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন স্কট ডিকেন্স, যে ম্যাল্‌থস মিল কাণ্ট হেগেল, যে নিউটন ডা্‌রউইন্ ওয়াট কেল্‌ভিন তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল, এই নতুন ঝড়ের ঝাপটায় তাদের শিখা নিবে যাবে—এ কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাইকেলের কাব্য পড়ার পর হেমচন্দ্রের 'বাজ্ রে শিঙ্গা' ও যেমন তাঁর ভাল লাগল না, দেবেন ঠাকুরের ছেলের মিহিসুরের ছড়াও তেমনই কানে লাগল না। ঝড় এলে লোকে যেমন ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত হয়, তিনিও তেমনই নিজের আদর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত হলেন। ভিক্টোরীয় সভ্যতার যে উদাত্ত গম্ভীর আদর্শে তিনি মানুষ, কোন কারণেই তা যে বর্জন করা সম্ভব এ কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। মুখে স্বীকার করতে না পারলেও মনে মনে সাহেবই তখনও তাঁর কাছে দেবতা ছিল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন 'বম' পড়ল মজঃফরপুরে। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে লাগল না—মারা গেলেন দুজন নিরীহ মেমসাহেব। এর পর আর কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। কংগ্রেসের খাতায় অবশ্য নাম রইল, কিন্তু 'মডারেট' দলে। এই মডারেটরাও কিছুদিন পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের নতুন দল গড়লেন—গোখেলের সঙ্গে তিলকের বনল না।

তাতে যোগ দেবার আর উৎসাহ পাননি হংস-শুভ্র। নিজের আদর্শ নিয়ে একান্তভাবে নিজের পারিবারিক জীবনেই নিবদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। দেশে আন্দোলন অবশ্য চলছিলই এবং তার ফলাফলও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজ-প্রীতি অনেকটা কমে গেছে যেন। ইংরেজ-ভক্তির যে দুর্গে তিনি আত্মরক্ষা করছিলেন, ইংরেজরা নিজেরাই একটার পর একটা গোলা ছুঁড়ে সে দুর্গকে ভূশায়ী করে ফেললেন, ক্রমে। সিডিশাস মীটিং অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, মর্লি-মিন্টো বিলের কৃপণতা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই আইনটার জোরে বিনা-বিচারে দেশের লোককে আটক রাখা—প্রত্যেকটি এক-একটি গোলা। খবরের কাগজের একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিলকের ছ'বছর জেল হয়ে গেল—ম্যাণ্ডালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। বাংলা দেশের কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, শচীন বোস, সতীশ চাটুজ্জে, ভুপেন নাগ, অরবিন্দ ঘোষ সবাই জেলে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', সব উঠে গেল। দেশ ছেয়ে গেল সি. আই. ডি-র গুপ্তচরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করলেন। তাঁর সমসাময়িক যে-সব নেতা বড় বড় স্বদেশী ছিলেন, এখন তাঁদের অধিকাংশই বড় বড় চাকরে হয়েছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার থেকে শুরু করে মাদ্রাজের যত আয়ার এবং নায়ারের দল, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, এ. চৌধুরী. এস. পি. সিন্‌হা, প্রভাস মিত্তির, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হাসান ইমাম—সকলেই গভর্নমেন্টের বড় বড় কর্মচারী। মনে হল, এই মোক্ষলাভের জন্যেই যেন এঁরা এতদিন আন্দোলন করছিলেন। ফিরোজ শা মেটাও 'সার' হলেন। হলেন না কিন্তু কেবল গোখলে। তিনিই শুধু গোপালকৃষ্ণ গোখলে থেকে গেলেন। কিন্তু গোখলে কটা আছে? গোখলের সগোত্র যাঁরা, গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করেছিলেন বলে তাঁরা সবাই জেলে। এর কিছুদিন পরে উপর্যুপরি কয়েকখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ল। ওয়েণ্ডারবার্নের লেখা হিউমের জীবনী, ডব্লিউ. সি. বনার্জির লেখা 'ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স', লায়ালের লেখা 'লর্ড ডাফ্‌রিনের জীবনচরিত'। পড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন, আমাদের দেশকে উদ্ধার করার জন্যে নয়, আমাদের দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত করে রাখবার জন্যেই হিউম সাহেব লর্ড ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ করে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর ইংরেজদের ওপরও আর ভক্তি রাখা গেল না। কিন্তু কংগ্রেসেও আর ফিরতে পারলেন না তিনি—তাঁর কাছে সমস্তই যেন বাজে হুজুক বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরা সব সুবিধাবাদীর দল, চাকরি বা বকশিশ পেলেই সব লম্ফঝম্প থেমে যাবে এদেরও।

ইংরেজ এবং দেশের লোক—দুয়েরই ওপর আস্থা হারিয়ে হংস-শুভ্রের অবলম্বনহীন মন যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ একদিন নজর পড়ল বুড়ো দারোয়ানটার ওপর। দেশের বড়লাট কে হল, না হল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ওর। ও ঠিক ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে, তুলসীতলায় জল ঢালে, পূজোপাঠ করে, রামায়ণ পড়ে, তিলক কাটে, ভজন গায়। বড়লাট রিপনই হোক বা মিন্টোই হোক, ওর স্বাধীনতা হরণ করতে পারেনি কেউ। বাইরের উত্তেজনার অভাবে আমাদের মন যেমন ক্ষণে ক্ষণে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে, ওর তেমন হয় না। ওর দিনচর্যা ঠিক আছে—কার্জনের আমলেও যেমন ছিল, হার্ডিঞ্জের আমলেও তেমনিই আছে। অথচ মানুষ হিসেবে ও কারও চেয়ে ছোট নয়। হংস-শুভ্র ওকে যত বিশ্বাস

করেন, নিজের ছেলে শশাঙ্ককে তত করেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ভুল করেছি এতদিনে—তিলকই ঠিক বলেছিল। হিন্দুধর্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজম্', বাদ বাকি "সব ঝুটা হ্যায়"। গীতা মহাভারত পড়ে সে মত আরও দৃঢ় হল। প্রাচীন হিন্দুধর্মের সনাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যেগুলোকে আগে কুসংস্কার বলে মনে হত, সেই গুলোরই নূতন নূতন অর্থ যেন প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মানসচক্ষে। উগ্র সাহেব ছিলেন যিনি একদিন, খানসামা-বাবুর্চি-ডিনার-লাঞ্চ-স্যুট সিগারেট-সর্বস্ব সাহেবই নয়, মনে-প্রাণে সাহেব, স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে মেম মাস্টারনী রেখে মেমসাহেব করবার চেষ্টা পর্যন্ত যিনি করেছিলেন (সফল হননি যদিও, কাঞ্চনমালা পানের বাটা ত্যাগ করতে রাজী হলেন না কিছুতে), ছেলেদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলেন, কোর্টশিপ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পর্যন্ত ক্রুটি করেননি, তিনি শেষ বয়সে একেবারে উলটে গেলেন। এখন পাঁজি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। নামাবলী গায়ে, কানে খড়কে গোঁজা, তর্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি অলঙ্কৃত এই লোকটির মধ্যে প্রাক্তন মিস্টার এইচ. এস. মোকার্জিকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব এখন।

একই শিক্ষার ফলে এবং এক রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে দু ভাই কিন্তু ঠিক এক রকম হননি। সোম-শুভ্রের ওপর এই শিক্ষার ফল ফলে ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সে-যুগের ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণের যে দুর্ভোগ, তা সবই ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা বেঁচে থাকলে হয়তো ত্যাজ্যপুত্রই করতেন, বিষয় থেকেও বঞ্চিত হতে হত, কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা সইতে হয়নি, বিষয়ের অর্ধেক ভাগ ঠিকই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র ব্রাহ্মদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, বিশেষ করে কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের পর থেকে। তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, ওরা সবাই ভণ্ড। দাড়ি রেখে চশমা পরে বেদ-উপনিষদের মুখস্থ বুলি আওড়ায় কেবল, মনেব এতটুকু প্রসারতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত জীবনী-শক্তি নেই, চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে চারদিকে বাঁচিয়ে ওজন-করা কথা বলার প্রয়াসেই ওদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। হয়তো হংস-শুভ্রের ধারণাটা ভুল, কিন্তু সেটা তাঁর বদ্ধ ধারণা হওয়াতে কিছুতেই তিনি সোম-শুভ্রের আকস্মিক ধর্মান্তর-গ্রহণকে ক্ষমার চক্ষে দেখেননি। সোম-শুভ্রের পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নই করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারও গড়ে ওঠেনি, কারণ তিনি বিবাহই করেননি। বিহার-অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কৃষিকর্ম করেই কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সারা জীবনটাই। তাঁর এক কলেজী বন্ধু সুরেশ্বর চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গেই সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুরেশ্বরও ব্রাহ্ম। প্রায় বছর দশেক আগে তিনি মারা গেছেন একটিমাত্র ছেলে রেখে। ছেলেটির মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কৃষিকর্ম এবং এই পিতৃমাতৃহীন পরমানন্দই সোম-শুভ্রের মনের আশ্রয় ছিল। পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একটি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। পাত্রী অনামিকা তাঁর এক বন্ধুরই মেয়ে। এদের কেন্দ্র করে সোম-শুভ্রের জীবন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের খবর তিনি নিতেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র এবং কুন্দ-শুভ্রাকে তিনি কোলে করেছেন, কিন্তু বাকি কজনের—সিতাংশু-শুভ্র, সুধাংশু-শুভ্র, ইন্দু-

শুভ্রা—এদের সংস্পর্শ পাননি তিনি। সিতাংশু জন্ম হবার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই ছাড়াছাড়ি। দেখা হয়েছে অবশ্য বহুবার। সেদিনও শশাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। হিমাংশু যেবার ডি. এস-সি হল, সেবার সে নিজেই এসে কাকামণির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। সিতাংশু ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতায় এসে নামল যেদিন, সেদিন তিনি নিজেই স্টেশনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। সুধাংশুও অক্সফোর্ড থেকে বরাবর চিঠি লিখত তাঁকে। হিমাংশু, সিতাংশু কেউ নেই আজ, সব অকালে মারা গেছে। কুন্দও নেই, হয়তো সেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও ভদ্রসমাজে তার অস্তিত্ব আর স্বীকার করা সম্ভব নয়। কুন্দর চিঠিখানা কিন্তু সোম-শুভ্রের কাছে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চিঠিখানা এখনও খুলে দেখেন তিনি। ছোট চিঠি, দুটি ছত্র মাত্র লেখা—"কাকামণি, চললুম। আপনার বিদ্রোহ সমাজ মেনে নিয়েছে—আমার বিদ্রোহও যেদিন নেবে সেদিন ফিরে আসব, যদি বেঁচে থাকি।" যদিও তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ নীতিবাগীশ বলে বিখ্যাত, তবু কুন্দর জন্যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তিনি বেশ একটু দুর্বলতা পোষণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—আহা, মেয়েটার ঠিকানাটা যদি পেতাম, দেখা করে আসতাম গিয়ে। তার কচি সুন্দর মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে। তাকে যখন তিনি শেষবার দূর থেকেই দেখেছিলেন, তখন তার বয়স বছর দুই হবে। দূর থেকেই তিনি এতকাল দাদার পরিবারের খবর নিয়েছেন এবং ভেবেছিলেন চিরকালই তাই হয়তো নিতে হবে; কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন হংস শুভ্রের এক চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একটু পুলকিতও যে না হলেন তা নয়, কিন্তু একটু দুঃখ হল। যে সংসার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, সে সংসার তো নেই। সে সংসারের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণেব বস্তু ছিলেন যিনি, সেই বউদিদিই নেই, হঠাৎ মারা গেছেন সেদিন।... হংস-শুভ্র রীতিমত সনাতন পদ্ধতিতে পত্র লিখেছিলেন।—

আশীর্বাদভাজন শ্রীমান্ সোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

পরমকল্যাণবরেষু,

গতকল্য আমার আশী বৎসর পূর্ণ হইল। অতীত জীবন পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। তোমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও একটা ভুল। ইহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখনও অনুতপ্ত হই নাই। কারণ, মনে একটি সান্ত্বনা ছিল, যাহা করিয়াছি তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছি। আজ কিন্তু আর সে সান্ত্বনা নাই, তাই অনুতপ্তচিত্তে ভুল সংশোধিত করিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু কখনও পরমত-অসহিষ্ণু নয়। হিন্দুধর্মে যত মত, তত পথ এবং সব পথই একলক্ষ্যাভিমুখী। হিন্দু ধর্মে মতের বিভিন্নতা আছে, অভিনবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আছে—কলহ নাই। বাস্তবধর্মী পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া তোমার সহিত মনোমালিন্য করিয়াছিলাম। সে মোহ কাটিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া এস, আমি অনুতপ্ত চিত্তে আমার নিষেধ প্রত্যাহার করিতেছি। তুমি সত্যই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা অবশ্য বিচার্য। বলা বাহুল্য, আসিলে আমি অতিশয় সুখী হইব।

সংসারে কাহারও সহিত মতের মিল হয় না। ছেলেরা এবং নাতিরা যাহার যাহা খুশি করিতেছে। সৎ পরামর্শ দিলে কেহ শোনে না। নিজের মতামত আস্ফালন করিয়া অপরের

জীবনযাত্রায় বিঘ্ন জন্মাইবারও প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি দমদমের বাড়িতে তারাপদকে লইয়া একাই থাকি। ইন্দুও আমার কাছে থাকে। কেন যে থাকে, বুঝি না। বার বার তাহাকে বলি, তুমি একাই যদি থাকিতে চাও, পার্ক স্ট্রীটে তোমার আলাদা একটা বাড়ি আছে, সেইখানেই যাও না, আমার কাছে কেন? সে কোন উত্তর দেয় না, যায়ও না, আমার বকুনি শুনিবার জন্য আমার কাছে পড়িয়া থাকে।

তুমি যদি এ অঞ্চলে আস, আমার সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আমার আশীর্বাদ লও। আশা করি, ভাল আছ। ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীহংস-শুভ্র মুখোপ্যাধায়

এ বছর দুই আগের ঘটনা।

তারপর থেকে সোম-শুভ্র মাঝে মাঝে দাদার কাছে যান। গেলে দাদা মনে মনে আনন্দিত হন নিশ্চয়ই, অন্তত সোম-শুভ্রের তাই ধারণা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ বা প্রমাণ বড় একটা পাননি তিনি। হংস-শুভ্র তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন, তাঁর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ঠিক ভাইয়ের মত নয়, সম্মানিত অতিথির মত আলাপ করেন তাঁর সঙ্গে। সোম-শুভ্রের মনে হয়, ঠিক সুর যেন মিলছে না, কোথায় কিসের যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। তবু তিনি যান মাঝে মাঝে।

বাসন্তীর চিঠিখানা আর একবার পড়ে, হংস-শুভ্র অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—

পাশের ঘরেই ইন্দু ছিল। বাবার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও তার কর্ণ এড়ায় না, সে বেরিয়ে এল।

কিছু বলছ বাবা?

না।—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হংস-শুভ্র।

ডাক এল নাকি? কার চিঠি ওখানা?

তোমার বড়বউদিদির।—মুখে হাসি ফুটিয়ে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন, এমন একটা ভাব করলেন, যেন খুব কৌতুকজনক একটা সংবাদ আছে চিঠিখানিতে। স্মিত মুখে নীরবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন। ইন্দুর বুঝতে বাকি রইল না যে বাবা বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে চুপ করে রইল। বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর মনোভাব টের পেয়েছে, তা হলে আরও বিরক্ত হবেন তিনি। তাই সে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল।

আজকের কাগজখানা দেখেছ? হিন্দু মহাসভা—

না, দেখিনি।

তারপর ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, কোন দিনই দেখি না। দেশের লোক দুটো পয়সা পাবে বলে কিনি।

সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দুকে বলতে হল, তা বটে, একটা খবরও সত্যি নয়।

কি করবে বেচারারা! পিঠের চামড়ার মায়া তো সবাই ত্যাগ করতে পারে না; মানুষের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত শক্তও নয়, চাবকালে বেশ লাগে।

তোমার খড়মের ফিতেটা তারাপদ ঠিক করে দেয়নি দেখছি এখনও।

ইন্দু একটু ঝুঁকে খড়মটা তুলে নিলে।

একটা ছোট পেরেক দিয়ে দিলেই তো হয়, আমিই দিচ্ছি,—তারাপদের অবসর হবে না কোনও কালে।

খড়মটা নিয়ে ইন্দু চলে গেল। হংস-শুভ্র হাসলেন একটু। মেয়েটা সর্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, ও অদরকারী নয়, খড়মের ফিতে থেকে আরম্ভ করে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর পর্যন্ত সর্বত্র নিজের প্রতিপত্তিটুকু জাহির করে রাখা চাই সর্বক্ষণ। সহসা হংস-শুভ্রের কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে সুযোগ পেত না যদিও, কিন্তু সেও সর্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে সব জিনিস রাখতে চাইত। খাওয়া-শোওয়া আসবাব পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, গামছা-খড়মের দরকার হলেও তার শরণাপন্ন না হলে পাওয়া যেত না। পুরুষদের স্বাধীনতা-হরণের এ কৌশলটা আজকালকার মেয়েদের ঠিক জানা নেই বোধ হয়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের আলাদা আলমারি, আলাদা ওয়াডরোব স্ত্রী-সংস্পর্শ-বর্জিত হয়ে খানসামার তদারকে থাকে। শশুর যেমন। হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, বিয়ে করলেই স্ত্রী-লাভ হয় না সকলের ভাগ্যে, কনকের মত অমন—

এই নাও।—খড়মটা ঠিক করে ইন্দু নিয়ে এল। হংস-শুভ্র পায়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে। খড়মটা পরতে গিয়ে চিঠিখানা কোল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে পাশের তেপায়াতে রাখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

কি লিখছেন বড় বউদিদি?

পড়ে দেখ।

ইন্দু চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।—

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আগামী রবিবার আমাদের ছোট্ট খোকনের মুখে ভাত দেব ঠিক করেছি। রবিবার ছাড়া অন্যদিনে হওয়ার অসুবিধা। কারও ছুটি নেই। সেদিন মনে করেছি সবাইকে বলব। ছোটঠাকুরপোর বম্বে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে ধরে রেখেছি। কাজলের বাবা দানাপুর থেকে এসে পৌঁছবেন—মানে, পৌঁছবার কথা—আগামী শুক্রবারে। কাল তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি, ঠিক যেন আসেন। বিয়ের পর থেকে তিনি তো আসেনইনি; হয়তো ভাবছেন, আমরা কিছু মনে করেছি; এই উপলক্ষ্যে এসে তাঁর সে ধারণাটা দূর হোক। কনককে অনেক করে লিখেছিলাম আসবার জন্যে, কোনও উত্তর পাইনি। মুক্তা আর শুক্তিকে বোর্ডিং থেকে আনিয়ে নেব সেদিন, সে দুদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সুপারিন্টেন্ডন্টের। অনুমতি পাওয়া গেছে শুনলাম ঠাকুরপোর কাছে। ভারি কড়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আমি 'ফোন' করতে বললেন যে, গার্জেনের চিঠি না পেলে ছুটি দিতে পারবেন না। ভাগ্যিস ঠাকুরপো এখানে ছিল। ঠাকুরপোকে কত বার বলেছি, আমাকে ওদের লোকাল গার্জেন করে দাও, ওদের মাসীর চেয়ে তো আমি বেশি আপনার—ঠাকুরপো মুখে প্রত্যেক বারই বলে, আচ্ছা, তাই করে দেব, তোমরা ঝঞ্ঝাটে পড়বে বলেই করিনি। এতে ঝঞ্ঝাটটা কি বলুন তো? আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন, কাকামণিও ঠিক সেই সময় এদিকে আসছেন। তিনি তো আমাদের পারিবারিক উৎসবে বড় একটা যোগ দেননি কখনও, এবার আসবেন লিখছেন। আমার বাবাকেও চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্যে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি যে আসতে পারবেন

সে আশা অবশ্য করিনি, তবু লিখতে হয় লিখেছিলাম। টুনি লিখেছে, তিনি নাকি আসবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, গাড়ি রিজার্ভ করতে লোক পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন নাকি, শেষে মণি কর্নেল হাউডকে ডেকে এনে থামায় তাঁকে। তিনি আসবেন না বটে, কিন্তু কত জিনিস যে পাঠিয়েছেন নাতির ব্যাটার জন্যে, তা এলে দেখতে পাবেন। দিল্লী শহরের যত মেওয়া ছিল সব ঝুড়ি ঝুড়ি, তা ছাড়া কত রকম টফি লজেন্‌জ বিস্কুট, কত হরেক ধরনের শিশি বাক্স কৌটা—একটা ঘর ভরে গেছে একেবারে। এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়েনি, পড়লেই ফুট-কড়াই হয়ে যেত। ও আমি খরচ করব না, খোকনের নামে জমা করে দেব। উপহার আরও অনেক এসে জুটেছে। ওঁর বন্ধু মেজর চণ্ডা চমৎকার একটা দোলনা কিনে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো একরাশ রেশমের খদ্দরি বিছানা এনে হাজির করেছে। বললাম, যা মুতুড়ে ছেলে হয়েছে, ওকে রেশম কেন, এক গাদা অয়েল ক্লথ কিনে দাও বরং। শুক্তি-মুক্তা দুজনে মিলে একটা পেরাম্বুলেটার দেবে বলেছে। নবনী তো বড় একটা আসে না, সেও সেদিন সুন্দর একটা ঝারা কিনে দিয়ে গেছে। ছেলের পাওনাভাগ্য খুব! শঙ্খ বলছে, আমি কিচ্ছু দেব না। কেবল কান মলে দিচ্ছে ব্যাটার। বেশ জোরে জোরে মলে দেয়—সেদিন তো ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। হিমু-ঠাকুরপো ঠিক অমনই করে হীরুর কান মলে দিত—মনে আছে আপনার? কোথায় আজ হিমু-ঠাকুরপো, কোথায় বা হীরু! ভগবান যাদের নিয়ে নিয়েছেন, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না; কিন্তু হীরু যে আমার থেকেও নই। কবে যে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কে জানে! দাদার ছেলে হয়েছে শুনে কি আনন্দ তার, কি চমৎকার চিঠি লিখেছে! কি নামই রেখেছিলেন ওর আপনি—হীরকের মত উজ্জ্বল, হীরকের মতই কঠিন! আপনার দেওয়া নামের মর্যাদা ও রেখেছে। সবই বুঝি, তবু কষ্ট হয়—মনে হয়, ও যদি কঠিন না হয়ে আর একটু কোমল হত, হয়তো ওকে ধরে রাখতে পারতাম। রজতের ব্যাপার তো জানেন, সে এখানে থেকেও নেই, কাজল মাঝে মাঝে আসে, সে কিন্তু ঘর থেকে আর বেরোয় না। সেদিন গিয়ে অনেক করে বলে এসেছি। যা খামখেয়ালী ছেলে, আসবে কি না জানি না।

আপনি ইন্দুকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। আমি আগের দিন বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেলে, মানে—দুপুরবেলাই পাঠাব, আপনি যাতে তিনটে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছতে পারেন। পাশাপাশি আরও দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—অনেকে আসবে তো, একটা বাড়িতে কুলোবে না। আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলো আপনার জন্যে ঠিক করে রেখেছি, ওপরে আপনার কষ্ট হবে। বেশি কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়গুলো আনবেন কেবল। পুজোর জিনিসপত্র আনবার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যে এক সেট সব কিনে রেখেছি, এমনকি শ্বেতপাথরের বাসন পর্যন্ত। আপনাকে আসতেই হবে, অমত করবেন না। আপনার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনি না থাকলে চলে? ইন্দুকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। আর তারাপদকেও আলাদা নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হবে না আশা করি।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইন্দুকে আশীর্বাদ দেবেন।

ইতি—প্রণতা বাসন্তী

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ইন্দুর সুন্দর মুখখানাও যেন অজ্ঞাতসারে পাষাণের মত কঠোর

হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হতে লাগল, তা আর যাই হোক, আনন্দ নয়। নিজের ব্যর্থ ব্যথিত জীবনের অনতিক্রম্য অভিশাপ বহন করে সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য দূরেই সরিয়ে রেখেছে, তার কারণ পাছে তার দুর্ভাগ্যের উত্তাপে আর কারও সৌভাগ্যের ফুল শুকিয়ে যায়, তা ঠিক নয়। আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখবার জন্যেই নিজেকে অবলুপ্ত করে দিতে চায় সে। যে মহাকালের নিদারুণ বিধানে তার সমাজ-জীবনের আশা-আনন্দ-আকাঙ্খা একবার নয় দু-দুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সে মহাকালকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পরাজয়-গ্লানি-লাঞ্ছিত এই ভাগ্য নিয়ে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সেই সমাজ-জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না। সে যেখানে গৌরবের আসন দাবি করেছিল, সেখানে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে কিছুতেই। বড়বউদিদি কেন তাকে যেতে লিখেছিলেন, তিনি কি তাকে চেনেন না? তাকে এমন অপদস্থ করবার মানে কি?

হংস-শুভ্র আড়চোখে একবার কন্যার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন।

হাঁটুর আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। কিছু বললেন না। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ রইল না খানিকক্ষণ। ইন্দু চিঠিখানা পড়ে সযত্নে সেখানা খামের মধ্যে পুরে তেপায়ার ওপরে রেখে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় হংস-শুভ্র কথা কইলেন।

বড়বউ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শশাঙ্কটাকে নানা রকম হুজুকে ক্রমাগত। এদিকে ঋণে তো জেরবার হয়ে পড়েছে শুনছি।

ঋণ শোধ হয়ে গেছে বোধ হয়। নতুন একটা মিল কিনেছেন, শুনলাম সেদিন তারাপদর কাছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললেন ইন্দু-শুভ্রা। মিল কেনার কথা হংস-শুভ্রও শুনেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা জ্বালাও ছিল। অতর্কিতে উত্তপ্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

হ্যাঁ, কিনেছে—বড় বউয়ের নামে।

ইন্দু চুপ করে রইল। তারপর অতিশয় নিরীহভাবে প্রশ্ন করলে, আপনার কি কি কাপড় গুছিয়ে দেব? যাবেন তো, বড়বউদি অত করে অনুরোধ করেছেন যখন?

খানিকক্ষণ গড়াগড়া টেনে অগ্নিবর্ষী চক্ষুর দৃষ্টি ইন্দুর মুখের ওপর স্থাপন করে বললেন, যাব কেন?

ইন্দু নতমুখে নতদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে হংস-শুভ্রের দৃষ্টির জ্বালা স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—সবেদন স্নিগ্ধতায়। এই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম। এর ওপরই বিধাতার যত আক্রোশ। আই. এ. পাস করে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল মহীতোষকে, ছ মাসের মধ্যে বিধবা হল। বছর দুই পরে আবার বিয়ে দিলেন—বীরেনও বাঁচল না। ওর জন্যে আলাদা বাড়ি করে দিয়েছেন, আলাদা সম্পত্তি করে দিয়েছেন। যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করবার কোন সুযোগের অভাব নেই। এ যুগের সবাই ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ওই বা দেবে না কেন—তিনি নিজেও তো কম কিছু করেননি। পর পর কয়েকটা মুখ মানস-পটে ফুটে উঠল—জোহারা, স্বর্ণ, মিস এলিসন, মিসেস ঘোষ, মোক্ষদা, আরও কয়েকটা—কেউ তো একালে আত্মসম্বরণ করে বসে নেই, পারুক না-পারুক দু হাতে জীবনটাকে আকঁড়ে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বিস্তার

করেছে সবাই। কুন্দর মুখখানা আবার মনে পড়ল, ইন্দুই বা কৃচ্ছ্রসাধন করবে কেন,এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে কেন ওর! একটা ছেলে পর্যন্ত হল না। কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে থাকুক না; কিন্তু না, তা থাকবে না ও, থান পরে শুধু হাতে আমার চোখের সামনে হবিষ্যি করে যাবে দিনের পর দিন। মাথার সিঁদুরটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক। হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল।

আমি যাব কেন? আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা একটা ফরমুলা মাত্র একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার শুধু। আমি প্রাগৈতিহাসিক। শ্বেতপাথরের বাসন দিয়ে আমার যুগের সঙ্গে এ যুগের সেতু বাঁধবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা তোমাদের।

তবু আপনাকে যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত।

তুমি যদি জোর করে নিয়ে যাও, তা হলে যেতেই হবে।

কন্যার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করে মৃদু হাসলেন হংস-শুভ্র। যে প্যাঁচটা কষেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দুর পক্ষেও অসম্ভব হবে ভেবে বেশ একটু পুলকিতই হলেন তিনি। ইন্দু তবু চেষ্টা করতে ছাড়লে না।

আমি ভাবছি—

তুমি কি ভাবছ, তা জানি। তুমি ভাবছ, বুড়োটা ওই হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়া হোঁচট খেয়ে মরুক, আমি দিব্যি এখানে নিরিবিলিতে থাকি।

তোমরা সবাই স্বার্থপর।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দু বললে, যাব তা হলে।

বলেই চলে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্র ডাকলেন।

আজ সোম আসবে একটু পরেই। মনে আছে তো?

কাকামণির ঘরটাই ঠিক করতে যাচ্ছি।

পালংশাক আনতে দেওয়া হয়েছে?

তারাপদকে সুক্তোর সব জিনিসই আনতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তার পাত্তা নেই। তুমি ওকে বড্ড আসকারা দাও বাবা।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না, কারণ দ্বারপ্রান্তে ভট্টাচার্য মশাই দেখা দিলেন। এইবার মহাভারত-পাঠ শুরু হবে।

ইন্দু-শুভ্রা কাকামণির ঘর ঠিক করতে গেল।

।। দুই ।।

কাকামণির ঘর ঠিক করে ঘন্টাখানেক পরে ইন্দু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। তার সমস্ত মন জুড়ে কি যে একটা হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। ঠিক রাগ নয়, ঠিক বিরক্তিও নয়, কি যেন একটা কি। মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। দু-দুবার বিধবা হয়েছে বলে যে গ্লানি

হওয়া স্বাভাবিক সে গ্লানি একা ঘরে তার হয় না, সে গ্লানি সামাজিক। দুবার বিধবা হয়ে সমাজের কাছে সে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, উপর্যুপরি দুবার ট্রেন মিস্ করলে পাঁচজনের কাছে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মহীতোষ কিংবা বীরেনের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র মমত্ববোধ নেই—এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সে মমত্ববোধটা তার সমস্ত সত্ত্বাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে না। দুটি যুবক তার জীবনে অতি অল্পদিনের জন্য এসেই চলেই গেছে, এদের মধ্যে কেউ একজন বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবন ফল-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠত, এই সব স্মৃতি-সম্ভাবনা নিয়ে সারা-জীবন হা-হুতাশ করে কাটিয়ে দেওয়ার মত নির্জীব মন তার নয়। তার পরনে থান, মাথায় সিঁদুর নেই, অঙ্গ নিরাভরণ, এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে কম্বলে শুয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য সে পালন করছে বটে, কিন্তু অন্তর তার নিরাসক্ত নয়, বৈরাগ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে সে। মুক্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় সে মুক্তি। কিন্তু কোথায় সে সহস্র বন্ধন, যা তাকে মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান দেবে? স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর যে বন্ধন, কোন এক বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে সব সামাজিক বন্ধনে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাঁধা পড়ে, তা কি সব সময়ে আনন্দময়? তা তো নয়। বাড়ির কার সঙ্গেই তার মনের সুর মেলে? যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সঙ্গেই বা মিলত কি না কে জানে! মহীতোষের প্রেমে পড়েই তাকে বিয়ে করেছিল সে, মনে হয়েছিল যে, মনের সুর মিলেছে, কিন্তু দু দিনেই ভুল ভেঙেছিল। যে মহীতোষকে সঙ্গী করে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে এক আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আশা করেছিল, সেই মহীতোষ যখন বিয়ের পর খাকি হাফপ্যান্ট পরে পুলিসে চাকরি নেবার জন্যে স্থানে-অস্থানে সেলাম করে বেড়াতে লাগল, তখন তার স্বপ্ন-কাব্যে প্রথম ছন্দ-পতন ঘটল। পুলিস মাত্রেই যে খারাপ তা নয়, খাকি হাফপ্যান্ট অনেক ভদ্রলোকও পরে, তবু যে কেন বেসুরা বাজল তা ঠিক জানা নেই তার; কিন্তু বেজেছিল। হয়তো আবার সুর জমত এসব সত্ত্বেও, হয়তো জমত না, কিন্তু মহীতোষ বাঁচল না। তারপর এল বীরেন। বীরেনকে সে আগে চিনত না। বাবা সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়েতে মত দিয়েছিল মাত্র। অন্য কোন কারণে নয়, বিধবা-বিবাহ সামাজে প্রচলিত হওয়া উচিত--এই সুস্থ মতবাদকে সমর্থন করবাব জন্যেই মত দিয়েছিল। অপরে যা করতে ভয় পায়, সে যে তা অকুতোভয়ে করতে পারে—এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। আবার বিয়ে করবার দিকে বিশেষ একটা লোলুপতা তার ছিল না। যৌন-সম্ভোগ-লালসা তার জীবনকে কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত করেনি, অযৌন জীবন যাপন করলে যে নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবেই, এই হাস্যকর উক্তিকে সে কোনদিনই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, সে বিয়ে করেছিল বিধবা-বিবাহের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ। বিধবা-বিবাহ সমাজে সুপ্রচলিত থাকলে হয়তো সে বিয়ে করত না।... বীরেনও বাঁচল না। দু-দুটো বন্ধন খুলে গেল। কিন্তু তাই বলে সে কি দাদা-বউদিদিদের সংসারে ঢুকে সকলের অনুকম্পাভাজন হয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে মানুষ করে নারীজন্ম সার্থক করবে? যাদের সঙ্গে এতটুকু মতের মিল নেই, সারা জীবন তাদের কথায় সায় দিয়ে গৃহলক্ষ্মী সেজে বসে থাকবে? পৃথিবীতে আর কাজ নেই? আর মানুষ নেই? আছে বইকি। অজস্র মানুষ আছে, সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যাদের সে দেখেনি অথচ ভালবাসে, যাদের আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করে, যাদের মনের সুরের সঙ্গে তার মনের সুর ঠিক ঠিক মিলে

যায়, তারাই তার আত্মীয়। তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে, তাদের জন্যেই বৈধব্যের এই ছদ্মবেশ। তাদের জন্যই দরকার হলে বিলাসিনীর ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ হবে তার পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে; কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হয়নি, প্রয়োজন হলে সে সব করবে, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবে, কিন্তু এখন নয়। এখন তাকে দমদমের বাড়িতেই থাকতে হবে কিছুকাল।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। যে কথাটা এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে তার মনকে আকুল করে তুলছিল, সহসা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা নয়, বর্ণনা। মেদিনীপুরের একটা বর্ণনা। বর্ণনাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ বর্ণনার পেছনে যে ছবি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভয়ঙ্কর। সকালে যখন কাগজ পড়েছিল, সেই ছবিটা মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তার মানস-পটে...তবু শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশন উৎসব করতে হবে, বউদিদির বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি উপহার পাঠিয়েছেন---লজেন্‌জ, বিস্কুট, মেওয়া...হীরক জেলে--কম্‌রেড....হীরককে সে বুঝতে পারে না... নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়া তার কাছে বড় হল! বুঝতে পারে না ঠিক, কিন্তু হীরককেই সে এখনও শ্রদ্ধা করে বাড়ির মধ্যে। রজতকেও করত, কিন্তু রজত বিয়ে করেছে, আর কোন আশা নেই তার কাছে, সেতারের তারগুলো এবার ঢিলে হয়ে যাবে ক্রমশ, দীপক রাগিণী আর আলাপ করা চলবে না তাতে! নন-ভায়োলেণ্ট নন-কো-অপারেটার ছোটদার কথা মনে পড়েই হঠাৎ অনঙ্গকে মনে পড়ল তার। অনঙ্গেব অঙ্গ নাকি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে রোজ জেলে চাবুকের চোটে...অনঙ্গ জেলের আইন মেনে চলবে না কিছুতে...এ কি ছেলেমানুষি তার, বার বার মার খাবে, তবুও মানবে না! হঠাৎ মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ইন্দু, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে অনঙ্গের ফটোখানা বার করে নির্নিমেষে চেয়ে রইল সেটার দিকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, শার্লমেন, তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির শা বেঁচে থাক্‌বে, ক্লাইবও থাকবে, কিন্তু অনঙ্গ থাকবে না। এই কচি কিশোর অনঙ্গ মহাকালের আবর্তে কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ তাকে মনে রাখবে না---যাদের জন্যে সে প্রাণ দিচ্ছে, তারাও না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে--জল নয়--বিদ্যুৎ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন।

।। তিন ।।

বাইরের ঘরে তখনও মহাভারত পাঠ চলছিল।

স্বর্গ থেকে পতনোন্মুখ যযাতিকে সম্মোধন ক'রে তাঁর মর্ত্ত্যবাসী দৌহিত্র অষ্টক প্রশ্ন করছিলেন, "উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?" যযাতি উত্তর দিচ্ছিলেন, "যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রম বিবর্জিত এবং কামাচার পরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পশুশ্রম মনে করিয়া ধর্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র..."

এমন সময় সোম-শুভ্র এসে পৌঁছলেন।

সোম-শুভ্রের বয়স ছিয়াত্তরের কাছাকাছি হলেও তিনি মোটেই অসমর্থ হয়ে পড়েননি।

এখনও বেশ খাড়া আছেন। মুখে প্রাজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্যও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, দেখলে ভয় করে না, সম্ভ্রম হয়। মাথাটি যেন বড় একটি কদমফুল, ছোট করে ছাঁটা ধপধপে সাদা চুলে ভরতি। এতটুকু টাক পড়েনি। গোঁফ দাড়ি কামানো নিটোল মুখে কোথাও জরার চিহ্ন নেই। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। পরনে থান, সাদা লংক্লথের 'চায়না' কোট, পায়েও ধপধপে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো। জুতোটির বিশেষত্ব আছে, ফরমাস দিয়ে তৈরি করানো। সোম-শুভ্রকে দেখলেই মনে হয়, শুভ্রতার মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ রকম সচেতন। মলিনতার সামান্যতম গ্লানিও যেন তিনি নিজের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপাদমস্তক সব ধপধপ করছে।

ঘরে ঢুকেই সোম-শুভ্র হেঁট হয়ে দাদার পদধুলি নিলেন। ভট্টাচার্য মশাইকে নমস্কার করলেন।

তুমি এসে পড়লে? নটা বেজে গেল নাকি?

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সোম-শুভ্র বললেন, নটা কুড়ি।

স্টেশনে কাউকে পাঠাতে পারিনি, নেপালী চাকরটা পালিয়েছে—

তারাপদ স্টেশনে ছিল।

ও, ছিল বুঝি! তাই বাজার থেকে ফিরতে এত দেরি তার।

সঙ্গে সঙ্গেই তারাপদ কাঁধে সোম-শুভ্রের বিছানায় বাণ্ডিল ও হাতে বাজারের থলি নিয়ে ঢুকল। হংস-শুভ্রের কথার জবাবস্বরূপই বোধ হয় বললে, একা আর ক'দিক সামলাই, বল? এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে ভেতরের দিকে চলে গেল হনহন করে।

তারাপদ ও হংস-শুভ্র সমবয়সী। শুধু তাই নয়, সহপাঠীও। সেকালে শিব-শুভ্রের বাড়িতে ছোটখাট একটা পাঠশালা ছিল। শিব-শুভ্রের বাড়িতে খেয়ে এবং শিব-শুভ্রের নিকট বেতন নিয়ে একজন পণ্ডিত, শুধু হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রকেই নয়, পাড়ার সব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতেন। কাউকে কোন খরচ দিতে হত না। সেই পাঠশালায় তারাপদ হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রের সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিল। সদ্‌গোপের ছেলে তারাপদর পড়া অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয়নি, কিন্তু এই সুবাদে সে হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে 'তুমি' এবং পরিবারের বাকি সকলকে অসঙ্কোচে 'তুই' বলে। তখন থেকেই সে একাধারে হংস-শুভ্রের বন্ধু এবং ভৃত্য, পার্শ্বচর এবং অনুচর। হংস-শুভ্র তার সমস্ত খরচ বহন করেন, সমস্ত আবদার সহ্য করেন। তারাপদও কম সহ্য করেনি—তার স্ত্রী মোক্ষদার সঙ্গে হংস-শুভ্রের যে সম্পর্ক ঘটেছিল, তাও সহ্য করেছিল, কিছু বলে নি। হংস-শুভ্র অবশ্য আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তার পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করে এসেছেন, তবুও এতটা কে সহ্য করতে পারত? হংস-শুভ্রের এই ধরনের অত্যাচার, শুধু একটা নয়, তারাপদ অনেক সহ্য করেছে। সেই ছেলে-বেলাতেই যখন পাঠশালায় পড়ত একটা সুন্দর পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিল। হংসকেই দিতে হল সেটা শেষ পর্যন্ত। না নিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে পাঁচটা নতুন পেন্সিল কিনে দিলে অবশ্য, কিন্তু চ্যাপ্টা-গোছের ওই পেন্সিলটা সে নিলে। কলকাতার বাজারে ও-রকম পেন্সিল তখন পাওয়া যেত না, কোন সায়েবসুবোর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তারাপদ জানে, হংসের স্বভাবই ওই রকম, যখন যেটা ধরে সহজে ছাড়ে না, একেবারে চূড়ান্ত করে তবে ছাড়ে। এখন ধর্ম নিয়ে পড়েছে। র‍্যাংকিনের বাড়ির স্যুট

ছাড়া যে এককালে আর কোন কিছু পরত না, সে এখন নামাবলী আর পাটের কাপড় পরে বসে আছে। হয়তো কোন্ দিন কমুণ্ডল নিয়ে ছাই মেখে বলবে—চললাম সংসার ছেড়ে। কিছুই বিচিত্র নয়। তারাপদর ধারণা, ঝোঁক চেপে গেলে হংস না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সোম-শুভ্র ভেতরে চলে গেলেন।

মহাভারত-পাঠ আবার শুরু হল।

"রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে—"

আগামী রবিবার দিনটা কেমন দেখুন তো, এই পাঁজি নিন।

মহাভারতের সম্ভবপর্ব থেকে হঠাৎ গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় নীত হওয়াতে ভট্টাচার্য মহাশয়েব মানসিক অবস্থাটাও অনেকটা যযাতির মত হল। তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, কি বলছেন?

আগামী রবিবার দিনটা শুভদিন কি না দেখুন, সেদিন অন্নপ্রাশন দেওয়া চলতে পারে কি না!

মিনিট পাঁচেক দেখে ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করলেন, না, অত্যন্ত অশুভ দিন আগামী রবিবার।

হংস-শুভ্রের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। ভট্টাচার্য আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে পঞ্জিকাটি সন্তর্পণে মুড়ে রেখে পুনরায় যযাতির উপাখ্যান আরম্ভ করতে যাবেন, এমন সময় হংস-শুভ্র বললেন, আজ আর থাক্।

আচ্ছা।

ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে উঠে গেলেন।

অগ্নিগর্ভ পর্বতের মত স্থির হয়ে বসে রইলেন হংস-শুভ্র।

ক্ষণকাল পরেই একটা সাদা প্লেট ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তারাপদ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, পণ্ডিত মশাই চলে যাচ্ছেন, ডাক তো। ভট্টাচার্য আবার ফিরে এলেন।

অন্নপ্রাশনের একটা ভাল দিন দেখে দিন তো পণ্ডিত মশাই।

ভট্টাচার্য আবার পঞ্জিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারাপদ প্লেটটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে হংস-শুভ্রের দিকে যে দৃষ্টিটা নিক্ষেপ করে গেল, তার অর্থ—আবার কি নিয়ে মাতলে তুমি? ছেলেটার অন্নপ্রাশনে বাগড়া লাগাচ্ছ নাকি?

খানিকক্ষণ পাতা উলটে ভট্টাচার্য বললেন, এর পরের বৃহস্পতিটা খুব ভাল দিন।

এর পরই হংস-শুভ্র যে প্রশ্নটি করলেন, তার জন্য ভট্টাচার্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি যজ্ঞ করতে পারবেন?

আজ্ঞে?

আমার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠান রীতিমত হিন্দু পদ্ধতিতে করতে চাই। তাতে যজ্ঞ হোম ঠিক বৈদিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে। আপনি কি অধ্বর্যু কিংবা অন্য কোন ঋত্বিকের কাজ করতে পারবেন?

ইতিপূর্বে কখনও করিনি। তবে সাধারণভাবে বৃদ্ধি-টৃদ্ধি—

না, সাধারণভাবে হবে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে করতে হবে। ভট্টাচার্য হংস-শুভ্রকে চিনতেন না। চুপ করে রইলেন।

কাশীতে খবর পাঠাতে হবে দেখছি। জিনিসপত্র যা যা লাগবে, তার একটা ফর্দ কোথা পাই—

আজ্ঞে, তা আমি করে দিতে পারব, বই আছে আমার কাছে।

বইটা আনুন তা হলে।

বলেই তিনি উঠে অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

যাচ্ছিলেন সোম-শুভ্রের কাছে। যেতে যেতে হঠাৎ ছবি-ঘরের কপাটটা তাঁর চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

তারাপদ!

তারাপদ এল।

এ ঘরটা খোল।

প্রকাণ্ড চাবির গোছাটা এনে তালাটা খুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল তারাপদ, হংস-শুভ্র বললেন, পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ দেবেন, সেটা তুমি টুকে নাও গিয়ে।

কিসের ফর্দ?

যজ্ঞের।

হংস-শুভ্র ঘরের ভেতরে ঢুকে কপাটটা বন্ধ করে দিলেন। বদ্ধ দ্বারের দিকে চেয়ে তারাপদ সবিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চলে গেল।

ছবি-ঘরে অনেক দিন ঢোকেননি হংস-শুভ্র। একটা ঘরকে ছবি-ঘর নাম দিয়ে সেটাকে স্বতন্ত্র মযার্দা দান তিনিই করেছিলেন একদিন, বহুকাল পূর্বে। মৃত পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়স্বজনদের ছবিই শুধু নয়, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিসও উত্তর দিকের এই ঘরখানিতে সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন তিনি। তারাপদকে বলেছিলেন, দুবেলা যেন ধূপধুনা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ঘরটা। তারাপদ অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন কবে যাচ্ছে, তিনি নিজেই বহুদিন ঘরটাতে ঢোকেননি। হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের মহাসমুদ্রে অবগাহন করে তাঁর মনে কিছুকাল থেকে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, যারা আত্মার অমরতায় আস্থাবান, মায়া-পাশ ছিন্ন করে অখণ্ড অব্যক্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও জীবের গত্যন্তর নেই বলে যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবকেই জন্মজন্মান্তরের আবর্তে আবর্তিত হয়ে অবশেষে সেই একই মহাসত্তায় মিশতে হবে—এই যারা সত্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে এই নশ্বর জীবনের দু-চারটে স্মৃতির টুকরোকে আঁকড়ে থাকার অর্থ—সেই বিরাট প্রবাহকে অস্বীকার করা, যার খরস্রোতে, তারা জানে যে, পর্বত সমুদ্রে এবং সমুদ্র মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের পর্বতের প্রতিকৃতি নিয়ে কি হবে, ওটা তো ওর আসল রূপ নয়। নিয়ত-পরিবর্তনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা বিশেষ মুহূর্তের ছবি রেখে লাভ কি? নিত্য-চলমান বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কল্পনানেত্রে দেখলে ওর স্বরূপ হয়তো দেখা যেতে পারে এবং তাই হয়তো সত্য দর্শন। বহুকাল তিনি ঢোকেননি ঘরটাতে। আজ কিন্তু ওই বড় তালাটা চোখে পড়াতে তাঁর দার্শনিক মন হঠাৎ যেন ক্রীড়া-প্রবণ হয়ে উঠল। দর্শনের বিজ্ঞ অধ্যাপক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলার মাঠে নেমে যেন ছুড়োহুড়ি করে খেলতে উৎসুক হলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে শিব-শুভ্রের বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবিখানা। হঠাৎ দেখলে রামমোহন রায় বলে ভুল হয়। সেই চোগা চাপকান শামলা। হংস-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও ছবি ছবিই, তবু হংস-শুভ্রের মত দার্শনিকও মনে মনে কোন একটা প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে রইলেন যেন ক্ষণকাল। বাচনিক কোন প্রত্যাদেশ এল না বটে, কিন্তু অনেক দিন আগেরকার একটা ছবি ফুটে উঠল মনে। তাঁর আর সোম-শুভ্রের উপনয়নের ছবি। ভট্টপল্লী থেকে গৌরীকান্ত শিরোমণি এসেছিলেন, কাশী থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত গোপীনারায়ণ। তা ছাড়া পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রী আরও অনেকে ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপটা গমগম করছিল, এখনও তাঁর মনে আছে। বিরাট উৎসব হয়েছিল। সাত দিন সাত রকম। প্রথম দিন হিন্দুমতে-ব্রাহ্মণভোজন, যাত্রা, ভাগবত-পাঠ। দ্বিতীয় দিন মুসলমানী মতে-পোলাও-কাবাব-কোপ্তার খানা, বাইনাচ, মুশয়রা। তৃতীয় দিন সাহেবদের জন্য সাহেবী হোটেলে সাহেবী ফ্যাশানে ডিনার, ড্রিঙ্ক, ডান্স। চতুর্থ দিনে কাঙালী-ভোজন—লুচি, ভাত, ডাল, পোলাও, তরিতরকারি, মিষ্টান্ন—সব রকম, যে যত খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্তন, হয়েছিল। পঞ্চম দিন কেবল মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল, সেও ভূরি-ভোজন। পুরুষদের কোন সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। মেয়ে রাধুঁনী, মেয়ে পরিবেশনকারিণী, মেয়ে কীর্তনীয়া, এমন কি মেয়ে-যাত্রা পর্যন্ত এসেছিল। ষষ্ঠ দিন কবির লড়াই, কবিদের সম্বর্ধনা করা হয়েছিল সেদিন। সপ্তম দিন হয়েছিল পালোয়ানদের কুস্তি, ওস্তাদদের গান, আর তাদের প্রত্যেকের ফরমাস অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। কেউ খেলেন বাদামের হালুয়া, কেউ মহিষের কাঁচা দুধ, কেউ স্বপাক আলোচাল গাওয়া-ঘি, কেউ সিদ্ধির সন্দেশ, কেউ মধু আর ফলাহার করলেন কেবল, কেউ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে নিলেন নিজের হাতে।....হঠাৎ চাবুকটা নজরে পড়ল হংস-শুভ্রের। চামড়ার ওই হান্টারটা দিয়ে সিতাংশুকে খুব মেরেছিলেন তিনি একদিন অবাধ্যতার জন্য। হংস-শুভ্র ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবির ভিড়ের মধ্যে সিতাংশুর ছবিখানা খুঁজতে লাগলেন। ওই যে হাসিমুখে চেয়ে আছে। ব্যারিস্টারের গাউনে কি সুন্দর মানাত ওকে! হিমাংশু-সুধাংশুর ছবিও পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে, কিন্তু সিতাংশুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটা দুষ্টু ছিল বলেই বোধ হয় বেশি ভালবাসতেন তাকে। যা ধরত, তা করত। তার মতের বিরুদ্ধেই ব্যারিস্টারি পড়েছিল, কিছুতেই আই সি. এস. পরীক্ষাটা দিলে না। কিছুতেই সামলানো যেত না, একটা ঝড় যেন। ঝড় থেমে গেছে। হংস-শুভ্র এগিয়ে গিয়ে আর একটা অয়েল-পেন্টিঙের সামনে দাঁড়ালেন। দূরসম্পর্কের পিসিমা ভুবনমোহিনী দেবী। রক্তের দিক দিয়ে সম্পর্কটা দূর বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এই ভুবনমোহিনী একদিন হংস-শুভ্রের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বহু-বিবাহের যুগে বহুপত্নীবান যে কুলীনের গলায় মালা দিয়ে ভুবনমোহিনী সীমন্তে সিঁদুর পরবার অধিকার পেয়েছিলেন, তার গৃহেই সেই ন বছর বয়স থেকেই বহু সপত্নী সমভিব্যাহারে তিনি এমন নিঁখুত রকম সুন্দর অনাড়ম্বর আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করে গেছেন যে, সে কথা ভাবলে হংস-শুভ্রের শির এখনও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে হংস-শুভ্রের বাড়িতে আসতেন তিনি। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। হংস-শুভ্র অবাক হয়ে যেতেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য রূপরাশি দেখে, প্রস্ফুটিত শতদল যেন। বেশি দিন বাঁচেননি, ভরা যৌবনেই মারা গেছেন। ইংরেজীকেতায়-মানুষ হংস-শুভ্র তাঁর এক গোছা চুল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কেটে রাখতে

চেয়েছিলেন, ভুবনমোহিনী দেননি। ভাগ্যে কিছু দিন পূর্বে একটা ফোটো তুলিয়ে রেখেছিলেন, তাই এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক খরচ করে সেই ফোটো থেকে এই ছবিখানা করিয়ে রেখেছেন তিনি। হংস-শুভ্র যখনই এ ছবিখানার কাছে এসেছেন মনে মনে প্রণাম করেছেন, আজও করলেন। হংস-শুভ্র এগিয়ে গেলেন। ছবির পর ছবি, কত ছবি! দামী গ্লাস-কেসে একখানা শাল রাখা ছিল—কাঞ্চনমালার শাল। সেখানার সম্মুখে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। পাশেই কুন্দর গয়নার বাক্সটা রয়েছে, যাবার সময় কুন্দ গায়ের সমস্ত গয়না খুলে রেখে গিয়েছিল। তারপরেই ভায়রাভাই রুদ্রবিলাস। এককালে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল লোকটার সঙ্গে, চমৎকার শেক্স্পিয়র আবৃত্তি করত। কবে মরে গেছে। শেক্স্পিয়ারের নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের আরও কতকগুলো প্রিয় নাম মনে প'ড়ে গেল—মিলটন, বেকন, লক, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, গিবন, রলিন্স.....স্বপ্নের মত মনে হল—বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত। এদের কারও সঙ্গেই আর জীবন্ত সম্পর্ক নেই, সমস্তই স্মৃতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

সোম-শুভ্র

।। এক ।।

টেবিলের ওপর সাদা একখানি চাদর পাতা। তার ওপর কয়েকটা সাদা প্লেট। এক ধারে একখানি খবরের কাগজ বিছানো। সোম-শুভ্র একটি চকচকে কাঁচি দিয়ে পালংশাক কাটছিলেন। যে পাতাটি পোকায় খেয়েছে অথবা যেখানে সামান্যতম মলিনতার সংস্রব আছে বলে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে খবরের কাগজে জমা করছেন। তিনি যা খাবেন, তা নিখুঁত রকম নির্মল হওয়া চাই এবং সে বিষয়ে তাঁর মন বেশি রকম সজাগ যে, তিনি নিজের হাতেই সব করেন। পাশেই চাল এবং ডাল রয়েছে। ইন্দু সব বেছে দিয়েছে একবার, তবু তিনি আর একবার নিজে দেখে দেবেন। কয়েকটি আলু, আধখানা বাঁধাকপি, গোটা দুই বিলিতী বেগুন হাতে করে ইন্দু ঢুকল। সোম-শুভ্র প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তার দিকে হাসিমুখে চাইলেন।

গরম জলে ধুয়ে নিয়ে এলে? আচ্ছা, রাখ ওই প্লেট দুটোতে। আমার আর কিছু লাগবে না।

আপানার কুকারটা ঠিক করে দিই?

সব আমি করে নেব এখন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দু কোনও উত্তর না দিয়ে আলু, কপি আর বিলিতী বেগুনগুলো প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সোম-শুভ্র ক্ষণকাল ইন্দুর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যেন তার আবদার রক্ষা করছেন এই ভাবে বললেন, আচ্ছা, বেশ, তুমিই কর আজ সব। কুকারের বাটিগুলো গরম জলে ধুয়ে নাও একবার তা হলে। আমার বেতের বাক্সটাতে জল মাপবার ছোট্ট মগটা আছে। ঠিক এক মগ জল লাগবে ঝরঝরে ভাত হতে। ডালে এক মগের কম দিলেও চলবে, পাতলা ডাল পছন্দ নয় আমার। হাসলেন একটু। ইন্দুর মুখেও সামান্য হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোম-শুভ্র পালংশাক কাটা শেষ করে চাল বাছতে লাগলেন।

যৌবনকালে সংসার বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন বলেই নয়, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে বাধ্য হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে তাঁকে। সেকালে ব্রাহ্মরা গোঁড়া হিন্দুদের কাছে প্রায় অস্পৃশ্যই ছিলেন্। পরিচয় জানতে পারলে হিন্দু রাঁধুনী পর্যন্ত থাকতে চাইত না। সোম-শুভ্র কখনও কারও কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেননি। ব্রাহ্মদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছিল; অপরিচ্ছন্ন চাকরের হাতে খেতে তাঁর চিরকালই অপ্রবৃত্তি, সুতরাং স্বপাক আহারেই অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু এমন হয়েছে যে অপরে রেঁধে দিলে তৃপ্তিই হয় না। সুরেশ্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক পরে হয়েছিল; ইক্‌মিক কুকারও অনেক পরের কথা। সে যুগে সনাতন প্রথাতেই

পিতলের বোকনোতে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেতেন তিনি। নিজে হাতে রেঁধে খেতে হত বলে তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় নেই বললেই হয়,—তরি-তরকারি যা খান, তা হয় কাঁচা, না হয় সিদ্ধ। শরীরের জন্য আর যা দরকার, তা পূরণ করেন দুধ দিয়ে। চাষবাস নিয়েই ছিলেন, সুতরাং গরুর অভাব হয়নি কখনও। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে—বিহার অঞ্চলে নিজের আস্তানাই গড়ে উঠেছে একটা—বন্ধুবান্ধবেরও অভাব হয়নি পরে—সুরেশ্বরদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই হয়েছিল—ইচ্ছে করলে অন্য ভাবেও তিনি আহারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু স্বপাক ত্যাগ করেননি তিনি। যে স্বাধীন মনোভাব তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল, সেই স্বাধীন মনোভাব তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। কখনও কোনও কারণে অধীনতা স্বীকার করেননি। বাল্যকালে হংস-শুভ্রের সঙ্গে বিলাসের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের জন্য অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। সে আদর্শ স্বাধীনতারই আদর্শ। বিদেশী রাজা আমাদের দেশ দখল করেছে বলে প্রাণ-মনও তাদের পায়ে সঁপে দিতে হবে—এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের হিড়িকে সবাই যখন সাহেবদের নকল করতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা হয়েছিল সেই মহাপুরুষটির প্রতি, যিনি সে যুগে মিশনারিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, হিব্রু আর গ্রীক অধ্যয়ন করে প্রচলিত বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্মের কীর্তিকলাপ প্রচার করেছিলেন, পৌত্তলিকতাই যে হিন্দুধর্মের শেষ কথা নয়, তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের মনীষাই নয়, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর আত্মসম্মানবোধ বেশি মুগ্ধ করেছিল সোম-শুভ্রকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কম মুগ্ধ করেননি। সে যুগে সকলেই যখন বিলাসের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ওই ধনীর দুলালের সত্য-অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ে বীতরাগ, পাশ্চাত্য সভ্যতার জারক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। মহর্ষি নিজেই যে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন তা নয়, অপরের স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর করে কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। তাই তাঁর প্রিয়শিষ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যখন মতবিরোধ হল, তখন নিজের মতে নিজের পথেই চলতে দিলেন তাঁকে। নিজেরও আদর্শ পরিবর্তন করলেন না, তাঁকেও পরিবর্তন করবার জন্যে জবরদস্তি করলেন না। তাঁর সহধর্মিণীকেও তিনি পৌত্তলিকতা থেকে জোর করে বিরত করতে চেষ্টা করেননি। তাঁর এই স্বাধীনতা-নিষ্ঠা যদিও সোম-শুভ্রের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, তবু তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকবার চেষ্টা করেননি, তার কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশে সে সমাজে যে সনাতনী মনোবৃত্তি তখনও ওতঃপ্রোত হয়ে ছিল, তা ঠিক সংসারমুক্ত মনোবৃত্তি নয়। উপবীতধারী ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কেশব সেনের অতি-প্রগতিশীল আন্দোলনেও তাঁর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়নি, তা যেন বড্ড বেশি পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ছিল। যদিও তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁর 'সুলভ সমাচার' যদিও স্বদেশী ভাবই উদ্দীপ্ত করত তখন সকলকার মনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যেন যীশুখ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে পড়লেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর কারও বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু দেশে তখন 'স্বদেশী' ভাব জেগেছে—বেদান্ত উপনিষদ ছেড়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি কমে আসছিল শিক্ষিত যুবকদের। দেশী কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ তাঁর। তাই হংস-শুভ্র যখন মেতেছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্জের দলে, সোম-শুভ্র তখন দীক্ষা নিচ্ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলেন বলে যে মহর্ষির দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা মোটেই নয়। নবগোপাল মিত্রের এবং রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধ তখন কোন্ যুবকের প্রাণে সাড়া না জাগাত! নবগোপাল মিত্রের নামই ছিল 'ন্যাশলাল মিত্তির'। তাঁর কাগজের নাম ছিল 'ন্যাশনাল পেপার'। তাঁর হিন্দুমেলায়, শঙ্কর ঘোষ লেনে তাঁর কুস্তির আখড়ায় সে যুগে কে না গেছে! সেই কুস্তির আখড়ায় সোম-শুভ্রও লাঠি খেলা, ছোরা-খেলা, তরোয়াল-খেলা শিখেছিলেন একদিন। লর্ড লিটন আসবার পর অবশ্য থেমে গেল সেসব। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেও সাগ্রহে যেতেন তিনি। যেতেন না কেবল 'পলিটিক্যাল' সভায়। সেকালের বক্তৃতা-মুখর পলিটিক্যাল আন্দোলনে তাঁর প্রাণ ঠিক সাড়া দিত না। তাঁর মনে হত, সাহেবী পোশাক পরে বিলিতী মদ খেয়ে সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি যদি কার্যত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্যাদা আমরা না দিতে পারি? আমাদের নিজেদেরই সমাজে যখন জাতিভেদের অসাম্য, স্ত্রীলোকদের পরদা সরিয়ে দেবার সাহস নেই, কুসংস্কারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন পঙ্কিল, ভ্রাতৃবিরোধই যখন সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনা, তখন সেখানে নিজেরা সেসব দূর করবার চেষ্টা না করে বক্তৃতা করলেই কি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে? স্বায়ত্ত-শাসন তিনিও কাম্য মনে করতেন; কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা অর্জন করাকেই। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তাই এ কথাটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায়নি যে, জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের হিতের জন্য যে শাসনবিধি আমরা চাইছি, তা কখনও স্থায়ী হবে না, জনসাধারণ যদি তার উপযুক্ত না হয়। নিজের চিত্ত স্বাধীন না হলে সত্যিকার স্বাধীনতা কে দিতে পারে? সমাজের পায়ে অসংখ্য কুসংস্কারের শৃঙ্খল আমরা নিজেরাই পরিয়ে রেখেছি, অথচ তার অগ্রগতির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি বিদেশী বড়লাটকে। এই হাস্যকর ব্যাপারে তাঁর মন কখনও সাড়া দেয়নি। তাই তিনি কংগ্রেস-সভায় বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার চেষ্টা না করে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর পৌরুষ যেন কৃতার্থ হয়েছিল। ধর্মের প্রতি অনুরাগের জন্যে তিনি ব্রাহ্ম হননি, ব্রাহ্মধর্ম সে যুগে বিদ্রোহের প্রতীক ছিল বলেই তিনি সে ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। কোনও গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিনি যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি, তার প্রমাণ—ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেননি। সে সমাজেরও নানা কুসংস্কার, নানা গোঁড়ামি তাঁর মনকে পীড়িত করত। শেষকালে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মদের 'হামবড়া' ভাব। মুখে যদিও সকলে বিনয়ের অবতার ছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় তাঁরা এমন ভাব প্রকাশ করতেন অব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্পর্কে যে, সোম-শুভ্রের লজ্জা করত। কারও সঙ্গে খাপ খায়নি বলেই তিনি পালিয়েছিলেন বাংলা দেশ ছেড়ে বেহারের দেহাতে, এবং সেখানেই স্কুল করে, হাসপাতাল করে নিজের আদর্শ-জীবন-যাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন এতকাল। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, বেহার অঞ্চলে অনেকখানি জমি কিনে নির্যাতিত ব্রাহ্মদের জন্যে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবেন,—অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্যে নির্যাতিত হতেন। অনেককে সাহায্য করতেন তিনি। ভেবে-চিন্তে উপনিবেশ স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ

করেছিলেন তিনি শেষকালে। ভেবে দেখলেন, এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব। বহু সম্প্রদায়-বিভক্ত এই দেশে আর একটা সম্প্রদায় বাড়ালে বিরোধের আর একটা বীজ বপন করা হবে মাত্র। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায়নি যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা প্রত্যঙ্গ—ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক করবার চেষ্টা করা অনুচিত। ওর যেটুকু ধর্ম সেটুকু সনাতন হিন্দুশাস্ত্র থেকেই নেওয়া, আর যেটুকু ঢঙ্ সেটুকু বিদেশী জিনিস। উপনিবেশ স্থাপন করলে অনিবার্যভাবে সেই ঢঙটুকুকেই প্রশয় দেওয়া হবে। নিছক ধর্মচর্চার জন্যে আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-সংস্কার করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পর হয়ে যেতে হয়, তাতে লাভ হয় না, লোকসান হয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। ধর্মের জন্যে, আদর্শের জন্যে কষ্ট স্বীকার না করলে, ঠিক যেন মূল্য দেওয়া হয় না তার। সুতরাং উৎসাহী ব্রাহ্ম-হিতৈষী হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল না। বন্ধু সুরেশ্বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন না তিনি। বেহারের যে অংশে তিনি জমি কিনেছিলেন, তা নেহাতই দেহাত—বেল-স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে—মেশবার মত বাঙালীও কাছে-পিঠে ছিল না বড় একটা। বেহারী জনমজুর, বেহারী চাকর-গোমস্তা, স্কুল, হাসপাতাল আর চাষ-বাস নিয়েই থাকতেন তিনি। বই পড়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের সঙ্গে যোগ ছিল বাংলা সাহিত্যের মারফত। বাংলা ভাষার প্রত্যেক লেখককে তিনি চিনতেন। সাহিত্য ছাড়া তাঁর আর একটি শখ ছিল, তা বাগানের—শুধু ফলের নয় ফুলেরও। প্রকৃতির কোলেই কেটেছে সারাটা জীবন। তাই কোন বিষয়ের কোন গোঁড়ামিই তাঁর মনকে আবিল করে তোলেনি। তিনি মনের শুভ্রতা সত্যিই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবাহ করেননি, কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেননি, মিথ্যা কথা বলেননি, হীন কাজ করেন নি কখনও কোনও রকম। তাঁর মনের আর একটা অবলম্বন ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। কলেজ-জীবনে আর্টের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর, বিশেষ করে উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি। উদ্ভিদ-জীবনের গহন রহস্যে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন। যশোলিপ্সা থাকলে তাঁর ওই সব অপূর্ব, অদ্ভুত এবং অনেক সময় আজগুবি গবেষণা ছাপিয়ে তিনি নাম করতে পারতেন, কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সত্যকে সন্ধান করবার যে আনন্দ সেই আনন্দেই মশগুল থাকতেন, সে সব লিপিবদ্ধ করে কাজে লাগাবার খেয়াল কখনও হয়নি। এমনও হয়েছে যে, তাঁর কল্পনা, তাঁর গবেষণা অনেক পরে অন্য বৈজ্ঞানিকের যশের কারণ হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে কখনও ক্ষুব্ধ হননি তিনি, আনন্দিতই হয়েছেন। গাছেরও যে অনুভূতি আছে—এ কথা জগদীশচন্দ্রের বহুপূর্বে তাঁর মাথায় এসেছিল। জগদীশচন্দ্র, ঠিক তাঁর সহপাঠী না হলেও, সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন উদ্ভিদের অনুভূতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সোম-শুভ্র নিজের কল্পনাকে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় মূর্ত দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। গাছের অনুভূতিই নয়, গাছ বিষয়ে নানা উদ্ভট কল্পনা আছে তাঁর। তাঁর ধারণা, পশুপক্ষীরাই শুধু যে মানুষের অনুরাগ বিরাগ বুঝতে পারে তা নয়, গাছেরাও পারে। গাছকে ভালবাসলে সে হৃষ্ট হয়, ঘৃণা করলে ক্লিষ্ট হয়। বায়লজিস্টরা গাছকে জীব-জগতের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়েছেন, গাছের পূর্ণ পরিচয় এখনও ঠিকমত পাননি বলে। ঘোড়ার শরীরে ডিপ্‌থিরিয়া এবং টেটানাস ঢুকিয়ে যখন প্রতিষেধক অ্যান্টি-টক্‌সিন তৈরি করা সম্ভব হল, তখন

সোম-শুভ্রের মনে হল, গাছের শরীরেও যদি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে গাছও হয়তো প্রতিষেধক কোনও ঔষধ প্রস্তুত করতে পারে। যে গাছ জীব-জগতের এত আহার এবং ঔষধ যোগাচ্ছে, তার পক্ষে এও অসম্ভব না হতে পারে। এই সব নিয়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসের অন্ত নেই। এই সম্পর্কেই বিশেষ করে তিনি এবার কলকাতায় এসেছেন।

হংস-শুভ্র এসে প্রবেশ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোম-শুভ্র।

ব'স ব'স। একটা কথা জানতে এলাম। শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনের খবর পেয়েছ তুমি?

হ্যাঁ, দুতরফ থেকেই পেয়েছি। শঙ্খর শ্বশুড়বাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। আগামী রবিবারে তো?

রবিবারে হবে না। ছুটির দিন দেখে অন্নপ্রাশন হয় না, শুভদিন দেখে হয়। পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই ঠিক করছি। তুমি থাকতে পারবে তো? প্রায় দিন দশেক পেছিয়ে গেল।

পারব।

তা হলে তো ভালই হল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হচ্ছিল। মৃগাঙ্ককেও চিঠি লিখে দিই তা হলে, তার এখন বম্বে যাওয়ার দরকার নেই। কংগ্রেসের একটা মীটিঙে ও না গেলে দেশোদ্ধার আটকে থাকবে না। সবাই দেশোদ্ধার করতেই মত্ত—নিজেকে উদ্ধার করা যে আগে দরকার, তা কেউ বুঝবে না।

হীরক এবং রজতের মুখ তাঁর মনে পড়ল। এই পৌত্র দুটির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে আজকাল ভাবাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। হীরক জেলে; রজতের পেছনে নাকি এখনও পুলিস ঘুরছে, এত খরচ করা সত্ত্বেও। রজতের সম্বন্ধে একটা যা ভরসার কথা, ছোকরা প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটাও নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়, কালো চোখের চাউনিতে আলো আছে। কাজলের ঢলঢলে মুখখানা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছু বলেননি তিনি, কিন্তু এক নজর দেখেই এই নাত-বউটিকে ভারি পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রজত কি একে ফেলে পালাতে পারবে? কিন্তু রজত সব পারে। একটুও মুখবিকৃতি না করে কুইনিন-মিকৃশ্চার খেয়ে বাজি জিতেছিল, একদিন ছেলেবেলায়। ট্রেন ফেল করে তুমুল বৃষ্টিতে হেঁটে এসেছিল কেবল কথা রাখবার জন্যে। সব পারে। আজকালকার এই ডাকাত ছেলেগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হল, এর আগে এ দেশে এ রকম ছেলে ছিল কি? ক্ষুদিরাম? কানাইলাল?—বারীনের নামটা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল হঠাৎ। না—না....হঠাৎ নজর পড়ল, সোম-শুভ্র তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আত্মস্থ হয়ে বললেন, ও, আচ্ছা, তুমি থাকছ তা হলে। দেখ, ভাবছি এই বোধহয় আমার জীবনের শেষ কাজ একটু ভাল করেই করব। কাশী থেকে ভাল পুরোহিত আনিয়ে রীতিমত যজ্ঞ করে, বুঝলে—,

উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, সোম-শুভ্র চাল বাছছেন—ইতিপূর্বে আরও দু একবার দেখেছেন, তবু মেজাজটা বিগড়ে গেল নতুন করে।

গমনোদ্যত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে সব কথা হবে এখন।

বিকেলে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।

ও, আচ্ছা।

একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোম-শুভ্র প্রশান্তভাবে চাল বাছতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে একটা কাচের কুঁজো হাতে করে তারাপদ প্রবেশ করলে।

এই দেখ, তোমার মনোমত হয়েছে কি না। তিন বার ধুয়েছি।

কুঁজোটা তুলে ধরলে। সোম-শুভ্র-ভ্রূ-কুঞ্চিত করে দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, এখনও ময়লা ভাসছে। থাক্ রেখে দাও তুমি, আমি নেব ঠিক করে এখন।

কোথা ময়লা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু!

আবার বেরিয়ে গেল তারাপদ। একটু পরেই আবার জল ভরতি কুঁজো নিয়ে ঢুকল।

নাও, দেখ।

সোম-শুভ্র দেখে বললেন, রেখে দাও। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রেখে দাও না, আমি সব ঠিক করে নেব।

তা তো নেবে। কিন্তু ওদিকে বড় কর্তা যদি টের পায় যে, তুমি নিজে সব ঠিক করে নিচ্ছ, তা হলে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে। তোমাদের বংশে রাগটি তো কারও কম নয়, নেপালী চাকরটাকে এমন খড়ম ছুঁড়ে মারলে সেদিন যে—

তারাপদ!

হংস-শুভ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওই শোন। এখন কলকাতা ছুটতে হবে আমাকে। অন্নপ্রাশনের তারিখ-ফারিখ সব উল্টে দিয়ে বসে আছে। যজ্ঞ হবে। বাণীকণ্ঠকে তার করা হয়ে গেছে।

বাণীকণ্ঠ কে?

এবাড়ির তোমরা কেউ চেন না তাকে। ওর এক ক্লাসের ইয়ার ছিল আগ্রায়। চমৎকার সারেঙ্গ বাজায়, এই তার গুণ।

তারাপদ!

উচ্চতর গ্রামে হংস-শুভ্রর ডাক শোনা গেল আবার।

আমি যাই। ইন্দু রইল, সে সব ঠিক করে দেব।

তারাপদ!

তারাপদ চলে গেল। কুকারের বাটিগুলি গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে একটা ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দু প্রবেশ করলে একটু পরে।

চালগুলো ধুয়ে আনি?

আন, ছাড়বে না যখন।

ইন্দু, নিখুঁত নিপুণতা সহকারে বাছা চালগুলি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোম-শুভ্র ডালে মন দিলেন।

।। দুই ।।

সোম-শুভ্র কলকাতায় এলে পরমানন্দের বাসাতেই ওঠেন। শশাঙ্কের বাসায় উঠতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় তাঁর। বাসন্তি এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে, কিন্তু তবুও তিনি ওঠেন নি। শঙ্খ রজত হীরক—এদের কাউকে তিনি চেনেন না। শশাঙ্ককে চেনেন, কিন্তু—এই কিন্তুটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি। অন্নপ্রাশনের দিনে যেতে হবেই, ভিড়ে গোলমালে কেটে যাবে কোন প্রকারে, এই ভরসা।

পরমানন্দ এবং অনামিকাকে আগে থাকতেই খবর দিয়েছিলেন। খবর না দিয়ে কোথাও যান না তিনি। পরমানন্দ এবং অনামিকা বিকেলে বেরিয়ে পড়ে সাধারণত। কোন মহদুদ্দেশ্য নয়, আড্ডা দিতে যায়। পরমানন্দ যায় নবকুমারের বাড়িতে, অনামিকা ইলার। পরমানন্দের চাকরি হয়েছে, নবকুমারের হয়নি। নবকুমার 'অধরা' নামক মাসিক-পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অনামিকার বিয়ে হয়েছে, ইলার হয়নি। ইলাও বিনা বেতনে শিক্ষায়িত্রীগিরি করেন সদ্য-স্থাপিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। পরমানন্দ নবকুমার শুধু যে এক জাতের লোক তা নয়, এক ধাতেরও। দুজনেই নোট-বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেছে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণও করেছে, কিন্তু একজনও ঠিক ব্রাহ্মণ প্রকৃতির নয়। সুলভ সংস্করণের নানা পুস্তকের দৌলতে দুজনেই বিশেষ করে নবকুমার—আধুনিক জগতের অনেক সংবাদ রাখে। ফড়ফড় করে অনেক কিছু আউড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে সাধারণত যে কোন লোককে। কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ওরা ঠিক ব্রাহ্মণ নয়, এমন কি শিক্ষিতও নয়। ওরা পল্লবগ্রাহী মাত্র। ওরা নানা বই থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করে, চতুর্দিকে আস্ফালন করে বেড়ায় নিজেদের জাহির করবার জন্যে এবং সেটাও নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষাটা মনে প্রবেশ করলে যে সংঙ্কোচ, যে দ্বিধা, যে বিনয় আত্মপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা এদের নেই, এবং নেই বলেই যেন এরা গর্বিত। অনামিকা-ইলারও সেই দশা। লোক-দেখানো শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। মনোজগতের নয়, বস্তুজগতের সুখ-সুবিধা আহরণের জন্যেই ছটফট করে বেড়াচ্ছে সর্বদা নানা ভাবে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে।

তবু সোম-শুভ্র এদের কাছেই আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। যদিও তিনি পরমানন্দকে মানুষ করেছেন এবং নিজে পছন্দ করেই অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তবু এদের যে তিনি ঠিক চেনেন না, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। আজকাল কোন ছেলেকে মানুষ করা মানে, তার জন্যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করা। সে সত্যিই মানুষ হচ্ছে কি না, তা নির্ধারণ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। পছন্দ করে বিয়ে দেওয়াটাও অনেকটা ওই জাতীয় অসম্ভব ব্যাপার। যে মেয়েটিকে পছন্দ করা যায়, সে সত্যিই পছন্দসই কি না, তা এক নজর দেখে বা সামান্য একটু আধটু খবর নিয়ে বোঝা শক্ত। এসব জানা সত্ত্বেও সোম-শুভ্র এদের কাছেই নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, তার কারণ, যৌবনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসম্ভব এবং আজগুবি কল্পনা পরিহাসের পরিবর্তে স্বপ্ন উদ্রিক্ত করতে পারে কেবল যৌবনের মনেই। যৌবনের প্রতি তাঁর এই আস্থার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, আধুনিক ছেলেমেয়েদের চপলতা, বিলাসপ্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বেচালকেও তিনি সহ্য করতেন। মনে করতেন, প্রাণের জীবন্ত প্রবাহ

স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের তৈরি কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম করে যায় মাঝে মাঝে। চিরকালই যায়। ও নিয়ে বেশি বিচলিত হয় তারাই, যারা সত্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে তিনি বেচাল পছন্দ করতেন না, সভ্যসমাজের রীতিনীতি মেনে চলাটাই ভাল লাগত তাঁর, নিজেও মেনে চলতেন। জীবন্ত প্রাণের আবেগকে স্বীকার করতেন বলেই তার দুর্দমনীয়তাকেও মানতেন। এই আবেগকে শুধু যে মানতেন তা নয়, এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

জীবনের ছিয়াত্তর বছর যখন পূর্ণ হল, হঠাৎ যখন তাঁর পুরাতন ভৃত্য ঝক্সু সন্ন্যাস-রোগে মারা গেল এক ঘন্টার মধ্যে, তখন তাঁর মনে হল, জমা-খরচ মিলিয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ এবার ঠিক করে ফেলা উচিত। যে কোন মুহূর্তে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। বিবাহ করেননি, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। দশ লক্ষ টাকার যে পৈতৃক সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই তিনি প্রায় খরচ করেননি। হাজার দশেক টাকা খরচ করে জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সস্তায় যে দুশো বিঘে জমি কিনেছিলেন, তা থেকে শুধু তাঁর ভরণ-পোষণ নয়, অনেক উদ্বৃত্তও হয়েছে। স্কুল এবং হাসপাতাল চালাতে কিছু খরচ হয়েছে অবশ্য, বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে নিয়েছেন কিছু, শশাঙ্ককে কিছু দিয়েছিলেন একবার, পরমানন্দর জন্যেও কিছু গেছে, কিন্তু তবু এখনও সবসুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ টাকাটার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া তাঁর যে সব গবেষণামূলক অদ্ভুত কল্পনা আছে, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূর্তি দেবার চেষ্টা করাও উচিত—সম্ভব হলে যন্ত্র-সহযোগে সেসবের যথার্থ্যও প্রমাণ করতে হবে। এই সম্পর্কে তাই তিনি পরমানন্দ এবং অনামিকাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যেন তাদের দু-একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনে বুধবার সন্ধ্যায়, সেই দিন তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে দু একটা আলোচনা করবেন। পরমানন্দ অনামিকা তাই সেদিন আড্ডা দিতে না গিয়ে নবকুমার-ইলাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের বাড়িতে। নবকুমার কাগজের সম্পাদক, সবজান্তা, সবাইকে তাক লাগিয়ে কথা বলে। ইলা বি. এস-সি. পড়েছিল, তারও বৈজ্ঞানিক হতে বাধা নেই।

সোম-শুভ্র ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন এবং পরমানন্দ, অনামিকা, নবকুমার, ইলার সম্মুখে এমন সসঙ্কোচে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পাঠ করলেন যে, যেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোন বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে কতকগুলি হাস্যকর উদ্ভটতার অবতারণা করে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছেন।

পরমানন্দ অনামিকা সোম-শুভ্রের কাছে নানা ভাবে উপকৃত। এমন কি তাদের আশাও আছে যে, হয়ত সোম-শুভ্র তাদেরই তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তাধিকারী করে যাবেন। সুতরাং সোম-শুভ্রের যে কোন প্রকার অদ্ভুত আচরণই তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তারাও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল (নবকুমার-ইলার কাছে) যখন তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, গাছেরাও মানুষেরই মতই কথা কয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। তাঁর মতে আমরা যাকে মর্মর বলি, তা ঠিক একই ধরনের ধ্বনি নয়। বিভিন্ন গাছের মর্মর যে বিভিন্ন তাই শুধু নয়, একই গাছের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে মর্মরধ্বনি বিভিন্ন—এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বাতাসের গতি-বেগ এবং পত্রের আকৃতির ওপরই মর্মরধ্বনি প্রধানত নির্ভর করে, তা তিনি জানেন; কিন্তু এও তিনি অনুভব করেছেন এবং তার কতকটা প্রমাণও পেয়েছেন যে, কেবল বাতাসের গতিবেগ ও পত্রের আকৃতি দিয়েই সর্বপ্রকার মর্মরধ্বনির ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে গাছেদের নিজেদেরও যেন সজ্ঞান কিছু প্রচেষ্টা আছে বলে মনে

হয় তাঁর। যন্ত্র দিয়ে তিনি মেপে দেখেছেন যে, একই উত্তাপে ও বায়ুমণ্ডলের চাপে একই বাতাসের গতি-বেগে একই গাছ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম মর্মরধ্বনি শোনায়। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র থাকলে তিনি প্রমাণ রাখতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর মতে গাছের ভাষা শুধু শ্রাব্য নয়, দর্শনীয়ও। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সে ভাষার মর্ম গ্রহণ করতে হয়। গাছের সব পাতা একসঙ্গে কাঁপে না, সব পাতার ওপর সূর্যালোক সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। শুধু ফোনোগ্রাফ নয়, সিনেমাটোগ্রাফও দরকার, যদি কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছের ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা করতে চান। গাছের ভাষা শ্রাব্য এবং দৃশ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে বলেও তাঁর মনে হয়। সিম্‌বায়োসিস বলে যেমন এক ধরনের জীবনযাত্রা-প্রণালী উদ্ভিদ ও পশু-জগতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—যাতে দুটি বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যৌথভাবে পরস্পরের সাহায্যে নিয়ে প্রাণ ধারণ করে—তেমনই, সোম-শুভ্রের ধারণা, গাছের ভাষা ও পাখির গান, গাছের ভাষা ও পতঙ্গের গুঞ্জন, পরস্পর পরিপূরক। একের সাহায্যে ব্যতিরেকে অপরে ঠিক যেন মূর্ত হতে পারে না। তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গাছের ভাষার রূপও বিভিন্ন। সোম-শুভ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তাদের এই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাব-বিনিময় ও করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কল্‌কেফুলের গাছের পাতায় পাতায় হঠাৎ একটা শিহরণ জাগল, একটা কোকিল ডেকে উঠল তার ডালে। ঠিক পাশেই একটা আতা গাছ, একই রকম হাওয়া বইছে কিন্তু তাতে শিহরণও নেই, কোকিলও নেই। কিন্তু আর একটু দূরে আর একটা কল্‌কেফুলের গাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগল অনুরূপ শিহরণ, তার ডালেও ডেকে উঠল কোকিল। মনে হল, দুটো গাছ যেন কথা কয়ে উঠল একই ভাষায়। এসব ঘটনা এত বার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এদের তিনি কাকতালীয়বৎ বলে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা ঠিক করে উঠতে পারেননি তিনি। তবু তিনি এগুলো ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখতে চান এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ যুগের কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো এ-নিয়ে কাজ করতে পারবেন, তাঁর এ কল্পনাও হয়তো সত্যরূপে মূর্ত হবে কোনদিন ভবিষ্যৎ কোন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাবলে।

সম্পাদক নবকুমারের মনে হল, সোম-শুভ্র বোধ হয় এই সব প্রলাপ তার 'অধরা' পত্রিকায় ছাপাতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিয়েছেন আজ। এই হাস্যকর ব্যাপার বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই নিবৃত্তি করা উচিত, নবকুমারের মনে হল। কর্তব্য-প্রণোদিত অপ্রিয় কার্যটাকে কৌশলে মোলায়েম করবার উদ্দেশ্য তাই সে বললে, আপনার প্রবন্ধটা আমার কাগজে নিতে পারতাম; কিন্তু তাতে এত গম্ভীর প্রবন্ধ ঠিক চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার কাগজ ঠিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তো নয়। তবে—

সোম-শুভ্রকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে নবকুমার থেমে গেল।

তোমার কাগজ আছে নাকি?

আমার ঠিক নয়। প্রোপ্রাইয়েটার হচ্ছেন রামদাস মল্লিক। আমি সহকারী সম্পাদক।

প্রোপ্রাইটার না বলে, প্রোপ্রাইয়েটর বললে, কারণ তার গর্ব, ইংরেজী কথা যখন বলে তখন অভিধান-সম্মত শুদ্ধ উচ্চারণই করে থাকে সে। সব সময় সফল হয় না যদিও কারণ সে ইংরেজ নয়, তবু চেষ্টা করে। বেণীমাধবের অভিধান উলটে-পালটে আজই সকালে প্রোপ্রাইয়েটর তার চোখে পড়েছিল। তাক মাফিক লাগিয়ে দিলে।

সোম-শুভ্র প্রশ্ন করলেন, রুবি মিলের রামদাস মল্লিক নাকি?

হ্যাঁ।

কাগজের নাম কি?

'অধরা'।

রামদাস মল্লিক সোম-শুভ্রের অপরিচিত নন। তিনিও ব্রাহ্ম। এই অজুহাতে এবং অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই কারণ দেখিয়ে বহুকাল পূর্বে তিনি সোম-শুভ্রের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা চাঁদা নিয়েছিলেন। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন,—হাজার টাকা অবশ্য আর কেউ দেননি, কিন্তু দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ একশো—যার কাছে যতটুকু নেওয়া যায় তিনি নিয়েছিলেন। অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য হয়নি, কিছুকাল পরে একটি তেলের কল স্থাপিত হয়েছিল। বিধবাদের সঙ্গে এই তেলের কলটির কিছু সম্পর্ক যে ছিল না, তা নয়। রুবি-নাম্নী যে বিধবা মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে রামদাস মল্লিক দ্বিতীয় পক্ষে তাকে বিয়ে করেছিলেন, তার নামের সঙ্গে মিলটির নাম যুক্ত ক'রে বিধবা-প্রীতির কিছু পরিচয় মল্লিক মশায় দিয়েছিলেন। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যায় না যে মল্লিককে, তিনি আজকাল 'অধরা' নামক এক পত্রিকারও স্বত্বাধিকারী হয়েছেন—এই বার্তা শুনে সোম-শুভ্রের মনের নেপথ্যে যে রসিকতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার আভাস মুখে অবশ্য ফুটল না কিছু। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে তিনি বললেন, ও! তোমাদের কাগজে চলে না বুঝি এ ধরনের লেখা?

আজ্ঞে না। আমরা পোস্ট-জর্জিয়ান লিটারারি মুভ্‌মেণ্ট নিয়েই আছি। তারই রূপটা বাংলা ভাষায় ফোটাতে চেষ্টা করছি।

হচ্ছে না কিন্তু কিছুই। —কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে বলেই সোম-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে ইলা বুঝলে যে, কথাটা এখন এ ভাবে বলাটা অশোভন হয়েছে। ইলার অপ্রতিভ ভাবটা দেখে অনামিকাকে ঘাড় ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে হল। পরমানন্দ দৃষ্টির ইঙ্গিতে নবকুমারকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন সোম-শুভ্রকে খুব বেশী নিরুৎসাহিত না করা হয়। সোম-শুভ্র প্রবন্ধের পাতাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এসব তিনি দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, 'অধরা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপাবার কোনও আগ্রহ তাঁর জাগল না। জাগলেও তার জন্যে নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী হবার দরকার হত না তাঁর, রামদাস মল্লিক যখন সে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এত কথা তিনি নবকুমারকে বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থেকে একটু সসঙ্কোচেই তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি তা বিশেষ কিছু নয় হয়তো, কিন্তু তবু এটা ছাপাব ঠিক করে ফেলেছি। ছাপালে পঞ্চাশ-ষাট পাতার একখানা চটি-বই হবে। এক হাজার কপি ছাপাতে কত খরচ পড়তে পারে?

নবকুমার উত্তর দিলে, দেড় শো টাকার মধ্যেই হবে।

দেড় হাজার টাকায় তা হলে দশ হাজার কপি হবে।

একেবারে দশ হাজার কপি ছাপাবেন? অত কি বিক্রি হবে?

বিক্রি করব না, বিতরণ করব।

এর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চর্তুদিকে সকলের যখন এত অভাব, তখন শুধু শুধু দেড়

হাজার টাকার এই অপব্যয়। পরমানন্দকে মানুষ করেছিলেন বলেই বোধ হয় তার ধারণা ছিল যে, সোম-শুভ্রের টাকাকড়িব ওপর তার একটা ন্যায্য দাবি আছে। তাই সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, তার মানে?

মনে করেছি, লাখ খানেক টাকা কোনও ভাল ব্যাঙ্কে জমা করে যাব। তারই সুদ থেকে প্রতি বছর এই বই ছাপা হয়ে বিতরিত হবে। হাজার দুই-তিন সুদ হবে বোধ হয়। দেড় হাজার যদি বই ছাপানোর খরচ হয়, বাকিটা হবে বিতরণের খরচ। যিনি বিতরণ করবেন, তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে, টিকিট প্রভৃতিও লাগবে কিছু—

ইলা আবার কথা কয়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে, আপনার টাকা অবশ্য আপনি যেমন ভাবে খুশি খরচ করতে পারেন—

তারপর একটু হেসে বললে, এ দেশে এখনও সে স্বাধীনতা আছে; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতগুলো টাকা আরও ঢের ভালভাবে 'ইউটিলাইজ' করা যেত।

সোম-শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং চুপ করেই হয়তো থাকতেন, যদি না তাঁর মনে হত যে, তাঁব নীরবতাকে হয়তো উপেক্ষা বলে মনে করবে মেয়েটি। মৃদু হেসে তাই উত্তর দিলেন, সেটা নির্ভর করে ইউটিলিটি কাকে বল তুমি, তার ওপর। তোমার শাড়ি দেখে আমার কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে, আমাদের দুজনের আদর্শে খুব বেশি তফাত নেই।

ইলার দামী রেশমের শাড়িটাব দিকে সস্নেহে চাইলেন তিনি।

ইলা লজ্জিত মুখে বললে, এর দামই বা কত? আর এ কটা টাকা দিয়ে কটা লোকেরই বা উপকার হবে? কিন্তু আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে—

তেত্রিশ কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবলে এক লাখ টাকাও কিছু নয়। আর একটা স্কুল তৈরি করে আরও গোটাকতক লোককে কেরানী হবার সুযোগ দিতে চাও? না, আর কোন হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কতকগুলো চোরকে প্রশ্রয় দিতে চাও? তোমার মতে কি হলে ভাল হয়, শুনি?

আপনার ওই বই ছাপিয়েই বা কি হবে?

হয়তো কিছু হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ যা আজগুবি বলে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হয়তো কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে মানব-সভ্যতার রূপই বদলে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—

কথাটা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত করে থেমে গেলেন তিনি। ঘড়িতে আটটা বাজল। অনামিকাকে উঠে পড়তে হল। সোম-শুভ্রের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে অবশ্য দুধ ছাড়া তিনি খাবেন না কিছু এবং সে দুধটুকুও নিজের প্যানে নিজের স্টোভে গরম করে নেবেন; কিন্তু তারও ব্যবস্থা করতে হবে অনামিকাকেই। অনামিকা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, সোম-শুভ্রের কথাবার্তা শুনে কিছু বলবার আর প্রবৃত্তিও ছিল না তার। আলেয়াকে নির্ভরযোগ্য আলো মনে করে বিভ্রান্ত পথিক অবশেষে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সোম-শুভ্রের আলোচনা শুনে অনামিকার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনই হয়েছিল। নিরীহ নির্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে—কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর করে বালিগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড় শো টাকা মাইনের কেরানীর আশাও কম নয়! বামন হয়ে চাঁদে হাত মনের মধ্যে তুষানল জ্বলছিল

অনামিকার। সে আর বসে থাকতে পারলে না, উঠে গেল। পত্নীর মনের অবস্থা পরমানন্দেরও অজ্ঞাত রইল না। হঠাৎ বেফাঁস কিছু বলে না বসে। অনামিকার পিছুপিছু সেও উঠে গেল।

নবকুমার বললে, আপনার সবচেয়ে বড় কথাটা কি, তা তো বললেন না?

আমার নিজের তৃপ্তি।

একটু চুপ করে থেকে সোম-শুভ্র আবার বললেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতার আড়ালে এই সত্য কথাটা ঢাকা পড়ে যায় অনেক সময়। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক কবি দার্শনিক দেশনেতা সকলেই যা সন্ধান করেছেন, তার নাম আত্ম-তৃপ্তি। দৈবক্রমে তাতে আর পাঁচজনের উপকার হয়ে গেছে। না-ও যদি তা হলেও তাঁরা স্বধর্মচ্যুত হতেন না।

এতটা বলে সহসা তাঁর মনে হল, আত্ম-প্রশংসা করা হচ্ছে। সসঙ্কোচে চুপ করে গেলেন।

ইলা মুখরা মেয়ে। বলে উঠল, দশজনের উপকার করে যাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে পূজনীয় কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সোম-শুভ্র বললেন, পৃথিবীতে এ রকম লোক থাকাও অসম্ভব নয়, যাঁরা দশের পূজা এড়াতে চান। মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাকেই পূজা করে কিনা। গ্যালিলিও যদি লোকের পূজা চাইতেন---

এখন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই পূজনীয় নন কি?

এখন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁব মতকে সমসাময়িক বিজ্ঞেরা শুধু আজগুবি বলেই মনে করেনি, তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিল সেজন্যে।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা বলে আমি এ কথা বলতে চাই না যে আমি গ্যালিলিওর সমকক্ষ! এটা হয়তো আমার বাজে খেয়াল মাত্র। তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম শুধু।

এ পর্যন্ত বলে স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন তিনি।

একটু পরে নবকুমার কথা কইলে, ইলা দেবী কম্যুনিস্ট, তাই আপনার খেয়াল বোধ হয় ভাল লাগছে না ওর।

সোম-শুভ্র সস্নেহে ইলার দিকে চাইলেন।

ইলা বলে উঠল, যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কম্যুনিস্ট না হয়ে পারে না। বর্তমান যুগে কম্যুনিজ্‌মই মুক্তি। আপনার মনে হয় না তা?

সোম-শুভ্র বললেন, হ্যাঁ, যাদের খেটে খেতে হবে, তাদের পক্ষে মুক্তি বইকি।

সকলেরই খেটে খাওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক সভ্যসমাজের উচিত—প্রত্যেক কর্মীকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সব মানুষের পক্ষে কি এক নিয়ম খাটে? তুঁতগাছ গুটিপোকার পক্ষে হিতকর স্বীকার করি, কিন্তু সব পোকার পক্ষে নয়। এমন কি সেই গুটি পোকাই যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, তার পক্ষেও নয়। সেও তখন তুঁতপাতায় আবদ্ধ থাকে না, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। গুটিপোকার চক্ষে যেটা নিরর্থক বিলাস, প্রজাপতির পক্ষে সেইটেই সার্থক কর্ম। এক নিয়ম কি খাটে সকলের বেলায়? বিশেষত মানুষের বেলায়?

উপমা দিয়ে কথা কইলে পারব না। নবকুমারবাবুর মত সাহিত্যিক তো আমি নই, লেখাপড়া শিখে বেকার বসে আছি, কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। তাই মনে হয়, সোভিয়েটের দেশে থাকলে হয়তো সসম্মানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম।

সোম-শুভ্র চুপ করে বসে রইলেন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর বিশ্বাস যে, প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম-অনুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য। মানুষের তৈরি সাম্যবাদের ছদ্মবেশ এতবার ধরা পড়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, জীবনটা সত্যিই যদি একটা যুদ্ধ হয় এবং তার প্রধান অস্ত্র যে শক্তি, তা প্রকৃতিই সকলকে যদি সমানভাবে না দিয়ে থাকেন, তা হলে নিখুঁত সাম্যের আশা দুরাশা মাত্র, আদর্শবাদীর স্বপ্ন শুধু। বাস্তব-জগতে সেটাকে মুখোশরূপে ব্যবহার করে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজ হাসিল করে নেবেন হয়তো; কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য অথবা খ্রীষ্ট-বিরোধী লেনিনের সাম্যরাজ্য দুর্বলের কল্পলোকে অথবা আদর্শবাদীর স্বপ্নলোকেই থেকে যাবে। জীবলোকে তা কোনদিনই মূর্ত হবে না, হবার উপক্রম করবে, কিন্তু হবে না। এসবই জানেন তিনি। তবু রঙিন-শাড়ি-পরা ছিমছাম এই মেয়েটির—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যার কোন দুঃখই নেই, অথচ অন্তরে যার এত গ্লানি—এর স্বরূপ জানতে পেরে এবং নিজের সচ্ছলতার সঙ্গে তার তুলনা করে তাঁর ভদ্র অন্তঃকরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

নবকুমার একটু অধীর হয়ে উঠেছিল। সোম-শুভ্র অথবা ইলা কাউকেই তাক লাগাতে না পেরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশেষে সে উঠে পড়ল।

কিছু যদি মনে না করেন, আমি উঠি এখন।

খাবে না এখানে?

পরমানন্দ খেতে বলেছিল; কিন্তু হঠাৎ এখন মনে পড়ল, সার নীলরতনের সঙ্গে একটা ''এন্‌গেজমেণ্ট আছে আমার—থাকতে পারব না।

আচ্ছা।

নবকুমার রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের পানের দোকানে একটা পাসিং-শো সিগারেট কিনে দেশলাইয়ের ওপর সেটা লঘুভাবে ঠুকতে ঠুকতে আগের মতই অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। ওখান থেকে উঠে এসে বা মিছে করে সার্ নীলরতনের নাম করে অস্বস্তির কিছুই উপশম হল না। নবকুমার চলে যাবার পর ইলা সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আমি কিন্তু অত সহজে নিস্তার দিচ্ছি না আপনাকে। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি বুড়ো মানুষ, তোমার সঙ্গে পারব কি?

দ্বারপ্রান্তে অনামিকাকে দেখা গেল। সমস্ত মুখ থমথম করছে তার। স্টোভ জ্বেলেছি, আসুন। ইলা তুমিও এস, খাবার দেওয়া হচ্ছে।

নবকুমারবাবু কোথা গেলেন?

তাঁর একটা এন্‌গেজমেণ্ট ছিল, চলে গেছেন তিনি।

সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন।

।। তিন ।।

সোম-শুভ্র নিবিষ্টচিত্তে বসে হিসেব লিখছিলেন। প্রত্যহ নিখুঁতভাবে পাই-পয়সার হিসেব মিলিয়ে তবে তিনি শুতে যান। বহুকাল থেকে এ কাজ করে আসছেন। আধ পয়সার হিসেব গোলমাল হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না—আধ পয়সার জন্যে নয়, হিসেবে গোলমালের জন্যে। কোন হিসেবের একচুল গোলমাল অসহ্য তাঁর পক্ষে। সারাজীবন তিনি এমন নিখুঁতভাবে হিসেব রেখেছেন যে, যে-কোন মুহূর্তে বলে দিতে পারেন, জীবনে কত কুলি-ভাড়া দিয়েছেন, কত কাপড় কিনেছেন, কত চাল-ডাল কিনেছেন। সমস্ত প্রকার খরচের নির্ভুল হিসেব আছে তাঁর কাছে। শুধু টাকাকড়ির ব্যাপারেই নয়, সব ব্যাপারেই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ম-নিবদ্ধ। কোন প্রকার অনিয়ম তাঁর সহ্য হয় না। এমন কি বিছানার চাদর কোথাও যদি সামান্য কুঁচকে থাকে, তা হলেও তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। ঘুম আসতে চায় না, সেটা ঠিক করে না নেওয়া পর্যন্ত মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে। এ রকম লোকের জীবন অশান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু সোম-শুভ্রের জীবন আশ্চর্য রকম শান্তিপূর্ণ, কারণ তিনি স্বাবলম্বী, কারও কাছে—এমন কি নিজের চাকরদের কাছেও—জোর-গলায় কিছু দাবি করবার আত্মম্ভরিতা তাঁর নেই। বরং তার ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয়, তিনি সর্বদাই সঙ্কুচিত, যেন নিজের অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি জীবনযাত্রায় বাধা-সৃষ্টি করছেন এবং সকলে তা সহ্য করছে বলে সকলের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।

ইলা এসে প্রবেশ করলে।

আমি আপনার বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে যাই।

না না, কিছু দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। আমি নিজেই করে নিতে পারব। অনু কেমন আছে?

ভাল আছে। সে-ই আসছিল, আমিই মানা করলাম তাকে। একটু চুপ করে শুয়ে থাকুক।

এর আগে কি ওর ফিট হয়েছি, কখনও?

কই, শুনিনি তো!

ইলা সোম-শুভ্রের বিছানা খুলে পাততে লাগল, সোম-শুভ্র বাধা দিতে পারলেন না--কোন ব্যাপার নিয়ে বেশী বাদ-প্রতিবাদ করাটাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি হাসিমুখে হিসেব লিখতে লাগলেন।

মশারির দড়ি নেই বুঝি? নিয়ে আসি।

সব আছে; দাঁড়াও, দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র উঠে তোরঙ্গ খুলে (সুটকেস পছন্দ করেন না তিনি) এক গুলি টোয়াইনের শক্ত সুতো, চারটি ছোট পেরেক এবং একটি ছোট হাতুড়ি বার করে ইলাকে দিলেন।

এসব আপনি সঙ্গে রাখেন বুঝি?

সোম-শুভ্র একটু হাসলেন শুধু। ওই তোরঙ্গের মধ্যে কত রকম জিনিস যে তাঁর সংগ্রহ করা আছে, তা দেখলে ইলা অবাক হয়ে যেত। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, নিব, আলপিন, ফাউণ্টেন পেন, ব্লটিং, সাধারণ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, দেশলাই, গালা, শিলমোহর, হরিতকী, মাজন—এসব তো আছেই,

অনেকেরই থাকে; কিন্তু এসব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যা অনেকের থাকে না। কয়েকটা ছোট ছোট কৌটোতে আধলা, পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, এমন কি কয়েকটা গিনিও আলাদা আলাদা করা আছে। কয়েকটা শক্ত খামে আছে নানা মূল্যের নোট। এসব ছাড়া ছোট পুঁটুলিতে নানা রকমের কাপড়ের টুকরো, নানা রঙের সুতোর গুলি, সরু মোটা ছুঁচ, নানা ধরনের ছোট বড় বোতাম সংগ্রহ করা আছে। যখনই যে কাপড়ের জামা অথবা মশারি করান, তখনই তার খানিকটা ছাঁট সংগ্রহ করে রেখে দেন, ভবিষ্যতে যদি তালি দিতে হয়—এই ভেবে। পড়বার সময় চশমা লাগে, দু'জোড়া করিয়ে রেখে দিয়েছেন—এক জোড়া হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলে অসুবিধেয় যেন পড়তে না হয় অথবা অপরকে যেন অসুবিধেয় ফেলতে না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সোম-শুভ্র এটা বুঝেছেন যে, অ-গোছালো হলে নিজের তো অসুবিধে হয়ই, আশেপাশে যারা থাকে তারাও অস্বস্তি ভোগ করে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে জীবনযাত্রার ছন্দে তাল কেটে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় যেন।

না না, ও ঠিক হচ্ছে না, ঠিক সমান করে মেপে নাও, যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকলে ঠিক হবে না। মশারির চারিটি খুঁট ঠিক সমান হওয়া চাই তো।

আপনি কি লিখছেন লিখুন না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র আর বাধা দিলেন না, লিখতে লাগলেন; কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, ঠিক হচ্ছে না, ও চলে যাবার পর ঠিক করে নিলেই হবে। যথাসাধ্য ভাল করেই ইলা মশারি টাঙালে, বিছানা-পাতা শেষ করে বললে, দেখুন।

চমৎকার হয়েছে।

যাবার আগে ইলা লীলাভরে হেসে বললে, আপনার যে এত কাজ করে দিচ্ছি, আমার একটু স্বার্থ আছে।

কি?

আমি যে স্কুলে পড়াই, সেখানে আমাকে মাইনে দেয় না। ভবিষ্যতে মাইনে পাব—এই আশায় ঢুকেছিলাম। স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তিনি এখন বলছেন, বি.টি. পাস লোক নেওয়া হবে। আমি যদি এক বছরের মধ্যে বি.টি. পাস করতে পারি, তা হলে তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, না পারলে অন্য লোক নেবেন। স্কুলের সেক্রেটারি অনাদি সেন আপনাকে খুব খাতির করেন, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড করে দেন আমাকে—

কি রেকমেণ্ড করব?

আমাকে যেন চাকরি করতে করতে বি.টি.পাসের সুযোগ দেওয়া হয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে তিন বছর পর্যন্ত সময় দিতে পারেন। আমি তা হলে টাকা কিছু জমিয়ে দিতে পারি, বি.টি. পড়ার অনেক খবচ তো।

কত খরচ?

তা মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ-সাত শো টাকা লাগবে। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যায়।

তাদের স্কুলের বিষয় তো আমি কিছুই জানি না। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার বিষয়েই বা এমন কি জানি! চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে!

বেশ, তবে দেবেন না।

প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ইলা। সোম-শুভ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাসি-হাসি মুখখানি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি করবেন তিনি, এমন ভাবে চিঠি দেওয়াটা কি উচিত হত? উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব মেটাতেই সারাজীবনটা কেটে গেল! কি যে কর্তব্য, তা ঠিক করা এত কঠিন! ইলার মুখখানা বারম্বার ভেসে বেড়াতে লাগল মনের ওপর। একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেই বোধ হয় ওর সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এমনভাবে মহত্ত্ব আস্ফালন করে অপরিচিত একজন মেয়েকে একটা চেক ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ইতরামি আছে, তার মধ্যে তার মধ্যে যেতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। তারপর হঠাৎ আর একটা কথাও মনে হল। যে শিব-শুভ্রের টাকা তিনি পেয়েছেন, তাঁর আত্মা যাতে তৃপ্ত হবে, টাকাটা কি সেই ভাবেই খরচ করা উচিত নয়? শশাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে হল। কে জানে, তার ব্যবসা কেমন চলছে আজকাল! বহুদিন তার কোনও খবর পাননি। গায়ে পড়ে খবর নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে-ও বোধ হয় সঙ্কোচভরেই তাঁর কাছে আসতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনবশেই সেবার আসতে হয়েছিল বলে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে বোধ হয়। শশাঙ্কের ছেলে শঙ্খ, তারও আবার ছেলে হয়েছে! শিশু শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখটা মনের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

শশাঙ্ক-শুভ্র

।। এক।।

কোন দামী মোটরকার যদি দৈব-দুর্বিপাকে বার বার ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরে যায় এবং যদি একাধিক মূর্খ মিস্ত্রী সস্তায় সেটাকে সারিয়ে দেবার অজুহাতে নানা রকম জোড়া-তালি লাগায় তাতে, তা হলে তার যা অবস্থা হয়, শশাঙ্ক-শুভ্রের বর্তমান অবস্থা অনেকটা তাই। শশাঙ্ক-শুভ্র মোটরকার নন—মানুষ, তাই অবস্থাটা জটিলতর।

প্রথম ধাক্কা খান যৌবনের প্রারম্ভে। বর্তমানের সাহেবী-স্যুট-পরা প্রৌঢ় শশাঙ্ক-শুভ্রকে দেখে অনুমান করা কঠিন যে, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একদা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হয়ে বোমার দলে যোগ দিযেছিলেন। দেশের বাগ্দীদের সংঘবদ্ধ করে, ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার কল্পনাও তাঁর মাথায় একদিন এসেছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের বই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গান, সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' তাঁরও চিত্তকে উদ্বোধিত করেছিল সেদিন স্বাধীনতার মন্ত্রে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে মেরে কানাইলাল যখন ফাঁসি গেলেন, তখন যুবক শশাঙ্ক-শুভ্রও ঠিক করে ফেললেন যে, ওঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তিনি। ও-পথে বিনা-বাধায় চলতে পেলে তিনি ঠিক কি যে হতেন, তা এখন আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু সে-পথে চলবারই সুযোগ তিনি পাননি ভালভাবে। যাত্রা করবার মুখেই তিনি ধাক্কা খেলেন। পথ-রোধ করে দাঁড়ালেন পিতা হংস-শুভ্র স্বয়ং। অনুগৃহীত একজন পুলিশ-কর্মচারীর মুখে যেই তিনি খবর পেলেন যে, শশাঙ্ক বোমার দলে মিশেছে, অমনই ডেকে পাঠালেন তাকে।

তুমি বোমার দলে যোগ দিয়েছ শুনছি।

দিয়েছি।

ও-দলে যোগ দেবার মত মনের জোর আছে তোমার?

আছে।

বেশ, দেখা যাক।

ড্রয়ার থেকে প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরা বার করে বললেন, এই নাও। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কিছুতেই বোমার দলে যেতে দেব না। তোমার যদি মনের জোর থাকে, এই ছোরা আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে চলে যাও।

ছোরা হাতে করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বললেন, বুঝেছি। দাও ছোরাখানা। ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা না করে ওদের ভাল গুণগুলো নেবার চেষ্টা কর। তোমাকে বিলেত পাঠাব ঠিক করেছি, তার জন্যে প্রস্তুত হওগে যাও।

বিলেত যাওয়ার নামে স্বদেশ-প্রেম কর্পূরের মত উবে গেল যেন।

ধাক্কাটা সামলাতে মাসখানেক লেগেছিল তবু।

মাস ছয়েক পরে বিলেত চলে যান তিনি।

দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেয়েছিলেন বিলেতে—জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাহেবিয়ানায় পাল্লা দিতে গিয়ে। সেও আজ অনেক দিনের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ছেলেটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব হয়েছিল, সেই ছেলেটিই যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর অধঃপতনের কারণ হবে —এ কথা তখন কে ভেবেছিল! অন্তরঙ্গতার অন্তরালে যে ঈর্ষার বীজ লুক্কায়িত ছিল, তা প্রথম অঙ্কুরিত হল একটি তরুণী মেমসাহেবকে কেন্দ্র করে। সনৎকুমারও সুশ্রী, অভিজাত বংশীয় ধনীর সন্তান, শশাঙ্কের চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং কোন কোন বিষয়ে এক-কাঠি বাড়া। ছিপছিপে চেহারা, স্মার্ট যাকে বলে তাই। শশাঙ্ক ছিল মোটা নাদুস-নুদুস গোছের। নাচের আসরে কন্দর্পের বিচারে তারই জিত হল, বরমাল্যও হয়ত তারই গলায় দুলত, যদি স্বয়ং কুবের এসে মধ্যস্থতা না করতেন। নিছক টাকার জোরে শশাঙ্ক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে, ঠিক পত্নীত্বে নয়, প্রণয়িনীত্বে বরণ করলেন। সনৎকুমার মুচকি হেসে চুপ করে রইলেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হল, হারটা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই শশাঙ্ককে হৃদয়ঙ্গম করতে হল যে, এই স্ত্রী স্বাধীনতার দেশে কোন ললনারই চরণে বা কণ্ঠদেশে কোনরকম শৃঙ্খলেরই স্থায়ী স্থান নেই, এবং তা নিয়ে হৈ-চৈ করাটা শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, অশোভনও। দেঁতো হাসি হেসে শিভ্যল্‌রির অভিনয় করা ছাড়া উপায় নেই। সপ্তাহখানেক পরে তাই তিনি যখন টের পেলেন, তাঁরই দেওয়া সাড়ে সাত শো পাউণ্ডের নেকলেস গলায় দুলিয়ে তাঁর প্রণয়িনী সনৎকুমারের সঙ্গে প্যারিস ভ্রমণে গেছেন, তখন আরও কয়েক পাউণ্ড খরচ করে জরুরী তার যোগে তাঁকে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-জ্ঞাপনও করতে হল। মর্মান্তিক সত্যটা মর্মে মর্মে অনুভব করেও কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র থামতে পারলেন না। টাকা ঢালতে লাগলেন। যাঁদের টাকা ছাড়া আর কোনও সম্বল নেই, তাঁদের টাকার উপর অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের ধারণা-টাকায় শেষ পর্যন্ত সব হয়। আকাশে পোস্ট-অফিস থাকলে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রকেও ঘুষ দেবার চেষ্টা করতেন বোধ হয় তাঁরা। বড়লোকের ছেলে শশাঙ্ক-শুভ্র দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান শূন্য হয়ে শুধু প্রণয় বাবদে নয়, নান বাবদে টাকা খরচ করে সনৎকুমারের সঙ্গে টক্কর দিতে লাগলেন। শেষটা হংস-শুভ্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে পুত্রকে তিনি যা লিখলেন, তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে—প্রিয় বৎস, একটা কথা যদি মনে রাখ, ভবিষ্যতে তোমারই উপকার হবে। প্রিন্স দ্বারকানাথের মত ধনীও অজস্র অপব্যয়ের আঘাতে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর তুলনায় আমাদের আয় সামান্য। বছরে মাত্র দশ লাখ টাকা। তোমার আরও চারটি ভাই, দুটি বোন আছে। প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার বরাদ্দ মাসহারার বেশি তুমি যা খরচ করবে, তা তোমার নামে লেখা থাকবে এবং তা তোমার অংশের প্রাপ্য থেকে বাদ যাবে ভবিষ্যতে। আর একটা কথা মনে রাখলেও সংযত হতে পারবে। কৃপণতা করে অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন করা যেমন নোংরামি, বাহাদুরি করে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অকারণ অপব্যয় করাটাও তার চেয়ে কম নোংরামি নয়।

কিছুকালের জন্য সংযত হলেন শশাঙ্ক-শুভ্র এবং সেই সংযমের যুগেই কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রিটা অর্জন করলেন। সনৎকুমার হলেন ব্যারিস্টার। শশাঙ্ক-শুভ্রও যদি ব্যারিস্টারি পাস করে

আসতেন, তা হলে পরবর্তী যুগে জটিলতর সমস্যায় পড়তে হত না তাঁকে। স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করবার একটা পথ উন্মুক্ত থাকত। তিনি বিদেশী সভ্যতার হাব-ভাব কায়দা-কানুন সমস্ত আয়ত্ত করলেন, করলেন না কেবল বিদেশী প্রথায় টাকা রোজগার করবার কৌশলটা। চাকরি করলে কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রিটা হয়তো কাজে লাগতে পারত, যদি প্রথম প্রথম—মানে, বয়স থাকতে থাকতেই—তিনি সেটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বোমার দলে যিনি একদিন যোগ দিয়েছিলেন, 'অন প্রিন্সিপল' তিনি চাকরির বিরোধী ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর তিনি যা করতেন, প্রায়ই 'অন প্রিন্সিপল' করতেন।

ফিরে এসে 'অন প্রিন্সিপল'ই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পুরাতন যোগসূত্রকে পুনঃস্থাপন করবার জন্যই নয়—নূতন ক্ষুধাও একটা অনুভব করছিলেন। কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ের পর যে জাতীয়তা-বোধ কালক্রমে মিইয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে যেন প্রাণসঞ্চার করলেন। জগৎ-সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব আবার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হল যখন, তখন ভারতের জাতীয়তার প্রতীক যে কংগ্রেস, তাতে না দেওয়াটা ঘোরতর অকর্তব্য বলেই মনে হল শশাঙ্ক-শুভ্রের। গোখলে কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ছাড়া পেয়েছেন তিলক। বিরুদ্ধপন্থী গোখলের চিতাপার্শ্বে তিলকের বক্তৃতাটা শশাঙ্ক-শুভ্রের এমন মর্ম স্পর্শ করল যে, তিলক-ভক্ত হয়ে পড়লেন তিনি হঠাৎ। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গোখলের 'সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া'র অধিনায়কত্ব করছেন বটে, কিন্তু তিলক তাঁর প্রাণেও সাড়া তুলেছেন। কোন্ কুল রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না তিনি। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও তো নেতা হবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারেনি। লালা লাজপত রায় দেশের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে একরকম বানপ্রস্থই অবলম্বন করেছেন আমেরিকায়। এস. পি. সিন্‌হা বম্বেতে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন বটে, কিন্তু তাঁর সুর পছন্দ হল না কারও। কিন্তু ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি বুড়োর দল বাগড়া দিতে লাগলেন বলে শশাঙ্ক-শুভ্রের রাগ হল খুব। এ নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি ঘোরাঘুরি কম করেন নি; এস. পি সিন্‌হার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছিলেন এবং কিছু করতে না পেরে শেষে যোগ দিয়েছিলেন তিলকের 'হোম-রুল লীগে'ই। তিলকের হোম-রুল আর পত্নী বাসন্তীর হোম-রুল কিন্তু এক নয়; তা ছাড়া বাসন্তীর বাবা একজন রায়-বাহাদুর। মনের প্রত্যক্ষলোকে কিন্তু তিলক ভক্তিটা প্রাণপণে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। তিলকই তাঁকে 'ডিসগাস্‌টেড' হবার সুযোগ দিলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগল, যখন বিদ্রোহী তিলক মডারেটদের সঙ্গে আপস করে কংগ্রেসে ঢুকতে রাজী হলেন। যে ন্যাশনালিজমের বিপ্লবী সুর তুলেছিলেন তিনি, শশাঙ্কের মনে হল, তা অনেকখানি নেমে গেল যেন। একটা 'থিওরি'ই খাড়া করে ফেললেন তিনি—এদেশের জল-হাওয়ায় বিদ্রোহ টিকতে পারে না—ভারি স্যাঁতসেঁতে দেশ। স্যাঁতসেঁতে দেশ ছাড়াও যে প্রবলতর আর একটা কারণ আছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেল। যতীন মুখুজ্জে বালাশোরের জঙ্গলে পুলিসের সঙ্গে লড়তে লড়তে প্রাণ দিলেন। বিবাহ করার ফলেই হোক বা বিশ্লেষণ করার ফলেই হোক, শশাঙ্ক-শুভ্রের ধারণা হল এ দেশে বিপ্লব-পন্থা অনুসরণ করা মানে প্রাণ দেওয়া বা নষ্ট করা। কোনটা করতেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। অথচ স্বদেশী কিছু একটা করবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল। এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন—তোমরা ব্যবসা কর; স্বাধীন ব্যবসা করে নিজের পায়ে

দাঁড়াবার চেষ্টা করাটাই দেশসেবা করা। কথাটা বড় ভাল লাগল। যুদ্ধ বেধেছে, এই সময় দেশী 'ইন্‌ডাস্ট্রি' গুলোকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। আর একটা থিওরিও খাড়া করলেন। ইংরেজরা বণিক, আঁতে ঘা দিলেই ওরা টলবে। কতকগুলো কেরানী, উকিল আর মাস্টারের বাজে চীৎকার ওরা গ্রাহ্য করবে কেন? হঠাৎ ব্যক্তিগত একটা কথা মনে পড়াতে আরও বেশি উৎসাহিত হলেন। সনৎ ব্যারিস্টারি করে আর কটা টাকা রোজগার করতে পারবে? আমি যদি ভাল করে ব্যবসা করতে পারি, তরতর করে দুদিনেই উঠে যাব ওকে ছাড়িয়ে। ব্যবসাই করতে হবে।.... থিওসফি ত্যাগ করে অ্যানি বেসান্ট যখন 'সম্মিলিত' কংগ্রেসের অধিনেত্রী হয়ে পুরো দমে হোম-রুল আন্দোলন শুরু করেছেন, শশাঙ্কের মাথায় তখন অঙ্কুরিত হচ্ছে নানা রকম ব্যবসার প্ল্যান।

তৃতীয় ধাক্কা এইবার খেতে হল। ব্যবসা করতে হলে টাকা চাই এবং টাকার মূল উৎস হংস-শুভ্র। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে তাঁর সঙ্গেই মনান্তর ঘটতে লাগল।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর শশাঙ্ক যা করতেন,'অন্ প্রিন্সিপল'ই করতেন। সুতীক্ষ্ণ একটা বিলেতী বিবেক তাঁর দেশী মস্তিষ্ক বিবরে আড্ডা গেড়ে ছিল। হংস-শুভ্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণ এই বিবেকই। হংস-শুভ্র নিজে এক কালে খুব সাহেব ছিলেন, এখন কিন্তু সাহেবিয়ানা তাঁর চক্ষুশূল। বিদেশী সভ্যতার আপাত-চটকদার জলুস একদিন তাঁর চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রতারিত করেছিল বলেই সে জলুসের ওপর এখন তিনি জাতক্রোধ। দেহ ও মন থেকে বাজে বিলিতী খোলসটাকে দূর করে দিয়ে যখন নিজের চতুর্দিকে হংস-শুভ্র সনাতনী পরিবেষ্টনী গড়ে তুলতে শুরু করেছেন, তখন শশাঙ্ক বিলেত থেকে ফিরলেন এবং পরিবর্তিত পিতাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি তিনি। কিন্তু ক্রমেই দেখলেন, যাকে বার্ধক্য জনিত মস্তিস্ক-বিকৃতি ভেবে সানুকম্প লঘু হাস্যভরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা মোটেই লঘু হাসিতে উড়ে যাবার মত হালকা জিনিস নয়। আঘাত করেও তাঁকে বিচলিত করা গেল না, কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ উড়ল শুধু, এবং তাতে ক্ষতি হল শশাঙ্ক-শুভ্রেরই। হংস-শুভ্রের মনস্তত্ত্বটা তিনি বুঝতে পারেননি সম্ভবত। পারলে এত কাণ্ড হয়তো হত না। হংস-শুভ্র সেকালে যেমন উগ্র সাহেব ছিলেন, একালে তেমনই উগ্র হিন্দু হয়েছেন। তফাত শুধু এই যে, উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র তাঁর পারিপার্শ্বিককে মনের মত করে গড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, ছেলেমেয়েদের সেই আদর্শে মানুষ করেছিলেন; কিন্তু উগ্র হিন্দু হংস-শুভ্র বৃদ্ধবয়সে নিজের দলে কাউকে পেলেন না। সাহেব হংস-শুভ্রের কীর্তিকলাপ হিন্দু হংস-শুভ্রের শান্তি বিঘ্নিত করতে লাগল এবং এইটেই বোধ হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না কারও কাছে, তাঁর নবতম ধ্বজাকে উদ্যত করে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও নিজের দুর্গে অটল হয়ে রইলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যাই হোক, আধিভৌতিক হিসাবে এতে শশাঙ্ক-শুভ্রেরই ক্ষতি হল।

পিতার সঙ্গে শশাঙ্ক-শুভ্রের প্রথম সংঘর্ষের কাহিনীটা এই রকম। পিতামহ যোগীশ্বর এককালে স্বগ্রামে জগদ্ধাত্রীপূজা করতেন। শিব-শুভ্রও কিছুকাল করেছিলেন, পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। যোগীশ্বরের আদি নিবাস সেই হিঙ্গুল গ্রামে পুরাতন বাস্তু-ভিটা সংস্কার করিয়ে জগদ্ধাত্রীপূজা পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন হংস-শুভ্র। হিঙ্গুল গ্রাম স্থানটি মোটেই সুগম নয়।

রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, কাঁচা-রাস্তায় গরুর গাড়ি করে যেতে হয়। বলা বাহুল্য, এসব বাধা প্রবুদ্ধ হংস-শুভ্রকে নিরস্ত্র করতে পারেনি। তিনি প্রতি বছর হিঙ্গুল গ্রামে যেতেন এবং আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতিবর্গ সকলকে নিমন্ত্রণ করে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীপূজা যথানিয়মে করতেন। পানা-পুকুরের জল, মশার কামড়, সুখাদ্যের অভাব প্রভৃতি তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৃগাঙ্ক ও ইন্দু তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই হিঙ্গুল গ্রামে গিয়েছে। প্রথম যখন পূজা আরম্ভ হয়, তখন হিমাংশু সিতাংশু সুধাংশু—তিনজনেই বিলেতে। শশাঙ্ক ফিরেছেন এবং কিছুদিন হোম-রুল করে অবস্থান করছেন শ্বশুরবাড়ি দিল্লীতে। হংস-শুভ্র তাঁকে আসতে লিখেছিলেন; কিন্তু তিনি আসেননি, অক্ষমতা এবং দুঃখ জ্ঞাপন করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন মাত্র। হিমাংশু, সিতাংশু এবং সুধাংশুকেও হংস-শুভ্র পত্রযোগে পূজার খবরটা সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, উত্তরে তারাও অনুরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। তিনজনেরই উত্তর এসেছিল, কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করা দূরের কথা, এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখই কেউ করেনি। হিমাংশুর চিঠি এক সুইডিশ প্রফেসারের গুণগানে ভরতি ছিল। ডোমিনিয়নের ডেলিগেট্‌স, বিকানীরের মহারাজা এবং সার্‌ এস. পি. সিনহাকে নিয়ে বিলেতে তখন যে ইম্পিরিয়াল ওআর কন্‌ফারেন্স বসেছিল, তাতে এস. পি. সিন্‌হার বক্তৃতায় ব্রিটিশ পাবলিক যে কি রকম মুগ্ধ হয়েছে, তারই বর্ণনা করেছিল সুধাংশু। আর সিতাংশু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল অ্যানি বেসান্ট, অ্যারুন্‌ডেল এবং ওয়াডিয়ার অন্তরিত হওয়ার খবরে এবং উল্লাস প্রকাশ করেছিল মিষ্টার জিন্না হোম-রুল লীগে যোগ দিয়েছেন বলে। বিলেতে বসেও ভারতবর্ষের খবর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল সে। সুরেন বাঁড়ুজ্জে, রাসবিহারী ঘোষ ভূপেন বোস, মদনমোহন মালবীয়, কে. জি. গুপ্ত. মহম্মদাবাদের রাজা, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, ভি. এস. শাস্ত্রী, সি. পি. রামস্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে কংগ্রেস বিলেতে ডেপুটেশন পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চেম্বারলেন সাহেব কিছুতেই নিজের পলিসি প্রকাশ করলেন না, ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে ভারতীয়দের কমিশন দিতেও চাইলেন না—সুতরাং সে ডেপুটেশন গেল না। সার্‌ এস. পি. সিনহাকে নিয়ে নমো-নমো করে যে কনফারেন্সটা হয়ে গেল, সিতাংশুর তা মোটেই মনঃপূত হয়নি। এই সব নিয়েই দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল সে। তবে সে-ই কেবল পুনশ্চ দিয়ে পুজোর বিষয় এক লাইন লিখেছিলেন—জগদ্ধাত্রী পুজোর খবরটা শুনে সে কিউরিয়াস হয়েছে। মৃগাঙ্ক তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। হংস-শুভ্র ঠিক করলেন, ওকে আর বিলেতে পাঠাবেন না। পাঠানওনি। সোম-শুভ্রও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মানে, ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র একখানা ডাকযোগে তাঁর উদ্দেশ্যেও প্রেরিত হয়েছিল। অনুতপ্ত হংস-শুভ্র যখন সোম-শুভ্রকে পত্রযোগে আহ্বান করেন, এটা তার আগের ঘটনা। যোগীশ্বরের পৌত্র হিসাবে তাঁকে খবরটা দেওয়া উচিত—এই ভেবেই খবরটা দিয়েছিলেন হংস-শুভ্র। একটু খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল হয়তো। সোম-শুভ্র এর উত্তরে দেবী সূক্তের একটা নূতন ধরনের ব্যাখা এবং গ্রামের গরিব-দুঃখীদের খাওয়ার্বার জন্য শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়েছিলেন। শশাঙ্ক-শুভ্র শ্বশুরবাড়িতে বসে রইলেন, অথচ জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলেন না, এতে হংস-শুভ্র মনে মনে খুবই চটলেন। মুখে কিন্তু কিছু বললেন না। পিতা-পুত্রে যে সংঘর্ষটা হয়ে গেল, তা মানসিক।

দ্বিতীয় বছরের পুজোয় শশাঙ্ক-শুভ্র কাঁচা রাস্তা ভেঙে শকটারোহণে হিঙ্গুল গ্রামে সস্ত্রীক হাজির হলেন। বাসন্তী জেদাজেদি না করলে সেবারও যেতেন কি না সন্দেহ। বাসন্তীর

জেদাজেদি করবার দুটো কারণ ছিল। বুদ্ধিমতী পুত্রবধূমাত্রেই শ্বশুড়-শাশুড়ীর স্নেহ আকর্ষণ করতে চায়। আমি সকলের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারি, আমাকে দেখলে কেউ না ভালবেসে পারে না—এই ধরনের একটা গর্বও বাসন্তীর মনে সদা-জাগরুক থাকত এবং সে গর্বের ন্যায্য খোরাক সংগ্রহ করবার জন্যে সে না পারত এমন কাজ নেই। সবাই আমাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করুক সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে না থাকলে জীবনই বৃথা—এই ছিল তার জীবনের মূল প্রেরণা। অনেকে এমনিতেই অর্থাৎ বাসন্তীর কোনো আয়াসের অপেক্ষা না রেখেই বাহবা দিত, অনেকের কাছে বাহবা আদায় করবার জন্যে বাসন্তীকে রীতিমত কষ্ট-স্বীকার করতে হত, তৃতীয় একটা একগুঁয়ে দল ছিল যারা কিছুতেই বাহবা দিত না। এই তৃতীয় দল সম্বন্ধে বাসন্তীকে বাধ্য হয়ে মিথ্যাভাষণই করতে হত—উচ্চকণ্ঠে সোচ্ছ্বাসে প্রচার করতে হত যে, ওরাও ওর সম্বন্ধে গদগদ। পরিচিত মহলে কেউ যে ওর সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে এবং আর পাঁচজনে সেটা জানবে, এ চিন্তা বাসন্তীর পক্ষে অসহ্য। তাই সেবার বাসন্তী প্রথমত এবং প্রধানত গিয়েছিল হংস-শুভ্রের বাহবা আদায় করবার জন্যে। দ্বিতীয় কারণটা—মজা দেখা। গরুর গাড়ি চড়ে মাঠের পর মাঠ ভেঙে পূর্ব পুরুষদের বাস্তুভিটেয় পৌঁছে, আত্মীয়-আত্মীয়া-পরিবৃত হয়ে জগদ্ধাত্রীপুজো দেখার মধ্যে যে মজা আছে, তা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়ার মত বস্তুতান্ত্রিক মন বাসন্তীর তখনও হয় নি। সেই সবে বিয়ে হয়েছে। শশাঙ্কর কিন্তু হয়েছিল। পাশচাত্য শিক্ষার গুণে যে মজায় তার মন সাড়া দিত, সে মজার প্রধান উপকরণ অর্থ। নিরর্থক গরুর গাড়ি চড়ে একটা অজ-পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে জগদ্ধাত্রীপুজোর নামে অকারণ শক্তি ও সময় অপব্যয় করার মধ্যে কি মজা যে থাকতে পারে, তা তাঁর মাথায় আসেনি। কিন্তু তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তরুণী ভার্যা যখন হিঙ্গুল গ্রামে যাবে বলে ঝুঁকলে, তখন 'অন্ প্রিন্সিপল' তিনি বাধা দিতে পারলেন না। সঙ্গেও আসতে হল। দুরূহ রাস্তায় অবলা পত্নীকে একা আসতে দেওয়াটাও 'অন্ প্রিন্সিপল' অনুচিত। সুতরাং বিবেকের খাতিরেই সেবার শত অসুবিধা ভোগ করেও তিনি হিঙ্গুল গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। আশা করেছিলেন, পিতা উল্লসিত হয়ে উঠবেন। হয়তো মনে মনে হয়েছিলেন, কিন্তু ভাষায় যা প্রকাশ করলেন, তাতে সুর কেটে গেল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ছিল নিম্নলিখিত প্রকার ঃ

হংস-শুভ্র খালি গায়ে একটি মোড়ার উপরে বসে হুঁকোয় কাঁঠালপাতার নল লাগিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। অদূরে একটা ঝি বাসন মাজছিল, খড়ো চালের একটি ঘরে নগ্নগাত্র কুৎসিত-দর্শন জনকয়েক ময়রা ভিয়ান চড়িয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে অবস্থিত গ্রাম্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন জগদ্ধাত্রী-প্রতিমাটির সম্মুখে এক পাল উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ রুগ্ন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে। দূর-সম্পর্কীয় কয়েকজন আত্মীয়া সিক্তবসনে কলসী কাঁখে জল আনছিলেন পাশের পুষ্করিণী থেকে। এমন সময় গরুর গাড়িটা এসে থামল এবং তার থেকে নামলেন সাহেবী-সুট-পরা শশাঙ্ক-শুভ্র এবং হাই-হিল-জুতো-পরা বাসন্তী। উভয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই হংস-শুভ্র হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, গুড মর্নিং, আশা করি, মিসেস মুখার্জির রাস্তায় কোনও রকম কষ্ট হয়নি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাসন্তী কিন্তু একমুখ হেসে বললে, বাবা কি যে বলেন!

ঘরের ভিতরে ঢুকে শশাঙ্ক-শুভ্র স্ত্রীকে বললেন, নুইসেন্স! এর পর আর থাকতে ইচ্ছে করছে না, চল, ফিরে যাই।

বাসন্তী আবার একমুখ হেসে বললে, পাগল নাকি!

মনান্তরের এই সূত্রপাত। বহুকাল পূর্বের এই সূত্রটি নানা ঘটনা পরম্পরায় নানারূপ আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক পাক খেয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল, তার ঠিক স্বরূপটি বাইরের লোকের দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু এরই বিপাকে পড়ে শশাঙ্ক-শুভ্র ব্যবসায়-ব্যাপারে হংস-শুভ্রের দাক্ষিণ্য-লাভে বঞ্চিত হলেন। একটা-না-একটা খিটিমিটি লেগেই থাকত দু'জনের মধ্যে। বাসন্তী মাঝে মাঝে থাকাতে কলহটা কোলাহলে পরিণত হতে পারে নি। হংস-শুভ্র বাসন্তীকে যে খুব পছন্দ করতেন না নয়, বরং ঠিক উল্টো। মেয়েটার কোনো রকম খুঁত ধরতে না পেরে, তার সর্বদা সব রকমে সবাইকে খুশি করবার চেষ্টা দেখে, তার বাপের অগাধ ঐশ্বর্যের ঝনৎকারে মনে মনে জ্বলে যেতেন তিনি। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কোন অজুহাতে না পেলে কি নিয়ে রাগ করবেন? বাসন্তী রাগ করবার কোন সুযোগই কখনও দিত না। মাঝে মাঝে মৃগাঙ্কর স্ত্রী কনকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তির্যক-পথে বাসন্তীকে আঘাত দেবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে আঘাতও বাসন্তীকে কাবু করতে পারত না। কনকের আরও বেশী প্রশংসা করে বাসন্তী হংস-শুভ্রকে অপ্রতিভ করে দিত। হংস-শুভ্র মনে মনে চটতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় থাকত না। শেষটা এমন হয়েছিল যে, হংস-শুভ্র বাসন্তীকে মনে মনে ভয় করতেন। বাসন্তীর মধ্যস্থতাতেই পিতা-পুত্রের অন্তরবহ্নি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠেনি। সব দিক বজায় রেখে সকলের প্রশংসা আদায় করে হাসিমুখে অসম্ভবকে সম্ভব করবার শক্তি পরিবারের মধ্যে একমাত্র বাসন্তীরই আছে। বাসন্তী হাসিমুখে কারও কাছে কখনও কিছু চাইত যখন, 'না' বলবার সামর্থ্য থাকত না তার। যা নিত, তার দশগুণ প্রত্যর্পণও করত সে নানা উপায়ে। আদরে, অবদারে, অভিমানে, অযাচিত উপহারে, অজস্র স্তুতিতে প্রত্যেক পরিচিত লোকের মনে যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করত সে, তাতে কোন কিছু বেসুরো বাজা অসম্ভব। বাসন্তীর জগৎ ছিল ঐকতানের জগত। এরকম স্ত্রীকে নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র বিব্রত হয়েছেন সারাজীবন। তাঁর সমস্ত হিসাব-নিকাশ, সমস্ত 'প্রিন্সিপল' বারম্বার ভেসে গেছে বাসন্তীর খুশির খরস্রোতে। বাসন্তী যা চাইবে তাই হবে। তাই হওয়াবে সে। অথচ বাসন্তীর উপর বেশিক্ষণ চটে থাকাও অসম্ভব। হেসে-কেঁদে শেষ পর্যন্ত সে ভাব করে নেবেই।

শশাঙ্ক-শুভ্রের সারাজীবনব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার একটা কারণ হয়তো বাসন্তী। কিন্তু বাসন্তী না থাকলে তাঁর অশান্তি আরও শতগুণ বাড়ত। বাসন্তী থাকাতে অনেক অশান্তিজনক ব্যাপার গ্লানিকর হয়ে ওঠেনি তাঁর জীবনে। তিনি রেগে এমন অনেক কাণ্ড করে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন, যার পরিণাম নিশ্চয়ই ভয়াবহ রকম বিষময় হয়ে উঠত, বাসন্তী যদি দু'হাত প্রসারিত করে না আটকাত তাঁকে। তাঁর হঠাৎ-রাগী চিত্ত-তুরঙ্গমের মুখে বাসন্তী-বল্‌গা না থাকলে কোন্ দিন কোন্ অতল গহ্বরে পড়ে তলিয়েই যেতেন তিনি। বাসন্তীকে না হলে তাঁর চলে না।

সবই বুঝতেন। কিন্তু তবু তাঁর দুঃখ হত। বাসন্তী যদি তাঁর মুখ চাইত একটু। বড্ড বেশি রকম খরচ করে—একেবারে বেপরোয়া। কিছু বলবার উপায় নেই, বললেও শুনবে না। ছেলেবেলা থেকেই ওই ভাবে মানুষ হয়েছে। বাপ অগাধ বড়লোক, আর সে তাঁর আদুরে মেয়ে।

।। দুই ।।

চাকরি-বিমুখ আভিজাত্য-গর্বে গর্বিত সাহেবী মেজাজ শশাঙ্ক-শুভ্র যদি দৈবাৎ আলাদিনের প্রদীপ একটা সংগ্রহ করতে পারতেন, তা হলে হয়তো তাঁর কোনোক্রমে কুলিয়ে যেত। অল্প আয়াসেই অর্থ-সমস্যা সমাধান করতে পারতেন তিনি। পিতৃ-প্রদত্ত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্দীজীবন যাপন করতে হত না তাঁকে। আলাদিনের প্রদীপ আরব্য উপন্যাসের কল্পলোকেই সম্ভব—এ কথা শশাঙ্কর মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের অবিদিত থাকবার কথা নয়; তবু তিনি সারাজীবনই ওই আলাদিনের প্রদীপের সন্ধানেই কাটিয়ে দিলেন। যৌবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন তাঁর মনে, তদনুসারেই তিনি চলেছিলেন; কিন্তু তিনি মাড়োয়ারী নন, বাঙালী ভদ্রলোক—তাই জটিলতাই বাড়ল কেবল, অর্থাভাব ঘুচল না। যোগ্যতা থাক না থাক, অর্থ চাই-ই। পিতা বিমুখ—নিজেকেই উপার্জন করতে হবে তা। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে স্বল্প আয়াসে রাশি রাশি টাকা আসবে—সংক্ষেপে এই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বহুবিধ-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার হয়ে, নানা কারবারে বহু টাকা নিযুক্ত করে অল্প সুদে টাকা ধার করে বেশী সুদ-দেনেওয়ালা ব্যাঙ্কে তা জমা রেখে, নানা রকম শেয়ার কিনে এবং দাঁও মাফিক তা বিক্রি করে, নূতন ধরনের জীবনবীমা-কোম্পানি সৃষ্টি করে, আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি দেশী ফলকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিদেশী বাজারে চালান দিয়ে, দেশলাই-কারখানা বানিয়ে, নূতন ধরনের ভদ্র ছাপাখানা বানিয়ে--বিবিধ বিচিত্র উপায়ে তিনি অর্থাগমের উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু ব্যারিস্টার সনৎ-কুমারকে নিষ্প্রভ করে দেবার জন্যে। কিন্তু পারেন নি। পারেন নি, কিন্তু থামেনও নি। বিলিতী মদের মত বিলিতী ব্যবসায়ের নেশাও পেয়ে বসেছিল তাঁকে, অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছিল যেন। তিনি ছাড়তে চাইলেও সেই কম্‌লি কিছুতেই তাঁকে ছাড়ে নি। যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে—সাহেবী-মেজাজের লোক হলেও এই প্রবাদটি তিনি বিশ্বাস করতেন। বস্তুত তাঁর জীবনে এবং মনোবৃত্তিতে দেশী-বিদেশীর একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়াতে তিনি আরও বেশী বিপন্ন হয়েছিলেন। যদিও বোমা-নন্‌সেন্স্ তাঁর মন থেকে অনেক দিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি ন্যাশনালিস্ট ছিলেন। এইজন্যেই হোক বা পরশ্রীকাতরতার বশেই হোক, সাহেবদের তিনি সুচক্ষে দেখতেন না। তাই পারতপক্ষে কোনো সাহেবী ব্যাঙ্কে তিনি টাকা রাখেন নি, কোনো ব্যবসায়ে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করেন নি। দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দেশী কর্মচারীদের সহায়তায় তিনি সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করতেন। নিজে জমিদারের ছেলে, দিলদরিয়া আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন চিরকাল, ব্যবসায় পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে যে বক-ধ্যান বা কাক-বুদ্ধির প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করে ব্রেকফাস্ট্-লাঞ্চ-টিফিন-ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে দামী মোটরকার বাহিত হয়ে প্রতিদিন (হ্যাঁ, রবিবার ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই) দেশী কর্মচারী চালিত ব্যবসায়ের কাগজী তত্ত্বাবধান করতেন ফ্যানের তলায় বসে বসে স্টেনো এবং প্রাইভেট সেক্রেটারির সহায়তায়। এই করতেই ঘেমে উঠতেন। নানারূপ স্নায়বিক অবসাদ ঘটত। বন্ধুবান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সপরিবারে সিমলা কিংবা শিলং দৌড়তে হত বছরে অন্তত একবার। ফলে যা হয়েছিল--বলা বাহুল্য--তার ইতিহাস অতিশয়

করুণ। দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হল, দেশী কর্মচারীদের অপটুতা অসাধুতা প্রকট হয়ে উঠল ক্রমশ, মুখার্জি সাহেবের স্বদেশ-হিতৈষণা ঋণজালে জড়িত হয়ে উপহাসের খোরাক যোগাতে লাগল সকলের। শেষে দেশী চরিত্র, দেশী সংস্কার, দেশী প্রথা—এনিথিং দেশীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। বিদেশীদের উপর বরাবরই রাগ ছিল, স্বদেশীদের উপরও বীতরাগ হয়ে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি কিছুদিন।

চতুর্দিকে অব্যবস্থা; মাথায় নানা রকম বিজ্‌নেস-প্ল্যান; বাসন্তীর প্রশংসা-কাঙাল পর-ভোলানো ঘর-জ্বালানো স্বভাবের জন্যে সংসার-খরচ মাসিক দশ হাজারে উঠেছে; কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই--ছেলেরা অবাধ্য, প্রত্যেকটি কর্মচারী চোর; সনৎকুমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে, চৌরঙ্গীতে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি কিনবে নাকি; অথচ তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কোনো দিকই সামলাতে পারছেন না। প্রত্যেকটি ব্যবসা টলমল করছে, কয়েকটা ডুবেই গেছে; কিছু টাকা পেলে হয়তো সামলে উঠতে পারা যেত--বেশি নয়, লাখখানেক টাকা। কিন্তু হংস-শুভ্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বরাদ্দ টাকার বেশি এক কপর্দকও দেবেন না। নাতিদের টাকাদেবেন--শঙ্খ রজত হীরক কম টাকা ওড়ায় নি তাঁর—নিতান্ত বাজে ব্যাপারে উড়িয়েছে, কিন্তু ব্যবসায় উন্নতির জন্যে একটি পয়সা দেবেন না তাঁকে তিনি। কাশীর পণ্ডিতদের টাকা দিচ্ছেন, তাঁকে দেবেন না। অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

এই সঙ্কটের মুখে শশাঙ্ক-শুভ্রের মনে পড়ল কাকামণিকে। কাকামণি ইচ্ছে করলে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। কাকামণি কেন যে ব্রাহ্ম হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন শুধু শুধু, তা আজও তাঁর মাথায় ঢোকে নি। ধর্ম জিনিসটার উদ্ভব বর্বর সমাজের কুসংস্কার থেকে--আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই কথাই বলেন। নানা বুদ্ধিমান লোক ওই দিয়ে নানা ধরনের মুখোশ তৈরি করে নিজেদের কাজ হাসিল করেছে বোকা-বোকা লোকদের ঠকিয়ে যুগে যুগে। কাকামণি বোকা লোক নন, তিনি কেন যে প্যাঁচে পড়ে পর হয়ে গেলেন, তা শশাঙ্কের বুদ্ধির অতীত। এই সামান্য কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা অনর্থক বাধো-বাধো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধো-বাধো ভাবটা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশী সময় অবশ্য লাগেনি শশাঙ্ক-শুভ্রের। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ এর চেয়ে ঢের বেশী দুরূহ কাজ করে থাকে। ঠিক সময়েই কাকামণির কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এই সম্পর্কে কাকামণির যে ছবিটি তাঁর মনে আঁকা আছে, তাও অপরূপ। পূর্বে কোনো খবর না দিয়েই শশাঙ্ক গিয়েছিলেন। খবর দিয়ে তাঁর মনকে প্রশ্ন-সঙ্কুল করে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয় নি। আচম্বিতে গিয়ে পড়লে কোন কিছু আন্দাজ করবার অবসর পাবেন না তিনি, এবং তাতেই সুফল ফলবে বলে শশাঙ্কর মনে হয়েছিল। গিয়ে দেখেন, ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটি বেতের মোড়ায় ওপর ধপধপে সাদা লংক্লথের ফতুয়া পরে সোম-শুভ্র অনিমেষ নয়নে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন। মাঠের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক-শুভ্রকেও ক্ষণকালের জন্যে নির্মিমেষ হয়ে পড়তে হল। বিরাট একখানা সবুজ মখমলের গালিচা কে যেন চক্রবাল-রেখা পর্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ক্ষণকালের জন্যেই———পর-মুহূর্তে তিনি সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। সোম-শুভ্র বসেই আছেন। শশাঙ্কর জুতোর শব্দ হয়েছিল নিশ্চয়; কিন্তু সে শব্দে সোম-শুভ্রের ধ্যানভঙ্গ হয় নি—ধ্যানই করেছেন, শশাঙ্কের প্রথমে ধারণা হয়েছিল। অমন নিস্তব্ধ তন্ময় বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে মানুষ যে গম-ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে থাকতে পারে, তা শশাঙ্কর পক্ষে

বিশ্বাস করা শক্ত হত, যদি না তিনি দেখতে পেতেন যে, সোম-শুভ্রের দুটো চোখই খোলা রয়েছে। খোলা চোখে এ কি রকম ধ্যান! বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল শশাঙ্ককে। একটু গলাখাঁকারি দিয়েও যখন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল না, তখন শশাঙ্ককে ডাকতে হল।

কাকামণি!

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে যেন চমকে উঠলেন তিনি। তারপর চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে শশাঙ্কের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ—নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

শশাঙ্ক! তুই এমন সময়ে হঠাৎ?

তখনও হংস-শুভ্র চিঠি লেখেন নি তাঁকে, তখনও তিনি স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে নির্বাসিত-জীবন যাপন করছেন। সুট-পরিহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের আকস্মিক অভ্যাগমে অপ্রত্যাশিত এমন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসে সমস্ত অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে গেল তাঁর যে, চোখে জল এসে পড়ল। শশাঙ্ক তা হলে এখনও ভোলে নি তাঁকে! হাজার হোক, কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন তো! এর পরই তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন শশাঙ্ক-শুভ্রের সম্বর্ধনার জন্যে। শশব্যস্ত হবারই কথা। নিজে তিনি চা খান না, মাংস খান না, সিগারেট খান না। শশাঙ্কর কিন্তু সবই চাই বোধ হয়, ও কষ্ট সহ্য করতে পারে না—জানেন তিনি। চারদিকে লোক ছুটিয়ে দিলেন। নিজের তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালতে বসে গেলেন।

হাত-পা-মুখ ধুয়ে, গরম দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খা ততক্ষণ! চা এসে পড়বে এক্ষুণি। আগে যদি একটু খবর দিতিস, কোনও কষ্ট হত না। স্টেশনে আমার শামপানিটা রেখে দিতাম। স্প্রিং-দেওয়া গাড়ি, ভাল বলদ, কোনও কষ্ট হত না তোর। নতুন যে বলদ জোড়া কিনেছি, ঘোড়ার মত দৌড়ায়।

গম্ভীর সোম-শুভ্র শিশুর মত প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

কথাবার্তায় ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক প্রসঙ্গের নানা আলোচনার আড়ালে-আড়ালে শশাঙ্ক নিজের বর্তমান জটিল অবস্থাটা ক্রমশ ফুটিয়ে তুললেন। কাকামণির সঙ্গে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি, তাঁর মতামত ঠিক জানা নেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ না হবারই কথা, তাই, এইটেকে প্রাধান্য দিয়ে হঠাৎয়েই কথা আরম্ভ করলেন তিনি। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ এ দেশে অনুসরণ করতে গিয়েই যে তিনি বিপন্ন, তা প্রতিপন্ন করবার জন্যে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর দুরবস্থার জন্যে যে ঘটনা-পরম্পরা দায়ী, তার ঠিক কোন্ কোন্‌গুলিতে বেশী রঙ ফলাও করলে সোম-শুভ্রের হৃদয় বিগলিত হবে, তা আন্দাজ করে নিতে বেশী বেগ পেতে হল না। বহু ব্যবসায়ে বহু লোকের সংস্পর্শে এসে এ দক্ষতাটা লাভ করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ আলাপ করবার পরই লোক-চরিত্র খানিকটা বুঝতে পারতেন। সোম-শুভ্রের চরিত্র তো অনেকটা জানাই ছিল; সুতরাং তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছতে বেশী দেরি হল না। ইচ্ছে করলেই তিনি যে একটা বড় চাকরি পেতে পারতেন, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যে তার চেষ্টা করেন নি; ব্যবসায়ে উন্নতি করতে না পারলে এ দেশের উন্নতি নেই, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি নানা রকম ব্যবসা ফেঁদেছিলেন এবং স্বদেশী লোকের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করার ফলেই যে নৈষ্ফল্য

ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারেন নি—এই সব কথা এমন একটা করুণ আন্তরিকতার সঙ্গে কখনও হেসে কখনও গম্ভীরভাবে তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছুক্ষণের জন্যে সোম-শুভ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা হল, শশাঙ্ক তাঁরই মত একটা আদর্শের জন্যেই জীবনপাত করছে এবং হংস-শুভ্র একটা অযৌক্তিক জেদের বশবর্তী হয়েই তাকে সাহায্য করছেন না। শশাঙ্কর বর্ণনাটা আরও মর্মস্পর্শী হয়েছিল বিশ্বাস-প্রসূত বলে। তিনি নিজে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, একটা বড় প্রিন্সিপলের খাতিরেই তিনি অনেক কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে এই সব ঝড়ঝঞ্ঝাপাত মাথা পেতে নিয়েছেন। এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ আছে বলে অনেক সাহেব খদ্দেরের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত—তবু যতক্ষণ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি তিনি। এখন অবশ্য কংগ্রেসের কেউ নন তিনি। মৃগাঙ্কর মত মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিক রাজনীতিতে আস্থা নেই তাঁর। রজতের মত ঢাল-খাঁড়া-হীন বিদ্রোহী নিধিরাম সাজতেও চান না তিনি। হীরকের সমাজতন্ত্রবাদ তো তাঁর মাথাতেই ঢোকে না। বস্তুত আজকালকার কোন রকম হুজুকে আর আস্থা নেই তাঁর। অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে দেশের মুক্তি নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য করে আগে দেশের লক্ষ্মী-শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে—পরাধীন দেশে অবশ্য তার অনেক বাধা আছে, কিন্তু বাধা সত্ত্বেও তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং ভালভাবে তা করতে পারলেই বাধা আপনি সরে যাবে—এই তিনি বোঝেন এবং এইজন্যেই তিনি স্বাধীন ব্যবসাতে সর্ব্যশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বুঝলে না।

সোম-শুভ্র নীরবে তাঁর বর্ণনা শুনে যাচ্ছিলেন। একটু ফাঁক পড়তেই হেসে বললেন, এখানে এসে পড়লি হঠাৎ কি মনে করে? একটু বিশ্রামের জন্যে বুঝি? ভালই করেছিস, খুব খুশি হয়েছি আমি। বউমাকেও আনলে বেশ হত। তাঁকে তো দেখিই নি আমি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁকে মন্ত্রণা দিলে—এই সুযোগ, বলে ফেল, আর দেরি করো না। লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত করা উচিত।

আঘাত করলেন। ফলও হল আঘাত করার মতই। শোনামাত্রই সোম-শুভ্র বিবর্ণমুখে খানিকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে রইলেন। মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে শশাঙ্ক-শুভ্র ভীতই হয়ে পড়লেন প্রথমে। আড়চোখে একবার চুপ করে রইলেন। ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর সোম-শুভ্র ধীরে ধীরে নিজের চোখ-মুখের ওপর হাত বুলিয়ে সমস্ত গ্লানিটা যেন তুলে নিলেন—কোনো বিষয়ে মনঃস্থির করবার পূর্বে এ রকম করেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করলেন, কত টাকার দরকার তোমার?

অন্তত লাখখানেক না হলে তো সামলাতে পারব না।

সোম-শুভ্র উঠে গেলেন, যখন মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ফিরে এসে অত্যন্ত সহজভাবে এক লাখ টাকার চেকখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও। এর জন্যে আসবার দরকার ছিল না তোমার এত কষ্ট করে। চিঠি লিখলেই পারতে। এর পর কিন্তু আর জমল না। আঘাত পেলে শামুক বা কাছিম যেমন শক্ত খোলের মধ্যে নিজের সর্বাঙ্গ গুটিয়ে নেয়, দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যের মধ্যে সোম-শুভ্র তেমনই আত্মগোপন করলেন। টাকার জন্যেই শশাঙ্ক এখানে এসেছে, তাঁর জন্যে নয়—এ ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়ামাত্রই তিনি আর একবার হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পারিবারিক বৃক্ষের ছিন্ন শাখা তিনি, অন্তরের যোগ লুপ্ত হওয়ার চেষ্টা যে বৃথা তা নয়, আত্ম-সম্মানহানিকর। সে চেষ্টা তিনি আর করলেন না।

চেকে পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্যবসায়-সংক্রান্ত জরুরি কাজের অজুহাত দেখিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লেন। আরও দু-একদিন থাকতে পারতেন, কিন্তু কাকামণির আচরণটা কেমন যেন 'ফানি' বলে ঠেকল তাঁর। কলকাতায় পৌঁছে তিনি নিজে যা করলেন, তা আরও 'ফানি'। ব্যবসা সামলাবার জন্যে এক লাখ টাকার সত্যিই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরে এসেই--মানে, হাওড়া স্টেশনেই একজন দালালের মুখে যেই খবর পেলেন যে, ব্যারিস্টার সনৎকুমার চৌরঙ্গীতে যে বাড়িটা কিনবেন প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন, সে বাড়িটা এখনও তাঁর কেনা হয় নি, বাড়ির মালিক এক লাখ টাকার কমে বাড়িটা ছাড়তে রাজী নন এবং এক লাখ টাকা দিতে সনৎকুমার ইতস্তত করছেন— অমনই তিনি বাড়ি না গিয়ে সোজা হাজির হলেন সেই বাড়ির মালিকের কাছে এবং কালবিলম্ব না করে নিয়ে ফেললেন বাড়িটা। ব্যবসাতে ঘা খাবার সম্ভাবনাটা রইল অবশ্য। কিন্তু ইতিপূর্বে বহু বার বহু রকম ঘা খেয়ে খেয়ে মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছিলই, ভাবলেন-- এটাতে নতুন আর কি হবে! সনতের উপরে টেক্কা দিয়ে বাড়িটা কিনে ফেলতে পারাতে বরং সে ক্ষতের উপর আরামপ্রদ মলম পড়ল একটা। ব্যবসাতে লোকসান হল কিছু, ছ'মাসের মধ্যে কিন্তু টাকাও জুটে গেল কিছু আবার। শেয়ার-মার্কেটে অপ্রত্যাশিত রকম কিছু পেয়ে গেলেন। নিজেদের অমন প্রকাণ্ড একটা বাড়ি হওয়াতে গদগদ বাসন্তী তার পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়নার সেটটা বাঁধা দিতে রাজী হল। সময় দিলেন অনেক পাওনাদার। পরের বছর ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করে উদ্ধারকরলেন গয়নার সেট, শিলং শহরে বাড়ি কিনে ফেললেন একটা। কিন্তু হুস করে সব ডুবে গেল আবার পাটের ব্যবসায়ে অত্যধিক ঝুকি নিতে গিয়ে তার পরের বছর। কয়েক-জনের পরামর্শে শটিফুডের ব্যবসাতে নামলেন! তাতেও গেল কিছু টাকা। ......উত্থান-পতন চলছেই সারাজীবন ধরে। সমস্ত খতিয়ে এই কিছুদিন আগে সম্প্রতি অনুভব করেছেন যে, পতনের দিকটাই ভারী বেশী। সমস্তই যেন পতনোন্মুখ। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার বলেই নিয়েছেন তিনি---বাসন্তীর নামে মিল কিনেছেন একটা। তাতে কিছু লাভ হয়ে যদি কিছু ধার শোধ হয়! ধার, ধার, চতুর্দিকে কেবল ধার! বাবার সঙ্গে মতের মিল নেই.....কার সঙ্গেই বা আছে!

।। তিন

মাস ছয়েক পরে।

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বাইরের ঘরে বসে ভাবছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। একি অত্যাচার! বাড়িটা ধর্মশালা নাকি। যার যখন খুশি আসবে, যতদিন খুশি থাকবে! হলই মাসতুতো ভাই। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কাকাকে নিয়ে আমার এখানে গুষ্টিসুদ্ধ মিলে চিকিৎসা করাবে তার! কলকাতায় বাড়ি আছে বলে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি! বাবা লিখেছেন, নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন তাঁদের---বুড়ো বয়সে এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কি দরকার তাঁর? আত্মীয়-বাৎসল্যটা আরও যেন বেড়েছে, কেউ গিয়ে ধরলেই হল। যেখানে-সেখানে এ রকম

উপকার করবার মানেই বা কি? ওরা কি 'নীডি'? মোটেই নয়। বাঙালী-জাতের স্বভাবই হচ্ছে পরের স্কন্ধে আরোহণ করা। না, 'অন প্রিন্সিপল' এসব তিনি সহ্য করবেন না। বাবা চটবেন, চটুন। কাণ্ট্ হেল্প।

...ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে আবার পাইপটা ধরালেন। বহুদিন আগেকার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ষষ্ঠী-চরণকে নিয়ে সে কি কাণ্ড! বাবার দূরসম্পর্কের পিসি ভুবনমোহিনী দেবীর বহুপত্নীক স্বামীর বংশধর ষষ্ঠীচরণ, কোথাও কিছু নেই, একদিন বাবার এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির। সমস্ত পরিচয় দিয়ে বাবা লিখেছেন—অর্থাভাবে পড়তে পারছে না, তোমার বাসায় রেখে বি. এ.পড়বার সুযোগ দিও একে। ছোকরা গরিব ছিল অবশ্য, কিন্তু মূর্তিমান জানোয়ার একটা। হাতের নখ কাটত না, চোখের পিচুটি পুঁছত না, চবর-চবর করে পান চিবোত খালি, আর পিক ফেলত যেখানে সেখানে; পেটে পিলে, মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। সব সহ্য করে তবু তাকে বাসায় রেখেছিলেন শশাঙ্ক। ছোকরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বাসন্তীকে দেখে—বাসন্তীর তখনও ছেলেপিলে হয় নি—ছোকরা মাথা ঘুরে গেল। তার সঙ্গে বার বার হেসে হেসে কথা কয়ে, আর সদা-সর্বদা তার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে তার মাথা আরও গুলিয়ে দিলে বাসন্তী নিজেই। হঠাৎ একদিন বাসন্তীকে প্রণয়-নিবেদন করে বসল সে। এর পর আর তাকে বাড়িতে রাখা চলল না। চাবকে দূর করা উচিত ছিল, কিন্তু বাসন্তী তা করতে দেয় নি, ভদ্রভাবেই বিদেয় করতে হল। হস্টেলে গিয়ে রইল সে। 'ওয়ার্ড' দিয়েছিলেন তাকে বি. এ. পর্যন্ত পড়াবেন, 'ওয়ার্ডের নড়চড় করলেন না। তিনি হস্টেলের সমস্ত খরচ বহন করলেন। ষষ্ঠীচরণকে হস্টেলে পাঠানো হয়েছে শুনে অসন্তুষ্ট হংস-শুভ্র পত্রযোগে যে গালাগালিটা দিয়েছিলেন তাঁকে, তা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হলেও শোভনতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। কিচ্ছু বলেন নি শশাঙ্ক-শুভ্র, আসল কারণটা খুলে বলা সম্ভবও ছিল না। উত্তরে কেবল লিখেছিলেন—ও রকম একটা নুইসেন্স্‌কে ভদ্র-বাড়িতে রাখা সম্ভব নয় বলেই হস্টেলে পাঠাতে হয়েছে। হংস-শুভ্র এর উত্তর দেন নি কোনো। বছর খানেক কোনো চিঠিই লেখেননি। এ ঘটনার প্রায় বছর চারেক পরে—শঙ্খ সবে হয়েছে তখন—হিঙ্গুলগ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাবার জন্যে চিঠি লিখলেন হংস-শুভ্র। দেশের বাড়িতে সব রকম পূজারই পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন তিনি। শশাঙ্ক লিখলেন—যেতে পারলে খুবই খুশি হব, কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যদি আসে, তা হলে আমি যাব না, অকারণ একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে চাই না। ফেরত-ডাকেই হংস-শুভ্রের উত্তর এল—আজকাল তোমাদের আত্মসর্বস্ব স্বজনবিমুখ মনোভাব দেখে দুঃখ হয়। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিবার্য ফল ভেবে চুপ করে থাকি। তোমার ভয় নেই, তুমি এস, ষষ্ঠীচরণের আসবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রফেসারি করছে, পুজোর ছুটিটা ওই অঞ্চলেই কাটাবে লিখেছে। শশাঙ্ক-শুভ্রের যাবার ইচ্ছে ছিল না, বাসন্তীর জেদেই সেবারও যেতে হয়েছিল। রুষ্ট শ্বশুরকে তুষ্ট করবার আগ্রহে শশাঙ্ক আপত্তি টেকে নি। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ষষ্ঠীচরণ সশরীরে বর্তমান। আপাদমস্তক জ্বলে উঠল তাঁর।

পিতাকে আড়ালে প্রশ্ন করলেন, আপনি লিখেছিলেন, ষষ্ঠীচরণ আসবে না, কিন্তু ও তো এসেছে দেখছি। আমাকে আগে লিখলে—

এসে পড়ল, কি করি বল? মানা তো করতে পারি না।

আমি থাকব না তা হলে।

তোমার খুশি। আমি ওকে চলে যেতে বলতে পারব না। ও আমার আত্মীয় লোক।He has as much right on my house as you have.

বেশ, আমি চললাম তবে।

সোজা বাসন্তীর কাছে গিয়ে বললেন, চল, এখানে আর এক দণ্ড থাকব না।

বাসন্তীর হাসিটা এখনও মনে পড়ছে তাঁর। বাসন্তী হেসে উত্তর দিয়েছিল, কি ছেলেমানুষি করছ তুমি!

তুমি থাক, আমি তা হলে চললাম।

সেবার অষ্টমীর রাতটা একা একা মেঠো রাস্তা ভেঙেই কেটেছিল তাঁর।

বাসন্তী সঙ্গে আসে নি। পিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না, বাসন্তীকেও ত্যাগ করব- এই জাতীয় নানা প্রতিজ্ঞা করতে করতে পথ হেঁটেছিলেন তিনি, বেশ মনে পড়ছে। ম্লানায়মান জ্যোৎস্নালোক নদী পারের শুভ্র কাশবনের ছবিটাও মনের মধ্যে আঁকা আছে এখনও। আশ্চর্য!

বাবাকে কি টেলিগ্রাম তুমি, আমাকে না জিজ্ঞেস করে?

জিজ্ঞেস আবার করব কি! সত্যি কথা লিখে দিলাম—রিগ্রেট। হাউস ফুল, নো রুম।

আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! এমন মুশকিলে ফেল তুমি।·ও রামদয়াল, পাশের বাড়িটো দেখ তো, ' টু লেট' লেখা ঝুলছিল দেখছিলাম; দেখ তো, কোনো ভাড়াটে এসেছে কি না!

দরোয়ান রামদয়াল চলে গেল।

শঙ্খ পাশের ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে বললে, ভাড়াটে আসে নি এখনও। যা ভাড়াও হাঁকছে, মাসে আড়াই শ' টাকা।

ভাড়া যাই হোক, তুই ঠিক করে আয় বাবা। কাল তোর দাদু আসছেন নবীন ঠাকুরপোদের নিয়ে। এ বাড়িতে কুলুবে না। তাঁকে আর একটা টেলিগ্রাম করে দে যে, বাড়ি ভাড়া করেছি একটা।

বাধ্য বালকের মত চলে গেল শঙ্খ-শুভ্র, শশাঙ্কের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই। শশাঙ্কর অনুমতির অপেক্ষা রাখে না কেউ; অথচ শশাঙ্ককেই সব টাকা যোগাতে হয়।

শঙ্খ চলে গেলে বাসন্তীর দিকে চেয়ে শশাঙ্ক বললেন, মাসে আড়াই শ' টাকা এখন পাব কোথা থেকে? তুমি তো সুব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলে।

তুমি টেলিগ্রাম না করলে এই বাড়িতেই কুলিয়ে নেওয়া যেত কোন রকমে। শঙ্খ না হয় তোমার ঘরেই শুত। হীরু আর রজতের ঘর দুটো তো খালিই পড়ে আছে।

হীরক-রজতের কথায় ক্ষণিকের জন্যে বাসন্তী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। ওদের জন্যে। ওদের জন্যে ঘর আলাদা করা আছে বটে, কিন্তু সে ঘরে ওরা আসবে না, তা সবাই জানে।...সত্যি কি আসবে না?

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, তিনখানি ঘরে কি হবে ওদের, পঙ্গপাল আসছে এক দঙ্গল।

একতলায় যে ঘরটায় বাক্স-আলমারি-খাট আছে, সেটাও খালি করে দেওয়া যেত— ফার্নিচারগুলো চারিয়ে দিতাম সব ঘরে।

তা হলে বাড়ি ভাড়া করতে পাঠালে কেন?

মুচকি হেসে বাসন্তী বললে, তোমার মান রাখবার জন্যে। তুমি যে লিখে দিয়েছ, নো রুম। কাল বড় মোটরখানা নিয়ে বেরিও না তুমি। আমি ওটা নিয়ে স্টেশনে যাব বাবাকে আনতে। নিজে না গেলে হয়তো আসবেনই না তিনি। আচ্ছা, তনিমার কোন খবর আসে নি এখনও?

কই, না।

বেয়ানটি বেশ কিপ্‌টে আছেন। ফোনের দু আনাও খরচ করতে রাজী নন। আমাকেই ফোন করতে হবে রোজ। আমি সেখানেই যাচ্ছি। বাড়িটা তুমি ঠিক করো।

হেসে বেরিয়ে গেল বাসন্তী।

শশাঙ্ক-শুভ্র চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বাসন্তী সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল। সারাজীবন ধরে সবাই তাঁর সব বিধি-ব্যবস্থা বারংবার উলটে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মুখের দিকে কেউ চাইবে না; এমন কি ছেলেরাও না। শঙ্খ এক হিসেবে ভাল বটে, রজতের মত খামখেয়ালী নয়, হীরকের মত পাগলও নয়। কিন্তু ওর বুকের পাটা বলে কোন জিনিসই নেই যেন। কেমন যেন অত্যন্ত ভালমানুষ-গোছের; সর্বদা যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে।—ওকে দেখলে পুত্র-গর্বে মন ভরে ওঠে না। নিয়মিত আপিস করে, সন্ধ্যাহ্নিক করে, সরু-গোছের একটা টিকিও রেখেছে। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ বসে বই পড়ে খালি, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবা ওকে ছেলেবেলায় কাশীতে এক টোলে পাঠিয়ে সেই যে ওর মনে কি এক ঘুণ ধরিয়ে দিলেন, কেমন যেন জরদগব-গোছ হয়ে গেছে। জোর করে টেনে এনে হিন্দু-স্কুলে ভর্তি করে না দিলে ওর কোন পদার্থই থাকত না আর। এই উপলক্ষ্যে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের কথাটা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছুই বলেন নি, কিন্তু আমলকী-ভেঞ্চারে একটি পয়সাও সাহায্য করলেন না এইজন্যে।

বেয়ারা এসে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল—মৃগাঙ্ক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। মৃগাঙ্কটাও যেন কি! হল ডাক্তার, মাতল খদ্দর নিয়ে। যা কিছু রোজকার করে, ওতেই যায়। দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে আছে, সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। বোর্ডিঙে বোর্ডিঙে মানুষ হচ্ছে তারা। বাবা বলছিলেন, আমার বাসাতে থেকেই পড়ুক ওরা—বাসন্তীও সায় দিয়েছিল তাতে। আশ্চর্য মনোবৃত্তি এদের! আমি যেন একটা অফুরন্ত জলাশয়, যার যখন খুশি এসে কলসী ভরে ভরে নিয়ে যাবে। বাসন্তী সায় দিয়েছিল—বাসন্তী তো দেবেই; কনক কিন্তু রাজী হয় নি। বাবার কাছ থেকে মাসহারা নিতেও রাজী হয় নি সে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ওম্যান। ওই তো ঠিক। শুক্তি-মুক্তো-ননীর পড়ার খরচ নিশ্চয় এস্টেট থেকে বাবা দেন... মৃগাঙ্কর দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচও বাবা দেন বোধ হয় কিছু। মৃগাঙ্ককেও তো বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেবার কথা। টাকার কথা মাথায় এসে পড়াতে শশাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, মনে মনে তিনি যোগ করছেন, আগামী মাসে কার কত টাকা দেনা শোধ করতে হবে। মিলটা যদি ঠিকমত চলে, আর গমের দর মণ-প্রতি যদি আট আনা করেও চড়ে, তা হলে দেনা শোধ করতে কতক্ষণ! রজত আর হীরক যদি ওসব বাজে ব্যাপারে উন্মত্ত না হয়ে ব্যবসাতে নাবত আমার সঙ্গে—শেষ পর্যন্ত নাবতে হবেই, ওসব বাজে নন্‌সেন্স নিয়ে বেশিদিন কাটানো যায় না। আমিও একদিন বোমার দলে যোগ দিয়ে ছিলাম, হেঃ—! রজত,

হীরক দুজনের মুখই পর পর ভেসে উঠল মনের ওপর। ছেলে দুটো...নিজের মনের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন একটু পরে। মনের অন্তরতম প্রদেশে ছেলে দুটো যেন আসন অধিকার করে আছে, তা শ্রদ্ধার আসন। বাই জোভ--না না, শ্রদ্ধা করবার মতন কিছুই নেই ওদের আচরণে, ওরা ভুল পথে চলছে--অর্থনৈতিক উন্নতি করতে না পারলে দেশের উন্নতি নেই। পিস্তল ছুঁড়ে কিংবা কুলি ক্ষেপিয়ে তা হবে না। ওয়েট এ বিট। তিনি নিজেই হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবেন দেশের উন্নতি কি করে করতে হয়! ভাল একটা ব্যাঙ্ক খুলতে হবে আগে। সোৎসাহে উঠে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পাইপটা ধরালেন আবার।

ঝনঝন করে ফোনটা বেজে উঠল।

হ্যালো, কে? বাসন্তী? হ্যাঁ, আমি। ও, তনিমার ছেলে হয়েছে? এক্ষুণি? ব্যাটাছেলে? বাঃ আচ্ছা, যাচ্ছি।

বাসন্তী ফোন করছে শঙ্খর শ্বশুরবাড়ি থেকে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, বুড়ো হয়ে গেলাম, পৌত্র হল! তারপরেই মনে হল, নাতিকে কেন্দ্র করে বাসন্তী এইবার একটা খরচের তুফান তুলবে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পাইপটা কামড়ে ধরলেন। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না কিন্তু। স্টেশনেও যেতে হবে একবার, মৃগাঙ্ক আসছে এই ট্রেনে।

মৃগাঙ্ক—শুভ্র

।। এক ।।

ছেলেবেলায় হিঙ্গুল-গ্রামে একবার জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষে গিয়ে মৃগাঙ্ক-শুভ্র এক বৈষ্ণবীর মুখে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি কীর্তন শোনেন। সে কীর্তন কিশোর মৃগাঙ্ক-শুভ্রের প্রাণ স্পর্শ করেছিল। জ্ঞাতসারে না হোক, অজ্ঞাতসারেই সেদিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কোন্ সুরে তাঁর জীবন-বীণা বাজবে। রাধা জাতি কুল মান সমস্ত ত্যাগ করে পাগলিনী হয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে। কোনও বাধাকেই বাধা বলে মনে করেন নি তিনি। কোন কৃচ্ছ-সাধনই কষ্টকর বলে মনে হয়নি তাঁর কাছে। কৃষ্ণপ্রেমে-বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছিল তাঁর অন্তর। প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এই অপরূপ কাহিনী ভারতবর্ষের কাব্যে-দর্শনে ধর্ম-কর্মে প্রাসাদে-পর্ণকুটিরে ধনী-দরিদ্র আপামর-ভদ্র সকলের অন্তরে যে মন্ত্রবলে আজও সুধা-সিঞ্চন ক'রে চলেছে সেই মন্ত্রবলেই কিশোর মৃগাঙ্ক-শুভ্র সহসা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ত্যাগ না করতে পারলে জীবন বিফল—ত্যাগই তৃপ্তি, ত্যাগই সুখ। রূপসী বৈষ্ণবীর কমনীয় কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে জীবন-যজ্ঞের মূলমন্ত্রটি যেন তাঁর মর্মস্পর্শ করেছিল সেদিন! ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বৃহৎ আদর্শের জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে পারতেন। সেদিন কিন্তু সামনে কোন আদর্শ ছিল না, প্রয়োজন হয় নি। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হলেন যখন, বৃহৎ কোন আদর্শ চিত্তকে উন্মুখ করে নি তখনও। মা মারা গেলেন হঠাৎ। দাদা তখন হোম-রুল করে বেড়াচ্ছেন তিলকের সঙ্গে। মৃত্যুকালে মায়ের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হল না তাঁর। শ্রাদ্ধের সময় এলেন বটে, কিন্তু কামাতে চাইলেন না। সহসা পিতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল মৃগাঙ্ক-শুভ্রর! মায়ের মৃত্যুতে, দিদির গৃহত্যাগে, তিনজন উপযুক্ত পুত্রের অকাল মরণে, ইন্দুর বৈধব্যে, কাকার ধর্মান্তর-গ্রহণে, দাদার অসদ্ব্যবহারে যে পিতার অন্তর অহরহ পুড়ে যাচ্ছে, তাঁকে কি করে একটু শান্তি দেওয়া যায়—এই হল মৃগাঙ্ক-শুভ্রর তখনকার লক্ষ্য। কায়মনোবাক্যে তিনি পিতার অনুবর্তী হয়ে চলতে লাগলেন। সবে তখন আই. এস-সি. পাস করে বি. এস-সি পড়ছেন, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বাবার ইচ্ছা অনুসারে সন্ধ্যাহ্নিক একাদশী করেন, মুরগি খাওয়া পাপ বলে মনে হয়। বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন হাতে এল বিবেকানন্দের বই একখানা। নূতন একটা আদর্শের সন্ধান পেলেন যেন! যে মহাপুরুষের বাণী সমসাময়িক বঙ্গদেশের কানে ঢোকে নি, উদ্বুদ্ধ করেছিল মাদ্রাজকে, আমেরিকাকে, লণ্ডনকে, তাঁর বজ্রনির্ঘোষে সহসা ঘুম ভেঙে গেল যেন মৃগাঙ্ক-শুভ্রর। মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করলেন গিয়ে, বিবেকানন্দের সমস্ত বই পড়ে ফেললেন রাতের পর রাত জেগে। এই বীর সন্ন্যাসীর বাণী তাঁর মনে অনেকদিন আগে শোনা সেই সুরটিকেই আবার যেন জাগিয়ে তুলল! আত্মত্যাগ করে, স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আত্মোৎসর্গ না করতে পারলে সুখ নেই। সন্ন্যাসী হতে হবে, দেশহিতব্রতে সর্বত্যাগী বীরের মত অগ্রসর হতে হবে।

ব্রহ্মচর্য করে শক্তিসংগ্রহ করতে হবে তাঁর মনে অনেকদিন আগে শোনা সেই সুরটিকেই আবার যেন জাগিয়ে তুলল! আত্মত্যাগ করে, স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হবে, কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে লাগলেন কিছুদিন। মনে হল, যেন বৃহত্তর জীবনের আহ্বান এসে পৌঁছেছে—যেমন এসে পৌঁছেছিল বুদ্ধের কাছে, চৈতন্যের কাছে, বিবেকানন্দের কাছে। হিমাচল থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম—বিরাট কর্মক্ষেত্রে পড়ে রয়েছে। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে—তামসিকতার অন্ধকার। সে অন্ধকারকে দূর করতে হবে আমাদের স্বকীয় সভ্যতার আলোকপাত করে। সন্ন্যাসীর আদর্শেই গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে মনে মনে—রাখাল মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন প্রায়ই গিয়ে—দীক্ষা নেবেন-নেবেন করছেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন সব ভেঙে গেল।

হংস-শুভ্র একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, একটি গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার করতে হবে। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।

নির্বাক হয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বলতে লাগলেন, মেয়েটি সুন্দরী। লেখাপড়া জানে, এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে।

মৃগাঙ্ক নির্বাক।

চুপ করে আছ কেন?

আমি ভেবেছি, বিয়ে করব না।

ও। এ রকম অদ্ভুত কথা ভাববার মানে?

রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবার ইচ্ছে—

হংস-শুভ্র কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, গেরুয়া সিল্কের জোব্বা পরে বক্তৃতা দেওয়ার বাসনা হয়েছে? বিয়ে করেও তা করা যায়। কালই হাফ-এ-ডজন অর্ডার দিয়ে আসতে পার। কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেই শ্রোতা জুটে যাবে। বক্তৃতার বিষয়টা কি? বেদান্ত, না, বিজ্ঞান?

মৃগাঙ্ক চুপ করে রইলেন নতনেত্রে।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হংস-শুভ্র আবার বললেন, পৃথিবীতে এমন কোন মহৎ কাজ নেই, যা বিয়ে করে করা যায় না। স্বয়ং রামকৃষ্ণও বিবাহিত ছিলেন। যাক, অত কথায় কাজ নেই, তুমি যা ঠিক করেছ তাই কর, আমি—

হংস-শুভ্র হঠাৎ থেমে গেলেন এবং একটু হাসলেন। তাঁর এ হাসিটি বড় মর্মান্তিক। খুব রাগ হলে বা দুঃখ হলে এই হাসিটি হাসেন তিনি। হাসি শুনে মৃগাঙ্ক-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দেখলেন, স্মিত অপ্রস্তুত মুখে হংস-শুভ্র জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হল, ওই স্মিত-হাসির অন্তরাল ভেদ করে তাঁর সারা জীবনের শোক-দুঃখ ক্ষোভ পরাজয় যেন ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করছে, হংস-শুভ্র আর যেন আত্মসম্বরণ করতে পারছেন না। স্মিত-হাসির সূক্ষ্ম পরদাটা কাঁপছে। আত্মীয়স্বজন, সমাজ, শাসনকর্তা, অদৃষ্ট,ভগবান—কেউ তার প্রতি সুব্যবহার করে নি। তিনি আশা করেছিলেন, মৃগাঙ্ক হয়তো তাঁর মনের মত হবেন। মৃগাঙ্ক নিজেও তাই আশা করেছিলেন, এতদিন পিতার অনুবর্তী হয়েই আদর্শ পুত্রের জীবন যাপন করে এসেছেন তিনি, কায়মনোবাক্যে পিতাকে সুখী করাই এতদিন জীবনের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু...। হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হল, পিতাকে সুখী করবার জন্যে নিজের আদর্শ ত্যাগও তো

ত্যাগ—সে ত্যাগটাও তো কম বড় নয়, কিন্তু...। আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। পিতার সুখের জন্যে নিজের আদর্শ ত্যাগ করতে হৃদয় কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন, অনিবার্যভাবে যে কথাটা এর পর তাঁর মনে হল, তাতে তিনি চমকে গেলেন। বাবাকে তিনি ভালবাসেন না, এতদিন ভালবাসর একটা ভান করে এসেছেন শুধু। প্রাণ দিয়ে সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্যে আদর্শ কেন, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয় না, আনন্দ হয়। বাবার প্রস্তাবে মনে দ্বিধা জাগছে মানে, বাবাকে তিনি ভালবাসেন না। তিনিও বাবাকে ভালবাসেন না!...

অমন গম্ভীর হয়ে যাবার দরকার নেই। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি তাদের যে, তোমার বিয়ে করবার মত নেই। তোমার মতামত যে নিতে হবে, এটা খেয়াল হয় নি আমার। হওয়া উচিত ছিল।

হংস-শুভ্র উঠতে যাচ্ছিলেন, মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আপনি যদি ঠিক থাকেন, তা হলে তাই হোক, আমার আপত্তি নেই।

মত বদলাবার আগে আর একটা কথাও শোনা দরকার তোমার। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে তোমাকে যেতে বাধ্য করছি—এ রকম কোন অপবাধ নিতে রাজী নই আমি। তুমি এ বিয়ে করলে আমি অবশ্য খুবই খুশী হব; কিন্তু না করলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করব, তা ভাববার দরকার নেই। এটুকু অন্তত জেনে রাখ, সাবালক হবামাত্র তোমার প্রাপ্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি নিয়মিত পাবে, শশাঙ্ক যেমন পাচ্ছে।

এই কথায় পিতার প্রতি এমন একটা গভীর শ্রদ্ধা মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে উৎসারিত হল যে, ভাবাবেগে তিনি নিরুত্তর হয়ে রইলেন!

এ কথা শোনবার পরও তোমার আর আপত্তি নেই?

না।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র বেরিয়ে চলে গেলেন। হংস-শুভ্র চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁরও শ্রদ্ধা জেগেছিল ইদানীং। হঠাৎ মনে হল, ছেলেকে ধর্মপথ থেকে বিরত করে অন্যায় করলুম কি? তখনই মনে হল আবার, সে রকম নিষ্ঠা থাকলে ও রাজী হত না কখনও; তা ছাড়া গার্হস্থ্য-ধর্মও ধর্ম..

উঠে চলে গেলেন।

সাত দিনের মধ্যেই কনকের সঙ্গে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের বিয়ে হয়ে গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই হংস-শুভ্র অনুভব করলেন যে, আবার ভুল করেছেন তিনি। বুঝতে পারলেন, গরিবকে দয়া করাটা হৃদয়বত্তার পরিচায়ক হলেও গরিবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় সব সময়ে। দরিদ্র-কন্যা কনকের মনটাও যে দরিদ্র, তা তাঁর অতি পরিমিত আহারে-ব্যবহারে, ব্যয়-সংক্ষেপ করবার চেষ্টায়, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে, দাস-দাসীদের চুরি ধরবার আগ্রহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা লক্ষণে অগোচর রইল না হংস-শুভ্রের কাছে। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন যদিও, বাইরে কিন্তু কনকের ধ্বজাটাকেই যখন-তখন সাড়ম্বরে উঁচে তুলে আস্ফালন করে বেড়াতে লাগলেন তিনি সকলের কাছে। কনক মিতভাষিণী, শান্ত-প্রকৃতির এবং কনকের বাবা কেরানী হলেও আচার-নিষ্ঠ হিন্দু, আপিসে

যাওয়ার আগে টিকিতে ফুল বেঁধে পুজো করেন প্রত্যহ—এই দুটো কারণকেই আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টির নিকষে কনকের গিল্‌টিত্ব ধরা পড়লেও এই বলে তিনি সান্ত্বনা পাবার প্রয়াস পেলেন—খাঁটি সোনা দুর্লভ আজকাল, যা পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। আর যাই হোক, বাসন্তীর মত পর-ভোলানে উড়নচণ্ডে হবে না। পরে যদিও ঘা খেয়েছিলেন, গোড়ায় গোড়ায় কিন্তু গিল্‌টিরই গুণগান করলেন তিনি কিছুকাল। অসম্ভবও হয় নি। কিঞ্চিত লেখাপড়া শেখার কল্যাণে কনকের বহিঃশোভাটা নিন্দনীয় ছিল না নেহাত।

আজন্মব্রহ্মচারী মৃগাঙ্ক-শুভ্র আত্মসমর্পণ করলেন রূপসী কনকের কাছে। কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তাঁর মন উন্মুখ হয়েই ছিল। কনকের ঔদার্য আছে কি নেই, আদর্শ জীবনসঙ্গিনী হবার উপকরণ তাঁর চরিত্রে কতটুকু আছে—এসব বিশ্লেষণ করবার তিনি অবসরও পেলেন না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না। তন্বী গৌরাঙ্গী অর্ধ-স্ফুট-যৌবনা বধূকে বাহু পাশে বেঁধে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। আত্মস্থ হলেন যখন, তখন, শুক্তি মুক্তা নবনী জন্মগ্রহণ করেছে।

ইতিমধ্যে ডাক্তারটাও পাস করে ফেলেছিলেন। যথারীতি প্র্যাক্‌টিস করবার জন্যে একটা ডিস্‌পেন্‌সারিও খোলা হল। কিন্তু সেখানে জুটতে লাগল রোগী নয়, কংগ্রেস-কর্মীর দল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন সমস্ত ভারতবর্ষ তোলপাড় হচ্ছে।

।। দুই ।।

দাম্পত্য-জীবনের যে চরিত্রটা নির্বিঘ্নে কেটেছিল বলে কনকের বিশ্বাস, ঠিক সেই সময়টাতেই কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বীজ তখনই উপ্ত হচ্ছিল, ফসলটা নয়ন-গোচর হল পরে, অর্থাৎ যথাসময়ে। পরে যা অপ্রত্যাশিত, এমন কি অযৌক্তিক বলে কনকের মনে হয়েছিল, নেপথ্য-লোকে অনেক আগে থেকেই তার যুক্তিযুক্ত একটা উদ্যোগ-পর্ব গড়ে উঠেছিল বই কি। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের আচরণে তা আভাসিতও হয়েছিল, কিন্তু কনকের চোখে তা পড়ে নি। আর একটু কম অহঙ্কারী কিংবা আর একটু বেশি কল্পনা-কুশলী হলে পড়ত। সেই সব সামান্য আভাস থেকেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সম্ভব্য পরিণামটা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব হত না। কিন্তু রূপ-গুণ-বিদ্যা দিয়ে তৈরী যে দুর্গে মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে সে বন্দী করে রেখেছিল, তার দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে কনকের লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভাবতেও পারে নি যে, ভূমিকম্পের এক নাড়াতেই দুর্গের দেওয়ালগুলো হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়বে একদিন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের দিকে মনও সে তেমন দিতে পারে নি। মাতৃত্ব-ভার বহন করতে করতে এম. এ. পর্যন্ত পরীক্ষা দেবার ঝোঁক পেয়ে বসলে স্বামীর মনের দৈনন্দিন ছোটখাট বিক্ষোভগুলো চোখে না পড়াটাই স্বাভাবিক—বিশেষত স্বামী যদি একনিষ্ঠ হন। ওই একটি বিষয়েই কেবল স্ত্রীলোক মাত্রেই মন সদা-জাগরূক। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে তাঁর শুষ্ক মুখের বা অনিদ্রার হেতু নির্ণয় করবার

সঙ্গত কারণ ঘটত। কিন্তু রাউলাট অ্যাক্ট যে ব্যক্তির নিদ্রা বিঘ্নিত করছে অথবা চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা যার আহারের রুচি হরণ করছে, তার সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার মত কল্পনাশক্তি কনকের ছিল না, অবসরও ছিল না। এসব নিয়ে আলোচনাও হয় নি কখনও স্বামীর সঙ্গে। স্বভাবতই মিতভাষিণী সে। চুপচাপ নিজের পড়াশুনা নিয়েই থাকত। স্বামী অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়ে শুয়ে পড়তেন। তার সঙ্গে অহেতুক বাক্যালাপ করবার প্রয়োজনই অনুভব করত না সে। সে জানত, স্বামী তার রূপে মুগ্ধ, শ্বশুর গুণে উচ্ছ্বসিত, পাড়া-পড়শী বিদ্যায় বিস্মিত। এই রূপ-গুণ-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করাটাই তার জীবনের লক্ষ্যে হয়ে উঠেছিল। নীরবে অনন্যমনা হয়ে তাই সে করে যাচ্ছিল। স্বামীর মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি সে লক্ষ্যই করে নি। তা ছাড়া বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছর নীরবে নেপথ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকে করতে হয়েছিল—খাপ-খাইয়ে-নেওয়ার সে দ্বন্দ্বেও তার সমস্ত চিত্ত ব্যাপৃত থাকতে অহরহ। এঁদো গলির খোলার-ঘর-বাসিনী কেরানী-কন্যাকে যখন হংস-শুভ্ররূপী হারুন-অল-রশিদের খেয়ালে শুভ্র-পরিবারের বধূর কঠিন ভূমিকায় অকস্মাৎ অবতীর্ণ হতে হল, তখন যেমন করেই হোক, সে ভূমিকার মর্যাদা সে রক্ষা করবেই—এই জেদ তাকে পেয়ে বসল। শুধু মর্যাদা রক্ষা নয়, মর্যাদা বৃদ্ধিও সে করবে—এই হল তার পণ। যদিও বাইরে সে স্মিতমুখে চুপ করে রইল, ভেতরে কিন্তু সে ঠিক করে ফেললে, সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, কেরানীর মেয়ে বলে যে হেয় নয়। এই সঙ্কল্পের তাড়নাতেই সে এম. এ. পাস পর্যন্ত পাস করে ফেললে তিন-তিনটে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও। এম. এ পাস করা ছাড়া এ বাড়িতে কৃতিত্ব দেখাবার অন্য কোন পথ ছিল না। কেবল বিধিপ্রদত্ত রূপের জোরে এ বাড়িতে সম্মান আদায় করা শক্ত, কারণ এখানে শুধু যে মেয়েরাই রূপসী তা নয়, পুরুষরাও রূপবান। এম. এ. পাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই ডিগ্রী-অর্জনের সাধনায় যে পরিমাণ একাগ্রতা তাকে পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ করতে হল, ঠিক সেই পরিমাণ একাগ্রতা সে যদি মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ওপর নিবদ্ধ করতে পারত, তা হলে হয়তো তার ক্রমপরিবর্তমান মনোবৃত্তির কিছু আভাস সে পেত। কিন্তু রূপ-মুগ্ধ যৌবন-লোলুপ যে ব্যক্তিটির পরিচয় সে বিবাহের কিছুদিন পরেই পেয়েছিল, তার সম্বন্ধে যে আর অধিক কিছু জানার প্রয়োজন আছে—এ কথা তার মনেই হয় নি। বহুবার-পড়া পুঁথির মত তাকে সে ঔদাসীন্যভরে সরিয়েই রেখেছিল। তারও যে বিবর্তন হওয়া সম্ভব, একনিষ্ঠ প্রেমিক যে একনিষ্ঠ বৈরাগী হয়ে উঠতে পারে—এ কল্পনাও সে করে নি। আর একটা জিনিসও তার কল্পনাতীত ছিল। এত কষ্টে অর্জন করা এম. এ. ডিগ্রী তাকে ঠিক সেই মর্যাদা দিতে পারলে না, যা সে মনে মনে কামনা করেছিল। প্রভূত বিদ্যার অধিকারী হয়েও কৃষ্ণকায় খ্রীষ্টানকে শ্বেতকায় খ্রীষ্টান-সমাজে যেমন সসঙ্কোচে বাস করতে হয়, বিদ্যার তকমা পরে তাকেও তেমনই এই অভিজাত পরিবারে সসঙ্কোচে বাস করতে হল। নিজের মন থেকেই তার সঙ্কোচ গেল না। যদিও বাড়ির বড়রা তাকে যথারীতি স্নেহ করতেন, ছোটরাও যথারীতি সম্মান দেখাতে ত্রুটি করত না, তবু তার কেমন যেন মনে হত, এরা সব নিয়ম-রক্ষা করছে কেবল। মনে মনে তাকে সেই খোলার ঘরের আঁস্তাকুড়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট করে রেখেছে সবাই।

আই. এ. পরীক্ষাই কিছুদিন আগে ইন্দু তো একদিন ঠাট্টাই করে বসল খোলাখুলি।

কেন ওই বাজে বইগুলো মুখস্থ করে মরছ বউদি?

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের লেখা হিস্ট্রি, বাজে হল?

আমরা নিজেদের হিস্ট্রি নিজেরা আগে লিখি, কতটা সত্যি কতটা বানানো আগে সেটা ঠিক হোক. তারপর পড়ো ওসব।

এতে যা লেখা আছে তা মিথ্যে?

অন্ধকূপ-হত্যাটা যে মিথ্যে, তা তে প্রমাণ হয়েই গেল। ওদের লেখা ইতিহাসে আমাদের অতীত গৌরবের কথা কতটুকু পড়েছ? বুদ্ধ-অশোককে নেহাত চাপা দেওয়া যায় না বলেই ওদেরর সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনতে পাওয়া যায়। ওদের দু-চারজনকে বাদ দিলে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগুলোতে আমাদের অতীত তো অন্ধকারময়। যা কিছু আলো ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে—

ইন্দুর চোখে বিদ্যুত দেখে কনক চুপ করে রইল। তার মনে হল, তার নিজের চোখের দৃষ্টিতে অমন বিদ্যুৎ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না—উঠবেও না কোন কালে—হাজার চেষ্টা করলেও উঠবে না। কেমন যেন ভীতু বাছুরের মত চোখ তার। আয়নার দেখা নিজের চোখের প্রতিচ্ছবি মনের ওপর ফুটে উঠল নিমেষেমধ্যে।

তা ছাড়া কি হবে পড়ে?

মৃদু হেসে কনক উত্তর দিয়েছিল, আর কিছু না হোক, ডিগ্রী হবে।

চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।

ইন্দু উঠে চলে গেল। কিন্তু কথাগুলোর দাগ থেকে গেল কনকের মনে। সে তা হলে চেনা বামুন নয়, তাই উপবীতগুচ্ছটাকে আস্ফালন করবার চেষ্টা করছে সাড়ম্বরে। কি স্পর্ধা মেয়েটার! সত্যই মেয়েটার স্পর্ধা অস্বস্তিকর। দুবার বিধবা হয়ে সকালের মাথা কিনে বসেছে যেন। কারও কিছু বলবার জো নেই। তা ছাড়া কি যে সব কাণ্ড করে গোপনে গোপনে, ভাবলেও শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। একদিন দুপুরবেলা এক বোরখা পরে এসে হাজির। বাড়িতে কেউ তখন নেই। কনক একা বসে পড়ছিল। ঘরে ঢুকে বোরখা খুলে ছোট একটা পুলিন্দা বার করে বললে, রেখে দিতে হবে এটা লুকিয়ে। কাল এসে নিয়ে যাব। একটা প্রতিশ্রুতি কিন্তু চাই।

কি?

খুলে দেখতে পাবে না, এর ভেতরে কি আছে। এর সম্বন্ধ কাউকে বলতেও পাবে না। বললে আমার মৃত্যু। রাজী আছ?

বেশ।

এইবার আমাকে তোমরা জড়োয়া গয়নাগুলো আর একখান বেশ রঙচঙে ভাল শাড়ি দাও। বোরখাটা এইখানে থাক্। কাল তোমার গয়না শাড়ি ফেরত দিয়ে এইগুলো নিয়ে যাব।

গয়না শাড়ি পরে গটগটে করে বেরিয়ে চলে গেল—যেন একটা রাজারাণী। রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসল। কি সপ্রতিভ! হাজার চেষ্টা করলেও কনক ও-রকম পারত না। দেখলে হিংসে হয়, রাগও হয়। কনক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি। কৌতূহল সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। পুলিন্দাটা খুলে দেখেছিল—দেখে শিউরে উঠেছিল। দুটো রিভল্‌ভার। যদিও কাউকে বলে নি সে কথা, তবু ইন্দুর কাছে গিয়েছিল তার পরদিন।

সামান্য এ লোভটুকু সামলাতে পারলে না বউদি—কি তুমি।

ইন্দুর চোখের সে হাস্যপ্রখর ব্যঙ্গশাণিত দৃষ্টি সে ভুলতে পারবে না কোনদিন। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়েছিল সেদিন ইন্দুর কাছে। কার কাছেই বা নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে সে? বাসন্তীর মহিমার তুলনায় সে তো নগণ্য। বাসন্তীর হাস্য-আলাপ দয়া-দাক্ষিণ্য দান-প্রতিদান-উৎসব-ঐশ্বর্য-অলংকৃত সহস্রবিধ অজস্রতার উচ্ছ্বসিত কলস্রোতের মুখে খড়ের টুকরোর মত ভেসে তার সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্ব। বাসন্তীর পাশে তাকে সূর্যকিরণ-লাঞ্ছিত চন্দ্রের মত ম্লান দেখায়। নিজেই সে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। শঙ্খ-রজত-হীরকের দিকেও সে ভাল করে চোখ তুলে চাইতে পারে না, অথচ তাদের কত কচি কচি দেখেছে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল সব, তাকে ছাড়িয়ে উঠলো। বর্ধমান শালচারাদের দিকে বিস্মিত নয়নে চেয়ে রইল ছোট পেয়ারাগাছ সে। নিজের পেটের ছেলে নবীনকেই সে ভাল করে বুঝতে পারে না। কেমন করে যেন কথা কয়, কেমন করে যেন চায়! অত শখ করে অত দামী পিয়ানোটা কিনলে, অথচ একজন বন্ধু চাইবামাত্র দান ক;ের দিলে এক মুহূর্তে! জিজ্ঞেস করাতে হাত উলটে কেমন করে যেন হাসলে একটু! এরা ভিন্ন জাতের লোক, ভিন্ন জগতের, এদের সঙ্গে তার মেলে না। মেলে না, কিন্তু মেলাবার চেষ্টা করতেও ছাড়ে নি সে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা অভিনয় করতে করতেই সারাটা জীবন কাটল। অপটু অভিনেতা যেমন অত্যাধিক বেশি হাত-পা নেড়ে বা অস্বাভাবিক চীৎকার করে অভিনয়ের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করে, সেও তেমনই একটা বড় রকম ডিগ্রী আস্ফালন করে অনাভিজাত্যের কলঙ্ক স্খালন করবার চেষ্টা করেছিল এবং তা করতে গিয়ে স্বামীর দিকে পর্যন্ত ভাল করে দৃষ্টি দিতে পারে নি। যে শ্বশুর তার গুণবত্তায় মুগ্ধ বলে তার ধারণা ছিল, সেই শ্বশুরকেও সে যে সন্তুষ্ট করতে পারে নি, তার প্রমাণ মিলল বি. এ. পরীক্ষা দিতে যাবার দিন। সকাল সকাল খেয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করতে গেছে—হংস-শুভ্র তখন কলকাতার বাড়িতেই থাকতেন—তিনি প্রশ্ন করলেন, এত সকালে কোথাও বেরুচ্ছে নাকি?

আজ আমার পরীক্ষা যে।

ও। সমস্ত দিন তুমি বাড়িতে থাকবে না, তোমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবে কে?

শ্বশুরের কাছে সে প্রশংসা পাবে ভেবেছিল, এ কথা প্রত্যাশা করে নি। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হংস-শুভ্র বললেন, সাহেবদের নকল করে, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছ কেন বল দিকি? লেখাপড়া শেখ না, ডিগ্রীর জন্য অত কাঙালপনা কেন?

কনক প্রত্যুত্তর দিতে পারত। কিন্তু চিরকাল মিতভাষিণী সে, চুপ করে রইল। হংস-শুভ্র আবার বললেন, ভালও লাগে এসব করতে? তুমি বই কোলে করে বসে থাকবে, আর তোমার ছেলেমেয়েদের কোলে করে বসে থাকবে তোমার দাই-চাকরগুলো? মৃগাঙ্কটাও ডাক্তারি ছেড়ে কংগ্রেস করে বেড়াচ্ছে বোধ হয় তোমার ডিগ্রীর ঝাঁজে বাড়িতে টিকতে না পেরে।

কনক আরও ক্ষণকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা দিয়ে ফিরে শুনলে, শ্বশুর দমদমে চলে গেছেন। শশাঙ্ক অনেক আগেই আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন শূন্য বলে মনে হল। ইন্দু পর্যন্ত চলে গেছে বাবার সঙ্গে। সে লেখাপড়া শিখছে, এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করছে সবাই? আশ্চর্য।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রায় সমস্ত দিন কি যে করতেন, তা জিজ্ঞাসা না-করাটাই শ্রেয় মনে হত কনকের। একদিন প্রশ্ন করে যে উত্তর পেয়েছিল, তাতে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়েছিল তার পক্ষে। চরকা চালিয়ে ইংরেজকে তাড়াবেন এঁরা। যে ইংরেজরা নেপোলিয়নকে হারিয়েছে, কাইজারকে হারিয়েছে, জল-স্থলে-অন্তরীক্ষে যাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এঁরা খদ্দর বানিয়ে কাবু করে দেবেন! উচ্ছ্বসিত হয়ে বক্তৃতা করে গেল লোকটা। যারা বেকার, তারাই এসব করে বেড়ায়—কর্তার প্র্যাক্‌টিস বোধ হয় জমে নি এখনও, তাই এই সব ছেলেমানুষি করে বেড়ানো হচ্ছে, প্র্যাক্‌টিস জমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর সে মাথাই ঘামায়নি, ভেবেছিল, দুদিনের খেয়ালে দু'দিনেই মিটে যাবে। এম. এ. পড়ার আয়োজনে মত্ত হয়েছিল সে। তবু কিন্তু মাঝে মাঝে তার কেমন যেন একা মনে হত। মনে হত, সে যেন, একঘরে হয়ে আছে, কেউ তাকে পৌঁছে না, চায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রায়ই বাইরে থাকতেন। ফিরে এসে একদিন হঠাৎ বললেন, তুমি গিয়ে বাবাকে ফিরিয়ে আন। আমি সময় পাচ্ছিনা। আজ আবার মেদিনীপুর যেতে হবে একটা দরকারে।—বলেই বেরিয়ে গেলেন।

দমদম থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হল। ফিরে দেখে, বাড়িতে কেউ নেই। জনবহুল কলকাতা শহরের বুকেও যে এমন নির্জনতা, এতখানি নিঃসঙ্গতা থাকা সম্ভব, তা সেই দিনই সে প্রথম বুঝেছিল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় কেউ নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে, দাই-চাকরগুলো বাড়ি গেছে, বুড়ো দারোয়ানটা ঘুমুচ্ছে নিজের ঘরে খিল দিয়ে। খাঁ-খাঁ করছে প্রকাণ্ড বাড়িটা। তেতলার ঘরে ঢুকে উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল কনভোকেশনের গাউনটা..... ইন্দুর মুচকি হাসিটা মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে ...দমকা হাওয়ায় দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল কপাটটা......।

।। তিন ।।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রও প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। আত্মার শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু সেটা আধ্যাত্মিক মার্গে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে এ শক্তিকে অস্ত্রের মত প্রয়োগ করা সম্ভব, সম্ভব হলেও আপামর-ভদ্র সকলে যে সহসা এই তপস্বী-সুলভ শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে, এ সম্বন্ধে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সন্দেহ ছিল। তথাপি তিনি গান্ধীপন্থী হয়েছিলেন, তার কারণ, আদর্শবাদী শিক্ষিত ভারতবাসীর সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না তখন। পর্বত শিখর থেকে উৎপন্ন নদী যেমন ঢালু ভূমি অনুসরণ করে অবশেষে সাগরে উপনীত হয়, সে যুগে তেমনই আত্মত্যাগমূলক উচ্চ-শিক্ষা-শিখর থেকে উৎপন্ন মন অনিবার্য যুক্তিপ্রবণতার অমোঘ আকর্ষণে অবশেষে যে সিদ্ধান্ত সমুদ্রে গিয়ে আত্মহারা হত, তার নাম—দেশসেবা। মৃগাঙ্কা-শুভ্র-জাতীয় সমস্ত লোকই তখন নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন যে দেশসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেবা না করলে দেশকে গড়ে তোলা যাবে না, আর দেশকে গড়ে তুলতে না পারলে জীবনই বৃথা। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের বিবর্তন একটু দেরিতে হয়েছিল। বৈষ্ণবীর গান এবং বিবেকানন্দের বাণীতে যে তরুণ চিত্ত একদা উদ্বুদ্ধ হয়েও পথ খুঁজে পায় নি, কনকের নিবিড়-সান্নিধ্য-সঞ্জাত ভোগরস পরম উপাদেয় হলেও ঠিক সেই কাম্য অমৃত নয়—এ কথা একদা সহসা উপলব্ধি করে যে হতাশ মন দিশহারা হয়ে পড়েছিল এবং

দাম্পত্যজীবনের বাহ্যাড়ম্বর বজায় রেখেও গোপন পথে তৃপ্তি সন্ধান করতে করতে দেশসেবা-স্বপ্নে মগ্ন হয়েছিল, তার বিবর্তন বিলম্বিত হলেও স্বাভাবিক পথেই হয়েছিল। বিবেকানন্দের আহ্বানেই তাঁর মন ছুটে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যবিধাতার বিধানে তাকে ঠিক সেই জিনিসটাই বরণ করতে হল, বিবেকানন্দ বারম্বার যা বর্জন করতে বলেছেন। কনকের রূপ-যৌবনে তিনি মুগ্ধ ও হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর মুগ্ধ অন্তরে কিসের যেন ছায়াপাত হত, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যুবতী পত্নীর পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে সহসা লজ্জিত হয়ে পড়তেন তিনি। যে বীর সন্ন্যাসীর বাণী মনের গ্লানিই মোচন করে নি শুধু, যাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা অন্ধত্ব মোচন করেছিল, যাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ভারতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আত্মসম্মান আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তির প্রেরণা দিয়েছিল, তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পেরে মৃগাঙ্ক-শুভ্র মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। চুম্বনমদির মধুযামিনীর স্বপ্ন হঠাৎ যেন ভেঙে যেত, জ্যোৎস্না নিবে যেত, প্রাসাদ মিলিয়ে যেত.....মনে হত, ঘনঘাচ্ছন্ন অমাবস্যা নিশীথে পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে জীর্ণবসন শীণকান্তি কারা সব চলেছে যেন দলে দলে.....কাঙালের মিছিল। হঠাৎ সব মিলিয়ে যেত আবার....মনে হত, না—না, আমি পারব না, আমি ভিন্ন পথের পথিক হয়েছি, ওদিকে চাইবারও অধিকার নেই আমার। নিবিড়তর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতেন কনককে।

.....খবরের কাগজ এড়াবার উপায় ছিল না কিন্তু। ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। পড়তেই হত। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনা, অরবিন্দ, বারীন, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, রাণাডে, গোখলে, তিলক, মিন্টো রিফর্ম, মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট—সবই খবরের কাগজ থেকে পাওয়া। মনেও থাকে না যদিও দুদিন পরে কিছু,—পুরানো খবরের কাগজ যথাসময়ে ওজন-দরে মুদীর দোকানে গিয়ে হাজির হয়—তবু খবরের কাগজ না পড়লে চলে না। খবরের কাগজের পাতাতেই হঠাৎ একদিন চোখে পড়েছিল, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকা থেকে দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছেন। পড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। অদ্ভুত লোক তো! অহিংসা, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, বুদ্ধ-চৈতন্য-যীশুখ্রীষ্ট-টল্‌স্টয়-থোরোর অসম্ভব কল্পনা বিলাসকে এই গুর্জরবাসী আইনজীবী রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে স্মাট্‌সের মত জাঁদরেল লোককে কাবু করে দিয়েছে! সত্যি? প্রকাণ্ড-পাগড়ি-পরা শীর্ণকান্তি লোকটার ছবির দিকে নীরব বিস্ময়ে তিনি চেয়ে ছিলেন খানিকক্ষণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান থেকে এসে হাজির হল একটা বিল। কনকের শাড়ি শেমিজ তেল পাউডার, ছেলেমেয়েদের পেনি নিকারবোকার প্যারাম্বুলেটার টফি—একগাদা বিলিতী জিনিসের লম্বা একটা বিল। গান্ধীর ছবির ওপরেই 'চেক' বইটা রেখে 'চেকটা' লিখে দিলেন। পরের দিন আর গান্ধীর কথা মনেই রইল না। কিছুদিন পরেই প্রবলভাবে মনে পড়ল আবার চম্পারণ জেলার আইন অমান্য ব্যাপারে। বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধের হিড়িকে গান্ধী কোথায় তলিয়ে গেলেন। একবার শোনা গেল, বিলেতে তিনি ইংরেজদের সাহায্যার্থে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডেল পেয়েছেন। কেমন যেন খটকা লাগল। কিন্তু ঘটনাপুঞ্জে তাও চাপা পড়ে গেল দু'দিন পরে। গান্ধীর স্মৃতি মন থেকে যখন প্রায় মুছে এসেছে, প্রথম যৌবনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার শিখাও যেন নির্বাণোন্মুখ, ব্যাঙ্কের মোটা টাকা, গৃহিণী-পুত্র-কন্যার স্নেহনিবিড় সঙ্গ মনকে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তুলেছে, তখন হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে জেগে উঠলেন তিনি। রাউলাট অ্যাক্ট

এবং ঠিক তার পিঠ-পিঠ জালিয়ানওয়ালাবাগ। ভারতের আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের মতন উদিত হয়েছেন মিস্টার এম. কে. গান্ধী নয়—গান্ধী মহারাজ। তার পরই অমৃতসর কংগ্রেস। সেও আর এক বিস্ময়। ডায়ার-ও' ডয়ারের কান্ডের পর গান্ধী দুঃখ প্রকাশ করলেন নিজের দেশবাসীর বর্বর আচরণের জন্যে—পাঞ্জাবে গুজরাটে উত্তেজিত জনতা মাথা ঠিক রাখতে পারেন নি। গান্ধী বললেন, রাজপুরুষেরা জালিওয়ালাবাগ করুক, কিন্তু আমরা কেন নিরীহ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে হত্যা করব, ঘরে ঘরে আগুন লাগাব? সমস্ত দেশ পঞ্চমুখ হয়ে যখন ইংরেজদের সমালোচনা করছে, তখন আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করা! গান্ধী কিন্তু বললেন, সত্যিই আমি লজ্জিত। এতো সত্যাগ্রহ নয়। আমি গুন্ডা চাই না, বক্তা চাই না, হুজুগে চাই না,—সত্যাগ্রহী চাই। ভীরু নয় বীর চাই। শুধু তাই নয়, মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড স্কীমের সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত হলেন তিনি। বললেন—"Do not return madness with madness, but return madness with sanity, and the whole sitution will be yours." হিন্দু ভারতবাসীর আচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠল যীশুখ্রীষ্টের মহিমা--চিত্তরঞ্জনের মত প্রতিভাবান প্রতিপক্ষও অভিভূত হয়ে হার মানলেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রও শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সেদিন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার মধ্যে আড়ম্বর ছিল না তেমন কিছু। কংগ্রেসের মেম্বর হলেন, খদ্দর পরলেন, চরকা কিনলেন। চরকা এবং খদ্দর নিয়ে বাড়ি ফিরে কিন্তু উৎসাহ পেলেন না। মনে হল, যেন অন্য দেশে প্রবেশ করলেন, যে দেশে পরাধীনতার গ্লানি নেই, কংগ্রেস নেই, যাদের নিজেদের কোন দুঃখ নেই, অপরের জন্যে দুঃখবোধ নেই--মনে হল, অন্ধ-বধির কতকগুলো লোক যেন দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে নিজেদের স্বার্থটুকু আঁকড়ে ধরে আছে, তার বেশি আর কিছু দেখে না, দেখতে পায় না, শোনে না, শুনতে চায় না। চরকা দেখে কনক মুখ টিপে একটু হাসলে, ছেলেমেয়েরা ভাবলে, নতুন ধরনের একটা খেলনা বুঝি! শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, ননসেন্স্‌! হংস-শুভ্র তখনও দমদমে যান নি, তিনি বললেন, এনেছ, দু দিন চালিয়ে দেখ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও টিকবে না। বাঙালী-বাবুদের ধাতে সইবে না। শেষকালে ওটা মাকড়সা আর ধুলোর আড্ডা হবে। ডাক্তারী বিদ্যেটাও বিদেশী বলে বর্জন করবে নাকি? তা যদি পার, তা হলে কিছু একটা হল। তা কিন্তু পারবে না।—এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলেন, খড়মের চটচট শব্দ যেন অট্টহাস্য করতে লাগল। ইন্দুটা পর্যন্ত ঠাট্টা করে বলে গেল, আমাদের দেশে তো চরকা ছিলই ছোটদা, সেটা কি করে উঠে গেল তার ইতিহাসটা আলোচনা করে তারপর চরকা চালাবার চেষ্টা করলে ভাল হয় না? উঠে যাবার কারণটা না দূর করলে তোমার চরকা আবার থেমে যাবে যে! একমাত্র শঙ্খ-শুভ্রই একটু যা সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে তখন, সে-ই প্রায় রোজ চুপিচুপি তাঁর কাছে আসত আর সূতো কাটত। বেশি কিছু বলত না। চুপ করে শুনত সব আর চরকা ঘোরাত। বিশেষ কিছু উচ্ছ্বসিত হয় নি একদিনও, তার মা বাসন্তীই বরং উচ্ছ্বসিত হয়েছিল বেশি। খুব দামী একখানা খদ্দরের শাড়ি পরে প্রায়ই আসত। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হত, এরাই বোধ হয় তাঁর মনের কথাটি ঠিক বুঝেছে। বস্তুত এরা ছাড়া আর কেউ বড় আসত না তাঁর কাছে। কনক পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। বাজে ব্যাপারে মন দেবার অবসর ছিল না তার; যখন অবসর হত, তখন মৃগাঙ্ক শুভ্রের এই সব খদ্দরী খেলাকে সকৌতুক ঔদাসীন্যভরেই লক্ষ্য করত সে। খেলা যে শেষে জীবনমরণ-সমস্যায় রূপান্তরিত

হয়ে উঠবে, তা সে ভাবতেই পারে নি। যেটাকে রবারের সাপ ভেবেছিল, সেটা সত্যিই যখন ফণা তুলে দংশন করতে উদ্যত হল, তখন নির্বাক হয়ে গেল সে।

খেলাফতের অজুহাতে মহাত্মা গান্ধী পরের বছর যখন নন-কোঅপারেশন শুরু করে দিলেন এবং সেই অহিংস-যজ্ঞে চারিদিক থেকে দলে দলে উকিল শিক্ষক ছাত্র, রাশি রাশি খেতাব, বোঝা বোঝা বিলিতী কাপড় আহুতি পড়ে অগ্নি-শিখা যখন গগন-বিসর্পী হয়ে উঠল—চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল, বিঠলভাই, বল্লভভাই, কেলকার, মুঞ্জে, মদনমোহন, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, রাজাগোপালাচারি, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার,সত্যমূর্তি, শওকৎ আলি, মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ, আনসারি, সুভাষচন্দ্র—দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা যখন সমস্ত ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে, ঘরে ঘরে চরকা চলতে লাগল, গ্রামে গ্রামে তাঁত বসল, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রও তাঁর উঠতি-পসারের মোহত্যাগ করে গা ভাসিয়ে দিলেন সেই তুফানের মুখে। মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেলেন পুলিসের হাতে। জেল হয়ে গেল। জেলকে তখন ভয় করে কে? জেল তখন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে।

জেলে গিয়েই কিন্তু তাঁর সর্বপ্রথম খটকা লাগল। জেলে যাদের সঙ্গে বাস করতে হল তাঁকে—যারা স্কুল-কলেজ-চাকরি-পসার বর্জন ক'রে দেশের জন্য জেলে এসেছে, তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এই ছ্যাবলা চ্যাংড়ার দল দেশোদ্ধার করবে? এদের না আছে নিষ্ঠা, না আছে গাম্ভীর্য, না আছে আত্মসম্মান। এদের দেখে তো শ্রদ্ধা হয় না, রাগ হয়। গৌরবে মন ভরে ওঠে না, লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে। এদের ওপর নির্ভর ক'রে মহাত্মাজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ পাবেন আশা করেছেন নাকি? এদের কি তিনি ঠিকমত চিনতেন? এদের গান হাসি হুল্লোড়ের মাঝে, জেলকর্তৃকপক্ষের কাছে এদের নানা রকম অশোভন অসঙ্গত আত্মসম্মানহানিকর আবদারের হীনতায় আদর্শবাদী মৃগাঙ্ক-শুভ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। কিছুদিন কেমন যেন মুষড়ে গেলেন তিনি। তাঁর দ্বিতীয় খটকা লাগল অহিংস আন্দোলনের চেহারা দেখে। জেলে ব'সেও খবর পাচ্ছিলেন তিনি। চারিদিকে দাঙ্গা বেধে উঠেছে, পুলিস গুলি চালাবার সুযোগ পাচ্ছে, প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষ্যে বম্বেতে যে কাণ্ড হয়ে গেল, তা লোমহর্ষকর—কোনমতেই অহিংস বলা চলে না তাকে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সেই প্রথম মনে হ'ল, টল্স্টয়ের আদর্শ সে যুগে এক টল্স্টয় ছাড়া আর কেউ যেমন পুরোপুরি পালন করতে পারে নি, এ যুগে তেমনই এক মহাত্মাজী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় পারবে না। কায়মনোবাক্যে অহিংস থাকা অশিক্ষিত জনতার সাধ্য নয়। তাই যদি না হয়, তা হ'লে এ অসম্ভব অসাধ্য আন্দোলন চালাবার মানে কি?...

মৃগাঙ্ক-শুভ্র জেল থেকে যখন বেরুলেন, তখন চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী জেলে। অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ। জেলের গেটে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হীরক ও তার বন্ধুবান্ধবেরা। হীরকের মুখ উদ্ভাসিত। কাকা দেশের জন্যে জেল খেটে বেরুলেন, এ যেন বিশেষ ক'রে তারই গৌরব। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে মাল্যভূষিত হয়ে মোটরে উঠে বসলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল, কনক আসে নি। শুক্তি মুক্তা নবনী—কেউ আসে নি। কারণটা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন লজ্জা হতে লাগল। কেউ একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে নি। শুক্তি মুক্তা নবনী না হয় ছেলেমানুষ, কনকও লেখে নি।

তিনি জেল থেকে কনককে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা যে তার জীবন-ধারা বদলে দেবে, এ কল্পনা তিনি করেন নি। কারণ স্ত্রী হ'লেও কনককে তিনি ঠিক চিনতেন না।

তিনি লিখেছিলেন, "আমার হঠাৎ যে জেল হয়ে যাবে, তা ভাবি নি। দেশের জন্যে এ ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি কিন্তু ধন্য হয়েছি। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। কারণ তুমি বুঝতেই পারবে না। স্বামী-স্ত্রী হ'লেও আমাদের জীবনের আদর্শ যে ভিন্ন, তা আমি কিছুদিন থেকে অনুভব করছিলাম। বিশেষ করে অনুভব করলাম সেইদিন, যেদিন তুমি আমার খদ্দরের কাপড়গুলোকে চট বলে ঠাট্টা করেছিলে। তারপর সবাই যখন দলে দলে স্কুল কলেজ পরীক্ষা বয়কট ক'রে চ'লে আসছে, তখন তোমার ডিগ্রী-লাভ করবার উৎকট আগ্রহ দেখেও আমার মনে হয়েছিল, তুমি ভিন্নজাতের লোক। আমার ছেলেমেয়েদের আমি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারতাম অবশ্য, কিন্তু তারা কেবল আমার ছেলেমেয়ে নয়, তোমারও ছেলেমেয়ে। তুমি যখন জোর ক'রে বললে যে, তাদের তুমি এসব বাজে হুজুকে মাততে দেবে না এবং দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে স্কুলে পাঠাতে লাগলে, তখন তোমার মান এবং দাবি বজায় রাখবার জন্যেই আমি কিছু বলি নি। কিন্তু তখন নিঃসংশয়ে বুঝে ছিলাম যে, আমার আদর্শ তোমার কাছে মূল্যহীন; তাই জেলে এসে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এক হিসেবে অবশ্য তোমার ভাগ্য ভাল। কারণ আমি জেলে চ'লে আসার জন্যে, আর যাই হোক, অন্নবস্ত্রের অভাবে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। এই জেলে আমার সঙ্গেই এমন লোক আছেন, যাঁরা জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায় বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। তাঁদের পরিবারবর্গকে হয়তো অন্নবস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আমার পূর্বপুরুষের দৌলতে সে ভোগ তোমাকে ভুগতে হবে না। ভালভাবে খেয়ে প'রে এমন কি নভেল পড়ে, সিনেমা দেখেও দিন কাটাতে পারবে। আমার ব্যাঙ্কের টাকা তোমার নামে করে নিও। 'চেক' পাঠালাম। বাবাকেও লিখে দিলাম যে, তিনি যেন তোমার হিসাবেই টাকা দেন, আমি যতদিন জেলে থাকব।..."

এর উত্তরে কনক কোন চিঠিই লেখে নি। বাসন্তীর চিঠিতেই মৃগাঙ্ক জানতে পারেন যে, কনক ভালভাবে এম. এ. পাস করেছে।

মোটর দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। গলা থেকে ফুলের মালাটা নামিয়ে রেখে মৃগাঙ্ক-শুভ্র জিজ্ঞাসা করলেন, শঙ্খ রজত কোথা?

দাদাকে বাবা কি একটা কাজে টাটা পাঠিয়েছেন। মেজদা বোধ হয় নৈনিতালে।

হীরকের মুখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

জানেন ছোটকাকা, মেজদার পেছনেও পুলিস লেগেছে!

জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখ দুটো, মুখের হাসি আরও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

শুক্তি মুক্তা নবনীরা এল না যে? খবর পায় নি নাকি তারা?—জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলেন না মৃগাঙ্ক-শুভ্র।

কি জানি, খবর পেয়েও আসতে পারে নি হয়তো। হস্টেল থেকে সব সময় ছুটি দেয় না তো।

ওরা হস্টেলে নাকি?

হ্যাঁ। কাকীমা দিল্লী চ'লে যাবার সময় ওদের হস্টেলেই তো রেখে গেলেন।

হীরক আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের দিকে। তার সদা দীপ্যমান মুখের হাসি একটু অস্বচ্ছ হয়ে এল ক্ষণিকের জন্য। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল কাকা বোধ হয় জানেন না। চুপ ক'রে রইল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রও চুপ করে রইলেন। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে মোটর ছুটতে লাগল। মোটর যখন শশাঙ্ক-শুভ্রের গাড়ি-বারান্দার নীচে থেমেছে, তখনও মৃগাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক।..হঠাৎ অনেকগুলো শাঁখের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলেন এবং তারপর বিব্রত হয়ে পড়লেন লাজবর্ষণের প্রাচুর্যে। লক্ষ্য করলেন, শুধু লাজ নয়, পুষ্পবৃষ্টিও হচ্ছে। ওপরের দিকে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়ল, গাড়ি-বারান্দার ছাতে আনন্দে আত্মহারা বাসন্তী খই আর ফুল ছড়াচ্ছে। সঙ্গে পাড়ার এক দল মেয়ে, প্রত্যেকেরই অঙ্গে নানা উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সজ্জা, কারও হাতে ফুলের ডাল, কারও মুখে শাঁখ—একটা সাগ্রহ সম্বর্ধনা মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন। ক্ষণিকের জন্যে সব ভুলে গেলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র, এমন কি অভ্যর্থনাকারিণীদের সাজসজ্জার কোন উপকরণই যে খদ্দর নয়, তাও নজরে পড়ল না তাঁর—তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মোটর থেকে নামতেই একদল কিশোরী মেয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করে মাল্য-চন্দন দিয়ে অভিনন্দিত করল তাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে কমনীয়কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' শুরু হয়ে গেল ড্রয়িং-রূমে। অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করেছিল বাসন্তী।

আদর-অভ্যর্থনা-অভিনন্দনের ধূম চলল কয়েক দিন ধ'রে পাড়ায় পাড়ায় বন্ধুবান্ধব-মহলে। কেমন যেন নেশা লাগল। নিজেরই মনে হতে লাগল, কয়েকমাস জেলে বাস করে সত্যিই একটা দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন তিনি। এসব কিন্তু বেশি দিন ভুলিয়ে রাখতে পারলে না তাঁকে। পরাজয়ের গ্লানিটা ছাপিয়ে উঠতে লাগল সমস্ত মালা-গান-হাততালিকে। অসহযোগ-আন্দোলন থেমে গেছে। নিবে গেছে সব। রাগ হতে লাগল মহাত্মা গান্ধীর ওপর। এমন করে সব থামিয়ে দিলেন কেন তিনি? মনে পড়ল তিলককে। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে কি এমন করে থামিয়ে দিতেন সব? অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই লোকমান্য বীর কি এত বড় একটা ভুল করতেন? হ'লই বা চৌরিচৌরা, হ'লই বা একটু-আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমস্ত দেশের জাগ্রত আত্মচেতনাকে এমন ভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার কি অধিকার ছিল মহাত্মাজীর? 'ট্রুথ' 'ট্রুথ' ক'রেই গেলেন লোকটি তিলকের কাছে কিন্তু ট্রুথের চেয়েও দেশ বড় ছিল। দাদাভাই নাওরোজি আর গোখেলের শিষ্য গান্ধীর কাছে কিন্তু ট্রুথ বড়, দেশ নয়। এ রকম শুচিবায়ু-গ্রস্ত লোকের দেশের কাজে নাবার দরকার কি ছিল? একটা ভাষাহীন অবরুদ্ধ ক্ষোভে সমস্ত চিত্ত উন্মথিত হতে লাগল তাঁর। কোন অবলম্বন না পেয়ে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন তিনি। আবার ডিস্পেন্সারি ফেঁদে ডাক্তারি করবার প্রবৃত্তি আর ছিল না। পারিবারিক জীবনেও কোন আশ্রয় মিলল না। কনকের ব্যবহারে তাঁর পারিবারিক জীবনের মূলোচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। কনক তাঁর ব্যাঙ্কের টাকার এক কপর্দকও স্পর্শ করে নি—দিল্লীতে গিয়ে মাস্টারি শুরু করেছিল সে। শুক্তি-মুক্তা-নবনীর হস্টেলের খরচ নাকি সে-ই পাঠায়। সবাই আশা করেছিল, মৃগাঙ্ক গিয়ে কনককে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি কিন্তু সে-সব কিছুই করলেন না। তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হস্টেলে গিয়ে দেখা করলেন। এমন ভাব প্রকাশ করলেন যেন তাঁরই নির্দেশে তারা হস্টেলে এসেছে এবং কনকও চাকরী নিয়েছে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে। তাঁর মনে হ'ল, যে ভাগ্যবিধাতা একদিন ভুলক্রমে তাঁর জীবনের সঙ্গে কনকের

জীবন জড়িত করেছিলেন, সেই ভাগ্যবিধাতাই এখন বোধ হয় আবার নিজের ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রথমবার মৃগাঙ্ক আপত্তি করেন নি, এবারেও করলেন না।

দমদম থেকে হংস-শুভ্র আর ফেরেন নি। মৃগাঙ্ক যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন অপ্রত্যাশিত রকম স্নেহপ্রবণ ব'লে হ'ল তাঁকে। তাঁর দিকে এক নজরে চেয়ে বললেন, বড্ড রোগা হয়ে গেছ দেখছি। অসুখ বিসুখ করেছিল নিশ্চয়।

না।

তবে? খেতে দিত না?

মৃগাঙ্ক-শুভ্র মৃদু হাসলেন একটু, কোন উত্তর দিলেন না। হংস-শুভ্রও কিছু না বলে অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমার স্ত্রী যখন স্বাবলম্বী হয়েছে, তখন তোমার আর ভদ্রস্থ নেই।

মৃগাঙ্ক চুপ ক'রে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে হংস-শুভ্র আশ্বাস এবং সান্ত্বনা দেবার সুরে শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে অবশ্য ভাবনা নেই তোমার। টাকা দিয়ে যতটা সম্ভব, তা আমি করব। তারাপদকে পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করেওছি। বউমাও শুনেছি ওদের টাকা পাঠায়। তা পাঠাক.....

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। তারপর বললেন, বউমা হঠাৎ চাকরি নিতে গেল কেন বুঝলাম না! ঝগড়া হয়েছিল তোমার সঙ্গে?

ঠিক ঝগড়া নয়, মতের মিল ছিল না।

ও।

হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললেন, ভেতরে যাও, তারাপদ আছে। ইন্দু নেই। হঠাৎ দু'দিন আগে কার এক টেলিগ্রাম পেয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। কি যে করছ তোমরা, তা তোমরাই জান।

সমস্ত দিন আর কোন কথা হ'ল না।

বিকেলে ফেরবার সময় হংস-শুভ্র কেবল প্রশ্ন করলেন, কি করবে ঠিক করেছ?

কিছু ঠিক করি নি এখনও।

ঠিক করতে বেশি দেরি হয় নি অবশ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাক এসে পৌঁছল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একটা কাজ পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন যেন। ভদ্রতার খাতিরেও কনকের সঙ্গে দেখা করবার যে ইচ্ছেটা মনে জাগছিল, তা ভেসে গেল উত্তর-বঙ্গের প্রবল বন্যায়। চার-চারটে জেলা ডুবে গেছে। ফসল গেছে, ঘর-বাড়ি গেছে, গরু-বাছুর পর্যন্ত নেই। অসংখ্য মানুষ মরেছে। যারা মরে নি, তারা গাছে গাছে ঝুলছে সাপের সঙ্গে। ঝুলেও নিস্তার পাবে না। অনাহার এবং মহামারী বসে আছে মুখব্যাদান করে। পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র গ্রামে গ্রামে নৌকোয় নৌকোয়। অন্ন বস্ত্র ওষুধ অজস্র বিতরণ করলেন দু'হাতে। তবু অসংখ্য রকম দাবি মেটানো অসম্ভব একার পক্ষে। জিনিসটা যদিও অজ্ঞাত ছিল না, স্বচক্ষে দেখে আবার নূতন ক'রে মর্মে মর্মে অনুভব করলেন যেন—সত্যিই কত অসহায় আমরা, সত্যিই কত পরাধীন! মানুষই নই, পশুর দল যেন। পশুরাও এমন ভাবে মরে না,পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। আমাদের পালাবার পথ নেই, পথ থাকলেও শক্তি নেই, সঙ্গতি নেই। দুঃখের দিনে ঝড়ে বন্যায় মহামারীতে অসহায়ভাবে মরি, সুখের দিনে ভয়ে ভয়ে প্রবল-সবলের হস্তে

আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকি কোনক্রমে। যে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে আস্থা কমে আসছিল, সেই মহাত্মা গান্ধীকে মনে পড়ল হঠাৎ--ক্ষীণ-দেহ-উলঙ্গ-প্রায় নাতি-দীর্ঘ সেই লোকটিকে, --মনে হল, জীর্ণশীর্ণ ভারতবর্ষের আত্মার মূর্ত প্রতীক যেন তিনিই। বিলাতী-শিক্ষা-পুষ্ট মুষ্টিমেয় ড্রইং-রুম-বিলাসীদের তিনি প্রতিনিধি। মনে পড়ল রেভারেণ্ড হোম্‌সের কথা--When Gandhi speaks it is India that speaks. When Gandhi acts, it is India that acts. When Gandhi is arrested it is India that is outraged and humiliated.মনে পড়ল আহ্‌মেদাবাদের আদালতে গান্ধীর উক্তি। আদালত যখন প্রশ্ন করলে, তোমার পেশা কি? অকম্পিত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—Farmer and weaver। সব যদিও থেমে গেছে, মহাত্মাজী জেলে, তাঁর অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে শত্রুপক্ষের হাসির খোরাক যুগিয়েছে, তবু কিন্তু এই ভীত ত্রস্ত অপমানিত অগণিত অসহায় ভারতবাসীর দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হ'ল, সত্যাগ্রহী মহাত্মাজী দেশের সত্যকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লেই থেমে গেছেন। এই সব ভীরু ভীতু লোভীরা কি সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের উপযুক্ত? এদের আত্মার সুপ্ত শক্তিকে জাগাতে হবে আগে। জাগাতে হবে ভারতবর্ষেরই শাশ্বত মন্ত্রে। সে মন্ত্র হিংসার নয়—প্রেমের, ভিক্ষার নয়—ত্যাগের, পরমুখাপেক্ষীর নয়—স্বাবলম্বীর, ভীতির নয়—শক্তির। সে মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসী অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, কিন্তু গুলি-গোলা কামান-বন্দুক দিয়ে নয়, আত্মার শক্তি দিয়ে। প্রয়োজন হ'লে দলে দলে প্রাণ বিসর্জন করবে, কিন্তু ভুলেও কখনও কারও প্রাণহননের চেষ্টা, এমন কি চিন্তাও করবে না--অসম্ভব বলে নয়, অমানুষিক ব'লে। যে ভারতবর্ষ যুগে যুগে পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে, সেই ভারতবর্ষ চরম দুর্দশাতে পড়েও তার অতীত মাহাত্ম্যের গৌরব থেকে চ্যুত হবে না কিছুতেই। তখনই আবার মনে হল, পারব কি আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে? মুখ বুজে পুলিসের মার খেতে পারবে কি সবাই? পারবে যে, তার প্রমাণ পরে অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন ধরসনা লবন-আইন-অমান্য আন্দোলনে।

.....উত্তর-বঙ্গের নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। যেখানে সম্ভব চরকাও বিতরণ করলেন। একটা অনিশ্চিত অসহায় উন্মাদনার মধ্যে দিন কাটতে লাগল। এই সময় হঠাৎ কাকামণির একটা পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ব্রাহ্ম সোম-শুভ্রের প্রতি মনটা বরাবরই বিরূপ ছিল। ব্রহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটা অঙ্গ, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেরই বৈদিক আর্যধর্মকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিজেদের ভারতীয়ত্বের যে পরিচয় দিয়েছিলেন—এ কথা অবিদিত ছিল না; তবুও ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে প্রসন্ন ভাব ছিল না তাঁর। বারম্বার মনে হ'ত, ওরা শ্রেষ্ঠম্মন্যতা-ভরে নিজেদের আলাদা ক'রে রেখেছেন আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। ব্রহ্মের উপাসনাটা ছুতো মাত্র, আসলে ওরা উপাসনা করে বিদেশী সভ্যতার। সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ প'ড়ে এ কথা আরও বেশী মনে হচ্ছিল তাঁর। সমানে সমানে ছাড়া কোন মিলনই যে শোভন হয় না, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মত লোকও যে বুঝতে পারেন নি, তার কারণ—মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হয়েছিল--চাকচিক্যময় বিদেশী সভ্যতার ইন্দ্রজাল। সোম-শুভ্রের প্রতি বিরূপতার প্রধান কারণটা ছিল অবশ্য পারিবারিক, এমন কি ব্যক্তিগতও। কাকামণি বাবার বিরাগ-হাজার টাকার একখানা 'চেক' এবং ছোট্ট একখানা চিঠি পেয়ে মতটা যেন বদলে গেল। মনে হ'ল, কাকামণিকে ঠিক যেন জানা যায়

নি। অকারণে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে এতদিন। আড়ম্বরহীন ছোট্ট চিঠিখানা আরও মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। অতিশয় সংক্ষেপে এবং একটু যেন সঙ্কোচভরে তিনি লিখেছেন--দেশের এই দুর্দিনে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। তোমার আচরণ প্রশংসনীয়। ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে সশরীরে যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। সেজন্য লজ্জিত আছি। সামান্য কিছু পাঠালাম, যদি কাজে লাগাতে পার, অতিশয় সুখী হব। আরও সুখী হব, আমার নামটা কোথাও যদি প্রকাশ না কর। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো। ইতি--আশীর্বাদক তোমার কাকামণি।...এই টাকা দিয়েই মৃগাঙ্ক-শুভ্র তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ের গোড়াপত্তন করেছিল। তারপর অবশ্য আরও অনেক টাকা দিয়ে বাড়িয়েছেন সেটাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সোম-শুভ্রের পাঁচ হাজার টাকা না পেলে হয়তো শুরুই করতে পারতেন না কাজটা। হাতে তখন কিছু ছিল না। বন্যাপীড়িতদের অন্ন বস্ত্র ওষুধ যোগাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর বার্ষিক বরাদ্দ থেকে এক কপর্দকও উদ্বৃত্ত ছিল না হাতে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ডাক্তারি এবং অন্ন বস্ত্র চরকা বিতরণ করবার ফাঁকে ফাঁকে যে একবারও কনককে মনে পড়ত না, তা নয়। একাধিকবার পড়ত। কিন্তু কনকের দিক থেকে কোন সাড়া না পেলে তিনি যাবেন কোন্ অজুহাতে? তাঁকে অবহেলা করে যে চলে গেছে, বিনা আহ্বানে কিছুতেই তার কাছে ফিরে যাওয়া যায় না--তা হোক সে কনক। হংস-শুভ্রের পুত্র তিনি, আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে কিছু করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সম্বন্ধে অবশ্য বজায় ছিল, কিন্তু কনকের অভাবে তাও কেমন প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল যেন। এমন কি, কনক চলে যাওয়ার সময় তার কলিকাতা-বাসিনী এক বোনকে ছেলেমেয়েদের লোকাল গার্জেন নিযুক্ত করে গিয়েছিল, মৃগাঙ্ক-শুভ্র সে ব্যবস্থাও বদলাবার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ কনক-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করবার প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। কনক একটা চিঠি লিখেও যে তাঁর খোঁজ নেয় নি, এ খবর তিনি কারও কাছে প্রকাশ করতেন না। কনকের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলতেন না কখনও। তাই অনেকেরই ধারণা ছিল যে, কনক বোধ হয় তাঁর সম্মতি-ক্রমেই চাকরি করছে। কনক কিন্তু একটি চিঠিও লেখে নি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার প্রয়াসে ডিগ্রী-অর্জনের দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হয়েও সে যখন একদিনের জন্যেও কারও প্রশংসা পেলে না--নিন্দা ব্যঙ্গ শ্লেষই যখন তার প্রাপ্য হল, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখ চেয়েই সে সব সহ্য করেছিল--যে স্বাভাবিক প্রেরণা-বশে স্ত্রী-মাত্রেই স্বামীর ওপর নির্ভর করে, সেই প্রেরণা বশেই সে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ঔদাসীন্যকে অগ্রাহ্য করে তার আনুকুল্যেই প্রত্যাশা করেছিল। সেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রও যখন একটা তুচ্ছ হুজুকে মেতে তাকে ফেলে চলে গেলেন, শুধু চলে গেলেন নয়, জেল থেকে চিঠি লিখলেন যে, ভয় নেই, অন্নবস্ত্রের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে, তখন চাকরি নেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না তার। ঝোঁকের মাথাতেই সে চাকরি নিয়েছিল। আশা করেছি, মৃগাঙ্ক-শুভ্র তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যথাসময়ে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়েও যখন মৃগাঙ্ক তার প্রতি তেমন কোন মনোযোগ দেখালেন না, তখন তার মনে হল, নীরবে দূরে সরে থাকাই ভাল। বিগত দিনের মহিমময় স্মৃতিগুলো এখনও বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যায় নি। প্রথম যৌবনের দিনে সম্রাজ্ঞীর মত কৃপা বিতরণ করেছিল যাঁকে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে উপযাচিকার মত? কখনও না। এখনও তার আশা আছে, মৃগাঙ্ক-শুভ্র একদিন কিন্তু আসবেনই।

উত্তর-বঙ্গের বন্যার প্রাবল্য যখন কমে এল ক্রমশ, অসংখ্য লোকের অজস্র দুঃখ-দুর্দশার একঘেয়ে কাহিনী শুনতে শুনতে মনও ক্রমশ অসাড় হয়ে এল যখন, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ক্লান্ত চিত্ত হয়তো কনকের সঞ্জীবনী স্পর্শ লাভ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত, কিন্তু নতূন একটা উন্মাদনার ঘূর্ণি উঠল তখন বাংলা দেশে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে স্বরাজ-পার্টি গড়বার জন্যে ডাক দিলেন দেশের লোককে। মনে হয়, গয়ার পরাজয় বাঙালীর আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করেছে। মেতে উঠল সবাই এর প্রতিবিধানকল্পে। অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনের শবদেহেব ওপর ব'সে শুরু হয়ে গেল নতূন রকম তান্ত্রিক সাধনা। সিদ্ধিও যে না মিলল, তা নয়। দিল্লী কংগ্রেস থেকে জয়ধ্বনি করতে করতে বাঙালী ভলান্টিয়ারের দল দেশে ফিরে এল। মৃগাঙ্ক-শুভ্র এতে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু প্রাণে ঠিক সুরটি যেন বাজল না। মহাত্মা গান্ধীর পথ দুর্গম দুঃসাধ্য হ'লেও তাঁর আদর্শের নিষ্কলুষ নির্ভীকতায়, তাঁর কর্মপদ্ধতির বৃহৎ বীরত্বে চিত্ত যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, কাউন্সিলে ঢোকবার জন্যে যেন-তেন-প্রকারেণ ভোট-সংগ্রহ ব্যাপারে ঠিক সে ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ল না। যদিও স্বরাজ-পার্টির আন্দোলন তির্যকপথগামী অসহযোগ-আন্দোলনই—এই হয়তো পলিটিক্সের সুসাধ্য রণকৌশল—কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্রের অন্তর স্বরাজ-পার্টির আহ্বানে ঠিক তেমন আবেগভরে সাড়া দিলে না, যেমন দিয়েছিল মহাত্মাজীর ডাকে। হয়তো একেবারেই দিত না। কিন্তু স্বীরাজ্য পার্টির আহ্বান যে চিত্তরঞ্জনের আহ্বান—যিনি দেশের ডাকে এক মুহূর্তে ভোগের উচ্চ শিখর থেকে পথের ধূলায় এসে দাঁড়িয়েছেন—তার আহ্বান অমান্য করা যে অসম্ভব। যন্ত্রচালিতবৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শহরে শহরে স্বরাজ্য-পার্টির ধ্বজা বহন করে। মনে কিন্তু শান্তি ছিল না । মনে হচ্ছিল, এইবার বুঝি সব ভেঙে পড়বে। মূলতান অমৃতসরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেল। স্থাপিত হ'ল 'তানজিম', 'তাবলিগ', 'হিন্দু মহাসভা'। 'সংগঠন'-আন্দোলন শুরু করলেন হিন্দুরা, 'শুদ্ধি'র সুর তুললেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কেনিয়াতে ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার চলতেই লাগল। গৌরের ' রেসিপ্রোসিটি বিল', শাস্ত্রীর বিলেত যাওয়া, Wood-Winterton Agreement—ব্যর্থ হয়ে গেল সব। এসব সত্ত্বেও উন্মাদনা ছিল কিছু অবশ্য। গভর্মেন্টেব নিজের অস্ত্রেই বারম্বার তাকে পরাভূত করে খবরের কাগজে তুফান তোলার মধ্যে হুজুকপ্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ বাঙালীর মনের খোরাক কিছু ছিল বইকি। তা ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের কত বিরাট প্রতিষ্ঠানের চেহারা দিন দিন বদলে যাচ্ছিল স্বরাজিস্ট্দের হাতে পড়ে। সীমাবদ্ধ কর্তৃত্বের মদিরাতেও ধমনীতে রক্তস্রোত একটু দ্রুতবেগেই বইছিল তখন। এমন সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, নাগপুরে জাতীয় পতাকা নিয়ে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন শুরু হয়েছে আবার। জাতীয় পতাকা নিয়ে পুলিস রাজপথ দিয়ে চলতে বাধা দেওয়াতে দলে দলে লোক জাতীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় বেরুচ্ছে আর জেলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল এ আন্দোলন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রও একদিন জাতীয় পতাকা ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে জেলে চ'লে গেলেন।

অল্প দিন পরেই ছাড়া পেয়ে ভাবলেন, অবলুপ্ত প্রায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকেই আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। জাতীয়-পতাকা-আন্দোলন দেখে তাঁর আশা হয়েছিল, অহিংস আন্দোলনের মর্ম দেশের যুবকেরা উপলব্ধি করেছে এবার বোধ হয়। আশা কিন্তু বেশিক্ষণ টিকল না। গোপীনাথ সাহার গুলিতে শুধু মিঃ ডে-ই মারা গেলেন না, মৃগাঙ্ক-শুভ্রের আশা-

ভরসাও নিঃশেষ হয়ে গেল যেন। পুলিস এসে তাঁর বাড়ি, শশাঙ্ক-শুভ্রের বাড়ি, দমদমের বাড়ি খানাতল্লাশি করে গেল। যদিও বিশেষ কিছু পেলে না, তবু এটা অস্পষ্ট রইল না যে, রজতকে তারা সন্দেহ করছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে বেশিদিন অবশ্য নিস্ক্রিয় থাকতে হল না। দেশবন্ধু শুরু করলেন, তারকেশ্বর সত্যগ্রহ। তার আবর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আবার জেলে গিয়ে উঠলেন তিনি। বস্তুত জেলই তখন কাম্য মনে হচ্ছিল তাঁর। জেলের বাইরে যা কিছু হচ্ছিল, তা যেন প্রাণহীন প্রহসন। মহাত্মাজী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নির্জনবাস করছিলেন সমুদ্রতীরে। তুরস্কদেশীয় যে খিলাফতের আঠায় মেড়ে হিন্দু-মুসলমানকে মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তুরস্কদেশীয় কামাল পাশা সে আঠাটুকু নিঃশেষে তুলে নেওয়াতে হিন্দু-মুসলমানের একতা-ইমাল্‌শন বেশিদিন টিকল না—তেল ও জল আত্মপ্রকাশ করল। নিদারুণ রকম স্পষ্টভাবে। দেশ জুড়ে বাধল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ভারতের স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ করে অভ্রভেদী হয়ে উঠল সারি সারি মন্দির আর মসজিদ! মুসলমানদের দিকে অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে দেশবন্ধু করলেন প্যাক্ট, মহাত্মাজী উপবাস। ফল কিছুই হল না।

হ্যাঁ, জেলে গিয়ে যেন বেঁচে গেলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। জেলেই খবর পেলেন, দেশবন্ধু মারা গেছেন।

কিছুদিন পরে জেল থেকে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর সমস্ত প্রাণ অসাড় হয়ে গেছে। এত অসাড় হয়ে গেছে যে, দেশব্যাপী সাইমন কমিশন বয়কটে যোগ দিতে আর উৎসাহ পেলেন না। কালো পতাকা ঘাড়ে করে করে সভা-সমিতির ভড়ং করতে ভাল লাগল না আর। দেশের যে পরিচয় ক্রমশ পাচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, আঁচলের গেরোর ওপর গেরো বেঁধে লাভ কি, সোনাই যদি বাইরে পড়ে থাকে? দেশের লোক যদি মানুষ না হয়, তা হলে কার জন্যে স্বাধীনতা অর্জন করা? বাজে হৈ-চৈ না করে গ্রামে গিয়ে দেশের লোককে শিক্ষিত সুস্থ সবল স্বাবলম্বী করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে মনে হল। হৈ-চৈ করবার মত উত্তেজনাও ছিল না কিছু। দেশবন্ধু মারা গেছেন, মহাত্মাজী তন্ময় হয়ে আছেন All India Spinner's Association নিয়ে। ফিরে গেলেন তিনি তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে। দেশকে গড়ে তোলাই হল উদ্দেশ্য। বিনা পয়সায় ওষুধ এবং চরকা বিলিয়ে, তাঁত বসিয়ে, নাইট স্কুল করে দিন কাটতে লাগল গ্রামে গ্রামে একা। পরিচিত কারও সঙ্গে, এমন কি খবরের কাগজের সঙ্গেও, সম্পর্ক রইল না কিছুদিন। এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল, তা ফলল। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ পরোপকারী মহাজনদের অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, তাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। কৃতজ্ঞতার বদলে কৃতঘ্নতা, উপকারের বদলে উপহাস,—এসব তো পেলেনই, স্থানীয় জমিদার এবং ডাক্তারের সঙ্গে শত্রুতাও হল। ছোটলোকদের স্পর্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলে চটলেন জমিদার এবং বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে রুগী ভাঙিয়ে নিচ্ছেন বলে চটলেন ডাক্তার। পুলিসের নেকনজর তো ছিলই। জমিদার, ডাক্তার, পুলিস—এঁরাই মফস্বলের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এঁরা সমবেতভাবে রুষ্ট হলে গ্রামে টেকা যায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ঘর পুড়ে গেল একদিন, এবং যাদের তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছিলেন, তারাই আগুন নেবাবার ছুতোয় এসে যথাসর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেল তাঁর। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, দেশসেবার পুরস্কারই এই, দমে গেলে চলবে না, ভালবাসা দিয়ে এদের জয় করতে হবে, আমার মধ্যেই নিশ্চয় গলদ আছে কোথাও মনে মনে এই সব

আবৃত্তি করতে করতে মৃগাঙ্ক-শুভ্র দ্বিতীয় বার প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন তারাপদ এসে হাজির।

কোথায় আছিস তুই? ছি ছি! এ যে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখছি!

তুমি হঠাৎ যে?

হঠাৎ হবে কেন? নবনীর ভয়ানক অসুখ। চল্।

নবনীর?

হ্যাঁ গো।

কি অসুখ?

পেটে ভয়ানক ব্যথা, ফিট হচ্ছে ক্রমাগত।

তাই নাকি?

শিয়ালদহ স্টেশনে নেবে তারপদ ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্ধান করলে, মৃগাঙ্ক-শুভ্র খুঁজে পেলেন না তাকে। নবনীর বোর্ডিঙে গিয়ে শুনলেন, সে কলেজে। কলেজে গিয়ে দেখা করলেন। নবনী বিস্মিত হয়ে গেল। কই, তার কিছু হয়নি তো? তারপর একটু মৃদু হেসে বললে, কিছু হলেও তোমাকে বিরক্ত করতে যাব কেন শুধু শুধু? ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল, ক্লাসে চলে গেল সে। কোঁচানো শান্তিপুরী কাপড় পরা, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে,পায়ে চকচকে পামসু, কোঁকড়ানো চুল, ধপধপে রঙ—এই সুন্দর সুশ্রী যুবক যে তাঁরই ছেলে, এ কথা নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। নবনী-শুভ্রের কাছে মোটা বকশিশ পেয়ে কলেজের যে চাকরটা তাকে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে সেলাম করত রোজ, সেই চাকরটাই একটু রূঢ়কণ্ঠে এসে বললে, তুমি আবার কি চাও এখানে হে? হাঁটুর-ওপরে-ওঠানো খদ্দরে কাপড় পরনে, আড়ময়লা খদ্দরের ফতুয়া-পরা ব্যক্তিটি যে নবনীবাবুর বাবা হতে পারেন, তা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে চেহারাটাও তাঁর শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল।

কিছু না, আমি যাচ্ছি।

একটু অপ্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে এলেন তিনি।

বেরিয়ে বাড়ির দিকে গেলেন এবং সেখানে পৌঁছে বুঝলেন, তারাপদর আসল উদ্দেশ্য কি। বাইরের ঘরে ভ্রূকুঞ্চিত করে হংস-শুভ্র বসে ছিলেন। প্রণাম করে মুখ তুলতেই প্রশ্ন করলেন, কোথা ছিলে তুমি এতক্ষণ?

নবনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি সকাল থেকে।

আপনার কথা তো তারাপদ বলেনি! সে বললে, নবনীর অসুখ।

তারাপদ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেকথা না বললে তুমি আসতে নাকি?

হংস-শুভ্র ধমক দিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা বলতে তো বলিনি তোমাকে।

তারাপদ কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর মৃগাঙ্ক-শুভ্র বললেন, আমি খবর পেলে দমদমেই যেতাম। আপনি কষ্ট করে এখানে এলেন কেন?

কষ্ট করে আমাকে প্রায়ই আসতে হয়। না এলে তোমার বাড়ি ভূতের বাড়ি হয়ে উঠত এতদিন।

কথাটা মিথ্যে নয়। হংস-শুভ্র কিছুদিন থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে এই খালি বাড়িটাতে এসে চুপ করে বসে থাকেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমার কষ্টের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। যে জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি শোন। এ বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম, তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে বলে। কিন্তু যা দেখছি, জেলে জেলে আর গ্রামে গ্রামেই কাটছে তোমার। তোমার বউ চাকরি করছে বিদেশে। তোমার ছেলেমেয়েরা বোর্ডিঙে। নবীনকে বলেছিলাম, বোডিং ছেড়ে এখানে এসে থাকতে। কিন্তু সে তাতে রাজী নয়।

কেন?

কেন যে, তাও খুলে বলে না। বাড়ির কারও সঙ্গে সে বিশেষ মেশেও না। ছুটি হলেই মায়ের কাছে চলে যায়।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র চুপ করে রইলেন। একটু আগে নবনীর মুখে যে কথাগুলো শুনেছিলেন তা মনে পড়ল। কেমন যেন একটা অস্পষ্ট বেদনা সঞ্চরণ করতে লাগল মনের ভেতর। হংস-শুভ্র অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দিলেন আরও।

পরের ছেলেমেয়েদের আপন করবার জন্যে তুমি প্রাণপাত করে বেড়াচ্ছ শুনলাম; অথচ তোমার নিজের ছেলেমেয়েরা পর হয়ে যাচ্ছে। তোমার কর্তব্য অবশ্য তুমিই ভাল বোঝ। আমি কিন্তু এ বাড়িটা নিয়ে কি করি এখন? বুড়ো বয়সে একটা শূন্যবাড়ি পাহারা দিতে হবে নাকি বসে বসে।

হংস-শুভ্র কণ্ঠস্বরে যদিও একটা ব্যঙ্গের সুর ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর শেষের কথাগুলো আর্ত মিনতির মত শোনাল। সেটা তাঁর নিজের কানেই বাজল এবং বাজবামাত্রই তিনি চটে গেলেন।

বলে উঠলেন, তা বলে তোমার ভাববার কোন দরকার নেই যে, তোমার সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। আমার কর্তব্য আমি নিজেই যথাসাধ্য করে যাব। তোমার দিকটা সম্বন্ধে তোমাকে সচেতন করে দেওয়া উচিত বলেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে। চিঠিতে সব কথা বলা যায় না। আচ্ছা, আমি চললাম এখন—জিনিসটা ভেবে দেখো।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তিনি উঠে গেলেন। সম্ভাব্য উত্তরটাকে এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন যেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। 'কিছু হলেও তোমাকে খবর দিতে যাব কেন শুধু শুধু?'—নবনীর কথাগুলো আবার কানের কাছে বেজে উঠল। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল যেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, এরা ভিন্ন জাতের লোক। এদের সঙ্গে মিলবে কেন? জোর করে মেলাবার চেষ্টা করা বৃথা। পরের ট্রেনেই স্বস্থানে ফিরে যাবার ইচ্ছে হল। হঠাৎ পাঁচফোড়নের মৃদু গন্ধ ভেসে এল একটা। বাড়ির ভেতরে কেউ রাঁধছে নাকি! ভেতরে ঢুকে দেখলেন, চারদিক তকতক ঝকঝক করছে। পুরনো ঠাকুর এবং চাকর কাজে লেগে গেছে। শোবার ঘরের পালঙ্কে ধপধপে বিছানা পাতা। বাথরুমে পরিষ্কার খদ্দরের ধুতি, তোয়ালে, সাবান, এমন কি জবাকুসুম পর্যন্ত। শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চায় টলটল করছে জল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের

কৃচ্ছ্রসাধন-ক্লান্ত মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। ঠিক করে ফেললেন, কিছুদিন অন্তত থেকে যাই—শরীরটাকেও বিশ্রাম দেওয়া হবে, বাবার অনুরোধটাও পালন করা হবে। বাবার অনুরোধটা যে ঠিক কি, তা স্পষ্ট ভাবে না শুনলেও বুঝতে কষ্ট হয়নি। এখানে কিছুদিন থাকলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

এই কিছুদিনের মধ্যেই শশাঙ্ক-শুভ্র এলেন একদিন বাসন্তীকে নিয়ে। বাসন্তী পীড়াপীড়ি করতে লাগল তার কাছে গিয়ে থাকবার জন্যে। অল্প দিন পরেই শঙ্খর বিয়ে, বিয়েতে মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে কি কি করতে হবে, তারই উচ্ছ্বসিত আলোচনা করতে লাগল সে। সোৎসাহে দীর্ঘ ফর্দই বানিয়ে ফেললে একটা। তারপর বললে, আমি এখন উঠি, মিসেস হালদারের ওখানে যেতে হবে একবার। তোমাকে কিন্তু আমি পাকড়ে নিয়ে যাব এসে, কোন আপত্তি শুনব না। হেসে বেরিয়ে চলে গেল। শশাঙ্ক বাসন্তীর সামনে পারতপক্ষে মুখ খোলেন না। বাসন্তী চলে গেলে, দু-চার কথার পর শুরু করলেন নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা। ঈষৎ অনুযোগভরে বললেন, কেন যে এমন ভাবে সময় নষ্ট করে বেড়াচ্ছ তুমি, তা তো বুঝি না। স্বদেশী করতে মানা করছি না। কিন্তু সেটা ইকনমিক বেসিসে না করলে শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়াবে না যে। তোমার ডাক্তারী বিদ্যেটাকে কাজে লাগাও না। কন্টিকারি, আমরুল, শিলাজতু—কত সব দিশী ওষুধ রয়েছে, সেগুলো যদি সত্যিই উপকারী বলে মনে কর, পেটেন্ট করে চালান দাও বিদেশের বাজারে। বিদেশের টাকা ঘরে না আনতে পাবলে কোন দিনই উন্নতি হবে না আমাদের। এঁরা অবশ্য নানা রকম ডিউটি বসিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করবেন আমাদের, সন্দেহ নেই—কিন্তু উই মাস্ট ফাইট দ্যাট—ওই সব নিয়েই ফাইট করতে হবে। মালব্যজীর ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টিই ঠিক পথ ধরেছে আমার মনে হয়। যাতে দেশের লোকের দু পয়সা লাভ হয়, তাই করতে হবে। শুধু চরকা চালিয়ে লাভ কি—ইকনমিক্যালি ওটা কি খুব একটা সাউণ্ড ব্যাপার? তোমাদের মহাত্মাজীর মাথায় কি যে আছে, তা জানি না। এবারকার ক্যালকাটা কংগ্রেসে কি ফার্সটা হল দেখলে তো? মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ গর্ভমেন্টকে যে 'আলটিমেটাম' দিলেন, এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না দিলে আবার নন-কো-অপারেশন করবেন তিনি—তাঁর কি ধারণা, ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ভয়ে ভয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলবে? আর দিয়ে যদি না ফেলে, তা হলে তিনি ওই ভাড়া-করা কতকগুলো চ্যাংড়াকে দিয়ে দেশোদ্ধার করে ফেলবেন? আই থিঙ্ক, দিস ইজ—

বাক্যটা সম্পূর্ণ না করে তিনি পাইপটা ধরালেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্র একটি কথাও বললেন না। পাইপ ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শশাঙ্ক বললেন, ওদিকে জওহরলাল আর সুভাষ বোস ছোঁড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের হীরু লেবারের দুঃখে কাতর। একটা মাড়োয়ারীদের মিলে কি সব করেছে যেন শুনেছি। রজত আউট অব কন্ট্রোল। মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশে, কে যেন বলছিল। মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশাবার মানে? ওদের জিন্না তো..... আঃ, সিকেনিং!

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করে রইলেন।

তুমি পেটেন্ট মেডিসিনের কথাটা ভেবে দেখো। সিরিয়াস্‌লি যদি করতে চাও, আমি ফিনান্স করতে রাজী আছি। আমাদের ওখানে আসছ কি?

না, এইখানে তো বেশ আছি।

সে তুমি আর বাসন্তী বোঝ, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

পাইপটা কামড়ে 'শ্রাগ' করলেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র জিজ্ঞেস করলেন, হীরু কোথা?

সে সারা ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গিয়েছিল বারদৌলি, সেখান থেকে ফিরে জামসেদপুরে কাটাল কিছুদিন, এখন নরিম্যানের বক্তৃতা শুনতে বম্বে গেছে। বম্বেতে টেকস্‌টাইল মিলগুলোতে স্ট্রাইক চলছে, তাতে মাতল কি না কে জানে। কাল আসবে শুনছি।

তারপর একটু থেমে বললেন, তোমাকে ভক্তি করে। ফিরলে ওকে একটু বুঝিয়ে বলো দেখি, এ রকম হৈ-চৈ করে লাভটা কি? তোমার কথা শুনলে হয়তো মত বদলাতে পারে।

আচ্ছা, আসুক।

আমি এখন উঠি। বাসন্তীকে তুলে নিতে হবে আবার।

শশাঙ্ক-শুভ্র চলে গেলেন।

হীরক আর ফেরেনি। মীরাট কন্‌স্‌পিরেসি কেসে ধরা পড়েছিল সে। শঙ্খ আর আসত না তাঁর কাছে। মৃগাঙ্কর মনে হল, আসন্ন বিবাহের রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে হয়তো, নীরস চরকা কাটবার প্রবৃত্তি এখন নেই বোধ হয়। একা একাই দিন কাটতে লাগল তাঁর। পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যতটা আরাম প্রত্যাশা করেছিলেন, ঠিক ততটা পেলেন না,—পারিবারিক আবেষ্টনীই ছিল না যে! কনককে ফেরবার জন্যে তিনি কিছু লিখলেন না, কনকও ফিরল না; শুক্তি মুক্তা নবনী এসে দেখা করে যেত বটে, তারাও বাড়িতে থাকতে চাইল না, নানা অজুহাত দেখিয়ে বোর্ডিঙেই থেকে গেল। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মৃগাঙ্ক-শুভ্র বুঝতে পারলেন যে, ভেতরে ভেতরে ওরা মায়ের দিকে। সব বুঝেও কিছুই বললেন না তিনি। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে বহুকাল পূর্বে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করেছিলেন। এখন আর সে ভাব নেই। মনের ওপর কড়া পড়ে গেছে। জবাবদিহি করে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করার প্রবৃত্তি আর ছিল না। একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য সমস্ত সত্তাকে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাড়িতেই থাকতেন সমস্ত দিন। নিয়মিতভাবে চরকা কাটতেন আর বই পড়তেন। নানা রকম বই—নভেল, নাটক, সাংখ্য, গীতা—তামিল ভাষাটাও শেখবার চেষ্টা করছিলেন, ইচ্ছে ছিল দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলো আয়ত্ত করে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরুবেন। নাড়ী টিপে ডাক্তারি করবার ইচ্ছে আর ছিল না। গ্রামসংস্কারের বাসনাও মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে আসছিল ক্রমশ। শশাঙ্ক-শুভ্রের কথায় ডাক্তারী রিসার্চ করবার ইচ্ছেটা হচ্ছিল বটে মাঝে মাঝে—ভাবছিলেন, তা করতে হলে জার্মান ভাষাটাও শেখা দরকার কিন্তু প্রবলভাবে কোন কিছুতেই মন সায় দিচ্ছিল না। খবরের কাগজের মারফত রাজনৈতিক যে সব সংবাদ পাচ্ছিলেন, তা মোটেই আশ্বাসজনক নয়। লাহোরে পুলিস-ইন্‌স্পেকটর মিস্টার সণ্ডার্সকে খুন করে গেল কে যেন। যদিও এই সণ্ডার্সই লাহোরে আন্টি-সাইমন-কমিশন শোভাযাত্রা ভাঙতে গিয়ে লালা লাজপত রায়ের মাথায় লাঠি চালিয়েছিলেন, যার ফলে অবশেষে তাঁর মৃত্যু হ'ল—তবু সণ্ডার্সের মৃত্যুতে ব্যথিত হলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। তারপরই বম পড়ল অ্যাসেম্ব্লিতে। সরদার ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়ল। মহাত্মাজীর আদর্শকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। বাংলা দেশে সুভাষ বোসের গান্ধী-বিরোধী বামপন্থী সুরও ভাল লাগছিল না তাঁর। খবরের কাগজ পড়াই বন্ধ করে দিলেন। তেতলার ঘরটাতে একা চুপ করে বসে থাকতেন।

হঠাৎ দুপুরে একদিন ইন্দু সেখানে এসে হাজির। এক পিঠ কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখ জ্বলছে, মুখে তীক্ষ্ণ হাসি—মূর্তিমতী কালবৈশাখী যেন। চরকাটার দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে সে বললে, আমি দাঁড়াতে পারব না, তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম। তুমিও শুনেছ বোধ হয়—

কি খবর?

লাহোর জেলে যতীন দাস মারা গেছে।

খবরটা বলেই ইন্দু বেরিয়ে চলে গেল।

মারা গেছে! যুবক যতীন দাসের মুখটা মনের ওপর ভেসে উঠল।

আলাপ ছিল তার সঙ্গে। হঠাৎ কশাহত হয়ে যেন উঠে দাঁড়ালেন। সামনে একটা সুট্‌কেস ছিল, সেইটি হাতে করে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে লাহোরের একটা টিকিট কেটে চড়ে বসলেন ট্রেনে। লাহোরে গিয়ে কি হবে, তা ভেবে দেখবার মত যুক্তি তখন মাথায় ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল, অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার, যা হোক একটা কিছু—অন্তত্পক্ষে লাহোরের দিকে ছুটে যাওয়া।....

লাহোর পর্যন্ত অবশ্য পৌঁছতে হয়নি তাঁকে। পথে এক গুজরাটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দুজনে একসঙ্গে জেলে ছিলেন বহুকাল। তিনি মৃগাঙ্ক-শুভ্রের অসহায় ভাব, অসংলগ্ন ভাষা, উত্তেজিত চোখের দৃষ্টি দেখে জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন বম্বেতে নিজের বাসায়। সেখানে কাটল কিছুদিন। শান্তিতেই কাটল। এমন কি সেখানে একটা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়েও বসতেন মাঝে মাঝে।

তারপর আবার মহাত্মাজী হঠাৎ দেখা দিলেন রাজনৈতিক আকাশে।

৩১ এ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ২৬ এ জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পালিত হল সারা দেশ জুড়ে.... কংগ্রেসের অসহযোগ-আন্দোলনের বার্তা আবার প্রচারিত হল, দেশের আকাশে বাতাসে। ঠিক হল, লবণ-আইন অমান্য করবেন মহাত্মাজী। এ শুনে হাসল অনেকে। 'স্টেট্‌সম্যান' ঠাট্টা করে লিখলে, "মহাত্মা মে গো অন বয়েলিং সি-ওয়াটার টিল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্ ওয়াজ অ্যাটেণ্ড!" মৃগাঙ্ক-শুভ্রেরও কেমন যেন একটু সন্দেহ জন্মাল। এ কি করে হবে? যথাসময়ে কিন্তু শুরু হয়ে গেল মহাত্মাজীর ডাণ্ডি—অভিযান আটাত্তর জন সঙ্গী নিয়ে। যাত্রা করলেন তিনি পদব্রজে, গ্রামে গ্রামে তাঁর অসহযোগবার্তা প্রচার করতে করতে। অপ্রত্যাশিত রকম ফল ফলল। তাঁর পদস্পর্শে দেশের মাটি পর্যন্ত সজীব হয়ে উঠল যেন। প্রতি পদক্ষেপে পেলেন তিনি জাগ্রত জনতার বিপুল অভিনন্দন। দেশময় জাগল সাড়া। সর্বত্র ধুম পড়ে গেল লবণ-আইন অমান্য করবার। কলকাতায় নুন তৈরি করবার সুযোগ ছিল না। সেখানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন আইন অমান্য করলেন প্রকাশ্য সভায় রাজবিদ্রোহমূলক রচনা পাঠ করে। শুরু হয়ে গেল ফের বিদেশী-বর্জন, শুরু হয়ে গেল মদের দোকানে চৌকিদারি। ভদ্র-ঘরের পরদানশীন মেয়েরা পর্যন্ত দলে দলে এসে যোগ দিলেন দেশের কাজে। জারি হতে লাগল জরুরি আইনের পর জরুরি আইন। বর্ষণ হতে লাগল লাঠি আর গুলি সত্যগ্রহীরা জনতার ওপর। ফাটল অনেক মাথা, প্রাণও হারাল অনেকে—সত্যাগ্রহীরা থামল না কিন্তু। গুলির মুখেও নির্ভয়ে এগিয়ে গেল তারা। পেশোয়ারে এক দিনেই মরলো শত শত সত্যাগ্রহী, তবু তাদের আগ্রহ কমে না। এক দল সরে গেলেই আর এক দল এসে দাঁড়ায়, তারা মরে গেলে আর এক দল। প্রতিবাদ করে না, হাত তোলে না,

নীরবে এগিয়ে আসে খালি। গাঢ়োয়ালী সেনারা গুলি চালাতে অস্বীকার করলে শেষ পর্যন্ত। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সমস্ত চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। এই তো চাই, এরই স্বপ্ন তো দেখছিলেন এতদিন। ধরস্নায় চলে গেলেন তিনি কংগ্রেস-ক্যাম্পের ডাক্তার হয়ে। সেখানে অভিযান শুরু হবার পূর্বে সরোজনী নাইডু তাঁদের যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অনেকদিন পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে—মহাত্মাজীর দেহ যদিও আজ জেলে, কিন্তু তাঁর প্রাণ রয়েছে তোমাদের সঙ্গে। ভারতের মর্যাদা আজ তোমাদের হাতে। কোন হিংসা, কোন উগ্রতা যেন প্রকাশ না পায় তোমাদের ব্যবহারে। ধীর অনিবার্য গতিতে এগিয়ে যাও তোমরা, মার খাবে, কিন্তু প্রতিরোধ করবে না, লাঠির ঘা আটকাবার জন্যেও হাত তুলবে না কেউ, শান্ত দৃঢ় পদে এগিয়ে যাবে শুধু পুলিসের লাঠিকে তুচ্ছ করে!

সরোজনী নাইডুর কথা রেখেছিল সবাই। লোহা বাঁধানো লাঠি অবিরাম পড়তে লাগল সত্যগ্রহীদের নগ্ন শিরের ওপর, অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল দলে দলে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করলে না কেউ। সকলের সাদা খদ্দর রক্তে রাঙা হয়ে গেল, স্ট্রেচার-বেয়ারারা নিঃশব্দে এসে তুলে নিয়ে গেল তাদের। আবার এগিয়ে এল আর এক দল। মার খেয়ে তারাও শুয়ে পড়ল, এল আর এক দল...তার পর আর এক দল....পুলিসের লাঠি সমানে চলতে লাগল.....অজ্ঞান মৃগাঙ্ক-শুভ্র যখন চোখ খুললেন, তখন তিনি জেল-হাসপাতালে। বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়ে গেল।

হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরা থেকে নামল যখন মৃগাঙ্ক-শুভ্র, তখন ভিড়ের মধ্যে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। চারদিকে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি। চটের-মত কাপড় পরা মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে সমীহ করবার প্রয়োজনই মনে করলে না কেউ। বরং কেউ কেউ তাঁর খদ্দরের দিকে অবজ্ঞাভরেই চাইলে দু-একবার। মহাত্মাগান্ধীর ওপর বাংলা দেশ তখন অপ্রসন্ন। বিহারে কংগ্রেস-মিনিষ্ট্রির বাঙালী-নির্যাতন চলছে তখনও পুরোদমে—নামাবলীর মত খদ্দর এবং গান্ধীটুপি বাঙালীর চক্ষে ভণ্ডামীর আবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন। তা ছাড়া এক মুখ কাঁচা পাকা গোঁফ-দাঁড়ি, রোগজীর্ণ শরীর—মৃগাঙ্ক-শুভ্রের চেহারার মধ্যেও সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মত কিছু ছিল না। অনেক কষ্টে কুলীর মাথায় নিজের বিছানা-বাক্স চাপিয়ে মৃগাঙ্ক-শুভ্র এদিক ওদিক চেয়ে ভাবলেন, দাদা টেলিগ্রামটা পাননি বোধ হয়। অগ্রসর হতে যাবেন, এমন সময় নিঁখুত সাহেবী-সুট পরা শশাঙ্ক শুভ্র এসে দাঁড়ালেন সামনে।

গড! আমি দু-দুবার এখান দিয়ে পাস করলুম, তোমাকে চিনতেই পারিনি।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখে মলিন হাসি ফুটে উঠল, হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন অগ্রজকে।

এঃ, চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে!

হঠাৎ শশাঙ্ক-শুভ্রের চোখে জল এসে পড়ল, নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। বাই জোভ, হোয়াট'স দিস্!

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, চল গাড়ি এনেছি। একটা সুখবর আছে, শঙ্খর ছেলে হয়েছে, একটু আগে খবর পেলুম। এখনও যাওয়া হয়নি সেখানে।

ও, তাই নাকি?

ছিপছিপে ফরসা সদাসঙ্কুচিত, মুখে বিনীত-মৃদু-হাসি শঙ্খর চেহারাটা মনে পড়ল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের।

শঙ্খ-শুভ্র

।। এক ।।

যাঁরা স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন বাস্তববাদী, যাঁরা সব জিনিসের বাইরেটা দেখেই তার মূল্য নিরূপণ করেন, তাঁরা শঙ্খ-শুভ্রকে ঠিক বুঝবেন না। শঙ্খ-শুভ্র-চরিত্রের আসল সৌন্দর্যটা বারংবার এড়িয়ে যাবে তাঁদের। কারণ সেটা স্থূল বস্তু নয়, সূক্ষ্ম রূপ। বস্তুত বস্তুর বাজারে শঙ্খ-শুভ্র মূল্যহীন। আস্ফালন করবার মত শব্দ-বহুল বা বর্ণ-বহুল এমন কিছুই নেই তার, যা তাক লাগিয়ে দিতে পারে সকলকে। সে মার্জিত-রুচি ভদ্রলোক। ভদ্রতা জিনিসটা যদিও বিরল, কিন্তু এই বিরল গুণ কারও মধ্যে প্রত্যক্ষ করলে আমরা বাহবা দিয়ে উঠি না। ভদ্রতাটা আমরা যেন সকলের কাছে প্রত্যাশা করি। না পেলে ক্ষুন্ন হই, পেলে চমৎকৃত হই না। সত্যিকার ভদ্রলোক হতে হলে ছোট-বড় যেসব ত্যাগ অহরহ করতে হয়, সেসব ত্যাগের মূল্য দিতে আমরা অভ্যস্ত নই। প্রকাণ্ড একটা কিছু প্রচণ্ড ভাবে এসে আমাদের চৈতন্যলোককে নাড়া না দিলে আমরা সাড়া দিই না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে আমরা হাততালি দিতে কার্পণ্য করি না, কিন্তু যদি কেউ নিজের একমাত্র মশারিটি অতিথিকে দিয়ে সারারাত মশার কামড় ভোগ করেন, তাঁর ব্যবহারে চমকপ্রদ কিছু অনুভব করবার প্রয়োজন আমাদের হয় না। শঙ্খ-শুভ্র আজীবন নিজের মশারিটি পরকে দিয়ে মুখে বিনীত হাসিটি ফুটিয়ে নীরবে মশার কামড় ভোগ করেছে। এ নিয়ে পাঁচজনের কাছে বাহাদুরি করতে তার ভদ্রতায় বেধেছে, পাঁচজনও এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হবার কোন প্রেরণা পাননি।

ছেলেবেলায় প্রথম যখন সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে সানন্দে নিজের কৃতিত্বটা সম্যকরূপে উপভোগ করবার আয়োজন করছে, ক্লাসের মাস্টারেরা বিশেষ করে থার্ড মাস্টার, যখন সবে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন—শৈশবের সেই স্বর্গলোকে একদিন এসে হানা দিলেন ঠাকুরদা।

কথায় কথায় হংস-শুভ্র একদিন বললেন, শশাঙ্ক-শুভ্রকে, আমার ইচ্ছে করে, শঙ্খ রজত হীরক—তিনজনকেই হিন্দু আদর্শে গড়ে তুলি, অবশ্য তোমার যদি না আপত্তি থাকে।

ষষ্ঠীচরণকে নিয়ে যা কাণ্ড ঘটেছিল, তার জের অনেকদিন গড়িয়ে গড়িয়ে মাত্র কিছুদিন আগে মিটেছে, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু টাকারও দরকার তখন, শশাঙ্ক-শুভ্র সোজাসুজি আপত্তি করতে পারলেন না।

বললেন, আমার আর আপত্তি কি! তবে সে রকম আর্দশ হিন্দু স্কুল কোথা! রবিবাবুর শান্তিনিকেতনে অবশ্য—

না, শান্তিনিকেতনে পাঠাতে বলছি না। কাশীতে আমার একজন বাল্যবন্ধু গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে একটি পাঠশালা খুলেছে—

কি হয় সেখানে?

সংস্কৃত পড়ানো হয়, ব্রহ্মচর্যের সব নিয়ম পালন করতে হয়। বাবুয়ানি চলবে না সেখানে, মাথা কামিয়ে টিকি রাখতে হবে।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ কবে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

শঙ্খ ঠাকুরদার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। মনে হল, তাঁর চোখ দিয়ে আগ্রহ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, হীরু অবশ্য মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এখন, শঙ্খ রজত যদি যেতে চায়---

রজতও সেখানে ছিল, সে সঙ্গে বলে উঠল, আমি মাথা কামিয়ে টিকি রাখতে পারব না।

তুমি?

হংস-শুভ্র শঙ্খর দিকে ফিরে চাইলেন। তখন শঙ্খর বয়স যদিও খুব বেশি নয়, তবু সে অনুভব করলে ঠাকুরদার জীবন-মরণ যেন নির্ভর করছে তার উত্তরের উপর। মাথা কামিয়ে টিকি রাখবার ইচ্ছে তারও ছিল না, কিন্তু ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করতে পারলে না। তার এত বড় বীরত্বের আসল মূল্য কিন্তু কেউ দেয় নি। হংস-শুভ্র সগর্বে ভাবলেন যোগীশ্বরের বংশের ছেলে তো! এই ছেলেটাই বংশের মুখ রাখবে দেখছি। শশাঙ্ক-শুভ্র ভাবলেন, একটা নতুন জায়গায় যাবার লোভেই রাজী হয়েছে বোধ হয়। বাসন্তী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু শ্বশুরের জেদ, স্বামী মুখ ফুটে বলেছেন---আপত্তি নেই, ছেলেও যেতে চাইছে, এই ঐকতানে বেসুর তুলে রসভঙ্গ করবার মেয়ে বাসন্তী নয়। পরে অবশ্য অন্য উপায়ে উদ্ভাবন করে হংস-শুভ্রের হিন্দু আদর্শকে ভূশায়ী করেছিল সে; তখন কিন্তু মত দিতে হয়েছিল।

বাল্যবন্ধুর সংস্কৃতবহুল অতিশয়োক্তিপূর্ণ চিঠির উপব নির্ভর করে স্বয়ং হংস-শুভ্র শঙ্খকে নিয়ে কাশী গেলেন। জটা-বল্কল-ধাবী-মুনি-ঋষি-পূর্ণ-মৃগ-ময়ূর-অধ্যুষিত তপোবন অবশ্য তিনি প্রত্যাশা করেননি; কিন্তু ভদ্রগোছের কিছু একটা দেখতে পাবেন, এ আশা ছিল তাঁর। কিন্তু কাশীর সেই গলিতে পদার্পণ করে একটু কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন তিনি। আবর্জনাপূর্ণ অত্যন্ত নোংরা একটা গলি। পিছন দিক থেকে পাচক ব্রাহ্মণের মত যে লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, ওহে, পণ্ডিত মশায় কোথায় আছেন একবার ডেকে দাও তো। সে লোকটি যখন মুখ ফেরালে, তখনও হংস-শুভ্র চিনতে পারলেন না। কপালে-শির-ওঠা কোটরগত-চক্ষু এই ব্যক্তিটিই যে তাঁর বাল্যবন্ধু মথুরামোহন, সংস্কৃত কলেজে এঁরই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে তিনি যে একদা মুগ্ধ হতেন, এ সত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও বিশ্বাস করতে একটু দেরি হল তাঁর। পরিচয় হতেই অবশ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন উভয়ে। ক্রমশ আলাপ ঘনিষ্ঠতর হল। মথুরামোহন অবশেষে হংস-শুভ্রকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, নিদারুণ দারিদ্র্য, বিমুখ রাজশক্তি, উদাসীন সমাজ—এই ত্রিবিধ দুরতিক্রম্য বাধাকে অতিক্রম করে বহুকষ্টে তিনি সনাতন-হিন্দু-আদর্শমূলক এই যে প্রতিষ্ঠানটি খাড়া করে তুলেছেন, তা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও আদর্শে ক্ষুদ্র নয়। চারটি ছাত্রকে তিনি খেতে দেন এবং সংস্কৃত পড়ান। ছাত্রদের অভিভাবককে কোন খরচ দিতে হয় না, তিনিই সমস্ত ভার বহন করেন। অর্থাৎ বিদ্যা বিক্রয় করেন না তিনি, দান করেন। ছাত্রদের শুধু পড়তেই হয় না, সমস্ত হিন্দু আচার শিখতে হয়, সমস্ত গৃহকর্মাদি স্বহস্তে করতে হয়। হংস-শুভ্র ঠিক মুগ্ধ না হলেও ক্ষুব্ধ হতে পারলেন না। তাঁর মনে হল,

সমাজের বর্তমান অবস্থায় একজনের চেষ্টায় এর চেয়ে বেশি আর কি হবে। মথুরামোহন ইচ্ছে করলেই রাজসরকারে চাকরি নিতে পারত, বিদ্যা এবং সুযোগ দুইই ছিল তার, কিন্তু সে-সব না করে নিজের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখে হিন্দু-সংস্কৃতি সেবায় সে আত্মনিয়োগ করেছে, হাততালির লোভে নয়, কর্তব্যবোধে। মথুরামোহনের চোখের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে এবং উদ্দীপনাপূর্ণ আলাপ শুনে হংস-শুভ্রের মন থেকে সমস্ত দ্বিধা মুছে গেল। শঙ্খকে তো রেখে এলেনই টোলে, কিছু সাহায্যও করে এলেন। আর একটা অপ্রত্যাশিত কাজও তিনি করে এলেন. ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে যা ঠিক খাপ খায় না। শঙ্খ-শুভ্রকে নিকটবর্তী পোস্ট-অফিসে নিয়ে গিয়ে তার নামে হাজারখানেক টাকা জমা করে পাস-বইটা হাতে দিয়ে বলে এলেন, দরকার হয় তো খরচ করিস।

শঙ্খ-শুভ্রকে অবশ্য এক মাসের বেশি থাকতে হয়নি।

এই এক মাসের মধ্যেই সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল কিন্তু। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে 'ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারি' জপ করে শয্যাত্যাগ করতে, নিজের হাতে কাপড় কাচতে, বাসন মাজতে, গো-সেবা করতে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহ সূত্রগুলো আয়ত্ত করতে কষ্ট হত তার খুবই; কিন্তু সপ্তাহে যে দুখানা চিঠি সে বাড়িতে লিখত, তাতে তার আভাসমাত্র থাকত না। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হত তার এক সহপাঠীর আচরণে। শঙ্খ-শুভ্রের নিরীহ নম্র ব্যবহার, অভিজাতসুলভ ভদ্রতা, মূল্যবান কাপড় জামা বালিশ তোষক ছেলেটাকে হিংস্র করে তুলেছিল যেন। সে সুযোগ পেলেই আড়ালে শঙ্খ-শুভ্রকে অশ্লীল কথা শোনাতে অদ্ভুত অশ্লীল ভঙ্গীভরে। এমন সব অদ্ভুত অসভ্য কথা বলত, যা শঙ্খ-শুভ্র শোনেওনি কোনদিন। একদিন ছুরি চালিয়ে তার বালিশটা কেটে দিলে, কালি ঢেলে বিছানার চাদরে। শঙ্খ-শুভ্র কোন নালিশ করেনি এ নিয়ে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার, সকলকে ভালবাসবার। ঠাকুরদার স্বপ্নকে সফল করে তোলবার আগ্রহ সত্যিই জেগেছিল তার মনে। গায়ত্রী পাঠ করবার সময় সত্যিই সে মনকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে বরেণ্য সবিতার জ্যোতি কল্পনানেত্রে দেখবার চেষ্টা করত। পরিবর্তিত অবস্থায় পড়ে শুধু সে যে নুয়ে পড়েনি তা নয়, ওই আদর্শে ওই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিতও হয়েছিল, এবং হয়তো তার জীবন ওই ছাঁচেই ঢালা হয়ে যেত, যদি না বাসন্তী হঠাৎ এসে হাজির হত সে সময়।

বাসন্তীর মামা যেই সিভিল সার্জন হয়ে বদলি হয়ে এলেন কাশীতে, অমনই বাসন্তী এসে হাজির হল একদিন। যে কারণে শঙ্খ ঠাকুরদার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণে তাকে বাসন্তীর প্রস্তাবেও রাজী হতে হল, এবং তখন যদিও তার স্পষ্টভাবে বোঝবার বয়স হয়নি, তবু আভাসে সে অনুভব করেছিল বোধ হয় যে, নিজের অন্তরতম আদর্শকে অক্ষত রাখতে হলে ভদ্রতা নামক সর্বরঞ্জন সুকুমার বৃত্তিটিকে মনের সদর থেকে সরিয়ে দুর্মুখ দুর্ধর্ষ কোন দরোয়ান সেখানে বসানো প্রয়োজন। সারাজীবন ধরে সে এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেনি। ভদ্রতার খাতিরে অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়েছে বার বার।

বাসন্তী এসে তাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বললে, তোকে পেটব্যথার ভান করতে হবে।

শঙ্খ বিস্মিত হয়ে গেল।

সে কি! পেটব্যথার ভান করতে হবে কেন?

অসুখের ভান না করলে তোকে নিয়ে যাই কি করে এখান থেকে? তোর ঠাকুরদাকে চিনিস তো!

নিয়ে যাবে কেন? আমার বেশ তো লাগছে এখানে। গুরুদেব গুরুমা দুজনেই খুব ভালবাসেন, যত্ন করেন। আমার কিছু তো কষ্ট হয় না।

কিন্তু আমার যে বড্ড কষ্ট হয় বাবা, তোকে ছেড়ে থাকতে। সে আমি পারব না।

বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে কি যে একটা বেজে উঠল, শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত বিরুদ্ধতা অবলুপ্ত হয়ে গেল নিমেষে। মায়ের চোখের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল সে। চোখে জল টলটল করছে।...স্বয়ং সিভিল সার্জন যখন বললেন যে, কাশীর জল-হাওয়া এ ছেলের সইবে না, তখন হিন্দু আদর্শের অজুহাতে শঙ্খ-শুভ্রকে মথুরামোহন আটকে রাখতে সাহস করলেন না। হংস-শুভ্রেরও আপত্তি করবার পথ রইল না আর। পারিবারিক আবহাওয়া অনুকূল থাকলে হংস-শুভ্র হয়তো কলকাতা শহরে কোন টোল বার কবতেন বা সৃষ্টি করতেন, কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্রের ওপর মর্মান্তিক চটে ছিলেন তিনি তখন। এত টাকা লোকসান দিয়েও ছেলেটার চৈতন্য হল না, আবার আমলকির মোরব্বা করে বিলেতে চালান দেবার আয়োজন করছে! মানা করলে শুনবে না। ওর কোন সংস্রবেই আব থাকবেন না তিনি। শঙ্খ নির্বিবাদে এসে হিন্দু স্কুলে ভরতি হয়ে গেল। হংস-শুভ্র টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না।

।। দুই ।।

যথাসময়ে হিন্দু স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে শঙ্খ-শুভ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ঢুকল এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাস করতে লাগল সসম্মানে। কিছুদিন পরে হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করলে নিজেকে। নানাবিধ সহপাঠীর সংস্রবে এসে নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাত আহত-প্রতিহত হয়ে বহু প্রকার আলাপ-আলোচনা শুনে, হরেক রকম বই পড়ে, পারিবারিক আনন্দ উত্তেজনার দোলায় দুলে, ব্যক্তিগত হর্ষ-বিষাদের কারণ অনুসন্ধান করতে করতে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন নিজের জগৎ তৈরি করছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে, সে জগতে সে ছাড়া আর কেউ নেই—সেখানে নিজেই সে নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রিত। সেখানকার আকাশ বাতাস ফুল পাখি, রঙ রূপ সুর, সবই তার নিজের সৃষ্টি, বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে, নিদারুণ ভিড় এবং কলরবের মধ্যেও সে তার এই স্বতন্ত্রলোকে নির্জনবাস করছে।... কলেজের কমন-রূমে হৈ-হৈ করছে যখন সবাই মোহনবাগানের খেলা নিয়ে, ডিবেটিং ক্লাবে মার্ক্সিজমের সপক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে যখন, নন-কো-অপারেশনের উত্তেজনায় সমস্ত কলেজ যখন আন্দোলিত, তখন শঙ্খ-শুভ্র সে-সবের মধ্যে থেকেও কেমন যেন অন্যমনস্ক। সব সময় অন্যমনস্ক থাকা সম্ভবপর হত না অবশ্য, আলোচনায় যোগ দিতে হতই, কিন্তু যা দু-চার কথা বলত সে, তা অত্যন্ত সাবধানে, অত্যন্ত অনাসক্ত অনাবদ্ধভাবে। ফরসা-জামা-কাপড়-পরা শৌখিন বিলাসীকে পায়ে হেঁটে কোন কর্দমাক্ত গলি যদি পার হতে বাধ্য করা হয়, তা হলে সে

যেমন কোঁচাটি তুলে সাবধানে এটা ওটা ডিঙিয়ে কাদা বাঁচিয়ে সেটা পার হয়ে যায়, শঙ্খ-শুভ্রও অনেকটা তেমনই করত। গলিটা কেমন তা ভাল করে দেখবার আগ্রহ হত না তার, গলিটা নোংরা---এ জ্ঞান মনে স্পষ্ট হবামাত্রই তার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে উঠত ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে। ভদ্রতার খাতিরে যদিও তাকে ঢুকতে হত মাঝে মাঝে নানা নোংরা গলিতে, কাদার ছিটেও লাগত মাঝে মাঝে গায়ে, কিন্তু গলি-জাতীয় সঙ্কীর্ণ নোংরামিকে কোন দিন প্রশ্রয় দেয়নি সে নিজের জগতে। পারতপক্ষে এড়িয়েই চলত ওসব। দলবদ্ধ জনতার জয়ধ্বনি মুখরিত অন্তঃসারশূন্য উৎসব অথবা সীমাবদ্ধ পরিচিত-গোষ্ঠির অতিশয় মামুলী আলাপ কোনটাই তার চিত্ত স্পর্শ করত না। জয়ধ্বনি-মুখরিত উৎসবগুলো ববং খানিকটা সহ্য করতে পারত সে---- অন্তঃসারশূন্য হলেও ওগুলো প্রাণের আবেগ-প্রসূত, এবং যা প্রাণের আবেগ-প্রসূত তা প্রাণকে খানিকটা স্পর্শ করেই; কিন্তু তথাকথিত বন্ধুবান্ধবদের তথাকথিত বিশ্রম্ভালাপ অসহ্য ছিল তার পক্ষে। টম্‌সন সাহেব মিস্টার চ্যাটার্জিকে কি বললেন, কার মোটরের রেডিয়েটার ফেটে কি হল, কে কোন্ কথা বলে কাকে থ করে দিয়েছে, অথবা কে কত সস্তায় চাল কিনতে পারে--- এই সব আলোচনার আবর্তে পড়লে সত্যিই কষ্ট হত তার। সবচেয়ে ভয় করত সে সেই সব নিরীহ লোককে, যারা দেখা হলেই হাসি-মুখে এগিয়ে আসে এবং শুরু করে----খবর সব ভাল তো, তারপর আছ কেমন বল। পালিয়ে আত্মরক্ষা করত সে। পালিয়ে যেত সেই জগতে, সেখানে একটা বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সিগারেট নীরবে জ্বলছে পছন্দ-করে কেনা হোল্‌ডারটি মুখে, বিশেষ ধরনের চা ধূমায়িত হচ্ছে চাঁপারঙের পেয়ালাটিতে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কবি গ্রন্থকার চিত্রকার বিশেষ ধরনের জীবন-দর্শনে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন সেখানকার বিশিষ্ট মানসিকতাকে, যেখানকার নির্জন নিঃসঙ্গতা মধুর হয়ে ওঠে কল্পনার সাহচর্যে, যেখানে বিশেষ একটু বন্ধুর সামান্য একটু হাসি বা ছোট্ট একটু কথা আলোক-রেখা বা শিশির-বিন্দুর মত পরিস্ফুট করে তোলে প্রাণ-পুষ্পকে। এই কাম্য জগতে সে আবিষ্কার করলে নিজেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকবার কিছুদিন পরেই।

....এবং তার কিছুদিন পরেই সেই জগতের দ্বারে এসে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু করে দিলেন মহাত্মা গান্ধীর দল এবং সে দলের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান--অপর কেউ নয়, তার নিজের কাকা। মৃগাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য নিজে মুখ ফুটে বাড়ির কাউকে কিছু করতে বলেননি। কিন্তু তাঁর অশরীরী আত্মা নীরব ভাষায় যা বলছিল, শঙ্খ-শুভ্রের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর আবেদন যে একেবারে তার চিত্ত স্পর্শ করেনি, তা নয়। প্রথমে শ্রদ্ধাই হয়েছিল।

সে স্বতন্ত্র জগতে একক বাস করত বলে যে পৃথিবীর আর সকলকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, তা নয়। বরং ঠিক তার উল্‌টো। ট্রেনে সহযাত্রীদের বাক্স-বিছানা সম্বন্ধে অধিকাংশ ভদ্রলোকের যে মনোভাব, তারও ঠিক সেই মনোভাব ছিল সকলের সম্বন্ধে, এমন কি নিজের পরিজনদের সম্বন্ধেও। সে মনোভাব ঠিক অবজ্ঞা নয়, ঠিক ঔদাসীন্য নয়, তা শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্যবদীর মনোভাব। যদি কোন কারণে অপরের সুট্‌কেসের ডালা খুলে যায় এবং তার প্রতি অনিবার্যভাবে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হলে সেদিকে যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করবে, তা অবজ্ঞার দৃষ্টি নয়, কৌতূহলের দৃষ্টি। তার সঙ্গে সম্ভ্রম থাকাও সম্ভব। কিন্তু কোন কারণেই সে অপরের সুট্‌কেস হাঁটকাবে না, কিংবা নিজের সুট্‌কেসের জিনিসের সঙ্গে পরের সুট্‌কেসের জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলবে না, কিংবা উচ্ছ্বসিত হয়ে অপরের সুট্‌কেসের নকলে নিজের

সুটকেসের চেহারা বদলে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তার মন যেমন সজাগ, অপরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সে তেমনই সশ্রদ্ধ। নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঢাক পেটাতে তার যেমন লজ্জা, অপরের বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত করতে তার তেমনই সঙ্কোচ। প্রকৃতির প্রত্যেক সৃষ্টিই যে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত, প্রত্যেক মতবাদের মূলেই যে কিছু-না-কিছু মহৎ প্রেরণা আছে--এ কথা সে যেমন স্বীকার করত, তেমনই এ কথাও সে মনে মনে জানত যে, তার স্বকীয় মহিমা, স্বকীয় মতবাদও তুচ্ছ নয়, তা বর্জন করে অপরের মহিমা অপরের মতবাদ গ্রহণ করলে কিছুতেই তার জীবন সার্থক হবে না। তাই ইতরের মত হুড়োহুড়ি করে সে যেমন নকলও করতে যেত না, ইতরের মত হৈ-হৈ তর্ক করে নিজেকে জাহির করবার দুরন্ত আগ্রহে অপরকে নিষ্প্রভ করে দেবার প্রবৃত্তিও তার হত না কখনও। বরং নিজের রুচির সঙ্গে নিজের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত। তাই বলে তার অন্তরলোকে যে বাণীমূর্তি সে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল, তার মুকুটে যে কোন চকচকে রত্ন বহুমূল্য বলে লাগিয়ে দিলেই যে তার তৃপ্তি হত তা নয়, সামান্য পালকেও তার মন ভরে উঠত যদি মুকুটের সঙ্গে ঠিক মানিয়ে যেত সেটা।

ছন্দ-পতন হল বলেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে গিয়ে ফিরে এল সে। চারদিকে যখন স্কুল-কলেজ বয়কট চলছে, কলেজের গেটে গেটে যখন পিকেটিঙের ধুম, তখন সে কলেজে যায়নি বিদেশী শিক্ষা বর্জন করা উচিত মনে করেছিল বলে নয়--যায়নি ইতরামি এড়াবার জন্যে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ কলেজ যাওয়া নিয়ে একটা নাটকীয় কাণ্ড করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তার, মনে হয়েছিল, এর চেয়ে কামাই করে জরিমানা দেওয়া বরং ভাল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে কিন্তু চরকা ঘোরাতে গিয়েছিল সে সত্যিকার প্রেরণা নিয়ে। সত্যিকাব প্রশ্ন জেগেছিল মনে। কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্র নিজেই অজ্ঞাতসারে তার সে প্রেবণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন একদিন। তর্কপ্রসঙ্গে তাঁর এক বন্ধুকে যখন বললেন তিনি যে, চরকা চালানোই এখন আমাদের একমাত্র পথ, নিরস্ত্র জাতের পক্ষে এই এখন প্রুডেন্স্, তখন—প্রুডেন্স্ কথাটা শোনামাত্রই তার মনে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ব্লেকের একটা লাইন মনে পড়ে গেল— "Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity"....আলোটা টপ করে যেন নিবে গেল হঠাৎ। চরকা যদি এই হীনতার প্রতীক হয়, তা হলে চরকার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া সব দুয়ার এঁটে বন্ধ করে দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে বর্জন করলেই কি আমাদের ভারতীয়ত্ব বেশি করে ফুটবে? সে ছেলেবেলায় টিকি রেখে সন্ধ্যাহ্নিক করতে শিখেছিল, এখনও তার টিকি আছে, এখনও সে সন্ধ্যাহ্নিক করে, ভাল লাগে বলেই করে। নির্জন ঘরে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বসে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে অনন্ত কল্পলোকে উড়ে বেড়াতে ভাল লাগে তার, বিশেষ বিশেষ মূর্তিকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত রকম আনন্দ পায় সে। অনেক উপহাস অনেক ব্যঙ্গ সহ্য করেও তাই সে এখনও আঁকড়ে আছে এসব—ভারতীয় বলে নয়, ভাল লাগে বলে। কি এসে যায় অপরের উপহাসে বা ব্যঙ্গে। সে সিগারেট খায়, চা খায়। বাঁধা গতের সঙ্গে মিলত থেলো হুঁকোয় তামাক এবং পাথরের গ্লাসে গুড়ের শরবত খেলে---আরও বাহবা পেত হয়তো জুতো না পরে খড়ম পায়ে দিলে। কিন্তু বাঁধা গতে 'সংগত' করে সকলের কাছে হাততালি পাওয়াই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়—বস্তুত, তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই নেই, নিজের জীবন নিজের মত করে যাপন করতে চায় সে কারও কাছে কোনও

কৈফিয়ত না দিয়ে। গীতা-উপনিষদের সঙ্গে বায়রন-কীট্‌স কেন পড়ছে— এ জবাবদিহি করবার হীনতা সে কিছুতেই স্বীকার করবে না, বায়রণ-কীট্‌স বিদেশী বলে তাদের ত্যাগও সে করতে পারবে না। বিদেশী বর্জনের ওই আস্ফালনের মধ্যেই একটা হীনতা আছে। কোনরকম হীনতার সংস্পর্শে এলেই মনের সমস্ত আনন্দ ম্লান হয়ে যায় যেন। প্রুডেন্স্‌-এর জন্যে চরকা চালাতে হবে শুনেই শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত উৎসাহ নিবে গেল। আর একটা হেতু গোড়া থেকেই তার মনকে বিরূপ করে রেখেছিল। যে কোন হাল্লা-হৈ-চৈ-আস্ফালন-আড়ম্বর পীড়াদায়ক মনে হত তার কাছে। আমরা স্বদেশী, আমরা আত্মিক-শক্তি-সম্পন্ন, আমরা অহিংস, আমরা সত্যাগ্রহী--আপিসে-আদালতে দোকানে দোকানে কলেজের গেটে গেটে পতাকা ঘাড়ে করে সেটা সগর্জনে প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটা নোংরামি আছে, সে অনুভব করত। তবু মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে সে গিয়েছিল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ। কিন্তু ফিরে আসতে হল; মন কিছুতেই পাখা মেলতে চাইল না। কতকগুলি বাঁধা বুলি আউড়ে ব্রাহ্মণত্বের ভড়ং করে অতি স্থূল আধিভৌতিক সংগ্রামে লিপ্ত হবার উৎসাহে মোটেই পেলে না সে। অহিংস সত্যাগ্রহের নানারকম ব্যাখ্যা শুনেও এ বিশ্বাস তার মন থেকে কিছুতে ঘুচল না যে, ওটা বিপক্ষকে জব্দ করার ফাঁদ মাত্র এবং অনন্যোপায় হয়ে সে ফাঁদ পাতা হয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। তার মনে হল, যীশুখ্রীষ্টের প্রেমের বাণীকে সেণ্ট্‌ পল যেমন ক্রিশ্চানিটিতে পরিণত করেছিলেন, বুদ্ধ-চৈতন্যের অহিংসা-নীতিকে মহাত্মাজী তেমনই রাজনীতিতে পরিণত করতে চান। সেণ্ট্‌ পলের ক্রিশ্চানিটির ওপর তার যেমন শ্রদ্ধা ছিল না, এর ওপরও তেমনই কোন শ্রদ্ধা হল না। কিন্তু না হলে কি হবে, চরকা তবু ঘোরাতে হল কিছুদিন। হঠাৎ ছেড়ে চলে আসতে ভদ্রতায় বাধল কেমন যেন। তা ছাড়া মাও আসতে দিলে না। কাশীতে বাসন্তী যেমন তাকে মিথ্যাচারণ করতে বাধ্য করেছিল, এখানেও ঠিক তেমনই করলে। মা তাকে এমন বিপদে ফেলে মাঝে মাঝে! অথচ মায়ের মুখের দিকে চাইলে তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবার শক্তিই যেন হারিয়ে ফেলে সে। বস্তুত, কারও সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করবার শক্তি তার নেই। রুচি বিরুদ্ধ হলেও পরের অনুরোধে বারম্বার তাকে এঁদো গলিতে ঢুকতে হয়েছে। মাসখানেক চরকা ঘোরাবার পর তার ক্লান্ত মন যখন চরকা-পর্বে যবনিকা-পাত করবার আয়োজন করছে, তখন হঠাৎ বাসন্তী একদিন বলে বসল, তুই তবু ছোট কাকার মান রক্ষে করেছিস বাবা। আর তো কেউ চরকা ছুঁলেও না।

আমিও আর পেরে উঠছি না।

তা বলে তুমি থামতে পাবে না। মন ভেঙে যাবে তা হলে বেচারীর। কাল তোর কত প্রশংসা করছিল আমার কাছে।

শঙ্খ-শুভ্র সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে সসঙ্কোচে চুপ করে গেল।

মনে হল, মা যদি আবার বলে দেন, কষ্ট পাবেন তিনি। আসল কথাটা না বলে ইতস্তত করে বললে, ভাল লাগছে না খুব।

তা হোক। একটু-আধটু চরকা ঘোরালে কি আর এমন কষ্ট হবে তোমার? ঠাকুরপোর মনে কত বড় একটা গর্ব যে, তুই রোজ চরকা কাটিস। বাসন্তীর প্রশংসা-লোলুপ মন কিছুতেই থামতে দিলে না শঙ্খ-শুভ্রকে। যদিও তার নিজের জগতে চরকার ঘর্ঘর-ধ্বনিকে সে ঢুকতে দিলে না, কিন্তু বাইরের জগতে ভদ্রতার খাতিরে রোজ তাকে চরকা কেটে যেতে হল দিনের

পর দিন। নিজের 'প্রিন্সিপল' আস্ফালন করে রজত বা হীরকের মত সরে থাকতে পারলে না সে কিছুতে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের জেল হবার পর সে যেন কারা-মুক্ত হল, এবং সহসা সন্দেহ-মুক্তও হল যেন। জেলে যাবার দিন কাকামণির যে মুখচ্ছবি দেখেছিল যে, তা অপরূপ। পুলিসের ব্যাটনের ঘায়ে ফাটা মাথায় রক্ত-ভেজা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, নাকটা থেঁতলে গেছে, মুখে কিন্তু কি প্রশান্ত হাসি! তার মনে হল, না না, ভুল করেছি বোধ হয়। এই তো বীরত্ব! এর মধ্যে লেশমাত্র হীনতা থাকতে পারে না। এ কথা স্বীকার করেও কিন্তু সে কাকার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে না। সেই কারণে পারলে না, যে কারণে সবুজ-রঙের পক্ষপাতী লোক চুনিকে ভাল পাথর স্বীকার করেও কেনবার বেলায় পান্না কেনে। তার মন যে আকাশে উড়ে আনন্দ পেত তা সাহিত্যের আকাশ, যে সমুদ্রে অবগাহন করে তৃপ্তি পেত তা রসের সমুদ্র। সে আকাশ, সে সমুদ্রে কোন গণ্ডি নেই, কোন সীমা নেই, কোন জাতিভেদ নেই। সেখানে গল্‌স্‌ওয়ার্দি, শেক্‌স্‌পিয়র, কালিদাস, ভল্‌টেয়ার, গেটে, ভার্জিল, চণ্ডীদাস, ইয়েট্‌স, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রেমব্রাণ্ট, র‍্যাফেল অবলীলাক্রমে এক পংক্তি-ভোজনে বসতে পারেন, রসস্রষ্টা সাহিত্যিক গান্ধীরও সেখানে অবাধ গতি। কিন্তু যে গান্ধী সি. আর. দাশকে হারিয়ে দেবার জন্যে ভোটারদের সহযোগিতা কামনা করেন, লেফ্‌ট উইংকে নিষ্প্রভ করে দেবার জন্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি থেকে লম্ফ দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে উপনীত হন, যাঁর নেতৃত্বে ভাড়া-করা ভলাণ্টিয়ায়ের দল অহিংসার ভড়ং করে বেড়ায় যেখানে সেখানে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানকে মেলাবার জন্যে যিনি তুরস্ক দেশীয় খিলাফতের সহায়তা নিতে ইতস্তত করেন না--সেই মহাত্মা-নামধেয় কৌশলী গান্ধীর সঙ্গে—তাঁর অতি বিশুদ্ধ স্বদেশ-হিতৈষণা সত্ত্বেও তাঁর মহত্ত্ব বীরত্ব আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিয়েও—শঙ্খ-শুভ্র কিছুতেই নিজের সুর মেলাতে পারেনি। এ নিয়ে কোন কলহ বা আস্ফালন সে করেনি, সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে মাত্র। যে জগৎ তার মানস-লোক, সে জগতেও মানুষের সুখ-দুঃখ আশা নিরাশা আনন্দ-উদ্বেগ সবই আছে—তা মানুষেরই জগৎ—কিন্তু তা কোন এক বিশেষ দেশের মানুষের নয়। সে জগতেও উদারতা প্রশংসনীয়, কিন্তু তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিশেষ রকম ছাপ-মারা উদারতা নয়, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারবাসীর দুর্দশায় তা অবিচলিত থেকে গুর্জরবাসী চাষার দুর্দশায় তা বিচলিত হয় না শুধু, সে উদারতা সর্বজনীন সহজ সহৃদয় উদারতা—স্বয়ম্প্রভ, স্বতঃস্ফূর্ত সহজবেদ্য; ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এই উদারতা যখনই সে দেখেছে, তখনই তার অন্তর জয়ধ্বনি করে উঠেছে। কিন্তু তাঁর 'ইনার ভয়েস'-এর বিচিত্র আচরণে আবার কেমন যেন অস্বচ্ছ হয়ে গেছে সব—এমন কথাও মনে হয়েছে, লোকটা ভণ্ড নয় তো! অর্থাৎ শঙ্খ-শুভ্র ন্যাশনালিস্ট্‌ নয়, কবি; রাজনৈতিক নয়, সাহিত্যিক। দেশকে সে যে ভালবাসে না, তা নয়; খুবই বাসে, তার স্বাধীনতার স্বপ্নের সুনির্দিষ্ট কোন রূপ নেই। পত্রান্তরালচারিণী সুর-স্বরূপিণী নাইটিংগেলের প্রতি কীট্‌সের যে মনোভাব, স্বাধীনতার সম্বন্ধে শঙ্খ-শুভ্রেরও অনেকটা সেই মনোভাব যেন। তা অরূপা, অলব্ধা, কল্পলোকবিহারিণী। তা রূপ ধরে আছে আদর্শের যে উর্ধ্বলোকে, সেখান থেকে তাকে নাবিয়ে আনতে চায় না সে। তার আশা, নিজেই সেখানে সে যাবে একদিন। আকুল আগ্রহে তাকে পেতে চায়, কিন্তু কোন রকম নোংরামির মধ্যে দিয়ে নয়।

"Away! away! for I will fly to thee

Not charioted by Bacchus and his pards
But on the viewless wings of poesy
Though the dull brain perplexes retards."
এ স্বপ্ন অনবদ্ধ নিষ্কলুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা—
"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার,
আমি পাই না তোমারে।"

শঙ্খ-শুভ্র কবি বটে, কিন্তু অদ্যাবধি একটিও কবিতা লেখেনি সে। চমৎকার যে খাতাখানা কিনে এনে রেখেছিল, তার সবগুলো পাতাই সাদা আছে এখনও। কি লিখবে? যে মেয়েটিকে তার ভাল লেগেছিল, সে আলেয়ার মত সরে গেল। যে বন্ধুটি প্রাণে সুর তুলেছিল, সে মরে গেল হঠাৎ একদিন। তা ছাড়া যা কিছু ধরতে যায়, ছুঁতে যায়, হাতে কালি লাগে। সাবান দিয়ে সে কালি ওঠাতেই অবসরটুকু কেটে যায়। হতাশা বেদনা কালি আর সাবানের কবিতা সে লিখবে না! মনের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে আসে মাঝে মাঝে—আসে, আবার চলে যায়। ভাষার ফাঁদ পেতে তাদের ধরতে ইচ্ছে করে না, ভয় হয়, ডানা খসে যাবে, রঙ ঝরে যাবে, মরে যাবে হয়তো....। কোন্ পথে তারা নিজে এসে ধরা দেবে, তারই সন্ধান সে করে স্বপ্নাতুর নয়নে আপন নিভৃত জগতে বসে বসে। একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে, প্রতীক্ষা করে। ভয় হয়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মত পরশমণি পেয়েও হয়তো সে হারিয়ে ফেলবে অন্যমনস্ক হয়ে। উন্মুখ সমনস্কতা সব সময়ে বজায় থাকে না যে! বাইরের জগতে নিরন্তর কলরব, কোলাহল উঠছেই। একটু ফাঁক পেলেই কাব্যকুঞ্জে দুদ্দাড় করে এসে হাজির হয় মত্ত মাতঙ্গ, তাকে সামলাতেই সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—নিমেষের মধ্যে সব তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। এই মত্ত মাতঙ্গদের এড়াবার সামর্থ্য নেই তার। এসে পড়লে ভদ্রতা করে চেয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হয় এবং তাদের শুষ্ক আস্ফালন শুধু দেখতে হয় নয়, দেখে মুগ্ধ হয়েছি—এ ভাবও চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তা ছাড়া মত্ত মাতঙ্গ সব সময় যে বাইরে থেকে আসে তা নয়, পরিবারের মধ্যেও মত্ত-মাতঙ্গের অভাব নেই। রজত একদিন হুড়মুড় করে এসে হাজির হল। বাঁ হাত দিয়ে অ্যাশ-ট্রেটাকে টেবিলের কোণ থেকে সরিয়ে দিলে—খানিকটা ছাই যে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, সেদিকে লক্ষ্যই করলে না—টেবিলের কোণটাতে বসে তার শৌখিন মালক্কা বেতের চেয়ারের হাতলে স্যাণ্ডাল-সুদ্ধ পা-টা তুলে দিয়ে উদ্ভাসিত চক্ষে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, বুঝলে দাদা, ভোটে জিতেছি। তোমাকেই এবার আমাদের অ্যাথ্লেটিক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হতে হবে।

শঙ্খ-শুভ্র বিন্দু-বির্সগ কিছুই জানত না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। মনে ঈষৎ আতঙ্কের সঞ্চার হল। বুক-পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে রজত বললে, এই কাগজটায় সই করে দাও—এইখানটায়।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু অধৈর্যভরে রজত-শুভ্র টেবিলের কোণটায় বাগিয়ে বসতেই সে তাড়াতাড়ি নিজের ফাউন্টেন-পেনটাকে সরিয়ে নিলে টেবিল থেকে।

হরেনবাবু এবার প্রেসিডেন্টশিপ থেকে রিটায়ার করেছেন, শুনেছ তো?

শঙ্খ কিছুতেই শোনেনি। চুপ করে রইল।

রজত বলতে লাগল, বিজন জগদীশবাবুকে প্রেসিডেন্ট করবে বলে খাড়া করেছিল। জগদীশবাবুকে! লোকটা চিঁ-চিঁ করে কথা বলে—এক নিশ্বাসে দুটো কথা বলবার ক্ষমতা নেই। আমি তাই বিশুকে দিয়ে তোমার নামটা প্রোপোজ করিয়েছিলাম—ভোটে আমরা জিতেছি।

শঙ্খ মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও রজতের মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে পারলে না। অনেক ক্লাবেই সে নিয়মিত চাঁদা দেয়, রজতের ক্লাবেও দেয়। স্কুলে পড়বার সময় স্বাস্থ্যচর্চাও করেছিল অবশ্য কিছুদিন; কিন্তু তাই বলে স্বাস্থ্যচর্চা-সমিতির পাণ্ডাগিরি করবার কল্পনাও সে করেনি কখনও। কিন্তু রজতকে থামানো শক্ত। তবু একটু ইতস্তত করে বললে, আমি কি তোমাদের প্রেসিডেন্ট হবার উপযুক্ত? আমাকে কেন—

বাঃ, তুমি হলে ভাদুড়ী-মেডেল উইনার। তা ছাড়া ইংরিজীতে ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট। তোমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত লোক আর কে আছে?

স্কুল-জীবনে সে একবার ভাদুড়ী-মেডেল পেয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্টও হয়েছে।

কিন্তু ওসব তো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমাকে আর ওসবের মধ্যে টানছ কেন?

করুণ দৃষ্টিতে সে রজতের দিকে চাইলে।

না না, সেসব শুনব না, সই করে দাও।

সই করে দিতে হল। শুধু তাই নয়, 'কাব্যে অভিনবত্ব' নাম দিয়ে সে যে প্রবন্ধটা লিখবে ভেবেছিল, তার মালমসলা সরিয়ে রেখে 'স্বাস্থ্যচর্চা' নামে নতুন একটা প্রবন্ধ ফাঁদতে হল কিছুদিন পরে। শুধু ফাঁদতে হল নয়, মাততে হল তা নিয়ে। কোন জিনিস অসম্পূর্ণ করে করা তার স্বভাব নয়। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য হলেও সেটা সুন্দর করে করাই তার স্বভাব। তাই প্রবন্ধে শুধু অ্যাকিলিস অ্যাগমেম্‌নন ভীম অর্জুন থেকে শুরু করে আশানন্দ-গামা গোবরের ফর্দ দিয়েই ক্ষান্ত হল না, দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জাতির স্বাস্থ্যও যে কিরূপ জড়িত, এমন কি সাহিত্যও যে স্বাস্থ্যেরই বিকাশ, তা নানা উদাহরণ-সম্বলিত করে লিখতে হল তাকে। লিখতে লিখতে এমন তন্ময় হয়ে গেল যে, নিজেরই মনে হতে লাগল, স্বাস্থ্যচর্চা করাই সম্ভবত মানব-জীবনের একমাত্র কর্তব্য। প্রবন্ধ শেষ হয়ে যাবার পর অনুতাপও হল—ছি ছি, বাজে জিনিস লিখে অনেক সময় নষ্ট হল! রজতের ওপর রাগও হল একটু। কিন্তু কারও ওপর রাগ করে থাকা তার স্বভাব নয়, বিশেষতঃ রজতের ওপর। তার যে রূপটা চোখে পড়ে, তা এমন বলিষ্ঠ এমন আবেগময় এমন দৃপ্ত যে, তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। কি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ছবি-আঁকায় মন দেবে না। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজে ব্যাপার নিয়ে। পুলিসের সন্দেহ, ও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নাকি! হতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। সব দোষ সত্ত্বেও কিন্তু এমন একটা কি আছে ওর মধ্যে যা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না—সতেজ প্রদীপ্ত প্রাণবান নির্ভীক কি একটা যেন। একটা ছবি শঙ্খ-শুভ্র কখনও ভুলবে না। কিছুদিন আগে একবার রজত হীরক আর সে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল এক জায়গা থেকে। পায়ে হেঁটেই ফিরছিল। সে একটু এগিয়ে এসেছিল। হীরক আর রজত পেছনে ছিল। কড়েয়ার

কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ চার-পাঁচজন গুণ্ডা এসে ঘিরে ধরলে তাকে। আংটি বোতাম ঘড়ি খুলে দিতে বললে। শঙ্খ যে দুর্বল তা নয়, মারামারি করলে হয়তো ও ওদের দু-একজনকে ঘায়েল করতে পারত, কিন্তু মারামারি জিনিসটার ওপর ওর বরাবর বিতৃষ্ণা, ভাব ছিল, কি করা যায়—আংটিটা খুলে দিয়ে দেব নাকি—এমন সময় রজত আর হীরক এসে পড়ল। সেই গুণ্ডার দলে রজতের যে সিংহমূর্তি সে দেখেছিল সেদিন, তা ভোলবার নয়। গুণ্ডাগুলো সহজে রণে ভঙ্গ দেয়নি, রীতিমত লড়েছিল। কিন্তু রজতের কাছে তারা দাঁড়াতে পারেনি। তাদের একজন ছোরাও বার করেছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে জুজুৎসুর এক প্যাঁচে রজত ছোরাটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে এবং যুগপৎ ঘুষি আর লাথি চালিয়ে ঘায়েল করে ফেললে দুটো লোককে। 'বাপরে' বলে শুয়ে পড়ল তারা, বাকিগুলো পালাল উর্ধ্বশ্বাসে। হাতের খানিকটা কেটে গিয়েছিল, নির্বিকারভাবে তাতে রুমালটা বেঁধে একটু ঝুঁকে ভূশায়ী লোক দুটোর দিকে চেয়ে বললে, না, মরেনি ব্যাটারা। চল, এবার যাওয়া যাক, পুলিস মহাপ্রভুরা আসবেন এইবার। যেন কিছুই হয়নি।

রজত যদিও নিজের বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় সাধারণতঃ, কিন্তু মাঝে মাঝে আঁধির মত আচমকা এসে শঙ্খ-শুভ্রের সাজানো বাগান ওলট-পালট করে দিয়ে চলে যায় সে। হীরক বড় একটা ঘেঁষে না। কিন্তু সেও অস্বস্তিজনক। সে তার মার্কস্ এবং এংগেল্স, ডাংগে এবং নরিম্যান, জওহরলাল এবং যোশী নিয়ে নিজের জগতেই থাকে। অত্যন্ত বেশি নীরব হয়ে থাকে বলে কেমন যেন ভয় করে তাকে। তার যে বিশেষ কোন একটা মতবাদ আছে, তা জানাই ছিল না কারও। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সে একটা মিলের কুলিদের ধর্মঘটের নেতা হয়েছে। তাদের মাইনে বাড়িয়ে তবে ছাড়লে। অথচ বাড়িতে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক দূরে থাক্, একটি কথাও বলে না। চুপচাপ আসে, চুপচাপ থাকে। বাবা একদিন বকলেন, হাসিমুখে চুপ করে রইল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল শুধু। কিন্তু মনে হল, সে দৃষ্টিতে জ্বালা নেই, ব্যঙ্গ নেই, আছে আত্মপ্রত্যয়। একটু করুণার এবং ক্ষমার আভাসও আছে বলে মনে হল। তার ভাবটা যেন—তোমরা কেন যে বুঝতে পারছ না বা বুঝতে চাইছ না, তা আমি জানি; কিন্তু এও আমি জানি যে, একদিন তোমাদের বুঝতে হবেই। তখন তোমাদের যে কি দশা হবে, তাই ভেবে কষ্ট হচ্ছে আমার। যখনই কেউ বকে তাকে, তার চোখে এই দৃষ্টি ফুটে ওঠে। তার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির এই অমোঘ অর্থ অনুভব করে শঙ্কিত হয়ে পড়ে শঙ্খ-শুভ্র। তার নিজের জগতে কেমন যে ছায়া নামতে থাকে, ফুল ঝরে যায়, প্রজাপতি উড়ে যায়....মনে হয়, কোদাল কাস্তে হাতুড়ি শাবল নিয়ে পিলপিল করে ঢুকছে যেন চাষাভুষো কামার-কুমারের দল...ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের ছবিটা মনে পড়ে...মনে পড়ে রাশিয়ার বিদ্রোহ। হীরকের শত্রু বলে মনে হয়। তখনই আবার মনে হয়, হীরক—আমাদের হীরু—সে কি শত্রু হতে পারে? কিন্তু সে কি যে হতে পারে আর কি যে হতে পারে না, তা বোঝবার উপায় নেই—সে দূরে দূরে থাকে, কাছে ঘেঁষে না।

ইন্দু-শুভ্রাও পরিবারের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী, যার চলাচলন আচার ব্যবহার কথাবার্তার মধ্যে কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে শঙ্খ-শুভ্র। ছোট পিসি যে নিষ্ঠাবতী বিধবা, তার রাজনৈতিক মতামত যে একটু উগ্র রকমের স্বদেশী, এই কথাই জানা ছিল তার। হঠাৎ সেদিন মেছুয়াবাজারে নজরে পড়ল, এক ট্যাক্সিতে এক পুলিস অফিসারের পাশে ইন্দু-

শুভ্রা বসে আছে। তার চোখ মুখ দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে প্রেমবিহ্বলতা বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু তা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে! ভূমিকম্প হলে মনের যেমন অবস্থা হয়, শঙ্খ-শুভ্ররও ঠিক তেমনই হল। আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়ল এ কথা কাউকে বলতে পারলে না বলে। মায়ের কাছে প্রায়ই কোন কথা গোপন করে না সে, কিন্তু এ কথাটা বলতে বাধল। ইন্দু-শুভ্রার প্রদীপ্ত মুখখানা মনের মধ্যে প্রেতের মতন ঘুরে বেড়াল কয়েক দিন। রাত্রে ঘুম হল না। একদিন দমদমে চলে গেল। গিয়ে দেখল, ইন্দু-শুভ্রা কোণের ঘরটাতে বসে নিবিষ্ট চিত্তে কানাইলালের জীবনী পড়ছে। পরনে সাদা থান, মাথার চুল রুক্ষ। মেছুয়াবাজারের ছবির সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই। সে ঘরের ভেতর ঢুকল, বেরিয়ে এল, ইন্দু মুখ তুলে চাইলে না পর্যন্ত। একেবারে অন্য লোক যেন। দুটো ছবিই এত সত্য বলে মনে হল তার কাছে যে, কোনটাকেই অস্বীকার করতে পারলে না সে ফলে অস্বস্তি বাড়ল। দুটো ছবিকে মেলাতে পারলে না বলে অস্বস্তি। তার শুচি-বাই নেই। কুন্দ-শুভ্রার সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধাই আছে। বাড়ির লোক কেউ যদিও কুন্দ-শুভ্রার নামোচ্চারণ পর্যন্ত করে না, কিন্তু তারাপদর কাছে কুন্দ-শুভ্রার গল্প শুনেছে সে একদিন লুকিয়ে। এক মুসলমান ওস্তাদের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে চলে গেছেন তিনি। শঙ্খ-শুভ্র মাঝে মাঝে ভাবে, এর জন্যে বাড়ি সুদ্ধ সকলের এত লজ্জা কেন? প্রেমের জন্যে লজ্জা? তা হলে রাধাকৃষ্ণের ছবি ঘরে ঘরে টাঙিয়ে রাখার অর্থ কি? মুসলমান বলে লজ্জা? তা হলে সভায় সভায় কাগজে কাগজে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে এ আগ্রহ কেন? চলে গেছে বলে লজ্জা? সমাজে সম্মানের আসন না দিলে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? শঙ্খ-শুভ্র নিজের অন্তরে কিন্তু কুন্দ-শুভ্রাকে যে আসনে বসিয়ে রেখেছে, তা শ্রদ্ধার আসন। না, এসবের জন্যে নয়, ইন্দু-চরিত্রের রহস্য উদ্ভেদ করতে না পেরে মনে মনে উৎসুক হয়ে আছে সে, অস্বস্তি ভোগ করছে। তা ছাড়া এই জাতীয় কোন ঔৎসুক্য তাকে অন্যমনস্ক করে দিলে সে ভীতও হয়ে পড়ে। ভয় হয়, পরশমণিটা কখন হাতে এসে হয়তো চলে যাবে, কিংবা গেছে।...বর্হির্জগতেব রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও এই ধরনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কুশাঙ্কুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কন্টকিত করে তোলে তার নিভৃত জগতের নির্জন পায়ে চলার পথটিকে—যে পথটি মাঠের মাঝ দিয়ে, ঝাউবনের পাশ দিয়ে, নদীর আঁকে-বাঁকে চলে গেছে রূপকথা-লোকে। কিছুতেই এড়াতে পারে না সে এই কুশাঙ্কুরদের। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে হা-হুতাশ করতেও লজ্জা করে তার! নীরবে সহ্য করে সমস্ত! রাজনৈতিক মতামতকে আর সে তত ভয় করে না। ওদের এড়াবার মস্ত বড় একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছে সে। তর্ক করে না, সায় দিয়ে যায় স্মিত মুখে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে সে গান্ধী-ভক্ত, রজতের কাছে সে সুভাষ-পন্থী, হীরকের কাছে কমিউনিস্ট। হীরক অবশ্য কাছে আসে না বড় একটা। কিন্তু হীরক জাতীয় আরও অনেকে আসে। রাজনীতির ধ্বজা নিয়ে কেউ এলে নিজের মনটাকে সাময়িকভাবে জলবৎ করে ফেললেই গোল থাকে না আর। যখন যে পাত্রে ঢুকতে হয়, তখনই তার আকার ধারণ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সহজে। চেষ্টা করে মনকে যে জলের মত করতে হয় তাও নয়, জলের মতই স্বচ্ছ সাবলীল মন তার। পাত্র না থাকলে তা ঝিরঝির করে পড়ে নিজের নির্জন-লোকের পাহাড়ী ঝরনায় বয়ে যায় শুভ্র সিকতার উদার আবেষ্টনীর মাঝ দিয়ে অজানা সাগরের উদ্দেশ্যে।

তাতেও উপলখণ্ড পড়ে বাধা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে। যে দুটি উপল পর পর এসে

হাজির হল একদিন অনিবার্যভাবে, সে দুটি যেমন অনড় তেমনই দুরতিক্রম্য। তার সাধ ছিল, সারাজীবন সাহিত্যসাধনা নিয়েই থাকবে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করেই কাটাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে ভাল একটা অধ্যাপকের চাকরিও জুটেছিল, কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র বাধা দিলেন।

বললেন, চাকরি করতে হবে না, 'বিজনেসে' ঢোক। চাকরির মোহ ত্যাগ না করলে বাঙালীর ভদ্রস্থ নেই।

শঙ্খ-শুভ্র চুপ করে রইল। শশাঙ্ক-শুভ্র তার মুখের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে পাইপটা ধরিয়ে বললেন, এদিকে তো স্বাধীনতার লম্বা লম্বা 'লেক্‌চার' দিয়ে বেড়াও তোমরা, কিন্তু চাকরি করবার কোন সুযোগই তো ছাড়তে চাও না দেখি।

শঙ্খ-শুভ্র কোন দিনই স্বাধীনতা নিয়ে 'লেক্‌চার' দিয়ে বেড়ায়নি, কিন্তু নির্বাক হয়ে রইল সে। বাদ-প্রতিবাদ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। চাকরি করলেও যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে, তথাকথিত স্বাধীন ব্যবসায়ীরাই যে সত্যিকারের দাসখৎ-লেখা গোলাম—এ কথা তার মনে এল, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল না। বাবা শেষ পর্যন্ত কি বলেন, তাই শোনবার জন্যে সভয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল সে।

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, রজত ছবি আর গুণ্ডামি নিয়ে মেতেছে, হীরক লেনিন-ট্রটস্কি-স্টালিনের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছে। আমার আশা ছিল, বুড়ো বয়সে তোমার হাতে 'বিজ্‌নেসে'র ভারটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব। কিন্তু তুমি যদি চাকরি করবে ঠিক করে থাক, তাহলে আমাকেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ঘানি টানতে হবে। উপায় কি? কেবল দেখবার লোকের অভাবে আমলকীগুলোতে ছাতা ধরে গেল। আমি একা আর কত দিক দেখি!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, চাকরিতে মাইনে কত?

দুশো।

বেশ, আমিই তোমাকে মাসে দুশো টাকা দেব, আমারই কাজ কর তুমি। শাক্‌চিতে একটা 'নিগোশিয়েট' করতে হবে, কালই চলে যাও।

শশাঙ্ক-শুভ্রের গাম্ভীর্য ভেদ করে একটা চাপা হাসি ফুটে বেরুবার চেষ্টা করছিল। বাছাধন এইবার কি করেন দেখা যাক! শঙ্খ একটি কথারও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন, শঙ্খ প্রতিবাদ করবে ঠিক। রজত-হীরককে যেমন জোয়ালে জোতা গেল না, একেও যাবে না। চাকরি করবার ছুতোয় এও ঠিক ফসকে পালাবার চেষ্টা করছে। আসল উদ্দেশ্য—কাব্য করে বেড়ানো। কিন্তু টাকা না হলে যে আজকালকার জগতে কিছু হবার উপায় নেই এবং 'বিজনেস'ই যে সে টাকার মূল—এ কথা কিছুতে বুঝবে না আজকালকার ছোকরারা। শঙ্খ কোন প্রতিবাদই করলে না। মাসিক দুশো টাকা বেতন নয়, সাহিত্যই যে তার চাকরি নেবার প্রেরণা—এ কথা সে তার অতিশয়-বস্তুতান্ত্রিক পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে বিফলকাম হত, তা নয়। শশাঙ্ক-শুভ্র প্রতিবাদ প্রত্যাশাই করছিলেন মনে মনে। কিন্তু তাঁর একটা কথা শশাঙ্ক-শুভ্রের সমস্ত যুক্তিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল—'আমাকেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ঘানি টানতে হবে। উপায় কি?'—সে চুপ করে রইল।

শশাঙ্ক-শুভ্র আর একবার আড়চোখে তার দিকে চেয়ে একবার পাইপ ধরালেন। তা হলে কি ঠিক হল, শাকচি যাচ্ছ তো কাল?

বেশ।

শশাঙ্ক-শুভ্র পুত্রের এই সুমতিতে বাইরে খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন অবশ্য, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন একটু। সে রুখে দাঁড়ালে তিনি যেন খুশি হতেন। শঙ্খ চলে যাবার পর পাইপটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে তিনি ভাবলেন, ছেলেটা কেমন যেন গোবরগণেশ গোছের। 'বিজনেস' ও ঠিক পারবে কি?

দ্বিতীয় উপল এল বাসন্তী—বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

একটি মাত্র মেয়েকে একবার ভাল লেগেছিল তার, তাও দূর থেকে। অবিরাম সান্নিধ্যের সংঘর্ষে সে ভাল-লাগা বিবর্ণ হয়ে যায়নি। তাই ভাল লাগা ব্যাপারটা ঘিরে মনে মোহ ছিল। তার ধারণা ছিল, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, আলোর কাছে যেমন ছুটে আসে বিচিত্র-পক্ষ পতঙ্গ অজানা অন্ধকার থেকে, তার মনের টানে তেমনই আবির্ভূত হবে তার জীবনসঙ্গিনী অকস্মাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে। কোথায় কখন তা ঠিক নেই, এবং ঠিক নেই বলেই স্বপ্নটা আরও মধুর, প্রত্যাশাটা আরও মদির। দোকানে গিয়ে বাছাই করে জুতো জামা কেনার মত কুমারীদের হাটে গিয়ে সে পাত্রীনির্বাচন করবে না কখনও, করতে দেবেও না কাউকে। মানসী মূর্ত হবে নিজেই একদিন সহসা। সে আহরণ করবে না, অভ্যর্থনা করবে। বাসন্তীর প্রস্তাব শুনে স্বপ্নচারীর হঠাৎ জাগরণ হল যেন রূঢ় বাস্তব-লোকে। সব ঠিক হয়ে গেছে! হয়তো সে প্রত্যাখান করত—এই একটি বিষয়ে অন্তত নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখবার চেষ্টা হয়তো করত সে; কিন্তু ছোট দাদু এতে জড়িত আছেন শুনে তার উদ্যত রসনা সংযত হয়ে গেল। ছোট দাদুর সম্বন্ধে শঙ্খর যে দুর্বলতা আছে, তা অজ্ঞাত ছিল না বাসন্তীর। কতদিন কত আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে তার সঙ্গে। সোম-শুভ্রের চিঠিখানা বাসন্তী হাতে করেই এনেছিল। পাত্রীর মাতামহের সঙ্গে সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তিনি সোম-শুভ্রকে প্রথমে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, যদি তিনি বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারেন এই আশায়। উত্তরে সোম-শুভ্র যা লিখেছিলেন, তা মোটেই আশ্বাসজনক নয়। পাত্রী-পক্ষ ভিন্ন পথে গিয়ে হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক এবং বাসন্তীকে ধরে সফলকাম হন। কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে যাবার পর সোম-শুভ্রের চিঠিখানা তাঁরা দেখিয়েছিলেন শশাঙ্ক এবং বাসন্তীকে। বাকি ছিল শঙ্খর মত নেওয়া। বাসন্তী সোম-শুভ্রের চিঠিখানা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করলে।

সোম-শুভ্র লিখেছিলেন—

সুহৃদ্বরেষু, আপনার দৌহিত্রী শ্রীমতী তনিমার সহিত, শঙ্খ-শুভ্রের বিবাহ হইলে আমি অতিশয় সুখী হইব। কিন্তু আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে করা কঠিন—প্রায় অসম্ভব। যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করা তত কঠিন নয়, কারণ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইলে অপমানের বেদনাটা তেমন নিদারুণভাবে বাজে না, যেমন বাজে প্রত্যাখ্যানটা নিকটতম প্রিয়জনের নিকট হইতে আসিলে। শশাঙ্ককে আমি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, কিন্তু বিধির বিধানে তাহার পুত্র শঙ্খর সহিত আমার পরিচয় পর্যন্ত নাই। দেখা হইলে পরস্পরকে চিনিতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া সে আমার কম প্রিয় নয়। বরং তাহাকে কাছে পাই নাই বলিয়া সে প্রিয়তর। তাহার অনেক গুণের কথা নানা লোকের মুখে শুনিয়াছি। জীবনে হয়তো কখনও তাহাকে কাছে পাইব না ভাবিয়া মাঝে মাঝে সত্যই আমার ক্ষোভ হয়। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। তনিমা যে সর্ববিষয়ে

তাহার উপযুক্তা পাত্রী, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিবাহ হইলে আমি খুবই সুখী হইব। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে অথবা তাহার অভিভাবকদের আমি কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। সে অধিকার স্বেচ্ছায় আমি একদিন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পরিত্যক্ত বেদখল ভূমিতে পদার্পণ করিবার লোভ থাকিলেও সাহস আমার নাই। এ বিবাহ হউক—সর্বান্তঃকরণে আমি ইহা ইচ্ছা করি। আমার এ ইচ্ছার মর্যাদা তাহারা দিবে কি না তাহা নিশ্চিতরূপে জানি না বলিয়াই এ বিষয়ে তাহাদের কোন অনুরোধ করিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা বুঝিয়া আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আশা করি, কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার লউন। কল্যাণীয়দের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসোম-শুভ্র মুখোপ্যাধায়

চিঠি পড়ে তার মনের যে অবস্থা হল, তা অবর্ণনীয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাটা সহসা যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। ইতিপূর্বে ছোট দাদুর আর একখানা চিঠিও সে দেখেছিল তার এক ব্রাহ্ম-বন্ধুর বাড়িতে। ধর্ম ও কুসংস্কার সম্বন্ধে তাতে তিনি সুন্দর একটি উপমা দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, পুঁজের সমস্ত উপকরণ যেমন রক্তের মধ্যে আছে, কুসংস্কারের সমস্ত উপাদানও তেমনই ধর্মের মধ্যেই আছে। একটা মৃত এবং আর একটা জীবন্ত, তফাত শুধু এইটুকু।....কেবল এই উপমাটির জন্যেই ছোট দাদুকে সে মাথায় করে রেখেছে মনে মনে। বড় দাদু যে ছোট দাদুর প্রতি অবিচার করেছেন—এ কথাও বারংবার মনে হয়েছে তার। অনেক বার ইচ্ছে হয়েছে ছোট দাদুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসবার। বড় দাদুর কথা ভেবে পারেনি। বড় দাদুর রাগটাকেও না হয় অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু সত্যি সত্যি দুঃখ পান যদি! বড় দাদুর দোষ অনেক আছে, কিন্তু তাঁর মনে দুঃখ দেওয়ার কল্পনাও সে করতে পারে না। তাঁর কত অসঙ্গত আবদার যে রক্ষা করেছে সে! বি. এ. তে ইকনমিক্স্ নিলে আরও ঢের বেশি ভাল করতে পারত, কিন্তু তাঁর অনুরোধে সংস্কৃত নিতে হল। হিঙ্গুল গ্রামে জগদ্ধাত্রী-পূজো উপলক্ষ্যে কলেজের দলবল নিয়ে গিয়ে অভিনয় করতে হল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। সেই পাড়াগাঁয়ে সংস্কৃত কে বুঝবে! অবুঝ বড় দাদু কিন্তু ছাড়লেন না। ছোট দাদু কখনও কোন অনুরোধ করেননি, করবার সুযোগই পাননি। নির্বাসিত ছোট দাদুর অদেখা মুখটা ভাববার চেষ্টা করলে সে। মনে হল, সে যেন দেখতে পাচ্ছে, আত্মসম্মানী ছোট দাদু অপ্রতিভ অপ্রস্তুত মুখে কি যেন একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।....

অনুক্ত অনুরোধটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন চোখের সামনে।

।। তিন ।।

তনিমা এঁদো গলি নয় বরং ঠিক উলটো। সে যেন মোগল-হারামের অতি সুসজ্জিত বিশ্রামকক্ষ অপরূপ, কিন্তু রহস্যময়। প্রবেশপত্র নিয়ে প্রবেশ করলেও মনে হয়, অনধিকার প্রবেশ করেছি। গা ছমছম করে। সম্মানিত অতিথির আসনে বসেও এ সম্ভাবনা মন থেকে

তিরোহিত হয় না। যে, যে কোনও মুহূর্তে একটু বেচাল হলেই চক্ষের ইঙ্গিতে পরদার অন্তরাল থেকে ছোরা-হাতে হাবসী খোজা বেরিয়ে আসতে পারে।। রূপসী বিদুষী মিষ্টভাষিণী ধনীর দুলালী তনিমাকে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না; তার সঙ্গে আলাপ করা যায়, কিন্তু অন্তরঙ্গতা জন্মে না। ভাবে ভঙ্গীতে, ভ্রূর ঈষৎ কুঞ্চনে, আঁখি-পল্লবের সামান্য-কম্পনে তার যে সত্তা আত্মপ্রকাশ করে, তা অবজ্ঞা করাও যেমন কঠিন, তার অস্পষ্টতায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করাও তেমনই শক্ত। তার ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের আসল স্বরূপটি যে ঠিক কি, তা সে নিজে পুরোপুরি কখনও ব্যক্ত করে না—হয়তো নিজেই জানে না; বস্তুত, এ সম্বন্ধে তার সঙ্কোচই আছে যেন, আভাসে ইঙ্গিতে তা প্রকট হয়ে পড়লে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের মর্মোদঘাটন না করতে পারলে তো কিছুই করা যাবে না—পারলেও কিছু করা যাবে কি না, এ ভয়েও শঙ্খর হয় মাঝে মাঝে।.... রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটা একদিন আবেগভরে তাকে পড়ে শোনাচ্ছিল, হঠাৎ লক্ষ্য করলে, তার চোখের দৃষ্টিতে নাসিকার আকুঞ্চনে যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে, তাকে কিছুতেই ভাল-লাগা বলা চলে না—নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ওষুধ গিলছে যেন! কবিতাটি পড়ে শেষ করতে হল, কিন্তু কণ্ঠস্বরের আবেগটা শেষ পর্যন্ত রইল না। পড়তে পড়তেই সে ভাবতে লাগল, রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতা ওর ভাল লাগছে না! কেন? অত্যন্ত বেশি যৌন বলে? বিবস্ত্রা রমণীটির পদপ্রান্তে নিরস্ত্র মদন যে পরাজয় স্বীকার করলে, তা রমণীটির মানসিক কোন উৎকর্ষে মোহিত হয়ে নয়, তা তার ''ললাটে অধরে উরু'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়'' মধ্যহ্ন-রৌদ্রের ঝলক দেখে—এতেই ওর রাগ হল নাকি! আজকালকার আলট্রা মডার্ন মেয়েদের মত এও নিজেব দেহটাকে উপেক্ষা করে মন-সর্বস্ব হয়ে উঠেছে বোধ হয়। কবিতা শেষ করে কিন্তু তার দিকে যখন চেয়ে দেখলে, তখন সে চোখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসছে। শঙ্খর মনে হল, এটা বোধ হয় ও ভণ্ডামি করছে তার খাতিবে। ওর আসল রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল ওর অজ্ঞাতসারে একটু আগে। তার গালে ছোট্ট একটি টোকা মেরে অন্তরঙ্গতার অভিনয় করে সে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু সহধর্মিণীর স্বধর্মের কোন পরিচয় না পেয়ে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে রইল সে। তাকে খোশামোদ করে বশ করা অথবা জোর করে দখল করা এ দুয়ের কোনটাই শঙ্খ-শুভ্রের মনঃপূত নয়। সে চাইছিল মুগ্ধ হতে এবং মুগ্ধ করতে কোন কিছু আস্ফালন না করে। কিন্তু কি করলে যে তা হবে, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না সে।...মোগল-হারামের সুসজ্জিত কক্ষে একা বসে সে অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছিল, পরদা সরিয়ে শাহ্জাদী কখন আসবেন—তনিমার অপরূপ দেহ-দেহলীতে কখন এসে দাঁড়াবে তনিমার সেই প্রকৃতি, যার আসার অপেক্ষা করে আছে তার সংযত পৌরুষ অবিচল নিষ্ঠাভরে। কিন্তু কিছুতেই সে আসছে না। পরদার ওপার থেকে কখনও নূপুর-শিঞ্জনে, কখনও পাদুকার শব্দে, কখনও কলহাস্যে, কখনও হঠাৎ-চীৎকারে, কখনও সোহাগ-বচনে, কখনও ভর্ৎসনার সুরে, কখনও সরবতায়, কখনও নীরবতায় যে মূর্তি আভাসিত হচ্ছে, তা এত পরস্পর-বিরোধী যে, কোন একটা বিশেষ ছবিতে সেগুলোকে শঙ্খ-শুভ্র খাপ খাওয়াতে পারছে না। একটা ছবি যেই গড়ে তোলে, অমনই আর একটা ছবি এসে অবলুপ্ত করে দেয় সেটাকে। 'বিজয়িনী' পড়ার পরদিনই সে শুনতে পেলে, পাশের ঘরে শুক্তি-

মুক্তার কাছে সে খুব আবেগভরে 'গীতগোবিন্দ' পড়ছে—"অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্!" আগের দিনের ধারণাটা ঘুচে গেল। 'গীতগোবিন্দ' যার ভাল লাগে, বিজয়িনী' তার খারাপ লাগবার কথা নয়। আর একদিন দেখলে, কীট্‌সের 'ওড টু সাইকি' পড়ছে মন দিয়ে, তার পরদিন 'ওমর খৈয়াম'। তার পরদিন আবার অন্য রকম—একেবারে 'হেল্‌প্‌স এসেজ'। ওয়াল্‌ট্‌ হুইটম্যানও পাওয়া গেল একদিন বালিশের তলা থেকে। হীরকের সঙ্গে কমিউনিজ্‌ম নিয়ে একদিন খুব তর্ক করলে, মনে হল, ওসবের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধাই নেই বুঝি। হঠাৎ একদিন উপবাস করলে। কেন—জিজ্ঞেস করাতে বললে, খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যেবেলায় দেখা গেল, জওহরলাল নেহেরুর ছবিতে একটা মালা দুলছে। তখন শঙ্খর মনে হল, আজ জওহরলালকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু উপবাসের কারণ যে জওহরলাল, কিংবা ফুলে মালা যে তনিমাই ঝুলিয়েছে, তা কিছুতেই সে স্বীকার করলে না। জিজ্ঞেস করাতে মুচকি হেসে বললে, আমার বয়ে গেছে জওহরলালকে নিয়ে মাথা ঘামাতে!—কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁওয়া যায় না তাকে। এমন কি সে গম্ভীর প্রকৃতির, না লঘুপ্রকৃতির; শান্ত, না, চঞ্চল; তাও ঠিক করে বোঝবার উপায় নেই। শুক্তি-মুক্তা যখন আসে (এবং প্রায়ই আসে তারা, তনিমা তাদেরই কলেজের নাম-করা মেয়ে), তখন তাদের সঙ্গে নিজের তেতলার ঘরে হাসি-গান হুল্লোড়ে মেতে থাকে যে ব্যক্তি, শঙ্খর কাছে তার আর এক রূপ—টিপটপ কেতাদুরস্ত। আবার শ্বশুড়-শাশুড়ীর কাছে, এমন কি ছোট পিসীর কাছেও, একেবারে নিরীহতার প্রতিমূর্তি সে যেন! অথচ যে রকম ছেলেমানুষির সঙ্গে এ ধরনের দুষ্টুমি ঠিক মানায়, ততটা ছেলেমানুষ যে সে নয়, তার প্রমাণেরও অভাব নেই। রজত-হীরকের সম্পর্কে পুলিস যখন বাড়ি খানাতল্লাশি করতে এল, তখন একমাত্র তনিমাই বাড়ির মধ্যে মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। পারিবারিক মর্যাদা বজায় রেখে পুলিস-অফিসারের সঙ্গে যে ভাবে সে কথা কইলে, তাতে শুধু শঙ্খ নয়, সবাই অবাক হয়ে গেল। মা এই নিয়ে কিছুদিন পরিচিত-মহলে সাড়ম্বরে গল্প করবার সুযোগ পেলেন। তারপর রজত যখন অপ্রত্যাশিতভাবে কাজলকে বিয়ে করে বসল, তখন তনিমা সব দিক বাঁচিয়ে যে ভাবে তাকে ভদ্ররূপ দিলে, তা কোন ছেলেমানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। না, তনিমাকে ছেলেমানুষ বলা যায় না। আড়াল থেকে শঙ্খ লক্ষ্য করেছে, সে যখন আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়, কিংবা যখন একলা বসে সেলাই করে বা পড়ে, তখন তার মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে তা তরলমতি কিশোরীর নয়, রহস্যময়ী যুবতীর। কিন্তু সে রহস্যালোকে প্রবেশের পথ শঙ্খ খুঁজে পাচ্ছে না কিছুতেই। সে ওর প্রেমে পড়তে চায়, কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে উঠছে না—ক্রমাগত ভদ্রতা করে অভিনয় করে যেতে হচ্ছে খালি।

বাবার 'বিজ্‌নেসে' ঢুকেও তার ঠিক এই দশা। সে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করছে নিজেকে উপযোগী করে তোলবার, চেষ্টার কোন ত্রুটি তার নেই, কিন্তু কিছুতেই যেন পেরে উঠছে না। শশাঙ্ক-শুভ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে উঠলেও তার নিজের বিবেকের কাছে সে একবারও বাহবা পাচ্ছে না। দোষ যে সব সময় তার নিজের তাও নয়, সে কিন্তু দোষী করছে নিজেকেই। অসৎ কর্মচারীকে বিশ্বাস করে প্রথম বার ঠকে, সৎ কর্মচারীকে অবিশ্বাস করে ঠকতে হচ্ছে দ্বিতীয় বার। তৃতীয় বার ঠকছে নিজেই সব

করতে গিয়ে সব দিক সামলাতে না পেরে। বহু চোরের মাঝখানে একজন সাধুর, বহু ইতরের মাঝখানে একজন ভদ্রলোকের, বহু মূর্খের মাঝখানে এক জন পণ্ডিতের যে দুর্দশা, 'বিজ্‌নেস'-জগতে ঢুকে শঙ্খ-শুভ্রেরও ঠিক সেই দুর্দশা হয়েছে। সে কিন্তু হার মানবে না। সেই ছেলেবেলায় কাশীতে সে যেমন ভেঙে পড়েনি, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, সারা জীবন ধরে নানা বিরুদ্ধে অবস্থাতেও সে যেমন পরাজয় স্বীকার করেনি, এখানেও করবে না। ব্যবসাতে যখন নামতে হয়েছে, নিখুঁতভাবেই করবে সেটা। ভেঙে পড়লে চলবে না। তাই সে কাব্যগ্রন্থের ওপর ব্লু-বুক রেখে, রেডিওতে গানের বদলে 'কর্মর্শ্যাল নিউজ' শুনে, পূর্ণিমা -সন্ধ্যায় বাড়ির নির্জন ছাদের পরিবর্তে সারা হ্যারিসন রোড ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘোরাঘুরি করে, নানা জাতের দালাল-ফড়ে-গোলাদার -আড়তদারদের ন্যক্কারজনক সান্নিধ্যে এসে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাণিজ্য-রসে নিমগ্ন হতে। কিন্তু নিমগ্ন হবার মত সাগর সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। সর্বত্রই হাঁটু-জল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্যাচ-পেচে কাদা। কিন্তু তবু সে সাহেবী সুট পরে, পোর্টফোলিও বগলে করে এই কর্দমাক্ত পথেই ছপাৎ ছপাৎ করে হেঁটে চলেছে সেই সাগরের উদ্দেশ্যে, জনশ্রুতি—যার তলায় লক্ষ্মী থাকেন।...হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে কিন্তু এখনও সে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের সেই নির্জন জগতে, যেখানে কালো-ধবল পালক-মেঘ সূর্যালোক-স্পর্শে মহিমময় হয়ে উঠেছে নির্মল নীল আকাশের বুকে, যেখানে নির্জন দ্বিপ্রহরে সমস্ত প্রকৃতি, এমন কি মধ্যগগনের জ্বলন্ত সূর্য পর্যন্ত, তন্ময় হয়ে শুনছে কপোতকণ্ঠের মৃদু করুণ কাকালী-ধ্বনি।...হঠাৎ আবার আত্মস্থ হয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে সে।

তনিমাকে সে পেয়েও পায়নি, 'বিজ্‌নেস' -জগতে ঢুকেও সে ঢুকতে পারে নি। তবু একদিন জানা গেল, তনিমা সন্তান-সম্ভবা এবং তার বিজ্‌নেসে লাভ হয়েছে। সবাই উল্লসিত হল, সে কিন্তু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে রইল।...এই সময় শোনা গেল, রজত-শুভ্রের একখানা ছবি বন্ধু-মহলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মানুষের ছবি নয়, কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও ছবি নয়, একটা ছোরার ছবি। প্রকাণ্ড একখানা ছোরা বিরাট একটা হৃৎপিণ্ডকে যেন বিদীর্ণ করছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। শঙ্খর মনে হল, রজত কি করে নিজের মনের মত পথ খুঁজে পেয়েছে? কে জানে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

রজত-শুভ্র

।। এক ।।

রজতও নিজের মনের মত পথ খুঁজে পায়নি। তার স্বভাবের মধ্যে বিধাতা যে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সমাবেশ করেছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সে দুই শক্তির বিপরীত আকর্ষণে সে কেবল বিপর্যস্তই হয়েছে, এক পাও অগ্রসর হতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই সে শিল্পী, ছেলেবেলা থেকেই সে গোঁয়ার। সৃষ্টির স্বপ্নে তন্ময় হয়ে যাবার ক্ষমতা তার যেমন ছিল, ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে ওঠবার ক্ষমতা তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। প্রবল এই দুই শক্তির দুর্নিবার তাড়নায় যে কখনও সৃষ্টি করত, কখনও ধ্বংস করত। স্কুলে যখন পড়ে, তখন একবার তাল তাল মাটি নিয়ে ভারা বেঁধে দিনরাত খেটে বিরাট এক মহাবীরমূর্তি খাড়া করেছিল সে বাড়ির উঠানে। মূর্তি শেষ হয়ে গেলে সবাই প্রশংসা করতে লাগল। রজত নিজে কিন্তু একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, না কিছু হয় নি। বলেই ক্ষান্ত হল না, তার পরদিন লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে সে মূর্তিকে চুরমার করে ফেললে। কারও মানা শুনলে না। সে যে কত ছবি এঁকেছে আর ছিঁড়েছে, কত পুতুল গড়েছে আব ভেঙেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আর ধ্বংসকর্তা মহেশ্বর যেন পাশাপাশি বাসা বেঁধেছেন তার মনের মধ্যে, পালনকর্তা বিষ্ণুকে বয়কট কবে। ভয়ানক খুঁতখুঁতে মন, কিছুতেই কোন জিনিস পছন্দ হয় না। তা ছাড়া আত্মসম্মান-জ্ঞান অতিশয় প্রবল। কোন কিছু খারাপ, তা ছবি বা পুতুল যাই হোক, তার নামে চলবে—এ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। কল্পনায় যা ফুটেছে, বাস্তবে ঠিক যতক্ষণ সেটা না ফোটাতে পারছে, ততক্ষণ তৃপ্তি নেই, ক্রমাগত ছিঁড়বে আর ভাঙবে সে। গোঁয়ার বলে কারও সঙ্গে মিলত না তার। ক্লাসের অধিকাংশ ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল না, বাড়িরও অধিকাংশ লোকের সঙ্গে না। বিরক্তি চেপে রেখে কারও সঙ্গে ভদ্রতা করতে পারত না সে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে হয় গাড়োল, না হয় চোর, না হয় চাকর, না হয় পাজি—এই বদ্ধমূল ধারণাকে বাঙ্ময় করতে কোন সঙ্কোচ হত না তার। কাউকে গ্রাহ্যই করত না, স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে মারামারি করে বসল একদিন। বাড়িব মধ্যে একটি লোককে সে সম্ভ্রম করত, ইন্দু-পিসীকে। ইন্দু-পিসীর প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, পরিমিত কথাবার্তায় এমন একটা আত্মসম্মানের আভা ফুটে বেরুত যে, রজত মুগ্ধ হয়ে যেত মনে মনে। আর ভালবাসত দুটি লোককে—দাদাকে আর দাদুকে, তাদের নানা দোষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও। বাবা-মাকে ভয় করত এবং তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত যথাসাধ্য। শঙ্খ-শুভ্রের ভালমানুষি দুচক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু চমৎকৃত হয়ে যেত তার অনাড়ম্বর বীরত্ব দেখে, চুপচাপ থাকে, কিন্তু ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হয়। কোন উচ্চবাচ্য না করে নীরবে কাশী চলে গিয়ে মাথা কামিয়ে টিকি রেখে টোলে ভরতি হয়ে যেতে পারে কেবল দাদুর মান রাখবার জন্যে! স্পোর্ট্‌সে নামতে চায় না, কিন্তু নামলেই ফার্স্ট। অথচ মুখে কথাটি নেই, সর্বদাই যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে। দিনরাত বই নিয়ে লাইব্রেরিতে বসে থাকত যে ব্যক্তি, সে বাবার কথায় সাবানের কারখানায় আর পাটের গুদামে ঘুরে

বেড়াচ্ছে এবং নাম করছে সেখানেও। মনে মনে তারিফ করত সে দাদাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করত, বেশ করে ঝাঁকানি দিয়ে বুঝিয়ে বলে, এ কি করছ তুমি? কেন করছ? একবার পরের মন যুগিয়ে চলতে শুরু করলে কি অন্ত পাবে তার? ইচ্ছে করত, কিন্তু বলতে পারত না। শঙ্খ-শুভ্রের চোখে-মুখে অনিবর্চনীয় কি যে একটা আছে, যার বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ওপর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না তার। মহাত্মা গান্ধীর ওপরই ছিল না। ওটেন সাহেবকে ঠেঙিয়েছিল যে সুভাষ বোস, সেই ছিল তার আদর্শ। সুভাষ বোসের সঙ্গে গান্ধীর যখন মিলছে না, তখন গান্ধীর কথা শোনার দরকার নেই, এই ছিল তার সোজা হিসেব। অত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ফ্যাখ্যার ধার ধারত না সে। সুবিধে পেলেই সায়েব ঠেঙাত। এ বিষয়ে দাদুর সহানুভূতি আছে বলেই দাদুর সঙ্গে তার ভাব। একবার ফুটবলের মাঠে এক গোরার সঙ্গে মারামারি করে যখন পুলিস-কেসে পড়ল সে, তখন গোঁয়ার্তুমির জন্যে উপদেশ আর বকুনি দিতে কেউ কসুর করেননি, গান্ধী-ভক্ত ছোটকাকার চোখ দিয়ে জলই বেরিয়ে পড়েছিল, দাদুই কেবল হঠাৎ বলে বসলেন, বংশের মুখ বক্ষা করেছিস তুই। অনর্গল টাকা খরচ করে বড় বড় ব্যারিস্টাব লাগিয়ে মকদ্দমা লড়লেন এবং জিতলেন। বাড়ির মধ্যে দাদুই তার বন্ধু। দাদুর কাছে কোনও কথা গোপন করে না সে। ইন্দু-পিসির কাছেও অবশ্য করে না। দাদুর সঙ্গে সৌহার্দ্যের ফলেই কিন্তু পলিটিক্সে ঢুকতে হল তাকে। দাদু সেদিন কথাটা অমনভাবে মাথায় ঢুকিয়ে না দিলে সে এসব নিয়ে মাথাই ঘামাত না বোধ হয় জীবনে। গুণ্ডামি আব ছবি আঁকা নিয়েই জীবন কাটত তার। ঘটনাটা সামান্যই। এক বন্ধুর বিয়েতে মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারেনি সে। মা-বাবাকে মিছে কথা বলেছিল। কিন্তু দাদু আর ইন্দু-পিসী যখন জিজ্ঞেস করলেন, তখন মিছে কথা বলতে বাধল। এঁদের কাছে কখনও সে মিছে কথা বলেনি। ইন্দু-পিসী শুনে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন, দাদু কিন্তু বোমার মত ফেটে পড়লেন। সামনে থেকে সরে পড়তে হল। চুপচাপ কাটল সমস্ত দিন। রজত ভাবলে, দাদু মা-বাবাকেও বলে দেবেন বোধ হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না তিনি। সন্ধ্যের সময় তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, দেখ্ বাজে মদ খেয়ে শরীর নষ্ট করিসনি। মদ যদি খেতেই চাস, আমার পরামর্শ নিস। এককালে আমি ও-বিষয়ে ওস্তাদ ছিলাম। মুগ্ধ হয়ে গেল রজত। ইন্দু-পিসীও কিছু বললে না। কিছুদিন পরে তার আর্টিস্ট বন্ধুদের একটা পার্টি দিয়েছিল সে। আর্টিস্ট বন্ধুদের পার্টিতে মদের ব্যবস্থা না করলে অঙ্গহানি হয়। দাদুর পরামর্শ চাইতে তিনি শুধু ভাল ভাল মদের নামই বলে দিলেন না, সে সবের দামও দিয়ে দিলেন, একটুও আপত্তি কবলেন না, কোন নীতি-উপদেশ দিলেন না। কিন্তু একটু হেসে যে কথাটি বললেন, তা রজতের আত্মসম্মানকে আঘাত করল হঠাৎ। বললেন, আজকাল খদ্দর-চরকার দিনে এ বিলিতী নেশাটা আউট অব ডেট। বড় পেছিয়ে আছিস তুই দেখছি। সে পেছিয়ে আছে? সে-ই তো অগ্রণী! সবাই যখন হয় ডিগ্রী, না হয় বিজ্‌নেস, না হয় পলিটিক্স, না হয় ধর্ম নিয়ে উন্মত্ত, তখন সেই তো বাড়ির মধ্যে একা আর্টের সাধনায় তন্ময় হয়ে আছে, যে আর্টে টাকা নেই, নাম নেই, যা গতানুগতিক নয় এবং সেই জন্যেই যা সর্বযুগের সভ্যতম মানুষের ধ্যানের বিষয়, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ করে তোলে, সেই আর্টের চর্চা করছে সে, সে আউট অব ডেট! দাদু বলে কি!

হংস-শুভ্রের কথাটা কিন্তু টাইম বমের মত নীরবে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল তার মনে। বিস্ফোরণ হল প্রায় মাসখানেক পরে মেকলে-সাহেবের লেখা বাঙালী-বর্ণনাটা পড়বার পর। সঙ্গে সঙ্গে হাতের আস্তিন গুটিয়ে বলে উঠল সে, স্পর্ধাতো কম নয় লোকটার! সেই দিনই স্বদেশী হয়ে গেল সে। মদ ছাড়লে, কলেজ ছাড়লে, খদ্দর ধরলে। সাহেব গ্রন্থকারদের লেখা সমস্ত ইতিহাসের বইগুলো পুড়িয়ে

ফেললে স্তূপাকার করে। এর পর থেকে চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হত বিশেষ করে সাহেবদের সেই কীর্তিগুলির ওপর, যা শুনলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে—ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা হও। সাহেব দেখলেই হাত নিসপিস করত, রাগে গিসগিস করে উঠত আপাদমস্তক। যারা আমাদের এতটা হীনচক্ষে দেখে, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আপোস চলতে পারে না। যারা আমাদের টিকিট থাকা সত্ত্বেও ফার্স্টক্লাস গাড়ি থেকে কান ধরে নামিয়ে দেয়, লাথি মেরে পিলে ফাটায়, জালিয়ানওয়ালা-বাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করেও যারা আস্ফালন করে, মিস মেয়োকে দিয়ে বই লেখায়, আমাদের দেশের সম্মানিত বড়লোকেরা যাদের দেশের হোটেলে পয়সা দিয়েও স্থান পায় না কেবল কালো রঙের জন্যে, আমাদেরই শিল আমাদেরই নোড়া নিয়ে উপকার করবার ছুতোয় যারা আমাদের দাঁত ভাঙছে অহরহ, তাদের মহত্ত্ব দেখে আর যে-ই মুগ্ধ হোক, রজত-শুভ্র হবে না। যে পলিটিক্স সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণা ছিল, যার জন্যে সে ছোটকাকাকে, হীরককে কত ঠাট্টা করেছে, সেই পলিটিক্সের জালে সেও জড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ। ছবি আঁকা ছেড়েই দিলে দিনকতক। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এই লাথি, জুতো, অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে তো কিছুই করা যাবে না। এ অবস্থায় আর্ট-চর্চা করা খাঁচার পাখির বুলিকপচানোর মত হাস্যকর ব্যাপার। তবু কিন্তু এই হাস্যকর ব্যাপারেই উন্মত্ত হয়ে পড়ত সে মাঝে মাঝে এসব সত্ত্বেও। খাঁচার কোকিল যেমন নিজের বন্দীত্ব ভুলে কুহু-কুহু করে ওঠে মাঝে মাঝে, সেও তেমনই মেতে উঠত রঙ আর তুলি নিয়ে। ঘরে খিল দিয়ে আপন মনে এঁকে ছবির পর ছবি—বাস্তব ছবি, অবাস্তব ছবি, সম্ভব অসম্ভব কত রকমের ছবি। ভুলে যেত পরাধীনতার গ্লানি, ভুলে যেত বাইরের জগৎ, এমন কি নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকত না তার সব দিন। মনের আকাশে ইংরেজ-বিদ্বেষের মেঘ বজ্রবিদ্যুতে ঘন-ঘোর হয়ে উঠত কিছুদিন, তখন অস্বস্তিতে অধীরতায় অনিদ্রায় পাগলের মত অবস্থা হত তার। হঠাৎ তারপর কোথাকার এক খেয়ালী দমকা-হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত সেসব, কোথা থেকে ছুটে আসত রঙিন আলোর বন্ধ-হারা প্রবল বন্যা, কালো মেঘের টুকরোগুলোকে বিপর্যস্ত করে দিত বহুবর্ণের তরঙ্গতাণ্ডবে। কিছুদিন পরে আবার থেমে যেত সব। ছবির ছেঁড়া টুকরোগুলো উড়ে বেড়াত বাগানে উঠোনে ছাতে রাস্তায়। প্রতিবাদ করতে সাহস করত না কেউ। প্রতিবাদে সে সহ্য করত পারত না। উল্টো ফল হত। কলেজ যাওয়া নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র একদিন বকা-ঝকা করলেন খুব। বললেন, কলেজ যেতেই হবে তোমাকে।

কিছুতেই যাব না আমি।

কলকাতার বাড়ি ছেড়ে হাজির হল গিয়ে দমদমে দাদুর বাড়িতে এবং সেই দিনই দীক্ষা হল তার। হংস-শুভ্র সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ এত অনুগ্রহ! এ কি, খদ্দর পরে ভদ্দরলোক হয়েছ দেখছি।

মদও ছেড়ে দিয়েছি।

বাঃ

কলেজও।

কলেজও? এখন কি করবে তা হলে? খালি সাহেব ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বেড়াবে?

রজত-শুভ্র হাসলে একটু।

সমস্ত দিনটা করবে কি? ছবি আঁকবে? ভাল।

নাতিকে হংস-শুভ্র চিনতেন, বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলেন না।

বাবার মত আপনিও কলেজ যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করবেন নাকি? তা যদি করেন, তা হলে এখান থেকেও পালাব।

পেড়াপেড়ি করবার মত জোর নেই আমার, বুড়ো-হয়েছি।

রজত-শুভ্র আর অধিক বাক্যালাপ না করে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ি ঢোকবার মুখেই তারাপদর সঙ্গে দেখা।

তারাপদ, আমি এসেছি, মাংস আনতে দাও।

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ইন্দু এখানে রয়েছে যে!—বলেই তারাপদ শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, ইন্দু কাছাকাছি কোথাও নেই তো? সে শুনতে পেলে আবার এক কাণ্ড করে বসবে। তার বৈধব্যের জন্যে যে বাড়ির কারও সামান্যতম অসুবিধে হবে এ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না সে। আশ্চর্য মেয়ে! তার দ্বিতীয় স্বামী কিছুদিন আগে মারা গেছে। এমন মেয়ে যে, মরবার সময় একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলেনি এবং তার পর থেকে বরাবর এমন হাসিমুখে রয়েছে যে ওর সামনে যেতে তারাপদর ভয় করে। ও যদি গলা ফাটিয়ে কাঁদত, তারাপদ করবার মত কিছু একটা পেত। কিন্তু নিজের জন্যে ও কাউকে কিছু করতে দেবে না, এমন কি সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পর্যন্ত দেবে না। ইন্দু কাছাকাছিই ছিল। তারাপদর কথাও শুনতে পেয়েছিল সে।

বেরিয়ে এসে বললে, ও, রজত এসেছিস! মাংস আনাও না তারাপদ, আমার নাম করে হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছ বুঝি! আমার কোন আপত্তি নেই।

না, এতে আর হাঙ্গামাটা কি?

পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল তারাপদ।

রজত গিয়ে ঢুকল ইন্দুর ঘরে?

হঠাৎ এসে পড়লি যে?

বাবা কলেজ যাবার জন্যে রোজ তাড়া দিচ্ছেন। পালিয়ে এলাম।

আর যাবি না?

না!

কেন? মহাত্মা গান্ধীর ওপর ভক্তি হয়েছে?

ওরকম নিরামিষ লোকের ওপর আমার ভক্তি হয় না!

তবে?

যে কারণে মদ ছেড়েছি, খদ্দর পরেছি, সেই কারণে কলেজেও আর যাব না।

কি সেটা?

ইংরেজদের ওপর রাগ। যারা প্রতি পদে আমাদের এত অপমান করে, তাদের কোনও রকম সংস্পর্শে থাকতে চাই না।

তা হলে ছবি আঁকাও ছাড়তে হয়, রঙগুলোও সব বিলিতী।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে রজত বললে, তাও ছাড়ব তা হলে।

ঝোঁকের মাথায় বলে বসল।

ইন্দু খানিকক্ষণ নির্মিমেষে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। চোখের দৃষ্টি তার উজ্জ্বল হয়ে এল ক্রমশ—ভেতরে যেন একটা আলো জ্বলে উঠল ধীরে ধীরে।

ওদের সংস্রব ত্যাগ করলেই কি আমাদের দুঃখ কমবে?

কি করতে বল তা হলে?

সত্যিই যদি এর প্রতিকার করতে চাও, তা হলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না, অহিংসার ঢঙ করেও কিছু হবে না। যে তোমার গালে চড় মারবে, তার নাকে ঘুষি লাগাবার মত সাহস সংগ্রহ করতে হবে।

সাহসের অভাব নেই। কিন্তু সাহস প্রকাশ করি কোথায়? খেলার মাঠে গোরা ঠেঙিয়ে মন ভরে না।

উপায় বলে দিতে পারি। কিন্তু শোনবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

কি?

এ কথা কাউকে বলতে পাবে না।

বেশ।

সেই দিনই দুপুরবেলা অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে রজত-শুভ্র। সমস্ত শুনে বললে, বেশ, রাজী আছি।

ভাল করে ভেবে দেখ, যদি না পার, এ কাজে নেবো না!

নিশ্চয়ই পারব।

মুখ বুজে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

পারব।

আচ্ছা, দেখি কেমন পারিস। বাঁ হাতের আঙুল কপাটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দে দিকি।

বাঁ হাতের আঙুল? কেন, কি করবে?

তুই দে না।

রজত আঙুল ঢুকিয়ে দিলে।

এবার বন্ধ করি কপাট?

ও, আচ্ছা, কর।

আঙুলটা পিষে গেল। রজতের মুখের একটি পেশী বিচলিত হল না। রক্তাক্ত আঙুলে টিংচার আয়োডিনের পট্টি বাঁধতে বাঁধতে ইন্দু-শুভ্রা বললে, তুই পারবি মনে হচ্ছে।

রজত-শুভ্রের আর্টিস্ট সত্তা নেপথ্যে তখন হাসছিল মুখ টিপে।

।। দুই ।।

ঠিক কিছুদিন আগে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেল। সে অধিবেশনে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলেই সন্তুষ্ট থাকব—মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবে দেশের যুবকদের, বিশেষত বিপ্লবপন্থীদের, মন একেবারে ভেঙে গেল। তারা যেন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, এই নিরীহ আপোস-উন্মুখ ব্যক্তিটির নেতৃত্বে এ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার কোন আশা নেই। স্বাধীনতা পেতে হলে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। এঁর ভরসায় বসে থাকলে চলবে না। সারা দেশময় দেখা দিতে লাগল নানা নামের যুবক-সঙ্ঘ। কলকাতায় মহাসমারোহে হয়ে গেল 'ইউথ কংগ্রেস,' উদ্দীপনা আরও বাড়ল যতীন দাসের মৃত্যুতে। রজত মেতেছিল এই সব নিয়ে, হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্র অন্তর্ধান করলেন একদিন তাঁর তেতলার ঘর থেকে। কিছুদিন আগে হীরক ধরা পড়েছিল। এদের দুজনের কারও মতের সঙ্গে

যদিও সে সায় দেয়নি কখনও, তবু পর পর এদের দুজনের অন্তর্ধানে তার মনে হল, ঠাস ঠাস করে দুগালে দুটো চড় মেরে গেল যেন কেউ। ক্ষোভে অপমানে যেন দম-বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল, প্রতিকার কিছু একটা না করতে পারলে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন অসহায়ভাবে আর কত মার খাব আমরা! ঘুরে ঘুরে বেড়াল কয়েকদিন অনিশ্চিতভাবে। যে দলে যোগ দিয়েছিল, অবিলম্বে প্রতিকারের কোন উপায় তারাও বলতে পারলে না কিছু। ইন্দু-শুভ্রা বললে, ছটফট করো না, যথাসময়ে করবার মত কাজ পাবে। ছোটকাকা বা হীরকের কথা তত তীব্রভাবে তাকে চঞ্চল করছিল না, বস্তুত তাদের সম্বন্ধে অনুভূতির তীব্রতাটা কমেই আসছিল দিন দিন, তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল, কিছু একটা করবার আগ্রহ। অলস প্রতীক্ষার নিষ্ক্রিয়তা আর সে সহ্য করতে পারছিল না। হঠাৎ একদিন দাদুর কাছে গিয়ে হাজির হল।

কিছু টাকা চাই।

টাকা! কত টাকা?

হাজার খানেক অন্তত।

কি হবে অত টাকা নিয়ে?

ছোটকাকার খোঁজে বেরুব। তোমরা তো কেউ কিচ্ছু করছ না।

উত্তরটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক এ কথা ভেবে সে যায়নি। সে কোথাও বেরিয়ে পড়তে চাইছিল, যেখানে হোক। হংস-শুভ্র মনে মনে হয়তো খুশি হলেন, কিন্তু মুখে বললেন, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা করে মাঝে মাঝে।

হংস-শুভ্রের মুখের ওপর চোটপাট জবাব রজত ছাড়া আর কেউ দিতে সাহস করে না।

তোমাদের যার যা খুশি করবে আর টাকা দিয়ে আমি তা সামলাব, টাকা আমার অত সস্তা নয়।

রজত চলে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্রকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠতে হল এবং খোশামোদ করে চেকখানা গুঁজে দিতে হল হাতে।

রজত কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। কারও সঙ্গে দেখা করবার দরকার অনুভব করলে না সে, এমন কি ইন্দু-শুভ্রার সঙ্গে পর্যন্ত না। হাওড়ার দিল্লী-এক্সপ্রেস ছাড়ছিল, তারই একখানা টিকিট কিনে উঠে বসল সে তাতে। সেকেণ্ড্ ক্লাস কামরায় একা বসে বসে দুধারের চলমান দৃশ্য দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ পরে সে যেন সমস্ত সমস্ত ভুলে গেল। দেশের দুঃখ, জাতির অপমান, ছোটকাকা, হীরক—কিছু মনে রইল না তার। দ্রুত গতিতে দ্রুত-পরিবর্তনশীল নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কেমন অনায়াসে ছুটে চলেছে সে। এরই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বসে রইল সে অনেক-ক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে কখন যে সে অন্যমনস্ক হয়ে সুটকেস থেকে খাতা পেনসিল বার করেছে, তা তার খেয়াল নেই। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলে, খাতাটায় ছবির পর ছবি—অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলেছে সে। ইন্দু-শুভ্রার সঙ্গে কথা হবার পর থেকে রঙ আর কেনেনি সে। দেশী পেনসিলে দেশী ড্রয়িং-কাগজের ওপরই শখ মেটাতে হত তাকে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠত দেশী জিনিসের অযোগ্যতায়। ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত সব। তবু কিন্তু বিলিতী জিনিস কিনতে প্রবৃত্তি হত না আর। মনে হত, বিলিতী জিনিস কিনতে যাওয়া মানে মেকলে আর মাইকেল ও'ডায়ারদের কৃপাপ্রার্থী হতে যাওয়া। তা সে মরে গেলেও হবে না। ছবিগুলো উলটে উলটে দেখলে সে কয়েকবার। একটাও মনের মত হয়নি। কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সবগুলো। তারপর মনে হল, কোথায় চলেছে

সে? কেন চলেছে? ছোটকাকাকে কোথায় খুঁজে পাবে? তা ছাড়া সত্যিই আর ছোটাকাকার জন্যে প্রাণ কাঁদছে না তো! কোনদিনই কাঁদেনি। বরং কাকীমার জন্যে কষ্ট হয় তার। ছোটকাকা দেশের জন্যে অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন তা ঠিক, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। যে গান্ধী স্বরাজ পাবার একটা দিন স্থির করে শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারলেন না, আকারে ইঙ্গিতে ব্যবহারে যিনি ক্রমাগত বামপন্থীদের বিরোধীতাই করে চলেছেন, অথচ নিজে কিছু করতে পারছেন না, তাঁর মধ্যে ছোটাকাকা যে কি দেখতে পেয়েছেন, তা তিনিই জানেন। পুলিসের কাছে অহিংসার বাণীর মূল্য কি? যে কনস্টেব্‌লটার রুলের ঘায়ে তাঁর মাথা ফাটল, সে কি কোনদিন তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মর্ম বুঝবে? সে যতদিন লাঠি চালাবার জন্যে মাইনে পাবে, ততদিন লাঠি চালিয়ে যাবে। হীরকও জেলে গেল অত্যন্ত বাজে একটা ব্যাপার মাথা ঘামাতে গিয়ে। টাইফয়েড-রুগীর পায়ের কড়া সারাবার চেষ্টা করার মত হাস্যকর ব্যাপার ওটা। দেশ স্বাধীন হলে কুলি মজুর আপামর ভদ্র সবাই নিস্তার পাবে। বিশেষ করে ওদেব নিয়ে অস্থির হয়ে পড়বার কি দরকার ছিল এখন? সর্বপ্রথম দরকার স্বাধীনতা, ইংরেজদের কবল থেকে নিজেদের উদ্ধার করা।....হঠাৎ রজত ঠিক করে ফেললে, দেশের যেখানে যত যুবক-প্রতিষ্ঠান আছে, সব কটার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এরাই এখন দেশের আশা-ভরসা। দিল্লীতে নেবে সে টিকিট কাটলে লাহোরের। লাহোরে নেমে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলে। গাড়োয়ানকে বললে, জেলে নিয়ে চল। জেলে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেবে জেলের গেটের সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে সে। এই জেলে যতীন দাস মারা গেছে, এই জেলে এখনও আছে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। জেলের পাহারাওয়ালা, গাড়ির গাড়োয়ান—দুজনেই বিস্মিত হল। নওজোয়ান ভারতসভার অনেক সভ্যের সঙ্গে আলাপ হল তার লাহোরে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগটাও দেখে এল একদিন। তারপর গেল পুণা। মহারাষ্ট্র জেগে উঠেছে আবার। কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্র যুবক-সঙ্ঘ জওহরলালকে সভাপতি করে বিরাট এক সভা করেছিল। বালগঙ্গাধর তিলকের দেশে গিয়ে রজত যেন নতুন প্রাণ পেল। নতুন করে সে যেন অনুভব করলে, আবেদন-নিবেদন আপোস-উপবাস চরকা-রামনামে কিছু হবে না। স্বাধীনতা-অর্জন করতে হবে বাহুবলে, রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন দিয়ে। বেশি নয়, দেশের এক হাজার যুবক যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তা হলেই হবে। তেত্রিশ কোটি লোক যে দেশে, সে দেশে এক হাজার যুবক পাওয়া যাবে না? তখনই মনে হল, বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। কিন্তু বিবেকানন্দ পাননি বলে তো হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। পুণা থেকে সে গেল নাগপুরে, নাগপুর থেকে বেরার। দু জায়গাতেই সুভাষ বোস সভাপতি হয়েছিলেন ছাত্র-সঙ্ঘের অধিবেশনে। সেখান থেকে মাদ্রাজ বোম্বাই বেনারস ঘুরে সে যখন দেশে ফিরল, তখন সে পুরোপুরি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক। ভারতব্যাপী বিরাট অগ্নিকাণ্ডের একটি আয়োজন করে ফিরেই কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল মহাত্মাজীর কাণ্ড দেখে। লাহোর কংগ্রেসের পর লোকটি অপ্রত্যাশিত সুর বদলে ফেলেছে। সত্যাগ্রহের আগুন লেগে গেছে সারা দেশে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়ে তাক লেগে গেল তার। মহাত্মাজী লিখছেন—None should find himself free or alive at the end of the effort! শুরু হয়ে গেল তার দাণ্ডি-অভিযান, বিরাট একটা উন্মাদনা শুরু হয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। শুধু লবণ-আইন নয়, সব রকম আইন অমান্য করতে লাগল সবাই। দেশবন্ধুর স্বরাজ-আন্দোলনের পর এত বড় নাড়া বাংলা দেশকে আর কিছুতে দেয়নি। সবাই মেতে উঠল যেন। যুবকদের নেতা সুভাষ বোসও ঝাঁপিয়ে পড়লেন এতে, জেল হয়ে গেল তাঁর। রজতও হয়তো যোগ দিত, কিন্তু যে দলের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল সে, তার দলপতির আদেশ না পেলে কিছু করবার উপায় ছিল না

তার। সে নিরুপায় হয়ে দেখতে লাগল নিরীহ সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিসের অত্যাচার। লাঠি বন্দুক দিয়ে যতটা সম্ভব, সবই হতে লাগল। মেদিনীপুর শ্মশান হয়ে গেল, বারদোলি থেকে দলে দলে লোক পালাতে লাগল ভিন্ন গ্রামে। ভর্তি হয়ে গেল সমস্ত জেল। নতুন জেল তৈরি হল। জেলের বন্দীদের ওপরও লাঠি চলতে লাগল। একদিন খবর পাওয়া গেল, আলিপুর জেলে সুভাষ বোস, যতীন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, প্রফেসর নৃপেন বাড়ুজ্জে, 'লিবার্টি'র সম্পাদক বক্‌শি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এ খবর পেয়ে রজত যেন ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে হয়তো কিছু করে ফেলত একটা, কিন্তু ঠিক সেই সময় এল দলপতির আদেশ—এক বাক্স রিভল্‌ভার পৌঁছে দিতে হবে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের কাছে।....বেরিয়ে পড়ল রজত একদিন অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে।

এর পর থেকে রজতের জীবনের রঙ যেন বদলে গেল কিছুদিনের জন্যে। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে—কখনও হাঁটাপথে, কখনও নৌকা করে, কখন ও ফকিরওয়ালা সেজে, কখনও ধর্মশালায় কখনও আস্তাবলে কাটিয়ে রিভল্‌ভারের বাক্স সে ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু আর বেশি কিছু করবার সুযোগ সে পায়নি। আর্মারি রেডে অংশ নেবার লোভ থাকলেও হুকুম পায়নি সে। যেদিন আর্মারি রেড হয়ে গেল, সেদিন সে পাটনায়। পাটনায় এসে সে খবর পেল, মিঃ স্লোকম্ব্ নামক একজন সাহেব জার্নালিস্ট্ মহাত্মাজীর সঙ্গে জেলে দেখা করে একটা মিটমাট করবার চেষ্টায় আছেন নাকি। এ সব নিয়ে বেশিক্ষণ মাথ ঘামাবার অবসরই সে পেল না, অবিলম্বে তাকে ফিরে আসতে হল কলকাতায় রিভল্‌ভার সংগ্রহের জন্যে। তার ওপর ভার পড়েছিল, আরও কিছু রিভল্‌ভার সংগ্রহ করে মেদিনীপুরে বিতরণ করে আসার। উগ্রতর কোন কর্তব্য পেলে সে সুখী হত। কিন্তু যে পাঞ্জাবী যুবকটি তাদের দলপতি ছিল, সে বললে, রিভল্‌ভার ছোঁড়বার লোক অনেক আছে, কিন্তু রিভল্‌ভার সংগ্রহ করবার লোক বেশি নেই, তোমাকেই এ ভারটা নিতে হবে। এতে চমকপ্রদ কিছু নেই, কিন্তু এইটেই আসল কাজ।You must play the part of the root to feed the flowers.....তাই মাটির অন্তরালে শিকড় যেমন থাকে, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের অন্তরালে বাস করে সে তেমনই রসদ সংগ্রহ করতে লাগল বিপ্লবীদের জন্যে। মিশতে হল জাহাজের দেশী বিদেশী খালাসীদের সঙ্গে তারাই ভিন্ন-দেশ থেকে রিভল্‌ভার কিনে এনে বিক্রী করে। চোর-ডাকাত-বাটাপাড়েরও খোশামোদ করে বেড়াল সে কিছুদিন। তারাও নানা স্থান থেকে চুরি করে আনে রিভল্‌ভার। দিনকতক মন্দ লাগল না। গোপনে গোপনে বেপাড়ার অন্ধকার গলিতে খুঁজিতে, খিদিরপুরডকে, সিনেমা-হলে, গড়ের মাঠে, পড়ো বাড়িতে, বহুবিধ বিচিত্র প্রাণীর রহস্যময় সংস্পর্শে এসে রজতের শিল্পীমন যেন লণ্ডন-রহস্যের বিপজ্জনক 'পরিস্থিতি'তে এক অপূর্ব রসে অভিভূত হয়ে রইল দিনকতক। কিছুদিন পরেই, কিন্তু এর নোংরামিটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। কতদিন আর এই ইতর লোকগুলোর খোশামোদ করে বেড়ানো সম্ভব? এর মধ্যে যেটুকু অভিনবত্ব তা দুদিনে ফুরিয়ে গেল, অবশিষ্ট রইল এর একঘেয়েমি আর নোংরামি। চোরের মত অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো, পুলিস দেখলে সশঙ্ক হয়ে পড়া, অতিশয় হীনচরিত্রের গুণ্ডাকে প্রচুর টাকা দিয়ে হাতে রাখা, সর্বদাই একটা ছদ্মবেশ ধরে অনর্গল মিছে কথা বলা,—কিছুদিন পরে হাঁপিয়ে উঠল রজত-শুভ্র। তার মনে হতে লাগল, না না, এর মধ্যে কোন মহত্ব নেই। রূটের পার্ট সে প্লে করতে পারবে না, যদি ওর মধ্যে থাকতেই হয়, ফ্লাওয়ারই হবে সে। দলপতি কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন, ভাল না লাগলেও ডিসিপ্লিনের খাতিরে তোমার কর্তব্য তোমাকে করতে হবে।

....তবু রজত-শুভ্র একদিন পিছু নিলে এক সাহেবের। দুপুরের একটা চলতি ট্রামে উঠে বসল সে সাহেবটার পাশে। ট্রামে আর কেউ ছিল না। সাহেবটা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। পাশ

থেকে তার মুখটা ভাল করে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ সে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। বাঃ, কি চমৎকার প্রোফিল! রেশমের মত চুলগুলো ফুরফুর করে উড়ছে, টকটকে লাল কানটা, কি বলিষ্ঠ চোয়াল, চিবুকের গড়ন কি সুন্দর! বিভল্‌ভারের একগুলিতে এমন সুন্দরী সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ফেলবে? এ তো কোনও অপরাধ করেনি! তার অন্তরাত্মা বলে উঠল, না না না। তুমি স্রষ্টা, তুমি শিল্পী, সৃষ্টি করাই তোমার ধর্ম, সুন্দরকে নষ্ট করবে কেন তুমি? টপ করে নেমে পড়ল সে ট্রাম থেকে এবং উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায় লোডেড রিভল্‌ভারটা পকেটে করে।...ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ল দলপতির কথা। তিনি বলেছিলেন দোষী-নির্দোষী বিচার করবার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা যাকে পাব, তাকেই মারব। এ দেশে ওদের জীবন দুর্বহ করে তুলতে হবে। Make the soil unsuitable for their growth ....এসব কথা ভেবেও কিন্তু মনে জোর পেলে না সে। উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরতেই লাগল।....

.....অনেকদিন পরে ঠিক সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল সে চুপ করে। অনেকদিন থেকেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তার বড়। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে কখন আসত, কখন যেত, টের পেত না কেউ। শশাঙ্ক বা বাসন্তী ঘাঁটাতে সাহস করতেন না তাকে। জানতেন, প্রতিবাদ করলে সে আরও বেঁকে বসবে। লাহোর-পুণা-বোম্বাই ঘুরে আসবার পর শশাঙ্ক আর একবার পিতার কর্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, বাড়িতে এমন শুয়ে বসে কাটানোর চেয়ে একটা কাজ করাই তো ভাল।

রজত উত্তর দিয়েছিল, কাজ তো করছি।

কি কাজ?

বলতে পারি, যদি আপনি ওয়ার্ড অব অনার দেন যে, সে কথা কাউকে বলবেন না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে বিস্মিত শশাঙ্ক বললেন, বেশ, বল।

আমি টেররিস্ট্ মুভমেন্টে কাজ করছি।

চমকে গেলেন শশাঙ্ক। নিজের যৌবনের দিনগুলো মুহূর্তে ভেসে উঠল মনের ওপর, শ্রদ্ধা হচ্ছিল, এমন সময় প্রৌঢ় পিতার বিজ্ঞতা অবলুপ্ত করে দিলে সব।

বললেন, এককালে আমিও ওসব হুজুক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—। রজতের চোখের দিকে চেয়ে কিন্তু থেমে যেতে হল তাঁকে!

থেমে যেতেই রজত বললে, এ বিষয়ে কোনও তর্ক আমি করব না। আপনি যদি জোর করে এ নিয়ে আলোচনা করেন, এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে।

ভীতু শশাঙ্ক-শুভ্র চকিতে পুত্রের মুখের দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এরপর এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনা করেননি তিনি। বাসন্তীকেও করতে দেননি। সে যে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে, এইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন তাঁরা।......ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সবিস্ময়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল রজত। বিস্ময়ের প্রধান কারণ আত্ম-আবিষ্কার। হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে যেন চমকে গিয়েছিল সে। এতদিন বিপ্লবের যে ধ্বজাটা সে আস্ফালন করে বেড়িয়েছে, তা যে নিতান্তই বাহ্যাড়ম্বর—এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু অস্বীকার করবারও উপায় ছিল না। শত্রুকে নাগালের মধ্যে পেয়ে হঠাৎ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সত্যিই পেছিয়ে এল সে। অমন একটা সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করতে কিছুতেই হাত উঠল না তার। ইন্দু-পিসী শুনলে বলবে কী? ইন্দু-পিসীর শানিত-হাস্য-দীপ্ত মুখখানা কল্পনায় যেন দেখতে পেলে সে। এবং তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যেন

তড়াক করে উঠে বসল। আমার যা খুশি আমি করব, কার কি বলবার থাকতে পারে তাতে? ইন্দুশুভ্রার কল্পিত প্রতিবাদের উত্তরে মনে মনে এই কথাগুলো আবৃত্তি করে অনেকদিন পরে নিজেব পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটি জ্বেলে সে ছবি আঁকতে বসে গেল।

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কে?

আমি, তনিমা।

ও, এস বউদি।

তনিমা ঘরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল ছবিটা দেখে।

বাঃ, কার মুখ এটা?

একটা সাহেবের। চমৎকার নয়?

হ্যাঁ, বেশ সুন্দর। এখন কিন্তু খাবে চল। কাটলেটগুলো ভাজছি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না।

হঠাৎ কাটলেট?

শুক্তি-মুক্তা এসেছে, তাদের খাওয়াচ্ছি করে।

ও।

শুক্তি-মুক্তার ঘন ঘন আসাটা রজত তেমন পছন্দ করত না। অন্য কোন কারণে নয়, তার মনে হত, এখানে বার বার এসে ওরা যেন খুড়ীমাকে অপমান করছে। খুড়ীমা যখন নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে এত কাণ্ড করেছেন, তখন তাঁর মেয়েরা এমন ভাবে গায়ে-পড়ে এখানে আসে কেন? নবনীর নির্লিপ্ততা ভাল লাগত তার। খেতে বসে এই শুক্তি-মুক্তাই কিন্তু তাকে নতুন পথের ইঙ্গিত দিলে। রাজনৈতিক আলোচনা উঠল। শুক্তি-মুক্তার কথার ভাবে বোঝা গেল, তারাও বিদ্রোহিনী। মেয়ে দুটোকে যত অপদার্থ ভেবেছিল, ঠিক তত অপদার্থ নয় তারা। দুজনেই সুভাষ বোসের ভক্ত। সুভাষ বোসের চরম পন্থায় তারা আস্থাবান। মহাত্মাজীও শেষকালে যে চরমপন্থী হয়ে উঠে আইন অমান্য শুরু করেছেন, এতে তারা মহাখুশি। তাদের মতে এখন সকলেরই উচিত মহাত্মাজীর পতাকার তলে এসে দাঁড়ানো। রজত তাদের সামনে কিছু না বললেও—বয়ঃকনিষ্ঠদের সামনে অতিশয় স্বল্পভাষী সে চিরকালই—মনে মনে ভেবে দেখলে যে, বিপ্লব-পন্থা ত্যাগ করে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে হয়, তা হলে গান্ধী-পন্থী হওয়াই উচিত। লুকিয়ে-চুরিয়ে লোক খুন না করে ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য-আন্দোলনই চালানো উচিত যতক্ষণ না আমরা পূর্ণ-স্বাধীনতা পাচ্ছি। কংগ্রেস যখন এত বড় বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পেরেছে সারা দেশে, তখন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ারও আর কোন সঙ্গত বাধা নেই। বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করাই তো উদ্দেশ্য।

এরপর কিছুদিন কংগ্রেসের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠল সে। যদিও দেশের সব নেতা জেলে, যারা বাইরে আছে তারাও পুলিসের লাঠির চোটে নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশ। তবু এখনও থামবার সময় হয়নি, রজতের মনে হল। এখনও দেশে এত লোক আছে যে, দশ বছর এ সত্যাগ্রহ চালানো যায়, এবং তাই চালাতে হবে। ছবি-আঁকা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত উৎসাহভরে সে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে বেড়ালে কিছুদিন আবার মহিষবাথানে যাবার জন্যে। সতীশ দাশগুপ্ত, সুরেশ বাঁড়ুজ্জে জেলে গেছে তো কি হয়েছে? রজত নিজেই যাবে এবার। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, দেশে লোকের অভাব নেই।

হঠাৎ নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত হল।—গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট। তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল

যেন। লোকটা আবার আপোস করতে উদ্যত হয়েছে! জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত প্রতিবাদ করলেন না! প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে সহযোগিতা করতে দেশ যে কারণে অস্বীকার করেছিল, সে কারণ কি অন্তর্হিত হয়েছে? দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যাবে কোন্ মুখ নিয়ে? সদাশয় আরুইন কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন কেবল অহিংস-রাজবন্দীদের জন্যে। রজতের মনে হল, কেন, দেশের জন্যেই কি সবাই কারাবরণ করেনি? এক দলকে ছেড়ে দিয়ে আর এক দলকে আটকে রাখবার মানে? মহাত্মাজী চুপ করে রইলেন। শোনা গেল কেবল, তিনি চেষ্টা করছেন। তাঁর চেষ্টা বিফল হল যখন, তখন তিনি প্যাক্ট ভঙ্গ করলেন না, চুপ করে রইলেন। বিপ্লবপন্থীরা নিজেরাই চেষ্টা করতে লাগল জেল থেকে। গভর্মেন্টকে আবেদন জানালেন তারা যে, গভর্মেন্ট সত্যিই যদি দেশের শান্তি চান, তা হলে কেবল মহাত্মাজীর সঙ্গে প্যাক্ট করলেই হবে না, তাদের সঙ্গেও করতে হবে এবং তা তারা করতে প্রস্তুত আছে, গভর্মেন্ট যদি পুলিসের মাবফৎ কথাবার্তা না চালিয়ে নিজেরা চালান। যতীন সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে বক্‌সা জেলে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করলেন, গভর্মেন্ট কিন্তু পুলিসের সম্পর্ক ছাড়তে রাজী হলেন না কিছুতে। সব ভেঙে গেল। তাদের কথা কেউ শুনলে না, শোনাবার দরকারও মনে করলে না। মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিস যে মেয়র সুভাষ বোসকে, এডুকেশন-অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জিকে, লাইসেন্স-অফিসার মিস্টার ঘোষালকে ধরে মার দিলে, আইন-অমান্য-প্রতিরোধ-অজুহাতে মেদিনীপুরে, যুক্তপ্রদেশে, গুজরাটে পুলিসের যে যথেচ্ছাচার হয়ে গেল, তার কোনও অনুসন্ধান পর্যন্ত হবে না—মহাত্মাজী বড়লাটের সঙ্গে শর্ত করেছেন। রজত-শুভ্রের সমস্ত বুকটা যেন জ্বলতে লাগল। সে জ্বালা আরও বাড়ল, যখন বিঘোষিত হল সরদার বল্লবভভাই প্যাটেল আগামী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করবেন। প্রচলিত বিধি অনুসারে সভাপতি নির্বাচিত হল না, হল ওয়ার্কিং কমিটি খেয়াল অনুসারে। মহাত্মাজী লাট সাহেবের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, তা যাতে করাচী কংগ্রেসের অনুমোদন পায়, তার ব্যবস্থা করতে ওয়ার্কিং কমিটি বদ্ধপরিকর। তা না হলে মহাত্মাজীর অপমান হবে যে! মতিলাল নেহরু মারা গেছেন, জওহরলাল 'বাপুজী'র বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আর কারও কাছ থেকে কোন বিরুদ্ধাচরণ প্রত্যাশা করা যায় না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আগেই বিতাড়িত হয়েছেন। আমেদাবাদ-বম্বে-দিল্লীর বড় বড় ব্যবসায়ীরাও শান্তির জন্যে উন্মুখ, কারণ আন্দোলনে তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে যে! সুতরাং গান্ধী-আরুইন প্যাক্টকে করাচী কংগ্রেসে পাকা করবার জন্যে তাঁরা অজস্র টাকা ঢালতে লাগলেন অর্থাৎ তাঁদের মনোমত ডেলিগেট সংগৃহীত হতে লাগল, তাঁদের যাতয়াতের ভাড়া ইত্যাদির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। লেফ্‌ট-উইংগাররা সব জেলে। গভর্মেন্টের চক্ষে তাঁরা নন-ভায়োলেন্ট নন বলে ছাড়া পাননি কেউ। সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ করবে কে? সুভাষবাবু ছাড়া পেয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি একা কি করবেন? তাঁর সপক্ষে বাংলা দেশে যারা জেলের বাইরে আছে, তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত-ঘরের যুবক, বাংলা দেশ থেকে করাচী পর্যন্ত যাবার গাড়িভাড়াই জোটাতে পারবে না অনেকে। এদের ভাড়া দেবার মত দেশ-বন্ধু আর তো দেশে নেই। হঠাৎ রজত-শুভ্র ক্ষেপে উঠল। যেমন করে হোক, একাই এর প্রতিবাদ করবে সে। কংগ্রেস শুরু হবার সাত দিন আগে হঠাৎ সে উধাও হল একদিন বাড়ি থেকে। ঝড়ের মত ছুটে চলেছিল সে দিল্লী এক্‌সপ্রেসে করাচীর দিকে। আর কিছু না পারুক, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলবে সে, ভুল করছ, তোমরা ভুল করছ। এরা সব দেশের প্রতিনিধি নয়, ভাড়া-করা-লোক এরা—বড় লোকদের সুবিধা করবার জন্যে এসেছে, দেশের নয়। কিন্তু দিল্লীতে নেবেই একটা খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। ভগৎ সিং আর তার দুজন সঙ্গীর

ফাঁসি হয়ে গেছে। যে গভর্মেন্ট কংগ্রেসের আনুকূল্য চায়, কংগ্রেস বসবার ঠিক চার দিন আগে তার এ কি ব্যবহার! এর একটি অর্থই হতে পারে, রজতের মনে হল। যারা নাম-লেখানো গান্ধী-পন্থী নয়, কংগ্রেস তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না, এবং গভর্মেন্ট সে কথা ভালভাবে জানে বলেই তাদের নিয়ে যা খুশি করবে। ফাঁসি দেবে, বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটকে রাখবে, তাদের বাপ-মা-ভাই-বোনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, তাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবে না। যদিও তারা ভারতের মুক্তির জন্যেই সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তাদের হয়ে একটি কথাও বলবে না, যেহেতু তারা খদ্দরের লেংটি পরে অহিংসার ভণ্ডামি করেনি দুর্গম পথে নির্ভীক বীরের মত যাত্রা করেছে স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। রজতের হঠাৎ মনে হল, এ কংগ্রেসে গিয়ে লাভ কি? সেখানে কিছু বলতে যাওয়া তো অরণ্যে রোদন করা। দিল্লীর রাস্তায় পাগলের মত ঘুরতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল, মামার বাড়িতে যাই, কিন্তু রায়বাহাদুর মাতামহর কথা মনে পড়তেই সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হল। খুড়ীমাও এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়! কিন্তু কি জানি তিনি কি মনে করবেন, এই ভেবে তাঁর খোঁজ করবার চেষ্টাও করলে না সে। চাঁদনি-চকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরে ঘুরে অবশেষে ঠিক করলে, যাব। সুভাষবাবুর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করা দরকার।

সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল সে। তিনি ঠিক করেছেন, লেফ্‌টিস্টদের তরফ থেকে একটা লিখিত বিবৃতি দেবেন কেবল যে, গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট তাঁরা সমর্থন করেন না; কিন্তু প্রকাশ্য সভায় এর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না তিনি। হেরে যাবার আশঙ্কা তো ছিলই, আর একটা কারণও তিনি দেখালেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস বসবার ঠিক চার দিন আগে, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি দেওয়ার অর্থ—গভর্মেন্ট চান, এই নিয়ে একটা বিরোধ হোক কংগ্রেসের মধ্যে। সুতরাং সে বিরোধ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। তা ছাড়া তিনি বললেন, মহাত্মাজীকে আমরা যখন নেতা বলে মেনে নিয়েছি, তখন বিপক্ষের কাছে তাঁর মান-রক্ষা করাই কর্তব্য। সুভাষবাবুর ওপর রজতের ভক্তি ছিলই, এ কথা শুনে তা গাঢ়তর হল। তা আরও বাড়ল নওজওয়ান-ভারত-সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে। ভক্তি বাড়ল বটে, কিন্তু বক্তৃতায় তিনি যা বললেন, যুক্তির দিক দিয়ে তা মূল্যবান হলেও রজত-শুভ্রের রুচিকর হল না। তিনি বললেন, কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা কর তোমরা। কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা মানে—নিজেদের দলে লোক সংগ্রহ করে নিজেদের ভোট বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ টাকা খরচ করে খোশামোদ করে বেড়ানো। কিন্তু দেশের টাকাওয়ালা বণিকেরা স্বার্থের খাতিরে শান্তি-প্রিয় গান্ধী-ভক্ত হয়ে উঠেছে, চাকুরেরা তো বটেই; অধিকাংশ ভদ্রলোকও হয় শান্তি-কামনায়, না হয় মহাত্মা-ভক্তিতে আন্দোলন করতে আর চায় না। এদের খোশামোদ করে বেড়াতে হবে? স্বাধীনতার জন্যে অশান্তির আগুন জ্বালাবে যারা, তাদের সাহায্যে করবার মত বোকা লোক কটা আছে? এই সব লোককে খোশামোদ করে ভজানো রজত-শুভ্রের কর্ম নয়। তার চেয়ে বরং...সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ট্রামে-দেখা সাহেবের মুখটা—বলিষ্ঠ চোয়াল চিবুক—রেশমের মত চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

তা হলে কি করবে সে? তার পৌরুষ ব্যর্থ হয়ে যাবে কোনও পথ না পেয়ে? সুভাষবাবুর দলে লোক-সংগ্রহ করে বেড়ানোই তার জীবনের কাজ হবে নাকি? এ কাজ সে পারবে না। হঠাৎ ঠিক করে ফেললে, ছবি আঁকব আবার। দেশের কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'প্রবাসী' না 'ভারতী' কোথায় যেন অবনীবাবুর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিল। তার প্রথম লাইন কটা

প্রায় মুখস্থই ছিল তার। মনে পড়ল সেই লাইন কটা, ইন্দ্রনীলমণির ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা সামনে রয়েছে, এর ঢাকনা খুলতে বাধা কি? কত শক্ত শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এইটেই কি খুব দুঃসাধ্য হল? দুঃসাধ্য কথাটা উদ্দীপ্ত করে তুলল তার কল্পনাকে। ঠিক করে ফেলল, এই দুঃসাধ্য কাজই সাধ্য করতে হবে তাকে। স্বদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান অপরে করুক, তার দ্বারা হল না ওসব।

রীতিমত 'স্টুডিও'ই গড়ে তুললে আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে। কল্পনা-তুরঙ্গম এমন দ্রুতবেগে ছুটল যে, দেশী-বিদেশীর সম্বন্ধে হুঁশ রইল না আর বড়। বিদেশী রঙ তুলি কাগজ ক্যাম্বিস কিনতেও দ্বিধা হল না। টাকা যোগালেন হংস-শুভ্র। বস্তুত হংস-শুভ্র যেন মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোঁয়ারটা যা খুশি করুক, কিন্তু চোখের সামনে করুক। আজ বম্বে, কাল মীরাট, পরশু করাচী, তার পরদিন চট্টগ্রাম করে বেড়ানোর চেয়ে কতকগুলো রঙ আর তুলি নিয়ে যদি ভুলে থাকে, থাক্। তা ছাড়া মুখে যদিও তিনি রজতের ছবি নিয়ে ব্যঙ্গই করতেন, কিন্তু মনে মনে তারিফ করতেন খুব। তাই টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না তিনি। শশাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য মনে মনে চটছিলেন, বাজে ব্যাপারে এতগুলো টাকা নষ্ট হচ্ছে বলে। কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না তাঁর, সাহসও ছিল না। এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্তও হয়েছিলেন তিনি, যে দলে মিশছিল তা ত্যাগ করে যদি ছবি-আঁকা নিয়ে থাকে, তাও মন্দের ভাল। তাই চুপ করে ছিলেন। তার স্টুডিওতে অবশ্য যাননি একদিনও, ওসব নন্‌সেন্স্ ভালই লাগত না তাঁর। বাসন্তী কিন্তু খুব মেতে উঠল ছেলের স্টুডিও নিয়ে। পরিচিত-মহলে আস্ফালন করার নূতন একটা বিষয় পাওয়া গেল। তার যে ছেলেকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না এতদিন, তার গুণপনা এবার দেখুক সবাই। প্রথম প্রথম রজত নিতান্ত অবহেলা ভরে যে ছবিগুলো এঁকেছিল—এক ঝাঁক প্রজাপতি, একরাশ ফুল, একটা ময়ূর, ছিড়ে ফেলার আগেই কাঙালের মত সেগুলো সংগ্রহ করেছিল বাসন্তী এবং আরও সংগ্রহ করবার আশায় প্রায়ই যেত স্টুডিওতে। যা দেখত, যা পেত, এত বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তা নিয়ে যে, রজত বিরক্ত হত।

একদিন সে বলেই ফেললে, ছবির তুমি কিছু বোঝ না মা। কতকগুলো বাজে ছবি বাঁধাচ্ছ খালি দামী ফ্রেম দিয়ে। কি হবে ওগুলো রেখে?

আমার ভাল লাগে, তাই রাখি।

কিন্তু ওগুলো যে আমার আঁকা, তা বলে বেড়াতে পারবে না সকলকে। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাসন্তী। মনে মনে একটু শঙ্কিতও হল। আস্ফলন করবার জন্যেই সে ছবি সংগ্রহ করছিল না কেবল, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বেড়াজালে বন্দী করবার চেষ্টাও করছিল তাকে। ধরবার ছোঁবার আগেই হীরক জেলে চলে গেল নিঃশব্দ। একে যেতে দেওয়া হবে না, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকাতেই হবে কোন রকমে। রজতেই তার লক্ষ্য, ছবিগুলো উপলক্ষ্য মাত্র।

যেন অসম্ভব কিছু একটা করতে বলছে, মুখের এমনই একটা ভাব করে বাসন্তী বললে, আমি কার মুখ চাপা দেব, বল্? নন্টু, ময়না, মিসেস হালদার, বক্সীর বউ—যে দেখছে, সে-ই প্রশংসা করছে। সেদিন আমার সঙ্গে সেই যে মেয়েটি এসেছিল—পূর্ণিমা ব্যানার্জি, সে তো বললে, নামজাদা ইটালিয়ান আর্টিস্টদের আঁকা ছবির চেয়েও তোর ছবি ভাল। 'খুনে' নাম দিয়ে ছবিটা এঁকেছিস, সেটা তো সে চেয়েই নিলে আমার কাছ থেকে। আমার দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুখ ফুটে চাইলে যখন—

রজত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ছবিতে রঙ দিয়ে যেতে লাগল কোন উত্তর না দিয়ে। অনেকক্ষণ

উভয়েই চুপ করে রইল। বাসন্তী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল। তন্ময় অথচ নির্বিকার কে এ? প্রশংসা দিয়ে কি একে ভোলানো যাবে?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বললে, পূর্ণিমা মেয়েটিকে কেমন লাগল তোর?

দেখিনি ভাল করে।

তোর যদি আপত্তি না থাকে তো বল্, সম্বন্ধ করি।

'খুনে' ছবিটা যদি ওর ভাল লেগে থাকে, তা হলে ওর সঙ্গে সারা জীবন বাস করা যাবে না।

খুনে ছবির বিষয়ে পূর্ণিমা কোন মন্তব্যই করেনি। বস্তুত কোন বিষয়েই কিছু বলেনি সে। গল্পটা বাসন্তী বানিয়ে বলেছিল। নিজের অস্ত্রে নিজেই আহত হয়ে চুপ করে রইল।

তোর খাবার টিফিনকেরিয়ারে দিয়ে গেলুম, খাস যেন মনে করে।

অত রকম খাবার আন কেন রোজ রোজ, কে খাবে অত?

আজ বেশি নেই।

বাসন্তী বেরিয়ে চলে গেল। কিছুতেই ছেলেটাকে বাগাতে না পেরে সে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়েছিল। আর কেউ না বুঝলেও তার মাতৃ-হৃদয়ের কাছে এ কথা অবিদিত ছিল না যে, এই খেয়ালের খেলাঘরে ও বাঁধা পড়েনি, আর এক খেয়ালের ঝোঁকে এক নিমেষে সমস্ত চুরমার করে দিয়ে চলে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ও।

কিছুদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। তার কারণ, রজত নিজেই জেদ করে নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল। খবরের কাগজ পড়ত না, পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করত না, পাছে দেখা হয়ে যায়—এই ভয়ে ট্যাক্সি ছাড়া রাস্তায় বেরুত না সে। স্টুডিওর দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম ছিল, বাড়ির লোক ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়। সে যেন চোখ বুজে কাণে তুলো দিয়ে বাইরের খবরকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল প্রাণপণে। সে খবর ভয়ঙ্কর, তা জানতে পারলেই শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে, তার হল্‌কায় শিল্পকলার সমস্ত সৌন্দর্য পুড়ে কালো হয়ে যাবে এক নিমেষে-এ ধারণা তার ছিল বলেই জোর করে সে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল রাজনৈতিক আবর্ত থেকে। বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করছিল মনকে— ছবির জগতেই মূর্ত কর তুমি নিজেকে। নখদন্তের নির্বিচারে ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হও যখন, তখন পশুর জগতে তোমার স্থান নেই। নিরন্তর এই মন্ত্র জপ করে সে ক্রমাগত ছবি এঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে একটা অস্বস্তির তুষানল ধিকধিক জ্বলছিল গোপনে গোপনে। নানা রঙের প্রলেপ দিয়েও আহত আত্মসম্মানের কুৎসিত কালো রঙটাকে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না সে একেবারে।

মনে হত, ভীরু ভীতু নপুংসক আমি, তাই পালিয়ে এসেছি, যতীন ঘোষের বিধবাকে বাঁচিয়ে তার স্বামীকে হত্যা করতে পারছিল যে, সে-ই বীর। তুলি থেমে যেত। মনে পড়ত ইন্দু-পিসীর কথাগুলো, পুলিস অফিসাররা মরতে ভয় পায় না, তারা জানে যে, তারা মরে গেলে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের গভর্মেণ্ট প্রতিপালন করবে, চাকরি দেবে, জায়গীর দেবে। তাই পুলিস অফিসারটিকে মেরে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের বংশলোপ করতে হবে। বিধবাটা বেঁচে থাকবে শুধু হাহাকার করবার জন্যে।

রজত শিউরে উঠত, প্রাণপণে চেষ্টা করত ছবিতে মন দেবার। লজ্জায় ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে, পরিপূর্ণ হয়ে উঠত সমস্ত অন্তর।

হঠাৎ একদিন স্টুডিওতে এসে দেখলে, তার টেবিলের ওপর মোটা লম্বা খাম রয়েছে একখানা।

দারোয়ান বললে, বাইসিক্লে করে এক বাবু এসে চিঠিখানা দিয়ে গেছেন। কোন ঠিকানা নেই—খোলা খাম। তার থেকে বেরুল এক তাড়া কাগজ এবং খবরের কাগজের কার্টিং। রজত পড়তে লাগল এবং পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল তার। করাচী কংগ্রেসের পর থেকে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক খবর লেখা ছিল, কাগজগুলোতে। সে এতদিন ইচ্ছে করেই কিছু জানতে চায়নি, জানবার পর কিন্তু পাগল হয়ে উঠল। কংগ্রেস কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী একাই চলে গেছেন বিলেতে গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগ দেবেন বলে। কংগ্রেসের এই একমেবাদ্বিতীয়তম্ ভক্তিতে রজতের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল যেন। লর্ড আরুইনও বিদায় নিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে এসেছেন লর্ড ওয়েলিংডন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্যাক্ট করবার দুর্বলতা দেখিয়ে পাদ্রীপ্রতিম লর্ড আরুইন ব্রিটিশ গভর্মেন্টের যে মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন, লর্ড ওয়েলিংডন সেই মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। প্যাক্টের শর্ত যে গভর্মেন্টের তরফ থেকে পুরোপুরি প্রতিপালিত হচ্ছে না, এ কথা জেনেও মহাত্মাজীর বিলেত যাবার আবেগ কিছুমাত্র কমেনি। গুজরাটের চাষীদের বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দিতে নানা বখেড়া করেছেন গভর্মেন্ট, যুক্তপ্রদেশের গরিব চাষীদের খাজনা মাফ করা হয়নি, বাংলা দেশে এখনও দলে দলে লোককে বিনা বিচারে আটক করা হচ্ছে। মহাত্মাজী শেষ-মুহূর্তে এসব সম্বন্ধে যা হোক একটা আপোস করে বিলেত চলে গেছেন। সবাই কিন্তু চুপ করে থাকেনি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীরা ছাড়া বাকি সকলে তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে প্যাক্টের। বাংলা দেশ প্রতিবাদ করেছে আরও সক্ষমভাবে। কিছুদিন আগেই ঢাকা-ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অন্তরালে যে রূঢ় সত্য প্রত্যক্ষ করেছে বাঙালী, তার ফলে মিস্টার লোম্যানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আসামীকে খোঁজবার জন্যে পুলিস বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে কাণ্ড করছে...হঠাৎ হাত থেকে কাগজের তাড়াটা কে যেন ছিনিয়ে নিলে। রজত চমকে চেয়ে দেখলে, ইন্দু-শুভ্রা। তার চোখে মুখে যেন ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হয়ে আছে।

অতিশয় ধীরকণ্ঠেই সে কিন্তু বললে, এ নিয়ে আর তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন, এ গুলো আমার জন্যে এসেছে।

আমি যদি ঘামাই ক্ষতি কি?

এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার নেই তোমার। তুমি ছবি আঁক।

রজতের মনে হল, তার গালে কে যেন চড় মারলে একটা।

ইন্দু-শুভ্রা কাগজের তাড়াটা হাতে করে যাচ্ছিল।

ছোট পিসী, যেও না, একটা কথা শোন আমার।

কাগজগুলো পড়বার পর রজতের যে ব্যবহার ইন্দু প্রত্যাশা করেছিল, রজতের কম্পিত কণ্ঠস্বরে তারই আভাস পেয়ে ফিরে দাঁড়াল সে।

তোমার প্রলাপ শোনাবার অবসর আমার নেই। সত্যি যদি করতে চাও, সঙ্গে আসতে পার।

বাধ্য বালকের মত উঠে গেল রজত-শুভ্র।

পড়ে রইল স্টুডিও আর চতুর্দিকে ছড়ানো অসংখ্য ছবি।

এর পর কিছুদিন তার যে ভাবে কাটল, তার বর্ণনা সে নিজেও বোধ হয় করতে পারত না সম্পূর্ণভাবে। সব কথা সম্পূর্ণভাবে জানবার সুযোগই হয়নি তার। অন্ধভাবে যন্ত্রচালিতবৎ যে সব কাজ তাকে করতে হয়েছে, তার কোন অর্থই সে বুঝতে পারেনি অনেক সময়ে। বোঝবার হুকুমও

ছিল না। ছবিই আঁকতে হয়েছে নানা রকম। উড়ন্ত পাখির, ঘুমন্ত শিশুর, ভিখারীর, তরুণীর, মন্দিরের, ঘড়ির, কত রকম যে তার ঠিক নেই। ছবিগুলোর সঙ্কেত যে কি, কার কাছে সেগুলো কবে কেন পাঠানো হচ্ছে, এসব কিছুই জানবার উপায় ছিল না। দিনকতক রিভল্‌ভার নিয়ে চাঁদমারি করতে হল এক অচেনা পল্লীগ্রামের জনমানবহীন ধ্বংসোন্মুখ বাগান-বাড়িতে গিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পুরীতে চোরের মত লুকিয়ে বাস করতে হত শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে, আর যে কোনও বস্তুর ওপর গুলি চালিয়ে ঠিক করতে হত হাতের লক্ষ্য। ঠিক ছিল, পরীক্ষক আসবেন একদিন। হঠাৎ অচেনা যুবক এলেন একজন কোন খবর না দিয়েই, আবির্ভূত হলেন যেন ঝোপের ভেতর থেকে। পকেট থেকে বার করে দেখালেন তারই আঁকা উড়ন্ত পাখির ছবি, বোঝা গেল দলেরই লোক। গাছ থেকে একটা ডাব পেড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে বললেন, মারুন দিকি। রজতের হাতের লক্ষ্য দেখে খুশি হয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন। হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বরের প্ল্যাটফর্মে কালো-রঙের-সাহেবী-সুট-পরা এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে, কাল ঠিক বেলা বারোটার সময়। তিনি আপনাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবেন। কালো-সাহেবী-সুট-পরা ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন একটা হোটেলে। সেখানে আরও কয়েকটি যুবক অপেক্ষা করছিল। নাম লটারি করা হল। রজতের নাম উঠল না, উঠল বিনয়ের। মিস্টার সিম্‌প্‌সনকে গুলি করবার ভার পড়ল তার ওপর। রজতকে বলা হল, পরশু রাত্রে তুমি লুপ লাইনের ঘোঘা আর কহল্‌গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গাতে রেল-লাইনের বাঁ ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে টর্চ হাতে করে। লুপ এক্‌স্‌প্রেস যখন যাবে, তখন কয়েকবার টর্চ জ্বালাবে কেবল, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। অন্ধকার রাত্রে একহাঁটু ঘাসের মধ্যে প্রেতের মতন দাঁড়িয়ে রইল সে। যথাসময়ে টর্চও জ্বালালে, কিন্তু কেন তা জানবার উপায় ছিল না। এই ষড়যন্ত্রের বিরাট ফ্যাক্টরিতে সে যেন একটা 'নাট' কিংবা 'বলটু' যখন যেখানে দরকার লাগানো হচ্ছে তাকে। রিভল্‌বারও সংগ্রহ করে বেড়াতে হল আবার কিছুদিন। সায়নাইডও। নানা রকম ছদ্মবেশে ধরে একজন সি. আই. ডি অফিসারের পেছনে ঘুরে ঘুরে তার গতিবিধির ইতিহাসও যোগাড় করতে হল। সুসঙ্গে কুসঙ্গে অনাহারে অনিদ্রায় পদব্রজে ট্রেনে স্টীমারে নৌকায় কত জায়গায় কত দুর্গতির মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যে সে, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিছুদিন পরে মনে হতে লাগল, তার দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা কিছুই যেন তার নিজের নয়। হৃদয়ের নেপথ্যলোকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ চিকমিক করে উঠত। মনে হত, নির্বিচারে এমন ভাবে নিজের স্বাধীন সত্তার শ্বাসরোধ করা কি ঠিক হচ্ছে? তখনই মনে পড়ত ছেলেবেলায় পড়া সেই ইংরেজী কবিতাটা—They are not to make reply, They are not to reason why, They are but to do and die... প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে থাকত সে। বহুদিন আগে ট্রামে সাহেবের সুন্দর মুখশ্রী দেখে তার মনে যে সুকুমার-বৃত্তি জেগে উঠেছিল, সবলে তার টুঁটি চেপে ধরবার চেষ্টা করত সে। বার বার আবৃত্তি করত মনে মনে, ওসব দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, You are but to do and die। মেরে মরবার জন্যে প্রস্তুতই হয়েছিল সে মনে মনে। লটারিতে নাম উঠলে সে-ই যেত।...হঠাৎ খবর এল, সিম্‌প্‌সন মারা পড়েছে, কিন্তু বিনয়ও পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে গেছে সে। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। লুকিয়ে পড়ল সবাই। হ্যাঁ, ভয়ে ভয়েই। খবর এল, পুলিস তার বাড়ি সার্চ করেছে। চট্টগ্রামে, ঢাকায়, মেদিনীপুরে প্রতি ঘরে ঘরে পুলিস হানা দিচ্ছে। গ্রেপ্তার করেছে অনেককে—অনেক নিরীহ লোককে, বিপ্লবের 'ব'ও যারা জানে না। তবু চোরের মত আত্মগোপন করে থাকতে হল। পুলিসের ছায়ামাত্র দেখলে পালিয়ে যেতে হত, বেরালের ভয়ে ইঁদুর যেমন পালায়। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যেত

তার এ কি হীনতা! একদিন সে দলপতিকে বললে, এ রকম পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে, আসুন, আমরা প্রকাশ্যভাবে সবাই মিলে আক্রমণ করি ওদের। যদি কিছু নাও করতে পারি, ওদের গুলি খেয়ে রাস্তার মরে পড়ে থাকাও ঢের বেশি গৌরবজনক। তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ওয়েট, ইওর চান্স্ উইল কাম। কিন্তু কিছুতেই তার নাম উঠল না। পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট মারা গেল মেদিনীপুরে, কিন্তু তার ভাগ্যে এক লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার সুযোগ এল না। কি গ্লানিকর এই লুকিয়ে থাকা! ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের লোমহর্ষক কাহিনী সব কানে আসছে, তবু লুকিয়ে থাকতে হবে নিজের প্রাণভয়ে নয়, দলের খাতিরে! অসংখ্য নিরীহ লোক নির্যাতিত হচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে সত্য কথা বলবার উপায় নেই। হিজলি ক্যাম্পে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চলল—সন্তোষ মিত্তির, তারকেশ্বর সেন মরে গেল, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে! শুধু বাংলা দেশ নয়, অন্যত্রও অশান্তির আগুন জ্বলছিল। পশ্চিম-সীমান্তে আবদুল গাফ্‌ফার খাঁ এবং তাঁর খুদাই-খিদামৎগাররা পুলিসের বেড়াজালে ধরা পড়ে জেলে পচছিলেন। খাজনা দিতে অসমর্থ যুক্তপ্রদেশের চাষীরা কিষাণ-সভার নেতৃত্বে আবার নো-রেণ্ট-ক্যাম্পেন শুরু করেছিলেন, কিন্তু গভর্মেণ্ট নূতন অর্ডিনেন্স করে সব থামিয়ে দিলেন। সেখানেও দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে। হঠাৎ খবর এল, গোল-টেবিল-বৈঠক থেকে মহাত্মা গান্ধী শূন্যহস্তে বম্বেতে অবতরণ করেছেন যদিও, তবু মহাসমারোহ পড়ে গেছে সেখানে। জওহরলাল এবং সেরওয়ানি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রেনেই পুলিস গ্রেপ্তার করেছে তাঁদের। দেশে যখন তুমুল ঝড় বইছে, তখনও ভস্ম মেখে দাড়ি-জটা পরে রজতকে লুকিয়ে থাকতে হবে! খবর এল, পুলিস আরও দুবার তার বাড়ি সার্চ করেছে, মাকে বউদিদিকে পর্যন্ত অপমান করেছে নাকি! বাড়ি ফিরে যাবে কি না ভাবছিল, এমন সময় বড়লাটের সঙ্গে টেলিগ্রাম-চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে মহাত্মাজী আবার শুরু করে দিলেন সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। গভর্মেণ্ট এবার প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁরাও কংগ্রেস-সম্পর্কিত সব-কিছুকে ঘোষণা করলেন বে-আইনী বলে। পুলিসের আইন অমান্য করে তবু কিন্তু শুরু হয়ে গেল পার্কে পার্কে মাঠে মাঠে সভা, বেরুতে লাগল বড় বড় শোভাযাত্রা পথে পথে। জওহরলাল নেহেরুর বৃদ্ধা জননী পুলিসের হাতে মার খেলেন এক শোভাযাত্রার নেত্রীরূপে, থামলেন না তবুও। শুরু হল পিকেটিং, শুরু হল বয়কট, উড়তে লাগল আবার ত্রিবর্ণ-পতাকা হাটে বাটে মাঠে, হর্ম্যে, মন্দিরে, কুটীরে, গাইতে লাগল সবাই স্বদেশী গান, তৈরি হতে লাগল নুন। কংগ্রেস-অধিবেশন দিল্লীতেই বসল, সভাপতি মদনমোহন মালবীয়কে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও। চাঁদনি-চকের ক্লক-টাওয়ারের নীচে বসল, আমেদাবাদের রণছোড়দাস অমৃতলাল সভাপতিত্ব করলেন। পুলিস বাধা দিলে অবশ্য, কিন্তু কংগ্রেস-অধিবেশন বসল এবং কংগ্রেস তার পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা না করে ছাড়ল না। ভরে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের সমস্ত জেল। রজত যদিও গান্ধী-ভক্ত নয়, তাঁর গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়া, তাঁর সমস্ত কার্ড টেবিলের ওপর রাখা, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অহিংসা-মন্ত্র প্রচার, তাঁর প্রথমে ছলে-বলে-কৌশলে বামপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা এবং পরে বেগতিক বুঝলেই অপটুভাবে তাদের অনুসরণ করা, তাঁর গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট, কথায় কথায় উপবাস, এর কোনটাই রজতের পছন্দ হত না; তবু কিন্তু সত্যাগ্রহীদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। এক-একবার ইচ্ছে করতে লাগল, ছুটে গিয়ে ওদের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে পুলিসের মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে, পারলে না কেবল দলের খাতিরে। স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক হবে না বলে। অসীম কষ্ট সহ্য করে অজ্ঞাতবাসই সে করতে লাগল।...ম্যালেরিয়া ধরল, ডিসেন্ট্রি হল, খাবার ঠিক নেই, শোবার জায়গা নেই, তবু কিন্তু আত্মপ্রকাশ করলে না সে। যত কষ্টই হোক, দলের আদেশ মানতে হবে। হঠাৎ একদিন দলের একজনের সঙ্গে

দেখা হল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও রজতকে চিনতে পেরেছিল সে। আড়ালে ডেকে বললে, পালাও পালাও, বনে জঙ্গলে হিমালয়ের বর্মায় যেখানে পার, পালাও শিগগির। আমাদের দলের কয়েকজন অ্যাপ্রুভার হয়েছে, আরও হবে। যে কজনের নাম করলে, তারা সবাই রজতের পরিচিতি। এরা অ্যাপ্রুভার হয়েছে?...নির্বাক হয়ে বসে রইল সে। মনে হল পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য আর কিছু নেই যেন...পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। হঠাৎ ঠিক করে ফেললে, যে দলে অ্যাপ্রুভার থাকে, সে দলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না সে। সে দলের হুকুম মানবার প্রয়োজন নেই আর, স্পোর্টস্‌ম্যানদের সঙ্গেই স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক ব্যবহার করা চলে, বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে নয়। আর সে অজ্ঞাতবাস করবে না, আত্মপ্রকাশ করবে এবার। পুলিস যদি ধরে ধরুক। এর মধ্যে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে, লুকিয়ে থাকার মধ্যে নেই। জটা-দাড়ি খুলে ফেলে একটা পুকুরে নেবে ভাল করে স্নান করলে সে। স্নান করে উঠে ব্যাগ থেকে ধুতি পাঞ্জাবি বার করে পরতে পরতেই কিন্তু কম্প দিয়ে জ্বর এল—ভীষণ কম্প। কিছুদূর গিয়েই আর চলতে পারলে না সে। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে, ব্যাগটা মাথায় দিয়ে। দিন দশেক পরে যখন চোখ খুললে, তখন দেখলে, রাস্তায় নয়, বিছানায শুয়ে আছে সে এবং তার দিকে উৎসুক আগ্রহে চেয়ে আছে একজোড়া কালো চোখ। কাজল।

।। তিন।।

কাজল বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কেন্দ্র করে যা ঘটল, তার জন্যে দায়ী কেবল তার রূপ নয়, সে রূপের টীকাকার শিল্পী রজতও। রজতের মনে হল, কাজলের চোখ শুধু কালো নয়, তার দৃষ্টিও ভাষা-ভরা। মনে হল, ওর দেহ শুধু মাংস-মেদ-মহিমাব সাবলীল প্রকাশই নয়, সে দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গে লেখা আছে আমন্ত্রণও। কাজল নিজে কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন নয়। তার উৎসুক চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় রজতকে বললে, এতদিন পরে তুমি এলে!—তখন জ্ঞাতসারে তার মনে এ রকম কোন ভাব জাগে নি। গৌরকান্তি প্রশস্তললাট রজতকে দেখে তার ভাল লেগেছিল অবশ্য, কিন্তু আর কিছু নয়। তার পীবর স্তনযুগল, কম্পিত করপল্লব, সুঠাম শ্রোণী, সন্নত দৃষ্টি, লজ্জারুণ কপোল, রক্তিম বিম্বাধর যখন নীরব ভাষায় আহ্বান করছিল রজতের পারুষ্যকে, তখন জ্ঞাতসারে কিন্তু সে সঙ্কুচিত হচ্ছিল মনে মনে। ভাষার দ্বারা তো নয়ই, চিন্তাতেও সে রজতকে প্রণয়ী হিসাবে প্রশ্রয় দেয়নি। রজত কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছিল। তার শিল্পী মন কাজলের কালো চোখের দৃষ্টিতে নিত্যনূতন ভাষা আবিষ্কার করছিল ক্ষণে ক্ষণে। কখনও মনে হচ্ছিল, সে দৃষ্টি যেন বলছে, —ছি ছি, কি ভীতু ভালমানুষ তুমি! আবার কখনও বলছে, ভয় কি তোমার? সে যখন মুখ ফিরিয়ে বাতায়ন-পথে চেয়ে থাকত, রজতের মনে হত, সে দৃষ্টি থেকে যেন অভিমান ক্ষরিত হচ্ছে; ক্ষণপরেই মৃদু হেসে যখন চাইত তার দিকে, মনে হত, কালো চোখের তারা থেকে উপচে-পড়া আলোর ঝলক যেন বলে গেল কানে কানে, ইস্, ভারি বয়ে গেছে আমার! আবদার অনুযোগ বিস্ময় প্রশ্ন অনুরাগ অভিমানের এমন ভাষাময় স্বচ্ছ প্রকাশ কারও চোখের দৃষ্টিতে রজত দেখেনি। এই দূর বিদেশে দুর্বল দেহে হতাশ চিত্তে সে যখন লুটিয়ে পড়েছিল পথের ধুলায়, তখন কি আশ্চর্য, যে রহস্যময়ী তাকে এমন ভাবে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছে, সে কুৎসিত নয়! তার দৃষ্টির অন্তরালে শিল্পীকাম্য রহস্য লুকিয়ে আছে! যে আদর্শের জন্যে সে জীবনপাত করেছে, বিশ্বাসঘাতকতার আগুনে তা যখন পুড়ে গেল দাউদাউ করে, আত্মপ্রকাশ করে

পুলিসের কবলে পড়বার জন্যেই সে যখন প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, তখন এ কি অপরূপ মধুর জগতে উত্তীর্ণ করে দিলেন তাকে বিধাতা! যুবতী নারীর এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইতিপূর্বে সে আর আসেনি কখনও। যে জীবন সে এতকাল যাপন করেছে, তাতে আদি-রসের কোন স্থান ছিল না।...এখন হঠাৎ যেন অনুভব করলে, বঞ্চিত হয়ে ছিলাম এতদিন। যে কেবল লক্ষ্যই করছিল কোন প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করবার সঙ্গত বিষয় একটা অন্তত ছিল। অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করতে পারত, বাড়িতে এক ঝি ছাড়া অন্য লোক নেই কেন, আর সবাই কোথায় গেল? দু-চারজন যারা খোঁজ নিতে আসে, তারা পাড়াপড়শী, আসে আর চলে যায়। কিন্তু কিছুই জানবার সাহস হচ্ছিল না তার, মনে হচ্ছিল, জানতে পারলেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে বোধ হয়।...

সুস্থ হয়ে উঠল যখন, তখন কাজলই একদিন প্রশ্ন করলে তাকে, আপনার বাড়ি কোথায়?

কলকাতা।

এই কথায় কাজলের চোখের দৃষ্টিতে যে আলো ঝলমল করে উঠল, রজতের মনে হল, তার অর্থ—তাই এমন!

আপনার নাম কি?

রজত—শ্রীরজত-শুভ্র মুখোপাধ্যায়।

কাজলের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আনন্দ। রজতের মনে হল, সে দৃষ্টি যেন বলে উঠল, বেশ নামটি তো!

এখানে এসেছিলেন কেন?

তা বলব না।

কাজলের দৃষ্টির স্বচ্ছতায় নামল অভিমানের ছায়া।

রজত কোনও প্রশ্নই করলে না। কেবল বললে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এইবার যাব ভাবছি।

চোখের দৃষ্টিতে সকরুণ মিনতি যে এমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, তা রজতের কল্পনাতীত ছিল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সে।

কাজল মুখে বললে, এর মধ্যেই যাবেন কেন? আর একটু সেরে উঠুন, তারপর যাবেন। এখনও তো দুর্বল আছেন।

রজত থেকে গেল। 'আপনি' 'তুমিতে পর্যবসিত হল ক্রমশ এবং কয়েকদিন পরে যে কাণ্ড সে করে বসল তা ভদ্রভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার নিজের কাছে এর একটা সঙ্গত জবাবদিহি ছিল অবশ্য, এবং এক কাজল ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে সে প্রস্তুত ছিল না। তার ভরসা ছিল, কাজল তাকে ক্ষমা করবে। প্রথমে কাজল বাধা দিয়েছিল একটু, কিন্তু সেটা খুব প্রবল বলে মনে হয়নি রজতের। ঘটনাটা ঘটে যাবার পরও কাজলের যে দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল, তা, রজতের মনে হল, ঘৃণার নয়, আনন্দের। কাজল মুখে কিন্তু বললে, এ কি করলেন আপনি?

তুমি সর্বাঙ্গ দিয়ে ডাকছিলে আমাকে, সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

আমি ডাকছিলাম? —দৃপ্ত কণ্ঠে তর্জন করে উঠল সে। যে চোখ দুটি হাসছিল বলে রজতের মনে হয়েছিল, তাতে দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

রাগ করো না। আমি তোমাকে চাই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত আছি আমি।

রাগ করো না। আমি কে, কোন্ জাত কিছুই জানেন না, দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন?

আছি।

আমি যদি বিবাহিত হই?

তোমার মাথায় সিঁদুর তো নেই!

সব জাত সিঁদুর পরে না।

তা হলেও ছিনিয়ে নিয়ে যাব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

আর আপত্তি থাকে যদি?

তা হলে জোর করব না, আর যা করেছি তার জন্যে যদি শাস্তি দিতে চাও, নিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

মৃত্যুদণ্ড চাইলেও দেব কি করে? আপনার গায়ে যা অসুরের মত জোর!

তার ব্যাগটা ঘরের কোণেই রাখা ছিল। উঠে গিয়ে রজত তার থেকে রিভল্‌ভারটা বার করে এনে বললে, এই নাও, লোডেড আছে।

বিস্ময় ফুটে উঠল কাজলের চোখে। মুখে বললে, খুব হয়েছে, রেখে দিন।

দু দিন পরেই কাজলের বাবা ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর মাতৃহারা মেয়েটিকে ঝিয়ের জিম্মায় রেখে তারই পাত্রের সন্ধানে বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন ছুটি নিয়ে। পাত্র যোগাড় হয়নি, কারণ গরিব লোক ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনও বিশেষ কেউ ছিল না। কাজলই তাঁর একমাত্র সন্তান। নিজেই মানুষ করেছিলেন মা-হারা মেয়েকে, বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে বড় বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়েছেন----এই অপরাধে পাড়ার লোকেরাও কেউ বিশেষ সদয় ছিলেন না তাঁর উপর। তাই তাঁর অবর্তমানে কাজল যখন একটা অজ্ঞাতকুলশীল অজ্ঞান যুবককে ঘরে টেনে তুললে, তখন পাড়ার লোক তাকে মানা তো করলেই না, ভবিষ্যৎ সান্ধ্য-আড্ডার খোরাক-সংগ্রহমানসে ভাবে ভঙ্গীতে উৎসাহই দিতে লাগল বরং।

প্রায় বছর দেড়েক অজ্ঞাতবাসের পর কাজলকে নিয়ে সে যখন কলকাতায় ফিরল, তখন মহাত্মা গান্ধী আবার উপবাস শুরু করেছেন অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে। মালবীয়জীর অনুরোধে হিন্দুনেতারা হৈ-হৈ করছেন তাঁকে ঘিরে পুণা জেলে। সত্যাগ্রহের উত্তেজনা মিইয়ে গেছে, সমস্ত উত্তেজনা মহাত্মাজীকে ঘিরে। গভর্মেণ্ট কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন দেশের ঘাড়ে নূতন কন্‌স্টিট্যুশন চাপাবার জন্যে, নরম মেজাজের নেতাদের নিয়ে তৃতীয় গোল-টেবিল-বৈঠকও বসবে নাকি আবার। বাংলা দেশের পুলিস নব নব অর্ডিনেন্সের বলে বলীয়ান হয়ে ডগ্‌লাস এবং এলিসন হত্যার প্রতিশোধ তুলেছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগনার ঘরে ঘরে। বিপ্লবীদের কেউ জেলে, কেউ ফাঁসি গেছে, কেউ অ্যাপ্রুভার হয়েছে। রজত কাজলকে নিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠল। বাড়িতে স্থান পাবে কিনা সন্দেহ ছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল একটা চাকরির। হাতে একটি পয়সা ছিল না। কিন্তু চেষ্টা করলেই চাকরি পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, কাজলকে হোটেলের ঘরে একা বসিয়ে রেখে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্কে এসে বিশ্রাম করত। তেষ্টা পেলে জলখেত রাস্তার কল থেকে। হঠাৎ একদিন শঙ্খ-শুভ্রের সঙ্গে হয়ে গেল রাস্তায়। শঙ্খ দেখতে পায়নি, রজতই ডাকলে তাকে। ডেকেই কিন্তু মনে হল, ভুল করেছি।

কালো-রঙ, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, উস্কোখুস্কো-চুল এই লোকটাই যে রজত, তা পরিচয় না দিলে শঙ্খ চিনতেই পারত না।

সমস্ত শুনে বললে, কি হয়েছে তাতে? বাড়ি চল্।

বাবা যদি তাড়িয়ে দেন?

রজতের ভীত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ। সেই রজত কি হয়ে গেছে!

আচ্ছা, আমি বলব বাবাকে। তোর ঠিকানাটা কি?

সহসা সাবেক রজত আত্মপ্রকাশ করলে যেন।

ঠিকানা দিচ্ছি। আমার জন্যে অনুরোধ করতে হবে না কাউকে।—গর্জন করে উঠল যেন।

শঙ্খ বললে, অনুরোধ করব না, খবরটা দেব খালি।

ঠিকানা নিয়ে শঙ্খ চলে গেল। রজত চেয়ে রইল নিখুঁত সাহেবী-সুট-পরা শঙ্খর দিকে। তারই দাদা!

শঙ্খ খবরটা তনিমাকেই বলেছিল প্রথমে। বাবাকে বলতে তারও সাহস হয় নি। সব শুনে তনিমা খানিক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর মুচকি হাসলে একটু।

সমস্ত ব্যাপারটা তুমি যদি আমার হাতে ছেড়ে দাও, তা হলে আমি সব ঠিক করে দিতে পারি। তুমি কিন্তু কাউকে একটি কথা বলতে পারবে না।

বেশ।

তনিমা বাসন্তীকে গিয়ে বললে, মা, আমার এক বন্ধুর মুখে আজ শুনলাম, ঠাকুরপো নাকি পছন্দ করে বিয়ে করেছে কাজল বলে এক মেয়েকে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল বাসন্তী।

কোথায়?

তা সে জানে না। খবর নিতে বলেছি।

কে বন্ধু তোমার?

আপনি চেনেন না তাদের। চট্টগ্রামে বাড়ি। ঠাকুরপোর সঙ্গে খুব আলাপ। আমি যখন সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম, তখন দেখা হল তার সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায়।

বাসন্তী খবর দিলেন শশাঙ্ক-শুভ্রকে। শশাঙ্ক মুখে যদিও বললেন—মরুকগে, মনে মনে কিন্তু তিনিও কম উৎসুক হলেন না।

দু দিন তনিমা চুপ করে রইল।

তৃতীয় দিন বাসন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন, রজতের কোনও খবর পেলে?

এখনও পাইনি।

ঘন্টা-দুই পরে শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করলেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তুমি ভাল করে খোঁজ কর আজই। গাড়িটা নিয়ে যাও না হয় তাদের বাড়ি।

তনিমা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এসে বললে, শুনলাম, কাল তারা কলকাতায় আসছে। এসে বউবাজারের একটা হোটেলে উঠবে।

হোটেলে?—প্রশ্ন করলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

তাই তো শুনলাম।

ঠিকানা এনেছে?

এনেছি।

সইয়ে সইয়ে খবরটা বলাতে ফল হয়েছিল। তনিমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ।

তার পরদিন যখন চেনা 'মিনার্ভা' গাড়িখানা হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক-শুভ্র, বাসন্তী এবং তনিমাকে নিয়ে বউবাজারের গলিতে সেই হোটেলের সামনে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল, তখন রজতের যেন মাথা কাটা গেল। দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহ করতে এসেছেন সবাই! আঃ, কি লজ্জা!

সামনাসামনি হতেই সে বলে উঠল, কেন এসেছ তোমরা? আমি যাব না।

যাবি না কেন?—বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল তাঁর।

যে সর্বনাশকে আমি স্বেচ্ছায় জীবনের সাথী করেছি, তার সঙ্গে তোমাদের জড়াব কেন?

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হংস-শুভ্রের চোখ দুটো।

তোমার মত লোকের সঙ্গে বাস করবার ইচ্ছে আমাদেরও নেই।

তোমার পূর্বপুরুষ তোমার জন্যে যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার ভার বয়ে বেড়াবার দায়িত্বও আমরা নিতে রাজী নই। এই নাও।

বিশ হাজার টাকার চেক তিনি লিখেই এনেছিলেম।

এই টাকাটা তোমার অংশে জমা আছে। তোমার বাকি সম্পত্তির হিসেব তুমি গিয়ে বুঝে নিও একদিন—ওর হাঙ্গামা পোয়াতে আমি পারব না। আমি চললুম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রজতের চোখে পড়ল, মা কাঁদছেন, বাবা অস্বাভাবিক রকম চুপ করে আছেন।

তনিমা বললে, আজকের মত চল অন্তত ঠাকুরপো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রজত বললে, বেশ, চল।

তারপর কাজলের দিকে ফিরে বললে, মাকে, বাবাকে, বউদিকে প্রণাম কর। দাদু সত্যিই চলে গেলেন নাকি?

বেরিয়ে গিয়ে দেখে এল, সত্যিই চলে গেছেন। গাড়িটা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

কাজল কলকাতায় এসে থেকে অসম্ভব রকম নীরব হয়ে গিয়েছিল, তার দৃষ্টির সে মুখরতাও আর ছিল না যেন। দৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে ছিল খালি ভয়। তার জীবনে ঝঞ্ঝার মত এসে এই লোকটি কোন্ অনিশ্চিত পরিণামের দিকে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তার কোনও আভাসই সে পাচ্ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলেই নীরব হয়ে ছিল। বিয়ের আগে রজতের সমস্ত ইতিহাস শুনেছিল সে। শ্বশুরকে সব কথা না বললেও তার কাছে রজত কিছুই গোপন রাখেনি। রজতের শেষ কথাগুলো সব সময়েই যেন কানে বাজত তার—আমার মত খামখেয়ালী লোকের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াবার আগে একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নীরবে যদি আমার অনুসরণ করতে না পার, দুঃখ পাবে। অনুসরণ করলেও যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে, তার ভরসা নেই। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদ করলে সে দুঃখ আরও গ্লানিকর হয়ে উঠবে। আমি তোমাকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাব, কিন্তু তোমার দিকটা তুমি ভেবে দেখ ভাল করে।

নারীমাত্রেই পুরুষের মধ্যে যে বীরকে পূজা করতে চায়, যে আত্মভোলা সর্বশক্তিমানকে বাঁধতে চায় মায়ার বন্ধনে, রজতের মধ্যে সেই দুর্জয়কে প্রত্যক্ষ করে কাজল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সেদিনকার দুষ্কৃতিটাকেও আর দুষ্কৃতি বলে মনে হচ্ছিল না তার। বরং এই দুরন্ত পুরুষ যে তার তুচ্ছ দেহটার মোহে ক্ষণিকের জন্যেও অভিভূত হয়েছিল, এজন্য একটা সূক্ষ্ম গর্বই জাগছিল তার মনে। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের সেই লাইনটা—"যে পথিক পথের ভুলে, এল মোর প্রাণের কূলে, পাছে তার ভুল ভেঙে যায়—"

মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিয়েছিল, আমি কোনও প্রতিবাদ করব না।

তাই কোনও প্রতিবাদ সে করেনি, কেবল অনুসরণ করছিল।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল।

দুই না তিন, তা-ও রজতের খেয়াল রইল না। আলাদা একটা বাড়িতে কাজলকে নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল সে। তার কত পোজের যে ছবি আঁকলে, তার আর ইয়ত্তা নেই। উচ্ছ্বসিত বাসন্তী এসে একদিন খবর দিয়ে গেল, শঙ্খর ছেলে হয়েছে। দেখতে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করলে। অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু হয়ে ওঠেনি আজও। কিছুই মনে থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না আর। এমন কি কাজলও ফুরিয়ে গেছে যেন। আবার দেশের কাজে নামলে কেমন হয়? মনটা আবার উন্মুখ হয়ে উঠল।.....পিওন চিঠি দিয়ে গেল দুখানা। দুটোই অপ্রত্যাশিত। একটা হীরকের, আর একটা সোমশুভ্রের অ্যাটর্নির। হীরকের দীর্ঘ চিঠি। ধীরে সুস্থে পরে পড়া যাবে। ভ্রূকুঞ্চিত করে অ্যাটর্নির চিঠিটা পড়তে লাগল রজত। সোম-শুভ্রের নির্দেশ অনুসারে তিনি সোম-শুভ্রের উইলের কপি পাঠিয়েছেন। শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, শঙ্খ, রজত, হীরক, শুক্তি, মুক্তা, নবনী, পরমানন্দ—প্রত্যেকে তিনি নগদ এক লাখ টাকা করে দিয়েছেন। এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন শিক্ষিতা অবিবাহিতা দরিদ্র হিন্দু কুমারীদের সৎপথে থেকে অর্থোপার্জনে সহায়তা করবার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর শিব-শুভ্রের বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম জীবিত থাকবেন, তিনিই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করবেন। এই এক লাখ টাকার সুদ প্রতি বছরে একজন করে পাবেন। এ বছরে পাবেন ইলা দেবী। আর এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে তাঁর 'বৈজ্ঞানিক কল্পনা' নামক পুস্তিকার মুদ্রণ ও প্রচারের জন্য। বাকি আঠারো লক্ষ টাকা তিনি সমানভাবে দান করে গেছেন তাঁর স্থাপিত স্কুল ও হাসপাতালে। তাঁর বিহারের জমি তিনি দান করেছেন তাঁর জনমজুরদের। দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তাদের নামের। সোম-শুভ্রের পরিচয় পেয়ে রজত বিস্মিত হল এবং মুগ্ধও হল।....

আবার মনে হল, এই এক লাখ টাকা নিয়ে দেশের কাজে নামলে কেমন হয়? কিন্তু তখনই মনে হল, কারবার কি আছে? সুভাষ বোস চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে; বিঠলভাই প্যাটেল, যতীন সেনগুপ্ত মারা গেছেন; জ্যাক্‌সনকে মারতে গিয়ে বীণা দাস ধরা পড়েছে; সত্যাগ্রহের শিখা নির্বাপিত। তবু ইচ্ছে করতে লাগল, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে। কিন্তু কাকে নিয়ে কি করবে? পুরানো দল ভেঙে গেছে, নূতন দলের কাউকে চেনে না সে। ইন্দু-শুভ্রা সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, একটা কথা পর্যন্ত বলে না আজকাল। পুলিস পর্যন্ত স্পর্শ করলে না তাকে। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাবে, কেন করলে না? হংস-শুভ্র গোপনে গোপনে যে তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা সে জানত না। হঠাৎ আবার মনে হল, কাজল ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু কাজলের দায়িত্ব তো ফুরোয়নি!

কই, কোথায় আছ তুমি?

এই যে। পাশের ঘর থেকে কাজল উত্তর দিলে।

তোমার সেই বেদিনীর পোশাকটা পরে এস তো, আর একটা ছবি আঁকি।

একটু পরেই কাজল হাসিমুখে এসে 'পোজ' দিয়ে দাঁড়াল।...

পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল অনেকক্ষণ।

রজত তার দিকে ফিরেও চাইল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতহস্তে তুলি চালিয়ে ছবি আঁকছিল একটা। হঠাৎ কাজলের নজরে পড়ল, তার ছবি নয়,—বিরাট একখানা ছোরা মূর্ত হয়ে উঠেছে ক্যান্‌ভাসের উপর, ছোরাটা বিদ্ধ করেছে প্রকাণ্ড একটা হৃদ্‌পিণ্ডকে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।....

হীরক-শুভ্র

হীরক-শুভ্র রজতকে জেল থেকে যে চিঠি লিখেছিল, তা এই—

শ্রীচরণেষু,

মেজদা অনেকদিন তোমার কোনও খবর পাইনি। বাড়ির সবাই আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, এক তুমি ছাড়া। তুমি অবশ্য কোন কালেই কলমের কারবার কর না, তুলিই তোমার মনের বাহন, একটা ছবি এঁকে পাঠালেও তো পার। সেদিন বউদির চিঠিতে জানলাম, তুমি বিয়ে করেছ। খবরটা আনন্দজনক হওয়া উচিত, নতুন বউদিদিকে দেখবার একটা কৌতূহলও যে না হচ্ছে তা নয়; কিন্তু তোমার মতন তেজী লোক যে বিয়ে করে অবশেষে নীড় আশ্রয় করবে—এটা ঠিক আশা করিনি। যদিও তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না, তবু তোমার কাছে প্রকাণ্ড কিছু আশা করেছিলাম আমি। তুমি বিয়ে করেছ, এ খবর পেয়েও সে আশ ত্যাগ করিনি এখনও। যে সব খবরের কাগজ আমরা পড়তে পাই, প্রতিদিনই সেগুলোর পাতা ওল্‌টাই-তোমার নাম কোথাও দেখতে পাব বলে। তোমার মতন একটা উদ্দাম প্রকৃতি যে চুপচাপ থাকবে, এ কথা ভাবতেই পারি না। তোমার অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্যে আমার কথা তোমাকে ভাল করে বোঝাতেই পারি নি কোনদিন। তুমি কোনদিনই ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত আমার কথা শোনে নি। চাষী-মজুরদের নামোচ্চারণ করবামাত্র তুমি ক্ষেপে উঠেছ এবং আমাকে থেমে যেতে হয়েছে। দাদাকে আমি কোনদিন বোঝাবার চেষ্টা করিনি, কারণ তিনি আলাদা জাতের লোক। বোঝালে তিনি বুঝবেন, সায়ও দেবেন হয়তো, কিন্তু কর্মী হিসাবে কিছুতেই ধরা দেবেন না। ওঁরা স্বপ্ন-সম্বল লোক। তোমার ওপর কিন্তু আমার আশা ছিল এবং এখনও আছে। তাই মনে করেছি, আজ ভাল করে আমার কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। চিঠিতে বলার একটা সুবিধে—ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আমি জীবনের আর সব-কিছু বিসর্জন দিয়েছি, সে আদর্শে অনুপ্রাণিত না হও, তার মর্মটা অন্তত বোঝবার চেষ্টা কর—এ দাবিটুকু কি আমি করতে পারি না? বাবা মা দাদু যে ভাষায় আমাকে চিঠি লেখেন, তা অনুকম্পার ভাষা। তাঁরা মনে করেন, নির্বোধ আমি একটা বাজে হুজুগে মেতে বিপন্ন হয়েছি। আমার আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখি না তাদের চিঠিতে। তাঁদের সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা যেন-তেন-প্রকারেণ আমাকে জেলের পাঁচিলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্যাপিটালিস্ট্‌ সমাজের ভাল ছেলে করে তোলবার। এর জন্যে তাঁদের সুপারিস-তদ্বিরের অন্ত নেই। দাদু, শুনেছি, এর জন্যে অনেক টাকাও নাকি খরচ করছেন স্থানে-অস্থানে। আমার আদর্শ নিষ্ঠার এই কি পুরস্কার? আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ছোট্ট পিসীর চিঠি পড়ে। আমি ভারতবর্ষের লোক হয়ে রাশিয়া নিয়ে মেতেছি, এ নিয়ে তাঁর শানিত মন্তব্যগুলি ছুঁচের মত বেঁধে। আমি রাশিয়া নিয়ে মাতিনি, আমি একটা আদর্শ নিয়ে মেতেছি—এক কথা কেন যে তিনি বোঝেন না, জানি না। আজ যদি রাশিয়া তার মহৎ আদর্শকে ত্যাগ করে, তা হলে

রাশিয়ার সঙ্গেও আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাশিয়া এই আদর্শকে মূর্ত করেছে বলেই রাশিয়ার ওপর আমার ভক্তি। ছোট পিসী আমার কথা বোঝেন না, তার কারণ তিনি ভিন্ন পথের পথিক।

ছোট দাদুর সঙ্গেও ভাব করেছি আমি। ছোট দাদুও আদর্শবাদী লোক। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও আস্থা নেই। তাঁর বিশ্বাস—বৈষম্যই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতিই ছলে-বলে-কৌশলে সাম্যবাদ-প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেবে বার বার। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব আমরা? আশ্চর্য যুক্তি তাঁর! তা ছাড়া তিনি কেমন যেন সন্দেহবাদী হয়ে উঠছেন। লিখছেন, ‘ইংরেজরা এ দেশে যখন আসে, তখন আমরা সবাই ইংরেজ-গুণগানের যে সব কথা বলেছিলাম তা সেকালের সংবাদপত্রগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে এখনও। মিলিয়ে দেখো, তোমাদের কমিউনিজ্‌ম-গুণগান সেগুলোর সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাবে। ইংরেজদের সম্বন্ধে ভুল যখন ভেঙেছে, তখন একটা নতুন ফাঁদে পা দেওয়াটা কি খুব সমীচীন?” এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওঁদের সকলের সম্বন্ধেই একটা কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। ওঁরা সমস্ত বুঝেও এসব কথা বলছেন আত্মরক্ষার জন্যে। জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে এই প্রকৃতিই ওঁদের মর্মমূলে রয়েছে। পৃথিবীর যে নবজাগরণ আসন্ন, তার যৌক্তিকতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলে যে শোষণ যন্ত্রের ওঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব হয়। নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানব-সমাজের বৃহত্তর আদর্শকে মনে মনে স্বীকার করলেও মুখে মানবার সাহস নেই ওঁদের। কিন্তু তোমারও কি নেই? তোমার সাহসের অভাব আমি কল্পনাই করতে পারি না। তোমাকে সুবিধাবাদী বলে ভাবতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার মনে হয়, নিজের খেয়ালে মত্ত আছ বলে এ দিকটা ভাল করে ভেবেই দেখনি তুমি। অভিজাতসুলভ ঔদাসীন্যে ভুলে আছ সব। কিন্তু আজ তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। একটা কথা জান? শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবে—আমার মনে এর বীজ তুমিই বপন করেছিলে একদিন। আমাদের ছট্টু বলে একটি চাকর ছিল, মনে আছে তোমার? বেচারা দু টাকা মাত্র মাইনে পেত, খেত আমাদের পাতের এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে। সশঙ্ক হয়ে থাকত বেচারা। কি সামান্য অপরাধে তাকে হান্টার দিয়ে খুব মেরেছিলে তুমি। আমি ভাবলাম, আর বুঝি আসবেই না। কিন্তু বিকেলে দেখলাম ঠিক এসেছে এবং ক্রমাগত চেষ্টা করছে তোমার মন যুগিয়ে চলবার। ধনীর হাতে দরিদ্রের শোচনীয় অপমানের চিত্রটা গভীর রঙে তুমিই এঁকে দিয়েছিলে সেদিন আমার মনে। সেই দিনই আমি ঠিক করেছিলাম যে, যদিও আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি, তবু গরিবদের দিকেই থাকতে হবে আমাকে, আর কিছুর জন্যে না হোক, আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে। আমরা বড়লোক বলে অপরিসীম লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছিল যেন সেদিন আমার। টলস্টয়, মার্ক্‌স, লেনিন, স্টালিন অনেক পরে পড়েছি—মিলের কুলিদের সংস্পর্শে এসেছি তারও অনেক পরে।

কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটি নিয়ে আলোচনা করব তোমার সঙ্গে। যারা এর মুখোশ পরে নিজেদের নানা কাজ হাঁসিল করে বেড়াচ্ছে, তাদের বিষয় আমার আলোচ্য নয়। তাদের উদাহরণ উদ্ধৃত করে অনেক লোক কমিউনিজ্‌মকে গাল দেয় শুনেছি। কমিউনিজ্‌মকে গাল না দিয়ে তাদের গাল দিলেই ভাল হয়। টিকি-তিলক-নামাবলীধারী ভণ্ডকে দেখে হিন্দুধর্মের বিচার করা ঠিক নয়। কমিউনিজ্‌মের কথা আলোচনা করবার সময় একটা কথা মনে রাখা উচিত। ফলের থেকে বীজ এবং বীজের থেকে অঙ্কুরের আবির্ভাব যেমন অনিবার্য, মানবের ইতিহাসে ফিউডালিজম্‌ থেকে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম এবং

ক্যাপিটালিজম্ থেকে কমিউনিজ্‌ম ও তেমনি অনিবার্য। নির্যাতিতদের দুঃখে বিচলিত হয়ে জনকতক উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি নিছক বক্তৃতায় চোটে এতবড় ব্যাপারটাকে সম্ভবপর করে তুলেছে—এ কথা যারা ভাবে, তারা ভুল ভাবে। রাত্রির পর যেমন দিন আসে, ক্যাপিটালিজ্‌মের পর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান তেমনই অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার একটা। মানব-সভ্যতার যাবতীয় কীর্তির সমস্ত সম্মান যাদের প্রাপ্য তাদের বঞ্চিত করে জনকতক অলস ধনী কতদিন আর ভোগ করবে এই বসুন্ধরাকে? যারা কর্মী, যারা বীর, তারা এই বার জেগেছে, ভীরু প্রবঞ্চকদের সরে পড়বার সময় হল এবার। নির্যাতিতেরা চিরদিন অত্যাচার সইতে পারে না। অত্যাচারীর চাবুকই মরিয়া করে তোলে তাদের একদিন। সেদিন এসেছে এবং সে কথা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে হবে এবং যারা ত্যাগ করতে রাজী নয়, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে মোহ-মুদ্গরের! তোমাকেই করতে হবে, তুমি যদি এর যৌক্তিকতা স্বীকার কর। সামাজিক মানুষ হিসাবে তা হলে তুমি ওর সহযোগিতা না করে পারবে না।

একদল সূক্ষ্ম তার্কিক আছেন, তাঁরা বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে জীবনে আর সুখ কি, সমাজের সঙ্গে প্রাণের নিগূঢ় যোগাই বা কোথায়? বারোযারিতলায়, ওয়েটিং-রুমে বা ধর্মশালায় বাস করে কি আমরা শান্তি পাব? মানুষ যে কিসে শান্তি পায় আর কিসে পায় না, তা জানি না। একটা কথা কিন্তু জানি। যুগে যুগে মানুষ সমাজের হিতার্থে নূতন নূতন নিয়ম করেছে এবং সে নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে কালক্রমে শান্তিও পেয়েছে। সবাই হয়তো পায় না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পেয়েছে, তা মানতেই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মানব-সমাজে একদিন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। যে কোনও পুরুষ নিছক গায়ের জোরে যে কোনও নারীর দেহ দাবি করতে পারত। বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হওয়াতে কতকগুলি পুরুষের দুঃখের কারণ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবাহ-প্রথাকে মেনে নিয়ে আমরা কি খুব অশান্তিতে আছি? বিবাহ-প্রথারও আবার নানা রকম চেহারা ছিল। Group marriage ছিল, বহু -বিবাহ ছিল। এখন সভ্যসমাজ থেকে সেসব উঠে গেছে। বহুপত্নীর মালিক হবার সাধ যাঁর, তাঁর হয়তো অসুবিধে হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে এক পত্নীকে জীবনে সন্তুষ্ট আছেন, তা অস্বীকার করি কি করে? কমিউনিস্টরা এখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ভালবাসার বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন স্বীকার করতে চায় না, বাইরের মিথ্যা আইনের হাঙ্গমা চুকিয়ে দিয়ে তারা অন্তরের সত্য আইনকে আশ্রয় করেছে। যাঁরা বিবাহ-আইনের নাগপাশে বেঁধে দাম্পত্য-জীবনকে রক্ষা করবার পক্ষপাতি, তাঁদের হয়তো রাগ হবে; কিন্তু যতদূর শুনেছি, অধিকাংশ লোকই সুখে আছে সেখানে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্বন্ধেও ওই কথা। কতকগুলো স্বার্থপর লোকেরই কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে সুখেও থাকবে অনেকে। বিচিত্র মানুষের মন। সবই সে সহ্য করে নেয় কালক্রমে। শুধু তাই নয়, কোন একটা নিয়ম সে বেশিদিন মানতেই চায় না। পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে নূতন শৃঙ্খল পরবার জন্যে সে সতত উন্মুখ। এরই নাম হয়তো আধুনিকতা। আধুনিকতার দাবি যদি না মানতে চাও, 'ফসিলের' দলভুক্ত হতে হবে তোমাকে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কমিউনিজ্‌ম সমাজের যে ব্যবস্থা করতে চাইছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা ভাল, না, মন্দ? রাশিয়ার দিকে চাইলেই এর উত্তর পাবে। সেখানে বেকার লোক নেই, অলস লোকের স্থান নেই, বংশ বা অর্থগত জাতিভেদ নেই। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা এই ক বছরের মধ্যে যা করেছে, তা বিস্ময়কর।

যেসব সমালোচক আরাম-কেদারায় বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তাদের নানারকম ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করেন, একটা কথা ভুলে যান তাঁরা—কাজ করতে গেলেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, অলস লোক কচিৎ ভুল করে, মরা লোকে একেবারেই করে না। ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা যা করেছে, তার কিছু আভাস রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাবে, অন্য কোন বই যদি হাতের কাছে না-ও পাও।

বর্তমানে সভ্যসমাজে 'ডিমক্র্যাসি' নামে যা প্রচলিত, আসলে তা পুরাতন রাজতন্ত্রেরই নব-রূপ। নূতন রাজাটির নাম 'টাকা'। ডিমসের মাথা বিকিয়ে আছে এই টাকার পায়ে। মাথা বিকিয়ে দিয়েও কিন্তু তাদের স্বস্তি নেই। ইংলণ্ডের মত সভ্যদেশেও বেকার-সমস্যা ঘোচেনি, এখনও সেখানে লোকে পেটের দায়ে টেম্‌সের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এখনও সেখানে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি হয়, এখনও সেখানকার ভ্রূণহত্যা-শিশুহত্যার তালিকা আতঙ্কজনক। অধিকাংশ লোকের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের শ্বাস-রোধ করে কয়েকজন পুঁজিবাদী যেখানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেইখানেই এই অবস্থা। আমাদের বিদ্রোহ এই ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে।

তুমি হয়তো বলবে, কেন, ফ্যাসিজ্‌ম তো বেকার-সমস্যা সমাধান করেছে! সেখানেও কি আধুনিক পদ্ধতিতে মানব সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে না? আপাতদৃষ্টিতে হচ্ছে হয়তো, এবং যেটুকু হচ্ছে তা সম্ভবত সোশ্যালিজ্‌মের কল্যাণেই হচ্ছে। কারণ এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ফ্যাসিজ্‌ম সোশ্যালিজ্‌মেরই পরিবর্তিত বক্ররূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও-জিনিস টিকবে না। ওটা ক্যাপিটালিস্টদের আত্মরক্ষার প্রয়াস, এবং আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ-প্রয়াস হবে। টবে কখনও অশ্বত্থগাছ হয় না। হয় সে মরে যাবে, না হয় টবকে বিদীর্ণ করে সনাতন মাটিতে শিকড় চালাবে সে। অশ্বত্থগাছের সম্বন্ধে চিন্তা নেই, কর্মীরা নিজেদের শক্তির সম্বন্ধে একবার যখন সচেতন হয়েছে, তখন তাদের থামাতে পারবে না কেউ—ওর ক্যাপিটালিস্টিক খোলসটাই যথাসময়ে খসে যাবে আশা করি।

আমার কল্পনায় যতটুকু কুলিয়েছে আমি ভেবে দেখেছি ভবিষ্যৎ-মানব-সমাজকে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মত বাস করতে হবে। ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজের ছোটখাট একান্নবর্তী পরিবারের যেসব গলদ থাকে, এতে তা থাকবে না। এ একান্নবর্তী পরিবারে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আলস্যকে, প্রশ্রয় দেওয়া হবে না নীচতাকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেও খর্ব করা হবে না কোন দিক দিয়ে। খাওয়া-পরার জন্য আত্ম-বিক্রয় করতে হবে না, মামলা করতে হবে না সম্পত্তির অংশ নিয়ে। মানুষের অনুরাগ-বিরাগের মাপকাঠি হবে ভাল-লাগা, অন্ন-বস্ত্রের জন্য বাধ্যতামূলক ভণ্ডামি নয়। অর্থাৎ তখনই 'বার্ড্‌স অফ এ ফেদার'রা 'ফ্লক টোগেদার' করবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাবে। বস্তুতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার জন্যে গরিব হাঁসকে বড়লোক কাকের মোসায়েবি করে বেড়াতে হবে না সে সমাজে। যে অন্নবস্ত্র বাসস্থানের জন্যে লোকে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তখন কাজের পরিবর্তে—যে কোন কাজের পরিবর্তেই—মানুষ তা পাবে এবং প্রত্যেকেই সুযোগ পাবে নিজের যোগ্যতা এবং রুচি-অনুসারে কাজ করবার। সুতরাং তখনই গড়ে উঠবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সমাজ নিজের নিজের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে। তখন যে জাতি-ভেদ থাকবে, তা স্বাভাবিক জাতিভেদ এবং অন্নবস্ত্রের সমস্যা না থাকাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকবে না—প্রকৃতির রাজত্বে মহিষ এবং ময়ূরে যেমন বিরোধ নেই। মানুষ এতদিন যা নিয়ে ঝগড়া করেছে, তা অতি-স্থূল বস্তু-সম্পত্তি, ভবিষ্যৎ মানুষদের সে বালাই থাকবে না। একমাত্র 'প্রাইভেট প্রপার্টি যা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা তার বুদ্ধি এবং

মন। নিখিল মানবের কল্যাণের জন্য সে মনেরও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, তার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হবে তাকে। অর্থাৎ নিজের হিত-চিন্তা করলেই হবে না শুধু, সকলের হিতের কথাই মনে রাখতে হবে। Love thy neighbour—এই উপদেশই পর্যাপ্ত হবে না তখন, Love the humanity as a whole—এই হবে তখনকার মনোভাব। তখন আলাদা আলাদা nation থাকবে না, frontier থাকবে না, foreign ambassador থাকবে না; তখনই সফল হবে কবির স্বপ্ন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানবজাতি'।

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে জেলের কয়েদীরাও তো অন্নবস্ত্র পায়। কমিউনিস্ট সমাজ তা হলে বৃহদায়তন একটা জেলখানা হবে নাকি? জেলখানায় জেলের প্রাচীরের বাইরে যাবার হবে নেই কারও এবং এই বন্দিত্বই শাস্তি। এ শাস্তিটা না থাকলে সত্যিই তো জেলখানার বন্দোবস্তে নিন্দা করবার বিশেষ কিছু নেই। ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজে গরিব মানুষেরা জেলেই তো ভাল থাকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করবার অনুমতি পেলে তারা জেল ছেড়ে আসতে চাইত কি না সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। বম্বের সনুর গল্পটা। মার্গারেট রীডের'Indian Peasant Uprooted ' বইটাতেও গল্পটা আছে। তার থেকেই অনুবাদ করে দিচ্ছি আমি।

সনুর মাইনে ছাব্বিশ টাকা। কিন্তু কোন মাসেই পুরো মাইনে পায় না বেচাবা। মিলের কাপড় নষ্ট করছে— এই অজুহাতে কোন মাসে পাঁচ, কোন মাসে দশ, কোন মাসে পনর টাকা মাত্র মেলে। মিলের গেট থেকে বেরিয়েই দেখে, লাঠি-হাতে কাবুলীওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। কাবুলীকে দেখেই চট করে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ভিড় হোক একটু ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়া যাবে। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে সে গেট থেকে নির্বিঘ্নে বেরুল বটে, কিন্তু কাবুলীর শ্যেনদৃষ্টি সে এড়াতে পারলে না। কাবুলী ঠিক তার পিছু নিয়েছিল। যেই একটা গলির মধ্যে সনু ঢুকতে যাবে, অমনই ক্যাঁক করে ধরলে, তার ঘাড়টা এবং এমন জোর করে একটা ঝাঁকানি দিলে যে, বেচারার ঘাড়ে কাছের জামাটা ছিঁড়েই গেল।

শালা বাগ্‌তা কাহে? রূপিয়া দেও—

নিরুপায় সনুকে কম্পিত হস্তে কাপড়ের খুঁট থেকে বার করতে হল টাকা। ছয় টাকা কাবুলীর হাতে দিয়ে কাতর চক্ষে চেয়ে রইল সে। কাতর চক্ষের দৃষ্টিতে বিচলিত হবার লোক কাবুলী নয়।

সে বললে, সুদ আট রূপি হ্যায়—আওর দো রূপি দেনো ওগা—তোম্‌হাবা পাস্ হ্যায়—দে দেও—

নিষ্করুণ কণ্ঠের নিষ্ঠুর আদেশ। সশঙ্ক সনু তখন হাত কচ্‌লে কচ্‌লে আগা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, এ মাসে তার দশ টাকা মাইনে কাটা গেছে, এ মাসে আর বেশি দিতে পারবে না সে। দেওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। পায়ে ধরতে লাগল তার।

কাবুলী খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর বললে, ই দো রূপি আসলমে চলা যায়েগা তব। বুঝা?

সনু ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝেছে। কোনক্রমে নিস্তার পেলে বাঁচে সে। কাবুলী নিস্তারই দিলে তাকে অবশেষে দু টাকা সুদ আসলের অন্তর্ভুক্ত করে।

সনু চলল বাড়ির দিকে। ইচ্ছে ছিল, মদের দোকানে ঢুকে আজ মাইনে পাবার দিনটা অন্তত এক পাত্র টেনে যাবে, কিন্তু তা আর হল না। কোন রকমে টাকা কটা বাড়ি নিয়ে ফিরত পারলে বাঁচে সে। বাড়ির দরজায় কিন্তু আর একজন পাওনাদার দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতি মাসেই মাইনে পাবার দিন কাবুলীওয়ালার মত এ লোকটাও দাঁড়িয়ে থাকে।

বাড়ি ভাড়া দাও।

সনুকে আবার গেরো খুলে ছয় টাকা দুআনা বার করে দিতে হল। একটি মাত্র ঘরের ভাড়া ছয় টাকা দুআনা। বাকি রইল তিন টাকা চৌদ্দআনা। সমস্ত মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পরের মাসের বিশে তারিখে এই তার উপার্জন। ঘরের ময়লা দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হতে লাগল, বাঁচব কি করে আমরা?

খানিকক্ষণ পরে বিড়িটি ধরিয়ে ঘরের দরজাটিতে এসে যেই বসল, বউও বসল এসে এবং অনর্গল বকে যেতে লাগল।

কি করে চলবে সমস্ত মাস? যে কাপড় মিলে নষ্ট হয়েছে তা বাজারে বেচে কি দশ টাকা উঠবে? পাঁচ টাকা, বড় জোর ছয় টাকা—তার বেশি কেউ দেবে না। ফি মাসে দেখছি তো! আমি এ মাসে অবশ্য ষোলো টাকা রোজগার করেছি—কিছু চাল কিনতে পারব। কিন্তু তোমার জামা যে ছিঁড়ে গেছে একেবারেই তা কি করে হবে? ছেলেটা বাবুদের জুতোয় কালি-বুরুশ করে রোজ দু-তিন আনা রোজগার করতে পারে অবশ্য। কিন্তু সেও যদি বাইরে যায়, ছোট ছেলেগুলোকে খাওয়াবে কে? আমি তো বাড়িতে থাকি না। কোলের ছেলেটাকে আপিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাই, নেশা ছুটে গেলেই সে উঠেই চেঁচাবে খাওয়ার জন্যে। পেট ভরে মাই খাইয়ে যেতে পারি না, বুকে দুধই নেই, খাওয়াব কোথা থেকে? ছটা মরেছে, এটাও যাবে। দশজনকে পেটে ধরেছিলাম, চারটি বেঁচে আছে, তাও কোনক্রমে। মায়ের যত্ন না পেলে কি ছেলে বাঁচে? আমি যত্ন করি কখন, রোজগার করতে না বেরুলে যে পেট চলে না। আচ্ছা, আমাদের ঘরে তো জায়গা আছে—আরও দুজনে ভাড়াটে নিলে কেমন হয়? দুজন কুলী আজ আমায় বলছিল। দুটো লোক অনায়াসেই নেওয়া যায়। অনেকটা সাহায্য হয় তা হলে। সমস্ত দিন ছেলেগুলো খিদেয় কাঁদে, রাত্রে একটু পেট ভরে খেতে দিতে পারি তা হলে।

দশ ফিট বাই দশ ফিট ঘরের মধ্যে আরও দুজন পুরুষ ভাড়াটে নেবার প্রস্তাবে সনু যেন ক্ষেপে উঠল। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে অশ্লীল ভাষায় সে গালাগালি দিতে শুরু করলে। বউকে গাল দিলে, মিলের মালিককে গাল দিলে, ক্যাশিয়ারকে গাল দিলে, কাবুলীকে গাল দিলে, বাড়িওয়ালাকে গাল দিলে, ভগবানকে গাল দিলে। পরিশ্রান্ত হয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল খানিকক্ষণ পরে। মনে পড়ল, চোদ্দ বছর আগে বিয়ে করবার জন্যে কাবুলীর কাছে যে টাকা সে ধার করেছিল, তা রোজই বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি মাসে ছয়টাকা আট-টাকা, কোন মাসে দশটাকাও সে দিয়েছে, শোধ কিন্তু হচ্ছে না। অতীতের কথা মনে পড়ল।...তার নিজের বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন তার মা তাকে নিয়ে বম্বেতে এসেছিল। মা মিলে কাজ করত, সে খেলা করে বেড়াত রাস্তায়। মাঝে মাঝে একটা স্কুলেও যেত। ....তার বড় ছেলেটাকে ইস্কুলে দেবার কথা মনে হয় তার। কিন্তু ছেলেটা যেতে চায় না। সে বুঝেছে যে, স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে জুতো বুরুশ করে যদি সে রোজ তিন-চার আনাও রোজকার করতে পারে, বাবা-মার সাহায্যে হয়। ছ বছরের মেয়েটা রাস্তায় নালার ধারে খেলা করে

বেড়ায় সমস্ত দিন। ছোট শিশু দুটো পড়ে থাকে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে আপিঙের নেশায় অজ্ঞান হয়ে।....আরও যদি কিছু টাকা থাকত! আর চারটি বেশি ভাত, আর একটু বেশি ডাল মেখে দিয়ে খেতে পারতাম। তাড়ি তো খেতেই পাই না আজকাল। একটা ধুতি, একটা জামা আর না কিনলে চলছে না। বউটাকে কতদিন বলেছি, আসছে মাসে ঠিক একখানা নতুন শাড়ি কিনে দেব। কিছুতেই হয়ে উঠছে না। টাকার অভাবে কতদিন যে দেশে যাই নি!.....ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সনু। বউটা আগেই ঘুমিয়েছিল। ঘুমের জন্যে দাম দিতে হয় না, তাই তারা ওই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে ঘরের মেঝেতে শুয়েই প্রাণ ভরে ঘুমুতে লাগল।

এ গল্পে এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। এই সনু যদি সপরিবারে জেলে একসঙ্গে থাকবার হুকুম পায়, জেলে যাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে ও। কিন্তু যিনি কমিউনিস্ট্ সমাজকে রূপান্তরিত জেল বলে ঠাট্টা করেন তিনি জানেন না যে, একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই সভ্য মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আশা করতে পারে। কারণ স্বাধীনতার বাধা যে আধিভৌতিক সমস্যা, তার সমাধান সে সমাজে করেছে। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। যে কোন সমাজে বাস করতে গেলেই অনিবার্যভাবে খানিকটা পরাধীনতা স্বীকার করতেই হয়, প্রত্যেকে সমাজেরই নিজস্ব আইন-কানুন আছে এবং তা না মেনে সে সমাজে বাস করা যায় না। কমিউনিস্ট্ সমাজেরও নিজেদের আইন আছে এবং সে আইন হয়েছে ওই সনুদের বাঁচাবার জন্যে। সে সমাজে শুধু সনুরাই বাঁচবে না, কর্মী মাত্রেই বাঁচবে সেখানে। সেখানে স্থান নেই কেবল অলসের। এই সমাজের বিধি-ব্যবস্থা যাঁদের কাছে জেলের বিধি-ব্যবস্থা। বলে মনে হয়, তাঁরা যে কি করে হিন্দু সমাজের হাজার রকম কুপ্রথা মেনে ইংরেজ শাসনের স্টিলফ্রেমের মধ্যে টিকে আছেন জানি না। তাঁরা হয়তো বলবেন, এর মধ্যেও আমরা স্বচ্ছন্দে নেই—এ-ও আমরা চাই না, আমরা স্বাধীনতা চাই। কমিউনিস্ট্ সমাজের স্বাধীনতাও যদি তাঁদের রুচিকর না হয়, তা হলে আর কি রকম স্বাধীনতা যে তাঁদের কাম্য হতে পারে, তা তো ভেবে পাই না। নিরঙ্কুশ বর্বরের আত্মসর্বস্ব স্বাধীনতা? সে রকম স্বাধীনতা ছিল অতীতকালে বন্য মানব-সমাজের দলপতিদের, এখন আছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের বিজ্‌নেস-ম্যাগনেটদের। সেকালের বন্য মানব-সমাজ অবলুপ্ত হয়েছেৎ, একালের ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজও হবে। ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। সুতরাং সে রকম স্বাধীনতা যদি কারও কাম্য হয়, তার লোভ ছাড়তে হবে তাঁকে। এ ধরনের স্বাধীনতা-কামী ছাড়া আর একদল লোক আছেন, যাঁরা কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতা করেন হিন্দুসভ্যতার প্রতি ভক্তির আধিক্যবশত। তাঁরা বলেন, এবং আমিও সে কথা বিশ্বাস করি, হিন্দুসভ্যতার মধ্যে ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না। পঞ্চায়েৎ-শাসিত গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত সবাই। অশোক হর্ষবর্ধন প্রভৃতির উদাহরণ উদ্ধৃত করে সেকালকে ফিরিয়ে আনতে চান তাঁরা। ফিরিয়ে আনতে পারলেও আমরা সুখী হতাম না। কারণ নানা দিক দিয়ে একাল অনেক এগিয়ে গেছে। মানবের মনীষা স্থাণু হয়ে বসে নেই এক জায়গায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি আমাদের হবে না আশা করি। হওয়া উচিতও নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ফলে যে মানবসমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, সময় এবং দূরত্বকে জয় করতে পেরেছি আমরা, বহু ভয়াবহ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, যে প্রকৃতিকে একদিন নিয়তির মত ভয় করতাম, তাকে দাসীর মত খাটাচ্ছি আজ। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সুবিধে নিয়ে একদল চতুর স্বার্থপর লোক নিজেদের বড় করে তুলেছে অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত করে। উদ্ভব হয়েছে ক্যাপিটালিজ্‌মের। যেসব যন্ত্র মানব-সমাজের উপকার লাগত, সেই সব যন্ত্র দিয়েই তারা পেষণ করছে অধিকাংশকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্যে। এরোপ্লেন থেকে বম পড়ছে, রেডিও

দিয়ে মিথ্যে প্রচার হচ্ছে, মিলে-ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে জীবন-ধারণের উপযোগী বস্তুসম্ভার নয়—যুদ্ধের মাল-মসলা; এবং তার জন্যে খেটে মরছে যেসব মজুরের দল তারা মরছেই, বাঁচছে না কেউ। বৃদ্ধি পাচ্ছে কেবল ক্যাপিটালিস্টদের মেদ-ভার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবসমাজের এই যে দুর্গতি হয়েছে, তা থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে—এই হচ্ছে কমিউনিজ্‌মের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত সুবিধা সবাই সমান ভাবে ভোগ করবে। যে সাম্য যে উদারতার জন্যে তোমরা হর্ষবর্ধনের আমলকে ফিরিয়ে আনতে চাও, কমিউনিস্ট্‌রা সেই সাম্য, উদারতাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন এ যুগে। অর্থাৎ হর্ষবর্ধনের আমলের উদারতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে সর্বজনহিতকরভাবে মেলাবার চেষ্টার নামই কমিউনিজ্‌ম। সে চেষ্টা যদি সার্থক হয়, তা হলে আমরা যতটা খুশি হব, অপরিবর্তিত হর্ষবর্ধনের যুগ ফিরে পেলে ততটা হব কি না সন্দেহ। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। হিন্দুসভ্যতায় আর্থিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না হয়তো, কিন্তু মানসিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল। ব্রাহ্মকে সমাজের শিরোমণি বলে মানতে হত সবাইকে। সে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যতদিন বজায় ছিল, ততদিন কোনও গোল ছিল না; তাঁর বিদ্যাবত্তা চরিত্রবল স্বতই সকলের শ্রদ্ধা উদ্রেক করত, শ্রদ্ধা আদায় করে বেড়াবার প্রয়োজন হত না তাঁর। কিন্তু তাঁর মূর্খ বংশধরেরা যখন কেবলমাত্র অর্কফলা ও উপবীত আস্ফালন করে সে সম্মান দাবি করতে লাগলেন এবং নানা ফন্দির-ফিকির করে তা আদায়ের ব্যবস্থা করলেন, তখনই ক্যাপিটালিজ্‌মের মত কুৎসিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। টিকি-তিলকধারী আচার-সম্বল ভণ্ডের প্রভুত্ব বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক হল। বৌদ্ধধর্মেও এই দোষ দেখা দিয়েছে পরে, এবং এর বারম্বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ইতিহাসে। হেরিডিটি নিয়ে অনেকে তর্ক করেন। বলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেরই তো ব্রাহ্মন হওয়ার কথা। হেরিডিটি সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বেশি থাকলে এ কথা বলতেন না। হওয়ার কথা নয়, হওয়ার সম্ভাবনা, পারিপার্শ্বিক এবং আরও বহুবিধ অবস্থা যদি অনুকূল থাকে। তা ছাড়া অত সূক্ষ্ম তর্কেরই বা প্রয়োজন কি? দেশ জুড়ে যেসব রাঁধুনি-বামুন, মুর্খ পুরুত, ভণ্ড বাবাজী, শিষ্যলোলুপ গুরুর দল, কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তো বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেও এরা ব্রাহ্মণ হয় নি। এই অযোগ্যদের চরণে মাথা নত করতে বাধ্য করে হিন্দুসমাজ এক হিসেবে ক্যাপিটালিজ্‌মকেই প্রশয় দিয়েছে।

এতক্ষণে তুমি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছ। বিশ্বাস কর, আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে করবার চেষ্টা করেছি। কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটা তোমাকে বললাম, এর শাখা-প্রশাখা অনেক আছে; ভয় নেই, সে সম্বন্ধে কিছু বলবে না। সেগুলোতে datails- এর তফাত খালি। কিন্তু একটা কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট মুভমেন্ট হয়েছে, তার উদ্দেশ্য এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কিছু বলা উচিত। সব কথা অবশ্য বলা যাবে না, যেহেতু আমরা এখনও 'বে-আইনী'। এ চিঠি যদি ধরা পড়ে, তুমি-আমি দুজনেই বিপদে পড়ব। লুকিয়ে এ চিঠি পাঠাচ্ছি—জেলের বাইরে লুকিয়ে পোস্ট্ করে দেবে একজন। সুতরাং এ চিঠিতে সব কথা খোলাখুলি লেখা নিরাপদ নয়। মীরাট মামলার সরকারী উকিলের সওয়ালে আর জজেদের রায়ে আমাদের ইতিহাস খানিকটা নিবদ্ধ আছে। খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছিলাম, তুমি পড়েছ কি না জানি না।

কানপুর কমিউনিস্ট্ মামলার সময়েই সর্বপ্রথমে লোকে জানতে পারে যে, ভারতে কমিউনিস্ট্ পার্টি বলে একটা পার্টি আছে। তার আগে এর নামই শোনে নি কেউ। আমার যতদূর মনে পড়ে, বিটলভাই প্যাটেলের আনুকুল্যে মিস্টার ডাংগে প্রথমে সোশ্যালিজ্‌ম-আন্দোলন শুরু করেন বম্বেতে। আমি তখড় সবে কলেজে ঢুকেছি, চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মাজী আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ

করে দিয়ে জেলে গেছেন। চরকা চালানো, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, মাদকদ্রব্য-বর্জন, বিদেশী-বয়কট—এসব ছাড়া দেশে তখড় উগ্রতার আর কিছু হচ্ছে না। দেশবন্ধুর দল অধরা হয়ে কাউন্সিলে ঢোকবার আয়োজন করছেন। কমিউনিস্ট্‌দের তখন দল বলে কিছু নেই। দুচারজন লোক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছেন দেশের মধ্যে। কিছুদিন পরে বাংলা দেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড্‌ পেজ্যান্ট্‌স পার্টি স্থাপিত হল কলকাতায়। আমি যোগ দিলাম তাতে। প্রথম আমিও যে সকলের মত মহাত্মাজীর স্বদেশী-আন্দোলনে মেতেছিলাম, তার প্রধান কারণ ছিল—তাঁর অভিযান ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যে ইংরেজ, ক্যাপিটালিজ্‌মের প্রতীক হিসেবে, আমাদেরও শত্রু। পরে আবিষ্কার করলাম, ভারতের স্বাধীনতা অপহারক যে ইংরেজ, তারই সঙ্গে বিরোধ তাঁর, ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতাই নেই, বরং ভারতের ক্যাপিটালিস্ট্‌দের পক্ষপটু দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবারই আগ্রহ তাঁর। এ কথা আবিষ্কার করার পর আর কংগ্রেসের ওপর কোন আস্থা রইল না। যদিও তার কিছুদিন আগে লাহোরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দেশবন্ধু সভাপতির অভিভাষণে তারস্বরে বলেছিলেন, স্বরাজ আমরা সকলের জন্যে চাই, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্যে নয়। টাটার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন তিনি কিছুদিন, কিন্তু তার উক্তিকে কাজে পরিণত করতে হলে জনসাধাণের মনে যে প্রেরণা জাগানো উচিত ছিল, তাদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার যে ব্যপক আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, সেসব কিছুই করতে দেখলাম না তাঁকে। ভোট-সংগ্রহ করে স্বরাজ্য-পার্টি গড়ে কাউন্সিলের সৌধমঞ্চে তিনি সেই জাতীয় উন্মদনা সৃষ্টি করতে মত্ত হলেন, যা দানীবাবু শিশিরবাবু বহুবার করেছেন রঙ্গমঞ্চে এবং যা আমরা প্রতিদিন উপভোগ করি খেলার বা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। কাগজে কাগজে তাঁর জয়জয়কার হতে লাগল, কিন্তু যে জনসাধারণের জন্যে তিনি স্বরাজ অর্জন করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে গেল। তাঁর শিষ্য সুভাষবাবুরও অনুরূপ ব্যবহার দেখলাম। ইনি যদিও অনেক শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশের ধনিকরা এঁকে শ্রমিকসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশের ধনিকরা এঁকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রের মত ব্যবহার করেছে অনেকবার। এঁরা বড় বক্তা, বিরাট বিদ্বান, অসাধারণ মেধাবী, রাজনৈতিক দাবাখেলায় সুদক্ষ, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কেউ নন এঁরা। আমার মনে হল ইংরেজদের তাড়িয়ে কংগ্রেস সত্যিই যদি স্বরাজ পান, তা হবে বড়লোকদের স্বরাজ, যেসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে কবি ভাষা ফোটাতে চেয়েছিলেন, তারা মূঢ় ম্লান মূকই থেকে যাবে। আর একটা মজার ব্যাপার, এই সময় সকলে তখন বলতে লাগল, মহাত্মা গান্ধীই জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এনেছেন। ঠিক ভাষা হত 'মত্ততা এনেছেন' বললে। নিজেদের উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হয়ে মহাত্মাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সবাই। অর্থাৎ যে কর্তা-ভজা মনোবৃত্তির জন্য ভারতের অধঃপতন, সেই অন্ধ-ভক্তির শিখরে দাঁড়িয়েই গান্ধীজী মহাত্মা হলেন এবং অশিক্ষিত লোকের মনে সেই সব আশা-ভরসা জাগিয়ে তুললেন (হয়তো অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও), যা সফল হওয়া কলিকালে অন্তত অসম্ভব। এ যুগে যন্ত্রসভ্যতাকে অস্বীকার করে রাম-রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস থেকে তিনি কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না কিছুতেই। দুর্বল অশিক্ষিত লোকেদের সবল শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা না করে তাদের শোনালেন অহিংসা-মন্ত্র, এবং বয়কট করতে বললেন শিক্ষা। শিক্ষা শব্দটার পূর্বে বিদেশী বিশেষণটা থাকাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জন করাটাই স্বদেশ ভক্তির অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। মূর্খের মূর্খতাটাই হয়ে উঠল গর্বের বস্তু। শুনেছি নাকি স্বদেশের কাজে নামবার আগে গোখ্‌লের নির্দেশমত ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেও তিনি যদি এই তাদের মুক্তি উপায় ঠিক করে থাকেন, তা হলে

আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি আর একটা কথাও ভেবে পাই না। দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলে বড়লোক মিল-ওনারদের সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব ? মোট কথা, মহাত্মাজীর আন্দোলনে আমি আশ্বাস পেলাম না। যাঁরা হিংস্র পথ অবলম্বন করে লাট-বড়লাট মারছিলেন, তাঁদের কার্যকলাপও আমার প্রাণ স্পর্শ করল না যেন। কতকগুলো সাহেব মেরে লাভ কি ? ফলে নিরাপরাধ বহু লোক নির্যাতিত হবে শুধু। তা ছাড়া, দেশ বলতে সত্যি সত্যি যা বোঝায়, সেই অশিক্ষিত অসহায় নগ্ন রুগ্ন ক্ষুধার্ত জন-মজুর-চাষীব দল, তাদের কি কোনও উপকার হবে দু-চারজন সাহেব মেরে ? আমার তো তা মনে হয় না। তারা সবল হোক, শিক্ষিত হোক, জাগুক—এই আমি চাই।

সুতরাং এদের জাগরণের জন্যেই শেষে আত্মনিয়োগ করলাম আমি পুরোপুরি। আমার কাজ হল তাদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা করা, অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা কেমনভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে সে খবর তাদের এনে দেওয়া, তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং স্বার্থরক্ষা করা। চরকা বা পতাকা ঘাড়ে করে অহিংস শোভাযাত্রার শোভা-বর্ধন করলে অথবা দু-একটা সাহেব খুন করলে আমার স্বদেশ-সেবার বাজার-দর বেড়ে যেতে পারত কিন্তু যাদের ম্লান মুখে শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে তাদের মুখ চেয়ে ওসব পথে যেতে আমার প্রবৃত্তি হল না।

কাজে নেবে কিন্তু দেখলাম, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা বড় সহজ কাজ নয়। আমার ভদ্র চেহারা আর ভদ্র পোশাকই প্রথম বাধা হল। প্রথমে আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না। 'নাইট স্কুল' করলাম, নিজে পড়াবার জন্য রোজ যেতাম, ছাত্রই জুটত না। তা ছাড়া অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং বয়স্ক, অ-আ থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষিত করে তোলা সহজও ছিল না আমার পক্ষে। বক্তৃতা করতাম, আমার বক্তৃতার ভদ্র ভাষা কেউ বুঝত না। বক্তৃতা দেবার জন্যে শেষে তাদের মধ্যে থেকেই চালাক-চতুর একজন লোককে বেছে নিয়ে বাহাল করলাম মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে। একটা ম্যাজিক-লণ্ঠন এবং স্লাইডও কিনলাম কিছু। অল্পবয়স্কদের অক্ষর-পরিচয় করাবার জন্যেও একজনকে নিযুক্ত করলাম। নিজে রাত জেগে জেগে দেশী-বিদেশী খবরের কাগজ থেকে নানা খবর অনুবাদ করতাম। সেগুলো ছাপাতাম একটা সাইক্লোস্টাইলে। একটা সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিলাম সেজন্যে। তোমার মনে আছে কি, একবার একটা নিমন্ত্রণে যাবার সময় শাল আংটি ঘড়ি পরে যাইনি বলে, তোমরা রাগ করেছিলে ? তখন বলিনি, এখন কিন্তু বলতে বাধা নেই, শাল আংটি ঘড়ি আমার ছিল না, সবই বিক্রি করে দিয়েছিলাম এই কাজের জন্যে। দাদু মাসে মাসে আমকে যে পকেট-মনি দিতেন, কলেজের বই কেনবার জন্যে যে টাকা পেতাম, সবই এর জন্যে খরচ করেছি। লাইব্রেরিতে বসে আর ক্লাসের নোট টুকে পরীক্ষার পড়া করতাম, একটাও বই কিনিনি। নিজের বাহাদুরি করবার জন্যে তোমাকে এসব লিখছি না, যা যা করেছি তাই অকপটে বর্ণনা করছি কেবল। যাদের আমরা বহু যুগ ধরে শোষণ করেছি, তাদের জন্যে এই সব সামান্য ত্যাগ খুব যে একটা বড় কিছু তাও আমার মনে হয় না। যাই হোক, এত করেও কিন্তু মন পাই নি ওদের; যে চালাক-চতুর ছোকরাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে বাহাল করেছিলাম, সে আমার সামনে যদিও কমিউনিজমের বক্তৃতা দিত, আড়ালে কিন্তু আমারই নামে লাগাত মনিবদের কাছে গিয়ে। শুধু মনিবদের কাছেই নয়, নিজেদের মধ্যেও গোপনে প্রচার করত যে, আমার মত ধনীর দুলাল ধাওড়ায় যাতায়াত করছে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়, মেয়েমানুষের খোঁজে। তার দোষ ছিল না বিশেষ। ইতিপূর্বে দু-একজন ধনীর দুলাল তাদের উপকার করবার ছুতোয়

এসে সত্যিই নারী-ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আমার নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম তারা বোঝেনি বলে প্রথমটা আমি মর্মাহত হয়েছিলাম; কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম খুব কম লোকেই বোঝে। অধিকাংশ লোকই নিজেরা স্বার্থপর মতলববাজ বলে প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কাজের পেছনেই মতলব অনুসন্ধান করে, না পেলেও মনে ভাবে, নিশ্চয়ই আছে কিছু একটা। রঘ্‌ঘুকে এজন্যে অপরাধী করি না আমি। সে মনিবদের কাছে আমার নামে লাগাত, সেখানে থেকেও টাকা পেত বলে। যে টাকার লোভ বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সামলাতে পারেন না—যার লোভে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারীরাও মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখছেন, মিথ্যে রায় দিচ্ছেন, মিথ্যে মকদ্দমা করছেন, বস্তুত না করছেন হেন অপরাধই নেই—তার লোভে পড়ে রঘ্‌ঘুও যদি এ কাজ করে থাকে, খুব বেশি দোষ কি দেওয়া যায় তাকে? অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসুখের এপিডেমিক যেমন স্বাভাবিক, ক্যাপিটালিজ্‌মের আওতায় অর্থগৃধ্নুতাও তেমনই একটা স্বাভাবিক জিনিস। কারণ নিছক পরিশ্রম বা যোগ্যতার পরিবর্তে এ সমাজে সসম্মানে সৎপথে থেকে সুখে জীবনযাপন করা যায় না, অথচ কিছুমাত্র পরিশ্রম না করে অযোগ্যতম ব্যক্তিও রাজার হালে থাকতে পারে টাকা থাকলে। তাই সবাই টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। রঘ্‌ঘুও হয়েছিল। পরে এসব কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। তখন কিন্তু দুঃখ হয়েছিল খুবই, বিশেষ করে যেদিন আমার ম্যাজিক-লণ্ঠনটা চুরি গেল! এত কষ্ট হয়েছিল যে, পুলিসে খবর পর্যন্ত দিয়েছিলাম। পুলিস অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি, তারা তখন মদের দোকানে পিকেটিং বন্ধ করতে ব্যস্ত ছিল। আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেও দুঃখ পেয়েছিলাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে যেসব জিনিস আমি সাইক্লোস্টাইল করতাম, তা সবাই আগ্রহ করে নিত। এক দিন আবিষ্কার করলাম, তা তারা নেয় পড়বার জন্যে নয়, জিনিসপত্র মুড়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি করবার চেষ্টাও আমার সফল হয়নি। যেখানে সেখানে থুতু ফেলা অন্যায়, ঘরের আশপাশে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়, ঘরদোর বিছানাপত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার না রাখলে নানা রকম অসুখ হয়, মশা-মাছি-ছারপোকা থেকে আত্মরক্ষা মানে যে নানাবিধ রোগ থেকেই আত্মরক্ষা, ঘরের কপাট-জানালা যতদূর সম্ভব খুলে রাখাই উচিত— আমার এই সব বক্তৃতা শুনে তারা হাসত। দু-একজন মাঝে মাঝে আমার প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করত, কিন্তু তা দু-একদিন। একটি পথ দিয়ে গিয়ে কেবল তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। যখন তাদের বোঝাতে পারলাম যে, দিন-রাত পরিশ্রম করে তারাই মিল চালাচ্ছে, অথচ মোটা মুনাফাটা যাচ্ছে কতকগুলো অকর্মণ্য লোকের পকেটে, তখন যেন তাদের একটু সাড়া পেলাম। ধর্মঘট করে তাদের দাবি জাহির করতে পারলে ওই সব মেকী মালিকেরা যে সব দাবি মেটাতে বাধ্য হবে, এ কথা শুনে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল তারা। ক্যাপিটালিস্ট্ সমাজে ওই একটি মাত্র জিনিস আছে, যা লোকের প্রাণে সত্যিকারের উৎসাহ জাগাতে পারে—বক্তৃতা নয়, আদর্শ নয়, মহত্ব নয়—টাকা। আয় বাড়াবার লোভ দেখাতেই ওদের ঘুম ভাঙল যেন। আমাদের পাড়ার 'মিলে' কুলী-স্ট্রাইক আমিই যে করেছিলাম, তা বোধহয় জান। কিন্তু তার জন্যে কি বেগ যে আমায় পেতে হয়েছে, তা বোধ হয় জান না। আমার কথায় তারা তো স্ট্রাইক করলে, কিন্তু আড়াই শো বুভুক্ষু পরিবারের দিন চলা ভার হয়ে উঠল, যখন মুদীরা ধার দেওয়া বন্ধ করে দিলে। এটা যে সম্ভব, তা আমি কল্পনা করিনি। মুদীরা যে কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগ দেবে, এ কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাদের আমি স্বদলভুক্ত মনে করেছিলাম।

কর্তৃপক্ষ নাকি অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের সব জিনিস কিনে নিয়েছিলেন। সাত দিন কাটতে না কাটতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তারা দলে দলে এসে আমাকে বলতে বাধ্য হল, অবিলম্বে খাওয়ার বন্দোবস্ত না করলে কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাদের। আমার রোখ চড়ে গিয়েছিল। বললাম, তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করব, তোমরা এক মাস অন্তত কাজে যোগ দিও না বলে তো বসলাম, কিন্তু পরে হিসেবে দেখলাম আড়াই শো পরিবারে খাওয়ার ব্যবস্থা করা মানে দৈনিক আড়াই শো টাকার ব্যবস্থা করা অন্তত। আমার নিজের হাতে তখন কিছু নেই। মেডেলগুলো পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছি। এক মাস যদি স্ট্রাইক চলে, প্রায় আট হাজার টাকার দরকার। ধার করবার জন্যে বেরুলাম। বড়লোক বন্ধু যারা ছিল, সব হিতৈষী হয়ে উঠল একযোগে। কেউ আমায় পাগল ভেবে চিন্তিত হল কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে, কেউ রাগ করলে, কেউ হাসলে—টাকা কেউ দিলে না। কাবুলীরা বিনা বন্ধকে অত টাকা দিতে রাজী হল না। আমার তখন বন্ধক দেওয়ার মত কিছু নেই। বাবা-মাকে এ কথা বলতেই সাহস হল না আমার। সাহস হলেও সফল হতাম কি না সন্দেহ। কারণ বাবা নিজেই তখন চর্তুদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন টাকা ধার করবার জন্যে। মাকে ধরে পড়লে তাঁর গয়নাগুলো দিতেন হয়তো, কিন্তু কেঁদে কেটে এমন একটা অনর্থ করতেন যে, মুশকিলে পড়ে যেতাম আমি। এই ভয়ে পারতপক্ষে বাড়িতে এসব আলোচনাই আমি করতাম না কারও সঙ্গে। মরিয়া হয়ে শেষে অসমসাহসিক কাজ করে ফেললাম একটা। দমদমে গিয়ে দাদুকে সব কথা খুলে বললাম। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলাপ হয়েছিল, তার প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট মনে আছে আমার এখনও।

সব শোনবার পর তিনি বললেন, মিলের কুলীদের জন্যে তোমার হঠাৎ এত দুঃখ হল কেন?

বড়লোক মিল-ওনার ওদের ঠকাচ্ছে বলে।

ঠকাচ্ছে? যে মাইনে দেবে বলেছিল, তা দিচ্ছে না?

যা দিচ্ছে, সেটা অত্যন্ত কম।

অত কমে ওরা রাজী হল কেন?

রাজী না হয়ে উপায় কি? স্বেচ্ছায় ওর বেশি কেউ দেবে না।

দেবে কেন, ওই হল ওদের বাজার-দর। কুলী আবার কত মাইনে পাবে?

বুঝলাম, দাদুর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। যে লোকের সা-রে-গা-মা-সম্বন্ধে ধারণা নেই, তাকে বেহাগ-ভৈরবীর তফাত বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

চুপ করে রইলাম। দাদুই কথা কইলেন আবার।

কুলীকে তুমি বাবু বানাতে চাও নাকি?

কুলীকে আমরা কুলী করে রেখেছি বলেই সে কুলী। বাবু হতে তার বাধা কি? সেও তো মানুষ।

ও, বটে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, অতএব এই মহৎ কর্ম করবার জন্যে তুমি এনতার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছ।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আমার সর্বস্ব, এমনকি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কেটে দিতে আমি প্রস্তুত আছি ওদের বাঁচানোর জন্যে।

কিন্তু সেটা ধীরে-সুস্থে করলে ক্ষতি কি? এক্ষুনি আট হাজার টাকাই খরচ করতে হবে?

এক্ষুনি আট হাজার টাকা না পেলে আমার মান থাকবে না; আমার কথায় আড়াই শো লোক স্ট্রাইক করে অনাহারে আছে—আমি কথা দিয়েছি, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব।

কথা দিয়েছ?

হ্যাঁ।

তা হলে এ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। ভদ্দরলোকের কথার দাম আট হাজার টাকার চেয়ে নিশ্চয় বেশি। নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার হিসেবে এটা লেখা থাকবে, মনে থাকে যেন। আর তোমার ওই প্রোলিটারিয়েদের এত লম্ফঝম্প যে একজন ক্যাপিটালিস্টের ফুলিশ উদারতায়, সে কথাও তারা ভুলে যাবে না আশা করি।

দাদু সেদিন টাকাটা না দিলে যে কি করতাম, জানি না। তারপর থেকেই আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হল যে, আয় বাড়াবার প্রলোভন না দেখালে শ্রমিক-কিষাণ কারও সাড়া পাওয়া যাবে না এবং বার বার আমি একা তার তাল সামলাতে পারব না। সুতরাং পার্টিতে যোগ দিতে হল। প্রথম প্রথম অবশ্য কিছুদিন আমরা একটা ঘরে বসে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিনি, কারণ কাজ করবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের হাতে ছিল না তখন। শুধু বক্তৃতা করে শ্রমিক বা কৃষকের মন গলানো যায় না, তারা হাতে হাতে ফল দেখতে চায়। তবু কিন্তু আমাদেরই চেষ্টায় এই সময় খড়গপুর রেলওয়ে স্ট্রাইকটা হয়েছিল, যদিও সেটা বিশেষ কিছু নয়। আর এই সময়টা মাঝে মাঝে প্রায়ই জামসেদপুর যেতাম সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্যে। ছোটকাকা সেই সময় জেল থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে নিয়ে দিনকতক হৈ-চৈ করলাম। কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, তিনি ছোটকাকা বলে। দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া কাকীমা চলে যাওয়াতে ব্যাপারটা সত্যিই নিদারুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তাই তাঁকে ঘিরে একটা উৎসব-কোলাহল সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। কিন্তু সেসব যে তাঁর চিত্ত স্পর্শ করতে পারেনি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত। এ ছাড়া আর কোনও দিক দিয়ে কংগ্রেসের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলাম বলে মনে পড়ে না। এমন কি, সাইমন-কমিশন-বয়কট হুজুগে মাতবারও প্রেরণা পাইনি আমি, যদিও আমাদের দলের জনকয়েক খুব মেতেছিল এ নিয়ে। লর্ড বার্কেন্‌হেডকে মুখের মতন জবাব দেবার জন্যেও দিল্লীতে যখন অল পার্টিজ কন্‌ফারেন্স চলছিল এবং কন্‌স্টিটিউশনে শতকরা কতজন হিন্দু, কতজন মুসলমান, কতজন শিখ থাকবে.....এ নিয়ে যখন নেতারা মাথা ঘামাতে লাগলেন এবং অবশেষে মতিলাল নেহেরুকে মহাত্মা গান্ধী যখন ভার দিলেন রিপোর্ট তৈরি করবার, তখনও তাতে উল্লসিত হবার কোন হেতু ছিল না আমার দিক দিয়ে। আমার মনে হয়েছিল, সাইমন কমিশন এবং নেহেরু কমিশন একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, দেশের নাইন্টিএইট পার্‌সেন্টদের জন্যে যে সাম্য আমার কাম্য, তার আভাসমাত্র সাইমন বা নেহেরু কেউ দেবেন না। সুতরাং ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি।

কিছুদিন পরে সহসা কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম বারদোলির খবর পেয়ে। গভর্মেন্ট খাজনা বাড়িয়েছেন বলে সেখানকার চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে। বল্লভভাই প্যাটেল তার নেতৃত্ব করেছেন। আমি আর কলকাতায় থাকতে পারলাম না। চলে গেলাম বারদোলিতে। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা অপূর্ব। বারদোলির কৃষকদের বীরত্ব ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হতে দেখলাম আমার চোখের সামনে। আবালবৃদ্ধবনিতার যে শৌর্য, যে আত্মত্যাগ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা সত্যি সত্যিই যদি সারা ভারতের শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারত, তা হলে ভাবনা ছিল না।

বারদোলিতে হয়েছিল বল্লভাই প্যাটেলের জন্যে। মহাত্মাজী তাঁকে যে 'সরদার' উপাধি দিয়েছিলেন সত্যিই সর্বতোভাবে তাঁর উপযুক্ত তিনি। যদি আর কিছু না করে তাঁর এই সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তিকে জনসাধারণের কাজে লাগাতেন, মস্ত বড় কাজ হত একটা। এই শক্তিমান পুরুষ তা হলে খুব বড় একজন কমিউনিস্ট নেতা হতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, শক্তিমান করে তোলবার আগ্রহ এঁদের ততটা নেই, যতটা আছে ইংরেজকে জব্দ করবার আগ্রহ, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ অন্ধ জনতাকে মাঝে মাঝে অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। অন্ধ জনতা মাথা তুলতে পারেনি। সরদারজীর স্থান নেবার মত দ্বিতীয় লোক সেখানে দেখা যায়নি। ইংরেজকে জব্দ আমরাও করতে চাই, কিন্তু তার চেয়েও আমরা বেশি করে চাই জনসাধারণকে নিজের শক্তির সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে। তা যদি করতে পারি, ইংরেজ আপনিই জব্দ হয়ে যাবে। একজন গান্ধী, একজন বল্লভভাই, একজন সুভাষ, একজন নেহেরু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই না আমরা। আমরা ঘরে ঘরে গান্ধী-বল্লভভাই-সুভাষ-নেহেরুকে পেতে চাই এবং তা পাওয়া সম্ভব হবে যদি আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষা দিতে পারি, যা গান্ধী-বল্লভভাই-সুভাষ-নেহেরু বরাবর পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর-ফ্যারাডে দীন-দরিদ্রের ঘরে জন্মেও বড়লোক হতে পেরেছিলেন—এ কথা উল্লেখ করে যাঁরা সাম্যবাদের সমালোচনা করেন, নির্মম দারিদ্রের পেষণে কত প্রতিভা যে অকালে নষ্ট হয়ে যায়, সে খবর তাঁরা রাখেন না। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। জামালপুরের শ্রমিকদের অবস্থাটা কি রকম দেখতে গিয়ে অপরূপ জিনিস দেখেছিলাম একবার একটা। দেখলাম, ওয়র্কি্শপের জিনিসপত্র দিয়ে একটা বারো বছরের ছেলে ছোট্ট একটা এঞ্জিন বানিয়েছে। অল্প কয়লাতে বেশ খানিকক্ষণ চলে সেটা। সেই এঞ্জিনের সাহায্যে ছেলেটা নিজের ঘরে টানা-পাখা লাগিয়ে দিব্যি হাওয়া খায় রোজ। দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি এটা পেটেন্ট কর, খরচ যা লাগে আমি দেব। এই কথা শুনে তার বাপ-মা ভয় পেয়ে গেল। ওয়র্কি্শপের জিনিসপত্র চুরি করে জিনিসটা তৈরি হয়েছিল, জানাজানি হয়ে গেলে তাদের চাকরি থাকবে না। পরে খবর পেয়েছি, সে ছেলে বিদ্যাসাগরও হয়নি, ফ্যারাডে ও হয়নি। হয়ে ছিল ওই ওয়ার্কশপেরই একটা নগণ্য মজুর। ওভার-টাইম খেটে, না খেতে পেয়ে যক্ষ্মা হয়ে মরেছিল, শেষ কালে। সোভিয়েট দেশে তার এ পরিণতি হত না বোধ হয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরে যাওয়াই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাটা আকস্মিক, বড় হওয়া সুদূরপরাহত। তা ছাড়া দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ না করতে হলে বিদ্যাসাগর-ফ্যারাডে যে আরও বড় হতেন না, তাই বা কে বললে, তাঁদের?

বারদোলি থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। এসে পড়লাম অল-বেঙ্গল স্টুডেন্ট্স কন্ফারেন্সের হিড়িকে। পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতি। তুমি সেই সময়টা তেতলার ঘরে খিল দিয়ে ছবি-আঁকায় মগ্ন থাকতে বলে বোধ হয় টের পাওনি যে, তখন ছাত্রমহলে কি উত্তেজনাটা হয়েছিল। জওহরলালের বক্তৃতায় কমিউনিজ্মের অনেক খোরাক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, জওহরলালই কমিউনিজ্মের সুরটা ভালভাবে তুলেছিলেন আমাদের মনে। তখন খুব ভাল লেগেছিল, পরে কিন্তু পণ্ডিতজীর ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝেছি, কমিউনিজ্ম তাঁর প্রাণের জিনিস নয়, মুখের কথা মাত্র। তিনি তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মারফৎ—অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক্যাল—কমিউনিজ্মের যে অনিবার্যতা

অনুভব করছিলেন, তাই ওজস্বিনী ভাষায় বলে বেড়িয়েছেন সভায় সভায়, কিন্তু আসলে অর্থাৎ মনেপ্রাণে তিনি একজন অ্যারিস্টক্র্যাট, ঐশ্বর্যের কোলে লালিত-পালিত মতিলাল নেহেরু একমাত্র পুত্র, নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মন যে ছাঁচে ঢালা তা আমীরী ছাঁচ। তাকেই হেড এবং হার্টের সঙ্গে তাঁর এত বিরোধ এবং তাই তাঁর কমিউনিজ্‌মের এত বক্তৃতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বাপুজীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। সুভাষবাবুর সঙ্গে যদিও আমার মতের পুরোপুরি মিল নেই, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে বাহাদুরি দিই আমি। মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের ধ্বজাটা তিনি উঁচু করেই রাখতে পেরেছেন। আমার নিজেরই অতীত মাঝে মাঝে ভীত করে তোলে আমাকে। যে ক্যাপিটালিজ্‌মের বীজ আমার রক্তধারায় সুপ্ত আছে, তা একদিন জেগে উঠে আমার এতদিনকার গড়া আর্দশের অট্টালিকায় ফাটল ধরিয়ে দেবে না কি, কে জানে! সান্ত্বনা পাই টল্‌স্টয় এবং আরও অনেক বড়লোকের কথা ভেবে, যাঁরা টাকার দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় ছিলেন, তবু কিন্তু যাঁরা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে চিত্তকে উন্মুখ রেখে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করতে পশ্চাৎপদ হননি।

স্টুডেন্ট্‌স কন্‌ফারেন্স শেষ হবার পর আর একটা বড় রকম কাজ নিয়ে পড়লাম আমরা। এটা প্রত্যাশাই করছিলাম। জামসেদপুর স্ট্রাইক। এর ইন্ধন আগে থেকেই যুগিয়ে রেখেছিলাম আমরা. গর্কির 'মাদার' যদি পড়ে থাক, তা হলে আমাদের কর্মপদ্ধতির ধারা অনেকটা বুঝতে পারবে। ঠিক অমনই করে লুকিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট বিলি করে আসতাম, ওই রকম লুকিয়ে মীটিং করতে হত। গালাগালি তো বটেই, মারও খেতে হয়েছে একবার। এই সময়েই ভাল করে পুলিসের নজরে পড়ি। আমাদের চেষ্টা কিন্তু সার্থক হয়েছিল। এক কথায় ১৮০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে বসল। কিন্তু তার পরই মুশকিল হল—চিরন্তন মুশকিল। ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা তো ছিলই, দেশের অনেক নেতাও চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে এটা না টেকে। টাটা স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, তাকে ভাঙবার চেষ্টা তো স্বদেশদ্রোহিতার সামিল, এই হল অনেকের ধুয়ো। নিজেদের এবং নিজেদের দলের নানা স্বার্থে জড়িত বিজড়িত হয়ে তথাকথিত নেতারা কখন যে কোন্ কথা বলেন, তার গোপন ইতিহাস বিবৃত করবার এ স্থান নয়। যদি কোনদিন দেখা হয়, বলব। সে বড় কৌতুকজনক ইতিহাস। আর এই খবরের কাগজের কর্তৃপক্ষেরা! এরা কার কাছ থেকে কত ঘুষ খেয়ে কি যে কখন লিখে বসবে তার ঠিক নেই। বিজ্ঞাপন পাওয়ার লোভেই এরা জনসাধারণের সর্বনাশ করতে পারে। তা ছাড়া ব্ল্যাকশিপ সব দেশেই থাকে, এদের দলেও ছিল, এবং সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছিল, তাদের চিনতে দেরি হচ্ছিল বলে। এরাই শ্রমিকদের অধীর করে তুলছিল নানারকম গুজব আর ভেংচি আর ভাংচি দিয়ে গোপনে গোপনে। শেষটা এমন হল, সব ভেঙে পড়ে বুঝি! সুভাষবাবু এলেন মিটমাট করতে। মিটমাট হল, শ্রমিকদের দিক দিয়ে মোটামুটি ভালই হল, অন্ততপক্ষে মন্দের ভাল বলতে হবে। কিন্তু তাও ভেস্তে গেল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে গিয়ে আবার। এই সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করে হতাশ হয়েছিলাম। পরে বম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইকেও এ জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে অনেকে ইতস্তত করে না। শ্রমিকদের যতক্ষণ পর্যন্ত সৈনিকের মত শিক্ষা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মুক্তি নেই। একতাই প্রত্যেক আন্দোলনের শক্তি। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের কুঠার যদি তার মূলে আঘাত করে, তা হলে কতক্ষণ টিকবে? কিন্তু এর উপায় কি? যুক্তি দিয়ে অশিক্ষিত শ্রমিককে বোঝানো যাবে না, লাঠির গুঁতো কিংবা টাকার গুঁতো ছাড়া অন্য কিছুই তাদের ফেরাতে পারে না। কিন্তু ওই দুই বস্তুই বিপক্ষের হাতে। সুতরাং সে হিসেবে আমরা নিরুপায়। বম্বে

টেক্সটাইল স্ট্রাইকে এই সত্যটা আরও মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করলাম। মিলওয়ালাদের সঙ্গে গভর্মেণ্টও যোগ দিলেন এবং স্ট্রাইক ভাঙবার জন্যে গুণ্ডা পর্যন্ত আমদানি করলেন বাইরে থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিলুয়াতে স্ট্রাইক হল, জামসেদপুরের টিন্‌প্লেট কম্পানিতে হল, বজবজে হল, কলকাতার জুটমিলগুলোতে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না কিছুই। থেমে গেল সব। কারণ শ্রমিকরা এখনও এদেশে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন হয়নি। এখনও ভদ্রলোকের বেকার ছেলেরাই আলতো আলতো ভাবে কমিউনিজ্‌ম করছে—লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি, বইয়ের দোকান, মাসিক-পত্রের সম্পাদকী অথবা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিস করতে করতে, এবং তারাও সবাই খাঁটি লোক নয় বলে শ্রমিকদেরও খাঁটি করে তুলতে পারছে না।

বম্বে থেকে ফেরবার পথেই আমি ধরা পড়লাম। জেলে বসে এখন কমিউনিজ্‌ম নয়, ভাষাতত্ত্ব চর্চা করছি। জেলে বসে খবরের কাগজের মারফৎ কিছু কিছু খবর অবশ্য পাই এখনও। মনে হয়, না পেলেই ভাল হত। কারণ যা পাই, তা আশ্বাসজনক নয়। কমিউনিজ্‌ম এখন নাকি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয়েছে, অর্থাৎ সেইদলের অঙ্গীভূত হয়েছে যাদের মূলধন ন্যাশনালিজ্‌ম—কমিউনিজ্‌ম নয়। সাইমন কমিশনের উল্টো পিঠ হুইট্‌লে কমিশনে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের এন. এম. যোশী আর চমনলাল গভর্মেণ্টি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে খুব হৈচৈ করলেন। 'ডাউন উইথ যোশী', 'ডাউন উইথ চমনলাল' পর্যন্ত হয়ে গেল। গভর্মেণ্টি এঁদের মত লোককেই চান, আমরা তাঁদের বিচারে বে-আইনী। গান্ধী-আরুইন প্যাক্টে মহাত্মাজীর বিচারেও আমরা অস্পৃশ্য। তিনি গোল-টেবিল-বৈঠকে যাবার আগে মুসলমানদের সঙ্গে আপস করতে গিয়ে জিন্নার ফোর্টিন পয়েণ্ট্‌স শুনলেন, কিন্তু আমাদের একটা পয়েণ্ট্ শোনা ও দরকার মনে হল না তাঁর। দেশের লোকের কাছেও হয় আমরা হেয় না হয় অজ্ঞাত। যাদের জন্যে আমরা এত দুঃখবরণ করেছি, সেই সব দরিদ্র কিষাণ-মজুরেরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবে, মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয়। হয়তো তারাও কিছু ভাবে না, ভাববার অবসরই নেই তাদের। নানাবিধ বোঝার ভারে তাদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে রোজ, তারই যন্ত্রণায় তারা কাতর, আমরা কখন তাদের জন্যে কি একটুখানি করেছি, তা তাদের মনে থাকবার কথা নয়। তার জন্যে দুঃখ নেই, কারণ জনপ্রিয় হওয়া কোনকালেই আমাদের (অন্তত আমার) লক্ষ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য আমার আদর্শ। সেই আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে—এ খবর যখন পাই, তখনই কেবল বড় কষ্ট হয়। যেদিন খবর পেলাম মানবেন্দ্র রায় কমিউনিস্ট্ ইনটার্‌ন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, সেদিন রাত্রে ঘুম হয়নি আমার। সেই মানবেন্দ্র রায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে নানা কেলেঙ্কারির পর বেরিয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস করলেন। গিরি আর শিবরাও গোল-টেবিল-বৈঠকে গেলেন। এই গিরিই আবার ফিরে এসে মাদ্রাজে গবেষণামূলক বক্তৃতাও করলেন, ভবিষ্যৎ ইণ্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশনে লেবারের স্থান কি হবে! দেশ জুড়ে কেবল গবেষণা, খোশামোদ এবং বক্তৃতা! কমিউনিস্ট্ নেতারাও কাজ করবেন না। অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মিস্টার জে. এন. মিত্র এক উদাহরণও দিয়েছেন, রেলের কর্মীরা স্ট্রাইক করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু যমুনাদাস মেটা, গিরি আর যোশীর জন্যে তা নাকি হয়নি। কাশ্মীরে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটা হয়ে গেল, যেটাকে ব্রিটিশভক্ত মুসলমানেরা কমিউনাল আখ্যা দিলেন, সেটার আসল কারণ যে অর্থ-

নৈতিক, এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলবার মত কমিউনিস্ট্ নেতা পাওয়া গেল না। অন্তত খবরের কাগজে কোন আভাস পেলাম না তার। জওহরলালের 'হুইদার ইণ্ডিয়া' পড়ে এবং নরিম্যানের মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা শুনে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হল, এরকম মুখের বাণী তো ক্রমাগত শুনে আসছি সুরেন বাড়ুজ্জের আমল থেকে। সত্যি সত্যি কিছু কাজ হচ্ছে কি?। কাগজে অবশ্য খবরের অভাব নেই। আনসারি আর বিধান রায়—এই দুই ডাক্তারে মিলে মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে আবার চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করলেন। প্রেস্ক্রিপ্শন—কংগ্রেসকে আবার কাউন্সিলে ঢুকতে হবে। স্বয়ং মহাত্মাজী সে প্রস্তাব করলেন পাটনায়—মহাত্মাজী, যিনি সি. আর. দাশের স্বরাজ্য-পার্টির বিরোধিতা করেছিলেন! মহাত্মাজীর এবার নতুন শত্রু জুটেছে—কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট্ পার্টি। কমিউনিজ্মের লেবেল কপালে লাগিয়ে এঁরাও ভোট ক্যান্ভাস করে বেড়ালেন এবং কাউন্সিলের অর্ধেক আসন দখল করে বসলেন। কিছুদিন পরেই এল হোয়াইট পেপার এবং সভায় সভায় কাগজে কাগজে তার বাচনিক প্রতিবাদ।...কানপুরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্ট্রাইক ঘোষণা করলেন—একটু আশান্বিত হলাম। কিন্তু যে স্ট্রাইক দেশব্যাপী হবে ভেবেছিলাম, তা শুরু হতে না হতেই থেমে গেল গভর্মেণ্টের লাঠির চোটে। লাঠি আরও অনেককালে থাকবে, কিন্তু নূতন কর্মী তো কই দেখা যাচ্ছে না আর! যে আদর্শকে লক্ষ্য করে আমরা একদিন অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, যার জন্যে কমিউনিস্ট্ নেতারা কোন বিপদকেই বিপদ বলে গণ্য করেননি, নবনীর চিঠি পেয়ে মনে হল, সে আদর্শ দেশের ছেলেদের মধ্যে আর নেই। তারা সিনিক হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস টেরিরিজ্ম কমিউনিজ্ম কোন কিছুরই ওপর আর আস্থা নেই তাদের। মুখে স্বীকার না করলেও, এখনও সকলেরই আস্থা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের ওপরেই। তু করে যদি ডাকে, লক্ষ লক্ষ ছেলে ছুটে যাবে চাকরি করবার জন্যে, তা সে যে চাকরিই হোক। নবনী আই. সি. এস. হতে চায়। আই. সি. এস. হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে—এই তার জীবনের আকাঙ্খা। তার চিঠি পেয়ে হতাশ হয়ে গেছি আমি। তার ওপর আমার অনেক আশা ছিল। তোমাকে আজ জেল থেকে বসে এই চিঠি লিখছি অনেক আশা নিয়ে। যে সাম্যেব বাণী আমাদের দেশে বুদ্ধ চৈতন্য প্রচার করে গেছেন, যে সাম্যের ঘোষণা আমাদের ভারতীয় সভ্যতার মর্মমূলে, যে সাম্য-দৃষ্টিতে আমরা প্রতি জীবে শিব প্রত্যক্ষ করি, সেই সাম্যবাদই একদিন মানুষের মুক্তি আনবে—এই বিশ্বাস নিয়ে অতিশয় অন্ধকার দুর্গম পথে আদর্শের মশাল জ্বেলে একদিন যাত্রা করেছিলাম। এসে পৌঁছেছি জেলে। ছাড়া পাবার আশা নেই। হয়তো জেলেই মরতে হবে. কিন্তু মরেও যে শান্তি পাব না মেজদা, যদি মরবার আগে শুনে না যাই যে, আমাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার ভার নিয়েছে কেউ। মেকী কমিউনিস্টে দেশ ছেয়ে গেছে। অন্তত একজন খাঁটি লোকও জেলের বাইরে কাজ করছে—এ খবরটুকু পেলেও আমার কারাবাস সার্থক হবে। এর জন্যে জন্মজন্মান্তর কারাবাস করতেও রাজী আছি।....কয়েকদিন পরেই দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হবার কথা। সে উৎসবে আমি থাকতে পারব না বলে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমার সব দুঃখের অবসান হবে, তুমি যদি রাজী হও। কথাটা একটু ভেবে দেখো। তুমি শক্তিমান লোক, ইচ্ছে করলে সবই করতে পার। ভেবে দেখো, বুঝলে?

প্রণত
হীরক

পরিশিষ্ট

অন্নপ্রাশন-উৎসবে কনক আসেনি। ইন্দু-শুভ্রা আসত, কিন্তু সে-ও আসতে পারেনি। সে এসে উঠেছিল তার পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। ভেবেছিল, কর্তব্যটুকু চট্ করে সেরে ঠিক সময়ে এসে উৎসবে যোগ দিতে পারবে। প্রলুব্ধ পুলিস-ইন্সপেক্টরটিও ঠিক সেই সময়ে এসেছিলেন, ইন্দু-শুভ্রার গুলিও ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছিল, কিন্তু ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পালাতে পারেনি। ইচ্ছে করেই পালায়নি। দৃশ্যটা উপভোগ করছিল সে। দেশদ্রোহী কামুক লোকটার রক্তাক্ত দেহটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে। পুলিস-ইন্সপেক্টরের দেহ-রক্ষীরা আশে পাশেই ছিল। ইন্দু ধরা পড়ল রিভল্‌বার হাতেই।

....খানিকক্ষণ পরেই পুলিস এসে ঘিরে ফেলল শশাঙ্ক-শুভ্রের বাড়িটাও। হংস-শুভ্র থেকে আরম্ভ করে নবজাত খোকনকে পর্যন্ত উঠতে হ'লে পুলিস ভ্যানে। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল খোকনকে। গায়ে টকটকে লাল আগুন-রঙের জামা, কপালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। পুলিস-ভ্যানে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে, খানিকক্ষণ। তারপর মোটরটা চলতে শুরু করতেই মায়ে মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে ফিক করে।



উদয় অস্ত

(প্রথম খণ্ড)

।। এক।।

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিতেই কুমার উঠিয়া বসিল, নূতন করিয়া যেন আবিষ্কার করিল রাত অনেক হইয়াছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। সকালেই সে সব জায়গায় টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিয়া দুইবার দেখিয়া গিয়াছেন। সে পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনগুলিতেও তেল ভরাইয়া রাখিয়াছে যদি দরকার হয়। শান্তা, মধু, ল্যাংড়া, বোধিয়া এই চারিজন বলিষ্ঠ ভৃত্যকে বাড়ি যাইতে দেয় নাই, তাহারা রাত্রে এখানেই খাইবে এবং থাকিবে। তা ছাড়া গঙ্গা তো আছেই। ঊর্মিলা সকাল হইতে বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া আছে। মাঝে শুধু একবার উঠিয়া গিয়া খাইয়া আসিয়াছে। সবই ঠিক আছে, এখানে যাহা করিবার সে করিয়াছে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। একবার সে উৎকর্ণ হইয়া স্টেশনের দিকে চাহিল। গাড়ির শব্দ কি? না, হাওয়া। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠিয়াছে। কুমারের মনে হইল একটা ভালো বই পাইলে রাত জাগিবার সুবিধা হইত। যে নূতন বইটা সে স্টেশন হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল তাহা ডাক্তারবাবু লইয়া গিয়াছেন। পুরাতন কোন বইয়ের সন্ধানে সে সন্তর্পণে পাশের ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ চোখে পড়িল বাবার আলমারির চাবিটা দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। চাবিটা লইয়া সে বাবার আলমারিটাই খুলিল। বাবার আলমারিতে অনেক পুরাতন বই আছে। বাবা নিজের আলমারি কাহাকেও খুলিতে দিতেন না। আলমারিটা খুলিয়া কুমার কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মনে হইল বাবা যাহা পছন্দ করেন না তাহা করা উচিত হইবে কি? কিন্তু এ সঙ্কোচভাব কাটিয়া যাইতে বেশি বিলম্ব হইল না, মনে হইল বই পড়িব তাহাতে দোষ কি, নষ্ট না করিলেই হইল। টর্চের সাহায্যে সে বইগুলি কৌতূহলভরে দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি বই সযত্ন-রক্ষিত, মলাট দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বইটিতে বাবার নাম লেখা। কোন্ তারিখে কেনা হইয়াছিল তাহাও লেখা আছে। কুমার-গীতা, রামায়ণ, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (যাহা বহুকাল পূর্বে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত), দামোদর গ্রন্থাবলী, গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত, ফলের বাগান, পশুপালন প্রভৃতি বইগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। মনোমত একটা বইও নজরে পড়িল না। হঠাৎ এককোণে একটা মোটা খাতা দেখিতে পাইল সে। খাতাটা খুলিয়া দেখিল প্রথম পাতাতেই লেখা—'স্মৃতিকথা'। উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিল বাবারই হস্তাক্ষর। কৌতূহল সহকারে পড়িতে লাগিল।

"আমার জীবন-চরিতে লিখিবার মতো কি-ই বা আছে। আমি অতি সাধারণ মানুষ, দরিদ্রের ঘরেই জন্ম। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান পাইয়াছি। ইহার বেশি আর কোন কৃতিত্বের দাবি আমার নাই। ইহাও জানি, যতটুকু করিয়াছি তাহাও ভগবানের দয়ায়। ভগবান আমার উপর দয়া করিয়াছিলেন এ গর্বটুকু অবশ্য আমি করিতে পারি। আর একটা গর্বও আমার আছে। যে-সব মহাপুরুষ বাঙালী জাতির এবং

ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহারা সমগ্র মানবজাতিরই অলঙ্কারস্বরূপ, স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাঁহাদের নাম কাব্যে, ইতিহাসে বহুভাবে বহুবার কীর্তিত হইত, আমি তাঁহাদের সমসাময়িক। তাঁহাদের তুলনায় যদিও আমি নিতান্ত নগণ্য, তবু এই গর্বটুকু আমার আছে যে তাঁহাদের অনেককে আমি দেখিয়াছি, অনেকের কথা শুনিয়াছি।

আমার এ জীবন-চরিত আমি লিখিতাম না। আগাগোড়া জীবনের সব কথা লেখা সম্ভবও নহে। যাহা লিখিতেছি তাহা সামান্য স্মৃতিকথা মাত্র। শৈশবের ঘটনা কিছুই আমার মনে নাই। বড় হইয়া মাতামহীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। কিন্তু ইহাও আমি লিখিতাম না, আমার বড় ছেলের অনুরোধে লিখিতেছি। সেই আমাকে এই খাতাখানা কিনিয়া দিয়া গিয়াছে। আমার হাতেও এখন প্রচুর সময়, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। তাই অনেকটা সময় কাটাইবার জন্যও নিজের জীবনকথা নিজেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, অতিশয় সসঙ্কোচেই করিতেছি। ভরসা আছে ইহা বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠির নয়নগোচর হইবে না, আমার সন্ততিদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে......"

উর্মিলা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কুমার টের পায় নাই। তাহার কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।

"বাবার গলাটা ঘড় ঘড় করছে। তুমি মাথাটা একটু ঠিক করে দিয়ে যাও। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গেছে একটু।"

খাতাটা বাহিরে রাখিয়া কুমার সন্তর্পণে আলমারিটা বন্ধ করিয়া দিল। বাবার মাথাটা সত্যই বালিশ হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া দিল।

সূর্যসুন্দর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। নাড়ানাড়িতে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল! প্রশ্ন করিলেন, "কে বিরু?"

"আমি কুমার। দাদা এখনও আসেনি"

"উশনা?"

"সবাইকে খবর দিয়েছি। এই ট্রেনেই হয় তো আসবে।"

"হরিবোল, হরিবোল।"

সূর্যসুন্দর ধীরে ধীরে আবার চোখ বুজিলেন। উর্মিলা আবার মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। গঙ্গা নীরবে বসিয়া পা টিপিতেছিল। কুমার ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

"কি বলছ?"

"স্টেশনে দুটো গাড়ি পাঠিয়েছিস তো?"

"হ্যাঁ। চারজন চাকরও গেছে।"

"খেয়েছিস?"

"আমার খাবার ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে তো কিছু। তখন আমি হালুয়াটা খাইনি, ওঘরে কোণে ঢাকা দেওয়া আছে, সেইটে খেয়ে নে—"

গঙ্গা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। হালুয়ার খোঁজে গেল না, পুনরায় সূর্যসুন্দরের পদসেবা করিতে লাগিল।

গঙ্গার সহিত ইহাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। গঙ্গা বিহারী বৈশ্য। গঙ্গার বাবা হরিচাঁদ বহুকাল পূর্বে সূর্যসুন্দরের চাকর ছিল। গঙ্গা যখন দশ বছরের বালক তখন সে-ও এক বছরের শিশু কুমারের বাহন ছিল। সেজন্য অনেকে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ময়ূর' বলিত। গঙ্গা এখন ব্যবসায় করে, অর্থাভাব নাই, তাহার ছেলে আই. এ. পাস করিয়াছে কিন্তু এখনও সে নিজেকে এ বাড়ির চাকর বলিয়াই পরিচয় দেয়। এখন সে কুমারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু; দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পিছু পিছু কুমার আবার আসিয়া বাবার ঘরে ঢুকিল।

"খেলি না?"

"বললাম তো খাবার ইচ্ছে নেই।"

"তাহলে পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়ে একটু শুয়ে পড়। মধুকে না হয় পা টিপতে বসিয়ে দে।"

"দেখি।"

গঙ্গা উঠিল না। কুমার তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর পাশের ঘরে চলিয়া গেল। কোণে টেবিলের ধারে একটা ক্যাম্পচেয়ার ছিল, তাহারই উপর বসিয়া পড়িল সে। টেবিলের উপর যে বাতিটা কমানো ছিল তাহা বাড়াইয়া দিয়া জীর্ণ খাতাটি খুলিযা পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

"বাংলা ১২৭২ সালে পয়লা বৈশাখ মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আমার মাতামহী আমার নাম রাখিয়াছিলেন সূর্যসুন্দর। মাতামহীর সংস্কৃতে বেশ দখল ছিল, মাতামহ ছিলেন টোলের ন্যায়রত্ন। মাতামহীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল দশ বৎসর মাত্র। মাতামহীর ছিল চার। বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হয় নাই। এখন এসব গল্পের মতো শোনায় কিন্তু তখন ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। আমার মাতামহ আমার মায়ের নাম রাখিয়াছিলেন বারাহী এবং মামার নাম শক্তিনারায়ণ। আমার মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। বারাহী নামের অর্থ কি তাহা আমি অনেকদিন জানিতাম না। পরে জানিয়াছি ইহা দুর্গার নাম। পঞ্চসাগরে যে পীঠস্থান আছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারাহী। আমার পিতার নাম কেদারনাথ। আমার পিতার বিবাহ সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক গল্প মাতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম। গ্রামের জমিদার তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদের আহ্বান করেন। সেই সময় নিমন্ত্রিত হইয়া আমার পিতাও আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত একজন সেতারীর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে নিজে আসিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতাই সেই শিষ্য। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বছর। দীর্ঘকান্তি গৌরবর্ণ ছিল তাঁহার। সত্যই রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। জনতার মধ্যেও তাঁহার চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বাজনা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটির পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইল অনেকে। কেহ কেহ গিয়া তাঁহাকে প্রশ্নও করিল। খবরটা মাতামহীর কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না। মাতামহী

যখন শুনিলেন যে তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর মুখোপাধ্যায় বংশের, তখন তাঁহার মনে হইল যে সমস্যায় তিনি পীড়িত হইতেছেন, মা মঙ্গলচণ্ডী তাহার সমাধান বুঝি করিয়া দিলেন। কন্যা বারাহীর বিবাহের জন্য তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনোমত সৎপাত্র কোথাও মিলিতেছিল না, সুন্দর, সুগায়ক, পণ্ডিতবংশের কেদারনাথকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাই করিবার জন্য তিনি মনে মনে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। অরক্ষণীয়া কন্যা লইয়া তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন, মায়ের বয়স বারো পার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কে আগাইয়া গিয়া সম্বন্ধ করিবে? কিছুকাল পূর্বে আমার মাতামহ মারা গিয়াছিলেন, আমার মামার বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। আট বৎসরের বালকই শেষে অভিভাবকের কাজ করিল। সেই গিয়া তরুণ সেতারী কেদারনাথকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিল। দিদিমা নানারকম রান্না করিয়াছিলেন, কিশোরী কন্যা বারাহী সেগুলি পরিবেশন করিল। কথায় কথায় দিদিমা জানিতে পারিলেন যে বাবারও কোনও অভিভাবক নাই। তিনি বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন! অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে আর কাহারও অনুমতি বা মতামত লইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে তিনি নিজে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। সুতরাং আহারাদির পর দিদিমা সসঙ্কোচে তাঁহারই নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি করিলেন।

বাবা না কি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার তো একটি বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।"

দিদিমা আকাশ হইতে পড়িলেন, "বিয়ে হয়ে গেছে! কোথায়?"

"আমার সেতারের সঙ্গে।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

বাবা বলিলেন, "হাসির কথা হতে পারে, কিন্তু মিছে কথা নয়। সেতার নিয়েই দিনরাত থাকি। অন্যদিকে মন দিতে পারি না। রোজগার তো কিচ্ছু নেই।"

দিদিমা ইহাতে দমিলেন না। বলিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা। টাকার ভাবনা আমরা ভাবব। আমার কন্যাদায়টি তুমি উদ্ধার করে দাও।"

"কিন্তু পরিবার পালন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই।"

"পরিবার তোমাকে পালন করতে হবে না, সে ভার আমি নিচ্ছি।"

বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঘরজামাই হয়ে থাকাও আমার পোষাবে না। আমি গানের আসরে আসরে ঘুরে বেড়াই। আজ কাশী, কাল মুঙ্গের, পরশু লখ্‌নউ—"

"বেশ তো তাতেও আমার আপত্তি নেই। তোমার যখন যেখানে খুশি যেও।"

"ছেলেমেয়ে হলে আপনারাই তাদের ভার নেবেন?"

"নেব।"

বাবা ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আমার মতো ভবঘুরেকে আপনি জামাই করতে চাইছেন কেন?"

"তুমি বড় বংশের ছেলে বলে। অধ্যাপকের বংশধর তুমি। এ রকম বংশ আর কোথায় পাব। আমার কন্যাদায়, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। মনে হচ্ছে ভগবানের দয়াতেই তোমার মতো সৎপাত্রের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে দায় থেকে উদ্ধার কর তুমি বাবা—"

"আমি সংসারের কোন ভার নিতে পারব না" এ শুনেও আপনার বিয়ে দিতে আপত্তি নেই?"

"কিছুমাত্র না।"

"বেশ, তাহলে আয়োজন করুন।"

কিছুদিন পরেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই কিন্তু বাবা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বছরখানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, সপ্তাহখানেক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে তিনি আসিতেন, আবার উধাও হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না, কারণ এই শর্তেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

আমার মাতুল গ্রামের পাঠশালাতেই বাংলা পড়াশোনা করিয়াছিলেন। তখন গ্রামে ইংরেজি পড়াশোনার তত সুবিধা ছিল না। কেহ ইংরেজি পড়িতে চাহিলে তাহাকে কলিকাতা যাইতে হইত। মামার অর্থাভাব, কলিকাতায় যাইবার সঙ্গতি ছিল না। তাঁহাব পূর্বপুরুষেরা এককালে খুব বর্ধিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু চাঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও অচলা হইয়া থাকেন না। ইংরেজি শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলেই প্রায় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারের লোকসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিষয়সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া ইংরেজি শিখিয়া চাকরি বা ইংরেজের অধীনে ব্যবসা করাই তখন অর্থোপার্জনের উপায় ছিল। গ্রামে যাহাদেরই সঙ্গতি ছিল তাহারাই কলিকাতার সহিত নিজেকে কোন না কোন ভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। মামার সে সঙ্গতি ছিল না। আর একটা বাধাও ছিল, সেটা আর্থিক নয়, মানসিক। তখন অনেক হিন্দু সন্তান খৃস্টান বা ব্রহ্ম হইয়া যাইতেছিল। মাতামহীর ভয় ছিল ছেলে কলিকাতায় গেলে হয় খৃস্টান, না হয় ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে। গ্রামের মধ্যেই উদাহরণও ছিল। দুলেপাড়ার একটি ছেলে কলিকাতায় গিয়া খৃস্টান হইয়া এক নীচজাতীয়া খৃস্টানীকে বিবাহ করিয়া আনে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং মামার কলিকাতা যাওয়া হয় নাই। তিনি বাংলা লেখাপড়া গ্রামে বসিয়াই করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিকটবর্তী হিজলী গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারের অধীনে থাকিয়া ডাক্তারি শিখিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ ডাক্তার দিদিমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাশ করেন, ইচ্ছা করিলে শহরে খুব বড় চাকরি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। গ্রামেই প্র্যাকটিস করিতেন। তাঁহার মধ্যে তৎকালসুলভ সাহেবিয়ানাও কিছু ছিল না, গলাবন্ধ কোট এবং ধুতি, এই ছিল তাঁহার পোশাক। সাহেবিয়ানার মধ্যে ছিল দাড়িটি, সূচ্যগ্র ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাঁহার খুব পসার ছিল। দশটা-বারোটা গ্রাম জুড়িয়া তিনি প্র্যাকটিস করিতেন। যান ছিল পালকি এবং ঘোড়া। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মামা তাঁহারই অধীনে কম্পাউন্ডরি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাংলা পুস্তকের সহায়তায় ডাক্তারি বিদ্যাটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি প্রায় বছর দশেক তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন। এই দশ বৎসরে তিনি ডাক্তারি বিদ্যাটা যে ভালভাবেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পরবর্তী জীবন। তাঁহার ভারাক্রান্ত নিমজ্জমান সংসার-তরণীটিকে তিনি টানিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এই ডাক্তারির প্রভাবেই। শুধু যে টানিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নয়, কিছুদিনের জন্য তাহাকে

ময়ূরপংখীর মর্যাদাও দিয়াছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব, শিব-প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত ব্রাহ্মণ-অতিথিসেবা কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। ভাগ্যান্বেষণের জন্য কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার নিকট হইতে পয়সা লইবেন? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাসতুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুসকরায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুসকরায় গেলেন। প্রথমে মাসীমার বাড়িতেই রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যখন প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার পর ছুটি পাইলে বা কোন পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, দুই-চারিদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। মামাও এ নিয়ম পালন কবিয়াছিলেন। অবশ্য, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি (অর্থাৎ আমার মা), দুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুস্‌করায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়া শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নবমন্ত্রে নব্য বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজগার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন। দিদিমা যাঁহাকে পছন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্যা ছিলেন না। তাঁহার বংশমর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভদ্র-গৃহস্থ ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন সুলক্ষণের জন্য। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নখ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাঁতের গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি সৌভাগ্যবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একান্ন টাকা বরপণ দেওয়া হইয়াছিল। ঘর করিতে আসিবার সময় বধূ একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার শখ ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপও তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া মামা নাকি বহু বড় বড় রুইকাৎলাকে গাঁথিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেশিদিন থাকিতে পারেন নাই। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি ব্যবসায়ের পক্ষে গুসকরা অপেক্ষা সাহেবগঞ্জ প্রশস্ততর ক্ষেত্র। সেখান অনেক ধনী মাড়োয়ারী আছে, অনেক বাঙালীর বাস, শহরটিও গঙ্গার তীরে, গঙ্গার দুই পারে বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ডাক্তার হিসেবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে আয়ের বিপুল সম্ভাবনা। মামার গুস্‌করায় প্র্যাকটিস কিছুটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রথমে সহসা তিনি আসিতে রাজী হন নাই। কিছুদিন পরে যোগাযোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। নামজাদা সিনেমার ছবি এখন যেমন যুবক-যুবতীদের লোলুপ করিয়া তোলে, তখন নামজাদা যাত্রার দল তেমনি সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিত। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলের তখন খুব নাম-ডাক ছিল। এই সব দল সাধারণত পূজা-পার্বণ বা বিবাহ উপলক্ষে কোনও বড়লোকের আহ্বানে আসিয়া একাদিক্রমে তিন-চার রাত্রি পালা-গান গাহিতেন। দশ-বিশ ক্রোশ দূর হইতে লোকে দল বাঁধিয়া যাত্রা শুনিতে আসিত। আমার মামার যাত্রা শোনার খুব শখ ছিল। তিনি একদিন যাত্রা শুনিবার জন্যই গুসকরা হইতে সাহেবগঞ্জে চলিয়া আসিলেন। হাতে কঠিন রোগী ছিল, একরাত্রির বেশি সেখানে থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু মতি রায়ের যাত্রা তাঁহাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল, গুস্‌করায় ফিরিয়া গিয়া তাই তিনি স্থির করিলেন—গুস্‌করাতেই মতি রায়ের দলকে আনাইতে হইবে। ডাক্তার হিসাবে কয়েকজন ধনী মহাজনের উপর তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, অর্থ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। তিনদিন পরেই তিনি যাত্রার বায়না করিবার জন্য পুনরায় সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহারই এক দাদা মধু ঘটক তখন সাহেবগঞ্জে গোলাদারি করিতেন। নুনের গোলা ছিল তাঁহার। ইহা ছাড়া ধান, চাল, পাট প্রভৃতিরও কারবার করিতেন। অনেক ব্যাপারী তাঁহার কাছে আসিত। ব্যাপারী এবং অতিথিদের জন্য তাঁহার আলাদা একটি বাসাই ছিল। যাত্রার বায়না করিতে আসিয়া মামা মধু ঘটকের এই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। পরিচয় পাইয়া মধু ঘটকও তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন দৈবাৎ আর একটি ঘটনাও ঘটিল। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পেটের ব্যথায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকিতে হইল। সাহেবগঞ্জে তখন সুরথ বসু নামে এক সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জনের বেশ পসার-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘটক মহাশয়ের গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি আসিয়া উক্ত ব্যাপারীটির চিকিৎসার ভার লইলেন। রোগের কিন্তু উপশম হইল না। ব্যথা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমার মামা তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি এঁকে একটা ওষুধ দিতে পারি, আমার বিশ্বাস সে ওষুধে ওঁর ব্যথা কমে যাবে।" ঘটক মহাশয়ের সম্মতি পাইয়া মামা ঔষধটি দিলেন, অদ্ভুত ফলও ফলিল। ব্যবসায়ীটি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সাহেবগঞ্জ ছোট শহর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মামার নাম রটিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—সুরথবাবুর মতো ডাক্তার যে রোগকে কায়দা করিতে পারে নাই, এই ছোকরা ডাক্তার একদাগ ঔষধেই তাহা সারাইয়া দিয়াছে। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। একদিনেই মামার অনেক রোগী জুটিয়া গেল। যাত্রার বায়না শেষ করিয়া মামা যখন গুস্‌করায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন ঘটক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "এ সুযোগ তুমি ছেড় না। গুস্‌করার

চেয়ে সাহেবগঞ্জ অনেক বড় জায়গা। এইখানে এসেই তুমি বসে পড়। আমি তোমাকে থাকবার জায়গা দেব, যতদিন না তোমার ভালো প্র্যাকটিস জমে আমার বাসাতেই তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে। গুস্‌করা থেকে তুমি এখানেই চলে এস।"

শিবু ঘটকও এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহার দাদাও দিলেন। তা ছাড়া, মামা স্বচক্ষেই দেখিলেন যে একদিনের মধ্যেই সাহেবগঞ্জে তাঁহার যেরূপ নামডাক হইয়া গেল তাহা অভাবনীয়। তাঁহার মনে হইল বিধাতার কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়তো ইহার মধ্যে আছে। এখানে প্র্যাকটিস জমিয়া গেলে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। সাহেবগঞ্জ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আর একটি কাজ করিলেন, ডাক্তার সুরথ বসুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, তাঁহার মতো বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তাহা হইলেই তিনি সহেবগঞ্জে আসিবেন, নতুবা নয়। তাঁহার মতো কৃতবিদ্য চিকিৎসকের বিরোধিতা করিবার সাহস তাঁহার নাই। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীটি ঘটনাচক্রে দৈবাৎ সারিয়া গিয়াছে, হয়তো সুরথবাবুর ঔষধই একটু দেরিতে কাজ করিয়াছে। এ বিষয়ে নিজে তিনি কোনও কৃতিত্ব বা চিকিৎসানৈপুণ্য দাবি করেন না। ডাক্তার সুরথ বসু উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। মামার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আপনি এখানেই প্র্যাকটিস আরম্ভ করুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমি একা সব রোগী সামলাইতে পারি না। মফঃস্বলের অনেক রোগীকে ফিরাইয়া দিতে হয়, আপনি যদি এখানে আসেন ভালই হয়, আমারই অনেক রোগী আপনি পাইবেন—"

কুমার নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল।

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পাইয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে ভৃত্য শান্তা দাঁড়াইয়া আছে। শান্তা চাকরটি ঈষৎ স্থূলকায়, মুখটা থ্যাবড়া গোছের। ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটি ভাবলেশহীন, মনে হয় জীবন্ত নয়, যেন মুখোশের চোখ।

"কি রে—"

খাতা বন্ধ করিয়া কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। শান্তা আর একটু আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আলুকা খেত'পর সিহাই আইলোছে।" অর্থাৎ আলুর ক্ষেতে শজারু আসিয়াছে।

কুমার খাতা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণে বন্দুক ছিল, তাহাতে টোটা পুরিয়া সন্তর্পণে সে পশ্চিম দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শান্তাও তাহার পিছু পিছু গেল, যাইবার পূর্বে টেবিল হইতে টর্চটি তুলিয়া লইল। একটু পরেই টর্চের প্রয়োজন হইবে তাহা সে জানিত।

মিনিট দশেক পরেই দুম দুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। সূর্যসুন্দর আচ্ছন্নের মতো পড়িয়া ছিলেন। বন্দুকের শব্দে তাঁহার আচ্ছন্নভাব কাটিল না, তিনি কেবল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ' রায় মশায়, আপনার সিপাহীই বন্দুক চালাচ্ছে না কি"—বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। গঙ্গা কিছু না বলিয়া একটু মৃদু হাসিল।

উর্মিলা হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা, কিছু বলছেন?" সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কুমারের লক্ষ্য অব্যর্থ। বেশ বড় একটা শজারু ঘায়েল হইয়াছিল। ওজনে প্রায় দশ-বারো সের হইবে। শান্তা মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিল, সে জানিত ইহার অর্ধেকটা অন্তত তাহারা পাইবে। কিন্তু তাহার চোখে-মুখে সে আনন্দ প্রতিফলিত হইতেছিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে কুমারের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমার বলিল, "এটাকে পরিষ্কার করে তৈরি করে ফেল্। ঠকুরকে বল খানিকটা রেঁধে রাখুক। দাদারা যদি এসে পড়ে খেতে পারবে। এখুনি চড়িয়ে দিতে বল। বাইরের উনুনটায় আঁচ দিয়ে দে—"

উত্তেজিত হইয়াছিল ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচ্‌কি, কুমারের দেশী কুকুর দুইটা। কুমারের দুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘনঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল। মাঝে মাঝে মুখ নিচু এবং কান খাড়া করিয়া ছুঁচ্‌কি মৃত রক্তাক্ত শজারুটার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইতেছিল না, একটু আগাইয়াই আবার পিছাইয়া আসিতেছিল। ওই কণ্টকিত বীভৎস জানোয়ারের খুব কাছে যাওয়া নিরাপদ কি না তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ল্যাংল্যাং আগাইবার চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছিল। দুই-একবার ভেক্ ভেক্ শব্দ করিয়া সে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, ছুঁচকি কুঁই কুঁই করিতে লাগিল।

আদেশ পাইয়াও শান্তা নড়ে নাই। কতটা মাংস রান্না করিবার জন্য আলাদা করিয়া দিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, নিজের দায়িত্বে তাহা ঠিক করা সে সমীচীনও মনে করিতেছিল না। কুমার তাহার মুখের দিকে এক নজর চাহিয়াই সমস্যাটা বুঝিতে পারিল।

বলিল, "সের তিনেক রান্না করতে বল। বাকিটা তোরা ভাগ করে নিয়ে নে"—শান্তা ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল। মৃত শজারুটাকে সে টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকিও অনুসরণ করিল। হঠাৎ একযোগে কতকগুলা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। শৃগালের ডাক থামিতে না থামিতে পাখিদের সম্মিলিত কাকলিও শোনা গেল। কুমার টর্চ ফেলিয়া নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজিয়াছে। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিল, মনে হইল দূর প্রান্তরে কে যেন বিলাপ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণশশী বকুল গাছের মাথার উপর দেখা দিল। কুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বাবার এই অসুখই যে শেষ অসুখ তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; ডাক্তারবাবুও সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বাবার বয়স বিরাশী পার হইয়া গিয়াছে, কিছুদিন হইতে তিনি অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছেন, এখন যদি তাঁহার মৃত্যু হয় নালিশ করিবার কিছু নাই, বরং তাহাই কাম্য। কিন্তু তবু সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দাদারা আসিয়া পড়িলে সে যেন নিশ্চিন্ত হয়। যদিও সে জানে দাদারা এখানে আসিয়া বেশি কিছুই করিতে পারিবেন না, বিদেশে নিজ নিজ কর্মস্থলে তাঁহারা সক্ষম ব্যক্তি, এখানে যত ঝঞ্ঝাট কুমারকেই পোহাইতে হইবে, তবু তাহার মনে হইতেছিল দাদারা আসিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে, অনেকটা বল পাইবে, দায়িত্বের বোঝা কমিয়া যাইবে। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঊর্মিলা বাবার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "বন্দুকের আওয়াজ হল কেন, কিছু মারলে না কি?"

"একটা শজারু—"

"এখন না মারলেই পারতে! বাবার অসুখ—"

"কিন্তু আলুর ক্ষেত যে শেষ করে দিলে।"

"মা—"

সূর্যসুন্দরের ডাকে ঊর্মিলা তাড়াতাড়ি আবার তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া যেমন শুইয়াছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন।

"বাবা, কিছু বলছেন?"

মাথার শিয়রে বসিয়া খুব আস্তে আস্তে প্রশ্নটি করিল। সূর্যসুন্দর কোনও উত্তর দিলেন না। উর্মিলা তখন গঙ্গার দিকে চাহিল অর্থাৎ এ অবস্থায় কি করা যায়, আবার ডাকিবে কি? গঙ্গা হাত নাড়িয়া কথা কহিতে বারণ করিল। উর্মিলা তখন ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল, তাহার আর কিছু করিবার ছিল না। শ্বশুরের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের বিবাহের কথাটা সহসা আবার মনে পড়িয়া গেল। তাহার বাবা যখন কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া পাগলের মতো বহুলোকের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাকে তেমন আশ্বাস দেন নাই যেমন ইনি দিয়াছিলেন। কেহ চাহিয়াছিলেন রূপ, কেহ পণ, কেহ ডিগ্রি, কেহ সব। ইনিই কেবল বলিয়াছিলেন "আমার ছেলের যদি মেয়ে পছন্দ হয় আর কিছুরই জন্য আটকাবে না।" সত্যই আটকায় নাই, নির্বিঘ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন আবার কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। বাহিরের অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া ঝিল্লী-ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোড়ো হাওয়াটার বেগও যেন বাড়িতেছিল ক্রমশ। গঙ্গার মনে হইতেছিল প্রকৃতিও বুঝি হাহাকার করিতেছে। সূর্যসুন্দরের পদপ্রান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গঙ্গা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার মনে কত কথাই জাগিতেছিল। এই লোকের কি প্রতাপই না ছিল এককালে। বড় বড় দুর্ধষ জমিদারেরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল-সার্জনরা খাতির করিত। এ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া কি মহিমাময় জীবনই না উনি যাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই লোকই এখন অসহায় অসমর্থ, দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত নড়াইবার শক্তি নাই। হঠাৎ গঙ্গার মনে পড়িয়া গেল সূর্যসুন্দরের হাতে সে কত মারই না খাইয়াছে। কথাটা মনে হওয়াতে তাহার ভারী আনন্দ হইল, মনে হইল এটা যেন তাহার জীবনের পরমলাভ। সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আর একটা কথা মনে হওয়াতে সে উঠিয়া পড়িল এবং উর্মিলার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—"কুমার এত রাত্রে মাংস রাঁধতে বলছে। পেঁয়াজ আছে তো? কাল হাটে পাওয়া যায়নি।"

"না পেঁয়াজ নেই।"

"দেখি যদি পাই কোথাও।"

গঙ্গা নিঃশব্দে উঠিয়া কুমারের ঘরে প্রবেশ করিল।

"তোর বাইকটা নিয়ে আমি বেরুচ্ছি একবার।"

"কোথায়।"

"পেঁয়াজ নেই, মাংস রান্না হবে কি করে, তুমি তো হুকুম দিয়েই খালাস।"

"বিনা পিঁয়াজেই হোক। একটু বেশি করে রসুন আর আদা দিতে বল।"

"দেখি যদি পাই কোথাও।"

"এতরাত্রে কোথা পাবি।"

"জহিরুদ্দিনের বাড়িতে পাব।"

"দেখ তাহলে।"

গঙ্গা বারান্দা হইতে বাইকটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কুমার পুনরায় জীবন-চরিতে মন দিল।

"আমার মামা অবশেষে সাহেবগঞ্জে আসিয়াই বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে আসিয়া কয়েকদিনের জন্য তিনি মধু ঘটকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বাজারের কাছে একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেইখানেই উঠিয়া গেলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সাহেবগঞ্জে একটি বাড়িও কিনিতে সমর্থ হইলেন। নিজের গ্রাম হইতে এই সময়ে তাঁহাকে পরিবারবর্গকেও আনিতে হইল, কারণ তাঁহার মা (আমার দিদিমা) ক্রমশ দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। শুনিয়াছি আমার বাবাই না কি ইহার কারণ। বাবা কিছুতেই সংসার-বন্ধনে ধরা দিতেছিলেন না। বিবাহের পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিতেছিলেন। সংসারের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন নাই। সেতারটি লইয়া কোথায় যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। মাঝে মাঝে দুই-একখানা পত্র লিখিতেন—কখনও কাশী, কখনও লক্ষ্ণৌ, কখনও বা দিল্লী হইতে। শহরের নাম ছাড়া আর কোনও ঠিকানা তাহাতে থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকাও পাঠাইতেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা ক্বচিৎ। নিজে কখনও আসিতেন না। এ দুঃখ দিদিমার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়াছিল। যুবতী কন্যার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এইজন্যই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। মামা যখন তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। মামার পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মা, তাঁহার দিদি (আমার মা) এবং তাঁহার সদ্য-বিবাহিতা পত্নী। আমার মামীমার বয়স তখন বারো কিম্বা তেরো। মামীমার পিতামাতা কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। তাই মামীমার শিশু ভ্রাতা নকুলও মামার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসবাস করিবার মাস ছয়েক পরেই একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বাবা হঠাৎ সাহেবগঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন নাই, কিন্তু যোগাযোগ এমনই হইল যে তিনি আসিয়া পড়িলেন। মামা যে সাহেবগঞ্জে আছেন এ খবরও তিনি জানিতেন না। তিনি মুঙ্গের যাইতেছিলেন একজন ওস্তাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে আর একজন ওস্তাদ-সেতারী ধূর্জটি বাগচীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পূর্ব পরিচয় ছিল, উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধাও করিতেন। বাগচী মহাশয় বাবাকে জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। বাগচী মহাশয়ের বাড়ি মামার বাড়ির কাছেই ছিল, সেখানেই তিনি বাবাকে লইয়া আসিলেন। বাবা যে শক্তিবাবু ডাক্তারের ভগ্নীপতি একথা তিনিও জানিতেন না। কিন্তু জানিতে বিলম্ব হইল না। ধূর্জটিবাবুর অসুস্থ স্ত্রী মামারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। একটু পরেই মামা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন সব জানাজানি হইয়া গেল।.....বাবা সেবার কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গেলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে এবং দিদিমার চোখের অবস্থা দেখিয়া থাকিয়া গেলেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু আমি বাবার সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা হইতে আমার মনে হয় বাবার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাগচী মহাশয়। শুনিয়াছি অধিকাংশ সময় তিনি বাগচী মহাশয়ের বাড়িতেই কাটাইতেন। বাগচী মহাশয় সাহেবগঞ্জের মিউনিসিপালিটিতে চাকুরি করিতেন। তাঁহার পুত্র-কন্যা হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং যে বেতন তিনি পাইতেন তাহাতেই সেই শস্তা-গণ্ডার যুগে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত, আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিবার তেমন উৎসাহও তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসাহ ছিল সেতারে। সমস্ত মন পড়িয়া থাকিত সেতারের দিকে। আমার মনে হয় এমন একজন সুর-তপস্বীর

সঙ্গলোভেই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ধূর্জটিবাবুর সেতার-সাধনা একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তিনি গৎ লইয়া বেশি মাতামাতি করিতেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেতারটি কেবল বাঁধিতেন। তাঁহার প্রিয় তবলচী সখীচাঁদ পাশে বসিয়া তবলা টুংটাং করিত, বাগচী মহাশয় সেতারের তারগুলিতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে প্রয়োজনমতো সেগুলি ঢিলা করিতেন বা কষিয়া দিতেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি, তিনি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। আমরা যখন স্কুলের ছুটির পর মাঠে খেলিতে যাইতাম তখন দেখিতাম তিনি সেতার লইয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যায় যখন ফিরিতাম তখনও দেখিতাম তিনি বসিয়া আছেন, নিবিষ্টচিত্তে সুর মিলাইতেছেন। রাত্রি ন'টা পর্যন্ত তিনি তন্ময় হইয়া কেবল সুর মিলাইতেন। সুর মিলিয়া গেলেই তাঁহার মুখভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিত, সেতারটি রাখিয়া তিনি পুলকিতচিত্তে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, তাহার পর সেইটি খোলে পুরিয়া তুলিয়া রাখিতেন, যেন সেদিনের মতো তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। আমার বাগচী মহাশয়ের স্মৃতির সহিত একটা পবিত্র শুভ্রতার অনুভূতি বিজড়িত হইয়া আছে। তাঁহার গায়ের রং ধপধপে ফরসা ছিল, মাথার চুলও ছিল শাদা, স্কন্ধে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইত। থান পরিতেন, পায়ের চটি জোড়াও ছিল শাদা কটকী চটি। আহার শ্বেতপাথরের থালায় আলো-চালের ভাত, কিছু সিদ্ধ তরকারি এবং শ্বেতপাথরের বাটিতে একবাটি দুধ। বাগ্চী গৃহিণী সুরসিকা ছিলেন, বলিতেন "মহাদেব কি না, তাই সব শাদা। বাড়ির সামনে একটা শাদা ষাঁড়ও এসে বসতে আরম্ভ করেছে।" আমার বিশ্বাস এই বাগচী মহাশয়ের জন্যই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে ছিলেন, মামার বাড়িতে তিনি কেবল আহার ও শয়ন করিতেন, বাকি সময়টা তাঁহার বাগচী মহাশয়ের বাড়িতেই কাটিত। শুনিয়াছি—দিদিমা যখন মায়ের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেন, বাবা চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেন, কোন জবাব দিতেন না। একদিন কেবল মৃদু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—'আমি তো আগেই বলেছিলাম।' এই সময় বাবার আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া সকলকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবা যে একজন তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন—একথা পূর্বে কেহ জানিত না। প্রকাশ হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিকট একটি কালীর পট আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর প্রত্যহ তিনি সেটির পূজা করেন, পূজার সময় 'কারণ' পানও করেন। সাহেবগঞ্জে একটি কালীবাড়ি ছিল। অমাবস্যা-রাত্রে কালীবাড়িতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরিতেন তখন তাঁহার মূর্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া পড়িত। গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, পরিধানে রক্তাম্বর, চোখ দুটি টকটকে লাল। বাবার এই উগ্র শাক্ত-আচরণ কিন্তু বাগচী মহাশয়কে একটুও বিচলিত করে নাই। বরং বাবার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছিল। তিনি যতক্ষণ সুর মিলাইতেন বাবা তাঁহার কাছে ততক্ষণ নীরবে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, মনে হইত বুঝি ধ্যান করিতেছেন। বাগচী মহাশয়ের সুর মেলানো শেষ হইয়া গেলে বাহির হইত বাবার সেতার। বাবা তখন আলাপ শুরু করিতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ চলিত। তবলচী সখীচাঁদের নয় বৎসরের মেয়েটি তাহার বাবাকে ডাকিবার জন্য প্রত্যহ একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আসিত এবং লণ্ঠনটি একধারে কমাইয়া রাখিয়া তন্ময়চিত্তে বাবার আলাপ শুনিত। সখীচাঁদ পাঠকের কন্যা মুনিয়াকে আমি পরে দেখিয়াছি, ডাক্তার হইয়া তাহার নাতি-নাতিনীর চিকিৎসাও করিয়াছি। সেই আমাকে বাবার সেতার বাজানোর গল্প করিত। বলিত, বাবা সেতার

বাজাইতে আরম্ভ করিলে এমন একটা গম্ভীর অদ্ভুত পরিবেশ গড়িয়া উঠিত যে তাহার জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলিবার সাহস হইত না। মনে হইত সামান্য শব্দ করিলেই বুঝি সর্বনাশ হইয়া যাইবে, যে সুরের প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝি চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। তাই যতক্ষণ বাবার আলাপ চলিত সে চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া থাকিত। বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়িত, ঘুমের মধ্যেও কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত সেতারের আলাপে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিত যেন বিচিত্র বর্ণের অপ্সরীরা চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের পায়ে নুপূর, গায়ে নানা রঙের ওড়না।

আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাবা ছিলেন না। তিনি সাহেবগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া আবার সহসা একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই, এমনকি আমার মাকেও না। দোল উপলক্ষে মামা সপরিবারে দেশে গিয়াছিলেন। আমার মা তখন আসন্ন-প্রসবা। সুতরাং মামা পরিবারবর্গকে দেশের বাড়িতে রাখিয়া একাই সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। আমার জন্ম মামার দেশের বাড়িতেই হইয়াছিল।

শুনিয়াছি আমার মা দুইদিন প্রসব-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। মায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা ছিলেন তিনি, পাড়ার সকলেও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার প্রসব-বেদনা তাই অনেকের কষ্টের এবং চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ (খেতু-মামা) খুব বেশি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পালকি পাঠাইয়া হিজলা গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারকে আনাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আর দেখা যায় না। আপনি যেমন করে হোক ওকে খালাস করে দিন। অন্তত ওষুধবিষুদ দিয়ে কষ্টটা লাঘব করে দিন। এর জন্যে যদি কিছু অর্থব্যয় করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। হিমু গয়লা আমার বাছুর দুটো নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। পঁচিশ টাকা এখখুনি দিয়ে দেবে—"

প্রবীণ শ্রীনাথ ডাক্তার মৃদু হাসিয়া খেতু-মামাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'টাকা খরচ করলেই যদি সব কষ্টের লাঘব হত তাহলে বড়লোকেরা কেউ কষ্ট পেত না। ভয়ের কোনও কারণ নেই, প্রথম পোয়াতি তাই একটু দেরি হচ্ছে, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে—"

আমি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনাথ ডাক্তার অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাল হরণ করিবার জন্য আধসের অম্বরি তামাক পোড়াইয়াছিলেন শুনিতে পাই। আর একটা আশ্চর্য যোগাযোগ সেদিন ঘটিয়াছিল। যে কয়জন লোক আমার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাঁহারাও সকলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মামার বাড়ির উঠানে। উঠানের একধারে গোয়ালঘর ছিল, সেইখানেই আমার জন্ম হয়, আমার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কেহই উঠান ত্যাগ করেন নাই। আমার মামী ও দিদিমা তো ছিলেনই, খেতু-মামাও ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন মামার এক জাঠতুতো দাদা (বঙ্কু মামা) এবং একজন দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি উমেশ ঘোষাল। আমার মায়ের সই ভবিও (ভবতারিণী দেবী) একধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমার জন্মের প্রায় বছরখানেক পূর্বে তাঁহার প্রথম সন্তান সন্তোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সন্তোষের সহিত কিছুদিন আমি গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াও ছিলাম। পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতরও হইয়াছিল। সে কথা পরে লিখিব।......"

বাবার গলার স্বর শুনিয়া কুমার খাতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হরিবোল, হরিবোল—"
ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কিছু বলছেন?"
"না"।
"ঘাড়ের কাছে লাগছে না তো?"
"না। বেশ আছি। বিরু আসেনি এখনও?"
"না। ট্রেন বোধহয় লেট আসছে। স্টেশন থেকে গাড়ি ফেরেনি এখনও।"
ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার?"
"বুধবার।"
"আজ নবাবগঞ্জের হাট, না?"
"হ্যাঁ।"
"হাটে কেউ গিয়েছিল?"
"গিয়েছিল"
"মাছ পেয়েছে?"
"পেয়েছে, পাকা রুই মাছ।"
"ভালই হয়েছে। মাছ মাংস না হলে বিরুর খাওয়া হয় না।"
"মাংসও হচ্ছে। উনি শজারু মেরেছেন একটা।"
"মেরেছে? বেশ করেছে। আলুর ক্ষেতটা একেবারে তছনছ করে দিচ্ছিল।"
কুমার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বেশী কথা বোলো না বাবা, দুর্বল লাগবে।"
মৃদু হাসিয়া সূর্যসুন্দর চোখ বুজিলেন।
কুমার চুপি চুপি ঊর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গা কি বাড়ি গেছে?"
"না। পশ্চিম বারান্দায় কি করছে যেন।"
কুমার গিয়া দেখিল গঙ্গা ছেঁড়া বোরা মেরামত করিতেছে।
কুমারকে দেখিয়া বলিল, "চাকরগুলা সব শজারু নিয়ে মেতেছে। মধুকে বলেছিলাম বোরাগুলো মেরামত করে রাখতে। কাল লাদুরামকে পঁচিশ বোরা মকাই পাঠাতে হবে। সে নগদ দাম দিয়ে দেবে বলেছে। কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল আমার। গুণে দেখি মাত্র ষোলটি ভালো বোরা আছে আমাদের। বাকীগুলো সব ছ্যাঁদা। সেগুলো সেরে রাখছি তাই। বাবা উঠেছেন নাকি। গলা শুনলাম মনে হল—"
"দাদার কথা জিগ্যেস করছিলেন।"
"ট্রেনটা খুব 'লেট' আজকে। বাইরে কে ডাকছে যেন—"
গঙ্গা উঠিতে যাইতেছিল, কুমার বাধা দিল।
"তুই যা কচ্ছিস কর্, আমি দেখছি।"
কুমার বাহিরে গিয়া দেখিল—মুন্দিপুরের রাধানাথ গোপ আসিয়াছেন।
"আমি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এসে খবর পেলাম যে ডাক্তারবাবুর পক্ষাঘাত হয়েছে।

তাই আর থাকতে পারলাম না, চলেই এলাম। কি ব্যাপার, কেমন আছেন, কি ব্যবস্থা হয়েছে"?

কুমার তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল।

"এখন ঘুমুচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, আমি কাল আবার আসব।"

"এত রাত্রে আবার ফিরে যাবেন? তার চেয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানেই শুয়ে পড়ুন।"

"আজ আমাকে ফিরতেই হবে। কাল ভোরেই আবার চলে আসব। এ অঞ্চলের অনেকেই আসবে, আর সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কাল এসে তার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। করেছ কিছু?"

"না। কি করতে হবে বলুন তো?"

"একটু ফালাও করে বসবার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা করতে হবে আর কি। লোক অনেক জুটবে তো। আমি কাল এসে করব সে সব। এখন চলি।"

কুমার আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল। তিনি মহিষের গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। রাধানাথ গোপ মুন্দিপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। প্রায় এক হাজার বিঘা জমি আছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী এবং সূর্যসুন্দরের একজন প্রগাঢ় ভক্ত। কুমার ফিরিবার সময় দেখিল গ্রামের আরও দুই-চারিজন লোক বৈঠকখানার বারান্দায় সূর্যসুন্দরের খবর লইবার জন্য বসিয়া আছে। কুমারকে দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। সকলেই উৎকণ্ঠিত, ডাক্তারবাবুর খবর জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। ইহারাও অনেকদূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে এবং অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছে। গরীব মুসলমান চাষী কয়েকজন। কুমার সহসা অনুভব করিল—সূর্যসুন্দর এ অঞ্চলের সকলেরই পিতৃস্থানীয়, সুতরাং যে কোন সময়ে এ বাড়িতে আসিবার অধিকার সকলেরই আছে। এ বাড়ি কেবল তাহাদেরই নয়, সকলের। এ বাড়িতে তাহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে অন্যায় হইবে।

"তোমরা খেয়ে এসেছ?"

"না বাবু। বাড়ি গিয়ে খাব।"

"এইখানেই খেয়ে নাও। এত রাত্রে বাড়ি ফিরে যাবে? দরকার থাকে যেতে পার, আর তা না থাকলে এইখানেই শুয়ে পড়।"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

কুমার ভিতরে গিয়া গঙ্গাকে বলিল, "সীতারামপুরের জনকয়েক চাষী বাবার খবর নিতে এসেছে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

গঙ্গা হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখন কত লোক খবর নিতে আসবে তার ঠিক আছে? কত লোককে খাওয়াব আমরা?"

"এদের ব্যবস্থাটা তো কর এখন। পরের কথা পরে ভাবা যাবে"।

গঙ্গা উঠিয়া গেল। মনে হইল চটিয়াছে। চটিলে গঙ্গা নীরব হইয়া যায়।

।। দুই।।

সূর্যসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরু, ওরফে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায় কিউল প্ল্যাটফর্মে সস্ত্রীক বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুধু ট্রেনের নয়, নিজের ছেলেমেয়েদেরও। তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। বড় ছেলে লক্ষ্ণৌ শহরে ডাক্তারি করে, ছোট ছেলে অধ্যাপক, কাশীতে থাকে। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে দ্বারভাঙ্গায়, ছোট মেয়ের কলিকাতায়। ছোট জামাই পুলিশে বড় চাকরি করে। ইহাদের মধ্যে যে কেহ কিম্বা সকলেই যে কোনও ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে। বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির স্ত্রী পুরসুন্দরী তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোনও ট্রেন আসিলেই প্রতি কামরায় উঁকি দিয়া দেখিতেছেন—কেহ আসিল কি না। বৃহস্পতি নিজে আসিয়াছেন দিল্লী হইতে। কিউল হইতে তাঁহাকে লুপ লাইনের ট্রেন ধরিতে হইবে। কিন্তু সে ট্রেনটির এন্‌জিন্‌ কোন একটা স্টেশনে নাকি খারাপ হইয়া গিয়াছে, ট্রেনটা কখন যে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ফলে তাঁহাকে সাহেবগঞ্জে বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ সক্‌রিগলি ঘাটে যাইবার গাড়িটা সম্ভবত পাওয়া যাইবে না। ইহার জন্য বিরু খুব যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। তিনি জানেন, যাহা ঘটিবার যথাসময়ে তাহা ঘটিবে। যদি ধীরে ধীরে ঘটে—তাহাকে দ্রুততর করিবার জন্য চেষ্টামাত্র করা যাইতে পারে, ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। তিনি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র, মানবজাতির অতীত ইতিহাসের সন্ধানে অনেক কবর খুঁড়িয়াছেন, অনেক খনিত কবর পরিদর্শন করিয়াছেন। খ্রিস্ট-পূর্ব বহু সহস্র বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিতে করিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার মনে অন্তত একটা দার্শনিক প্রশান্তি থাকা উচিত, এ জ্ঞান তাঁহার আছে। ট্রেনের একটু-আধটু 'লেট' হওয়া বা পিতার অসুখের সংবাদ তাই যাহাতে তাঁহাকে খুব বেশি বিচলিত করিয়া না ফেলে সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কর্তব্য সম্বন্ধে অবশ্য তিনি উদাসীন হন নাই। ট্রেন লেট দেখিয়া কিউল হইতেই তিনি কয়েকটি টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন। পত্নী পুরসুন্দরীকেও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দিল্লী হইতে আসিবার পথে একটু ঘুরিয়া লক্ষ্ণৌয়ে নামিয়া গগনকে (বড় ছেলেকে) সঙ্গে করিয়া আনিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু এ ইচ্ছা অবশেষে তিনি দমন করিয়াছিলেন। এই অসুখই যে বাবার জীবনের শেষ অসুখ তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহাকে বাবার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, পথে কোন কারণেই বিলম্ব করা চলিবে না। তাই তিনি গগনের নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট ছেলে দিগন্তকেও টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই জামাই সুব্রত এবং সোমনাথকেও করিয়াছেন। তিনি জানেন কুমারও নিশ্চয়ই সকলকে খবর দিয়াছে। তবু 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনিও প্রায় সকলকেই একটা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন! এমন কি তাঁহার দুই বোন ঊষা এবং সন্ধ্যাকেও। কিরণের বর্তমান ঠিকানা জানা নাই বলিয়া তাহাকে খবর দিতে পারেন নাই। ঊষার শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়, সন্ধ্যার দেওঘরে। বিরু আশা করিতেছিলেন সন্ধ্যা-ঊষা নিশ্চয়ই এতক্ষণ পৌঁছিয়া গিয়াছে। চিত্রাও—বিরুর ছোট মেয়ে—হয়তো পিসিদের সহিত আসিয়া গিয়াছে। ছুটি পাইলে ছোট জামাই সুব্রতও নিশ্চয়ই আসিবে, কিন্তু তাহার ছুটি পাওয়াই মুশকিল।

পরসুন্দরীর সহিত এই সব আলোচনা করিয়া বিরু পুনরায় স্টেশন মাস্টারের নিকট

গিয়াছিলেন ট্রেনের খবরটা লইবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ট্রেনের এখন অনেক দেরি। কোনও খবরই নেই। এখন যে ট্রেনটা আসছে—স্বাতী আর সোমনাথ যদি পলেজা ঘাট পেরিয়ে পাটনা হয়ে আসে, সেটা ধরতে পারবে। ওরা আসতে পারে এ ট্রেনে। গগন আর দিগন্ত তো পারেই। আসল কথা হচ্ছে ওরা খবরটা পেয়েছে কি না। চারিদিকে যে রকম মিস্ম্যানেজন্ট, টেলিগ্রাম পৌঁছেছে কি না কে জানে। দ্বারভাঙ্গায় সোমনাথ আছে কি না তা-ও অনিশ্চিত। তাকে টুরে বেরুতে হয় তো। সে না এলে স্বাতীও আসতে পারবে না—"

স্বাতী বিরুর বড় মেয়ে, সোমনাথ বড় জামাই।

মুকুন্দ নামক যে বালক ভৃত্যটি ময়দা বাহির করিয়া লুচি ভাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল। একথা শুনিয়া সে থামিয়া গেল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুরসুন্দরীর দিকে চাহিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ট্রেনটা দেখেই তাহলে ময়দা মাখিস। তুমি এখন বিস্কুট দিয়েই চা খাও তাহলে—"

বিরু বলিলেন, "বেশ। ক্ষিধেও পায়নি তেমন —"

"চা খাবে, না, কফি? চা-তো এই একটু আগেই খেলে—"

"বেশ কফিই কব।"

বিরুর কিছুতেই আপত্তি নাই। যে সময়টা এখানে অনিবার্যভাবে থাকিতেই হইবে সে সময়টা কোনও কিছু করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। মনটা যেন নিযুক্ত থাকে, পিতার অসুখের সংবাদ ফাঁক পাইয়া তাঁহাকে যেন অশোভনভাবে চঞ্চল করিযা না তোলে। হঠাৎ তিনি একটা বড় তোরঙ্গের উপব বসিয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। পায়ে নূতন জুতা ছিল, কোঁচ-কোঁচ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিনিসপত্রগুলা আর একবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। সব ঠিকই আছে। জিনিসপত্র অনেক। দুইটা ট্রাঙ্ক, চারটি হোল্ড-অল্, গোটা ছয়েক সুট-কেস, ছোট বিছানা গোটা চারেক, মুখ-বাঁধা ফলের ঝুড়ি গোটা চারেক, মুখ-খোলা একটা, দুইটি বিরাটকায় টিফিন কেরিয়ার, একটা বড় হট্ কেস, মুখ-বাঁধা সন্দেশের হাঁড়ি গোটা দুই, গোটা দুই 'থারমস্', দুইটি বড় বড় কেরাসিন কাঠের বাক্সে রন্ধনের সরঞ্জাম, তা ছাড়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন একটা। বিরু বাজারের খাবার খাইতে পারেন না তাই যখনই বাহিরে যান সঙ্গে রন্ধনের সব ব্যবস্থা লইয়া যান, এমন কি বঁটি-শিল-নোড়া পর্যন্ত। মুকুন্দ রন্ধন ব্যাপারে সুদক্ষ। পুরসুন্দরীর সহকারিণী পার্বতীও ভাল রাঁধিতে পারে। সে-ও সঙ্গে আসিয়াছে। ভোরেই সে স্নান সারিয়া লইয়া দূরে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। মেয়েটা রোগা, কিন্তু একপিঠ চুল। পার্বতী বিরুর বৃদ্ধ চাপরাশি হরদৎ সিংয়ের একমাত্র কন্যা। হরদৎ সিং সপরিবারে বিরুর কাছেই থাকিত। তাহার পত্নী-বিয়োগের পর পুরসুন্দরীই পার্বতীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে হরদৎ সিংও মারা গেল। অনেক খরচ করিয়া বিরু পার্বতীর বিবাহও দিলেন। কিন্তু মেয়েটা দুর্ভাগিনী, বিবাহের ছয় মাস পরেই বিধবা হইয়া গেল। তখন হইতেই সে পুরসুন্দরীর কাছে আছে। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। পার্বতীর বয়স এখন ত্রিশ, কিন্তু এমন রোগা ছিপছিপে চেহারা যে দেখিলে মনে হয় কুড়ি বছরের বেশি নয়। খুব আদুরে। পুরসুন্দরীর দুই কন্যা চিত্রা ও স্বাতীর অপেক্ষাও বেশি প্রতাপ তাহার। হরদৎ সিং ছাপরা জেলার লোক ছিল, কিন্তু পার্বতীকে দেখিয়া সে কথা

বুঝিবার উপায় নাই। সে একেবারে বাঙালিনী হইয়া গিয়াছে। পুরসুন্দরী লোকের কাছে তাহাকে চাকরাণী বলিয়া পরিচয়ও দেন না, বলেন ও আমার মেয়ে।

মুকুন্দ কফির সরঞ্জাম বাহির করিয়া কফি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বিরু তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পায়চারি শুরু করিলেন। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। দুই হাত পিছনে দিয়া মাথা হেঁট করিয়া তিনি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়া হাজির হইলেন। মুকুন্দ যে কফি করিতেছে সে কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কোন একটা বইয়ে তিনি ইজিপ্টের এক ফারাওয়ের মমির যে ছবি দেখিয়াছিলেন সেই ছবিটা তাঁহার মানসপটে সহসা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল বাবাকে তিনি যে খাতাখানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাবা কিছু লিখিয়াছেন কি? ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের ছাত্র, ভাবিতে চেষ্টা করিলেন কি ভাবে লিখিলে জীবন-চরিত ঠিক ভাবে লেখা যায়। হিটাইট সিউমেবিয়ান মহেঞ্জোদারো প্রভৃতির ইতিহাস কি কি উপাদানের অভাবে অসম্পূর্ণ. . . .চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল, মুকুন্দের ডাক শোনা গেল।

"বাবু, কফি ভিজিয়েছি—"

বিরু ফিবিযা আসিয়া দেখিলেন পুরসুন্দরী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছেন। দৃশ্যটি দেখিয়া তিনি যেন একটু আরাম পাইলেন। কাঁদা উচিত বই কি। পিতৃতুল্য শ্বশুরের সাংঘাতিক অসুখের সংবাদে বাড়ির বড় বউ যদি না কাঁদে তাহা হইলে....তাহা হইলে ঠিক যে কি হয় তাহা বিরু সহসা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তাঁহার মনে হইল—শোকে বেসামাল হইয়া পড়াটা কি খুব শোভন? তিনি নিজে তো এখনও একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। কফির কাপে এক চুমুক দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। রোরুদ্যমানা পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া থাকাটাও তাঁহার নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। তিনি একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন, কফিতে আর এক চুমুক দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া পুনরায় হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। জুতা পুনরায় কোঁচকোঁচ শব্দ করিতে লাগিল। জুতাজোড়ার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু অস্বস্তিকর শব্দটা পুনরায় তাহাকে উঠিতে বাধ্য করিল। পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। মুকুন্দের হাতে কফির কাপটা দিয়া বলিলেন, "চল্ ওই ফলের ঝুড়িগুলোর মুখ খুলে দি। একটু হাওয়া লাগুক, তা না হলে পচে যাবে হয়তো। ঘণ্টাখানেক পরে আবার সেলাই করে নিলেই হবে। গুনছুঁচ আছে তো?"

"আছে।"

"চল তবে।"

পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পর ফলের ঝুড়িগুলির দিকে অগ্রসর হইলেন।

.....পুরসুন্দরী কাঁদিতেছিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার কাপড়ের আঁচল ভিজিয়া গিয়াছিল, ক্রন্দনাবেগে সমস্ত দেহটাই কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিছুতেই তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যই এ ক্রন্দন, ইহাতে কৃত্রিমতা বা ভণ্ডামি কিছুই ছিল না, কিন্তু একথাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে নিজের বাবার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যে শোকে

তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন সমস্ত বুকের ভিতরটা যেমন ভাবে মুচড়াইয়া উঠিয়াছিল এখন ঠিক তেমনটা হইতেছে না। দুই চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, সূর্যসুন্দরের প্রশান্ত মুখটাও মনের মধ্যে বারবার ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু তিনি অনুভব করিতেছেন এ ক্রন্দন যেন স্বতোৎসারিত নয়। বিবাহের পর হইতে যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন তাহা নিজের জীবন নয়, পরের জীবন। যে সংসার-রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যবিধাতা একদা তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন সেই রঙ্গমঞ্চের নির্দেশ অনুসারে সারাজীবন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অভিনয় মাত্র। অভিনয় করিতে করিতে ক্রমশ অভিনয়টাকেই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, অপরের সুখদুঃখ কালক্রমে এমনভাবে নিজের সুখদুঃখে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে নিজের সুখদুঃখের কথা আর মনে নাই। বিবাহের আগে কখনও ঠাণ্ডা ভাত খাইতে পারিতেন না, কিন্তু বিবাহের পর ঠাণ্ডা ভাত খাওয়াটাই দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির পুরুষদের খাওয়া চুকিয়া গেলে তবে মেয়েদের খাওয়া হয়, ডাক্তার শ্বশুর দিনের বেলা একটা দেড়টা এবং রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার আবার থিয়েটারের শখ ছিল, কোনও কোনও দিন আরও বেশি রাত হইয়া যাইত। পুরসুন্দরী প্রায়ই না খাইয়া ঘুমাইতেন। কোনও কোনওদিন তিনি আড়াল হইতে গানও শুনিতেন। বাহিরের ঘরটায় এক-একদিন গানের আসর বসিত। পুরসুন্দরী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। অশ্রুধারা বন্ধ হইয়া গেল। অর্ধ-বিস্মৃত বধূ-জীবনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। উঠানের উপরে স্তূপীকৃত গম, বারান্দার একধারে মকাই, বাড়ির বাহিরের জমিটাতে সব্জির বাগান, শাক বেগুন কপি লাউ কুমড়া অফুরন্ত! কত লোক যে লইয়া যাইত। জংলি গাইটার কথা মনে পড়িল। শ্বশুরের কত অদ্ভুত খেয়ালই যে ছিল। জংলি গাই পুষিয়াছিলেন। গাইটা না কি ধরা পড়িয়াছিল নেপালের জঙ্গলে। যে জমিদারের লোকজন উহাকে ধরিয়াছিল শ্বশুর মহাশয় ছিলেন তাঁহার বাড়ির ডাক্তার। জমিদার মহাশয় দুর্দান্ত জংলি গাইটির গল্প শ্বশুর মহাশয়ের নিকট করিয়াছিলেন, শ্বশুর মহাশয় একদিন গিয়া গাইটি দেখিয়াও আসিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল তাঁহার। কিছুদিন পরে জমিদারবাবু শ্বশুর মহাশয়কে জানাইলেন ওই বন্য-গাভীকে পোষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, সামর্থ্যে কুলাইতেছে না। দুধ দুহিতে গিয়া দুইটি গোয়ালা গুরুতরভাব জখম হইয়াছে। মোটা মোটা দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। যে ঘরের খুঁটায় উহাকে বাঁধা হইয়াছে সে ঘরটির চাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গাইটি তিনি জঙ্গলে ছাড়িয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। গাইটি ডাক্তারবাবুর পছন্দ হইয়াছিল, তিনি যদি চান তাহা হইলে অবশ্য গাইটি তাঁহার নিকটই পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার সানন্দ সম্মতি জানাইয়া পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার দিন কয়েক পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মনে পড়িলে এখন হাসি পায়। কিন্তু সে রাত্রে পুরসুন্দরীকে সভয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। পুরসুন্দরীর তখন সবে বিবাহ হইয়াছে, বয়স খুব কম, বাড়ির চারিদিকে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল, সন্ধ্যার পরে এমনিই গা ছম্ ছম্ করে। হঠাৎ গভীর রাত্রে 'রে রে রে রে' শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। পরে জানা গেল ডাকাত নয়, জংলি গাই আসিতেছে। তাহার শিঙে নাকে এবং গলায় শক্ত দড়ি বাঁধা, তবু সে জন দশেক বলিষ্ঠ লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে। বাছুরটি বেশ বড়, এদেশের ছোট দেশী গরুর মতো, অথচ বয়স মাত্র ছয় মাস। সে রাত্রে, সে কি কাণ্ড! বাড়িসুদ্ধ লোক উঠিয়া পড়িল,

যতগুলি লণ্ঠন ছিল সব জ্বালা হইল! বাড়ির সম্মুখে যে আমগাছটা ছিল তাহাতে ভারী লোহার শিকল দিয়া জংলি গাইকে শক্ত করিয়া বাঁধিবার পর শাশুড়ি বলিলেন, "ওর কপালে সিঁদুর আর খুরে জল দিতে হবে, সেটার ব্যবস্থা কর। তা নাহলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে—।" শ্বশুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। কিম্বা পিচ্‌কিরি করেও দিতে পার। কিন্তু সিঁদুর দিতে হলে ওই আমগাছে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। ওই নীচু ডালটায় যদি উঠতে পার তাহলে ওখান থেকে ওর মাথার উপর সিঁদুর লাগানো শক্ত হবে না। পারবে উঠতে? এককালে তো পারতে—" শাশুড়ি ঝাঁজিয়া বলিলেন, "কি যে বল তার ঠিক নেই। ছেলেবেলায় পারতাম বলে এই বুড়ো বয়সেও পারব না কি! পা হড়কে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—"

"তাহলে উদিৎ সিং উঠে দিয়ে দিক।"

উদিৎ সিং ছিল বাড়ির রক্ষক, সমস্ত চাকরদের কামতি অর্থাৎ সরদার। উদিৎ সিংয়ের চেহারাটা পুরসুন্দরীর মনে পড়িল! রোগা পাতলা ছোটখাটো মানুষটি। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তাহার। গলার স্বর ছিল তীক্ষ্ণ সরু, চটিয়া গেলে ছোট চক্ষু দুইটি হইতে আগুনের ফুলকি বাহির হইত যেন। রগের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিত। নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয় ছিল সে। কাহারও ছোঁয়া-জলে স্নান পর্যন্ত করিত না। একটি কুঁড়ে ঘরে সে আলাদা থাকিত, স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইত। দিনের বেলা রাঁধিত না। চিঁড়েদই, ছাতু বা বেলের সময় বেল, আমের সময় আম বা ওই ধরনের কিছু খাইয়া কাটাইয়া দিত। রান্না করিত সন্ধ্যার পর। শাশুড়ি তাহাকে এক ঘটি দুধ রোজ দিতেন। তখন বাড়িতে দশবারো সের দুধ হইত। দুধটাই ছিল উদিৎ সিংয়ের প্রধান আহার। গোয়ালার পিছনে মোতায়েন হইয়া প্রত্যহ সে দুধ দুহাইত। শ্বশুরমহাশয়কে দেবতার মতো ভক্তি করিত সে। তাঁহার আদেশে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে আপত্তি ছিল না তাহার। বরং বিপদ যত বেশি হইত তাহার উৎসাহ তত বাড়িত। জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁদুর দিতে হইবে এবং সে গুরু-ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে এই আনন্দে সে সগর্বে আগাইয়া আসিল। শাশুড়ি কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে লাগিলেন। এ পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত গাভীকে, এমন কি মহিষকেও, তিনি স্বহস্তে সিন্দুর দিয়া বরণ করিয়াছেন; অন্যরূপ করিলে অমঙ্গল হইবে না তো। উদিৎ সিংই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করিল। সে বলিল, মাইজি বাঁশের সিঁড়ি দিয়া গাছের উপরে উঠিয়া যান, আমরা সিঁড়িটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতেছি। তাহাই হইল, শাশুড়ি গাছের উপর উঠিয়াই জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁদুর দিলেন।

পুরসুন্দরীর হঠাৎ দুর্গাদাস এবং জাম্বুবানের কথা মনে পড়িল। দুর্গাদাস কাকাতুয়া এবং জাম্বুবান অ্যালসেশিয়ান কুকুর। তাহাদের সঙ্গেই লইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিরু রাজি হইলেন না। পুরসুন্দরীর আর একবার মনে হইল তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য কেহ কখনও দেয় না; এমন কি তাঁহার ছেলেমেয়েরাও না। সকলেই নিজের খুশি অনুসারে সব কিছু করিতে চায়। এই কিছুদিন আগেই গগন কি কাণ্ডটাই না করিল। তরকারিটা স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। অথচ ধনেপাতা তাঁহার নিজের খুব প্রিয়। বিরুও প্রথমে ধনেপাতা পছন্দ করিতেন না, এখন একটু একটু খান। স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে তাঁহাকেও 'চীজ' খাইতে হয়—কি দুর্গন্ধ জিনিসটা, ঠিক পচা সরের মতো। কিন্তু তবু খাইতে হয়, উপায় নাই। ননদরাও তাই। উষাকে ভালো একটা পানের

বাটা কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন, উষার পছন্দ হয় নাই, অমন সুন্দর মিনার-কাজ জিনিসটা না কি জবড়জং। সন্ধ্যার পছন্দও ঠিক দিদির মতো। বউদিদির যাহা ভালো লাগে তাহাদের তাহা ভালো লাগে না। পূজার সময় অমন দামী বেনারসী শাড়িটা কিনিয়া দিলেন, সন্ধ্যার নাকি পছন্দ হয় নাই। রং নাকি বেশি ঘোরালো। (অমন চমৎকার মেরুন রঙের বেনারসী দেখা যায় না প্রায়), পাড় নাকি বেশি চওড়া (আজকাল সরু পাড়ই না কি ফ্যাশন), তা ছাড়া কাপড়টা নাকি বড় ভারী। শুনিলে হাসি পায়। আসল জরির কাজ করা বেনারসী শাড়ি, হালকা হয় কখনও! তাই আজকাল আর কাহাকেও কিছু কিনিয়া পাঠান না তিনি, টাকা পাঠাইয়া দেন। ছোট-ছেলে দিগন্ত অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ বড় একটা করে না। যাহা খাইতে দেন তাহাই খায়, যাহা পরিতে বলেন তাহাই পরে। কিন্তু পুরসুন্দরীর মনে হয়—খাওয়া পরার দিকে তাহার তেমন লক্ষ্যই নাই, ওসব বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যায়, করিতে হয় বলিয়া করে। তাহার মন কেবল বইয়ে। যখনই যেখানে থাকে, বই হাতে লইয়া বসিয়া থাকে। কাপড় জামা জুতা কিছুরই শখ নাই, শখ কেবল বই কেনার। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির ভালো একটা চাকরি ছাড়িয়া তাই প্রফেসারি করিতেছে। সহসা তাহার জন্য পুরসুন্দরীর মন কেমন করিতে লাগিল। অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। পূজার ছুটির সময় আসিয়া মাত্র দিন কয়েক ছিল। এই প্রসঙ্গে ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথাও মনে পড়িল। নন্দার সহিত দিগন্তের বিবাহ দিবার জন্য ললিতবাবু অনেকদিন হইতেই অনুরোধ কবিতেছেন। নন্দা মেয়েটিও ভালো, বি-এ পড়িতেছে, সুশ্রী। কিন্তু দিগন্ত এখন কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। বলিতেছে ডক্‌টরেটের জন্য একটা থিসিস লইয়া সে ব্যস্ত আছে, তাহা শেষ না করিয়া আর কোনদিকে সে মন দিবে না। আজকালকার ছেলেদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।.....একটা খাবারের ফেরিওলা খাবারের গাড়িটা ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সদ্য-ভাজা জিলাপিগুলি দেখিয়া তাঁহার স্বাতীর কথা মনে হইল। মেয়েটা গরম গরম জিলাপি খাইতে বড় ভালবাসে। চিত্রাও বাসে। ডালমুটও চিত্রার খুব প্রিয়। অথচ উনি বাজারের জিনিস কেনা পছন্দ করেন না। তাই তাঁহাকে বাড়িতে ময়রা ডাকাইয়া জিলাপি ও ডালমুট তৈরি শিখিতে হইয়াছে। ওঁরও খাওয়ার শখ কম ছিল না। কিন্তু বাজারের বা হোটেলের কোনও জিনিস কখনও খান নাই, সবই তাঁহাকে বাড়িতে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার জন্য কত বই পড়িয়াছেন, কত বাবুর্চি (এমন কি গোয়ানিজ বাবুর্চি পর্যন্ত) রাখিয়াছেন। কত লোকের কাছে কত খোশামোদ করিয়া নূতন নূতন রান্না শিখিয়াছেন। অনেকে আবার শিখাইতে চায় না। মিসেস রায়ের কথা মনে পড়িল। সামান্য ফ্রেঞ্চ কাটলেট শিখাইতে কি বেগই না দিয়াছিলেন ভদ্রমহিলা। শেষ পর্যন্ত শিখানই নাই—ফিরপোর এক রাঁধুনী শেষে তাঁহাকে শেখায়। মনে পড়িল ইদানীং শ্বশুর তাঁহার হাতের নিরামিষ রান্না খুব পছন্দ করিতেন। যখনই শ্বশুরের কাছে থাকিয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যহ সুক্‌তো ও ঘণ্ট রাঁধিতে হইয়াছে। শ্বশুর ইদানীং মাছ-মাংস প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু পুরসুন্দরী প্রথমে যখন বধূ হইয়া আসেন তখন বাড়িতে মাছ-মাংসের খুব ধুম, তাল তাল মশলা বাটা, পেঁয়াজ-রসুন-গরম মশলার গন্ধে বাড়ি ভরপুর। শ্বশুর গরগরে মশলা-দেওয়া ঝাল-ঝাল মাংস পছন্দ করিতেন। কোথায় গেল সে সব দিন। পুরসুন্দরীর মনে অতীত-জীবনের নানা ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্টেশন ইয়ার্ডের একধারে যে মালগাড়িটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে একদৃষ্টে তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মালগাড়িটা

দেখিতেছিলেন না, ভাবিতেছিলেন গগন কি চম্পাকে লইয়া আসিবে? সে আসন্নপ্রসবা, বাপের বাড়িতে আছে, এ অবস্থায় তাহাকে না আনাই উচিত, কিন্তু গগন যে রকম গোঁয়ার তাহাকে হয়তো লইয়া আসিবে। ট্রেনে যা ভিড় আজকাল......। কিন্তু এ চিন্তা তিনি বেশিক্ষণ করিতে পাইলেন না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পশ্চিম হইতে একটা গাড়ি আসিতেছে।

বিরু ফলের ঝুড়িগুলি খুলিয়া ফলগুলিতে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া তিনি ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া ফেলিলেন। ফলের ঝুড়িগুলি লইয়া টানাটানি করিবার সময় বোতামগুলি নিজেই তিনি খুলিয়াছিলেন। মুকুন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই ফলগুলার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। আমি গাড়িটা দেখি কেউ এল কিনা।" পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া কিছুদূর তিনি আগাইয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। পুরসুন্দরীর কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমি গাড়িটা দেখি গিয়ে। ওরা যদি কেউ আসে" ওদের সামনে কান্নাকাটি কোরো না। কাঁদবার কি আছে এতে। তোমাকে কাঁদতে দেখলে সবাই মুষড়ে পড়বে। বাবার কঠিন অসুখ তো আর একবার হয়েছিল, গিয়ে দেখবে হয়তো সেরে গেছে সব। গলার বোতামটা আবার তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। গলাব কাছটায় কেমন যেন আঁট আঁট মনে হইতেছিল। আর কিছু না বলিয়া তিনি হন হন করিয়া ওদিকে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলেন।

......গাড়িতে অসম্ভব ভিড়। গগন, দিগন্ত, স্বাতী বা সোমনাথ কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। কেহই আসে নাই। না আসিবার মানে? গগন বউমাকে আনিবার জন্য পাটনায় নামিয়া পড়িল না কি! দিগন্তকে গগন হয়তো খবর দিয়াছিল। স্বাতী-সোমনাথ হয়তো কাটিহার দিয়া গিয়াছে। কয়েকটা 'হয়তো'র কবলে পড়িয়া বিরু একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। ভিড় বাঁচাইয়া হুইলার কোম্পানির দোকানের কোণে দাঁড়াইয়া তিনি হাত দুইটি মুঠা করিতেছিলেন এবং খুলিতেছিলেন। সারাজীবন তিনি নানারকম 'হয়তোকে' কেন্দ্র করিয়াই গবেষণা করিয়াছেন। একটা মাথার খুলি বা বাসনের টুকরামাত্র সম্বল করিয়া তিনি প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজের সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কখনও বিব্রত বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তিনি বেশ একটু বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা শেষ পর্যন্ত যদি না আসে"। বড় বিশ্রী ব্যাপার হইবে। আর একবার তাহাদের টেলিগ্রাম করিবেন কিনা একথাও তাঁহার মনে হইল।

"এই যে দাদা এখানে—"

বিরু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বোন কিরণ। অবাক হইয়া গেলেন। কিরণের স্বামী মাত্র একমাস আগে বদলি হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঠিকানা বিরু জানিতেন না, তাই তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে পারেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে কিরণ আসিয়া গেল। কিরণের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। কিরণের মাথার সামনের দিকে চুলে কি লাগিয়াছে? চুন? পরমহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। চুল পাকিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য, একধারে চুল অমনভাবে পাকিয়া গেল কেন! অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। কিরণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার খবর কি দাদা?" তখন তিনি আত্মস্থ হইলেন।

"কি জানি। আমি তো এখানে ট্রেনের গোলমালে আটকে পড়েছি। তুই খবর পেলি কি করে? আমি তো তোদের নূতন ঠিকানা জানতাম না তাই খবর দিতে পারিনি।"

"আমি কুমারের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কুমার ঠিকানা জানত।"

"কোথায় বদলি হয়েছিস আজকাল?"

"দেরাদুনে।"

"কার সঙ্গে এলে? ঘণ্টুর সঙ্গে?"

"না, ঘণ্টু তো মিলিটারিতে জয়েন করেছে, শোননি? তাকে একটা খবর দিয়ে আমরা চলে এসেছি, ওঁর সঙ্গেই এসেছি, উনি ছুটি নিয়েছেন।"

"কেষ্টও এসেছে না কি, কই"

"জিনিসপত্তর নামাচ্ছেন বোধ হয়। ওই যে।"

কুলির সারির পিছনে কিরণের স্বামী কৃষ্ণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্থকনামা ব্যক্তি। কুচকুচে কালো রং, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকুরি করেন। বিরুকে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন, তাহার পর হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন। সাহেবী পোশাক পরা ছিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যান্টের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেল।

বিরু বলিলেন, "আমরা ওধারের প্ল্যাটফর্মে আছি। তোমরাও চল। এখন কতক্ষণ পরে যে সাহেবগঞ্জের গাড়ি পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলতে পারছে না।"

।। তিন।।

বিরু রাত্রের গাড়িতে তো আসেনই নাই, সকালের গাড়িতেও আসিলেন না। আর কেহও আসিল না। মনে মনে একটু চিন্তিত হইলেও কুমার খুব বেশি দমিয়া যায় নাই, কারণ বাবা আজ সকাল হইতে অনেকটা ভালো আছেন। অনেকটা ফলের রস খাইয়াছেন, বেশ ভালো ভাবে কথা বলিয়াছেন, কথার জড়তা-ভাব অনেকটা কমিয়াছে। পায়ের দুই-একটা আঙুলও নাড়াইতে পারিতেছেন। .... বাবাকে ফলের রস খাওয়াইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছিল। সম্মুখে উৎসুকদৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল ছুঁচকি ও ল্যাংল্যাং। কুমার মাঝে মাঝে তাহাদের রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া দিতেছিল এবং বকিতেছিল।

"এতো লোভী কেন! শজারুর মাংস তো একগাদা খেয়েছ। দাদারা কেউ এল না, দুপুরেও তো অনেক খাবে—"

ছুঁচকি তাহার সূচালো মুখটা আরও সূচালো করিয়া কান দুইটি খাড়া করিয়া কুমারের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইল। মনে হইল এখনি যেন কথা কহিবে। ল্যাংল্যাং কিন্তু অন্য ভাব প্রকাশ করিল। তাহার সমস্ত মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহর্ষে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, তাহার কোমরটা পর্যন্ত দুলিতে লাগিল। ভাবটা কুমার যেন একটা রসিকতা করিয়াছে এবং সে তাহা সানন্দে উপভোগ করিতেছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু দুইজনে ঘেউ ঘেউ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। কুমার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পিওন। লোকটা নূতন আসিয়াছে, ছুঁচকি-ল্যাংল্যাং এখনও তাহাকে ভালো করিয়া চেনে না, তা ছাড়া লোকটার প্রকাণ্ড গোঁফ থাকাতে চেহারাটাও দুষমনের মতো।

পিওন বলিল, "টেলিগ্রাম—'

কুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িল। কিউল হইতে বিরু টেলিগ্রাম করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ট্রেনের গোলমালের জন্য এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছি, বাবা কেমন আছেন অবিলম্বে জানাও। আরজেন্ট রিপ্লাই-প্রিপেড টেলিগ্রাম। কাল সন্ধ্যাবেলাই আসিয়াছিল। এত বিলম্বে দিল কেন?

"টেলিগ্রাম কাল রাত্রে এসেছে, এতক্ষণে দিচ্ছ?"

পিওন বলিল, "রাত্রে কোনও পিওন থাকে না। কে নিয়ে আসবে।"

কুমারের মনে পড়িল পোস্টাফিসে পোস্টমাস্টারও নূতন লোক আসিয়াছেন। আগের পোস্টমাস্টার থাকিলে নিজেই আসিয়া টেলিগ্রামটি দিয়া যাইতেন। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহি করিয়া দিল, কিছু বলিল না। যাহা করিবার সে যথাসময়ে করিবে।

পিওন চলিয়া গেল।

"গঙ্গা, গঙ্গা—"

গঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল না।

সামনের ফুলবাগানে মধুর ছোট ছেলে 'এতবারিযা' গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল। সে ছুটিয়া আসিল।

"গঙ্গা চৌকি নামাচ্ছে।"

"চৌকি! কোথাকার চৌকি?"

"রাধাবাবু কোথা থেকে আনিয়েছেন, ঠিক জানি না।"

রাধানাথ গোপ নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে খুব ভোরে আসিয়া কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির সম্মুখে যে মাঠটা পড়িয়া আছে তাহাতে আট-দশটা চালা করিয়া দেওয়া হোক, প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙাইয়া তাহার নীচে কতকগুলি চৌকিও তিনি পাতিয়া দিতে চান। দূর হইতে বাহিরের লোক যদি আসে, আসিবেই, তাহারা বসিবার-শুইবাব জায়গা পাইবে। আত্মীয়স্বজন যাহারা আসিবেন তাহাদের জন্য গোটা দশ-বারো তাঁবুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ সকলে আসিলে বাড়িতে কুলাইবে না। বাড়িতে মাত্র পাঁচখানা ঘর। ডাক্তারবাবুর নিজের ছেলেমেয়েরা আছে, ভাই আছে, ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা আছে, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা আছে। এ খবর পাইলে সকলেই আসিবে, সকলকে স্থান দিতে হইবে তো। দূরদর্শী রাধানাথ ভোরে আসয়াই কুমারকে একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিরাট পরিকল্পনা শুনিয়া কুমার একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধাবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি সব করব। আমারও কর্তব্য এটা—"

সুতরাং কুমারকে বলিতে হইয়াছিল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন তাহলে। আমাকে যা বলবেন তাই করব।"

"তুমি বাবার কাছে বসে থাক কেবল, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

তাহার পর নিম্নকণ্ঠে তিনি একটি প্রয়োজনীয় কথা পাড়িলেন।

"এখানকার নতুন ডাক্তরবাবুটির উপর তোমাদের বিশ্বাস আছে তো? না থাকে তো কোলকাতা থেকে কাউকে আনাও। যা হবার অবশ্য তাই হবে, ওঁর আশীর উপর বয়স

হয়েছে—এখন যদি উনি যানও আমাদের ক্ষোভের কিছু থাকবে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয়।"

"না, নতুন ডাক্তারবাবুটিকে তো ভালই মনে হচ্ছে। বারবার এসে দেখে যাচ্ছেন। ওঁর চিকিৎসায় কিছু ফলও হয়েছে, বাবা আজ অনেকটা ভালো আছেন।"

"বাঃ, তাই না কি!"

রাধানাথ গোপ বাম করতলটি মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমার মনে হয় তবু সিভিল সার্জনকে খবর দাও একবার, তিনি এসে দেখে যান।"

"বেশ। দশটার ট্রেনে লোকই পাঠিয়ে দিচ্ছি একটা।"

"তাই দাও। আমি গিয়ে ওদিককার কাজে লেগে পড়ি তাহলে।"

দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন, কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"তোমাদের বাঁশ আছে?"

"আছে কিছু।"

"কিছু আছে তো? আমিও দু'গাড়ি বাঁশ আর কিছু খড় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে। দরকার হয় যদি তোমার কাছ থেকেও কিছু বাঁশ নেব। জনমজুর এসে গেছে, আমি ততক্ষণ জায়গাটা সাফ করিয়ে ফেলি।"

রাধানাথ গোপ তখন হইতেই জনমজুর লইয়া ব্যস্ত আছেন। কুমার আর ওদিকে যায় নাই, বাবার মুখ-ধোয়ানো প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিল। গঙ্গা চৌকি নামাইতেছে শুনিয়া কুমার উঠিয়া পড়িল। গঙ্গাকে এখনি পোস্টাফিসে পাঠাইতে হইবে। চাকর দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে রাধানাথবাবু যদি কিছু মনে করেন তাই নিজেই সে গেল।

রাধানাথ প্রায় জন কুড়ি মজুর, প্রচুর বাঁশ-খড়, কোদাল-শাবল, কাটারি-দড়ি প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কুমার গিয়া দেখিল গোটাচারেক গরুর গাড়িতে চৌকি আসিয়াছে, গঙ্গা চাকরদের সহায়তায় সেগুলি নামাইতেছে। রাধানাথবাবুর সহিত চোখোচোখি হইতেই কুমার বলিল, "দাদার টেলিগ্রাম এসেছে, ওঁরা কিউলে আটকে পড়েছেন, ট্রেনের কনেক্‌শন পাননি। টেলিগ্রামটা কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছে, এতক্ষণে ডেলিভারি দিয়ে গেল। বলছে—পিওন ছিল না, তাই পাঠাতে পারেনি। আগের পোস্টমাস্টারবাবু থাকলে নিজেই এসে দিয়ে যেতেন।"

গোপ মহাশয় নির্নিমেষে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এও যাবে। যে লোক সদরে সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাচ্ছে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি দেব।"

"আচ্ছা। দাদাকে আগে টেলিগ্রামটা করে দিই, দাদা কিউল থেকে রিপ্লাই প্রিপেড্ টেলিগ্রাম করেছেন।"

"সেখানে কোন ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবে?"

"কেয়ার অফ্ স্টেশন মাস্টার।"

"বিরুবাবুর সবই বিচিত্র কাণ্ড।"

রাধানাথ গোপের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস জাগিল।

"গঙ্গাকে একটু ছুটি দেবেন? ও গিয়ে টেলিগ্রামটা করে আসুক।"

"হ্যাঁ, ও যাক না। গিরিধারী তুমি চৌকিগুলো নাবাও।"

"আমাকে যদি কিছু করতে হয় বলুন।"

"বলেইছি তো, তুমি তোমার বাবার কাছে চুপ করে বসে থাক গিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি দেখ শুধু বসে বসে। ভাল কথা, চন্দরবাবুকে খবরটা দিয়েছ তো—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"কোথা আছেন তিনি আজকাল, অনেকদিন দেখিনি তাঁকে।"

"পুরীতে আছেন—"

"যদি আসেন, আসবেন তো নিশ্চয়ই, তাহলে দেখাটা হয়ে যাবে অনেকদিন পরে। আমি ওঁর ছাত্র তা জান তো, এখানে যখন প্রথম মাইনা স্কুল হয়, তখন উনিই হেডমাস্টার হয়েছিলেন। ও রকম মাস্টাব আমি দেখিনি। দু' ভাইই অদ্ভুত— "

চন্দ্রসুন্দর সূর্যসুন্দবের একমাত্র ছোট ভাই।

গঙ্গা কুমারের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

"তুই টেলিগ্রামটা পোস্টাফিসে দিয়ে আয়।"

গঙ্গা এতক্ষণ নীরব ছিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে এবার সে বলিল, "রাধানাথবাবু যা কাণ্ড লাগিযেছেন শেষে তোমাকে বিপদে না ফেলেন।"

"কি বিপদ।"

"শেষকালে যদি বলেন এসব করতে দু'শ-পাঁচশ' টাকা খরচ পড়েছে—।

"না, না—তা কি বলেন কখনও!"

"কিছুই আশ্চর্য নয়। খগেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী দেখাশোনা করবার সব ভার উনি নিয়েছিলেন। এমনি নিজে যেচেই নিয়েছিলেন। বিয়ে শেষ হয়ে যাবার ছ'মাস পরে উনি খগেনবাবুকে জানালেন যে বরযাত্রীদের জন্য তাঁর তিনশ' টাকা খরচ হয়েছে। খগেনবাবু বেচারাকে দিতে হল টাকাটা। অথচ ববযাত্রী ছিল মাত্র পঁচিশ জন—"

"খরচ নিশ্চয় পড়েছিল—"

"তুমি রাধানাথবাবুকে চেন না। উনি সব জায়গায় বাহাদুরি করে এগিয়ে যাবেন, তারপর তার থেকে লাভ করবার চেষ্টা করবেন।"

"কি যা তা বলছিস ভদ্রলোকের নামে!"

"দেখো শেষে—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গা পুনরায় বলিল—"বাবার অসুখ করেছে তাতে এমন ধুমধাম করে ঘরবাড়ি বানাবার কি আছে। কেউ যদি আসে, বাইরের বৈঠকখানায় বসবে—খবর নিয়ে চলে যাবে। এত ঘর বানাবার দরকার কি!"

"দরকার আছে। ঘর না থাকলে বেশি লোক এলে মুশকিল হবে। আমাদের বাড়িরই যদি সবাই আসে জায়গা দিবি কোথা। বেশি কয়েকটা ঘর থাকা ভাল—"

"তাহলে এক কাজ কর তুমি। ঘর তৈরি করতে যা খরচ হচ্ছে তা নগদ হিসেব করে এখনি দিয়ে দিও। ছ'মাস পরে তোমার কিছুই মনে থাকবে না।"

"আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুই এখন টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। ট্রেনের গোলমালে

দাদাকে নিশ্চয় অনেকক্ষণ কিউলে থাকতে হবে, তা না হলে টেলিগ্রাম করত না। টেলিগ্রামটা কাল রাত্তির থেকে এসে পড়ে আছে, এতক্ষণে দিয়ে গেল। নতুন পোস্টমাস্টারটি লোক সুবিধের নয়।"

"তাই না কি!"

গঙ্গা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল। কুমার টেলিগ্রাম লিখিতেছিল, কোনও জবাব দিল না। গঙ্গাও আর কিছু বলিল না, টেলিগ্রামটা লইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সাইকেলে চড়িয়া সুকুমার হাজির। সুকুমার স্টেশন মাস্টারের ছেলে।

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন আজ?"

"কালকের চেয়ে অনেক ভাল। কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। খেয়েওছেন।"

"তাহলে বালুয়াচকে চলুন না। সেখানে যা হাঁস বসেছে দেখে এলাম, একটা ফায়ার করলে অন্তত পঞ্চাশটা পড়বে। হাজার হাজার বসে আছে। চলুন না, যাবেন?"

"এখন কি করে যাই বল"

"জ্যাঠামশাই তো ভাল আছেন বললেন"।

"তবু একজন কাছে থাকা দরকার সর্বদা। দাদারা আসুক, তারপর যাওয়া যাবে একদিন"।

"আমাকে সঙ্গে নেবেন কিন্তু"।

"বেশ"।

"বাবা বললেন—কোন-কিছু যদি দরকার থাকে খবর দিতে।"

"এখন তো কোন দরকার নেই, হলে নিশ্চয় খবর পাঠাব।"

"আচ্ছা।"

সুকুমার আবার বাইকে চড়িয়া চলিয়া গেল। যদিও স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তবু সুকুমার যখনই আসে বাইকে চড়িয়া আসে। বাইকটি নূতন কিনিয়াছে।

কুমার ভিতরে গেল। ঊর্মিলা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া সূর্যসুন্দরের চোখের কোণ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। কুমারকে দেখিয়া সূর্যসুন্দর ঘাড় ফিরাইলেন।

"বিরুর কোন খবর আসেনি?"

"খবর এসেছে। কিউলে ট্রেন মিস্ করে দাদা টেলিগ্রাম করেছে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালে এসে পড়বে নিশ্চয়।"

"আর কারু খবর আসেনি?"

"না।"

সূর্যসুন্দর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়াও পড়িলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, শেষ সময়ে সকলের সহিত দেখা হইবে তো! অন্তরের ভিতর হইতে কে তাঁহাকে আশ্বাস দিল, হইবে। পৃথ্বীশও আসিবে। পৃথ্বীশ প্রায় সাত-আট বছর আগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। কেন করিয়াছে কেহ জানে না। কোথাও আছে, কি করিতেছে কোনও খবরও সে দেয় না। সূর্যসুন্দরের মনে হইল সে-ও আসিবে। কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছি।"

"রাধাবাবু এসেছেন। তিনি বলছেন, সিভিল সার্জনকে আনিয়ে একবার দেখাতে। আজ এগারোটার ট্রেনে নবীনকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি।"

"ভালো তো আছি। কি দরকার তাঁকে কষ্ট দিয়ে।"

"তবু একবার দেখে যান।"

"হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে তিনি যদি মত দেন, তাহলেই সিভিল সার্জনকে খবর দিও। তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও বরং।"

"আচ্ছা।"

কুমার অনুভব করিল—বাবার মনে প্রফেশনাল এটিকেটের কথা যখন জাগিতেছে তখন জ্ঞানের মধ্যে আর কোনও আবিলতা নাই। কাল সন্ধ্যার সময় বাবার জ্ঞান এত পরিষ্কার ছিল না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাঁহার চিঠি লইয়া সিভিল সার্জনের কাছে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কুমার চলিয়া গেলে সূর্যসুন্দর ঊর্মিলাকে বলিলেন, "মা, তুমি উঠে মুখ-হাত ধুয়ে এস। সারারাতই তো মাথার শিয়রে বসে আছ।"

"না, আমি ঘুমিয়েছি তো।"

"কোথায় ঘুমুলে।"

"আপনার মাথাব শিয়রেই ঘুমিয়েছিলাম। এখানে অনেকটা জায়গা আছে যে।"

"চা খেয়েছ?"

"এইবার খাব। বিজলী আসছে, সে এলে তাকে বসিয়ে যাব।"

"বিজলী কে।"

"রমেশ কাকার নাতনী।"

"ও, সে এসেছে নাকি।"

"পরশু এসেছে।"

সূর্যসুন্দর চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে বুজিলেন, কথা কহিয়া তিনি যেন একটু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার স্মৃতিপটে বিজলীর ছেলেবেলার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ফ্রক-পরা বিনুনি-দোলানো ছোট মেয়ে একটি। বাড়িতে তখন একটি টিয়াপাখি ছিল, টিয়াপাখির খাঁচাটির কাছে ঘুরঘুর করিত। চন্দরের বন্ধু রমেশ। সূর্যসুন্দরই তাহাকে জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। রমেশের ছেলে সুখেন্দু (কোথায় আছে সে এখন?) —রমেশ যখন প্রথম এখানে আসে সুখেন্দুর বয়স এক বৎসর। সেই সুখেন্দুর মেয়ে বিজলী এখন যুবতী। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়......সূর্যসুন্দর আর ভাবিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নবীনকে সিভিলসার্জেনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার চাকরদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। আখের ক্ষেত, গমের ক্ষেত প্রভৃতিতে যেসব কাজ বাকী ছিল সেগুলি সারিয়া তাহারা যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়িতে সদা-সর্বদা লোক থাকা দরকার। অক্লান্তকর্মী রাধানাথ একটা চালাঘর প্রায় খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, বাড়ির পিছনের দিকের মাঠে গোটা দুই তাঁবুও খাটানো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাজ করিতে পারিলে কুমারের মনটাও অবলম্বন পাইয়া স্থির হইত। মাঠে অনেক কাজ, কিন্তু বাবাকে ফেলিয়া মাঠে যাইবার উপায় নাই। গোপ মহাশয়ও তাহাকে ওদিকে ভিড়িতে দিবেন না, সুতরাং সে পূর্বদিকে পেয়ারা গাছতলায়, যেখানে রোদ পড়িয়াছে, সেইখানে ক্যাম্বিসের একটা 'ডেক' চেয়ার পাতিয়া সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"মামার দেশের বাড়িতেই আমি বড় হইতে লাগিলাম। আমার জন্মের পর মামা কেবল মামীমাকেই সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন। মা এবং দিদিমাকে লইয়া গেলেন না। মামার খুড়তুতো ভাই দুইটি চাকরি পাইয়া পূর্বেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ঘরের গাই কালীর অনেক দুধ হইতেছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ, জমি হইতে আসে প্রচুর। মামা বলিলেন, এসব ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার দরকার কি। সবাই বিদেশে চলিয়া গেলে পুকুর-বাগান কিছুই থাকিবে না। মা এবং দিদি এসব লইয়া এখানেই থাকুন, খেতু দেখাশোনা করিবে, আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব। সুতরাং আমার বাল্যকালের প্রথম কয়েক বৎসর মামার দেশের বাড়িতে শঙ্করা গ্রামেই কাটিয়াছিল। সাত-আট বৎসর পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। সে সময়ের স্মৃতি আমার মনে খুব স্পষ্টভাবে আঁকা নাই। আবছা-ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। মামা মা এবং দিদিমাকে গ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া নিজের বউটিকে লইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে দিদিমা (আমার মায়ের মা) খুব সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অবশ্য মুখে তিনি কাহারও কাছে বিশেষ কিছু বলিতেন না; আমার মা তো নীরবতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইত না। তিনি মুখ বুজিয়া ঘরের সমস্ত কাজগুলি একেব পর এক কবিযা যাইতেন। তাঁহাব তখনকার যে ছবিগুলি আমার মনে আঁকা আছে, তাহাদের একটিতেও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ঘর-দুয়ার-উঠান-গোয়াল পরিষ্কার করিতেছেন, পুকুর হইতে জল আনিতেছেন, রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছেন, অথবা দিদিমার পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন—মায়ের এই সব ছবিই আমার মনে আঁকা আছে। কোথাও বসিয়া পর-নিন্দা বা পর-চর্চা করিতেছেন এরূপ একটি ছবিও আমার স্মৃতিপটে আঁকা নাই। তবে মামা কেবল মামীমাকে লইয়া বিদেশ চলিয়া যাওয়াতে আত্মীয়দের মনে যে ঈষৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা খেতু-মামার আলাপে বুঝিতাম। খেতু-বাবা প্রায়ই আসিয়া দিদিমার কাছে এসব প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিতেন, তাহার কিছু কিছু আমার এখনও মনে আছে।

একদিন খেতু-মামা মাঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ি আসিলেন। মাঠের ফেরতই তিনি আমাদের বাড়িতে অধিকাংশ দিন আসিতেন। নিজের জমিতে জনমজুরদের সহিত নিজেই কাজ করিতেন তিনি। সেদিন দুপুরে মাঠ হইতে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়া মাথার টোকাটা খুলিয়া ফেলিলেন, হাতের কাটারিটা উঠানের একধারে রাখিলেন, তাহার পর হাঁকিলেন—"কই বারাহী, এক ঘটি জল দে তো—"

মা রান্নাঘরে ছিলেন, আমি ছিলাম লেবু-তলার ওপাশে। উঠানে দুইটি লেবু গাছ ছিল। লেবু গাছের দক্ষিণ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। তিনদিকে বাড়ির দেওয়াল, আর একদিকে লেবু গাছ। চমৎকার নির্জন জাযগাটি, অথচ উঠানের মধ্যেই। আমি সেইখানেই খেলা করিতে ভালবাসিতাম। আমার সঙ্গী ছিল সন্তোষ। সন্তোষের মা ভবতারিণী দেবী মায়ের সখী ছিলেন, ইহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সেদিন ইটের টুকরা ও কাদা দিয়া শিব-মন্দির গড়িতেছিলাম।

মা খেতু-মামাকে জল আনিয়া দিলে খেতু-মামা পা দুইটি বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন।

"আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চাই, খাব। তারপর তামাক সাজ এক ছিলিম। তামাকটি তোর

মতন কেউ সাজতে পারে না। কেদারকে তামাক সেজে খাইয়েছিলি একদিনও? খাওয়াস নি? খাওয়ালে তোকে ফেলে যেতে পারত না।"

আমি লেবু গাছের আড়ালে বসিয়া সব দেখিতেছিলাম। মা খেতু-মামার কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ঘরে ঢুকিয়া একটি ছোট রেকাবী ও এক ঘটি জল আনিয়া দিলেন। রেকাবীতে সম্ভবত বাতাসা ছিল। বাতাসাগুলি মুখে ফেলিয়া দিয়া খেতু-মামা আলগোছে ঢক্ঢক্ করিয়া সমস্ত জলটুকু পান করিলেন, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না। একটু পরেই দেখিলাম মা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছেন। খেতু-মামার কোমরে পিছন দিকে সর্বদা একটি হুঁকা গোঁজা থাকিত। সেটি তিনি মায়ের হাতে দিলেন। মা কলিকাটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হুকায় জল ভরিলেন। খেতু-মামা দু'একবার টানিয়া খানিকটা গল ফেলিয়া দিয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিলেন। তাহার পরই হুঁকার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

দিদিমার দৃষ্টি তখনও একেবারে লোপ পায় নাই। খেতু-মামার গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রোজ দুপুরে তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইতেন।

খেতু-মামা বলিলেন, "খুড়িমা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যে। চেঁচামেচি করে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম না কি?"

"না। ঘুম আমার হয়ে গেছে। বারাহী খেয়েছিস?"

"এইবার খাব।"

"কি যে সমস্ত দিন ঘুটঘুট করিস রান্না ঘরে। আমার খাওয়া তো সেই কখন হয়ে গেছে।"

মা কোনও উত্তর না দিয়া দিদিমার চওড়া কাঠের পিড়িখানি বারান্দায় পাতিয়া দিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দিদিমা বসিতেই খেতু-মামা প্রশ্ন করিলেন, "শক্তির খবর পেয়েছ? সব ভালো আছে তো?"

"দিন কয়েক আগে এসেছিল একটা চিঠি। বউমার নাকি ছেলেপিলে হবে। এ সময় আমাদের ওখানে থাকলেই ভালো হত।"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আজকালকার ভদ্রলোকরা দেখছি বউ নিয়ে একা একা থাকাটাই উচিত মনে করছেন। মা বোন বা আত্মীয়-স্বজনদের ঘেঁষটা পছন্দ করছেন না। কিছু টাকা মনি-অর্ডার করেই মনে করছেন যে কর্তব্য সমাপন হল।"

খেতু-মামা মাঝে মাঝে খুব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন।

দিদিমা বলিলেন, "সন্তোষের বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করে, সেখানে ভালো একটা বাসাও পেয়েছে, কিন্তু কই বউকে তো নিয়ে যায়নি। বউ তো মায়ের কাছে আছে।"

"তোমার ছেলে শক্তি সে জাতের নয় খুড়ি। তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়।"

খেতু-মামা বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

"কি সন্দেহ হয়"

"ও একটু স্ত্রৈণ"

দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "না, তা ঠিক নয়। নিজের বউকে কে না ভালবাসে, বাসাই তো উচিত।"

"তাতে আর সন্দেহ্ কি। কিন্তু তা বলে বউকে নিয়ে মজা করে শহরে একা একা থাকব, আর মা বোন পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে এটা কি উচিত?"

"কিন্তু এখানকার বিষয়-আশয় কে দেখে বল?"

"বিষয়-আশয় তো দেখে তোমাদের দুখীরাম আর ছিরু, আর সামলাই আমি। তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখেও ভাল দেখতে পাওনা আজকাল, আর বারাহী তো ছেলেমানুষ, তোমরা যে বিষয়-আশয় দেখতে পারবে না এ কথা শক্তি ভালো করেই জানে। ওটা ওর একটা ছুতো—"

দিদিমা ইহার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। মনে হইল খেতু-মামার কথায় তিনও যেন সায় দিতেছেন।

........কতদিন আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও কথাগুলি স্পষ্ট মনে আছে। বড় বয়সের অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুদিন আগেকার কথাও মনে নাই, শৈশবের ওই কথাগুলি কিন্তু মনে আছে।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়িতেছে। রাস-উপলক্ষে গ্রামে কোথায় যেন যাত্রা হইতেছিল, আমরা শিশুর দল সন্ধ্যা হইতেই আসরের সামনেই জাঁকাইয়া বসিয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য, কলরব করিতেছিলাম। যাত্রা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে একজন লোক আসিয়া বলিল, তোমরা বড্ড গোলমাল করছ, ওঠ এখান থেকে।"

আমি সকলের হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর আমরা গোলমাল করিব না।

"তবু উঠতে হবে। চৌধুরী বাড়ির ছেলে-মেয়রা বসবে এখানে।"

চৌধুরীরা গ্রামের জমিদার ছিল। যাত্রার আসরে তাহাদেরই স্থান যে সর্বাগ্রে এ জ্ঞান তখন ছিল না, তাই বলিলাম, "বা আমরা বিকেল থেকে জায়গা দখল করে বসে আছি—"

"ওঠ ওঠ, উঠে পড়, মেলা গোলমাল কোরো না। ওই পটল কর্তা আসছে—"

এ কথা শুনিবামাত্র আমার সঙ্গীরা একযোগে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিই কেবল বসিয়া রহিলাম, কারণ পটলকর্তা কে তাহা আমি জানিতাম না।

সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বসে রইলে কেন খোকা, উঠে পড় উঠে পড়—"

"আমি আগে থাকতে এসে বসেছি, আমি উঠব কেন?"

পর মুহূর্তেই পটলকর্তা আসিয়া পড়িলেন। আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া আমার কান দুইটি ধরিয়া আমাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন।

"দূর হয়ে যা, বাঁদর কোথাকার, সামনে এসে বসেছেন—"

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন আমাকে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলাম। এ অপমানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তাহার পরদিন সকালেই পটলকর্তা আমাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির, হাতে একটি সোলার তৈরি পাখি।

"ও বারাহী, তোর ছেলে কোথা, কাল আমি চিনতে পারিনি তাই কান মলে চড় মেরেছি ওকে। জরিমানা দিতে এসেছি আজ। ডাক তাকে—"

সোলার সুন্দর পাখিটি পাইয়া আমি সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলাম। মায়ের নির্দেশে তাঁহাকে প্রণামও করিলাম। পটলকর্তা সত্যই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি গ্রামে

থাকিতেন না, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আসিতেন। কলিকাতায় কোন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি ছিল তাঁহার।

পটলকর্তার শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব বেঁটে-খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। ঘাড় বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার ছিল না। মনে হইত বুকের উপরই মুখটি বসানো আছে, মাঝে কিছু নাই। খুব ধপধপে ফরসা রং ছিল। ডান পায়ে ছিল গোদ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা 'চায়না' কোট পরিতেন। চোখ দুইটি খুব ছোট ছোট ছিল। নাকটি খাঁদা, চিবুকের নীচে বেশ থল্‌থলে চর্বি। গোঁফ-দাড়ি ছিল না। বেঁটে মোটা চিনেম্যান গোছের চেহারা ছিল তাঁহার। অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন। রাগিয়া মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এমনি একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার নিজের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। গ্রামের কুম্ভকার পঞ্চানন গ্রামের সমস্ত প্রতিমা গড়িত, কিন্তু পটলকর্তা নিজের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাটি গড়াইতেন কৃষ্ণনগরের কারিগর আনাইয়া। একবার অসুস্থতার জন্য কৃষ্ণনগরের সেই কারিগরটি আসিতে পারিল না। অগত্যা পটলকর্তা পঞ্চাননকেই প্রতিমা গড়িবার ভার দিলেন। বলিলেন, "মজুরী তোমাকে বেশী দেব, প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। সোনার বেনেদের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়তে পারবে তো—"

পঞ্চানন বলিল, "পারব।"

"বেশ, তাহলে গড়। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন আমি কোলকাতা থেকে আসব। এসে যেন দেখতে পাই প্রতিমাটি তৈরি আছে, নিখুঁত প্রতিমা চাই।"

পটলকর্তা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় পটলকর্তা যখন স্টেশনে নামিলেন তখন প্রিয় বন্ধু ও পারিষদ ভোলানাথের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভোলানাথ তাঁহাকে লইবার জন্যই স্টেশনে আসিয়াছিলেন। পূজার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকিবে বলিয়া ভোলানাথকে তিনি স্টেশনে থাকিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

নামিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রতিমা কেমন হয়েছে?"

"নিজের চোখেই দেখো। আমি আর কি বলব—"

"তার মানে? ভালো হয়নি?"

"আমি কিছু বলব না ভাই। পঞ্চানন ভাববে আমি তার নামে লাগিয়েছি।"

"লাগাবার কি আছে এতে। কেমন গড়েছে বল না।"

"পঞ্চানন চিরকাল যেমন গড়ে তেমনি গড়েছে।"

ইহার বেশী আর কোনও কথা তিনি ভোলানাথের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু এ কথা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে প্রতিমা ভোলানাথের মনোমত হয় নাই। আর একবার প্রশ্ন করিলেন।

"প্রতিমা তোর পছন্দ হয়নি তাহলে?"

"পুজো করবে তুমি, আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তোমার দরকার কি?"

পটলকর্তার গৃহিণীও (সকলে তাঁহাকে পটল গিন্নি বলিয়া ডাকিত) ট্রেন হইতে নামিয়াছিলেন। তিনি মাথায় ঘোমটাটা একটু টানিয়া বলিলেন, "তখনই বলেছিলাম কেষ্টনগর

থেকেই কারিগর আনাও। একজনেরই না হয় অসুখ করেছে, আর কারিগর ছিল না সেখানে? তার ভাইও তো আসতে চেয়েছিল।"

পটলকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "পঞ্চা আমাকে বললে কেষ্টনগরের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়ে দেবে সে। সোনার-বেনেদের প্রতিমা ওই তো গড়ে ফি বছর।"

ভোলানাথ বলিলেন "এবার গড়েনি। সোনারবেনারা এবার কেষ্টনগর থেকে লোক আনিয়েছিল। চমৎকার প্রতিমা হয়েছে তাদের।"

"তাই না কি।"

পটলকর্তার গালে কে যেন একটা চড় কসাইয়া দিল। সোনারবেনেদের প্রতিমা চমৎকার হইয়াছে! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। গ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বংশপরম্পরাগত শত্রুতা। এই সুবর্ণবণিকরা মকদ্দমা করিয়া পটলকর্তার পিতামহকে ঋণের দায়ে নাকি সর্বস্বান্ত করিয়াছিল। পটলকর্তা বলেন—উহারা জাল হ্যাণ্ডনোট তৈয়ারী করিয়াছিল। সত্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু পটলকর্তার ধারণা সেই মকদ্দমার ফলেই তাঁহাকে আজ বিদেশে চাকুরি করিতে হইতেছে। পূর্ব-পুরুষদের বিষয় আশয় থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই গ্রামেই পায়ের উপর পা দিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। দৈন্য সত্ত্বেও পটলকর্তা পূর্বপুরুষদের জগদ্ধাত্রী পূজাটা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই পূজা উপলক্ষ করিয়া সোনারবেনেদের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করিতেন। ঠিক টেক্কা দিতে পারিতেন না, কারণ সোনারবেনেরা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন। বাজি পুড়াইয়া, লোক খাওয়াইয়া, যাত্রা থিয়েটার করিয়া তাঁহারা যে বিপুল উৎসব করিতেন তাহা করিবার সামর্থ্য পটলকর্তার ছিল না। তবু তিনি চেষ্টা করিতেন প্রতিমাটা অন্ততঃ যাহাতে সোনারবেনেদের প্রতিমার অপেক্ষা ভাল হয়; প্রতি বৎসর তাহা হইতও, অন্তত ভোলানাথ-প্রমুখ তাঁহার পারিষদেরা একথা তাঁহাকে বলিত এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মুখে একি কথা!

বাড়িতে ঢুকিয়াই তাঁহার দেখা হইয়া গেল হাবুর সহিত। হাবু পাড়ারই ছেলে এবং সম্পর্কে তাঁহার নাতি।

"হাবু, প্রতিমা কেমন হয়েছে রে—"

"সিংহ ভালো হয়নি দাদু। কান দুটো ইঁদুরের কানের মতো হয়েছে—"

পটলকর্তা ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে দালানের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়া গেলেন। চটিয়া গেলে পটলকর্তার গলা হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হইত, যাহা অবর্ণনীয়। দাঁতও কড়মড় করিত। দালানে পঞ্চানন বসিয়া তখনও প্রতিমার গায়ে রং দিতেছিল। পটলকর্তা দালানের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতিমাটি নিরীক্ষণ করিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল—"পঞ্চা! এ কি করেছিস? এই কি সিংহের কান?"

পঞ্চানন একলম্ফে পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পটলকর্তাকে সে চিনিত। ইহার পর পটলকর্তা যাহা করিলেন তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পঞ্চাননকে না পাইয়া সিংহেরই কানটা মলিয়া দিলেন। মাটির কান মট করিয়া ভাঙিয়া গেল।

"ও কি করলে, ও কি করলে; কাল যে পুজো—"

পটল-গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া মুক্তকচ্ছ কম্পিত-কলেবর পটলকর্তাকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

পুনরায় পঞ্চাননের কাছে গোপনে লোক পাঠানো হইল। সে লুকাইয়া আসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সিংহের কান জোড়া লাগাইল।

এ গল্পটি আমি সন্তোষের মায়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি খুব চমৎকার গল্প বলিতে পারিতেন। কতদিন আগে শোনা গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার জীবনে পটলকর্তার সহিত দেখা আরও দুই একবার ঘটিয়াছিল। তাহা যথাস্থানে বলিব। পটলকর্তার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার মামার দূরসম্পর্কের কাকা হইতেন। আমার মামা আত্মীয়বৎসল ছিলেন। অনেক গরীব আত্মীয়কে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পটলকর্তাকেও করিতেন। একথা তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম......."

এই পর্যন্ত পড়িয়া কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল একটি দোয়েল পাখি সামনের গাছের ডালে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে পুচ্ছটি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠ। অথচ এই দোয়েলই গ্রীষ্মকালে কি চমৎকার ডাকে! তাহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে শীতকালে দোয়েলরা ভালো ডাকিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যাহার গলায় অত সুর, শীতকালে সে বেসুরা। কুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাখিদের কি পক্ষাঘাত হয়? দোয়েলটা উড়িয়া গেল। কুমারও উঠিয়া পড়িল। খাতাটি বগলে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল।

পিছনের ঘরে বসিয়া কুমার আবার স্মৃতিকথায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

'আমার সেই সময়কার আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে সন্তোষের মাকে, আমার সইমাকে। আমার শৈশবজীবনের প্রধান একটা অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে আমরা গল্প শুনিতে যাইতাম। সাধারণত দিদিমারাই নাতিদের গল্প বলেন, আমার দিদিমা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। মা তাঁহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া দিতেন। তিনি বিছানায় বসিয়া আপন মনে নিজের সহিতই কথা কহিতেন। কি বলিতেন বুঝিতাম না, যাহাদের নাম করিতেন তাহাদেরও চিনিতাম না। অঘোর-ঠাকুরপো, মহেশমামা, মহেন্দ্রদাদা এমনি সব কত নাম। খেতুমামাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'সন্ধ্যের সময় খুড়ি অতীতে ফিরে যান।' হয়তো তাঁহার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িত। সেই সময় যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহারা বহুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় পাইয়া বসিত। তাহাদেরই সহিত তিনি গল্প করিতেন। আমরা কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন। তাই আমরা সন্ধ্যার সময় সইমার কাছে গিয়া আশ্রয় লইতাম। তিনি আমাকে, সন্তোষকে এবং পাড়ার আরও দুই চারিজন ছেলেমেয়েকে রোজ গল্প বলিতেন। গ্রীষ্মকালে আমাদের আড্ডা বসিত রান্নাঘরের ছোট দাওয়াটিতে, শীতকালে রান্নাঘর সংলগ্ন ভাঁড়ার ঘরে। সইমা রাঁধিতে রাঁধিতে আমাদের গল্প বলিতেন। সে কত রকমের গল্প। পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুখু-দুখুর গল্প। এসব ছাড়া গ্রামের অনেক পুরাতন সত্য গল্পও আমাদের বলিতেন তিনি। গল্প বলিবার চমৎকার একটি বিশেষত্ব ছিল তাহার। এমন ভাবে গল্প বলিতেন যেন সমস্ত ঘটনাটা আমাদের চোকের উপর ফুটিয়া উঠিত। সিনেমা দেখিয়া ছেলেমেয়েরা আজকাল যে আনন্দ পায় আমরা তাহার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইতাম, কারণ কল্পনার

সিনেমায় আমরা মনে মনে যে ছবি সৃষ্টি করিতাম বাস্তবের সিনেমায় তাহা সম্ভবে না। একই গল্পকে কেন্দ্র করিয়া আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছবি দেখিতাম। সইমার গল্পস্রোত কখনও মন্থর গতিতে চলিত, কখনও দ্রুতগতিতে। কখনও জোরে জোরে বলিতেন, কখনও চুপি চুপি। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের সহিত সইমা যেন একাত্ম হইয়া যাইতেন। রাক্ষসীর কথা যখন বলিতেন, তখন তিনিই যেন রাক্ষসী, পরীর কথা যখন বলিতেন তখন তিনই যেন পরী। আমরা রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া শুনিতাম। মাঝে মাঝে আমাদের গল্প-শোনায় বাধা পড়িত। সই-মা মাঝে মাঝে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন। সই-মার রান্নার খুব সুখ্যাতি ছিল। তাই আশেপাশের গ্রামে ভোজকাজের বাড়িতে সই-মার ডাক পড়িত।

গরুর গাড়ি, কখনও কখনও বা পাল্‌কি পাঠাইয়া তাঁহাকে তাহারা লইয়া যাইত। কয়েকটি বিশেষ রান্নায় সই-মার খুব নাম ছিল। লাউঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্‌তো, বড়ির ঝাল, বেগুনের টক প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজকাল উৎসবের বাড়িতে লোকে নামকরা গায়ক-গায়িকাকে যেমন সসম্মানে লইয়া যায়, সেকালে সই-মাকে ঠিক তেমনি সসম্মানে লোকে দুই একটা তরকারি রাঁধিবার জন্য লইয়া যাইত। গায়ক-গায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান শুনাইবার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার লোভেই অনেক সময় তাঁহারা আসেন, কিন্তু সই-মা যাইতেন স্নেহের আকর্ষণে, হয়তো প্রশংসার লোভ একটু থাকিত। আমি জানি পাঁচ ক্রোশ দূরের একটি গ্রামে একবার একজনের অসুখের পর অরুচি হইয়াছিল, কোন খাবারই তাহার মুখে রুচিত না। সইমার সহিত তাহাদের সামান্য একটু আত্মীয়তা ছিল। রোগীর মা স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'সন্তোষের মা, তুমি একবার চল। তোমার হাতের রান্না খেলে হয়তো অতুলের অরুচি ঘুচবে। কোবরেজ মশাই তরকারিতে মশলা দিতে বারণ করেছেন। তরকারিতে মশলা না দিয়ে তরকারির স্বাদ আমরা তো করতে পারি না। তুমি পার। বিনা মশলায় চমৎকার রাঁধ তুমি। তোমাকে যেতে হবে।' সইমা সত্যই তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং তাহাদের বাড়িতে দশ-পনর দিন থাকিয়া অতুলের অরুচি সারাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সন্তোষও তাহার মায়ের সহিত গিয়াছিল, আমারও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে যাইতে দেন নাই। সই-মার তখনকার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমনি রং। আমার মা শ্যামবর্ণা ছিলেন। কিন্তু সই-মা ছিলেন ধপধপে ফরসা। আগুনের তাত বা রোদের তাত লাগিলে মুখখানা সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন ছিল তাঁহার। কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল নীল রঙের ছোট্ট একটি উল্‌কি, মনে হইত টিপ পরিয়া আছেন। তখন সন্তোষ ছাড়া তাহার আর কোন সন্তান হয় নাই। আমরা শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহার উপর্যুপরি তিনটি কন্যা হয়—"

কুমারের এই অংশটুকু পড়িতে বড় ভাল লাগিতেছিল। দিদিমা যৌবনে যে এত রূপসী ছিলেন তাহা সে জানিত না। সে যখন দিদিমাকে দেখিয়াছিল তখন তিনি অতি-বৃদ্ধা, সোজা হইয়া হাঁটিতে পর্যন্ত পারিতেন না, কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল।.....চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কয়েকদিন পূর্বে যে মহিষটা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল সে না কি সমীপবর্তী বাহী নদীর জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কুমার উঠিয়া পড়িল এবং

নদীতীরে গিয়া দেখিল সত্যই তাই। এটি মহিষ নয়, মহিষী। কিছুদিন পূর্বে কুমার এটিকে কিনিয়াছিল। এখনও কিন্তু তেমন পোষ মানে নাই, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

কুমার নদীতীরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—'যমুনী, আয়, আয়, আঃ আঃ আঃ।' কুমার প্রত্যাশা করে নাই যে যমুনী আসিবে, কিন্তু আসিল। নদীতে তেমন জল ছিল না, বেশির ভাগই কাদা। সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া যমুনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। একটা চাকর দড়ি লইয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে বাঁধিবার জন্য গুড়ি মারিয়া আসিতেছিল। কুমার তাহাকে বারণ করিল।

"ওকে এখন বাঁধতে হবে না। এইখানেই চরুক—"

পাশের একটা জমিতে প্রচুর গম আর যব হইয়াছিল। কুমারেরই জমি। যমুনী সেই ক্ষেতে ঢুকিয়া মনের আনন্দে খাইতে আরম্ভ করিল। কুমার বাধা দিল না। মহিষটা এমনভাবে ফসল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া চাকরগুলার বুক করকর করিতেছিল, কিন্তু মালিক যখন কিছু বলিতেছে না, তখন তাহারাও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। কুমার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া খাতায় মন দিল। দেখিল বাবা দিদিমার কথা আর লেখেন নাই, অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন।

"....সেই সময়ের আর একটা লোকের কথা মনে পড়িতেছে, গোলক পণ্ডিতকে, যিনি আমার এবং সন্তোষের হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত কতদূর লেখাপড়া জানিতেন জানি না, কিন্তু তিনি যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকও খুব ভাল ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সাধারণত যেরূপ উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতেন (সাহেবগঞ্জের দীনু পণ্ডিত যেমন ছিলেন, পরে সাহেবগঞ্জে গিয়া এই লোকটির কবলে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল) গোলক পণ্ডিত মোটেই সে রকম ছিলেন না। পাঠশালা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তাহার ছিল না, ছাত্রসংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা নয়। সন্তোষ, জীবু এবং আমি এই তিনজন মাত্র তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তাঁহার ছিল ছোট একটি মুদির দোকান। চাল, ডাল, নুন, মশলা প্রভৃতি তাহাতে থাকিত। দোকানের সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দায় আমরা তিনজন বসিয়া তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতাম। শিক্ষাপদ্ধতিটা এই প্রকার ছিল। আমাদের প্রথমেই গিয়া গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর আমরা চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইতাম। তিনি সরস্বতীর সংস্কৃত স্তবটি এক এক লাইন করিয়া বলিয়া যাইতেন, আমাদের তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীর ধ্যান, প্রণামমন্ত্র, স্তোত্র সমস্তটা বলিবার পর পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বারান্দার উপর খড়ি দিয়া অ আ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগ বুলাইতাম। ক্রমশ অক্ষরগুলি স্থূলাকৃতি হইয়া উঠিত, আমাদের হাত মুখ জামা কাপড়ও খড়ির গুঁড়ায় শাদা হইয়া যাইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় হুকুম দিতেন—"এইবার ডাল দিয়ে সাজাও—"

"কি ডাল দিয়ে সাজাব পণ্ডিত মশায়?"

"মশুর ডাল দিয়ে সাজাও আজ।"

আমরা তখন মশুর ডাল অক্ষরগুলির উপর নিপুণভাবে সাজাইতাম। দেখিতে দেখিতে মশুর-ডালে-লেখা 'অ' 'আ' হইয়া যাইত। নিজেদের কৃতিত্বে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। বৈচিত্র্য করিবার জন্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাল ব্যবহার করা হইত। ডাল আমরা কিনিতাম পণ্ডিত মহাশয়ের দোকান হইতেই। পাঁচটি ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে পাঁচ রকম ডাল

থাকিত। ইহার জন্য আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে সবসুদ্ধ চার পয়সা দিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের আনন্দ ও বিস্ময় বৃদ্ধি করিতেন। ডালের বদলে কোনদিন বা তুলার বিচি আনিয়া দিতেন। এ সবের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হইত না। একবার কোথা হইতে তিনি কুঁচফল আনিয়া আমাদের বলিলেন, "আজ এইগুলো দিয়ে সাজাও দিকি—"। সেদিনকার উত্তেজনা আজও যেন অনুভব করিতেছি। কুঁচফলের অ-আ-গুলি আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। লেখা হইয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের ধারাপাত ঘোষাইতেন। শতকিয়া হইতে শুরু হইত। দোকানের কাজ করিতে করিতেই পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়াইতেন। খরিদ্দার আসিলেও আমাদের পড়া বন্ধ হইত না। পড়াইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কোন বেতন লইতেন না, আমাদের বাড়িতে তাঁহার খাইবার নিমন্ত্রণ হইত। খাওয়ার খুব যে একটা বিশেষ ঘটা বা আয়োজন হইত তাহা নয়, সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারিই হইত, বিশেষত্বের মধ্যে হইত কেবল পায়েস। আহারের শেষে খুব বড় একটি জামবাটি-পূর্ণ পায়েস পণ্ডিত মহাশয় পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিতেন। সেদিন তিনি পানও খাইতেন। অন্যদিন তাঁহাকে পান খাইতে দেখিতাম না। ঠানদির বাড়িতে আহারাদির পর তাঁহাকে হরিতকির টুকরা মুখে দিতে দেখিয়াছি। এই ঠান্‌দিও একটি চমৎকার চরিত্র। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ির কাছেই ঠান্‌দির বাড়ি ছিল, ঠান্‌দির বাড়িতে দুইবেলা তাঁহার আহারাদি সম্পন্ন হইত। ঠান্‌দির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানি না, সম্ভবত রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। শুনিয়াছি গ্রামের কাহারাও সহিত ঠান্‌দির রক্তের সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি গ্রামের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের একধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে একা তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সেই কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে যে জমিটুকু ছিল তাহা নিজের হাতেই তিনি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কত রকম তরিতরকারিই না হইত। কুমড়া ঝিঙা ধুঁধুল, বেগুন, নানারকম শাক, লঙ্কা, পুদিনা সব ছিল। তাঁহার বাড়ির উঠানের একধারে একটা পিয়ারা গাছ, আর একধারে একটা কুলগাছও ছিল। অজস্র ফলিত। কুলগাছে ঢিল মারিলে ঠান্‌দি চটিয়া যাইতেন, লাঠি হাতে বাহির হইয়া আসিতেন—"কে রে মুখপোড়া, গাছে ঢিল মারছিস কে। তোদেরই তো দেব, তোদের গর্ভেই তো সব যাবে, ঢিল মেরে এখন থেকে কাঁচা কুলগুলোকে নষ্ট করছিস কেন। ওই কোষো কুল খেলে কি বাঁচবি, কেসে কেসে মরবি যে"। ঢিল-নিক্ষেপকারীকে কোনদিন তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু গাছে ঢিল পড়িতেই লাঠিটি হাতে লইয়া তিনি বাহির হইতেন, উল্লিখিত উক্তিটি সক্রোধে উচ্চারণ করিতেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া মিনিট কয়েক দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহার পর মুচকি হাসিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। ওই মুচকি হাসিটি হইতে বোঝা যাইত যে তাঁহার রাগটা মেকি। দুষ্ট ছেলেরা যে তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার সাড়া পাইলেই যে ছুটিয়া পালায়, ইহাতেই তিনি খুশী। ইহা লইয়া তিনি গর্বও করিতেন। তাঁহার কাছে কেহ যদি বলিত অমুক ছেলেটা এই বদমায়েসি করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সগর্বে উত্তর দিতেন, 'কই, আমার সামনে করুক দিকি'। তাঁহার বদান্যতাও ছিল। নিজের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের খাওয়ার মতো তরি-তরকারি রাখিয়া বাকিটা তিনি সকলকে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার বাগানের তরি-তরকারি খায় নাই এমন লোক শঙ্করা গ্রামে খুব কমই ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত শঙ্করা গ্রামের লোকেরা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।

পণ্ডিত মহাশয় দুইবেলা তাঁহার বাড়িতে আহার করিতেন। তিনি রান্নাবান্না সব করিতেন

স্বহস্তে। ইহার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে নগদ টাকা-কড়ি কিছুই দিতে হইত না। তিনি তাঁহার দোকান হইতে চাল ডাল মশলা প্রভৃতি দিতেন, একটু বেশী বেশী করিয়া দিতেন যাহাতে ঠান্‌দিরও কুলাইয়া যায়। ঠানদির চেহারা অদ্ভুত ছিল। মাথার চুল বেটাছেলের মতো করিয়া ছাঁটা। কাঁচা-পাকা চুল। মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি। ঠানদি একটু স্থূলকায়া ছিলেন, হাঁটিবার সময় লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতেন। গায়ে কিন্তু শক্তি ছিল। বাগানের কাজকর্ম, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি নিজের হাতেই করিতেন তিনি। উঠানের একধারে ছোট একটি কূপ ছিল সেই কূপ হইতে নিজের হাতেই তিনি জলও তুলিতেন। কখনও কাহারও পুকুরে জল আনিতে যাইতেন না। মাঝে মাঝে তাহার কূপটি ঝালাইবার জন্য গ্রামান্তর হইতে লোক আসিত। পণ্ডিত মহাশয় মজুরি স্বরূপ তাহাদের চার আনা পয়সা দিতেন, আর ঠানদি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। এই লোকগুলি আমারে নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাহারা কুয়ার ভিতর দড়ি, ঝুড়ি বালতি প্রভৃতি নামাইয়া দিত, তাহার পর একজন নামিয়া যাইত, আর একজন উপর হইতে বালতি করিয়া জলকাদা প্রভৃতি তুলিতে থাকিত। একবার মনে আছে প্রকাণ্ড একটা ব্যাংও উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সেই লোকগুলি থাকিত আমরা পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতাম। যে কুয়ার ভিতর জুজুবুড়ি আছে, কুয়ার পাড়ে ঝুঁকিয়া কুক্ করিয়া শব্দ করিলে যে জুজুবুড়ি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, সেই জুজুবুড়িকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকগুলা কুয়ার ভিতর নামিতেছে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। সত্যই আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি ঠানদির সহিত গ্রামের কাহারও রক্তের সম্পর্ক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিতও না। সন্তোষের মা বলিতেন গ্রামে মধু চাটুজ্যে বলিয়া কে একজন ছিলেন তিনিই ঠানদিকে বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবন হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঠানদি নাকি তাঁহার ধর্মভগ্নী ছিলেন। বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবাচার্যের নিকট তাঁহারা উভয়েই দীক্ষা লন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যে মৃত্যুকালে তাঁহার কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং গ্রামের প্রান্তে ওই জায়গাটুকু ঠানদিকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চাটুজ্যেপাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও দেন নাই। সেই জমির উপরেই পরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপিত হয়। মধু চাটুজ্যের তিনকুলে কেহ ছিল না, এটকুও তিনি ঠানদিকে দিয়া যাইতে পারিতেন। দিয়া যান নাই তাহার কারণ তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ঠানদি শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। পাড়ার লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে সুচক্ষে দেখিবে না। বাহিরের একটি স্ত্রীলোক মধু চাটুজ্যের সমস্ত বিষয়টা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ইহা সহ্য করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইবে। আর একটা কথাও তাঁহার বোধ হয় মনে হইয়াছিল। ঠানদি যদি বাস করিতে না পারিয়া ভিটাটুকু অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দেন এবং সে লোকটিও যদি পাড়ার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেটাও ঠিক হইবে না। সম্ভবত এই সব ভাবিয়া পাড়ার পাঁচজনের বিচারবুদ্ধির উপরই তিনি ভিটাটুকুর ভার দিয়া গিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঠানদির ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল এক অদ্ভুত ঘটনার ফলে। গোলক পণ্ডিতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গ্রামে। শিবরাম গাঙ্গুলীর রাধাশ্যাম বিগ্রহের পূজারী হইয়া তিনি প্রথমে শঙ্করা গ্রামে আসেন। শিবরাম

গাঙ্গুলীর বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্বশুরের অর্থে এবং আগ্রহেই তিনি রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই গোলক পণ্ডিতকে পূজারী নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শিবরাম এবং তৎপত্নী বিন্ধ্যাবাসিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোলক পণ্ডিতের পূজারীপদ অটল ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকমলের সহিত গোলক পণ্ডিতের খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে জাতিভেদ, অস্পৃশতা এবং পঞ্জিকা মানিয়া চলিতেন। গ্রামের দলাদলি এবং ঘোঁটেরও প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তিনি। তিনি যখন মালিক হইলেন তখনই ঠানদি মধু চাটুজ্যের বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া শঙ্করা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। শুরু করিবামাত্র অনেকেরই বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তিনি, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণকমলের অভিসন্ধি ছিল যে নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যের বিষয়টি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই ক্রমশ হস্তগত করিয়া ফেলিবেন। অসম্ভবও হইত না, কারণ ঠিক তাঁহার জমির পাশেই মধু চাটুজ্যের জমি, আল ক্রমশ সরাইয়া লইলে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু মধু চাটুজ্যের উইল বাহির হইতেই সব গোলমাল হইয়া গেল। ঠানদির উপর তিনি জাত-ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে ধমক দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া ঠানদিকে গ্রাম ছাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন ঠানদি অত সহজে হঠিবার পাত্রী নন, বেশ প্রতাপশালিনী। আইনও তাঁহার স্বপক্ষে ছিল। তিনি একেবারে সোজা চলিয়া গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেটটি ছিলেন একটি সদ্য-পাস-করা ছোকরা সাহেব। অবলাদের প্রতি সাহেবদের সৌজন্য সুবিদিত। তিনি নিজে আসিয়া সব অনুসন্ধান করিলেন এবং ঠানদিকে অভয় দিয়া গেলেন। কৃষ্ণকমলকে অনুভব করিতে হইল আইনের দিক দিয়া সুবিধা হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সহেবের কোপদৃষ্টিতে পড়া সমীচীনও নয়। তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। গ্রামের দলাদলির দলপতি ছিলেন তিনি। তাঁহার প্ররোচনায় গ্রামের লোকেরা ঠানদিকে একঘরে করিল। সিদ্ধান্তটা গোপনই ছিল, ঠানদি প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে অবশ্য বেশী বিলম্ব হইল না। কিছুদিন পরেই যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের জন্মদিনে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া গ্রামের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন এক গোলক পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ খাইতে আসিল না, তখন ঠানদি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কৃষ্ণকমল গোলক পণ্ডিতকেও যাইতে বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু গোলক পণ্ডিত তাঁহার বারণ শোনেন নাই। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন তিনি। এইজন্য তাঁহার চাকুরিটি গেল। কৃষ্ণকমল তাঁহাকে পূজারীপদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্য লোক বাহাল করিলেন। গোলক পণ্ডিত দেশেই ফিরিয়া যাইতেন কিন্তু ঠানদি তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমি আমার বাড়ির পাশে তোমাকে একটুকরো জমি দিচ্ছি, তুমি তার উপর একটা দোকান কর, মাথা গোঁজবার জায়গাও কর একটা। মুখপোড়াদের হুমকিতে পালিয়ে যাবে কেন পুরুষ মানুষ হয়ে। এটা কি মগের মুলক না কি। তুমি বিয়ে থা করনি, সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই, তোমার একটা পেট চলে যাবেই। এইখানেই থাক।" গোলক পণ্ডিত থাকিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা ঠানদির পুকুরও বন্ধ করিয়াছিল। ঠানদি তাহাতেও দমেন নাই। তাঁহার কিছু গহনা ছিল, সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তিনি নিজের উঠানে পাকা ইঁদারা করাইয়া লইলেন। যতদিন সে ইঁদারা না হইল ততদিন তিনি তিন-ক্রোশ-দূরবর্তী একটি নদী হইতে জল আনাইতেন, এজন্য তিনি একজন বাঁকী (যাহারা বাঁকে করিয়া জল বহন করে) মাহিনা দিয়া বাহাল

করিয়াছিলেন। আমার জন্মের বহুপূর্বে এইসব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অনেক বড় হইয়া আমি এসব কাহিনী শুনিয়াছি। আমার শৈশবে যখন আমি ঠানদি এবং গোলক পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহাদের সহিত গ্রামের লোকের যে এত বিরোধিতা আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিরোধিতার পরিবর্তে হৃদ্যতাই বরং লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্বেই কৃষ্ণকমল মারা গিয়াছিলেন। এখন আমার মনে হয় তাঁহার বাগানের তরিতরকারির জোরেই ঠানদি সকলের সঙ্গে পুনরায় ভাব জমাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের তরি-তরকারি যে সকলেই সানন্দে লইত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাঁচিয়া থাকিলে এটা সম্ভব হইত কি না জানি না। কিন্তু তিনি ঠানদির সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করিয়াছিলেন তাহার ফল বীভৎসভাবে ফলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর। আমি শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর ঠানদি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। গোলক পণ্ডিতও। আমি যখন ঠানদিব মৃত্যুসংবাদ পাই, তখন আমি কলিকাতায় পড়িতেছি। ভয়াবহ সে সংবাদ। গ্রামের একটি লোকও না কি ঠানদিব মড়া তুলিতে আসে নাই। মড়া তিন দিন পড়িয়া ছিল। গোলক পণ্ডিত অনেকের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়া অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ঠানদির ঘরের চালে শকুনি বসিয়াছে। গোলক পণ্ডিত তখন অগত্যা যাহা করিলেন তাহা খুবই দৃষ্টিকটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি ঠানদিনর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া একাই তাহাকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঠানদির জমির এক ভাগীদার চাষী ছিল, বৃদ্ধ নিযামত আলি। সেই কেবল লাঠি উচাইয়া শকুনি এবং কুকুর তাড়াইতে তাড়াইতে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়াছিল। নিয়ামত আলির সহায়তায় গোলক পণ্ডিত ঠানদিকে দাহ করেন। ঠানদি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোলক পণ্ডিতকেই দিয়া গিযাছিলেন। কিন্তু ঠানদির মৃত্যুর পর গোলক পণ্ডিত আর শঙ্করা গ্রামে থাকেন নাই। তিনি ঠানদির সমস্ত সম্পত্তি নিয়ামত আলিকে দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নিয়ামত আলির সন্তান-সন্ততিরা কিছুদিন আসিয়া ঠানদির ভিটাতে বাসও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই, ঠানদির প্রেতাত্মার ভয়ে শেষে তাহারা পলাইয়া গেল। রাত্রে তো বটেই, দিনে দুপুরেও তাহারা নাকি ঠানদিকে দেখিতে পাইত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই কুল-গাছটার আশে-পাশে।"

কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। বাড়ির দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সমস্তটা তাহাদের। জমিতে অনেক ফসল ফলিয়াছে, চারিদিকে সবুজে সবুজ। যমুনী মনের আনন্দে একটা ক্ষেতের যব গম নিঃশেষ করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার নাক হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া শব্দও বাহির হইতেছে, কিন্তু কুমারের এসব দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইতেছিল সত্যই কি ভূত আছে? মা কি কোথাও বাঁচিয়া আছেন? মুক্তি মোক্ষ এসব কি ধরনের অবস্থা। আমাদের কথা মায়ের কি আর একটুও মনে নাই? বাবার কথাও না? এ চিন্তা কিন্তু কুমারের মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। রাধানাথ গোপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ঘর থেকে মণ দুই চিঁড়ে আনতে বলে দিয়েছিলাম। সেটা এসে পৌঁছেচে। কোথাও রাখিয়ে দাও। কত লোক আসবে তো, 'রেডিমেড' খাবার কিছু থাকা ভাল। রামধনিয়ার গোলাতে ভাল গুড় আছে, আনিয়ে রেখে দাও কিছু—"

দুইটি বস্তা মাথায় করিয়া দুইজন মজুরনী আসিয়া পড়িল। একজন কুমারকে দেখিয়া মৃদু

হাসিল। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহ উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুদিন পূর্বে তাহার স্বামী এখানে কাজ করিত। সে-ও জমিতে জন খাটিতে আসিত। তখন কুমার ছয় সাত বছরের শিশু, এখন কত বড়টি হইয়াছে। চলিত হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল। এ বাড়ির সব তাহার চেনা। দ্বিতীয় মজুরনীটি অনুসরণ করিল তাহার।

"ওগুলো রাখিয়ে দাও, তাহলে। আমি চললুম। দেখো যেন ড্যাম্প না লাগে।"

রাধানাথ গোপ আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন।

কুমার ইতস্তত করিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল অবশেষে।

"ওর দামটা কি এখনিই দিয়ে দেব?"

"ওর দাম অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছি। তোমার বাবা দিয়েছেন। এইখানে জমা আছে"—বলিয়া তিনি বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ধমকের সুরে বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাব তুমি করতে যেও না। সে অঙ্ক তুমি কষতে পারবে না, যদিও তোমার ম্যাথামেটিক্‌সে অনার্স ছিল—"

খানিকক্ষণ কুমারের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারও ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটা চাকরকে ডাকিয়া চিঁড়ার বস্তা দুইটি ভাঁড়ার ঘরে মাচার উপর রাখিয়া দিতে বলিল।

......মজুরনীটি খিড়কির পাশে কুমারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কুমার কাছে আসিতেই তাহার মুখে মাথায় চিবুকে হাত বুলাইয়া আদর করিল। তাহার পর ডাক্তারবাবুর অসুখের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভাই বোনদের খবর দেওয়া হইয়াছে কিনা, কবে তাহারা আসিবে, সমস্ত জানিয়া লইল সে। তাহার পর ম্লান হাসিয়া বলিল, "তোদের দেখেই আমার আনন্দ। আমি নিজে তো হতভাগী, স্বামী নেই, একমাত্র ছেলে কয়লা সবে জোয়ান হয়ে উঠেছিল, গতবার কলেরায় সে-ও গেল। রাধাবাবুর কাছে কিছু ধার আছে, খেটে খেটে সেইটেই উশুল করছিল এখন—"

কুমার উর্মিলাকে ডাকিয়া বলিল—"এদের কিছু খেতে দাও।"

"আচ্ছা—"

মজুরনী দুইজন বারান্দায় উঠিয়া দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিতে লাগিল। কয়লার মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কুমার আবার গিয়া ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়াছিল। ডায়েরিখানা আবার পড়িতে শুরু করিয়াছিল সে।

".....আজ শেষ বয়সে শঙ্করা-গ্রামে-অতিবাহিত আমার সেই শৈশব জীবনের কথা স্মরণ করিতে গিয়া আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে, সেটি গ্রামের পূজা পার্বণের কথা, সেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা। বৈশাখের নববর্ষ হইতে শুরু করিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, গন্ধেশ্বরী পূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, জামাই ষষ্ঠী, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথ, নীলষষ্ঠী, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, চড়ক প্রভৃতি বড় বড় উৎসব তো ছিলই তা ছাড়া সীতানবমী, লুণ্ঠনষষ্ঠী, উমা চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, দুর্গাষ্টমী, তালনবমী, সত্যনারায়ণ পূজা, ললিতা সপ্তমী, পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ছোট

ছোট উৎসবেও আমাদের বাল্যজীবন হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, মুসলমানদের উৎসবও, বিশেষ করিয়া মহরম। মহরমের সেই রঙিন পতাকার সারি, রঙিন কাগজ আর রাংতার তৈরি মন্দিরের মতো প্রকাণ্ড 'তাজিয়া', মনুষ্যবেশী ঘোড়ারা, তাহাদের লাঠি-খেলা, তরোয়াল-খেলা, তাহাদের হাসেন-হোসেন চীৎকারে আমাদের মনে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। মহরমের মেলার ভীড়ে আমি তো একবার হারাইয়াই গিয়াছিলাম। ফরিদ নামে আমাদের এক প্রজা আমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরাইয়া আনে। মনে পড়িতেছে সে সমস্তক্ষণ আমাকে কাঁধে লইয়া লাঠি-খেলা প্রভৃতি দেখাইয়াছিল। রাত্রে সে যখন আমাকে লইয়া ফিরিল তখন বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে।

''সমস্ত উৎসবের সেরা উৎসব ছিল অবশ্য দুর্গোৎসব। সমস্ত গ্রাম যেন মাতিয়া উঠিত। আমার মামার বাড়িতেই দুর্গোৎসব হইত। সে কি সমারোহ। পঞ্চানন যেদিন হইতে প্রতিমা গড়িতে শুরু করিত সেইদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। আমরা, পাড়ার ছেলেরা, সর্বক্ষণ তাহার নিকটই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তাহার ফরমাস খাটিতাম। বাহিরের প্রতিমা পঞ্চানন গড়িত, মনের প্রতিমা আমরা গড়িতাম। সে যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত। ষষ্ঠীর দিন হইতে শুরু করিয়া বিজয়া দশমী পর্যন্ত কাহারও বাড়িতে রান্না হইত না। বাড়ির মেয়েরা পূজার আয়োজন করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ ভোগ রাঁধিতেন, কেহ পূজার জোগাড় দিতেন, কেহ বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের একধারে বসাইয়া তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনের দিকে গোটা দুই ঘর ছিল, তাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকিত, যাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া পূজার উৎসবে যোগ দিতে পারে। উৎসবের বিবিধ আয়োজন করিতেন কর্মকর্তারা। যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, কথকতা, কবির লড়াই সেই সময়েই দেখিয়াছি, আজকাল আর ওসবের তত রেওয়াজ নাই। খাদ্যদ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না। মায়ের ভোগ দিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ি হইতে এত ফল ও মিষ্টান্ন আসিত যে বিতরণ করিয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে পংক্তিভোজনে বসিয়াও আমরা ভূরি-ভোজন করিতাম। খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় চপ কাটলেট পুডিং জাতীয় আধুনিক খাদ্য থাকিত না, থাকিত ভালো সুগন্ধ আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, পাঁচ ছয় রকম নিরামিষ তরকারি, একটা ভালো চাটনি, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, দই এবং পয়েস। মায়ের সম্মুখে একটি ছাগ-শিশুকে বলিদান দেওয়া হইত, তাহা রান্নাও হইত, সকলকে তাহা দেওয়াও হইত কিন্তু তাহার আমিষত্বের প্রমাণ বড় একটা পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারি টুকরা আলু, দুই চারিটা ছোলার দানা এবং একটু ঝোলই অধিকাংশের ভাগ্যে জুটিত। একবার বোধহয় একটুকরা মেটে পাইয়াছিলাম। নিরামিষ রান্নাগুলি কিন্তু অপর্যাপ্ত এবং অপূর্ব হইত। ওরূপ সুমিষ্ট নিরামিষ রান্না আজকাল বড় একটা হয় না। সন্তোষের মা নিজের হাতেই দুই তিনটা তরকারি রাঁধিতেন, রন্ধন-গৃহের প্রধান পরিচালিকাও তিনি ছিলেন। রন্ধন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠিলে কর্তাব্যক্তিরা বলিতেন—আমরা কিছু জানি না, সোনোর মায়ের কাছে যাও। সোনো মানে সন্তোষ। ছেলেবেলায় পূজার সময় চার পাঁচদিন যেরূপ দীয়তাং ভুজ্যতাং দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি আজও মনে অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার জন্য খুব যে বেশী একটা খরচ হইত তাহাও নয়। চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচ শরিক ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পূজা করিতেন। প্রত্যেক শরিকের উপর এক একদিনের পূজার ভার থাকিত।

তার খুব গুরুভার ছিল না। পূর্বপুরুষেরা এজন্য প্রচুর জমি দিয়া গিয়াছিলেন। নগদ পয়সা খুব বেশী খরচ হইত না। ভোগের চাল ডাল তরি-তরকারি জমি হইতে আসিত, গোয়ালাদের নামে জমি দেওয়া ছিল তাহারা বিনামূল্য পূজার সময় যত দুধ দই লাগিত তাহা সরবরাহ করিত। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িত, বাজনাদার বাজনা বাজাইত বিনামূল্যে তাহাদেরও জমি দেওয়া ছিল, পুরোহিতেরও জমি ছিল। দুলেরা বিনামূল্যে পূজার বলির জন্য ছাগ-শিশু সরবরাহ করিত, পূজার কয়দিন ফাইফরমাস খাটিত, শম্ভু ময়রা ভিয়ান বসাইয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। সকলকেই জমি দেওয়া ছিল, কেহই পারিশ্রমিক চাহিত না, চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চার-পাঁচদিন বা বড় জোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমের জন্য কেহ দুই বিঘা, কেহ পাঁচ বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত। প্রতি শরিক পূজাবাবদ দশ-পনর টাকা খরচ করিতে পারিলেই মহাসমারোহে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইয়া যাইত। যে সব শরিকের অবস্থা ভালো তাঁহারা বাহির হইতে যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি আনাইতেন। চাটুজ্যেদের প্রকাণ্ড অতিথিশালা ছিল, যাত্রার দল বা কীর্তনীয়ারা সেখানেই থাকিত। মনে আছে কলিকাতা হইতে একবার একজন যাদুকর আসিয়াছিলেন, খুব একটা মজা হইয়াছিল সেবার। তিনি কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। নিষ্ঠাবান পুরোহিত মহাশয়ের চাদরের ভিতর হইতে মুরগীর ডিম বাহির করিয়া তিনি তুমুল হাসির তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। পুরোহিত রাধু ভট্টচাজ কিন্তু ব্যাপারটাকে নিছক প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, চটিয়া গেলেন। এত চটিয়া গেলেন যে মুক্তকচ্ছ হইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। যাদুকর অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করেন!

আমার মনে এই ধরনের বহু স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। সব স্পষ্টভাবে মনে নাই, যতটুকু আছে তাহারও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করি একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তবে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

প্রথম ঘটনাটি খেতু-মামাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। খেতু-মামা আমার মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। মামার জমি পুকুর বাগান মামা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খেতু-মামা পরের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে বড় ভালবাসিতেন। পরের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি সব মানুষেরই অল্প-বিস্তর থাকে, পরের বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগে খেতু-মামা এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিতেন, খুব আন্তরিকতার সহিত হাঁক-ডাক করিয়াই করিতেন। শুধু মামার নয়, বিদেশবাসী আরও অনেকের বিষয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বঙ্কু মামা, মামার আর এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা কলিকাতায় ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন। তাঁহার বিষয়-আশয়েরও ভার ছিল খেতু-মামার উপর। গ্রামের আরও অনেকের বিষয়ের দেখা-শোনাও করিতেন তিনি। তাঁহার নিজের জমিজমা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরের বিষয়ের খবরদারি করিতেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার প্রতাপ খুব ছিল। তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলিতেন যেন তিনিই গ্রামের রক্ষক। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত— "এই খেতু চাটুজ্যে আছে বলেই পুকুরে মাছ, গাছে ফলপাকড়, জমিতে ধান দেখতে পাচ্ছ। বাবুরা তো যে যার বউ নিয়ে শহরে গিয়ে মজা ওড়াচ্ছেন, আমি না থাকলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খেত সব। ঘরের চালে খড় পর্যন্ত থাকত না। ওই যে বিনোদ চৌধুরী, নামেই গ্রামের জমিদার তিনি, কোলকাতা, মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, কাশী, কাশ্মীর করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর জমিদারি চালাচ্ছে কে—এই খেতু চাটুজ্যে। ওই বৈকুণ্ঠ নামেই ম্যানেজার, কিন্তু আসলে আস্ত একটি জরদ্গব, ওর উপর নির্ভর করলে কি বিনোদ চৌধুরীর

জমিদারি থাকত? থাকত না। জমিদারি আছে তার কারণ হালটি ধরে বসে আছে এই খেতু চাটুজ্যে।" খেতু-মামাকে প্রায়ই সদরে যাইতে হইত মকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য। নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। একদিন কিন্তু একটা চাঞ্চল্যজনক ঘটনা ঘটিল। গ্রামের জমিদার বিনোদ চৌধুরীর সহিত খেতু-মামার আন্তরিক সম্পর্ক কতটা ছিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু আইনত কোন সম্পর্ক যে ছিল না তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই। ঘোষাল পাড়ার বখাটে ছেলে বিশ্বেশ্বর খেতু-মামার-দৃষ্টি এড়াইয়া সকলের বাগান হইতে ফল এবং সকলের পুকুর হইতে মাছ নিয়মিত ভাবে চুরি করিত। এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিল সে। একদিন কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল, খেতু-মামা তাহাকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরে সে বিনোদ চৌধুরীদের বাগানে ঢুকিয়া ডাব পাড়িতেছিল। খেতু-মামা বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন—বাজার করিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল নারিকেল গাছে কেহ চড়িয়াছে। মাথার পাগড়ি এবং গায়ের ফতুয়া দেখিয়া মনে হয় কমল পাশি। সেই সাধারণত সকলের ডাব পাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে তো তাঁহার নিকট অনুমতি লয় নাই। বিনা অনুমতিতে সে ডাব পাড়ে কেন।

খেতুমামা হাঁক দিলেন—"ডাব পাড়ে কে—"

"আমি কমল।"

"কার হুকুমে ডাব পাড়ছ।"

"ম্যানেজারবাবুর হুকুমে।"

খেতুমামা একথা শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু হটিবার পাত্র নন তিনি। বাগানে ঢুকিয়া নারিকেল গাছের নীচে উর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর ঘোষাল বিপদে পড়িল। সে কমল পাশির পাগড়ি এবং ফতুয়া পরিয়াই ডাব চুরি করিতে আসিয়াছিল, এই কৌশলে সে ইতিপূর্বে বহুবার ডাব পাড়িয়াছে, কমল পাশির সহিত তাহার ষড় ছিল। খেতু-মামা যে এমনভাবে নারিকেল গাছর নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবেন তাহা সে কল্পনা করে নাই। গাছের উপর সে যতটা পারিল দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু খেতু-মামা অনড়। অবশেষে নামিতে হইল তাহাকে। খেতু-মামা দুর্মুখ ছিলেন। বিশুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শালা, তুই। কমল পাশি সেজে এসেছিস। তোর বাপও পাশি না কি।"

বিশুর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, সে কিন্তু কিছু বলিল না।

খেতু-মামা মুখ ভ্যাংচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "নারকোল গাছে উঠেছিলি কেন—অ্যাঁ—"

"আমার খুশী।"

"তোমার খুশী!"

খেতু-মামা তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিলেন।

এইবার বিশুর মুখ ছুটিল।

"আপনি মারবার কে। আপনার বাপের গাছ?"

এইবার খেতু-মামার অদৃশ্য পুচ্ছটিতে পা পড়িল। তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে একটি বেঁটে লাঠি সর্বদা থাকিত, সেইটি তিনি সজোরে বিশুর মাথায় বসাইয়া দিলেন। মাথা ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেল।......

খানিকক্ষণ পরে ফুল-মামী (খেতু-মামার স্ত্রী) কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, খেতু-মামাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

"উনুন ধরিয়ে বসে আছি, বাজার করে আনবে তবে রান্না করব, একি কাণ্ড মা—"

খেতু-মামা জামিনে খালাস পাইলেন না। মকদ্দমা হইল। আদালতে চৌধুরীদের ম্যানেজার বৈকুণ্ঠ তরফদার হলফ করিয়া বলিয়া আসিলেন যে তিনি বিশু ঘোষালকে ডাব পাড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বিনোদ চৌধুরী স্বয়ং সাক্ষী দিয়া বলিয়া গেলেন যে তিনি খেতু মামাকে তাঁহার বাগানের বা বিষয়ের রক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। খেতু-মামার দুইমাস জেল হইয়া গেল। বিনোদ চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। পারিষদ মহলে নাকি বলিয়াছিলেন—সম্ভব হইলে তিনি খেতু-মামার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহা সম্ভব ছিল না। ঘোষাল পরিবারের বিশু ছেলেটা বখাটে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশুর দাদা একজন রায় বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আজ না হয় খুলনায় আছে কাল যদি এখানে আসে? কুম্ভীরের সহিত ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা যায় না। এই কারণে অতবড় একজন গর্ভনমেন্ট অফিসারের কোপদৃষ্টিতে পড়িতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

খেতু-মামার জেল হওয়াতে শুধু ফুল-মামী নয়, আমরাও অসহায় হইয়া পড়িলাম। খেতু-মামা সত্যই গ্রামের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে গ্রামে চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। দিদিমা ফুল-মাসিকে আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় দিলেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা লইয়া আমাদের বাড়িতেই আহার এবং শয়ন করিতে লাগিলেন। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে ডাকাইয়া অনুরোধ করিলেন—"খেতুর জেল হওয়াতে আমরা সবাই সশঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তুমি বাবা রাত্তিরে এখানে এসে শুয়ো। যদি অসুবিধে না হয় এখানেই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়াও কোরো—"

গোলক পণ্ডিত যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "শোব, নিশ্চয়ই শোব। খাওয়ার হাঙ্গামা আর করবেন না। আমি খেয়ে-দেয়েই আসব, নিশ্চয়ই আসব।"

দিদিমা বললেন, "খাওয়ার আর হাঙ্গামা কি। আমাদের এত লোকের রান্না তো হবেই—"

গোলক পণ্ডিত কুণ্ঠিত মুখে বলিলেন, "না না, সে থাক। ঠানদি আবার কি মনে করবেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে শোব এসে এখানে।"

গোলক পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

ফুল-মামী দিদিমার পাশে এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। পণ্ডিতমশায় চলিয়া যাইবার পর অসংকোচে মন্তব্য করিলেন, "মাগী পণ্ডিতকে গুণ করেছে। হরিদাস বলছিল মাগী সন্ধ্যের পর যখন রান্নাবান্না করে তখন পণ্ডিত না কি রান্নাঘরের বারান্দায় বসে ভাগবত শোনায় ওকে। না রে হরিদাস?

হরিদাস খেতু-মামার বড় ছেলে। বয়স বারো তেরো। সে উঠানে বসিয়া ধনুক করিবার জন্য বাঁখারি চাঁছিতেছিল। সে আরও নূতন খবর দিল। বলিল, "পণ্ডিত মশায় ঠানদির উনুন ধরিয়ে দেয়, কুয়া থেকে জল তুলে দেয়। একদিন দেখলাম মশলাও বাটছে।"

ফুল-মামী নাক কুঁচকাইয়া বলিলেন, "মরণ আর কি। কালে কালে কতই যে দেখব।"

ফুল-মামীর রাগের কারণ ছিল। গোলক পণ্ডিত হরিদাসকে নিজের পাঠশালায় পড়াইতে

রাজি হন নাই। তিনি তিন চারটি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং সেগুলিকে নিজে নির্বাচন করিয়া লইতেন। হরিদাসকে তিনি নির্বাচন করেন নাই।

দিদিমা ফুল-মামীর সহিত একমত হইলেন না।

বলিলেন, "গোলক যা-ই করুক, লোকটি অতি সজ্জন। তা না হলে ওকে রাত্রে এখানে শুতে ডাকতাম না"

ফুল-মামী ইহার উত্তরে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিলেন।

গোলক পণ্ডিতের শুইতে আসিবার দৃশ্যটা আমার একনও মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া বহুবার গলা-খাঁকারি দিতেন। রাস্তার মোড় হইতেই তাঁহার গলা-খাঁকারি শোনা যাইত। শুধু গলা-খাঁকারি নয়, মাঝে মাঝে—"এই—এইও" বলিয়া হুঙ্কারও ছাড়িতেন। সম্ভবত তাঁহার মনে হইত কাছে-পিঠে চোর বা ডাকাত নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে, তাঁহার সাড়া পাইলেই তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে। সুতরাং সাড়া দিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না। আর একটা কাজও তিনি সঙ্গে-সঙ্গে করিতেন। তাঁহার লিক্‌লিকে সরু একটি বেত ছিল। পাঠশালা করিবার সময় প্রয়োজনীয় আসবাব হিসাবে সম্ভবত তিনি সেটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠশালার কোনও ছাত্রের অঙ্গে তাহা তিনি ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সেই বেতটিকে এই ব্যাপারে তিনি কাজে লাগাইয়াছিলেন। পথ চলিতে চলিতে বেতটিকে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে উঁচাইয়া ধরিয়া "এই—এই" করিতে করিতে তিনি বেতটিকে ঘন-ঘন নাড়িতে নাড়িতেই পথ চলিতেন। মনে হইত তিনি যেন সেটি কোন অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখে আস্ফালন করিতেছেন। তাঁহার বাম হস্তে থাকিত ছোট একটি লণ্ঠন। আমাদের বাড়িতে ভাণ্ডার ঘরের সংলগ্ন ছোট যে কুঠুরিটি ছিল তাহাতেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি গলা-খাঁকার দিয়া বেত্র আস্ফালন করিতে করিতেই আমাদের উঠানে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার জন্য বারান্দায় এক ঘটি জল আগে হইতেই রাখা থাকিত। তিনি লণ্ঠনটি বারান্দায় রাখিয়া কোটের পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একজোড়া খড়ম বাহির করিতেন। মায়ের আদেশে আমি তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দিতাম। পা দুইটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তিনি খড়ম পরিতেন। তাহার পর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মী, এবার তোমরা শুয়ে পড় সব। আমি রইলাম কোন ভয় নেই।" তাহার পর কোটটি খুলিয়া আলনায় রাখিতেন এবং বিছানায় বসিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন। জানি না। তাঁহার এই প্রণত অবস্থার ছবিটিই আমার মনে আঁকা আছে। তাঁহাকে শায়িত অবস্থায় কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি যখন প্রণাম করিতেন, মা তখনই আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন, তাই তাঁহার শোয়াটা দেখিতে পাইতাম না। খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি নিজের দোকানে চলিয়া যাইতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতাম—দেখিতাম তিনি স্নান করিয়াছেন, দোকানে ধুপধুনা জ্বলিতেছে, দুই চারিটি খরিদ্দার আসিয়াছে। আমাদের কার্যক্রমও শুরু হইয়া যাইত :

.....খেতু-মামার জেল হওয়াতে দিদিমা পুত্রের নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছিরুকে প্রায়ই বলিতেন—দেখ তো, কেনারাম বাড়িতে এসেছে কিনা, থাকলে ডেকে আনিস। কেনারাম সরকার ছিলেন দিদিমার বাপের বাড়ির লোক, তাঁহার সহিত হয়তো আত্মীয়তাও ছিল, ঠিক জানি না। কেনারামের বোনের শ্বশুরবাড়ি শঙ্করায়। কেনারাম ভগ্নীপতির কাছেই থাকিতেন, চাকুরি করিতেন পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়। দিদিমার চিঠি লিখাইবার

দরকার হইলে কেনারামের ডাক পড়িত। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে দিদিমা নিজে চিঠি লিখিতে পারিতেন না। আমার মা-ও নিরক্ষরা ছিলেন না। কিন্তু মাকে দিয়া দিদিমা চিঠি লেখানো পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, ও বড্ড তড়বড় করে লেখে। চিঠি একটু গুছিয়ে লিখতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, কেনারাম বেশ গুছাইয়া বাগাইয়া চিঠি লিখিতে পারে। তাহার হাতের লেখাটিও ভালো। কেনারামকে কিন্তু প্রায়ই বাড়িতে পাওয়া যাইত না। কারণ তাহাকে প্রায়ই তাহার ভগ্নীপতির ফরমাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাদের চাষী ছিরুর অন্তত তাহাই ধারণা ছিল। যাই হোক ছিরু একদিন কেনারামকে ধরিয়া আনিল, দিদিমা তাহাকে দিয়া মামাকে চিঠিও লিখাইলেন। চিঠির মর্ম, ক্ষেত্রনাথের জেল হওয়াতে তাঁহারা বড়ই বিচলিত এবং ভীত হইয়াছেন, গ্রামে দুষ্টলোকের উপদ্রবও বাড়িয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এখন সাহেবগঞ্জেই যাইতে চান। ধানের বিলি-ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এখন এখানে থাকিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। দুই সপ্তাহ পরে মামার উত্তর আসিল। তিনি মাতৃভক্ত লোক ছিলেন, উত্তরে জানাইলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিন সকলকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পত্র পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন; কিন্তু হাতে দুই তিনটি শক্ত রোগী থাকায় আসিতে পারিলেন না। আরও মাসখানেক কাটিল, কিন্তু মামা আসিলেন না। তখন দিদিমা স্থির করিলেন গ্রামের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই সাহেবগঞ্জে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাও খুব সহজসাধ্য হইল না। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—ট্রেনে বেশীক্ষণ থাকিলে তাঁহার মাথা ঘোরে, 'বমনেচ্ছাও' হয়। এই কথাটিই তিনি বলিয়াছিলেন আমার বেশ মনে আছে। বলিলেন এই কারণেই তিনি নিজের দেশেও যাইতে পারেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় দেশে যাইবার তাঁহার প্রয়োজনও হয় না। একথা শুনিবার পর দিদিমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি তখন পটলকর্তাকে একটি পত্র লিখাইলেন যে তিনি যখন ছুটির সময় বাড়ি আসিবেন তখন ফিরিবার পথে তাঁহাদের যেন সাহেবগঞ্জে রাখিয়া যান। পটলকর্তা সম্মতি জানাইয়া উত্তরও দিলেন, কিন্তু লিখিলেন যে দুই মাসের পূর্বে তাঁহার ছুটি পাইবার সম্ভবনা নাই। ততদিন যদি দিদিমারা শঙ্করায় থাকেন ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে পৌঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। একদিন অভাবিবত উপায়ে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল একটি।

.....একদিন সকালে দুইটি কালো বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ আমাদের বাড়ির উঠানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, আরক্তিম আয়ত নয়ন, তৈলহীন অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম, গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে রক্তচন্দনের তিলক, প্রশান্ত ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডল, ধুলিধুসরিত নগ্নপদ, একহাতে প্রকাণ্ড একটি সেতার, অন্য হাতে একটি পুঁটুলি। আমি নেবুতলার আড়াল হইতে নির্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। বাবাকে সেই আমি প্রথম দেখিলাম। দিদিমা বারান্দায় বসিয়া ছিলেন, বাবা তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। দিদিমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনিও বাবাকে চিনিতে পারেন নাই।

"কে বাবা তুমি?"

"আমি কেদার।"

"কেদার। এ সময়ে কোথা থেকে এলে বাবা?"

"আমি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে মৃণালপুর গ্রামে একটা গানের আসরে এসেছিলাম।

সেখান থেকেই এখানে এলাম। আপনাদের বাড়িটা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনারা যে এখানে আছেন, তা জানতাম না।"

"বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। আমাদের যে কিভাবে দিন কাটছে!"

দিদিমার গলা কাঁপিয়া গেল, তিনি চোখে আঁচল দিলেন।

বাবার সঙ্গে যে লোক দুইটি আসিয়াছিল বাবা তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "এইবাব তোমরা যেতে পার। আমি ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এই নাও—"

বাবা মেরজাইয়ের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাদের দিতে গেলেন। তাহারা কিন্তু কিছুতেই টাকা লইতে চাহিল না। উভয়েই হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছ থেকে একটি কানা-কড়ি আমরা নিতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমাদের পুলিসে দিয়ে দিন—"। বাবাও দেখিলাম না-ছোড়, তাহাদের কিছু দিবেনই। অনেক বলা-কহার পর তাহারা অবশেষে একটি করিয়া টাকা লইয়া বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দিদিমা চোখে কম দেখিতেন বলিয়াই বোধহয় কানে বেশী শুনিতেন। উঠানের একপ্রান্তে লোক দুইটির সহিত বাবার যে বাদানুবাদ চলিতেছিল তাহা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

"কার সঙ্গে কথা কইছিলে, পুলিসের কথা বলছিল কেন, কে ওরা?"

বাবা সংক্ষেপে বলিলেন, "ডাকাত—"

"ডাকাত! বল কি!"

বাবা যাহা বলিলেন তাহা রোমাঞ্চকর।

"কাল বিকেলের দিকে মৃণালপুর থেকে বেরিয়েছিলাম। মঙ্গল গাঁয়ে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্ষিধে পেয়েছিল, একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে তাকে জিগ্যেস করলাম—শঙ্করা যেতে হলে কোন রাস্তা সোজা হবে। সে বললে—মানুষ-লোটন মাঠটা পার হয়ে দবিরগঞ্জ, সেখান থেকে আশনা, আশনা থেকে শঙ্করা দুক্রোশের মধ্যেই। কিন্তু মানুষ-লোটন মাঠে ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে, রাত্রে ও-মাঠ পেরুনো ঠিক হবে না ঠাকুর। তার চেয়ে রাত্রে এইখানেই শুয়ে থাকুন, ভোর-বেলা বেরিয়ে যাবেন। আমি দেখলাম রাত্রের মধ্যেই যদি আশনা পৌঁছে যেতে পারি তাহলে সকালে এখান পৌঁছে যাব। আরও ভাবলাম, সন্ধ্যাবেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামে হাঁটতেও পারব। মায়ের নাম করে বেরিয়েই পড়লাম। বিপদটি কিন্তু ঘটল। মানুষ-লোটন মাঠের মাঝামাঝি যখন এসেছি গুটি চারেক কালো কালো মূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। একজন বললে—এই চল্ আমাদের সঙ্গে। জিগ্যেস করলাম কে তোমরা? বললে, আমরা মায়ের অনুচর, বলির পশু সন্ধান করতে বেরিয়েছি, তোকেই বলি দেব, চল্। বললাম, তোমাদের মা কোথায় আছেন। দূরে খানিকটা অন্ধকার জমাট হয়ে ছিল সেই দিকে দেখিয়ে বললে—ওই গাছতলায়। বুঝলাম, আপত্তি করলে এইখানেই মেরে ফেলবে। গেলাম তাদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। গোটা দুই লণ্ঠনও রয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকটি লোকের দুষমনের মতো চেহারা, গাঁট্টা গোঁট্টা, কালো মুশ্‌কো, মাথায় বাবরি চুল, প্রত্যেকের হাতে বেঁটে মোটা লাঠি একটি করে। আর গাছের ডালে সত্যিই দেখি মা কালীর পট টাঙানো রয়েছে একটি। পটটি ঘিরে জবাফুলের মালা দুলছে। আমি বুঝলাম আজ আর নিস্তার নেই—"

দিদিমা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলেন।

"তারপর—?"

"মৃত্যুর জন্যেই তৈরি হলাম। তাদের বললাম, আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল, মরবার আগে প্রাণভরে মায়ের নাম গান করতে দাও আমাকে। আমি ছেলেবেলা থেকে মায়ের নামই গান করেছি, শেষ সময়েও তাই করতে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধটি তোমরা রাখবে। একথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করে পরামর্শ করলে খানিকক্ষণ। তার পর বললে—বেশ, আমাদের আপত্তি নেই। হোক মায়ের নাম একখানা। আমি ঠিক কালীর পটটির নীচে গিয়ে বসলাম। তারপর সেতারটি বেঁধে ধরলাম একখানা শ্যামাসঙ্গীত দরবারি কানাড়ায়। ডাকাতের দল চুপচাপ বসে শুনতে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু আর এক কাণ্ড হল। প্রকাণ্ড গাছ, অনেক পাখি ছিল তাতে। তারাও সব একযোগে সঙ্গত করতে লাগল। আমার সঙ্গে। সেই অন্ধকার মহাশূন্য সুরে সুরে ভরে উঠল যেন হঠাৎ। অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল একটা। কিছুক্ষণ পরে আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম, তারপর ঠিক যে কি ঘটেছিল তা আমি জানি না, আমার গান যখন শেষ হল তখন চোখ খুলে দেখি সেই পঞ্চাশ জন ডাকাত হাত জোড় করে আমার সামনে বসে আছে। আর মা কালীর পটে যে জবাফুলের মালাটা ছিল সেটা আমার গলায় রয়েছে। আমি যখন তন্ময় হয়ে গান গাইছিলাম তখন মালাটি আপনি নাকি ওপর থেকে আমার গলায় এসে পড়েছে। কখন পড়েছে, কি করে পড়েছে তা আমি বুঝতে পারিনি। ডাকাতদের বললাম, আমার গান শেষ হয়েছে, মায়ের কাছে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছি, এবার তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারা বলতে লাগল, আপনাকে আমরা চিনতে পারিনি ঠাকুর, আমাদের মাপ করুন। আমরা ভক্ত নই, আমরা ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে। পেটের দায়ে এই মহাপাপ করি। কিন্তু আসল ভক্তকে আমরা চিনতে পারি। আপনার গায়ে আমরা হাত দিতে পারব না। স্বয়ং মা যখন আপনাকে অভয় দিয়ে আপনার গলায় মালা পড়িয়ে দিয়েছেন, তখন আমরা কি আর কিছু করতে পারি? আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। কারণ কিছুদূর গিয়ে আমাদের আর একটা ঘাঁটি আছে, তারা হয়তো আপনাকে আটকাতে পারে। ওরাই আমাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে গেল—। সবই মায়ের ইচ্ছে—"

বাবা উঠানে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন। যাহা বলিতেছিলেন তাহা এতই চমকপ্রদ যে তাঁহাকে দিদিমা বসিতে পর্যন্ত বলেন নাই। এইবার তাঁহার হুঁশ হইল।

মা কালীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন "—সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া, তিনিই রক্ষে করেছেন। তুমি বাবা উঠে এস, এখানে বস। হাত পা মুখ ধোও। ও বারাহী, কোথা গেলি তুই, কেদার এসেছে, জল নিয়ে আয়, পা ধুইয়ে দে, পেন্নাম কর—"

আমি লেবু গাছের আড়াল হইতেই সব শুনিতেছিলাম ও দেখিতেছিলাম। মাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তিনি রান্নাঘর হইতে একগলা ঘোমটা টানিয়া বাহির হইলেন। মাকে এত বড় ঘোমটা দিতে আগে কখনও দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। যদিও একটু অবান্তর হইবে তবু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। মা খুব ভালো অভিনয় করিতে পারিতেন। একবার লুকাইয়া মায়ের অভিনয় আমি দেখিয়াছিলাম। দুপুরবেলা সইমার বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের আড্ডা জমিত। একদিন সন্তোষ ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি আমাকে বলিল,

মায়েরা থিয়েটার করছে, দেখবি তো আয়। গিয়া দেখিলাম সইমার শুইবার ঘরে খিল-লাগানো। কিন্তু কপাটে ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, মা চমৎকার একখানি শাড়ি পরিয়া মায়ের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া পদ্যে কি বলিতেছেন। সইমার বলা শেষ হইলে মা শাড়ির আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সইমার মুখের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর তিনিও কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। উত্তেজিত হইয়া আমি মা-কে ডাকিতে যাইতেছিলাম কিন্তু সন্তোষ আমাকে মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল এবং চোখের ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেলাম। সন্তোষ বলিল, তোর মা সীতা সেজেছে, আমার মা সরমা। কাউকে বলিস না যেন। জানাজানি হয়ে গেলে মা ভয়ানক রাগ কববে। মায়ের একগলা ঘোমটা দেখিয়া সেদিনকার কথা মনে পড়িল। মনে হইল মা সেদিন যেমন সীতা সাজিয়াছিলেন আজ বোধহয় তেমনি কনে বউ সাজিয়াছেন। বাবা বারান্দায় তাঁহার ধুলিধূসরিত পা দুইটি ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন। মা প্রথমে গিয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর ঘটি ঘটি জল ঢলিয়া তাঁহার পা দুইটি ধুইযা দিলেন, তাহার পর একটি টুকটুকে লাল গামছা দিয়া পা দুইটি মুছাইয়া দিলেন। বাবা নির্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কোন মহারাজা তাঁহরা প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম এই আগন্তুক কে! তখনও তাঁহাকে আমি বাবা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। চেনা সম্ভব ছিল না। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, এত দিন পরে ফিরিলেন।

দিদিমার তখন আমার কথা মনে পড়িল।

বলিলেন, "সূয্যি গেল কোথা। ডাক তাকে। বাবাকে পেন্নাম করুক এসে।"

মায়ের পা-ধোয়ানো শেষ হইয়াছিল, তিনি নীরবে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। সেই সময় ছিরু কি একটা কাজে বাড়ির ভিতর আসিল। দিদিমা তাহাকেই বলিলেন, "ছিরু দেখ তো সূয্যি কোথা গেল। ডেকে নিয়ে আয় তাকে। তার বাবা এসেছে।"

"ও, এই আমাদের জামাইবাবু না কি?"

ছিরু বাবাকে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল, "সূয্যি ওই যে নেবুতলার পিছন থেকে উঁকি মারছে। এদিকে আয়—"

আমার কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। আমি একছুটে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

"দেখছ, ছেলের কাণ্ড!"

ছিরু আমার পিছু পিছু আসিয়া আমাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিল। বাবাকে আমি সেই প্রথম প্রণাম করিলাম। বাবা কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার মাথার উপর খানিকক্ষণ হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর মেরজাইয়ের ভিতর হইতে একটি থলি বাহির করিয়া দিদিমার হাতে দিলেন। নীরবেই দিলেন। কোনও কথা বলিলেন না। শুনিয়াছি তাহাতে না কি একশত টাকা ছিল। মায়ের জন্য তিনি একখানি লালপাড় শাড়ি, দিদিমার জন্য একটি ছিটের দোলাইও আনিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়িটা সহসা যেন ভরিয়া উঠিল।

বাড়ির বাহিরের দিকে একটা বৈঠকখানা ছিল। বাবা সেইখানেই আস্তানা গাড়িলেন। ছিরু চৌকির উপর শতরঞ্জি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। আমি বাবার পুঁটুলি বহন করিয়া লইয়া গেলাম।

বাবা পুঁটুলি খুলিয়া নিজের কাপড় গামছা বাহির করিলেন এবং বাকি কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিলেন। আমি কাছেই ঘুর ঘুর করিতেছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করিতেছিলেন না। ইহাতে মনে মনে আমার অভিমান হইতেছিল, কিন্তু ইহাও বুঝিতেছিলাম যে যদিও বাবা কোন কথা বলিতেছেন না—কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ আলাপ চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাবা বলিলেন, "কোথায় চান করিস তোরা?"

"আমাদের পুকুরে। বাড়ির পিছনেই—"

"আমি এবার চান করব। তেল নিয়ে আয়।"

ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে সরিষার তৈল লইয়া আসিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিলেন। কানের গর্তে দিলেন, নস্যের মতো নাকেও খানিকটা টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে জল মুছিয়া তিনি দুই চোখেও এক ফোঁটা করিয়া তৈল দিলেন। প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে এমন করিয়া তেল মাখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময়ই লক্ষ্য করিয়াছিলাম বাবার গায়ের রং কত ফরসা, বুকের মাঝখানটায় কে যেন সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! বাবাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া গেলাম এবং তিনি যতক্ষণ স্নান করিলেন ততক্ষণ তাঁহার কাপড়টি লইয়া পাড়ে বসিয়া রহিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন, স্নান করিতে করিতে নানারকম স্তোত্র-আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য প্রণাম করিলেন। এ সবের পরও স্নানান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন তিনি। তাহার পর আহারান্তে ঘুমাইলেন খানিকক্ষণ। বাবার সেদিনকার কার্যকলাপ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুমাইয়া উঠিয়া তিনি দিদিমাকে যাহা বলিলেন তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

বলিলেন, "আগামী অমাবস্যায় আমি কালীপূজা করব। গ্রামে কি কেউ প্রতিমা গড়ে দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, আমাদের পঞ্চানন আছে, তাকে খবর দিলেই আসবে। অমাবস্যা কবে?"

"এখনও দিন দশেক দেরি আছে।"

"তার মধ্যে প্রতিমা হয়ে যাবে। সূয্যি, যা পঞ্চাননকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সোৎসাহে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। পঞ্চানন বাড়িতেই ছিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, সে প্রতিমা গড়ার ভার লইল। সেই পঞ্চানন, যে পটলকর্তার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। সই-মা আসিয়া সেদিন মায়ের চুল বাঁধিতে বসিলেন এবং মায়ের আপত্তি-সত্ত্বেও তাঁহার খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা জড়াইয়া দিলেন। দুই ভ্রূর মাঝখানে পরাইয়া দিলেন ছোট্ট একটি কাঁচপোকার টিপ। মায়ের কোনও আপত্তি তিনি শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার জেদে মাকে একখানি খড়কেডুরে শাড়িও পরিতে হইল। নিজহস্তে মায়ের পা ঝামা দিয়া ঘসিয়া তিনি আলতা পরাইয়া দিলেন। মায়ের মধ্যে যে এত রূপ লুকানো ছিল তাহা জানিতাম না, তাহাকে এরকম সাজসজ্জা করিতেও ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। মা অধিকাংশ দিনই চুল বাঁধিতেন না, একটা আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন। দিনরাত সংসারের নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন.....বাসন মাজিতেন, ঘুঁটে দিতেন, ঘর নিকাইতেন, এমনকি দুধ পর্যন্ত দুহিতেন—তাই

তাঁহার হাত বা পায়ের যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে তাহা কখনও নজরে পড়িত না। সেদিন সহসা যেন আবিষ্কার করিলাম মা আমার কত সুন্দর। সই-মা সন্ধ্যার সময় আসিয়া পালঙ্কের উপর ফরসা চাদর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানাও করিয়া দিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, "তুই আজ আমার কাছে গিয়ে শুবি সন্তোষের সঙ্গে। ভাল গল্প বলব আজ।" আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সই-মার কাছে সন্ধ্যার পর গিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু রাত্রে শুইয়াছি আসিয়া মায়ের কাছে। সেদিন তাই প্রস্তাবটা একটু নূতন ধরনের ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়ের কাছে কে শোবে তাহলে।" সই-মা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর বাবা এসেছেন যে। তিনি এখানে শোবেন। এই ছোট খাটে তিনজনের কুলোয় কখনও। আমাদের খাটটা খুব বড় তো, তুই আমি সন্তোষ তিনজনে বেশ কুলিয়ে যাবে।"

বাবার কিন্তু বৈঠকখানা হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সন্ধ্যার পর সেতার লইয়া বসিলেন এবং একের পর এক রাগ-রাগিণী আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সময় যে কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছিল জানি না, রাত যে কত হইয়াছে সে খেয়ালও ছিল না, ঘুমও পাইতেছিল না, তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিলাম। বোধহয় বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। সহসা সই-মার কণ্ঠস্বরে যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সই-মা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখ মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে।

"ওগো, ওস্তাদ সাহেব, রান্না-বান্না যে সব হয়ে গেছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে, হুকুম করেন তো খাওয়ার ব্যবস্থা করি। খেয়ে দেয়ে আর এক পালা গাইতে হবে তো।"

বাবা সেতারটি নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "আমি পালাবার পালাটাই শিখেছি কেবল, অন্য পালা জানি না।"

সই-মা কথায় হটিবার পাত্রী নন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "শিখতে দোষ কি। সব শিখিয়ে দেব। এখন অনুমতি দিন, ভাত বাড়ব?"

"বাড়ুন।"

পালা-ঘটিত কথা-বার্তা তখন বুঝি নাই, কথাটা কিন্তু মনে আছে।

আহারাদির ব্যবস্থা সইমা-ই করিয়াছিলেন। পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরানো হইয়াছিল। সেই মাছের ভাজা, ঝোল, অম্বল সই-মা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে বাবা রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সইমাও বাবার খাওয়ার বহর দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এতদিনে একটা জামাইয়ের মতো জামাই এসেছে পাড়ায়, রান্না করা সার্থক হল।"

আহারাদির পর বাবা দিদিমার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। আমি সই-মার বাড়িতে চলিয়া গেলাম। সই-মা গল্প শুরু করিলেন। সেইদিনই প্রথম নলদময়ন্তীর গল্প শুনিলাম। মানুষের নাম যে নল হইতে পারে ইহা শুনিয়া বড় মজা লাগিয়াছিল। দময়ন্তী নামটাও কম অদ্ভুত লাগে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা প্রকাণ্ড রাজহংস আসিয়া আমাকে বলিতেছে, 'তোমাদের বাইরের ঘরে নল এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন'। ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। পাশে দেখিলাম সন্তোষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সই-মা নাই। আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর ঘর

হইতে বাহির হইয়া গেলাম। উঠানে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র নারিকেল গাছটার মাথার উপর জ্বলিতেছে। অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দিক নিস্তব্ধ, খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর সদর দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলাম। স্বপ্ন সত্য হইবে এ বিশ্বাস অবশ্য ছিল না, কিন্তু মনে হইতেছিল যে কিছু একটা নিশ্চয় দেখিতে পাইব। বাহিরের বৈঠকখানার ঘরটা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আমগাছের তলা দিয়া, ধানের মরাই এবং খড়ের গাদার পাশ দিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরজা খোলা। সই-মার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়ি খুব বেশী দূর নয়, তবু খানিকটা যাইতে হয়। অন্য সময় হয়তো অত রাত্রে ওইটুকু পথও একা যাইতে পারিতাম না, কিন্তু সেদিন সোজা চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার দরজা খোলা। লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দেওয়ালে একটি ছোট কালীর পট ঠেসানো রহিয়াছে, বাবা সেই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে একটি বোতল রহিয়াছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা যে সেদিন কি করিতেছিলেন তাহা বুঝিবার মতো বয়স আমার নয়, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকে এসব কাজ করে না। আমি প্রস্তরমূর্তিবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার এ নৈশ অভিযানের কথা কেহ জানে না, কাহাকেও বলি নাই। বৈঠকখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সই-মার বাড়িতে গেলাম না, নিজের বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সই-মা আর মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। মনে হইল মা যেন কাঁদিতেছেন, আর সই-মা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। আমি উঠানের একধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আমি নিজেই সোজা তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলাম।

সই-মা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলের কাণ্ড দেখ। উঠে এলি কেন রে—"

"ঘুম ভেঙে গেল।"

"খিদে পায়নি তো, সন্ধ্যেবেলা খেলি না তো ভাল করে। পায়েস খাবি একটু?"

"না।"

"তাহলে শুবি চল।"

সই-মার সহিত আবার চলিয়া গেলাম। মা একা নতমুখে বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। মায়ের এই ছবিটি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে, বরাবর থাকিবে। শয়ন ঘরের দ্বার খোলা, প্রদীপের মৃদু আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো-আঁধারিতে মা নতমুখে বসিয়া আছেন। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরনে খড়কে-ডুরে শাড়ি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, বাবা আসেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে আর এক দেবতার পূজায় তন্ময় হইয়া আছেন। ইহার করুণ গম্ভীর মাধুর্য তখন ভালো করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম মা দুঃখ পাইয়াছেন। দুঃখটা কেন এবং কিসের তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়টা সেদিন বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল। সই-মার সহিত যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলাম, "বাবা এখনও শুতে আসেনি কেন সই-মা?"

"পুজো করছেন।"

"এত রাত্রে কিসের পুজো?"

"কালীপুজো।"

উঠান পার হইয়া শুনিতে পাইলাম বাবা গান ধরিয়াছেন, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা—"। সই-মা আর আমি জামতলার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবা কিন্তু দুই এক কলি গাহিয়াই থামিয়া গেলেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পব বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা দুইজন জামতলার অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবাব আসব বেশ জমকাইয়া উঠিল।

গ্রামে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বাবার খবর পাইয়া তাঁহারা আসিলেন। খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা, এস্রাজ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র আসিয়া জুটিল। কণ্ঠ-সঙ্গীতে আমাদের পাড়া প্লাবিত হইতে লাগিল। স্নানাহারের সময় ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেরা বৈঠকখানার উঠানে ও বারান্দায় ভীড় করিতে লাগিলাম। অন্য পাড়ার ছেলে-মেয়োরাও দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। দুই চারিদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, তথাকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণীরাও ক্রমশ আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইতে লাগিলেন। বাবার আগমনে গ্রামান্তরেও বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্গীতশাস্ত্রে বাবার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহার গাহিবার বাজাইবার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া কত লোক যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু আমার বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া গেল, মস্তক আকাশ স্পর্শ করিল। মায়ের মুখেও দেখিলাম হাসি ফুটিয়াছে, দিদিমার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে। সই-মা বাবাকে খাওয়াইবার জন্য নিত্যনূতন রান্নার উপকরণ সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন। অন্যান্য বাড়ির রন্ধন-পারদর্শিনীরাও এ বিষয়ে সচেতন হইলেন। অনেক বাড়ি হইতে তরকারি মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। বাবার আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। পঞ্চাননও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্দিষ্ট দিবসে চমৎকার একটি কালী প্রতিমা আনিয়া হাজির করিল। বাবা নিজ ব্যয়ে উঠানে একটি ছোট আটচালা প্রস্তুত করাইলেন, তাহার মধ্যে একটি মাটির বেদী নির্মিত হইল, সেই বেদীর উপর প্রতিমাটি রাখা হইল। গ্রামে বাবার বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছিল, তাহারাই স্বেচ্ছায় সোৎসাহে পূজার সর্ববিধ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। এমন কি, লক্ষণ-যুক্ত কালো পাঁঠা এবং হাড়কাঠও সংগৃহীত হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, তিনি নিজেই পূজা করিবেন। সন্ধ্যা হইতে কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসিয়া বাবা একের এক এক শ্যামা সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুদিত চক্ষু ছাপাইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। আনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে বাবা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ রাঁধিলেন। জীবনে সেই বোধহয় প্রথম আমি ভাল কবিয়া মাংস আহার করিলাম। বাবা চমৎকার মাংস রাঁধিতেন, পরে অনেকবারই তাঁহার হাতের রান্না খাইয়াছি কিন্তু সেদিনকার সেই মহাপ্রাসাদের স্বাদ আমার মুখে এখনও যেন লাগিয়া আছে।

কালীপূজার দিন দুই পরে বাবা দিদিমাকে বলিলেন,

"এখানে অনেকদিন কেটে গেল, এবার যদি অনুমতি দেন যাই।"

"কোথা যাবে, দেশে?"

"না। নলহাটিতে যেতে হবে একবার। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে যাব।"

"তাহলে তুমি এক কাজ কর না বাবা। সাহেবগঞ্জে শক্তির কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে যাও। সেখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারছি না—"

বাবা সম্মত হইলেন। একটা শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার বাল্যজীবনের আর একটা অধ্যায় শুরু হইল।

"একবার শোন—"

কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল উর্মিলা তাহাকে ডাকিতেছেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

"কি—"

"পেচ্ছাপ করে বাবা বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছেন। তুমি কোমরটা তুলে ধর, আমি চাদরটা বদলে দি।"

চাদর বদলাইয়া কুমার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল বাবা আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। তাহার মনে হইল নিজের অসহায় অবস্থায় বাবা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। যিনি প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেন, যাঁহার ভয়ে প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারগণও প্রজাদের অযথা অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, তিনি আজ নিতান্তই অসহায়। কোমর হইতে কাপড় সরিয়া গেলে সেটা ঠিক করিয়া লইতে পারেন না।

"কুমারবাবু আছেন?"

বাহিরের দরজায় ডাক শুনিয়া কুমার বাহির হইয়া গেল। দেখিল নবাগত পোস্টমাস্টার বাবুটি দাঁড়াইয়া আছেন।

"নমস্কার। আসুন, কি খবর?"

"ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এখন।"

"একটু ভাল বলেই বোধ হচ্ছে।"

ইহার পরই পোস্টমাস্টারবাবু যাহা বলিলেন তাহাতে কুমার বুঝিল বাবার খবর লইবার জন্য তিনি আসেন নাই।

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি কুমারবাবু। গঙ্গার বাড়ি থেকে আমার ছোট ছেলের জন্য দুধ নিতাম রোজ। গঙ্গা খবর পাঠিয়েছে যে সে আর দুধ দিতে পারবে না। কারু গোয়ালা কর্পূরা গোয়ালা কেউ দিতে পারল না। অথচ দুধ না পেলে আমার ছোট ছেলেটা—"

"কতটা দুধ চাই আপনার?"

"আধসেরটাক হলেই হয়ে যাবে।"

"বেশ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল কুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "পোস্টমাস্টারবাবুর জন্যে এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দে।"

চাকরটা ভিতরে চলিয়া গেল।

"আমি একটা পাত্র নিয়ে আসব কি?"

"আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি দেখবেন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি যায়।"

"সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।"

পোস্টমাস্টারবাবু মিথ্যাভাষণ করিলেন। তখনও যে টেলিগ্রামটি পোস্টাফিসে পড়িয়াছিল এ খবর গঙ্গা একটু পরেই লইয়া আসিল।

গঙ্গা আসিতেই কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পোস্টমাস্টারবাবুর দুধ পাঠাসনি কেন আজ?"

গঙ্গা একটু ঝাঁঝের সহিত উত্তব দিল, "ওকে আমি আর দুধ দেব না। গোযালাটোলাব কোন গোয়ালাও দেবে না, আমি মানা করে এসেছি সকলকে। একের নম্বর পাজি লোকটা। প্রায় দু' ঘণ্টা আগে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছি, এখনও পাঠায়নি।"

"জানিস না, বাজে কথা বলিস কেন। পোস্টমাস্টারবাবু এখনি এসেছিলেন, বললেন টেলিগ্রাম চলে গেছে।"

"মিথ্যুক লোকটা। ঝক্সু বললে টেলিগ্রাম যায়নি।"

ঝক্সু পোস্টাফিসের পিওন। সকাল হইতেই পোস্টাফিসে থাকে, কারণ পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়ির কাজও তাহাকে কবিতে হয়। সুতরাং সে যখন খবরটা দিয়াছে তখন তাহা বাজে খবর নয়। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল। সংবাদটা শুনিয়া তাহাব আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এরকম করিবার মানে কি? কিন্তু সহসা আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিল সে।

বলিল, "ও ছোটলোক বলে কি আমাদেরও ছোটলোক হতে হবে?"

গঙ্গা কোনও উত্তর না দিয়া গজগজ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফিরিয়া এক তাড়া নোট কুমারের হাতে দিয়া বলিল, "আড়াই শ টাকা লাদুরামের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। টাকাটা ভাল করে রেখে দাও। একটু পরেই সে মাল নিতে আসবে। চাকরগুলো কোথা—"

"মাঠে গেছে। আসবে এখুনি।"

"টাকাগুলো টেবিলের উপর রাখছ কেন। দাও, আমাকে দাও বউমাকে দিয়ে আসি।"

নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।

কুমারও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিল কিন্তু ঘাড় ফিরাইতেই চোখে পড়িয়া গেল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার রামচরিত্র তেওয়ারি মহাশয় আসিতেছেন। চোখোচোখি হইতেই নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন এবং কাছে আসিয়া বলিলেন, "পিতাজি আজ কৈসে হ্যঁয়?"

"পহলে সে কুছ আচ্ছা।"

"খুশী কি বাত হ্যয়।"

মাস্টার মহাশয় বারান্দার চৌকিটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন যে স্কুলের 'বালকসমিতি'কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুইজন করিয়া এখানে আসিয়া 'ডিউটি' দিবে। সমিতির যে বাইসাইকেলটি আছে সেটিও এখানে সর্বদা

থাকিবে, কারণ 'বখত্পর' কখন যে কি দরকার হয় বলা তো যায় না, সর্বদা প্রস্তুত থাকাই ভাল। কুমার তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি বলিলেন, ধন্যবাদ তিনি লইবেন না। কর্তব্য করার জন্য আবার ধন্যবাদ কেন? কুমার বলিতে পারিত যে 'বালকসমিতি'-র সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই, বাড়িতে লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা বলিল না। বলিলে তেওয়ারিজি অসন্তুষ্ট হইবেন, মনে করিবেন কুমারবাবু তাঁহাকে পর মনে করিতেছেন। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারিজি বেশীক্ষণ বসিলেন না, একটু পরেই তাঁহার স্কুল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেই তিনি আবার আসিবেন। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ল্যাংল্যাং ও ছুঁচ্কি ঘাড় কামড়া-কামড়ি করিতে করিতে হাজির হইল। পরস্পর খেলা করিতেছে, সাধুভাষায় যাহাকে বলে বপ্রক্রীড়া।

কুমার ধমক দিল—"এই ল্যাংল্যাং ছুঁচ্কি কি হচ্ছে।"

ল্যাংল্যাংয়ের চক্ষু দুইটি যেন হাসিতে লাগিল। সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে হ্যা হ্যা শব্দ, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির বয়স কম, ধমক খাইয়া সে একটু ভয় পাইল এবং মুখ তুলিয়া কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল, ভাবটা—সত্যিই রাগ করলে নাকি। ল্যাংল্যাং অত ঘোরপাঁচের মধ্যে না গিয়া একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, ছুঁচ্কিও সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিল তাহার। কুমার ছুঁচ্কির পেটের উপর একটা পা তুলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু চাপ দিতে দিতে বলিল, "শজারুর মাংস খেয়ে খুব ফুর্তি হয়েছে দেখছি—"

ছুঁচ্কি ঘাড় বাঁকাইয়া কুমারের পায়ে আস্তে আস্তে কামড় দিতে দিতে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল, এমন সময় রাধানাথ গোপ দর্শন দিলেন।

"সিভিল সার্জনের কাছে কে যাচ্ছে?"

"নবীন যাবে। সে খেতে গেছে। ট্রেন তো দেড়টায়।"

"হ্যাঁ। তাকে এই চিঠিখানা দিও। ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে কিম্বা বাড়িতে যেন পৌঁছে দেয়।"

"আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট কে?"

"আমাদের জামাই। যুগলের আপন ভগ্নীপতি।"

যুগলকিশোর রাধানাথের খুড়তুতো ভাই।

কুমার চিঠিখানি লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিয়ে দেব। আপনি এবার স্নান-টান করুন। রান্না হয়ে এল—"

রাধানাথ গোপ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমার জন্যে রান্না করিয়েছ নাকি। আমি কিছু চিঁড়ে বেঁধে এনেছিলাম। ভাবছিলাম রামদহিনের দোকান থেকে দই আনিয়ে—"

"না, না, সে হবে না। আমি আপনার জন্যে অন্য ঘরে আলাদা করে রামভুজকে দিয়ে রান্না করাচ্ছি। মাছ মাংসের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁই থাকবে না—"

রাধানাথ গোপ এ সংবাদে মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু মুখে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—"এ কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ তুমি অসুখের বাড়িতে—"

কুমার চুপ করিয়া রহিল।

।। চার ।।

বিরুবাবু সাহেবগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল, সকরিগলিঘাটের ট্রেনটি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা।

কৃষ্ণকান্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটি বার দুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, তাহার পর আসিয়া ওয়েটিং রুমে ইজিচেয়ারটাতে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া দিলেন। বিরু আশা করিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্ত হয়তো কোনও মন্তব্য করিবে। কৃষ্ণকান্ত কিন্তু কিছুই করিলেন না, ইজিচেয়ারের হাতলের উপর পদদ্বয় তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন।

"এখন কি করা যায় বল তো কেষ্ট?"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষু দুইটি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল।

"গরম গরম জিলিপি ভাজছে বাইরে দেখে এলাম। বলেন তো তাই কিছু কিনে আনি।"

পুরসুন্দরী ঘোমটার আড়ালে একটু হাসিলেন। কিরণের চোখের দৃষ্টিও হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিরু বলিলেন, "জিলিপি খেতে চাও খাও। লুচি-ডিম খেয়ে পেট ভরেনি বুঝি।"

"পেট ভরেছে। কিন্তু খাওয়া কি সব সময়ে পেট ভরাবার জন্যেই? গরম গরম জিলিপি খাওয়ার বিশেষ একটা আনন্দ আছে।"

"বেশ, কিনে আন কিছু। আমি কিন্তু খাব না, বাজারের খাবার সহ্যই হয় না আমার। কিন্তু আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না, অন্য কথা ভাবছি। বাবার কাছে পৌঁছবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।"

এক খিলি পান ও দোক্তা মুখে দিয়ে কিরণ বলিল, "আমারও। কাল সকালে কখন গাড়ি।"

"শুনছি ছটার সময়। বাড়ি পৌঁছতে বারোটা-একটা বেজে যাবে। ভাবছি—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরু থামিয়া গেলেন। যাহা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবেন কিনা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ আর একটু দোক্তা মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাদা আর থির থাকতে পাচ্ছে না। হাজার হোক বড় ছেলে তো, আর কত আদরের যে ছেলে—"

কিরণের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। দাদা ছেলেবেলায় বাবা-মার কত আদরের যে ছিল তাহারই নানা প্রসঙ্গ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সে বলিল, "আমাদের ছেলেবেলায় বন্দে মাতরম্ টুপি বলে একরকম টুপি উঠেছিল ছোট ছেলেদের। পাগড়ির মতো দেখতে, রঙিন সিল্কের। দাদা স্টেশনমাস্টারের ছেলের মাথায় সেই টুপি দেখে এসে ঝোঁক ধরলে পুজোর সময় আমারও ওই টুপি চাই। কাটিহারে, পূর্ণিয়ায় কোথাও পাওয়া গেল না। বাবা শেষে কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন টুপি ওকে।"

পার্বতী ঘরের একাধারে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আলু-পটল তো কুটলাম। শাকগুলা শুকিয়ে গেছে। চারটি মটর ডাল ভিজিয়ে দেব? গরম গরম বড়া ভেজে নিলেই হবে।"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "অত হাঙ্গামা করবার দরকার কি মা এখন।"

পার্বতী ঝাঁজিয়া জবাব দিল—"এখানে কাজই বা কি আছে এখন। সমস্ত রাত তো বসে থাকতে হবে শুনছি। তুমি চাবি দাও, আমি বড়া করব।"

পার্বতীর কণ্ঠস্বরে একটা জেদের সুর ফুটিয়া উঠল।

পুরসুন্দরী উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটিতে চাপ দিলেন একটু। কোন কথা বলিলেন না।

"দাও চাবিটা।"

কি যে জ্বালায় মেয়েটা। পুরসুন্দরী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিলেন।

পার্বতী কেরোসিন কাঠের বড় বাক্সটি খুলিয়া প্রথমে শিল-নোড়া বাহির করিল, তাহার পর খানিকটা মটর ডাল বাহির করিয়া সেগুলি একটা বাটিতে ভিজাইতে দিল। মুকুন্দ বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বড়া-ভাজার সরঞ্জাম দেখিয়া বলিল, "ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে উনুন জ্বালতে দেবে না। বেকার এসব বার করছ।"

"তোকে ফপর দালালি করতে হবে না, চুপ কর। এখানে না দেয়, আমি মুসাফিরখানায় যাব, যেখান পকৌড়ি ভাজছে।"

পরসুন্দরী পার্বতীর দিকে চাহিয়া পুনরায় উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটে চাপ দিলেন, কিছু বলিলেন না। পার্বতী ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া মুসাফিরখানার দিকে গেল।

কিরণ বউদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"পার্বতীটা তোমায় খুব জ্বালায় দেখছি।"

"জ্বালায়, কিন্তু ও না থাকলে আমার সংসারও অচল। নিজে তো আর তেমন খাটতে পারি না। সংসারের ভার ওরই ওপর।"

কিরণ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ভারী তো সংসার, তুমি আর দাদা। ছেলে-মেয়েরা তো সব বাইরে। সংসার ছিল বটে আগে। এক হাতে তুমিই সব সামলাতে। ওরই ফাঁকে বাঘ-বকরিও খেলে যেতে আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনে আছে তোমার? তোমার বউ কেমন হয়েছে? তোমার মতো কাজের হয়েছে তো?"

পুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মেয়েরা অতটা পারবে না। চম্পা মেয়ে ভালো। শৌখিন কাজকর্ম অনেক জানে। লেখাপড়াতেও ভালো। কিন্তু ঘরের কাজ করতে চায় না। খুব বড়লোকের মেয়ে তো; বাপের বাড়িতে আদরে মানুষ হয়েছে। একটু বেশি খাটাখাটি করলেই বুক ধড়ফড় করে। কি করে ও মেয়ে যে পেট থেকে ছেলে ফেলবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে আছি আমি। দিনরাত খালি বই নিয়ে বসে থাকে।"

কিরণ গগনের বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই। তাই গগনের বউ চম্পার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। পুরসুন্দরীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া সে আরও কৌতূহলী হইল।

"ও, তাই বুঝি! কিন্তু পোয়াতি মেয়েদের অমন দিনরাত বসে থাকা তো ভালো নয়। ডাক্তারেরা মানা করে। ঘণ্টু যখন আমার পেটে ছিল ডাক্তার ঘোষ আমাকে দিয়ে রোজ ঘর পোঁছাতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অপারেশন করতে হল, আমার রাস্তাই ছোট ছিল তো। কিন্তু শরীর খুব ভালো ছিল আমার। চম্পার স্বাস্থ্য কেমন?"

"বাইরে থেকে ভালোই তো মনে হয়। খুব মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। কলেজে যখন পড়ত তখন না কি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সংসারের ধকল সহ্য করতে পারে না

মোটে। দুটি প্রাণীর জন্য গগনকে একটা ঠাকুর, দুটো চাকর, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। এ ছাড়া মোটরের ড্রাইভার আর ডিস্‌পেনসারির কম্পাউন্ডার তো আছেই।"

"গগন তোমাদের কিছু সাহায্য-টাহায্য করে?"

"করবে কোত্থেকে! যত্র আয় তত্র ব্যয়। কত রোজগার করে তা-ও জানি না। তবে বাঁচে না কিছু। উনি বলেন, ওকে যে আমার টাকা দিতে হচ্ছে না এইটেই আমার লাভ।"

"আর দিগন্ত?"

"সে প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে পাঠায় আমাকে কিছু। দাদাকেও নাকি কিছু কিছু দেয়। দাদা-অন্ত প্রাণ তো।"

হঠাৎ 'ফু ফু ফু' করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। দেখা গেল নিদ্রিত কৃষ্ণকান্তের ঠোঁট দুইটি বায়ু সহযোগে উক্ত শব্দ করিতেছে।

কিরণ সে দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"অদ্ভুত মানুষ, যেমন অসুরের মতো খাটতে পারে, তেমনি আবার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোতে পারে। বিছানার দরকার নেই। কাল ট্রেনে অসম্ভব ভিড় ছিল। আমি বসে জেগে কাটালুম। উনি বসে বসেই খাসা ঘুমিয়ে নিলেন। আশ্চর্য ক্ষমতা।"

কৃষ্ণকান্তের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল। তিনি যখন ঘুমাইতেছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা মৃদুতম কণ্ঠে হইলেও তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি কখনও ঘড়িতে এলার্ম দিয়া শোন না, যখন উঠিবেন মনে করেন তখনই উঠিতে পারেন।

তিনি একজন ফরেস্ট-অফিসার। সারাজীবনই প্রায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনেক শিকার করিয়াছেন, কিন্তু কখনও রাত্রি জাগরণ করেন নাই। বাঘ শিকার করিতে গিয়াও মাচায় শুইয়া ঘুমাইয়াছেন, বাঘ কাছাকাছি আসিবামাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে, বাঘ রেন্‌জের মধ্যে আসিলে বাঘকে গুলি করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম সম্বন্ধে যেমন, আহার সম্বন্ধেও তেমনি। প্রচুর খাইতে পারেন, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, যখন যাহা পান পেট ভরিয়া খাইয়া লন এবং অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলেন। আহার এবং নিদ্রার অসুবিধার জন্য সাধারণত লোকে যে সব কষ্ট ভোগ করে কৃষ্ণকান্তকে তাহা ভোগ করিতে হয় না। তিনি সুখী পুরুষ। কিরণের সহিত তাঁহার সম্পর্কটাও একটু অদ্ভুত গোছের। বড়-ছোট একঘর ছেলেমেয়েরাই সাধারণত সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করে। সে জটিলতা দাম্পত্য-জীবনকে কখনও বিষময়, কখনও মধুময় করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দান করে। ইহাদের জীবনে এসব ঘটে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই ঘণ্টু ওরফে ঘনশ্যাম জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিক প্রসব হয় নাই। সিজারিয়ান করিয়া ঘণ্টুকে বাহির করিতে হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তারেরা কিরণের টিউব দুইটিও কাটিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে আর সন্তান না হয়। ঘণ্টুর বয়স যখন আট কি নয় বৎসর তখনই কৃষ্ণকান্ত তাহাকে একটি সাহেবি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসিত বটে কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকিত বোর্ডিংয়ে। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত-কিরণের সংসারে সন্তানের ঝামেলা ছিল না। কিরণ প্রথমে কিছুদিন বাংলা নভেল-নাটক লইয়া কাটাইল, বহুরকম বাংলা সাময়িক পত্রিকার গ্রাহিকা হইল। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর ছিল, সংসারের কাজ করিতে হইত না। দিনকতক পরেই কিন্তু তাহার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল। বই পড়ার নেশা ছুটিতে আরম্ভ করিল। কেবল বই পড়িয়া আর মন

ভরে না। তখন মন দিল নানা রকম রান্নায়। ইংরেজি-বাংলা পাক-প্রণালী কিনিয়া বহু রকম জ্যাম জেলি আচার চাটনি, বিদেশী নানা রকম অদ্ভুত রান্না করিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে এবং তাঁহার বন্ধুদের খাওয়াইতে লাগিল। ঘণ্টুর কাছেও মাঝে মাঝে খাবারের পার্শেল যাইত। কৃষ্ণকান্ত আপিসের কাজ করিতেন, বন্দুক লইয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিরণের কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না, বরং এমন উৎসাহিত করিতেন যে কিরণের ধারণা হইত সে একটা অসাধারণ কিছু করিতেছে। তাহার হাতের প্রস্তুত যে কোনও ব্যঞ্জন যেমনই হউক এমন তারিফ করিয়া আহার করিতেন যে কিরণের মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হইত যে কৃষ্ণকান্ত হয়তো অতিশয়োক্তি করিতেছেন। একদিন তাহাকে তিনি কলির দ্রৌপদীই বলিয়া বসিলেন। রান্না লইয়াও কিন্তু কিরণ বেশিদিন নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। উল বোনায় মন দিল, মেমসাহেব রাখিয়া সেলাই শিখিল। তারপর ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিখিল। কিন্তু ওই কিছুদিন মাত্র। অন্তরনিহিত একটা ক্ষুধার তৃপ্তি যেন কিছুতেই হয় না। অবশেষে সে ক্ষুধা নিবারণের কিছু উপকরণ সে পাইল কৃষ্ণকান্তকেই অবলম্বন করিয়া। নিজের ছেলেকে মা যেমন শাসন করে কৃষ্ণকান্তকেও তেমনি শাসন করিতে আরম্ভ করিল সে। এটা কোরো না, এমন ঠাণ্ডায় বেরিয়ো না, অত খাওয়া ভাল নয়—এইরূপ নানা আদেশ সে কৃষ্ণকান্তের উপর জারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত হইলেন, মনে মনে একটু হাসিলেনও, কিন্তু আদেশ পালন করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে কিরণের বড় সুখ হইল। ক্রমশ কৃষ্ণকান্তের সমস্ত জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল সে, এমনকি আপিসের ব্যাপারেও কি করা উচিত, কি অনুচিত তাহাও সে ঠিক করিয়া দিতে চাহিল। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহার নাম দিলেন বাড়ির বড়-সাহেব এবং তাহার সহিত বড়-সাহেবের মতোই ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ আপিসের বড়-সাহেবকে যেমন সুবিধা পাইলে ফাঁকি দিতে কসুর করিতেন না (এ বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল) তেমনি বাড়ির বড়-সাহেবকেও ফাঁকি দিতেন। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িয়া যাইতেন, ধরা পড়িয়া আনত-নয়নে মুচকি মুচকি হাসিতেন। এইভাবে দুইজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা রস জমিয়া উঠিয়াছিল। আপাতত, এই সুরে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন-বীণা বাঁধা।

নিজের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যটি কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজিয়া শুনিলেন। কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়তো চোখের পাতা দুটি ঈষৎ কাঁপিতেছিল, কিম্বা মুখভাবে হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিরণ ধরিয়া ফেলিল যে তিনি জাগিয়াছেন।

"মটকা মেরে পড়ে থাকবার দরকার কি। দেখ না, দাদা কোথা গেল। বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছে দাদা, একটু গল্পস্বল্প করে অন্যমনস্ক করে রাখ তাকে। ট্রেন তো সেই সকালে, ওগো শুনছ—"

"অ্যাঁ, আমাকে বলছ—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বসিলেন এবং স্মিতমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন।

"কি বলছ বল।"

কিরণের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছদ্ম কোপ চকচক করিয়া উঠিল।

"ঘুমের ভান করে পড়ে থাকার দরকার কি। গল্পস্বল্প করে দাদাকে একটু ভুলিয়ে রাখ না। তোমার ভাঁড়ারে তো অনেক বাঘ-ভালুকের গল্প আছে"

"এখনকার বাঘ-ভালুকের গল্প দু'চারটে আছে অবশ্য, কিন্তু দাদার সে সব ভালো লাগবে

কি? সিউমেরিয়ান বা ব্যাবিলনের বাঘের গল্প তো আমার জানা নেই। দেখি, কোথা গেলেন—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ওয়েটিং রুমের মেঝেতে মুকুন্দ পূর্বেই বিছানাপত্র পাতিয়া ফেলিয়াছিল। পুরসুন্দরী শুইয়া পড়িলেন। কিরণকেও বলিলেন—"তুইও একটু গড়িয়ে নে। রাত্রের গাড়িতে যদি গগন আর দিগন্ত এসে পড়ে, তাহলে আর ঘুম হবে না কারও।"

"এত সকাল সকাল ঘুমই আসবে না আমার। তুমি শোও", তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "গগন আর দিগন্তকে যে কতদিন দেখিনি।"

পুবসুন্দরী কোন জবাব দিলেন না।

কিরণ নিজের স্যুটকেস হইতে একটি সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাহাতেই মন দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহিত নীরবে আলাপ করিতেছে। কখনও ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইতে লাগিল, কখনও মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, কখনও বা উল্টোনো নীচের ঠোঁটটি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল।

পার্বতী ফিরিল একটু পরেই। পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পা টিপিয়া রাঁধিবার কিছু সরঞ্জাম লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। পুরসুন্দরী চোখ বুজিযা পড়িয়া ছিলেন, সব টেরও পাইতেছিলেন, কিন্তু পার্বতীকে বাধা দিলেন না, যা খুশি করুক। কিরণ ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল কিন্তু সে-ও কিছু বলিল না। উদীয়মানা অভিনেত্রী মন্দারমালা একটা বিশেষ সাবান মাখিয়া কি ভাবে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করেন তাহাবই বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে সে নাসাকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া ছিল।

পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া একেবাবে অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। পার্বতী কেন যে এতরাত্রে এত অসুবিধার মধ্যেও মটর ডালের বড়া ভাজিতে চাহিতেছে, তাহার রহস্য আর কেহ না বুঝুক তিনি বুঝিয়াছিলেন। দিগন্ত মটর ডালের বড়া খাইতে খুব ভালবাসে। সে হয়তো রাত্রের ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই পার্বতী এত কাণ্ড করিতেছে।

দিগন্তকে মেয়েটা দেবতার মতো ভক্তি করে। কি যে উহার মনে আছে ভগবানই জানেন। দুর্ভাগিনী মেয়েটা। দিগন্ত যে উহার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহাও মনে হয় না। না দিলেই ভালো। পুনরায় তাঁহার ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথা মনে পড়িল। বেশ মেয়েটি। দিগন্তের সহিত বেশ মানাইবে। দিগন্ত আসিলে এবার ভালো করিয়া কথাটা পাড়িতে হইবে তাহার কাছে। কিন্তু বাবার যদি কিছু একটা হইয়া যায় তাহা হইলে তো আবার বাধা পড়িবে, এক বৎসর কালাশৌচ। মানুষের কিছুই হাত নাই। চক্ষু বুজিয়া পুরসুন্দরী নানান চিন্তা করিতে লাগিলেন। চোখ দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন যে পড়িল তাহা তিনি নিজেও বুঝিলেন না। আজকাল কারণে-অকারণে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

"বউদি ঘুমিয়ে পড়লে না কি—"

পুরসুন্দরী শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথা কহিতে তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তিনি নিজের মধ্যেই তলাইয়া থাকিতে চান।

"দেখে আসি, ওরা কোথা গেল—"

সিনেমা-পত্রিকাটি পুনরায় বাক্সে পুরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া কিরণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম একেবারে খালি। একধারে কিছু মাল

স্তূপকরা, তাহার কাছেই কুলিরা পাশাপাশি শুইয়া আছে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হুইলারের দোকানটাও বন্ধ। কিরণ একটু আগাইয়া দেখিল, বাঁ দিকে বাহিরে যাইবার গেট। গেটের পাশে সাহেবি-পোশাক-পরা একটি ছোকরা বসিয়া আছে, সম্ভবত টিকিট কালেকটার। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—মুসাফিরখানাটা কোন্ দিকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবি-পোশাক-পরা ছোকরাটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বউদি, আপনিও এসেছেন!"

হাজারিবাগের যতীশকে দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া গেল।

"কেষ্টদাকে খুঁজছেন? তিনি খাবারের দোকানের দিকে গেলেন। ডেকে দেব?"

"না, আমিই যাচ্ছি। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা! তুমি রেলে ঢুকেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভালো তো?"

"মা মারা গেছেন গেল বছর।"

"ও—"

কিরণের মনে পবিত্র একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ধপধপে ফরসা থান-পরা, ধপধপে সাদা মাথার চুল, টকটকে গায়ের রং, রোগা, খর্বাকৃতি যতীশের মায়ের চেহারাটা কিরণের চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি কিরণকে ঠিক নিজের পুত্রবধূর মতোই ভালবাসিতেন। তখনও ঘণ্টুর জন্ম হয় নাই।

"সাবিত্রী কেমন আছে"

যতীশের দাদা সতীশের স্ত্রী সাবিত্রী। কিরণের সমবয়সী ও সখী ছিল।

"বউদির থাইসিস হয়েছে।"

"ও! কোথা আছে সে? হাজারিবাগে?"

"না। হাজারিবাগের বাড়ি আমরা বিক্রি করে দিয়েছি। বউদি ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে আছেন। ডাক্তারেরা বলছেন সারাজীবনই নাকি থাকতে হবে।"

"সাবিত্রীর ছেলেপিলে হয়নি?"

"একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলে হবার পরই বউদির অসুখ হয়, ছেলেটি বাঁচেনি।"

যাহাদের সহিত একদিন কত অন্তরঙ্গতা ছিল তাহাদের সংসারের এই সব নিদারুণ বার্তা কিরণ নির্বিকারভাবেই দাঁড়াইয়া শুনিল। বুঝিতে পারিল না যে একই জন্মে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্মের সহিত পূর্বজন্মের সম্পর্ক স্মৃতির অতি ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহা আর জীবন্ত নয়, মৃত। ইহারা একদিন অতি আপনার জন ছিল, আজ কেহ নয়।

কিরণ মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার দাদা কোথা?"

"দাদা সম্বলপুরে আছেন। আবার বিয়ে করেছেন তিনি। ছেলেও হয়েছে দুটি।"

"আবার বিয়ে করেছেন? বিয়ে না করলেই পারতেন।"

যতীশ কুণ্ঠিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে যে।

বলিল, "বউদিকে একথা জানাইনি আমরা—"

"তুমি বিয়ে করেছ?"

"না। বউদির স্যানাটোরিয়ামের খরচ চালাতে হয় আমাকে। দাদা তো মোটে পঞ্চাশ টাকা করে দেন।"

যদিও ইহাদের সংসারের সুখ-দুঃখ-ভালো-মন্দের সহিত কিরণের সর্বপ্রকার যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবু সে মুরুব্বির মতো উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

"তোমার দাদারই উচিত ছিল নিজে বিয়ে না করে সাবিত্রীর চিকিৎসার খরচ চালানো, আর তোমার বিয়ে দেওয়া।"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন। আমিই রাজি হইনি।"

"কেন?"

যতীশ কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিরণের মুখেও আর কোন কথা জোগাইল না। বহুকাল পূর্বে দশ-বারো বছরের রোগা-রোগা যে ছেলেটি বউদি বউদি করিয়া তাহার নিকট বারবার আসিত, সে যে এত মহৎ, তখন তো কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

"কতক্ষণ তোমার ডিউটি—"

"এই ট্রেনটা আসবে, তারপর ছুটি! ওয়েটিং রুমে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

"না। আচ্ছা আমি যাই। দেখি তোমার দাদা বাইরে কি করছেন।"

কিরণ বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল না। খাবারের দোকানে কেহ নাই। মুসাফিরখানার বিস্তৃত চত্বরে বহু যাত্রী। একটা পান-সিগারেটের বড় দোকানও রহিয়াছে। কিরণ সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল পার্বতী পকৌড়ি-ওলার সহিত বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। পকৌড়ি-ওলা চিরন্‌জিপ্রসাদও ছাপরা জেলার লোক। পার্বতীর চালচলন, ফরসা শাড়ি এবং শাড়ি পরিবার কায়দা দেখিয়া সে প্রথমে তাহাকে বাঙালিনী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু পার্বতী যখন তাহার সহিত ছাপরাই ভাষায় আলাপ করিল, সে অবাক হইয়া গেল এবং আত্মহারা হইয়া পড়িল যখন শুনিল যে খাস ছাপরা জেলাতেই তাহার বাড়িও। ইহার পর আর কিছু আটকাইল না। গরম গরম মটর ডালের বড়া ভাজিয়া দিবার সমস্ত ভার চিরন্‌জি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। কিরণ গিয়া দেখিল পার্বতী একটি মোড়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মুকুন্দ বসিয়া আছে তাহার পায়ের তলায়। মুকুন্দের হাতে একঠোঙা পকৌড়ি। সানন্দে সে পকৌড়ি ভক্ষণ করিতেছে। চিরন্‌জি তাহার তোলা-উনুনে পুনরায় কয়লা দিয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছে যাহাতে উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ওঠে। কিরণকে দেখিয়া পার্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোর জামাইবাবুকে দেখেছিস?"

"ওই যে।"

মুচকি হাসিয়া পার্বতী মুখটা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ সবিস্ময়ে দেখিল কৃষ্ণকান্ত একদল সাঁওতালদের মধ্যে বসিয়া আছেন। কয়েকটি সাঁওতাল যুবতী ও কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বাকি সকলেও বেশ পুলকিত। কৃষ্ণকান্ত সাঁওতালী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিরণ আন্দাজ করিল, কোনও রসের গল্প ফাঁদিয়াছে নিশ্চয়। সে বিষয়ে ওস্তাদ তো! সে দলটার দিকে আগাইয়া গেল। কিরণকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত অপ্রতিভমুখে উঠিয়া পড়িলেন, যেন কোনও অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

"এরা কে?"

"এরা? এরা সাঁওতাল, আমার আলাপী লোক। মুংলিকে তুমিও তো দেখেছ? সেই যে ডালটানগঞ্জে আমাদের বাংলার মাঠে মাঠে পাতা কুড়োতে আসত ছোট মেয়েটা। কত বড় হয়েছে দেখ, ওর আবার ছেলে হয়েছে—"

পিঠে-ছেলে-বাঁধা মুংলি সলজ্জভাবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল। তাহার উদ্দাম যৌবন খাটো শাড়ির বাঁধ মানিতেছিল না, কিরণ একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাকে বললাম দাদাকে খুঁজতে, আর তুমি ওদের সঙ্গে এসে আড্ডায় বসে গেছ।"

"পুরোনো বন্ধু যে সব। ওই বুধু মাঝির সঙ্গে কত হুঁড়ার শিকার করেছি এককালে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।"

এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে প্রচুর জিলাপী লইয়া খাবারের দোকানী হাজির হইল।

"চার সের হ্যয় হুজুর—"

কৃষ্ণকান্ত মুংলির দিকে ফিরিয়া সাঁওতালী ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ—"নে, খা তোরা। ভাগ করে দে সবাইকে—"

মুংলি আর একবার হাসিয়া গলিয়া পড়িল। দলে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল ছিল, মুংলি তাহার দিকে চাহিতে সে সম্ভবত লইবার অনুমতি দিল। মুংলি আগাইয়া আসিয়া কিরণের দিকে ফিবিয়া বলিল, "সেলাম মাইজি—" তাহার পর ঝুড়িটা লইয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। একটা আনন্দের হুল্লোড় পড়িয়া গেল যেন।

"চল, এবার দাদাকে খুঁজি। কাছে-পিঠে তিনি কোথাও নেই, খুঁজে দেখেছি।"

কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া কিরণ মন্তব্য করিল—"কমবয়সী ছুঁড়ি দেখ্‌লে আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না।"

"ঠিক বলেছ। অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হয়ে গেল।"

মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকান্ত কিরণের দিকে আড়চোখে একবার চাহিলেন। দেখিলেন কিরণও হাসিতেছে।

"গুণের আর শেষ নেই। কি বলে অতগুলো জিলিপি ওদের সব দিয়ে দিলে। নিজেদের জন্যও কিছু রাখতে হয়—"

"খাবে? গরম গরম ভাজিয়ে নি, চল না। চল, দোকানে বসেই খাওয়া যাক। ওখানে একটা বেঞ্চি আছে। দাদা-বউদি তো খাবে না। পার্বতী আর ওই ছোঁড়া চাকরটা তো এখানেই আছে। ওদেরও ডেকে নি, কি বল—"

"নাও—"

পার্বতী খাইতে চাহিল না। পকৌড়ি খাইয়া মুকুন্দেরও পেট ভরিয়া গিয়াছিল।

"আমরা দুজনেই খাই চল তাহলে।"

"আমার লজ্জা করবে ভারি।"

"এতে লজ্জা কি। জিলিপি খাওয়া অন্যায় নয়।"

একটু পরেই দেখা গেল, কিরণ আর কৃষ্ণকান্ত দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া দুইটি শিশুর মতো জিলিপি ভক্ষণ করিতেছে। শুধু জিলিপি নয়, গরম গরম কচুরিও। তাহার পর ভাঁড়ে করিয়া চা।

"তোমার জেদেই কতকগুলো অখাদ্য গিল্‌তে হল।"

"কুচ্‌পরোয়া নাই। হজমি ওষুধ আছে আমার সঙ্গে—আগে চল দাদার খোঁজটা করি। কোথায় গায়েব হলেন ভদ্রলোক—"

বিরুবাবুকে কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিরণ শেষে অনুমান করিল, "দাদা তো এখানেই পড়ত, কোন পুরোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয় তো।"

"তাই আশা করা যাক। এখন কি ওয়েটিং রুমে ফিরবে? তার চেয়ে চল ওই ওভার-ব্রিজটায় ওঠা যাক—যাবে?"

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্নটি করিয়া কিরণের দিকে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

"এই গরমে—?"

"গরম বলেই যেতে চাইছি। ওখানে হাওয়া পাওয়া যাবে একটু।"

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ওই টং-এর ওপর।"

"দাঁড়াব কেন, পায়চারি করব।"

"বুড়ো বয়সে শখও কম নয়।"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইলেন। তাহার পর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাগ-রাগ মুখ করিয়া কিরণ অনুসরণ করিল। তাহার মুখের ভাবটা, কি সব ছেলেমানুষী এই রাতদুপুরে!

.....বিরুবাবু ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। তাঁহার সঙ্গে একটি পাগড়ি-বাঁধা লোক দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। পরে জানা গেল সে নৌকার মাঝি। বিরুবাবু ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে এই ঝক্‌সু মাঝির সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে যে এখনই নৌকা খুলিয়া দিলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সে বিরুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবে। বাতাস অনুকূল আছে, হয়তো পাঁচটার আগেই পৌঁছিয়া যাইবেন। বিরুবাবু মনস্থ করিয়াছেন, ট্রেনের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নৌকাযোগেই যাত্রা করিবেন। ঝক্‌সু মাঝি মালপত্র লইয়া যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রস্তাবটি শুনিলেন।

বলিলেন, "নৌকোয় যাওয়ার 'রিস্‌ক'ও তো আছে। যদি ঝড়-বৃষ্টি হয়, যদি চড়ায় কোথাও আটকে যায়—"

ঝকসু মাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। একথা শুনিয়া কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল, মনে

হইল একটা বাঘ বুঝি গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটি খুব যে বলিষ্ঠ তাহা নয়, যুবকও নয়। দোহারা চেহারা, কুচকুচে কালো রং, কানের কাছের কেশগুচ্ছে পাক ধরিয়াছে, গোঁফও কাঁচাপাকা। সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দিতে যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই যে, কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিলে বাবুকে সে আশ্বাস দিত না। সে রেল-কম্পানির মতো বেইমান নয় যে অগ্রিম ভাড়া লইয়া যাত্রীদের পথে বসাইয়া দিবে। আজ রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির কোন আশঙ্কা নাই, থাকিলে সে বাবুকে লইয়া যাইতে চাহিত না। যদি ঝড়-বৃষ্টি হয় বা নৌকা আটকায়ই যায় তাহা হইলে সে একটি পয়সা ভাড়া তো লইবেই না, উপরন্তু কান কাটিয়া 'জরমানা' (জরিমানা) দিবে।

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কান নিয়ে আমরা কি করব বল"। বিরুবাবু কিন্তু মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বলিলেন, "কেষ্ট তুমি এখানে থাক, সকালের ট্রেনে এদের নিয়ে যেও। আমি চলে যাই। আমার যাওয়াটা আগে দরকার, একটা মিনিটেরও এখন অনেক দাম। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যেমন করে হোক আমি সেখানে পৌঁছতে চাই।"

কৃষ্ণকান্তের হঠাৎ মনে পড়িল একবার একটা ছুটিতে তিনি বিরুবাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এক সহকর্মীর সহিত একটা বাসনের টুকরার বয়স লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন বিরুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আরে পাঁচশো বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও কতটুকু সময়!—" সেই একই ব্যক্তির নিকট এক মিনিটই এখন অত্যন্ত মূল্যবান মনে হইতেছে। এ অবস্থায় আপত্তি করা বৃথা।

বলিলেন, "বেশ যান তাহলে, আমি এদের নিয়ে যাব—"

পুরসুন্দরী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, এক কোণে বসিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার জলে ফাঁড়া আছে শুনেছি। তোমাকে এই রাত্রে একা আমি নৌকায় যেতে দেব না"

"পাগল না কি! বিপদের সময় ও সব কুসংস্কার মানলে চলে? আমাকে যেতেই হবে।"

"তাহলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

"তুমি গেলে লাভটা কি হবে শুনি।"

পুরসুন্দরী উঠিয়া পড়িলেন ও কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু কাপড় গামছা সেমিজ ব্লাউজ পুরিয়া বলিলেন, "আমি একা বসে বসে দুশ্চিন্তা করতে পারব না। তার চেয়ে চল সঙ্গেই যাই।"

"চল।"

কৃষ্ণকান্ত আর একটি প্রস্তাব করিলেন।

"নৌকোটা কত বড়, সকলের কুলুবে না? সবাই গেলে কেমন হয়?"

"না, সকলের কুলুবে না। মাল যে অনেক। তুমি থাক। গগন-দিগন্তও হয়তো এসে পড়বে পরের ট্রেনে। কাউকে না দেখলে ওরা আবার ঘাবড়ে যাবে। তোমরা থাক—"

কিরণ বলিল, "পার্বতী?"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ও থাক। ও মুসাফিরখানায় রান্না নিয়ে আছে। আমরা যে চলে যাচ্ছি,

সে কথা ওকে জানাবারও দবকার নেই। যদি জেদ ধরে বসে যে যাব—তাহলে ওকে থামানো মুশকিল হবে। আমরা চুপি চুপি চলে যাই—"

"যা করবে তাড়াতাড়ি করে ফেল। এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।"

"চল, আমি তো প্রস্তুত।"

পুরসুন্দরী ব্যাগটি হাতে ঝুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণ বলিল, "আমার দাদার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নৌকা যে ছোট। বড় নৌকো পাওয়া যাবে না?"

বিরু অধীব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"তোরা পরে যাস—"

তিনি ঝক্‌সুর মাথায় নিজের জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পুরসুন্দরীও পিছু পিছু গেলেন। স্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় দুই মাইল দূরে। রাস্তাও ভালো নয়। মিউনিসিপালিটির রাস্তা অত্যন্ত বেমেরামত। মিউনিসিপালিটির বাহিরের রাস্তাও সুগম নয়, ধূলিতে পরিপূর্ণ, অসমতল, মাঝে মাঝে খানাখন্দও আছে। বিরুবাবুর হাঁটা অভ্যাস আছে, তাঁহার তত কষ্ট হইতেছিল না, তা ছাড়া তিনি খালি হাতে হাঁটিতে ছিলেন। পুরসুন্দরীর হাতে ব্যাগ ছিল, সে ব্যাগে ছিল তাঁহার নিজের কাপড়, কুসংস্কারবশত তাহা তিনি কোন কুলিকে ছুঁইতে দেন না, বরাবর নিজেই বহন করেন। পুরসুন্দরীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল, খুবই কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি নীরবেই হাঁটিতে লাগিলেন।

বিরুবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পবে যে ট্রেনটা আসিল তাহাতেই গগন, দিগন্ত, গগনের বউ চম্পা এবং মিস বোস আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিরণ ছিল না। যতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গিয়াছিল, সেখান ভালো করিয়া বিছানা করিয়া নেটের মশারি খাটাইয়া দিয়া একটি টেবল্ ফ্যান পর্যন্ত লাগাইয়া দিয়াছিল—যাহাতে বাকি রাতটুকু তাহারা আরামে ঘুমাইতে পারে। কিরণের পাশে কৃষ্ণকান্তও শুইয়াছিলেন, না শুইলে কিরণও শুইতে চাহিত না। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িতেই তিনি নিঃশব্দে পদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ওয়েটিং রুমে জিনিসপত্র পাহারা দিতেছিল পার্বতী আর মুকুন্দ। পকৌড়ি-ওলা চিরনজিও ওয়েটিং রুমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পার্বতী হুকুম দিলেই বড়া ভাজিতে আরম্ভ করিবে। পার্বতী মুখ-ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথা বলিতেছিল না। পুরসুন্দরী যে তাহাকে লুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন এ রাগ তাহার কিছুতেই যাইতেছিল না। প্রতিশোধস্বরূপ সে কি যে করিবে তাহাও তাহার মাথায় আসিতেছিল না। যাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবে তিনিই তো নাগালের বাহিরে। তবু সে ঠিক করিয়াছিল পুরসুন্দরীর সহিত দেখা না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকিবে।

.....ট্রেনটা যখন চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণকান্ত প্রথম-শ্রেণী হইতে অবতীর্ণ যাত্রী চতুষ্টয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক চিনিতে পারিলেন না। গগন-দিগন্তকে বহুদিন তিনি দেখেন নাই, চম্পাকে তো দেখেনই নাই। সঙ্গে মিস বোস থাকাতে তাঁহার একটু সন্দেহ হইতেছিল, কারণ

দ্বিতীয় কোনও নারী আসিবার কথা তিনি শোনেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মিস বোসকে দেখিয়া তাঁহার পুনরায় খটকা লাগিল। ইরানীদের মতো মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, খাটো গাউন পরা এ মেয়েটির সহিত গগন বা দিগন্তর যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা ভাবা শক্ত। অথচ মেয়েটির সপ্রতিভ চালচলন, কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় যে ইহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। সেই জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিদের সহিত বচসা করিতেছে।

"এই যে দিগন্ত, এসে গেছ তোমরা। বাঁচলুম!"

কৃষ্ণকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিলেন পার্বতী দ্রুতপদে আসিতেছে। কথাগুলি সে-ই বলিল। কৃষ্ণকান্ত তখন ভরসা করিয়া আগাইয়া গেলেন।

"চিনতে পারছ আমাকে? পারছ না নিশ্চয়ই!"

দিগন্তর হাই-পাওয়ার চশমার উপর মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো পড়িয়াছিল। তাহা সরাইযা সে কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গগনও তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে-ও পারিল না। পার্বতীই পরিচয় করাইয়া দিল।

"বড় পিসেমশাই। বড় পিসিমাও এসেছেন।"

তখন সকলে প্রণাম করিল। মিস বোসও।

পার্বতীও মিস বোসকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ আবার কে!

গগনকে চোখের ইশারায় মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিল সে।

গগন বলিল, "উনি একজন মিড-ওয়াইফ। শ্বশুরমশাই সঙ্গে দিয়েছেন।"

মিস বোস কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়াছিলেন, পার্বতীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কুলিদের হুকুম দিলেন, "ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে চলো—"

কুলিদের লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পার্বতী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশী পোশাক পরিয়া আছে বটে, কিন্তু রূপসী। ফরসা রং, অদ্ভুত কালো চোখ, দেহসৌষ্ঠব অনিন্দনীয়, কোমরটি তো মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্বতী প্রশ্ন করিল—"খ্রিস্টান না কি।"

"না। খাঁটি হিন্দু"—গগন উত্তর দিল।

"ওরকম পোশাক কেন তবে?"

"আমিই পরিয়ে এনেছি। ট্রেনে সাহেবী পোশাক থাকলে ঢের সুবিধে হয়। চম্পা কিছুতেই পরতে চাইলে না—"

গগন নিজে খাকী মিলিটারি পোশাক পরিয়া আসিয়াছিল। কোমরের বেলট হইতে একটা রিভলবার ঝুলিতেছিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চমৎকার মানাইয়াছিল তাহাকে। দিগন্ত বেশ পরিবর্তন করে নাই। সে বরাবর যাহা পরে তাহাই পরিয়াছিল। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি, পায় একজোড়া স্যান্ডাল, বগলে ছিল একটা বই। মাথার কোঁকড়ানো বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত, কয়েক গোছা চুল বারবার চশমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর সে বারবার সেটা বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত সানন্দে ইহাদের দেখিতেছিলেন। চম্পাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। চম্পা তো চম্পাই। কনকচাঁপার মতো গায়ের রং। ফিকে নীল শাড়িটি

কি চমৎকারই না মানাইয়াছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়াইয়া আছে। কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যেন দেবীদর্শন করিতেছেন। আসন্ন-প্রসবা? কই দেখিয়া তো মনে হয় না।

গগন কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনারা বসেছেন কোথা।"

"ওয়েটিং রুমেই।"

"বাবা-মাকে দেখছি না, ঘুমুচ্ছেন নাকি।"

"তাঁরা কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকা করে চলে গেছেন।"

"কেন। দাদুর অবস্থা খুব খারাপ না কি।"

"না, সে রকম কোনও খবর আসেনি। তবে উনি কিউল থেকে একটা তার করেছিলেন, আশা করেছিলেন উত্তর পাবেন একটা, কিন্তু উত্তর আসেনি। তাই ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন।"

পার্বতী কুটুস্ করিয়া বলিল, "যান, কিন্তু আমাকে না বলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমি মুসাফিরখানায় গিয়ে তোমাদের জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করছি আর, ওঁরা আমাকে কিছু না বলে চুপি চুপি এদিক দিয়ে চলে গেছেন—!"

গগন গম্ভীরভাবে বলিল, "খুব অন্যায় করেছেন। তোমার অনুমতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

পার্বতী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। দাঁড়াও না, আমি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি।"

"নতুন মজা আর কি দেখাবে। একটি মজাই তো জানা আছে তোমার— উপোস—"

গগনের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"ভালো হবে না বলছি।"

পার্বতী কিল তুলিয়া শাসাইল।

দুইজনে সমবয়সী, একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে।

"কি রান্না করে রেখেছ?"

"কিছু করিনি।"

"চল, ওয়েটিং রুমে বসেই ঝগড়া করা যাক।"

গগন, পার্বতী আর চম্পা আগাইয়া গেল।

দিগন্তকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত একটু পিছনে পড়িলেন।

কৃষ্ণকান্ত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে মিড-ওয়াইফ নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি?"

"দাদার শাশুড়ি বউদিকে আসতেই দিচ্ছিলেন না, কিন্তু দাদাও একেবারে না-ছোড়।"

এই পর্যন্ত বলিয়া দিগন্ত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল। হাসির দ্বারা সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে বুনো-ওলের সহিত বাঘা-তেঁতুলের বেশ একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি। ঝগড়াঝাঁটি করে এসেছ?"

"না, তা হয়নি।"

দিগন্ত স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"কি হল তাহলে?"

"যা বরাবর হয়, দাদা ঝড়াৎ করে আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে বসল—কাম শার্প। গেলাম। দাদা বললে—চম্পাকে আমি নিয়ে যাবই, তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তখন দাদার শ্বশুর-শাশুরীকে গিয়ে বোঝালাম যে দাদা নিজেই ডাক্তার, সে যখন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছে তখন আপনাদের ভাবনা কি। দাদুরও খুব কষ্ট হবে বউদি না গেলে। দাদার শাশুড়ি বললেন, ভরা পোয়াতি, রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায় তখন সামলাতে পারবে? আমি বললাম, বেশ তাহলে একজন নার্স কিম্বা মিড-ওয়াইফ সঙ্গে চলুক। আপনাদের যার উপর বিশ্বাস বলুন—তাকেই নিয়ে যাই। যাঁর উপর তাঁদের বিশ্বাস তিনি আসতে পারলেন না, তিনিই এই মিস্ বোসকে রেকমেন্ড করলেন। মেয়েটি নাকি বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সম্প্রতি। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। এখুনি দাদার শ্বশুরবাড়িতে টেলিগ্রাম করতে হবে একটা। দাদার শ্বশুর-শাশুড়িও হযতো দাদুকে দেখতে আসতে পারেন।"

"জমজমাট ব্যাপার তাহলে বল!"

"দাদা আরও জমজমাট ব্যাপার করে এসেছে কিউলে। খারাপ চা দিয়েছিল বলে এক চা-ওলার টি-পটসুদ্ধ উল্‌টে, চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে, স্টেশন মাস্টারকে ডেকে— সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড।"

"তাই না কি! কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"কি আর হবে! ওরা অমনি খারাপ চা তো বরাবর দিচ্ছে, তা না হলে লাভ হয় না, কেলনার তো উঠে গেছে।"

না, তা বলছি না। পুলিশ কেস হয়নি তো?"

"না। আমি চা-ওলাটাকে গোপনে গোটা দুই টাকা দিয়ে দিয়েছি।"

দিগন্ত কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল। এমন সময় কিরণ আসিয়া উপস্থিত। মনে হইল বেশ চটিয়াছে।

"ও, এরা সব এসে গেছে বুঝি! বাঃ, তুমি বেশ লোক তো, একলা উঠে চলে এলে, আমাকে ডাকলে না।"

কৃষ্ণকান্ত একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া পরিষ্কার মিথ্যা কথাটি বলিলেন।

"দু'তিনবার ডাকলাম, কই উঠলে না তো। ভাবলাম কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে হয় তো মাথা-টাথা ধরবে, তাই আর বেশি ডাকলাম না।"

"মিথ্যুক কোথাকার। একবারও ডাকনি আমাকে।'

কৃষ্ণকান্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

টিকিট-কলেক্‌টার যতীশ আসিয়া হাজির হওয়াতে হাওয়াটা অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল।

"আপনাদের জন্য চা করতে বলেছি। ক'কাপ আনতে বলব।"

কৃষ্ণকান্ত কিরণকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি নিজে গিয়ে চা-টা করাও তাহলে। চা খারাপ দিয়েছিল বলে গগন শুনছি কিউলে একটা চা-ওলাকে জখম করে এসেছে।"

"কে বললে?"

"দিগন্ত।"

কিরণকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, "দাদা এখানে কিছু বলবে না। চা-টা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আলকাতরার মতো রং—"

"না, না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে ভাল চা করাচ্ছি, যতীশ কোথায় তোমার স্টল, চল—"

যতীশ বলিল, "আপনি যাবেন কেন। আমিই সব ঠিক করে দিচ্ছি।

কিরণ সে কথায় কানই দিল না।

"আমাদের সঙ্গে ভাল দার্জিলিং চা আছে। আমাদের কাপ-ডিশও সঙ্গে রয়েছে। সেগুলো বার করুক পার্বতী। কোথা গেল, পার্বতী—"

মুকুন্দ ওয়েটিং রুমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "চিরনজিকে নিয়ে বড়া ভাজতে গেছে।"

"তুই চায়ের জিনিসপত্তরগুলো বার কর তাহলে।"

যতীশ বলিল, "আমি তাহলে গরম জল নিয়ে আসি। দুধও চাই বোধহয়।"

"হ্যাঁ, তা চাই।"

যতীশ চলিয়া গেল।

কিরণের সাড়া পাইয়া গগন এবং চম্পা ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে প্রণাম করিল। উভয়ের থুতনিতে হাত দিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওমা, এ যে রাজলক্ষ্মী দেখছি। ট্রেনে ঘুম হয়নি নিশ্চয়, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি দেখি যতীশ চায়ের জলের কি করলে। ভালো ফুটন্ত জল না হলে চা ভালো হবে না। মুকুন্দ, তুই ততক্ষণ চায়ের জিনিসগুলো বার কর। আমি দেখি—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া একট ইজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে কিরণকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি যে কৌশলে কিরণের মনোযোগ চায়ের ব্যাপারে লাগাইতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তাঁহার মুখে একটু মৃদু হাসিও ফুটিয়াছিল। কিরণ শশব্যস্ত হইয়া মুসাফিরখানার দিকে চলিয়া গেল। চায়ের স্টল কোথায় সে একটু আগেই দেখিয়াছে। গগন এবং দিগন্ত প্রবেশ করাতে মিস্ বোস উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বেশি চেয়ার ছিল না। গগন দিগন্তকে বলিল, "দেখ তো, আরও চেয়ার জোগাড় করতে পারিস কি না। লেডিজ ওয়েটিং রুম থেকে যে কটা পাস টেনে বার কর। প্ল্যাটফর্মেই বার কর। বাইরেই বসা যাক—"

দিগন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। কে বলিবে সে একজন গণ্যমান্য প্রফেসার।

পরদিন সকালে গগনরা চলিয়া যাইবার দুই ঘণ্টা পরে কলিকাতার দিক হইতে যে ট্রেনটি সাহেবগঞ্জে আসিল সেই ট্রেন হইতে সূর্যসুন্দরের একমাত্র ভ্রাতা চন্দ্রসুন্দর অবতরণ করিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজগোপালবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে ব্রজগোপালবাবুকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তিনি যেমন শীর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি কালো; মাথার চুলগুলিও কাশফুলের মতো ধপধপে শাদা। বৃদ্ধ নন, অকালে চুল পাকিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর ট্রেন হইতে নামিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং খুশি হইলেন। ব্রজগোপাল আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন,

"আমার চিঠি পেয়েছিলি, তাহলে। তোর চুল যে বিলকুল শাদা হয়ে গেল রে, অ্যাঁ, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমার চুল এখনও পাকেনি যে রে সব। আমার জিনিসপত্তরগুলো নাবা। এই নে লিস্ট—।" সুদৃশ্য কাপড়ের-তৈরি মনি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া সেটি ব্রজগোপালের হাতে দিলেন। তাহার পর ব্যাগটি তুলিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, "এটি আমার এক নাতনী, মানে ছাত্রের মেয়ে—আমাকে করে দিয়েছে। আর একটু 'সোবার' হলে ভাল হত, না?" ব্রজগোপাল গম্ভীর লোক, একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও মন্তব্য করিলেন না। তিনি ট্রেনে উঠিয়া গেলেন এবং লিস্ট মিলাইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রসুন্দর শিক্ষক, সারাজীবন নানাস্থানে, নানাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা নানাপদে অধিষ্ঠিত আছে। অনেক শিক্ষকেরই আছে, কিন্তু চন্দ্রসুন্দরের বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পারিবারিক খবর তো রাখেনই, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেকের চাকুরিও করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার কৃতী এবং পদস্থ ছাত্রেরও অভাব নাই, তাহাদের উপর প্রভাবও তাঁহার যথেষ্ট। আর একটি ক্ষেত্রেও চন্দ্রসুন্দর প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সনাতন-পন্থী গোঁড়া হিন্দু, সনাতন-পন্থীরা তাঁহাকে খুব খাতির করেন। ব্রহ্ম-ধর্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে হিন্দুসম্প্রদায়ের একদা উদ্ভব হইয়াছিল, একদা যাঁহারা হিন্দুদের প্রতিটি আচরণ, এমনকি কুসংস্কারও, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় সমর্থন করিবার প্রয়াস করিতেন, চন্দ্রসুন্দব সেই দলের লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণের টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কন্ডাকটার, সূর্যগ্রহণের সময় হাঁড়ির ভিতর রোগের বীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইতেছিলেন তখন চন্দ্রসুন্দর কলেজের ছাত্র। অনেকেই বিবেকানন্দের পদধুলি লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, চন্দ্রসুন্দর কিন্তু সুযোগ পাইয়াও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ববোধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। হউন বিবেকানন্দ, কিন্তু কায়স্থ তো। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কায়স্থের পদধূলি কেন লইবেন তিনি? বার তিনেক ফার্স্ট আর্টস (সেকালে আই, এ বা আই, এস-সি ছিল না) ফেল করিয়া অবশেষে তিনি স্কুল মাস্টারি গ্রহণ করেন। ধর্ম বিষয়ে বরাবরই তিনি গোঁড়া। ছাত্রজীবনেই মাছ-মাংস ছাড়িয়াছিলেন, দুইবেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করেন। একাধিক গুরুর নিকট দীক্ষাও লইয়াছেন। সুতরাং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, এক্ষেত্রে বেশ প্রভাবও আছে। অনেক জায়গায় তাঁহার গুরু-ভাই আছেন, কেহ নগণ্য, কেহ কেহ মান্যগণ্য। এই ম্লেচ্ছাভাবাপন্ন যুগে তিনি হিন্দুদের আচার-বিচার কঠোরভাবে মানিয়া চলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করে। এই সব কারণে যখন তিনি কোন তীর্থস্থানে বা গুরু-ভ্রাতার নিকট যান—তখন পথে-নিবার্য কোন কষ্ট-ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। খানকতক পোস্টকার্ড সময় মতো লিখিয়া পোস্ট করিয়া দিলেই হইল। হয় কোনও ছাত্র, না হয় কোনও গুরু-ভাই তাঁহার পথ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেনই। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজার হালে আসিয়াছেন। জলিল বলিয়া তাঁহার একটি মুসলমান ছাত্র হাওড়ায় টিকিট কলেকটার। দাদার অসুখের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তিনি তাহাকে, ব্রজগোপালকে এবং নরেশকে পত্র দিয়াছিলেন। জলিল

স্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং পূর্ব হইতেই তাঁহার জন্য একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিল এবং যে টিকিট চেকারটি ট্রেনে যাইতেছিল তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল—সে যেন পথে মাস্টার-মশাইয়ের খোঁজখবর লয়। নরেশ রামপুরহাটে থাকে। সে রাত্রি তিনটার সময় আসিয়া তাঁহাকে শুদ্ধাচারে প্রস্তুত বাড়ির চা খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ব্রজগোপালের তত্ত্বাবধানে আসিয়া চন্দ্রসুন্দর নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজগোপাল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তাহার বাধ্য ছাত্রও অনেক আছে নিশ্চয়, তাহাদের অসঙ্কোচে ফাইফরমাস করা চলিবে। হাতের কাছে ফাইফরমাস করিবার লোক না থাকিলে চন্দ্রসুন্দর অস্বস্তিবোধ করেন। ফাইফরমাস করিয়া করিয়া তিনি তাঁহার দুই পুত্র কার্তিক-গণেশেব মাথা খাইয়াছেন। যতদিন নাবালক অবস্থায় তাহারা তাঁহার কাছে ছিল, ততদিন বালক-ভৃত্যের মতো তাহারা তাঁহার ফরমাস খাটিয়াছে। পড়া করিবার সময় তিনি তাহাদের ফরমাসের পর ফরমাস করিয়া পড়িতে দিতেন না। তাঁহাব স্বভাবটা ছিল বিলাসী, কিন্তু চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে দুইটিকেই সব করিতে হইত। করিতে হইত, কাবণ বাল্যকাল হইতে পরিবারের সকলের মনে একটা ধাবণা হইয়া গিয়াছিল, 'চন্দরের শরীরটা ভাল নয়'। চন্দ্রসুন্দরের দিদিমাই এই ধারণাটি তাঁহার শৈশবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার না কি স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে। মাথা ঘোরে, হাত-পা ঝিন ঝিন করে, মাঝে মাঝে হাত-পা অসাড়ও হইয়া যায়, অকস্মাৎ সারা গায়ে আমবাত বাহিব হইয়া পড়ে। তাঁহার এক গুরু-ভাই কবিরাজী করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের মধ্যে যে সাম্যভাব থাকিলে শরীর ভাল থাকে চন্দ্রবাবুর তাহা নাই। সেইজন্য কখনও বায়ু, কখনও পিত্ত, কখনও কফ মাথা চাড়া দিয়া তাঁহাকে বিব্রত করে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে তাই সর্দি হয়, একটু গরমেই সর্বাঙ্গে ফোড়া বাহির হইয়া পড়ে। কার্তিক-গণেশকে এই সব অসুখের ধাক্কাই প্রধানত সামলাইতে হইয়াছে। চন্দ্রসুন্দরের পত্নী চিন্ময়ী বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বার বার সেঁক দেওয়া, ক্রমাগত বসিয়া পাখা করা বা পা টেপা—এ সব কার্যে তিনি তত অভ্যস্ত ছিলেন না। ছেলেরাই বাবার সেবা করিত। চন্দ্রসুন্দরের একটিমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহাকে তিনি দশ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। জামাতার মধ্যে যে গুণটি তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে ত্রিসন্ধ্যা করিত, নিরামিষাশী ছিল, বেশ বড় একটি শিখাও ছিল তাহার। চন্দ্রসুন্দব ফার্স্ট আর্টস পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেতন বেশি পাইতেন না। তাই যেখানেই একটু বেশি বেতনের সন্ধান পাইতেন সেইখানেই দরখাস্ত করিতেন। এইভবে বহু স্কুলে তিনি চাকুরি করিয়াছেন। পত্নী চিন্ময়ী এই অর্থকৃচ্ছ্রতা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি অধিকাংশ সময়ে পিতৃগৃহে থাকিতেন। অগ্রজ সূর্যসুন্দরের সহিত নানাকারণে তিনি একত্র থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে তাঁহার মতের মিল ছিল না। নিজের মতবাদকে দাদার গৃহস্থালীতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার দক্ষতা বা কৌশলও তাঁহার ছিল না। যখনই সে চেষ্টা করিতে যাইতেন, তাহা কলহের মতো দেখাইত। আপোস করিয়া থাকিবার মতো সহনশীল মনোভাবও ছিল না তাঁহার। ইহার প্রধান কারণ বোধহয় সূর্যসুন্দরকে ঠিক তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। দাদাই

তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, বার বার ফেল করা সত্ত্বেও তাঁহার পড়ার খরচ যোগাইয়াছেন—একথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সূর্যসুন্দরের চেষ্টাতেই প্রথমে তাঁহার মাস্টারি এবং তাহার পর পোস্টাফিসের একটি চাকরি জুটিয়াছিল, যদিও এই শেষোক্ত চাকরিটি তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই; পারিলে হয়তো তাঁহার উন্নতি হইত এবং এত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকিত না। অর্থাভাবে পড়িলে সূর্যসুন্দরই বরাবর তাঁহাকে টাকা যোগাইয়াছেন। তাই সূর্যসুন্দরকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত মনে মনে দাদাকে তিনি শ্রদ্ধাই করিতেন, ভয়ও করিতেন খুব। কখনও তাঁহার মুখের উপর প্রত্যুত্তর দিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যদিও দাদার আর্থিক উন্নতি এবং প্রবল প্রতিপত্তি তাঁহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিত, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে এমন একটা নিগূঢ় বন্ধন ছিল যে দাদার অসুখের সংবাদ পাইয়াই তিনি সুদুর উড়িষ্যা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনের নেপথ্যে একটা অনুতাপের মেঘ জমিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি দাদার সহিত ঠিক আদর্শ অনুজোচিত ব্যবহার করেন নাই। এজন্য দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—একথাও তাঁহার মনে হইতেছিল, কিন্তু কিভাবে তাহা যে করা সম্ভব তাহাও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কুমারের টেলিগ্রামটা পাইয়া প্রথমে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর ঠিক করিলেন—যাইতে হইবে, যত কষ্ট, যত অসুবিধাই হউক—যাইতে হইবে। দ্বিতীয়বার ফার্স্ট আর্টস ফেল করার পর দাদা তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহর খানিকটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—'টাকার জন্য তুমি ভাবিও না। আমি টাকার অভাবে ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তোমার মনে সে ক্ষোভ যেন না থাকে। ফেল হইয়াছ তাহাতে দমিয়া যাইও না। ভাল করিয়া আবার পড়, আগামী বারে নিশ্চয় পাস করিবে।" কার্তিক-গণেশকে খবর দিয়া এবং ছাত্রদের পোস্টকার্ড লিখিয়া তিনি ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলেন। কার্তিক-গণেশ কেহই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিতে পারে নাই। কার্তিককে তাঁহার এক গুরু-ভাই রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। গণেশও তাঁহার এক বড়লোক ছাত্রের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিতেছে। পত্নী চিন্ময়ী এবং কন্যা-জামাতাকেও তিনি একটি করিয়া পেস্টকার্ড লিখিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাহারা যে আসিবে সে ভরসা তাঁহার নাই।

ব্রজগোপালবাবু জিনিসপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইয়া পুনরায় গণিয়া দেখিলেন, পুনরায় গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বাংকের উপর, বেঞ্চের নীচে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু লিস্টে লিখিত একটি ছোট পুঁটুলি পাওয়া গেল না। তিনি তখন চন্দ্রসুন্দরের নিকট গিয়া বলিলেন, "একটি পুঁটলি ছাড়া আর সব জিনিস পেয়েছি। নামিয়ে রেখেছি সেগুলি—"

"পুঁটুলিটা নেই? নরেশ তাহালে তুলে দিতে ভুলে গেছে। নরেশ ভোরবেলা রামপুরহাটে আমার জন্যে চা এনেছিল। পুঁটুলিতে নিমকি ছিল কিছু। পুঁটুলি নিয়ে নরেশ বললে—ওয়েটিং রুমে চলুন। সেখানেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল সে। গায়ত্রীটা জপে নিয়ে সেইখানে বসেই নিমকি দিয়ে চা খেলুম। তাড়াতাড়িতে বোধহয় পুঁটুলিটা তুলে দেয়নি। চিরকালের ভুলো তো নরেশটা। যাক গে। চল তাহলে এবার। তোমার বাসাটা কত দূর—"

"কুলি পাড়ায়।"

"ও, তাহলে তো কাছেই।"

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় আর এক সমস্যার উদ্ভব হইল।

"কাকাবাবু, কাকাবাবু—"

ডাক শুনিয়া চন্দ্রসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, একটি মোটাসোটা ফরসা মহিলা তাঁহার দিকে হাসিমুখে আগাইয়া আসিতেছে। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী উষাকে তিনি প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই।

উষা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পেরেছেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে পারেননি, আমি উষা।"

চন্দ্রসুন্দর বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আরে, সত্যিই আমি চিনতে পারিনি।"

"বাবার কিছু খবর পেয়েছেন?"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি, নতুন কোন খবর তো জানি না।"

"আমরাও টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। সন্ধ্যাও এসেছে।"

"ও!"

উষা ঘাড় ফিরাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই তিন সরে আয় ওখান থেকে। গাড়ির নীচে কি দেখছিস। ছোটদাদুকে প্রণাম কর এসে। দাদাদের ডেকে নিয়ে আয়।"

উষার তিন ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়টির বয়স দশ, মেজটির আট, ছোটটির ছয়। নাম এক, দুই, তিন। তিনজনই হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরিয়া রহিয়াছে, তিনজনেরই চুল দশ আনা ছ' আনা করিয়া ছাঁটা—চন্দ্রসুন্দর এই জিনিসটিই লক্ষ্য করিলেন।

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাই, আপনি পরে আসুন। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আমার বাড়িটা চিনে বার করতে পারবেন কি?"

"তা পারব। কিন্তু—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।"

চন্দ্রসুন্দর ইতস্তত করিতে লাগিলেন। নিজের ভাইঝিদের স্টেশনে রাখিয়া আরামে থাকিবার জন্য ছাত্রের বাসায় চলিয়া যাওয়াটা যে একটু দৃষ্টি-কটু—এই ধারণাটা তাঁহাকে বাধা দিতেছিল।

ব্রজগোপালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আমার ছাত্র। তোরা তো প্ল্যাটফর্মে থাকবি, আমি এর বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাচ্ছি। পরে এসে দেখা করব এখন।"

উষা বলিল, "আমরা এখানকার এস. ডি. ওর বাংলোয় যাব। রঙ্গনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রঙ্গনাথের বিশেষ বন্ধু সে, একসঙ্গে বিলেতে ছিল।"

ব্রজগোপাল বলিল, "এস. ডি. ওর কার বাইরে এসেছে।—তিনিও এসেছেন।"

"রঙ্গনাথ কে?"

"সন্ধ্যার স্বামী। তুমি সব ভুলে গেছ কাকাবাবু। এই যে ওরা—"

স্লিপিংস্যুট-পরা রঙ্গনাথ এবং তাঁহার পিছু পিছু সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথ বেঁটে, শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুইটি বুদ্ধিদীপ্ত। সন্ধ্যা কালো, চোখে সোনার চশমা, মাথায় কাপড় নাই। কালো হইলে কি হয়, অপূর্ব সুন্দরী। তাহার পায়ে স্যান্ডেল, হাতে রিডার্স ডাইজেস্ট।

"—সন্ধ্যা, কাকাবাবুও যাচ্ছেন—"

সন্ধ্যা-রঙ্গনাথ উভয়েই প্রণাম করিল।

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

এস. ডি. ও সাহেব ভিড় ঠেলিয়া রঙ্গনাথের করমর্দন করিলেন।

"জিনিসপত্র নেবে গেছে সব? তোমার সদানন্দদা কোথায়?"

"ওই যে।"

উষার স্বামী সদানন্দ ভিড় বাঁচাইয়া একটু দূরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রোগা, লম্বা, ফরসা চেহারা। জুলফির চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। পরনে বাঙালী পোশাক। গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবি, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গলায় পাকানো চাদর, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম-শু। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় হীরার আংটি জ্বলজ্বল করিতেছে। তিনিও আসিয়া চন্দ্রসুন্দরকে প্রণাম করিলেন।

সদানন্দকে চন্দ্রসুন্দর চিনিতে পারিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্বে সম্প্রতি দুই-একবার দেখা হইয়াছিল।

"এবার চলুন যাওয়া যাক, আমার স্কুলের না হলে দেরি হয়ে যাব।"

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল। আমি তাহলে চলি।"

ব্রজগোপালের সহিত চন্দ্রসুন্দর চলিয়া গেলেন। স্টেশনের বাহিরেই দেখিলেন এস. ডি. ও সাহেবের প্রকাণ্ড 'কার'টি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এস. ডি. ও কি জাত? ব্রাহ্মণ? চেহারাটা তো ব্রাহ্মণের মতো—"

"উনি হিন্দুই নন, মুসলমান।"

"রাধামাধব, রাধামাধব।"

অকারণে চন্দ্রসুন্দর 'থুঃ' বলিয়া নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অনেক প্রিয় মুসলমান ছাত্র আছে, অনেক মুসলমানের সহিত হৃদ্যতাও আছে, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলাই উচিত মনে করেন অথচ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা অসঙ্কোচে মুসলমানের বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে! তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মেয়ে আপত্তি করিত। এসব লেখা-পড়া শেখানোর ফল। দাদাকে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা তাঁহার বারণ শোনেন নাই, মেয়েদের কলেজেও পড়াইয়াছেন। জামাই দুইটিও বিলাতফেরত। উহারা যে মুসলমানদের বাড়িতে গিয়া খানা খাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল—ব্রজগোপাল যদিও চুপ করিয়া আছে কিন্তু সে বোধহয় মনে মনে হাসিতেছে। চন্দ্রসুন্দরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল তাহাকে বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও দাদা তাঁহার ছেলে-মেয়েদের মনে ম্লেচ্ছ মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি অনেক মানা করিয়াছিলেন, দাদা শোনেন নাই। মেয়েদের বেথুনে-লরেটোতে পড়াইয়াছেন, বিলাত-ফেরত জামাই করিয়াছেন। কিন্তু তখনই মনে হইল—মুমূর্ষু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কি ঠিক হইবে? চুপ করিয়া গেলেন।

ব্রজগোপালের বাসায় পৌঁছিয়া চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘরের লোক হইয়া গেলেন। ব্রজগোপালের স্ত্রীকে মা এবং তাঁহার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঠাকুরদা সম্পর্ক পাতাইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিলেন তিনি। ব্রজগোপাল যে ছাত্রজীবনে কতপ্রকার

দুষ্টামি করিত এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া যাইত, Circumnavigation শব্দটার প্রকৃত অ্যাক্সেন্টসম্মত উচ্চারণ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, এই সব গল্পে তিনি আসর গুলজার করিয়া ফেলিলেন। ব্রজগোপালের স্কুল ছিল, তাহার ছেলেমেয়েদেরও ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল কেবল ব্রজগোপালের ছোট ছেলে মটরু, (বয়স পাঁচ বছর, সবে হাতে খড়ি হইয়াছে) আর ব্রজগোপালের স্ত্রী শিপ্রা।

চন্দ্রসুন্দর শিপ্রার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও সকাল সকাল খাব মা। আমিও স্কুল-মাস্টার তো, নটার সময় খাওয়াই অভ্যাস বরাবর—"

শিপ্রা বলিল, "জানি তো। আপনি চান-টান করুন। ছানার ডালনাটা হয়ে গেলেই খেতে দেব আপনাকে।"

"ছানার ডালনা হচ্ছে না কি? বাঃ"

চন্দ্রসুন্দর মাছ-মাংস খান না বটে, কিন্তু সুখাদ্যের দিকে বেশ লোভ আছে।

"আমাকে একটু তেল দাও তাহলে।"

"কি তেল মাখেন?"

"গায়ে সরষের তেলই মাখি। মাথায় মাখি একটা কবরেজি তেল, সেটা আমার সঙ্গেই আছে। ওই কাঠের বাক্সটা খোল, ওর কোণের দিকে আছে।"

পৈতা হইতে একটি চাবি খুলিয়া শিপ্রার হাতে দিলেন। শিপ্রা কবিরাজী তেলের শিশিটি বাহির করিয়া দিল। তাহার পর একটা বাটিতে খানিকটা সর্ষপ তৈল আনিয়া ছোঁড়া চাকরটাকে বলিল, "মাখিয়ে দে বাবুকে—"

চন্দ্রসুন্দর বামহাতের তালুতে কবিরাজী তৈল ঢালিয়া লইয়া সেটি মাথায় ঘষিতে লাগিলেন। ঘষিতে ঘষিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি আধ-বোজা হইয়া অসিল। শিপ্রা রান্নাঘর হইতে আসিয়া একটি ছোট মোড়া আগাইয়া দিল।

"এইটেতে বসে তেল মাখুন। আমি রান্নাঘরে যাই; ঘি-টা চড়িয়ে এসেছি—"

"যাও"

শিপ্রা চলিয়া গেল। ছোঁড়া চাকরটা পায়ে তেল মালিশ করিতে লাগিল। মটরু একধারে দাঁড়াইয়া নূতন ঠাকুরদাটির দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

"এদিকে সরে এস দাদু। লিখতে শিখে গেছ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শিখিয়াছে।

"আচ্ছা। কি কি শিখেছ—বল দেখি—"

"অ, আ আর ই—"

মটরু ঘাড়টি কাৎ করিয়া মুখের মধ্যে বামহস্তের তর্জনীটি পুরিল এবং মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বাস, ওই পর্যন্ত? ঈ?"

"ওটা বড্ড শক্ত। ঠিক হয় না।"

"হতেই হবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ছিঃ মুখে আঙুল দিতে নেই। আচ্ছা ওই তিনটে আগে লিখে দেখাও দিকি আমাকে।"

মটরু একছুটে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরে শ্লেটে আঁকা-বাঁকা করিয়া অ-আ-ই লিখিয়া আনিল।

"বাঃ, এ তো চমৎকার হয়েছে। একেবারে মুক্তাক্ষর দেখছি। হ্রস্ব-ইটার ল্যাজটা একটু ছোট হয়েছে যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চান করে উঠে ঠিক করে দিচ্ছি সব। ঈ-টা যদি ভাল করে লিখতে পার তাহলে মজার জিনিস খেতে দেব একটা।"

"কি?"

"চুরণ"

"চুরণ কি? লবেনচুস?"

"না। তার চেয়েও ভালো"

চন্দ্রসুন্দরের কাছে সুলেমনি লবণ, লেবুর রস এবং অন্যান্য জারক মশলা-যুক্ত একপ্রকার মুখরোচক কবিরাজী চূর্ণ কৌটা ভরতি সর্বদা থাকে। বিহারীরা ইহাকে 'চুরণ' বলে। তাঁহার এক বিহারী কবিরাজ গুরুভাই তাঁহাকে নিয়মিত এই 'চুরণ' সরবরাহ করেন। ঔষধটি পাচক, কিন্তু ইহার প্রধান গুণ ইহা খাইতে চমৎকার। চন্দ্রসুন্দর আবিষ্কার করিয়াছেন ছোট ছোট শিশুদের আকর্ষণ করিবার শক্তিও ইহার যথেষ্ট। চন্দ্রসুন্দর তাই প্রায় ইহাকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করেন।.....ছোঁড়া চাকরটি পা দুইটি শেষ করিয়া পিঠে তেল মালিশ করিতে যাইতেছিল, চন্দ্রসুন্দর বাধা দিলেন।

"পিঠে দুটো ছোট ছোট ফোড়া হয়েছে, ওখানে তেল লাগিও না। বউমা—"

শিপ্রা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"বাড়িতে চন্দন-পিঁড়ে আছে নিশ্চয়?"

"আছে।"

"আর গোল-মরিচ?"

"তা-ও আছে।"

"তাহলে খাওয়ার পর একটা ওষুধ করে দিও মা। চন্দন-পিঁড়িতে একটু গঙ্গাজল দিয়ে কয়েকটা গোল-মরিচ ঘষে ঘষে দিলে একটা ক্বাথ মতন হবে। সেইটে আমার ফোড়া দুটোতে লাগিয়ে দেব। গোড়ায় গোড়ায় দিলে খুব উপকার হয়—"

শিপ্রা বলিল, "বেশ তো, করে দেব।"

চন্দ্রসুন্দর আসিয়া বলিলেন, "A stitch in time saves nine। মায়ের ইংরেজি পড়াশোনা আছে তো?"

"কিছু আছে।"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল সে। পুরা খবরটা বলিল না। সে বি. এ. পাস।

আহারাদির পর পিঠের ব্রণ দুইটিতে গোলমরিচের মলম লাগাইয়া চন্দ্রসুন্দর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া লইলেন। ঘুমাইবার পূর্বেই তিনি মটরুকে ঈ লিখিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মটরু কোথা?"

"পাড়ায় খেলতে গেছে।"

"খুব ব্রাইট বয়।"

তাহার পর পকেট হইতে নিকেলের ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখিলেন তিনটা বাজিয়াছে।

"ব্রজ ক'টা নাগাদ ফেরে—"

"পাঁচটা। কোন কোন দিন সাড়ে পাঁচটাও হয়ে যায়।"

"এত দেরি হয় কেন?"

"স্কুলের কাছেই বোসবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। আপনাকে চা করে দি—"

"আমি একটু বেরুচ্ছি, এসে খাব"

চন্দ্রসুন্দর জামাটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ হইতে একটি মতলব তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। দাদার জামাইয়ের সঙ্গে এখানকার এস. ডি. ও সাহেবের যখন এত বন্ধুত্ব, তখন তাঁহার ছোট ছেলের একটা ভাল চাকরি কি তিনি করিয়া দিতে পারেন না? ছেলেটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কাছে-পিঠে কোন ডাক্তার পর্যন্ত নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে এবং দু'একজন পুলিশ কনেস্টবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তিনি এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সম্মুখীন হইলেন। প্রথমেই একটি গেট। গেটের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর বারান্দা পর্যন্ত গিয়াছে। বারান্দার উপর ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর বাঁধা। বারান্দার অপর প্রান্তে সুদৃশ্য একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে। এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী না কি? চন্দ্রসুন্দর চশমাটা বাহির করিয়া পরিলেন। তবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। গেটের ভিতর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটাকে ধমক দিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চন্দ্রসুন্দরের দিকে আগাইয়া আসল।

"কাকাবাবু, আসুন।"

চন্দ্রসুন্দর যাহাকে এস. ডি. ওর স্ত্রী ভাবিয়াছিলেন সে সন্ধ্যা। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

"কুকুরটা কিছু বলবে না তো?"

"বাঁধা আছে। আপনি কি ওয়েটিং রুমেই আছেন?"

চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক ছাত্রের বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছেন। কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই ছাত্রটির বাসাতেই আছি। ওরা ছাড়লে না কিছুতে। এরা সব কোথা—?"

"উত্তর দিকের বারান্দায় গল্প করছে সব।"

"তুমি এখানে একা কেন?"

সন্ধ্যার মুখমণ্ডলে একটা লজ্জার আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"আমি প্রুফ দেখছি।"

"কিসের প্রুফ"

"দৃশদ্বতী বলে আমি একখানা মাসিকপত্র বার করি। তার প্রুফ।"

"তাই না কি। বাঃ। আমি তো কিছুই জানতাম না।"

"বসুন।"

চন্দ্রসুন্দরকে একটি চেয়ারে বসাইয়া কুকুরটাকে আর একবার ধমকাইয়া সন্ধ্যা ভিতরের

দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিল সে, তাহার হাতে দুইখানি দৃশদ্বতী। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রচ্ছদপটে একটি প্রস্তরাকীর্ণ নদীর ছবি রহিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর যদিও খুশি হইবার ভান করিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন একটু। দৃশদ্বতী শব্দটির অর্থ তাঁহার জানা ছিল না। একটি প্রবন্ধের শিরোনামাও তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। প্রবন্ধটির নাম—"তথা-কথিত সতীত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি।" তৃতীয়ত মনে পড়িল, সন্ধ্যা এম. এ. পাস, তিনি এফ. এ. ফেল।

"পড়ে দেখব'খন। ওদের খবর দিয়েছিস?"

"না। আপনিই চলুন না ওধারে। মিস্টার রহমন্ লোক খুব ভালো"

"তোদের খাতির করে খুব। না?"

"ওঁর সঙ্গে তো খুব বন্ধুত্ব।"

"গণেশটা বাঁকড়ো জেলার অজ পাড়া-গাঁয়ে পড়ে আছে। রহমন সাহেবকে বলে ওর যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস।"

"বলব ওঁকে। গণেশ কতদূর পড়েছে।"

"ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি। উপর্যুপরি অসুখ, দু'বছর পরীক্ষাই দিতে পারলে না।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার।"

"টাইপ করতে পারে?"

"না। শেখবার সুযোগই পায়নি।"

সন্ধ্যা আর কোন প্রশ্ন করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"বলিস একটু বুঝলি। তুই বললে কাজ হবে।"

"আমি মিস্টার রহমনকে বলতে পারব না। তবে ওঁকে বলব। ওঁর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব।"

"তা যা ভাল বুঝিস করিস। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—"

"চলুন না, আপনার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই রহমন সাহেবের। আলাপ হলে দেখবেন খুব ভালো লোক।"

"না থাক। দরকার হয়তো পরে দেখা করব আমি। শিপ্রা হয়তো চা করে বসে আছে আমার জন্যে। আমি যাই এবার।"

"শিপ্রা কে?"

"আমার ছাত্রের বউ। ভারী ভালো মেয়েটি।"

চন্দ্রসুন্দর উঠিয়া পড়িলেন।

"স্টেশনে দেখা হবে আবার। এখন চলি।"

গেট হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রসুন্দর নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ বোধ করিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর স্টেশনে আসিয়া পড়িলেন। গাছের তলায় একটা ফলওয়ালা কমলালেবু, বেদানা, খেজুর প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল দাদার জন্য এক টাকার কমলালেবু কিনিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানে কালো-কোট-পরা একটি বেঁটে লোকও তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফল কিনিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাঁহার পিঠটা দেখিতে পান নাই। ভদ্রলোক মুখ ফিরাইতে চিনিতে পারিলেন।

"আরে হাবুমামা যে!"

হাবুমামা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মুখের ভিতর হইতে বাঁধানো দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "চন্দর! সকালের ট্রেনে এসেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ। দাঁতটা খুললে কেন?"

"নতুন করিয়েছি। মুখে থাকলে ভালো করে কথা বলতে পারি না। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে বুঝি।"

"তুমি কোন ট্রেনে এলে।"

"এখনি এলাম একটা মালগাড়িতে।"

"মালগাড়িতে?"

"হ্যাঁ, চেনা গার্ড ছিল। তুমিও চেন তাকে। নরেনবাবুর ছেলে ক্যাবলা। ভাগনা কেমন আছে?"

"দাদার অসুখের খবর তুমি পেলে কি করে? কুমার কি তোমাকেও টেলিগ্রাম করেছিল?"

"না। ওরা তো আমাব ঠিকানা জানত না। আমি বোলপুরে যোগেনের কাছে শুনলাম। এসে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। খবর পেলাম একটু পরেই একটা মালগাড়ি ছাড়ছে, আর ক্যাবলা তার গার্ড। তার সঙ্গেই চলে এলাম। ভাগনার কি খবর বল তো?"

"টেলিগ্রামে অসুখের খবর পেয়েছিলাম। আর তো কিছুই জানি না।"

হাবুমামা পকেট হইতে ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া দাঁতের পাটি দুইটি তাহাতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন।

"দাঁত বাঁধালে কবে?"

"মাসখানেক হল। মাড়িব ঘা এখনও শুকোয়নি।"

"কৌটায় পুরছ কেন?"

"অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল—গল্প করতে হবে তো। বললুম তো, দাঁত পরলে কথা বলতে পারি না, মনে হয় এখুনি পড়ে যাবে। খেতেও পারি না ও দিয়ে। অনিলার জেদে করাতে হয়েছে। জলে গেছে কতকগুলো টাকা অনর্থক।"

"অনর্থক কেন। ভালো করে চিবিয়ে খেতে পারবে, ভালো হজম হবে।"

"আমি এমনিতেই বেশ চিবিয়ে খেতে পারি, হজমও খুব হয়। আমার মাড়ির জোর খুব আছে। তোমার আঙুলটা আমার মুখে পুরে দাও না, কুট করে কেটে নেব।"

চন্দ্রসুন্দর হাসিলেন।

"এখনও মাংস-টাংস চালাচ্ছ না কি?"

"খুব। তবে পাই না, যা দাম আজকাল। পুজোতেও আজকাল লাউ-কুমড়ো বলি দিচ্ছে।"

"লেবু কিনলে না কি?"

"হ্যাঁ, অসুখের বাড়িতে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে নিলাম।"

"দুজনে তো একসঙ্গেই যাচ্ছি, তাহলে আমার আর আলাদা করে কিছু নেবার দরকার নেই, কি বল। একসঙ্গে কতকগুলো নিলে আবার পচে যাবে হয় তো।"

হাবুমামা কোনও উত্তর দিলেন না। নাক দিয়া সশব্দে একবার নিঃশ্বাস টানিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ।

"দাদার মেয়ে-জামাইরাও এসেছে। তারা এস. ডি. ওর ওখানে আছে।"

"হ্যাঁ, তা তো থাকবেই। এক ক্লাসের ইয়ার নিশ্চয়।"

হাবুমামা মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইলেন।

"তুমি আজকাল রেলে চাকরি করছ না কি মামা"?

"না। হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন তোমার? ও, এই কোটটা। এটা ক্যাবলার। গার্ড গাড়িতে এলুম কিনা। ক্যাবলা বললে তুমি এই কোটটা পরে থাক, কেউ যদি দেখতে পায় ভাববে তুমিও বুঝি রেলের লোক। আজকাল কেউ 'চুগলি' করলেই তো চাকরটি যাবে। চুগলি-খোরের অভাবও নেই। চল—"

"কোথা যাবে তুমি?"

"ক্যাবলার বাড়ি। তার কোটটা তাকে দিয়ে যেতে হবে।"

"আমিও ওই পাড়াতেই উঠেছি এক ছাত্রের বাড়ি।"

"চল তাহলে।"

উভয়ে কুলি-পাড়ার দিকে অগ্রসর হইল।

।। পাঁচ।।

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম হইতে লাগিল। দশ-বিশ ক্রোশ দূরের লোকেরাও আসিয়া হাজির হইল। কেহ পালকি করিয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ গো-শকটে, কেহ বা পদব্রজে। কেহ খবর লইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা রহিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা বলিয়া গেল শীঘ্রই আবার আসিবে। রাধানাথ গোপ যে চালাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বাহিরের লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। কুমার ভাবিতে লাগিল আরও করাইবে কি না। তাঁবুগুলি বাড়ির লোকেরা দখল করিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনরা এখনও সকলে আসিয়া পৌঁছায় নাই। সূর্যসুন্দরের মেজ এবং সেজ ছেলে আসেন নাই এখনও। মেজ ছেলে পৃথ্বীশ আসিবেন কিনা তাহা অনিশ্চিত। সেজ ছেলে উশনাও দূরে থাকেন। অনেক সময় তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হয়। তিনি কন্ট্রাকটারি করেন, কখন যে কোথায় তাঁহার কাজ থাকে তাহা এখান হইতে সব সময় নির্ণয় করা যায় না। কুমার মাসখানেক পূর্বে নাগপুর হইতে তাঁহার চিঠি পাইয়াছিল। সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করিয়াছে। তিনি ঠিক আসিয়া পৌঁছিবেন, হয়তো একটু দেরি হইবে। কিন্তু মেজদা আসিবেন কি না ঠিক নাই। বহুদিন পূর্বে তিনি বিবাগী হইয়া গিয়াছেন, মাঝে মাঝে কুমারকে চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু তখন হইতে আর বাড়ি আসেন নাই। সূর্যসুন্দর তাঁহার সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ না করিলেও কুমার বুঝিতে পারিতেছিল মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমারের নিকট তাঁহার যে ঠিকানাটা ছিল সেই ঠিকানাতেই সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনও খবর আসে নাই। সেজদা সপরিবারে আসিবেন; গগনের শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও আসিবেন খবর আসিয়াছে। আরও আত্মীয়-স্বজন আসিবে। কিন্তু বাড়িতে আর স্থান কই? ইহার উপর আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সূর্যসুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে গগনের বউয়ের সাধ দিতে হইবে। সুতরাং আরও জনসমাগম অনিবার্য। কুমার অগ্রসর হইয়া

দেখিল রাধানাথবাবু নাই। তিনি জনমজুরদের বলিয়া গিয়াছেন, আরও একটি বড় গোছের আট-চালা প্রস্তুত করিতে। এটি প্রস্তুত করিলে আপাতত আর কিছু করিবার থাকিবে না। যদি প্রয়োজন হয় পরে দেখা যাইবে। বাঁশ-খড়ও ফুরাইয়া গিয়াছিল। কুমার ঠিক করিল আরও কিছু বাঁশ-খড় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কুমার দেখিতে পাইল গঙ্গা আসিতেছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে কিছু পূর্বে পুরসুন্দরীর নিকট হইতে একটি ফর্দ লইয়া বাজারে গিয়াছিল। জামাইরা আসিয়াছে, পুরসুন্দরী পোলাও-মাংসের আয়োজন করিতেছেন।

গঙ্গা নিকটে আসিতেই কুমার প্রশ্ন করিল, "কি হল?"

"এখানে যা কিশমিশ রয়েছে তাতে চলবে না। জাফরান কি আলুবোখরা তো পাওয়াই গেল না। যুগলের দোকান কি একটা দোকান! ভালো লবেঞ্চুস পর্যন্ত নেই। ভেবেছিলাম উষার ছেলেদের জন্য আনব কিছু।"

"কি হবে তাহলে?"

"আমাকে কাটিহারে দৌড়তে হবে, দেড়টার ট্রেনে চলে যাই। সাধের জন্যে কি কি লাগবে তার ফর্দটাও পেলে একসঙ্গে সব কিনে আনতাম।"

"বাবা এখন এসব হাঙ্গামা না করলেই পারতেন।"

"বাঃ, বউমার সাধ দেবেন না, বলিস কি তুই! হাঙ্গামা আবার কি। কাটিহার থেকে ঠাকুর আনলেই চলবে। বউদি একা কতদিক সামলাবেন। উর্মিলা তো বাবার কাছেই রাতদিন বসে আছে, আর থাকতেই হবে। হ্যাঁ আর একটা সুখবর আছে—"

"কি?"

"নিখিলবাবু আর তাঁর স্ত্রী আজ সকালের ট্রেনে এসে গেছেন। এখুনি আসবেন তাঁরা। নিখিলবাবু যদি সাধের ভারটা নিয়ে নেন তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না।"

"আচ্ছা, রাধানাথবাবু কোথা গেলেন বল তো?"

"নিখিলবাবুর কাছেই গেছেন বোধহয়। কুঠির দিকেই তো যেতে দেখলাম। একটু খোশামোদ করতে গেছেন আর কি।"

"যাঃ! উনি শুধু শুধু নিখিলবাবুর খোশামোদ করবেন কেন।"

"কেন আর, স্বভাব।"

মুচকি হাসিয়া গঙ্গা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কুমার তাহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

সূর্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমার দেখিল, বাবাকে কেন্দ্র করিয়া মেঝেতে বেশ একটি সভা বসিয়াছে। কাকাবাবু গীতাপাঠ করিতেছেন। চন্দ্রসুন্দরের ধারণা হইয়াছে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর ইহাই একমাত্র পথেয়। সূর্যসুন্দর পাথেয় লইতে আপত্তি করেন নাই, চন্দ্রসুন্দরের আত্মতৃপ্তির জন্যই সম্ভবত তিনি রাজি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি শর্ত করিয়াছেন, একেবারে যেন পাঁচটি শ্লোকের বেশি পড়া না হয়। এক সঙ্গে বেশি পড়িলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, তা ছাড়া সকলের হয়তো ভালও লাগিবে না। উর্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া চুল কুরিয়া দিতেছিল, চম্পা বসিয়াছিল পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায় হাত বুলাইতেছিল সে। মেঝেতে কম্বলের উপর চন্দ্রসুন্দরের পাশে গলায় আঁচল দিয়া এবং হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল কিরণ। একটু দূরে উষা পান সাজিতেছিল। সন্ধ্যা আর একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িতেছিল

সেদিনকার খবরের কাগজটা। তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দিগন্তও তাহার পাশে বসিয়াছিল, সম্ভবত গীতাই শুনিতেছিল।

পশ্চিমদিকের প্রশস্ত বারান্দায় কুমার কয়েকটি চেয়ার, ক্যাম্প চেয়ার, তেপায়া, ছোট-টেবিল প্রভৃতি পাতাইয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গনাথ, গগন এবং গ্রামের আরও জনকয়েক যুবক সেখানে বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতেছিলেন। প্রচুর সিগারেট পুড়িতেছিল। সদানন্দ কোণের ছোট ঘরটায় বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন। গ্রামের নাপিত লোচন (তাহার গলায় গলগণ্ড এবং গলগণ্ডের উপর একট তুলসীর মালা) তাঁহাকে কামাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দ বলিয়াছেন তিনি নিজে কামানোই পছন্দ করেন। লোচন তবু যায় নাই। সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, জামাইবাবুদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া তবে যাইবে। কুমারের এইরূপই নির্দেশ। বিরুবাবু গিয়াছিলেন স্টেশনে। তাঁহার মেয়ে-জামাইরা কেহই আসিয়া পৌঁছায় নাই। কোথায় কি রকম ট্রেনের যোগাযোগ আছে, তাহারা কখন আসিয়া পৌঁছিতে পারে এইসব খবরাখবর করিতে তিনি গিয়াছিলেন। উষার ছেলে তিনটি, এক-দুই-তিনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। পার্বতী পুরসুন্দরীর সহকারিণীরূপে রান্নামহলের দিকে আছে এবং কয়েকটি বোকা চাকরের উপর তম্বি করিতেছে। তাহার ধমকে সন্ত্রস্ত হইয়া একটি চাকর উধর্বশ্বাসে মশলা পিষিতেছে, একটি কাপড় কাচিতেছে এবং আর একটি ইঁদারা হইতে জল তুলিতেছে। ঊর্মিলা সংসারের সমস্ত ভার বড়দির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং বড়দির দক্ষিণ-হস্ত পার্বতী যে এই বোকা-অথচ-পাজি চাকরগুলাকে দুই ধমকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে খুব খুশিও হইয়াছে। হাবু মামা বাহির বাড়িতে নূতন কম্পাভারটির সহিত আড্ডা জমাইয়াছেন। কম্পাউন্ডারটি যুবক। যুবকদের সহিত এবং কিশোরদের সহিতই হাবু মামার জমে ভাল। তিনি গীতার আসরে আসেন নাই। গঙ্গা একনজরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কুমার একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রসুন্দর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পড়িতেছিল—

যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।

যিনি বিশুদ্ধাত্মা কিনা শুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতাত্মা কিনা আত্মাকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি সংযত-দেহ, জিতেন্দ্রিয় কিনা যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কিনা সর্বভূতের আত্মাকে যিনি নিজের আত্মার মতো দর্শন করেন, যিনি যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগী, মানে নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি কুর্বন্ অপি মানে কাজ করেও, ন লিপ্যতে, কাজে লিপ্ত হন না।

চন্দ্রসুন্দর সহসা চম্পার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বউমা, বুঝতে পারছ তো? আই-এতে তোমার সংস্কৃত ছিল কি?"

চম্পা সলজ্জভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল।

দিগন্ত নিম্নকণ্ঠে বলিল, "বউদি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেছেন গেলবার। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন।"

"ও তাই না কি। তা তো জানতুম না....."

চন্দ্রসুন্দর চুপ করিয়া গেলেন।

পুনরায় তিনি গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর বাধা দিলেন।

"এখন আর থাক। এদের সঙ্গে একটু গল্প করি।"

চন্দ্রসুন্দর ইহাতে একটু মর্মাহত হইলেন। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। তাই বলিলেন, "আমি তাহলে আহ্নিকটা সেরে নিই গে। ওবেলা আবার হবে।"

তিনি গীতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

ঊষা একসঙ্গে দুই খিলি পান এবং খানিকটা কিমাম মুখে পুরিয়া গল্প করিবার জন্য সূর্যসুন্দরের বিছানায় আসিয়া বসিল। বসিয়াই বুঝিতে পারিল পিক্ ফেলিবার জন্য উঠিতে হইবে। পিক্ ফেলিয়া আসিয়া আবার বসিল। কুমার তখনও দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ঊষা বলিল, "তুইও ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বস না। দাঁড়িয়ে কেন। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয় বাপু।"

"তোমরা গল্প কর। আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে।"

কুমার বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাবার 'স্মৃতিকথা'টি লইয়া গেল।

"তোমার শরীর দুর্বল লাগছে না তো বাবা"—ঊষা জিজ্ঞাসা করিল।

"না। আমি বেশ ভাল আছি। তোদের সবাইকে দেখে আমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। যেতে তো হবেই এবার, তবু অসুখ হয়েছিল বলেই দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে, তা না হলে সবাইকে একসঙ্গে এমনভাবে পেতাম কি—"

সূর্যসুন্দর হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

কেন থামিলেন তাহা বুঝিতে ঊষার বিলম্ব হইল না।

"মেজদা-সেজদার কোন খবর এখনও আসেনি, নয়?"

"না। উশন্ আসবে। পৃথু কি করবে কে জানে"

"মেজদার খবর কি পাও কোনও—"

"কুমার মাঝে মাঝে চিঠি পায়। কুমার তাকে খবরও দিয়েছে।"

"মেজদা খবর পেলে আসবে ঠিক।"

সূর্যসুন্দর চুপ করিয়া রহিলেন।

সূর্যসুন্দরের অবস্থার সত্যই অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। মুখ-চোখের স্বাভাবিক রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অঙ্গের অবশ্য তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার নিজের কোনও অশান্তি বা উদ্বেগ ছিল না। ব্যাপারটাকে তিনি মানিয়াই লইয়াছিলেন।

ঊষার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই ডায়েট কনট্রোল করছিস শুনলাম। ওসব করতে যাসনি, দুর্বল হয়ে যাবি। আমাদের বংশে রোগা কেউ নেই। তোর মত যখন আমাব বয়স, তখন আমার ওজন ছিল আড়াই মণ। সাধারণ ঘোড়া আমাকে বইতে পারত না।"

"তোমাদের সে যুগই আলাদা ছিল। এখন যে সবাই ঠাট্টা করে। আমার দেওর আমার কি নাম রেখেছে জান? ফ্যাট ফ্যাক্টারি। এফ্ এফ্ বলে ডাকে। ওদের গুষ্টির সব ফড়িংয়ের মতো চেহারা। ওদের মধ্যে আমি হয়েছি বকোমধ্যে হংসযথা। প্রত্যেকটি জায়ের কাঠি-কাঠি চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। আর জান বাবা, সব্বাই আমার চেয়ে বেশি খায়। সেজ-জা তো তিনবার ভাত নেয়, অথচ ওই রোগা লিক্‌লিকে চেহারা—"

সন্ধ্যা খবরের কাগজের একটা অংশের উপর আঙুল বুলাইয়া তাহা দিগন্তকে দেখাইল।

দিগন্ত তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া পড়িতে লাগিল সেটা। সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে তাহার কানে কানে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না।

সূর্যসুন্দর উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ভাসুরপোর বিয়ে বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ। সে ক'দিন যে খাটুনি গেছে তা আর বলবার নয়। ঝি-চাকরের অভাব নেই, কিন্তু কেবল ঘুরতে ঘুরতেই কাবু হয়ে পড়েছিলাম আমি। যে দিকে না গেছি, অমনি একটা কাণ্ড হয়ে বসে আছে। পঞ্চাশটা ছোট ছেলেই জুটেছিল বাড়িতে, আর প্রত্যেকটি ছেলে বায়নাদার। খাও বললেই খাবে না, প্রত্যেকের পিছনে খাবার নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হবে। কুটুমের ছেলেদের বকা-ঝকাও যায় না। ওরি মধ্যে আবার শ্বশুরের, মামাশ্বশুরের আলাদা তত্ত্ব। শ্বশুর ঠিক কাঁটায়-কাটায় দশটার সময় খাবেন, চার-পাঁচ রকম নিরামিষ তরকারি চাই—ভাজাভুজি, সুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল—রোজ হওয়া চাই। আর মামা-শ্বশুরের আছে কলিক ব্যথা। তিনি ভাত-রুটি খাবেন না। কখনও ছানা, কখনও ফলের রস। বাড়িতে পুরোনো ঝি-চাকর সবই আছে, কিন্তু আমি নিজে না দাঁড়ালে ঠিকমতো কিচ্ছু হবে না। শাশুড়ি যখন ছিলেন তখন এসব করতেন। এখন তিনি নেই, সব ঝক্কি আমার উপর।"

"বউ কেমন হল?"

"ওই হয়েছে একরকম। ওরা তো সবাই বলছে সুন্দর-সুন্দর, আমার কিন্তু বাপু তেমন পছন্দ হয়নি। মানুষ নয় যেন পুতুল। কি রকম ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, সরু সরু হাত, মুখে একটা মেকি হাসি, প্রাণ নেই যেন। গায়ের রং ঠিক কি তা বোঝবার উপায় নেই, দিন-রাত পেন্টের উপরই আছে। তবে জিনিসপত্র দিয়েছে একটি কাঁড়ি, মায় রেডিও পর্যন্ত।"

সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাঁহার বাক্যবাগীশ কন্যাটির বাক্য-প্রবাহ উপভোগ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন উষার বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নাই। ছেলেবেলায় নিজের পুতুলের সহিতও সে ঠিক এইভাবে অজস্র কথা বলিত।

উষা উর্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "উর্মিলা, তুমি উঠে চান-টান করে এস না। আমি ততক্ষণ বাবার কাছে বসছি।"

উর্মিলা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মেজদির শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল।

"আমি বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে তবে যাব। সাড়ে আটটায় ফলের রস খাবেন।'

"সে আমি করে দেব এখন। তুমি চানটা সেরে এস। এর পর বাথরুম খালি পাবে না।"

উষা নিজে তখনও স্নান করে নাই। উর্মিলাকে সে তাড়া দিতেছিল, সন্ধ্যাকে তাড়া দিয়া পূর্বেই স্নান করাইয়াছে, কারণ নিজে যখন সে বাথরুমে ঢুকিবে তখন বেশ দেরি হইবে তাহার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে। তাই বাথরুমটা যাহাতে খালি থাকে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। দিদি-বউদির স্নান সকালেই হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও হইয়াছে, উর্মিলার হইয়া গেলেই সে বাথরুমটা দখল করিবে। স্নান সম্বন্ধে একটি বিশেষ পদ্ধতি সে তাহার ফয়জাবাদ-প্রবাসিনী পিস্‌শাশুড়ির কাছে শিখিয়াছে। তাহা অনুসরণ করিয়া ফলও পাইয়াছে। তাহার বুকে-পিঠে ছুলি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে। প্রথমে একটা চট্‌চটে কালো তেল মাখিতে হয়, হাকিমি তেল, বিশ্রী গন্ধ। তাহার পর সাবান দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সেটা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বেশ

সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহা ছাড়া আরও একটা কাজও সে করে, নিজের কাপড় সায়া ব্লাউস প্রভৃতি নিজের হাতে কাচিয়া আলাদা শুকাইতে দেয়। তাহার ধারণা নোংরা চাকরদের দিয়া কাপড় কাচাইয়াই তাহার উক্ত চর্ম-রোগটি হইয়াছিল।

ঊর্মিলা বেচারী কি করিবে, উঠিয়া গেল। ঊর্মিলা চলিয়া গেলে সন্ধ্যা দিদির দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিল একটু, হাসিয়া দিগন্তর কানে কানে চুপি চুপি কি বলিল।

"সন্ধ্যা কি বলছে রে দিগন্ত?"

দিগন্ত নিরীহ মুখভাব করিয়া বলিল, "হিন্দু কোডবিল নিয়ে আলোচনা করছি আমরা।"

"তাতে আমার দিকে চেয়ে সন্ধ্যার মুচকি হাসার কি আছে! জানো বাবা, সন্ধ্যাটার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে। কাগজের সম্পাদক হয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে!"

সন্ধ্যা আর একবার মুচকি হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, দিগন্তর সঙ্গে যেমন নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিল তেমনি করিতে লাগিল। ঊষা হয় তো আরও কিছু বলিত কিন্তু মিস বোস প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। মিস বোসের পুরা নাম অনুপমা বসু। সকলে তাহাকে অনু বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার তাহার জন্য আলাদা একটা ছোট তাঁবু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

অনু আসিয়া চম্পাকে বলিল, "বউদি, আসুন একটু আমার সঙ্গে এবার—"

চম্পা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন থাক—"

অনু দিগন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আগেই জানতাম, বউদি এখানে এসে আর কিছু করতে চাইবেন না। আজও ইউরিন রাখেননি—"

চম্পার নতমস্তক আরও নত হইয়া পড়িল।

"চলুন ব্লাড প্রেসারটা নিয়েনি। আমি কথা দিয়ে এসেছি ওঁদের রোজ রিপোর্ট পাঠাব। কাল পাঠানো হয়নি, আজও তাই হবে না কি। চলুন—"

চম্পার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় না রাগে ঠিক বোঝা গেল না।

সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল।

ঊষা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "গগনের শাশুড়ি দেখছি একটি মেয়ে দারোগা পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে!"

সন্ধ্যা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতেছিল, একথায় তাহার ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভালই করেছে। যা করা উচিত তা ঠিক ঠিক হবে। ও না এলে কিচ্ছু হত না।"

"ওসব না হলেও কিছু ক্ষতি হত না। আমাদের রোজ ব্লাড-প্রেসারও কেউ মাপেনি, পেচ্ছাপও কেউ দেখেনি, অথচ তিন তিনটে সুস্থ ছেলে বেশ নির্বিঘ্নেই হয়েছে। সকলেরই হচ্ছে। ওসব আদিখ্যেতা......"

দিগন্তর চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুক-মিশ্রিত শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। তাহার ভয় হইল দুই পিসিতে ঝগড়া না বাধিয়া যায়। সে সন্ধ্যাকে চুপি চুপি বলিল, "চল, ও ঘরে যাই—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বিজ্ঞানের রোজ কত উন্নতি হচ্ছে, যতটা সম্ভব তার সাহায্য নেওয়া উচিত বই কি। যার সামর্থ্য আছে সে কেন নেবে না—"

বাবার সমর্থন পাইয়া সন্ধ্যা তির্যক দৃষ্টিতে দিদির পানে একবার চাহিয়া তাহার পর পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্বে বিজয়িনীর মতো আর একবার উষার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—শুনলে তো!

উষা কিন্তু হারিবার মেয়ে নয়, সে পুনরায় বলিল, "বিজ্ঞান-টিজ্ঞান বুঝি না, ও সব আদিখ্যেতা। সব খরচ দাদাকেই দিতে হবে, গগনের শ্বশুর একটি আধলা দেবে না, দেখে নিও।"

এ আলোচনা কিন্তু আর অধিকক্ষণ চলিল না। ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু, আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখি।"

"দেখ।"

সূর্যসুন্দর মুখে আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—সেই আশাতেই তো আছি।

গগন নানারকম যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় তিনটি ক্যাম্প চেয়ারে তিন জামাই বসিয়াছিলেন। গ্রামের যে তিনটি যুবক আসিয়াছিল, যোগেন, রামপ্রসাদ এবং প্রিয়গোপাল, গগন উঠিয়া যাইবার পর তাহারাও একে একে উঠিয়া গেল। ইহারা তিনজনেই শিকারী। কৃষ্ণকান্তের মুখে শিকারের গল্প তাহারা পূর্বে শুনিয়াছিল, আশা ছিল এবারও তিনি কিছু শুনাইবেন কিন্তু সদানন্দ এবং রঙ্গনাথের সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত মুখ খুলিলেন না। বলিলেন, পরে শুনাইবেন। বিলাত-ফেরত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটু সভয় কৌতূহলও ছিল। তাঁহার ধারণা বিলাত-ফেরত মাত্রেই একটু চালিয়াত হয়, কখনও জ্ঞাতসারে—কখনও বা অজ্ঞাতসারে। স্বদেশবাসীদের, এমন কি স্বদেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদেরও তাহারা যেন একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখে। তাহাদের বিশ্বাস সাগরপারে গিয়া এবং একটা বিশেষ দেশে বা শহরে কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করিয়া তাহারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর জীবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুখে এ ভাবটা সকলে প্রকাশ করে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস মনে মনে ইহারা সকলেই একজাতের। তাই কৃষ্ণকান্ত নীরবে ইহাদের চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে দুই-একটি প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আসল মৎস্যটি ধরা পড়ে কি না। কৃষ্ণকান্ত একজন শিকারী, শিকারীসুলভ সাবধানতা সহকারে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন।

মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ কেমন লাগছে তোমাদের? সাহেব মানুষ তোমরা, অসুবিধা হওয়ারই কথা। আর এ একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তো—"

রঙ্গনাথ একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সকাল হইতেই একটি চীনা গল্প-সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু সদানন্দ যাহা বলিলেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি একটা মামুলি বিনয়-বচন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহা মামুলি বিনয়-বচন নহে। অহাতে একটা আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল, মেকি মনে হইল না।

সদানন্দ বলিলেন, "পাড়া-গাঁয়েই তো চিরকাল বাস করেছি ভাই। বিলাতে তো দিন-কতকের জন্যে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করবার জন্যে। যে কদিন ছিলাম অতি কষ্টেই ছিলাম।

বিলাতে গিয়েই প্রথম বুঝেছিলাম যে মুখে ওরা যত কেতা-দুরস্তই হোক না, ওটা বাইরের চাকচিক্য মাত্র, আমাদের ওরা কখনও আপন বলে ভাবতে পারে না। ওদের চোখে সবাই আমরা 'ব্রাউনি'। কি হে রঙ্গনাথ—"

রঙ্গনাথ আর একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আর আমাদের চোখে ওরা ফিরিঙ্গি—"

সদানন্দ এ উত্তর শুনিয়া দমিলেন না, ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ওদের যে আমরা ঘৃণা করি তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের দেশে ওরা লুটপাট করতে এসেছিল। ডাকাতদের সম্বন্ধে কারও সম্ভ্রম থাকতে পারে না।"

রঙ্গনাথ আর একবার হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে একটা উত্তর আসিয়াছিল—মারাঠা দস্যুরাও আমাদের দেশকে এই কিছুদিন আগেই তছনচ্ করিয়াছিল, বর্গীদের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের যে ঘুমপাড়ানি ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মারাঠা বীরদের নাম আমরা সগর্বে উচ্চারণ করি না কি? ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহা সত্যই ভালো তাহা স্বীকার করিতে ক্ষতি কি। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। তর্কটা তিনি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতে চান।

সদানন্দ কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা সার বুঝেছি স্বদেশকে ভালবেসেই আনন্দ বেশি। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল, তা ছাড়া পুরোপুরি স্বদেশী না হতে পারলে আমরা বাঁচতেও পারবো না। পরের দ্বারে হাত পেতে কতদিন চলবে। স্বদেশী হবার জন্যে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয় তা-ও করতে হবে—"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় রঙ্গনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেদিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটাইয়া পুস্তকের দিকেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন—এ ছোকরা বেশ চতুর। চিতা-বাঘের মতো প্রকৃতি। সদানন্দের কথা শুনিয়া কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত স্বদেশী বক্তৃতায় ভুলিবার লোক নন। তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে আমাদের দেশে স্বদেশীর ধুয়া প্রধানত বিলাত-ফেরতরাই তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহাও তাঁহার ধারণা যে ওটা তাহাদের আহত অহঙ্কারের আস্ফালন মাত্র। ওটা মুখোশ, আর ওই মুখোশের তলায় আছে নানাজাতের লোভ এবং মোহ। তাই তাঁহাদের মুখের বুলি সহজে কাহারও অন্তর স্পর্শ করে না। এদেশের লোক অধঃপতিত বটে, কিন্তু আসল-নকলের প্রভেদ তাহারা বোঝে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে চিনিতে তাহারা ভুল করে নাই। কৃষ্ণকান্তের মতে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক যুগের প্রবর্তক এবং একমাত্র স্বদেশী নেতা। সদানন্দের কথার সুরে তিনি কিন্তু বিস্মিত হইলেন, সুরটা মেকি মনে হইল না।

সদানন্দের মানসিক জগতের খবর রাখিলে তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। সদানন্দের মানসিক জগতে বারবার ঋতু পরিবর্তন হয়। যখন প্রথমে তিনি বিলাত হইতে ফেরেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল সাহেবীকেতায় ব্যবসায় না করিলে প্রকৃত ব্যবসা করা যায় না। তিনি নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাই নাম রাখিয়াছিলেন 'চ্যাটো ইনডাস্'। তিনি নিজে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষীয়, ফার্মের নামে ইহাই তিনি বিলাতী ঢঙে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ফার্মের নাম এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাঁহার মনের ঋতু-পরিবর্তন হইয়াছে। পুরাপুরি স্বদেশী না হইতে পারিলে আত্মসম্ভ্রম বজায় থাকে না, আনন্দও পাওয়া যায় না—এই কথা ভাবিয়া এখন তিনি

সুখ পাইতেছেন এবং ইহার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি আহরণ করিতেছেন। গত বৎসর ফার্মের নাম বদলাইয়া তিনি "চট্ট-ভারতী" করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দাদারা তাহা করিতে দেন নাই। অনেক বিষয়েই তাঁহার মত বদলাইয়াছে। পূর্বে তিনি বিদেশী জিনিস এদেশে আনিয়া বিক্রয় করিতেন, এখন তিনি এদেশের জিনিস বিদেশে বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। এদেশের তাঁতের কাপড়, শাল, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লন্ডনে এবং প্যারিতে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে তিনি বিলাতী-ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। এখনও তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার ছুতায় প্রগলভতাকে প্রশ্রয় দিতে চান না। বিদেশের পার্কে, মিউজিকহলে, ক্যাবারেতে যে সব দৃশ্য একদিন তিনি সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন, সে সব দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। এখন তাঁহার মানসিক জগতে যে ঋতুর রাজত্ব রঙে-রসে তাহাতে স্বদেশীয়ানারই প্রভাব। হয়তো এ ঋতুও বেশিদিন থাকিবে না, আবার নূতন কোন ঋতুর আবির্ভাব হইবে নূতন ভাবের পশরা বহিয়া। কৃষ্ণকান্ত এত খবর জানিতেন না, তাই একটু বিস্মিত হইলেন। তবু একটু টিপ্পনি কাটিতে ছাড়িলেন না।

"তোমার ও কৃচ্ছ্র সাধন কথাটা থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

"কিছুমাত্র না। খুব ভাল লাগছে আমার এখানে। আর কিছু না হোক, কান আর চোখ বিশ্রাম পেয়েছে। এতদিন শহরের মাপা জলে স্নান করেছি, এখানে অবগাহন হচ্ছে। রঙ্গ-নাথেরও নিশ্চয়ই তাই মনে হচ্ছে?"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "যে কোনও পরিবর্তনই আমার ভাল লাগে।"

হাস্যদীপ্ত চক্ষে কৃষ্ণকান্তের দিকে এক নজর চাহিয়া আবার চীনা-গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কৃষ্ণকান্তের পুনরায় চিতাবাঘের কথা মনে হইল। তিনি পুনরায় প্রশ্নের একটি টোপ ফেলিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। দাদুর পরীক্ষা শেষ করিয়া গগন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কেমন দেখলে দাদুকে ছোট ডাক্তারবাবু?"

"ভালই। হার্ট বেশ ভালো। তবে রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় চলে যাক কেউ।"

"কুমারকে বল—"

"ছোটকাকা কোথা?"

"মাঠে গেছে শুনলাম।"

"আচ্ছা আসুক।"

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেন।

সকলে মনে করিল তাঁহার ঘুম আসিয়াছে, কথা বলিয়া আর বিরক্ত করা উচিত নয়। এক ঊর্মিলা ছাড়া আর সকলে একে একে উঠিয়া গেল। ঊর্মিলা চুপ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। সে-ও ক্রমশ ঢুলিতে লাগিল। একবার ঝুঁকিয়া দেখিল, বাবা ঘুমাইয়াছেন কি না। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দেখিয়া মনে হইল ঘুমাইতেছেন। তখন সে-ও শিয়রের দিকে যে

জায়গাটাটুকু ছিল তাহারই একধারে সন্তর্পণে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। চোখ বুজিয়া মনে মনে তিনি অদ্ভুত একটা ছবি দেখিতেছিলেন! প্রকাণ্ড একটা পথ যেন পূর্বদিগন্ত হইতে আসিয়া পশ্চিমদিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের আদি-অন্ত কিছু নাই। সেই পথে তিনি যেন একা চলিতেছেন। তাঁহার পিছন দিক হইতে মাঝে মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। মামার, মামীর, দিদিমায়ের, মায়ের, মন্মথর, রাজলক্ষ্মীর, বাবার, পৃথ্বীশের, আরও অনেকের। মনে হইতেছে অনেকদূর হইতে যেন ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখ দিকে কেহ নাই। কেবল পথ, দিগন্তবিস্তৃত পথ, সর্পিল রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিমদিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সে পথে একা তিনি যাত্রী। দুইদিকে ধূ ধূ করিতেছে প্রান্তর, প্রান্তরও দিগন্তপ্রসারী। কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমদিগন্ত হইতে ওই পথ ধরিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ একটি মনুষ্যমূর্তি। ধীবে ধীবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, ওই কি কৃষ্ণ? তখনই মনে হইল কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিবেন কেন, তাঁহাকে তো জীবনে তেমন করিয়া কখনও ডাকি নাই। তবে ও কি মৃত্যু? নিষ্পলক নয়নে সূর্যসুন্দর সে দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে আসিতেছে, কিন্তু আসিতেছে.....।

।। ছয়।।

কুমার মাঠে গিয়াছিল। মাঠের কুঁড়ে ঘরটিতে বসিয়া সে সূর্যসুন্দরেব জীবন-স্মৃতি পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ফাঁকা মাঠ। রবি-ফসল বুনিবার সময়, কোথাও জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা বীজ ছিটাইতেছে। দূরে একটা জমিতে কিছু আখ ছিল, কয়েকটি চাকর তাহা কাটিয়া কাটিয়া একধারে স্তূপীকৃত করিতেছে। কুমার মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল বাবার 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাহার মনে হইতেছিল বাবার অসুখের পটভূমিকায় তাঁহার অতীত জীবন-চিত্রটা অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিশু সূর্যসুন্দর এবং বৃদ্ধ সূর্যসুন্দর যেন এক বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছেন। সাগ্রহে সে পড়িতেছিল।

''সাহেবগঞ্জে আমাদের রখিয়া বাবা পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সাহেবগঞ্জে পৌঁছিয়া দিন সাতেক ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই বাগচী মহাশয়ের বাসায় গান-বাজনা লইয়া থাকিতেন; খাইবার সময় এবং শুইবার সময় অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে তাঁহাকে বাড়িতে আনিতে হইত। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় তিনি অন্তর্ধান করিলেন। দিদিমার-অশ্রুধারা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা-কে কোনদিন কাঁদিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তিন যেন পাষাণ-প্রতিমার মতো হইয়া গেলেন। যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের কাজ করিয়া যাইতেন, কোনও কথা বলিতেন না। তিনি স্বভাবতই স্বল্পভাষিণী ছিলেন, আরও যেন নীরব হইয়া গেলেন। ইহার আরো একটা কারণ বোধহয় ছিল। দেশের বাড়িতে মা-ই ঘরের গৃহিণী ও সর্বেসর্বা ছিলেন। সাহেবগঞ্জে আসিয়া কিন্তু মামীমার

আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। কারণ ইহা বেশ বোঝা যাইত যে মামা যদিও মুখে খুব 'দিদি' 'দিদি' করিতেন, দিদিকেই গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু চাবিকাঠিটি ছিল মামীরই হাতে। সংসারে যে পুরুষ উপার্জন করে স্বভাবত তাহার স্ত্রীরই সেই সংসারে প্রতিপত্তি হয়। আজকাল খোলাখুলি ভাবেই হয়, সেকালে লোক-দেখানো ভব্যতার একটা আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু বোঝা যাইত। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, আমিও তাহা অনুভব করিতাম, নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং নিজের ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া মা যে ভাবে মামার সংসারে থাকিতেন তাহার তুলনা বড় একটা মেলে না। তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝানোও শক্ত। নিজের জন্য বা আমার জন্য মা কখনও কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতেন না। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে গভীর রাত্রে গোপনে সেলাই করিয়া লইতেন, তবু বলিতেন না যে কাপড় কিনিয়া দাও। দিদিমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি ভাল করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। মামীমা মায়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, নিজে বেশ সাজিয়া গুজিয়া থাকিতেন, মাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কিছু কিনিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার ভাবটা ছিল—দিদিই তো কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আমার উপর-পড়া হইয়া কিছু করিতে যাওয়া কি ভালো? মা কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছু-দিন পর হইতে মায়ের মুখভাবে অপূর্ব একটা আত্মসমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সে মুখভাব আমি কখনও ভুলিব না। দুঃখ এই যে আমার ছেলে-মেয়েরা তাহা দেখিল না, কখনও দেখিবেও না। তাঁহার কোনও ছবি নাই। তখন ফোটো তোলার রেওয়াজ অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার মায়ের বা বাবার ফোটো তোলানো সম্ভবপর হয় নাই। বাবা কোথাও বেশীদিন থাকিতেন না, ফোটো তোলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তিনি রাজি হইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মনোভাবই অন্যপ্রকার ছিল। তিনি সুরূপ শক্তিমান লোক ছিলেন, কিন্তু শরীর লইয়া কোন-প্রকার আস্ফালন তিনি পছন্দ করিতেন না। মায়ের ফোটো-তোলানো হয় নাই, কারণ তখন মামার বাড়িতে পরদা-প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি ছিল। রাস্তা দিয়া সমারোহে শোভাযাত্রা গেলেও বাড়ির মেয়েরা জানলার ধারে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার অনুমতি পাইত না। অপরিচিত ফোটোগ্রাফারের সম্মুখে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিবার কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। যাহারা পারিত তাহাদের অভিনেত্রীর বা কুলটার সমপর্যায়ে ফেলিয়া রক্ষণশীলেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তখন ঘরে ঘরে ক্যামেরারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। প্রতি শহরে এত ফটোগ্রাফারও ছিল না। তখন একমাত্র কলিকাতাতেই বোধহয় পেশাদার ফটোগ্রাফাররা কিছু অর্থোপার্জন করিতেন।

সাহেবগঞ্জে মামা বেশ পশার জমাইয়াছিলেন। প্রত্যহ অনেক রোগী তাঁহার ডিস্‌পেনসারিতে আসিত। তিনিও প্রায় প্রত্যহ বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন, কখনও মিরজাচৌকিতে, কখনও পীরপৈঁতিতে, কখনও সকরিগলিতে। গঙ্গার ওপারে তাঁহার নাম-ডাক হইয়াছিল, সেখানকার অনেক গ্রাম হইতেও তাঁহাকে ডাকিতে আসিত। নৌকা করিয়া যাইতেন, কখনও কখনও একাধিক দিন তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। মোট কথা, তিনি ও অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখন মামা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নূতন বাড়ি কিনিলেন। সেই বাড়িতে আমরা উঠিয়া গেলাম। গৃহ-

প্রবেশ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানো হইয়াছিল। সেই সময় সাহেবগঞ্জের বাঙালী পরিবারের অনেককে দেখিলাম, অনেকের সহিত পরিচয়ও হইল।

সাহেবগঞ্জে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বরদাবাবু সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র আনন্দ, মন্মথ এবং বসন্ত। মন্মথ আমার সমবয়সী ছিল। যখন দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইলাম তখন দেখিলাম সে আমার সহপাঠিও। বসন্তর তখন সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে। আনন্দ-দা পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়াছেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরথবাবুও সে উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিতেছিলেন। বস্তুত, তাঁহারই আনুকূল্যে মামার পশার এত শীঘ্র বাড়িয়াছিল। মামার নূতন বাড়িটিও তিনি চেষ্টা করিয়া শস্তায় কিনাইয়া দিয়াছিলেন। ইহারা ছাড়া সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কর্মচারীরা, পোস্টমাস্টারবাবু, থানার দারোগা ও কনেস্টবলগণ, মামার রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা, স্কুলের পাঠশালার শিক্ষকেরা, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দে উৎসবে সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করিতেছিল।

সেই সময়ই দীনুপণ্ডিতকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ও রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত লম্বা লোক আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। তিনি বারান্দার একধারে একটি বেঞ্চির উপর বহুক্ষণ আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং শহরের কোনও গণ্যমান্য লোক আসিলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে কোনও জামা ছিল না। কাঁধে একটি সাধারণ চাদর, পরনে থান কাপড় এবং পায়ে একজোড়া লাল চটি-জুতা। বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক উপরে কালো সুতা দিয়া একটি মাদুলি বাঁধা ছিল, মাথায় টিকিও ছিল। মাথার চুল কদম ছাঁট। দীনু পণ্ডিতকে এই বেশেই বরাবর দেখিয়াছি। তাঁহার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে শাদা পিঁচুটি জমিয়া থাকিত। তিনি কেন যে তাহা পরিষ্কার করিতেন না জানি না। সেকালে অনেকে দাড়ি কামাইত, কিন্তু যুগপৎ গোঁফদাড়ি কামানো প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর অবশ্য শ্রাদ্ধের সময় সকলে মাথার চুলের সহিত গোঁফ-দাড়িও কামাইয়া ফেলিত, কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্লিন-শেভড্ হইবার আগ্রহ কাহারও তেমন ছিল না। দীনু পণ্ডিতের মুখে গোঁফ-দাড়ি না দেখিয়া আমি ভাবিলাম—সম্ভবত উহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তিনি মাকুন্দ এবং জাতিতে কৈবর্ত। দীনু পণ্ডিতের বর্ণনা একটু বিশদ করিয়া দিলাম, কারণ তাঁহার স্মৃতিটা এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে। শৈশবে তাঁহার হাতে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি; যদিও দিদিমা আমার সহায় ছিলেন, তবু তাঁহার প্রবল প্রকোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল, কেহই পাইত না। সেদিনই বরদাবাবুর মেজছেলে মন্মথর সহিত আমার আলাপ হইল। আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হইতে বেশী দেরি হইল না। সেই আমাকে আড়ালে ডাকিয়া দীনু পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিল, "ওই লোকটিকে চিনে রাখ। কিছুদিনের মধ্যেই ওর খপ্পরে পড়তে হবে তোমাকে।"

"উনি কে?"

"দীনু পণ্ডিত। এখানকার পাঠশালায় পড়ায়।"

"গোঁফদাড়ি কামানো কেন?"

"শালা মাকুন্দ, জাতে কৈবর্ত।"

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'শালা' বলিতেছে! দীনু পণ্ডিতের সঙ্গে পরে যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইল তখন এই বিস্ময়ভাবটা আর রহিল না। অনেকে তাহাকে আরও অশ্লীলভাষায় গালাগালি দিত। সত্যই লোকটি নর-রূপী পশু ছিল। ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যই শিক্ষকেরা শাস্তি দেন। দীনু পণ্ডিত কিন্তু শাস্তি দিতেন বড়লোকদের খোশামোদ করিবার জন্য; কথাটা অদ্ভুত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাটা সত্য। সাধারণত বড় গভর্নমেন্ট অফিসার বা রেলওয়ে অফিসারদের খোশামোদ করিতেন তিনি। রেলি কোম্পানীর বড়বাবু মুকুন্দবাবুকেও এবং থানার দারোগা কার্তিকবাবুকেও করিতেন। তখন এস-ডি-ও ছিলেন সুধাকান্ত সেন এবং ডি-টি-এস আফিসের বড়বাবু ছিলেন জগন্ময় রায়। দীনু পণ্ডিত ইহাদের গোলাম ছিলেন। কোনও কারণে ইহাদের মধ্যে কেহ যদি শহরের কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইতেন দীনু পণ্ডিত তাহার শোধ তুলিতেন তাহাদের ছেলেদের পিঠের উপর! অর্থাৎ বড় অফিসারদের শত্রু দীনু পণ্ডিতেরও শত্রু স্থানীয় ছিল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের শাসন করিবার ক্ষমতা দীনু পণ্ডিতের ছিল না, তিনি নির্যাতন করিতেন তাঁহাদের ছেলেদের। মন্মথর বাবা বরদাবাবু মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া দীনু পণ্ডিত তাঁহাকে খোশামোদ করিতেন। সুতরাং মন্মথ এবং বসন্ত তাঁহার বেত্রাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। মন্মথ কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চিনিত, কারণ চেয়ারম্যান হইবার পূর্বে বরদাবাবুর সহিত কার্তিকবাবুর ঝগড়া হয়। বরদাবাবু তেজস্বী লোক ছিলেন। কার্তিকবাবু একটি লোককে অন্যায়ভাবে গ্রেফ্‌তার করাতে বরদাবাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া শহরে কিছুদিন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বরদাবাবু সেই লোকটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকদ্দমা পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন এবং মকদ্দমায় জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য বেচারা মন্মথকে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রত্যহ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দীনু পণ্ডিত যে বড়লোকদের খোশামোদ করিতেন তাহার একটা সঙ্গত কারণও ছিল। অপোগণ্ড পাঁচটি পুত্র ছিল তাঁহার। একটিও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাই। তাহাদের কোথাও কোনও কাজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একজন আবগারি কমিশনারকে খোশামোদ করিয়া বড় ছেলেটিকে আবগারি বিভাগে ঢুকাইতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শামুক আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহারও লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিল না, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। সে খুব ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিত। ক্যারিকেচার করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার। পরবর্তী জীবনে এই সব করিয়াই জীবিকা অর্জন করিত সে।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আমার সমবয়সী অনেক বাঙালী ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মন্মথর সহিত বন্ধুত্বটা একদিনেই যেন জমিয়া গেল। এ বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সেদিনের আর একটি ঘটনাও আমার স্মৃতি-পথে এখনও জাগরুক আছে। মামার বিবাহের ঘটক শিবু ঘটকের দাদা মধু ঘটক সাহেবগঞ্জে গোলাদারি কারবার করিতেন ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহারই পরামর্শে মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসিয়াছিলেন, কিছুদিন ইহার বাড়িতেও ছিলেন। এই মধু ঘটককে সেদিন আমি প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মধু ঘটকের চেহারা ছিল পাতলা ছিপছিপে লম্বা ধরনের। পরনে হাতকাটা লংক্লথের ফতুয়া এবং শাদা থান। কানে খড়কে গোঁজা। মাথার চুলগুলি ঘননিবদ্ধ নয়, যেগুলি আছে তাহাও পাকা, কিন্তু সুবিন্যস্ত। পাকা সরু গোঁফটিও সুরক্ষিত। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, চোখের তারা নীল, চোখের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। মুখটিও ছোট কিন্তু মুখের ভাব বেশ গম্ভীর। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছেন, দুনিয়াটাকে সর্বদাই যেন ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। মন্মথই সেদিন দূর হইতে মধু ঘটককেও চিনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওই ঘটক মাশাই। লোক খুব সাচ্চা কিন্তু বড় তিরিক্ষে। ওর কাছে পারতপক্ষে আমরা ঘেঁষি না। দেখা হইলে পড়া জিগ্যেস করেন, না পারলে বকেন। ব্যাকরণ-ট্যাকরণ এখনও সব মুখস্থ—"।

একটু পরেই শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে মামার সহিত মধু ঘটক কথা বলিতেছেন।

"রান্না বান্না কি সব রাঁধুনী বামুনই করছে"—মধু ঘটক মামাকে প্রশ্ন করিলেন।

"কোলকাতা থেকে চার জন রাঁধুনী আনিয়েছি। এখানকার জন দুই আছে। উমেশ আর দুনিয়ালাল।"

"এত হৈ-হৈ না করলেই পারতে। বউমা চারটি শাকান্ন রেঁধে দিলে আমরা তৃপ্তি করে খেতাম। আচ্ছা, আমি এখন উঠি তাহলে। কাল আবার আসব।"

"আপনি খেয়ে যাবেন না?"

"না, আমি রাঁধুনী বামুনের হাতে খাই না। থাক্, আমার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি তো ঘরের লোক।"

"না, না, সে কি হয়। আজকের দিনে আপনি না খেয়ে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে যে। খেতে হবে আপনাকে— "

"নিতান্তই যদি না ছাড় তাহলে বউমাকে একটু আলাদা করে চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল। বেশী কিছু হাঙ্গামা কোরো না যেন—"

তাহাই হইল। উৎসবের দিন মামীমা শৌখীন কাপড় গহনা পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মামার আদেশে তাঁহাকে সে সব ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে হইল। মামা নিজে দাঁড়াইয়া রান্নাঘরটি গোবর এবং গঙ্গাজল দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। মামীমাকে সেই স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরে বসিয়া ঘটক মহাশয়ের জন্য নিরামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন ও মিহি আতপ চালের ভাত রান্না করিতে হইল। আমার মা অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মা-ই অনায়াসে সব রাঁধিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন মামীমার নাম করিয়া বলিয়াছেন তখন মামীমাকেই রাঁধিতে হইল। রান্না তত ভাল হয় নাই, কিন্তু ঘটক মহাশয় অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে আহার করিলেন। ঘটক মহাশয়ের চারিত্রিক অনমনীয়তার আরও পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তিনি লোক খুব ভাল ছিলেন। নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চাহিতেন, কোনও কারণেই তাঁহাকে স্বমতের বিরুদ্ধে লওয়া যাইত না।

সেদিন আরও দুইটি অদ্ভুত ধরনের চরিত্র দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। দুজনেই স্ত্রীলোক। একজন ভৈরবী-মা, আর একজন সিপাহী-ঠাকরুণ। ভৈরবী-মা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন মামার সহিত তাঁহার কি সূত্রে পরিচয় তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শুধু আমি কেন অনেকেই। সে চেহারার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। টক্‌টকে গৌরবর্ণ, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, হাতে ত্রিশূল, পরিধানে গৈরিক, কপালের মাঝখানে

প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের টিপ। সম্ভবত পূর্বে নাকছাবি পরিতেন, ডান নাকের পাতায় একটি ছিদ্র ছিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে কোনরূপ অলংকার বা বিলাসের কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁহার সৌম্যমূর্তি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল; পরে তিনি আমার জীবনে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সেই বিস্ময়ভাব কখনও কাটে নাই। তিনি আজও আমার নিকট প্রহেলিকার মতো রহস্যপূর্ণ। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন, ডান পায়ের কয়েকটি আঙুল বাঁকা ছিল, শুনিয়াছিলাম কেদার-বদরি তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলেই আঙুলগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্যও সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সর্বদা আকাশের তলায় থাকিতেন। ঘরে, এমন কি ঢাকা বারান্দাতেও থাকিতেন না। গ্রীষ্মকালের দিনে গাছের ছায়ায় থাকিতেন, শীতকালে রাত্রে ছোট একটু ধুনী জ্বলাইয়া লইতেন। খাওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন রান্না জিনিস খাইতেন না। সাধারণত ফল মূল কাঁচা দুধই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল।

মামা আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এইটি আমার ভাগ্‌না।"

"ও কেদারের ছেলে?"

"হ্যাঁ"

মামার আদেশে তাঁহাকে আমি প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্তটি অনেকক্ষণ রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, "এ লক্ষণযুক্ত ছেলে, উন্নতি করবে।"

মামা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ, এঁর জন্যে ফল আনা হয়েছে কি না।"

তাঁহার জন্য নানাবিধ ফল আসিয়াছিল। সেগুলি একটি ছোট ঝুড়ি করিয়া লইয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম মামা বলিতেছেন, "জামাইবাবু কোথায় যে চলে গেলেন আবার। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেননি।"

ভৈরবী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও তো সংসারে থাকবার লোক নয়। তবে আসবে আবার। ওর ভোগ কিছুদিন আছে এখনও।"

মামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাও।"

আমি পুনরায় চলিয়া গেলাম। মামা ভৈরবী-মায়ের সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল ভৈরবী-মা বাবাকে যখন চেনেন তখন হয়তো তাঁহার সহিত নিগূঢ় কোন যোগাযোগও আছে। কিন্তু কি প্রকার যোগাযোগ তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

সিপাহী ঠাক্‌রুণের সহিতও সেদিন কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল। মন্মথই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

"ওই দেখ, সিপাহী ঠাক্‌রুণ। জানিস, ও মেয়েমানুষ—"

"মেয়েমানুষ! তাই না কি"

"হ্যাঁ, লুকিয়ে পুলিসে কাজ করত, ধরা পড়ে, গেছে।"

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া লোকটিকে মেয়েমানুষ বলিয়া মনে করা সত্যই শক্ত। পোশাকও পুরুষের পোশাক, ঢিলাহাতা, গেরুয়া-রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি, মাথায়

হলুদরঙের প্রকাণ্ড পাগড়ি। পাগড়ির লেজটি বেণীর মতো পিঠের উপর ঝুলিতেছে। পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি বেঁটে মোটা লাঠি, লাঠির প্রত্যেকটি গাঁটে পিতলের তার-জড়ানো, চোখে গগলস্। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ না কি পুরুষের ছদ্মবেশে মিলিটারিতে ভরতি হইয়াছিল, ভরতি হইবার সময় কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাহার পর কোথায় যেন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে উরুতে গুলি লাগিয়া সিপাহি ঠাক্‌রুণ যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। স্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে বোঝা গেল যে তিনি স্ত্রীলোক। তাঁহার বীরত্বে সাহেব জেনারেল খুব খুশী হইয়া ছিলেন, তাঁহার একটা মোটা রকম পেনসন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই পেনসন লইয়া সিপাহী ঠাক্‌রুণ এখানকার থানার জমাদার পাঁড়েজির বাসায় থাকেন। পাঁড়েজি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকুরুণ কনেস্টবলদের সঙ্গে রাত্রে রোঁদও দেন। কিছুদিন আগে একটা চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, কিন্তু ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন।

বাংলাও বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথাও বলেন। ড্যাম, স্টুপিড, ভেরী গুড—এই তিনটি কথা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যায়। আর একটা আশ্চর্যজনক কথাও মন্মথ সেদিন বলিয়াছিল।

"ওই দীনু পণ্ডিতও ওঁকে ভয় পায়। যদু বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। তাকে দীনু পণ্ডিত খুব মেরেছিল, অথচ বেচারার তেমন কোন দোষ ছিল না। যদু বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তায় সিপাহী ঠাক্‌রুণের সঙ্গে তার দেখা। সিপাহী-ঠাক্‌রুণ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার কান আর পিঠ দেখলেন। কালো রক্তাক্ত পিঠে বেতের দাগ। তখন কিছু বললেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই তিনি হাজির হয়েছিলেন দীনু পণ্ডিতের বাসায়। দীনু পণ্ডিতকে কান ধরে পঁচিশবার উঠবোস করিয়েছিলেন।"

মন্মথর এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা জানি না। মন্মথর কথা বাড়াইয়া বলিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পরে পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিল সে। কিন্তু দীনু পণ্ডিত যে সিপাহী ঠাক্‌রুণকে ভয় করিতেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের পাঠশালা ভিজিটও করিতেন, অর্থাৎ সহসা কোন কোন দিন পাঠশালার সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাঠশালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। সিপাহী ঠাকারুণকে ওই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে দীনু পণ্ডিতের ভাবান্তর হইত, মুখভাব অবর্ণনীয় হইয়া উঠিত। মুখে একটা ভয়-ভয় অথচ হাসি-হাসি ভাব ফুটাইয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতেন—'মন দিয়ে লেখা-পড়া কর বাবারা, আখেরে তোমাদেরই ভাল হবে।'—বলিতেন এবং আড়চোখে সিপাহী-ঠাক্‌রুণের দিকে চাহিতেন।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আরও তিনটি লোক দেখিয়াছিলাম, যাহাদের কথা এখন ভুলি নাই। প্রথম লোকটি ফেলু পুরুত। থলথলে চেহারার লোকটি। মুখটি হাঁড়ির মতো বড়, চোখ দুটি ঈষৎ.কটা এবং টানা টানা। মুখটি ফোলা ফোলা। দুই গালে এবং চিবুকের তলায় মাংস থলথল করিতেছে, সামান্য উত্তেজনাতেই, সেগুলি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে সেগুলির ভিতরে জীবন্ত যেন কিছু আছে। মামা ঘটক মহাশয়ের সমস্ত ব্যাপারীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মামার অনুরোধে অঘোরবাবু ফেলু পুরোহিতকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। খাইতে

বসিয়া ফেলু পুরুত তাক লাগাইয়া দিলেন সকলকে। মামার এক জেলে রোগী অনেক চিতল মাছ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল। প্রায় তিনি চার মণ। ফেলু পুরোহিত পুরা আহারের পর একুশখানা চিতলমাছের পেটি উদরস্থ করিলেন। যে পংক্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন সে পংক্তির লোকেরা তাঁহার খাওয়া দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, 'আরও খান', আরও খান' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।......পরদিন প্রভাতে দেখিলাম চার পাঁচজন লোক উঠানে বসিয়া পা ধুইতেছে, তাহাদের পায়ে প্রচুর কাদা। শুনিলাম উহারা ফেলু পুরুতকে পুড়াইয়া ফিরিয়াছে। আহারের ঘণ্টাখানেক পর হইতেই ফেলুর ভেদ বমি শুরু হয়। ভোর হইতে না হইতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শঙ্খ-মামা। একটি ছোট ন'হাতি কাপড় পরিয়া, কপালে নিজের পৈতাটি কসকসে করিয়া বাঁধিয়া তিনি বাড়ির ভিতর বারান্দার এক কোণে একটি মোড়ার উপর বসিয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শব্দ করিতেছিলেন। মুখময় খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, নাসারন্ধ্র হইতে চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে, কপালে রগে সাদা সাদা কি একটা লাগাইয়াছেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। মামা একবার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শেঁকো। তুই এমনভাবে এখান বসে কোঁতাচ্ছিস কেন। মাথা ধরেছে তো শুয়ে পড়গে যা না—"

শঙ্খমামা কোনও জবাব দিলেন না, আরও বার দুই 'ওঁ' 'ওঁ' করিলেন কেবল। মামা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্খমামা তখন নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া মামীমাকে বলিলেন—"ওঁ বউদি দাদা শুতে বললে আমাকে। খেতে দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি"। একটু পরেই মামিমা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দেখিলাম মাথা-ধরার জন্য তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। প্রচুর আহার করিলেন। তাহার পর কোঁথাইতে কোঁথাইতে গিয়া একটা ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শঙ্খমামাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, ঠিক ওই এক চেহারা, এক ধরন। কোনও ভোজবাড়ির নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু ভোজ-বাড়িতে গিয়া পাছে কোনও কাজ করিতে হয় তাই মাথা-ধরার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং মাথায় পৈতা বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লাগাইয়া 'ওঁ' 'ওঁ' শব্দ করিতেন।

তৃতীয় যে লোকটি সেদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন সকলে তাঁহাকে 'দালাল মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম দেবেন ভট্টাচার্য। মধু ঘটকের যে ব্যবসায় ছিল, তাহাতে তিনি পাটের দালালি করিতেন। দীর্ঘ ঋজুদেহ গৌরবর্ণ। ভীড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাকটি বেশ বড় ও সূচ্যগ্র, চক্ষু বুদ্ধিদীপ্ত, পাতলা ঠোঁটে চাপা হাসি। সেদিন ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে শেষের দিকে একটা জায়গা খালি ছিল। কে একজন বলিল, 'বংশীবাবু আপনি বসে পড়ুন ওখানে।' বংশীবাবু একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, কোন-এক জমিদারের নায়েব তিনি, দালাল মহাশয়কে পাটসংগ্রহ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার এলাকায় যাইতে হয়। বংশীবাবুকে খুশী রাখিলে তাঁহারই সুবিধা। কিন্তু দালাল মশাই ইহাতে আপত্তি করিলেন।

"বংশীবাবু, ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসবেন কি করে। উনি যে বদ্যি—"

বংশীবাবুর স্তাবক হরিহর বলিলেন, "শিক্ষিত সমাজে বৈদ্যও আজকাল ব্রাহ্মণ, তাঁর পৈতে আছে, অত গোঁড়ামি আজকাল অচল—"

দালাল মশায় ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যদি স্যাকরাকে দিয়ে একটা সোনার মুকুট তৈরি করিয়ে মাথায় পরে বেড়ান, আপনাকে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে দেবে?"

হরিহর দে লোকটি কুৎসিত-দর্শন এবং বেঁটে। তিনি মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত এক টেবিলে খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বংশীবাবু মানী ব্যক্তি, তিনিও ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন একটু, কিন্তু সামলাইয়া লইলেন।

"না, না, দালাল মশাই ঠিকই বলেছেন, আমি আলাদাই বসব। সামাজিক ব্যাপারে সাবেক প্রথা মেনে চলাই নিরাপদ।"

হরিহর দে-কে মৃদুকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—"এই জন্যেই তো দলে দলে ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছে সব।"

পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্বন্ধে এই ধরনের কড়াকড়ি আজকাল কেহ ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু সে যুগে ইহা সকলে মানিযা চলিত। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা ছিল তখন। এখনও সেই সাবেক-প্রথা চালু আছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। এখন কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ধনীরা এখন এক পঙ্‌ক্তিতে বসে, এক সঙ্গে আহার-বিহার করে, গরীবদের সেখানে স্থান নাই। দালাল মহাশয় পঙ্‌ক্তির ব্যাপারে সেদিন ওই কাণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতের লোকেদের যে ঘৃণা করিতেন না ইহাও আমি পরে দেখিয়াছি, এমন কি অনেক মেথরকে তিনি অর্থ-সাহায্য দিতেন, তাহাদের সহিত তাঁহার স্নেহের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু কোন-প্রকার বাহাদুরি চালিয়াতির গন্ধ পাইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নিজের গ্রামে তিনি এই কাণ্ডটি করিয়াছিলেন। তখন ট্যাঁক-ঘড়ি নামে এক প্রকার ঘড়ির খুব প্রচলন হইয়াছিল! ছোট ঘড়ি, ডালা বন্ধ, ঘড়ির মাথার কাছে একটু চাপ দিলেই ডালাটা লাফাইয়া ওঠে। ঘড়িটি সাধারণত ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখা হইত। দালাল মশাই গ্রামে একদিন সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া সময় নির্ণয় করিতেছিলেন। গ্রামের তপু নাপিতের ছেলে ঝপু আসিয়া উপস্থিত হইল। তপু নাপিত হইলেও গরীব ছিল না। জমিজমা কিছু ছিল, একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ঝপু কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় গিয়া কোনও সদাগরি আপিসে একটি চাকরিও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার দিকে একনজর চাহিয়াই দালাল মশায় চটিয়া গেলেন। দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গলায় ফুলদার কম্‌ফর্টার, পায়ে মোজা ও বুট জুতো।

"আকাশে কি দেখছেন দালাল মশাই?"

"বেলা কত হল তাই ঠিক করছি।"

"এই যে দেখে নিন।"

ঝপু ট্যাঁক হইতে ট্যাঁক-ঘড়ি বাহির করিয়া দালাল মহাশয়ের প্রায় নাকের কাছে তাহা লইয়া গেল। স্প্রিং টিপিতেই ডালাটা লাফাইয়া উঠিল। দালাল মশাই চমকাইয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শালা, আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছিস তুই—"

ঝপু দালাল মহাশকে চিনিত। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দালাল মহাশয়ও তাহার পিছু পিছু

ছুটিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাইল ছুটিয়া ঝপুকে তিনি ধরিলেন, ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন.......

গগনের ডাক শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিল।

"দাদুকে পরীক্ষা করে দেখলুম। দাদুর রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় লোক পাঠাতে হবে। এখানে হবে না।"

"সিভিল সার্জন তো সে কথা বললেন না কিছু।"

"বলা উচিত ছিল।"

"কাটিহারে বাবার রক্ত-পরীক্ষা করানো হয়েছিল একবার। ব্লাড শুগারও দেখেছিল। তুই দেখেছিস রিপোর্টগুলো?"

"দেখেছি। আমি W. R. করাতে চাই—"

"সেটা আবার কি?"

"রক্তে সিফিলিসের কোন বিষ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার।"

কুমার অবাক হইয়া গেল।

"খুব সম্ভবত কিছু নেই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে ওটা দেখে নেওয়া উচিত। ওটা একটা রুটিনের মধ্যে। আমি রক্ত নিয়ে সিরাম বার করে দিচ্ছি—কেউ নিয়ে চলে যাক্। যাবার মতো লোক নেই কেউ?"

"লোক আছে। চল্ দেখি, বাবা আবার কিছু মনে করবেন না তো"।

কথাটা শুনিয়া সূর্যসুন্দর কিন্তু খুশী হইলেন।

"গগন ঠিকই বলেছে। W. R. করা উচিত। একবার একটা রোগীর বিউরো কাটতে গিয়ে আমার আঙুলের কোণে ছুরির খোঁচা লাগে। বগলের গ্ল্যাণ্ডগুলো খুব ফুলে ওঠে, জ্বর হয়। তখনকার দিনে এর যা চিকিৎসা ছিল তা করেছিলাম, তবু দেখে নেওয়া ভালো। দাদু আমার বুদ্ধিমান ডাক্তার হয়েছে দেখছি—"

সেই দিনই রক্ত লইয়া একজন লোক কলিকাতা চলিয়া গেল।

।। সাত।।

বাহিরে তিনটি বড় বড় আটচালা প্রস্তুত হইয়াছিল, আর সেগুলিতে আড্ডা জমাইয়াছিল তিন শ্রেণীর লোক। এক নম্বর আটচালায় জুটিয়াছিলেন বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধগণ। ইহারা অনেকেই সূর্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী। ডাক্তার হিসাবেই নয়, নানাভাবে ইহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সূর্যসুন্দর জড়িত আছেন। প্রকৃত আত্মীয় বলিতে যাহা বুঝায় ইহারা তাহাই। হিন্দু-মুসলমান-বিহারী-মাড়োয়ারি বাঙালী আধা-বাঙালী সব রকম লোকই আছেন ইঁহাদের মধ্যে। হিন্দিতেই গল্প চলিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার মর্ম বাংলাতেই ব্যক্ত করিব।

প্রবীণ সুবাতালী তহশিলদার খুব ভোরেই নিজের ঘোড়াটিতে চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটি সাধারণ দেশী ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে জিনও নাই। চামড়ার লাগামও নাই। লাগামের

বদলে আছে রঙীন পাটের দড়ি। জিনের বদলে একটি গদি। সাধারণ সতরঞ্চি ও কম্বল পাট করিয়া এবং তাহার উপর একটি কাপড় বিছাইয়া ছোটখাটো একটি গদির মতো করা হইয়াছে! সেই গদিতে বসিয়া সুবাতালী তহশিলদার সারাজীবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেদের বড় বড় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে দামী জিন, দামী সাজ, সুবাতালী কিন্তু ওই ছোট দেশী ঘোড়ার উপর দেশী বিছানা পাতিয়া চড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার পরিধানে একটি সাদা লংক্লথের মেরজাই, পায়ে দেশী মুচির তৈরি জুতা এবং মাথায় পাতলা-কাপড়ে তৈরি মুসলমানী টুপি। তিনি একটি দড়ির খাটে বসিয়া আসর জমাইয়াছেন। সূর্যসুন্দরের বিষয়েই গল্প হইতেছে।

সুবাতালী বলিতেছিলেন "আমাদের ডাক্তারবাবু মানুষ নন, বিরাট একটা বটগাছ। কত আজব ধরনের চিড়িয়া যে ওঁর ডালে এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ঠিক নেই। কেশমশাইকে মনে আছে রমেশ?"

স্থানীয় জমিদারি সেরেস্তার প্রবীণ গোমস্তা রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "খুব আছে। কেশমশাইকে ভোলা যায় না কি। আপনি যে তার চাকরি করে দিয়েছিলেন, তা-ও মনে আছে।"

রমেশ গদগদ দৃষ্টিতে সুবাতালীর দিকে চাহিলেন, যেন কেশমশাইকে চাকরি দিয়া সুবাতালী রমেশেরই ব্যক্তিগত কোন উপকার করিয়াছেন। একটু মিহি খোশামোদ করা রমেশবাবুর স্বভাব।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুর খাতিরে। কিন্তু সে কি চাকরি করত? আফিংই খেত তিনবার করে—সকালে দুপুরে আর রাত্রে। যখনই সেরেস্তায় গেছি তখনই দেখেছি ঢুলছে বসে। তবু ডাক্তারবাবুর খাতিরে রেখেছিলাম তাকে, কিন্তু নিজেই সে চাকরি ছেড়ে দিলে একদিন। বললে সেরেস্তার চৌকিতে না কি এত ছারপোকা যে বসা যায় না—"

রমেশ মন্তব্য করিলেন, "আয়েসী লোক ছিলেন তো। ঘুমের ব্যাঘাত হত।"

একটা হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

"না, না হাসির কথা নয়। কেউ খাদ্য-রসিক থাকে, কেউ সাহিত্য-রসিক থাকে, তেমনি উনি ছিলেন ঘুম-রসিক।"

চোখ বড় বড় করিয়া সুবাতালী বলিলেন, "লোকটা গুণী ছিল কিন্তু। আমার আস্‌গরের বিয়ের সময় নেচে গেয়ে বাজিয়ে একাই জমিয়ে তুলেছিল লোকটা—"

"ওই জন্যেই তো ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। আর একটা খবর আপনারা কেউ বোধহয় জানেন না, এই যে এখানকার হাই-স্কুল- -এর প্রথম ভিত পত্তন করেন ডাক্তারবাবু। দুর্গাস্থানে প্রথমে খোলা হল লোয়ার প্রাইমারি স্কুল, আর সে ইস্কুলের প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই—"

সুবাতালী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তারাপদ পণ্ডিতই তো ওই পাঠশালাটা চালাতেন।"

"সে পরে। প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই। ওর হাতখরচের মতো দু'চার টাকা যাতে হয়ে যায় তার জন্যেই ওই পাঠশালাটা বসিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু এই ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবকে ধরে। সেকালে বড় বড় বাঙালী অফিসাররা ডক্তারবাবুর বাড়িতে উঠতেন, ডাকবাংলা তো ছিল না। একবার এক ইন্সপেকটর অতিথি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পাঠশালার কথা

শুনে তিনি বললেন, বেশ আমি মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমি দেখি একবার। তারপর আপনারা দরখাস্ত দিলেই হয়ে যাবে। ইনেস্‌পেক্‌টার নাম-মাত্র দেখলেন গিয়ে, পাঠশালাটার সামনে মিনিট পাঁচেকও দাঁড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, ডাক্তারবাবু গ্রামের পাঁচজনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তারপর থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে পেতে লাগলেন কেশমশাই। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেশমশাই প্রথমে এতে রাজি হননি। তিনি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, 'আপনি ভুল করলেন ডাক্তারবাবু। ছাত্রেরা যে যা দিত তাতেই আমার বেশ চলে যাচ্ছিল। এখন এই ইনেস্‌পেক্‌টার টিনেস্‌পেক্‌টার এসে রোজই একটা একটা বখেড়া বাধাবে দেখবেন। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো গা। ওরা বাঘ'। ডাক্তারবাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে না না। কোন ভয় নেই। আপনি যেমন কাজ করছেন করে যান না। কি করবে আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। যদি করে তখন দেখা যাবে। ভাল করে কাজ করলে এইটেই পরে আপার প্রাইমারি স্কুল হয়ে যাবে। আপনার মাইনেও বাড়বে তখন।' কেশমশাই কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন।"

সুবাতালী হাই তুলিয়া বলিলেন, "এক নম্বর কোঢ়ি ছিল লোকটা।"

কোঢ়ি মানে কুঁড়ে।

"তারপর কি হল?"

"মাস ছয়েক বেশ চলল। তারপরেই হল মজার কাণ্ড একটি! সেই ইনেস্‌পেক্‌টারটি বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বদলে নূতন আর একজন এসেছিলেন, তিনিও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু একেবারে অচেনা লোক, এ অঞ্চলে আসেননি কখনও। তিনি যেদিন ইস্কুল ভিজিট করতে এলেন সেদিন তুমুল বর্ষা। ট্রেন থেকে নেমেই বুঝতে পারলেন, এত বর্ষায় স্টেশন থেকে বেরুনো যাবে না, আর তখন এখানকার পথ-ঘাট যা ছিল তা তো জানেনই। ইনেস্‌পেক্‌টার কি করবেন ভেবে না পেয়ে শেষকালে নিজের চাপরাশিটাকে পাঠালেন স্কুলটা খুঁজে বার করতে, আর সম্ভব হলে স্কুলের পণ্ডিতকে খবর দিতে, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। কেশমশাই তখন আপিঙের নেশায় মশগুল হয়ে স্কুল ঘরেই বসে আছেন। তিনি বেরুতে পারেননি। খানিক্ষণ পরে সেই চাপরাশি জিজ্ঞেস করতে করতে হাজির হল এসে তাঁর কাছে। দরজা ঠেলাঠেলি করতেই কেশমশাই জিগ্যেস করলে—"কে—"

"আমি ইনেস্‌পেক্‌টারের চাপরাশি—"

"এখানে কি চাই?"

"আপনি কি পণ্ডিতজী?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব এসেছেন, স্টেশনে বসে আছেন।"

"তা আমি কি করব?"

"তিনি আপনার স্কুল দেখতে এসেছেন।"

"কাল বেলা দশটার সময় আসতে বোলো।"

চাপরাশি এরকম জবাব শুনবে প্রত্যাশা করেনি। অবাক হয়ে চলে গেল সে। খবরটা শুনে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবও উদ্বিগ্ন হলেন। রাত্রে থাকেন কোথা। ডাক-বাংলো নেই, স্টেশনে ওয়েটিং রুমও নেই। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু ছিলেন তখন। তিনি পরামর্শ দিলেন

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চলে যান, সেখানে খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা হবে, আপনার কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জলটা একটু ধরতেই এক কুলির সঙ্গে স্টেশনের এক-চোখো আলোর সাহায্যে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব ছপ ছপ করে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গানের মজলিশ বসত। অন্য রকম আবহাওয়াই ছিল তখন এ বাড়ির। আমি সুদ্ধ গান গাইতাম তখন। তবলা বাজাত কানা কার্তিক। তবলা বাজাতে বাজাতে তার কানা চোখটাও ফাঁক হয়ে যেত। ইনেস্‌পেক্‌টার আসতেই ডাক্তারবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাকে। তারপর চা এল, নিমকি এল। ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব গানের মজলিশে জমে গেলেন বেশ। কেশমশাই তখনও এসে পৌছননি। তিনি না আসাতে মজলিশটা জমেও যেন জমছিল না। তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন তো। তবলা, বাঁশী, বেহালা, হার্মোনিয়াম সব বাজাতে পারতেন, গানের গলাও খুব মিষ্টি ছিল, নাচতেনও চমৎকার। ওঁর এই সব গুণের জন্যই না ডাক্তারবাবু ওঁকে খাতির করতেন এত। ওঁর একটা যাত্রার দল ছিল না কি এককালে। শোনা যায় উনি ফিমেল পার্ট করতেন, আর মদও খেতেন, কিন্তু পয়সার অভাবে—"

তহশিলদার সাহেব একটু অধীর হয়ে পড়েছিলেন রমেশের গল্পের দৈর্ঘ্যে।

বললেন, "আগে বঢ়ো না ভাই। পহলে গপ খতম্ করো—"

"হ্যাঁ। তারপর গান-বাজনা যখন জমে' উঠেছে, তখন কেশমশাইয়ের গলা শোনা গেল বাইরে। বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, 'বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এক শালা ইনেস্‌পেক্‌টার এসে হাজির হয়েছে। তখনই বলেছিলুম আপনাকে, বখেড়া হবে। চাপরাশি পাঠিয়েছে আমার কাছে। উদ্দেশ্যটা যাতে তাঁকে আমি জামাই আদরে ডেকে এনে অভ্যর্থনা করি' বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ঢুকতেই ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। অচেনা জায়গা, জলে বৃষ্টিতে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন বলেই লোক পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। নিন আলাপ করুন। ইনেস্‌পেক্‌টার মৃদু মৃদু হাসছেন। কেশমশাই তো স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। নমস্কার করে করজোড়ে বললেন, 'ধর্মাবতার, আপনি এখানে আছেন জানলে কক্‌খনো আমি এসব কথা বলতুম না। তবে একটা কথা আপনাকে বলব, আমার মতো বহু গরীব পণ্ডিতদের মনের কথা আজ আপনি শুনে ফেললেন আমার মুখ দিয়ে। এখন আমাকে ক্ষমা করা না করা হুজরের ইচ্ছে। জানি না ভগবানের মনে কি আছে।' এমনভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন কথাগুলো যে সবাই হেসে উঠল।

ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব বললেন, "না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি কিচ্ছু মনে করিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। বসুন—"

কেশমশাই বসলেন একধারে। ডাক্তারবাবু তখন আসল পরিচয়টি দিলেন কেশমশাইয়ের। বললেন, 'ইনি গান-বাজনাতেও খুব গুণী লোক। আপনি সে পরিচয়ও পাবেন"। একটু পরেই কেশমশাই নেচে গেয়ে আর বেহালা বাজিয়ে এমন জমিয়ে তুললেন যে ইনেস্‌পেক্‌টার তার বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট তো লিখলেনই না, উপরন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গুণী ছিল লোকটা—"

সুবাতালী বললেন, "বেশক্। আব্ উসব জমানা গিয়া ভাই। ওরকম কেশমশাইও আর হোবে না, নিস্‌পিট্টরও হোবে না।"

নবাবগঞ্জের গোবিন্দ মণ্ডল ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সীয়া রাম, সীয়া রাম, সীয়া রাম,—বলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিলেন। গোবিন্দলাল মণ্ডল একজন জমিদার, কিন্তু তাঁহার বেশ-বাস হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়াই কুমারকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইশত টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এটা রাখিয়া দাও। কুমার ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই, প্রশ্ন করিয়াছিল, "কোথায় রেখে দেব?"

"পোস্টাপিসে রেখে দাও। আমার ঘরে টাকা চুরি হয়ে যায়। এটা তোমার নামে জমা থাক—"

কুমার তবু ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছিল। তাহার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মণ্ডল মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা আমার কাছে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তা। তোমার কাছেই থাক—"

"যদি খরচ করে ফেলি—"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ মণ্ডলের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "ফেল। খুব খুশী হব তাহলে। সেই জন্যেই তো আনলাম। খরচ তো হচ্ছে চারদিকে—"

কুমার অবশেষে টাকাটা লইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডল মহাশয় আটচালার এক কোণে গিয়া বসিলেন, তখন হইতে বসিয়াই আছেন এবং মাঝে মাঝে "সীয়ারাম, সীয়ারাম" বলিতেছেন।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহও আসিয়াছেন। চমক লাগাইবার মতোই চেহারা তাঁহার। প্রকাণ্ড পাকানো গোঁফ এবং জুলফি, দুইই পাকা। সিংহ মহাশয়ের বর্ণ ঘোর কালো বলিয়া পাকা গোঁফ এবং জুলফি বেশ মানাইয়াছে। চক্ষু দুইটি টানাটানা এবং লাল। তিনি একধারে বলিয়া নিম্নকণ্ঠে স্থানীয় গোলাদার মহাজন ওঝাজির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ওঝাজির চেহারাও দেখিবার মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। প্রকাণ্ড টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। গায়ে জামা নাই। কাঁধে গামছা গলায় পৈতে, বুক ও পিঠ-ভরা লোম, অজানুলম্বিত বাহু। চাকরবাকরদের সহিত ক্রমাগত চেঁচামেচি করতে হয় বলিয়া গলার স্বরটা একটু ভাঙা-ভাঙা। প্রচুর চিৎকার করিতে হয় তাঁহাকে। কারণ তিনি শুধু গোলাদারি কারবারই করেন না, রেলের কুলি-কনট্র্যাক্টারিও করেন। প্রত্যহ প্রায় দুইশত কুলিকে খাটাইতে হয়। চমকলাল ওঝাজির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন একটি হারের জন্য। চমকলাল ডাক্তারবাবুর নাত-বউয়ের সাধ-উপলক্ষে বধূকে একটি সোনার হার উপহার দিতে চান এবং এ খবরটি গোবিন্দ মণ্ডলের নিকট হইতে গোপনও রাখিতে চান। তিনি ওঝাজিকে অনুরোধ করিতেছেন যাহাতে তিনি কলিকাতায় কোন বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া দেন। এখানে হার করাইতে গেলে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ওঝাজির মুনিম্‌জি (ম্যানেজার) বিশ্বাসী লোক, সমঝদারও। ওঝাজির রেলের পাস আছে, ওঝাজি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার এ কাজটি করাইয়া দিতে পারেন। ওঝাজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দিবেন, যদি টি-আই না আসেন। টি-আই আসিলে মুনিম্‌জিকে এখানেই থাকিতে হইবে। তখন তিনি অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই আলোচনাই চলিতেছিল এমন সময় নিখিলবাবু প্রবেশ করাতে সুবাতালী ছাড়া আর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আরে বস, বস, দাঁড়াচ্ছ কেন—"

নিখিলবাবুও একধারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার। বাংলাদেশে তাঁহার নিজেরও ছোটখাটো জমিদারি আছে একটা। বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি। এখানেও কার্যত তিনিই জমিদার। আসল জমিদার কলিকাতাবাসী। সবাই নিখিলবাবুকে খাতির করেন। সুবাতালী বয়োবৃদ্ধ বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাকে সমীহ করিয়া করিয়া চলেন। সুবাতালীও স্নেহ করেন তাঁহাকে। নিখিলবাবুর দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবাতালী প্রশ্ন করিলেন, "কি নিখিলবাবু, কি 'পিলান' করলেন?" পিলান মানে, প্ল্যান।

"এই যে সব লিখে এনেছি কাগজে। মেয়েদের উপর কোনও ভার থাকবে না। এমন কি পান পর্যন্ত সাজবে মহাদেব বারুই। দুনিয়ালাল মাংস রান্না করবে কুঠিতে। এ বাড়িতে মাংস এলে চন্দরবাবু খুঁত খুঁত করবেন। মুষণকে বলে দিয়েছি যে খাসী নিয়ে কুঠিতেই যাবে। ওইখানেই সব হবে। আর আমিষ হবে ওদিকের চোয়ারীতে—"

নিখিলবাবু একটি লম্বা কাগজ বাহির করিয়া সুবাতালীর হাতে দিলেন। সুবাতালী মিরজাইয়ের পকেট হইতে চশমা বাহিব করিয়া সেটি পড়িলেন এবং কাগজটির প্রতি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর সেটি ফেবত দিয়া বলিলেন, "কুছ নেহি সম্‌ঝা। অংরেজি পঢ়তে পারি না।"

নিখিলবাবু মৃদু হাসিয়া কাগজটি পকেটে পুরিলেন।

বলিলেন, "আপনার সমঝাবার কোন দরকার নেই। আপনার বাথানে ক'টার সময় দুধ দোয়া হবে বলুন।"

"ভোর তিন্ বাজে। দু'মণ দুধ এখানে আসবে আমি বলে দিয়েছি।"

"আমি রামটহলকে দুধ আনতে পাঠাব। কয়েকটা পরিষ্কার পিতলের হাঁড়ি নিয়ে যাবে সে। আপনার গোয়ালাদের বলে দেবেন তারা যেন দুধটা পিতলের হাঁড়িতে দোয, কারণ ওদেব কেঁড়েতে দুইলে এমন ধোঁয়া-গন্ধ হবে যে পায়েস মাটি হয়ে যাবে—"

সুবাতালী স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, "বেশ তাই হোবে। আমার উপর আর কোনও ফরমায়েস আছে—?"

"আপনি কেবল আসর জমিয়ে বসে থাকবেন, আপনি আর মোড়লজি। আর কিছু করতে হবে না। গল্প করবেন খালি—"

গোবিন্দ মণ্ডল "সীয়ারাম সিয়ারাম" বলিয়া মস্তকে হাত বুলাইলেন। অর্থাৎ সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

চমকলাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিজের গোঁফে তা দিলেন একবার, তাহার পর আড়-চোখে নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। ভাবটা, আমার উপর কি কোনও ভারই দিবেন না? আমি কি কোনও কিছুরই যোগ্য নই? নিখিলবাবু তাঁহার দৃষ্টির ভাবার্থ বুঝিলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, "চমকলাল, তোমার উপর খুব একটা শক্ত কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে কি না বল—"

"হুকুম করুন।"

"তোমাকে মশলা-বাটার ভারটা দিতে চাই। তার মানে, মশলাগুলি বাছিয়ে, ধুইয়ে, বাটিয়ে রাখতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। গোটা দশেক

জোয়ান গোয়ালা চাই। শিল-নোড়ার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার তো অনেক গোয়ালা প্রজা আছে, তোমার পক্ষে দশটা লোক জোগাড় করা শক্ত হবে না—"

"দশ বিশ যেত্না কহিয়ে—"

"তুমি তাহলে তোমার গোয়ালাদের নিয়ে সন্ধ্যের সময় এখানেই চলে এস। তুমি নিজে মোতায়েন থাকলে কাজ ভাল হবে, ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা এলার্ম ঘড়ি দিয়ে দেব, চারটে থেকে উঠে কাজ শুরু করে দিও।"

"হাঁ হাঁ—ই কোন্ বড়ি বাত্ হ্যায়।"

"তাহলে তোমার সঙ্গে ওই কথা রইল।"

নিখিলবাবু তারপর ওঝাজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ওঝাজি কুলি সাপ্লাই করবেন। ঝাড়ু দেওয়া, সামিয়ানা টাঙানো, জল-তোলা—এসব আপনার কুলিদের দিয়ে আপনাকেই করাতে হবে। আমার কাছে চারটে বড় বড় ড্রাম্ আছে, আপনার কাছে ক'টা আছে—"

"দশঠো—"

"আরও গোটা পাঁচ ছয় চাই। বড় বড় কলসীও আনিয়ে রেখেছি আমি কিছু। সব জল ভরাতে হবে। অনেক কুলি চাই, এই ভারগুলো আপনি নিন—"

হাত-জোড় করিয়া ওঝাজি বলিলেন, "লেঙ্গে—"

"আর রমেশ—"

নিখিলবাবু রমেশবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"বলুন—"

"তোমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছি। আমিষ আর নিরামিষ তিনটে ব্যাচ্ তিন জায়গায় খাবে। যারা খালি নিরামিষ তারা এক ঘরে, যারা মাছ আর নিরামিষ তারা এক ঘরে, আর যারা সব খাবে তারা এক ঘরে। মাছ-মাংসের ব্যাপারটা চোয়ারীতে ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—"

"তার মানে তিন ব্যাচ ছোকরা চাই?"

'ছ' ব্যাচ্ চাই। তিন ব্যাচ্ পরিবেশন করবে, আর তিন ব্যাচ্ রান্না ঘর থেকে ওদের হাতে জিনিস তুলে দেবে।"

রমেশবাবু একটু ভাঁড় প্রকৃতির লোক। চেহারাও ভাঁড়ের মতো। বেশ মোটা সোটা, মুখখানিও গোলগাল। নিখিলবাবুর কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিলেন, তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"কি, পারবে না?"

"পারব না বললে চলবে কেন, পারতেই হবে। আমি ভাবছি ছোঁড়াগুলোর কথা, জানেনই তো, আজকাল ছোঁড়াদের ব্যাপার। উত্তর দিকে যেতে বললে দক্ষিণে যাবে, পুবে যাবে, কিন্তু উত্তর দিকটিতে কিছুতে যাবে না। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে তো, তাই ভাবনায় পড়ে গেছি—"

"কেন, জন্তু, বঙ্কিম, বাজন, তোমার নাতি সুদো, এরা তো ছেলে খারাপ নয়—"

"আজ্ঞে, ওই ওপর-ওপরই ভালো। প্রত্যেকটির আঁটিতে টক। সেদিন জ্ঞানচাঁদের ছেলে

রাত্রে হাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে গল্প করছিল, আমাকে দেখে বিড়িটি ফেলে দিলে অবশ্য, এ খাতিরটুকু এখনও করে, কিন্তু তাকে যেই বললাম, বাবা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে, বাড়ি যাও। উত্তরে কি বললে জানেন, আজকাল ডাক্তারেরা বলে ওপ্‌ন এয়ারে শরীর ভাল থাকে। তখন আমাকে বলতে হল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ—আমারই ভুল হয়েছে, রঘুসিংয়ের নিমোনিয়া হয়েছে শুনলাম। সত্যিই তো, তার নাক দিয়ে পাম্‌প্‌ করে ঠাণ্ডা ঢোকানো হয়েছিল, মনে ছিল না কথাটা আমার—"

একটু থামিয়া চোখ বড় বড় করিয়া তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"প্রত্যেকটি ডেঁপো।"

গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিলেন—"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সীয়ারাম—"

নিখিলবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমাদেরই বংশধর তো সব।"

সুবাতালী হাসিয়া ফোড়ন দিলেন, "আপনা আপনা জোয়ানি ইয়াদ করো ভাই।"

এ আলোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না। রাধানাথ গোপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা। তিনি খাতা হইতে সূর্যসুন্দরের অবস্থা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এটিও নিখিলবাবুব বন্দোবস্ত। তাঁহার নির্দেশ অনুসারেই রাধানাথ গোপ প্রতিদিন ডাক্তারের রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। এই ব্যবস্থা করিয়া নিখিলবাবু এক ঢিলে দুইটি পাখি মারিয়াছেন। প্রথমত যাহারা দলে দলে আসিয়া ডাক্তারবাবুর খবর লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, তাহাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে ডাক্তারবাবুকে বাঁচানো হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, রাধানাথ গোপকে একটা কাজ দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবুর ধারণা তাঁহাকে কাজ না দিলে তিনি অকাজের সৃষ্টি করিবেন।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া রাধানাথ বলিলেন, "অনেক ভাল আছেন আজ ডাক্তারবাবু। হয়তো এ যাত্রা সামলেও যেতে পারেন পীরবাবার কৃপায়।"

সুবাতালী তহশিলদার উপরে হাত তুলিয়া বলিলেন, "খোদা কি মরজি—"

নিখিলবাবু রাধানাথ গোপকে পুনরায় মনে করাইয়া দিলেন, "তোমাকে কলা-পাতার ভার দিয়েছি, মনে থাকে যেন। এক হাজার কলাপাতা চাই।"

"খুব মনে আছে। ব্যবস্থাও করেছি। এ তো আমাদেরই নাতবোয়ের সাধ। এ কথা মনে থাকবে না? আচ্ছা, আমি চলি—"

তিনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

উষার বড় ছেলে 'এক' আসিয়া খবর দিয়া গেল—"দাদুর চান খাওয়া সব হয়ে গেছে। আপনাদের ডাকছেন—"

"আমি একাই একবার দেখা করে আসি আগে। একসঙ্গে গিয়ে ভীড় করা ঠিক হবে না।"

"তাই যান।"

নিখিলবাবু উঠিয়া গেলেন।

।। আট।।

দ্বিতীয় আটচালাটিতে আড্ডা জমাইয়াছিল গ্রামের যুবকবৃন্দ। রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গোপাল তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল ওঝাজির তিন ছেলে শিউনাথ, দেবনাথ এবং জিলন। আর ছিল স্বর্গীয় ধাড়ী হালুয়াই-এর দুই পুত্র ঘোটন ও লোটন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ গল্প শুনিতেছিল।

কৃষ্ণকান্ত জমাইয়া শিকারের গল্প শুরু করিয়াছিলেন।

"বাঘ শিকারের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে মাচায় বসে শিকার করা। যে জঙ্গলে বাঘের খবর পাওয়া যায় সেই জঙ্গলে প্রথমে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় কোন দিকে বাঘটার থাকা সম্ভব, কোন রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কোথায় ঘুমোয়, কোথায় জল খায়। এসব জানবার পর তার যাতায়াতের রাস্তায় একটা মোষ বেঁধে রাখা হয়। মোষটিকে যদি বাঘে মারে তাহলে সেই মরা মোষটার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা উঁচু মাচা বেঁধে তার উপর বসে থাকতে হয়। বাঘের স্বভাব হচ্ছে—গরু বা মোষ মেরে তখ্‌খুনি তার সবটা খেয়ে ফেলে না, রক্তটা খেয়ে তারপর আধ-খাওয়া করে সেটাকে ফেলে রেখে বাঘ চলে যায়। তারপর দিন এসে বাকিটা খায়। সেই সময়ই তাকে মারতে হয়। কিন্তু আমি যে গল্পটা বলছি তাতে মাচার ব্যাপার নেই। আমি একটা প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠে বসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল অ্যালফ্রেড। এ লোকটিকেও অ্যালফ্রেড দি গ্রেট বললে অন্যায় হয় না, যদিও সে সায়েব নয়। কুচকুচে কালো সাঁওতাল ক্রিশ্চান। আমার বেয়ারার পদে বাহাল ছিল সে, কিন্তু আসলে ছিল আমার শিকারের বন্ধু। চেহারাটা অনেকটা বাঁদরের মতো। বেঁটে, রোগা, তরতর করে গাছে উঠতে পারত, গাছের ডাল ধরে ঝুলে সড়াক করে অন্য গাছে চলে যেতে পারত। হাসলে চোখ-মুখের চামড়া কুঁচকে যেত, বুজে যেত চোখ দুটো, বেরিয়ে পড়ত হলদে দাঁতের সারি! চোখের রং ক'টা ছিল। তাকে দেখে সাঁওতাল মনেই হত না! শুনেছিলাম তার বাপ না কি সায়েব ছিল। এই অ্যালফ্রেড ছিল জঙ্গলের একটি সেরা গোয়েন্দা। জঙ্গলের কোথায় কি হচ্ছে সব তার নখদর্পণে। কোথায় শম্বর আছে, কোন পাহাড় থেকে দুর্ধর্ষ বুনোশুয়াররা নাবে, কোথায় ভালুকের আস্তানা, ময়ালসাপ কবে কোথায় হরিণ ধরেছিল—সব খবর তার জানা! সেই আমাকে একদিন খবর দিলে যে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যে নদীটা চলে গেছে তারই একটা বাঁকে একটা বাঘ প্রায়ই জল খেতে আসে সন্ধ্যা বেলা। বাঁকটার ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড একটা গাছও আছে, তাতে চড়ে যদি বসে থাকি, তাহলে বাঘটাকে অনায়াসে মারা যায়। অ্যালফ্রেড বললে, কাছাকাছি দ্বিতীয় আর একটা গাছও আছে সেটাতে সে থাকবে। লোভ হল। একদিন গিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। আমার বাংলো থেকে বেশ দূরে। মোটরে করে মাইল দশেক যেতে হবে, তারপর আর মোটর চলবে না। হাঁটতে হবে জঙ্গলের ভিতর। তা-ও প্রায় মাইল দুই। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে খুব ভালো লাগে। সরু সরু পথ আছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। কাঠুরেরা রোজ যায় সেই সব পথ দিয়ে সকাল বেলা। সমস্ত দিন বনে বনে কাঠ কাটে, সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসে আবার। চমৎকার লাগে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব, মাঝে মাঝে রোদের আভাস, কোথাও আলোছায়ার অদ্ভুত আলপনা, কাঠঠোকরার ডাক, বনমুরগীর ডাক, তিতিরের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে; দু'পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, প্রত্যেক গাছে লতাও জড়িয়ে আছে। লতা বললেই সাধারণত আমাদের মনে যে রকম নরম-নরম রোগা পাতলা মেয়েলি ধারণা হয় এসব সেরকম লতা নয়। বেশ বলিষ্ঠ লতা সব, কাছির মতো শক্ত।"

"হাঁথীও বান্‌হা যায়?"

প্রিয়গোপাল সরল লোক। সে বিস্ফারিত নেত্রে উৎকর্ণ হইয়া কৃষ্ণকান্তের অরণ্য বর্ণনা শুনিতেছিল। অনেক প্রশ্নই মনে জাগিতেছিল তাহার, কারণ শুধু সে সরল নয়, কৌতূহলীও।

কিন্তু কাছির মতো লতার কথা শুনিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে উক্ত প্রশ্নটি করিয়া বসিল।

"হাতী বাঁধা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখি নি আমি। তবে খুব সম্ভবত যায়।"

রামপ্রসাদ একটু ফক্কোড় প্রকৃতির। সে হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয় গোপালকে বলিল—"তাহলে তুই এক কাজ কর না। তোর ভুসির ব্যবসা ছেড়ে এই লতার ব্যবসা আরম্ভ করে দে। জামাইবাবুকে ধরলেই উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। অমন মজবুত লতা যখন, খুব বিক্রি হবে।"

প্রিয়গোপাল চটিয়া গেল। চটিয়া গেলে সে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে।

"দেখো রামপ্রসাদ, ফাজলামি করিও না।"

স্থূলকায় শিউনাথ গল্পে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হইল।

" আরে ভাই কচ্-কচ্ নেহি করো। জামাইবাবু আপনি বলুন তারপর কি হল।"

"তারপর একদিন গিয়ে সেই গাছে চড়লাম।"

"কখন গেলেন? রাত্রে?"

"না, সূর্যাস্তের প্রায় ঘণ্টা দুই আগে গিয়েছিলাম। তার আগেরদিন ছোটখাটো একটা মাচাও বাঁধিয়ে রেখেছিলাম গাছের উপর।"

"কি দিয়ে বানালেন?" —ঘোটন প্রশ্ন করিল।

ঘোটন হালুয়াই (ময়রা) এখন আর জাত-ব্যবসা করে না। সে এখন কন্ট্রাক্টারি করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সে কৌতূহলী।

"খড় বাঁশ আর গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়ে। পাতাসুদ্ধ ডাল কেটে আড়ালও তৈরি করতে হয়, যাতে বাঘ বুঝতে না পারে যে গাছের উপর কেউ বসে আছে, বা গাছের উপর মাচা বাঁধা হয়েছে।"

"ওতে কি মাচান বেশ মজবুত হয়?"

ঘোটন পুনরায় প্রশ্ন করিয়া ভ্রাতা লোটনের দিকে চাহিল। সে যে বোকা নয়, বুদ্ধিমান—তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা লোটনের নিকট জাহির করিবার কোনও সুযোগ সে ত্যাগ করে না। লোটনের ধারণা ঘোটন জ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু উজবুক। কনিষ্ঠের এ ধারণা অপনোদন করিবার জন্য সে সর্বদা ব্যগ্র। দুই ভাই অনেকদিন পূর্বেই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কন্ট্রাক্টারি করিতে গিয়া ঘোটন প্রায় সর্বস্বান্ত, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে লোটনের কাছে হাত পাতিতে হয়, লোটনও যতটা পারে জ্যেষ্ঠকে সাহায্যই করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্বন্ধে তাহার ধারণা উচ্চ নহে।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দিলেন "যতটুকু হয় কাজ চলে যায় তাতে। একজন বা বড় জোর দু'জন এক রাত্তির বা দু' রাত্তির কাটাতে পারলেই হল। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া তো কাজ নেই। বেশী মজবুত করতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়েছিলাম একবার—"

"কি রকম?"

ঘোটনই প্রশ্ন করিল আবার।

রামপ্রসাদ অর্ধ-স্বগতোক্তি করিল—"লোটন এবার আর টাকা দিচ্ছে না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একবার একটা গাছের উপর ছোট একটা চৌকি তুলিয়া তার

পায়াগুলো বেশ মজবুত করে বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম গাছের ডাল-পালার সঙ্গে। খুব মজবুত হয়েছিল। অনেকগুলো 'বাগ' মেরেছিলাম। প্রায় শতখানেক হবে।"

"বলেন কি?"

"হ্যাঁ হে, অসংখ্য ছারপোকা ছিল চৌকিটাতে!"

জিলন এবং দেওনাথ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজি পড়িতেছে, 'বাগ্' মানে যে চারপোকা তাহা তাহারা জানে। যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা ব্যাপারটার রস ঠিক উপভোগ করিতে পারিল না। জিলন জিজ্ঞাসা করিল—"আসল বাঘ শিকারের কি হল?"

"হল না। বাঘ এল, সামনে দিয়ে হেলে দুলে চলে গেল। আমি রাইফেল তোলবার পর্যন্ত সমস্ত পেলাম না। চৌকির বাগ সামলাতে আমি ব্যস্ত তখন। তারপর থেকে গাছের ডাল দিয়েই মাচা বানাই—"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বলিল, "তারপর কি হল বলুন। বিকেলে গিয়ে সেই মাচানে চড়লেন?"

"আপনি গাছেও চড়তে পারেন বুঝি?"

"পারি। কিন্তু ওটাতে চড়েছিলাম মই দিয়ে। অনেক উঁচুতে মাচা বাঁধতে হয় কিনা। মাটি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট উঁচুতে—"

"অত উঁচুতে কেন?"

"তা না হলে বাঘের ধরবার সম্ভাবনা থাকে। বাঘ উনিশ কুড়ি ফুট অনায়াসে উঠে পড়তে পারে—"

প্রিয়গোপাল বিস্মিত হইল এ কথায়।

"গাছে চড়ে যায় বিল্লিরই মতো!"

"হ্যাঁ, বিল্লিরই জাত তো।"

এইবার প্রিয়গোপাল অদ্ভুত প্রশ্ন করিল একটা।

"আচ্ছা, বাঘ বিল্লির মতো মুসা ভি খায়?"

মুসা মানে ইঁদুর।

"বাঘ না খায় এমন জিনিস নেই। গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ, শম্বর, নীলগাই, শেয়াল কুকুর এমন কি বাঘ পর্যন্ত। শুনেছি কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু বাঘের মাংস বাঘে খায়।"

"তা হলে মুসা ভি খায় জরুর—"

"এক-একবারে হাজারখানেক মুসা না খেলে তো ওর পেটই ভরবে না। মেহনতে পোষাবে না।"

"পেলে খায় জরুর।"

শিউনাথ ধমকাইয়া উঠিল।

"আরে ভাই বেকার কচকচ নেহি করো। বলুন আপনি গল্প বলুন।"

রামপ্রসাদ যোগেনের কানে কানে চুপি চুপি বলিল—"মুসাতে ওর বোরা বোরা ভুসি কেটে সাফ করে দিচ্ছে। তাই বাচ্চুর মুসার উপর রাগ। তিনটে বিল্লি পুষেছে—"

উচ্চকণ্ঠে যে কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "জামাইবাবু আপনি এবার গিয়ে ওকে একটা বাঘের বাচ্চা পাঠিয়ে দিন। তা না হলে ওর ভুসির ব্যবসা তো গেল।"

"ফাজলামি করিও না রামপ্রসাদ বলে দিচ্ছি।"

"তোমরা গল্প শুনবে, না, ঝগড়া করবে"—আবার ধমকাইয়া উঠিল শিউনাথ। কৃষ্ণকান্ত ইতিমধ্যে একটি দিয়াশলাই কাঠি কানে ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিয়া কান চুলকাইতেছিলেন। সকলে থামিয়া গেলে আবার শুরু করিলেন।

"তিনটে নাগাদ মাচার উপর গিয়ে উঠে বসলাম। বনের ভিতর তিনেটের সময়ই মনে হয় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অ্যালফ্রেড উঠল আর একটা গাছে, সেটার উপরও মাচা বানানো হয়েছিল। তার কাছেও একটা রাইফেল ছিল।"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় কর্ণ-বিবরে কাঠি ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিলেন।

"তারপর?"

"তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। বাঘ-শিকারে এই বসে থাকাটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শুধু বসে থাকা নয় একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকা। অনড়, অচল হয়ে বসে থাকতে হবে। সিগারেট খাওয়া চলবে না, নস্যি নেওয়া চলবে না—"

"কেন—"

শিউনাথ প্রশ্ন করিল এবার। সে একটি পাকা সিগারেট-খোর। তখনও তাহার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল একটি। সিগারেটহীন হইয়া এক নিদ্রা দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু করা সম্ভব তাহা তাহার চিন্তার অতীত।

"সিগারেটের গন্ধ পেলে বাঘ সরে পড়ে। তার সন্দেহ হয়। যে কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ পেলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে সে। বড় বড় শিকারীরা আতর এসেন্স মেখেও শিকারে যেতে বারণ করেছেন। বাঘের ঘ্রাণশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুই-ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চোখের দৃষ্টিও। তাই রংচঙে ডগমগে জামা-কাপড় পরেও শিকারে যাওয়া মানা। খাকি কিম্বা পাঁশুটে রঙের পোশাক ছাড়া অন্য কিছু চলে না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাওয়া চাই। ঢিলে-ঢালা কাপড় পাঞ্জাবিও চলবে না, হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরতে হবে। বাঘ যদি গাছের দিকে তাকায় এবং শিকারীকে যদি দেখতে পায়—তা হলেও সে যেন ভাবে ওটা গাছেরই একটা অংশ। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে।"

যোগেন এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এইবার বলিল।

"এ তো তা হলে একটা তপস্যা বলুন।"

"নিশ্চয়, তপস্যা বই কি। একটু শুধু তফাত আছে, তপস্বী চায় ভগবান, শিকাবী চায় বাঘ।"

এ রসিকতায় অনেকেই হাসিয়া উঠিল, হাসিল না প্রিয়গোপাল। তাহার কেমন যেন খটকা লাগিল। কোনও যুক্তির বা উক্তির খুঁত থাকিলে তাহার মন হোঁচট খায়। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "খালি বাঘ চায়? ভালুক, শুয়োর, ই সব?"

"হ্যাঁ, ইসবও চায়। আমারই ভুল হয়েছে, বলা উচিত ছিল, শিকার চায়। তবে যে শিকারী বাঘের আশায় বসে আছে সে ভালুক বা শুয়োর দেখে ফায়ার করে না। করলে বাঘ ভড়কে যাবে।"

"তারপর কি হল বলুন—"

"গাছের মাচার উপর ঠায় বসে রইলুম ঘণ্টা দুই। তারপর হঠাৎ ময়ূরের ডাক শোনা গেল। বুঝলাম বাঘ বেরিয়েছে এবার—"

"বাঘ বেরুলে ময়ূর ডাকে নাকি?"

"হ্যাঁ, আর ডাকে এক রকম হরিণ, ইংরাজিতে তার নাম 'বার্কিং ডিয়ার', ওদেশে বলে কোটরা হরিণ। এদের ডাক শুনলে শিকারীরা বুঝতে পারে বাঘ বেরিয়েছে। অনেক সময় শম্বরের ডাকও শোনা যায়—" "শম্বর কি?"—-প্রিয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিল।

"এক জাতের বড় হরিণ।"

"ভঁইসের মতো? না, তার চেয়েও বড়ো?"

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল শিউনাথ।

"কি পাগলের মতো যা তা জিজ্ঞেস করছ। আপনি গল্প বলুন জামাইবাবু। ওর কথায় কান দেবেন না।"

প্রিয়গোপাল রুখিয়া উঠিল।

"আমার যা জানবার তা জেনে লিব না? তুমি আমাকে মানা করবার কে আছ। জামাইবাবুকে আর কদিন পাব। যা শিখবার শিখে লি—"

কলহের উপক্রম হইল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "শম্বর বেশ বড় হরিণ। একটা গরুর মতো প্রায়। খুব প্রকাণ্ড শিং থাকে ওদের মাথায়। ডাল-পালা-ওলা চমৎকার শিং—"

রামপ্রসাদ ফোড়ন দিল—"তুই ভঁইস্ বেচে দিয়ে একটা শম্বর কেন গোপলা। জামাইবাবু, শম্বর কিনতে পাওয়া যায় কি?"

প্রিয়গোপাল রামপ্রসাদের দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

"বলুন আপনি, তারপর কি হল। এদের কথার জবাব দিতে গেলে আর গল্প বলা হবে না আপনার।"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

"একটু পরেই বাঘ দেখা গেল। অ্যাল্‌ফ্রেড্ ঠিক খবরই দিয়েছিল। নদীর বাঁকে এসে জল খাচ্ছে। করলাম ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল বাঘটা, গুলি লেগেছে কিনা বুঝতে পারলাম না, কারণ লাফিয়ে উঠেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি মারবার আর ফুরসৎ পাওয়া গেল না।"

"গুলি নিশ্চয় লাগলে পড়ে যেত, না কি?"

"গুলি যদি মাথায় লেগে ব্রেনে ঢোকে, কিংবা বুকে লেগে হার্টে ঢোকে—তাহলেই বাঘ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। অন্য জায়গায় লাগলে পড়ে না। তখন একটা গুলিকে ওরা গ্রাহ্যও করে না। পায়ে কিংবা ঘাড়ে গুলি খেয়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। আর সেই চোট্ খাওয়া বাঘ বড় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে তখন।"

"কি করলেন আপনি?"

"দু' এক মিনিট চুপ করে বসে থেকে আর একটা ফায়ার করলাম যে বনে সে লাফিয়ে ঢুকেছিল সেই বনটাকে লক্ষ্য করে। অ্যালফ্রেডও তাই করলে।"

"কেন?"

"যদি বাইচান্স লেগে যায় আরও ঘায়েল হবে, কিম্বা তেড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে চার্জ করবে, কিম্বা আরও দূরে যাবে।"

এইবার গল্পটা জমিয়াছিল।

উৎসুক শিউনাথ এমন মুখভাব করিয়া শুনিতেছিল যেন সে-ই এই দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।

"কি হল দ্বিতীয়বার ফায়ারের পর?"

"সরেই পড়ল। আর দেখতে পেলাম না। তখন একটা 'সিটি' মেরে অ্যালফ্রেডকে ডাকলাম। সে-ও সিটি মেরে সাড়া দিলে।"

"সিটি?"

"হ্যাঁ, মুখে আঙুল পুরে খুব জোরে সিটি দেওয়া যায়। বনে জঙ্গলে মনে হয় কোনও পাখি বুঝি ডেকে উঠল। শিকারীরা সিটি দিয়ে পরস্পরের খবর নেয়। সিটি শুনে অ্যালফ্রেড্ নেবে এল, আমিও নাবলুম।"

"তারপর?"

"তারপর বন্দুক রি-লোড করে রওনা দিলুম বাড়ির দিকে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার। একটা বাঘের উপর গুলি চলে গেছে কিন্তু সে মারা পড়েনি। এ অবস্থায় বনের ভিতর দিয়ে হাঁটা খুবই দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু প্রাণ হাতে করেও অনেক সময় এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়। অনেকে এই করতে গিয়ে মারাও পড়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা সেবার বেঁচে গেলাম। বরং জঙ্গল থেকে বেরিয়েই চিতল পেয়ে গেলাম একটা।"

"চিতল মাছ?"

"না, চিতল হরিণ। রাত্রে গিয়ে মাংসের ঝোল আর ভাত খাওয়া গেল।"

"হরিণের নামও চিতল হয় না কি?"

"হ্যাঁ। গায়ে চিতা চিতা দাগ থাকে বলে ওদের নাম চিতল।"

"বাঘটাকে ছেড়ে দিলেন?"

"পাগল! ও বাঘকে কখনও ছেড়ে দেওয়া যায়। পরদিনই তার খোঁজ করবার জন্য লোক লাগালাম। বিকেলে অ্যাল্‌ফ্রেডের এক অনুচর এসে খবর দিলে যে সে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে, শুধু দেখতে পায়নি, রক্তের দাগ ধরে সে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছে। তার ধারণা নদীর ওপারে যে দুটো পাহাড় পাশাপাশি আছে বাঘটা সেই পাহাড় দুটোর মাঝখানের সঙ্কীর্ণ গলির মতো জায়গায় ঢুকে বসে আছে। সে দুর্গম স্থান। দু পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখানের সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকু কাঁটার জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তা ছাড়া তার ভিতর দিয়ে একটা ঝরনার ধারাও বেরিয়ে আসছে। সেখানে ঢুকে বাঘ শিকার অসম্ভব।"

"কি করলেন তাহলে?"

"অবস্থা অন্য রকম হলে" ছেড়ে দিতাম, কিন্তু যে বাঘ গুলি খেয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে মারতেই হবে এই শিকার-শাস্ত্রের আইন। ছেড়ে দিলে ওই জখম বাঘরাই

শেষে মানুষখেকো বাঘ হবে। সুতরাং সেইখানে লোক মোতায়েন করে রাখা হল বাঘটা বেরোয় কি না, দেখবার জন্য। কাছাকাছি সুবিধে মতো জায়গা বেছে মাচাও বাঁধা হল একটা, আর একটা ছাগল বেঁধে রাখা হল সেই মাচার কাছাকাছি। আর দিনরাত সেখানে বসে পাহারা দিতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিন এল না, দ্বিতীয় দিনও এল না। তবু দোনো-মোনো করে তৃতীয় দিনও বসলাম গিয়ে মাচায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন পাত্তা নেই। ছাগলটা সমানে ডেকে চলেছে। মশার কামড় অগ্রাহ্য করে ঠায় বসে আছি। পাশে অ্যালফ্রেড। হঠাৎ ছাগলের ডাকটা পট করে থেমে গেল। বাঘের গোঙরানি আওয়াজও পেলাম। অ্যালফ্রেড সঙ্গে সঙ্গেই spot light ফেলতেই দেখতে পেলাম বাঘটা ছাগলটাকে ধরেছে। ছাগলটা ছটফট করছে আর বাঘটা সেখানেই বসে তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। আবার লাফিয়ে উঠল ব্যাটা, এবার কিন্তু আর পালাতে পারল না, পড়ে গেল সেখানেই। আর একটা ফায়ার করলাম। ব্যাঘ্র-লীলা শেষ হল তার।"

"প্রথম গুলিটা লাগেইনি?"

"লেগেছিল, ভাল করে' লাগেনি। ঘাড়ে লেগেছিল, কিন্তু বেঁধেনি! দ্বিতীয় গুলিটা মাথায় লেগেছিল, তৃতীয়টা পেটে।"

বাঘের গল্প আরও কিছুদূর হয়তো চলিত, কিন্তু পোস্টমাস্টারবাবু আসিয়া একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, ডাকের চিঠি-পত্র তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন। চিঠিগুলি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া সহসা তিনি করজোড়ে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, 'জামাইবাবু' আমি গরীব। আমাকে রক্ষা করুন।'

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন।

।। নয় ।।

"কি ব্যাপার, কে আপনি?"

"আমি এখানকার পোস্টমাস্টার। নতুন এসেছি বদলি হয়ে। এখানকার হাল-চাল কিছুই জানি না। বড়ই বিপদে পড়ে গেছি জামাইবাবু!"

"কেন, কি হল?"

"একদিন রাত্রে একটা জরুরি তার এল কুমারবাবুর নামে। রাত্রে তার এলে এখানে রাত্রে সেটা ডেলিভারি হয় না, কারণ কোনও পিওন রাত্রে থাকে না। 'তার'টা সকাল বেলা পাঠিয়ে দিলাম। রাধানাথবাবু বলছেন—অত জরুরি তার আমার নিজেরই এসে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পোস্টমাস্টার নিজে বাড়িতে গিয়ে 'তার' দিয়ে আসবে এ রকম কানুন তো কোথাও নেই।"

শিউনাথ মন্তব্য করিল—"এখানকার কানুন আলাদা, আপনার দিয়ে আসাই উচিত ছিল। আপনার আগে ছিলেন নিয়ামৎ আলী, জরুরি তার রাত্রে এলে নিজেই দিয়ে যেতেন বাড়িতে। দুঃসংবাদ থাকলে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা সে-খবর জেনে তবে দিতেন। ডাক্তারবাবুর বাড়ির 'তার', আপনার দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বই কি।"

"আমি নতুন লোক, কিছুই জানতাম না।"

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "তাতে হয়েছে কি। আর আমাকেই বা এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন, আমি কি করতে পারি।"

"আপনি রাধানাথবাবুকে বলুন একটু, তিনি আমার নামে রিপোর্ট করেছেন। আপনি জামাই মানুষ, আপনার অনুরোধ উনি রাখবেন।"

"রাধনাথবাবুর রিপোর্ট কি খুব মারাত্মক হবে?"

"হবে। তিনি আমার নামে লিখেছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, তিনি ওঁর জামাই। আর পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার নামে লম্বা এক ডি. ও. এসেছে জবাবদিহি চেয়ে—আমি কেন পাবলিকের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করছি। তাতে আরও লেখা আছে—এন্‌কোয়ারি করবার জন্যে একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টার আসবেন, আমি যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকি। দোষ সাব্যস্ত হলে শাস্তি হবে। মানে রাধানাথবাবু যা বলবেন তাই হবে। আমি বিরুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই টেলিগ্রামটা করেছিলেন, তিনি খুব চটে আছেন দেখলাম। বললেন, আমাব শাস্তি হওয়াই উচিত। কুমারবাবু বললেন, আমি ওসবের মধ্যে থাকতেই চাই না। আমি রাধানাথবাবুকে কিছু বলতে গেলে তিনি আমাকেই ধমকে দেবেন। আপনি যদি কাকাবাবুকে দিয়ে বলাতে পারেন কাজ হবে, উনি কাকাবাবুর ছাত্র। চন্দ্রবাবুর কাছে গেলাম। তিনি ভদ্র ব্যবহার করলেন খুব। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আমি ব্রাহ্মণ শুনে আমার পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, অতিবৃদ্ধপিতামহের নাম এই সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ঠাকুরদার বাবা কিম্বা ঠাকুরদার নাম আমি জানতাম না। এইতেই খুব চটে গেলেন তিনি মনে হল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—গায়ত্রী জানি কিনা। গায়ত্রী সেই বিশ বছর আগে শিখেছিলাম, তা কি আর মনে আছে? বললাম সে কথা। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, সন্ধ্যাহ্নিক করেন না রোজ? সত্যি কথাই বলতে হল, করি না। এ শুনে তিনি ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার দিকে, তারপর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, সুবিধা হবে না। যোগেনবাবু তখন বললেন, আপনি জামাইবাবুদের মধ্যে কাউকে যদি অনুরোধ করেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। জামাইদের খাতির হয়তো উনি রাখবেন। আপনি যদি একটু দয়া করেন গরীবের উপকার হয়।"

কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

"আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো নেই ভদ্রলোকের, তবে আপনি যখন এত করে বলছেন তখন অনুরোধ করে দেখব। ওই যিনি মুখের সামনে মাঝে মাঝে হাত চাপা দেন, তিনিই তো রাধানাথবাবুর—"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, তিনিই।"

"আচ্ছা, আমি বলব।"

পোস্টমাস্টারবাবু চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"লোকটা একের নম্বর হারামি। ঠিক করেছেন রাধানাথবাবু।"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিছু তো দোষ করেনি বেচারা। আইনত ওর কোন দোষ নেই।"

"সব সময় আইন চালাতে গেলে কি চলে জামাইবাবু। সেদিন আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছিল, মনি-অর্ডারটা নিলে না।"

রমেশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

রামপ্রসাদ বলিল, "এই রমেশবাবুকে জিগ্যেস করুন না।"

রমেশবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কৃষ্ণকান্তের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

"এই এখানকার পোস্টমাস্টারবাবুর কথা হচ্ছে।"

"এসেছিল বুঝি তোমার কাছে। তুমি রাধানাথকে বললে হয়তো বেঁচে যাবে বেচারা। তা না হলে ওর অদৃষ্টে দুঃখ আছে।"

"যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বেচারার তেমন দোষ নেই বিশেষ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেলিগ্রাম আর কোন পোস্টমাস্টার দিয়ে আসে বলুন।"

রমেশবাবু চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

রমেশবাবুর মুখখানা চাকার মতো গোল এবং তালের মতো নিভাঁজ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। বেশ ভারিক্কি গোছের চেহারা। যখন কাহারও সহিত কথা বলেন বাম হাতটি পিছন দিকে কোমর এবং পিঠের সন্ধিস্থলে স্থাপন করেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণকান্তের মন্তব্যটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর পুনরায় কৃষ্ণকান্তের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পৃষ্ঠস্থ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি একবার খুলিয়া আবার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। উত্তেজিত হইলে এরূপ করেন।

"দেখ বাবা, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। আমাদের এ গ্রামটি ছোট এবং সেকেলে। অনেক কিছুই নেই এখানে। ট্রাম, মোটর, ফোন, সিনেমা—এসব কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে। এখনও আছে। এই গ্রামের ডাক্তার, মাস্টার, দারোগা, স্টেশন মাস্টার, পোস্ট মাস্টার, কাছারির ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, মানে গ্রামের ছোট বড় সবাই আমরা একটি পরিবারের মতো বাস করি। এতকাল করে এসেছি, আর যতদিন আমরা থাকব ততদিন করব। আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ নিতে হবে। এই এখানকার আইন—অন্য কোন আইন চলবে না এখানে। খোদ লাটসাহেবও যদি এখানে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও আমার দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানতে টানতে পাশার আড্ডায় বসতে হবে। এখনও এই ভাবটি বজায় আছে আমাদের। থাকবেও আমরা যতদিন আছি। ওই টেলিগ্রামটি রাত্রে না দিয়ে ওই পোস্টমাস্টার গ্রামসুদ্ধ লোককে চটিয়েছে। ওই বুড়ো ডাক্তারবাবু আমাদের গ্রামের মাথা। তাঁকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। শুধু আমরা কেন, এ অঞ্চলের সবাই করে। তাই তাঁর নাত-বোয়ের সাধ দেওয়া হবে বলে দশখানা গাঁয়ের মাতব্বরেরা মাথা ঘামাচ্ছে। ওঁর টেলিগ্রামটা আটকে রাখা উচিত হয়নি ছোকরার। ওঁর অপমানে আমরা সবাই ক্ষুণ্ণ হয়েছি। কোনও গয়লা ওকে দুধ দেয়নি তা জান? কুমারই ওকে দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকম ব্যাপার শুধু আজ নয়, বরাবরই চলে আসছে! ডাক্তারবাবুকে অপমান করে কেউ রেহাই পায়নি কখনও। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শুনবে?"

"বলুন।"

"তখন আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, সবে এসে স্টেটের চাকরিতে বাহাল হয়েছি। ডাক্তারবাবুর তখন তুমুল প্রাক্‌টিস্‌। তিনটে বড় বড় ঘোড়া বাঁধা বাড়িতে। আর সে সব কি

সাধারণ ঘোড়া? বড় বড় পাহাড়ী ঘোড়া। সাধারণ ঘোড়া ওঁকে বইতেই পারত না। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হলে আর একটা ঘোড়ায় চড়তেন। সেটা ক্লান্ত হলে আর একটায়। এ অঞ্চলের সর্বত্র ডাক তখন ওঁর। মালদা থেকে পর্যন্ত কল আসত। হাতি আসত, নৌকো আসত, পালকি আসত, সে এক দিনই ছিল আলাদা। ডাক্তারবাবু প্রায় সমস্তদিন বাড়ির বাইরেই থাকতেন। ফিরতেন রাত্রিবেলা। ফিরেই থিয়েটারে রিহার্সালে আসতেন। ওঁর বাড়িতেই থিয়েটারের আখড়া ছিল তখন।"

"উনি থিয়েটার করতেন না কি!"

"করতেন মানে?"

রমেশবাবু সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন।

"উনি যদি ডাক্তারি না করে পেশাদার অভিনেতা হতেন তাহলে গিরিশ ঘোষ দানীবাবুর মতোনই হতে পারতেন। সীতার বনবাসে উনি রামের পার্ট যা করতেন তেমনটি আর কখনও দেখিনি। সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে রোজ রিহার্সাল হত। এ হাসপাতাল তখন ছিল না। তখন ছিল মাটির প্রকাণ্ড একটা চোয়ারি। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ঘর, চার-পাশে বড় বড় বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার কোণে কোণে ঘর। মাঝের বড় ঘরটায় রিহার্সাল হত। রিহার্সাল দেবার জন্যে বাইরে থেকেও লোক আসত, কাটিহার থেকে সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায়ই আসত অনেক ছোকরা। বলাবাহুল্য, বিনা-টিকিটেই আসত সবাই। সবই তো চেনা-শোনা ছিল। এখানকার স্টেশনে এসে কেউ যদি বলত—'ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যাব'—কেউ আর টিকিট চাইত না। এই রেওয়াজ ছিল। হঠাৎ এক নতুন টিকিট কালেক্টার বদলি হয়ে এল। ছোকরা যেমন তিরিক্ষি মেজাজের, তেমনি দুর্মুখ। একদিন তার খপ্পরে পরে গেল কাটিহারের ভূষণ। আলিবাবার রিহার্সাল হচ্ছে তখন, ভূষণ আবদাল্লা সাজবে, সপ্তাহে দু'দিন রিহার্সাল দিতে আসে। যথারীতি সে উইদাউট্ টিকিটে এসেছে। নতুন টিকিট কালেক্টার কপালের উপর ভুরু তুলে বলে উঠল—'ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব মানে? ডাক্তারবাবু কি রেল-কোম্পানীর মালিক, না জামাই? ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব বললেই ছেড়ে দিতে হবে!' ভূষণ রুখে উঠল এ কথায়। পকেট থেকে পেনালটি সুদ্ধ গাড়ি-ভাড়া বার করে বললে ডাক্তারবাবু কে, তা দু'দিন পরে জানতে পারবেন। এই নিন্, ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন আমাকে। রসিদটি পকেটে পুরে চলে এল ভূষণ। ডাক্তারবাবু সেদিন এক দূরের কলে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন—শক্ত রোগী, ফিরতে হয়তো দিন দুই দেরি হবে। তবু আমাদের রিহার্সাল বসল। ভূষণ আমাদের কারো কাছে কথাটি ভাঙলে না। চুপি চুপি ভাঙলে কেবল উদিৎ সিংয়ের কাছে। উদিৎ সিং নামে ডাক্তারবাবুর এক সিপাহী ছিল তখন। লিক্‌লিকে সরু চেহারা, কিন্তু খাপ-খোলা তরোয়াল একটি। সর্বদাই মারমুখী হয়ে থাকত। তার ভয়ে থর থর করে কাঁপত সবাই। ডাক্তারবাবুর জমি বাগান ঘর দুয়ারের সেই ছিল রক্ষক। ডাক্তারবাবুকে ভক্তি করত দেবতার মতো।

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল, যেই সে শুনলে যে নতুন টিকিটকালেকটার ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে অপমানসূচক কথা বলেছে। তারপর দিন হাটবার ছিল। ডাক্তারখানার সামনেই হাট। তারপর দিন টিকিটকালেকটার এসেছে হাট করতে। আর যাবে কোথা, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর উদিৎ সিং, গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এল তাকে হাসপাতালের সামনে। বললে, 'ডাক্তারবাবুর নামে কাল কি বলেছ হারামজাদা, শুয়ার কি

বাচ্ছা, এখন তোমার কোন বাপ তোমাকে বাঁচাবে।' জুতিয়ে লোকটাকে শুইয়ে ফেললে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেননি কল থেকে। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া উদিৎ সিংকে রোখবার সামর্থ্য আর কারও ছিল না। উদিৎ সিং লোকটাকে জুতিয়ে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বললে, 'যাও শালা, আব্ ঘরমে যাকে হালুয়া খাও।' সে কিন্তু ঘরে গেল না, গেল থানায়। থানার দারোগা ছিলেন তখন হর্‌চন্দন সিং। ডাক্তারবাবুর পরম বন্ধু। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক তাঁর চাকরের নামে নালিশ করতে এসেছে দেখে একটু অবাক হলেন তিনি। তাঁর এক হাবিলদারকে ডেকে বললেন, তুমি একটু খোঁজ করে এসো তো, ব্যাপার কি। হাবিলদারের সঙ্গে উদিৎ সিংয়েরই দেখা হয়ে গেল। বন্ধুত্বও ছিল দু'জনের। তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে দারোগা হরচন্দন সিং উপরের ঠোঁটের উপর নীচের ঠোঁটটি চড়িয়ে দাড়ির ভিতর আঙুল চালালেন খানিকক্ষণ। চমৎকার চাপ-দাড়ি ছিল তাঁর। তারপর হাবিলদারকে আড়ালে ডেকে বললেন, "এই লোকটিকে আমি হাসপাতালে পাঠাব মেডিকেল রিপোর্টের জন্য। তুমি কম্পাউণ্ডারবাবুকে বলে এস সে যেন এর জামায় খানিকটা অ্যালকহল ঢেলে দেয়; আর আমাকে যেন চিঠি লিখে জানায় যে লোকটা মত্ত অবস্থায় হাটে এসেছিল প্রথমে, তার পর হল্লা করতে করতে হাসপাতালে এল, তাই উদিৎ সিং ওকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই জন্যেই পড়ে গিয়ে নাকে লেগেছে ওর।" হাবিলদার ফিরে যাবার পর দারোগা সাহেব টিকিট-কালেকটারকে বললেন, "আপনি আগে হাসপাতালে যান, সেখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসুন, তারপর আপনার ডায়েরি লিখব।" হাসপাতালে ফিরে এল সে। হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার তখন হাবু মামা। ওই যে পাকা চাপ-দাড়ি, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই তখন ছিল কম্পাউণ্ডার। সে লোকটার ঘা ড্রেস করবার ছুতোয় তার জামায় কাপড়ে বেশ করে অ্যালকহল ঢেলে দিলে, আর দারোগা সাহেব যেমন লিখতে বলেছিল তেমনি লিখে দিলে। সেই রিপোর্টটি নিয়ে যেতেই দারোগা সাহেব হুকুম দিলেন—একে অ্যারেস্ট করে 'ঠান্ডি' ঘরে রেখে দাও। আমি এন্‌কোয়ারি করে দেখি আগে কি হয়েছে। কম্পাউণ্ডারবাবু যা লিখেছেন তা তো ভয়ানক। 'ঠান্ডি' ঘর মানে ঠাণ্ডা ঘর, যে ঘরে ঢুকলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, অর্থাৎ গারদ। হাবিলদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলে। কিছুক্ষণ পরেই কান্নাকাটি পড়ে গেল ছোকরার বাড়িতে। তার কচি বউ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল ডাক্তারবাবুর অন্দরমহলে একেবারে বউদির কাছে। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি। বউদিও তখন ছেলেমানুষ। তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাকে খেতে দিলেন। মেয়েটি বসে রইল। ডাক্তারবাবু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়েও গেল। তিনি ফিরে এসেই ছোকরাকে হরচন্দনের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। উদিৎ সিং আর ভূষণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন আর একটা কাজও করলেন তিনি। ওই টিকিটকালেক্‌টার কোয়ার্টার পায়নি, তাকে একেবারে বাড়িতে নিয়ে এলেন। মানে, একেবারে আপন করে নিলেন তাকে। সে এখন কোথায় আছে জানি না, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে আর খবর পায় যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গিন অসুখ তাহলে ঠিক ছুটে আসবে, যেখানেই থাকুক। এই হচ্ছে এখানকার দস্তুর। এই পোস্টমাস্টার টেলিগ্রাফটি আটকে রেখে বেদস্তুর কাজ করে ফেলেছে। তুমি যদি ওকে বাঁচাতে পার বাঁচাও। কিন্তু রাধানাথ গোপ একটি জাঁতি-কল। ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। তবে তুমি জামাই মানুষ, তোমার মান হয় তো রাখতে পারে। দেখ একবার বলে।"

রমেশবাবু এ প্রসঙ্গে হয়তো আরও বক্তৃতা দিতেন কিন্তু পিছন হইতে নিখিলবাবুর ধমক খাইয়া থামিয়া গেলেন।

"রমেশ তুমি এখানে বেশ আড্ডায় জমে গেছ দেখছি। আড্ডা পরে দিও, এখন পরিবেশনের ব্যবস্থাটা আগে ঠিক করে ফেল দিকি। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, কোন ব্যাচে কাকে নেবে লিস্ট কর আগে—"

"আজ্ঞে সেইজন্যেই তো এদের কাছে এসেছি। এখানে চাঁই ক'জন আছে কিনা। প্রিয়গোপাল, দেওনাথ, জিলন, ঘোটন, লোটন, রামপ্রসাদ—"

প্রিয়গোপাল বলিল, "হামাদের যা বলবেন তাই করব।"

এ আলোচনাতেও বাধা পড়িল। হাসপাতাল হইতে একটা বুক-ফাটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। সকলেই সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। দেখা গেল হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়া একটি যুবতী কাঁদিতেছে, তাহার কোলে একটি শিশু। সে যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। গতরাত্রে সে নাকি তাহার সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া ঘরে শুইয়াছিল, একটি শৃগাল কখন যে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটিকে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল সে কিছুই জানিতে পারে নাই। একটু পরেই বাহিরে ছেলের কান্না শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন বাহিরে গিয়া দেখে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ছেলের হাতের খানিকটা চিবাইয়া দিয়াছে, ঘাড়েও দাঁত বসাইয়াছে। ছেলেটি তখনও বাঁচিয়া ছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—বাঁচিবার আশা কম। খুব বেশী রক্তক্ষয় হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত একধারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "বাঘ মানুষ খায় জানি, কিন্তু শেয়ালেব এত বড় স্পর্ধা হবে তা ভাবতে পারিনি। আচ্ছা—"। তিনি আরও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোরুদ্যমানা জননীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিখিলবাবু দাঁড়ান নাই, তিনি কাছারির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সাধারণত জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলেন। রমেশবাবু তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "ওহে, চল চল, আর দেরি করা নয়। নিখিলবাবু চলে গেছেন, হয় তো অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য।"

"আমাকে কি করতে হবে?"

"পরামর্শ! তোমার মতো একটা মাথা সহায় থাকলে ভারী নিশ্চিন্ত হব আমি। নিখিলবাবু আমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছেন। নানা জাতের এতগুলি লোককে পরিবেশন করে খাওয়ানো, বুঝতেই পারছ। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, তুমি না সহায় হলে চলে?"

বিনোদিত হইয়া শিউনাথ বলিল, "কিন্তু আমি মোটা মানুষ, আমি কি পরিবেশন করতে পারব?"

"তোমাকে পরিবেশন করতে কে বলছে। তুমি পরামর্শ দাও, লোক জোগাড় করে দাও। চল, প্রিয়গোপাল, লোটন, ঘোটন তোমরাও এস।"

রামপ্রসাদ বলিল, "ডাক্তারবাবুর অসুখ, অথচ বাড়িতে ধুম লেগে গেল দেখছি। অসুখের বাড়িতে সাধারণত কান্নাকাটি হয়, এ ঠিক উল্টো হচ্ছে।"

"হবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। এখন পৃথ্বীশ আর উশনা এসে পৌঁছলে বাঁচা যায়। প্রথম নাতবৌয়ের সাধে ওরা থাকবে না। এ কথা ভাবাই যায় না। এসে পড়বে ঠিক।"

"সাধ কবে?"

"আগামী শুক্রবার। চল, চল, নিখিলবাবু চটছেন এতক্ষণ।"

সকলকে লইয়া রমেশবাবু কুঠির দিকে অগ্রসর হইলেন! জমিদারের কাছারি এখানে কুঠি নামে পরিচিত।

ভিতর হইতে গঙ্গা আসিয়া কৃষ্ণকান্তকে চুপি চুপি বলিল, "দিদি আপনাকে ডাকছেন—"

কৃষ্ণকান্ত অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুঝিলেন অনেকক্ষণ অদর্শনের ফলে কিরণ চঞ্চল হইয়াছে।

।। দশ ।।

কৃষ্ণকান্ত সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন কিরণ ওদিকের বারান্দায় বসিয়া ফলের রস করিতেছে। কৃষ্ণকান্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিরণ এমন ভাব দেখাইল যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই। যেন তাহার সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগও তাহার নাই।

"দূতের মুখে অন্য রকম খবর পেলাম"—মুচকি হাসিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন।

এইবার তুবড়ির মতন ফাটিয়া পড়িল কিরণ।

"তোমাদের আক্কেলকে বলিহারি যাই। না হয় তোমরা এ বাড়ির জামাই-ই হয়েছ, কিন্তু গেরস্তর মুখের দিকে চাইবে না তা বলে!"

"সর্বদাই তো চেয়ে আছি, এক দণ্ডও তো চোখ বুজিনি। চক্ষু কি আরও বিস্ফারিত করব?"

"ক'টা বেজেছে জান!"

"জানবার দরকার কি। আপিস তো নেই।"

"তা' বলে সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না? বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে।"

"ওতে বাধা দিও না। বউদির ওটা শখ। তা না হলে দুটো ঠাকুর আছে, পার্বতী আছে......"

"যাও না উনুন ধারে খানিকক্ষণ বসে থাক না গিয়ে, তাহলে শখের মজাটা টের পাবে—"

"আমার শখের জন্যে আমিও মাচার উপর ঠায় বসে থেকেছি রাতের পর রাত মশার কামড় সহ্য করে।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। রান্না হয়ে গেছে, চান কর গে যাও। বাবা গোঁ ধরে বসে আছেন তোমাদের সঙ্গে খাবেন। তাঁর পিত্তি পড়ে যাচ্ছে। তাই ফলের রস দিচ্ছি একটু। এত বেলা হল ক্ষিদে পায়নি?"

"ঘণ্টা দুই আগে যা খেয়েছি তা তো জানো। খান বারো লুচি, একবাটি আলুর দম, দুটো ডিম, তার উপর মিষ্টি। ক্ষিদে পায় কখনও?"

"দিন দিন নতুন হচ্ছ দেখছি। ওই কটা ফুলকো লুচি খেয়ে ক্ষিধে হয়নি তোমার! মিথ্যুক কোথাকার।"

সহাস্য সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিরণ পুনরায় ফলের রসে মন দিল।

"সদানন্দ আর রঙ্গনাথ কোথা, ওদের দিকেও একটু মনোযোগ দাও না, অতটা একচোখো হলে লোকে কি বলবে। তা ছাড়া এক সঙ্গেই তো খাব সব। ওরা কি 'রেডি'—"

"রেডি না ছাই। সদানন্দ এতক্ষণে তেল মাখতে বসেছে। রঙ্গনাথ, সন্ধ্যা আর স্বাতী সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সব বে-আক্কিলে তোমরা—"

"সোমনাথ কোথা?"

"সে উষার ছেলেদের ঘুড়ি তৈরি করে দিচ্ছে ওদিকের বারান্দায়।"

বিরুবাবুর বড় কন্যা স্বাতী ও বড় জামাই সোমনাথ আগের দিন সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছোট মেয়ে-জামাই এখনও আসে নাই। সে জন্য বিরুবাবু চিন্তিত আছেন, বারবার স্টেশনে যাতায়াত করিতেছেন।

"যাই, বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে আসি। সত্যি তোমার ক্ষিধে পায়নি? যাই হোক, বউদিকে এবার রেহাই দাও তোমরা রান্নাঘর থেকে।"

"একটা কথা বুঝছ না তুমি, বউদি রেহাই পেতে চান না। উনি রেঁধে আর পরিবেশন করে সুখ পান আর হাতে স্বর্গ পান রান্না ভাল হয়েছে বললে। তা বলব।"

কিরণ তাহার দিকে একটা হাস্যোজ্জ্বল তির্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাবাকে ফলের বস খাওযাতে গেল। কৃষ্ণকান্ত গেলেন দক্ষিণ বারান্দায় সোমনাথের কাছে।

।। এগারো ।।

সূর্যসুন্দর সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যেন একটা নূতন ধরনের নব-জীবন লাভ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি প্রিয়জনের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহাকে অসুখ না বলিয়া সুখ বলাই তো উচিত। কেবল একজনের অভাবে তাঁহার মনের ভিতরটা খচখচ করিতেছিল। পৃথ্বীশ আসিবে কি? তাহাকে কি কুমার খবর দিতে পারিয়াছে? অনেক দিন তো তাহার কোন খবর নাই। সেই চিঠিটির কথা তাঁহার বারবার মনে পড়িতেছিল, গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে যে চিঠিটি সে লিখিয়া গিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল—"মা-ই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমিও বন্ধনমুক্ত হইয়াছি। তাই আমি এবার ঈপ্সিত পথে চলিলাম। আপনার সেবা করিবার জন্য দাদা, উশনা, কুমার রহিল। আমি দূর হইতে আপনার সংবাদ রাখিব এবং প্রয়োজন বুঝিলে ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা আমার নাই, আর ঘোর স্বার্থপর না হইলে গৃহস্থ হওয়া যায় না, তাই আমি সন্ন্যাস জীবন যাপন করিব ঠিক করিয়াছি। বাড়ির কোন সাহায্য আমি লইব না। আমি প্রায় নিঃস্ব হইয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। কেবল যে বেহালাটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেইটি লইয়া যাইতেছি।"......সাত বৎসর হইল পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সে কুমারকে চিঠি লেখে। সে সব চিঠি কুমার তাঁহাকে দেখাইয়াছে। চিঠিতে কোন ঠিকানা থাকে না। পোস্টাফিসের ছাপ হইতে একবার হরিদ্বারের নাম পড়া গিয়াছিল, আর একবার কটকের নাম। তবে অল্প কিছুদিন আগে সে কুমারকে পোস্টবক্সের একটা ঠিকানা জানাইয়াছে। লিখিয়াছে, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ওই

ঠিকানায় পত্র দিলে সে পাইবে। পোস্ট বক্স বম্বেতে। কুমার সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাফ করিয়াছে, চিঠিও দিয়াছে। কিন্তু কই পৃথ্বীশ এখনও তো আসিল না, কোন জবাবও আসে নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর কথাটাও তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীশ অজ্ঞান হইয়া যায়। বারো ঘণ্টার পর তাহার যখন জ্ঞান হয়, তাহার পর হইতে তিনদিন সে ক্রমাগত কাঁদিয়াছিল, তাহার পর সাতদিন নির্বাক হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া যাইবার পাঁচদিন পরে হঠাৎ সে গৃহত্যাগ করে। সূর্যসুন্দর যথেষ্ট খোঁজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। মানুষের সবই সহিয়া যায়। এতবড় মর্মান্তিক ব্যাপারটাও সূর্যসুন্দরের সহিয়া গিয়াছিল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। কল্পনার সহায়তায় তিনি ইহার একটা নিগূঢ় তাৎপর্যও বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সান্ত্বনা লাভও করিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার বাবাই পৃথ্বীশরূপে পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। পৃথ্বীশের মুখের আদলটা না কি তাঁহার বাবার মুখের মতো, বুকটাও ঠিক তেমনি লাল। বাবার মতোই তাহার সঙ্গীতানুরাগ এবং সংসারে অনাসক্তি অনুপস্থিত পৃথ্বীশকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে তিনি একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিলেন। ইদানীং আর একটা কথা মনে হওয়াতে তিনি পৃথ্বীশকে ফিরাইয়া আনিবার বিশেষ চেষ্টা আর করেন নাই। বোম্বের ঠিকানাটা পাইবার পর কুমার তাঁহাকে বলিয়াছিল—"ঠিকানা তো একটা পাওয়া গেল, এবার আমি না হয় বম্বে গিয়ে মেজদাকে ধরে নিয়ে আসি। আমি গেলে ঠিক আনতে পারব!" সূর্যসুন্দর কিন্তু তাহাকে যাইতে দেন নাই। মুখে বলিয়াছিলেন বটে, "না থাক। কোথা ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ওর পিছনে। জোর করে কি কাউকে ধরে রাখা যায়? ও যদি আসে, আপনিই আসবে"—কিন্তু মনে মনে তাঁহার অন্য প্রকার যুক্তি ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "বাবা আমার জন্যই শেষ জীবনে নিজের খেয়াল খুশীর পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীশরূপে আবার যদি আমার কাছে আসিয়াই থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জোর করিয়া সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে? চলুন না তিনি নিজের পথে, নিজের খেয়ালে....."

তিনি চোখ বুজিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন। বাবার মুখটাই আবার তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত ঈষৎ রক্তাক্ত চোখের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল একটা চাপা হাসি যেন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"না, এবার আর তোমায় কষ্ট দেব না—হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন।

ঊর্মিলা মাথার শিয়রে আনত মস্তকে নীরবে বসিয়াছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না।

"বাবা, আমাকে কিছু বললেন?"

"না।"

সূর্যসুন্দর আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ খুলিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যা যা কোথা?"

"মেজদি বাথরুমে। ছোটদি আর ছোট জামাইবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন সোমনাথকে নিয়ে।"

"কোথা গেছে?"

"বাহিতলায়।"

খবরটি শুনিয়া সূর্যসুন্দর প্রীত হইলেন। বাগানে কেহ গেলে তিনি বড় খুশী হন। বাহি নদীর

ধারে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড আমবাগান আছে। প্রায় চল্লিশ বিঘার বাগান। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কাজ। এই প্রসঙ্গে বন্ধু নীলকমলকে আর ভোজু নাপিতকে মনে পড়িল। বাগানটির সহিত ইহাদেরও স্মৃতি জড়িত আছে।

নীলকমলের বাড়ি ছিল মালদহ জেলার এক গ্রামে। সূর্যসুন্দর তাহাদের বাড়ির গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নীলকমল বহুদিন হইতে সূর্যসুন্দরকে অনুরোধ করিতেছিলেন, "আপনি যদি বলেন, আপনাকে কিছু ভালো আমের কলম পাঠিয়ে দিই। আপনার ওই জমিটায় চমৎকার বাগান হবে"। তিনি দুইবার অনেক কলম পাঠাইয়াও ছিলেন, কিন্তু সময়াভাব বশত সূর্যসুন্দর সেগুলি রোপণ করিতেও পারেন নাই। দুইবারই প্রায় শতাধিক কলম টবেই শুকাইয়া গিয়াছিল। নীলকমল তখন অনুভব করিলেন এই পন্থায় চলিলে গাছই মরিবে, বাগান হইবে না। তখন তিনি সূর্যসুন্দরকে পত্র লিখিলেন, "ডাক্তারবাবু এবার কলমের গাছ লইয়া আমি নিজে যাইব এবং আপনার বাড়িতে গিয়া কিছুদিন থাকিব। আমার জন্য বাহিরের একটি ঘর এবং চাকর মজুত রাখিবেন।" বহু আমের কলম লইয়া নীলকমল একদিন আসিয়া হাজির হইলেন এবং সূর্যসুন্দরের বাড়িতে প্রায় ছয়মাস থাকিয়া বাগানটি সম্পূর্ণ করিয়া গেলেন! তিনি না আসিলে বাহিতলার আমবাগানটি হইত না। এই প্রসঙ্গে ভোজু নাপিতের কথাও তাঁহার মনে পড়িল। ওই চল্লিশ বিঘা জমির মাঝখানে এক বিঘা জমি ছিল ভোজু নাপিতের। সূর্যসুন্দর ভোজু নাপিতের ওই এক বিঘা জমির পরিবর্তে তাহাকে অন্যত্র পাঁচ বিঘা জমি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজু তাহাতে রাজি হয় নাই। অন্যত্র এক বিঘা জমি লইয়াই সে তাঁহার ওই জমিটুকু দিয়াছিল। টাকা-কড়ির জোরে এসব হয় না, হয় প্রেমের জোরে। সূর্যসুন্দর নিজের জীবনে বারম্বার এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

"বাগানে গেছে ওরা? বেশ হয়েছে। কুমার কোথা, সে থাকলে গাছগুলো চিনিয়ে দিতে পারত।"

"উনি একটা নৌকো করে বেরিয়েছেন পাখি শিকার করতে। চরে আজকাল খুব হাঁস বসছে তো।"

"ও, তা বেশ করেছে। যদি কিছু মেরে আনতে পারে, জামাইরা এসেছে খাবে আনন্দ করে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

ফলের রস লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল।

"রসটা খাও বাবা। লেবুগুলো ভালো আনেনি, সব শুকনো শুকনো—"

সূর্যসুন্দর অন্য জগতে ছিলেন, লেবুর বিষয়ে কোন মন্তব্য করিলেন না। হঠাৎ বলিলেন, "তুই জানিস কি, আমার বাবার বড় গেলাস আছে একটা, কাঠের সিন্দুকটায় আছে বোধহয়, খুঁজে দেখ তো।"

"ঠাকুরদার গেলাস?"

"হ্যাঁ, দেখিসনি সেটা?"

কিরণের মনে পড়িতেছিল না দেখিয়াছে কিনা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পাত্রী সে নয়। খানিকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখেছি, মনে পড়েছে, খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। কেন, কি হবে সে গেলাস নিয়ে?"

"সেটা বার কর। দেখব একবার।"

"আচ্ছা, ঊর্মিলা, জানো কোথায় আছে সেটা?"

"না, আমি তো দেখিনি। দিদি জানেন বোধহয়। পুরানো সব বাসন উনিই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা' ফলের রসটা খেয়ে নাও এখন, আমি দেখছি কোথা আছে সেটা—"

সে সন্তর্পণে সূর্যসুন্দরকে ফলের রস খাওয়াইতে লাগিল। কিরণের মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাবা হঠাৎ ঠাকুরদার কথা ভাবিতেছেন কেন! অসুখের সময় মৃতের কথা মনে করা তো ভালো লক্ষণ নয়।

রস খাওয়া শেষ করিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "চম্পা কোথা?"

"সে ওই পিছনের ঘরে, গগনের ফরমাসে তোমার জন্যে স্টোভে কি একটা খাবার করছে।"

"কত আর খাব আমি। কি খাবার?"

"আপেল সেদ্ধ করে কি যেন করছে দুজনে মিলে। আপেল স্টাফিং না, কি যেন বললেন। আমিও ওসব শিখেছিলুম এককালে, এখন ভুলে গেছি। তোমার জামাইটির খাওয়ার শখ বলে তো কিছু নেই—যা সামনে ধরে দাও গপ গপ করে খেয়ে ফেলবে!"

"দুজনে মিলে করছে? গগনও আছে না কি?"

"গগনই তো ফরকট্‌টি তুলেছে। সকাল থেকে তিনজনে স্টোভ নিয়ে বসেছে। আপেল আনিয়েছে কাটিহাব থেকে।"

"আর একজন কে?"

"ওই মিস্ বোস। ও তো ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরছে চম্পার সঙ্গে। খুব সেবা করে কিন্তু। ও সঙ্গে না এলে এই ভীড়ের বাড়িতে এত রকম হয়ে উঠত না। এখন ভালয় ভালয় সাধের ব্যাপারটা মিটলে বাঁচা যায়।"

"নিখিলবাবু যখন ভার নিয়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ির সব ভোজ কাজ তো উনিই করিয়েছেন।"

"তুমুল আয়োজন হচ্ছে শুনছি—"

"হ্যাঁ, আমিও তাই শুনছি। সুবাতালী, ওঝাজি, চমকলাল, গোবিন্দ মণ্ডল, নিখিলবাবু এরা সবাই যখন একজোট হয়েছে তখন তুমুল ব্যাপারই করে ছাড়বে।"

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথায় চুল কুরিয়া দিতেছিল।

সে স্মিতমুখে বলিল, "ভালই তো হচ্ছে। আমাদের প্রথম বউ।"

সাধের প্রসঙ্গে কাল হইতেই যে সমস্যাটা কিরণের মনে জাগিয়াছিল তাই এইবার সে ব্যক্ত করিল।

"সাধে একটা কিছু তো দিতে হবে। এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না, কি যে করব তাই ভাবছি। ঊর্মিলা তুই কি দিবি?"

"আমার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি কেনা হয়েছিল, এখনও পরিনি সেটা, সেইটে দিয়ে দেব ভাবছি। মভ কলার, ওকে সুন্দর মানাবে—"

"আমি কি করি বল তো। আমি একটি সোনার হার দিতে চাই, কিন্তু এখানে তো তৈরি হার পাওয়া যাবে না।"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "শিবু স্যাকরাকে বললে সে হয়তো করে দিতে পারে।"

"চার পাঁচ দিনের ভিতর কি পারবে।"

"তা পারবে না কেন। কুমারকে বল তাকে ডেকে পাঠাক, আমাদের বাড়িতে বসেই করুক না। উর্মিলার একটা কি গয়না তো করেছিল।"

উর্মিলা বলিল, "আমার বাজু করিয়েছিলেন উনি ওকে দিয়ে। বেশ সুন্দর গড়েছিল। এই যে দেখুন না—"

উর্মিলা হাত তুলিয়া বাহু দেখাইল, তাহার পর খুলিয়া দিল।

কিরণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া মন্তব্য করিল, "পালিশ তত ভাল নয়।"

গগন শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

"পিসিমা, বাড়িতে 'নাটমেগ্' আছে?"

"জানি না তো। কি করবি?"

"দাদুর জন্যে যে আপেল স্টাফিংটা করছি তাতে 'নাটমেগ' দরকার। দেখি, মাকে জিজ্ঞেস করি—"

গগন পুনরায় ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সূর্যসুন্দর ডাকিলেন।

"শোন। চম্পা নাকি ভালো গীটার বাজায় শুনলাম।"

"গীটার, বেহালা দুইই বাজায়।"

"সঙ্গে এনেছে যন্ত্রগুলো?"

হ্যাঁ।"

"তাই শোনাক না। খাবার-টাবার করে কি হবে।"

"খেতে খেতে গীটার শুনতে আরও ভালো লাগবে। যদি ঠিক মতো হয়, দেখো কি গ্র্যাণ্ড খেতে।"

গগন নাটমেগের খোঁজে চলিয়া গেল।

কিরণ বলিল, "চমৎকার ছেলে দুটি দাদার। দুটি হীরের টুকরো যেন।"

"মেয়ে দুটিও ভাল। বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান।"

"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

"বউদি খুঁত খুঁত করছে তোমার খেতে বেলা হচ্ছে বলে। তুমি বলছ সকলের সঙ্গে খাবে, কিন্তু তোমার জামাইদের তো কারো এখনও চান পর্যন্ত হয়নি। কুমার শিকার থেকে ফেরেনি। দাদা পীর-পাহাড়ে গিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যারা বাগানে গেছে। ওদের সঙ্গে খেতে গেলে দুটো বেজে যাবে তোমার।"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "দুটোই না হয় হল, ক্ষতি কি তাতে। সকাল থেকে তো তিনবার খেলাম। আর কতটুকুই বা খাব আমি।"

পার্বতী এককাপ ওভাল্‌টিন লইয়া প্রবেশ করিল।

"দাদু, মা বললেন এটাও খেয়ে নিতে।"

"কি বিপদ! কতবার খাওয়াবি তোরা!"

"মা বললেন খেতে অনেক বেলা হবে, এটা খেয়ে নিন।"

ছোটছেলের মত জেদ করিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "না, না, এখন আর খেতে পারব না। এক্ষুনি তো ফলের রস খেলাম।"

পার্বতী ওভাল্‌টিনের কাপটা পাশের তেপায়ার উপর রাখিয়া ঢাকা দিল, তাহার পর রাগতমুখে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই বারান্দায় তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"মা দাদু খাচ্ছেন না। যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন তা আর বলবার নয়। তুমি সামলাও এসে। আমার কথা শুনছেন না।"

"অতি দজ্জাল মেয়েটা"—কিরণ হাসিয়া সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "ওকে দেখে আমার উদিৎ সিংয়ের কথা মনে হচ্ছে। উদিত সিংকে মনে পড়ে তোর?"

"না।"

"খুব ছোট ছিলি তুই তখন। ওরই মতো ছিপছিপে আর ফরসা ছিল উদিৎ সিং। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তার। বামুন দিদিকে মনে আছে?"

"একটু একটু আছে। কুঁজো হয়ে লাঠি নিয়ে হাঁটত, না?"

"হ্যাঁ, কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। সে-ও খুব প্রতাপী ছিল। আমার এক বন্ধু ওকে, বলত কুকী"

"কুকী মানে?"

"মেয়ে-রাঁধুনী। কুক—কুকী। অখিলকে একদিন খুন্‌তি নিয়ে তাড়া করেছিল।"

"কেন?"

"জুতো পরে রান্নাঘরে উঁকি দিয়েছিল বলে। অখিলকে বলত 'পোড়ামুহা'। খুব কালো ছিল তো অখিল।"

পুরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। যদিও বর্ষিয়সী হইয়াছেন, তবু শ্বশুরের সামনে এখনও তিনি ঘোমটা দিয়া আসেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ওভালটিনটা খেয়ে নিন। সকলের সঙ্গে খাবেন বলছেন, কিছু না খেলে পিত্তি পড়ে যাবে। ওটা খেয়ে ফেলুন, বেশী তো দেইনি।"

"এইমাত্র ফলের রস খাওয়ালে যে কিরণ।"

"ফলের রসটা ভাতের সঙ্গে খেলে হত। কতটুকু দিয়েছ।"

কিরণ বলিল, "খুব কম। আধ কাপও নয়।"

"তাহলে ওভালটিনটা খেয়ে নিন। ভাত না হয় কম খাবেন। গগন বলেছে ওভালটিনটা খাওয়া দরকার আপনার।"

সূর্যসুন্দর অনুভব করিলেন খাইতেই হইবে। বাড়ির মধ্যে একমাত্র পুরসুন্দরীকেই তিনি ভয় করেন, তাহার উপর ইহা যখন গগনের প্রেসকৃপসন, তখন কোন প্রতিবাদই চলিবে না।

"ঠাকুরঝি খাইয়ে দাও ওটা।"

কিরণ সূর্যসুন্দরের গলায় ছোট লোমওয়ালা তোয়ালেটা জড়াইয়া দিয়া ফিডিং কাপে করিয়া 'ওভালটিন' খাওয়াইতে লাগিল।

এক চুমুক দিয়াই সূর্যসুন্দরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"বাঃ, খুব সুন্দর তো এটা খেতে!"

পুরসুন্দরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গগন খুব ভালবাসে। বারো টিন কিনে এনেছে আপনার জন্যে।"

যতক্ষণ না ওভালটিন খাওয়ানো শেষ হইল ততক্ষণ পুরসুন্দরী আধঘোমটা টানিয়া প্রহরীর মতো এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খাওয়া শেষ হইলে উর্মিলা উঠিয়া নীরবে ফিডিং কাপটি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পর মাথার শিয়রে বসিয়া চুলের ভিতর ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিল।

একটু পরে প্রবেশ করিল গঙ্গা একটা কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া। ধোপার বাড়ির কাপড়, তাগাদায় কাচিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গঙ্গা, তোকেই খুঁজছিলাম। বাজার থেকে চট্ করে গিয়ে কিছু জইত্রী কিনে আন ত। গগন চাইছে। বাইসাইকেলে করে যা বাবা, ও কি একটা রান্না করছে বাবার জন্যে।"

"ও, আচ্ছা।"

গঙ্গা কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "রতনা ধোপার কাছ থেকে তোমার তাগাদার কাপড়গুলো নিয়ে এলাম। ওদের বাড়িতে বিয়ে লাগছে, না নিয়ে এলে ওই দামী কাপড়গুলো পরতো সবাই মিলে। মিলিয়ে দেখে রেখে দাও এক্ষুনি। পরে আবার বোলো না যেন এটা নেই, সেটা নেই।"

বলিয়াই সে জইত্রী আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

পুরসুন্দরীও রান্নাঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বউমা শোন। আমার বাবার গ্লাসটা কোথা আছে বল তো?"

"বড় কাঠের সিন্দুকে আছে সেটা।"

"কাউকে দিয়ে বার করাও তো দেখব একবার। এক্ষুনি বার করতে বল।"

"আচ্ছা।"

পুরসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর পার্বতী পুনরায় প্রবেশ করিল।

সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমার কথা শোনা হল না। মায়ের কথা শোনা হল। আমি যেন কেউ নই। আচ্ছা"—মাথা ঝাঁকাইয়া সে আবার বাহির হইয়া গেল।

।। বারো।।

আমবাগানে তিনটি ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যা, স্বাতী এবং রঙ্গনাথ বেশ জমাইয়া আড্ডা দিতেছিল। বাগানের চাকরটি তাহাদের মাঝখানে একটি ছোট টেবিলও পাতিয়া দিয়াছিল। স্বাতী সন্ধ্যার চেয়ে বছর চারেকের ছোট হইলে কি হয়, দুজনে বন্ধুত্ব খুব। বিবাহের পর বয়সের এ পার্থক্যটুকুও ঘুচিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সাধারণত ইহাই হয়। তাহাদের মধ্যে পিসিভাইঝির দূরত্ব আর ছিল না। স্বাতীর রং খুব ধপধপে ফরসা, চোখ দুটি ছোট, ছোট, মুখের উপর ঈষৎ তির্যকভাবে বসানো, মুখের ভাবটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের। খুব পাতলা ঠোঁট, চিবুকের মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো তিল।

স্বাতী বলিতেছিল, "টেলিগ্রাম পেয়ে কি তাড়াহুড়ো করে যে আমরা এসেছি ছোট পিসি—তা বলবার নয়। ভয় হচ্ছিল দাদুকে এসে দেখতে পাব কিনা। ওঁর ছুটি পেতে দু'দিন দেরি হয়ে গেল তো। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে আমরা যেন দাদুর অসুখের জন্যে আসিনি। এসেছি বউদির সাধ খেতে। দাদুকে তো খুব হাসি-খুশী দেখলুম, মনে হচ্ছে অসুখই হয়নি।"

"বাবা বরাবরই ওই রকম, অসুখ হলে কাউকে বুঝতে দেন না যে অসুখ হয়েছে। কিন্তু বাবার মনে সুখ নেই বুঝতে পারছি।"

"কেন?"

"মেজদার জন্যে। মনে মনে উনি মেজদার জন্যেই প্রতীক্ষা কবছেন। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে মেজদার নাম ধরে ডাকছিলেন।"

"সত্যি মেজকাকা যে কোথায় আছেন, কে জানে!"

রঙ্গনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তোমার শাড়ির আঁচলটা নতুন ধরনের দেখছি। হায়দ্রাবাদি বুঝি?"

"হ্যাঁ। হায়দ্রাবাদ থেকেই আনিয়েছি। আপনি বেশ পাড় চিনতে পারেন তো।"

রঙ্গনাথ সন্ধ্যার দিকে একবার চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা যাজ্ঞবল্ক্যকেও মৈত্রেয়ীর জন্যে পাড়ের খবর রাখতে হত, যদিও উপনিষদে এ কথা লেখা নেই—"

সন্ধ্যার মুখে হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আপনি তাহলে কি করে জানলেন এ কথা।"

"ক্ষিধে পেলে যাজ্ঞবল্ক্য খেতেন এ কথাও উপনিষদে লেখা নেই, কিন্তু আমি জানি খেতেন।"

সন্ধ্যা বলিল, "উনি আমার দৃষদ্বতীতে কাপড়ের পাড় সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা।"

"আচ্ছা, ছোট পিসি, দৃষদ্বতী মানে কি! অমন কটমট নাম রেখেছ কেন কাগজের?"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বল—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "কি দরকার ওসব ইতিহাস শুনে?"

"না বলুন। অনেকে জিগ্যেস করে—"

"তবে শোন। দৃষদ্বতী নদীর নাম। সেকালে আর্যরা যখন ব্রহ্মাবর্তে এসেছিলেন তখন দুটি নদীকে তারা দু-রকম মর্যাদা দিয়েছিলেন। একটি সরস্বতী, আর একটি দৃষদ্বতী। সরস্বতী ছিল অন্তঃসলিলা, বাইরে থেকে দেখতে শুকনো, কিন্তু বালি একটু খুঁড়লেই স্বচ্ছ পরিষ্কার জল বেরুতো। ওই নদীতে ছোট বড় গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ করত সবাই। গর্তগুলোকে তাঁরা বলতেন সরসী, মানে ছোট ছোট পুকুর। যে নদী সরসী-সমন্বিতা তার নাম দিলেন তাঁরা সরস্বতী। আর্যেরা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে পূজা করতেন ওই নদীকে। পরে যিনি জ্ঞানের দেবতা হলেন তাঁরও সম্ভবত ওই নদী থেকেই নামকরণ হল সরস্বতী। দ্বিতীয় নদীটি ছিল অন্য রকম। ছোট বড় অনেক পাথর অতিক্রম করে বইত সে নদী, যেন অনেক বাধা বিঘ্নও তাকে দমাতে পারেনি। ইজিপ্টে নীল নদের ক্যাটারাক্টগুলো অনেকটা ওই রকম। পাথরের সংস্কৃত হচ্ছে দৃষৎ, তাই তাঁরা সে নদীর নাম দিয়েছিলেন দৃষদ্বতী। সরস্বতী যেমন ছিল জ্ঞানের প্রতীক,

দৃষদ্বতী তেমনি ছিল বীরত্বের প্রতীক। সরস্বতীকে পুজো করতেন ব্রাহ্মণেরা, আর দৃষদ্বতীকে ক্ষত্রিয়েরা। তাই সন্ধ্যা ওর কাগজের নাম রেখেছে দৃষদ্বতী।"

"কিন্তু ওতে তো যুদ্ধের বা বীরত্বের কিছু থাকে না। ওতে মেয়েদের সম্বন্ধেই তো গল্প প্রবন্ধ থাকে দেখেছি।"

"তোমার ছোটপিসির ধারণা আমাদের সমাজে মেয়েদের খবর মানেই যুদ্ধের খবর। মেয়েরা পরাধীন, মেয়েরা নির্যাতিত, তাই মেয়েরা বিদ্রোহ করছে। তাদের মুক্তির জন্যে যা কিছু করা হয় তাই যুদ্ধ। ও কাগজের গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব ওয়ার-বুলেটিন।"

রঙ্গনাথ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে হাসির আভা উঁকি দিতেছিল। স্বাতী বোকা মেয়ে নয়, কিন্তু সে বোকা সাজিবার ভান করিত। সে সব বুঝিতেছিল কিন্তু ভান করিতেছিল যেন কিছুই বোঝে নাই।

"এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কারা?"

"আমরা, পুরুষরা।"

নীরব হাসিতে স্বাতীর মুখখানি ভরিয়া গেল, ছোট চোখ দু'টি বুজিয়া আসিল।

"কিন্তু শত্রুর প্রতি আপনাদের ব্যবহার তো অদ্ভুত! শুধু খাওয়াচ্ছেন না, ভাল ভাল গয়না দিচ্ছেন, সব রকমে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

"আমাদের মধ্যে যারা বিবেকী তারাই দিচ্ছে, অনুতপ্ত হয়ে খেসারত দিচ্ছে। কিম্বা এ-ও হতে পারে অনেকে হয় তো ঘুষ দিয়ে শত্রুকে বশ করবার চেষ্টা করছে।"

সন্ধ্যা সূর্যসুন্দরের জন্য উলের দস্তানা বুনিতেছিল। কোন মন্তব্য না করিয়া সে নীরবে বুনিয়া যাইতেছিল। একটি হাসির আভা তাহার সুন্দর কালো মুখখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল শুধু। সে মাঝে মাঝে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে রঙ্গনাথকে দেখিতেছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—যে দৃষ্টিতে মা তাহার দুরন্ত সন্তানকে নিরীক্ষণ করে।

"আচ্ছা পিসেমশাই—"

"একবার তো মানা করে দিয়েছি আমাকে পিসেমশাই বলবে না। পিসেমশাই শুনলেই আমার চোখের সামনে আমার নিজের এক দূর সম্পর্কের পিসেমশাইয়ের ছবি ফুটে ওঠে। রোগা কালো বেঁটে কুঁজো, গুলিখোর। সুতরাং আমি কারো পিসেমশাই হতে চাই না।"

"কি বলে, ডাকব তাহলে?"

"দাদা বললে—"কি যে বলেন ক্ষতি কি?"

"তোমরা পিতৃতুল্য মাস্টারকে দাদা বল, হবু-স্বামীকেও বিয়ের আগে দাদা বল, পিসেমশাইকে দাদা বললে কিছু বেমানান হবে না। শুনেছি সংস্কৃত তাত শব্দ থেকে বাংলা দাদা কথাটা হয়েছে।"

"তা হোক। দাদা বলে ডাকা চলবে না। মা ভয়ানক রেগে যাবে তাহলে।"

"বেশ, তাহলে শুধু 'পি' বোলো।"

রঙ্গনাথ এবার সন্ধ্যার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে নতনেত্রে নীরবে হাসিমুখে বসিয়া দস্তানাই বুনিতে লাগিল।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা পিসেমশাই, মিস বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?"

"না। তবে মেয়েটি ভালো বলেই মনে হয়।"

"আলাপ হয়নি, তবে কি করে বুঝলেন?"

"গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টা করে না দেখে। তোমার ছোটপিসির ওর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা।"

"তাই নাকি ছোটপিসি, আমারও খুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে।"

এ কথাটা স্বাতী মিথ্যা বলিল। মিস্ বসুকে মোটেই তাহার ভালো লাগে নাই, বরং তাহার মনে হইতেছিল দাদা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে কোথা হইতে লইয়া আসিল। তাহার ফিটফাট ধরনধারণ, তাহার সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার বরং একটু ঈর্ষাই হইয়াছিল। তাহার জন্য আলাদা বাথরুম, কাটিহার হইতে তাহার জন্য কমোড, আলাদা একটা মেথরাণী—এসব তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু সোজাসুজি মনোভাব ব্যক্ত করিবার মেয়ে সে নয়। প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল মিস্ বসুকে কাহার কেমন লাগিয়াছে।

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বলিল, "ভালোই মেয়েটি।"

"ও, তাই বুঝি। খুব কাজের?"

"না, ভালো মানে মডার্ন। আধুনিক।"

"ও।"

রঙ্গনাথ উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের গাছগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কিছু জমিদারি আছে, কিছু কিছু বাগানও আছে। কিন্তু তিনি নিজে মনোমত আর একটি বাগান করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। সাহিত্যে যে সব দেশী-বিদেশী গাছের নাম তিনি পড়িয়াছেন, সেইগুলি একটি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার। নানা পুস্তক হইতে নানারকম বৃক্ষ ও লতার নাম তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও জোগাড় হয় নাই, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালকদের সঙ্গে ও বিষয়ে তাঁহার পত্রালাপ চলিতেছে। নিজে তিনি সেখানে কয়েকবার গিয়াছেনও। তাই বাগান দেখিলেই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন এবং নিজের কল্পনায় তা দেন।

সন্ধ্যা বুনিতে বুনিতে হঠাৎ স্বাতীকে প্রশ্ন করিল—"তুই হিন্দু-কোডবিলটা পড়েছিস?"

"ওই খবরের কাগজে একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে দেখেছি। আমার তত ভালো লাগেনি।"

"ভালো লাগেনি কেন?"

স্বাতী জানে ছোটপিসির পাল্লা বড় শক্ত পাল্লা। কুট কুট করিয়া প্রশ্ন করিবে, আস্তে আস্তে কুরিয়া কুরিয়া তোমার মনের কথাগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিবে, তাহার পরই ঝপ্ করিয়া চাহিয়া ধরিবে যুক্তির জাঁতিকলে ও ফাঁদে স্বাতী পা দিবে না।

"কেন, তা-ও কি বলতে পারি। ও নিয়ে আমি মাথাই ঘামাইনি।"

"ঘামানো উচিত। আমাদেরই জন্যে ওটা হচ্ছে, আমরা যদি মাথা না ঘামাই তাহলে কে ঘামাবে।"

স্বাতী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচিয়া গেল সে।

"কে আসছে বল তো ছোটপিসি?"

সন্ধ্যা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ন্যুব্জদেহ একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়া দিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গায়ে একটা আ-ময়লা আল-খাল্লা গোছের জামা, এক মুখ খোঁচা খোঁচা

সাদা গোঁফ দাড়ি, মনে হয় যেন দশবারো দিন কামানো হয় নাই। পায়ের জুতোটাও ছেঁড়া। কিছুদুর আসিয়াই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর বাগানের মালীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে শান্তা, দোঠো বাঘান্‌ঢিরো দাত্‌মন্‌ তোড়ি দে তো বেটা। অভি তক্‌ মু নেই ধোলোছি—"

শান্তা সসম্ভ্রমে দাঁতন আনিতে ছুটিল।

বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া আগাইয়া আসিল সন্ধ্যার দিকে। তাহার পানের দাগ-লাগা অপরিষ্কার দন্তগুলি দেখিয়া সন্ধ্যা ঘৃণায় মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখভাবে তাহা সে প্রকাশ করিল না, বরং হাসিমুখেই চাহিয়া রহিল আগন্তুকের দিকে। ক্ষীণভাবে ইহাও তাহার মনে হইতে লাগিল মুখটা যেন চেনা-চেনা। বৃদ্ধ কিছুদূর আসিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল। সন্ধ্যার সহসা মনে হইল তাহার ওই ফোলা-ফোলা হাস্য-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহের ঝরণা নামিতেছে। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ কথা বলিল।

"কে তুই, কত বড় হয়ে গেছিস, চিনতে পারি না।"

"আমি সন্ধ্যা।"

"আরে, আরে তুই সন্ধ্যা। সেই এত টুকুন 'সন্ধ্যা-মুনি রাত-জাগুনি' এত বড় হয়েছিস তুই? বাহবা বাহবা—বাঃ।"

মহানন্দে বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। শান্তা ইতিমধ্যে দুইটি "বাঘান্‌ঢির" (বাঘ-ভেরেণ্ডা) দাঁতন আনিয়াছিল। বৃদ্ধ সে দুইটি লইয়া বলিল, "আমি মুখটা আগে ধুয়ে ফেলি। তারপর তোদের সঙ্গে কথা বলব। আঁধার থাকতেই কিষণপুর থেকে হেঁটে বেরিয়েছি। সোজা আগে তোমাদের বাড়ি গিয়ে ডাক্তারবাবুর খবরটা নিলাম। শুনলাম ভালো আছেন। তারপব এখানে মুখ ধুতে এলাম। এখানে যখনই আসি তখনই বাঘান্‌ঢির দাঁতন দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলি। এ বাগান্‌টি আমিই লাগিয়েছিলাম এখানে। ওতে ভাল বেড়াও হয়, দাঁতনও হয়। শান্তা দো বালতি পানি ওঠা হিঁ তো বেটা।"

একটু দূরে কূপ ছিল। শান্তার সহিত বৃদ্ধ সেই দিকেই গেলেন। বৃদ্ধকে দুই বালতি জল তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসতেই সন্ধ্যা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তা, উনি কে বলতো।"

"কবিরাজ জি।"

তখন সন্ধ্যার মনে পড়িল পেট-পচা কবিরাজকে। তাহার ছেলেবেলায় ইনি প্রায়ই আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। খাদ্য-রসিক, খুব খাইতে পারিতেন, কিন্তু হজম হইত না। উদবাময়ে ভুগিতেন। নিজেই বলিতেন, "আমার পেটের ভিতরটা পচে গেছে"—আর হা হা করিয়া হাসিতেন। সেইজন্য বাড়িতে ইহার নাম হইয়া গিয়াছিল পেট-পচা কববেজ। সন্ধ্যার ইহাও মনে পড়িল, মা ইহাকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। কবিরাজ মহাশয় স্বাতীরও জন্ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাতীকে তাঁহার তেমন মনে ছিল না। স্বাতী কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের গল্প শুনিয়াছিল অনেক।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটপিসি, এই পেট-পচা কবরেজ, না?"

"হ্যাঁ, বেশ মজার লোক।"

সন্ধ্যা পুনরায় দস্তানা-বোনায় মন দিল। হিন্দুকোড বিলের কথা আর উঠিল না, স্বাতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারকম বিকট শব্দ করিতে করিতে মুখ-প্রক্ষালন

করিলেন। তাহার পর কটি-দেশ-আবদ্ধ গামছাটি খুলিয়া মুখ মুছিলেন। তাঁহার কোমরে একটি বটুয়াও বাঁধা ছিল। বটুয়া হইতে চারআনা পয়সা বাহির করিয়া শাস্তাকে বলিলেন, "যা তো বেটা, বিছুয়াকা দোকানো সে কুছু দহি-চুড়া লে আ.....দোঠো শাল পাত্তা ভি!" শান্তা চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভুক লেগেছে বেটি। কিছু খেয়ে লি। এই শালা পেটই তো জ্বালিয়ে মারলে হামাকে", তাহার পর সংশোধন করিয়া বলিলেন, হামাকে কেন, সকলকেই।"

কবিরাজ মহাশয়ের ভাষা একটু অদ্ভুত ধরনের। কখনও বেশ শুদ্ধ বাংলা বলেন, কখনও আবার হিন্দির বুক্‌নি মিশিয়া যায়। তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ধ্যা-স্বাতী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"না না, হাসির কথা নয়, খাঁটি কথা। পোয়েটরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পাতা, ফুল-ফল-জীব-জন্তুর বর্ণনা করে বলেন—আহা ভগবানের সৃষ্টি কি আশ্চর্য, 'এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ', কিন্তু আসল জিনিসটির নাম তাঁরা করেন না, ভগবানের সেরা সৃষ্টি কি জান? পেট! পেট পরিমাণে মাত্র এক বিঘৎ কিন্তু ওইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি। ওই দুনিয়ার মালিক। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওকে খাজনা দিতে হয়। ও গহ্বর খালি রাখবার উপায় নেই। পেটই আমাদের কান ধরে ছুট্ করাচ্ছে চারদিকে। আমার মতো বুড়োও আমদাবাদ থেকে পাট্‌নী, পাটনী থেকে মাদারিচক, মাদারিচক থেকে নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থেকে মনিহারি, মনিহারি থেকে দিরা ছুটে বেড়াচ্ছে ওরই তাগাদায়। কাজিগাঁয়ে, বিষুণমুদির কাছে ওষুধের দাম বাকি পড়ে ছিল ছ'মাস। অনেক তাগাদার পর আজ বেটা মাত্র চার আনা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটি পেটায় নম হয়ে গেল—"

কবিরাজ মহাশয় দাঁতগুলি বাহির করিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বলিল, "আপনি এখানে খাচ্ছেন কেন, বাড়িতেই চলুন না, সেইখানেই খাবেন।"

"আরে তা' তো খাবই। খবর নিয়ে এসেছি, রান্নার দেরি আছে এখনও। বড় বহু-মা নিজের রান্নাঘরে আছেন, তার মানে ভালো ভালো রান্না হচ্ছে। সে সব পরে খাব। কিন্তু এদিকে পেট যে মানছে না, তাই একটু দহি-চূড়া 'ঘুস' দিচ্ছি বেটাকে—"

"জল খাবারও বাড়িতে খেলেই পারতেন।"

"তা পারতাম। তোমাদের বাড়ি তো আমারই বাড়ি। কুমারকে দেখতে পেলাম না। গঙ্গা শালা ঘুর ঘুর করে মুরব্বিয়ানা করছে দেখলাম। ওটাকে বড় ভয় করি। ঠিক ভয় নয়, ঘৃণা করি। মুখের উপর অপমান করে দেয়। কুমার একটা কুকুরকে রাজা করে রেখেছে—শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা—সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে না? এ হয়েছে তাই। ওকে দেখলেই আমি সরে পড়ি! নিজের মান নিজের কাছে।"

স্বাতী বলিয়া উঠিল, "না না, সে কি! গঙ্গা-দা কি আপনাকে অপমান করতে সাহস করবে?"

কবিরাজ মহাশয় ঘাড় ফিরাইয়া স্বাতীর মুখের দিকে চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—'ইনি কে? চিনছি না।"

"দাদার বড় মেয়ে, স্বাতী।"

"ও, আচ্ছা! বিরুবাবুর মেয়ে। আরে তবে তো আমার নাত্‌নী। আমার বুড়িয়ার সৌতীন।"

কবিরাজ আবার খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল। কবিরাজ গঙ্গার প্রসঙ্গই তুলিলেন আবার।

"তোমার গঙ্গা-দা একটি গাধ্‌হা। কথায় কথায় চাঁট ছোড়ে। একদিনের কথা শুন। প্রায় একবছর আগেকার কথা। ডাক্তারবাবু তখন এখানে ছিলেন না। তিনি বিরুবাবুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কুমার ছিল না! বেলা তখন দেড়টা কি দুটো হবে, আমি এসে পৌঁছে গেলাম কাঁটাক্রোশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে। খুব খিদে লেগেছিল। বাড়ির বাইরে কাউকে দেখলাম না। কুমারের কুকুরগুলো বসে ছিল বারান্দায়, আমাকে দেখে ভুক্‌তে লাগল। বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তারবাবু কোথা। সে বললে, দিল্লী গেছেন, বড়দার কাছে। 'কুমার কোথা'? 'মাঠে গেছে'। তখন তাকেই বললাম, 'বড় ভুক্ লেগেছে ভাই। কিছু খাবার বন্দোবস্ত কর। এর উত্তরে বললে কি জান? 'এটা কি হোটেল? যখন তখন খাবার পাওয়া যাবে?' চণ্ডালটার কথা শুনে আমি তো অবাক। বললাম, 'এটা হোটেল নয় তা জানি, হোটেলেও যখন তখন খাবার পাওয়া যায় না তা-ও জানি। কিন্তু এটা যে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, আমার বাড়ি। তুমি ভিতরে গিয়ে খবর দাও যে কবিরাজজি এসেছেন। গাধ্‌হাটা বললে, 'বউমা এই একটু আগে ঘুমিয়েছে, তাকে আমি জাগাতে পারব না। আপনি বসুন'। সঙ্গে সঙ্গে জুতোটি খেলেন বাছাধন। কপাটের আড়াল থেকে কুমারের বউয়ের গলা শোনা গেল। আমাদের কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলাম। গঙ্গাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কবিরাজ মশাইকে বসতে বল। আমি এখুনি খাবার দিচ্ছি ওঁকে। গঙ্গা গজগজ করতে করতে চলে গেল ভিতরে। একটু পরেই ফিরে এসে বললে, 'আসুন'। গিয়ে দেখি বউমা কার্পেটের আসন পেতে দিয়েছেন। আর খেতে দিয়েছেন চকচকে কাঁসার বাটিতে ঘন দুধ, ভাল চূড়া, মর্তমান কলা, খেজুরের গুড়, আর নারকেলের সন্দেশ। তখনই বুঝলাম—কুমারের বউ মানবী নয়, দেবী। ওর শাশুড়িও দেবী ছিলেন। সে গল্পও শোনাব তোমাদের। খাওয়া শেষ করে পান চিবুতে চিবুতে বাইরে এসে গঙ্গাকে বললাম, 'কিরে, দেখলি? তা তোর দোষ নেই বেটা। তুই ছোট বংশের ছেলে, তুই এসবের মর্ম কি করে বুঝতে পারবি। মাথাতে ঢুকবে না তোর। তবে একটা কথা শুনে রাখ, এটা হোটেল নয়, ডাক্তারবাবুর বাড়ি।' তারপর থেকে কিন্তু এই গঙ্গাটাকে দেখলেই আমি সরে পড়ি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিমুখে একবার সন্ধ্যার দিকে, আর একবার স্বাতীর দিকে চাহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কুমারের কিন্তু ও খুব হিতৈষী। আর সেইজন্যেই আমার কাছে ওর সাতখুন মাপ।"

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "ঠাকুমার কি গল্প বলবেন বলছিলেন।"

"তোমার ঠাকুমা লছমী ছিলেন। ওঁর জন্যেই তোমার ঠাকুরদার এত সুনাম, এত খাতির, উন্নতি। ওঁর চেয়ে ধনী লোক অনেক আছেন এদেশে, কিন্তু ওঁর চেয়ে বেশী খাতির আর কারও নেই। সব তোমার ঠাকুমার জন্যে। উনি ছিলেন আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

কবিরাজ মহাশয় হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কি গল্প বলছিলেন যে—"

"তোমার ঠাকুমার সম্বন্ধে গল্প কি একটা? অনেক গল্প। তবে এখন যেটা মনে পড়ছে, শোন। অনেকদিন আগের কথা। সেদিনও ডাক্তারবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দূরে কোনও কলে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যেতেন। তখন বৈশাখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। লু বইছে। এই গাঁয়েরই গোপীরাম মাড়োয়ারির স্ত্রীর 'পরসোত' (সূতিকা) হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করছিলাম, ডাক্তারবাবুই রোগীটি জোগাড় করে দিয়েছিলেন আমাকে। সেদিন সেই রোগীর খবর নেবার জন্যে কাজিগাঁ থেকে হেঁটে আসছি আমি। অনেকদিন খবর পাইনি, ওষুধের দামও বাকি ছিল কিছু, যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায় দুপুর রোদ মাথায় করে এলাম। আমার তো সর্বদাই—অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—অবস্থা। এসে শুনলাম, রোগীটি একেবারে ভালো হয়ে গেছে, মানে ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে—"

কথাটা বলিয়া কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত দিয়া আবার খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "বেটা একটি ছিদেম দিলে না আমাকে। তখন কি আর করি। হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের বাড়ির দিকেই আসতে লাগলাম। খিদে পেয়েছিল খুব। সকাল থেকে কিছু পাইনি। তোমাদের বাড়ির সামনে যেখানে হাট বসে সেখানে এসে উঠেছি, এমন সময় কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখে শুনলাম, ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বেজেছে? তিনি বললেন, দেড়টা। বলে তিনি চলে গেলেন। আমি হাটের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখান থেকে তোমাদের বাড়িটা দেখা যায়। দেখলাম বাড়ির দুয়ার জানালা সব বন্ধ। বন্ধ থাকাটাই স্বাভাবিক, রোদে-পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক, তার উপরে পছিয়া হাওয়া। আমি ভাবলাম এরকম সময়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। ফিরলাম। ঠিক করলাম ওই বিছুয়ার দোকানেই ধারে কিছু খেয়ে নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব একটু, তারপর রোদ পড়লে বিকেলে বাড়ি ফিরে যাব। কিছুদূর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, কবিরাজজি, কবিরাজজি। পিছু ফিরে দেখি তোমাদের চাকর ঘিনুয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে বললে, আপ চলিয়ে, মাঈজি আপকো বোলাতী হেঁ। মাঈজি? কোন মাঈজি? সে বললে, আমাদের মাঈজি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ডাকছেন? তিনি আমাকে দেখলেনই বা কি করে। অবাক হলাম একটু। তারপর তার পিছু পিছু এলাম তোমাদের বাড়িতে। তোমার ঠাকুমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, আপনি হাটের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে, আবার চলে যাচ্ছেন কেন। যা রোদ। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে আপনার? সত্য কথাই বললাম, না খাওয়া হয়নি। তোমার ঠাকুমা বললেন, তাহলে স্নান করে এখানেই চাট্টি খেয়ে নিন। ভাত তরকারি সব আছে। আমার খাওয়া হয়নি এখনও। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। বুঝলে? আমি রাজপুত, আমার প্রাণ পাষাণ, কিন্তু সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। অনেকদিন আগে ভূপেন বোসের লেখা হিন্দু ফ্যামিলি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সে লেখা কণ্ঠস্থ আছে আমার। তার একজায়গায় আছে—"With the Hindu life is bound by it traditional duty of hospitality. It is the duty of a householder to offer a meal to any stranger who may come before midday and ask for one, the mistress of the house does not sit down to her meal until every member is fed, and, as some-times her food is left, she does not take her meal until well after midday, lest a hungry stranger should come

and claim one.....''। এই আদর্শ তোমার ঠাকুমার মধ্যে দেখিয়াছিলাম সেদিন। এর চেয়েও বড় আদর্শ। কারণ আমাকে দূর থেকে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চাকর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন, রাস্তা থেকে ডেকে এনে খাইয়েছিলেন—''

কবিরাজ মহাশয় নীরবে হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মনে হইল যেন প্রণাম করিতেছেন। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করিলেন, ''তোমার মায়ের নাম কি ছিল বল তো?''

''রাজলক্ষ্মী।''

''বাঃ বাঃ বাঃ—সার্থক নাম। সত্যিই তিনি ডাক্তারবাবুকে রাজা করে দিয়ে গেছেন। সত্যিই এ অঞ্চলের রাজা উনি—আনক্রাউনড্ কিং—''

রঙ্গনাথ বাগান পরিক্রমা শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের পিছন দিকে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এই অদ্ভুত আগন্তুকটিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু হঠাৎ তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার পিছন দিকে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন এবং ঘুরিয়া বসিলেন।

''কে আপনি?''

স্বাতী বলিল, ''আমার ছোট পিসেমশায়।''

কবিরাজ মহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

''যাক্, দর্শন হয়ে গেল। সন্ধ্যার বিয়ের সময় আমি ছিলাম না, দেশে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি হলে চলে আসতাম। কিন্তু রাজপুতানা থেকে আসা যায় না। নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু আসতে পারলাম না। বসুন।''

শান্তা কবিরাজ মহাশয়ের জন্য দহি-চূড়া-গুড় এবং দুইটি শাল পাতা লইয়া হাজির হইল। কবিরাজ অবিলম্বে উঠিয়া একটু দূরে কূপের নিকট চলিয়া গেলেন এবং কূপের নিকটই উবু হইয়া বসিয়া মাটিতে পাতা দুটি পাতিয়া ফেলিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার আহার সমাধা হইয়া গেল। তাঁহার একটু সময় লাগিল মুখ ধুইতে। বেশ ভালো করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন তিনি।

রঙ্গনাথ নীরবে দেখিতেছিলেন।

মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যাকে বলিলেন, ''এদের এই অনাড়ম্বর সরল জীবন-যাত্রাতে সভ্যতা, না সভ্যতার অভাব, কি আছে তা ঠিক করা শক্ত।''

সন্ধ্যা বলিল, ''কবরেজ মশাই গরীব, কিন্তু অসভ্য নন। বেশ শিক্ষিত এবং সভ্য।''

''আমার কথাটা ধরতে পারলে না তুমি। গরীব হলেও এই টেবিলটার উপর পাতা দুটো পেতে চেয়ারে বসে খেতে পারতেন। আমাদের সামনে খেতে আপত্তি থাকলে, টেবিল-চেয়ার ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও বাধা ছিল না।''

''উনি বরাবরই ওই রকম, এ দেশের ধারাই ওই। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন প্রতি বছর ফসল কাটা হয়ে যাবার পর মাঠে জনমজুরদের খাওয়ানো হত। আয়োজন যৎসামান্য। কেবল থাকত প্রচুর দই, চিঁড়ে আর গুড়। ওরা নিজেরাই কলা-পাতা কেটে আনত, আর

কয়েকটা মাটির বড় বড় ঢেলার উপর সেটা পেতে বড় একটা গামলার মতো করে নিত। তাতে ঢালা হত দই, তার উপর চিঁড়ে আর গুড়। মহানন্দে খেত সবাই—"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। মুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। বেশী চেয়ার ছিল না, রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"তুমি বস, তুমি বস, আমি মাটিতেই বসছি।"

"আপনি এই চেয়ারটায় বসুন।"

স্বাতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা বসতে পারি। তোমার চেয়ারে বসবার হক আমার আছে। ছোট গিন্নী তো!"

সন্ধ্যা বলিল, "ওর চেয়েও ছোট আছে আরেকজন। চিত্রা।"

"সে-ও এসেছে?"

"আসে নি। আসবে।"

"আসুক, দেখি তাকে পছন্দ হয় কিনা। একে খুব পছন্দ হয়েছে। আপতত এই ছোট-গিন্নী থাক—"

মুচকি হাসিয়া স্বাতী ঘরটার দিকে ছুটিয়া গেল, আরও চেয়ার আছে কিনা দেখিবার জন্য। চেয়ার ছিল না, ছিল একটা কাঠের বেঞ্চি। শান্তার সাহায্যে সেইটাই সে বাহির করিয়া আনিল।

সকলে উপবেশন করিলে রঙ্গনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার দেশ বুঝি রাজপুতনায়?"

"হ্যাঁ, আমাদের ঠাকুরদা অন্তত তাই বলতেন। আমরা তিনপুরুষ কিন্তু এই দেশেই বাস করছি। তবে দরকার হলে মাঝে মাঝে দেশে যাই। গ্রামের ভাঙা বাড়িটা আছে এখনও, তবে আর থাকবে না। বাড়ি না সারালে থাকে না, আর সারাতে হলে পয়সা চাই, সে পয়সা আমার কোথা—"

"দেশে আত্মীয়-স্বজন আছে?"

"প্রচুর। বাড়ির কপাট জানলা সব খুলে নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখলাম ইটগুলোও নিয়ে যাচ্ছে।"

সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। রঙ্গনাথ উপলব্ধি করিলেন কবিবাজ সুরসিক ব্যক্তি।

"দেশে গিয়েছিলেন কেন?"

"বক্তৃতা করতে।"

"কিসের বক্তৃতা?"

"রাজপুতদের এক সভা হয়েছিল। আজকাল সবাই তো নিজের ঢোল পিটাতে ব্যস্ত, রাজপুতরাও ব্যস্ত হয়েছিল। অনেক রাজপুত জমা হয়েছিল সেখানে, আমারও ডাক পড়েছিল।"

"কি বললে সবাই?"

"কি আর বলবে, নিজেদের ঢাক পেটালে খালি। আমরা হ্যান আমরা ত্যান্—এই সব আর কি। টডের রাজস্থান আওড়ালে কেউ কেউ।"

"আপনি কি বললেন।"

কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত চাপা দিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি যা বললাম, তাতে চটে গেল সবাই।"

"কেন, কি বলেছিলেন।"

বলেছিলাম "আমরা নিজেদের যতই বড়াই করি না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে রাজপুতরা অতি নির্বোধ জাতি। উদাহরণও দিয়েছিলাম অনেক। রামচন্দ্রই ধরুন। তাকে কি কেউ বুদ্ধিমান বলবে! সৎমার উসকানিতে বাবা বললে বনে যাও, অমনি সে বনে চলে গেল। তা-ও গেলি গেলি বউটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি কেন। বউ নিয়ে কেউ কখনও বনে যায়? বনে গিয়েও সে যা করলে তা কোনও বুদ্ধিমান লোক করত না। বউ বললে আমাকে সোনার হরিণ ধরে এনে দাও। অমনি ছুটল হরিণের পিছু পিছু। সোনার জীবন্ত হরিণ হওয়া যে সোনার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব—তা সে ভেবে দেখলে না একবার। ছুটল হরিণ ধরতে। তার আগে লক্ষ্মণের ব্যবহারটাও বিবেচনা কর। সূর্পণখা ব্যভিচারিণী তা মানলুম, তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত, তার নাক কান কাটতে গেলি কেন, এটা কি কোন ভদ্রলোকের কাজ? এই সবের ফলেই সীতাহরণ আর লঙ্কাকাণ্ড। এ সব বুদ্ধির পরিচয় নয়। তারপর মহাভারতের গল্পটা ভাবুন। যুধিষ্ঠিরকে কি বুদ্ধিমান লোক বলবেন আপনি? ও তো একটা জরদ্‌গব। ধর্মপুত্র মানে কি বোকা? ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। ভীষ্মের চরিত্রে একটু তবু নুন ঝাল আছে, কিন্তু কেমন যেন এক-বগ্‌গা গোছের। তোর বাপ দুশ্চরিত্র বলে তুই আজীবন কৌমার্যব্রত পালন কর্‌বি কেন। এর কোন মানে হয়। তারপর কুরু-পাণ্ডবদের কাণ্ডটা দেখুন। তোদের মধ্যে আপোসে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া হয়েছে মানলুম, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ও হামেশাই হয়ে থাকে। তাই বলে ঘরের বউকে সভার মাঝখানে টেনে এনে উলঙ্গ করবি? আর তাই নিয়ে হাসাহাসি করবি? এ যে ছোট লোকেরাও করে না। কর্ণ দুর্যোধন ওরা কি মানুষ? লম্পট সব। আর ওই অর্জুন লোকটি যেখানে গেছে একটি করে বিয়ে করেছে। ভীমসেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকেও ছাড়েনি। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা তো পিশাচ, ছোট শিশুকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল অশ্বত্থামা। তারপর ইতিহাসের এলাকায় আসুন! ওই যে পদ্মিনীর গল্প ও শুনে আপনারা বাহবা বাহবা করেন। আমি তো ওর মধ্যে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। আলাউদ্দিন যখন পদ্মিনীকে দেখতে চাইল তখন তার স্বামী ভীম সিং উত্তর দিলেন—আমাদের স্ত্রীলোকেরা অসূর্যম্পশ্যা, কারো সামনে বার হয় না। খাশা কথা। কিন্তু আলাউদ্দিন কত বুদ্ধিমান দেখুন, সে বলে পাঠালে আমার সামনে বের হবার দরকার নেই আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি দেখলেই আমি সন্তুষ্ট হব। ভীম সিং অমনি রাজি হয়ে গেল। বুঝুন। সামনে দেখা আর আয়নায় দেখা তফাতটা কি, দেখে তো নিলে। ফল যা হয়েছিল তা তো জানেনই আপনারা। বোকা, বোকা, সব বোকা। ইতিহাসে এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে—সামনে গরুর পাল নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, ভাবছে গরু তাদের দেবতা বলে সকলেরই দেবতা! আজকালকার যুগে আসুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত মানে দারোয়ান, কিম্বা কনেস্টেবল। হোঁৎকা চেহারা, ইয়া গোঁফ, মগজে এক ছটাক বুদ্ধি নেই। মুনিব হুকুম দিলেই মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়া হচ্ছে, আর ওরা মারপিট করে জেল খেটে মরছে। রাজপুতের ইতিহাস মানে নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস। ওরা কখনও মুসলমানদের সঙ্গে পারে?"

কবিরাজ মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা বলিল, "কিন্তু যাই বলুন, রাজপুতদের ইতিহাস আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস।"

"ঠিক বলেছ। গৌ মানে এখানে গরু। ওদের গর্জনে হুঙ্কারে আমি তো গরুদের হাম্বারব ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না।"

"রাণা প্রতাপকে শ্রদ্ধা হয় না আপনার?"

"শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু ওকে বুদ্ধিমান বলতে পারি না। আকবরের সঙ্গে ওর ভাব করা উচিত ছিল। আরে, আগে বাঁচতে হবে তো। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানসিং ওর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু—"

কিন্তু এ আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হইল না। কুমারকে দূরে দেখা গেল, তাহার কাঁধে বন্দুক! তাহার পিছনে বাইক ঠেলিতে ঠেলিতে আসিতেছিল স্টেশনমাস্টারের ছেলে সুকুমার এবং চাকর ল্যাংড়া। ল্যাংড়ার দুই হাতে অনেকগুলি মরা হাঁস বদ্ধ-পদ অবস্থায় ঝুলিতেছে।

কবিরাজ মহাশয় সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"তুমি শিকার করলে? বাঃ অনেক পেয়েছ দেখছি!"

"দুটো ফায়ার করেছিলাম। জলে পড়ে গেল কয়েকটা, তোলাই গেল না।"

"আজ রাত্রে তাহলে থেকে যাই, কি বল।"

কুমার সুকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই গোটা চারেক নিয়ে যা। চারটেতে কুলুবে তো?"

"দুটোতে যথেষ্ট হবে। মা ওসব খায় না, বাবাও মন্ত্র নিয়েছেন— খাবেন কি না জানি না। আর তো বাড়িতে কেউ নেই। দুটোই নিচ্ছি আমি।"

"বেশ।"

সুকুমার গোটা দুই বড় বড় বেলে হাঁস বাইকের হাতলের দুইধারে বাঁধিয়া লইল।

"আমি চলি তাহলে।"

"আচ্ছা।"

সুকুমার টপ করিয়া নিজের নূতন বাইক্‌টাতে চড়িয়া বসিল। এই শিকার-উপলক্ষে নিজের বাইক্‌টাতে যে বারবার চড়িবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাতেই সে খুশী। এখানে বাইক চড়িবার সুযোগই নাই, বাজারে বা পোস্টাফিসে কতবার আর যাওয়া যায়। আজ সে অনেক সুযোগ পাইয়াছে। অধিকাংশ সময়ই বাইক্‌টা ঠেলিয়া তাহাকে কুমারের পিছু পিছু চলিতে হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে বাইক্‌টাকে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তো। বালুয়াচকে যখন হাঁস পাওয়া গেল না তখন বাইকে চড়িয়া সে-ই গঙ্গার ধারে গিয়া খবর আনিল যে কাজিগ্রামের বাঁকটায় অনেক হাঁস আছে, সে- ানে বসিবার বেশ ভালো একটা আড়ালও আছে। বাইক করিয়া এ খবর না আনিলে কুমারবাবু বালুয়াচক্‌ হইতেই ফিরিয়া আসিতেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তুমিই রাঁধবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"বাঃ, তাহলে তো গ্র্যাণ্ড হবে! কিন্তু একটু অনুরোধ আছে কুমারবাবু।"

"কি?"

"খুব বেশী লঙ্কা দিও না। আমি অর্শের রুগী তো। আর বেশী লঙ্কা খাওয়াটা তোমাদের পক্ষেও ভালো না।"

"বেশ, তাই হবে।"

কুমার তখন ল্যাংড়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই হাঁসগুলো ছাড়িয়ে কুটে এখানে ঠিক করে রাখ। এখন ওগুলোকে ওই কেরোসিন কাঠের সিন্ধুকটার ভিতর ঢুকিয়ে রেখে দে। তারপর বাড়ি থেকে বাসনপত্তর, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন আর তোলা উনুনটা নিয়ে আয়। সব ঠিক হয়ে গেলে তারপর উনুনের আঁচটা দিয়ে দিস্।"

ল্যাংড়া এসব কাজ করিয়া অভ্যস্ত, সে কাজে লাগিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন "মাংস কি এখানে রাঁধবে নাকি?"

"বাড়িতে যে কাকাবাবু রয়েছেন। বউদি এসব হাঙ্গাম বাড়িতে করতেই দেবেন না। এমনি হাঁসটাঁস মারাতে ওঁর মনে মনে আপত্তি যথেষ্ট। এখানেই বেশ হবে।"

"বেশী ঝালটি কিন্তু দিও না বাপু—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "ডাক্‌রোস্টই তো ভালো সবচেয়ে।"

"সে আর একদিন খাওয়াবো আপনাকে। আজ কারি হোক।"

"কি কি হাঁস পেয়েছেন। চখা তো রয়েছে দেখছি। ওগুলো কি—"

"বেশির ভাগই টিল। আর ওই বড়টা Spoonbil। এদেশে বলে পস্‌নি ঠোরা।"

সন্ধ্যা নাকটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঁশটে গন্ধ হবে না তো?"

"না। ঠেসে পেঁয়াজ রসুন দেব।"

সন্ধ্যা দূরে চাহিয়া বলিল, "মেজদি আসছে। এবার বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল উষা আসিতেছে। তাহার গায়ের লাল র‍্যাপারটা প্রতিফলিত সূর্য কিরণে আগুনের মতো দেখাইতেছিল। দূর হইতে তাহাকে মূর্তিমতী রোষবহ্নির মতোই দেখাইতেছিল বটে কিন্তু নিকটে আসিতে দেখা গেল সে হাসিতেছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া সে আর একটু হাসিল এবং আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"আরে আরে আমাকে প্রণাম করছিস কি! তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের বউ, আমি ছত্রি।"

"বাঃ, আপনি যে কাকাবাবু!"

"এই কাণ্ড দেখ।"

তাহার পর উমা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাবে না? ক'টা বেজেছে জান?"

"তা তো জানি না, ঘড়ি কাছে নেই।"

সন্ধ্যার হাতে সুদৃশ্য একটি রিস্ট-ওয়াচ ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দেড়টা।"

"এতক্ষণ বসে গল্প করছিলি, তোর হুঁস থাকা উচিত ছিল।"

"কবরেজ কাকা এসে পড়লেন যে।"

উষা হাসিমুখে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব গল্প জমিয়েছিলেন বুঝি। আহা, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু চল সব, আর দেরি নয়। রান্না হয়ে গেছে, বাবা তোমাদের সকলকে নিয়ে খাবেন বলে অপেক্ষা করছেন। ওগুলো কি।"

ঘরের বারান্দার উপর স্তূপীকৃত হাঁসগুলি এইবার সে দেখিতে পাইল।

সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছোটদা মেরে এনেছে।"

"ও বাবা, এত বেলায় অত তত্ত্ব এখন করবে কে!"

"আমি এখানেই রান্না করব।"

"তুমি তো শুধু খুন্তি নাড়বে। মশলাপত্তর হাঁড়িকুড়ি ঘি তেল মশলা সব বয়ে বয়ে আনতে হবে। কে করবে অত কাণ্ড!"

কুমার বলিল, "তুই ভাবচিস কেন, ল্যাংড়া করবে সব।"

"আমি তোমার সঙ্গে থাকব ছোটকাকা"—স্বাতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

ঊষা ল্যাংড়ার নিকট আগাইয়া গেল এবং তাহাকে আদেশ করিল, "দেখ মেটেগুলো সব আলাদা করে রাখিস। আলাদা চচ্চড়ি হবে।"

কবিরাজ মহাশয় স্মিতমুখে ইহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছিল না, মুগ্ধ অভিভূত হইয়া তিনি কেবল দেখিতেছিলেন ইহাদের, লোকে যেমন ভালো ফুলের বাগান দেখে।

ল্যাংড়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঊষা বলিল, "চল, চল, আর দেরি নয়। বাবা অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য। গগনের বউ গীটার বাজিয়ে শোনাবে বাবাকে। কাকাবাবু চলুন, গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে। কাকীরা কেমন আছেন। ভালো আছেন তো—"

"খুব প্রবলভাবে ভালো আছেন। বয়স তিনকুড়ি পার হয়েছে, কিন্তু বুড়ি হয়নি। এখনও শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে খায়। যখন কথা বলে মনে হয় কামান গর্জন করছে। তার ভয়েই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—"

"খুব বকেন বুঝি আপনাকে।"

"আমি ছাড়া আর কাকে বকবে। আর তো কেউ নেই।"

কবিরাজ হাসিমুখে ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঊষার সহসা মনে পড়িল কবিরাজ-কাকার দুটি মেয়ে ছিল। দুটিই গিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল সে।

কবিরাজ বলিলেন, "আমি যখন থাকি না তখন ভগবানকে বকে। বকে আর কাঁদে। চোখে ঘুম নেই। রাত্রেও বকে। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না ভগবানের কান নেই, আর মৃত্যু পৃথিবীর নিয়ম। সবাই মরবে। আগে আর পিছে। বলি কিন্তু বোঝে না।"

হঠাৎ এই শোকাবহ পরিস্থিতির চেহারা বদল হইয়া গেল পোস্টমাস্টারবাবুর আবির্ভাবে। তিনি একটি টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছেন।

"পিওনটা ফেরেনি এখনও। তাই আমিই নিয়ে এলাম।"

কুমার সানন্দে অনুভব করিল রাধানাথবাবুর ঔষধ ধরিয়াছে। টেলিগ্রাম খুলিয়া কুমার বলিল, "সেজদা কাল আসছে।"

ঊষা সানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

"সেজবউদিও আসছে তো।"

"হ্যাঁ। লিখেছেন—Reaching with family"

"বাবা শুনে খুব খুশী হবেন। উনি ভাবছেন। মেজদার কোন খবর নেই?"

"এখনও পাইনি তো।"

"কি যে কাণ্ড মেজদার!"

কবিরাজ মহাশয় সান্ত্বনা দিলেন।।

"দেখ সবাই যদি একরম হত তাহলে একরাঙা হয়ে যেত দুনিয়াটা। ভগবান দু'টি মুখ একরকম করেননি। হাতের পাঁচটি আঙুল পাঁচরকম। পৃথুবাবু নতুন সুর বাজিয়েছে একটা। যখন শুনব তখন ভালোই লাগবে মনে হয়—"

রঙ্গনাথ পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া তাহাতে লিখিতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে যে সব কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহাই টুকিয়া রাখিতেছিলেন। এরকম খাপছাড়া ডায়েরি লেখা তাঁহার স্বভাব।

স্বাতী সহসা চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট পিসি, তোমার পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটা পোকা বসেছে—"

সন্ধ্যা নিজের মনে দস্তানা বুনিতেছিল, আর ভাবিতেছিল দিদি আসিয়াই কবিরাজ-কাকাকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে তো করে নাই। অন্যায় হইল কি? সকলকে প্রণাম করা কি উচিত? কেবল প্রণম্যদের প্রণাম করাই ঠিক। কিন্তু সত্যই কি কেহ প্রণম্য আছে—এই সব কথা ভাবিতেছিল সে। ভাবিতেছিল ইহা লইয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবে। স্বাতীর কথায় সে লাফাইয়া উঠিল না। মৃদুকণ্ঠে কেবল বলিল, "ফেলে দে না—"

"ও বাবা, ওব গায়ে আমি হাত দিতে পারব না। প্রকাণ্ড বড়—"

ঊষা বলিল, "গঙ্গা ফড়িং। গঙ্গায় কত জল জিগ্যেস করলেই পা তুলে দেখাবেন গঙ্গায় কত জল--ওই দেখ পা তুলেছে। বাঃ সুন্দর সবুজ ফড়িংটি তো! এত বড় প্রায় দেখা যায় না। যাক আমি ফেলে দিচ্ছি।"

রঙ্গনাথ মৃদু হাসিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাঘের কবলে পড়েছিলে?"

"তার মানে?"

"পোকার জগতে গঙ্গা ফড়িং হচ্ছে বাঘ।"

দূরে দেখা গেল শান্তা আসিতেছে।

"ওই শান্তা আবার আসছে। চল, চল, বউদি রাগ করছেন ঠিক—"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

কুমার পোস্টমাস্টারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি পাখির মাংস খান তো।"

"খাই।"

'তাহলে আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খাবেন। হাঁস শিকার করেছি আজ।"

"হ্যাঁ, বন্দুকের আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু আগে।"

"রাত্রি দশটা নাগাদ আসবেন।"

"আচ্ছা।"

পোস্টমাস্টার অন্তরের অন্তস্তলে যাহা অনুভব করিলেন তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত একটা আনন্দ হইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বাতী শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। দেখা গেল বাগানের বাহিরেই যে মাঠটা আছে সোমনাথ সেখানে এক দুই তিনকে লইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছে। এক লাটাই ধরিয়া আছে, চমৎকার একটি লাল ঘুড়ি আকাশে উড়িতেছে।

ঊষা বলিল, "ওদের নিয়ে এমনিই তো আমি নাকানিচোবানি খাচ্ছি, এর উপর তুমিও যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে তো আমি আর পেরে উঠব না, হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। চান টান হয়ে গেছে তোমার?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিল, "ভোরেই তো চান করেছি।"

"চল এখন খাবে চল। এই এক ঘুড়ি লাটাই থাক এখন, খাবি চল—"

এক ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "বাঃ, একটু আগেই তো লুচি-তরকারি পেট ভরে খেয়েছি। আমার এখন খিদে পায়নি।"

দুই বলিল, "আমারও পায়নি।"

তিন বলিল, "আমারও।"

তিনের বয়স যদিও ছয়, কিন্তু তাহার আধো আধো কথা এখনও আছে, এখনও সে পরিষ্কারভাবে 'র' উচ্চারণ করিতে পারে না।

ঊষা ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাদের তো কোন সময়েই খিদে পায় না, ঘাড় ধরে খাইয়ে দিতে হয়। চল, যা পার খেয়ে নেবে। বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে তোমাদের জন্য।"

সুতা গুটাইতে গিয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। বাবলা গাছে ঘুড়িটা আটকাইয়া শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল।

"ওই যাঃ—এ কি হল!"

এক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

"ও ঠিক করে দেব আমি। তা ছাড়া গঙ্গাকে আরও চারটে ঘুড়ি, দুটো লাটাই, আর অনেক সুতো আনতে দিয়েছি আমি। চল না, খেয়ে দেয়ে আবাব ওড়ানো যাবে—"

ছেঁড়া ঘুড়িটা গুটাইয়া সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল আবার।

।। তেরো ।।

সূর্যসুন্দরের ঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরটি প্রকাণ্ড হলের মতো। সকলেরই বেশ কুলাইয়া গেল। সূর্যসুন্দরের বিছানার পাশে যে তেপায়াটা ছিল তাহার উপর প্রকাণ্ড একটি কাঁসার গ্লাসে ডালসুদ্ধ এক ঝাঁক রক্তজবা শোভা পাইতেছিল। পুরসুন্দরী গ্লাসটি কাঠের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের বাবার গ্লাস, ওই গ্লাসেই তিনি প্রত্যহ নাকি জল পান করিতেন। অত বড় গ্লাস আজকাল দেখা যায় না, যেমন বড় তেমনি ভারী। খালি গ্লাসটাই কিরণ সহজে একহাতে তুলতে পারে নাই। জলভরতি এক গ্লাস ঠাকুরদা প্রত্যহ এক হাতে অবলীলাক্রমে তুলিতেন, এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দর গ্লাসটিতে জল ভরাইয়া তাহাতে কিছু জবাফুল সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জবাফুল তাঁহার বাবার খুব প্রিয় ছিল, প্রত্যহ জবাফুল দিয়া কালীপূজা করিতেন তিনি। শেষ-জীবনে নিজের বাসার আঙিনায় দুইটি জবার গাছও তিনি পুঁতিয়াছিলেন। এই গাছ দুইটির এবং তাঁহার পোষা হরিণটির সেবা করা তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। পোষা হরিণের শিং দুইটিও সূর্যসুন্দর সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সেটি সামনের দেওয়ালেই টাঙানো ছিল। তাহাদের ঘিরিয়াও জবাফুলের মালা

দুলিতেছিল। আজ সহসা তিনি যেন একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাবার স্মৃতি-চিহ্নগুলিকে সাজাইয়া একটু যেন বেশী তৃপ্তি পাইতেছিলেন। এই সবের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর শুধু বাবাকেই নয়, পৃথ্বীশকেও যেন স্পর্শ করিতে চাহিতেছিল। তিনি তাঁহার মনের ভাব অবশ্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি জানেন কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলে এ সবের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। আপনার মনেই মশগুল হইয়া বসিয়াছিলেন তিনি। পত্নী রাজলক্ষ্মীর অয়েলপেন্টিংখানাও সামনের দেওয়ালেই বিলম্বিত ছিল। ঊর্মিলা তাহাতেও একটা কুন্দফুলের মালা টাঙাইয়া দিয়াছিল।......একটা কাঁসার গ্লাস, এক জোড়া হরিণের শিং, আর রাজলক্ষ্মীর ছবিটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে জগৎ মনে মনে সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা ঠিক স্বপ্নও নহে, বাস্তবও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত জগৎ। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন এই যে আজ তিনি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতিনী-নাতবউ লইয়া খাইতে বসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বাবা এবং রাজলক্ষ্মী অদৃশ্যভাবে উপস্থিত আছেন। পৃথ্বীশও। তিনি ডাক্তার, এই সেদিন পর্যন্ত প্র্যাক্টিস করিয়াছেন, মানুষের স্থূল শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার ছিল। কিন্তু স্থূল শরীরের কারবার করিতে করিতেই এমন সব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যাহার তাৎপর্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি বা প্যাথোলজির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, সূক্ষ্মপথে রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার মর্ম বোঝা যায়। পরলোক বলিয়া যে কিছু একটা আছে তাহার আভাস একাধিকবার তিনি ইহজীবনেই পাইয়াছেন। সেদিন বিশেষ করিয়া চৌধুরীজির কথাটা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। বছর দশেক আগে চৌধুরীজির মৃত্যু হইয়াছে। তিনিই তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন, চৌধুরীজির শেষ চিকিৎসাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রায় বারোঘণ্টা পূর্বে চৌধুরীজি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। শেষে কাহাকেও আর চিনিতেছিলেন না। বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিলেন বুঝা যাইতেছিল না। সূর্যসুন্দর সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন এবং ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছিলেন। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া খাওয়াইতে হইতেছিল, ঔষধের সবটা পেটেও যাইতেছিল না, কস বাহিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। চৌধুরীজির বড় ছেলে ফাগুবাবু রাত্রি দশটা নাগাদ শুইতে গেলেন। তাঁহারও জ্বর হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরই জোর করিয়া তাঁহাকে শুইতে পাঠাইলেন। যখন ঘটনাটি ঘটিল তখন রাত্রি একটা! সূর্যসুন্দরেরও একটু ঢুল আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন—নিশীথ নীরবতাকে বিদীর্ণ করিয়া যেন কে ডাকিতেছে—ছক্কু, ছক্কু, চল আমি এসেছি। ডাকটি শুনবামাত্র চৌধুরীজি তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সূর্যসুন্দর দেখিলেন, তাঁহার আচ্ছন্নভাব নাই—চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল।

"ছক্কু ছক্কু বলে কে ডাকলে না?"

"হ্যাঁ।"

"শুনেছেন আপনি?"

চৌধুরীকে বেশ উত্তেজিত বোধ হইল।

"শুনেছি। কেউ বোধহয় চাকর-টাকরকে ডাকছে। ছক্কু বলে আপনাদের কোন চাকর আছে কি? যাইহোক আপনি উঠেছেন যখন— তখন এই ওষুধটা খেয়ে নিন।"

"না, আমি আর ওষুধ খাব না। বাবুলাল আমাকে ডাকতে এসেছে, আমারই ডাক নাম ছক্কু।"

সূর্যসুন্দর একথা জানিতেন না।

"বাবুলাল কে?"

"আমার বাল্যবন্ধু। অনেকদিন আগে মারা গেছে। কথা ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে অপরের মৃত্যুকালে ডাকতে আসবে। বাবুলাল ডাকতে এসেছে। আমি চললাম।"

চৌধুরীজি বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এ ঘটনাটা মনে পড়িবার পর তাঁহার বাল্যবন্ধু মন্মথকে মনে পড়িল। সে-ও তো অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। সে কি তাঁহার মৃত্যুকালে ডাকিতে আসিবে? কোনও কথা হয় নাই তো।

কিরণ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"চম্পাকে আগেই খাইয়ে দিলুম। গগনের জেদ! গগন বলছে তোমরা যখন খাবে তখন চম্পা এই কোণের ঘরে বসে গীটার বাজাবে। তুমি গীটার শুনতে চেয়েছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

"বউদি কিন্তু খুব চটে গেছে। বলছে শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী-দেওর কেউ খায়নি ও আগে খাবে কেন।"

"তাতে কি হয়েছে। শাশুড়ীর ধারা ধরেছে দেখছি বড় বউ। ও পোয়াতি মানুষ, ওকে আগেই খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডেকে দাও আমি বলে দিচ্ছি।"

"ডাকতে হবে না, আমি বসিয়ে দিয়েছি। খাবে তো ভারি। আমি ঊর্মিলাকেও বসিয়ে দিয়েছি, ও তো আপনাকে খাওয়াবে।"

কিরণ আবার চলিয়া গেল।

ঠিক পাশের ঘরেই চম্পা গীটার বাজাইতেছিল।

"দে যখন ছাড়বি না।"

পার্বতী ফ্রাই আনিতে যাইতেছিল। কিরণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জামাইবাবুদের ভালো করে জিগ্যেস কব—আর কি চাই। তোমার বড় জামাইবাবুটি বেশ খাইয়ে লোক।"

"আচ্ছা।"

পার্বতী প্রচুর ফ্রাই আনিয়া আবার সকলকে দিতে লাগিল।

চন্দ্রসুন্দর একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। পুরসুন্দরী পবিত্রভাবে আলাদা রান্নাঘরে তাঁর জন্য নিরামিষ রান্না করিয়াছেন ইহা তিনি জানেন, নিরামিষ তরিতরকারিও নানারকম হইয়াছে, সে বিষয়েও খুঁত ধরিবার কিছু নাই, তবু কিন্তু চন্দ্রসুন্দর যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার সামনে বসিয়া ছেলে-মেয়ে-জামাই একসঙ্গে খাইতেছে, ইহা তাঁহার আন্তরিক অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই, ইহার মধ্যে তিনি বৈদেশিক উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাইতেছিলেন। গগনের ঢিলা পাজামা, রঙ্গনাথের কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, চম্পার গীটার বাজানো—কোনটাই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ দাদাই এ সব প্রশ্রয় দিয়াছেন।

দাদার ছেলে-মেয়ে জামাইদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যা-বৈভব প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু তাহাদের বিদেশী চাল-চলন মোটেই তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। তিনি মনে মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন—মজা বুঝিবেন পরে, অতি বাড় ভালো নয়। এ কথাও তাঁহার মনে হইতেছিল, সবই অদৃষ্টের খেলা, তা না হইলে তাঁহার অমন ভালো ছেলে, যাহারা দুইবেলা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল খায় না, তাহাদের এ দুর্দশা কেন। পার্বতী যখন প্রচুর চিংড়ি মাছের ফ্রাই আনিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন সহসা চন্দ্রসুন্দর যেন অনুভব করিলেন তাঁহার গলার ভিতরটা কুটকুট করিতেছে। জিবের পাশটাও। মনে পড়িল বাড়ির পাঁদাড় হইতে কুমার প্রচুর ওল খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবিলেন বউমা ঠিক সেই ওল এই পাঁচ-মিশেলি ছ্যাঁচড়ার মধ্যে দিয়াছে। সহসা তাঁহার গলাটা খুব বেশি কুটকুট করিতে লাগিল, তিনি একটুকরো লেবুতে নুন মাখাইয়া চুষিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নিরুপায় ক্ষোভ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল ছেলে-মেয়ে জামাইদের জন্য পোলাও কোর্মা কাবাবের আয়োজন করিয়া বড় বউ তাঁহার জন্য কেবল কতকগুলা শাক পাতা আর ওল সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে কিন্তু কিছুই বলিলেন না, কেবল সশব্দে লেবুটা চুষিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটা পুরসুন্দরীর দৃষ্টি এড়াইল না। বাম হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কাকাবাবু, খাচ্ছেন না যে। আর একটু ডাল এনে দেব?"

"বুনো ওল না শুকিয়েই তবকারিতে দিয়েছ মা, গলা কুট কুট করছে।"

"ওল তো রান্না হয়নি আজ।"

"গলা কিন্তু কুট কুট করছে।"

চন্দ্রসুন্দর মুখটা উঁচু করিয়া বাঁ হাত দিয়া গলা চুলকাইতে লাগিলেন। ইহাতে একটু রসভঙ্গের মতো হইল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "তুই বোধহয় লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছিস। দুটো রসগোল্লা খেয়ে ফেল।"

পুরসুন্দবী বলিলেন, "গরম গরম লুচি ভেজেছি। পায়েস দিয়ে তাই না হয় খান। ওসব খেতে হবে না, এই বাটিতেই হাতটা ধুয়ে ফেলুন।"

তাহাই হইল। চন্দ্রসুন্দর অসহায়ের মতো মুখ করিয়া পায়েস দিয়া গরম লুচি খাইতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে চম্পা গীটারে 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটা বাজাইতেছিল। গগন নিমীলিত নয়নে কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে মনে মনে গাহিতেছিল 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'..।

সূর্যসুন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই সুস্থ পায়ের পাতাটা নাড়িয়া তাল দিতেছিলেন।

ইহা যে অসুখের বাড়ি তাহা মনেই হইতেছিল না। মনে হইতেছিল এক অভিজাত খাম-খেয়ালী বৃদ্ধকে ঘিরিয়া উৎসব চলিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত মৃদুকণ্ঠে রঙ্গনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, শাক ভাজাকে যদি ফ্রাই বলা যায়, তাহলে কি খুব ভুল হবে?"

"হওয়া তো উচিত নয়। হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন?"

"চলিত কায়দা অনুসারে তাহলে পার্বতীকে ফরমাস করি।"

"করুন।"

"পার্বতী আমার জন্যে একটু পালং ফ্রাই নিয়ে এসো তো।"

"সে আবার কি?"

"রঙ্গনাথ বলিলেন, "পালংশাক ভাজা চাইছেন।"

"চিংড়ির ফ্রাই খেয়ে শাক ভাজা খাবেন?"

"খাব। রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চমৎকার হয়েছে ওটা!"

কিরণ নিম্নকণ্ঠে মন্তব্য করিল—"সবই অদ্ভুত!"

ঊষা সহসা উঠিয়া এক-দুই-তিনের কাছে গেল। তাহার মনে হইল তাহারা খাইতেছে না।

"আয় খাইয়ে দি তোদের। পাগল করে দিবি দেখছি আমাকে। খাচ্ছিস না ঘাঁটচিস কেবল। সরে আয়—"

স্বাতী সোমনাথকে শুনাইয়া ঊষার কানে কানে বলিল, "প্রতিটি তরকারি আজ ঝালে পুড়িয়েছে পার্বতী। কি করে যে খাই!"

আসলে প্রতিটি তরকারি তাহার খুব ভাল লাগিতেছিল কিন্তু তাহার শ্বশুরবাড়িতে একেবারে অঝালা রান্না হয়, ভণ্ডামি করিয়া সোমনাথকে তাই সে জানাইয়া দিল যে ঝালে-পোড়া তরকারি তাহার পক্ষেও সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সোমনাথ বলিল—"আমার তো চমৎকার লাগছে।"

ঊষা স্বাতীর পাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর পাতে তো কিছু পড়ে নেই।"

স্বাতী মুচকি হাসিয়া বলিল, "উঃ, যা করে খেয়েছি, পাছে পার্বতী কিছু মনে করে।"

হঠাৎ প্লেট হাতে করিয়া মিস্ বোস। (ওরফে অনু) আসিয়া প্রবেশ করিল।

"বাঃ, আমাকে আলাদা করে তাঁবুতে খেতে দিয়েছেন কেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে খাব।"

স্বাতীর পাশেই সে বসিয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

কুমারের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ হইতেই উঠিবার জন্য উসখুস করিতেছিল। সে বলিল, "আমি এবার উঠি, তিনটে বেজে গেছে। আপনারা খান। আমি বাগানে গিয়ে হাঁসগুলোর ব্যবস্থা করি গিয়ে।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, উঠে পড় তুমি কুমারবাবু। ও ব্যাপারটা বেশ ঝঞ্ঝাটের, সময় লাগবে।"

কুমার উঠিয়া পড়িল এবং একটু পরে একটা পেট্রোম্যাক্স্ আলো লইয়া চলিয়া গেল।

সূর্যসুন্দর হঠাৎ বলিলেন, "চম্পাও এই ঘরে এসেই বাজাক না। ওঘরে বেচারি একা একা থাকবে কেন, এইখানেই আসুক।"

পুরসুন্দরীর ইহাতে আপত্তি ছিল, চন্দ্রসুন্দরের তো ছিলই।

পুরসুন্দরী শ্বশুরের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেবল বাঁ হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখানে বসবার জায়গা কোথা।"

সূর্যসুন্দর গগনের দিকে চাহিলেন।

গগন সোৎসাহে দিগন্তকে আদেশ করিল—"ওই কোণের দিকে বড় মোড়াটা পেতে দে না—তা হলেই হবে।"

দিগন্ত এঁটো হাতেই উঠিয়া বড় বেতের মোড়া খালি কোণটায় পাতিয়া দিল। তাহার পর পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বউদি, দাদু তোমাকে এইখানেই আসতে বলছেন, মোড়া পেতে দিয়েছি, এস।"

গীটারটি হাতে লইয়া চম্পা আনত মস্তকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটিতে সুন্দর মানাইয়াছিল তাহাকে।

গগন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "নতুন একটা কিছু ধর। দাদু, কি বাজাবে?"

সূর্যসুন্দর উদ্ভাসিত মুখে চম্পার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন রাজলক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে তাঁহার নাত-বউটিকে দেখিতেছে।

"ফরমাসটা তুমিই কর।"

"না তুমি কর।"

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি—এ গানটা বাজাতে পারে কি?"

চম্পা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল পারে।

"তবে ওইটেই হোক, গগনের ওইটেই তো মনের কথা।"

চম্পার মস্তক আর একটু নত হইয়া গেল।

একটু পরেই গীটারে গানটা বাজিতে লাগিল।

এই সব কাণ্ড দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর নিকট বসিয়া ব্রাহ্মণ-বংশের কুলবধূ গীটার বাজাইয়া গুরুজনদের সম্মুখে বাইজিদের মতো লালসার গান গাহিতেছে ইহা অপেক্ষা বেশী শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে! মনে মনে তিনি 'ছি ছি ছি' করিতেছিলেন—কিন্তু বাহিরে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না, স্বয়ং সূর্যসুন্দরের হুকুম। তখন তিনি পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বড় বউ তোমার পায়েসটাও একটু ধরে গেছে মনে হচ্ছে।"

"তাই না কি, অত বুঝতে পারি নি তো।"

হাবু মামা নিষ্পলক-নেত্রে চন্দ্রসুন্দরের দিকে চাহিয়াছিলেন।

চোখোচোখি হইতেই বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া মুচকি হাসিলেন একটু। তাহার পর চাহিলেন শূন্য পায়েসের বাটিটার দিকে, আবার বার দুই নিশ্বাস টানিয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন।

গীটারে বাজিতে লাগিল—

সখি জাগো—
মেলি রাগ-অলস আঁখি
অনুরাগ-অলস আঁখি
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখি জাগো—।

সূর্যসুন্দর বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মীর ছবিটার দিকে তিনি চাহিতেছিলেন বটে কিন্তু তিনি মনে মনে দেখিতেছিলেন সেই লজ্জিত বধূটিকে, তাহার নামও রাজলক্ষ্মী ছিল, কিন্তু সে এই ছবির রাজলক্ষ্মী নয়। তাঁহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল।

।। চোদ্দ ।।

আহারান্তে হাবু মামা কবিরাজী ঔষধ 'চুরণ' খাইবার জন্য চন্দ্রসুন্দরের তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরসুন্দরী একটি শ্বেত পাথরের ছোট বাটিতে চন্দ্রসুন্দরের জন্য পান ছেঁচিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রসুন্দর তাহাই চিবাইতেছিলেন। হাবুলমামার মুখে পান নাই দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

"পান খাও নি?"

"আগে 'চুরণ'টা খেয়ে নি, তারপর খাব। একটু গুরুভোজন হয়েছে আজ। অনেকদিন এসব খাওয়া তো নেই। তুমিও নানা বায়নাকা করলে বটে, কিন্তু মন্দ খাওনি।"

"এ সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে খেয়ে তৃপ্তি হয় না মামা। ওই ফ্রাই না কি, এমন বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ ছাড়ছিল, পেঁয়াজের কাঁচা রস দিয়েছে, না কি দিয়েছে ভগবানই জানেন!"

হাবু-মামা বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি খড়্গপুরে কত দিন ছিলে?"

"বছর দুই। কেন বল তো?"

"আমি যে কোয়ার্টারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সেই কোয়ার্টারেই বরাবর ছিলে?"

"হ্যাঁ কোয়ার্টারটি তো ভালই ছিল।"

"কি করে ছিলে তাই ভাবছি।"

"কেন। কোন কষ্ট ছিল না, দক্ষিণ পুব পশ্চিম তিন-দিকই খোলা।"

"কিন্তু তোমার বাড়ির লাগোয়া থাকতেন এক মৌলভী সাহেব। তাঁর বাড়ির পেঁয়াজ ভাজার শব্দ পর্যন্ত তোমার ঘরে বসে শোনা যেত। গন্ধ তো পাওয়া যেতই। তাঁর মুর্গি তোমার উঠোনে বারান্দায় রোজ উড়ে আসত এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওখানে দু'বচ্ছর কাটালে কি করে?"

"পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ছিলুম। কি করব বল। দারিদ্র্যো দোষো গুণরাশি-নাশী!"

হাবু-মামা মুচকি হাসিলেন এবং চুরণটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। গেলেন কম্পাউনডারবাবুর কাছে।

গগন চুপি চুপি আসিয়া দাদুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপেল স্টাফিং কেমন খেলে দাদু? ভাল লাগল?"

"চমৎকার। আগে কখনও খাইনি।"

"তোমাকে এবার একটা পর্তুগীজ তরকারি খাওয়াব।"

"কি?"

"টম্‌ফ্র্যাডু—"

"সে আবার কি। মাংস না মাছ?"

"লাউ। ছোটকাকার অনেক লাউ হয়েছে দেখছি। কাল করাব চম্পাকে দিয়ে।"

"বেশী খাটিও না ওকে।"

"দিন-রাত তো বসেই আছে। বাজনা কেমন শুনলে?"

"খাসা।"

"গানও মন্দ গায় না। সন্ধ্যের পর গাইতে বোলো, গাইবে।"

ঊর্মিলা আসিয়া পড়াতে এসব গোপন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। গগন ছোট-কাকীর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়াই তাহার দেখা হইয়া গেল দিগন্তের সঙ্গে।

"দিগন্ত, ননীকে একটা টেলিগ্রাম করে দে তো। ইংরেজি বাংলা কয়েক রকম পাকপ্রণালী যেন পাঠিয়ে দেয় কিনে। আপেল স্টাফিং খুব ভালো লেগেছে দাদুর। দাদুকে রোজ একটা করে নতুন রান্না করে খাওয়াক না চম্পা। এখনি টেলিগ্রামটা করে দে। আরজেন্ট টেলিগ্রাম করিস। আমার স্যুটকেসে টাকা আছে, তোর বউদির কাছ থেকে চেয়ে নে।"

"টাকা আছে আমার কাছে।"

"তাহলে যা। একটা চিঠিও লিখে দিস।"

"আচ্ছা।"

বৃহস্পতি ওরফে বিরুবাবু আহারাদির পর নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া ইজিপ্টের বইটিই পড়িতেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক তিনি, স্বল্পাহারীও। অনেকরকম রান্না হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বেশী কিছু খান নাই। দুই আঙুলে করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সব জিনিসই একটু আধটু চাখিয়াছিলেন। চাখিতে চাখিতেই তাঁহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। ভাত যৎসামান্য খাইয়াছেন, ডালই একটু বেশী প্রিয় তাঁহার, প্রায় আধ বাটিটাক্ চুমুক দিয়া খাইয়াছেন সেটা। আপেল স্টাফিংটা তাঁহার মন্দ লাগে নাই। চম্পার রান্নার হাত আছে। চম্পার গানবাজনাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাঁহার কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করেন নাই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনে উপভোগ করিয়াছেন তাহা। বাবা যে ইহাতে আনন্দ পাইয়াছেন ইহাতেই বেশী খুশী তিনি। কিন্তু এ খুশীভাবটাও তিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন নাই, সাধারণত করেন না। এক-দুই-তিনকে কি গল্প বলিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। ফারাও খুফু পুত্রকে যে যাদুকরের গল্পটা বলিয়াছিলেন সেই গল্পটাই তিনি উহাদের শুনাইবেন। সে গল্প তাহাদের ভালো লাগিবে। যাদুকর দেশী হাঁসের মুণ্ড কাটিয়া তাহা আবার জুড়িয়া দিয়াছিলেন।.......সহসা অন্য একটা কথা মনে হওয়াতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহাদের বাড়ির কাছে একটা পীর-পাহাড় আছে। তাহার তলায় কোন ঐতিহাসিক-রহস্য আত্মগোপন করিয়া নাই তো! হারোপ্পা, মহেঞ্জোদারো তো ওইরূপ পাহাড়ের মতোই ছিল। স্বর্গীয় রাখাল বাঁড়ুয্যে কল্পনার জোরে সেই সব পাহাড়ের তলায় অতীতের ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাহাড়টা খুঁড়াইয়া দেখিলে ক্ষতি কি? তাহা কি সম্ভব? গভর্নমেণ্টকে বলিলে শুনিবে কি? শুনিবে না, পীর-পাহাড়কে খুঁড়িতে সাহসই করিবে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাই বাধিয়া যাইবে হয় তো। মনে পড়িল নকুলদা যখন এক স্টোনকন্ট্রাক্টার মাড়োয়ারির নিকট চাকুরি করিতেন তখন এই পাহাড়ের তলায় না কি কয়েক ঘড়া মোহর পাইয়াছিলেন। কাহাকেও সেকথা বলেন নাই অবশ্য, খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু ওই পাহাড়-খোঁড়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থা

ফিরিয়া যায়।......বৃহস্পতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাহাড় খুঁড়িবার সময় দু'-একটা পাথরে কি যেন লেখাও ছিল, কারুকার্যও ছিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। বাবার জন্য যে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, সে দুশ্চিন্তার মেঘ আগেই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের খেয়ালে নিজের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যে কয়েকখানা বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

ঊষা নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া সদানন্দের পা টিপিয়া দিতেছিল। আহারাদির পর সদানন্দের দিবানিদ্রা দেওয়ার অভ্যাস আছে। নিদ্রার পূর্বে পা-টেপানোটাও তাঁহার একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে। পূর্বে চাকর দিয়া টিপাইতেন, কিন্তু এখন ঊষা নিজেই টিপিয়া দেয়। চাকরদের হাতে ছোঁয়াচে চর্ম-রোগ হইতে পারে এই ধারণা যেদিন হইতে তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে সেদিন হইতে সে সদানন্দের পায়ে কোনও চাকরকে হাত দিতে দেয় না। এমন কি তাঁহার কাপড় চোপড়ও নিজেই কাচিয়া দেয়। প্রায় প্রকাশ্য-ভাবেই সে সদানন্দের সেবা করিতেছিল, ঘরের কপাটটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বামীর পদ-সেবা করিতেছে তাহাতে লজ্জার কি আছে। সন্ধ্যাটারই বরং লজ্জা-সরম নাই, দুপুরে স্বামীকে লইয়া ঘরে খিল দিয়াছে। ঊষা পান চিবাইতেছিল, ঠোঁট দুটি লাল, মাথার চুল আলুলায়িত, একটা সুন্দর কেশতৈলের সৌরভে ঘরে বাতাস আমোদিত, চোখের দৃষ্টি আনন্দে সোহাগে টলমল করিতেছে। পা টিপিতে টিপিতে সে স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল। ইদানীং কিছুদিন হইতে সে স্বামীর সহিত যে আলাপই করুক না কেন, তাহাতে ভর্ৎসনার সুর ফুটিয়া ওঠে।

"তুমি এসে থেকে তো বাবার কাছে একবারও বসলে না। বাইরে বাইরে খালি বাজে গল্প করে বেড়াচ্ছ। কাছে বসলে বাবা কত খুশী হন। কি যে মুখ-চোরা স্বভাব তোমার।"

"কেষ্ট-দা'ও তো যাননি।"

"কেষ্ট-দার কথা ছেড়ে দাও। বুনো লোক। জানোয়ারদের সঙ্গই ওঁর ভালো লাগে।"

"রঙ্গনাথ গিয়াছিল কি ?"

"গিয়েছিল একবার সকালের দিকে, তুমি তখন চান করছিলে। গিয়ে বসে বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, এদিকে বেশ লেফাপা দুরস্ত আছে তো। দাদার জামাইটিও বেশ হয়েছে। ঘুরছে ফিরছে বাবার কাছে গিয়ে বসছে। তুমিই খালি এড়িয়ে চলছ?"

"গুরুজনদের সামনে গিয়ে কেমন যেন স্বস্তি পাই না। কি গল্প করব ওঁর সঙ্গে?"

"যে কোন বিষয়ে গল্প করতে পার! বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে গল্প করা যায়। সোমনাথ তার ওপরওলা কি এক সাহেবের সম্বন্ধে গল্প করছিল। রঙ্গনাথ গাছপালা নিয়ে কি সব বলছিল, কে একজন বুড়ো মুসলমান এসেছিল সে তো সমস্তক্ষণ আখ আর গুড়ের গল্পই করলে। বাবা সবার সঙ্গেই বেশ সায় দিয়ে দিয়ে গল্প করলেন।"

"আমি বাবার সঙ্গে কি নিয়ে গল্প করব তা তো মাথাতেই আসছে না।"

"বই টই নিয়ে বলো না কিছু। বাবা এককালে খুব বই পড়তেন। বাংলা ভাষায় যত বই বেরুত সব বাবা কিনতেন, কি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল আমাদের। এ গ্রামের সব বাঙালী আমাদের বাড়ি থেকে বই নিয়ে পড়ত। সেই জন্যেই সব হারিয়ে গেছে। যে বই নিয়ে যায় সে তো আর ফিরিয়ে দেয় না, সে পাট নেই কারও।"

সদানন্দের ঘুম আসিতেছিল।

জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, সন্ধ্যের পর বসব গিয়ে।"

"আর দেখ, এক-দুই-তিনকে তুমি একটু শাসন করো। বড্ড বেড়েছে ওরা।"

"আচ্ছা।"

"আর দেখ, আমাদের চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে কাটিহারে পাঠিয়ে দিই, কি বল, কিছু তরকারি, ফল, চা কফি হরলিক্স্ কোকো এইসব কিনে আনুক। কুমার বেচারা একা আর কত সামলাবে। দাদা অবশ্য এসেই ওকে কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কর্তব্য আছে।"

"বেশ।"

সদানন্দের নাকটা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

উষা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া তাহার পর মৃদু হাসিল। দ্বিতীয়বার নাক ডাকিতে সে ধীরে ধীরে তাহাব গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। উষা দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে দিনে ঘুমাইলে আরও মোটা হইয়া যাইবে।

এক-দুই-তিনকে লইয়া স্বাতী পেয়ারা গাছগুলির তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। গাছ-পাকা পেয়ারার উপর তাহার খুব লোভ। কুমার—স্বাতী-সোমনাথের জন্য একটি আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছিল দক্ষিণ দিকের মাঠে। সোমনাথ আহারান্তে সেই তাঁবুর ভিতব ঢুকিয়াছিল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়াছিল স্বাতীও আসিবে। আসিলে তাহাকে বিলাতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি দেখাইবে সে। পত্রিকাটি সে স্টেশন স্টলে কিনিয়াছিল, কিন্তু ট্রেনের ভীড়ে স্বাতীকে দেখাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন স্বাতী আসিল না তখন সোমনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে অবশেষে পেয়ারা গাছগুলির নীচে আসিয়া পড়িল।

"এ কি এতো খাওয়ার পর আবার পেয়ারা খাবে নাকি!"

স্বাতী আসল কথাটি চাপিয়া গেল। ইহাই তাহার স্বভাব।

"দাদুর জন্যে খুঁজছি। দাদু পেয়ারা খুব ভালোবাসেন তো।"

দুই বলিয়া উঠিল—"একটু আগে যে পেয়ারাটা পেলাম সেটা তো আমরাই খেলাম ভাগ করে। দাদুর জন্যে রাখলে না তো।"

"ও পেয়ারা কি দাদুকে দেওয়া যায়। পাকেই নি।"

এক বলিল, "না জামাইবাবু, সুন্দর ছিল পেয়ারাটা।"

"চুপ কর ফাজিল কোথাকার"—ধমকাইয়া উঠিল স্বাতী। তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া সোমনাথকে বলিল—"ওই অনেক উঁচুতে চমৎকার একটা পেয়ারা রয়েছে। পেড়ে দেবে?"

প্রায় মগডালের কাছাকাছি একটা বড় পাকা পেয়ারা ছিল। সোমনাথ মালকোঁচা মারিয়া গাছে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তরুণী স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না।

কিরণও খাওয়া শেষ করিয়াই কৃষ্ণকান্তকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারও উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া কিছু নীতি-উপদেশ দেওয়া। কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে সে ধরিতেই পারিল না! কৃষ্ণকান্ত আহার শেষ করিয়াই নিজের বন্দুকটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথা গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। বন্দুকের খালি বাক্সটার দিকে চাহিয়া কিরণ খানিকক্ষণ দাড়াইয়া রহিল, তাহার পর চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি লিখিল পুত্র ঘণ্টুকে।

"বাবা ঘণ্টু, তোমার দাদু অনেকটা ভালো আছেন। বিপদটা আপাতত কেটে গেছে মনে হচ্ছে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ি এখন জমজমাট। উষা তার তিন ছেলে নিয়ে এসেছে। দাদার ছেলে-মেয়েরা এসেছে সবাই, গগনের বউও এসেছে। বউদি তো এসেইছেন। সন্ধ্যা-রঙ্গনাথও এসেছে। সোমনাথ-স্বাতীও। সেজদাও সপরিবারে আসছেন, খবর এসেছে আজ। এ সময় তুমি না থাকাতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যেমন করে পার ছুটি নিয়ে চলে এস। সবাই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, আমার ছেলেটিই আমার কাছে নেই, একি ভালো লাগে কখনও? তুমি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটির দরখাস্ত কোরো, যদি ইতিমধ্যে না করে থাকো। দরখাস্তে লিখে দিও না হয়—মায়ের খুব অসুখ করেছে।"

এই একটি কথাই সে নানা সুরে লিখিতে লাগিল।

পার্বতী পুরসুন্দরীকে লইয়া পড়িয়াছিল।

"নিয়ে আসি না একটু তেল। তুমি আপত্তি করছ কেন।"

"না এখন তেল মাখাতে হবে না আমার পায়ে। বিছানার চাদরটা তেলে মাখামাখি হয়ে যাবে, আজই বার করেছি ওটা।"

"হলেই বা, আরও তো চাদর আছে।"

"তুই গড়িয়ে নে না একটু, আমাকে নিয়ে পড়লি কেন।"

"ঘোরাঘুরি তোমার কম হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথাটি যদি বাড়ে তখন আমাকেই ভুগতে হবে যে। আমি উনুনে তেলের বাটিটা চড়িয়ে এসেছি, নিয়ে আসি।"

পার্বতী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পুরসুন্দরী অর্ধ-স্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, "জ্বালিয়ে খেলে মেয়েটা—"

বৃহস্পতি কোণের দিকে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, "দিক না একটু তেল মালিশ করে। ঠিকই তো বলছে ও, হাঁটুর ব্যথাটা বাড়লে মুশকিল হবে—"

পুরসুন্দরী বাদ-প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, অপ্রসন্নমুখে পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাম করিবার জন্য দিগন্তর সহিত সন্ধ্যাও পোস্টাফিসে গিয়াছিল। উষা ঠিক খবরটি জানিত না। সন্ধ্যা রঙ্গনাথের সহিত নিজের ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল এইটুকুই উষা দেখিয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই যে সন্ধ্যা অন্য দরজাটি দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা উষা দেখে নাই। সন্ধ্যার দিনের বেলা ঘুম আসে না। দিনের বেলা সে পড়া-শোনা করে। কিন্তু রঙ্গ নাথের দিনের বেলা না ঘুমাইলে চলে না। তাহার আর একটি বদ-অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা পাশে না শুইলে তাহার ঘুমই আসে না। রঙ্গনাথ ঘুমাইয়া পড়িতেই সন্ধ্যা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইল—দিগন্ত কোথা যেন যাইতেছে।

"কোথা যাচ্ছিস এ সময়ে?"

"পোস্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে। দাদা বললে পাকপ্রণালী চাই দু'তিন রকম। আমার এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে দি সে খুঁজে কিনে পাঠিয়ে দেবে।"

"পাক-প্রণালী? কি হবে?

"দাদা বলছে দাদুকে নতুন নতুন তরকারি রান্না করে খাওয়াবে রোজ। আইডিয়াটা চমৎকার, না?"

কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া দিগন্ত সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যা দেখিল তাহার চোখের দৃষ্টি দাদার নতুন আইডিয়ার কিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ খুব ভালো লাগিয়া গেল দিগন্তকে। নূতন আলোকে তাহাকে যেন দেখিতে পাইল।

"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই, গ্রামের ভিতর যাইনি অনেক দিন। সেই ছেলেবেলায় যেতুম।"

"চল।"

পোস্টাফিসের কাছাকাছি আসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "তুই টেলিগ্রাম কর, ততক্ষণ আমি কাশী সিংয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি। ওরা কেউ আছে কিনা কে জানে!"

পোস্টাফিসের পিছনেই কাশী সিংয়ের বাড়ি। কাশী সিং এককালে এখানকার থানার হাবিলদার ছিল। আদি বাড়ি তাহার মুঙ্গের জেলায়। এখানেই পুলিশের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করে। সেই সময় সূর্যসুন্দর চেষ্টা করিয়া তাহাকে স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে উচ্চ-শ্রেণীর সিপাহীর পদে বহাল করাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারই তাহাকে গ্রামের মধ্যে কিছু জমি দান করেন। সেই জমির উপর কাশী সিং বাড়ি করিয়াছিলেন। সেই হইতেই কাশী সিংয়ের সহিত সূর্যসুন্দর পরিবাবের হৃদ্যতা। কাশী সিংয়ের বউ প্রায়ই নানা রকম খাবার ঘরে প্রস্তুত করিয়া সূর্যসুন্দরের ছেলে-মেয়েদের জন্য লইয়া যাইত। চিড়া বা মুড়ির মোয়া, ঠেকুয়া, খাবুনি, ব্যাসনের সন্দেশ, ডাল মাড়া প্রভৃতি একদিন ঊষা ও সন্ধ্যার হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কাশী সিংয়েরও দুটি মেয়ে ছিল, বুধিয়া আর সীতিয়া। ঊষা আর সন্ধ্যার খেলার সঙ্গী ছিল তাহারা। কাশী সিং বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। কাশী সিংয়ের স্ত্রী বাঁচিয়া আছে এখনও।

সন্ধ্যা তাহার কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল।

"চাচী চিনতে পার আমাকে—"

চাচী উঠানে নামিয়া আসিল এবং মুখ তুলিয়া কপালে বাঁ হাতটা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিল চাচীর চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। চাচীর শিরাবহুল জরাকুঞ্চিত কপালের চামড়াটা আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। চাচী সন্ধ্যাকে চিনতে পারিল না।

"চিনতে পারলে না তো, আমি সন্ধ্যা"—

চাচী বাঙালীদের সঙ্গে আধা-বাঙ্‌লা আধা-হিন্দিতে কথা বলে।

"আরে সন্‌ঝা-মাই। আমি শুনেছি তোরা এসেছিস। যেতে পারিনি, আঁখে আর ভাল সুঝে না। সীতিয়াকে রোজ যেতে বলি, সে-ও পারে না, তার কোমরে দরদ—

"সীতিয়া আছে না কি এখানে?"

"আছে। শুয়ে আছে ঘরে। এ সীতিয়া—দেখ দেখি কে আয়ল বা—"

সীতিয়া বাহির হইয়া আসিল কোমরে হাত দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মুখে এক মুখ হাসি। সীতিয়াকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল সন্ধ্যা। এ কি চেহারা সীতিয়ার। এত মোটা হইয়াছে! সীতিয়া কথা বলিল পরিষ্কার বাংলাতে।

"কাকাবাবুর অসুখ করেছে, তোরা এসেছিস, সব আমি জানি, কিন্তু কি করব, চলতে পারছি না কোমরে এত ব্যথা।"

"কি হয়েছে কোমরে?"

"বাত।"

"এত অল্প বয়সে বাত! ডাক্তার দেখিয়েছিস?"

"দেখিয়েছি। হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু একটা মালিসের ওষুধও দিয়েছেন। লাগাচ্ছি তো, কিন্তু কমছে না।"

"তুই গগনকে দেখা। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"গগন কে?"

"দাদার বড় ছেলে। সে ডাক্তার হয়েছে যে, শুনিসনি?"

এই সংবাদে কাশী সিংয়ের স্ত্রীর মিশি মাখানো দাঁতগুলি আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

"খোঁকাবাবু ডাক্টর বন গৈলন! শিউজি বাঁচিয়ে রাখুন তাকে।"

পাঁচ ছয় বৎসরের একটি উলঙ্গ বালক লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিল। তাহার প্রকাণ্ড টিকি, নাক-বোঝাই সর্দি। গায়ে একটা নীল সোয়েটার রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাকী দেহটা উলঙ্গ। কোমরে একটা লাল ঘুনসি, তাহাতে ছোট্ট একটা বটুয়া ঝুলিতেছে।

"শিউযতন, গোড় লাগ। মৌসি—"

"তোর ছেলে?"

সীতিয়া হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল।

"বড় দুষ্টু, দিন রাত রাস্তায় খেলছে।"

শিউযতন কোন রকমে প্রণামটা সারিয়া আবার লাফাইতে লাফাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

"আয় ঘরে বসবি আয়—"

সন্ধ্যা অনুভব করিল, সীতিয়া আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরই ঢুকিল। গিয়া দেখিল সেখানেও একটি তিন চার মাসের ছেলে নিজের হাতের মুঠা দুইটি দেখিয়া দেখিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান শিশু। তাহার গায়ে ফুলদার রঙীন রেজাই ঢাকা, মাথায় লাল টুপি। ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রেজাইটা লাথি মারিয়া সরাইয়া দিবে। চোখের কাজল সারা মুখে মাখিয়াছে। সন্ধ্যা নিজে যদিও নিঃসন্তান, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। তাহার মনে হইল সীতিয়াকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাহার কর্তব্য। সে বিছানার একধারে বাগাইয়া বসিল। চাচীও কয়েকটি লাড়ু লইয়া প্রবেশ করিল।

"খা।"

লাড়ুগুলি দিয়া চলিয়া গেল চাচী। বারান্দায় গিয়া বরশী হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চাচী তামাক খায়।

ছেলেবেলায় লাড়ু পাইলে সন্ধ্যা উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন ততটা হইল না। সে কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেল চাচী যে পাত্রটিতে লাড়ু আনিয়াছিল সেই পাত্রটি দেখিয়া! প্লেটের মতো, কিন্তু কাচের বা চিনেমাটির নয়, বেতের। তাহাতে নানা রকম রংও রহিয়াছে, চমৎকার দেখিতে। গৃহশিল্প সম্বন্ধেও অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। অনেক ভাবিয়াছেও।

সীতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কোথা থেকে কিনেছিস? বেশ চমৎকার।"

"ভিখ্‌নার বউ তৈরি করে' বিক্রি করে।"

"কোথা থাকে সে?"

"কাজি গাঁয়ে। তুই নিবি? এইটেই নিয়ে যা না।"

"দে।"

বাল্যসঙ্গিনীর নিকট হইতে এই সামান্য উপহার পাইয়া সন্ধ্যা সহসা যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

"আমি কিন্তু ভিখ্‌নার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আচ্ছা, খবর পাঠিয়ে দেব তাকে।"

সন্ধ্যা নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল কি করিবে। ভিখ্‌নার বউ বেতের বাসন তৈয়ারি করিতেছে, এই অবস্থায় তাহার একটি ফোটো তুলিবে সে। বাসনগুলির ফোটো তুলিবে, দৃষদ্বতীতে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখবে। তাহার পর সে নিজের গলা হইতে সোনার সরু হারটা খুলিয়া সীতিয়ার ছেলের গলায় পরাইয়া দিল।

"ওকি করলি!"

"দিলুম তোর ছেলেকে। তোর বড় ছেলেকে একটা ফুল প্যান্টও করিয়ে দেব আমি। রমজানিয়া এসে মাপ নিয়ে যাবে।"

সীতিয়া হাসিয়া বলিল, "রমজানিয়া অনেকদিন হল মারা গেছে। তার ছেলে গোহর এখন দর্জির কাজ করে।"

"রমজানিয়া মারা গেছে? বেশ, গোহরকেই পাঠাব তাহলে। বুধিয়ার খবর কি?"

"বুধিয়া শ্বশুর বাড়িতে আছে।"

"ভাল আছে বেশ?"

"খুব ভাল নেই। তার স্বামীটা বড় মারখুণ্ডা। তোর ছেলেমেয়ে কি?"

"আমার এখনও হয় নি ভাই।"

"কেন?"

"এমনি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। সমাজের নানারকম কাজকর্ম করারও ইচ্ছে আছে। কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে থাকলে ওসব হত না।"

"তা বটে। আমার মাত্র দুটো ছেলে, তাতেই পাগল করে দিয়েছে আমাকে। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ করেছিস কি করে। কোন ওষুধ খেয়েছিস?"

"না।"

সন্ধ্যা জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধেও প্রচুর পড়াশোনা করিয়াছে। স্থির করিল এ বিষয়েও পরে সে সীতিয়ার সহিত আলোচনা করিবে।

"লাড়ু খাচ্ছিস না যে?"

অনেক বেলায় খেয়েছি। সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে খাব।" বারান্দায় চাচীর হুঁকার শব্দ শোনা গেল।

মিস অনুপমা বসুও নিজের কর্তব্য সমাপনান্তে নদীর ধারে গিয়া একটি বিস্তৃত পাথরের উপর বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য চম্পার মাকে চম্পার রিপোর্ট প্রত্যহ পাঠানো। ইউরিন কেমন, ব্লাডপ্রেসার কত, খাওয়ায় রুচি আছে কিনা, ভিটামিনগুলি প্রত্যহ খাইতেছে কিনা, এসব খবর প্রত্যহ না পাইলে চম্পার মা অনর্থ করিবেন, হয়তো চলিয়া আসিবেন। তাই এগুলি সে সযত্নে প্রত্যহ পাঠাইতেছে। গঙ্গার জলস্রোতের দিকে চাহিয়া বাবুলের কথা মনে পড়িতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বাবুলের চঞ্চল স্বভাবের কথাই মনে হইতেছিল তাহার। সে এখন কেমন আছে কে জানে। ভালই আছে সন্দেহ নাই, না থাকিলে খবর পাইত। তাহার বাবা নিশ্চয়ই খবর দিতেন।

তাহারই ছেলে বাবুল। কিন্তু যেহেতু বাবুলের বাবার সহিত তাহার সামাজিক অনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই, তাই প্রকাশ্যভাবে সে নিজের মাতৃত্ব ঘোষণা করিতে পারে না। অনুপমার বাবা শঙ্কর-প্রসাদ নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ডিগ্রি র সহিত একটি প্রণয়ীও জুটাইয়া আনিল। সুপর্ণ সিংহ নামটাই অনুপমার চিত্তকে প্রথমে আকর্ষণ করে। একটি নামের মধ্যে পক্ষিরাজ এবং পশুরাজের এমন সমন্বয় দুর্লভ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার। লোকটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল জাগিল। প্রথমে দেখা হইয়াছিল কলেজেরই কমন রুমে। তখন বয়সটাই এমন যে সব কিছুই ভালো লাগে। দোকানে টাঙানো ছিট হইতে শুরু করিয়া বিশেষ ধরনের পশু-পাখি ফড়িং ফুল লতা-পাতা সব কিছুই মনকে মুগ্ধ করে। এক বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে কলেজে আসিয়াছিলেন সিংহ মহাশয়। আলাপ করিয়া অনুপমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিলাতী ডিগ্রী আছে। সমাজেরই সেবা করেন। নামটিও চমৎকার। যথাসময়ে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পিতা শঙ্করপ্রসাদ এসব কিছুই জানিতেন না। বাবুল যখন পেটে আসিল তখন অনু তাঁহাকে সব কথা জানাইতে বাধ্য হইল, কারণ নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সুপর্ণ উড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে খবর পাওয়া গিয়াছিল তিনি নাকি একটি ধনী-কন্যার পাণি-পীড়ন করিতে উৎসুক হইয়া তাহারই পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধনী-কন্যাটি পিতার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে গাঁথিতে পারিলে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন (অর্থাৎ সমাজ-সেবা) সফল হইবে। কারণ সমাজ সেবা করিতে হইলে প্রচুর টাকা চাই। অনুপমা তাহাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় নাই, কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। কারণ সুপর্ণ সেই মেয়েটির পিছু পিছু কখনও বম্বাই, কখনও মসৌরি, কখনও রামগড়, কখনও বা কালিম্‌পঙে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ইদানীং ঠিকানাও পায় নাই।

শঙ্করপ্রসাদ অনুকে ভর্ৎসনা করেন নাই, বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়া কোনও নাটকীয় কাণ্ডও করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। সব জেনে শুনে

যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করেছ, তার ভার তোমাকে বইতে হবে। সামাজিক লাঞ্ছনা আজকাল আর হয় না, তবে লোক-লজ্জা বলে একটা জিনিস আছে এখনও। আমি যতদূর সাধ্য তোমাকে তার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব।" অনুপমার মাথায় সিঁদুর পরাইয়া তিনি তাহাকে ব্যাঙ্গালোরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার হাসপাতালেই বাবুলের জন্ম হয়। বাবুল একটু বড় হইবার পর সে তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া ব্যাঙ্গালোর হাসপাতালেই নার্সের কাজ শেখে। তাহার পর সেখান হইতে মাদ্রাজে যায়। মাদ্রাজের এক মিশনরি সাহেবের সাহায্যে সে বিলাত পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। নার্সিং এবং ছেলে-প্রসব-করানো বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করিয়াছে। ভালই রোজকার হয়। বাবাকে কোন কোন মাসে দুইশত টাকা পর্যন্ত পাঠাইতে পারে। শঙ্করপ্রসাদ সমস্ত টাকা বাবুলের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে।... নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুর মনে হইল, এখনও সে সুপর্ণ সিংহকে ভালবাসে। আগেও একথা মনে হইয়াছে। আবার হইল।

সূর্যসুন্দর নিমীলিত-নয়নে শুইয়া আবার সেই দিবাস্বপ্নটি দেখিতেছিলেন। নির্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে তিনি একা যাত্রী। তিনি যেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলিয়াছেন। কেন চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। সূর্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ বর্ণ-বিচিত্র। সেই বর্ণ-বিচিত্র ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। অনিবার্য অক্লান্ত গতিতে আসিতেছে। কিন্তু কে, ও কে—

"কে, ওকে ?"

তন্দ্রার ঘোরে সূর্যসুন্দর কথা কহিয়া উঠিলেন।

"বাবা কিছু বলছেন ?"

ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল।

সূর্যসুন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া প্রথমে নেটের মশারিটা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর ঊর্মিলার মুখটা। বুঝিতে পারিলেন, তিনি পথ চলিতেছেন না, বিছানাতেই শুইয়া আছেন। তাঁহার পুরাতন খাটের উপরই শুইয়া আছেন, তাঁহার পুরাতন শয়ন-গৃহে। মনে পড়িল এ রকম স্বপ্ন আর একবার দেখিয়াছিলেন।

"বাবা, কিছু বলছেন ?"

"না। কুমার কোথা ?"

"তিনি বাগানে গেছেন. পাখির মাংস রান্না করছেন সেখানে।"

"ও"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন।

একটু পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন চন্দ্রসুন্দর। ঊর্মিলাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ধ্যের পর এই খানে বসে গীতা পড়ব। তুমি মা মেজেটা গঙ্গাজল দিয়ে একটু নিকিয়ে দিও, কেমন ? মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুনের রান্না এইখানটায় বসে খেয়েছ তো তোমরা, তার উপর বসে গীতা পড়াটা কি ঠিক হবে—"

ঠিক হইবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর ঊর্মিলা দিল না।

কেবল বলিল, "আমি গঙ্গাজল দিয়ে এখুনি ধুয়ে দিচ্ছি মেজেটা।"

।। পনেরো ।।

কুমার বাগানের ঘরটিতে মাংস চড়াইয়াছিল।

ঘরের বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘোর শীতও। নানাসুরে নানা-রকম নৈশ কীট-পতঙ্গ চিৎকার করিতেছে, একটা পেচকের কর্কশ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। ঘরের ভিতর কয়লার উনুনের উপর প্রকাণ্ড মাংসের ডেক্‌চিতে মাংস ফুটিতেছে। মশলাভাজার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। ল্যাংড়া চাকরটা ঘরের এককোণে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা বস্তা বুঝি কোণে ঠেসানো আছে। ইহারা মশারিতে অভ্যস্ত নহে আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়া মশা হইতে আত্মরক্ষা করে, দম বন্ধ হয় না। মশা বেশি নাইও, কারণ কুমার চতুর্দিকে ফ্লিট্ ছিটাইয়াছিল। কুমারের পায়ের কাছে ছুচ্‌কি সামনের থাবার উপর মুখটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, মাঝে মাঝে কুমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল, মাঝে মাঝে কান খাড়া করিতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করিতেছিল না। ল্যাং-ল্যাং ঘুমাইতেছিল। ঘরের একধারে পেট্রোম্যাক্স জ্বলিতেছে। কুমার তাহার কাছেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া বাবার 'স্মৃতিকথা'য় মন দিয়াছে। তাহার পাশেই রহিয়াছে একটি গুলিভরা বন্দুক। গোটা দুই বড় বড় ব্যাঙ্ আসিয়া জুটিয়াছে, লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। অনেক দূরে কোথায় যেন মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। থানার বর্তমান দারোগা সাহেব মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে বন্দুক-আওয়াজ করেন। তিনি বলেন—ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে বন্দুক আওয়াজ করিবে। যাহার বন্দুক নাই সে শাঁখ বাজাইতে পারে, যাহার শাঁখ নাই সে গলা-খাঁকাবি দিক। তাই কুমারের মনে হইল দারোগা সাহেবই বোধহয় বন্দুক আওয়াজ করিতেছেন। কুমারের এসব দিকে কিন্তু ততটা মন ছিল না, সে নিবিষ্ট চিত্তে বাবার বাল্যজীবন কাহিনী পড়িতেছিল।

"যথা সময়ে আমি দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেলাম। ভরতির দিন দিদিমার আদেশে বাড়ির ক্ষ্যান্ত ঝি চাল ডাল তরকারি ফলমূল দিয়া সাজাইয়া একটি সিধা দীনু পণ্ডিতকে দিয়া আসিয়াছিল। সিধার সহিত একখানি নরুন-পাড় ধুতি এবং একটি লাল গামছাও ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে দীনু পণ্ডিত খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। দিদিমা মাঝে মাঝে দীনু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। এই সব কারণেই সম্ভবত দীনু পণ্ডিত [illegible] উপর একটু প্রসন্ন ছিলেন। পাঠশালায় প্রথম দিন গিয়াই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। গিয়া দেখি নবীন চোদ্দ-পোয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই বিস্তৃত হাতের উপর দুইখানি ইট। চৌদ্দ-পোয়া শাস্তিতে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, দুই পায়ের মাঝখানে চৌদ্দ-পোয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত ব্যবধান থাকিবে। নবীনের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিদিমার কৌশলে আমি দীনু পণ্ডিতের কোপকবল হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য খুব নিরীহ ছেলে ছিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বালাইবার মতো ইন্ধন আমার ছিল না। সে ইন্ধন ছিল মন্মথর। বদমায়েসিতে তাহার জোড়া আমি হইতে পারি নাই, যদিও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব খুব হইয়াছিল। মন্মথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়ই শাস্তি পাইত। প্রায়ই তাহাকে 'ঘুঘু-ঘোড়া' হইয়া বসিতে হইত। মন্মথও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত

না। সুযোগ পাইলেই অন্ধকারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় ঢিল ফেলিত। গোলক পণ্ডিতের নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। শিশুবোধক, ধারাপাত শেষ হইয়াছিল। হাতের লেখাও অনেকটা মক্‌সো করিয়াছিলাম। কিন্তু দীনু পণ্ডিত গোড়া হইতে আবার সব শুরু করিলেন। দিদিমাকে গিয়ে বলিলেন—"মা, ভাগ্যে আপনার নাতিটিকে এখানে এনেছিলেন। ওই অজ পাড়া-গাঁয়ে গোলক পণ্ডিতের কাছে থাকলে হয়েছিল আর কি। ও তো একটি গবাকান্ত হয়েছে।" দিদিমা বুদ্ধিমতী ছিলেন, গোলক পণ্ডিতের কাছে আমি কতটা বিদ্যার্জন করিয়াছি তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি দীনু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। বলিলেন, "এখন তোমার কাছে এনে দিয়েছি বাবা—তুমিই ওর ভার নাও, ওকে মানুষ করে তোল।" দীনু পণ্ডিত সাহলাদে বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, করব বই কি। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করাই তো আমার কাজ। ওই যে রামবাবুর ছেলে ঘোঁতা, যেমন বোকা তেমনি পাজি ছিল। কারো গাছে ফল থাকবার যো ছিল না ওর জ্বালায়। আম জাম পেয়ারা কুল প্রত্যেকটি গাছ মুড়িয়ে খেত ছোকরা, আর বাকী সময়টা ছিপ নিয়ে বসে থাকত গঙ্গার ধারে। রামবাবু ওকে একদিন ধরে এনে আমার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। ওকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিট্ করেছিলাম। এখন রেলে টালি ক্লার্ক হয়েছে জানেন বোধ হয়।" দিদিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার নাম ডাক তো খুব। সূয্যির ভারটিও তুমি নাও বাবা। ওর মায়ের ওই একমাত্র ভরসা। বাপ তো থেকেও নেই।"

দিদিমার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া আসিয়াছিল। দীনু পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার ভার তিনি বহন করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপে তিনি তো আমাকে শাসন করিতেনই—অবশ্য খুব একটা মারধোর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না—আমার হাতের লেখা অঙ্ক এবং ভাষা জ্ঞানও যাহাতে অনিন্দনীয় হয় সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পাঠশালাতেই আমি ধারাপাত, শুভঙ্করী এবং লোহারামের ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে আমার সেই পাঠশালার জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া দুই তিনটি বন্ধুর কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী এবং দিবাকরের কথা। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকেই আমার পরবর্তী জীবনকেও কম প্রভাবিত করে নাই। মন্মথ ছিল বেশ মিশুক এবং সরল। চমৎকার গান গাহিতে পারিত। অভিনয়েও দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে যে সব যাত্রা হইত, মন্মথ ছিল সে সবের উৎসাহী দর্শক। মামার এবং দিদিমার কড়া শাসনে আমার ভাগ্যে প্রায়ই যাত্রা দেখা ঘটিয়া উঠিত না। আমি যাত্রা-দেখার আনন্দটা উপভোগ করিতাম মন্মথর সহায়তায়। সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যাত্রার গান বক্তৃতা আমাদের শুনাইত। তাহার গানের গলা অসাধারণ ছিল, যেমন চড়া, তেমনি মিষ্ট। বক্তৃতাও খুব ভালো করিত। তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ি যাইতাম। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী সত্যই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। বৈকালে যেদিন তাঁহার বাড়িতে না যাইতাম তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, চাকর পাঠাইতেন আমার খবর লইবার জন্য। চাকরের সঙ্গে আবার আমাকে যাইতে হইত। গিয়া দেখিতাম আমার জন্য খাবার ঢাকা-দেওয়া রহিয়াছে। সেটি সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়া, তাহার পর চাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। দিদিমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন

তিনি। ইহার সূত্রপাত হয় আমার সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পরেই। কথায় কথায় একদিন বাহির হইয়া পড়ে দুইজনেরই বাপের বাড়ি একই গ্রামে। আমার মা যে স্বামী-পরিত্যক্তা ভাগ্যহীনা এবং আমি যে পিতৃহীন অনাথেরই মতো—একথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাঁহারা। সম্ভবত এই সব কারণে এবং দিদিমার ইঙ্গিতে তিনি আমার বৈকালিক আহারের ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ-রকমের ছিল। সকালে ব্যবস্থা ছিল মুড়ি কিম্বা বাসী রুটি এবং পাতলা গুড়। পাঠশালায় যাইবার সময় ভাত, কলাইয়ের ডাল এবং বাসী অম্বল ছাড়া আর কিছু থাকিত না। মাঝে মাঝে আলুভাতে থাকিত। পাঠশালায় যাইবার সময় তরকারি বা মাছ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ঠাণ্ডা তরকারি (ক্বচিৎ কোনদিন মাছ) দিয়া ঠাণ্ডা ডাল-ভাতই ছিল বরাদ্দ। আমি মন্মথর বাড়ি হইতে প্রত্যহই কিছু ভালমন্দ খাবার খাইয়া আসিতাম, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন সন্দেশ, কোন-দিন দুধের সর বা চাঁচি, যেদিন লুচি পরোটা থাকিত সেদিন তো হাতে স্বর্গ পাইতাম। মন্মথর বাড়ি হইতে ফিরিয়া মামার বাড়ির বরাদ্দ ডাল-ভাত-তরকারি এবং দিদিমার প্রসাদ খাইতাম। খাইবার খুব যে একটা ইচ্ছা থাকিত তাহা নয়, কিন্তু দিদিমার জেদে খাইতে হইত, মামীমা পাছে কিছু মনে করেন এ ভয়ও ছিল। সংসারে মামীমার আধিপত্য ক্রমশ বাড়িতেছিল, মা ক্রমশ যে· নিজেকে সংসার হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। তিনি যে বাড়িতে আছেন তাহা বোঝাই যাইত না। কখন খাইতেন, কখন শুইতেন, কিছুই টের পাইতাম না। কখনও তাঁহাকে বসিয়া গল্প করিতে দেখি নাই। সর্বদাই নীরবে কাজ করিতেন। কাজই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা, রান্না করা সবই তিনি একা করিতেন। ক্ষ্যান্ত ঝি কেবল মাছ কুটিয়া দিত। রান্না আবার দুই-রকম ছিল। দিদিমার জন্য শুদ্ধাচারে আলোচালের ভাত রান্না করিতে হইত। আলাদা একটু রান্নাঘরই ছিল তাঁহার জন্য। দিদিমা তাঁহার পাত হইতে আমার জন্য প্রত্যহ কিছু আলো-চালের ভাত, মুগের ডাল রাখিয়া দিতেন। মা সংসারে সব কাজই এত নীরবে এমন প্রচ্ছন্নভাবে করিতেন যে তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না। তাঁহাকে কখনও ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সর্বদা একটি লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন, মাথায় সিঁদুর পরিতেন বটে, কিন্তু কেশের প্রসাধন করিতে কখনও দেখি নাই। অনেক চুল ছিল তাঁহার, সেগুলি তাঁহার মাথার উপর স্তূপ হইয়া থাকিত। দিদিমা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেন এবং চুলে· জট পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন শুনিতে পাইতাম।....এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটাতে মা যেন আরও লজ্জিত, আরও ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। একদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম—আমার একটি ভাই হইয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। হঠাৎ ভাই আসিল কোথা হইতে? গোয়ালের পাশে যে ঘরটিতে গরুর খড় রাখা হইত সেখান হইতে খড় বাহির করিয়া কখন যে সেটা আঁতুড়-ঘরে পরিণত হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

উঁকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ছেঁড়াকম্বল ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন। পাশেই ছেঁড়া-নেকড়ায়-ঢাকা একটি ফুটফুটে শিশু। সে-ঘুমাইতেছে। ক্ষ্যান্ত ঝির ধমক খাইয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিলাম। একটি মোটা কালো মেয়ে একটি ভাঙা লোহার কড়াই করিয়া কিছু গনগনে কয়লার আগুন লইয়া প্রবেশ করিল।

শুনিলাম সেই ধাত্রী, জাতে ডোম। সেই ছেলে প্রসব করাইয়াছে, সেই এখন মায়ের সহিত এই ঘরে থাকিবে, আমরা কেহ এ ঘরে ঢুকিতে পাইব না।

দিদিমার কাছে গেলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "ভাইকে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ, দূর থেকে দেখেছি। খুব সুন্দর। ধপধপ করছে রং, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—"

"হবেই তো। ও যে চাঁদ"—দিদিমা বলিলেন।

"চাঁদ?"

"তুই সূয্যি, তোর ভাই চাঁদ হবে না? খুব সুন্দর হয়েছে?"

"খুব। চাঁদের চেয়েও ভালো।"

"পোড়াকপাল আমার, এস সময়ই চোখের দৃষ্টিটা গেল। ওর মুখ আর দেখতে পাব না।"

ইহার পর দিদিমা চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দিদিমা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মা-ই প্রত্যহ দিদিমার চুল আঁচড়াইয়া পিছনে ছোট্ট একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। মা আঁতুড়ে ঢোকার পর মামীমা একদিন চিরুণী লইয়া দিদিমার চুল আঁচড়াইতে বসিলেন। দুই একবার চিরুণী চালাইবার পরই দিদিমা থামাইয়া দিলেন তাঁহাকে।

"সর, তোকে আর চুল আঁচড়াতে হবে না। তুই ঠিক পারচিস না। আমি আর চুল রাখবই না। বিশুকে খবর পাঠা, আমার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছেঁটে দিক। এ আপদ আর রাখা কেন—"

পরদিন বিশু নাপিত আসিয়া দিদিমার মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো করিয়া দিয়া গেল। দেখিতে অদ্ভুত হইল দিদিমাকে। ইহার দিন কয়েক পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া দিদিমার একটু জ্বরভাব হইল। প্রবীণ ডাক্তার সুরথবাবু দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি মাথায় গরম টুপি, গায়ে গরম জামা এবং পায়ে মোজা পরিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহার পর দিদিমার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। গফুর দরজি তাঁহার জন্য যে জামা করিয়া আনিল তাহা মেয়েদের জামা নয়, ঢিলা-হাতা কোটের মতো পাঞ্জাবী, চায়না কোট তাহার নাম। দিদিমার রং খুব ধপধপে ফরসা ছিল, নাকটি ছিল টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো। তিনি যখন টোপরের মতো কালো মখমলের টুপি ও গরম পাঞ্জাবী পরিয়া বিছানায় বসিয়া থাকিতেন মনে হইত কোনও বৃদ্ধ ইহুদী বুঝি বসিয়া আছে। দিদিমা বলিয়া তাঁহাকে চেনাই যাইত না। মামা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি দুইবেলা, সকালে-সন্ধ্যায় দিদিমাকে আসিয়া প্রণাম তো করিতেনই, দূরে কোন 'কলে' যাইবার আগেও প্রণাম করিয়া যাইতেন। মায়ের এই নূতন বেশ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তিনি মায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে সবুজ-পাড়-দেওয়া বেগুনী-রঙের একটি চমৎকার বালাপোষও আনাইয়া দিয়াছিলেন। বালাপোষটি গায়ে দিয়ে দিদিমাকে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার মুখভাব ক্রমশ শিশুর মুখের মতো হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইত যেন একটি শিশু কোনও মন্ত্রবলে হঠাৎ বড় হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে...."

কুমার তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল এবং কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল বাবার দিদিমা সত্যই কেমন দেখিতে ছিলেন।

হঠাৎ ল্যাং-ল্যাং ভেউ-ভেউ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। ছুঁচকিও তাহার অনুসরণ করিল। কুমার খাতা বন্ধ করিয়া দ্বারের দিকে চাহিল একবার, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। ডেক্‌চির ঢাকনাটা খুলিয়া একবার দেখিল মাংসের ঝোল কতটা আছে। ঝোল তখনও ছিল। হাতার সাহায্যে একটুকরা মাংস বাহির করিয়া সে তখন একটা বাটিতে রাখিল, তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়া সেটাকে ঠাণ্ডা করিল, তাহার পর আঙুল দিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল মাংস সিদ্ধ হইয়াছে কি না। একটু বাকী আছে, মনে হইল জলটা মরিতে মরিতে হইয়া যাইবে।

"কুমারবাবু না কি। এখানে কি হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ কবিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি। দুইজনেরই মুখে অপ্রস্তুত ভাব। জামাইবাবুকে তাহারা চিনিতে পারে নাই—তাড়া করিয়া গিয়াছিল এজন্য দুইজনেই যেন খুব লজ্জিত। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই হোক বা একজন আর একজনকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হোক তাহারা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় পা কান কামড়াকামড়ি করিয়া বপ্রক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের পোশাক অদ্ভুত। ব্রিচেস্ পরা সাহেবী পোশাক, হাতে বন্দুক, মাথায় টর্চ-বাঁধা। চক্ষু-কর্ণ-রোগের বিশেষজ্ঞেরা মাথায় যেমন টর্চ বাঁধেন অনেকটা তেমনি।

"কোথায় গিয়েছিলেন, দিদি খুঁজছিলেন আপনাকে?"

"তোমার দিদি সারাজীবনই খুঁজছেন আমাকে। কখনও পাচ্ছেন, কখনও হারাচ্ছেন।"

"এ বেশে কোথা গিয়েছিলেন?"

"প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম।"

"প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ?"

"আজ সকালে হাসপাতালে দেখলাম একটি মানবশিশুকে শেয়ালে খেয়েছে। শৃগালের স্পর্ধা বরদাস্ত করা যায় না। গোটা কুড়ি শৃগাল সংহার করেছি।"

"কোথায়?"

"পাশের বাগানটায়! ওই বেতের জঙ্গলটাব পাশে।"

"অতগুলো শেয়াল একসঙ্গে পেলেন কি করে?"

"টোপ ফেলেছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে মাথায় এই আলোটা জ্বেলে দিলুম। শেয়ালরা কৌতূহলী জীব, অস্থানে এমন জোর আলো দেখে দেখতে এল ব্যাপারটা কি। গুটিগুটি রেন্‌জের মধ্যেই এসে পড়ল, তারপর আর ফিরে গেল না।"

"কুড়িটা মেরেছেন?"

"কুড়িটা। তোমার কোনও জমিতে যদি সারের দরকার থাকে, ওগুলো পুঁতে দিতে পার সেখানে। শেয়ালের মাংস খাওয়া যায় না, বিশ্রী গন্ধ ওদের মাংসে, কুকুর-কুকুর গন্ধ। নিগ্রোরা বোধহয় খায়।"

একটা কেরোসিন বাক্সের উপর পেট্রোম্যাক্‌সটা জ্বলিতেছিল, সেটা মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাক্সটার উপর উপবেশন করিলেন।

"আপনি এই ক্যাম্পচেয়ারটায় আরাম করে বসুন না।"

"না, রাজাকে অকারণে সিংহাসনচ্যুত করা আমাব স্বভাব নয়। ভগবানের আদেশে আমি কেবল দুষ্কৃতদের শাসন করি।"

কুমার পুনরায় মাংসের দিকে মন দিয়াছিল। ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গন্ধটা তেমন ভালো ছাড়ছে না।"

"বুনো হাঁস?"

"হ্যাঁ।"

"কি কি হাঁস?"

"টিল, পোচার্ড, লালসর, স্পুনবিল, গীজও আছে একটা—

"কতটা মাংস আছে?"

"তা সের পাঁচ ছয় হবে।"

"ভাল সরষের তেল আছে এখানে?"

"আছে।"

"তাহলে এক কাজ কর। পোয়া দেড়েক সরষের তেল চড়িয়ে দাও একটা কড়াতে। কড়া এনেছ?"

"হ্যাঁ, ওই যে।"

"পেঁয়াজ রসুন আদা?"

"তা-ও আছে।"

"তাহলে গোটা তিনেক রসুন, পাঁচ-ছটা পেঁয়াজ আর ছটাকখানেক আদা কুঁচিয়ে তেলে ভেজে সবসুদ্ধ ঢেলে দাও ওটার ভিতরে। খানিকটা কাঁচা তেলও দাও তার উপর। পাখির মাংস সরষের তেলেই জব্দ। তোমার দিদির কাছে শিখেছি এটা।"

"জলটা মরুক আগে। ওরে ল্যাংড়া—

"জি।"

কোণের বস্তাটা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

"কড়াটা পরিষ্কার কর। আর তিনটে রসুন, ছ'টা পেঁয়াজ, আর খানিকটা আদা কোট্।"

কৃষ্ণকান্ত মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ বেশ চমৎকার কামুফ্লেজ করে ছিল তো ল্যাংড়া।"

ল্যাংড়া উঠিয়া আসিয়া আদেশ প্রতিপালনে মন দিল। ল্যাং-ল্যাং এবং ছুচ্‌কি তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিল। ল্যাংড়া তাহাদের পরম বন্ধু, একটু আগেই পাখির মাংস খাওয়াইয়াছে।

কুমার বলিল, "আপনার শিকারের গল্প অনেকদিন শুনিনি জামাইবাবু—"

"আজ দুপুরে তো বলছিলাম রামপ্রসাদ, যোগেন আর প্রিয়গোপালদের—"

"এখন বলুন না একটা, শুনি। মাংসের জলটা মরুক ততক্ষণে—"

কৃষ্ণকান্ত ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না এখন।"

"আচ্ছা আপনার ভাইঝির শ্বশুর কালীবাবুকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল বলুন তো। আবছা আবছা শুনেছিলাম।"

"প্রতিশোধ নিয়েছিলাম।"

"কি রকম?"

"মালতী আমার এক দূরসম্পর্কের দাদার মেয়ে। দুমকায় যখন ছিলাম তখন মেয়েটা খুব ন্যাওটা ছিল আমার। বীরেনদা দুমকায় থাকতেন তখন। কিছুদিন পরে আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে বীরেনদা দুম্ করে মালতীর বিয়ে দিয়ে বসলেন ওই কালীবাবুর ইম্‌বেসিল (imbecile) ছেলেটার সঙ্গে। মূর্খ, খস্‌খসে মোটা, দুটি গাল যেন দুটি বান্ রুটি। সম্বলের মধ্যে আছে শহরে গলির শেষ প্রান্তে এক জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। বিয়ের সময় আমি যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে সম্ভবত ভালই হয়েছে। ভুলটি ভাঙল বছরখানেক পরে। মালতীর চিঠি পেলাম। লিখেছে তার উপর যে ধরনের অত্যাচার চলছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। সহ্যেব সীমা অতিক্রম করেছে সে। নিজের বাবাকে চিঠি লিখে সে কোনও প্রতিকার পায়নি, তাই আমাকে লিখেছে। আমিও যদি এর কোনও প্রতিকার না করি তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। টেলিগ্রাম করে ছুটি নিলুম, তারপর গেলুম তার কাছে। কালীবাবু লোকটিকে সেই প্রথম দেখলাম। ভালুক আর বাঁদরের কম্‌কিনেশন। বেঁটে, রোগা, মুখময় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি, কুৎসিত দর্শন লোকটা। চোখে নীল চশমা। বাঁ হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি সর্বদা চলাচল করছে গোঁফদাড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মতো। আমি গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। চুপ করে রইল, তারপর দাড়ির জঙ্গলে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে বললে, "আপনাকে তো চিনি না। বীরেনবাবুর কোনও চিঠিও পাইনি। এ অবস্থায় ঘরের বউকে আপনার সামনে বার করি কি করে" বললাম, "আপনি মালতীকে গিয়ে বলুন যে তোমার কেষ্টকাকা এসেছে।" অনেক কচলাকচলি করে তবে মালতীর সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম বুড়োর স্ত্রী নেই। একটি মাত্র শোবার ঘর। সেই ঘরে বুড়ো ছেলের সঙ্গে এক ঘাটে শোয়, মালতীকে শুতে হয় ঘরের বারান্দায়। সমস্ত রাত শীতে ঠকঠক করে কাঁপে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, বাড়িতে ঝি নেই, চাকর নেই, তার উপর রাত্রে ঘুমও নেই—বোঝ অবস্থাটা। কালীবাবুকে বললাম, আপনি এই বৈঠকখানার একধারে শুলেই তো পারেন। মেয়েটার শীতে ভারী কষ্ট হচ্ছে যে। দাড়িতে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে কালীবাবু বললেন, "আমার গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনি ওপর-পড়া হয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? হুঁ"—আবার খানিকক্ষণ থেমে—"আপনি দূরসম্পর্কের কাকা, জোয়ান বয়স। আমার বউমাটিও সুন্দরী, যুবতী। আপনার সহানুভূতি হবারই কথা। হুঁ"—এই বলে আবার দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বাঁকাতে হবে। মালতীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললাম—"তোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, রাত্তির আড়াইটের ট্রেনে তোকে নিয়ে যাব। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম জায়গাটা। দেখলাম ওদের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা সেকেলে শুক্‌নো ইঁদারা আছে। বেশ প্রকাণ্ড ইঁদারা। তারপর থানায় গেলাম। সেখানে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল পুরাতন বন্ধু সুরপৎ সিংয়ের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গে শিকারও করেছি অনেকবার। সে তখন ওখানকার দারোগা। খুব সুবিধে হয়ে গেল। তারপর বাজারে গেলাম। বেশ মজবুত দেখে কিছু দড়ি আর একটা মুখোস কিনে নিয়ে এলাম, লুকিয়ে রেখে দিলুম সেগুলো ব্যাগের মধ্যে। সব ঠিক করে আবার থানায় গেলাম। সুরপৎ সিংকে আমার প্ল্যানটি খুলে বললাম অকপটে। সে হাসল একটু। তারপর বলল, "ঠিক আছে। তবে দেখো, মরে যায় না যেন!" বললাম, "না, মরবে না"। রাত বারোটা নাগাদ মুখোশ পরে ওদের

শোয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় মারলাম লাথি, তারপর দিলুম একটা ধাক্কা। কপাট মজবুত ছিল না তেমন, ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে বাপ ব্যাটা দু'জনকেই টানতে টানতে নিয়ে সেই শুক্‌নো ইঁদারাটার ভিতর নামিয়ে দিলুম!"

কুমার স্মিত মুখে বলিয়া উঠিল, বলেন কি! চীৎকার করলে না তারা?"

"তারস্বরে! তাদের সঙ্গে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। কিন্তু লোকজন উঠতে উঠতে আমি ইঁদারায় নাবিয়ে মুখোসটা ফেলে দিয়েছি ইঁদারাব মধ্যেই। পাশেই ছিল তো ইঁদাবাটা—

"ইঁদারায় নাবাতে গেলেন কেন?"

"বাইরে শীতে কি রকম কষ্ট হয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নিয়ে গিয়েছিলাম বাপ ব্যাটাকে— "

"তারপব?"

"আমার হাল্লা শুনে বেরিয়ে এল দু' একজন। তাদের বললাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ডাকাতগুলো হয়তো আছে এখনও আশে পাশে। এই শুনে ঘরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপর মালতীকে নিয়ে আমি নিজেই থানায় গেলাম। সেখানে অফিসিয়ালি রিপোর্ট করলাম—"আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু রাত্রে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাইঝির স্বামী আর শ্বশুরকে একটা ডাকাত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কোথা নিয়ে গেছে জানি না, আপনারা সেটা খোঁজ করুন। আমাকে কালই কাজে জয়েন করতে হবে, তাই এই ট্রেনেই আমি আমার ভাইঝিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যখন কেস হবে তখন এসে সাক্ষী দেব। ঠিকানা দিয়ে কেটে পড়লাম আড়াইটেব ট্রেনে।"

"কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"কেস হল। গিয়ে সাক্ষীও দিলাম। ডাকাত ধরা না পড়াতে কেস ধামা চাপা পড়ে গেল।"

"আর মালতী?"

"মালতী আর ফিরে যাযনি। তাকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলাম। এখন সে এম-এ, পাস করে প্রফেসারি করছে।"

"কালীবাবু কিছু করেননি?"

"যথেষ্ট করেছিলেন। মকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু নিয়ে যেতে পারেননি আর মালতীকে। আমারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেননি, সুরপৎ আমার সপক্ষে ছিল তো। তুমি মাংসটা দেখ এইবার, জলটা মরে গেছে মনে হচ্ছে—"

কুমার উঠিয়া গেল এবং মাংসটা নাড়িয়া দেখিল।

"ভাগ্যে আপনি বললেন, জল একদম শুকিয়ে গেছে, আর একটু হলে ধরে যেত— "

"এইবার তৈলাক্ত কর। বেশ খানিকটা তেলে পেঁয়াজ রসুন আদাটা ভাজ।"

পেঁয়াজ রসুন আদা কাটা হইয়া গিয়াছিল, কুমার সেগুলি ভাজিয়া মাংসে ঢালিয়া দিল। ল্যাং ল্যাং এবং ছুঁচকি এতক্ষণ কানখাড়া করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই বাহিরে কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়া তুমুল কোলাহল উঠিল একটা। একাধিক রুষ্ট কুকুরের চীৎকারে অন্ধকার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুমার বলিল, "তাকিয়াটা এসেছে বোধহয়।"

"তাকিয়া? সে আবার কে?"

"বোসবাবুর কুকুর। বোসবাবু পুষেছিল ওটাকে। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেছেন, ওটাকে আর নিয়ে যাননি। ও আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কিছুতে আমোল দিচ্ছে না ওকে—"

সহসা একটা কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমার দ্বারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভেতরে আয়—"

দেশী কুকুরেরা সহজে কথা শোনে না। অনেক ডাকাডাকির পর তবে ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভিতরে আসিল। যখন আসিল তখনও তাহারা রাগে গরগর করিতেছে। ঘাড়ের লোম খাড়া। বিজয়ীর মতো তাহারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ঝগড়াটে হিংসুটে কোথাকার। বস এখানে।"

কুমার তাহাদের হাত দিয়া ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া দিল।

"বসে থাক চুপ করে।"

তাহারা বসিবার পর কুমার ডাকিল—"তাকিয়া, তাকিয়া আয়, তাকিয়া—"

কুণ্ঠিত মুখে সসঙ্কোচে পাশুটে রঙের একটি বেঁটে মোটা কুকুর আনত নয়নে, আনত পুচ্ছে দ্বারপ্রান্তে আসিল।

"আয়, আয়, ভেতরে আয়—"

তাকিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করিল না, সসঙ্কোচে দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওর নামটি বেশ লাগসই হয়েছে। কে রেখেছে?"

"আমি। আমিই ওকে প্রথমে পুষেছিলাম। এখন ওকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। তাকিয়া, তাকিয়া আ, আ।"

তাকিয়া সভয়ে ল্যাজ নাড়িয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের কোণ হইতে ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি দুইজনেই আবার গরগর করিয়া উঠিল।

"চোপ্। চুপ করে বসে থাক তোরা। হিংসুটে কোথাকার।"

কুমারের ধমক খাইয়া আবার নীরব হইল তাহারা।

এমন সময় বাহির হইতে স্বাতীর গলা শোনা গেল।

"ছোটকাকা, ছোটকাকা—আলো দেখাও।"

ল্যাংড়া পেট্রোম্যাকস্ লইয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বাতী আসিয়া হাজির, তাহার পিছনে স্মিতমুখী সন্ধ্যা।

"মাঝ রাস্তায় ছোট পিসির টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল। শিগ্গির চল, চিত্রা এসে গেছে—"

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বড় পিসিকে যত বলছি আপনি এখানেই আছেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কেবল ভাবছে, ভেবেই যাচ্ছে, চলুন।"

কৃষ্ণকান্ত সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব কোথা?"

"আপনাকে খুঁজছেন।"

"আমাকে! কেন?"

"গাছের সম্বন্ধে কি যেন জিগ্যেস করবেন। বাগান করবার শখ হয়েছে।"

"কিন্তু আমি তো জঙ্গলের খবর রাখি।"

"হয়তো জঙ্গলের গাছই বাগানে লাগাবেন। চলুন।"

কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?"

'এখনও হয়নি। তবে দিদিমা তাঁর জন্যে অন্য ঘরে তরকারি-টরকারি আলাদা করে রেখেছেন। ছানার পায়েস হয়েছে তাঁর জন্যে। চমৎকার হয়েছে পায়েসটা—"

"তুই পায়েসও খেয়েছিল না কি!"

স্বাতী নিজেই পায়েস চাহিয়া খাইয়াছিল, কিন্তু বলিল, "দিদি জোর করে খাওয়ালে—কি করব বল। বললে—চেখে দেখ্। কিন্তু দিলে একটি বাটি। হ্যাঁ, দিদি বললে কলাপাতা কাটানো হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে শালপাতা নিয়ে যেতে। জামাইরা শুধু থালায় খাবে, আমরা পাতায়।"

"ল্যাংড়া কলাপাতা কেটেছিস তো?"

"জি হাঁ।"

"সব নিয়ে চল তাহলে। আগে মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে চল।"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

স্বাতী কুমারকে চুপি চুপি বলিল, "জানো ছোটকাকা, বাবা বড় disappointed হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন—চিত্রা আসবার আগে টেলিগ্রাম করবে আর তিনি ঘটা করে স্টেশনে আনতে যাবেন। কিন্তু ওরা খবর না দিয়েই হুট্ করে এসে পড়েছে। কি করবে, টেলিগ্রাম করার সময় পায়নি সুব্রত লাস্ট মোমেন্টে ছুটির খবর পেলে—"

"ও, তাই বুঝি।"

হঠাৎ স্বাতী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটকাকা, ওদুটো কি, শেয়াল নাকি!"

সত্যই দুইটি শৃগাল একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের দেখিতেছিল।

"এ দুটোর ভবলীলাও শেষ করে দেব না কি"—কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন।

"অনেক তো মেরেছেন আজ। ছেড়ে দিন এ দুটোকে।"

শৃগাল দুটিও সরিয়া পড়িল।

"অনেক শেয়াল মেরেছেন বুঝি? কোথা?"—স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"পাশের বাগানটায় স্তূপ করা আছে।"

"চলুন না দেখি—"

"না এখন নয়। কাল সকালে দেখো।"

সন্ধ্যার মৃদুকণ্ঠের গম্ভীর আদেশকে কেহ অমান্য করিতে পারিল না। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহারা বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল চন্দ্রসুন্দর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ধূপকাঠি জ্বলিতেছে। চন্দ্রসুন্দর পরিবেশটিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মেঝের একধারে রাধানাথ গোপও বসিয়া আছেন এবং মুগ্ধচিত্তে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। তিনি নিজের বাগান হইতে কয়েকটি বড় বড় গাঁদাফুলের মালা আনিয়াছিলেন, সেগুলি চন্দ্রসুন্দরের দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। প্রিয়গোপাল এবং সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সর্ফুদ্দিনও একধারে বসিয়া আছে। ইহারা সকলেই চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র।

ঘরের আর একধারে একটু তফাতে বসিয়া আছে কিরণ, নিখিলবাবুর স্ত্রী কাঞ্চনমালা, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী যোগমায়া এবং মিস বোস। কিরণ এবং যোগমায়ার গলায় আঁচল, হাত দুইটি গোড়-করা। উষাও এখান ছিল, কিন্তু চিত্রা আর সুব্রত আসাতে উঠিয়া গিয়াছে। ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। গগন পিছনের দরজাটা দিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল। আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল গীতাপাঠ আর কতক্ষণ চলিবে। কথা ছিল সন্ধ্যায় দাদুর ঘরে মজলিস বসিবে, চম্পা গান গাহিবে। কিন্তু ছোট-দাদুর গীতা পাঠ সে সম্ভাবনা রহিত করিয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে তাঁহার কানে যাইতেছিল, তিনি তাহার কিছু অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার মুদিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথটা, সেই আদি-অন্তহীন নির্জন পথ, যে পথে তিনি একক যাত্রী, যে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু? মৃত্যু কি এভাবে আসে?

হঠাৎ বাহিরে খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিযা উঠিল।

"ও কি?"

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

রাধানাথ গোপ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, "কিষুণগঞ্জের রামবিলাস বাবাজীর কীর্তনের দল। তাদের খুব ইচ্ছে তারা আপনার হাতার একধারে বসে নামকীর্তন করবে রোজ। রামবিলাস বলছিল আমি তো ডাক্তারবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে নামগান শোনাই—"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কাঞ্চনমালা, নিখিলবাবুর স্ত্রী, কিরণেব কানে কানে কি যেন বলিলেন।

কিরণ বলিল, "কাকীমা বলছেন, একটু দূরে বসে ওরা বাজাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাবার কানের কাছে যেন গোলমাল না হয়"

"না, না, ওরা দূরে বসেই বাজাবে। ওই হাসনুহানার ঝাড়ের ওপারে ওদের জায়গা করে দিয়েছি। মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে তবে ওদের খবর দিয়েছিলাম—"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "বাজাক না। ভগবানের নাম হবে, ভালই তো।"

রাধানাথ গোপ তাহাদের বসাইবার জন্যে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর পুনরায় গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না।

পুরসুন্দরী সূর্যসুন্দরের কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জন্যে গরম লুচি ভেজে আনি দুখানা?"

"না। আমি আর রাত্রে কিছু খাব না। দিনে অনেক খাওয়া হয়েছে। রাত্রে না খাওয়াই ভালো।"

গগন মাথার দিকে দরজার কাছে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ভোরের দিকে আমি না হয় হরলিক্‌স করে দেব এক কাপ্।"

"তুমি করে দেবে?"

সূর্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি খুব ভোরে উঠি যে। আপনার ঠিক পাশের ঘরেই তো আমি আছি। সমস্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছি ওখানে। স্টোভ কুঁজো চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, ওভালটিন্ হরলিক্‌স—"

গীতাপাঠে বাধা পড়ায় চন্দ্রসুন্দর মনে মনে চটিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি! পুরসুন্দরী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাত তো অনেক হল। আপনার খাবার জায়গা করে দি?"

"আমারও তেমন খিদে হয় নি মা।"

"তবু যা পারেন খেয়ে নিন। গরম গরম ফুলকো লুচি আপনি বসলে ভেজে ভেজে দেব। আপনার খাওয়া হলে তবে এরা খেতে বসবে। কুমার মাংসের হাঁড়ি খোলবার আগেই আপনাকে খাইয়ে দিতে চাই।"

কিরণ মন্তব্য করিল—"সে-ই ভালো। একে পাখির মাংস, তায় কুমার রেঁধেছে, ঢাকা খুললে ও তো মাৎ করে দেবে চারদিকে। কাকাবাবু, আপনি খেয়েই নিন।"

"আচ্ছা এই শ্লোকটা শেষ করে উঠছি।"

শ্লোকটা পড়িতেছিলেন কিন্তু তাহাতেও আবার বাধা উপস্থিত হইল। হাই-হিল-জুতা খটখট করিয়া চিত্রা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। শুধু জুতা নয়, ওভার-কোটও পরিয়াছে, হাতে দস্তানা, চোখে চশমা। সে সোজা গিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানায় বসিল এবং দুই হাতে সূর্যসুন্দরের গাল দুটি ধরিয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিল। প্রণাম করিল না। চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য!

পুরসুন্দরী চন্দ্রসুন্দরের দিকে আড় চোখে চাহিয়া চিত্রাকে বলিলেন, "জুতোটা খুলে আয় বাইরে, এখানে গীতা পড়া হচ্ছে যে। আগে প্রণাম কর, দাদুকে, ছোটদাদুকে—"

"ও!"

অপ্রতিভমুখে চিত্রা বাহির হইয়া গেল এবং জুতা খুলিয়া আসিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। চিত্রার স্বামী সুব্রতও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেট, তাহার পরিধানে শুধু খাকি সুট। সে-ও পুরসুন্দরীর কথাগুলি শুনিয়া হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। চন্দ্রসুন্দর সুব্রতকে দেখেন নাই, কিন্তু সে যে পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্ তাহা শুনিয়াছিলেন।

বলিলেন, "তুমি দাদু কষ্ট করে জুতো খুলছ কেন। এখানে আর কেউ কিছু মানছে না, সব জগন্নাথক্ষেত্র হয়ে গেছে। তা ছাড়া গীতা পড়াও হয়ে গেছে। তুমি জুতো পরেই ভিতরে এস।"

সুব্রত কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল মাত্র, তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর সূর্যসুন্দরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, আপনি কেমন আছেন এখন?"

"খুব ভালো আছি। তবে সময় হয়ে এল, তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবার পারের খেয়ায় উঠ্‌তে হবে।"

পার্বতী হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ধমকের সুরে পুরসুন্দরীকে বলিল, "মা, তুমিও এসে গল্পে মেতে গেছ! চিত্রা আয়, সুব্রত তুমিও এস, বাথরুমে গরম জল দিয়েছি। মা, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না এস, আঁচ বয়ে যাচ্ছে, বেগুন ব্যাসন সব ঠিক করে দিয়েছি।"

গগনকে আবার দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"ওরে পার্বতী, চিত্রা আর সুব্রতর জিনিস-পত্র ওই হলদে তাঁবুটায় নিয়ে যেতে বললে ছোটকাকা। ওরা ওখানেই থাকবে, তুই গুছিয়ে দে সব।"

"বাবা বাবা, এক হাতে আমি আর ক'দিক সামলাই বল!"

বলিয়াই পার্বতী অন্তর্ধান করিল।

ইহার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন কবিরাজ মশায়। তিনি হঠাৎ মিলিটারি কায়দায় সুব্রতকে স্যালুট করিয়া বলিলেন—"জয় হিন্দ্"। তাহার পর আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছুদিন ফৌজে চাকরি করেছিলাম। ফৌজী আদবকায়দা কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তারপর সুপারিনটেণ্ড সাহেব কেমন আছ?"

"ভাল। আপনি?"

"আমি নেই। যা দেখছ তা অতীতের কঙ্কাল।"

চিত্রার বিবাহের সময় কবিরাজ মশায় ছিলেন, তখন সুব্রতর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ হইয়াছিল।

পার্বতীর উচ্চ কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

"চিত্রা, সুব্রত এস, তোমাদের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"যাও, যাও তোমরা যাও। ছোট বামুনদিদিকে আর চটিও না। সেই বুড়ীই বোধহয় পুর্নজন্ম গ্রহণ করে এসেছে আবার।"

"কার কথা বলছেন?"

"সেকালে আর এক বামুনদিদি ছিলেন এ বাড়িতে, তার কথা তোমরা বোধহয় শোননি। বিরুবাবুর মনে আছে হয় তো।"

"সুব্রত, চিত্রা-আ—"

আবার পার্বতীর গলা শোনা গেল।

"যাও, যাও তোমরা যাও।"

চিত্রা সুব্রত উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় কবরেজ মশাই"—কিরণ প্রশ্ন করিল।

"ভুস্‌কারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। ওইখানেই আমি আমার আস্তানা করে নিয়েছি।"

এ অদ্ভুত খবরে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভুস্‌কার মানে যে ঘরে গমের ভুসি জমা করা থাকে। প্রকাণ্ড উঁচু ঘর। জানালা দরজা কিছু নাই। একটি দেওয়ালের উপরে শুধু একটি ছোট জানলার মতো ফাঁক থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই ঘরে ভুসি ঢালা হয়। ভুসি বাহির করিবার

সময়ে সিঁড়ির সাহায্যে সেই পথেই চাকরেরা ঢোকে। ঘরের ছাত হইতে মেজে পর্যন্ত ভুসি ঠাসা থাকে সেখানে। কেবল ওই জানালার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা খালি থাক ভিতরে। সেখানে কবিরাজ মহাশয় শুইয়াছিলেন এ সংবাদ সত্যই অদ্ভুত।

কিরণ প্রশ্ন করিল, "ওখানে আপনি উঠলেন কি করে?"

"মই দিয়ে। কুমারবাবুর লম্বা মই আছে যে একটা।"

"আপনার গায়ে তো ভুসি-টুসি কিচ্ছু লাগেনি দেখছি।"

"আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলাম। কম্বলটায় লেগেছে খুব। সেটা খুলে এসেছি।"

সূর্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুস্‌কারে শোওয়া ওঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস।"

কবিরাজ অকৃত্রিম আনন্দে খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"সেই কলাচুরির কথা মনে আছে আপনার ডাক্তারবাবু?"

"আছে বই কি—"

ঊষা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে সবটা শোনে নাই। কিন্তু গল্পের গন্ধ পাইয়াছিল।

বলিল, "কোথায় কলা চুরি হল?"

"এখন হয়নি। হয়েছিল অনেকদিন আগে। তোমাদের জন্মাবার আগে। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে বড় মজার গল্প।"

"বলুন না।"

ছোট-খুকীর মত আবদার করিয়া ঊষা বাবার বিছানার একধারে জাঁকিয়া বসিল।

কুমার পিছনের দ্বার দিয়া ঢুকিয়া কাঞ্চনমালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এখন যাবেন? আমি মথুরার হাতে কাকাবাবুর জন্য খানিকটা রান্না-করা মাংস পাঠাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান মথুরার সঙ্গে যেতে পারেন।"

"তাই যাই তাহলে। লণ্ঠন দিও একটা।"

"হ্যাঁ লণ্ঠন দেব বই কি"

কাঞ্চনমালা বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর ও গীতা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এসব আলোচনা তাঁহার তত ভালো লাগিতেছিল না।

কবিরাজ মহাশয় একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন এবং শুরু করিলেন তাঁহার গল্প।

"এটা গল্প নয়। আমি যা বলি তা একটাও গল্প নয়, সত্য। আই অ্যাম এ হিস্‌টোরিয়ান্। ডাক্তারবাবুর বাড়ির চারিপাশে তখন বাগান ছিল। ফুল ফল শাক-সব্‌জি কপি-আলু সব রকম হত। ডাক্তারবাবু বিতরণ করতে কসুর করতেন না, তবু চুরি হত। কাক-বাদুড়-গরু-ছাগলরা তো করতই, মানুষরাও করত। যখনকার কথা বলছি তখন ডাক্তারবাবুর কলা-চাষ করবার শখ খুব প্রবল। জিতুবাবু বলে, এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থাকতেন। এবং চাষ সম্বন্ধে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবুকে উৎসাহিত করতেন। আর আমরা বিনা পয়সায় নানা রকম তরিতরকারি ফলমূল খেয়ে বাহবা বাহবা করতুম। কলা চাষের খুব ধুম চলেছে তখন, বাড়ির চারদিকে নানা রকম কলাগাছ লাগানো হয়েছে। সে যে কত রকমের কলা, তা আর কি বলব তোমাদের। সব আমার মনেও নেই। চীনে কলা, বর্মী কলা, সিংগাপুরী

কলা, কাবুলী কলা, মাদ্রাজী কলা, মর্তমান কলা, অগ্নীশ্বর কলা—এই কটা নাম মনে পড়ছে। জিতুবাবু ঢাকা থেকে এক রকম কলা গাছ আনলেন তার নাম শফ্‌রি কলা। তিনি এক ডজন শফরি কলার গাছ লাগালেন, নানা রকম সার-টার দিয়ে। ডাক্তারবাবু রোজ সকালে উঠে রোগী দেখবার আগে কলা-গাছগুলিকে একবার দেখে আসেন। জিতুবাবু তো দুঘণ্টা অন্তর দেখছেন। ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বাড়ল, তারপর দেখা দেখা গেল একটি গাছে কলার ফুল হয়েছে। সেদিন কি আনন্দ সকলের। বাড়িতে নূতন ছেলে হয়েছে যেন। তারপর সেই মোচা কলা ছাড়তে লাগল ক্রমশ। ক্রমশ কাঁদি হল একটা। সবাই এসে চোখ বড় বড় করে দেখে দেখতে লাগল সেটাকে। তারপর যেদিন কলার রং ধরল সেদিন তো হৈ-চৈ পড়ে গেল বাড়িতে। দুটো দল হয়ে গেল। বিরুবাবুর মা বললেন—এখুনি ওটাকে গাছ থেকে কেটে ভাঁড়ার ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হোক, দু একদিনেই পেকে যাবে। এ শুনে জিতুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তিনি বললেন—গাছে আরও দু একদিন থাক, মাটির রসটা পুরো টেনে নিক, তারপর কাটা হবে। জিতুবাবু এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, তাঁর কথা অমান্য করা গেল না। কাঁদি গাছেই রইল। তারপর দিন ডাক্তারবাবু কলে বেরুবার আগে সকাল সাতটার সময়ে দেখেছেন কাঁদি গাছে ঝুলছে, আরও দু'চারটে কলা পেকেছে। ন'টার সময় জিতুবাবু গিয়ে দেখলেন—সব সাফ, গাছে কাঁদি নেই, কে কেটে নিয়ে গেছে। হুলস্থূল পড়ে গেল। থানায় পর্যন্ত খবর দেওয়া হল। দুপুর বেলা আমেদাবাদ থেকে আমি এসে পৌঁছিলাম এক বেটো ঘোড়ায় চড়ে। তখন আমার ঘোড়া ছিল, তার ল্যাজে চুল ছিল না, বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু চলত ভালো। বিরুবাবুর মায়ের কাছে খবর পাঠালাম আমি এসেছি। তিনি তো অন্নপূর্ণা ছিলেন, খবর পাঠালেই অন্ন জুটে যেত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। জিতুবাবু ভুরু কুঁচকে বসে আছেন, চাকর-বাকরগুলো সবাই সন্ত্রস্ত, উদিৎ সিং তম্বি করে বেড়াচ্ছে চারদিকে। তারপর শুনলাম ব্যাপারটা। আমারও রাগ হল খুব। এ শালা চণ্ডালের দেশ, ডাক্তারবাবু এদের এত দেন, এদের জন্যে এত করেন তবু ব্যাটারা চুরি করতে ছাড়ে না। ডাক্তারবাবু তখনও কল থেকে ফেরেননি, বিরুবাবুর মা আমাকে আগেই খাইয়ে দিলেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুব বলে মই আনিয়ে ভুসকারে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে নিরিবিলিতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়। বিশেষত শীতকালে। বরাবরই আমি ওখান শুতাম। সেদিন ভুসকারে ঢুকে ভুসোগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে গিয়ে দেখি ভুসোর মধ্যে কলার কাঁদিটা ঢোকানো রয়েছে। বুঝলাম চুরি করে কেউ সরিয়ে রেখেছে এখানে। নিয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকার হলে নিয়ে যাবে। ওখানে শোয়া আর নিরাপদ বলে মনে হল না। নেবে গিয়ে খবরটি চুপি চুপি উদিৎ সিংয়ের কানে তুলে দিলাম। সাপের ল্যাজে পা পড়লে যা হয় অনেকটা তেমনি হল। উদিৎ সিং তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দুলতে লাগল, যেন আমাকেই ছোবলাবে। নাকের ছ্যাঁদা ফাঁক হয়ে গেল, ছোট ছোট চোখ দুটো থেকে ছুটতে লাগল আগুন। দাঁতে দাঁত পিষে নিচু গলায় তর্জন করে আমাকে বললে, কোইকো কোই বাত নেহি বোলিয়ে। ম্যয় শালেকো পাড়কেঙ্গে। তারপর কি করলে জান? সেই কলার কাঁদির পাশেই ভুসোর মধ্যে ডুবে বসে রইল। নাকের ছ্যাঁদা দুটি আর চোখ দুটি বেরিয়ে রইল শুধু। ঠিক সন্ধ্যের পরই ধরা পড়ল চোরটা। ডাক্তারবাবু তাকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, খেতে পাচ্ছিল না—তাই বাগানের মালী করে বাহাল করেছিলেন। সেই শালার এই ব্যবহার।

উদ্দিৎ সিংহ তো তাকে জুতিয়ে রক্তারক্তি করে দিলে, তারপর থানা পুলিস। নির্ঘাত জেল হয়ে যেত, ডাক্তারবাবুই আবার বাঁচালেন তাকে। চাকরিও দিলেন আবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেননি। মাস ছয়েক পরে আর এক জায়গায় চুরি করে ধরা পড়ল সে। তখন জেল হয়ে গেল......।

গগন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, সে অনুভব করিল কবিরাজ মহাশয় যদি আর এক প্রস্থ গল্প আরম্ভ করেন তাহা হইলে বড়ই দেরি হইয়া যাইবে। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন আমরা সব বাইরে গিয়ে বসি। দাদুর সমস্ত দিন বড্ড strain গেছে, উনি এবার একটু ঘুমুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভালো। চল বাইরেই যাই আমরা। আমি তো পুরোনো গুদাম ঘরের মতো। আমার মনের দরজা জানলা খুলে দিলে কত যে গল্পের আরশোলা, ইঁদুর, টিকটিকে বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক আছে? রাত ভোর হয়ে যাবে।"

হাসিতে হাসিতে কবিরাজ মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন। গগন পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরে নিয়ে আয় এইবার।"

দিগন্ত অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া পাশের ঘর হইতে একটি নীল-শেড-দেওয়া সুদৃশ্য বাতি লইয়া প্রবেশ করিল।

"কোথা রাখব এটা?"

"মাথার শিয়রের দিকে এই তেপায়াটার উপর। দাদুর ঘরে রাতের এই বাতিটাই জ্বলবে। শেডটা ভালো, সুদিং আলো হবে। এই লণ্ঠনগুলো সরিয়ে নিয়ে যা।"

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আবার কোথা থেকে পেলি?"

"কাটিহার থেকে আনলাম।"

"তাই বুঝি সন্ধ্যে থেকে দু'ভায়ে মিলে ওইটে নিয়ে ঘুজ্‌ঘুজ্‌ করছিস।"

দিগন্ত দাদার আদেশ অনুসারে আলোটি যথাস্থানে রাখিয়া লণ্ঠনগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা একটা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া উঠিল।

উষার দিকে চাহিয়া গগন প্রশ্ন করিল—"বেশ সুন্দর হয় নি?"

"চমৎকার।"

"দাদুকে এবার ঘুমুতে দাও একটু। তুমি আবার যেন গল্প ফেঁদো না"

"গল্প তো তোমরাই করছ। আমি তো এতক্ষণে এলাম ছেলে তিনটেকে খাইয়ে। ছেলে তো নয়, এক একটা ডাকাত।"

"ঘুমিয়েছে ওরা?" সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন।

"না! চক্ষে ঘুম নেই কারো। অথচ সমস্ত দিন হৈ-হৈ করে বেড়িয়েছে! কতক্ষণ আর চাপড়াব। বুড়ো হাতিদের কি আর চাপড়ে ঘুম-পাড়ানো যায়! ওঁদের বাপের কাছে দিয়ে চলে এলুম তাই। ওঁরও ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যের সময় বাবার কাছে এসে একটু বসেন, কিন্তু যা হৈ-হৈ হচ্ছে, বসবেন কখন। আমারও ক্লান্ত লাগছে। মোটা মানুষ ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বাবার পায়ের কাছে এইখানটায় একটু গড়িয়েনি। ওই ছোট বালিশটা আমাকে দে তো ঊর্মিলা—"

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কোথাও উঠিয়া যায় নাই, কোন কথা বলে নাই। কেবল তাহার অঙ্গুলিগুলি সূর্যসুন্দরের কেশ-বিরল মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল।

ঊষা মাথায় বালিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার নাকও ডাকিতে লাগিল। সূর্যসুন্দর তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

গগন তখন চুপি চুপি দাদুর কানের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "দাদু, আলোটা ভালো লাগছে তো?"

"ওয়াণ্ডারফুল।"

"চম্পাকে ডাকব? সে এইখানে তোমার কাছে বসে আস্তে আস্তে গান শোনাক না একটা। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়।"

"বেশ, সে তো ভালই হবে। কিন্তু ওর কষ্ট হবে না তো, পোয়াতি মানুষ—"

"বাপের বাড়িতে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই অবস্থায়! ডেকে আনি?"

"আন তাহলে।"

দিগন্ত পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। গগন সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দিগন্ত তোর বউদিকে নিয়ে আয়। তার আগে ক্যাম্প-চেয়ারটা দাদুর মাথার দিকে পেতে দে। চম্পা ওইটেতে বসে গান শোনাক দাদুকে—"

বাধ্য বালকের মতো দিগন্ত আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া দিল এবং তাহার পর চম্পাকে ডাকিয়া আনিল। চম্পা যেন গ্রীন-রুমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পরিধানে জরির পাড়-বসানো নীল শাড়ি, খোঁপায় কুন্দফুলের মালা। সে সলজ্জ মৃদু হাসিয়া গগনের দিকে চাহিল, তাহাব পর মৃদুকণ্ঠে দিগন্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গানটা গাইব?"

দিগন্ত বলিল, "দিন শেষে বসন্ত যা—"

গগন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দিগন্তর দিকে চাহিল। সে আশা করিয়াছিল দুপুরে কথা-মতো 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' গানটাই গাওয়া হইবে। কিন্তু দিগন্ত এ কি ফরমাস করিল। কিন্তু সে জানে এ সব ব্যাপারে দিগন্তই বেশী সমঝদার, তাই সে আর প্রতিবাদ করিল না।

চম্পা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

"দিন শেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে।
তারি সুর নেব ধরে'
আমার গানেতে ভরে।
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে'।"

গগন দিগন্ত দুই জনেই নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া গেল। সূর্যসুন্দর গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নিজের মাকে দেখিতে পাইলেন। মায়ের কোলে একটি শিশু, তিনিই যেন শিশু হইয়া মায়ের কোলে শুইয়া আছেন, মা যেন মৃদু কণ্ঠে গান গাইয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। মায়ের ছবি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বাবা আসিলেন, তাঁহার

হাতে এক-গোছা সবুজ দুর্বা। বাবার হরিণটা আসিয়া দূর্বাগুলি খাইতে লাগিল। বাবা চলিয়া গেলে আসিলেন মামা। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার উপর সত্যই অন্যায় করেছিলাম আমি, আমায় মাপ করো। মামাও চলিয়া গেলেন, তাহার পর আসিল মন্মথ। হাসিয়া বলিল, কি রে তুইও টিকিট কেটেছিস দেখছি। কোন ভয় নেই। বেশ আছি আমরা এখানে। এখানেও গান গাই। শুনবি? তোর সেই হার্মোনিয়ামটা আছে তো। হার্মোনিয়ামটা বাহির করিয়া আনিয়া, তেমনি করিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া সেই পুরাতন গানটা ধরিল—

উরমির পর উরমি উঠিয়া
সবলে এ তনু দেয় ডুবাইয়া
কেন নাহি যাই তলায়ে
ডুবে গিয়ে পুন কেন উঠি ভেসে

তাহার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল, "হার্মোনিযামের বেলোটা খারাপ হয়ে গেছে, সারিয়ে নিস।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সে-ও চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল নবুদা, তাহার পর রায় মশায়।...সর্বশেষে আসিল 'বউ'—বিরুর মা। মুখে প্রসন্ন হাসি।—মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে মেয়ে, বউ, নাতি, নাতবউ নিয়ে বেশ আরামে আছ দেখছি।

যে জগৎ অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে, যে জগতের অধিবাসীরা আর ইহলোকে নাই সেই জগত তাঁহার ঘুমের মধ্যে মূর্ত হইল। প্রায়ই হয়।

...তাহার পর হঠাৎ সব লুপ্ত হইয়া গেল আবার। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন—ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে, চম্পা উঠিয়া গিয়াছে। ঊর্মিলা শুধু বসিয়া আছে মাথার শিয়রে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কীর্তনের গান—

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

"কারা হরিনাম করছে?"

"রামনিবাস বাবাজীর দল কীর্তন করছে, সেই যে সন্ধের সময় এসেছিল।"

"ও।"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুঝিলেন। ঊর্মিলা আনতমুখে সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর যখন অনুভব করিল সূর্যসুন্দর সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তখন সে-ও মাথার শিয়রের স্থানটিতে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। তিনি রামনিবাসের বাবা শ্রীনিবাসের কথা ভাবিতেছিলেন। লোকটা মদ খাইত, মাংসও খুব প্রিয় ছিল তাহার। প্রায়ই তাঁহার বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। কখনও শুধু হাতে ফেরে নাই। ঘুঘু হরিয়াল শরাল প্রভৃতি প্রায়ই মারিয়া আনিত। শুধু মারিয়া আনিত নয়, তাঁহার আস্তাবলটায় বসিয়া বাঁধিত। একা হাতেই সে পাখির পালক ছাড়াইত, কুটিত, মশলা বাটিত। বামুনদিদি তাহাকে বাড়িতে আমল দিতেন না। রান্না করিতে করিতে তাঁহার জন্যে খানিকটা আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে

বাকিটাতে খুব ঝাল দিত। তাহার পর সেই ঝাল মাংসের চাট দিয়া মদ খাইত। রোজ মদ খাইত সে। বস্তুত ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সকালে উঠিয়া পাখির মাংস সহযোগে মদ খাওয়া। যেদিন সে অন্য পাখি পাইত না, সেদিন চড়াই শালিক পর্যন্ত মারিত। ঢিল ছুড়িয়া মারিত। এ বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাহার, মাংস সে কোন রকমে রোজ জোগাড় করিবেই। মাংস তাহার প্রত্যহ চাই-ই, অথচ বাজারে প্রত্যহ মাংস পাওয়া যাইত না, এখনকার মতো তখন গ্রামে গ্রামে কশাইয়ের দোকান ছিল না, পূজার সময় ছাড়া পাঁঠা কাটা হইত না। আদিম বন্য মানবদের মতো তাই শ্রীনিবাসকে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। মদ খাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিল শ্রীনিবাস। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সবই সে মদে নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে গ্রামের প্রান্তে দশ বিঘার যে আমবাগানটি আছে সেইটি বাঁধা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল সে। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া রীতিমত দলিলপত্র করিয়া ধার করিয়াছিল। কিন্তু শোধ করিতে পারে নাই। কাহারও ধার সে শোধ করে নাই। অবশেষে একটা নষ্ট স্ত্রীলোকের আশ্রয় লইয়াছিল। সে নষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসের খুব হিতৈষিণী ছিল। সেই তাহাকে খাইতে পরিতে দিত এবং পাওনাদারদের তম্বি হইতে লুকাইয়া রাখিত। কোন পাওনাদার শ্রীনিবাসেব নাগাল পাইত না। সে নাকি শাখাপত্র বহুল বড় বড় গাছে উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। স্ত্রীলোকটি একটি বালতির ভিতর এক বোতল মদ, কিছু মাংস এবং খানকয়েক রুটি লইয়া গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস গাছের উপর হইতে একটি দড়ি নামাইয়া দিত। স্ত্রীলোকটি বালতিতে দড়ি বাঁধিয়া পুনরায় সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস বালতি উপরে টানিয়া লইত। স্ত্রীলোকটিও তাহার পব গাছে উঠিয়া যাইত। সূর্যসুন্দর একবার স্বচক্ষে তাহাদের একটি গাছের উপরে দেখিয়াছিলেন। পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের অবশেষে কঠিন পীড়া হইল। সিরোসিস অব লিভার এবং তদুপরি নিউমোনিয়া। ছিন্নবসনা রুক্ষকেশা শ্রীনিবাসের স্ত্রী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যসুন্দরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সূর্যসুন্দর শ্রীনিবাসের চিকিৎসা করিবার জন্য তাহার বাড়ি গেলেন। গিয়া দেখিলেন চিকিৎসা করিবার আর কিছু নাই, শেষ চিকিৎসক যম আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীনিবাস অসহায় দৃষ্টি তুলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পব দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, দুই গাল বাহিয়া ধারা নামিল। শ্রীনিবাসের পুত্র রামনিবাস তখন চাব বছরের শিশু। সে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, শ্রীনিবাস তাহার হাতটি টানিয়া সূর্যসুন্দবের হাতে দিয়া নির্নিমেষ উৎসুক দৃষ্টিতে সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় সূর্যসন্দর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়াছিলেন। যে হ্যাণ্ডনোট ও দলিল লিখিয়া শ্রীনিবাস একদা তাঁহার নিকট বাগান বাঁধা রাখিয়া আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল, সেই হ্যাণ্ডনোট ও দলিলটি তিনি বাড়ি হইতে আনাইয়া তাহার সম্মুখেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়তো কিছু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। বামনিবাস তাঁহাব সে টাকা শোধ করে নাই। সেই বাগানটি অন্য লোককে বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছে। আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি আছে। অনেক ভক্ত জুটিয়াছে। রামনিবাস এখন বাবাজী, কেহ কেহ গুরুজিও বলে। ভক্তদের কৃপায় তাহার আর অন্নকষ্ট নাই।

কীর্তন আবার প্রবল হইয়া উঠিল—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

শুনিতে শুনিতে সূর্যসুন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

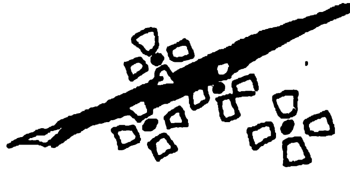
ঘুমাইয়া আবার তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আবার যেন 'বউ' আসিয়াছে। বলিতেছে, 'তুমি দিনকতক পরে এসো। সবার সঙ্গে দেখা না করে' যেন এসো না। গগনের বউ ভারী সুন্দর হয়েছে না?' মুচকি হাসিয়া বউ চলিয়া গেল। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সকলের সঙ্গে তো দেখা হয় নাই, সকলে তো এখন পর্যন্ত আসিয়াও পৌঁছায় নাই। সকলে কি আসিবে? কতদিন পরে আসিবে? ততদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবার মতো শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি? দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ঘরে সেই নীল শেড দেওয়া আলোটা জ্বলিতেছে। তাঁহার বিছানার কাছে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? বউ নাকি!

"কে—"

মৃদু কণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি চম্পা', আপনার জন্য ওভালটিন এনেছি।"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না, দিতে পারিলেন না। একটা অপূর্ব মাধুর্যরসে তাঁহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গেল, তিনি কথা বলিতে পারিলেন না।

প্রথম খণ্ড শেষ



উদয় অস্ত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম পর্বের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার সূর্যসুন্দর বিরাশী বৎসর বয়সে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পক্ষাঘাত হইয়াছে। সূর্যসুন্দরের ছোট ছেলে কুমার সকলকে টেলিগ্রামে খবর দেওয়াতে তাঁহার বড় ছেলে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্ত্রী পুরসুন্দরীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে তাঁহাদের পালিতা কন্যা পার্বতী। বৃহস্পতি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র। বৃহস্পতির দুই পুত্র গগন, দিগন্ত এবং আসন্নপ্রসবা গগনের স্ত্রী চম্পাও আসিয়াছে। চম্পার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আসিয়াছে মিস অনুপমা বসু, একজন মিড্ওয়াইফ। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বাতী এবং তাহার স্বামী সোমনাথ, কনিষ্ঠা কন্যা চিত্রা এবং তাহার স্বামী সুব্রতও আসিয়াছে। সোমনাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সুব্রত এস. পি.। সূর্যসুন্দরের কন্যারা কিরণ, ঊষা, সন্ধ্যা এবং জামাইয়েরা কৃষ্ণকান্ত, সদানন্দ এবং রঙ্গনাথও উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত একজন ফরেস্ট অফিসার এবং শিকারী। সদানন্দ জমিদার, রঙ্গনাথও ধনী, শৌখিন, বিদ্বান ব্যক্তি। সন্ধ্যা প্রগতিশীলা আধুনিকা। সে নিঃসন্তান।

সূর্যসুন্দরের ছোট ছেলে কুমার বাবার একটি পুরাতন ডায়েরি পাইয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুমার সময় পাইলেই সেই ডায়েরিটি পড়িতেছে। পাছে কেহ কাড়িয়া লয়, সেজন্য ডায়েরির কথা কাহাকেও বলে নাই।

কুমারের স্ত্রী ঊর্মিলা শ্বশুরের শিয়রে সর্বদা বসিয়া আছে।

সূর্যসুন্দরের মেজ ছেলে উশনারও আসবার কথা আছে। সে হয়তো আসিবে। কিন্তু তাঁহার সেজ ছেলে পৃথ্বীশ আসিবে কিনা অনিশ্চিত। সূর্যসুন্দর পৃথ্বীশের কথাই মাঝে মাঝে চিন্তা করিতেছেন। সে সাত আট বছর নিরুদ্দেশ। সে আসিবে কি? কখনও কখনও তাঁহার মনে হয়—"আমার বাবা আমার জন্যই শেষ-জীবনে নিজের খেয়াল-খুশির পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীশ রূপে যদি আমার কাছে আসিয়া থাকেন—হয়তো তাহাই আসিয়াছেন—তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জোর করিয়া সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে?"

সূর্যসুন্দর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথিতযশা হৃদয়বান্ চিকিৎসক। অনেকেই তাঁহার কাছে উপকৃত এবং কৃতজ্ঞ। অসুখের খবর পাইয়া গুণমুগ্ধ ভক্ত একদল আসিয়াছে এবং রোজ আসিতেছে। সূর্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী সুরসিক পেট-পচা কবিরাজ, সুবাতালী তহশিলদার, জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা প্রবীণ রমেশবাবু, জমিদার গোবিন্দ মণ্ডল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহ, স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার নিখিলবাবু প্রত্যহ আসিতেছেন। তাঁহার ছেলেদের বন্ধুবান্ধব এবং সমবয়সী রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গোপাল, শিউনাথ, দেওনাথ, জিলন, ঘোটন, লোটন প্রভৃতিও কখনও বারান্দায়, কখনও বাহিরের ঘরে বসিয়া আড্ডা জমাইতেছে।

সূর্যসুন্দর একটু সুস্থ হইয়াছেন। একদিন সকলের সহিত আহারও করিলেন। গগনের বউ চম্পা খাওয়ার সময় তাঁহাকে গীটারে রবীন্দ্রসংগীত বাজাইয়া শুনাইল। সূর্যসুন্দরের ছোট ভাই চন্দ্রসুন্দরও আসিয়াছেন। তিনি একটু রক্ষণশীল গোঁড়া-প্রকৃতির লোক। তিনি একদিন সূর্যসুন্দরকে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। একদা-উপকৃত রামনিবাস বাবাজী হাতার একধারে বসিয়া কীর্তন করিতেছেন।

সূর্যসুন্দরকে একটু সুস্থ দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন সকলে। সেইজন্য গগনের বউ চম্পার সাধ উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন সূর্যসুন্দরের বন্ধুরা।

কুমার মাঝে মাঝে সূর্যসুন্দরের বাল্যজীবনের কাহিনী ডায়েরি হইতে পড়িতেছে। আর দূরসম্পর্কের আত্মীয় হাবু মামা (তিনিও আসিয়াছেন) সূর্যসুন্দরের যৌবন সুহৃৎ স্বর্গীয় রায়মহাশয়ের কাহিনী তাঁর পৌত্র পরীক্ষিৎ রায়কে শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

সূর্যসুন্দরের নিমীলিত নয়নের সম্মুখে কখনও তাহার মা-বাবা, কখনও মৃতা স্ত্রী আসিয়া দেখা দিতেছেন। আর একটা দৃশ্যও তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে—একটা আদি-অন্ত-হীন দিগন্ত-বিস্তৃত পথ। সে পথে তিনি একক যাত্রী। সে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে! তাহাকে চেনা যায় না। মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু।

রাধানাথ গোপ—সূর্যসুন্দরের একজন হিতৈষী ধনী গৃহস্থ—সূর্যসুন্দরের হাতায় প্রকাণ্ড কয়েকটা চালা তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কারণ আশেপাশের নানা গ্রাম হইতে সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর পাইয়া দলে দলে লোক আসিতেছে। তাহাদের একটা বসিবার আশ্রয় দরকার।

সূর্যসুন্দরের অসুখকে কেন্দ্র করিযা আত্মীয় অনাত্মীয় বহু লোক সমবেত হইয়াছেন।

সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর পাইয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে রাত্রে নিজের নিজের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ঘুমাইতেছিলেন না। প্রত্যেকেই রাত্রির নির্জনে নিজের নিজের ঘরে এক একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিতান্ত নিজস্ব একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে মানুষের যেন তৃপ্তি হয় না। সূর্যসুন্দরের জন্য যে দুশ্চিন্তা লইয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সূর্যসুন্দরকে দেখিবার পর সে দুশ্চিন্তা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। সকলেরই মন আবার আত্মকেন্দ্রিক হইয়া আপন আপন আকাশে ডানা মেলিতেছে।

হাবুমামা আশ্রয় লইয়াছিলেন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার-বাবুর কোয়ার্টারে। কুমার বাড়িতেই তাঁহাকে একটা আলাদা ঘর দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি সেখানে যান নাই। তিনি আসিয়াই হাসপাতালের ছোকরা কম্পাউণ্ডার পরীক্ষিৎ রায়ের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে তাহার কোয়ার্টারে সে একাই থাকে তখন সেখানে থাকাই স্থির করিলেন। পরীক্ষিতও আনন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিল। হাবুমামা সূর্যসুন্দরের আপন মামার জ্ঞাতি-সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। বয়সে তিনি সূর্যসুন্দরের অপেক্ষা অনেক ছোট। বাল্যকালে তিনি এবং তাঁহার ভাই সাবু সাহেবগঞ্জের বাড়িতে আসিয়া দাদার আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই। সাহেবগঞ্জে শক্তিনারায়ণ নিজের সংসারে অনেক আত্মীয়-স্বজনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অনেকে তাহার বাড়িতে থাকিয়া খাইয়া পরিয়া 'মানুষ' হইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু লেখাপড়ায় কেহই বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তিনি নিজের সাধ্যমত ইহাদের সকলকেই কোন চাকরিতে বা কোনও কর্মে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টাও

করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় অনেকে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমাইতে সক্ষম হইয়াছেন। হাবুমামা যখন উপর্যুপরি কয়েকবার ফোর্থ ক্লাস হইতে প্রোমোশন পাইলেন না তখন শক্তিনারায়ণ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। হাবুমামা কোট প্যাণ্ট রেলের টুপি পরিয়া দিনকতক টিকিট কালেকটারি করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরিটি বজায় রাখিতে পারেন নাই। জীবনে অনেক চাকরিই তিনি পাইয়াছিলেন। যদি একটাতেও তিনি স্থায়িভাবে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারিতেন হয়তো তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইত, দৈন্যদুর্দশাও ঘুচিত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বেপরোয়া খামখেয়ালী ভাব ছিল যে, কোনও বন্ধনেই তিনি বেশীদিন বাঁধা থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সে বন্ধনের সহিত যদি আত্মীয়-প্রীতি বা সামাজিকতার বিরোধ বাধিত তাহা হইলে তিনি তাহা ছিন্ন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার এক বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী যাইবার জন্য তিনি রেলের চাকরিটি ছাড়িয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহার অনেক চাকরি গিয়াছে। সূর্যসুন্দরের অসুখের সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্যও হয়তো তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, বর্তমানে যে কাজটি করিতেছেন তাহাও হয়তো থাকিবে না। বর্তমানে এক ব্যবসায়ীর জন্য মফস্বলে মাল খরিদ করিয়া বেড়ানোই তাঁহার কাজ। ধান চাল খরিদ করিবার জন্য তিনি বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, যেই শুনিলেন সূর্যসুন্দর অসুস্থ অমনি চলিয়া আসিয়াছেন। চাকরি থাক বা যাক তাঁহার সে বিষয়ে চিন্তা নাই। সূর্যসুন্দরের সহিত তাঁহার কেবল মামা-ভাগ্নে সম্পর্কই নাই, আর একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। যখন তাঁহার প্রথম চাকরি টিকিট কালেকটারিটি গেল, তখন শক্তিনারায়ণ তাঁহার উপর খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাকে বাড়ি হইতে দূর করিয়াও দিয়াছিলেন। ঠিক সে সময় সূর্যসুন্দর ডাক্তারি পাশ করিয়া এই নিতান্ত নগণ্য পল্লীগ্রামে আসিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়াছেন। তখন তাঁহর আয় যৎসামান্য। প্রিয়গোপালের বাবার দেওয়া একটা সামান্য খড়ের ঘরে কোনক্রমে তিনি বাস করিতেছেন। দিনের বেলা দুধ খাইয়া থাকেন, রাত্রে স্বপাক ভাতে-ভাত খান। এই অবস্থাতেও সূর্যসুন্দর হাবুমামাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কম্পাউণ্ডারি শিখাইয়াছিলেন। হাবুমামা বহুদিন সূর্যসুন্দরের কম্পাউণ্ডার হইয়া ছিলেন। সাধারণ কোনও রোগের মোটামুটি চিকিৎসাও শিখিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের ইচ্ছা ছিল হাবুমামাকে দূরের কোনও একটা গ্রামে বসাইয়া দিবেন। তখন ও-অঞ্চলে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলিত হয় নাই। হাবুমামা যদি সূর্যসুন্দরের পরামর্শ শুনিতেন তাহা হইলে তিনিও কোন গ্রামে ভদ্রভাবে বসবাস করিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটা উড়ু-উড়ু ভাব ছিল, তিনি সূর্যসুন্দরের নিকট কিছুদিন থাকিয়াই আবার অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই প্রথম যৌবনে সূর্যসুন্দরের যে সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি আজও তাঁহার মনে অক্ষয় হইয়া আছে। তিনি যখন সূর্যসুন্দরের নিকট ছিলেন তখন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ত্রিপুরারি সিংহ সিংহবিক্রমে ও-অঞ্চলে শাসন করিতেছিলেন। নীলকুঠির অ্যালবার্ট সাহেব এবং আর একজন জমিদার তেজনারায়ণ চৌধুরীর সহিত তাঁহার সর্বদা সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত। সেই সব সংঘর্ষে তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন তাঁহার একচক্ষু ম্যানেজার চন্দন রায় এবং ঈষৎবধির দেওয়ান গোপীবল্লভ চৌধুরী। সূর্যসুন্দর তখন এখানে আসিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং অনিবার্যভাব ইহাদের সহিত সূর্যসুন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত

হইয়াছিল। যোগাযোগের ইতিহাসটি সুন্দর। হাবুমামা তখন সূর্যসুন্দরের কাছে ছিলেন, তিনি ঘটনাটি জানিতেন, তখনকার আরও অনেক ঘটনা জানা ছিল তাঁহার। হাসপাতালের নূতন কম্পাউণ্ডার পরীক্ষিৎ রায় অতীত যুগের সেই সব ঘটনা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। হইবার কারণও ছিল, কারণ চন্দন রায় তাহারই ঠাকুরদাদা ছিলেন। ঠাকুরদাদার অতীত জীবনকাহিনী হাবুমামার জানা আছে শুনিবামাত্র সে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছিল এবং সেখানেই তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। হাবুমামাও আপত্তি করেন নাই, পরীক্ষিতের কোয়ার্টার নিরিবিলি, ছোকরাটিও ভালো। আসিবামাত্র তাঁহার সহিত ঠাকুরদা সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছে, যখন-তখন ভক্তিভরে চা করিয়াও খাওয়াইতেছে। বনিয়াদী বংশের ছেলে, হাবুমামার খুব পছন্দ হইয়াছে।

রাত্রে আহারাদির পর হাবুমামা আসিয়া দেখিলেন পরীক্ষিৎ তখনও জাগিয়া আছে।

"কি হে এখনও ঘুমোওনি—"

"আপনি না এলে ঘুমোব কি করে? চা করব নাকি?"

"প্রচুর খাওয়া হয়েছে। এর উপর এখন চা খাওয়াটা কি ভালো?"

"তাহলে থাক। আপনি কিন্তু গল্প বলবেন বলেছিলেন আজ।"

"তাহলে চা কর।"

পরীক্ষিৎ তড়াক করিয়া বিছানা হইতে নামিয়া স্টোভ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হাবুমামা বলিলেন, "তোমার ঠাকুরদার গল্প কি একটা যে চট্ করে বলে ফেলব। আমার লেখবার ক্ষমতা থাকলে তোমার ঠাকুরদাকে নিয়ে বই লিখতাম—"

নাক দিয়া বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া হাবুমামা বিছানার উপর উবু হইয়া বসিলেন।

পরীক্ষিৎ বলিল, "ডাক্তার-দাদুকে খুবই ভালবাসতেন ঠাকুরদা, বাবার মুখে শুনেছি। বাবাও ডাক্তার-দাদুকে খুব ভক্তি করতেন। স্বচক্ষে দেখেছি এটা।"

"করবে না? প্রথম আলাপেই যে তাক লেগে গিয়েছিল তোমার ঠাকুরদার। ত্রিপুরারি সিং তখনকার দিনে হাতে মাথা কাটতেন সকলের। ভাগনার কাছে তিনি তোমার ঠাকুরদাকে পাঠিয়েছিলেন একটা মিথ্যে মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্যে। ভাগনা তখন সবে এসেছে, ত্রিপুরারি সিংয়ের জমিদারিতে প্র্যাকটিস করবে ঠিক করেছে। তোমার ঠাকুরদা ভাবতেই পারেননি যে ভাগনা সার্টিফিকেটটা দেবে না। তখনকার দিনে ত্রিপুরারি সিংয়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করবার কথা ভাবতেও পারত না কেউ। ভাগনা তখন নিঃসহায় নিঃসম্বল কিন্তু তবু ভাগনা সার্টিফিকেট দিলে না। তোমার ঠাকুরদা বললেন—তাহলে আপনার পক্ষে এখানে প্র্যাকটিস করা অসম্ভব হবে। অপমানিতও হবেন হয়তো। ভাগনা টলল না, বললে তাহলে কালই আমি চলে যাব। আমার দিকে চেয়ে বললে—হাবুমামা, জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল, কালই যাব আমরা। পরের দিন কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। স্বয়ং ত্রিপুরারি সিং এসে হাজির। তিনি বললেন, আপনার সৎসাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আপনাকে আমি যেতে দেব না। মিথ্যে সার্টিফিকেট টাকা ফেললে পাওয়া যায়, আমি পেয়েও গেছি, সিভিল-সার্জনই দিয়েছে একশ' টাকা ফি নিয়ে। কিন্তু সাচ্চা লোক দুর্লভ। আপনি থাকুন এখানে, আপনার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার ঠাকুরদা সেই দিনই নেমন্তন্ন করলে আমাদের। ভূরি-ভোজন হল তাঁর কাছারিতে। সে-সব দিন আর ফিরবে না, বুঝলে—

স্টোভটা জ্বলিয়া উঠিল। পরীক্ষিৎ চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

হাবুমামা বেশ বড় একটি কাচের গ্লাসে প্রায় পুরা একগ্লাস চা লইয়া চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগিলেন। পরীক্ষিতের এ সময় চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু হাবুমামাকে সঙ্গদান করিবার জন্য সে-ও এককাপ চা ছাঁকিয়া লইল। হাবুমামা প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া চা-টি ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিলেন এবং যতক্ষণ না শেষ হইল চোখ খুলিলেন না। পরীক্ষিৎ স্মিতমুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল তিনি চোখ খুলিতেই প্রশ্ন করিল—"এইবার ঠাকুরদার গল্প শোনান একটা—"

"ক'টা বেজেছে—"

"শ্যাওড়া গাছে প্যাঁচাটা ডাকল একটু আগে। বারোটা বেজেছে—"

"প্যাঁচাই বুঝি ঘড়ি তোমার—"

"না। ঘড়ি আছে একটা—"

একটি ছোট কৌটা খুলিয়া সে একটি হাত-ঘড়ি বাহির করিল।

"বারোটা বেজে কুড়ি। প্যাঁচাটা ঠিক বারোটায় সময় ডাকে একবার।"

"রাত হয়ে গেছে। একটা ছোট গল্প শোনাই তোমাকে। তোমার ঠাকুরদাকে তুমি দেখেছ?"

"না—"

"তাঁর একটি চোখ ছিল না।"

"হ্যাঁ শুনেছি সে-কথা।"

"প্রিয়গোপালের বাবাকে দেখেছ?"

"না—"

"তিনি কালা ছিলেন। বদ্ধ-কালা। দেওয়ান ছিলেন তিনি। ওই কানা ম্যানেজার আর কালা দেওয়ানের ভয়ে থরথর কাঁপত সবাই। বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। এরা দুজনে যখন গোপনীয় পরামর্শ করতেন তখন সেটা একটা দেখবার মতো জিনিস হত, যদিও কেউ দেখবার বিশেষ সুযোগ পেত না।"

"কেন—"

"তিন-কোশিয়া মাঠের মাঝখানে বসে পরামর্শ করতেন তাঁরা। তিন-কোশিয়া মাঠ দেখেছ?"

"দেখেছি। লোকে বলে ওখানে নাকি ভূত-প্রেত আছে—"

"এ গুজবটা তোমার ঠাকুরদাই রটিয়েছিলেন সম্ভবতঃ। ভূত-প্রেত আছে কিনা জানি না। কিন্তু ও-মাঠের তিন ক্রোশের মধ্যে জনমানবের বসতি নেই। অন্তত সেকালে ছিল না। দেওয়ানজি আর ম্যানেজার ওই মাঠের মাঝখানে বসে পরামর্শ করতেন।"

"কেন—"

"কারণ খুব চেঁচিয়ে না বললে তো দেওয়ানজি শুনতেই পেতেন না কিছু। গাঁয়ের মাঝখানে ওরকম চেঁচিয়ে পরামর্শ করলে তা কি আর গোপন থাকে। তোমার ঠাকুরদা শেষে ওই বুদ্ধি বার করেছিলেন।"

"বাঃ, বেশ ভালো বুদ্ধি তো—"

"হ্যাঁ, খুব বুদ্ধিমান ছিলেন তোমার ঠাকুরদা—অত দূরদর্শী লোক আমি দেখিনি—আর একটা গল্প মনে পড়ল হঠাৎ—"

হাবুমামা বার দুই জোরে জোবে নিশ্বাস টানিয়া হাস্যদীপ্ত চক্ষে পরীক্ষিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কি গল্প মনে পড়ল, বলুন—"

হাবুমামা তবু কিছু বলিলেন না, স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন। পরীক্ষিতও চাহিয়া বসিয়া রহিল তাঁহার দিকে।

হঠাৎ হাবুমামা বলিলেন, "আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি হাঁড়িগুলো মাথায় পরে' পরে' দেখছেন মাথাটা ঢোকে কিনা।"

"হাঁড়ি মাথায় ঢোকে কিনা দেখছিলেন? কেন?"

"তবে গোড়া থেকে শোন। ভাগনা প্রথম যে বাড়িটা করেছিল সেটা ছিল বাজারের কাছে। বাড়ির পিছনে ছিল একটা সীডলেস বেলগাছ আর তার পিছনে একটা পুকুর। তোমার ঠাকুরদা প্রায়ই সেখানে আসতেন। একদিন তিনি বারান্দায় বসে আছেন এমন সময় একটা কুমোর এক ঝাঁকা হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছিল সামনের রাস্তা দিয়ে। তিনি ডাকলেন তাকে। তার কাছ থেকে বেশ ফাঁক-মুখো চারটে বড় বড় হাঁড়ি কিনলেন। তখনও বুঝিনি কেন কিনেছেন। গম্ভীর লোক ছিলেন, জিগ্যেস করতে সাহস হল না। তিনি নিজেও কিছু বললেন না। তিনি যে ঘরে শুতেন, আমি থাকতুম ঠিক তার পাশের ঘরটিতে। দুটি ঘরের মাঝে একটি দরজা ছিল, সেই দরজায় ছিল একট ফুটো। ভোরে উঠেই আমার প্রথম কাজ ছিল, সেই দরজার ফুটোয় চোখটি দিয়ে দেখা রায় মশায় কি করছেন। রোজই দেখতাম পুজো করছেন। সে দিন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। দেখলাম তিনি হাঁড়িগুলো মাথায় পরে' পরে' দেখছেন।

প্রত্যেকটি হাঁড়িরই মুখ বেশ বড় ছিল, সব হাঁড়িগুলোতেই তাঁর মাথা বেশ ঢোকে। তখন তিনি তাঁর চাকর চোখনকে ডেকে বললেন হাঁড়িগুলোতে আলকাতরা মাখিয়ে শুকিয়ে রেখে দিতে। কি ব্যাপার, কিছুই বুঝলাম না। জিগ্যেস করতেও সাহস হল না। গম্ভীর লোক, তার এক চোখ কানা। ভয়ঙ্কর মনে হত তাঁকে। কিছুক্ষণ পরে ভাগনা কল থেকে ফিরে এসে দেখলে চোখন হাঁড়িতে আলকাতরা মাখাচ্ছে। রায় মশায় বারান্দায় বসে আছেন—"

ভাগনা জিগ্যেস করলে—"হাঁড়িতে আলকাতরা লাগাচ্ছেন কেন—"

স্বল্পভাষী রায় মশায় সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—"দরকার আছে—"

দরকারটা কি তা বোঝা গেল তিন মাস পরে। রায় মশায়ের নামে সর্বদাই দুটো-তিনটে ওয়ারেন্ট থাকত। নীলকর কুঠিওলা সাহেবের সঙ্গে হরদম তাঁর মোকর্দমা লেগেই থাকত কিনা, খুন জখম দাঙ্গা প্রায়ই হত। কিন্তু রায় মশায়কে ধরতে পারত না কেউ সহজে। ঘুষ দিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে, চোখে ধুলো দিয়ে ঠিক বেরিয়ে যেতেন তিনি। মাস তিনেক পরে—রায় মশায় তখন আমাদের বাড়িতে রয়েছেন—সেদিন শনিবার অমাবস্যা, সন্ধ্যার পর বেশ মেঘ করে এসেছে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করলে। রায় মশায় ঘরে বসে পুজো করছেন তখন। এখানকার দারোগা আসেননি, এসেছেন কলকাতা থেকে আর একজন দারোগা। এখানকার দারোগা চন্দরভান সিং রায় মশায়ের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে

থাকতেন সর্বদা। তাঁর কেশটি পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না কখনও। নীলকর সাহেবরা নাকি একথা জানিয়েছিল তাই কলকাতা থেকে দারোগা এল তাঁকে অ্যারেস্ট করবার জন্যে। ভাগনা আপ্যায়িত করে বসালো সেই দারোগাকে। ভাগনার তো চিরকালই সব্বাইকে আপ্যায়িত করা স্বভাব। ভাগনে ভাবলে বোধহয় আপ্যায়িত করলে দারোগা হয়তো ছেড়ে দেবে রায় মশায়কে। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। লোকটি ডজন দুই ফুলকো লুচি, তদুপযুক্ত আলুর ছেঁচকি, হালুয়া আর চা খেয়ে রুমালে মুখটি মুছে বললে—"তাহলে বেরিয়ে আসতে বলুন রায় মশাইকে—তাঁর পুজো আশা করি হয়ে গেছে এতক্ষণ—"

"তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন না?"

"ওরে বাপস্! সে অসম্ভব, চাকরি যাবে তাহলে—"

"তা যদি হয় তাহলে আর উপায় কি। হাবুমামা, দেখ রায় মশায়ের পুজো হল কিনা। হয়ে থাকে তো আসতে বল তাঁকে।"

রায় মশায় নিজের ঘরে বসে প্রাণায়াম করছিলেন, একটু আগেই দেখে এসেছিলাম আমি। গিয়ে দেখি তিনি নেই, আসন খালি। তাঁর ঘর থেকে ভিতরের দিকের বারান্দায় যাবার একটা দরজা ছিল। সে দরজাটা দেখলুম খোলা। সেই দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে গেলাম। রায় মশায় নেই। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে বললে কিছু জানে না। বেরিয়ে এসে বললাম, রায় মশায় তো ভিতরে নেই।

"সে কি!" আকাশ থেকে পড়লেন দারোগা।

তারপর বললেন, "নিশ্চয় আছেন, লুকিয়ে আছেন, বাড়ি সার্চ করব আমরা—"

ভাগনা বললে, "করতে পারেন—"

তন্নতন্ন করে সার্চ করা হল বাড়ি। রায় মশায়কে পাওয়া গেল না। বাড়ির পিছনে খানিকটা জঙ্গলের মতো ছিল, তার পরেই একটা পুকুর। সেখানেও গেলেন দারোগা সাহেব পুলিস-টুলিস নিয়ে। কিন্তু রায় মশাইকে ধরতে পারলেন না, তিনি যেন কর্পূরের মতো উবে গেলেন।

"গেলেন কোথায়?" পরীক্ষিৎ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

হাবুমামা বার দুই জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

"ওই কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে নেবে গেলেন সেই পুকুরে। আর একটা হাঁড়িও উপুড় করে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেকালে টর্চ ছিল না, পুলিসের লোক লণ্ঠন তুলে দেখলে গোটা দুই কেলে হাঁড়ি ভাসছে পুকুরে, এরকম ভেসেই থাকে, তাদের সন্দেহ হল না কিছু। একটু পরে তারা চলে গেল। তোমার ঠাকুরদাকে ধরতে পারলে না। তার চলে যাবার পর তোমার ঠাকুরদা কাদায়-জলে মাখামাখি হয়ে উঠে এলেন পুকুর থেকে। এসেই গরম জলে স্নান করে তখ্‌খুনি আবার ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। গেলেন হোসিয়ারপুর কাছারিতে। বললেন ওরা আবার এখুনি আসতে পারে। এল ঠিক। কিন্তু তখন পাখি উড়ে গেছে।"

হাবুমামা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ওরকম দূরদৃষ্টিওলা লোক আমি আর দেখিনি। উপস্থিতবুদ্ধিও অদ্ভুত ছিল। সে গল্প কাল বলব, এখন শুয়ে পড়।"

"আবার কি গল্প?"

"আরে, তোমার ঠাকুরদার কি একটা গল্প। সব সময় মনেও পড়ে না। কাল শুনো। এখন শুয়ে পড়—"

"হ্যাঁ, শুয়ে পড়ছি। শুয়ে শুয়েও বলতে পারেন—"

"ওফ্, নাছোড়বান্দা লোক দেখছি তুমি। শুয়ে শুয়ে পারব না। কাল তো দেখলে আমি নাক-মুখ ঢাকা দিয়ে শুই। একেবারে রেজিস্টার্ড পার্সেলটি হয়ে ঘুমের দেশে চলে যাই। ও অবস্থায় কথা বলা যাবে না, কাল শুনো—"

হাবুমামা শুইয়া পড়িয়া আপাদমস্তক ঢাকা দিলেন।

পরীক্ষিতও শুইয়া পড়িল।

।। দুই।।

বিরুবাবুকেও গল্প বলিতে হইয়াছিল। ইজিপ্টের প্রাচীন গল্পে খানিকক্ষণ জমিয়াছিল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ জমিল না। স্বাতীও গল্পের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল, "বাবা, তুমি প্রোথেরো সায়েবের গল্প বল, বেশ জমবে—"

"প্রোথেরো কে বড়মামা"—এক জিজ্ঞাসা করিল।

"একজন সাহেব। বেশ মজার সায়েব ছিল সে।"

দিগন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরসুন্দরী বিছানার এক কোণে বসিয়া স্কার্ফ বুনিতেছিলেন। স্বাতী আসিয়াই তাঁহাকে এই ফরমাশটি করিয়াছে, এজন্য সে সঙ্গে করিয়া উলও আনিয়াছে। দিগন্ত প্রবেশ করিয়া একবাব হাসিমুখে চোখ মিটিমিটি করিয়া এদিক-ওদিক চাহিল, তাহার পর সোজা বিছানায় উঠিয়া গিয়া পুরসুন্দরীর কোলে মাথা দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

পুরসুন্দরী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি যে করিস বুড়ো বয়সে। বুনছি যে—"

দিগন্ত আর একটু হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল, গল্প শুনতে এলুম। কিসের গল্প হচ্ছে—"

স্বাতী বললে—"বাবা এবার প্রোথেরো সাহেবের গল্প বলবেন"

"আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, এখন ভুলে গেছি। অদ্ভুত ছিল লোকটা এইটুকু মনে আছে শুধু।"

"বাবা এইবার আরম্ভ কর—"

বিরুবাবু আরম্ভ করিলেন।

"অদ্ভুত তো ছিলই, বিরাট বিদ্বান্‌ও ছিল। অক্সফোর্ডের এম. এ. ছিল। ইতিহাসের বই লিখেছিল একখানা। আর একটা বইও লিখেছিল—যাতে সে লিখেছিল যে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব বেশীদিন আর টিকবে না, কারণ ইংরেজরাও 'ডালি' অর্থাৎ ঘুষ নিতে আরম্ভ করেছে। যে ন্যায়পরতার আদর্শ ইংরেজ এদেশে এনেছিল তার মর্যাদা আর তারা রাখতে পারছে না। সুতরাং রাজত্ব আর বেশীদিন থাকবে না।"

"খুব লম্বা ছিল, নয় বাবা?" স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"হাঁ, তা সাড়ে ছ'ফুট তো হবেই, বেশীও হতে পারে। বড় বড় লম্বা লোক তার কাঁধের

কাছে পড়ত। আমাদের হেডমাস্টারমশাই বেশ লম্বা ছিলেন, কিন্তু তিনি তার কাঁধের কাছে পড়তেন। তার লম্বা গোঁফও ছিল। সাদা সিল্কের মতো গোঁফ, হাওয়ায় ফরফর করে উড়ত—"

দুই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"হাতের লেখাও বড় বড় ছিল। প্রতিটি অক্ষর প্রায় এক ইঞ্চি করে লম্বা। আমাদের ভিজিটরস বই ফুলস্ক্যাপ সাইজের ছিল। প্রোথেরো সাহেব যখন লিখত তাতে, তখন ২০/২৫ পাতা লাগত। প্রতি পাতায় সাত আট লাইনের বেশি আঁটত না। দাগড়া দাগড়া লম্বা লেখা। দাঁতও খুব বড় বড় ছিল, ফাঁক ফাঁক, হলদে রঙ। গাঁউ-গাঁউ করে কথা বলত—"

স্বাতী হঠাৎ মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতেই বিরুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন সোমনাথ প্রবেশ করিতেছে। পুরসুন্দরীও মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "এস, বাবা, এস, বস। স্বাতী মোড়াটা ভালো করে পেতে দে। ওই চাদরটা বিছিয়ে দে ওর উপর—"

স্বাতী মোড়াটা কোণ হইতে আনিয়া পাতিয়া দিল।

"তাঁবুতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?—"

"না, তাঁবু খুব ভালো লাগে আমার। টুরে বেরুলে তো তাঁবুতেই থাকতে হয়—"

"এখন উঠে এলে কেন? রাত তো অনেক হয়েছে, ঘুম হচ্ছে না বুঝি—"

সোমানাথ কিছু না বলিয়া মুচকি হাসিল শুধু। আসলে স্বাতী এখানে ছিল বলিয়া সে-ও এখানে আসিয়াছে। স্বাতীও তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু দিগন্তর কানে কানে সে বলিল—"এখানে ও কেন যে অমন কবছে কে জানে। ভয়ংকর ঘুমকাতুরে। একা একা খুব ঘুমুতে পারে—"

"অজানা জায়গা বলে বোধহয় ওরকম হচ্ছে। আমাবও হয়।"

"মামা, প্রোথেরো সায়েবের গল্প বলছ না কেন। থেমে গেলে যে—"

একের তাগাদায় বিরুবাবু পুনরায় শুরু করিলেন।

"আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন প্রোথেরো সাহেব ছিলেন ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌টার। তিনি প্রথম যখন আমাদের স্কুলে আসেন সে ঘটনাটা এখনও আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমবা তখন খুব নীচু ক্লাসে পড়তাম। হরেনবাবু হেডমাস্টার আমাদের বাড়ি এখনও আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন খুব নীচু ক্লাসে পড়তাম। হরেনবাবু হেডমাস্টার আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, খেতেন আর আমাদের পড়াতেন। খুব ভালো লোক ছিলেন, আমাদের পড়াতেনও খুব ভালো, কিন্তু বড্ড ভীতু ছিলেন তিনি। সন্ধ্যার সময় শিয়াল ডাকলেও ভয় পেতেন—বলতেন, কপাট জানালা সব বন্ধ করে দাও। একবার একটা ফেউ ডেকেছিল, তিনি ঘরের চারিদিকে ফিনাইল ছেটাতে লাগলেন। তখন কেশ মশাই ছিলেন। তিনি বললেন, ফেউ কি সাপ যে ফিনাইল ছেটাচ্ছেন? হরেনবাবু বললেন—বইয়ে পড়েছি তীব্র গন্ধে যে-কোনও জানোয়ারই দূরে সরে য়ায়। এই বলে তিনি ঘরের চারিদিকে ফিনাইল তো ছেটালেনই স্কুলের চাকরটাকে বললেন হাতার চারিদিকেও ছেটাতে। তাঁর সব অদ্ভুত ধারণা ছিল। একদিন রাত্রে দুটো গাধা চীৎকার করছিল। তিনি হৈ-হৈ করে কেশ মশাইকে ডেকে তুললেন। কেশ মশাই তাঁর পাশের ঘরেই শুতেন। 'কি হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছেন কেন?'—জিজ্ঞেস করলেন তিনি। হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম।' তিনি গাধার ডাক নাকি আগে শোনেননি। কেশ মশাই নাকি বলেছিলেন, 'সিংহই বটে, তবে পশুরাজ সিংহ নয়। আপনার আত্মীয় কেউ হবে, আপনি এসেছেন শুনে হয়তো খোঁজ নিতে এসেছেন।' হরেনবাবুর উপাধি

ছিল সিংহ। খুবই ভীতু লোক ছিলেন মাস্টার মশাই। তিনি যখন চিঠি পেলেন যে প্রোথেরো সায়েব মাসখানেক পরে তাঁর স্কুলে আসবেন তখন এত ভয় পেয়ে গেলেন যে বাবাকে এসে বললেন—'ডাক্তারবাবু, আমাকে কিছু-দিনের ছুটি দিন, অনেকদিন বাড়ি যাইনি, ঘুরে আসি, প্রোথেরো সায়েব চলে গেলে, তারপর আসব। সব শুনে-টুনে আমার বড় ভয় করছে। দৈত্যের মতো লোকটা তার উপর পাগল।' বাবা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। বাবা আশ্বাস দিলেন তাঁকে। বললেন, 'দেখুনই না কি হয়। আপনার চাকরি তো নিতে পারবে না। বড়জোর স্কুলের 'এড' বন্ধ করে দেবে। তখন দেখা যাবে।' প্রোথেরো সাহেবের সম্বন্ধে সত্যিই নানারকম ভয়ংকর গুজব রটেছিল। সবচেয়ে ভয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি এসে কি যে করবেন তা আগে থাকতে জানা যেত না। আন্দাজ করাও যেত না। কোনও স্কুলে গিয়ে তিনি হয়তো সব ক্লাসের ছেলেদের পরীক্ষা করলেন, আবার কোনও স্কুলে হয়তো লাস্ট ক্লাসের ছেলেদের পরীক্ষা করলেন কেবল। একটা স্কুলে গিয়ে তিনি ছেলেদের নাকি পরীক্ষা করেনইনি, মাস্টারদের পরীক্ষা করেছিলেন, রীতিমত পরীক্ষা, ডিক্‌টেশন, অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল এইসব। আর একটা স্কুলের বিল্‌ডিংটা পরীক্ষা করলেন। সিঁড়ি আনিয়ে ছাতে উঠলেন, খানিকটা দেওয়ালের প্ল্যাস্টার খুঁড়ে খামে পুরে নিয়ে গেলেন। সেটা পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন নাকি রুড়কিতে। আর একটা স্কুলে গিয়ে পড়লেন ক্লার্ককে নিয়ে। সমস্ত পুরোনো হিসেবপত্র তন্নতন্ন করে দেখলেন। নানারকম করতেন তিনি। একটা স্কুলে গিয়ে বললেন—আজ ফুটবল খেলা হোক। একদিকে থাকবে মাস্টাররা, আর একদিকে ছাত্ররা। এগারো জন মাস্টার খেলোয়াড় পাওয়া গেল না, মাত্র চারজন খেলতে জানতেন, তাও খুব ভালো নয়! প্রোথেরো সাহেবের হুকুমে তাঁদের খেলতে হল, স্কুল থেকে বাকী সাতজন যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। সাহেব তো রেগে টং, হেডমাস্টারকে তাড়া করে গেলেন, বললেন, সে-স্কুলে ফুটবল টিম নেই, মাস্টাররা খেলতে জানে না, সে স্কুলের এড বন্ধ করে দেওয়া উচিত। গ্রাম থেকে শেষে জনকয়েক পুরোনো ছাত্রকে যোগাড় করে আনা হল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বাবুলাল ভকত। তার খেলা দেখে খুব খুশী হলেন প্রোথেরো সাহেব। তিনি নিজে নাকি রেফারি হয়েছিলেন। এইরকম নানা কাণ্ড করতেন প্রোথেরো সাহেব। এই লোক আমাদের স্কুলে এসে যে কি করবে এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন সবাই। জনমজুর লাগিয়ে ইস্কুলের হাতা পরিষ্কার করানো হতে লাগল। আমাদের ছুটি হয়ে গেল চার দিন, ইস্কুলটা ভালো করে চুনকাম করানো হল। রংও দেওয়া হল কপাটে জানালায়। ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টার মহম্মদ রসুল সাহেব এইসব করবার জন্যে হেডমাস্টার মশাইকে চিঠি লিখেছিলেন। রসুল সাহেব ছিলেন বুড়ো মানুষ, জেলার ইন্‌পেক্‌টার ছিলেন তিনি। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকতেন। তিনি লিখলেন প্রোথেরো সাহেব যেদিন আসবেন তার ঠিক আগের দিন সকালে এসে পৌঁছবেন তিনি। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্যে। প্রোথেরো সাহেবের যেদিন আসবার কথা, তার আগের দিন এসে হাজির হলেন তিনি। রসুল সাহেবের ছিল ধপধপে ফরসা রং, একটু বেঁটে, সাদা সিল্কের মতো দাড়ি আর চুল, চোখে নীলচে রঙের চশমা। একটু বেঁটে ছিলেন, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলতেন রূপোবাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ির উপর ভর করে। কালো আলপাকার আচকান, ধপধপে সাদা পাজামা আর কালো মখমলের পামশু পরতেন। মাথার টুপিটিও কালো মখমলের। খুব আস্তে আস্তে মুচকি হেসে কথা বলতেন।

হিন্দী-বাংলা-ইংরেজি মেশানো এক অদ্ভুত ভাষা ছিল তাঁর। সকালেই এসেছিলেন তিনি। এসেই বললেন—"আজ সাহেব কাটিহার স্কুল দেখবেন। কুছ্‌ভি ডিফেক্‌ট্‌ পাবে না। পহলে সে সব ঠিক কর দিয়া। আজ হিঁয়াভী ঠিক কর দেঙ্গে।

বাবা জিগ্যেস করলেন, "আচ্ছা রসুল সাহেব, আগে তো ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌টারের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা থাকতেন, এখন সে নিয়ম বদলে গেছে নাকি?"

"এক এক সাহেবের এক এক কানুন। মিস্টার প্রোথেরো লাইকস্‌ টু রোম অ্যালোন।"

রসুল সাহেব সমস্ত দিন আমাদের স্কুলে রইলেন। নিজে হিসাবের কাগজপত্র দেখলেন। আমাদের ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে পড়া ধরলেন, যারা বেশ চটপট জবাব দিকে পারলে না, তাদের বললেন, তোমাদের কাল স্কুলে আসতে হবে না, থোড়াভি ডিফেক্‌ট্‌ মিললে সাহেব হাল্লা মাচাবে। তোমাদের কাল ছুটি। তারপর তিনি অফিসের খাতাগুলো ভালো করে দেখলেন। স্কুলের বিল্ডিংটাও দেখলেন। এক জায়গায় একটু ফাট ধরেছিল দেয়ালে, মিস্ত্রী ডাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু সারিয়ে নিলেন। স্কুলের ফুটবল টিমটা ঠিক আছে কি না খবর নিলেন। মাস্টারদের বললেন তাঁরা যেন ফিটফাট হয়ে স্কুলে আসেন আর যিনি যে বিষয় পড়ান তার বইগুলো যেন ভাল করে পড়ে আসেন। প্রেথেরো সাহেব কখন যে কোথায় ক্যাঁক করে চেপে ধরবেন বলা যায় না। রসুল সাহেব ভোর ছ'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্কুলেই রইলেন। খেতে পর্যন্ত এলেন না। আমরা তাঁর খাবার স্কুলেই পৌঁছে দিয়ে এলাম। খাবার দিতে গিয়ে দেখলাম তিনি নিজে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক ঘরের ঝুল ঝাড়াচ্ছেন। স্কুলের চাকরটা একটা বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাতের, দেয়ালের ধুলো আর ঝুল ঝাড়ছে, রসুল সাহেব মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দাড়িতে চুলে ঝুল লেগেছে। এর পর চুনকাম করানো হল। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে তিনি স্নান করলেন, তারপর চায়ের টেবিলে বসলেন। তাঁর ইন্‌সপেক্টারি জীবনের নানা রকম গল্প করতে লাগলেন। আমরা আড়াল থেকে সব শুনছিলুম। তিনি একটা অদ্ভুত গল্প বলেছিলেন। আমাদের দেশে তখন নাইট স্কুলের রেওয়াজ হয়নি। রাত্রে যে স্কুল বসতে পারে তা কল্পনাও করত না কেউ। রসুল সাহেব বললেন তিনিই বোধহয় প্রথম নাইট স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর নিজের গ্রামে। তিনিই তখন সে অঞ্চলে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টার হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা গোপন করতে হয়েছিল, গভর্নমেন্ট তখন নাইট স্কুল করবার জন্য সাহায্য দিত না। অথচ দিনের বেলা ছাত্র পাওয়া মুশকিল। গ্রামের অধিকাংশই চাষী আর গোয়ালা। তাদের ছেলেরা দিনের বেলায় গরু চরায়, মাঠের কাজ করে। স্কুলে আসবার তাদের অবসর নেই। রসুল সাহেব তখন গ্রামের সবাইকে ডেকে স্থির করলেন যে স্কুল সন্ধ্যের পরই বসবে রোজ। কিন্তু যদি কোনদিন কোন সাহেব-সুবো স্কুল ভিজিট করতে আসে সেদিন দিনের বেলা স্কুল বসাতে হবে। ওপরে তিনি জানাবেন না যে নাইট স্কুল বসানো হচ্ছে। ওপরে কেবল জানানো হবে যে স্কুল হয়েছে একটা, সেটা যে নাইট স্কুল এ খবরটা চেপে যাবেন তিনি তাদের কাছ থেকে। তাঁর পাতলা দাড়ি চুমরে মুচকি হেসে রসুল সাহেব বললেন, ভাল কাজ করতে গেলে কানুনকে কুছ কুছ বদলে নিতে হয়। তাতে দোষ হয় না। এই সব গল্প হচ্ছে এমন সময় কাটিহার থেকে সন্ধ্যের ট্রেন এলো। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই স্টেশন ছিল, তখন ট্রেন এলে দেখা যেত, গাড়ি আসা-যাওয়ার শব্দও পাওয়া যেত। গাড়ি আসার শব্দে রসুল সাহেব উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, বললেন, ইস গাড়ি মে কাটিহার সে কুছ খবর আনা

চাহিয়ে। আজ প্রোথেরো সাহেব তো কাটিহার স্কুল জরুর ভিজিট কিয়া হ্যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর এসে পৌঁছল। কাটিহার স্কুলের বৃদ্ধ হেডক্লার্ক নবীনবাবু এসে ঢুকলেন। তাবে দেখে আমরা আঁতকে উঠলুম। তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নাকের খানিকটা এবং বাঁ চোখটাও ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢাকা। তিনি এসেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বলতে লাগলেন, আমাকে মেরেছে, এই বুড়ো বয়সে আমাকে মেরেছে প্রোথেরো সাহেব। আমি আর চাকরি করব না। আমি আর চাকরি করব না। বার বার এই বলে কাঁদতে লাগলেন খুব। রসুল সাহেব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন খুব, একটি কথা বলতে পারলেন না, নির্বাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কেবল।

বাবা নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছিল, কেন মারলে আপনাকে, সব খুলে বলুন না। দরকার হলে নালিশ করব আমরা সাহেবের নামে। নবীনবাবু একটু থেমে থেমে ব্যাপারটা বললেন। সাহেব তাঁকে হিসাবের লেজারটা আনতে বলেছিলেন। তারপর সেই লেজার থেকে তাঁকে প্রায় পঞ্চাশটা ফিগার ডিকটেট করলেন। তারপর বললেন, যোগ কর। অত বড় যোগ চট করে কি করা যায়? তবু করলাম, কিন্তু ভুল হল। আর একবার করতে বললেন, সেবারও ভুল হল। তৃতীয়বার ঠিক হল। কিন্তু লেজারে যে যোগফল ছিল তার সঙ্গে মিলল না। সাহেব গাঁউগাঁউ করে জিজ্ঞেস করলেন—এর মানে কি। আমি শুধু বললাম, আই ডোণ্ট নো সার। যেই বলা অমনি খাতাটা ছুঁড়ে মেরে দিলে আমার মুখের উপর। আর একটু হলে অন্ধ হয়ে যেতুম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোক। রসুল সাহেব চোখ বড় বড় করে শুনছিলেন সব! তার চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে গিয়েছিল। হেডক্লার্ক কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে গেলেন। রসুলসাহেব তখন বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন—এবার আমারও কলিজাতে ডর ঘুসছে ডাক্তার সাহেব। এ তো আদমি না, খুনী শের হ্যায়। কখন কার উপর লাফিয়ে পড়বে কে জানে! কি করা যায় বলুন তো।' বাবা বললেন, 'কিছু ভয় নেই। এখানে যদি মারধোর করে আমরাও ছেড়ে দেব না। আমি রামপীরিতকে খবর পাঠাচ্ছি এখুন। সে জনাকয়েক লাঠিয়াল জোগাড় করে রাখুক।" রসুল সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে বাবার দুটো হাত ধরে বললেন, 'খবরদার অমন কাজ করবেন না ডাক্তারবাবু। তাহলে আপনাদের স্কুল তো উঠে যাবেই আমারও চাকরি যাবে। হয়তো জেলও হয়ে যেতে পারে। খবরদার ও মতলব করবেন না। আসল ইংরেজের বাচ্চা, আসল গহ্‌মনা সাপ। কিং কোব্রা—তার পুছড়ি দাবনা হরগিজ্ মুনাসিব নহি হ্যায়।

বিরুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্ধবিস্মৃত শৈশব আবার যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মনে। তিনি ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়েছিলেন যে তাঁহার ছেলেমেয়েরা তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেছে।

"তারপর কি হল—"

"প্রোথেরো সাহেব এলেন তার পরদিন"

"এসে কি করলেন—"

"স্কুলে এসে ঘুরে গেলেন একবার, আর কিছুই করলেন না। সমস্ত দিন ডাকবাংলোয় বসে লিখতে লাগলেন। তখন তিনি কি একটা বই লিখছিলেন। হেডমাস্টার মশাইকে বললেন সন্ধ্যের পর তিনি ছেলেদের নিয়ে আকাশের নক্ষত্র দেখবেন, ছেলেরা সে-সময় যেন স্কুলের

মাঠে জড়ো হয়। আমাদের তখন নেচার স্টাডি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বলে একটা বই ছিল। তাতে মোটামুটি গাছপালার নাম, সাধারণ পাখিদের নাম এইসব জানতে হত, আকাশের নক্ষত্রও চিনতে হত। তাছাড়া ছোট জমির টুকরোতে বা টবে ধান গম যব মটর এইসব বীজ ছিটিয়ে দিয়ে তাদের অঙ্কুর কেমন করে বেরোয় কখন পাতা বেরোয়, গাছ রোজ কেমন করে বাড়ে এইসবও শেখবার কথা। কিন্তু আমাদের স্কুলে ওই বিষয়টি ভালো করে পড়ানো হত না। মাত্র পঁচিশ নম্বর থাকত বলে ওর উপর বিশেষ জোরও দিত না কেউ। প্রোথেরো সাহেব ইংরেজী অঙ্ক ছেড়ে যে ওই subject-টার উপর জোর দেবেন, একথা কেউ ভাবেনি। হেডমাস্টারমশাই তো ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন, তিনি বললেন আমি তো কিচ্ছু জানি না ও-বিষয়ে। আজ আমারও অদৃষ্টে মার খাচ্ছে দেখছি। আমি আর সন্ধ্যের সময় যাব না ভাবছি। আমার পেটটাও কামড়াচ্ছে। রসুল সাহেব বললেন—না, না, ওসব মতলব করবেন না। তাহলে আরও ক্ষেপে যাবে। আমিও কি কিছু জানি? আম, বাবুল, কাটাহ্‌র এই রকম দু'চারটে পেড় চিনি, আর কৌয়া, কবুতর, ময়না, মুরগী এইরকম দু'চারটে চিড়িয়া চিনি, বাস্। সান আর মুন ছাড়া আকাশের আর কিছুই চিনি না। কিন্তু তা বলে আমি কি ডিউটি থেকে পালিয়ে থাকতে পারি? যদি সাহেব কুছ পুছে আই শ্যাল কনফেস্। তারপর যা হয় হোক।

প্রোথেরো সাহেব সমস্ত দিন র চা খেয়ে ক্রমাগত বই লিখে যেতে লাগলেন। নিজেই স্পিরিট স্টোভে চা করছিলেন । কারো সাহায্য নিচ্ছিলেন না। মাঝে মাঝে চা খাচ্ছিলেন আর লিখছিলেন। খুব বড় বড় অক্ষরে লিখছিলেন। চার পাঁচ লাইনে একটা কাগজ ভরে যাচ্ছিল। তিনি এক পাতা লিখেই সেটা টেবিল থেকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছিলেন আর তাঁর চাপরাসী সেটা সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে পাশের টেবিলে জমা করে রাখছিল। সেখানে সমস্ত দিনে কাগজের একটা স্তূপ হয়ে গেল।

সাহেব সমস্ত দিন চা, বিস্কুট আর ডিম সিদ্ধ খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। বাবা খবর পাঠিয়েছিলেন তার খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা, প্রোথেরো সাহেব জানালেন করতে হবে না। সন্ধ্যের একটু আগে খবর এল সাহেব মদ খাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বোতল বার করেছে।

এই শুনে রসুল সাহেব খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—একেই তো খফ্‌ত মেজাজের লোক। তাব উপর মাতোয়াবা হলে কি যে করবে খোদাই জানে। হেডমাস্টার মশাই বার বাব বলতে লাগলেন, আমার খুব পেট কামড়াচ্ছে, আমি যাব না। রসুল সায়েব কিন্তু নাছোড়। তিনি বলতে লাগলেন, যেতে আপনাকে হবেই। আপনাকে না দেখলে আরও খফ্‌ত হোয়ে যাবে সাহেব। আপনি চলুন, আমি থাকব। সাহেবকে বুঝিয়ে বলব সব।

সন্ধ্যের আগে থেকেই স্কুলের সামনের মাঠে চা'কর ভুট্টা আমদের দুটো চাকরকে নিয়ে বেঞ্চি সাজাতে লাগল। টেবিল চেয়ারও নিয়ে গেল। দু'একটা বড় বড় হ্যারিকেন লণ্ঠনও তেল ভরিয়ে রাখা হল। তখনও পেট্রোম্যাক্স বাজারে আসেনি। একটু অন্ধকার হলেই প্রোথেরো সাহেব হাজির হলেন এসে । প্রকাণ্ড একট বিলিতী টর্চ তাঁর হাতে। টর্চ দেখে আমরা তো অবাক। তখনও টর্চ বাজারে আসেনি।

তিনি এসেই একটা ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, শো মি গ্রেট বেয়ার্। ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আর একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও চুপ। তৃতীয়

ছেলেটাও যখন দেখাতে পারল না তখন তিনি হেডমাস্টারমশাইকে বললেন—শো দেম দি গ্রেট বেয়ার।

হেডমাস্টার মশাই তখন কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বললেন—তিনি আকাশের কোন নক্ষত্রই চেনেন না। রসুল সাহেব তখন এগিয়ে এসে বললেন—আমিও চিনি না। আমরা সবাই আর্ট কোর্সের লোক, আমাদের বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান খুব কম। যখনই নেচার স্টাডি ছেলেদের কোর্স করা হয়, তখনই আমি একা নোট দিয়েছিলাম যে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেবার মতো টিচার প্রায় কোন স্কুলেই নেই। যাই হোক, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন বিজ্ঞান অধ্যাপক আমাদের মধ্যে এসেছেন। আপনি দয়া করে আজ আমাদের কিছু শিখিয়ে দিন।

প্রোথেরো সাহেব বললেন, অল রাইট্।

তারপর তিনি আকাশে টর্চের আলো ফেলে আমাদের নক্ষত্র দেখাতে লাগলেন। গ্রেট বেয়ার, পোল-স্টার, লিটল বেয়ার, ড্রেকো, হারকিউলিস আর্কটুরাস এবং আরও অনেক নক্ষত্র চিনিয়ে দিলেন আমাদের। ওদের মধ্যে যে আমাদের সপ্তর্ষি, ধ্রুব, ধ্রুব-মাতৃমণ্ডল, স্বাতী আছে তা অনেক বড় হয়ে পরে জেনেছিলাম। আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার প্রথম গুরু প্রোথেরো সাহেব। সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত নক্ষত্রের ক্লাস হয়েছিল। প্রোথেরো সাহেব রসুল সাহেবকে বললেন, ছেলেদের খিদে পেয়ে যাচ্ছে, আপনি ওদের জন্য কিছু গরম গরম খাবারের ব্যবস্থা করুন। দাম আমি দেব। স্টেশনের গুজরাটি খাবারওলা বিঠল ভাই আমাদের কচুরি ভেজে খাইয়েছিল। প্রোথেরো সাহেবের পঁচিশ টাকা খরচ হয়েছিল। প্রোথেরো সাহেব নিজেও কচুরি খেয়েছিলেন খুব। এক একবারে চার-পাঁচটা করে মুখে পুরেছিলেন। সে ক'ঘণ্টা যে কি আনন্দে কেটেছিল তা আর কি বলব। আকাশের নক্ষত্রদের ঘিরে যে-সব বিদেশী রূপকথা আছে তা-ও শুনিয়েছিলেন আমাদের। তিনি ইংরেজীতে বলছিলেন এবং হেডমাস্টার মশাই সেগুলো বাংলা করে শোনাচ্ছিলেন আমাদের। তার পরদিন তিনি ভিজিটার্স বুকে স্কুল সম্বন্ধে প্রায় কুড়ি পাতা লিখলেন। ভালই লিখেছেন শুনলাম। তাঁর লেখার ফলে আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে নতুন শিক্ষক এলেন একজন।

"খোকা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি। ওঠ, নিজের বিছানায় গিয়ে শুগে যা—"

"আমরাও উঠি এবার। রাত অনেক হয়েছে। বারোটা বাজে—"

"তাই নাকি। তাহলে এবার যাও, শুয়ে পড় তোমরা। আমরাও শুই—"

বিরুবাবুর ঘরে সভা ভঙ্গ হইল, যদিও এক-দুই-তিনদের ইচ্ছা ছিল গল্প আরও খানিকক্ষণ চলুক।

।। তিন ।।

সূর্যসুন্দরকে চম্পা গান শুনাইতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া গগন সে গান শুনিতেছিল। সূর্যসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলে চম্পা ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। চম্পা সবই ধীরে ধীরে করে। তাহার গমনভঙ্গিমা ধীর, চলে ধীরে ধীরে, কথাও বলে মৃদুকণ্ঠে। যখন গান ধরে তখন তাহার কণ্ঠস্বর খুব উচ্চ গ্রামে উঠিয়া নিজেকে জাহির করিতে চায় না। যখন

কাহারও দিকে চায় চোখের পাতাটিও অতি ধীরে ধীরে তোলে। তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন একটি শান্ত সুরে বাঁধা।

গগন বলিল, "দাদুকে কি একটা বাজে গান শোনালে—

"ঠাকুরপো যে ওই গানটাই গাইতে বলেছিল"

"তোমার ঠাকুরপোর যেমন বুদ্ধি—"

চম্পা মৃদু হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, সে কখনও কোন প্রতিবাদ করে না।

"তোমার কি খুব ক্লান্ত লাগছে?"—গগন প্রশ্ন করিল।

"না। কেন?"

"চল না তাহলে গঙ্গার ধারে বসা যাক একটু। এখুনি চাঁদ উঠবে। গঙ্গার ওপারের বাবলা-বনের ফাঁক দিয়ে চাঁদ ওঠাটা যে কি সুন্দর তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার ছেলেবেলার সঙ্গে ওই চাঁদ ওঠার স্মৃতিটা জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় বাবলা-বনের ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ওই চাঁদকে কত রূপে দেখেছি। চল আজ দেখা যাক কি মেক আপ নিয়ে নাবছেন তিনি—"

"গঙ্গার ধারে কি মাটিতে বসবে?"

"পাগল। দুটো ক্যাম্প-চেয়ার নিয়ে যাই চল।"

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই বোঝা গেল চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্যই গগন চম্পাকে নির্জন নদীতীরে লইয়া আসে নাই। সে আসিয়াছিল একটি গোপন পরামর্শ করিবার জন্য। মিস বোসের সম্পর্কে। মিস বোস যে মিস নহেন মিসেস, এ খবরটি গগন জানিত। চম্পাকে আনিতে সে যখন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল তখন কোনও সবজান্তার নিকট মিস বোসের গোপন বিবাহ-কাহিনীটি শুনিয়াছিল সে। শত চেষ্টা করিলেও এসব জিনিস সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায় না। সবজান্তা ভদ্রলোকটি মিস বোসের অবিবাহিত স্বামী সুপর্ণ সিংহের বর্তমান ঠিকানাটিও বলিয়াছিল গগনকে। ঠিকানাটি জানিবার পর হইতেই গগনের মনে একটি মতলব জাগিয়াছে। ভাবিয়াছিল পত্রযোগেই ব্যাপারটা হয়তো সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু সুব্রত যখন স্বশরীরে এখানেই হাজির হইয়াছে তখন এই তো সুযোগ। তাছাড়া মিস বোসও এখানে রহিয়াছে। সে নিজেই সুব্রতকে বলিতে পারে। সুপর্ণবাবু যে-অঞ্চলে এখন নূতন করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিতেছেন সুব্রত সেই অঞ্চলেই এখন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিস। সুব্রত চেষ্টা করিলে অনায়াসে তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু সুব্রতকে কিছু বলিবার পূর্বে তাহার মনে হইয়াছে সর্বাগ্রে চম্পার সহিত পরামর্শ করা দরকার। কেন মনে হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। হয়তো যে-কোনও অজুহাতে পত্নীর সান্নিধ্য লাভটাই প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ পরামর্শদাত্রী হিসাবে চম্পা যে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নহে তাহা গগনও জানে। অবশ্য চম্পার মাধ্যমেই তাহার মিস বোসের সহিত আলাপ, ইহাও একটি কারণ হইতে পারে।

কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া গগন আশ্চর্য হইয়া গেল। চম্পা চরিত্রের এমন একট দিক দেখিতে পাইল যাহা সে ইতিপূর্বে দেখে নাই। চম্পা মিস বোসের সমস্ত কাহিনী জানে, অথচ এতদিন চুপ করিয়া ছিল, তাহাকে পর্যন্ত কিছু বলে নাই।

"তুমি সব জানতে। আমাকে কিছু বলনি তো"

"পরের কথা তোমাকে বলে কি হবে। তা ছাড়া সত্যি কি মিথ্যে তাও তো জানা নেই ঠিক। ও নিয়ে ঘোঁট করে কি লাভ"

"তাহলে সুব্রতকে বলব না?"

চম্পা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ওকে আগে জিগ্যেস করি, ও যদি বলে তাহলে বলো। ছোট জামাইবাবু কি করতে পারেন?"

"পুলিসের লোক দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারে। সুপর্ণ ওরই এলাকায় থাকে, ও যদি ওকে ডাকিয়ে এনে একবার কড়কে দেয় তাহলেই বাবুসায়েবের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু তার আগে অনুপমার মতটা নেওয়া উচিত"

"তা ঠিক। অনুপমা যদি মত দেয় তাহলেই সুব্রতকে জিগ্যেস করব।"

"হ্যাঁ সেই ভালো। অনুপমাকে জিগ্যেস করলে কতখানি সত্যি কতখানি মিথ্যে তাও বোঝা যাবে। আমাদের তো লোকের মুখে শোন', আর এ-দেশের লোককে তো চেনই। কারো ভালো দেখতে পারে না। অনু বিলেত গেছে, রোজগার করে খুব, কারও তোয়াক্কা করে না—এই জন্যে লোক হিংসেয় ফেটে পড়ছে। হয়তো সবটাই বানানো গল্প। সত্যি মিথ্যে না জেনে কিচ্ছু কবতে যেও না।"

গগন মুগ্ধ হইয়া গেল। এ চম্পার পরিচয় সে আগে তো পায় নাই।

হঠাৎ বলিল, "আমায় সত্যি মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও, এই গানটা গাও তো"

"এখন আবার গান!"

"ক্ষতি কি!"

"কেউ শুনতে পায় যদি"

"পাগল হয়েছ। কেউ জেগে নেই এখন"

"খুব আস্তে আস্তে গাইছি তাহলে"

"বেশ"

একটু পরেই চম্পার গান নির্জন নদীতীরে একটা স্বপ্নলোক সৃজন করিয়া ফেলিল। নদীর অস্ফুট কল্লোল, অবিশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনিও চম্পার গানের সহিত যোগ দিল।

গগন বলিল—"দেখ, দেখ—"

চম্পা চোখ তুলিয়া দেখিল নদীর ওপারে বাবলা-বনের আড়ালে চাঁদ উঠিয়াছে। মনে হইতেছে একটা বিরাট কালো জাফরির আড়ালে দাঁড়াইয়া চাঁদও যেন চম্পার গান শুনিতেছে।

।। চার।।

পার্বতী পুরসুন্দরীর পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল। সকলের খাওয়াদাওয়া চুকিয়া যাইবার পর, রান্নাঘরের কাজ সারিয়া গরম তেলের বাটিটি লইয়া সে পুরসুন্দরীর নিকট আসিয়াছিল।

পুরসুন্দরী আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শোনে নাই। বিরুবাবু বিছানায় বই পড়িতেছিলেন। তখনও তাঁহার ঘুম আসে নাই। Conquest of Mexico and Peru বইটিতে তন্ময় হইয়াছিলেন। পার্বতী যে নিকটে বসিয়া পুরসুন্দরীর পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল তাহা তাঁহার মনোযোগ বিচলিত করিতে পারে নাই। একটু পরে পার্বতী কথা বলিল।

"মা, তুমি গগনকে একটু শাসন করে দিও। বউকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। সন্ধ্যেবেলা দাদুর কাছে গান গাইয়েছে। এখন আবার দেখলাম নদীর ধারে নিয়ে গেছে। দু'জনে পাশাপাশি ক্যাম্প চেয়ারে বসে আছে। চম্পা গান গাইছে আবার। পোয়াতি মানুষ, অতটা ভাল নয়"

পুরসুন্দরী মনে মনে এ-কথায় সায় দিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলেন। তিনি জানেন মানা করিলে কোন ফল হইবে না, তিক্ততার সৃষ্টি হইবে কেবল।

পার্বতী কিন্তু নাছোড়।

"গগনকে ডেকে আনি। তুমি মানা করে দাও—"

"ওরা আপনি উঠে যাবে এখনি। দিগন্ত কোথা?"

"সে নিজের ঘরে বসে কি একটা লিখছে, তাকেই বরং ডেকে বলি তোমার নাম করে গগনকে গিয়ে বলুক—"

হঠাৎ বিরুবাবু কথা কহিয়া উঠিলেন।

"না, না, দিগন্তকে এখন বিরক্ত করিস না, ও নিজের থীসিসটা লিখছে বোধ হয়, তুই এবার শুগে যা, কোথায় শুবি?"

"ছোট কাকা মিস বোসের ঘরে আমার বিছানা পাতিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ও খ্রীষ্টানীর সঙ্গে আমার শুতে ইচ্ছে করছে না। জায়গা থাকলে এখানেই শুয়ে পড়তাম কিন্তু এখানে জায়গা কই"

বিরুবাবু সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিলেন।

"ও খ্রীষ্টানী তোকে কে বললে। আমি শুনেছি ভদ্র হিন্দুবংশের মেয়ে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে"

পার্বতী জেদী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

"অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—"

বিরুবাবু আবার লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং মেক্সিকো-পেরু বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

পার্বতী অনুপমার তাঁবুতে গিয়া যাহা দেখিল তাহা সে দেখিবে বলিয়া প্রত্যাশা করে নাই। দেখিল অনুপমা নিজের বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কাঁদিতেছে নাকি! পার্বতী নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মিস বোস, ঘুমিয়েছেন নাকি—"

অনুপমা উঠিয়া বসিল। তখন আর পার্বতীর সন্দেহ রহিল না। সত্যই সে কাঁদিতেছিল,

চোখে জল। চোখের জলের কি মহিমা আছে জানি না, পার্বতীর বিরুদ্ধ ভাবটা হঠাৎ যেন কুয়াশার মতো মিলাইয়া গেল।

সে তাহার পাশে বসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া সস্নেহে বলিল, "কাঁদছ কেন ভাই—"

ইহাতে অনুপমার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল পার্বতী।

"এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার?"

অনুপমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সামলাইয়া শান্ত হইয়া বসিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এমন সুখের সংসারে কি কারও কষ্ট হতে পারে। এমন পরিপূর্ণ সুখের সংসার আমি আর দেখিনি!"

"তবে কাঁদছিলেন কেন?"

"এমন সুখের সংসারের মাঝখানে এসেছি বলেই হঠাৎ নিজের জীবনের দুঃখটাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। কেঁদে তাই হালকা হয়ে নিলাম একটু—"

"কি এমন দুঃখ আপনার—"

অনুপমা ম্লান হাসিয়া পার্বতীর মুখের দিকে চাহিল।

"গভীর দুঃখের কথা কাউকে বলা যায় না। চোখের জলই তার একমাত্র ভাষা, তা তো আপনি দেখেছেন। আর কি বলব—"

পার্বতী কয়েক মুহূর্ত অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর হঠাৎ আবদারের সুরে বলিয়া বসিল—"না শুনে আমি ছাড়বই না—"

হঠাৎ সে অনুপমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"এ আমার অতি গোপন কথা, কাউকে বলি না।"

"আমাকে কিন্তু বলতেই হবে"

পার্বতীর জেদ যেন উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল।

"এখন থাক। আর একদিন চেষ্টা করব। কিন্তু কি করবেন শুনে? উপন্যাসের মতো শোনাবে। সত্যি বলে মনে হবে না। মনে হবে বানিয়ে বলছি।"

"আমি তাই শুনব—"

বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল।

"মিস বোস জেগে আছেন নাকি—"

গগনের গলা!

অনুপমা তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আসুন। জেগে আছি—"

গগন ভিতরে ঢুকিল।

"পার্বতী তুই এখানে?"

"আমি যে এখানে শোব। ওই তো আমার বিছানা—"

গগন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চম্পার পরামর্শ অনুসারে সে অনুপমার সঙ্গে তাহার স্বামীর বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে আসিয়াছিল। পার্বতীর সম্মুখে কথাটা প্রকাশ করা সমীচীন

হইবে না মনে করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। অথচ ইহাও তাহার মনে হইল, ব্যাপারটার আজ রাত্রেই নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়া ভালো। মেজকাকা কাল সকালেই আসিয়া পৌঁছাইবেন। তা ছাড়া সমস্ত দিন হৈ-চৈ তো আছেই। সুব্রতরও ছুটি হয়তো বেশীদিন নাই। দাদুর অবস্থা যখন ভালোর দিকে তখন সে হয়তো কালই চলিয়া যাইতে চাহিবে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে অনুপমাকে বলিল, "ঘুম পেয়েছে নাকি? চোখ দুটো ফুলো ফুলো দেখছি"

পার্বতী তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। কিন্তু একটু আগে সে যে কাঁদিতেছিল তাহা আর বলিল না।

অনুপমা বলিল, "না, ঘুম পায়নি। কেন বলুন তো—"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, গোপনীয় কথা। যদি আপত্তি না থাকে একটু বাইরে চলুন, দুটো চেয়ার পাতা আছে।"

পার্বতী বলিল, "বৌদিও আছে নাকি সেখানে?"

"না। সে শুতে গেল।"

"বৌদিকে নিয়ে তুমি গঙ্গার ধারে বসেছিলে, মা শুনে খুব রাগ করছিলেন। কতরকম পাখিপক্ষী রাতের আকাশে উড়ে যায়। পোয়াতি মানুষের মাথার ওপর দিয়ে ওসব উড়ে যেতে দেওয়া ঠিক নয়—"

"আচ্ছা থাম থাম পাকা বুড়ি কোথাকার"

"মায়ের কাছে যখন বকুনিটি খাবে তখন বুঝতে পারবে —"

গগন অনুপমার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাবেন তো চলুন—"

"চলুন—"

গগনের সহিত অনুপমা বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে পার্বতীও নিঃশব্দচবণে তাহাদের অনুসরণ করিল।

।। পাঁচ।।

উষাকে কুমার যে ঘরটি দিয়াছিল সেটি বেশ বড় ঘর। ঘরে একটি মাত্র মাঝারি গোছের চৌকি ছিল। সেটিতে সদানন্দের বিছানা করিয়া দিয়া উষা নিজের বিছানা পাতিয়াছিল মেজের উপর। প্রশস্ত বিছানা না হইলে তাহার চলে না। কারণ তাহার ছেলে তিনটি রাত্রে ঘুমের ঘোরেও ছুটোপাটি করে। বার বার তাহাদের সোজা করিয়া শোওয়াইয়া দিতে হয়। তাহাদের বাড়িতে যে শোওয়ার ঘরটি আছে তাহার মেঝে প্রায় সম্পূর্ণ চৌকি দিয়া ঢাকা। ছোটখাটো একটি মাঠ বলিলেই হয়। তাহার উপর এক-দুই-তিন সারারাত ঘুরপাক খায়, আর উষা তাহাদের বার বার ঠিক করিয়া শোওয়াইয়া দেয়। এখান তাই সে মাটিতে বিছানা করিয়াছে।

গভীর রাত্রি। রামনিবাস বাবাজীর কীর্তনের দল অনেকক্ষণ কীর্ত্তন গাহিয়া এখন কিছুক্ষণের

জন্য বিশ্রাম লইতেছে। চতুর্দিকে ঝিল্লীধ্বনি। মাঝে মাঝে দুই একটা প্যাঁচা ডাকিতেছে। সদানন্দের দিবানিদ্রাটি বেশ দীর্ঘ হইয়াছিল তাই রাত্রে ঘুম আসিতেছিল না। ঘুম না আসিলে সাধারণতঃ বাড়িতে তিনি যাহা করেন, এখানেও তাহাই করিতেছিলেন। উষার সঙ্গে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন। আমাদের দেশে দুইজনে সাধারণতঃ পেটাপেটি খেলা হয়। কিন্তু সদানন্দ বিদেশ হইতে আরও নানারকম খেলার প্রণালী সংগ্রহ করিয়া উষাকে সেগুলি শিখাইয়াছিলেন। সুতবাং যদিও দুইজনের খেলা তবু তাহা কখনও একঘেয়ে হয় না। কখনও ব্রিটিশ, কখনও ফরাসী, কখনও সুইডিশ, কখনও বা জার্মান দেশের খেলা খেলিয়া তাহারা পরস্পরের মনোরঞ্জন করে।

নীরবেই খেলা চলিতেছিল।

সদানন্দ বলিলেন—"বাবা তো বেশ ভাল আছেন দেখছি। চল না, এবার ফিরে যাই।"

"কেন, তোমার কোন কাজ আছে সেখানে?"

"কাজ তেমন কোন নেই। কিন্তু এখানেই বা চুপচাপ বসে বসে কি করি বল। কেবল খাওয়া আর ঘুমোনো কি ভাল লাগে। এখানে যে মনের খোরাক কিছু নেই। কলকাতায় দোকানে গিয়ে বসলে তবু পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়—"

"এখানেও তো লোকজনের অভাব নেই। কিন্তু তুমি কারো সঙ্গে মিশতে পার না যে। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ বসে আছ কেবল। বড় জামাইবাবু, রঙ্গনাথ, ওরা নিজের নিজের দল করে নিয়েছে। তুমি তো বাবার কাছে গিয়েও একবার বসলে না ভাল করে।"

"আমি গিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু কথা কইতে পারিনি। কবরেজ মশাই আসর সরগরম করেছিলেন। আমি চুপ-চাপ বসেছিলাম পিছন দিকে।"

"তুমি এক কাজ কর না। তোমার তো মাছ ধরার খুব শখ, আমাদের পুকুরে গিয়ে মাছ ধর না। বড় বড় রুই কাতলা আছে। কুমারকে বল সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওর হুইল-টুইল সব ছিল এককালে, এখনও হয়তো আছে—"

সদানন্দ এই খবর শনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

"এ-খবরতো জানতুম না। মাছ ধরার ব্যবস্থা হলে সময়টা ভালই কাটবে। কালই কুমারবাবুকে বলতে হবে। ভাল মাছ ধরতে পারি তো বাবাকে দু'একটা নতুন ধরনো মাছের তরকারিও খাওয়াব। গগন তো এ বিষয়ে খুব উৎসাহী।

"খুব। নাও ফেল—"

উষা আড়চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল একবার যদি মাছ ধরার নেশায় পাইয়া বসে তাহা হইলে ভদ্রলোক আর নড়িতে চাহিবে না। উষা অনেকদিন পরে আসিয়াছে, বাবাকে ছাড়িয়া তাহার এখন যাইবার ইচ্ছা নাই।

।। ছয় ।।

সন্ধ্যা নিজের ঘরে একট পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আনাইয়া লইয়াছিল। বাবার জন্য যে-দস্তানাটা সে বুনিতেছিল সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। টেবিলের অপর পার্শ্বে রঙ্গনাথ একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া একটি পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা বুনিতেছিল বটে,

যন্ত্রচালিতবৎ তাহার হাত দুইটি চলিতেছিল। কিন্তু সে ভাবিতেছিল অন্য কথা। দুপুরে সে তাহার বাল্যসখী সীতিয়ার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল। মনে হইতেছিল মন কি বিচিত্র। বাল্যকালে ওই সীতিয়াকে ছাড়া তাহার একদণ্ড চলিত না। সীতিয়ার যখন বিবাহ হইয়া গেল তখন সে কান্নকাটিও করিয়াছিল। কিন্তু এখন? এখান আসিয়াও তাহার কথা মনে পড়ে নাই, মনে পড়িল পোস্ট-অফিসের কাছাকাছি গিয়ে যখন সে সীতিয়াদের বাড়িটা দেখিতে পাইল। অর একটা উপমাও তাহার মনে হইল, আমাদের মন নদীর ঘাটের মতো। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় ঘাট বুঝি বরাবর একই রকম আছে। বহমান নদীস্রোত যে সে-ঘাটের রূপ প্রতিমুহূর্তেই বদলাইয়া দিতেছে সে খেয়াল আমাদের থাকে না, হঠাৎ এই সত্যটা আবিষ্কার করিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু ইহাই নিয়ম। এ নিয়ম না থাকিলে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। কিন্তু এসব চিন্তার অন্তরালে আর একটি ছবিও তাহার মনের অবচেতন লোকে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সহসা সেটি প্রকট হইয়া উঠিল। সীতিয়ার ছোট ছেলের ছবি। কি সুন্দর ছেলেটি, কেমন হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল যে তাহার নিজের ছেলে হয় নাই। হইতে পারিত কিন্তু নিজেই সে হইতে দেয় নাই। স্ত্রীলোক হইলেই যে জননী হইতে হইবে এই অমোঘ নিয়মের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়াছে। রঙ্গনাথকে বলিয়া দিয়াছে—"আমি মা হতে চাই না, তোমার যদি ছেলের শখ থাকে তাহলে আর একটা বিয়ে করতে পার।" রঙ্গনাথ উত্তর দিয়াছিল—"ছেলের শখ আপাতত আমারও নেই। ইয়োরোপটা আর আমেরিকাটা দুজনে মিলে আগে বেড়িয়ে আসা যাক তারপর ওকথা ভাবা যাবে। তখনও যদি তোমার এ-মত প্রবল থাকে তারপর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের কথা চিন্তা করে দেখা যাবে। যা ঝামেলা, ইচ্ছে হয় না।" তখনও হিন্দু কোড বিল পাস হয় নাই। বিলটি পাস হইবার পর এ-প্রসঙ্গে আলোচনাও হয় নাই আর।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সন্ধ্যা বলিল—"কি পড়ছ—"

"কেষ্টদা 'রেড্-উড্' (Red wood) সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিয়েছেন সেইটি পড়ছি।"

"রেড্-উড্--কোথা সেটা?"

"ইউনাইটেড স্টেটে। কালিফোর্নিয়াতে। সিয়ের নেভাডা (Sierra Nevada) পাহাড়ের গায়ে। অদ্ভুত জঙ্গল।"

"কি রকম?"

"সে জঙ্গলের গাছ কত উঁচু জান? দু'শ' তিনশ' ফুট। গাছের গুঁড়ির ডায়ামেটার কুড়ি পঁচিশ ফুট। গাছের গুঁড়িতে যে ছাল আছে, স্পঞ্জের মতো, আগুনে পোড়ে না। ওখানকার জংলী ইণ্ডিয়ানরা প্রতি বছর বনে আগুন লাগায় নীচের ঝোপজঙ্গলগুলো পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে। না পুড়িয়ে ফেললে জঙ্গলে চলাফেরা করে শিকার করা সম্ভব নয় । কিন্তু এ-গাছগুলো পোড়ে না। ফায়ার রেজিসটান্ট (Fire resistant)।"

রঙ্গনাথ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল সহসা।

সন্ধ্যা কেবল বলিল—"খুব আশ্চর্য তো"

ইহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া রঙ্গনাথ বলিল—"কি লিখেছ শুনবে? The gently tapering shafts are almost bare of branches for a hundred feet or more above the ground. The bark is deep purplish red, massively fluted; the

foliage is delicate and feathery. A virgin red-wood forest, with the light filtering through the tree-tops and falling in diagonal beams between the great columns, is one of the most beautiful sights in the world. আমরা যখন যাব তখন এ-জায়গাটা দেখে আসতে হবে বুঝলে। কেষ্টদারও যাবার খুব ইচ্ছে। ওখানে জন্তুজানোয়ারও অদ্ভুত রকম পাওয়া যায় কিনা। কৃষ্ণপুচ্ছ হরিণ, কালো ভালুক, মিংক উইজল্ (Mink weasel), রিং-টেল্ড ক্যাট (Ringtailed cat)। রিং-টেল্ড ক্যাট নাকি অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। অনেকে পোষে। তাছাড়া র‍্যাটল সাপ আছে। কেষ্টদার অনেক খোরাক আছে সেখানে। পাখিও নানারকম। আমার কিন্তু জন্তুজানোয়ারের চেয়ে গাছের সৌন্দর্য বেশী ভাল লাগে। ধীর স্থির বেশ একটা সংযত সৌন্দর্য আছে গাছের মধ্যে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু প্রগল্‌ভ নয়। ভারী সুন্দর লাগে। আমি সব দেশের গাছ দেখে বেড়াতে চাই—আর নিজের যে বাগানটি করতে চাই—"

হঠাৎ সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু আজ ভারী সুন্দর জিনিস দেখেছি একটি—"

"কি"

"সীতিয়ার ছেলে—"

"সে আবার কে"

"সীতিয়া এই গ্রামের মেয়ে। আমার বাল্যসখী। আজ দুপুরে তার বাড়ি গিয়েছিলাম। তার ছেলেটি চমৎকার। ধপধপে ফরসা আব গামুস মোটা—"

"ও, তাই নাকি—"

রঙ্গনাথ সবিস্ময়ে এবং সকৌতুকে সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল সন্ধ্যার দৃষ্টি যদিও দস্তানায় নিবদ্ধ কিন্তু তাহার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটি ফুটি করিতেছে।

।। সাত।।

কৃষ্ণকান্তের কুচকুচে কালো রংএর জন্যে যদিও তেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁহার সুলালিত গোঁফ আছে একজোড়া। কৃষ্ণকান্ত প্রতিদিন শুইতে যাইবার আগে এই গোঁফ-জোড়ার পরিচর্যা করেন। বাঁহাতে একটি হাত-আয়না ধরিয়া ডান হাতের তর্জনী দিয়া হাকিমী একটা তৈল মর্দন করেন গোঁফে। কৃষ্ণকান্তের প্রিয়-বন্ধু দিল্লীর হাকিম বর্কতুল্লা সাহেব বাঘের চর্বি হইতে এই তৈল তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ বাঘের চর্বিতে দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু হাকিম সাহেবের প্রস্তুত-নৈপুণ্যে ইহা সুগন্ধি। সাধারণতঃ ইহা পঁচিশ টাকা তোলায় তিনি বিক্রয় করেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে তিনি ইহা বিনা পয়সায় দিয়াছেন এবং বরাবর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহার কারণ কৃষ্ণকান্ত একবার একটি বড় চর্বিদার বাঘ মারিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। সেই চর্বি হইতে বর্কতুল্লা সাহেব নাকি প্রচুর গুল্ফ-টনিক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্কতুল্লা সাহেবও শিকারী, সুযোগ পাইলে তিনি কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে শিকার করিতে যান।

তৈল প্রসঙ্গে বর্কতুল্লা সাহেব বলিয়াছিলেন—এই তৈল লাগাইলে গুল্ফ তো বীরত্বব্যঞ্জব হইবেই,শরীরে কুবৎ অর্থাৎ শক্তিও বাড়িবে।

কৃষ্ণকান্ত শিক্ষিত লোক। কিন্তু কোন্ শিক্ষিত লোকের কুসংস্কার নাই? তিনি শিকারী মানুষ, অনেক রকম তুকতাকে তাঁহার আস্থা আছে। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি এই তৈল ব্যবহার করিতেছেন। কুবৎ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে কি না বলা শক্ত, কারণ কৃষ্ণকান্ত এমনিতেই বেশ শক্তিশালী সাহসী লোক, কিন্তু গোঁফটির বেশ উন্নতি হইয়াছে। এত কালো এবং মসৃণ হইয়াছে যে গোঁফ আছে কি না বোঝাই যায় না । চামড়ার রঙের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অথচ কাফ্রীদের চুলের মতো কোঁকড়ানো।

কিরণ ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে কৃষ্ণকান্তের গুম্ফ পরিচর্যা দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিল, "বুড়ো বয়সে রোজ রোজ এক ঘণ্টা ধরে গোঁফ নিয়ে সময় কাটাতে লজ্জা করে না তোমার?"

"আমি শাড়িও পরি না, চুড়িও পরি না, লজ্জা করবে কেন—"

"তার মানে?"

"লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ!"

"আহা!"

কিরণ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। এবং হাসিমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

"তেল মেখে গোঁফের যা ছিরি হয়েছে। ঠিক যেন ভেড়ার লোমের মতো।"

"সত্যি? শুনে খুব আনন্দিত হলাম। রাশিচক্রে প্রথম রাশির নাম মেষ। বৈশাখ মাসে সূর্য সেখানে থাকেন। ভেড়া খুব তেজী জানোয়ার। ভেড়ার লোমের মতো যদি হয়ে থাকে তাহলে বর্কতুল্লার কথা ফলেছে বলতে হবে। সে বলেছিল কুবৎ হবে। এটা ভালো টনিক।"

"কুবৎ কি—"

"শক্তি, তেজ—"

"এমনিতেই তোমার যা কুবৎ তাতেই তো রক্ষে নেই। বেশী কুবৎ নিয়ে কি হবে বুড়ো বয়সে—"

"বুড়ো বয়সেই তো এসব দরকার। ভিতরে শক্তি যখন কমতে থাকে তখনই বাইরের শক্তি দরকার। তুমি তোমার চুলের গোড়ায় মেখে দেখতে পার।"

"রক্ষে কর।"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর কিরণ অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হইল।

"কালও তুমি বন্দুক নিয়ে বেরুবে নাকি—"

"বিছুয়ার জঙ্গলে অনেক তিতির আছে শুনেছি। সেখানেই যাব—"

"তিতির তো অনেক মেরেছ। সারাজীবন তো ওই নিয়ে আছ। এখানে অসুখের বাড়িতে এসেছ, এখানে রোজ রোজ জীবহত্যা নাই করলে—"

"জীবহত্যা তো কম হচ্ছে না। কুমার রোজ মাছ-মাংসের যে রকম আয়োজন করছে তাতে তো মনে হয় না যে বাবার অসুখের জন্য জীবহত্যা বন্ধ আছে। বাবা তিতিরের মাংস খুব ভালোবাসেন। যদি মারতে পারি তাঁকে স্ট্যু করে দিও। তিনি খুব খুশী হবেন। তোমাদের মতো জীবহত্যা-কমপ্লেক্স তাঁর নেই।"

"বাবা তিতিরের মাংস ভালোবাসেন বলেই বিছুয়ার জঙ্গলে ছুটছ নাকি!"

কৃষ্ণকান্ত হাসিমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন।

"এইবার আমাকে কোণঠাসা করেছ। সত্যি কথা যদি বলতে হয়—আর তোমার কাছে কখনও তো মিথ্যা কথা বলিনি—তাহলে বলতে হয় যে, না, সেজন্যে যাচ্ছি না। যাচ্ছি নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। রামপ্রসাদ বিছুয়ার জঙ্গলে যে তিতিরের বর্ণনা দিলে তাতে মনে হল সেগুলো কালো তিতির। কিন্তু কালো তিতির তো মণিপুরের জঙ্গলে শিকার করেছি। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের কাছাকাছিও পেয়েছিলাম একবার। কিন্তু এখানেও কালো তিতির পাওয়া যায় শুনে আশ্চর্য লাগল। তাই দেখতে যাচ্ছি। স্রেফ কৌতূহল। যদি মারতে পারি স্ট্যু খাওয়া যাবে। সাইজে অনেকটা মুরগীর মতো, খেতে মুরগীর চেয়েও ভালো।"

"তুমি ঘনটুকে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছ?"

"চিঠি লিখলেই কি সে আসবে? মিলিটারিতে ছুটি পাওয়া শক্ত।"

"তবু তুমি লিখেই দেখ না।"

"খবর তো পেয়েছে সে। ছুটি পেলে আসবে নিশ্চয়।"

"না, তবু তুমি আর একটা চিঠি লেখ কাল।"

কিরণের কণ্ঠে আবদারের সুর ধ্বনিত হইল।

কৃষ্ণকান্ত গোঁফে তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—"কাল ভোরেই তো বেরিয়ে যাব। রামপ্রসাদের সঙ্গে। ফিরে এসে আর লেখবার সময় থাকবে না। পরশু লিখব—"

"গরুর গাড়িতে যাবে?"

"না। মাত্র চার ক্রোশ তো, হেঁটেই চলে যাব।"

"কাল মেজদা আসছেন, তুমি চলে যাবে?"

"মেজদার ভয়েই তো আরও পালাচ্ছি। তাঁকে বাঘের চামড়া দেবার কথা ছিল। এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। দেখা হলেই চেপে ধরবেন। যতক্ষণ এড়িয়ে থাকা যায়—"

"মেজদার সঙ্গে দেখা হবার পর তিনেট বাঘ তো মেরেছ, চামড়াগুলো কি করলে—"

"সব দান করে দিয়েছি, কাঁচাই দিয়েছি। কিন্তু মেজদাকে তো কাঁচা দেওয়া যাবে না, ট্যান করিয়ে দিতে হবে। খরচের ব্যাপার। কিন্তু দেব যখন বলেছি দেবই, একটা বড় বাঘের খবর পেয়েছিও। এবার ফিরে গিয়ে থলিতে পুরব সেটাকে।"

একটা লম্বা হাই তুলিয়া কিরণ বলিল—"আলো নিবিয়ে দাও, ঘুম পাচ্ছে—"

কিরণ শুইয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিল একটা বিকট শব্দ শুনিয়া। 'বুবো বুবো—', এই ধরনের শব্দটা।

"ওটা কিসের ডাক বল তো"

"প্যাঁচার মনে হচ্ছে। কালপ্যাঁচা"

"ও বাবা, মহা অলুক্ষণে পাখি। তাড়াও ওটাকে।"

কৃষ্ণকান্ত বন্দুকটি লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটু পরেই দুম দুম করিয়া শব্দ শোনা গেল। কিরণ হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। কেন বা কাহাকে তাহা বোঝা গেল না ঠিক।

একটু পরেই কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"প্রকাণ্ড প্যাঁচা। মরল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। ওই দূরে যে বাগানটা আছে সেইখানেই

ওদের আড্ডা বোধ হয়। গঙ্গার ধারে উঁচু পাথরটায় বসেছিল। প্যাঁচা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম।"

"কি"

"গগন আর মিস বোস গঙ্গার ধারে বসে কথা কইছে। মনে হল মিস বোস রোরুদ্যমান। গগন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বন্দুকের আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠে পড়ল।"

কিরণ অবাক হইয়া গেল।

তাহার পর বলিল, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনে যে কি আছে ওরাই জানে!"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "সব সময় খারাপ দিকটাই ভাব কেন। গগন ভালো ছেলে। ওর সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনা নেই। মিস বোসের কথা বলত পারি না। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"

"তোমরা যে কি তা আর জানতে বাকী নেই—"

কৃষ্ণকান্ত এ-কথার কোন জবাব দিলেন না, নিবিষ্টচিত্তে আরও কয়েক মিনিট গোঁফে চর্বি ঘষিলেন। তাহার পর আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

।। আট।।

স্বাতী ও সোমনাথের শুইবার জন্য যে-ঘর কুমার ঠিক করিয়াছিল তাহা পুরসুন্দরীদের ঘরের কাছেই। প্রায় সামনা সামনি। মাঝে কেবল একটা ছোট বারান্দা। পুরসুন্দরীর ঘরের খোলা দরজা দিয়া স্বাতীর ঘরের দরজা দেখা যায়। পুরসুন্দরীর ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। পুরসুন্দরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বিরুবাবু ঘুমান নাই, মাথার শিয়রে আলো জ্বালিয়া তিনি তখনও Conquest of Mexico and Peru পড়িতেছেন। এই নিতান্ত নিরীহ ব্যাপারটি যে স্বাতী-সোমনাথের ঘরে এক নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সোমনাথ ঘরে আসিয়াই কপাটে খিল দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু স্বাতী দিতে দেয় নাই।

"এখন কপাট বন্ধ কোরো না।"

"কেন?"

"আমার বড্ড গরম লাগছে।"

আসল কথাটি স্বাতী সহজে প্রকাশ করে না।

"গরম? বাইরে রীতিমত ঠাণ্ডা"

"ঠাণ্ডা হলে দাদা বৌদিকে নিয়ে বাইরে বসে আছে কি করে।"

"তোমার দাদা একটি পাগল। অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ি চল, ঘুম পাচ্ছে—"

"ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমোও না, কপাটটা খোলা থাক"

"কপাট খোলা থাকবে! তুমি শোবে না?"

"আমি এখন শুই কি করে। বাবার ঘরের কপাট খোলা রয়েছে দেখছ না? বাবার ঘরের কপাট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি কপাট বন্ধ করতে পারব না। তোমরা বেহায়া হতে পার কিন্তু আমাদের তো লজ্জাশরম আছে—"

কথাগুলি বলিয়া স্বাতী স্বামীর দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। সে-হাসির আভা তাহার চোখে-মুখে যে-শোভার সৃষ্টি করিল তাহা অবর্ণনীয়।

স্বাতীর কথাগুলির সহিত এই হাসিটুকু না থাকিলে তদ্দণ্ডেই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হইয়া যাইত। স্বাতীর হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া সোমনাথ গলিয়া গেল—

"বেহায়া নয় লোভী। সুতবাং চক্ষুলজ্জা নেই, কপাট বন্ধ করে দিচ্ছি—"

উঠিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

"ছি, ছি, কি করছ, বাবা কি মনে কববেন"

খট্‌ করিয়া ছিটকিনি যথাস্থানে বসিয়া গেল।

হঠাৎ স্বাতী লীলাভবে মাথা দোলাইয়া আরও সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া যাহা বলিল তাহা অপ্রত্যাশিত।

"সেই কথাটি মনে আছে তো।"

"কি কথা"

"আমাকে নতুন প্যাটার্নেব চুড়ি গড়িয়ে দেবে বলেছিলে। ফিরে গিয়েই দিতে হবে কিন্তু।"

সোমনাথ স্বাতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

।। নয় ।।

চিত্রা-সুব্রতর শুইবার স্থান হইয়াছিল একটি তাঁবুতে। তাঁবুটি ভালো। সঙ্গে বাথরুমের ব্যবস্থাও আছে। সুব্রত মিলিটারি পোশাকে আসিয়াছিল, এখন শুইবার পোশাক লুঙ্গি পরিতেছে। চিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিয়া সে বলিল, "খাওয়াদাওয়ার যে রকম বহর দেখছি তাতে মনে হচ্ছে সাতদিনেই ভুঁড়ি হয়ে যাবে।"

সুব্রত সাতদিনের ছুটি লইয়াছিল।

চিত্রা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "তুমি যা খেয়েছ তা আমি দেখেছি। কিছুই তো খাও নি।"

"এসব মসলা-দেওয়া 'রিচ্‌' খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস তো নেই। জানো তো, স্ট্যু, রোস্ট, টোস্ট, স্যালাড্‌ এইসব খেলেই ভালো থাকি"

"বল তো এখানেও সে-সব ব্যবস্থা হতে পারে। ছোট কাকার কানে একবার তুলে দিলেই হল"

"না দরকার নেই"

সুব্রতর অভ্যাসটা অবশ্য দেড় বছরের, চাকরি হওয়ার পর হইতে সে সাহেবীখানা শুরু করিয়াছে। তাহার পূর্বে সে কলিকাতার মেস-হস্টেলের মসলা-দেওয়া রান্নায় এবং তৎপূর্বে

বীরভূমের খেঁড়ো-পোস্ত বড়িচচ্চড়ি কলাইয়ের ডালে অভ্যস্ত ছিল। অফিসার হইবার পর হইতেই তাহার বাঙালী খাওয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে। সুব্রতর বাড়ি বীরভূমের এক পল্লীগ্রামে। পিতা পৌরোহিত্য করেন, কিছু জমিজমাও আছে। সে লেখাপড়ায় ভালো ছেলে ছিল, প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া চাকরিটি পাইয়াছে। তাহার স্বভাবও বেশ ভালো, কিন্তু সে যে একজন বড় অফিসার, একথা সে ভুলিতে পারে না। ভাষায় প্রকাশ না করিলেও ভাবে-ভঙ্গীতে সেটা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

বিছানায় উপবেশন করিয়া সে একবার আড়মুড়ি ভাঙিল। তাহার পর বলিল, "তোমার ছোট দাদু আমাকে একটু মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন"

"কি মুশকিল—"

"তাঁর এক ননম্যাট্রিক ছেলের জন্য একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে বলছেন। কি কাণ্ড!"—বলিয়া সে বিলাতী কায়দায় 'শ্রাগ' করিল।

"এতে আর মুশকিল কি। সে যদি চাকরির যোগ্য হয় আর তুমি যদি করে দিতে পার, দাও করে।"

"তাকে কনেস্টবল করে নেওয়া যেত, কিন্তু তার 'হাইট' বড্ড কম শুনছি। পুলিসে বেঁটে লোকের চাকরি হওয়া শক্ত।"

"তবে সেই কথা বলে দাও ছোট দাদুকে।"

"তোমার ছোট দাদুর মুখের উপর রূঢ় সত্যটা বলি কি করে।"

"আচ্ছা, আমি বলে দেব তুমি যদি না পার।"

"না, না, এখন কিছু বোলো না। চেষ্টা করব ওকে যদি সি. আই. ডি -তে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

"না। আমাদের বংশের ছেলেরা স্পাই হবে না।"

চিত্রার চোখে-মুখে সহসা যেন আগুন ধরিয়া গেলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিবিয়া গেল সেটা। সে হাসিয়া বলিল, "আমার সব চেয়ে কি ভালো লাগছে জান? আমি আমার আঁকবার সরঞ্জামগুলো নিয়ে এসেছি। দাদুর একটি পোর্ট্রেট আঁকব"।

"দাদু কি সিটিং দিতে পারবেন?"

"বালিশে ঠেস দিয়ে যদি বসতে পারেন ভালোই, তা না হলে শোয়া অবস্থাতেই আঁকব"।

বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সুব্রত দাঁড়াইয়া উঠিল।

"এত রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ কেন। আমার রিভলভারটা বার কের দাও তো স্যুট্‌কেস থেকে। বেরিয়ে দেখি। এরকম নদীর ধারে ডাকাতি প্রায়ই হয়।"

চিত্রা চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল স্বামীর মুখের দিকে।

"ডাকাতি! আমাদের বাড়িতে কখনও ডাকাতি হয় নি। হবেও না।"

"তবু একবার বেরিয়ে দেখা উচিত।"

"তুমি একা যেও না, আমিও যাব।"

"আমি এখুনি আসছি, তুমি আবার বেরুবে কেন?"

চিত্রা কোন উত্তর দিল না, রিভলভারটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

"পাগল না কি তুমি!"

সুব্রত টর্চটা লইয়া তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইয়া তাহারা গগনকে দেখিতে পাইল। গগন বলিল, "বড় পিসেমশাই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন। একট প্যাঁচা ডাকছিল, সেইটে তাড়ালেন বোধহয়। তুমি এসে পড়েছ ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা। চল তোমার ঘরেই যাই।"

তিনজনে গিয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল।

।। দশ ।।

রাধানাথ গোপ চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র। বাল্যকালে মাইনর স্কুলে তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন সম্পন্ন গৃহস্থ, বেশ ধনী লোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জাতে বিহারী গোয়ালা। সে-যুগে বাঙালীরা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশে সর্ববিভাগেই নেতৃত্ব করিতেন। বহু বাঙালী শিক্ষকের বহু অবাঙালী ছাত্র ছিল এবং তাহারা পরস্পর যে-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত তাহা প্রেমের বন্ধন। বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাদের অন্তরের আদান-প্রদান চলিত। তখন শিক্ষক সত্যই ছাত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ছাত্ররা গুরুকে সত্যই ভক্তি করিত। রাজনীতির বিষ তখন এমনভাবে ছড়ায় নাই। বাঙালী-বিহারী 'ফিলিং' তখন ছিল না। সে যুগের এই মাধুর্যেব স্মৃতি সে-যুগেব অনেক লোকেব মনে এখনও জাগরূক আছে। রাধানাথ গোপেরও আছে। তিনি তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক চন্দ্রসুন্দরকে ভুলিতে পারেন নাই। ভুলিতে পারেন নাই যে চন্দ্রসুন্দর শুধু যে তাহাদের ভালো পড়াইতেন তাহা নয়, তাঁহাদের দাঁত, কান, নাক, চোখের কোণ, আঙুলের নখ পরিষ্কার আছে কি না দেখিতেন, চুল সামান্য এলেমেলো থাকিলেও স্বহস্তে তাহা ঠিক করিয়া দিতেন। জামাকাপড় পরিষ্কার আছে কি না, জামার বোতামগুলি বিশেষতঃ গলার ও বুকের বোতাম ঠিক আছে কি না তাহার তদারক করিতেন। ভালো ছেলেদের বেশী 'টাসক্' (task) দিয়া বাড়িতে সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন। এজন্য তাঁহাকে প্রত্যহ অনেক রাত পর্যন্ত জাগিতে হইত। দুরূহ ইংরেজী উচ্চারণগুলি যাহাতে ঠিকমতো তাদের মুখে দিয়া বাহির হয় এজন্য কি চেষ্টাই না করিতেন। ইংরেজি 'z' উচ্চারণটা লইয়া বেশি গোল হইত। কিংবা যেখানে 's'-এর উচ্চারণ 'z'-এর মতো—যেমন is বা was-এর ক্ষেত্রে—সেখানেও গোলমাল হইত। সাধারণতঃ ছেলেরা 'জ'-এর উচ্চারণ করিয়া 'ইজ্' বা 'ওয়াজ' বলিত। ইহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত চন্দ্রসুন্দর অনেক পরিশ্রম করিতেন। এসব কথা রাধানাথ গোপ ভোলেন নাই। এইসব কারণে চন্দ্রসুন্দরের প্রতি তাঁহার ভক্তি আজও অচল আছে। আর একটা কারণও ছিল। চন্দ্রসুন্দরের গোঁড়ামির জন্যও তিনি তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। তিনি যে অনাচারের স্রোতে ভাসিয়া যান নাই, পাহাড়ের মতো দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাতে রাধানাথ গোপের ভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যে পরিবারে সকলেই মাছ-মাংস পেঁয়াজের ভক্ত সেই পরিবারে চন্দ্রসুন্দরের মতো লোকের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর মনে হয় তাঁহার কাছে। অথচ ওই রাধাকান্ত গোপ সূর্যসুন্দরকে কম ভক্তি করে, না। সূর্যসুন্দরের কোনরকম গোঁড়ামি নাই, কোনওরকম অযৌক্তিক গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করেন না—ইহাও

রাধানাথকে সমান মুগ্ধ করিয়াছে। সূর্যসুন্দরের বিরাট ব্যক্তিত্ব. সহৃদয়তা, বিশেষ করিয়া টাকা-কড়ি বিষয়-আশয় সম্বন্ধে তাঁহার বৈরাগ্যই রাধানাথের ভক্তি বেশী করিয়া উদ্রিক্ত করিয়াছে। তাঁহার মতো নিস্পৃহ সাধুলোক রাধানাথ আর দেখে নাই। এ-অঞ্চলের তিন-তিনটি বড় জমিদার সূর্যসুন্দরকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। ইচ্ছা করিলে এ-অঞ্চলে নামমাত্র খাজনা দিয়া দুই তিন হাজার বিঘা জমি সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব হইত না। কিন্তু সেদিকে তাঁহার কিছু মাত্র লোভ ছিল না। এ-বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলিতেন, এত জমি লইয়া আমি কি করিব! তাঁহার দুই-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জমিদারদের ম্যানেজার বা নায়েব ছিলেন। তাঁহারা একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে কিছু জমি করিয়া দিয়াছিলেন। গছাইয়া দিয়েছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া আর একট জিনিসও রাধানাথকে বরাবর বিস্মিত করিয়াছে। পূর্বে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে দুই বেলা পাতা পড়িত কত। আত্মীয়-অনাত্মীয় বাঙালী-বিহারী-মুসলমান-খৃষ্টান পাঞ্জাবী-মারোয়াড়ি সকলের কাছেই তাঁহার গৃহ বরাবর অবারিত দ্বার। গঙ্গাস্নানের যোগ লাগিলে তাঁহার বাড়িতে মেলা বসিয়া যাইত। নিকটবর্তী শহর ও গ্রাম হইতে কত লোক আসিত তাহার ঠিক নাই। আর সকলেই অসংকোচে আসিত। এ যেন তাহাদের বাড়ি। আগে রোজই তাঁহার বাড়িতে সন্ধ্যায় গানবাজনার আড্ডা বসিত, কত কাপ চা যে বিতরিত হইত তাহার ঠিক নাই। সূর্যসুন্দরের একটা প্রধান গুণ ছিল তিনি অতি সহজে সকলের অন্তরঙ্গ হইয়া যাইতে পারেন। তিনি শুধু যে চিকিৎসক ছিলেন তাহা নয় বহু পরিবারের হিতৈষী বন্ধুও ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার ছেলেটির রেলে চাকরি হইয়াছে। তাঁহাদের যে জামাই এখন ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে ভালো কলেজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য সূর্যসুন্দর কত চেষ্টাই না করিয়া ছিলেন। নিজের খরচ করিয়া পাটনা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের অনেক গুণ। তাঁহার বিবিধ গুণ এত বিচিত্র ও অধিক যে তিনি মাছ মাংস খান কি না এ-প্রশ্ন অবান্তর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূর্যসুন্দরের পরিবারে চন্দ্রসুন্দর ব্যতিক্রম বলিয়াই তাঁহাকে বেশী ভালো লাগে রাধানাথ গোপের।

সব কাজ শেষ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রসুন্দরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে, কপাটের ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। তিনি বদ্ধদ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গলা খাঁকারি দিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "মাস্টারমশাই জেগে আছেন কি—"

"কে—"

"আমি রাধানাথ। ভিতরে আসতে পারি?"

"এস"

কপাট ঠেলিয়া ভেতরে ঢুকিয়া রাধানাথ দেখিলেন, চন্দ্রসুন্দর পত্র লিখিতেছেন।

"ও, তুমি! এত রাত্রে কি মনে করে—"

সেই ছাত্রজীবনে রাধানাথ শিক্ষক চন্দ্রসুন্দরের সম্মুখে যেমন ভাবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতেন তেমনি ভাবে দাঁড়াইলেন।

"সমস্ত দিন নানাকাজে ব্যস্ত ছিলাম। ভালো করে আপনার খবর নিতে পারি নি। আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো, বাড়িতে ভিড় হয়েছে, আবও হবে। যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে বলবেন। এত রাত্রে লেখাপড়া করছিলেন নাকি?"

"চিঠি লিখছিলাম আমার ছেলেকে। সে বেকার বসে আছে। তাকে এখানে আসতে লিখলাম। দাদার জামাইরা সব পদস্থ, যদি কেউ কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারে"

"হ্যাঁ, লিখে দিন। আমাদের জামাইও এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। তার দ্বারা যদি কিছু হয় সে নিশ্চয় করে দেবে। সে লেখাপড়া শিখেছে কতদূর—"

"ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি"

রাধানাথ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"আপনার ছেলে ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি? এ তো বড় আশ্চর্য!"

"আমার দুর্ভাগ্য। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্"

চন্দ্রসুন্দর দুই হাত দিয়া নিজের ডান পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে টিপিতে টিপিতে রাধানাথের দিকে হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন।

"চেষ্টার কোনও ত্রুটি করি নি বাবা। কিন্তু আমরা চেষ্টাই করতে পারি, ফলাফল ভগবানের হাতে। গীতায় স্বয়ং ভগবান এই কথা বলে গেছেন। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

রাধানাথ গোপ বিছানার একধারে সসংকোচে উপবেশন করলেন।

"দেখ, তোমরা পাঁচজনে চেষ্টা করে যদি কিছু করে দিতে পার। আমাদের নাতজামাই এস. পি.। তাকেও বলেছি। সে বললে 'হাইট' ভালো হলে কনেস্টবল হতে পারত। তার থেকে উন্নতি হওয়াও সম্ভব। কিন্তু আমাব ছেলে বেঁটে। সবই অদৃষ্ট, বুঝলে!"

চন্দ্রসুন্দর হাসিমুখে গোছের মাংসল অংশটা টিপিতে লাগিলেন।

"পা কামড়াচ্ছে নাকি মাস্টার মশাই—"

"হ্যাঁ, বেতো শরীর তো! বাত আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। বাবারও ছিল শুনেছি। শোবার সময় পা টেপানোটা আমার অনেকদিনেব অভ্যাস। দাদারও অভ্যস ছিল আগে, সন্তোষ দাদাব পা টিপত। ওখানে আমার একটা ছোঁড়া চাকর আছে সেই টিপে দেয়। কিন্তু এখানে ভিড়ের বাড়িতে কারো হাতেব অবসর নেই, কাকে বলি—

"আমি দিচ্ছি। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি যখন স্কুলে পড়তুম, কতবার আপনার পা টিপে দিয়েছি মনে নেই? আমি আপনার সেই রাধানাথই আছি"

"তুমি আর সে রাধানাথ নেই বাবা। তুমি এখন বড় হয়েছ। যখন ছোট ছিলে তখন তুমি আমার রাধানাথ ছিলে"

চন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠস্বর সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল।

"আমি এখনও আপনার সেই রাধানাথই আছি মাস্টার মশাই। শুয়ে পড়ুন, পা-টা বাড়িয়ে দিন"

চন্দ্রসুন্দর একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে পা- টা বাড়াইয়া দিলেন। রাধানাথ তাঁহার পা টিপিতে লাগিলেন।

।। এগারো।।

কুমার নিজের ঘরে বসিয়া সূর্যসুন্দরের ডায়েরি পড়িতেছিল।

"আমার ভাই চন্দ্রের বয়স যখন মাস ছয়েক তখন দিদিমা মামাকে একদিন বলিলেন, 'বাবা

তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছিলাম ভালয় ভালয় ছ'মাস কেটে গেলে চন্দরকে নিয়ে ওর মা বাবার কাছে পুজো দিয়ে আসবে। ওখানেই বাবার ভোগের প্রসাদ মুখে দিয়েই ওর অন্নপ্রাশনও হবে।' এই প্রস্তাবে মামা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। কারণ তারকেশ্বরে যাওয়া মানেই খরচ। সঙ্গে একজন লোকও চাই। মামা বলিলেন, 'বাবা তারকেশ্বরকে স্মরণ করে এইখানকার শিবমন্দিরেই পুজো দিয়ে দাও। শিব তো সর্বত্রই এক।' দিদিমা চটিয়া গেলেন। বলিলেন, 'তোর মতো অত তত্ত্বজ্ঞান আমার হয় নি। আমি বাবা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছি, সেইখানেই যেতে হবে ওদের। তোর টাকার অভাব থাকে, আমিই খরচ দিয়ে দেব। আমার কাছে টাকা আছে। আমিই ওদের খরচ দেব। কার্তিকেরও একটা মানত আছে, সেই নিয়ে যাবে ওদের। সূয্যিও যাবে। তুই তারাপদকে ডেকে একটা ভাল দিন দেখতে বল।' দিদিমা খুব রাশভারী লোক ছিলেন, মামা তাঁহাকে ভয় করিতেন। তিনি আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। কার্তিক ছিলেন মামার নুনের গোলার একজন গোমস্তা এবং তারাপদ ছিলেন বাড়ির পুরোহিত। আমরা দুজনকেই মামা বলিতাম। আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। মামীমাও ইহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, মামীমার অসন্তুষ্ট ভাবটা তাঁহার চোখে মুখে নীরবে পরিস্ফুট হইয়া রহিল। আমার সহিত বা মায়ের সহিত যখন কথা কহিতেন তখন কথাবার্তায় একটা ঝাঁজও লক্ষ্য করিতাম। ইহার কারণ তখন বুঝিতে পারি নাই, বড় হইয়া অনেক পরে বুঝিয়াছি। যাহারা আশ্রিত তাহারা আশ্রয়দাতার বাড়িতে অন্ন বস্ত্র এবং থাকিবার স্থান একটা পায় কিন্তু সম্মান কখনও পায় না। যে-কন্যার স্বামী নিজে উপার্জন করিয়া নিজের সংসাব স্থাপন করিতে অসমর্থ পিতৃগৃহেও সে-কন্যার সম্মানের আসন থাকে না। বাল্যেই কন্যা পিতৃগৃহে আদৃত, যৌবনে তাহার সম্মানের স্থান পতিগৃহে। মা-বাবা বাঁচিয়া থাকিলেও পতিগৃহবঞ্চিতা কন্যাকে লইয়া পুত্র এবং পুত্রবধূদের সহিত তাহাদের মনোমালিন্য ঘটে। ইহাই নিয়ম। আমাদের ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মামীমা আমাদের সুনজরে দেখিতেন না। আমরা, যে তাঁহার সংসারে গলগ্রহ একথা তিনি আমাদের ভাব-ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিতেন। কেবল দিদিমার ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। মামা কিন্তু আমার মাকে এবং আমাকে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি মামীমাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। মামীমা যে আমাদের উপর বিরূপ একথা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল, ইহা বিশ্বাস হয় না কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করিতেন না বলিয়া সন্দেহ হয় যে, তিনিও মামীমাকে ভয় করিতেন, মামীমারও একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। তা ছাড়া পারিবারিক অশান্তি কেহ চায় না, তাহা এড়াইবার জন্য অনেকে অন্যায়ও সহ্য করিয়া যান। মামা বোধহয় তাহাই করিতেন। তিনি দোটানায় পড়িয়াছিলেন। একদিকে মা-বোন আর একদিকে স্ত্রী। কাহাকেও চটাইবার সাহস তাঁহার ছিল না। তাই তিনি আমাদের সম্বন্ধে যতটা সম্ভব নীরব থাকাই নিরাপদ মনে করিতেন। আমাদের সম্বন্ধে দিদিমা যাহা স্থির কিরিয়া দিতেন তাহাই হইত। সুতরাং আমাদের তারকেশ্বর যাওয়ার ব্যবস্থা অনড় রহিল। একটা শুভদিন দেখিয়া কার্তিক মামার সহিত আমরা তারকেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কার্তিক মামা দুই দিনের জন্যে একটা ছোট বাসাও ভাড়া করিলেন। সেকালেও দৈনিক ভাড়া দিয়া ঘর পাওয়া যাইত। আমরা যে-ঘরটি লইয়াছিলাম তাহার দৈনিক ভাড়া ছিল চার আনা। আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন অপরাহ্ণ। কার্তিক মামা পাণ্ডার সহিত দেখা করিয়া আসিয়া বলিলেন, আজ পূজা হইবে না, এখানে রাত্রিবাস করিতে

হইবে। সকালে তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমরা সেই ভাড়া করা ঘরে রাত্রি কাটাইলাম। আমার ঘুম আসিতেছিল না। কার্তিক মামা ফড়িং-সন্ন্যাসীর এক অদ্ভুত গল্প বলিতে লাগিলেন। এক সন্ন্যাসী দিনের বেলায় রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইত, নদীতে স্নান করিত, দেবালয়ে পূজা দিত, কিন্তু সন্ধ্যা হইবামাত্র সে ফড়িংয়ে রূপান্তরিত হইয়া ঝিঁঝির দলে যোগ দিয়া তাহাদের ঐকতানে গলা মিলাইয়া গান গাহিত। এই গল্প শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে মা মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। চন্দ্র মন্দিরের চত্বরে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্র ছেলেবেলায় অতিশয় সুদর্শন ছিল। মন্দিরের অনেকেই তাহার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ একটি দাড়ি-ওলা দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসীর মতো লোক চন্দ্রকে টপ করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কারণ তখন ছেলেধরার ভয় খুব ছিল। আমার চীৎকারে লোক জড় হইয়া গেল, কার্তিক মামা ছুটিয়া আসিলেন। লোকটি কিন্তু ভয় পাইল না, চন্দ্রকে কোলে করিয়া নির্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কার্তিক মামা হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "ওকে দিন, ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাব।"

লোকটি প্রশ্ন করিল, "এটি কার ছেলে?"—তাহার পর আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ওই ছেলেটির ভাই কি?"

"হ্যাঁ, কেন?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"কাতির্কবাবু আমায় চিনতে পারছেন না, বোধহয় দাড়ি রেখেছি বলে। আমি কিন্তু আপনাকে আর সূয্যিকে চিনেছি—"

"আরে, জামাইবাবু না কি!"

কার্তিক মামা স-সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "প্রণাম কর, প্রণাম কর, তোর বাবা, চিনতে পারিস নি?"

প্রণাম করিলাম। সত্যিই আমি বাবাকে চিনিতে পারি নাই।

কাতির্ক মামা বলিলেন, "বাবা তারকেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। হরিপালে আমার শ্বশুরবাড়ি। ভাবছিলুম বাবা যদি কোন বিশ্বাসী লোকের দেখা পাইয়ে দেন তাহলে তাব সঙ্গে এদের সাহেবগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়ে আমি হরিপাল চলে যাব। তাদের প্রসাদটা দিয়ে আসব। আপনি স্বয়ং যখন এসে গেছেন তখন আপনার ভার আপনিই নিন। আমি চট করে আমার ছেলেমেয়েদের দেখে আসি। অনেকদিন দেখি নি। দিন দুই পরেই আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করছি। উঃ, হঠাৎ আপনার দেখা পেয়ে কি যে আনন্দ হচ্ছে আর কি বলব—"

কার্তিক মামা ইহার পর যাহা করিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। তিনি বগল বাজাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই লঘু দিকটা আগে কখনও দেখি নাই। বেশ মজা লাগিল। আমি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম।

বাবার সঙ্গেই আমরা সাহেবগঞ্জে আসিলাম।

দিদিমা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। চাঁদ হাতে পাওয়ার আনন্দটা কিন্তু প্রকাশ পাইল অশ্রুরূপে। তিনি ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন। বাবার দুই হাত ধরিয়া তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি বাবা আর যেও না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি। সূর্য-চন্দ্রকে দেখতে পাই না।

বারাহী সমস্ত দিন সংসার নিয়ে থাকে। বউমাও আসন্ন-প্রসবা। কিছুদিন পরে ও নিজের সামগ্রীটি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সূর্য-চন্দ্রকে তখন দেখবে কে। তুমি এখানে থাক বাবা, তুমি ভার না নিলে তোমার ছেলের ভার কে নেবে বল।'' বাবা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন, ''কিন্তু বিয়ের আগে আমার সঙ্গে একথা তো হয় নি। আমি এসব ব্যাপারে অসমর্থ বলে বিয়েই করতে চাই নি। কিন্তু আপনি যখন বললেন সব দায়িত্ব আপনারাই নেবেন তখন আমি রাজী হলাম। এখন আবার অন্য কথা বলছেন কেন?''

আমি কাছেই ছিলাম। দেখিলাম বাবার চক্ষু দুইটি হাসিতেছে। দিদিমা উত্তর দিলেন, ''আমি যদি অন্ধ হয়ে না যেতাম তাহলে তোমাকে এ-অনুরোধ করতাম না। বারাহীর ভার তো আমরা নিয়েইছি, সে ভার আমরা বইবও, কিন্তু কেউ দেখাশোনা না করলে অমন সোনারচাঁদ ছেলে দুটি নষ্ট হয়ে যাবে।''

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ''আমি সারাজীবন পথেঘাটে তীর্থে ধর্মশালায় কাটিয়েছি, গানবাজনার আখড়ায় ঘুরেছি, ছোট ছেলে মানুষ করবার শিক্ষা তো আমার নেই।''

দিদিমা বলিলেন, ''সে-শিক্ষা কোন বাপ-মায়েরই নেই। কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে থাকলে বাবা-মাকে দেখলেই ছেলেরা যে-শিক্ষা পায় তাই তো বাবা আসল শিক্ষা। তোমার ছেলেরা যদি সব সময় দেখতে পায় তোমাকে, তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শেখে তাহলে তোমাকে আদর্শ করেই বড় হবে তারা। তোমার মতো সাধু লোকের সংস্পর্শে থাকাই তো পরম ভাগ্যের কথা। এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি হতে পারে। তুমি ওদের জন্মদাতা। এ-পুণ্য থেকে ওদের বঞ্চিত কোরো না। তুমি ওদের ছেড়ে যেও না বাবা।''

''কিন্তু আমার তো বাঁধা-ধরা কোন রোজগার নেই। শ্বশুরবাড়ির অন্ন খেয়ে আমি থাকতে পারব না।''

দিদিমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ''তোমার চলে কি করে?''

''আমার কিছু শিষ্য আছে। অনেককে গানবাজনা শিখিয়েছি। তাদের নিমন্ত্রণে তাদের কাছে মাঝে মাঝে যাই। তা না হলে কোনও তীর্থে চলে যাই। মন্দিরে বা ধর্মশালায় থাকি আর মায়ের নাম কীর্তন করি। এখানেও থাকতে পারি যদি আমার আলাদা থাকার একটা ব্যবস্থা হয়। আমি স্বপাক খাই, কিংবা মায়ের প্রসাদ খাই। এখানে কোনও মন্দির আছে?''

''কালী-মন্দির আছে একটা।''

''ও-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেবারে যখন এসেছিলাম মন্দিরে পুজো দিতে যেতুম। সে তো বেশ ভালো বড় মন্দির। রোজ বলি হয়।''

''মন্দিরের মালিক অযোধ্যানাথ আমার ছেলেকে খুব খাতির করে। ও তাদের বাড়ির ডাক্তার। তোমার মতো লোককে পেলে বর্তে যাবে ওরা। গানবাজনারও শখ আছে, প্রায়ই কীর্তন হয়।''

''কিন্তু মন্দিরে দিনরাত পড়ে থাকলে ছেলেদের দেখাশোনা করব কি করে। এখানে যদি থাকতেই হয় এ-বাড়ির কাছাকাছি কোনও একটা আস্তানা করতে হবে।''

বাবার কথাবার্তায় দিদিমা আশার সুর শুনিলেন। বলিলেন, ''সব হয়ে যাবে বাবা। তুমি মতিস্থির কর, কিচ্ছু আটকাবে না।''

"দেখি ভেবে"

বাবা উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেলেন। আমিও আস্তে আস্তে উঠিয়া তাঁহার পিছুপিছু গেলাম। বাবা সম্ভবতঃ বাগচী মহাশয়ের বাড়ির দিকে যাইতেছিলেন, কারণ সেতারী বাগচী মহাশয়ই সাহেবগঞ্জে তাঁহার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। আমাদের বাড়ি হইতে বাগচী মহাশয়ের বাড়ি যাইতে হইলে একটি সরু গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। বাবা সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গলিটি তখন নির্জন ছিল। আমি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলাম। ছুটিয়া গিয়া বাবার হাঁটু দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-সজল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "বাবা তুমি যেও না। এখানেই থাক।" আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিয়াছিল। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আমার মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকাইয়া আবার আমাকে নামাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন—"আচ্ছা।" আর কিছু বলিলেন না। আমি তাঁহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। একটু পরে ঘাড় ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ি যাও।" বাবার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। মিথ্যা স্তোকও দিতেন না। যতদূর মনে পড়ে আমার মতো ছোট ছেলেকে ভুলাইবার জন্যও তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলেন নাই,। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। কিন্তু যে-কথাটি বলিতেন তাহা মূল্যবান।

বাবা শেষ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গেলেন। তাঁহার মনোমত একটা ব্যবস্থাও হইয়া গেল। আমার সহপাঠী মন্মথর বাবা বরদাবাবু সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুভঙ্করীর সহিত দিদিমায়ের খুব হৃদ্যতা ছিল। দিদিমা পরদিনই পালকি করিয়া তাঁহার কাছে গেলেন। মামা রোগীর বাড়ি যাইবার জন্য পালকি করিয়াছিলেন। তখন রিক্‌শা বা মোটরের তেমন প্রচলন হয় নাই। মামা শহরের মধ্যে পালকি করিয়াই রোগীর বাড়ি যাতায়াত করিতেন। সেই পালকি বাড়ির মেয়েরাও সময় সময় ব্যবহার করিত। দিদিমার সহিত মন্মথর মায়ের কি কথাবার্তা হইয়াছিল জানি না, কিন্তু তাহার পরদিন বরদাবাবু আমাদের সকলকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ ছিল বোধহয় ইতুপূজা। তখনকার দিনে যে-কোনও পূজা উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইতে গৃহলক্ষ্মীরা ভালবাসিতেন। তাই কোন না কোন ছুতায় বাড়িতে নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া যাইত। উপলক্ষটা হইত নিতান্ত উপলক্ষ মাত্র। সেদিন আহারাদির পর বরদাবাবু বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেদারবাবু, একটা প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, রাগ করবেন না তো।"

বাবা সাধারণত স্বপাকই আহার করিতেন, কিন্তু সেদিন দিদিমার অনুরোধে তিনি বরদাবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন।

বরদাবাবুর কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "সে কি, রাগ করব কেন। কি প্রস্তাব বলুন।"

"এখানকার মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাকস কালেকটারের একটি চাকরি খালি আছে। আপনি যদি সেটি নেন আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হব। মাইনে মাসিক আঠারো টাকা। কাজ বিশেষ কিছু নেই। যা সামান্য আছে তা আপনার নতুন শাগরেদ বিষ্ণুই করে দেবে। বিষ্ণুও আমাদের

ট্যাকস্ কালেকটার। ছোকরা খুব ভালো। শক্তিবাবুর মায়ের খুব ইচ্ছে যে আপনি এখানে থাকেন। শক্তিবাবুর বাড়ির কাছেই আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেটাতে আপনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। ওটা ভাড়া দেব বলে কিনেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও ভাড়াটে জোটে নি। আপনার মতো লোক যদি ওটাতে বাস করেন তাহলে ওটার একটা সদগতি হয়। আমরাও খুব আনন্দিত হই। ওটা এমনিই পড়ে আছে। ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে শেষকালে।''

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, '' আমাকে কি রকম ভাড়া দিতে হবে''

''আপনি যা দেবেন তাই নেব। যদি কিছু না দেন তাতেও আপত্তি নেই। শক্তিবাবু আমাদের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছেন''

বাবা বলিলেন, ''আচ্ছা, ভেবে দেখি''

বাবা আসিবার দুই একদিন পরেই বিষুণচাঁদের সহিত বাবার আলাপ হইয়াছিল বাগচী মহাশয়ের বাড়িতে। সেখানেই সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ সংগীতের মজলিস বসিত। সেতারে বাবার পিলু আলাপ শুনিয়া বিষুণচাঁদ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বাবাকে ধরিয়া পড়িল, পিলুটা তাহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। অনেক ওস্তাদ নিজের বিদ্যা সহজে অপরকে দান করিতে চান না। তাঁহারা সংসারী ওস্তাদ। সে-বিদ্যার বৈশিষ্ট্যে অর্থ উপার্জন করিয়া তাঁহাদের সংসার চালাইতে হয়, সেটি তাঁহারা সকলকে শিখাইতে চান না। বাবা ছিলেন সংসারবিরাগী উদাসীন লোক। তিনি যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহা বিনা দ্বিধায় সকলকে বিতরণ করিয়া দিতেন। বিষুণচাঁদকে তিনি বলিলেন, ''এটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম লখনউ শহরের মীরদুল্লা সাহেবের কাছে। মাস তিনেক লেগেছিল শিখতে। আজই তুমি আরম্ভ করে দিতে পার। আমি এখানে মাস তিনেক থাকব কিনা সন্দেহ। আমি না থাকলেও বাগচীমশাই আছেন, তিনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন''

ইহার পর বাবার চাকরির সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল তখন সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দিত হইল বিষুণপ্রসাদ চৌবে। বিষুণপ্রসাদ চমৎকার বাংলা বলিত। সে বাবাকে বলিল, ''আপনি গুরুজি সেতার নিয়ে 'মস্ত্' হয়ে থাকুন দিনরাত, আপনার সব কাজ আমি করে দেব। সব কাজ তো আমিই করি। আপনাকে এখানে রাখবার জন্যে বর্দাবাবু এ পোস্টটা খাড়া করলেন। আমাকে দিয়ে ঝুটমুট একটা দর্খাস্ত লিখিয়ে নিলেন যে আমি একা এত কাজ পাচ্ছি না।'' -- বিহারীরা বরদাবাবুকে বর্দাবাবু বলিত।

বাবা সাহেবগঞ্জ হইতে আর গেলেন না। বরদাবাবু তাঁহার যে ছোট বাসাটির কথা বলিয়াছেন সেই বাসাটিই তিনি লইলেন মাসিক এক টাকা ভাড়া দিয়া। বাসাটি ছোট, কিন্তু একার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুইখানি ঘর। একটি বেশ বড় আর একটি ছোট। উঠানটি বেশ চওড়া। উঠানের একধারে রান্নাঘর ও তাহার পাশে ভাঁড়ার ঘর ছিল। সেগুলি অবশ্য পাকা নয়। মাটির দেওয়াল, খোলার চাল। বাবা সেগুলি নিজে কখনও ব্যবহার করেন নাই। কিছুদিন পরে বাবার পোষা হরিণটি সেই ঘরে থাকিত। বাবা তাহার নামও রাখিয়াছিলেন 'হরিণ'। হরিণ বলিলেই সে লাফাইতে লাফাইতে কাছে ছুটিয়া আসিত। বিষুণপ্রসাদই দেহাত হইতে হরিণশিশুটিকে লইয়া আসিয়াছিল। বাবার সেটি খুব পছন্দ হওয়াতে বিষুণপ্রসাদ বাবাকেই

সেটি দান করিয়া কৃতার্থ হয়। বিষুণপ্রসাদের মতো ভক্ত আমি কম দেখিয়াছি। বাবার সামান্যতম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সে সদাসর্বদা ব্যগ্র থাকিত। সে প্রত্যহ খুব সকালে আসিয়া বাবার ঘর দুইটি এবং সম্মুখের বারান্দাটি ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিত। তাহার পর কূয়া হইতে জল তুলিয়া বালতি কলসী ভরিয়া ফেলিত। বাবা আদেশ করিলে বাবার রান্নাটাও করিয়া দিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাবা স্বপাক আহারই পছন্দ করিতেন। সকালে ভাতে-ভাত, ঘি এবং একবাটি দুধ ছাড়া তিনি আর কিছু খাইতেন না। রাত্রে খাইতেন কালী-মন্দিরের প্রসাদ। তাহাতে প্রায় প্রত্যহই মাংস থাকিত। মন্দিরের মালিক অযোধ্যানাথ বাবার পূজা দেখিয়া এমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই মন্দিরের কার্যকলাপ বাবারই নিয়ন্ত্রণে হইতে লাগিল। মন্দিরের মাহিনা করা পুরোহিত কালীকিঙ্করবাবু বাবার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িলেন এবং বাবার কাছে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মোট কথা, অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাবা সাহেবগঞ্জের সমাজে একটি শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিলেন। তাঁহার দুই দল ভক্ত জুটিয়া গেল। একদল গানের আর একদল কালী-সাধনার। বাবা যদি ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থ লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অর্থকষ্ট থাকিত না। কিন্তু তিনি সে-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। মিউনিসিপ্যালিটির বেতনও তিনি সব খরচ করিতেন না। প্রতি মাসেই কিছু বাঁচিয়া যাইত। বাবা তাহা সঞ্চয় করিতেন না। তাহা দিয়া ভিখারী-ভোজন করাইতেন। তখনকার দিনে মাসিক আঠারো টাকা বেতন নিতান্ত কম ছিল না।

আমি আর চন্দ্র বাবার বাসায় আসিয়া প্রায় সমস্ত দিনই থাকিতাম। চন্দ্রকে বাবা সেতারের গৎ শুনাইয়া ঘুম পাড়াইতেন। বাবার বিছানার একপাশে মা তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। সে হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করিত। কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেই বাবা সেতারের গৎ বাজাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিতেন। অমি পূর্বে লেখাপড়া করিতাম মামার নুনের গোলায়। নুনের ব্যাপারীদের বসিবার জন্য একটি আলাদ ঘর ছিল, বেশ প্রশস্ত ঘর। সেই ঘরের একধারে বসিয়া আমি পড়াশোনা করিতাম। কার্তিক মামা মাঝে মাঝে আসিয়া তদারক করিয়া যাইতেন আমি ঠিকমতো পড়িতেছি কি না। মামাই তাঁহাকে এ-ভার দিয়াছিলেন। তিনি যখন মামাকে রিপোর্ট করিতেন যে আমি পড়িতেছি না তখন মামা আমাকে খুব বকিতেন। মামার একটা বিশেষ গালাগালি ছিল 'হ্যাঁচ্‌কারা'। ইহার কি অর্থ তাহা আমি আজও জানি না। মামা বিশেষ মারধোর করিতেন না, ওই শব্দটি স-জোরে উচ্চারণ করিয়া বড় জোর কান মলিয়া দিতেন। বাবা আসিবার পর হইতে আমি বাবার ঘরে গিয়া পড়িতে লাগিলাম। বাবার ঘর তখন নির্জন থাকিত। বাবা খুব ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গার ঘাট হইতেই তিনি চলিয়া যাইতেন কালী-মন্দিরে। সেখান হইতে পূজা সারিয়া ফিরিতে তাঁহার আটটা ন'টা বাজিয়া যাইত। আমি দিদিমার কাছে শুইতাম। দিদিমা খুব ভোরে আমাকে উঠাইয়া দিতেন। বলিতেন, 'ওঠ, ওঠ, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে নিয়ে বাবার কাছে যা। কাছে কাছে থাকলে তবে তো মায়া বসবে। একবার মায়া বসে গেলে আমার কোথাও যাবে না।' প্রায় রোজই দিদিমা এই কথাটি বলিতেন । কিন্তু খুব সকালে উঠিলেও খুব সকালে আমি বাবার কাছে যাইতে পারিতাম না। ইহার কারণ মামীমা উঠিতেন একটু বেলায়।

যে বাসী রুটি ও গুড় আমার সকালবেলার জলখাবার ছিল তাহা থাকিত ভাঁড়ার ঘরে। ভাঁড়ার ঘরের তালার চাবি থাকিত মামীমার কাছে। সদর দরজাতেও রাত্রে ভিতর হইতে তালা বন্ধ থাকিত, সে-চাবিও থাকিত মামীমার আঁচলে। দিদিমা অন্ধ ছিলেন, আমার যাইবার বাধা যে কোথায় তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন না। আমিও তাঁহাকে বুঝিতে দিতাম না। আমি তাঁহাকে এ-কথা বলিলে তিনি হয়তো মামীমার নিকট হইতে চাবিটা লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিতেন, কিংবা মামীকে ভোরে উঠিতে বাধ্য করিতেন। ইহার মধ্যে যে-কোনটি করিলে যে শেষ পর্যন্ত আমিই বিপন্ন হইব এ-কথা সেই ছেলেবেলাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম যে মামীমাই গৃহের কর্ত্রী, অন্ধ দিদিমা আইনতঃ তাঁহার উপরওলা হইলেও কার্যতঃ তাঁহার অধীন। সুতরাং সেই ছেলেবেলা হইতে আমি মামীমাকে খুশী রাখিবার চেষ্টা করিতাম। দিদিমা আমাকে ভোরে উঠাইয়া দিলে আমি ছাতে চলিয়া যাইতাম। ছাতে বসিয়া সূর্যোদয় দেখিতাম। সূর্যোদয়ের নিত্য-নূতন মহিমায় আমার সমস্ত চিত্ত আপ্লুত হইয়া যাইত। প্রত্যহই অনুভব করিতাম যে সূর্য এত বৃহৎ, এত উজ্জ্বল, এমন মহিমান্বিত, দিদিমা সেই সূর্যের নামে আমার নাম রাখিলেন কেন। আমি তো সর্বদিক দিয়াই সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট। আমি কি ও-নামের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিব? মামীমা প্রত্যহ সাড়ে ছ'টার সময় উঠিতেন। উঠিয়া প্রথমেই তিনি মামার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মামা সকালে উঠিয়া মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া পাটের কাপড় পরিয়া ফুল তুলিয়া পূজার ঘরে ঢুকিতেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতেন। বাড়ির উঠানে কলকে ফুলের গাছ ছিল একটা, অধিকাংশ দিনই কলকে ফুল দিয়া পূজা হইত। মাঝে মাঝে মামার এক রোগী আগের দিন সন্ধ্যায় কলাপাতায় জড়াইয়া কিছু কিছু ফুল দিয়া যাইতেন, তাহার পরদিন মামাকে আর ফুল তুলিতে হইত না। মামা পূজার ঘরে ঢুকিলেই আমি ছাত হইতে নামিয়া আসিতাম এবং মামীমার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতাম। মুখ ফুটিয়া মামীমার কাছে খাবার চাহিবার সাহস আমার কখনও হয় নাই। মামীমা আমাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন আমার কি চাই। আমাকে দেখিয়াই তিনি রান্নঘরে ঢুকিয়া একটি কাঁসিতে খান দুই রুটি এবং একটু গুড় বাহির করিয়া দিতেন। শীতকালে গুড়ের সহিত কিছু বাসী তরকারিও থাকিত। সেই বাসী রুটি ও গুড় যে কি উপাদেয় মনে হইত তাহা ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। খাইয়াই আমি বাবার কাছে চলিয়া যাইতাম। গিয়া দেখিতাম বিষুণপ্রসাদ বাবার ঘর-দুয়ার ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিতেছে। কলসীতে এবং বালতীতে খাবার জল ভরা হইয়া গিয়াছে। আমি যে মাদুরে বসিয়া পড়িতাম সেটিও নিপুণভাবে ঘরের মেঝেতে বিষুণপ্রসাদ পাতিয়া রাখিয়াছে। আমাকে দেখিয়া প্রত্যহ সে ইংরাজীতে বলিত, 'গুড় মর্ণিং সার, দি স্টাডি ইজ রেডি।' তখন আমি ইংরাজী জানিতাম না, বিষুণপ্রসাদের ভাষাটা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তাহার হাসি এবং ভাবভঙ্গি হইতে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে আমার কষ্ট হইত না। বিষুণপ্রসাদ কোন ইংরাজী স্কুলে কতদূর পর্যন্ত পড়িয়াছিল তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছিলাম কাশীর নিকটবর্তী কোন গ্রামে তাহার বাড়ি ছিল। বিমাতার অত্যাচারে সে নাকি গৃহত্যাগ করে এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকাল হইতেই তাহার সংগীতে অনুরাগ। সাহেবগঞ্জ থানার কনেস্টবলদের একটি গানের আখড়া

ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহারা খচমচ খচমচ করিয়া খঞ্জনি ও ঢোল সহযোগে গান করিত। বিষুণপ্রসাদ এই আখড়ার একজন নেতা ছিল। তাহার নিজের সেতারও ছিল একটি। খুব ভোরে উঠিয়া সে এই সেতারে রেওয়াজ করিত। বাবা সাহেবগঞ্জে আসিবার পূর্বে সে মনের মতো গুরু পায় নাই। বাবার নাগাল পাইয়া সে যেন বর্তিয়া গেল। প্রকৃত শিষ্যের মতোই সে বাবার সেবা করিত। বিষুণপ্রসাদ না থাকিলে বাবা শেষ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে থাকিতেন কিনা সন্দেহ। বিষুণপ্রসাদের আন্তরিক সেবাই বাবাকে সাহেবগঞ্জে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মাকে কখনও বাবার বাসায় আসিতে দেখি নাই। তিনি মামার অন্তঃপুরে গৃহকর্মের মধ্যে নীরবে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বাড়িতে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ কেহ কখনও শোনে নাই। তাঁহাকে প্রসাধন করিতেও আমি কখনও দেখি নাই। এই সময়ের দুইটি চিত্র আমার মনে আজও স্পষ্টভাবে আঁকা আছে। আমি রাত্রে দিদিমার কাছে শুইতাম। একদিন গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলাম মা দিদিমার কোলের উপর মুখ রাখিয়া নীরবে শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মনে হইল, মা কাঁদিতেছেন। আমার বয়স তখন বেশী নয়, কিন্তু তবু আমি যেন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই পরম শোকাবহ দৃশ্যের আমিই একমাত্র দর্শক ছিলাম। আমি অবশ্য একটি কথাও বলি নাই। সহসা আমার চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল। মায়ের কান্নার কারণ কি তাহাও বুঝিতে পারি নাই। ঠিক ইহার দুই দিন পূর্বে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাবার বাসায় পরম রূপবতী একটি বাইজী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যে সাধারণ বাইজী নন তাহা তাঁহার চেহারা ধরণ-ধারণ এবং বেশবাস হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল। তিনি স্টেশন হইতে পালকি ভাড়া করিয়া বাবার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দুইজন ভৃত্য এবং একজন তবলা-বাদকও আসিয়াছিল। তিনি যখন পালকি চড়িয়া সদলবলে বাবার বাসায় আসিয়া পড়িলেন তখন পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি পালকি হইতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন এবং একধারে একটু দূরে বসিয়া রহিলেন। বিষুণপ্রসাদই তাঁহাকে আসন পাতিয়া দিল। বাইজী পরিষ্কার বাংলায় বাবাকে বলিলেন, "বাবা, আপনি এখানে আছেন তা জানতাম না। কলকাতায় গিয়েছিলাম সেখানে খবর পেলাম আপনি এখানে আছেন। আপনি কি আর লখনউ যাবেন না?"

"আপাতত যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানেই এখন থাকতে হবে আমাকে।"

বাইজী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। "আমিই তাহলে আসব মাঝে মাঝে। আপনার কাছে দু'একটা গৎ নিয়ে যাব।"

"দু'একটা গৎ-এর জন্য অতদূর থেকে আসবার দরকার কি? লখনউ শহরে বড় বড় ওস্তাদের অভাব নেই।"

"ওস্তাদের অভাব নেই, কিন্তু গুরুর অভাব আছে। কেউ ভালো করে শেখাতে চায় না, সবাই যেন দোকানদারি করে। আপনার মতো গুরু আমি কখনও পাই নি। আপনি অনুমতি দিন আপনার কাছেই আসব আমি।"

"এসো"

বাইজী কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলেন এবং সেই সময়টুকুর মধ্যেই বাবার নিকট একটি গৎ আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি বাবার পায়ে কাছে এক থলি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন। বাবা থলিটি স্পর্শ পর্যন্ত করেন নাই। বিষুণপ্রসাদ খুলিয়া দেখিয়াছিল থলিতে একশত টাকা রহিয়াছে। বাবাকে সে যখন প্রশ্ন করিল, "গুরুজি, এ-টাকা কোথায় রাখব?" বাবা বলিলেন, "তোমার কাছেই রেখে দাও, আমার সংসার তো তুমিই চালাচ্ছ।"

মায়ের কথা বলিতে বলিতে অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। মায়ের দ্বিতীয় আর একটি চিত্রও আমার মনে আঁকা আছে। আগেই বলিয়াছি মাকে কখনও প্রসাধন করিতে দেখি নাই। সম্ভবতঃ কোন দিন তিনি ভালো করিয়া চুলও বাঁধিতেন না। দিদিমা এজন্য প্রায়ই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। দিদিমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, মা ভালো শাড়ি পরিয়া ভলো করিয়া চুল বাঁধিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বাবার বাসায় রোজ অন্ততঃ একবারও গিয়া বাবার গৃহস্থলী গুছাইয়া দিয়া আসেন। মা কিছুতেই তাহাতে রাজী হইতেন না। বাবার বাসায় মাকে কখনও যাইতে দেখি নাই। একদিন দেখিলাম মামীমা মায়ের চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন। দেখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মায়ের যে অত চুল ছিল তাহা জানিতাম না। সমস্ত পিঠ ছাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। চুলের সঙ্গে কবিরা কালো মেঘের উপমা দেন। সেদিন সত্যই আমার মনে হইয়াছিল মায়ের পিঠে যেন বর্ষার কালো মেঘের খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে। আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মামীমা ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিতেই আমি একছুটে বাহিরে চলিয়া গেলাম। মা সেদিন কেন চুল বাঁধিতে বসিয়াছিলেন তাহা আজও আমি জানি না। কিন্তু সেই চুলের ছবি আজও আমার মনে আঁকা আছে। অমন ঘনকৃষ্ণ রাশি রাশি চুল আমি আর কাহারও মাথায় দেখি নাই।

ইহার মাস দুই পরেই মা মারা যান। ম্যালেরিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাই সকলের অনুমান। ম্যালেরিয়া তখন্ অনেকেরই হইত। মা-ও প্রায় কম্প-জ্বরে ভুগিতেন। কিন্তু মামা তাহাকে কখনও ঔষধ খাওয়াইতে পারেন নাই। তিনি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকবার ঔষধ আনিয়া দিয়াছেন কিন্তু মা খান নাই। নিজের জন্য কোন কিছু করিতেন না। অপরে তাঁহার জন্য কিছু করুক ইহাও তিনি চাহিতেন না। মৃত্যুকালে কেহ তাঁহার কাছে ছিল না। তিনি একতলায় একটা কোণের ঘরে একা শুইতেন। কখন শুইতেন, কখন উঠিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। ভোরে উঠিযাই তিনি গঙ্গস্নান করিতে চলিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিতেন। সেদিন যখন অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁহাকে রান্নাঘরে দেখা গেল না তখনই তাঁহার খোঁজ পড়িল। দেখা গেল সেদিন আর তিনি ঘর হইতে বাহির হন নাই। কপাট ভাঙিয়া তাঁহার মৃতদেহ বাহির করিতে হইল। যখন তাঁহার ঘরের কপাট ভাঙা হইতেছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম না। বাবার বাসায় বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিলাম।

মায়ের শ্মশান-যাত্রার ছবিটা এখনও মনে আছে। পাড়ার ছয়-সাতজন লোক, মামা ও আমি শবানুগমন করিয়াছিলাম। বাবা আমাদের সঙ্গে যান নাই। মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া বাড়িতে পর্যন্ত আসেন নাই। বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল, প্রতিবেশীদের ভিড়ে উঠান ছাইয়া গিয়াছিল। মামীমা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। সদাহাস্যমুখী নেত্যরও দুই চোখে ধারা বহিয়া যাইতেছিল। দিদিমা কাঁদিতে

কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আরও এমন অনেক লোক, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক, হাহাকার করিতেছিল যাঁহাদের আমি চিনিতে পারিলাম না। হয়তো মায়ের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার খুব কান্না পাইতেছিল, বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমি বিবর্ণমুখে একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে হইতেছিল আমি যেন একজন আগন্তুক, আমি যেন কাহারও কেহ নই, যেন একটা অভিনয় দেখিতেছি। এমন কি ইহাও আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন মাটিতে দাঁড়াইয়া নাই, শূন্যে দাঁড়াইয়া আছি। এরকম নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ নিরাসক্ত অবস্থা আমার জীবনে আর কখনও আসে নাই।

মামীমা মায়ের পায়ে আলতা ও মাথায় সিঁদুর পরাইয়া প্রণাম করিলেন। আরও অনেকে করিল। আমিও করিলাম। মামাও করিলেন। মামা খুব কাঁদিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন— "আমার সংসার এইবার ভেঙে গেল। সংসারের মেরুদণ্ড চলে গেল।' কার্তিক মামা কোথা হইতে একট জবা ফুলের মালা আনিয়া মাকে পরাইয়া দিলেন। যে কলকে ফুলের গাছটিকে মা রোজ যত্ন করিত সে-ও তাহার সব ফুলগুলি উজাড় করিয়া দিল। কার্তিক মামা সেগুলি দিয়াও একটি মালা গাঁথিয়া দিলেন। তাহার পর বাবার খোঁজ পড়িল। মামা বলিলেন, জামাইবাবু, কোথা, তাঁকে দেখচি না। বাবাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। একজন তাঁহাকে মন্দিরে খোঁজ করিতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল তিনি সেখানে নাই, বাড়িতেও নাই। এই সংবাদে সকলে আরও বিব্রত হইয়া পড়িল। মামা বলিলেন, তিনিও বোধ হয় চলে গেলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া যান নাই। আমরা শ্মশানে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেখানে বসিয়া সেতার বাজাইতেছেন। তাঁহার আত্মসমাহিত গম্ভীর মুখভাব, সেতারের অদ্ভুত আলাপ সেই শ্মশানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই।

মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসজীবনের রূপ নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু সে পরিবর্তনের ক্ষেত্র বোধহয় ছিল আমার অবচেতনলোকে। আমি নিজে কিছু বুঝিতে পরিতাম না। কিন্তু অন্যান্য সকলে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিত। আমার বন্ধু মন্মথ বলিত, "তোর মুখটা সর্বদাই যেন থমথম করছে। অমন গোমড়া মুখ করে আর কত দিন থাকবি? মা কি আর কারো মরে নি! ওই দেখ না, বাবুলের মা সেদিন মারা গেছেন, দেখ্ না ও কেমন ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে। আলবার্ট কেটে ফুলেল তেল মেখে সিগারেট ফুঁকছে। তোকে অত করতে বলছি না, তুই একটু হাস দেখি!" 'মামীমা আমাকে খুব বকিতেন। বলিতেন, আমার খাওয়া নাকি কমিয়া গিয়াছে। দিদিমা মুখে কিছু বলিতেন না। যখন তখন আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন, আর ক্রমাগত কাঁদিতেন। নীরব কান্না। সে কান্নার বিরাম ছিল না। রাত্রে আমি তাঁহার কাছে শুইতাম। চন্দ্র শুইত মামীমার কাছে। সকালবেলা পূজা সারিয়া আসিয়া বাবা চন্দ্রকে নিজের কাছে লইয়া যাইতেন। নেত্য গিয়া তাহাকে দিয়া আসিত। বিষুণই সমস্ত দিন তাহার দেখাশোনা করিত। আমিও বাবার বাসাতে বসিয়া পড়াশোনা করিতাম এবং তাহার পর স্কুলে চলিয়া যাইতাম। আমার জীবনধারা নিয়মানুবর্তিতার বাঁধা খাতে পূর্ববৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মায়ের মৃত্যুতে কোন পরিবর্তন হইল না।

একটা পরিবর্তন কিন্তু আমার জীবনে ক্রমশঃ মুখ্য স্থান অধিকার করিতেছিল, বাবা নয়। বাবা যে-সব গুণে গুণী ছিলেন তাহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার বয়স আমর তখনও হয় নাই। তিনি কখনও কাহারও মনে নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি নিজেকে লইয়াই থাকিতেন। কে তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি অহোরাত্র তাঁহার সেতার, সংগীত ও শ্যামাপূজায় মগ্ন থাকিতেন। আমি প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়শোনা করিতাম তাহা যেন তিনি দেখিতেই পাইতেন না। দেখিয়াও দেখিতেন না। আমার অপেক্ষা তিনি ঢের বেশী মনোযোগ দিতেন হরিণটার প্রতি। নিজের হাতে তাহার জন্য কচি দূর্বা তুলিয়া আনিতেন। তাহাকে যত্ন করিয়া দুধ খাওয়াইতেন। চন্দ্রের প্রতিও বাবা তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তাহাকে কোলে তুলিয়া কখনও আদর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। সন্ধ্যার পর সে যখন খুব কাঁদিত তখন কেবল তাহাকে সেতার বাজাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিতেন। সে ঘুমাইয়া পড়িলেই তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন দিদিমার কাছে। যতদূর মনে পড়ে আমাদের জন্য কোন ঝক্কি কখনও পোহান নাই। যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকুই কেবল করিতেন। সুতরাং আমার বালকমনে বাবার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। ওই বয়সেই আমি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, মায়ের অকালমৃত্যুর কারণ বাবাই। বাবার ঔদাসীন্যের জন্যই আমার অভিমানিনী মা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মামার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। কারণ দেখিতাম তিনিই সমস্ত সংসারটাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রচুর উপার্জন করিতেন, খরচও প্রচুর ছিল। অনেক গরীব আত্মীয় এবং গ্রামবাসীকে তিনি পালন করিতেন। অনেক দরিদ্র রোগীকে বিনা পয়সায় ঔষধ এবং পথ্য দিতেন। তাঁহার পশার খুব বাড়িয়াছিল। অনেক সময় তিনি দূরে দূরে রোগী দেখিতে চলিয়া যাইতেন। বাড়ি ফিরিতেন দুই তিন দিন পরে। বাড়িতেও প্রত্যহ বহু রোগী জুটিত। মামার ঔষধের দোকান ছিল একটি। তাঁহার কম্পাউণ্ডার ছিলেন নিকুঞ্জবাবু। পূর্ববঙ্গের লোক। তাঁহার ছিল একমুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি, বড় বড় লাল চোখ এবং হলদে রঙের বড় বড় দাঁত। ভীষণদর্শন লোক ছিলেন তিনি। আমাকে 'ছ্যামড়া' বলিতেন। পাড়ার কলহপরায়ণা একটি দাইকে বলিতেন 'খাটাস্'। তাঁহার মুখের অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু এই দুইটি কথা মনে আটকাইয়া আছে। যতদূর মনে পড়ে তাঁহার বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা। মামা, তাঁহাকে দুইবেলা খাইতে দিতেন। থাকিবার জন্য একটি ঘরও দিয়াছিলেন। রোগীদের নিকট হইতে তিনি কিছু উপরিও রোজগার করিতেন। প্রতি রোগী তাঁহাকে একটি করিয়া পয়সা দিত। মামাই এ-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইহাতে তাঁহার নাকি মাসে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার হইত। প্রতিবৎসর পূজার সময় দশ দিনের ছুটি লইয়া দেশে যাইতেন। সে-সময় হাবু মামা বা অর কেহ তাঁহার জায়গায় কাজ করিত। দেশে যাইবার সময়ে মামা নিকুঞ্জবাবুকে মাহিনা ছাড়া কুড়ি টাকা আশীর্বাদী স্বরূপ দিতেন। আজকালকার ভাষায় ইহাকে 'বোনাস' বলা যাইতে পারে। দেশে যাইবার জন্য নিকুঞ্জবাবু যখন স্টেশনে যাইতেন তখন তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া সকেলেরই মনে কৌতুক জাগিত। কোঁচানো কালো-পাড় ধুতি, চকোলেট রঙের সাটিনের একটি আজানুলম্বিত কোট, ব্রাউন রঙের জুতা এবং কালো রঙের মোজা। কোটের উপর গলায় একটি কোঁচানো শান্তিপুরী চাদরও ঝুলাইতেন। পাড়ায় শশী হালদারের একটি মনিহারীর

দোকান ছিল, সে বলিত প্রতিবার বাড়ি যাইবার আগের দিন নিকুঞ্জবাবু একটি ভালো চিরুনি, চুল বাঁধিবার ফিতা এবং তৎকাল-প্রচলিত ম্যাকেসর তেলও নাকি লুকাইয়া খরিদ করিতেন।

বাল্যকালে মামার ব্যক্তিত্বই অমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া থাকিত। মনে মনে আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে মামার জীবনের ছাঁচেই গড়িতে ভালবাসিতাম। মামার কাছে যেমন দলে দলে রোগী আসিয়া ভালো হইয়া যাইত" কল্পনা করিতাম আমার কাছেও তেমনি রোগীরা আসিয়া ভালো হইয়া যাইতেছে। মামার ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে ছোটবড় কয়েকটি বোতল লইয়া আমি গুদামঘরের এককোণে নিজের একটি ডিস্‌পেন্‌সারিও করিয়াছিলাম। মামার সেই গুদামঘরটিতে ভাঙাচোরা নানারকম জিনিস থাকিত। একট ভাঙা বালতি, একটি ভাঙা লণ্ঠন, দুটি পা-ভাঙা চেয়ার এবং কয়েকটি ছেঁড়া বালিশকে রোগী কল্পনা করিয়া আমি আমার ডাক্তারি করিতাম। গুদামঘরটা প্রকাণ্ড ছিল। সকলের অগোচরে আমি সেখানে প্রবেশ করিতাম। ভাঙা বালতি কোনদিন হইত ম্যালেরিয়া রোগী, কোনও দিন বা কল্পনা করিতাম তাহার উদরী হইয়াছে। ওই চার-পাঁচটি ভাঙা জিনিসই হেরফের করিয়া নানা রোগীতে রূপান্তরিত হইত। মামা রোগীদের সহিত যে-ভাবে যে-ভাষায় আলাপ করিতেন, আমিও তাহাদের সহিত তাহাই করিতাম। তাহার পর তাহাদের বোতলে-রাখা লাল নীল জল একে একে খাওয়াইয়া দিতাম। অর্থাৎ তাহাদের উপর ঢালিয়া দিতাম। আমার এই গোপন ডাক্তারির কথা কেহ জানিত না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু মন্মথকেও একথা বলি নাই। এই বিশেষ বিষয়ে আমার কেমন যেন একটা লজ্জা ছিল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, জানিতে পারিলে সকলেই আমকে উপহাস করিবে। বলিবে, কুজের চিত হইয়া শুইবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি ডাক্তারি ডাক্তারি খেলাই খেলিতাম, সত্য সত্যই যে ডাক্তার হইব একথা কোন দিন ভাবি নাই। কোথায় কোন্ স্কুলে ডাক্তারি পড়া হয়, কি করিয়া সে স্কুলে ভরতি হওয়া যায়, মামা কি করিয়া ডাক্তারি শিখিলেন এসব কথা কখনও ভাবি নাই। পড়াশোনাতে আমি মোটেই ভালো ছিলাম না। সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি যতটা মুখস্থসাধ্য ততটাই আমি আয়ত্ত করিতে পারিতাম। কিন্তু যেখানেই বুদ্ধির ব্যাপার সেইখানেই আমার মুশকিল ছিল। পাটীগণিত, শুভঙ্করী, জ্যামিতি, পরিমিতি আমার মাথায় তেমন ঢুকিত না। আমাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিবার লোকও তেমন কেহ ছিল না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, আমি ওসব কিছু জানি না। বিষুণপ্রসাদও সম্ভবতঃ অঙ্কে তেমন পারদর্শী ছিল না, কারণ অঙ্কের প্রসঙ্গ উঠিলেই সে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইবার চেষ্টা করিত। তাহার পর একদিন সে সরলভাবে বলিয়াই ফেলিল—ওসব ভাই 'ইয়াদ্' (মুখস্থ) করে ফেল। ওসব আমিও কিছু বুঝি না। সুতরাং অঙ্কও আমি যথাসাধ্য মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। মুখস্থর বাহিরে কিছু পড়িলে আর পারিতাম না। স্কুলের গণিত শিক্ষক বিপিন বসু আমাকে 'গবেট' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং আমার ওই নামটাই স্কুলে চালু হইয়া গিয়াছিল।

আমার স্কুল-জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া আমার আরও দুইটি মুখ মনে পড়িতেছে, সুধীরের ও কমলার। মামার বড় ছেলের আর বড় মেয়ের। সংসারে যখন নূতন শিশুদের আগমন হয় তখন প্রায়ই তাহারা লুকাইয়া আসে, প্রায়ই গভীর রাত্রে তাহাদের জন্ম হয়। ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নয়, কিন্তু আমার মনে ওই রকম একটা ধারণাই জন্মাইয়া গিয়াছে।

সুধীরের জন্ম তাহার মামার বাড়িতে হইয়াছিল। সে যখন সাহেবগঞ্জে আসে তখন তাহার বয়স ছয় মাস। সাহেবগঞ্জেও সে রাত্রি দুইটার ট্রেনে আসিয়াছিল, আমি তখন জাগিয়া ছিলাম না। সকালে উঠিয়া তাহাকে প্রথম দেখিলাম। অমন রূপ কোনও শিশুর দেখিয়াছি বলিয় মনে পড়ে না। ঠিক যেন দেবশিশু। চন্দ্রও দেখিতে খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু সুধীরের মুখে এমন একটা দিব্যভাব ছিল যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। আজ বৃদ্ধবয়সে আমার জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়া সুধীরের মুখটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। বছর দুই আগে সে মারা গিয়াছে। মনে হইতেছে, মৃত্যুর অন্ধকার পটভূমিকায় সে যেন জ্যোতির্ময় দেবতার মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যিশুখৃষ্ট বা চৈতন্য সত্যই দেখিতে কেমন ছিলেন জানি না, বড় বড় শিল্পীদের আঁকা তাঁহাদের ছবি-মাত্র দেখিয়াছি। সুধীরের কথা মনে হইলে ওই সব ছবির কথা মনে পড়ে। সুধীরের জন্য বাল্যকালে আমাকে কিছু অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেজন্য সুধীর তো দায়ী নয়। দায়ী সেইসব সাংসারিক পরিস্থিতি যাহা চিরন্তন এবং যাহা প্রায় অনপনেয়। সুধীরকে লইয়া মামীমা যখন আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন তখন দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পৌত্র সুধীরকে তিনি দেখিতে পান নাই। দেখিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু সুধীর আসিবার পর হইতে তিনি যেন আমাকে ও চন্দ্রকে আরও বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মনে হইয়াছিল মামীমার যখন নিজের ছেলে হইয়াছে তখন তাঁহার নিকট হইতে যতটুকু স্নেহ আমরা পাইতাম তাহাও আর পাইব না। আমাদের সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পূর্বাপেক্ষা আমাদের যে তিনি বেশি ভালবাসিতে লাগিলেন তাহা নয়। জন্মাবধি তাঁহার নিকট যে ভালবাসা পাইয়াছি তাহার অপেক্ষা বেশি ভালবাসা পাওয়া যে সম্ভব তাহা কল্পনা করাও শক্ত। কিন্তু সুধীর আসাতে সেই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ যেন বাড়িয়া গেল। দিদিমা যেন শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি তো তাঁহার সহিত এক খাটেই শুইতাম, এইবার চন্দ্রের বিছানাও তাঁহার আর এক পাশে হইল। রাত্রে আমাদের দেখাশোনা করিবার জন্য মামার দূরসম্পর্কীয়া বিধবা ভাইঝি 'নেত্য'কেও তিনি তাঁহার ঘরে মেজেতে শুইতে বলিলেন। মামাকে বলিয়া আমার এবং চন্দ্রের জন্যে নূতন কোট ও দোলাই করাইয়া দিলেন। আমাকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ এক গ্লাস দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। দুগ্ধ পান করিবার সময় ঢকঢক শব্দ না হইলে তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন আমি বুঝি দুগ্ধ পান করিতেছি না। চোখে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু আহারের পর প্রত্যহ পেটে হাত বুলাইয়া দেখিতেন পেট উঁচু হইয়াছে কিনা। ইহাতে ফল কিন্তু ভালো হয় নাই। পূর্ব হইতেই মামীমা আমাদের উপর একটু অপ্রসন্ন ছিলেন, এইবার আরও চটিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে একটা কালো ছায়া নামিয়া অসিল। দিদিমার প্রতাপে যদিও আমাদের আহার বা পোশাকের কোন অসুবিধা রহিল না কিন্তু মামীমার মনোকষ্টের কারণ হইয়াছি বলিয়া আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে দিদিমা যখন চীৎকার করিয়া নেত্যকে ডাকাডাকি করিতেন—'ওলো হারামজাদী নেত্য, কোথা গেলি তুই, জানলা কপাটের ফুটোগুলোতে তুলো গুঁজে দিয়ে যা না। তোর হাত খালি না থাকে তো বউমাকে পাঠিয়ে দে, ছেলে দুটোর ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!' দিদিমা ঠাণ্ডাকে বড় ভয় করিতেন। শীতকালে নিজে তিনি আপাদমস্তক গরম জাম-কাপড়ে আবৃত থাকিতেন, তাঁহার মাথায় কান-ঢাকা টুপি এবং পায়ে

মোজা থাকিত, তবু তাঁহার ভয় হইত জানলা-কপাটের ফুটা দিয়ে ঠাণ্ডা প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কোন অনর্থ ঘটাইবে। তাই তিনি নেত্যকে দিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় জানলা-কপাটের ফুটো তুলা দিয়ে বন্ধ করাইতেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, দৈবাৎ কোনও ফুটো বন্ধ না হইলে সেটা বুঝিতে পারিতেন। নেত্যকে কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যায় পরদিনের জন্য মসলা বাটিয়া রাখিতে হইত। তাই ঠিক সন্ধ্যার সময় তাহার হাত খালি থাকিত না। দিদিমার চেঁচামেচির চোটে মামীমাকেই আসিয়া প্রায় প্রতিদিনই তুলা বা ন্যাকড়া গুজিয়া দিতে হইত। কখনও বা নেত্য মসলা বাটিতে বাটিতে উঠিয়া আসিত এবং দিদিমার গালাগালি শুনিতে শুনিতে তুলা গুঁজিত। দিদিমা যত গালাগালি দিতেন সে তত হাসিত। অদ্ভুত মেয়ে ছিল সে। বালবিধবা ছিল বলিয়া তাহার মাথায় চুল বেটাছেলেদের মতো ছাঁটা ছিল, একেবারে কদমফুল ছাঁট। আমাদের রাঙা নাপিতানী দুই মাস অন্তর তাহার মাথায় চুল ছাঁটিয়া দিত। তাহার যৌবনোদগম না হইলে তাহাকে কিশোর বালক বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না। ফরসা গোল মুখ, গাল দুটি টেবো টেবো, ছোট চোখ, হাসিবার সময় চোখ দুটি একেবারে ঢাকিয়া যাইত। তাহাকে কখনও গম্ভীর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সর্বদাই সে হাসিত, অনেক সময় তাহাকে বাসন মাজিতে মাজিতে একা একা বসিয়া হাসিতেও দেখিয়াছি। কাছে-পিঠে কেহ নাই, নেত্য আপন মনে হাসিয়া চলিয়াছে। এ-সংসারটাই যেন তাহার নিকট একটা হাস্যজনক ব্যাপার ছিল। দিদিমার গালাগালি সে যেন বেশি করিয়া উপভোগ করিত, সে বুঝিতে পারিত গালাগালিটা মৌখিক, উহার আড়ালে অফুরন্ত স্নেহ আছে। মামীমা কিন্তু আমার এবং চন্দ্রের উপর ক্রমশঃ চটিতেছিলেন। আমি সুধীরকে কোলে করিলে তিনি যেন সহ্য করিতে পারিতেন না। ছোঁ মারিয়া আমার কোল হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইতেন। আমার বড়ই কষ্ট হইত। আমি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতাম না। তাঁহাকে কখনও আমি বুঝাইতে পাবি নাই যে আমি সত্যই সুধীরকে ভালবাসি, আমার দ্বাবা তাহার কোনও অনিষ্ট কখনও হইতে পাবে না। কিন্তু মনের কথা অনুক্ত হইলেও শিশু তাহা বুঝিতে পাবে। আমার মনের কথা সুধীর বুঝিত। সে আমাকে দেখিতে পাইলেই আমার কোলে আসিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিত। তাহার পর যখন সে বড় হইল, যখন স্কুলে ভরতি হইল তখন সে সর্বদাই আমার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরিত। স্কুলে আমিই তাহার রক্ষক ছিলাম।

এই ভাবে নানারূপ সুখদুঃখের ভিতর দিয়া সাহেবগঞ্জে আমার শৈশব অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ-জীবনে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। মাঝেমাঝে মন্মথ ও খোঁড়া অশ্বিনী আমাদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিত। পূর্বে বলিয়াছি আমাদের পাঠশালার দীনু পণ্ডিত আমাদের জীবনে সমস্যার মতো ছিলেন। কখন যে কাহার উপর তাঁহার কোপদৃষ্টি পড়িবে তাহা কেহ বলিতে পারিত না এবং সেইজন্যই সকলকে সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। মন্মথ এবং অশ্বিনী পণ্ডিতের উপর শোধ তুলিবার চেষ্টা করিত, সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত, কি করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিবে। একট ঘটনা মনে পড়িতেছে। প্রতি বৎসর দীনু পণ্ডিতের শ্বশুরবাড়ি হইতে জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব আসিত এক হাঁড়ি সন্দেশ, এক জোড়া কাপড় এবং একটি চাদর। দীনু পণ্ডিত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তবু তাঁহার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই লৌকিকতাটুকু বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ি হইতে একজন লোক উপহারগুলি বহন করিয়া লইয়া আসিত। সেবার একট মজা হইল। যেদিন শ্বশুরবাড়ি হইতে তাঁহার সওগাত আসিল সেদিন

দীনু পণ্ডিত সাহেবগঞ্জে ছিলেন না। কেহই ছিল না বাড়িতে। তাঁহার পাঠশালাটি যাহাতে গভর্নমেণ্টের সাহায্য লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি দুমকায় গিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ির লোকটি যথাসময়ে পাঠশালায় আসিয়া দেখিল পণ্ডিত পাঠশালায় নাই। আমি বলিলাম তিনি দুমকা গিয়াছেন, ফিরিতে হয়তো দুই একদিন বিলম্ব হইবে। সে-সময় পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারবর্গও দেশে গিয়াছিল। লোকটি বলিল, তাহা হইলে আমি অপেক্ষা করি, জামাইবাবু আসিলে তাঁহাকে জিনিসগুলি দিয়া যাইব। সে-সময় পাহাড়তলিতে একটা হাট বসিত। খোঁড়া অশ্বিনী তাহাকে হাট দেখাইতে লইয়া গেল এবং হাটে তাহাকে অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখিল। বাকী কাজটা সমাধা করিল মন্মথ। সন্দেশের হাঁড়িটি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িতে বাহিরের ঘরটিতে ছিল। মন্মথ সন্দেশগুলি বাহির করিয়া হাঁড়ির ভিতর কিছু কচু পুরিয়া হাঁড়ির মুখ পূর্বে যেরূপ ভাবে বাঁধা ছিল সেইরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহার পরদিন আসিলেন। শ্বশুরবাড়ির লোককে বকশিস দিয়া বিদায় করিলেন। তখনও তিনি হাঁড়ি খুলিয়া দেখেন নাই ভিতরে কি আছে। যখন দেখিলেন, তখন তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

পরদিন যখন পাঠশালায় আসিলেন তখন রাগে তাঁহার মুখটা থমথম করিতেছে। মন্মথ আমার কানে কানে বলিল, 'কচু খেয়ে শালার মুখ বোধহয় ফুলেছে।' দীনু পণ্ডিত পাঠশালায় আসিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বলিলেন, ''আমার বাড়িতে গিয়ে সন্দেশের হাঁড়ি থেকে সন্দেশ চুরি করে কে তার ভিতর কচু পুরে দিয়েছে। সত্যি কথা যদি বল আমি কিছু বলব না। আর স্বীকার যদি না কর আমি প্রত্যেককে 'নিল ডাউন' করিয়ে রাখব সমস্ত দিন। তাতেও যদি দোষী ধরা না পড়ে গো-বেড়েন করব প্রত্যেককে।''

আমরা সকলেই নীরব হইয়া রহিলাম। মন্মথ আমাদের প্রত্যেককে সন্দেশের ভাগ দিয়াছিল, আমরা সকলেই জানিতাম কি ভাবে সন্দেশের হাঁড়িতে কচু প্রবেশ করিয়াছে। দীনু পণ্ডিত আমাদের প্রত্যেককে কান ধরিয়া নিল ডাউন করাইয়া দিলেন। তাহার পর ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে মাঝে মাঝে একজনকে পুরাতন পড়াও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যে না পারিল তাহার কর্ণযুগল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। খোঁড়া অশ্বিনী খুব মার খাইল। এই ভাবে যখন আমাদের নির্যাতন চলিতেছে তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভগবান কৃপা করিলেন। সিপাহী ঠাকরুনকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল। তিনি কিছুক্ষণ আগে হইতেই রাস্তার ওপারে দাঁড়াইয়া দীনু পণ্ডিতের কীর্তিকলাপ দেখিতেছিলেন। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইতেই তিনি রাস্তা পার হইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন। সিপাহী ঠাকরুনকে দেখিয়া দীনু পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল।

''ড্যাম! এসব কি হচ্ছে দীনু! ছেলেগুলোকে মেরে ফেলবে নাকি! এটা তোমার পাঠশালা না, কসাইখানা? সিট্ ডাউন!''

উচ্চকণ্ঠে তাঁহার মিলিটারি আদেশ শুনিয়া আমরা সকলে বসিয়া পড়িলাম।

দীনু পণ্ডিত আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'অতি পাজী ছেলে এরা। আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে সন্দেশ এসেছিল এরা সেগুলো চুরি করে খেয়ে হাঁড়ির ভিতর কচু পুরে রেখেছেন মা ঠাকুরুন।''

''কে এ কাজ করেছে ধরতে পেরেছ?''

"ধরতে পারিনি ঠিক, তবে এরাই করেছে।"

"সেটা জানলে কি করে তুমি! তুমি কি গণৎকার?"

ধমক খাইয়া দীনু পণ্ডিত থতমত খাইয়া গেলেন।

সিপাহী ঠাকরুন বলিলেন, "আমি আজই তোমার নামে রিপোর্ট করছি। তুমি গুরু নও, দানব।"

এই বলিয়া সিপাহী ঠাকরুন গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন।

দীনু পণ্ডিত তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন, "তাহার পর বলিলেন, "যাও তোমরা বাড়ি যাও।"

পরদিন হইতে পাঠশালা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। দীনু পণ্ডিত সন্দেশের কথা যেন ভুলিয়াই গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মামা নুনের ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হইলেন। দিদিমার ধারণা হইল তিনি মা মঙ্গলচণ্ডীকে মানত করিযাছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মা দয়া করিয়াছেন। তিনি মামাকে বলিলেন, "তুই এবার নিজে গিয়ে মায়ের পুজোটা যাতে ভালো করে হয় তার ব্যবস্থা কর। এ ক'বছর তো টাকা পাঠিয়ে পুজো হচ্ছে। প্রতি বছর ওরকম বেগার-ঠেলা পুজো করা ঠিক নয়। আমি এখানে বসে বসেই রোজ মাকে বলি, মা অপরাধ নিও না, ছেলে ব্যস্ত আছে বলে নিজে যেতে পারে না। এবার নিশ্চয় যাবে। তুমি যাও এবার বৌমাকে নিয়ে। আমি তো চোখে দেখতে পাইনা পেলে আমিই যেতাম। আমি নেত্যকে নিয়ে থাকছি তুমি ঘুরে এস। জমিজায়গারও তদারক করে এস। এ-বছর তো ঠাকুরপো একটি পয়সা পাঠায় নি, লিখেছে ফসল ভালো হয় নি বলে পাঠাতে পারে নি। নিজে একবার গিয়ে দেখা দরকার।"

মামা যাওয়াই স্থির করিলেন। সে-সময় আমারও পূজার ছুটি। আমিও দিদিমাকে ধরিয়া বসিলাম মামার সহিত আমিও যাইব। দিদিমা প্রথমে রাজী হন নাই। অনেক কাঁদাকাটি করিয়া ধরাতে শেষটা হইলেন। তাহাও বোধহয় হইতেন না কিন্তু মামীমা বিশেষ অনুরোধ করতে হইলেন। মামীমার একটু স্বার্থ ছিল। সুধীর আমার খুব ন্যাওটা হইয়া পড়িয়াছিল। সে অপরের কোলে কাঁদিত কিন্তু আমার কোলে কাঁদিত না। তাহার আর একটা প্রিয়জন ছিল নেত্য। নেত্য কিন্তু দিদিমার কাছে থাকিবে, সুতরাং মামী আমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

পর্ব

অনেকদিন পরে শঙ্করায় ফিরিলাম। আমার বয়স তখন বোধহয় বারো বছরের কাছাকাছি। শঙ্করায় দেখিলাম অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সই-মায়ের—সন্তোষের মায়ের—পরিবর্তনটা বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল। দেখিলাম তাঁহার চুলে পাক ধরিয়াছে, সামনের দিকে চুলই নাই খানিকটা জায়গায়। আগে সোজা হাঁটিতেন, এখন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। মুখের হাসিটাও একটু বদলাইয়াছে, কারণ নীচের কয়েকটা দাঁতই নাই। সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম সন্তোষের। দেখিলাম সে ওই বয়সেই একটি 'ফুল'-বাবুতে পরিণত হইয়াছে। ফুল পেড়ে কোঁচানো ধুতি পরে। ডবল-ব্রেস্টেড শার্ট। গেঞ্জিগুলিও বেশ শৌখিন। ঝিনুকের বোতাম দেওয়া এবং বোতামের ঘরের আশেপাশে রেশমের সুতা দিয়া ফুল-লতা-পাতা আঁকা। আমি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ও-রকম গেঞ্জি আমি আগে কখনও দেখি নাই। সন্তোষের পাঞ্জাবি-গুলিও দেখিলাম, আদ্দির এবং চমৎকার গিলা করা। সন্তোষের দুই জোড়া গোঁফ-ওলা পামশু দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। সই-মা বলিলেন, উনি গতবার পুজোর সময় এই সব কিনে এনেছিলেন। এবার আরও আনবেন। তোর পায়ে হয় তো নিয়ে যা এক জোড়া। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রইলাম। আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, মনে হইতেছিল আমার কানের ডগা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। একটি কথাও বলি নাই। সই-মা কিন্তু আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। আমর মুখের দিকে চাহিয়া সহসা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তিনি। অনেকক্ষণ চোখে আঁচল দিয়া নীরবে কাঁদিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আজ বারাহী নেই তাই আর কিছুই নেই। তোকে যে দুটো জামা জুতো দেবো সে অধিকারও আমার আর নেই। সবই ফুরিয়ে গেছে।" তাহার পর চোখের জল মুছিয়া আদর করিয়া আমার গায়ে-মুখে-মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমি তোর সই-মা যে। তোর যেদিন জন্ম হয়, আঁতুড় ঘরে আমি ছিলাম সেদিন। তোর মা বেঁচে থাকলে একদিন তোকে বলত সব। তখন বুঝতে পারতিস আমি তোর পর নই। আপন জন, অতি আপন। নিয়ে যা ওগুলো। গায়ে দিয়ে দেখ। রাজু, দাদার পাঞ্জাবীগুলো নিয়ে আয় তো।"

তিন-চার বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে তিন-চারটি পাঞ্জাবী লইয়া হাজির হইল। মেয়েটির গায়ের রং ধপধপে ফরসা। চুলগুলি লাল। চুলের বেড়া-বিনুনি করা।

"প্রণাম কর আগে—"

রাজু প্রণাম করিয়া জামাগুলি ফেলিয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষের মা বলিলেন, "একে তুই দেখিস নি। এ আমার ছোট মেয়ে।"

সন্তোষের ছোট একটি টাট্টু ঘোড়াও আছে দেখিলাম। হরি বাগ্‌দীর ছেলে নিতাই সেটির দলাই-মালাই করে। সন্তোষ আমাকে আস্তাবলে লইয়া গিয়া দেখাইতে লাগিল।

বলিল, "নিতাইটা দলাই-মলাইয়ের কাজ এখনও শেখে নি ভালো করে। নগেন চৌধুরীর বুড়ো সহিসটাকে রাখতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে আসতে চায় না।"

নিতাই বলিল, "আমিই শিখে নেব দাঠাকুর, তুমি কিচ্ছু ভেবো নি।"

নিতাইয়ের বয়স দশ-এগারো বৎসর, কিন্তু দেখিলাম তাহার এবিষয়ে উৎসাহ প্রবল। সে আমাদের সম্মুখেই দলাই-মলাই শুরু করিয়া দিল।

সন্তোষের লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। সে গোলক পণ্ডিতের পাঠশালাতেই ঢুকিয়াছিল। কিন্তু গোলক পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন।

শুনিলাম বলিয়াছিলেন, "গরুর কখনও লেখাপড়া হয় না। তুই গোয়াল ঘরে গিয়ে জাবনা খা, পাঠশালায় আসতে হবে না।"

ইহাতে সন্তোষ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় নাই। সে নাকি সত্যিই একদিন গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া বাছুরের দড়িটা গলায় দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"মা, দেখ দেখ আমি কেমন গরু হয়েছি।" সন্তোষের মা হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ বুঝিয়াছিলেন ছেলের আর লেখাপড়া হইবে না। আর তাহাকে পাঠশালায় পাঠান নাই।

ঠানদি তখনও বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। তিনি ঘরের বাইরে বড় একটা যাইতেন না। তাঁহার কথা কেহ উল্লেখও করে নাই। আমিও তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেকদিন পরে আমি তাঁহার ভয়াবহ মৃত্যুকাহিনী শুনি।

মামা খুব ধুমধাম করিয়া পূজা করিলেন। গ্রামের সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। গ্রামের জমিদার চৌধুরী মহাশয় নিজে দাঁড়াইয়া খাওয়া-দাওয়া, কাঙালী-ভোজন প্রভৃতির তদারক করিয়াছিলেন। খেতুমামাও নিজের প্রতিপত্তি জাহির করিতে কসুর করেন নাই। তিনি এমন একটা ভাব দেখাইতেছিলেন যেন তিনিই বাড়ির সর্বময় কর্তা। সেইসময় তিনি মামাকে যে-গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহা আমি আজও ভুলি নাই। চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া গল্প হইতেছিল, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেতুমামার কণ্ঠস্বর একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকিত। কাহিনীটি বীরত্বব্যঞ্জক হইলে তাহা উচ্চতর হইত।

খেতুমামা বলিতেছিলেন, "সেই ডাব চুরির কথা তোমার মনে আছে শক্তি?"

"কোন্ ডাব চুরি?"

"আরে সেই যে চৌধুরীদের বাগানে বিশে শালা ডাব চুরি করবার জন্যে গাছে উঠেছিল আমি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। মনে নেই এক লাঠিতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম তার? সেই নিয়ে মামলা হল, আমার জেল হয়ে গেল।"

মামা বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে।"

"সেই বিশে আবার আমার খপ্পরে পড়েছিল। এখন শালা জেলে ঘানি টানছে। নফরা আজকাল তিনপাহাড়ের স্টেশন মাস্টার জান তো?"

"শুনেছি"

নফরা খেতুমামার বড় ছেলে।

"আমি এই কিছুদিন আগে নফরার কাছে গিয়েছিলাম। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ নফরা এসে বললে, বাবা, ইঁদুরটা এবার কলে পড়েছে, দেখবে না কি। নফরা একটু আধটু কবিতা লেখে জানো তো, উপমা দিয়ে কথা বলে। আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। জিগ্যেস

করলাম কোথায় কলে পড়ল। তখন সে হেঁয়ালিটি ভেঙে বলল—বিশে বামালসুদ্ধ ধরা পড়েছে। গাঁজা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল, পুলিশ ধরে তিনপাহাড়ে নাবিয়েছে। আমি যদি পুলিসকে অনুরোধ করি, পুলিস হয়তো ছেড়ে দিতে পারে। পুলিস আমার চেনা। বললাম, খবরদার। উঠে পড়লুম বিছানা থেকে। ভাবলুম শালার চাঁদবদনটি দেখে আসি একবার। পা বাড়ালুম স্টেশনের দিকে। গিয়ে দেখি বসে আছেন বাছাধন মুখখানি চালতার মতো করে। ইচ্ছে হল একটা লাথি ঝেড়ে দি শালার মুখের উপর। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হল না। কেবল গালাগালি দিলাম। বললাম, কিরে শালা এইবার তো টের পেলি যে ভগবান আছেন। ব্যাটা ইঁদুর, চিরকাল গোলার ধান চুরি করে খেয়েছিস। ফাঁদের কথাটা ভুলে গিয়েছিলি, না? আমার কথা শুনে গুম হয়ে বসে রইল।"

কুমারের চোখে ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। সমস্ত দিন প্রচুর খাটুনি গিয়াছে। কাল সেজ-দা আসিবে, ভোরে উঠিয়াই চাকরদের লইয়া স্টেশনে যাইতে হইবে। আর রাত জাগা ঠিক নয়। আলো নিবাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

।। বারো ।।

উশনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে অনেকে গিযাছিল। কুমার তো ছিলই, বিরুবাবুও ছিলেন। একটু পরে সন্ধ্যা, রঙ্গনাথ, গগন, সুব্রত, সোমনাথ, স্বাতী, চিত্রাও আসিযা হাজির হইল। কৃষ্ণকান্ত আসেন নাই, কারণ খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি তিতিরের সন্ধানে বিছুয়া জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন।

ডিস্‌টান্ট সিগ্‌ন্যালটার দিকেই চাহিয়া ছিলেন সকলে। একটু দূরে চার-পাঁচটি চাকর অপেক্ষা করিতেছিল। কুমারের কুকুর দুইটিও সকলের সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারাও যেন বুঝিতে পারিয়াছিল বাড়ির কোনও পরিজন আসিতেছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহাদেরও স্টেশনে যাওযা উচিত। কিন্তু স্টেশনে গিয়া যতটা শোভনতা রক্ষা করা কর্তব্য ততটা তাহাদের ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল না। ছুঁচকি ল্যাংল্যাংয়ের পিঠের উপর পা দুইটি তুলিয়া দিয়া তাহার কান কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, আর ল্যাংল্যাং চেষ্টা করিতেছিল তাহাকে ফেলিয়া দিয়া তাহার পা কামড়াইয়া ধরিতে। তাহারা খ্যাঁক খ্যাঁক গরর গরর শব্দও করিতেছিল, কিন্তু মৃদুভাবে। কারণ তাহারা ঝগড়া করিতেছিল না, খেলা করিতেছিল। এমন সময় প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে 'তাকিয়া'কে দেখা গেল। 'তাকিয়া' ছুঁচকি এবং ল্যাংল্যাংয়ের শত্রু। সুতরাং ছুঁচকি ল্যাংল্যাং আর কালবিলম্ব করিল না। ল্যাজ ও কান খাড়া করিয়া বীরবিক্রমে তাড়া করিয়া গেল। 'তাকিয়া' বেশ হৃষ্টপুষ্ট কুকুর। সম্মুখ-সমযের আগুয়ান হইলে সে হয়তো ইহাদের ঘায়েল করিতে পারিত। কিন্তু সে মহাভীতু। ল্যাজটি পিছনের পা দুইটির মধ্যে ঢুকাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। নিমিষের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া পাশের আমবাগানের ভিতর দিয়া কোথায় সে যে গা ঢাকা দিল তাহা ঠিক বোঝা গেল না। বিজয়ী ছুঁচকি ল্যাংল্যাং ফিরিয়া আসিয়া কুমারকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। উভয়েই হাঁপাইতেছে, উভয়েরই জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে, ল্যাংল্যাংয়ের মুখেও বেশ একটা বাহাদুরির ভাব। তাহারা হয়তো ভাবিতেছিল সকলেই তাহাদের তারিফ করিতেছে, আসলে

কিন্তু কেহই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্যও করে নাই। কুকুর কুকুর দেখিলেই তাড়া করিয়া যায়, ঝগড়া করাই উহাদের স্বভাব। ইহাতে লক্ষ্য করিবার কি আছে? কিন্তু ছুঁচকি ল্যাংল্যাংয়ের মুখভাব দেখিয়া মনে হইল, তাহাদের আত্মপ্রসাদের যেন সীমা নাই।

.....একটু পরেই গঙ্গা আসিয়া পড়িল। আসিয়াই রাগতকণ্ঠে কুমারকে বলিল, "মধুকে তুমি দূর করে দাও, ওর দ্বারা আর কাজ চলবে না।"

"কেন, কি করেছে—"

"ওকে কাল থেকে পইপই করে বলেছি যে সাড়ে আটটায় গাড়ি ও যেন ঠিক সময় বয়েল দুটোকে খেতে দিয়ে স্টেশানে আটটার সময় গাড়ি নিয়ে আসে। তোমরা তো চলে এলে, আমি গোয়ালে গিয়ে দেখি বয়েল দুটোকে থেকে দিয়েছে বটে কিন্তু মধুর পাত্তা নেই। দৌড়লুম তার বাড়ি। সেখানওে দেখি নেই। তার মেয়েটা বললে জগন্নাথের দোকানে গেছে। গেলুম সেখানে। জগন্নাথ বললেন ও বয়েল দুটোর জন্য দড়ি কিনতে এসেছিল, নিয়ে গেছে দড়ি। এসব কি আগে করতে পারে নি?"

কুমার প্রশ্ন করিল, "গাড়ি এসেছে তো?"

"এসেছে—"

"তুই তাহলে বাড়ি চলে যা। আমি যেগীয়ার মাকে পাঁচ সের আটা দিয়ে যেতে বলেছি। সেটা তুই নিয়ে বৌদিকে দিয়ে আয়। সেজ-দা কলের ময়দা খাবে না।"

"তুমিও দেখছি মধুর মতো"—গঙ্গা ধমকাইয়া উঠিল—"আমাকে আগে বললেই হত আমি কালই ময়দা এনে রেখে দিতাম। সব কাজ কি শেষ মুহূর্তে করলে চলে!"

গঙ্গা আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

মধু গরুর গাড়ির বয়েল দুইটিকে খুলিয়া দিয়া স্টেশনের বাহিরে গাড়িটি নামাইয়া রাখিয়াছিল। বয়েল দুটিকে একটা পাছে বাঁধিয়া সে কুণ্ঠিতমুখে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া কুমার আগাইয়া গেল।

"বয়েলের নাথ্‌থা ছিঁড়ে গিয়েছিল না কি?"

যে-দড়িটা বয়েলের নাকের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া দুই পাশে লাগামের মতো বাহির হইয়া আসে তাহাকে এদেশে নাথ্‌থা বলে।

মধু বলিল, "না, ছেঁড়ে নি। পুরানো হয়ে গিয়েছিল। আজ সেজবাবু আসছেন, তাছাড়া কাল থেকে বাড়িতে ভোজ, তাই নতুন নাথ্‌থা বদলে দিলাম। জগন্নাথ কাল রঙীন নাথ্‌থা দিতে পারে নি আজ দিয়েছে।"

কুমার একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল মধু বেশ শৌখিন নাথ্‌থাই কিনিয়াছে। লাল এবং সবুজ দড়ির বিনুনি। সাদা নধরকান্তি গরু দুটির মুখে বেশ মানাইয়াছে। কুমার লক্ষ্য করিল মধু গরু দুটির শিঙে তেল মাখাইয়া দিয়াছে। গরু দুইটির মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে তাহারাও এই প্রসাধনে বেশ পুলকিত হইয়াছে যেন। কুমারও খুশী হইল। গঙ্গা যে এইমাত্র মধুর নামে নালিশ করিয়া গেল সে-কথা সে আর মধুকে বলিল না।

"ট্রেন আসছে—ট্রেন আসছে—"

বিরুবাবু মনে মনে অনেকক্ষণ হইতেই শশব্যস্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল

প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান, কিন্তু তাহা অশোভন হইবে বিবেচনা করিয়া কেবল চীৎকারটাই করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া স্টেশনে প্রবেশ করিল। উশনা সেকেণ্ড ক্লাসে ছিলেন। সঙ্গে ছিল স্ত্রী জগন্ময়ী, দুই পুত্র জীবু ও শিবু এবং দুই কন্যা লীলা ও ইলা। তাছাড়া ছিল সুদৃশ্য খাঁচার ভিতর একটি চমৎকার চন্দনা। নাম কৃষ্ণদাস।

উশনা যখন ট্রেন হইতে নামিলেন তখন প্রথমটা কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। কারণ দশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখে দাড়ি ছিল না। কেবল বাবরি চুল ছিল। চশমাও ছিল না। এখন তাঁহার একমুখ কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি। চোখে পুরু লেন্সের মোটা চশমা। চিনিয়া লইতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না। বিরুবাবুই প্রথমে চিনিতে পারিলেন এবং দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আগাইয়া গেলেন।

"কিরে উশনা এসেছিস? দাড়ি রেখেছিস দেখছি। ছি, ছি, কি কাণ্ড? চশমা কবে নিলি? কিছু লিখিস নি তো! চেহারাই বদলে ফেলেছিস! রংটাও ময়লা হয়ে গেছে—"

উশনা দাদাকে প্রণাম করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কেমন আছেন?"

বিরুবাবু, কেন জানি না, উত্তর দিলেন ইংরেজীতে—"Much improved. এ-টালটা সামলে গেলেন বোধহয়।"

শুনিবামাত্র উশনা হাত জোড় করিয়া চক্ষু বুজিয়া মা-কালীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন। তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে একটি জাগ্রত কালী আছেন। বিশাল তাঁহার মন্দির। দূর-দূরান্তর হইতে লোকে সেখানে পূজা দিতে আসে। বাবার অসুখের খবর পাওয়ামাত্র তিনি সেখানে জোড়া পাঁঠা এবং সওয়া পাঁচ টাকার শিন্নি মানত করিয়াছিলেন। জগন্ময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবা ভাল আছেন। আজই বিঠলরামকে পঁচিশটা টাকা টি. এম. ও. করে দাও। কালই যেন মায়ের পুজো দিয়ে দেয়।"

ইহার পর প্রণামের পালা চলিল। চাকররা জিনিসপত্র নামাইতেছিল। অনেক জিনিস। তোরঙ্গ, বিছানা, সুটকেসই গোটা দশেক। তাছাড়া পুঁটুলিও হরেক রকমের। নানা পরিধির ঝুড়িও অনেকগুলি! উশনা একটু যোগাড়ে লোক। সংগ্রহ করার বাতিক আছে। বাবার জন্য পুরাতন চালই আনিয়াছেন পাঁচ-ছয় রকম। কোনটা দশ বছরের পুরোনো, কোনটা বা পাঁচ বছরের, কোনটা কাটারি-ভোগ, কোনটা বাসমতী, কোনটা জিরাসাল। সব রকম ডাল পাঁচ সের করিয়া আনিয়াছেন। বাবা শুক্তো ভালবাসেন বলিয়া নানারকম বড়িও আনিয়াছেন তিনি। একটা ঝুড়িতে বড় বড় অনেক বাতাসা। আর একটা ঝুড়িতে প্যাকেটে-বাঁধা মসলা নানা রকম। মিষ্টিও তিন হাঁড়ি। টিফিন কেরিয়ারে লুচি ঠাসা। অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড হাঁড়িতে এক হাঁড়ি মাংস। ইহা ছাড়া এক টিন ঘি, এক টিন তেল।

বিরুবাবু বলিলেন, "করেছিস কি? এত রকম জিনিস বয়ে এনেছিস কেন?"

উশনা প্রশান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছে আমার ক্লায়েন্টরা। বয়েছে কুলিরা। আমাকে কিনতেও হয় নি। বইতেও হয় নি।"

মাংসর হাঁড়িটা দেখাইয়া বলিলেন, "ওইটে আনতেই একটু বেগ পেতে হয়েছে। চার জায়গায় চেঞ্জ তো। প্রত্যেক জায়গায় গরম করিয়ে নিয়েছি। আমরা সবাই তো মাংসাশী, মাংসটা পেলে খুশী হবে সবাই। তাছাড়া ওটা মা কালীর প্রসাদ—"

বিরুবাবু বলিলেন, "কিন্তু কাকাবাবু এসেছেন—"

"বাঃ, ভালই হয়েছে! অনেক দিন দেখি নি কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর জন্যেও কিছু মেওয়া আছে। আছে না গো?"

জগন্ময়ী আধ-ঘোমটা দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন আছে। তাহার পর চুপিচুপি কুমারকে বলিলেন, "সন্দেশের হাঁড়িগুলো মাংসের হাঁড়িটার সঙ্গে ঠেকাঠেকি কোরো না। তাহলে কাকাবাবুও খেতে পারবেন।"

কুমার মধুকে ডাকিয়া বলিল, "তিন খেপ লাগবে। সন্দেশের হাঁড়ি বোধিয়া আর মাংসের হাঁড়িটা ল্যাংড়া নিয়ে যাক। বাকি জিনিস তুই গাড়িতে নিয়ে যা। গাড়িতে একবারে যদি না কুলায়, দুবারে যাবে।"

সকলেই পদব্রজে বাড়ির দিকে রওনা হইলেন। স্টেশনের কাছেই বাড়ি।

রঙ্গনাথ সন্ধ্যাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেজকাকা কি কাজ করেন?"

"উনি একজন বড় কনট্রাক্টার"

"চেহারাটা কিন্তু রাজার মতো"

"তার মানে?"

"তাসের রাজার ছবি দেখ নি?"

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "ওঁর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পাবরে ওঁর মেজাজও রাজার মতন। আমার বিয়েতে উনি আসতে পারেন নি, কিন্তু সব চেয়ে দামী হারটা উনিই পাঠিয়েছিলেন।"

রঙ্গনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। জবড়জং হারটা তাঁহার পছন্দ হয় নাই। সেকথা তখনও বলেন নাই, এখনও বলিলেন না।

বাড়ির কাছে আসিয়া কিন্তু উশনা যাহা করিলেন তাহা আধুনিক দৃষ্টিতে হাস্যকর। তিনি গেটে ঢুকিয়াই "বাবা গো" বলিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের মতো ছুটিয়া সূর্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চোখ হইতে চশমা পড়িয়া গেল, মুখের ঘন গোঁফ-দাঁড়ি অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি সূর্যসুন্দরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পা-টার উপর মাথা রাখিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সূর্যসুন্দর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে উশনার এই ছেলেমানুষী দেখিতেছিলেন। মনে মনে কৌতুক-বোধও করিতেছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল একটু উপহাস করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করেন, কিন্তু তাহা করিলেন না, সহসা তাঁহার চোখ হইতেও টপটপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার চোখের উপর বালক উশনার চেহারাটা ভাসিয়া উঠিল। তাহার ছেলেবেলার একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িল, স্নান করিবার আগে সে কিছুতেই তেল মাখিতে চাহিত না। তাহার মাকে এবং চাকরদের এড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। বলিত তেল মাখাইতে গেল তাহার না কি কাইকুতু লাগে। সেই বালক এবং এই চাপদাড়ি-ওলা লোকটা যে একই ব্যক্তি তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। সূর্যসুন্দর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উশনা প্রশ্ন করিলেন, "এখন কেমন আছ বাবা।"

"আমি খুব ভাল আছি। তুই অমন করে কান্নাকাটি করিস না। হাতমুখ ধুয়ে আগে চা জলখাবার খেয়ে নে"

বিরুবাবু তাঁহাকে ধরিয়া ভিতরের দিকে লইয়া গেলেন। তাহার পর জগন্ময়ী শিবু জীবু লীলা ইলা একে একে আসিয়া সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিল। শিবু জীবু পায়জামা পরিয়া আছে দেখিয়া সূর্যসুন্দর বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সূর্যসুন্দরের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরু উশনাকে বলিলেন, "চল কাকাবাবুর কাছে চল, কাকাবাবু কাল থেকে অনেকবার তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। সন্ধ্যাহ্নিকের ঝামেলা না থাকলে স্টেশনেও হয়তো যেতেন।"

চন্দ্রসুন্দর সকালে ও সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ করিয়া পূজাপাঠ করেন। উশনা আর বিরু গিয়া দেখিলেন তখনও তাঁহার পূজা শেষ হয় নাই, উদাত্তকণ্ঠে শিব-স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। পদ্মাসনে ঋজু হইয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু দুইটি মুদিত, হাত দুইটি জোড়-করা। সম্মুখে কোশাকুশি এবং নানারকম ফুল। নিকটেই রাধানাথ গোপও হাত জোড় করিয়া বসিয়া ছিলেন। উশনাকে দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন এবং চোখের ইঙ্গিত করিয়া বসিতে বলিলেন। রাধানাথই খুব ভোরে পূজার ফুল যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন। উশনা প্রথমে বসিলেন না। দূর হইতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর সেখানেই বসিয়া পড়িলেন মাটিতে। কয়েক মিনিট বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেলেন আবার।

স্নানান্তে উশনা জলখাবার খাইতে বসিলেন। পুরসুন্দরী নানারকম মিষ্টান্ন, ফল, ছানা, সর প্রভৃতি সাজাইয়া দিয়া একটি পাখা হাতে করিয়া সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

"একি কাণ্ড করেছ বউদি। এতো খাওয়া যায়! ভোগের মতো সব সাজিয়ে দিয়েছ, আমি কি ঠাকুর নাকি!"

"ঠাকুরপো তো বটে। খাও, বেশী কিছু দিই নি। কাল থেকে জগোর উপরই ভার দেব, সেই তোমার খাওয়া-দাওয়ার তদারক করবে। তুমি কি খাও তা তো আমার জানা নেই।"

"আমি সকালে এক গ্লাস গরম দুধ আর একটি সন্দেশ খাই। বাস্। বিকেলে কাজ থেকে ফিরেও তাই"

"বেশ এখানেও তাই হবে।"

তাহার পর পুরসুন্দরী বলিলেন, "কত জিনিসপত্র এনেছ তুমি। হাঁড়ি আনাতে হবে কয়েকটা। এখানে ভাঁড়ারের সব হাঁড়ি ভরতি।"

"আমি সব গুছিয়ে দেব। কয়েকটা হাঁড়ি আর একটা খড়ি আনিয়ে রাখ। খড়ি দিয়ে হাঁড়ির উপর নাম লিখে দেব। ওখানেও আমি এইভাবে ভাঁড়ার গুছিয়ে দিয়েছি।"

"গঙ্গাকে হাঁড়ি আর সরা আনতে বলেছি। খড়িও আনতে বলব।"

উশনা আহারে মন দিলেন। যদিও তিনি প্রথমটা আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাতে তাঁহার কিছুই পড়িয়া নাই।

আহারের পর চীৎকার করিয়া তিনি মেয়েকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

"ওরে লীলা আমাকে পান দে। তোর বড়মার জন্যেও আনিস।"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "এখন আর পান খাই না ভাই। দাঁতগুলো সব গেছে।"

"ভাল মঘই পান এনেছি। এক খিলি খেয়ে দেখ না।"

লীলা চমৎকার একটি পানের বাটা বাহির করিয়া পান সাজিতে বসিল। বাটাটি শুধু যে বড় তাহা নয়, কারুকার্যময়। মোরাদাবাদের।

।। তেরো ।।

চিত্রার তাঁবুতে চিত্রা, স্বাতী, লীলা এবং ইলা জটলা করিতেছিল। স্বাতী ও চিত্রা সহোদরা। ইহারা পরস্পরকে খানিকটা চেনে, কিন্তু বিবাহের পর ইহাদের ঘিরিয়া একটা রহস্যের অন্তরাল সৃষ্টি হইয়াছে, কুয়াশার মতো কি একটা যেন পরস্পরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে যেন আর স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় না। বাল্যকালে এবং কৈশোরে তাহারা ঝগড়া করিত, খুনসুটি করিত, তাহাদের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। এখন হইয়াছে। তাহাদের উভয়েরই জীবনে স্বামীর এবং শ্বশুরবাড়ির যে প্রভাব পড়িয়াছে তাহার সবটা পরস্পরের নিকট খুলিয়া বলা চলে না। স্বাতীর স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চিত্রার স্বামী পুলিস সুপারিনটেণ্ডেট। দুইজনেই পদস্থ অফিসার। স্বাতী এবং চিত্রা সুবিধা পাইলেই এখন গল্পচ্ছলে নিজের নিজের স্বামীর গুণপনা এবং মহিমা আস্ফালন করিতে চেষ্টা করে। অবশ্য শোভনতা রক্ষা করিয়া। পরস্পরের গহনা কাপড় প্রভৃতির খবব সংগ্রহ এবং বিতরণ করিবার আগ্রহও ইহাদের কম নয়। দেখা হইলে এইসব সম্পর্কেই আলাপ করে উভয়ে। তবু খানিকটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়।

আজ স্বাতী লীলা ও ইলাকে চিত্রার কাছে আনিয়াছে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য। নূতন করিয়াই আলাপ করিতে হইবে। কারণ স্বাতী-চিত্রা ইহাদের শেষবার দেখিয়াছিল গগনের উপনয়নের সময়। তখন খুব ছোট ছিল ইহারা। একজন আট বছরের আর একজন ছয় বছবের। দশ বৎসরে ইহাদের প্রচুর পরিবর্তন হইয়াছে। অষ্টাদশী লীলা এবং ষোড়শী ইলা উভয়েই এখন নূতন মানুষ।

ইহারা আসাতে চিত্রা একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। কারণ সে ঠিক করিয়াছিল সূর্যসুন্দরের একটা ছবি আঁকিবে। তাহারই তোড়জোড় করিতেছিল, ইহারা আসাতে মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। স্বাতী ইচ্ছা করিয়াই এই সময়ে ইহাদের লইয়া আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ চিত্রাকে বিরক্ত করিবার জন্যই। স্বাতী একটু দুষ্টপ্রকৃতির, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'মিস্‌চিভাস্‌'।

স্বাতী অসিয়াই বলিল, "এদের দুজনেরই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে, জানিস?"

লীলা-ইলা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

চিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ক্লাসে পড় তোমরা?"

লীলা বলিল, "আমরা বাড়িতে পড়ি। ক্লাস এইটের বই পড়ছি এখন।"

বলিয়াই সে—একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে জানে তাহাদের যে বয়স তাহাতে তাহাদের আরও অনেক উঁচু ক্লাসে পড়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহার কারণও নির্দেশ করিল সে।

"বাবা স্কুলে পড়ানো পছন্দ করেন না। তাই আমাদের স্কুলে পড়া হয় নি। বাড়িতেই পড়ি আম্‌রা।"

ইহা কিন্তু তাহাদের নীচু ক্লাসে পড়ার সত্য কারণ নয়। আসল কারণ উশনা মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়া বিষয়ে তাদৃশ উৎসাহী নন। হইলে মেয়েদের বোর্ডিংয়ে রাখিয়া পড়াইতে পারিতেন। সে সংগতি তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি জানেন লেখাপড়া শিখাইলেও মেয়েদের একগাদা টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিতে হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া তাহাদের বা

বরপক্ষের শাড়ি-গয়না-ফার্নিচার-লোলুপতা কিছুমাত্র কমিবে না। স্কুল-কলেজে পড়িয়া প্রকৃত জ্ঞান বা বিদ্যালাভের সম্ভাবনা নাই। সম্ভাবনা আছে বিপথে যাইবার। সুতরাং তিনি ও-বিষয়ে তেমন গা করেন নাই। তবে একটা কাজ তিনি করিয়াছেন—মেয়ে দুটির সংগীত সাধনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। শুকুলদেবজী নামে একজন বৃদ্ধ ওস্তাদকে তিনি বাড়িতে স্থান দিয়া ঘরের লোক করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় খরচ উশনাই বহন করেন। শুকুলদেব লীলা ও ইলাকে সেতার শিখাইয়াছেন। তাহাদের সেতার-বাজনা শুনিবার মতো।

চিত্রা মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় বিয়ের ঠিক হয়েছে?"

লীলা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। ইলা একটু বেশী সপ্রতিভ। সে বলিল, "দিদির ঠিক হয়েছে বম্বেতে আর আমার নাগপুরে।"

"কি করে পাত্ররা—"

"যিনি বম্বের তিনি আই. এ. এস. আর যিনি নাগপুরের তিনি ইন্‌জিনিয়ার।"

"বাঃ, বেশ।"

স্বাতী বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে একটু হিংসা হইল তাহার। চিত্রা বলিল, "কাকাবাবু খুব ভালো পাত্র যোগাড় করেছেন তো!"

ইলা আরও বিশদ করিয়া বলিল ব্যাপারটা।

"যিনি আই. এ. এস. তিনি বাবার এক বন্ধুর ছেলে। বাবার সেই বন্ধুটি হঠাৎ মারা যান। তাঁর ছেলেকে বাবাই বরাবর পড়িয়েছেন। খুব ভালো ছেলে। আমাদের পালটি ঘর। সে নিজেই বাবাকে বলেছে যে দিদিকে বিয়ে করবে।"

এই পর্যন্ত বলিয়া ইলা চুপ করিল। স্বাতীর ইচ্ছা করিতেছিল ইলার ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির কথাও খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে। কত পণ লাগিবে, কি কি গহনা দিতে হইবে, ফার্নিচার কি কি চাহিয়াছে, ছেলেটি দেখিতে কেমন—এইসব। কিন্তু সে সুযোগ আর হইল না। ইলার দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল।

"ওখানে বাঁশ পুঁতে আলনার মতো করছে কেন? কাপড় শুকুতে দেবে?"

"না, ওখানে মাছ টাঙিয়ে রাখা হবে। বৌদির কাল সাধ যে। অনেক জায়গা থেকে মাছ আসবে তো। সেইগুলো টাঙিয়ে রাখা হবে।"

"কত মাছ আসবে?"

"শুনেছি অনেক। নিখিল দাদু বলছিলেন পঁচিশ মণ মাছের ব্যবস্থা করেছেন তিনি।"

"অনেক লোক খাবে বুঝি?"

"সে তো খাবেই।"

জীবু আসিয়া খবর দিল সন্ধ্যা লীলা-ইলাকে ডাকিতেছে।

স্বাতী বলিল, "চল, আমিও যাই। পিসীমা নিশ্চয়ই একটু নতুন কিছু মতলব আঁটছে। চিত্রা যাবি?"

"না। আমি এখন দাদুর ছবি আঁকব।"

স্বাতী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চিত্রার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া এক ছুটে চলিয়া গেল। এ-হাসির ঠিক অর্থ যে কি তাহা চিত্রা বুঝিল না,

তবু তাহারও মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল। সে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া সূর্যসুন্দরের কাছে হাজির হইল।

সূর্যসুন্দর বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন।

"দাদু, তোমার ছবি আঁকব।"

উর্মিলা একধারে বসিয়া একটা বই পড়িতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চিত্রা বলিল, "কাকীমা, এইগুলো ধর তো। আমি আমার ইজেলটা নিয়ে আসি। পশ্চিমদিকের জানালাটাও খুলে দাও"

উর্মিলার হাতে রংয়ের বাক্স, তুলি, পেলেট, পেনসিল প্রভৃতি দিয়া চিত্রা আবার চলিয়া গেল। একটু পরেই সে একটা স্ট্যাণ্ডে ফিট করা ক্যানভাসে এবং ছোট একটা ফোলডিং টুল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সূর্যসুন্দর বালিশে ঠেস দিয়া আরামেই বসিয়া ছিলেন। তিনি সম্মুখের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেওয়ালটা দেখিতেছিলেন না। অতীতকে দেখিতেছিলেন। যে-অতীত আর ফিরিবে না, অথচ যে-অতীতেরই নবরূপ বর্তমান সেই অতীতই তাঁহার চোখে মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। উশনাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য, যে উশনাকে তিনি শেষবার, প্রায় দশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলেন সেই উশনাই তাঁহার মনে জীবন্ত হইয়া ছিল। আজ যে ব্যক্তি আসিয়াছে সে যেন অপরিচিত। উশনার মুখে চাপদাড়ি ও চোখে পুরু লেন্সের চশমা তিনি কল্পনাই করেন নাই। তাঁহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া উশনার ওই কান্নাটাও তাঁহার তত ভাল লাগে নাই। মনে হইয়াছিল বড় বেশী মেয়েলী। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁহার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল। (থিয়েটার দেখিতে দেখিতেও তো চোখে জল আসিয়া পড়ে), কিন্তু ব্যাপরাটা তাঁহার তত শোভন মনে হয় নাই। অথচ কি করিলে যে ঠিক শোভন হইত তাহাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিতে পারিতেন না। তিনি তাহা ভাবিতেও ছিলেন না। থিয়েটারের কথা মনে হওয়াতে তাঁহার মনে পড়িতেছিল মন্মথকে। সে অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। সে খুব ভালো থিয়েটার করিত। তাহার ছিল ছন্নছাড়া জীবন। তাহার পারিবারিক অশান্তি, তাহার অভিনয়-নিপুণতা, তাহার অপূর্ব সংগীত সমস্তটাই যেন তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি আঁকার আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে তিনি দেখিতেছিলেন না। স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া তিনি অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পড়িতেছিল কোন একটা নাটকে (নাটকের নামটা ঠিক মনে নাই) মন্মথ এক দরবেশের ভূমিকায় 'সচ্চা সল্‌লা লেও দিলদার' গানটা গাহিয়াছিল। কী অপূর্ব সে গান! মন্মথ প্রায়ই আসিয়া তাঁহার কাছে থাকিত। বামুনদিদি এজন্য তাহাকে কত বকিতেন কিন্তু সে গ্রাহ্য করিত না। তাঁহার বামুনদিদিকেও মনে পড়িল। বামুনদিদি তাঁহার বাড়ির রাঁধুনী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় বাড়ি ছিল তাহার। জামিদারী সেরেস্তার এক গোমস্তা অনুকূলবাবু তাহাকে দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। অনুকূলবাবুর বাড়িতে সে কিন্তু টিকিতে পারে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ যদিও সে বাড়ির রাঁধুনী মাত্র ছিল, কিন্তু সে চাহিত সকলের

উপর কর্তৃত্ব করিতে, সেই যেন বাড়ির মালিক। এ অসঙ্গত আবদার কাহারও পক্ষে সহ্য করা কঠিন। হক্‌রু চৌধুরীদের বাড়ির এক বধূর সহিত তাহার জানাশোনা ছিল। বউটি তাহাদের গ্রামের। অনুকূলবাবুর স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ করিয়া সে অনুকূলবাবুর গৃহ ত্যাগ করে। সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল হক্‌রু চৌধুরীর বাড়িতে। সূর্যসুন্দরের প্র্যাকটিস তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গৃহস্থালী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তখনও তিনি স্থাপন করিতে পারেন নাই। ডাক্তারি পাস করিবার পূর্বেই মামা অবশ্য তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই সে বধূটি মারা যায়। তাহাকে নিজের সংসারে তিনি আনিতে পারেন নাই। সেই বালিকা-বধূর মুখটা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। জীবনের নিগূঢ় নিবিড় সম্পর্ক তাহার সহিত হয় নাই। সে যেন আগন্তুকের মতো আসিয়া আগন্তুকের মতো চলিয়া গিযাছে। তাহার অনেক পরে আসিয়াছিল রাজলক্ষ্মী। বামুনদিদি আসিবারও অনেক পরে। বামুনদিদির কথাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। খুনখুনে বুড়ী ছিল সে। সোজা হইয়া হাঁটিতে পারিত না, লাঠি ধরিয়া কুঁজা হইয়া হাঁটিত। একটি দাঁত ছিল না, কিন্তু সর্বদাই মনে হইত কি যেন চিবাইতেছে। মাথায় সামান্য যা পাকা চুল ছিল তাহা ঝুঁটি করিয়া পিছনে বাঁধিয়া রাখিত। একটা বড় বড়ির আকারের ছিল সেটা। অত্যন্ত বদরাগী এবং দুর্মুখ ছিল বামুনদিদি। যখন রাগিয়া যাইত তখন উচ্চনীচ জ্ঞান থাকিত না। সূর্যসুন্দরও তাহার নিকট গালাগালি খাইয়াছেন। মন্মথের মতো ঐরাবতও তাহার গালাগালির চোটে কতবার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে। আর একটি লোকও তাহাকে ভয় খাইত। সে অখিল। সূর্যসুন্দরের আর এক বন্ধু। সাহেবগঞ্জে রেলে কাজ কবিত। দারুণ মাতাল ছিল। সূর্যসুন্দর অনেক সময় তাহাকে নর্দমা হইতে তুলিয়া বাড়ি পৌছাইয়া দিয়াছেন। মাতাল হোক, কিন্তু বড় প্রাণখোলা লোক ছিল সে। অন্তর-দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সাহেবগঞ্জে রেলের 'স্টোর-কিপার' ছিল সে। খুব চুরি করিত। আয়না, দেরাজ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, খাট কিছুই বাদ দিত না। কিন্তু একাই সব ভোগ করিত না, বন্ধুবান্ধবদের অকৃপণ হস্তে দানও করিত। তাহার দেওয়া একটা গোলটেবিল এখনও সূর্যসুন্দরের কাছে আছে। এই অখিলকে দেখিলেই বামুনদিদি ক্ষেপিয়া যাইত। অখিলের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাই সে অখিলেব নাম দিয়াছিল 'পোড়া মুহ'—অর্থাৎ মুখপোড়া। অখিল আর বামুনদিদির প্রথম সংঘর্ষের কথাটা আবার সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। বামুনদিদি আসিবাব পূর্বে সূর্যসুন্দরের বাসায় মৈথিলী ঠাকুর রাখারই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাহারা বেশীদিন টিকিত না। প্রায়ই আসিত এবং চলিয়া যাইত। এই জন্যই দেওয়ানজি (হক্‌রু চৌধুরী) বামুনদিদিকে সূর্যসুন্দরের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "একেই রাখুন। খুব কাজের লোক। লোকও খারাপ নয়, তবে একটু ঝগড়াটে। কিন্তু আপনার বাড়িতে তো এখন পরিবার নেই, কার সঙ্গে আর ঝগড়া করবে।"

অখিল ইহার পর যখন আসিল তখন বামুনদিদি রান্নাঘরের একচ্ছত্র মালিক। অখিল ব্যাপারটা জানিত না। প্রতিবারই আসিয়া সে যেমন রান্নাঘরে সোজা গিয়া ঠাকুরকে বলিয়া আসিত, 'ঠাকুর চাল বেশী নাও। আমি এসে গেছি'—সেবারও তাই করিতে গিয়া কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। বামুনদিদি চীৎকার করিয়া উঠিল "কে র‍্যা তুই! হেঁসেলে জুতো পরে ঢুকেছিস, বেরো, বেরো—"

"আমি অখিল, ডাক্তারবাবুর বন্ধু।"

তাহা শুনিয়া বামুনদিদি আরও ক্ষেপিয়া গেল।

"দূর হ, দূর হ, বেরো এখান থেকে—"

একটা জ্বলন্ত চেলা-কাঠ লইয়া বামুনদিদি অখিলকে তাড়া করিয়াছিল। অখিল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা না করিলে বামুনদিদি সত্যই হয়তো তাহার মুখে জ্বলন্ত কাঠটা গুঁজিয়া দিত। সূর্যসুন্দর তখন বাড়িতে ছিলেন না, 'কলে' বাহিরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া যখন অখিলের সঙ্গে দেখা হইল তখন অখিল বলিল, "সূয্যি, এবার দেখছি রান্নাঘরে কুকের বদলে কুকী রয়েছে। মনুষ্যরূপী 'ড্যাসহুণ্ড' একটি। আর একটু হলে মেরে ফেলেছিল আমাকে। তোমাকেও এইভাবে অ্যাটাক করে নাকি!" অখিলের হাস্যস্নিগ্ধ মুখটা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িতে লাগিল। বামুনদিদি অখিলকে রোজই যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিত। গালাগালির ভাষাটাও ছিল কদর্য। বলিত, "সুয্যি ডাক্তারের বাড়িতে চাল খুব সস্তা, না? তাই দলে দলে তোরা গিলতে আসিস, না?" প্রতিটি 'না'-এর সহিত দুইটি হাত প্রসারিত করিয়া সম্মুখের বাতাসকেই খোঁচা মারিত। সে কাহাকেও বাদ দিত না। অখিল, মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী সকলেরই উদ্দেশ্যে সে একই ভাষা প্রয়োগ করিত। তাহারা চটিত না, হাসিত। অশ্বিনী একবার তাহাকে একটা মলক্কা বেতের মোটা লাঠি আনিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ঠাকরণ, এইটে নাও। শুধু গালাগালি দিয়ে আর হাত নেড়ে আমাদের তাড়াতে পারবে না।"

অশ্বিনীর একটা কথা মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। সে বলিয়াছিল—"বামুনদিদিকে কখনও তাড়িও না। ও তোমার হিতৈষী। তোমার মা বেঁচে থাকলে ঠিক এই কথাই ভাবতেন, হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারতেন না। আমরা গুড্-ফর-নাথিং-এর দল এখানে দিনের পর দিন তোমার অন্ন ধ্বংস করছি আর থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছি, এটা তোমার কোন গার্জেন সহ্য করত না। বামুনদিদি সত্যিই তোমার গার্জেন। ওকে যত্ন কোরো।" বামুনদিদিকে যত্ন করিবার প্রয়োজনই হইত না। সেই বাড়ির কর্ত্রী ছিল। দিন-রাত গজর গজর করিত, আর সকাল হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত খাটিত। বাড়িতে প্রত্যহ দশ-বারোজন বাহিরের লোক তো খাইতই, তাহার উপর হঠাৎ-আসা অতিথিদের সংখ্যাও কম ছিল না। কাটিহার হইতে, পূর্ণিয়া হইতে, বাবসোই হইতে, ভালুকা হইতে, হরিশচন্দ্রপুর হইতে, কিষণগঞ্জ হইতে হঠাৎ চেনা-শোনা লোকের দল আসিয়া পড়িত। গঙ্গাস্নানের কোন একটা যোগ থাকিলে তো কথাই ছিল না, দশ-বারোজন তো বটেই, কখনও কখনও পঞ্চাশ-ষাট জনও আসিয়া সূর্যসুন্দরের বাসায় একবেলা থাকিয়া গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করিয়া যাইত। সমস্ত হাঙ্গামা পোহাইত ওই বামুনদিদি আর মধুয়া চাকরটা।

সেকালে অবশ্য হাঙ্গামাটা এত জটিল ছিল না। প্রথমতঃ চায়ের হাঙ্গামা ছিল না। সূর্যসুন্দরের বাড়িতে চা প্রথম আমদানি করে মন্মথ, বিরুর জন্মদিনে। দ্বিতীয়তঃ, জলখাবারের ব্যাপারটাও সহজ ছিল। ছোলা ভিজা আর গুড়, দুইটা জিনিসই সূর্যসুন্দরের চাষের জমি হইতে আসিত, কখনও কখনও উদিৎ সিং বাহিরে হালুয়া করিত। খাওয়া-দাওয়াও সরল ছিল তখন। ডাল ভাত, দুই একটা নিরামিষ ভাজা-ভুজি আর মাছ। মাছ প্রচুর ছিল। জমিদার বাড়ি হইতে, স্টেশন হইতে, জেলে-রোগীদের নিকট হইতে সূর্যসুন্দর প্রত্যহ এত মাছ ভেট পাইতেন যে তাঁহাকে মাছ কিনিতে হইত না। অনেক সময় তিনি বিতরণ করিয়া দিতে চাহিতেন। কিন্তু বামুনদিদি তাহা করিতে দিত না। বেলা বারোটা পর্যন্ত মাছ বাছিত, কুটিত। মধুয়াকে ছুঁইতে

দিত না। তাহার পর সেগুলি বারান্দায় উনুন জ্বালিয়া ভাজিত। খাওয়া-দাওয়ার পর যে-মাছ বাঁচিত তাহার অম্বল করিত সে। মাছের দিকে অদ্ভুত একটা টান ছিল তাহার। অথচ নিজে সে মাছ খাইত না। বালবিধবা ছিল। অখিল মাঝে মাঝে ক্ষেপাইত তাহাকে। বলিত, "বামুনদিদি, আমি তোমাকে একটা গাউন আর মেমসাহেবের টুপি কিনে দিচ্ছি। তাই পরে তুমি কাঁটা-চামচে দিয়ে চৌকির উপর বসে মাছ খাও, কিছু দোষ হবে না তাতে। সাহেবীপোশাকপরা বিধবা মেমেসায়েবরা গপাগপ মাছ খায়। আর আমাদের দেশের শাস্ত্রকাররা বিধান দিয়েছেন বৃহৎ কাষ্ঠের উপর বসে খেলে দোষ নেই। তাই কর তুমি।" বামুনদিদি তাহাকে ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিত। বামুনদিদিকে ক্ষেপাইয়া ক্ষেপাইয়া বামুনদিদির সহিত অখিলের শেষে ভাব হইয়া গিয়াছিল। বামুনদিদি তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে ছাড়িত না। কিন্তু শেষের দিকে সে একটু যেন প্রসন্ন হইয়াছিল। অখিল ঘুষ দিয়া প্রসন্ন করিয়াছিল তাহাকে। একদিন সে বামুনদিদির জন্য একটা খাট আনিয়া ফেলিল। সেগুন কাঠের পালিশ-করা ছোট একটি চমৎকার খাট। একজনের শুইবার মতো। বলা বাহুল্য, রেলের স্টোর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল সেটা। সেকালে ওপরওলা সাহেব খুশী থাকিলে পুকুর চুরি করাও চলিত। রেলের কত মাল যে বাহিরে পাচার হইয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। অখিল বলিল, "তোমার জন্যে এই খাটটা নিয়ে এলাম। আর মাটিতে শুয়ো না। বুড়োবয়সে ঠাণ্ডা লেগে তোমার কিছু হলে আমাদেরই মুশকিল। আমরা একেবারে অনাথ হয়ে যাব।" বামুনদিদি যদিও জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলিয়া খাটটার দিকে চাহিয়াছিল (তাহার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টি অবশ্য কেহ দেখে নাই)—কিন্তু মনে মনে খুশী হইয়াছিল সে। খাটটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—"কুথা পেলি তুই এ-খাট!" অখিল অবশ্য মিথ্যা কথা বলিল, "তোমার জন্যে কিনে নিয়ে এলাম, আর কোথা পাব।" ইহার কিছুদিন পরে সূর্যসুন্দর একদিন কল হইতে ফিরিয়া একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখিলেন। অখিল রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া আছে এবং বামুনদিদি গাল দিতে দিতে তাহার পিঠে তেল মাখাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল কিছুদিন পরে যখন অখিলের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ আসে তখন বামুনদিদি পুত্রহারা জননীর ন্যায় গগনভেদী কান্না কাঁদিয়াছিল। বামুনদিদির বাহিরটা কর্কশ হইলেও ভিতরটা কোমল ছিল। ইহার অনেক প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন। তাই তাহার নিদারণ রূঢ়তা সত্ত্বেও তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন নাই। সূর্যসুন্দরের কাছেই বামুনদিদি তাহার জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সূর্যসুন্দরই তাহার মুখে গঙ্গাজল দিয়াছিলেন। কানে হরিনাম শুনাইয়াছিলেন। বামুনদিদি তাঁহাকে পুত্রের মতোই ভালবাসিত, তাই পুত্রের মতোই তাহার শেষকৃত্য তিনি করিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়া আনেন তখন বামুনদিদি ছিল। রাজুকে সে নিজের পুত্রবধূর মতো যত্ন করিত। বকিত, গালাগালি দিত, কিন্তু যত্ন করিত খুব। সূর্যসুন্দরের মনে হইতে লাগিল, বামুনদিদির দেহটা কবে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতির জগতে সে বাঁচিয়া আছে এখনও। স্মৃতির জগতেও সকলে বাঁচিয়া থাকে না। বাড়ির নিপুণা গৃহিণী যেমন অকেজো পুরাতন জিনিসগুলিকে মাঝে মাঝে বাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দেন মনের মধ্যেও তেমনি এক নিপুণা অদৃশ্য গৃহিণী থাকেন যাঁহার কাজ জীবনের অপ্রয়োজনীয় ঘটনার স্মৃতিগুলিকে মুছিয়া ফেলা, স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে বাজে জিনিসগুলি দূর করিয়া দেওয়া। সব ঘটনার স্মৃতি মনে থাকে না, থাকা সম্ভব নয়। একদিন যাহা কত প্রয়োজনীয় ছিল পরে তাহার

স্মৃতিটুকুও বাঁচিয়া থাকে না। এ-বিস্মৃতির রহস্য ভেদ করা সহজ নয়। বিরুর মায়ের সব কথা সূর্যসুন্দরের মনে নাই, কিন্তু বামুনদিদির প্রায় সব কথাই তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছেন।...হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল বামুনদিদি জব্দ হইয়া থাকিত শিশু বিরুর কাছে। বিরু, পৃথ্বীশ, উশনা, কিরণ এবং উষার জন্ম দেখিয়া গিয়াছে বামুনদিদি। পৃথ্বীশের যখন জন্ম হয় তখন বামুনদিদিই বিরুর ভার লইয়াছিল। বিরু রাত্রে তাহার কাছে শুইত। কি বিরক্তই না করিত তাহাকে। রাত্রে বার বার বিছানা ভিজাইয়া ফেলিত। ভোরে উঠিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে হইত। তাহাকে জামা-কাপড় পরানো তো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। মধুয়া জোর করিয়া পরাইতে পারিত। কিন্তু বামুনদিদির জেদ ছিল, সে বিরুর গায়ে আর কাহাকেও হাত দিতে দিবে না, এমন কি বিরুর মা-কেও নয়। বলিত, "বো তো নিজেই একটা ছেল্যামানুষ, ও আবার কি জানে।" 'বো' মানে বউ। রাজলক্ষ্মীকে সকলে বউ বলিয়াই ডাকিত। সূর্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরও। বামুনদিদিই বিরুর সব ঝঞ্ঝাট পোহাইত। বিরুর একটা অদ্ভুত খেলা ছিল বামুনদিদির সঙ্গে। বামুনদিদি যখন রাঁধিত তখন ছিল বিরু পিছন দিক হইতে তাহার বড়ির মতো খোঁপায় টান দিয়া ছুটিয়া পলাইত। কখনও পিঠে লাঠি বসাইয়া দিত। ছেলেবেলায় বিরুর হাতে সর্বদা ছোট লাঠি থাকিত একটা। লাঠি খাইয়া বামুনদিদি চীৎকার করিয়া শুইয়া পড়িত এবং ভান করিত যেন মারা গিয়াছে। বিরু তখন তাহার মুখের উপর উপুড় হইয়া বলিত—"বামুনদি, তুই মলে গেলি? ওঠ, ওঠ। মলে' গেলি? মলিস না, ওঠ, ওঠ, আবার খেলি।" বামুনদিদি উঠিতে চাহিত না। বিরু তাহার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করিত তখন। তারস্বরে ক্রন্দন করিত। বামুনদিদি কিছুক্ষণ মড়ার ভান করিয়া অচমকা হঠাৎ উঠিয়া বিরুকে ধরিয়া ফেলিত এবং চুমু খাইত। বিরু ছেলেবেলায় খুব মোটা ছিল, ছুটিতে পারিত না। এখন সেই বিরু কি হইয়া গিয়াছে। রোগা লম্বা জুলফির চুলে পাক ধরিয়াছে। বামুনদিদি এখন যেখানেই থাকুন—এ-বিরুকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন কি? বিরুকে লইয়া বামুনদিদির একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল, চামরুর বউ। পৃথ্বীশ যখন রাজলক্ষ্মীর পেটে আসে তখন তাহার দুধ শুকাইয়া গিয়াছিল। বিরু কিছুতেই গরুর দুধ খাইতে চাহিত না। তাহার পেটে গরুর দুধ তেমন সহ্যও হইত না। সূর্যসুন্দর কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তৎকালে প্রচলিত শিশুদের খাদ্য মেলিন্‌স ফুড আনাইয়া দেখিলেন তাহাও বিরুর সহ্য হইতেছে না। তখন এ-সমস্যার সমাধান করিল চামরুর বউ। চামরু মুসলমান। সূর্যসুন্দরের জমি চাষ করিত। চামরুর বউও মজুরনী ছিল। সেও সূর্যসুন্দরের জমিতেই খাটিত। এই সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরই তাহার নাম রাখিয়াছিলেন চামেলী। বিরুর বয়স যখন ছয় মাস তখন চামেলীর জন্ম হয়। চামরুর বউ একদিন চামরুর মারফত সূর্যসুন্দরকে জানাইল যে বাবুর বা মাইজির যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে সে খোকাবাবুকে নিজের দুধ খাওয়াইতে পারে তাহার এত দুধ যে চামেলী খাইয়া শেষ করিতে পারে না। তাহার একটা 'থন'-এর (স্তনের) দুধই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। দ্বিতীয় 'থন'টা সে খোকাবাবুকে অনায়াসেই খাওয়াইতে পারে। বৌ (রাজলক্ষ্মী) প্রথমটা রাজী হয় নাই। কিন্তু বিরুর পেটে যখন গরুর দুধ বা মেলিন্‌স্ ফুড কিছুতেই সহ্য হইল না তখন শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজী হইতে হইয়াছিল। সুতরাং বামুনদিদি বিরুকে সম্পূর্ণ জয় করিবার অনেক আগেই চামরুর বউ তাহার হৃদয় জয় করিয়াছিল। চামরুর বউ বিরুকে অনেক সময় মাঠে লইয়া যাইত। বিরুর শৈশবের অনেকখানিই খোলামাঠে কাটিয়াছে। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামল

মাঠের মাঝখানে একটা বুড়ো বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের তলায় বিরুকে বসাইয়া নিত চামরুর বউ। তাহার সঙ্গিনী ছিল চামেলী। আর তাহাদের পাহারা দিত ভাগিয়া, রাখাল চাকরটা। বিরু যখন আর একটু বড় হইল তখনও ছোট লাঠিটি লইয়া সে মাঠে মাঠেই ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত। ভাগিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বনে-জঙ্গলেও ঘুরিত। টুনটুনি, নীলকণ্ঠ ,বক, ফিঙে, শালিক প্রভৃতি পাখিরা তাহাকে নূতন জগতের সন্ধান দিত যেন। ফড়িং ধরিবার চেষ্টায় সে এক ঝোপ হইতে আর এক ঝোপে ছুটাছুটি করিত। ভাগিয়া তাহাকে একবার একটা পাখির বাসাও দেখাইয়াছিল। তিনটি ছোট ছোট নীলচে রংয়ের ডিম ছিল তাহাতে। ডিমগুলির গায়ে বাদামীরঙের ফুটফুট দাগ। এই নিত্যনূতনের সন্ধানে ছেলেবেলা হইতেই মাঠে-মাঠে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানো একটা নেশা হইয়া গিয়াছিল তাহার। চাকররা তাহার নাম দিয়াছিল জংলিবাবু। ভাগিয়া তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইত। সূর্যসুন্দরের কোনও রোগী ঘোড়ায় চড়িয়া আসিলে সেই ঘোড়ায় বিরুকে চড়াইয়া দিত এবং ঘোড়াটার লাগাম ধরিয়া হাট পর্যন্ত লইয়া যাইত। বামুনদিদি কিন্তু এ-সবের ঘোর বিরোধী ছিল। বামুনদিদির ইচ্ছা বিরুর খেলাধূলা চলাফেরা উঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। এজন্য বিরুকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করিবারও চেষ্টা করিত সে। তাহার জন্য মাটির গুলি বানাইয়া রাখিত। উঠানের কোণে খেলাঘর করিয়া দিত। বিরু সে-সব লইয়াও মাতিয়া থাকিতে কসুর করিত না। কিন্তু যেই উঠোনের এক কোণে চামরুর বউ দেখা দিত, যেই হাসিমুখে বলিত, সেলাম, জংলিবাবু—অমনি বিরু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিত এবং তাহার কোলে চড়িয়া মাঠে চলিয়া যাইত। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও বামুনদিদি আর তাহাকে ফিরাইতে পারিত না। চামরুর বউয়ের কোলে চড়িয়া সে গল্প শুনিত একট গিধ্ (শকুনি) তাহাদের জমির উঁচু শিমূল গাছটার মাথায় 'খোতা' (বাসা) বাঁধিতেছে, মাঠে কয়েকটা জংলি খার্হা (খরগোশ) আসিয়াছে, চুলুহা (আর একজন চাষের চাকর, খুব ষণ্ডা ছিল) ফাঁদ পাতিয়া তাহাদের ধরিবে বলিয়াছে। যদি ধরিতে পারে খাঁচা বানাইয়া খর্হা পুষিতে হইবে। সর্বন মিস্ত্রী ভাল খাঁচা বানাইতে পারে। বিরুর কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িত। বামুনদিদির তৈরী কাদার গুলি বা মুড়ির মোয়ার কথা তাহার আর মনে থাকিত না। এইসব লইয়া কিন্তু ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হইত মাঝে মাঝে। বামুনদিদি রাজলক্ষ্মীকে বলিত, চামরুর বউকে বাড়িতে ঢুকিতে দিও না। ও কোলে করিয়া বিরুকে মাঠে লইয়া যাইবে কেন। ভদ্রলোকের ছেলে, বিশেষত ওইটুকু ছেলে, মাঠে গিয়া কি করিবে? চামরুর বউয়ের অন্য কোনো মতলব আছে নিশ্চয়। ওইসব ছোটলোকের মেয়েরা অনেক সময় ডাইনি হয়। যদি বিরুকে 'গুণ' করিয়া ফেলে তাহা হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। রাজলক্ষ্মীরও এসব শুনিয়া একটু একটু ভয় যে না করিত তাহা নয়, সূর্যসুন্দরকে দুই-একদিন সে একথা বলিয়াছিল, কিন্তু দুই-একদিন মাত্র। সম্ভবত চামরুর বউয়ের সরল স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ভয় কাটিয়া গিয়াছিল। সম্ভবত তাহার মনে হইয়াছিল, নিজের দুধ দিয়া বিরুকে ও মানুষ করিয়াছে, বিরুর উপর উহারও তো কিছু অধিকার আছে, ও কি বিরুর কোন অনিষ্ট করিতে পারে! রাজলক্ষ্মী চামরুর বউকে বাধা দিতে পারে নাই। সে রোজ আসিতও না। কিন্তু যখনই আসিত বিরুকে লইয়া চলিয়া যাইত। বামুনদিদির ইহাতে রাগারাগির অন্ত ছিল না। নিজেই সে দুই-একদিন মানা করিয়াছিল, কিন্তু চামরুর বউ তাহার কথা শুনিল না। রাজলক্ষ্মীও যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল না তখন বামুনদিদির বড় রাগ হইল। তাহার

মনে হইল রাজলক্ষ্মী তাহাকে অপমান করিয়াছে। রাগ হইলে বামুনদিদি নিজের ছোট পুঁটুলিটি লইয়া হক্‌রু চৌধুরীর বাড়িতে চলিয়া যাইত। সেখানে গিয়া প্রায়োপবেশন শুরু করিয়া দিত। অবশেষে সূর্যসুন্দর নিজে গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া, তাহার মান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া আসিতেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। বামুনদিদি এভাবে চলিয়া গেলে সূর্যসুন্দরকে বেশ একটু অসুবিধায় পড়িতে হইত। বাড়িতে অতগুলি রান্না করিবার লোকও চট্ করিয়া পাওয়া যাইত না। কুঠি হইতে নিখিলবাবুর ঠাকুর দুনিয়ালাল অনেক সময় আসিয়া সামলাইয়া দিত। বিষ্ণুবাবু থাকিলে তিনিই ভার লইতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভাল রাঁধিতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি সব সময় থাকিতেন না। বিষ্ণুবাবুর মুখটা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তিনি এতদিন যেন মনের কোন গোপন কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, হঠাৎ বাহির হইয়া আসিলেন।....বিষ্ণুবাবু ইন্‌স্‌পেকটিং পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে টুরে টুরে ঘুরিতে হইত। এক-একটা টুর সারিয়া সূর্যসুন্দরের কাছে আসিয়া কয়েকদিন থাকিতেন, তাহার পর আবার টুরে চলিয়া যাইতেন। বিষ্ণুবাবুর একমাথা কোঁকড়ানো চুল এবং একমুখ কালো কুচকুচে দাড়ি ছিল। চোখে সোনার চশমা ছিল একটি। বেঁটেখাটো মানুষ ছিলেন তিনি। সকলের সহিতই খুব সসম্ভ্রমে কথা বলিতেন। বর্ধমান জেলার কোনও গ্রামে বাড়ি ছিল। ছুটির পর যখন দেশ হইতে ফিরিতেন, সূর্যসুন্দরের জন্য ওলা, পাটালি গুড়, কদমা প্রভৃতি আনিতেন। বিহারপ্রদেশে এ তিনটি জিনিসই দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাই বিষ্ণুবাবু দেশ হইতে ফিরিলে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। ওলা, পাটালি গুড়, কদমা ভাগ ভাগ করিয়া চেনা-শোনা অনেকের বাড়িতে পাঠানো হইত। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবুর বাড়ি, জমিদারের ম্যানেজার নিখিলবাবুর বাড়ি, দারোগা চন্দ্রভান্ বাবুর বাড়ি, রমেশের বাড়ি। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল রমেশের বাড়ি কদমা একটু বেশী করিয়া দিতে হইত। কারণ রমেশ বিষ্ণুবাবুকে একদিন বলিয়াছিল, "আপনি আমার জন্য কদমা একটু বেশী করে আনবেন। আপনার বৌমাটি কদমা দিয়ে মুড়ি খেতে খুব ভালবাসে।" বিষ্ণুবাবু এক ঝুড়ি কদমা আনিতেন। কিছু ভাঙিয়া যাইত, ভাঙা টুকরাগুলি রমেশ লইয়া যাইত। বলিত, "আমাকেই দিন ওগুলো। ভাঙা হোক না, ক্ষতি কি, ভেঙেই তো খেতে হবে।" বিষ্ণুবাবুকে ঘিরিয়া অনেকগুলি স্মৃতি পর-পর সূর্যসুন্দরের মনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল বিষ্ণুবাবু গাঁজা খাইতেন। কিন্তু খুব লুকাইয়া। সন্ধ্যার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেন এবং ভজু নাপিতের বাড়ি গিয়া হাজির হইতেন। ভোজুও গাঁজা খাইত। ভোজুর সহিত দাবাও খেলিতেন তিনি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, বিষ্ণুবাবু, গানের আসর ফেলে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকারে কোথায় বেরিয়েছিলেন? বিষ্ণুবাবু উত্তর দিতেন, এই একটু 'ইভ্‌নিং ওয়াক' করে এলাম। এই ইভ্‌নিং ওয়াকের অর্থ কি, তাহা অবশ্য পরে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা লইয়া আর কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিত না। সূর্যসুন্দরই সকলকে মানা করিয়া দিয়াছিলেন। বিষ্ণুবাবু সকালেও কখনও কখনও দাবা খেলিতেন। ভোজু নাপিত সপ্তাহে দুই দিন আসিয়া সকলকে কামাইয়া দিয়া যাইত। বিষ্ণুবাবু থাকিলে সে দুই দিনও ভোজুর সহিত দাবা খেলিতেন। বিষ্ণুবাবুর ছোট একটি মাদুর ছিল। সেটি লইয়া নিম গাছটার তলায় পাতিতেন। নিম গাছের তলায় একটা ছোট চৌতারা ছিল। দশরথ মিস্ত্রী চৌতারাটি যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। দশরথ সূর্যসুন্দরের রোগী ছিল। কোন ফি, এমন কি ঔষধের দামও দিত না। মাঝে মাঝে বিনা মজুরিতে কাজ করিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিত সে।

চৌতারাটি বানাইবার সময় সে বলিয়াছিল, নিমগাছের হাওয়া খুব ভালো, চৌতারাটি বানাইয়া দিতেছি, ইহার উপর বসিয়া সকাল-সন্ধ্যা গায়ে নিমের হাওয়া লাগাইলে শরীর ভালো থাকিবে। কিন্তু কেহই এ-উপদেশ পালন করে নাই। চৌতারাটির উপর কুকুরগুলার আড্ডা হইয়াছিল। আর বিষ্ণুবাবু যখন থাকিতেন তখন ভজু নাপিতের সহিত দাবা খেলিতেন ওখানে। বিষ্ণুবাবুর আর একটি ছবিও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তাঁহার 'টুরে' বাহির হইবার ছবিটি। টুরে বাহির হইবার দিন খুব ভোরে উঠিতেন, উঠিয়া কুয়া হইতে নিজেই জল তুলিয়া স্নান করিয়া ফেলিতেন। উপবীতটা সাবান দিয়া খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর পশ্চিম দিকের কোণের ঘরটায় বসিয়া পূজা করিতেন অনেকক্ষণ। অন্যদিন তাঁহাকে পূজা করিতে দেখা যাইত না। পূজা শেষ করিয়া ছুটিতেন নিমু ময়রার দোকানে। তাহার দোকানে বসিয়াই গরম লুচি তরকারি এবং জিলাপি আহার করিয়া আবার দ্রুতপদে বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। আসিয়া আগেই কুচকুচে কালো মোজা এবং জুতাটা পরিয়া ফেলিতেন। জুতা পরিতে তাঁহার অনেকক্ষণ সময় লাগিত, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফিতা বাঁধিতেন। বিষ্ণুবাবু 'শু'-জুতা টুরে বাহির হইবার সময় কেবল পরিতেন। অন্যদিন পরিতেন কেবল চটি জুতা। জুতা-মোজা পরা হইয়া গেলে পরিতেন কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি একটি। সেটি তাঁহার ট্রাঙ্কে থাকিত, সেটিও তিনি কেবল টুরে বাহির হইবার সময় পরিতেন। টুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন সেটি। তুলিয়া রাখিয়া লুংগি পরিতেন। একটি গেরুয়া রঙের লুংগি ছিল তাঁহার। কাপড় পরা হইলে গেঞ্জি পরিতেন এবং তাহার উপর পরিতেন একটি আজানুলম্বিত তসরের কোট। এটিও পোশাকী। টুর হইতে ফিরিয়া এটিও তুলিয়া রাখিতেন। কোট পরা হইয়া গেলে বাক্স হইতে আর একটি পোশাকী জিনিসও বাহির করিতেন তিনি। একটি পাট করা মুর্শিদাবাদী চাদর। সেটি কাঁধের উপর ফেলিয়া মসলার কৌটা হইতে কিছু মশলা মুখে দিয়া তিনি স্টেশনের দিকে ছুটিতেন। টুরে বাহির হইয়া তিনি লোয়ার প্রাইমারী এবং আপার প্রাইমারী স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন শ্বশুরবাড়ি যাইতেছেন। স্টেশনের দিকে ধাবমান বিষ্ণুবাবুকে সূর্যসুন্দর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, শর্টকাট্ হইবে বলিয়া মাঠামাটি ছুটিতেছেন। ট্রেন আসিয়া গিয়াছে।....সূর্যসুন্দরের মুখে একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"দাদু হাসছেন যে! ছবি ভালো হচ্ছে না বুঝি। এখন তো কিছুই হয় নি, পরে দেখবেন। আপনি নড়বেন না, যেমন বসে অছেন, তেমনি বসে থাকুন।"

সুদূর অতীত হইতে সূর্যসুন্দর সহসা বর্তমানে উপনীত হইলেন। ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া চাহিয়া রহিলেন চিত্রার দিকে। কে এ মেয়েটি! পরমুহূর্তেই মনে পড়িল সব। বিরুর ছোট মেয়ে, তাঁহার ছবি আঁকিতেছে। সেকালের মেয়েরা এসব কল্পনা করিতে পারিত কি? রাজলক্ষ্মী অবসর-বিনোদন করিত অন্য প্রকারে। দুপুরে রোদে বসিয়া বড়ি দিত, আচার প্রস্তুত করিত নানারকম, মোরব্বা করার শখও ছিল। উল বোনা তেখনও তেমন প্রচলিত হয় নাই। এ-অঞ্চলে নিখিলবাবুর স্ত্রী আধুনিকা ছিলেন, তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নকলে চুল বাঁধিতেন, শাড়ি পরিতেন। অনেক রকম শৌখিন রান্নাও জানা ছিল তাঁহার। তিনিই এ-গ্রামে সর্বপ্রথম বাড়িতে চপ-কাটলেট করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন সকলকে। তিনিও উল বুনিতেন না। জুতা পরিতেন না। মাথায় ঘোমটা দিতেন। তখন মেয়েদের চিত্রবিদ্যার দৌড় আলপনায়

সীমাবদ্ধ ছিল। খুব ভালো আলপনা দিত তাহারা। সন্তোষের মায়ের হাতের আলপনা ও-অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। পূজার ঘট বা বিবাহের মঙ্গলকলসেও চমৎকার ছবি আঁকিয়া দিতেন। কিন্তু এরূপ পোর্ট্রেট আঁকা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিতেন কি? হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট-পরা, মাথার চুল বব্ করিয়া ছাঁটা, চোখে-মুখে একটা নূতন ধরনের সংস্কৃতির দীপ্তি, উজ্জ্বল কিন্তু শাণিত নয়—সূর্যসুন্দর অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চিত্রার দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার মনে হইল সন্ধ্যার সহিত তাহার যেন কোথায় মিল আছে, অথচ অমিলও প্রচুর। হঠাৎ একটা জিনিস তিনি লক্ষ্য করিলেন, চিত্রার চিবুকের ডৌল ঠিক তাহার দিদিমার চিবুকের মতো। বেশ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সন্ধ্যার চিবুকও অনেকটা এই রকম।

সূর্যসুন্দরের চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা ক্যামেরা হাতে করিয়া স্বাতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে চিত্রার মতো ছবি আঁকিতে পারে না বটে, কিন্তু ক্যামেরায় একটা ফটো তো তুলিতে পারে। চিত্রার কাছে সে হারিয়া যাইবে কেন। নিজের ক্যামেরাটা সে আনে নাই, কিন্তু সন্ধ্যার ক্যামেরা ছিল, সেইটাই সে লইয়া আসিয়াছে।

"দাদু, আমার দিকে একবার চাও তো লক্ষ্মীটি—"

ক্লিক!

"বাস হয়ে গেছে—"

ইহার পর স্বাতী বক্রদৃষ্টিতে চিত্রার ছবির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিল ক্ষণকাল। তার পর সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "দাদু, চিত্রা তোমাকে ছবিতে একদম ছোকরা বানিয়ে দিচ্ছে।

চিত্রা কোন উত্তর দিল না, তাহার চোখে মুখেও কোন হাসি ফুটিল না, সে যেমন তন্ময় হইয়া আঁকিতেছিল, তেমনি আঁকিতেই লাগিল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "একটি ছোকরার ছবিই তো ওর মনে আঁকা আছে। সেইটিই ওর হাত দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে—আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র।

এইবার চিত্রার মুখে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল তাহার বুকের ভিতর একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল যেন। বলিল, "পোর্ট্রেটের সঙ্গে ফটোগ্রাফের আসল তফাতই তো ওইখানে। ক্যামেরা যন্ত্র, যা তার সামনে পড়বে তারই ছবি সে হুবহু তুলে নেবে, কিন্তু পোর্ট্রেট আঁকে শিল্পী। সে যা দেখবে তারই হুবহু নকল করবে না, সে যার ছবি আঁকছে তার আসল ব্যক্তিত্বটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। দাদু বাইতে বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু আসলে তো উনি তরুণ—"

"তরুণ নয়, বীর"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় প্রবেশ করিলেন। বাহিরের বারান্দার চৌকিতে কবিরাজ মহাশয় কখন আসিয়া বসিয়াছিলেন কেহ টের পায় নাই।

"এই মেমসাহেবকে দেখে ভয়ে আমি ঢুকতে পারি নি। বাইরে চুপ করে বসেছিলাম। তারপর ওঁর মুখে বাংলা কথা শুনে ভয় ভাঙলো, ভাবলাম আমাদের আপন লোকই হবে কেউ—"

স্বাতী হাসিয়া বলিল, "ও যে চিত্রা আমার বোন—"

"আরে তাই নাকি, চিনতে পারি নি। গুড্ মর্নিং ম্যাডাম্, ইওর হাম্বল সার্ভেন্ট—" বলিয়া ঝুঁকিয়া কুর্নিশ করিলেন। চিত্রা আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিল তাঁহাকে।

"আরে, আরে, এরা করে কি! আমি ছত্রি তোরা ব্রাহ্মণ—"

সূর্যসুন্দর হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন। কোন মন্তব্য করিলেন না। কবিরাজ মহাশয়ও জাতির প্রসঙ্গ আর তুলিলেন না। যে কথাগুলি বলিতে বলিতে ঢুকিয়াছিলেন তাহাতেই ফিরিয়া গেলেন।

"তোমার দাদুকে তুমি তরুণ করে এঁকে ঠিক করেছ দিদি। দেখি কেমন হচ্ছে ছবিটা।"

কবিরাজ মহাশয় পিরানের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। তাহার পর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"ঠিক হচ্ছে। চোখ-মুখের ভাবে তারুণ্য ফুটেছে বটে খানিকটা, তবে উনি সত্যি যে রকম তরুণ সেটা এখনও হয় নি। তোমরা আজকাল তরুণ কথাটাকে কেমন খেলো করে ফেলেছ। তরুণ বললেই যেন হাব-ভাব-মাখা, ন্যাকন্যাকা, ছিমছাম, রোগা-রোগা গোছের অপদার্থ একটা ছোঁড়ার ছবি মনে ভেসে ওঠে। তার মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আর আসল কাজের বেলায় টুঁ টুঁ—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিতে হাসিতে দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন। স্বাতী এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এইবার হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। চিত্রার মুখেও হাসি ফুটিল, কিন্তু সে বেসামাল হইল না। কবিরাজ মহাশয়ের দিকে হাসিমাখা একটা দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আপনার মতে তাহলে তরুণ মানে কাটখোট্টা—"

"ঠিক কাটখোট্টা নয়, মজবুত, শক্ত-সমর্থ। শুধু দেহে নয়, মনেও। তোমার কর্তাটির মনের খবর তুমিই বলতে পার, কিন্তু বাইরের যতটুকু দেখলাম ভালই লাগল। তারুণ্য মানে প্রবল পৌরুষের সুস্থ প্রকাশ। তোমার দাদুর একটা গল্প শুনবে? তখন ওর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে কেটেছে, তখন ঘোড়া চড়েই রুগীর বাড়িতে যেতেন. সন্ধ্যাবেলা ফিরে গান-বাজনা সেরে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন, শুয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল শিবলাল ওঝার মেয়ের বিয়ে, দিন-তিনেক আগে হলুদমাখা সুপুরি পাঠিয়ে লোচন নাপিতের মারফৎ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। আগে ওই রকম রেওয়াজ ছিল, ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের বদলে হলুদমাখা সুপুরি পাঠানো হতো। মনে পড়বামাত্র উঠে পড়লেন বিছানা থেকে, শনিচরা সহিসকে ডেকে বললেন, ঘোড়া কস্। আমি সেদিন তোমাদের বাড়িতে ছিলাম তোমার ঠাকুমায়ের হাতের রান্না চর্ব্য-চূষ্য-লেহ-পেয় সব রকম উদরস্থ করে কোণার ঘরটাতে শুয়ে ছিলাম কম্বল ঢাকা দিয়ে। তখন শীতকাল, মাঘ মাস। ঘোড়াটা চিঁহি করে ডেকে উঠল, ঘোড়াটার পিঠ জিন দিলেই সে চিঁহি করে ডেকে জানিয়ে দিত—I am ready. শব্দ শুনে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি ডাক্তারবাবু বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রুগী দেখতে বেরুচ্ছেন নাকি এত রাত্রে?' ডাক্তারবাবু বললেন,'না অমি যাচ্ছি শিবলাল ওঝার বাড়িতে। আজ তার মেয়ের বিয়ে। নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'এত রাত্রে দশ মাইল দূরে যাবেন নিমন্ত্রণ রাখতে! পাগল নাকি আপনি!' ডাক্তারবাবু বললেন, 'শিবলাল গরীব লোক। ভাববে আমি গরীব বলে এলেন না। বিরু আর পৃথ্বীশের পৈতের সময় এসে কত খেটেছিল? মনে নেই? সমানে লুচি ভেজেছিল বেচারা। আমাকে

যেতেই হবে।' তবু আর একবার মানা করলাম, কিন্তু শুনলেন না তোমার দাদু। পরে শুনেছিলাম শিবলালের মেয়েকে উনি দশটি টাকা দিয়ে এসেছেন। সেকালের দশ টাকা এখনকার প্রায় একশ' টাকার সমান। শুধু তাই নয়, সেখানে পংক্তি-ভোজনে বসে পেট ভরে খেয়েছেনও। অথচ বাড়িতে ভর-পেট খেয়েছিলেন তার একটু আগে। উনি মনে মনে এখনও তোমাদেরই বয়সী। শরীরটা একটু অপটু হয়ে গেছে—তা তো হবেই—বিরাশী বছর বয়স তো হল—বাসাংসি জীর্ণানি—"

সূর্যসুন্দর হাসিমুখে সব শুনিতেছিলেন। সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বাড়িয়ে বলছেন, কবিরাজ মশায়। আমাদের কথা বলে এখন লাভ কি, আমাদের তো যাবার সময় হয়ে এসেছে। এখন যা-কিছু প্রত্যাশা ওদের কাছে। ওদেরই স্তুতি করুন—"

"চণ্ডী তো রোজই পড়ি। চণ্ডী পড়া মানেই এঁদের স্তুতি করা। যা দেবি সর্বভূতেষু বলে কবি যা লিখছেন তা এঁদেরই গুণগান। ঠিকই বলেছেন, আমাদের কাজ এখন এদের কাছে দু'হাত পেতে ভিক্ষা করা—মিলে মাইয়া এক মুঠটি আন্‌ধা লুল্‌হাকে—" বলিয়াই কবিরাজ মশাই মুখে হাত চাপিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সামনের দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, যে দুই-একটি ছিল তাহা পানের ছোপ লাগিয়া প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। হাসিলে সেগুলি বাহির হইয়া পড়িত এবং বিশ্রী দেখাইত। তাই কবিরাজ মশাই মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতেন।

স্বাতী হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "এক মুঠটি পেলে সন্তুষ্ট হবেন? সর্বস্ব দিয়েও তো আপনাদের মন পাওয়া শক্ত।"

বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। চিত্রাও ইজেল গুটাইতে লাগিল।

"ছবি আঁকা শেষ হইয়া গেল এর মধ্যে?"—কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন।

"না, এখনও হয়নি, পরে ফিনিশ করব।"

কিরণ চিন্তিত মুখে প্রবেশ করিল।

"চিত্রা, গঙ্গা এসেছে এখানে?"

"না।"

"তাকে দেখেছিস কোথাও?"

"না, কেন?"

"উনি সেই কোন্ ভোরে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন না। কিচ্ছু খেয়ে যাননি। দেখি, কুমারকে বলি গিয়ে, কুমারকেও তো দেখছি না।"

সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দিকে গেছে, বলে গেছে কিছু?"

"গেছে বিছুয়ার জঙ্গলে।"

"সে তো এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। কখন বেরিয়েছে?"

"খুব ভোরে; বোধ হয় চারটের সময়।"

"তা হলে তো এত শিগ্‌গির ফিরতে পারবে না? হেঁটে গেছে?"

"বোধ হয়। রামপ্রসাদের সঙ্গে গেছে।"

"আমাকে বললেই হত, কুটির হাতীটা কসিয়ে দিতুম। নিখিলবাবুকে একবার বললেই হয়ে যেত। ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ওখানে তিতির ভালো পাওয়া যায়।

"সেই লোভেই তো গেছে। আপনাকে তিতিরের স্ট্যু খাওয়াবে, কিন্তু কিচ্ছু খেয়ে যায়নি যে। ওখানে কিছু খাবার পাঠানো যায় না?"

"তোর নিখিল কাকাকে বল গিয়ে। ঘোড়ায় চড়ে কেউ বিছুয়ার জঙ্গলে চলে যাক—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "নিখিলবাবু এখন ভোজের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত, খুবই ব্যস্ত। চার-পাঁচটা ঠাকুরকে নিয়ে পড়েছেন দেখলাম। উনি কি এখন এসব ব্যাপারে কান দেবেন?"

"দিতেই হবে"—বলিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "কিরণ নিখিলবাবুর খুব প্রিয়। দেখবেন ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "ভোজের আয়োজন খুব জোর হচ্ছে, না?"

"হবে না? আপনার নাত্‌বৌয়ের সাধ। সেই লোভেই তো আমি থেকে গেলাম। আমেদাবাদে একটা রোগী ছিল, মরুক গে ব্যাটা—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সূর্যসুন্দরের হঠাৎ 'বউ'কে মনে পড়িল।

রাজলক্ষ্মী এখন কোথা?

।। চোদ্দ।।

নিখিলবাবু সত্যই খুব ব্যস্ত ছিলেন। হাতে কয়েকটি খাতা লইয়া ভোজের বিরাট আয়োজন করিতেছিলেন তিনি। খাতাগুলিতে ভোজের বিষয়ে নানাবিধ নোট করা ছিল। নিরামিষ এবং আমিষ উভয়বিধ খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে করিতে হইবে, অথচ একপ্রকার খাদ্যের সহিত আর একপ্রকার খাদ্যের ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত চলিবে না। নিখিলবাবু মাছ-মাংসের ব্যবস্থা একেবারে অন্য বাড়িতে করিয়াছেন। মুষণ কশাই কয়েকটি খাসি লইয়া দেখাইতে আসিয়াছিল।

নিখিলবাবু বলিলেন, "আমার আড়াই মণ মাংস চাই।"

"এগারোটা জান্‌বর হ্যয় হুজুর। হো যায়গা। দু-চার সের ইধর-উধর হো সক্‌তা হ্যায়।"

"দু-চার সের বেশী হলে ক্ষতি নেই, কম যেন না হয়। তুমি না হয় আর একটা খাসি বেশী কাটো। এগুলো আমার কাছারাতি নিয়ে যাও। কাল ভোর তিনটের সময় এগুলো বানিয়ে দেবে। দশটার মধ্যে 'রেডি' চাই। দুনিয়ালাল, তুমি দেখ খাসিগুলো ভালো কিনা। আর মাছ-মাংস রাঁধবার বাসন তোমার মাইজীর কাছ থেকে চেয়ে নাও। হাতা, বড় বড় কড়াই, বড় বড় ডেকচি সব ওখানে জমা করা আছে। দশটা ডেক্‌চিতে মাংস রান্না হবে। এক একটা ডেক্‌চিতে দশ সেরের বেশী দিও না। সেই রকম ডেকচিই আনিযেছি আমি ত্রিশটা। কড়াই চল্লিশটা আছে। মাছের কালিয়া হবে ওগুলোতে। তুমি তোমার মাইজির কাছে চিঠ্‌টা দিয়ে বাসনপত্র নেবে—"

"আচ্ছা—"

"আর যে বাসনগুলি নেবে সেগুলি কাজ হয়ে গেলে ধুয়ে মাজিয়ে আবার মাইজির কাছে ফেরত দিয়ে দেবে 'চিঠ্‌টা' মিলিয়ে। বুঝলে?"

"হাঁ—"

"এই ট্রেনে সাহেবগঞ্জ থেকে কিছু ঠাকুর আসবে। কলকাতা থেকেও আসবে বারোজন।

তোমার যে ক'জন ঠাকুর দরকার নিয়ে নিও। কিন্তু আমিষ ডিপার্টমেণ্টের তুমি হবে 'হেড'। রান্না যদি খারাপ হয়, তোমাকেই দায়ী করব আমি।"

"আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না হুজুর।"

দুনিয়ালাল নিখিলবাবুর পুরাতন ঠাকুর। নির্ভরযোগ্য। নিখিলবাবু দেখিলেন দুনিয়ালাল হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতেছে। দুনিয়ালাল মিথিলার লোক। বাংলা বলিতে পারে, বাংলা বোঝেও। সূর্যসুন্দরের বাড়ির সহিত তাহার অনেকদিনের সম্পর্ক। চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র সে। লম্বা সুঁটকো চেহারা। কপালে হলুদ রঙের চন্দনের ছাপ। তাহাকে হাত কচলাইতে দেখিয়া নিখিলবাবু ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কতটা গাঁজা চাই তোমার?"

"গোটা-দুই টাকা দিন হুজুর তাহলেই হয়ে যাবে।"

"দু' টাকার গাঁজা খাবে তুমি!"

"বাইরের যারা আসবে তাদেরও তো দু'একটা টান দিতে হবে হুজুর—"

"সবাই তোমার মতো গাঁজাখোর হবে তা তুমি জানলে কি করে?"

"সবাই হুজুর, সবাই। যারাই এসব ভোজ কাজে রান্না করে তারা সবাই একটু-আধটু 'ইস্‌টিম্‌' করে নেয়। না করলে এত খাটুনি বরদাস্ত করতে পারে না।"

নিখিলবাবু দেখিতে পাইলেন দুইটি গরুর গাড়ি বোঝাই লাউ-কুমড়ো আসিতেছে। তিনি দুনিয়ালালের হাতে দুইটি টাকা দিয়া সেইদিকে আগাইয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার সহিত তাঁহার দেখা হইল।

"গঙ্গা এদিকে শোন। কোথায় যাচ্ছ—"

"বাইরের যারা এসেছে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি—"

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, তিনি যে খড়ের ঘরগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন সেগুলি আগন্তুকের ভিড়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই দূরের গ্রাম হইতে আসিয়াছিল, অধিকাংশই দরিদ্র চাষী মজুরের দল। ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এই সংবাদটুকু জানিবার জন্যই আসিয়াছিল তাহারা। এখানে আসিয়া যে খাইতে পাইবে এ-প্রত্যাশা ছিল না তাহাদের। কিন্তু সূর্যসুন্দর বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে যেন কিছু জলখাবার দেওয়া হয়। কুমার চিঁড়া ও গুড়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। গঙ্গার উপর ভার পড়িয়াছিল সে-সব বিতরণ কবিবার।

নিখিলবাবু বলিলেন, "তুমি হাবুমামাকে ডেকে দিয়ে যাও—"

নির্দিষ্ট কাজে বাধা পড়িলে গঙ্গা মনে মনে চটিয়া যায়, কিন্তু নিখিলবাবুর আদেশ অমান্য করা শক্ত।

হাবুমামা ভোরে উঠিয়াই পরীক্ষিৎকে সঙ্গে লইয়া পীর-পাহাড় ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং পীরপাহাড়ের কাছে সূর্যসুন্দরের যে বাগান ও জমি আছে সেগুলি কিভাবে জমিদারের চেষ্টায় (সূর্যসুন্দরের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও) আজ এমন চমৎকার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারই বিশদ বর্ণনা দিতেছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া একগ্লাস চা শেষ করিয়া তিনি ঠিক করিয়াছিলেন গঙ্গার তীরে যাইবেন। গঙ্গাতীরের সহিত তাঁহার কত স্মৃতিই জড়িত আছে। জাহাজঘাট বার

বার একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া গিয়াছে, এক এক দল রেলোয়ে কর্মচারী আসিয়াছেন এবং চলিয়া গিয়াছেন। সে-যুগে সন্ধ্যাবেলা সকলেরই আড্ডা ছিল সূর্যসুন্দরের বাড়িতে—গান-বাজনা হইত, থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। বিশেষ করিয়া টালি ক্লার্ক মোহিনীকে তাহার মনে পড়িল। ভীতু লোক ছিল, কোনও কথা বলিবার আগে হইতেই ঠোঁট দুইটা নড়িতে আরম্ভ করিত, কিন্তু বাঁশি বাজাইত চমৎকার। মনে পড়িল খোনা ডাক্তারকে, তিনি ওই পুরাতন জাহাজঘাটের একটা পরিত্যক্ত ভাঙা রেলোয়ে কোয়ার্টারে থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রীও খোনা ছিল। তাহাকে আড়ালে সকলে খুনী বলিত।

"নিখিলবাবু আপনাকে ডাকছেন—"

হাবুমামা অবাক হইয়া গেলেন।

"আমাকে?"

"হ্যাঁ, আপনাকে"

বলিয়াই গঙ্গা চলিয়া গেল। বাড়ির পিছন দিকের রাস্তা দিয়া গেল, যাহাতে নিখিলবাবুর চোখে পড়িতে না হয়, পড়িলেই আবার একটা ফরমাস করিয়া বসিবেন, লোকটির স্বভাবই ওই রকম।

নিখিলবাবুর আদেশ অমান্য করা শক্ত। হাবুমামাকে উঠিতে হইল।

নিখিলবাবু সমীপবর্তী হইতেই নিখিলবাবু বলিলেন, "হাবুমামা, আপনাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। এই খাতা নিন, পেনসিল নিন, আর এই দশ টাকার সিকিও রাখুন। এই যে লাউ-কুমড়োগুলো এসেছে, আরও আসবে, তা কোথা থেকে আসছে, ক'টা আসছে, যে গাড়োয়ান এনেছে তার নাম কি, সব এই খাতায় টুকে রাখুন। আর প্রত্যেক গাড়োয়ানকে একটা করে সিকি দিয়ে দেবেন আর তাকে কখন ছুটি দিলেন সে-সময়টা টুকে রাখবেন। বাইরের ঘর থেকে টাইমপিসটা নিয়ে আসুন—"

হাবুমামা বলিলেন, "ওরে বাবা, আপনি তো তাহলে আমাকে বন্দী করে ফেলবেন দেখছি। ভাবছিলুম একটু গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব—

"বসে বসেই গায়ে ফুঁ দিন। ভিতরে উঠোনে কাঠের ঘরের পাশে যে লম্বা ঘরটি আছে তাতেই রাখান এগুলো। পরীক্ষিৎ কোথা?"

"হাসপাতালে আছে বোধহয়"

"তার উপর মাছের ভারটা দেব ভাবছি"

নিখিলবাবু হাসপাতালের দিকে চলিয়া গেলেন।

হাবুমামাও বার দুই জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া লাউ-কুমড়ার গাড়িগুলোর দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুবাতালী তহশিলদারের বাথান হইতে যথাসময়ে দুধ আসিয়া গিয়াছে। ঘড়িতে এলার্ম দিয়া নিখিলবাবু রামটহলকে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে কয়োকটি মাজা পিতলের হাঁড়ি লইয়া গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হইয়া গিয়াছিল। ভোর পাঁচটায় দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সুবাতালী তহশিলদারের দুই মণ দুধ পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি পাঠাইয়াছেন তিন মণ। রামটহল বলিল তিনি এক মণ দইও পাঠাইবেন-গোয়ালাদের বলিয়া দিয়াছেন। রামটহল লোকটি জাতে

গোয়ালা। কিন্তু সে বহুদিন হইতে জমিদারের কাছারিতে সিপাহীরূপে নিযুক্ত আছে, ত্রিপুরারি সিংহের আমোল হইতে। ত্রিপুরারির তিন পুত্র—ধনুকধারী, রামধারী এবং তিলকধারীকে মানুষ করিয়াছে সে। রামটহলের বয়স অনেক, কিন্তু দেখিলে তাহা বোঝা যায় না। বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। মুখে সর্বদা একটা মৃদু মুচকি হাসি, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি, পায়ে মহিষ-চর্মের জুতা, চলিলেই মস্‌মস্‌ আওয়াজ করে। যে-জুতায় আওয়াজ হয় না, সে-জুতা রামটহলের পছন্দ নয়। ধনুকধারী একবার তাহার জন্য একজোড়া জুতা কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু রামটহল সেটা পরে নাই। যে-জুতায় মস্‌মস্‌ আওয়াজ হয় না সে-জুতা পুরুষ মানুষে পরে নাকি! বাবুদের আজকাল মেয়েলী মনোবৃত্তি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া রামটহলেরর দুঃখ হয়। বড়া মালিক (ত্রিপুরারি সিংহ) মহিষের চামড়ার জুতা পরিতেন। তাঁহার বিশাল গোঁফে তেল মাখিতেন, মুখে মাখিতেন মহিষের দুধের সর, পালোয়ানদের সহিত কুস্তি করিতেন, ওস্তাদদের আসরে বিরাট তানপুরা লইয়া বড় বড় রাগ-রাগিণী আলাপ করিতে পারিতেন। আর আজকালকার বাবুরা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছে, মুখে স্নো-পাউডার মাখে, নরম নরম জুতা-জামা পরে, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস খেলে আর গান-বাজনা শোনে গ্রামোফোনে বা রেডিওতে। রামটহলের নাকটি ঈষৎ বাঁকা। ত্রিপুরারি সিংহের আমোলে পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সহিত বা বদমাস প্রজাদের সহিত প্রায়ই খণ্ড-যুদ্ধ হইত। তখন রামটহল একজন লাঠিয়াল যোদ্ধা ছিল। এইরূপ একটি যুদ্ধে রাম টহলের নাকটি জখম হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

নিখিলবাবু বলিলেন, "রামটহল এই দুধের ভার তোমাকে নিতে হবে। এখনই একবার ফুটিয়ে রেখে দাও ঢাকা দিয়ে। বিকেলে আর একবার ফুটিও, তারপর রাত্রে আর একবার। কাল ভোরে এই দুধের পায়েস হবে।"

"সব ঠিক হো যায় গা হুজুর—"

"দুধ জ্বাল দেবে কে? লোক ঠিক করেছ?"

"বারোঠা গোয়ালা কড়াই লেকে আভি আওয়ে গা—"

"তোমার উপর এ ভার দিয়ে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত তো?"

রামটহল কোন উত্তর দিল না। মৃদু-হাস্য-স্নিগ্ধ মুখটি তুলিয়া নিখিলবাবুর দিকে একবার চাহিল মাত্র। সত্যই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সে। নিখিলবাবুর দক্ষিণ হস্ত।

বিরুবাবুর চাকর মুকুন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "চমকলালবাবু এসেছেন। ওঝাজি কুলিও পাঠিয়েছেন অনেক। তাদের কি কাজে লাগাবেন জিগ্যেস করছে—"

"চল যাচ্ছি"

মুকুন্দ আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। খুচরা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতেই বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিখিলবাবুও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিলেন, রামটহল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শুনিয়ে— '

"কি"

"কলকাত্তাসে মালিক লোগ কুছ ভেট ভেজেঁ হ্যাঁয় কি?"

"না, এখনও তো আসেনি কিছু। হয়তো আসবে"

নিখিলবাবু চলিয়া গেলেন। ত্রিপুরারি সিংহের ছেলেরা যে এই উৎসবে কোন ভেট পাঠায়

নাই ইহাতে যেন রামটহলেরই লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। ত্রিপুরারি সিংহের তিন ছেলে এবং তিন মেয়ের জন্ম যে ডাক্তারবাবুর হাতেই একথা আর যেই ভুলুক রামটহল ভুলিবে না।

নিখিলবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন চমকলালবাবু একটি সুদৃশ্য 'টপ্‌পর' (শকটের উপরের ছাউনি) দেওয়া মহিষের গাড়িতে আসিয়াছেন।

তাঁহার সহিত আরও অনেকগুলি লোকও আসিয়াছে। তাঁহার সন্ধ্যার সময় আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আগেই আসিয়া পড়িয়াছেন।

"আমি এসে গেছি ম্যানেজার বাবু। মসালা কোথায় আছে বার করুন। আমি শিল লোঢ়ি (শিল-নোড়া) এনেছি কয়েকটা। এখানে ক'টা আছে?"

"কাল গোটা দশেক এসেছিল বোধহয়। দেখছি। এই রামনিবাস—"

রামনিবাস বাবাজী স্নান করিয়া রোদে পিঠ দিয়া আরামে বসিয়া ছিল। নিখিলবাবুর ডাকে তাহাকে উঠিতে হইল।

"তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে খবর নাও তো, কাল ক'টা শিল-নোড়া এসেছে আমার কাছারি থেকে। যে ক'টা আছে বাইরে নিয়ে এসে চমকলালবাবুর জিম্মা করে দাও। আর ভোজের জন্য যা যা মসলা কেনা হয়েছে সেগুলোও বের করে দিতে বল। বড়বৌমার ভাঁড়ারে আছে এসব—"

রামনিবাস বাবাজী অন্দরমহলের দিকে চলিয়া গেল। সে আসিয়াছিল কীর্তন করিবে বলিয়া, কিন্তু নিখিলবাবু তাহাকে এ কি কাজে লাগাইয়া দিলেন!

"আপনি ক'জন লোক এনেছেন চমকলালবাবু?"

"বারোজন"

"ছ'জনকে পূব দিকের বারান্দায় বসিয়ে দিন আর ছ'জনকে পশ্চিম দিকের বারান্দায়। নিরামিষ আর আমিষ রান্না আলাদা আলাদা হবে। আমিষ রান্নার মসলা দুনিয়ালালকে পাঠিয়ে দিতে হবে আলাদা করে। নিরামিষ রান্না এ-বাড়িতে হবে। সে-ব্যবস্থা আমি করেছি। আপনি মসলাগুলো বাটিয়ে ফেলুন—"

"জরুর"

"ওরে বোধিয়া পুব দিকের বারান্দায় আর পশ্চিম দিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে দে। আরাম কুরসি। আপনার খইনি-টইনি সব ঠিক আছে তো?"

"সোব ঠিক আছে। ও নিয়ে আপনি কিছু ভাবিৎ হোবেন না।" চমকলাল সিং যদিও খাঁটি বিহারী, কিন্তু তিনি বাঙালীদের সহিত বাংলাতেই কথা বলেন। মাঝে মাঝে দু'একটা হিন্দী শব্দ মিশিয়া যায়। কখনও কখনও কোথাও বা অকারণে 'ওকার' বা 'হসন্ ত'-ও দিয়া ফেলেন।

ওঝাজি কুড়ি জন কুলি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের সর্দার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কাম বাতা দিজিয়ে হুজুর।"

"কুঠিতে চারটে বড় বড় তিরপল আর দুটো বড় বড় শামিয়ানা আছে। সেগুলো নিয়ে এস। ওই মাঠটায় খাটাতে হবে। বাঁশ দড়ি কিছু এখানে আছে, কিছু বাজার থেকে আনতে হবে। ওগুলো খাটানো হয়ে গেলে বড় বড় শতরঞ্জি পাততে হবে শামিয়ানার নীচে। তার উপর চাদর

আর তাকিয়া দিতে হবে। সে-সব পরে হবে এখন। চাদর তাকিয়া নবাবগঞ্জ থেকে আসবে। তোমরা আগে শামিয়ানা আর তিরপলগুলো টাঙিয়ে ফেল”

রামনিবাস বাবাজী কয়েকটি চাকরের সহায়তায় শিল নোড়া মসলার ঝুড়ি প্রভৃতি ভিতর হইতে বাহিরে আনিতেছিল। মসলার ঝুড়িটা বেচারা নিজেই মাথায় করিয়াছিল। তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন। সে একজন কীর্তন গায়ক গুরুজী, তাহাকে দিয়া নিখিলবাবু মসলার ঝুড়ি বহন করাইতেছেন! কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ এটা ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাজ, দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং নিখিলবাবু আদেশ করিয়াছেন। সে ঠিক করিয়াছিল মসলার ঝুড়িটা নামাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইবে এবং কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিবে। একবার কীর্তন শুরু করিয়া দিলে নিখিলবাবু সম্ভবতঃ আর তাহাকে উঠাইবেন না।

ঠিক এই সময় কিরণ ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। “কাকাবাবু, আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে”

“তুই আবার কি মুসকিলে পড়লি?”

কিরণের মুখের দিকে নিখিলবাবু হাসিমুখে চাহিলেন। দেখিলেন তাহার চোখ মুখ সত্যই চিন্তাচ্ছন্ন।

“উনি রাত চারটের সময় বিছুয়ার জঙ্গলে তিতির শিকার করতে গেছেন। কিচ্ছু খেয়ে যান নি। অথচ এখনও পর্যন্ত তো ফেরবার নাম নেই। ওঁকে এখান থেকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন—”

কিরণের কণ্ঠে আবদারের সুর ফুটিয়া উঠিল। নিখিলবাবু যেন সেই বেণী-দোলানো কিশোরী কিরণকে দেখিতে পাইলেন। বরাবরই জেদী এবং আবদেরে। মনে পড়িল উহারই জেদে কুঠির বকুল গাছটায় দোলনা টাঙাইয়া দিতে হইয়াছিল। টাঙাইবার বহুরকম অসুবিধা ছিল, কিন্তু নাছোড়বান্দা কিরণের জেদে সে-সব অসুবিধা সত্ত্বেও দোলনা টাঙাইয়া দিয়াছিলেন তিনি। সেই দোলনায় দোদুল্যমান হাস্যমুখী কিরণে ছবিটাও ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল তাঁহার মনে। আর একটা ছবিও ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার নিজের মেয়ে সুরভির। কিরণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সে। বহুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। অত ভিড়ের মধ্যেও নিখিলবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

“ঘোড়ায় কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমি খাবার নিয়ে আসছি।”

কিরণ ভিতরে চলিয়া গেল। নিখিলবাবু মহাসমস্যায় পড়িলেন বিশ্বাসযোগ্য ঘোড়সোয়ার এখন কোথায় পাইবেন তিনি!

ওঝাজির কুলিদের সর্দার এতোয়ারি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে তিনি ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, “তিরপল আর সামিয়ানা আনতে ক’জন গেল?”

“দশজন।”

“তুমিও যাও। আমাদের জিতু সহিসকে লাল ঘোড়াটা নিয়ে আসতে বল এক্ষুণি। ঘোড়াটা যেন কসে’ নিয়ে আসে। তোমার বাকি লোকগুলোকে বল জল তুলুক। ওই যে সব ড্রামগুলো আছে, ওগুলো সব ভরিয়ে নাও। ভিতরে কয়েকটা বড় জালা আর কলসী আছে সেগুলোও ভরে ফেল। ওঝাজি ড্রাম পাঠাবেন বলেছিলেন তাঁর কি হল?”

এতোয়ারী বলিল সেগুলোও আসিয়া পড়িবে। ওঝাজি সেগুলি মাজাইয়া এখনই পাঠাইয়া দিবেন।

"তুমি যাও। জিতুকে ঘোড়াটা নিয়ে এখুনি আসতে বল।"

এতোয়ারী চলিয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কিরণের সমস্যার সমাধান হইয়া গেল অন্য উপায়ে। সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সরফুদ্দিন তাহার পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির হইল। প্রতিবৎসর নূতন ঘোড়া কেনা তাহার শখ। এই বৎসর শোনপুরের মেলা হইতে ছাই-ছাই রঙের এই পাহাড়ী ঘোড়াটা কিনিয়া আনিয়াছে এবং সেটার পিঠে চড়িয়া চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ঘোড়ার পিঠ হইতে একলম্ফে নামিয়া সে ঘোড়াটাকে বাগানের বেড়াটায় বাঁধিয়া হাসিমুখে নিখিলবাবুর দিকে আগাইয়া আসিল।

"আদাব কাকাবাবু। আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাবা বিকেলে আসবেন। আমাকে এখন কি করতে হবে বলুন।"

সরফুদ্দিন শৌখিন লোক। কানে আতরসিক্ত তুলা, মুখে জরদাসুরভিত পান। সর্বাঙ্গ হইতে ভুরভুর করিয়া গন্ধ ছাড়িতেছে।

"তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে। তুমি বিকেলে মহাদেব বারুইকে দিয়ে পান সাজাবে। কাল অন্তত দু'হাজার খিলি পান চাই। কিন্তু এখন তোমাকে আর একটা কাজ দিচ্ছি। আমাদের বড় জামাই খুব ভোরে বিছুয়ার জঙ্গলে গেছে তিতির শিকার করতে। এখনও পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। কিছু খেয়ে যায় নি। তুমি একবার তার খবরটা নাও, কিরণ খুব ভাবছে।"

"এখুনি যাচ্ছি--"

সরফুদ্দিন তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইল।

"একটু দাঁড়াও। কিরণ কিছু খাবার দিচ্ছে, সেটাও নিয়ে যাও।"

"ও, আচ্ছা।"

সরফুদ্দিন ফিরিয়া আসিল। কিরণ তাহারও সমবয়সী। ছেলেবেলায় প্রায় তাহার জন্য শিউতলাও হইতে পদ্মফুল আনিয়া দিত। এবার কিরণের সহিত তাহার কথাই হয় নাই। হঠাৎ মনে হইল, শুধু এবার কেন অনেকদিনই তাহার কিরণের সহিত কথা হয় নাই। উৎসুকনেত্রে সে সূর্যসুন্দরের মাধবী-লতায়-ছাওয়া গেটটার দিকে চাহিয়া রহিল। গোছা গোছা মাধবী ফুল ফুটিয়াছে। তাহার মনে হইল তাহার বাগানে এমন সুন্দর মাধবী ফুল তো হয় না। কুমার কি সার দেয় সেটা জানিয়া লইতে হইবে। তাহার একথা মনে হইল বটে, কিন্তু কুমারের নিকট এ-খবরটি তাহার জানিয়া লওয়া হইবে না, একটু পরেই সে ভুলিয়া যাইবে। অনেক জিনিসই সে অনেকের নিকট জানিয়া লইবে ভাবিয়াছে, কিন্তু একটাও জানিয়া লওয়া হয় নাই।

একটু পরেই কিরণ বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। মাথায় ঘোমটা নাই।

"সরফু এসেছিস নাকি। কতক্ষণ এসেছিস? ওই ঘোড়া তোর, বাঃ চমৎকার"

অবগুণ্ঠনমুক্ত কিরণকে দেখিয়া সরফু অবাক হইয়া গেল। তাহার মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল সে।

"ছেলেবেলায় তুই পাকা বুড়ি ছিলি, এবার দেখছি সত্যিসত্যি বুড়ি হয়ে গেছিস। মাথার চুলও পেকে গেছে"

মাথার পাক চুলের কেহ উল্লেখ করিলে কিরণ চটিয়া যায়। বলিল, "আহা তুমি যেন খোকা আছ। তোমারও তো জুলফির চুলে পাক ধরেছে। গোঁফদাড়িও পেকেছে নিশ্চয়—"

"বিলকুল"

সরফুদ্দিনের হাসি আরও উচ্চগ্রামে উঠিল।

কিরণ নিখিলবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "কাকাবাবু খাবার নিয়ে এসেছি, কাকে দিয়ে পাঠাব?"

"সরফুদ্দিন নিয়ে যাবে"

"ও সরফু। তুই যাবি? আমারও ইচ্ছে হচ্ছে তোর পিছনে বসে চলে যাই, ছেলেবেলায় যেমন যেতাম—"

"আয় না"

"ধ্যেৎ, এখন আর কি পারি। লোকে বলবে কি। এই নে, প্যাকেটের ভিতর লুচি আর ডিমের ওমলেট আছে। সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াবি। নানা ছুতোনাতায় না-খাওয়ার চেষ্টা করবে। কোনও ওজর শুনবি নে"

"আচ্ছা—"

"তুইও একটু খেয়ে যা। সেজদা এমন চমৎকার সব খাবার এনেছে। মহীশুরি পাক, পেস্তার বরফি, নিয়ে আসি দাঁড়া—"

না-না করিবার পূর্বেই কিরণ বালিকার মতো চঞ্চল চরণে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

নিখিলবাবুর দিকে চাহিয়া সরফুদ্দিন হাসিয়া বলিল, "দেখুন দিকি কাণ্ড। মুখের পানটা ফেলে দিতে হবে এখন—"

"দিতেই হবে। কিরণ ভযানক জিদী—"

নিখিলবাবুর আবার সুরভিকে মনে পড়িল। সেও জিদী ছিল খুব।

।। পনেরো।।

বাল্যবন্ধু সীতিয়াকে দেখিয়া আসিবার পর হইতেই সন্ধ্যার মাথায় মতলবটি গজাইয়াছে—এখানে গ্রামের মেয়েদের লইয়া একটি সভা করিতে হইবে এবং সেই সভায় স্থির করিতে হইবে কি করিয়া এই গ্রামে একটি নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করা যায়। এই জন্যই সে স্বাতী চিত্রা লীলা ইলাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। ঠিক হইয়াছে লীলা সেতার বাজাইবে, ইলা গান গাহিবে। স্বাতী বক্তৃতা করিবে। স্বাতী প্রথমে রাজী হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার ধমক খাইয়া অবশেষে রাজী হইতে হইয়াছে। তবে সে বলিয়া দিয়াছে দু'এক মিনিটের বেশী বলিতে পারিবে না। এ-বিষয়ে সে কতটুকু বোঝে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিবে মাত্র, বক্তৃতা করিতে পারিবে না। চিত্রা কি করিবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তাহার সহিত এ-বিষয়ে ভাল করিয়া আলাপই হয় নাই। বাবার ছবি লইয়া সে ব্যস্ত ছিল। বাবার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরও ছবিটা লইয়াই তন্ময় হইয়াছিল সে খানিকক্ষণ। সন্ধ্যা তাহার কাছে আরও দুইবার লোক পাঠাইবার পর অবশেষে সে আসিয়া হাজির হইল।

"কেন ডাকছ পিসি?"

"বাবার ছবি শেষ হল?"

"এত তাড়াতাড়ি কি হয়। কিছুতেই ঠিক মনোমত হচ্ছে না। তুমি দেখবে? এসো না। কোথায় যেন একটু তফাৎ হয়ে যাচ্ছে ঠিক ধরতে পাচ্ছি না।"

সন্ধ্যাও বিবাহের পর কিছুদিন ছবি আঁকিয়াছিল, সুতরাং তাহার মতের মূল্য আছে।

"আমি একটু পরে গিয়ে দেখব এখন। এখন যে জন্য ডেকেছি শোন। এখানে আমরা যখন সবাই এসে গেছি তখন গ্রামের অন্য সব মেয়েদের ডেকে একটা সভার আয়োজন করব ভেবেছি। আমার ইচ্ছে এই উপলক্ষে এখানে একটি নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করা হোক। আজ বিকেলই আমাদের আমবাগানে সভা হবে। স্বাতী বক্তৃতা করবে, লীলা সেতার বাজাবে, ইলা গান করবে। তুই কি করবি?"

চিত্রা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

"আমি? আমি আবার কি করব! বসে বসে দেখব আর শুনব সব"

চিত্রা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"তুই তো আগে বেহালা বাজাতিস"

"এখনও বাজাই। কিন্তু অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। বেহালা তো আনা হয় নি। দাদুর ছবি আঁকব বলে ছবি আঁকবার সরঞ্জামটা এনেছি খালি—"

"বেহালা এখানে পাওয়া যাবে। বিজলীর বাড়িতে বেহালা আছে। সেটা এখনই আনিয়ে নিচ্ছি। তোকে বেহালাই বাজাতে হবে। ঠিকঠাক করে রাখ। পাংচুয়ালি চারটের সময় সভা আরম্ভ করব। সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছি বড়দি আর ছোটদিকে নিয়ে। ওরা কেউ কিছু করতে রাজী হচ্ছে না। তুই একবার বলে দেখ না।"

"চম্পাও সভায় যাবে নাকি"

"ওকে বড়বৌদি যেতে দেবেন না। পোয়াতি মানুষ, ওকে নিয়ে টানাটানি করাও ঠিক হবে না। ও গেলে তো সভা জমে যেত, যা সুন্দর গীটার বাজায়"

অপ্রত্যাশিতভাবে ঊষা আসিয়া হাজির হইল।

"আচ্ছা, ছোট, অসুখের বাড়িতে তুই এ কি হুজুক তুলেছিস বল তো। কাল বাড়িতে কত লোক খাবে, কাকাবাবু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, আর তুই বাড়ির তিনটে চাকরকে বাগান পরিস্কার করতে পাঠিয়ে দিলি। বোধিয়া বাড়ির সব শতরঞ্জি কম্বলগুলো নিয়ে চলে গেল। নিখিলকাকা ভয়ানক রাগারাগি করছেন।"

সন্ধ্যা আনতনয়নে সব শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর শান্তকণ্ঠে বলিল, "করুন। তুমি শুধু রেগ না।"

ঊষা সন্ধ্যার আনতনয়ন দেখিয়া এবং শান্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয় পাইয়া গেছে। সে জানে অত্যন্ত রাগিয়া গেলে সন্ধ্যার চক্ষু আনত হয়, কণ্ঠস্বর শান্ত হইয়া আসে। আরও বেশী রাগিলে একদম চুপ করিয়া যায় এবং উপবাস করিতে থাকে। সে বড় সাংঘাতিক পরিস্থিতি। একবার আরম্ভ হইলে তিন চার দিনের আগে কমে না। কোথাও শক্ত গেরো পড়িয়া গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। ঊষা আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "আমি রাগ করব কেন। আমি রাগিনি"

"না রাগলে সভায় যেতে চাইছ না কেন"

"আচ্ছা তুই পাগল না ক্ষ্যাপা। তিন-তিনটে ডাকাত ছেলে নিয়ে আমি হিমশিম খাচ্ছি। আমি সভায় যাই কি করে' বল তো! এসব কথা মুখে আনিস কি করে' তোরা? আর একটু হলে কি যে সর্বনাশ হয়ে যেত, দুই ভাই ওই বড় পেয়ারা গাছটার মগডালে উঠেছিল। জানিস? আর ওদের হুঁচকি লাগাচ্ছে ওই বুড়োধাড়ী, স্বাতী—"

"এক, দুই, তিন তো সভায় আবৃত্তি করবে। তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও আমি ওদের আটকে রাখছি"

"ওদের দলে টেনেছ? ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি।"

ঊষা দুই হাত জোড় করিয়া সন্ধ্যাকে নমস্কার করিল। সন্ধ্যার গাম্ভীর্য কিন্তু তাহাতে এতটুকু বিচলিত হইল না।

"এতে আবার দলে টানাটানি কি! ওরা ভালো আবৃত্তি করতে পারে, ওদের আবৃত্তি করবার ইচ্ছেও খুব, আমাদের ঘরোয়া সভা হচ্ছে তাতে ওদের আবৃত্তি করতে দিলে দোষটা কি!"

ঊষা বিগলিত হইয়া গেল। কথার সুর বদলাইয়া গেল তাহার।

"সত্যিই ওরা ভালো আবৃত্তি করে। তিনটা আধো-আধো কথায় এমন সুন্দর বলে যে কান জুড়িয়ে যায়। বেশ, তাহলে ওদের তোর কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই শিখিয়ে দিলে আরও ভালো করে পারবে—"

"সে যা করবার আমি করব। তুমি কি করবে বল। তুমি তো আগে গান গাইতে চমৎকার। সে গলা কি আছে এখনও? তোমার সেই 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানটা সেই কবে শুনেছিলাম, এখনও যেন কানে বাজছে। মনে আছে গানটা—"

"মনে আছে। কিন্তু সভায় আমি গাইতে পারব না। ওঁর সামনে বড় লজ্জা করবে আমার—"

"জামাইবাবু তো সভায় থাকবেন না। কোনও পুরুষ-মানুষই থাকবে না। মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা থাকবে"

"তাই নাকি! গাঁয়ের মেয়েরা সব আসবে?"

"সীতিয়া বলেছে ডেকে আনবে অনেককে। প্রিয়গোপালের বাড়ির মেয়েরা আসবে। আমাদের চাকরদের বাড়ির মেয়েরাও আসবে। বর্ষাতিয়ার মায়ের খুব উৎসাহ। আর একজনকে খবর পাঠিয়েছি সে যদি আসে তাহলে তাকেই আমরা সভানেত্রী করব"

"কে বল তো"

"দাদার দুধ-মা। চামরুর বউ। সে বুড়ী এখনও বেঁচে আছে শুনলাম"

"ওমা, তাই নাকি!"

ঊষার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া গেল। খুব খুশীও হইল সে মনে মনে।

"তার বয়স তো বাবার বয়েসের কাছাকাছি। সে হেঁটে আসতে পারবে?"

"ছোটদা নিয়ে আসবে তাকে গাড়ি করে—"

"ছোটদা ওঁকে নিয়ে গেছে আমাদের পুকুরে, উনি সেখানে মাছ ধরবেন। ছিপটিপ নিয়ে চা খেয়ে সকালেই বেরিয়েছে ওরা—"

"জামাইবাবুকে পুকুরে বসিয়ে দিয়ে ছোটদা যাবে টোপরা। সেখানাকর জলকর থেকে মাছ

আনবার জন্যে নিখিলকাকা পাঠিয়েছেন ওকে। গরুর গাড়ি চড়ে গেছে। টোপরাতেই চামরুর বউও থাকে আজকাল তার মেয়ের বাড়িতে। চামরুর ছেলেটা মরে গেছে তো। বেচারী মেয়ের কাছেই থাকে এখন"

"এত তত্ত্ব তুই জানলি কোত্থেকে"

"ছোটদার কাছ থেকে। ছোটদাই নিয়ে আসবে চামরুর বউকে"

"ওঁকে একলা পুকুর ঘাটে বসিয়ে রেখেছে নাকি ছোটদা তাহলেই হয়েছে। উনি যা ভীতু মানুষ, একা ওই তেপান্তর মাঠে বসে থাকতে পারবেন কি! শহরের লোক তো!"

ঊষার মনে ও মুখে নূতন আশঙ্কা ছায়াপাত করিল।

"জীবু শিবুকে ওঁর কাছে রেখে গেছে ছোটদা। একটা চাকরও কাছে থাকবে"

"যাক, বাঁচা গেল। আমি এক দুই তিনকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে"

"তোমাকেও কিন্তু সেই গানটা গাইতে হবে"

"তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। এ-বয়সে গানের গলা কি ওঠে কখনও"

"যতটা ওঠে তাতেই হবে। এ তো ঘরোয়া ব্যাপার আমাদের। সবাই মিলে একটু আনন্দ করা।"

"দুৎ"

একটু হাসিয়া ঊষা চলিয়া গেল। তাহার হাসি হইতে সন্ধ্যার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ঊষা গান গাহিবে। মুখে যতই আপত্তি করুক, মনে মনে সে খুশীই হইয়াছে। ঊষার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া সন্ধ্যা মুখ টিপিয়া হাসিল একটু। তাহার পর সে উঠিয়া পড়িল। কিরণকে আর একবার বলিতে হইবে। বৌদিদিরা ব্যাপারটা এখনও জানেই না। অর্থাৎ তিনটি দুরারোহ পর্বত লঙ্ঘন করিতে হইবে এখনও। আর বসিয়া থাকা চলে না। বাবাকেও বলিতে হইবে।

সন্ধ্যা উঠিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ঠিকঠাক করিয়া লইল। তাহার পর পরিপাটি করিয়া নিজের-হাতে-বোনা উলের বেঁটে ব্যাপারটি (স্কার্ফ) নিপুণভাবে গায়ে জড়াইয়া ভেলভেটের চটিটি পায়ে দিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল চটিতে ধূলা লাগিয়াছে। সামান্য ধূলা নিজেই অনায়াসে ঝাড়িয়া লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করিল না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল—"ভুটুয়া—"

"—জি"

একটি ক্ষুদ্র বালক দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল। ন্যাড়া মাথায় প্রকাণ্ড টিকি, পরিধানে ছেঁড়া হাফ প্যাণ্ট এবং তাহার উপর বেমানান লাল রঙের হাঁটু পর্যন্ত একটা কামিজ। কামিজটি সন্ধ্যাই কিনিয়া দিয়াছে। বোধিয়ার ভাগনে। কুমার ইহাকে সন্ধ্যার ফাইফরমাশ খাটিবার কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। অন্য সময়ে সে মাঠে গরু চরায়, অর্থাৎ গরু চরাইবার নামে খেলা করিয়া বেড়ায়। ফাইফরমাস খাটা তাহার অভ্যাস নাই।

"ভুটুয়া আমার জুতো ঝাড়িসনি আজ? ঝেড়ে দে—" সন্ধ্যা একটা ময়লা রুমাল তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল। ভুটুয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, চোখ ছোট করিয়া, মুখ সূচালো করিয়া এমনভাবে সেটা ঝাড়িতে লাগিল যেন তাহাকে কোনও দুরূহ কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

চটি ঝাড়া হইয়া গেলে চটিটি পায়ে দিয়া সন্ধ্যা আয়নায় আর একবার নিজের মুখটি দেখিল। কানের পাশে দুই একটি চুল স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সেটি ঠিক করিয়া দিল। তাহার পর লজেন্সের কৌটা হইতে লজেন্স বাহির করিয়া একটি নিজের মুখে পুরিল আর একটি ভুটুয়াকে দিল।

বাহির হইতে যাইবে এমন সময় রঙ্গনাথ দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

"একটা কথা ছিল—"

"কি"—মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল।

"ছোটবাবু বেরুবার আগে একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে"

সন্ধ্যা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "এমন থিয়েটারি ঢং-এ কথা বলছ যে হঠাৎ! কি বক্তব্য?"

"ছোটবাবু বলে গেছেন আমি গিয়ে তোমাদের সভার জন্যে শতরঞ্জি কম্বল চেয়ার টেবিল চৌকি যেন বাগানে গিয়ে সাজিয়ে দিই। জিনিসগুলো ওখানে চলে গেছে, আমি গিয়ে সাজাব কি?"

"সাজাও না, ভালই তো"

"তুমি গিয়ে আবার সব ওলটপালট করে ফেলবে নাতো। পরে আর চাকর পাওয়া যাবে না, নিখিলবাবু বলেছেন এক ঘণ্টার মধ্যে চাকরগুলোকে ফেরত পাঠাতে হবে। অর্থাৎ বার বার ওলটপালট করবার সুযোগ আমরা পাব না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুমিও চল না আমার সঙ্গে, যেমন বলবে তেমনি করা যাবে। যার কর্ম তার সাজে—"

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল।

'চল যাচ্ছি। বড়দি আর বৌদিদের বলা হয়নি এখনও। ওদের নিয়ে যেতে হবে সভায়। চল না, তুমিও বলবে একটু। তুমি জামাই, তোমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

"সেই জন্যেই তো আমার চুপ করে থাকা উচিত"

"বেশ, চুপ করেই থেকো তাহলে—"

রাগের ভান করিয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল। রঙ্গনাথও অনুসরণ করিলেন।

উঠানের এক প্রান্তে বড় ইঁদারাটার কাছে যে পাকা চৌতারাটা আছে তাহার উপর চন্দ্রসুন্দর এক দুই তিনকে তেল মাখাইতেছিলেন। বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকিলে তাহাদের তেল মাখানো এবং তাহাদের সহিত একসঙ্গে স্নান করা চন্দ্রসুন্দরের চিরকালের অভ্যাস এবং বিলাস। ইহাতে তিনি বড় আনন্দ পান। তাঁহার মাস্টারি জীবনের প্রারম্ভে যখন তিনি সূর্যসুন্দরের কাছে থাকিয়া এখানকার মাইনর স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখনও তিনি স্নানের আগে দাদার ছেলে-মেয়েদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইতেন। বিরু, পৃথ্বীশ, উশনা, কিরণ, সন্ধ্যা, কুমার সকলেই তাঁহার হাতে তেল মাখিয়া তাঁহার সহিত স্নান করিয়াছে। প্রত্যেকের মাথাতেই 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলিয়া তিনি জল ঢালিয়াছেন। শিশুদের মাথায় জল ঢালিলে তাহারা ছটফট করিতে থাকে, হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া অসহায়ের মতো চীৎকার করিয়া ওঠে, এ-দৃশ্যটা চন্দ্রসুন্দর বড়ই উপভোগ করেন। শিশুদের সঙ্গই উপভোগ্য তাঁহার নিকট। আজ উষার ছেলে তিনটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। দুই-এর পিঠে তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিতেছিলেন—'দুই বাবু বসি বসি তেল মাখে ঘষি ঘষি'। তেল মাখাইতে মাখাইতে মুখে মুখে বড় বড় ছড়াও তিনি বানাইয়া ফেলেন। ছড়াগুলির কাঠামোটা অবশ্য করাই থাকে, নামটা কেবল বদলাইতে হয়। সন্ধ্যা কাকাবাবুর দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। তাহার মনে পড়িল কাকাবাবু তাহাকেও এই ছড়া বলিয়া স্নান করাইতেন—'সন্ধ্যামণি বসি বসি তেল মাখে ঘষি ঘষি।' আরও দুই একটা ছড়াও তাহার মনে পড়িল—'সন্ধ্যামণির চুলে জট, তাই করছে ছটফট', 'কুমারবাবু লক্ষ্মীমুনি, সন্ধ্যারানী ছিঁচকাঁদুনি'। বড় ভাল লাগিল সন্ধ্যার। সে আগাইয়া গিয়া বলিল, "এইবার কাকাবাবু ঠিক

নিজের কাছে পেয়ে গেছেন। আর একটা কাজও করতে হবে আপনাকে। এক দুই তিনকে রেসিটেশন দেখিয়ে দিতে হবে একটু। আপনি আমাদের রেসিটেশন বরাবর ঠিক করে দিয়েছেন, এইবার ওদের দিন।"

চন্দ্রসুন্দর সভার খবর জানিতেন না। একটু বিস্মিত হইলেন।

"হঠাৎ এখন রেসিটেশন?"

"আমাদের মেয়েদের একটা সভা হচ্ছে বাগানে। সেখানে ওরা আবৃত্তি করবে। কবিতা ওদের মুখস্থ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ছাতা বলে ধিক ধিক মাথা মহাশয়'। আপনি একটু ঠিক করে দিন"

চন্দ্রসুন্দর উৎসাহিত হইলেন।

"বাঃ, সভার কথা আমাকে কিছু বলিসনি তো"

"এ শুধু মেয়েদের সভা যে। কোনও পুরুষ থাকবে না সে-সভায়"

একটু দমিয়া গেলেন চন্দ্রসুন্দর। যে-জিনিসটা তিনি পছন্দ করেন না—(বিদেশী ছাঁচে ফেলা স্ত্রীস্বাধীনতা ও অতিআধুনিকতা)—ইহার মধ্যে যেন তাহারই আভাস পাইলেন তিনি। কিন্তু খুব একটা তীব্র প্রতিবাদ করিলেন না। কেবল হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা দিন দিন যে কি হচ্ছ মা, কোন পথে যে পা বাড়াচ্ছ তা তোমরাই জান!" চন্দ্রসুন্দরের মনে পড়িল বউ (সন্ধ্যার মা) যখন নববধূ তখন সে একদিন মামার বাড়ির ছাতে আলিসা হইতে ঝুঁকিয়া একটি বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল বলিয়া বাড়িতে কি কাণ্ডই না হইয়াছিল। আর আজ ইহারা মাঠে সভা করিতেছে! কালের প্রভাব দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিয়াছেন প্রতিবাদ করিয়াও লাভ নাই, কালই বেশী বলীয়ান। ভালো হোক, মন্দ হোক পরিবর্তনই নিয়ম, তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে।

কাকাবাবুর কথার সুর শুনিয়া সন্ধ্যা সরিয়া পড়িল।

কিরণ বারান্দায় বসিয়া ফলের রস কবিতেছিল। তাহার মুখের মেঘাচ্ছন্নভাবটা তখনও কাটে নাই। নিজেকে নিতান্তই দুর্ভাগিনী মনে হইতেছিল তাহার। স্বামী চিরকাল নিজের খেয়ালেই মত্ত, তাহার দুর্বার শিকার প্রবৃত্তিকে সে এতদিন এত চেষ্টা করিয়াও দমন করিতে পারিল না। আর একমাত্র ছেলেটি তো মিলিটারিতে। কখনও ছুটি পায় না। কতদিন যে বাড়ি আসে নাই। সে আশা করিয়াছিল এই অসুখের উপলক্ষ করিয়া হয়তো আসিবে। কিন্তু কই।

"বড়দি আজ বিকেলে আমাদের সভার কথা মনে আছে তো"

কিরণ ঘাড় হেঁট করিয়া ফলের রস ছাঁকিতেছিল।

বলিল, "আমার ওসব কিছু ভালো লাগছে না এখন।"

"এতে ভালো না লাগবার কি আছে?"

"উনি সেই কোন্ ভোরে শিকারে বেরিয়েছেন। না ফেরা পর্যন্ত কিছু ভালো লাগছে না আমার"

"জামাইবাবু সময় হলেই ফিরে আসবেন। ক'টার সময় বেরিয়েছেন?"

"ভোর চারটের সময়। আর বিছুয়ার জঙ্গল কি এখানে! শুনলাম চার ক্রোশ দূরে"

"তাহলে এর মধ্যে ফিরবেন কি করে! হেঁটে গেছেন তো"

"হ্যাঁ"

"যেতে আসতেই তো চার পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। তারপর শিকার করতেও অন্তত দু'তিন ঘণ্টা। তারপর বিশ্রাম করবেন একটু নিশ্চয়। দুটো-তিনটের আগে ফিরতেই পারেন না। এখন তো এগারোটাও বাজেনি।"

সন্ধ্যা নিজের হাতঘড়িটা আর একবার দেখিল।

"অসুখের বাড়িতে গেরস্তকে এরকম উদ্ব্যস্ত করলে কি রকম লাগে বল দিকি।"

"সবাই মুখ গোমড়া করে বসে থেকেই বা কি লাভ হবে। বাবা তো অনেকটা ভালো আছেন। সেইজন্যই তো এই সভা কবছি, সবাই মিলে একটু আনন্দ করা যাক—"

"তোমার সভায় হবে কি?"

"হবে আবার কি! সবাই বসে একটু আনন্দ করা যাবে। গ্রামের অনেক মেয়েরাও আসবে। স্বাতী বক্তৃতা করবে, চিত্রা বেহালা বাজাবে। লীলা সেতার বাজাবে, ইলা গান করবে। এক দুই তিন আবৃত্তি করবে। ছোটদিও গান করবে বলেছে। তোমাকেও একটা কিছু করতে হবে। চামরুব বউ যদি না আসে তাহলে তোমাকে 'প্রিজাইড' করতে হবে।"

কিরণ যদিও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল কিন্তু মনে মনে সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল। কোন সভায় 'প্রিজাইড' করা যে একটা গৌরবের বিষয় তাহা সে জানে। দেরাদুনে একটা সভায় একবার মিলিটারি সাহেব সভাপতিত্ব করেন। কৃষ্ণকান্তের সহকারি গিয়ান সিংয়ের মেয়ে নির্মলা তাঁহার গলায় গেঁদা ফুলের প্রকাণ্ড মালা পরাইয়া দিয়াছিল। বহুদিন আগেকার এই চিত্রটা তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। বড়দিদি বলিয়া খাতির করিযা তাহাকে এ-সম্মানটা দিয়াছে, এজন্য সন্ধ্যার উপর মনে মনে প্রসন্ন হইল সে।

"চামরুর বউ কি আসতে পারবে? কুমার বলছিল খুব বুড়ো হয়ে গেছে। চোখেও না কি ভালো দেখতে পায় না। যাই হোক সে যদি আসে তাকেই 'প্রিজাহড' করতে বলিস।"

"তাতো বলবই। কিন্তু সে শুধু চেয়ারেই বসে থাকবে। প্রিজাইড তোমাকেই কবতে হবে।"

"বাবাকে বলেছিস?"

"বলতে যাচ্ছি। বউদিদিদেরও এখনও বলা হয় নি। ভাবছি, ছোটবউদি যাবে কি করে? বাবার বাছে তাহলে থাকবে কে। গঙ্গাকে পাওয়া যাবে কি? নিখিলকাকা তো সবাইকে বাইরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন।"

কিরণ বলল, "বাবাকে একা ফেলে সবাইয়ের যাওয়া চলবে না"

কিরণ সন্ধ্যা দুইজনেই সূর্যসুন্দরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। গিয়া দেখিল চম্পা একটি সুদৃশ্য চিরুনি দিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে। কিরণের হাতে ফলের রস দেখিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "এখুনি চম্পা আমাকে ওভালটিন খাইয়েছে—"

"এটুকুও খেযে নাও। যা শুকনো লেবুগুলো, আধ কাপের মতও হয় নি। ফিডিং কাপটা দাও তো ওদিক থেকে—"

"না, ফিডিং কাপের দরকার নেই। ওটা দেখলেই মনে হয় আমি রুগী। এমনি খেতে পারব, দাও।"

সূর্যসুন্দর বাঁ হাত দিয়া কাপটি ধরিয়া এক চুমুকে সবটা শেষ করিয়া ফেলিলেন।

"সন্ধ্যা কি হুজুকটি তুলেছে শুনেছ তো।"

"শুনেছি। নিখিলবাবু এসেছিলেন এখুনি। চাকরেরা বাগানে চলে গেছে বলে রাগারাগি করছিলেন।"

সন্ধ্যার আত্মসম্মান ইহাতে আহত হইল।

বলিল, "এতে রাগারাগি কেন। আমি না হয় কয়েকটা মজুর আনিয়ে নিচ্ছি।"

"মজুর একটাও পাবি না। নিখিলবাবু সবাইকে কাজে লাগিয়েছেন। এ ছোট গ্রাম তো ক'টাই বা মজুর আছে এখানে।"

এই কথায় সন্ধ্যার মনে যেন একটা নূতন আলোকপাত হইল। এখানে ইচ্ছা করিলে একজনই তাহা হইলে সমস্ত মজুরদের দখল করিতে পারে পয়সার জোরে। ইহা তো অন্যায়।

"গ্রামের সব মজুরদের নিয়ে নিয়েছেন কাকাবাবু? এখানে কত করে মজুরি আজকাল?"

"তা ঠিক জানি না। তবে আমার এখানে মজুরির লোভে কেউ আসে নি, নিজেরাই এসেছে। জমিদাররা কিছু পাঠিয়েছেন, ওঝাজি বোধহয় কিছু পাঠিয়েছেন, বাকী সব নিজেরা এসেছে।"

এসব খবর সন্ধ্যারও অবিদিত নয়। কিন্তু সে অনেকদিন শহরে আছে, গ্রামের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক অনেকদিন ছিন্ন হইয়াছে তাই সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে এখানকার মজুররা অর্থকেই সব সময় পরমার্থ মনে করে না। সূর্যসুন্দরের কথা শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল, আনন্দিতও হইল।

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল। বাড়িতে যদিও অনেক লোকজন আসিয়াছে কিন্তু সূর্যসুন্দরের বিছানায় সেই দিবারাত্রি থাকে। রাত্রে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে শুইয়া খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া লয়। তখন গঙ্গা অথবা কুমার জাগিয়া বসিয়া থাকে।

পুরসুন্দরী এবং জগন্ময়ী প্রবেশ করিলেন। জগন্ময়ীর হাতে একটি থালায় কিছু মিষ্টান্ন।

পুরসুন্দরী বলিলেন, 'বাবা, সেজবউ অনেক রকম মিষ্টান্ন এনেছে। একটু একটু চেখে দেখবেন নাকি?"

"এখন থাক। খাবার সময় দিও। মাছ এসেছে আজ?"

"নিখিলকাকা সকালেই দুটো বড় বড় রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোবিন মহলদার একটা বড় চিতল মাছও দিয়ে গেছে।"

"বাঃ! আমাদের বাগানে সন্ধ্যা কি একটা সভা করছে। তোমরা যাবে না?"

সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, "যাবেন বই কি! সব্বাইকে যেতে হবে"

পুরসুন্দরী সভার কথা শোনেন নাই।

"কিসের সভা?"

সন্ধ্যা এবং কিরণ দুইজনে মিলিয়া ব্যাপারটা বিবৃত করিল। কিরণ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সমস্ত শুনিয়া পুরসুন্দরী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এতও তোর মাথায় আসে!"

তাহার পর বলিলেন, "আমরা সবাই যাব কি করে? বাবার কাছে কে থাকবে তাহলে। ঊর্মিলা সভায় যাক, ও তো বাবার বিছানা ছেড়ে ওঠে না একবারও। ওই যাক, আমি কাছে থাকব"

জগন্ময়ী মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া একধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কোনও মন্তব্য করিলেন না।

দিদি (পুরসুন্দরী) যাহা বলিবেন তাহাই তিনি নির্বিচারে পালন করিবেন। তাঁহার নিজস্ব কোন মতামত নাই।

পুরসুন্দরী, জগন্ময়ী, কিরণ এবং সন্ধ্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া ছিলেন। সন্ধ্যাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পুরসুন্দরী তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"সন্ধ্যা বাগানে সভা করছে। তোমাদের একেবারে বাদ দিয়েছে। সভায় খালি মেয়েরা থাকবে"

"আমাদের একেবারে বাদ দেয় নি। শতরঞ্জি কম্বল চেয়ার টেবিল পাতবার জন্যে আমাদের ডাক পড়েছে। এটাও আমাদের প্রতি কম অনুগ্রহ নয়"

সন্ধ্যা সকলের পিছনে ছিল। রঙ্গনাথের দিকে সহাস্য কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

।। ষোল।।

চন্দ্রসুন্দর স্নান শেষ করিয়া জীবু শিবুকে লইয়া পড়িয়াছিলেন।

"তোরা পায়জামা পরে ঘুরছিস কেন! কাপড় পর"

শিবু লজ্জিত হইল। সে নিজেই অনুভব করিতেছিল যে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু হইতেছে। কিন্তু কি করিবে, কাপড় পরা তাহাদের অভ্যাসই নাই। যেখানে তাহারা থাকে সেখানে কাপড় পরার রেওয়াজই নাই। সকলে পায়জামাই পরে সব সময়ে।

জীবু বলিল, "ওখানে আমরা কাপড় পরিই না।"

চন্দ্রসুন্দর অবাক হইলেন।

"সে কি রে! বাঙালীর ছেলে কাপড় পরিস না!"

শিবু সজ্জল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমরা কাপড় পরতেও পারি না ভাল করে। অভ্যাস নেই তো—"

"তা বললে চলবে না তো দাদু। বাঙালীর ছেলে, কাপড়-পরা শিখতে হবে বই কি। পায়জামা পরেই বিয়ে করতে যাবি নাকি। আয় আমি তোদের কাপড়-পরা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোদের বাবা-কাকাদেরও শিখিয়েছিলাম। কাপড়-পরা সোজা কাজ নয়। ওর একটা হিসেব আছে। আলনা থেকে ওই কাপড়টা পাড়—"

জীবু একটা কাপড় পাড়িয়া পরিতে লাগিল।

"না না, ও ঠিক হচ্ছে না। দেখিয়ে দি আয়। কাছার যেটা উপরের খুঁট সেটা জাস্ট মাটি ছুঁয়ে থাকবে। বেশী বড় হয়ে গেলে কাছা ঢিলে হয়ে যাবে, বেশী ছোট হলে আঁট হবে। দুটো ব্যাপারই অস্বস্তিকর। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে—"

তাহার পর কোঁচাটা কি করিয়া করিতে হয় দেখাইয়া দিলেন।

"কাপড়ের বহর যদি বেশী হয় কোঁচা ধুলোয় লুটোবে। সেটাকে এইভাবে সামলাতে হয়"

নিজের হাতে কোঁচাটা তুলিয়া গুঁজিয়া দিলেন।

কোঁচা দিয়ে মালকোঁচা করা যায়। কোঁচা খুলে কোমরে বেল্টের মতোও বাঁধা যায়। কাপড়ের কসি বেশ গুঁজে নাও। তা না হলে কাপড় ফস্ করে খুলে যাবে"

কসিটাও নিজের হাতে ঠিক করিয়া দিলেন।

"গায়ত্রী মনে আছে?"

দুইজনেই বলিল, "আছে—"

দুইজনেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করিয়া তাহা আবৃত্তিও করিল।

"বাঃ—"

চন্দ্রসুন্দর মনে মনে কিন্তু একটু হতাশ হইলেন। গায়ত্রী তাহাদের মনে না থাকিলে তিনি ঘটা করিয়া তাহা তাহাদের মুখস্থ করাইতেন।

।। সতেরো।।

মাছ আনিবার জন্য কুমার হীরু হালদারের বিরাট জলকর মতি বিলে গিয়াছিল। হীরুর ঠাকুরদা মোতি মহলদার যখন এই বিলটির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়াছিলেন তখন ইহার নাম ছিল টিকরি বিল। মোতির মৃত্যুর পর মোতির পুত্র ঘিসু ইহার নাম বদলাইয়া পিতার নামে নামকরণ করিয়াছিল। সূর্যসুন্দর ঘিসু হালদারের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং তাহার বাড়ির সব কাজে মোতি বিল হইতে মৎস্য সরবরাহ হইত। নিখিলবাবু তিন দিন পূর্বে হীরু মহলদারের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। নির্দেশ দিয়াছিলেন কুমার গেলে তবে যেন মাছ ধরানো শুরু করা হয়। জীবন্ত টাটকা মাছ চাই।

বিলের ধারে একটি খড়ের ঘর। সেখানে আরাম করিয়া বসিবার এবং শুইবার ব্যবস্থা আছে। হীরু শৌখিন লোক। কোন ত্রুটি রাখে নাই। খাট, টেবিল, চেয়ার, আরাম-চেয়ার, ফুলদানি, আয়না, সব এখানে আছে। হীরু কুমারের সহপাঠী বলিয়া এখানে কুমারের খাতির আরও বেশী। অর্থাৎ হীরু এমন ভাব দেখায় যেন এই জলকর এবং তাহার আশেপাশের বাগান জমি প্রভৃতির আসল মালিক কুমারই। সে যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

....জাল ফেলা হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে টানা হইতেছে। হীরু নাই, একটা জরুরী দরকারে সে পূর্ণিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাইবার পূর্বে কুমারের জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে সে। চায়ের সব ব্যবস্থা আছে। চা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য আলাদা একটা চাকরও আছে। একটি দুগ্ধবতী গাভীও রাখিয়া গিয়াছে সে যাহাতে টাটকা দুধ দিয়া কুমার চা খাইতে পারে।

কুমার আটটার পূর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার একবার চা খাওয়া হইয়া গিয়াছে। একজন জেলে বলিল মাছ উঠিতে এখনও বেশ বিলম্ব আছে। আরও ঘণ্টা দুই লাগিবে অন্ততঃ। কুমার ইহা অনুমান করিয়াছিল। তাই সূর্যসুন্দরের ডায়েরিখানা সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সে জলকরটার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। জলকরের চারিদিকে লম্বা লম্বা বাঁশ পোঁতা। প্রত্যেকটি বাঁশের উপর একটি করিয়া পাখি বসিয়া আছে। চিল কাক তো আছেই, নীলকণ্ঠ ফিঙেও আছে। সহসা কুমার দেখিতে পাইল একটি 'খোক্‌না'ও উড়িতেছে। খোক্‌না, চিলজাতীয় একরকম শিকারী পাখি। বাংলা নাম কোড়ল। অত্যন্ত চতুর এবং ক্ষিপ্র। ছোঁ মারিয়া

বড় বড় মাছকে নখে ঝুলাইয়া লইয়া নিমেষে সরিয়া পড়ে। অনেক সময় পক্ষী শিকারীদের ইহারা অনুসরণ করে। বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া যদি কোন পাখি দূরে বা জলে পড়িয়া যায় তাহা হইলে শিকারী সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই খোক্‌না সেখানে পৌঁছিয়া যায়। কুমার প্রায়ই শিকারে বাহির হয়, এই ডাকাত পাখিটার পরিচয় তাহার ভালো করিয়াই জানা আছে। কুমার উৎসুক নয়নে খোক্‌নাটাকে দেখিতেছিল। বেশ বলিষ্ঠ পাখি, বলিষ্ঠ নখ, বলিষ্ঠ ঠোঁট। যদি একটা মাছ ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লয় দেখিবার মতো দৃশ্য হইবে একটা। গোটা দুই খোক্‌না ছিল। একটা বাঁশের উপর বসিয়া ছিল, আর একটা আকাশে 'চক্কোর' দিতেছিল। কুমার অনেকক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিল। যদিও দুই-একটা মাছ লাফাইয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেগুলির প্রতি খোক্‌নাদের তাদৃশ মনোযোগ দেখা গেল না। তখন সে চাকরটাকে আর এক কাপ চা করিতে বলিয়া ডায়েরিতে মন দিল।

''শঙ্করা হইতে ফিরিয়াই আমাকে পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হইল। জেলা হইতে ডেপুটি ইন্‌সপেক্‌টার আসিয়া এ পরীক্ষা লইতেন। দিদিমার ভয় ছিল আমি পাস করিতে পারিব কি না। তাঁহার পরিচিত যতগুলি ঠাকুরদেবতা ছিলেন সকলেরই নিকট তিনি সওয়া পাঁচ আনার পূজা মানত করিলেন। পরীক্ষা দিতে যাইবার পূর্বে মামা, মামীমা, দিদিমাকে তো প্রমাণ করিলামই, নিত্য দিদিকেও করিলাম। সে তো হাসিয়াই আকুল। দিদিমা আমার মাথায় দেবতার নির্মাল্য দিয়া সজল কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, 'কিচ্ছু ভয় নেই, মা মঙ্গলচণ্ডী সব ঠিক করে দেবেন। যাবার আগে তোমার বাবাকে প্রণাম করে যেও।''

আমি যখন বাবার বাসায় গেলাম তখন তিনি তাঁহার হরিণ-শিশুটিকে কোলে করিয়া কচি ঘাস খাওয়াইতেছিলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই প্রশ্ন করিলেন, 'আজ এত প্রণামের ঘটা যে! ব্যাপার কি—'

'আমার আজ পরীক্ষা—'

বাবা হরিণ-শিশুটিকে কোল হইতে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাহা করিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর—আমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। তাহার পর উর্ধ্বনেত্র হইয়া যে সংস্কৃত মন্ত্রটা বলিলেন, তাহা এখন আমার মনে নাই। তাহার পর আর একবার চুম্বন করিয়া আমাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'পাস করবে।'

বাবার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি নিরাসক্ত এবং আবেগবর্জিত বলিয়া সকলের ধারণা ছিল, তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। এই আবেগ প্রকাশ করিয়া তিনি যেন একটু লজ্জিত হইয়াছেন মনে হইল, কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। এ-পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল বাবা আমাদের সম্বন্ধে উদাসীন, দিদিমার অনুরোধেই এখানে আছেন। যতটুকু করিতেছেন কর্তব্যের খাতিরেই, তাহার সহিত হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। সেদিন কিন্তু পাথরের তলায় ঝরনা আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম, যে-আনন্দে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। সম্ভবতঃ এই আনন্দের জোরেই পরীক্ষায় পাস করিয়া গেলাম। সাধারণতঃ আমি ভীতু প্রকৃতির ছিলাম। কিন্তু সেদিন যেন নির্ভয় হইয়া গেলাম। অনুভব করিলাম আমি নিঃসহায় নই, বাবা আমার সহায় আছেন।

আমার পরীক্ষা পাশের কৃতিত্বটা কিন্তু ষোল আনাই লইলেন দীনু পণ্ডিত। তিনি যে আমার মতো গাধাকে পিটাইয়া প্রায় ঘোড়া করিয়া আনিয়াছেন এই কথাই দিদিমাকে আসিয়া সাড়ম্বরে বলিতে লাগিলেন। দিদিমা তাঁহাকে এক জোড়া কাপড়, একটি তসরের চাদর, কিছু সিধা এবং পাঁচটি টাকা দিয়াছিলেন। আমি যেদিন পাঠশালা হইতে সার্টিফিকেট লইয়া আসি সেদিন ওই জিনিসগুলি পণ্ডিত মশায়ের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছিলাম। খুব খুশী হইয়াছিলেন দীনু পণ্ডিত এবং আমাকে যে উপদেশটি দিয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে। বলিয়াছিলেন—'সর্বদা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করবে। হটাম্ করে কিছু করে বসো না।' পণ্ডিতমহাশয় বীরভূম জেলার লোক ছিলেন। কথাবার্তায় তাহা প্রকাশ পাইত।

পরীক্ষা পাশের খবর বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এবার তিনি গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন না। কেবল বলিলেন, 'বেশ। আমি জানতাম তুমি পাস করবে।' সেতারে সুর বাঁধিতেছিলেন তাহাই বাঁধিতে লাগিলেন। বাবা আমার সহিত যখনই কথা বলিতেন, 'তুমি' বলিতেন। তাঁহার মুখে 'তুই' শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। যদিও বাহিরে তাঁহার এই রকম কেতাদুরস্ত পর-পর ভাব ছিল কিন্তু একথা ক্রমশঃ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম যে অলক্ষ্যে একটা সদাজাগ্রত দৃষ্টি তিনি আমার উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে যদিও তিনি কিছু বলিতেন না কিন্তু আমি অনুভব করিতাম তাঁহার এই দৃষ্টি যেন সর্বদাই আমাক অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। তিনি যে ক্রমশঃ আমার এবং চন্দরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন ইহার প্রমাণও পাওয়া যাইতে লাগিল। একদিন তিনি দিদিমার হাতে গোটা দশেক টাকা দিয়া বলিয়া আসিলেন, 'সূর্যের আর চন্দরের জামা-কাপড় এই টাকা দিয়েই কিনে দেবেন।' তাহার পর যখন আমি মাইনর স্কুলে ভরতি হইলাম তখন ভরতি হওয়ার সব খরচ তিনিই বহন করিলেন। স্কুলের বেতনও তিনিই প্রতিমাসে দিতেন। ইহাতে মামার খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দিদিমার মুখে শুনিয়াছি তিনি ইহাতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। দিদিমাকে বলিয়াছিলেন, 'দিদির ছেলেদের ভার আমি নিয়েছি। সে-ভার আমি বইব। জামাইবাবু যদি এ-টাকাটা জমিয়ে রাখেন তাহলে ওদের জন্য এক টুকরো জমি কিনে দিতে পারি। বাড়িও একটা হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে।'

দিদিমা উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'তুমিই তাকে বুঝিয়ে বোলো বাবা। আমি এ-কথা তাকে বলব কি করে। কি মনে করতে কি মনে করবে কে জানে। খামখেয়ালী লোক তো, হঠাৎ আবার একদিন উধাও হয়ে যাবে। তুমিই বোলো।' মামাও বলিতে পারেন নাই। বাবা রাশভারী গম্ভীর লোক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।

.....আমি মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়া গেলাম। মন্মথ এবং খোঁড়া অশ্বিনীও ভরতি হইল। তাহারও পাস করিয়াছিল। অশ্বিনীও খুব ভালোভাবে পাস করিয়াছিল। মাইনর স্কুলেও ভালো ছেলে বলিয়া সুনাম হইয়াছিল তাহার। ইংরেজীটা খুব ভালো শিখিয়াছিল। ইহারই জোরে পরবর্তী জীবনে খুব উন্নতি করে সে। রেলের খুব বড় অফিসার হইয়াছিল।

পাঠশালায় দীনু পণ্ডিতই সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু মাইনর স্কুলে ছিলেন তিনজন শিক্ষক। হেড মাস্টার এবং পণ্ডিতমশাই। হেড মাস্টার নীলমাধববাবু সেকালের জুনিয়র-সিনিয়র ছিলেন। অত্যন্ত মাতালও ছিলেন। সেকালে বিদ্বান লোকদের পক্ষে মদ খাওয়াটা খুব বেশী নিন্দনীয় ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার সহিত সভ্যতার এবং সভ্যতার সহিত মদ খাওয়ার যেন একটা স্বাভাবিক

যোগাযোগ ছিল। নীলমাধববাবুকে বিদ্বান বলিয়াই সকলে খাতির করিতেন, মাতাল বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতেন না। কালো লম্বা লোক ছিলেন তিনি। স্কুলে সাহেবী পোষাক পরিয়া আসিতেন। সাদা জিনের প্যান্ট এবং কালো গলাবন্ধ কোট। কোটের গলার কাছে একটা সাদা শক্ত কলারও দেখা যাইত। স্বল্পভাষী লোক ছিলেন তিনি। কোথাও আড্ডা দিতে যাইতেন না। স্কুল হইতে সোজা বাড়ি যাইতেন, বাড়ি হইতে সোজা স্কুলে যাইতেন। অন্য কোথাও কেহ তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। স্কুলের কেরানী যতীনবাবু তাঁহাকে যমের মতো ভয় করিতেন। সকলেই করিত। ঠিক দশটার সময় তাঁহাকে স্কুলের গেটে প্রবেশ করিতে দেখা যাইত, কখনও কোনও দিন কোনও কারণে এক মিনিটও 'লেট' হন নাই। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলে স্কুলের কলরব নিমেষে থামিয়া যাইত। ছেলেরা যন্ত্রচালিতবৎ নিজ নিজ স্থানে গিয়া বসিত। অথচ কোনও ছেলেকে তিনি কখনও মারিতেন না, বকিতেন না বা জরিমানাও করিতেন না। পড়াইতেন অতি চমৎকার। প্রত্যেক ছেলের পড়া ধরিতেন, প্রত্যেক ছেলের 'হোম-টাস্ক' সযত্নে সংশোধন করিয়া দিতেন। কেহ পড়া না পারিলে নীরবে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিতেন, 'স্কুলে বসেই পড়াটা শিখে তবে বাড়ি যাবে।' গলার স্বর একটু ভাঙা চিল। সর্বদা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিতেন। মনে হইত সর্বদাই তিনি যেন কোনও দুরূহ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন। সমস্যাটা যে কি তাহা বুঝিবার বয়স তখনও হয় নাই। পরে জানিয়াছি তাঁহার জীবনটাই সমস্যাসংকুল ছিল। বড়লোকের ছেলে ছিলেন তিনি। তিনি পিতামাতার অমতে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। এজন্য তিনি গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাও ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাকে। সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনাটি পরে ঘটিয়াছিল। যে বিধবাটিকে বিবাহ করিয়া তিনি এত নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সে-ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আর একজনের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। মনে হয় এই নিদারুণ দুঃখের ছাপই তাঁহার মুখে বিষাদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই। তাঁহার মাতাল বলিয়া বদনাম ছিল, কিন্তু মত্ত অবস্থায় কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। শুনিয়াছি সন্ধ্যার পর তিনি মদ খাইতেন। মনিয়ার নামে মা একটি চাকরানী তাঁহার দেখাশোনা করিত। সে তাঁহার রাঁধুনীও ছিল। জাতিতে সে ছিল কাহার, কিন্তু যৌবনে এক পশ্চিম-দেশীয় ব্রাহ্মণ কনেস্টবলের রক্ষিতা ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'বাভনী' বলিয়া ডাকিত। তাহার মেয়ে মনিয়া বাল্যকালেই মারা গিয়াছিল। এ-খবরটা যাহারা জানিত তাহারা তাহাকে 'মনিয়ার মা'ও বলিত। কিন্তু 'বাভনী' নামটাই বেশী প্রচলিত ছিল। এই 'বাভনী' নীলবাধমবাবুর যে যত্ন করিত তাহার তুলনা হয় না। সাহেব গঞ্জে বাভনীই তাঁহার একমাত্র আপন লোক।

আমাদের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন গিরীনবাবু। খিটখিটে রোগা লোক। একঘর ছেলেমেয়ে ছিল তাঁহার। এক ডজন পুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহার চেহারায়, পোশাকে, চালচলনে কোনও আভিজাত্যের চিহ্ন ছিল না। উষ্ক-খুষ্ক চুল, কপালের মাঝখানে একটি শিরা, মুখ সর্বদাই কুঞ্চিত, ভুরুতে চুল নাই, দাঁত পানের ছোপ-ধরা। খ্যাঁক খ্যাঁক করিয়া কথা বলিতেন। জামা পরিতেন না। গ্রীষ্মকালে একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া স্কুলে আসিতেন, শীতকালে একটা লুই। পায়ে চটি। কিন্তু এই স্বল্প পোশাকও তিনি পরিষ্কার রাখিতে পারিতেন না। নূতন অবস্থায় চটি জুতাটির যে কি রং ছিল তাহা নির্ণয় করা যাইত না। কাপড়ও সর্বদা আড়ময়লা, তাহাতে মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা সেলাই দেখিতে পাইতাম। চাদরেও কখনও তালি, কখনও সেলাই।

এই গিরীন মাস্টারকে আমরা যমের মতো ভয় করিতাম। কারণ বেতের ব্যবহারটা তিনি একটু বেশী মাত্রায় করিতেন। যখন ঠেঙাইতে আরম্ভ করিতেন তখন তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। শুধু যে প্রহার করিতেন তাহা নয়, প্রহার করিতে করিতে খুব চীৎকারও করিতেন। চীৎকার মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া যাইত। তখন হেড মাস্টার মহাশয় স্কুলের চাকর সহজলালকে পাঠাইয়া তাঁহাকে আপিসে ডাকিয়া লইতেন। আপিসে তাঁহাকে কি বলিতেন জানি না, কিন্তু সেদিনের মতো মার থামিয়া যাইত। গিরীন মাস্টারের ভাষাও বড় অভদ্র ছিল। তাঁহার মৃদুতম গালাগালি ছিল, বেটাচ্ছেলে। বেশী রাগিয়া গেলে শালা, হারামজাদাও বলিতেন। তাঁহার একটি গুণ অবশ্যই ছিল, যে-বিষয়গুলি তিনি পড়াইতেন সেগুলি যেমন করিয়া হোক—মারের চোটে বা বকুনির চোটে—ছেলেদের মনে গাঁথিয়া দিতেন। যতক্ষণ না সেগুলি কণ্ঠস্থ হইত ততক্ষণ তিনি হাল ছাড়িতেন না। বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করিতেন। কণ্ঠস্থ করনো তাঁহার একটা বাতিক ছিল। অঙ্ক পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে হইত। এজন্য ছেলেদের বাপ-মায়েরা গিরীন মাস্টারকে খুব পছন্দ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, মারুক ধরুক যাই করুক ছেলেদের নিকট কাজ তো আদায় করিয়া লয়। তিনি যে-সব বিষয় পড়াইতেন সে সব বিষয়ে সত্যই কোনও ছেলে ফেল করিত না।

পণ্ডিত মহাশয়ের নাম ছিল বিরজা পণ্ডিত। তাঁহার আবক্ষ দাড়ি. চক্ষু দুইটি সর্বদাই জবাফুলের মতো লাল। গঞ্জিকা-ভক্ত ছিলেন তিনি, গাঁজা খাইয়াই স্কুলে আসিতেন। তাঁহার গা হইতে গাঁজার গন্ধ ছাড়িত। টিফিনের সময়ও গাঁজা খাইবার জন্যই বাড়ি চলিয়া যাইতেন। টিফিনের পর যখন ফিরিতেন তখন তাঁহার চক্ষু দুইটি আরও লাল দেখাইত, দুর হইতেই গাঁজার গন্ধ পাওয়া যাইত। বলিষ্ঠ লোক ছিলেন বিরজা পণ্ডিত। দুই বেলায় দুই সের করিয়া মহিষের দুগ্ধ পান করিতেন নাকি। এসব খবর অবশ্য মন্মথর মুখে শোনা। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে গাঁজা বা দুধ খাইতে দেখি নাই। তবে এটা ঠিক তিনি কাছে আসিলেই গাঁজার গন্ধ পাওয়া যাইত। গিরীন মাস্টারের মতো প্রত্যহ ছেলে ঠেঙাইতেন না। ক্লাসে আসিয়া সম্মুখের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিতেন, 'পড়'। কোনও ছেলের মুখের দিকে তিনি তাকাইতেন না। সম্মুখের দেওয়ালের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি খানিকক্ষণ নিবদ্ধ থাকিত। আমরা পড়িতে আরম্ভ করিলে তাঁহার দৃষ্টি ক্রমশঃ দেওয়াল হইতে আমাদের মুখের উপর নামিয়া আসিত। শুধু নামিয়া আসিত না, প্রত্যেক ছেলের মুখের উপর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত। নীরবে তিনি লক্ষ্য করিতেন প্রত্যেকটি ছেলে পড়িতেছে কি না। কেহ পড়িতেছে না লক্ষ্য করিলে মার্জারের মতো নিঃশব্দচরণে ছেলেটির পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেন, তাহার পর আচমকা হয় তাহার চুলের মুঠি না হয় কান দুইটি ধরিয়া একেবারে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ফেলিতেন। শূন্যেই কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিতেন, তাহার পর আবার ধপাস্ কবিয়া নামাইয়া দিতেন। নামাইয়া নিজের চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন কিছুক্ষণ। তাহার পর ঈষৎ দুলিতে দুলিতে চাপা তর্জন করিতেন একটা—'শানে আছড়ে মেরে ফেলব।' বিরজা পণ্ডিতকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় করিত। গিরীন মাস্টারের বেত এবং হুংকারের মধ্যে কিছু লুকোছাপা ছিল না। কিন্তু বিরজা পণ্ডিতের আবক্ষ দাড়ি, নির্নিমেষ রক্তচক্ষু, নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়ানো, তাহার পর আচমকা চুলের মুঠি ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলা বড়ই ভীতিকর ছিল আমার কাছে।

দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় আমাদের রক্ষক ছিলেন সিপাহী ঠাকরুন। শুনিয়াছিলাম মাইনর

স্কুলেও তিনি মাঝে মাঝে আসিতন এবং ছেলেদের নির্যাতন দেখিলে আগাইয়া তাহাদের রক্ষা করিতেন। মন্মথ বলিয়াছিল সিপাহী ঠাকরুন একদিন নাকি বিরজা পণ্ডিতকে কুলিপাড়ার গলিতে দাড়ি ধরিয়া চড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। আমরা যখন মাইনর স্কুলে ভরতি হইলাম তখন সিপাহী ঠাকরুন ছিলেন না। কিছুদিন পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। হঠাৎ মারা যান তিনি। থানার কনেস্টবলরা মিলিটারী কায়দায় শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু পাঠশালা স্কুলের অসহায় শিশুরাই যে একজন বলিষ্ঠ ত্রাণকর্ত্রী হারাইয়াছিল তাহা নয়, অনেক দীন দরিদ্র লোকও অভিভাবকহীন হইয়া গিয়াছিল। সিপাহী ঠাকরুন অনেক গরীব লোককে খাইতে দিতেন। অনেকের জামা-কাপড় কিনিয়া দিতেন। অনেক গরীব ছেলের স্কুলের বেতনও দিতেন শুনিয়াছি।

আজকাল বি. এ., এম. এ , পি-এচ্. ডি. ঘরে ঘরে। সেকালেও ছিল, কিন্তু এত ছিল না। সেকালে এনট্রান্স পাস লোককেই সকলে যথেষ্ট কৃতবিদ্য মনে করিতেন। নীলমাধববাবু এফ. এ. পাস ছিলেন। পল্লীগ্রামে বি. এ., এম. এ. সচরাচর দেখা যাইত না। তাঁহারা শহরেই বড় চাকরি করিতেন। উচ্চ ডিগ্রিধারীদের এমন ভিড় তখন ছিল না। কিন্তু একটা জিনিস তখন ছিল যাহা এখন নাই। তখন ছেলেরা লেখাপড়াটা ভালো করিয়া শিখিত। এখন শেখে না। এখন ডিগ্রিটাও সস্তা এবং সহজলভ্য। তখন মারের চোটে প্রাণের দায়ে পরীক্ষার ভয়ে আমরা পাঠ্যপুস্তগুলি ভালো করিয়া পড়িতাম। এখন ছেলেরা বই পড়ে না, নোট পড়ে। তাহাতেও না কুলাইলে পৈরবীর শরণাপন্ন হয়, কখনও কখনও পরীক্ষককে ঘুষ দিবার চেষ্টাও করে। আমরা তো নয়ই আমাদের অভিভাবকেরা একথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তখন একজন এনট্রান্স পাস ছেলের ইংরেজীতে, অঙ্কে, সংস্কৃতে যতটা দখল থাকিত এখন ততটা নাই। এখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক উচ্চ ডিগ্রিধারী ছেলেও এক লাইন ইংরেজী শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না। বাংলাও পারে না। আমার ভাই চন্দর একজন কৃতবিদ্য লোক, ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত খুব ভালো জানে, কিন্তু সেকালের এফ. এ. পরীক্ষা পাস করিতে পারে নাই। অঙ্কে ফেল করিত, কখনও বা ফিজিক্সে। তখন এফ. এ. কোর্সে বিজ্ঞানও পড়ানো হইত। আমার বিদ্যা মাইনর পর্যন্ত। কিন্তু ওই মাইনর পড়িয়াই আমি যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা এখনকার ম্যাট্রিকুলেশন, এমন কি আই. এ. পাস ছেলেরাও শেখে না। আমাদের পড়িতে হইত লোহারামের ব্যাকরণ, সদ্ভাবশতক, সীতার বনবাস, পদ্যপাঠ, শুভঙ্করী, পাটীগণিত, ইউক্লিডের জ্যামিতি, পরিমিতি, ইংরেজী 'মল' ক্লাস কুব, লেনিজ গ্রামার—এ সব ছাড়াও ছিল পুরাবৃত্তসার, পদার্থবিদ্যা, শরীর পালন। পড়াশোনাই তখন ছাত্রজীবনের প্রধান কর্ম ছিল। আজকাল পড়াশোনা ছাড়া স্কুল-কলেজেই আরও নানারকম জিনিসের চর্চা হয়। স্পোর্টস, ডিবেটিং ক্লাব, এমন কি নাচ-গানের সুযোগও অনেক স্কুল-কলেজে দেওয়া হয়। মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়ার প্রথা অনেক স্কুলে প্রচলিত আছে। বয়েজ স্কাউটস্, এন. সি. সি. প্রভৃতি তখন ছিল না। তখন আমাদের একমাত্র কাজ ছিল বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাস করা। পিতামাতারাও তাহাই চাহিতেন, তাই তাঁহারা বাড়িতেও কড়া নজর রাখিতেন ছেলেরা পড়িতেছে কি না। ইহার কারণও ছিল, তখন পরীক্ষা পাস করিলেই চাকরি হইত এবং চাকরি হইলেই ভবিষ্যতের সুরাহা হইয়া যাইত। এখন আর তাহা হয় না। তাই ছাত্রেরা আজকাল পড়াশোনায় তেমন উৎসাহী নয়, তাহাদের পিতামাতাদেরও উৎসাহও মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহারা এখন ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ান, উপার্জনের পথ

খোলা নাই বলিয়া। উপার্জন-ক্ষমতা অর্জন করাটাই চিরকাল সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, লেখাপড়াটা গৌণ। জ্ঞানের সাধনায় ব্রাহ্মণেরাই আগ্রহশীল, দারিদ্র্যবরণ করিয়াও তাঁহারা মা সরস্বতীর ভজনা করেন। ব্রাহ্মণ চিরকালই বিরল, এমন কি ব্রাহ্মণের বংশেও প্রকৃত ব্রাহ্মণের ক্বচিৎ জন্ম হয়। আবার কখনও অব্রাহ্মণ বংশেও তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটে।

যদিও সেকালে পড়াশোনার অর্থকরী বলিয়া সুনাম ছিল এবং ছেলেদের অভিভাবকেরা ছেলেরা যাহাতে পরীক্ষায় পাস করে সে-বিষয়ে সচেতন থাকিতেন, তবু সেকালে পড়াশোনায় অমনোযোগী ছেলের সংখ্যা কম ছিল না। আমাদের দলের মধ্যে মন্মথ পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল। তাহার ঝোঁক ছিল গান-বাজনায় এবং অভিনয়ে। এখনকার মতো তখন সিনেমার প্রচলন হয় নাই। কিন্তু যাত্রা-থিয়েটার ছিল। সাহেবগঞ্জে শখের থিয়েটারের দল ছিল একটা। রেলের বাবুরাই তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ অভিনেতাই রেলের কর্মচারী। একজনের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার নাম রাসবিহারীবাবু। নিজে ভালো অভিনয় করিতেন, অভিনয় শিক্ষাও দিতেন। রিহার্সালের সময় রেলের কালো-প্যাণ্টের উপরই ওড়না জড়াইয়া স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ও দেখাইয়া দিতে পারিতেন। ভালো ছবি আঁকার হাত ছিল। থিয়েটারের সমস্ত 'সিন' নিজের হাতে আঁকিতেন। খুব দ্রুতবেগে দুই হাতে আঁকিতে পারিতেন। বড় বড় সাদা ক্যাম্বিসের পরদা দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যে কখনও রাজপ্রাসাদে, কখনও ঘন অরণ্যে, কখনও বা সৈন্যশিবিরে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আমরা অবাক হইয়া দেখিতাম। গঙ্গার ধারে খেলারাম মারোয়াড়ীর একটা বাগান-বাড়ি ছিল। সেইখানে রাসবিহারীবাবু 'সিন' আঁকিতেন। আমরা—স্কুলের ছেলেরা—ছুটি পাইলেই সেখানে গিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতাম। মন্মথই আমাকে লইয়া যাইত। বলা বাহুল্য খুব লুকাইয়া যাইতে হইত। দিদিমা বা মামা জানিতে পারিলে খুব বকাবকি করিবেন, এ ভয় ছিল।

মন্মথর বাবা বরদাবাবুর কিন্তু এ বিষয়ে খুব কড়াক্কড়ি ছিল না। তিনি একটু উদারপন্থী লোক ছিলেন। মন্মথর দাদা (তাঁহাকে আমরা আনুদা বলিতাম) ক্রমাগত এনট্রান্স ফেল করিতেছিলেন। বরদাবাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নিজের আপিসে ঢুকাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। বলিয়াছিলেন, এনট্রান্সটা পাস করুক। তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এই আনুদা থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। বরদাবাবু ইহাতে আপত্তি করেন নাই। মন্মথও স্কুলে পড়িতে পড়িতেই ছোটখাটো ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিত। সে একবার লবের ভূমিকায় নামিয়াছিল মনে পড়িতেছে। বরদাবাবু ইহাতেও আপত্তি করেন নাই। বরদাবাবু নিজেও নামিতেন মাঝে মাঝে! বরদাবাবুর বাড়িতেই সেকালে একটু আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। মন্মথর দুই দিদি ছিল। তাহারা কুঁচি দিয়া কাপড় পরিত এবং গান গাহিত। খোঁপায় বেল ফুলের মালা দিয়া ছাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও প্রকাশ্যে পড়িতে সংকোচ হইত না তাহাদের। অনেকেরই সমালোচনার লক্ষ্যস্থল তাহারা। অনেকেই ব্যঙ্গ করিত কিন্তু সবই করিতে হইত গোপনে। প্রকাশ্যে বরদাবাবুর বা তাঁহার পুত্রকন্যাদের সমালোচনা করিবার সাহস ছিল না কাহারও। কারণ বরদাবাবুর হাতে অনেক চাকরি, অনেক নিমজ্জমান সংসার-তরণীর কর্ণধার তাঁহার অনুগ্রহেই ঝড়ঝাপটা সামলাইবার শক্তি অর্জন করিতেন। সুতরাং তাঁহার অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি যে মন্মথর সঙ্গে মিশি এটা মামা খুব পছন্দ করিতেন না। কিন্তু আমাকে মানা করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। কারণ মামার অনেক

আত্মীয়স্বজনের চাকরি বরদাবাবুই করিয়া দিয়াছিলেন। মামার বাড়িতে সর্বদাই বেকার একদল পোষ্য থাকিত। তাহারা দুই বেলা খাইত এবং নুনের গদিতে শয়ন করিত। আহার-নিদ্রা এবং পরচর্চা করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না তাহাদের। বরদাবাবুর সহায়তায় মামা তাহাদের চাকরি জুটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বরদাবাবু যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এমন কাজ মামা কখনও করিতেন না।

স্কুল হইতে ফিরিয়া আমি প্রতিদিনই স্নানাহাব করিয়া বেড়াইতে যাইতাম। আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল হয় পাহাড়তলি কিংবা খেলারামের বাগান-বাড়ি। সাহেবগঞ্জে রেল-লাইনের ওপারে পাহাড়তলি নামে একটি মনোরম স্থান ছিল। স্কুলের ছেলেরা অনেকেই সেখানে বেড়াইতে যাইত সিগারেট খাইবার জন্য। তখন প্রকাশ্যে রাস্তায়-ঘাটে ভদ্রলোকের ছেলেরা সিগারেট ফুঁকিতে সাহস করিত না। ডাক্তার সুরথবাবুর চোখে পড়িলে সর্বনাশ হইয়া যাইত। তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়া সিগারেট ফেলিয়া দিতে বাধ্য করিতেন তিনি। তাহার পর বাড়িতে রিপোর্ট করিতেন। তিনি ছিলেন শহরের সব ছেলেদের গার্জেন। সন্ধ্যার পর তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোন ছেলে দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিতেন, এত দেরির কারণ কি। সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে ধমক খাইতে হইত। পাহাড়তলিতে গিয়ে পাহাড়ে উঠিতাম আমরা। খুব দ্রুতবেগে উঠিতে পারিতাম। পাহাড়েব মাথায় একটি বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ ছিল। তাহারই তলায় বসিয়া মন্মথ সিগারেট ধরাইত। আমিও দু'এক টান দিতাম। কিন্তু ওই দু' এক টান মাত্রই। মন্মথর অনুরোধেই টানিতে হইত। কিন্তু আমার তেমন ভালো লাগিত না। টান দিলেই কাসি হইত খুব। একদিন বমিও হইয়া গিয়াছিল। আর একটা কারণেও আমি সিগারেট খাইতে চাহিতাম না। ভয় হইত যদি ওই নেশার দাস হইয়া পড়ি পয়সা পাইব কোথায়? আমার হাতে মামা একটি পয়সাও দিতেন না। স্কুলের মাহিনাটি পর্যন্ত কার্তিক মামা নিজে গিয়ে স্কুলে জমা দিয়া আসিতেন। জলখাবার বাড়িতে খাইতাম। স্কুলের বইও কার্তিক মামাই কিনিয়া দিতেন, কিংবা কোথাও হইতে পুরাতন বই যোগাড় করিয়া আনিতেন। এ-বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা ছিল। সেকালে আমরা অনেক ছেলেই খাতা কিনিতাম না। চেনাশোনা রেলের কর্মচারীরা অনেক সময় রুল-টানা খাতা আমাদের দিতেন। তাহাতে না কুলাইলে কার্তিক মামাই হলুদ রঙের শ্রীরামপুরী কাগজ কিনিয়া বাড়িতে আমাদের জন্য খাতা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। আমার হাতে পয়সা আসিবার কোনও সুযোগই ছিল না। বাবার কাছে পয়সা চাহিবার কথা ভাবিতেও ভয় হইত। দিদিমাও নগদ পয়সা দিতে চাহিতেন না, তাঁহার ভয় হইত আমি পয়সা লইয়া বাজারের তেলে-ভাজা ফুলুরি কিনিয়া খাইব এবং তাহা খাইলেই নির্ঘাত পেটের অসুখ করিবে। মাঝে মাঝে নিত্য আমাকে লুকাইয়া দুই একটা পয়সা দিত। বলিত, 'একাই সব খাস নি, আমার জন্যেও দু'একটা নিয়ে আসিস। লুকিয়ে আনিস কিন্তু—।' তাহার হাসিমাখা মুখটি আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। হাতে পয়সা ছিল না বলিয়াই আমি ছেলেবেলায় সিগারেট খাওয়া শিখিতে পারি নাই। কিন্তু লুকাইয়া রাসবিহারীবাবুর সিন্-আঁকা দেখা বা আড়ি পাতিয়া থিয়েটারের রিহার্সাল শোনার জন্য পয়সার দরকার ছিল না। সুযোগ পাইলেই এই দুটি কাজ করিতাম। বস্তুতঃ আমার নীরস ছাত্রজীবনে ওই শখের থিয়েটারই আমার কল্পনার খোরাক যোগাইত। উহাই আমার কাছে নানা রসের উৎস ছিল। ছেলেবেলায় শঙ্করা গ্রামে সন্তোষের মা রূপকথা বলিয়া আমাকে অপরূপ লোকে লইয়া যাইতেন, কাহিনীর

ময়ূরপংখীতে চড়াইয়া, কত অজানা দেশে অচেনা ঘাটে, কত নামহীন সমুদ্রে নদীতে অরণ্যে প্রান্তরে, আকাশের কত নক্ষত্রলোকে ভ্রমণ করাইতেন। সাহেবগঞ্জে সন্তোষের মা ছিলেন না। তাঁহার স্থান লইয়াছিল শখের থিয়েটার এবং রাসবিহারীবাবু।

রাসবিহারীবাবুই সাহেবগঞ্জের শখের থিয়েটারের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। সিন্ আঁকিতেন, ভালো অভিনয় করিতেন, সকলকে অভিনয় শিখাইতেন এবং যেদিন থিয়েটার হইবে তাহার সাত দিন আগে হইতেই ডি. টি. এস. আপিসের পিছনের মাঠে নিজে দাঁড়াইয়া মঞ্চ প্রস্তুত করাইতেন। রাসবিহারীবাবুর চেহারায় ও চরিত্রে এমনি একটি বৈশিষ্ট্য এবং ব্যঞ্জনা ছিল যাহা অসাধারণ। বড় ভারি মাথায় বাবরি চুল, গোঁফদাড়ি কামানো। ঈষৎ বেঁটে, বলিষ্ঠ এবং নাতিস্থূল চেহারা। টানা-টানা চোখের দৃষ্টি ভাষাময়। মনে হইত সর্বদাই যেন একটা মজার কথা মনে মনে উপভোগ করিতেছেন। থিয়েটারে প্রায়ই খুব ছোটোখাটো ভূমিকায় নামিতেন—যেমন চাকর অথবা পারিষদের ভূমিকায়—কিন্তু অভিনয় নিখুঁত হইত। অর্ধেন্দু মুস্তফী এবং অমৃতলাল তাঁহার আদর্শ ছিলেন। শুধু যে তিনি থিয়েটার ব্যাপারেই দক্ষ ছিলেন তাহা নয়, অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারেও অপরিহার্য ছিলেন তিনি। মড়া পোড়াইতে তাঁহার মতো ওস্তাদ সাহেবগঞ্জে আর কেহ ছিল না। সৎকার-সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সব জাতের শবকেই শ্মশানে লইয়া যাইতেন। বলিতেন মড়ার কোন জাত নাই। ভোজ-কাজের ব্যাপারে অধিকাংশ বাড়িতেই রান্না পরিবেশনের ভার তাঁহার উপর দিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হইতেন। পরিবেশন করিতে করিতে চোখমুখের এমন ভাবভঙ্গী করিতেন যে সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত। মূক অভিনয়ে তাঁহার জোড়া কেহ ছিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সুযোগ পাইলে সকলের সঙ্গেই কৌতুক করিতেন। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ভাব ছিল, প্রায়ই তাহাদের লইয়া ফষ্টিনষ্টি করিতেন। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। স্কুলের সবে ছুটি হইয়াছে, স্কুলের গেট দিয়া পিলপিল করিয়া ছেলের দল বাহির হইতেছে। দেখা গেল, রাসবিহারীবাবু গেটের ঠিক সামনে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ বলিলেন, বাঃ চমৎকার কেটেছে ঘুড়িটা। বলিয়াই চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে বাড়ির দিকে ছুটিতেছিলাম, কিন্তু ঘুড়ি কাটিয়াছে শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আকাশ হইতে কাটা ঘুড়ি পাওয়া, আকশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই লোভনীয় ছিল আমাদের কাছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘাড় ব্যথা করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু ঘুড়ি দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম রাসবিহারীবাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন, তখন বুঝিতে পারিলাম আমাদের তিনি ঠকাইয়াছেন। তাঁহার এক ছেলের নাম ছিল ননী। একদিন বেলা দশটার সময় ননীকে ডাকিতে গিয়াছি। তাহার কাছে আমার একটা খাতা ছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। ননী ননী বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছি, রাসবিহারীবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—'কি বোকা রে তুই, এই ঘোর গ্রীষ্মে এত বেলা পর্যন্ত ননী কি আর আছে? গলে গেছে।' বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই ধরনের ছোটখাটো রসিকতা তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত।

রাসবিহারীবাবু রেলে সামান্য কাজ করিতেন—সম্ভবতঃ গার্ড ছিলেন—কিন্তু সাহেবগঞ্জের বাঙালী-অবাঙালী সকলের হৃদয়ে তিনি যে-স্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন তাহা অসামান্য। বিহারীরা তাঁহাকে রাসোবাবু এবং মারোয়াড়ীরা তাঁহাকে রাস্সোবাবু বলিত। তাঁহার ছোট-খাটো

পরিহাসপ্রিয়তার জন্য এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য সকলেই শ্রদ্ধা করিত তাঁহাকে। তিনি সুযোগ পাইলেই সকলের উপকার করিতেন, কিন্তু কখনও প্রত্যুপকারের আশা করিতেন না। কেহ প্রত্যুপকার করিতে গেলে তাহা এড়াইয়া যাইতেন বা প্রত্যাখ্যান করিতেন। অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁহার। অনেককে ঋণী করিয়াছেন, কিন্তু নিজে বরাবর অঋণী ছিলেন। তিনি বহুলোকের মড়া কাঁধে করিয়া বহন করিয়াছেন কিন্তু এমনই যোগাযোগ ঘটিয়াছিল তাঁহার মড়া কাহাকেও বহন করিতে হয় নাই। শ্মশানের ঠিক পাশেই যে গঙ্গাঘাট ছিল তাহাতেই তিনি প্রত্যহ হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিয়া আসিতেন। একদিন স্নান করিতে গিয়া সেখানেই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এরকম মৃত্যু বিরল। গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া সূর্য-স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। তাঁহাকে বহন করিবার জন্য কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না।

এই রাসবিহারীবাবুই আমার থিয়েটারের নেশা ধরাইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে, ডাক্তারি পাস করিবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এ-নেশা আমার ছিল। নিজের বাড়িতেই একটা থিয়েটারের আখড়া করিয়াছিলাম।

।। আঠারো।।

আমার স্কুল জীবনের আর একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। মন্মথ হঠাৎ একদিন একটা যাত্রাদলের সহিত উধাও হইয়া গেল। তখন যাত্রার খুব প্রচলন ছিল। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ কুণ্ডু, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলই তখন প্রিয় ছিল সকলের। আর বহুল প্রচলন ছিল বিদ্যাসুন্দরের পালা, কথকতা প্রভৃতির। থিয়েটার অপেক্ষা এই সবই লোকে বেশী পছন্দ করিত। মন্মথ তো একেবারে মাতিযা উঠিত। তাহার বাড়িতে তেমন কড়াক্কড়ি ছিল না, কোনও যাত্রার দল আসিলে সে তাহাদের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইত, তাহাদের সঙ্গেই সর্বদা থাকিত এবং তাহাদের ফাই-ফরমাশ খাটিত। তখন অনেক যাত্রা—বিশেষ করিয়া বউ কুণ্ডু, বউ মাস্টার—খুব ভোরে, সাড়ে তিনটা বা বড়জোর চারটার সময় আরম্ভ হইত এবং দশটা নাগাদ শেষ হইয়া যাইত। কাহারও কাজকর্মের বা রাত্রির ঘুমের ব্যাঘাত হইত না ইহাতে। এইজন্য আমার প্রায় যাত্রা-শোনা হইত না। আমি দিদিমার কাছে শুইতাম, দিদিমা অত ভোরে আমাকে উঠাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার ভয় হইত ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইবে। মামা নিজে যাত্রা শুনিতেন, কিন্তু বাড়ির ছোট ছেলেদের বা মেয়েদের যাত্রা শোনা পছন্দ করিতেন না। চিকের বন্দোবস্ত থাকিলে মামীমা কখনও কখনও যাইতেন। মন্মথ কিন্তু রোজ গোড়া হইতে যাত্রা শুনিত। কারণ যাত্রার দলের সঙ্গেই রোজ রাত্রে শুইত সে। বরদাবাবু বা তাঁহার স্ত্রী ইহাতে আপত্তির কিছুই দেখিতেন না। একদিন শুনিলাম যাত্রা দলের একটি ছেলে অসুস্থ হইয়া পড়াতে মন্মথই তাহার বদলে গান গাহিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সেকালের যাত্রায় একদল বালক গায়ক

থাকিত, তাহার শ্রোতাদের মধ্যে চলিয়া গিয়া জুড়ির গান গাহিত। জুড়িরা ছিল মূল গায়েন (গায়ক), তাহার আসরের চারিধারে দাঁড়াইয়া গান গাহিত। বালকেরা শ্রোতাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতিধ্বনি করিত। ইহাতে যে জমাটি আবহাওয়া সৃষ্টি হইত তাহা আজকালকার থিয়েটারে বা সিনেমায় হয় না। সেকালের যাত্রায় সব রকম রসের প্রচুর পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকিত। বক্তৃতা, ওস্তাদী গান, কমিক, পোশাকের জাঁকজমক, অভিনয়-কৃতিত্ব, তরবারি-ক্রীড়া, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির প্রভাব একটা পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায় দর্শক ও শ্রোতাদের মনে যে আনন্দ-লোক সৃষ্টি করিত তাহা আজকালকার থিয়েটার বা সিনেমায় দেখি নাই। যাত্রার আসরের মধ্যেও একটা উদার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। সংকীর্ণ চেয়ারে বসিতে হইত না। মাটিতেই ফরাশ বা শতরঞ্জির উপরই বসিত অনেক লোক। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসরের কাছে বসিত। তাহার পর বসিত বয়স্কেরা। বৃদ্ধেরা একটু আলাদা জায়গায় নিজেদের বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক সময় গড়গড়া থাকিত। যাহারা মাটিতে বসিতে চাহিত না, তাহারা নিজেদের খরচে যাত্রার একধারে মাচা বানাইয়া তাহাতে বসিত। এরকম মাচার নাম ছিল ঘড়ি-ঘর। সেটা অনেকটা আজকালকার রিজার্ভড্ বক্সের মতো। যাত্রার দল শুধু যে পুরুষদের দ্বারাই পরিচালিত হইত তাহা নয়, মেয়েদের দ্বারাও হইত। বউ কুণ্ডু, বউ মাস্টার মেয়েদের যাত্রা ছিল। এই ধরনের মেয়ে যাত্রা সাধারণতঃ মৃত অধিকারীদের পত্নীরা পরিচালনা করিতেন। এই রকম একটা মেয়ে যাত্রার (বউ মাস্টার, কি বউ কুণ্ডু তাহা ঠিক মনে নাই) অধিকারিণীর মাতৃস্নেহ মন্মথকে দেখিয়া উথলিয়া উঠিল। ঠিক মন্মথর মতোই তাঁহার একটি পুত্র ছিল নাকি, পুত্রটি অকালে তাহার মাকে ছাড়িয়া চিরতরে চলিয়া যায়। মন্মথর মতো সে-ও নাকি সুকণ্ঠ ছিল, অনেক ভালো ওস্তাদ রাখিয়া তাহাকে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান তাহাকে কাড়িয়া লইলেন। মন্মথের মধ্যে তাঁহার মৃতপুত্রের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন এবং দুই বাহু দিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। কয়েকদিন পরে দেখা গেল মন্মথকে তিনি একটি সোনার আংটি গড়াইয়া দিয়াছেন। সর্বদাই মন্মথকে কাছে কাছে চোখে চোখে রাখিতেন। একদিন মন্মথর মাকেও গিয়া বলিলেন, "আপনার মন্মথর মধ্যে আমি আমার হীরুকে ফিরে পেয়েছি। আমি যে ক'দিন এখানে থাকি মন্মথ আমার কাছেই থাকুক, আপনি আপত্তি করবেন না,' মন্মথ মা আপত্তি করেন নাই। মন্মথরা মা শুভঙ্করী দেবী সহৃদয়া মহিলা ছিলেন। পুত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া তিনি বিগলিতও হইয়াছিলেন। উক্ত অধিকারিণী অবিমিশ্র শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিয়াছিলেন সকলের। তিনি মাথায় একটি অলংকৃত শিরস্ত্রাণ এবং গায়ে একটি সুরঞ্জিত জরির-কজা-করা আলখাল্লা পরিয়া আসরে দাঁড়াইয়া জুড়ির গান করিতেন। গানের গলা অপূর্ব ছিল। তাঁহার গানের সহিত বেহালা বাজাইতেন বৃদ্ধ বিধু ঘোষাল। তাঁহার গলা আর বেহালার সুর একেবারে নাকি মিশিয়া যাইত। মনে হইত বেহালাই গান গাহিতেছে। সেতারী বাগচি মহাশয় তাঁহাকে কোকিলকণ্ঠী আখ্যা দিয়াছিলেন। এহেন প্রতিভাময়ী নারীর অনুরোধ বরদাবাবু বা শুভঙ্করী উপেক্ষা করিতে পারেন না। মন্মথ অধিকাংশ সময়ই তাঁহার কাছে থাকিত। স্কুলে অবশ্য আসিত সে। কিন্তু যাত্রার দলের অধিকারিণীর স্নেহভাজন হইয়াছিল বলিয়া স্কুলে আসিয়া পড়াশোনা অপেক্ষা মাতব্বরিই বেশী করিত। এমন কি গিরীন মাস্টার পর্যন্ত তাহাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই যাত্রার দলের সহিত মন্মথ একদিন চলিয়া গেল। হইচই পড়িয়া গেল শহরে। মন্মথর মা কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন। বরদাবাবু কিন্তু বিশেষ বিচলিত হইলেন না। বলিলেন, 'ও দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। ভগবান ওকে যে গুণ দিয়েছেন তার সমঝদার এখানে নেই। এখানে গান গাইলে আমরা বকি, আর ওরা এইজন্যেই ওকে বাহবা দেয়। এই 'বাহবা'র মোহটা কেটে গেলেই ও আপনি ফিরে আসবে। এ মোহ কাটতে অনেক সময় দেরী হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেটে যায়।' বরদাবাবুর এই দার্শনিক উক্তি কিন্তু মন্মথর মাকে শান্ত করিতে পারিল না। তাঁহারই জেদে বরদাবাবু শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দিলেন। সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দল বায়না লইয়া ধানবাদে গিয়াছে। একটি কনস্টেবল লইয়া আনুদা সেখানে ছুটিলেন এবং দিন সাতেক পরে মন্মথকে পাকড়াও করিয়া আনিলেন। মন্মথ নাকি কিছুতেই আসিতে চাহিতেছিলেন না, অধিকারিণীও কান্নাকাটি কম করেন নাই; তিনি একথাও নাকি বলিয়াছিলেন যে মন্মথর যেরূপ প্রতিভা ও কণ্ঠস্বর তাহাতে সে একজন ভারতবিখ্যাত গায়ক হইতে পারে, তাহার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন এবং সংগীতবিদ্যায় তাহাকে পারদর্শী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একথাও তিনি বলিয়াছিলেন যে মন্মথ একটু বড় হইলে তাহার হাতেই যাত্রার দলের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া তিনি কাশীবাসিনী হইবেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মন্মথকে আনুদা লইয়া আসিলেন। সঙ্গে পুলিস ছিল বলিয়া তাহা সহজসাধ্য হইল।

মন্মথ ফিরিয়া আসিলে তাহাকে লইয়া ছাত্রমহলে একটু হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। হিমালয় লঙ্ঘনকারী বিরাট বীর অথবা তুষারাচ্ছন্ন মেরুআবিষ্কর্তা দুঃসাহসী নাবিক যে সম্মান পাইয়া থাকেন মন্মথকে আমরা সেই সম্মানই দিলাম। আমরা মাস্টারদের শাসনে জর্জরিত হইয়া একঘেয়ে পাঠ্যপুস্তকের শ্বাসরোধকর বন্দীশালায় দিনের পর দিন আবদ্ধ ছিলাম, ইহার বাহিরে যে বৃহত্তর একটা জগৎ আছে, এই বন্দীশালার প্রাচীর টপকাইয়া সে জগতের রূপরস উপভোগ করাও যে সম্ভব মন্মথই তাহা আমাদের প্রথমে দেখাইয়া দিল। তাই তাহাকে আমরা বিদ্রোহী বীরের সম্মান দিলাম।

মন্মথ কিন্তু আর স্কুলে ফিরিয়া আসিল না। সে তাহার মাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিল, 'আমার পড়াশোনা ভালো লাগে না। আমি গান-বাজনা নিয়ে থাকব। তোমরা যদি আমাকে স্কুলে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি কর আবার আমি পালিয়ে যাব।' বরদাবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। সক্‌রিগলির গণেশ ওস্তাদ প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে গান শিখাইতে লাগিল। রাসবিহারীবাবুর থিয়েটারের দলেও সে এবার খোলাখুলিভাবে মিশিয়া গেল। বরদাবাবু ইহাতেও আপত্তি করিলেন না। বরদাবাবুর ইহাই বিশেষত্ব ছিল। নিজের ছেলে-মেয়েদের একটা বিশেষ গণ্ডীতে তিনি জোর করিয়া আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেন না। নিজের নিজের রুচি অনুসারে তাহাদের স্বাধীনভাবে চলিতে দিতেন। সে যুগে এরকম মনোভাব দুর্লভ এবং বিস্ময়কর ছিল। বরদাবাবু নিজেও একজন আর্টিস্ট ছিলেন। ছবি আঁকার এবং ফটোতোলার শখ ছিল তাঁহার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িতে ছেলে-মেয়েদের বাধা দিতেন না। তাঁহাদের পরিবারে আধুনিকতার একটা বেপরোয়া হাওয়া বহিত। তাঁহাদের বাড়ির সকলে পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ শৌখিন এবং ছিমছাম থাকাই পছন্দ করিতেন। তাহাদের বাড়ির অসবাবপত্রেও আধুনিকতার ছাপ দেখা যাইত। মনে

পড়িতেছে, তাঁহাদের বাড়িতেই আমি প্রথম 'হোয়াট নট্' নামক আসবাবটি দেখিয়াছিলাম। আমাদের বাড়িতে 'পরদা' ছিল, অপরিচিত লোকের সামনে আমাদের বাড়ির মেয়েরা বাহির হইত না। স্বল্পপরিচিত জ্ঞাতি কুটুম্বদের সামনেও তাহাদের দীর্ঘ ঘোমটা না দিয়া উঁকি-ঝুঁকি দিলেও মামা রাগারাগি করিতেন। কিন্তু মন্মথদের বাড়ির দ্বার সকলের কাছেই অবারিত ছিল। পাড়ার ছেলেদের সেখানে আড্ডা বসিত, তাস-খেলা চলিত, গান-বাজনার আসর তো ছিলই। মন্মথর মা এসব বোধহয় তত পছন্দ করিতেন না। মনে আছে দিদিমাকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার বাড়িতে হিন্দুয়ানি বেশ বজায় আছে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে নেই। আমাদের বাড়িতে সব কিরিশ্চানী (খ্রীষ্টানী) কাণ্ড। আমার ভালো লাগে না ভাই। কিন্তু কি করব বল, ছেলে-মেয়েরা ওই চায়, উনিও ওই পছন্দ করেন। আমিও তাই ওই স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছি। ওদের সুখেই আমার সুখ।' অত্যন্ত স্নেহময়ী ছিলেন শুভঙ্করী। কাহাকেও কোন রূঢ়কথা বলিতেন না। রুখিয়া দাঁড়াইয়া কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা জোর করিয়া তাঁহার নিকট পয়সা আদায় করিত এবং সে পয়সা যথেচ্ছ ব্যয় করিত। ইহার ফল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হয় নাই। মন্মথর দুটি বোন ছিল, সোন এবং রূপা। সোনা আমাদের অপেক্ষা বছর দুইয়ের ছোট ছিল। রূপা ছিল আরও ছোট। এই সোনা পাড়ার ছেলেদের মাতাইয়া তুলিয়াছিল সেই অল্প বয়সেই। সেই বয়সেই তাহার চোখে মুখে যে প্রাণোচ্ছলতা দেখিয়াছি তাহা যুবতী-সুলভ, অত কম বয়সের মেয়ের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। সত্যই তাহার হাসিতে মানিক এবং অশ্রুতে মুক্তা ঝরিত। ঝরনার সঙ্গে তাহার যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। চমৎকার গান গাহিত, চমৎকার ভঙ্গীতে কথা বলিত, চলনেও যেন একটা ছন্দ ছিল। মনে হইত যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। পোশাক-পরিচ্ছদেও নিত্য নূতন বৈচিত্র্য প্রকাশ করিত সে। নিত্য নূতন ধরনের খোঁপা-বাঁধিত। যেদিকে দিয়া যাইত সেদিক সৌরভে আকুল হইয়া উঠিত। রোজই নূতন ধরনের সৌরভ। তাহার আর একটা বৈশিষ্ট্য মনে পড়িতেছে। চলিবার সময় সামনের দিকে বরাবর চাহিয়া থাকিত না, ঘাড় ফিরাইয়া বার বার পিছনেব দিকে চাহিত। আমি যখন মাইনর পাস করি, তাহার কিছুদিন পরেই সোনা কুলে কালি দিয়া গৃহত্যাগ করে। কাহার সহিত করিয়াছিল জানি না। শুনিয়াছিলাম পরে সে নাকি কলিকাতার এক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীও হইয়াছিল। নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা আশ্চর্য কথাও মনে পড়িতেছে। যে মন্মথ নিজে একদিন গৃহত্যাগ করিয়া যাত্রার দলে ভিড়িয়াছিল, সেই মন্মথই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এই ব্যাপারে। আমাকে প্রায়ই বলিত, 'ওকে যদি ধরতে পারি তাহলে গুলি করে মেরে ফেলব।' ধরিবার উদ্দেশ্যে দুই একবার কলিকাতা গিয়াওছিল কিন্তু সোনার নাগাল আর পায় নাই। কি নামে কোন্ রঙ্গমঞ্চে সে অবতীর্ণ হইতেছিল তাহা তাহার পক্ষে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ছিল। শেষে শোনা গেল সে নাকি বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে। সোনা চিরকালের মতো হারাইয়া গেল।

আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মামার একটি মেয়ে হইয়াছিল দিদিমা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন কমলা। কমলা দেখিতে সুধীরের মতো সুন্দর হয় নাই। রং ফরসা ছিল কিন্তু গড়ন তেমন নিখুঁত ছিল না। মামীমার ভাই নকুল তাহার নাম দিয়াছিল থেব্ড়ি। এই নকুল বয়সে আমার অপেক্ষা কিছু ছোটই ছিল। তাই যদিও সে সম্পর্কে গুরুজন আমি তাহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিতাম। মামীমার পিতা পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। নকুলের মা-ও যখন

মারা গেলেন তখন নকুল বাধ্য হইয়া তাহার দিদির আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মামার সংসারে আর একটি পরিজন বাড়িল। নকুল ছিল চন্দরের সমবয়সী। নকুল, চন্দর এবং সুধীর দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেল। এই নকুল আমার এবং চন্দরের জীবনে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে। তাহার প্রধান দোষ ছিল সে চুরি করিয়া খাইত। আচার চুরি করা তাহার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে ছিল। রোজই চুরি করিত। মামার রোগীরা প্রায়ই নানারকম খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন, আম জাম পেয়ারা কলা, আচার, আমসত্ত্ব প্রায়ই আসিত। সন্দেশও আসিত মাঝে মাঝে। নকুল লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, ফাঁক পাইলেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া কিছু-না-কিছু হাতাইয়া আনিত। মামীমা বুঝিতে পারিতেন ভাঁড়ারঘর হইতে জিনিস সরিয়া যাইতেছে, ইহা লইয়া প্রায়ই তিনি বকাবকি করিতেন। প্রথম তাঁহার সন্দেহ হইত নেত্যকে। কিন্তু পরে নকুলই তাঁহাকে একদিন গোপনে খবর দিল যে চন্দর এবং আমিই নাকি চুরি করিয়া খাই। মামীমা তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন, (যেহেতু নকুল তাঁহার ভাই) এবং খবরটি তুলিয়া দিলেন মামার কানে। মামা একদিন যাচ্ছেতাই করিয়া বকিলেন আমাকে। সেদিন আমি যে কি অপমানিত বোধ করিয়াছিলাম তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমার যেন মাথা কাটা গিয়াছিল। আমার আরও বেশী লাগিয়াছিল কারণ মামার নুনের গোলার কয়েকজন ব্যাপারী সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহারা মামার খোশামোদ করিত। একজন বলিল, 'আপনি বৃথাই রাগ করছেন ডাক্তারবাবু, কালটি যে কলি।' আর এক জন ফোড়ন দিল, 'এদিকে তো ছেলেটি দেখতে ভালোমানুষের মতো, ওর ভিতর এমন জিলিপির প্যাঁচ আছে বাইরে থেকে তা তো বোঝা যায় না।' আমি কোন প্রতিবাদ করি নাই। প্রতিবাদ করিলে ব্যাপারটা আরও জানাজানি হইয়া যাইবে, বাবার কানে যদি ওঠে তিনি কি মনে করিবেন, এই সব ভয়ে আমি অবনতমস্তকে এই অন্যায় বকুনি নীরবে হজম করিয়া গেলাম। কিন্তু ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না। দোষটা পরের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ পাইয়া নকুলের সাহস এবং স্পর্ধা বাড়িয়া গেল। নকুলের অপরাধে মামীমা একদিন চন্দরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ভাঁড়ারঘর হইতে একবাটি সর নাকি অন্তর্ধান করিয়াছিল। চন্দর তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল। দিদিমা তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চন্দর কাঁদছে কেন অমন করে কোথাও পড়ে টড়ে গেল নাকি।' নেত্য বলিল, 'ভাঁড়ারঘর থেকে সর চুরি করে খেয়েছে বলে মা মেরেছেন।' এই কথায় যেন বারুদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। দিদিমা বাঘিনীর মতো হুংকার করিয়া উঠিলেন।

'চন্দর চুরি করে খেয়েছে? কে দেখেছে ওকে খেতে। ও তো সেরকম ছেলে নয়। ও চুরি করেছে?'

সুধীর কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, 'মেজদা খায় নি ঠাকুমা। মামা খেয়ে মেজদার নামে লাগিয়েছে।'

আর যায় কোথা! দিদিমা তখনই মামীমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'তুই চন্দরকে মেরেছিস' কেন! ও কত বড় বংশের ছেলে জানিস? ও কখনও চুরি করে খেতে পারে। চুরি করেছে তোর ভাই। হা-ঘরে লক্ষ্মীছাড়া বংশের ছেলে কিনা তাই ছুং ছুং করে বেড়াচ্ছে চারদিকে। শক্তিকে আজই বলছি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিক ওকে। দুধ কলা দিয়ে ওসব কালসাপ পোষবার দরকার নেই।'

দিদিমা কিন্তু কথাটা মামার কানে তোলেন নাই। তাঁহার হয়তো মনে হইয়াছিল নকুল

অনাথ এবং নিরাশ্রয়, তাহাকে দূর করিয়া দিলে সে যাইবে কোথায়। মামীমা দিদিমার এই বকুনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন বটে—দিদিমার মুখের উপর কেহ কথা বলিতে সাহস করিত না, এমন কি মামাও না—কিন্তু ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে শুভ হইল না। আমাদের প্রাপ্য দুধ ক্রমশঃ বেশী জোলো হইতে লাগিল, যে ডাল আমরা খাইতাম তাহাতে ফ্যানের অংশ এত বেশী থাকিতে লাগিল যে তাহা অনেক সময় ডাল বলিয়া চেনাই যাইত না। যে বাসী রুটি আমাদের জলখাবার ছিল তাহাতে আগে একটু-আধটু ঘি মাখানো থাকিত এখন ক্রমশঃ তাহা স্নেহহীন হইয়া রুক্ষমূর্তি ধারণ করিল। নকুল সুধীর কমলা এক পঙক্তিতে আমাদের সঙ্গে খাইতে বসিত বটে, কিন্তু মাছের পেটিটা বা তরকারির ভালো অংশটুকু উহাদের পাতেই পড়িত। আমাকে এবং চন্দরকে মাছের কাঁটাকুটি অথবা তরকারির দুই একটা আলু পটল এবং ঝোল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। একদিন দেখিলাম মামীমা নকুলকে এবং সুধীরকে আলাদা ডাকিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন। আমি সবাই বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু চন্দর পারিত না। একটু বড় হইয়া কিন্তু সে-ও বুঝিল এবং আমার মতো সে-ও সহ্য করিতে লাগিল। যে সব ছেলে-মেয়েরা পরের বাড়িতে মানুষ হয় তাহাদের চরিত্রে এই সহনশীলতা স্বতঃই যেন স্বাভাবিক গুণরূপে বিকশিত হয়। সসংকোচে বিনা প্রতিবাদে অন্যায় অবিচার সহ্য করাই তাহাদের অভ্যাস হইয়া পড়ে। প্রতিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই ইহাও তাহারা যেন উপলব্ধি করে। বনের পাখীরা বন্দী হইয়া ক্রমশ পিঞ্জরজীবনেই নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লয়। পরাশ্রিত বালক-বালিকারাও অবাঞ্ছিত পরিবেশকেই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লয়। ছেলেবেলায় পিতামাতার স্নেহনীড়ই শিশুদের একমাত্র আপন স্থান। অন্য যে কোন আশ্রয়, তাহা যত নিকট আত্মীয়ের গৃহেই হোক না কেন, তাহাদের কাছে পর-বাস। পরে আমার নিজের সংসারেও আমাকে অনেক আত্মীয় বালক-বালিকাকে আশ্রয় দিতে হইয়াছিল, কিন্তু আমিও তাহাদের এই গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। কারণ সংসার আমার একার নহে, সংসারে একাধিক লোক শাসন করে এবং সে শাসন অনেক সময় হিতকারী হইলেও পরাশ্রিতদের পক্ষে অত্যাচার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরকে আপন করা সত্যই বড় কঠিন। তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেও অনেক সময় তাহার মনে হয় যে লোক-দেখানো লৌকিকতা করা হইতেছে। পরকে আপন করিতে পারে অকৃত্রিম ভালবাসা, কিন্তু সে ভালবাসা দুর্লভ। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে প্রত্যেকেই নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিতে ব্যস্ত, সেখানে স্বার্থপরতার নানা মূর্তিই প্রকট, বাড়ির কর্তা এবং কর্ত্রী যদি পরার্থপরও হন তবু তাঁহারা নীচতার গ্লানি হ'ইতে আশ্রিত অসহায় বালক-বালিকাদের রক্ষা করিতে পারেন না, মামার সংসারে মামা এবং দিদিমা আমাদের সহায় ছিলেন, দিদিমা স্নেহ-বশে এবং মামা কর্তব্যবোধে, কিন্তু তবু মামীমার ব্যবহার আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রায় প্রত্যহ আঘাত করিত। ক্রমশঃ সে অনুভূতির সূক্ষ্মতা আর রহিল না, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া তাহা লুপ্ত হইয়া গেল। বাড়িতে নকুলের প্রতিপত্তিই বাড়িতে লাগিল। ভাগনার অপেক্ষা শালার প্রতিপত্তি বেশী হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। নকুল খুব খারাপ লোকও ছিল না। সে চন্দরকে খুব ভালবাসিত এবং আমাকে, কেন জানি না, সমীহ করিত। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। একদিন সে পাঠশালা হইতে আসিয়া বলিল, 'চল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি। সেখানে মজার ব্যাপার আছে একটা।' আমি বৈকালে সাধারণতঃ কোথাও যাইতাম না। 'হোম টাস্ক' থাকিত, বৈকালে বসিয়া সেইগুলিই করিতাম।

মামীমা সন্ধ্যাবেলাই সব ছেলেদের খাওয়াইয়া দিতেন। খাইবার পরই ঘুমে আমার চোখ জড়াইয়া আসিত। তাই বৈকালেই আমি 'হোম টাস্ক' সারিয়া রাখিতাম। সেদিন শনিবার ছিল, পরদিন ছুটি, নকুলের সহিত গঙ্গার ধারে যাইবার কোন বাধা ছিল না। গঙ্গার ধারে গিয়া দেখিলাম নকুলের প্রিয়তম বন্ধু ট্যারা নগেনও বসিয়া আছে। এই নগেনই উত্তরকালে নকুলের ব্যবসায়ের অংশীদার হইয়াছিল। নকুল আমাদের বলিল, 'তোরা ব'স আমি আসছি।' কাছেই একটা পোড়ো নীলকুঠি ছিল, আমাদের বসাইয়া নকুল সেই দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই সে চটের একটি থলি লইয়া ফিরিল। থলির ভিতর বড় বড় পাকা পেয়ারা ছিল। ইতিপূর্বে অত বড় পেয়ারা আমি দেখি নাই। নকুল আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া পেয়ারা দিয়া নিজে একটি লইল। আমি সবিস্ময়ে ফলটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিলাম। নকুল বলিল, 'আরে দেখছ কি, কামড় দাও, পেয়ারা কাশীর পেয়ারা। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল কেউ দেখতে পেলে মুসকিল হবে।' আমি আরও অবাক হইয়া গেলাম। কাশীর পেয়ারা এখানকার নীলকুঠিতে আসিল কি করিয়া। সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে নকুল ধমকাইয়া উঠিল, 'আরে আগে খেয়ে ফেল না। পরে সেসব শুনো।' পরে শুনিয়াছিলাম। নগেনের বাবা ছিল রেলে ট্রানশিপ্‌মেন্টের মালবাবু। নগেন প্রায়ই স্টেশনে যাইত। গতকল্য সে দেখিয়া আসিয়াছিল এই পেয়ারাগুলি চালান যাইতেছে। অনেকগুলি ঝুড়ি প্ল্যাটফর্মে বসানো বহিয়াছে। নকুল এ খবর পাইবামাত্র স্টেশনে চলিয়া যায়। একটা ঝুড়ি ভাঙা ছিল, নকুল এ সুযোগ উপেক্ষা করে নাই। ইহার জন্য নকুলকে খুব বেশী দোষ দেয়া যায় না। কারণ 'চুরি' জিনিসটা তখন খুব ঘৃণ্য ছিল না। রেলের বাবুরা, পুলিস কর্মচারীরা প্রায় প্রকাশ্যেই চুরি করিত। পরের বাগান হইতে আম কাঁঠাল কলা মূলা চুরি করাটাই রেওয়াজ ছিল। যে সব ছেলে ইহা করিতে পারিত, তাহাদের পিতামাতারা সেটা ছেলেদের বাহাদুরি বলিয়া গণ্য করিতেন, চোর বলিয়া তাহাদের শাসন করিতেন না। তাই সেদিন গঙ্গার ঘাটে নকুলকে আমি চোর বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি নাই। বরং তাহার চোরাই মাল সে যে আমাদের ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে ইহাতে সেদিন আমাব বালক-হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেদিন বুঝিয়াছিলাম এবং তাহার পর হইতে সারাজীবন এ ধারণা আমার অটুট ছিল যে নকুল নিজে যাহাই হোক সে আমাকে ভালবাসে। নকুল পড়শোনায় মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু মাস্টার পণ্ডিতরা তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। নকুল নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করিত। গিরীন মাস্টারের বাড়ির বাজার করিয়া দিত সে। খুব ভালো বাজার করিতে পারিত। মামীমাও তাহাকে বাজারে পাঠাইতেন। এইজন্য সকালবেলাটা তাহার পড়াশোনায় না কাটিয়া বাজারে বাজারেই কাটিত। আর সন্ধ্যার পর তাহার ঘুম পাইত। বৈকালেও সে বাড়িতে থাকিত না। শুনিয়াছিলাম বৈকালে সে বিরজা পণ্ডিতের কাছে পড়িতে যায়। কিন্তু রাজেন আসিয়া একদিন যে খবরটি ফাঁস করিল তাহা ভয়ানক। সে নাকি স্বচক্ষে একদিন নকুলকে গাঁজা সাজিতে দেখিয়াছে। বিরজা পণ্ডিত যে গাঁজা খান একথা সুবিদিত ছিল, তাঁহার ছাত্র নকুল প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে গাঁজা সাজিয়া দিতে পারে কিন্তু খবরটি শুনিয়া সকলে, বিশেষতঃ মামীমা, বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন কথাটা যেন মামার কানে না ওঠে। রাজেনকেও তিনি অনুনয় করিলেন। রাজেন বলিল, 'আমি নিজে থেকে যেচে কিছু বলব না, কিন্তু মামা যদি আমাকে জিগ্যেস করেন তাহলে আমাকে সত্যি কথাই বলতে হবে। মিথ্যে কথা কি বলা যায়?'

এই রাজেন ছেলেটিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। সে-ও ছিল ডি. টি. এস. আপিসের বড়বাবু জগন্ময় রায়ের ভাগ্নে। আমাদের দলে তিনটে 'ভাগ্নে' তখন সাহেবগঞ্জে একত্রিত হইয়াছিল। আমি, চন্দ্রসুন্দর এবং রাজেন। রাজেনের ছিপছিপে পাতলা চেহারা, ধপধপে ফরসা রং। চোখ দুটি টানা-টানা এবং রক্তাভ। সে-ও কম দুষ্ট ছিল না। নেত্য ভীতু বলিয়া প্রায়ই সে তাহাকে ভয় দেখাইত। নেত্য যেখানে বসিয়া বাসন মাজিত সেখান হইতে একটি আমড়া গাছ দেখা যাইত। রাজেন সর্বাঙ্গে সাদা চাদর জড়াইয়া অন্ধকারে সেই আমড়া গাছে উঠিয়া নেত্যকে ভূতের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। আর একবার একটা ভীষণ মুখোশ পরিয়া হঠাৎ সন্ধ্যবেলা রান্নাঘরে আসিয়া হাজির। আমরা খাইতে বসিয়াছিলাম, সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, মামীমা পর্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন। হঠাৎ রাজেন মুখোশটা খুলিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'ছিঃ, তোমরা এত ভীতু! এটা যে মুখোশ তা বুঝতে পারলে না!' তাহার কণ্ঠস্বর শান্ত ছিল বটে, কিন্তু চোখ দুইটি কৌতুকে হাসিতেছিল। ইহা তখন তাহার নিকট তুচ্ছ খেলামাত্র ছিল, কিন্তু আজ ভাবিয়া দেখিতেছি এই খেলাই সে পরে সারাজীবন খেলিয়াছে। বারবার সে নিজের এবং অপরের মুখোশ খুলিয়া বলিয়াছে,—আরে দ্যুৎ, মুখোশ দেখে ভুলছ কেন। এটা যে মুখোশ, মুখোশের আড়ালে যে আছে তাকেই দেখ। রাজেন পরে যে আধ্যাত্মিক-জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বাল্যকালের এই মুখেশের খেলা, ভূতের ভয় দেখানো প্রভৃতি যেন তাহারই সূচনা। বাল্যকালে তাহার আর একটা বৈশিষ্ট্যও সকলকে আতঙ্কিত করিত। অত্যন্ত নির্ভীক ছিল সে। উঁচু ছাতের আলিসার উপর নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, বড় বড় গাছের মগ-ডালে উঠিতে তাহার বিন্দুমাত্র ভয় করিত না। এখন আমার মনে হয় এসবের মূলে ছিল তাহার ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস। বাবাকেও খুব ভক্তি করিত সে। বাবা যখন মন্দিরে কালীপূজা করিতেন তখন প্রায়ই সে তন্ময় হইয়া বসিয়া পূজা দেখিত। তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত না এই বালকই গঙ্গার ঘাটে মাঝিদের নৌকা খুলিয়া দেয়, বা গাছে চড়িয়া নেত্যকে ভূতের ভয় দেখায়।

মাইনর স্কুলে পড়িবার সময়ই আমাদের উপনয়ন হইয়াছিল, আমার, চন্দরের এবং নকুলের। রাজেনেরও প্রয়ে সেই সময়ে হইয়াছিল। উপনয়নের পর আমি মাত্র এক বৎসর নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাহ্নিক করিয়াছিলাম। তা-ও মামার ভয়ে। কিন্তু চন্দরের এ বিষয়ে অস্বাভাবিক একনিষ্ঠতা দেখিয়া দিদিমা ভয় পাইয়া গেলেন। চন্দর ওই অল্প বয়সেই পদ্মাসনে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়াম করিত। শোনা গেল রাজেনও নাকি তাহাই করে। এ বিষয়ে রাজেনই নাকি চন্দরের আদর্শ। উভয়েই মোটা টিকি রাখিয়াছিল, উভয়েরই মাছ-মা‚সের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিতেছিল। আমাদের ভাগে মাছ-মাংস যে খুব বেশী পড়িত তাহা নয়, কিন্তু দু'এক খানা যাও বা পড়িত, তাহাও চন্দর খাইত না, পাতে ফেলিয়া রাখিত। বলিত, তাহার ভালো লাগে না। এই সব শুনিয়া দিদিমা ঘাবড়াইয়া গেলেন। নেত্য একদিন দিদিমাকে বলিল, 'রাজেনের যে রকম হাবভাব দেখছি ও শেষকালে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। রোজ নাকি ও আর চন্দর গঙ্গার ধারে বসে হরিনাম সংকীর্তন করে। আমার ভয় হচ্ছে রাজেনের সঙ্গে মিশে চন্দরও না শেষকালে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।' দিদিমা আরও ঘাবড়াইয়া গেলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল চন্দর নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। একথা বলিতে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। দিদিমা তখন নকুলের শরণাপন্ন হইলেন। নকুলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মতো লোককেও কার্যোদ্ধারের জন্য বানরের

খোশামোদ করিতে হইয়াছিল। নকুলও রোজ সন্ধ্যাহ্নিক করিত, তাহারও রাজেনের সহিত ভাব ছিল। চন্দরের সহিত তো ছিলই। তাই দিদিমা বোধহয় ভাবিলেন নকুল চেষ্টা করিলে চন্দরকে রাজেনের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারিবে। নকুল অবশ্য সাড়ম্বরে সন্ধ্যাহ্নিক করিত আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে ততটা নহে যতটা মামাকে খুশী করিবার জন্য। রাজেনের উপর তাহার প্রেমও যে গভীর ছিল তাহা নহে, কিন্তু দিদিমা এত সব জানিতেন না। তিনি একদিন নকুলকে বলিলেন, 'তুই আর চন্দর রাজেনের সঙ্গে অত মিশিস কেন। বেড়াবার জন্যে গঙ্গার ধারেই বা যাওয়ার দরকার কি তোদের। বাড়ির পিছনেই তো অতবড় মাঠ রয়েছে, সেখানে বেড়ালেই হয়, রাজেনের সঙ্গে অত ঘোরা কেন? যা শুনেছি তাতে মনে হয় ও ছেলেটা শেষকালে বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা গরীবের ছেলে—তোমাদের ওসব হুজুকে মাতলে তো চলবে না। শক্তি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছে, তার আশ্রয়ে থেকে তোমরা আখেরের কাজটি গুছিয়ে নাও। লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার কর, তবেই না তোমার মায়ের দুঃখ ঘুচবে। সন্ন্যাসী হবার কি এই বয়েস?' চতুর নকুল বলিল, 'রাজেন আমাদের গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে চানাচুর কিনে খাওয়ায়। সেই লোভেই যাই আমরা। বেশ, আর যাব না।' নকুল যাহা প্রত্যাশা করিতেছিল দিদিমা সেই উত্তরই দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 'বেশ আমি তোদের রোজ দুটো করে পয়সা দেব, এইখানেই চানাচুর কিনে খাস। চানাচুর খাওয়ার জন্যে গঙ্গার ধারে যাওয়ার দরকার কি, রাজেনের সঙ্গেই বা মেশবার দরকাব কি। আমি তোমাদের চানাচুর খাওয়ার পয়সা দেব।' নকুল দিদিমার নিকট হইতে রোজ দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া যাইত। ইহাতেও কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। দিদিমাকে পাড়ার আর একটা ছেলে আসিয়া খবর দিল যে চন্দর রাজেনের সহিত গঙ্গার ঘাটে যাইতেছে না বটে, কিন্তু পাহাড়তলিতে যাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, সেখানে যে গুহাটা আছে, তাহার মধ্যে দুইজনে ঢুকিয়া কি যেন করে। দিদিমা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। পাহাড়তলির সে গুহা যে সাংঘাতিক গুহা। নানারকম বদনাম ছিল গুহাটার। কেহ বলিত উহার মধ্যে একটা বাঘ থাকে, কেহ কেহ একটা সাপও নাকি দেখিয়াছে সেখানে। একটা অঘোরপন্থী উলঙ্গ সাধু যে ওখানে কিছুদিন ছিল একথা তো সুবিদিত। সে ভয়ঙ্কর লোক ছিল। শ্মশান হইতে আধপোড়া মড়া চুরি করিয়া আনিয়া আহার করিত। তাহাকে অনেকে মড়ার মাথার ঘিলুও খাইতে দেখিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর গুহায় রাজেন চন্দরের সহিত গিয়া কি করে? চন্দরকে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। নকুল বলিল, 'ওরা গুহার ভিতরে বসে যোগ করে। নাক টিপে দম বন্ধ করে বসে থাকে। আমি যাই না ওদের সঙ্গে।' দিদিমা শেষে 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই নীতি অনুসরণ করিয়া রাজেনকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজেন আসিলে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'শুনলুম, তুই আর চন্দর পাহাড়তলির গুহায় যাস! কি করিস সেখানে গিয়ে?' রাজেন বলিল, 'এমনি বেড়াতে যাই, বেশ নির্জন জায়গাটা। ওখানে বসে থাকতে ভালো লাগে।' দিদিমা বুঝিলেন, রাজেন আসল কথাটা কিছুতেই বলিবে না। তখন তিনি হঠাৎ রাজেনের দুই হাত ধরিয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'তোর হাতেই চন্দরকে সঁপে দিলাম আমি। ওর ভালো-মন্দের ভার তুই নে। আর যাই করিস, ওকে সন্ন্যাসী করিস না। আর তুইও দাদু সন্ন্যাসী হস না। সন্ন্যাসীদের বড় কষ্ট। জটা পরে, নেংটি পরে ছাই মেখে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয় ওদের। ভিক্ষে করে খেতে হয়। গাঁজাও খেতে হয় শুনেছি। তোরা দুধের ছেলে তোরা কি এসব পারবি? পারবি না। এ দুর্মতি তোর কেন যে

হয়েছে তা তো বুঝতে পারছি না। আজ আমায় কথা দিয়ে যা আর ও পথে পা বাড়াবি না। ও পথ তোদের পথ নয়। কথা দে আমাকে।'

রাজেন শুধু মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল, কিছু বলিল না। এক ছুটে পালাইয়া গেল। সে মাঝে মাঝে আসিয়া দিদিমাকে ভয় দেখাইত, 'তোমার কথা রাখতে পাচ্ছি না দিদিমা। গিরীন মাষ্টার বড্ড মারধোর শুরু করেছে। দেখছি সন্ন্যাসীই হয়ে যেতে হবে শেষকালে।'

আজ জীবনের সায়াহ্নে এই সব কথা স্মরণ করিয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিতেছি। রাজন বা চন্দর কেহই সন্ন্যাসী হয় নাই। রাজেন বার দুই এনট্রান্স ফেল করিয়া জীবিকার্জনের জন্য নানারকম কাজ করিয়াছে, যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছে, বহু পুত্রকন্যার জন্মদান করিয়া বিধিমত সংসার পাতিয়াছে তবে একথাও সত্য আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন তাহার জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সংসার-আশ্রমে থাকিয়াও তপস্যা করিয়াছে সে। তাহার শান্ত সৌম্য মুখের দিকে চাহিলেই তাহা বোঝা যায়, অন্য কোনা সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, তাহার প্রদীপ্ত চোখের প্রশান্ত দৃষ্টিই তাহার সাক্ষী। এই আধ্যাত্মিকতা শেষে তাহার জীবনের আধিভৌতিক সমস্যারও সমাধান করিয়াছে। তাহার সাধনায় ও নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকগুলি ভক্ত জুটিয়াছে তাহার। রাজেন এখন গুরুগিরি করে। ভক্তদের দাক্ষিণ্যে তাহার সংসার বেশ সচ্ছল। শেষ বয়সে কিছুদিন আগে তাহার বাল্যকালের সন্ন্যাস রোগ আর একবার মাথা চাড়া দিয়াছিল। সংসারের গোলমালে অতিষ্ঠ হইয়া সে কোন একটা তীর্থস্থানে পলাইয়া গিয়াছিল নির্জনে তপস্যা করিবে বলিয়া। কিন্তু ইহাতেও সে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারে নাই! তাহার স্ত্রী পিছু পিছু গিয়া হাজির হইয়াছিল। বলিয়াছিল, 'তুমি নির্জনে এসে তপস্যা করলে তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখবে কে। সংসার চলবে কি করে। দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি, একটা ছেলেও মানুষ হয় নি। তোমার জন্যেই ভক্তরা আসে, প্রণামী দেয়, সংসার চলে। তুমি সরে থাকলে আর তারা আসবে না। সংসার চলবে তাহলে কি করে?'—এই অতিশয় ন্যায়সংগত কথা শুনিয়া রাজেন প্রথমে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছিল। রাজেন লোক ভালো। তাহার মুখেই গল্পটা শুনিয়াছি। এই কিছুদিন পূর্বে সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। এখনও সে আমাকে বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান দেয়। চন্দরের ইতিহাস একটু অন্যরকম। চন্দর লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছেলে ছিল। মাইনর স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিল। এনট্রান্স পরীক্ষাটাও পাস করিয়াছিল, কিন্তু ফল তেমন ভালো হয় নাই। ধর্মচর্চাই তাহার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। আধ্যাত্মিক পথে সে সত্যই কতটা অগ্রসর হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বাহিরের আড়ম্বরটা খুব বাড়াইয়া দিয়াছিল, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। টিকি রাখিয়া মাছ মাংস পেঁয়াজ ত্যাগ করিয়াছিল, দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া রোজ পুজা করিত। কোথাও কোন সন্ন্যাসী বা গুরু আসিয়াছে খবর পাইলে সেখানেই গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ধর্ম-বিষয়ক কোন বক্তৃতা বাদ দিত না। অন্তরে সে কতটা ধার্মিক হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বাহিরে সে যে ধর্ম-ধ্বজী হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চন্দর যখন মাইনর পাস করে, আমি তখন ডাক্তারি পাস করিয়াছি। মাইনর পাস করিয়া সেকালে ক্যাম্বেল স্কুলে ভরতি হওয়া যাইত। আমার ক্যাম্বেল স্কুলে ভরতি হওয়ার কাহিনী আমি পরে লিখিব। এখন চন্দরের কথাটাই শেষ করিয়া রাখি। মাইনর পাস করিয়া চন্দর যখন বৃত্তি পাইল আমি তখন খুবই উৎসাহিত

হইলাম। তাহাকে বলিলাম তুমি যতদূর পর্যন্ত পড়িতে পার পড়, আমি সব খরচ দিব। চন্দর মাইনর পাস করিয়া কলিকাতায় গিয়া ভরতি হইল, বোর্ডিংয়ে থাকিতে লাগিল। আমি তাহাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে লাগিলাম। শুধু টাকা নয় তাহাকে প্রতি মাসে খাঁটি ঘি এবং মাথায় মাখিবার জন্য কবিরাজী তেলও পাঠাইতে হইত। দিদিমার আদেশেই এসব করিতাম। দিদিমার বদ্ধ ধারণা হইয়া গিয়াছিল চন্দরের মস্তিষ্কটা তেমন সবল নয়। তাহার উপর মাছ খায় না, শক্ত শক্ত বই পড়িতে হয়, অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়াম করে, বোর্ডিংয়ের নিরামিষ খাওয়াও তেমন পুষ্টিকর নয়, দিদিমার নির্দেশ তাই আমি তাহার দুধ ও মাখনের জন্য অতিরিক্ত টাকাও পাঠাইতাম। সুবিধা পাইলে ঘি-ও পাঠাইতাম। এক কবিরাজ দিদিমাকে চ্যবনপ্রাশ সরবরাহ করিতেন। তাঁহার একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখনও মনে আছে। তাঁহার পেটের ঠিক মাঝখানে একটা বড় আবের মতো ছিল। এখন মনে হয় খুব সম্ভবতঃ সেটি ভেন্ট্রাল হার্নিয়া। তিনি শুধু গায়ে আমাদের বাড়িতে আসিতেন, বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়রা তাঁহার পেটের আবটা লইয়া মাতিয়া উঠিত। তিনিও হাসিমুখে প্রশ্রয় দিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের নামটা মনে নাই। 'কব্‌রেজ মশাই' নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। মাথায় চকচকে টাক, গোঁফ দাড়ি কামানো, মুখখানি সর্বদাই হাসি-হাসি। মনে হইত একটা চাপা ব্যঙ্গও যেন সে হাসিতে উঁকি দিতেছে। তিনি দিদিমাকে বলিলেন, ছেলেমানুষের মস্তিষ্ক তো সাধারণত দুর্বল হয় না, যদি হইয়াই থাকে একটা কবিরাজী তেল মালিশ করুক। দিদিমার আদেশে এক শিশি করিয়া এই তেলও আমি চন্দরকে পাঠাইতে লাগিলাম। কিন্তু লোকমুখে খবর পাইতাম চন্দর লেখাপড়ার পরিবর্তে সনাতন হিন্দু-ধর্ম-সংরক্ষণেই বেশী মন দিয়াছে। কলিকাতায় তখন ব্রাহ্মধর্মে খুব আড়ম্বর। সৎবংশের অনেক ভালো ছেলেরা তখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমাজে আলোড়ন আনিয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভব হইয়াছে একদল গোঁড়া সনাতনী-দলের। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ নেতাগণ তখন সনাতনী ধর্মের স্বপক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। চন্দর ইঁহাদেরই দলে ভিড়িয়া গেল। এনট্রান্স পরীক্ষাটা কোন রকমে পাস করিল, কিন্তু এফ. এ. (তখন আই. এ. র বদলে এফ. এ. ছিল) পরীক্ষাটা আর পাস করিতে পারিল না। উপর্যুপরি ফেল করিতে লাগিল। আজকালকার আই. এ. বা আই. এসসি. পরীক্ষার মতো এফ. এ. পরীক্ষা সহজ ছিল না। তখনকার এফ. এ. ছাত্রদের বিজ্ঞানও পড়িতে হইত। চন্দর এই বিজ্ঞানেই ফেল করিতে লাগিল বার বার। অঙ্কটা তাহার মাথায় কিছুতেই ঢুকিত না। প্রতিবারই দেখা যাইত যে ম্যাথামেটিক্‌স্‌কে-এ ফেল করিয়াছে। দিদিমা ইংরেজী জানিতেন না, ম্যাথামেটিক্‌সকে তিনি বলিতেন 'লাঠালাঠি'। নকুল তাঁহাকে বুঝাইয়াও দিয়াছিল যে সত্যই নাকি ওই পরীক্ষায় পরীক্ষকদের সহিত লাঠালাঠি করিতে হয়। লাঠিখেলায় তাহাদের পরাস্ত না করিতে পারিলে পরীক্ষার পাস নম্বর পাওয়া যায় না। চন্দর বার বার ফেল করাতে দিদিমা খুব দমিয়া গিয়াছিলেন, বোধহয় মনে মনে একটু অপ্রস্তুতও হইয়াছিলেন। চন্দর যে হীরের টুকরো ছেলে একথা সুযোগ পাইলেই তিনি সকলকে শুনাইতেন। সেই চন্দর বারবার ফেল করিতেছে ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান আহত হইতেছিল। নকুলের কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন এবং আশ্বস্ত হইলেন। নিজেকে প্রবোধ দিবার সুযোগ পাইলেন। চন্দর ছেলেমানুষ, ভীতু, তাহার গায়ে কি অত জোর আছে, ও কি ষণ্ডা সাহেবদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিতে পারে। আমাকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই ওকে আরও পাঁচটা করে টাকা পাঠা, ভালো ভালো খাবার

কিনে খাক। গায়ে জোর না হলে লাঠালাঠিতে পারবে কেন সায়েবদের সঙ্গে।' দিদিমার এ ভুল আমি ভাঙাইয়া দিই নাই। মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া তিনি যদি সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন পান না, আমি সেটা ভাঙাইয়া দিব কেন। আমাকেও তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা তুই যে ডাক্তারি পাস করলি তোকেও কি লাঠালাঠি করতে হয়েছিল?' বলিয়াছিলাম, 'না, ডাক্তারি পড়তে গেলে লাঠালাঠি করতে হয় না।' দিদিমা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাই আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তিনি কি এই অবিশ্বাস্য কথাটা সত্যই বিশ্বাস করিতেন? না, নিজের মনকে চোখ ঠারিয়া সত্যের মুখে মুখোশ পরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? এ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করি নাই। তবে জানি স্নেহের বশবর্তী হইয়া মানুষ সব করিতে পারে। শাদাকে কালো বা কালোকে শাদা বলিতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না।

বাবা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজের সেতার, কালীপূজা এবং হরিণের সেবা লইয়াই থাকিতেন, মামার সংসারের সহিত নিজেকে কখনও জড়ান নাই, তবু তিনি সব খবর রাখিতেন। মাহিনা পাইবার পর মাসে তিনি একবার মামার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন দিদিমাকে টাকা দিবার জন্যে। আধঘণ্টার বেশী দিদিমার কাছে থাকিতেন না, কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মামার সংসারের স্বরূপ তাঁহার মনে আঁকা হইয়া যাইত। তিনি আসিলেই মামী গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, কিন্তু সে প্রণাম যে বাহ্যিক তাহা বাবার অগোচর ছিল না। মামীমাকে তিনি চিনিয়াছিলেন, অর্থাৎ মামীমা যে আমাদের হিতৈষী নন, আমাদের সম্বন্ধে তিনি যে ঈর্ষা-পরায়ণ একথা বাবার অবিদিত ছিল না। কিন্তু ইহা লইয়া কাহাকেও তিনি একটি কথাও কখনও বলেন নাই। স্বভাবতঃই তিনি স্বল্পভাষী গম্ভীর লোক ছিলেন। আমার সহিতও তাঁহার ক্বচিৎ কথা হইত। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'চন্দরের জন্য আব তুমি অনর্থক টাকা খরচ কোরো না। কলকাতায় বেশী দিন থাকলে ও হুজুকে মেতে আবও নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে একটা চাকরিবাকরি যোগাড় করে দাও বরং। তোমার দিদিমা বৃথা আশা করে আছেন ও ডেপুটি হবে। ওর আর কিছু হবে না। তুমি ওকে তোমার কাছেই ডেকে নাও। দিদিমার অনুরোধে কিন্তু তাহাকে আর এক বৎসর পড়াইতে হইল। কিন্তু তবু সে এফ. এ. পাস করিতে পারিল না। খবর পাইলাম সে কোন এক গুরুর কাছে মন্ত্র লইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পর সে যখন আমার নিকট আসিল তখন তাহাকে লইয়া আমি মহাসমস্যায় পড়িলাম। তাহার ধর্মের আতিশয্য, তাহার আহ্নিক-প্রাণায়াম, তাহার নিরামিষ, পিঁয়াজ রসুনের গন্ধে অহিষ্ণুতা, তাহার শুচিবাই আমাকে বড়ই বিব্রত করিতে লাগিল। সকলেরই মনে হইতে লাগিল সে যেন একটা বহুমূল্য কাচের পুতুল—সামান্য টোকা লাগিলেই ভাঙিয়া যাইবে।

আমার ডাক্তারি পড়িবার কাহিনীটাও অদ্ভুত। অনেকে ইহাকে আকস্মিক যোগাযোগ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ইহার মধ্যে ভগবানের হাত ছিল। পৃথিবীতে কোন কিছুই আকস্মিক নয়, যাহা ঘটে তাহা ভগবানের বিধানেই ঘটে।

আমি চন্দরের মতো ভালো ছেলে ছিলাম না। তবে কখনও ফেল করি নাই। স্কুলের শিক্ষকেরা আমার সম্বন্ধে কখনই উচ্চাশা করিতেন না। স্কুলে 'গবেট' 'গবাকান্ত' এইসবই আমার নাম ছিল। আমি যে মাইনর পাস করিতে পারিব ইহাও কেহ আশা করেন নাই।

মাইনর পাস করিবার পর আমি যে বিদেশে এনট্রান্স পড়িতে যাইব এ কল্পনাও আমি করিতে পারিতাম না। মামা ঠিক করিয়াছিলেন মাইনরের শেষ পরীক্ষা দিয়া আমি তাঁহার নুনের গোলায় খাতা লিখিব। সেইজন্য মামা, কার্তিক মামা প্রায়ই আমাকে বলিতেন, হাতের লেখাটা ভালো কর। আর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ভালো করিয়া শিখিয়া লও। পারো তো শুভঙ্করীটাও আয়ত্ত করিয়া ফেল। ব্যবসার কাজ করিতে গেলে ওইগুলাই বেশী দরকার। আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। কি আর বলিব। দরিদ্রকে নীরব হইয়াই থাকিতে হয়। বাবা যে আমাকে বিদেশে বোর্ডিংয়ে রাখিয়া পড়াইবেন সে রকম অবস্থা তাঁহার ছিল না। নিজের খরচ বাদে তাঁহার উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত সম্ভবতঃ তাহা তিনি আমাদের খরচের জন্য দিদিমার হাতে দিতেন। দিদিমা বোধহয় সেটা দিতেন মামীমার হাতে। মামীমা বলিতেন বাবা যাহা দেন তাহাতে আমাদের কুলায় না। একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় বান্ধবী হিরি গয়লানীকে যাহা বলিতে ছিলেন তাহা আড়াল হইতে আমি শুনিয়াছিলাম। বলিতেছিলেন, 'ঠাকুরজামাই তাঁর ছেলেদের জন্য দু'পাঁচ টাকা দেন বটে কিন্তু দু'দুটো ছেলের খরচ কি ওতে কুলোয়? তুমিই বল না। ও শুধু লোক-দেখানো দেওয়া। আমরাও মান্যি করে উনি যা দেন তাই নি। কিন্তু ওতে সংসারের সুসার হয় না কিছু, ওঁর মান রক্ষেটা হয়।' গয়লানী নাপিতানী লোকেরাই মামীমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাহাদের সহিতই তিনি প্রাণের কথা কহিতেন। মামীমার আর একটি ছেলে এবং আর একটি মেয়ে হইয়াছিল। খোকন আর নন্‌তি। খোকনের ভালো নাম সুনীল, নন্‌তির ভালো নাম কুসুম। ইহারাও আমাদের খুব প্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু মামীমা ক্রমশঃ যেন আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। ইহার একটা কারণ বোধহয় সুধীর ক্লাস-প্রমোশন পাইতেছিল না। মামীমার ধারণা হইয়াছিল আমরা বাড়িতে আছি বলিয়া সুধীরের লেখাপড়ায় অসুবিধা হইতেছে। আমরা না থাকিলে সুধীরের জন্য তিনি আলাদা প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা থাকিতে সুধীরের জন্য আলাদা টিউটার নিযুক্ত করা দৃষ্টিকটু। নকুলের নানারকম দৌরাত্ম্যও তাঁহার অশান্তির কারণ হইয়াছিল। নকুলের দুষ্কৃতি তিনি প্রথম প্রথম গোপন করিতে চাহিতেন, কিন্তু শেষে আর গোপন করা সম্ভব ছিল না। নকুল বাড়ির বাহিরেও নানারকম দুষ্টামি করিত। মামার অনেক ব্যাপারীরা ভাত রাঁধিয়া খাইতেন। নকুল দূর হইতে ঢিল ফেলিয়া তাঁহাদের ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি ভাঙিয়া ছুটিয়া পলাইত। ইহাতে বিশেষ একটা আনন্দ পাইত সে। একদিন ধরা পড়িয়া মামার হাতে খুব মার খাইল। বাড়িতে একটা অশান্তির ঝড় বহিয়া গেল। মামীমা সমস্ত দিন কান্নাকাটি করিলেন। কিন্তু ইহার শেষ ফল ভুগিতে হইল আমাকে এবং চন্দরকে। মামীমা আমাদের উপর আরও চটিয়া গেলেন। তাঁহার কথার ঝাঁজে এবং অগ্নিদৃষ্টির ঝলকে আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

এই সব অশান্তির মধ্যেই আমাকে মাইনর পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। আশা করিতে পারি নাই যে পাস করিয়া যাইব। কিন্তু ভগবানের দয়ায় পাস করিয়া গেলাম। আমাদের মধ্যে খোঁড়া অশ্বিনীর ফল সর্বাপেক্ষা ভালো হইয়াছিল। জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিল সে। অশ্বিনীর বাবা নৃসিংহবাবু রেলে বড় চাকুরি করিতেন, অনেক বাঙালী ছেলের চাকুরি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিল। অশ্বিনীর পাসের খবর বাহির হইবার পর সমস্ত শহরেই একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের বাড়িতে উৎসবের আয়োজন হইল। অশ্বিনী আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি লজ্জায় আর যাই নাই।

শুনিলাম অশ্বিনী কলিকাতায় পড়িতে যাইবে, হেয়ার স্কুলে ভরতি হইবে, নৃসিংহবাবু তাহার জন্য নাকি সাহেব মাস্টার রাখিয়া দিবেন। অশ্বিনী ভালো ছেলে, তাহার বাবা বড়লোক, মনে হইল যাহা ঘটিতেছে তাহা ঘটাই স্বাভাবিক এবং উচিত। তবু আমার কেমন যেন হিংসা হইতে লাগিল। অশ্বিনীর সৌভাগ্যে একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম! মামার নুনের গোলায় বসিয়া হিসাবের খাতা লিখিতে হইবে আমার এই সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যেন আসন্ন মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার মতো আমার মনের দিগন্তকে অন্ধকার করিয়া রাখিল। বার বার মনে হইতে লাগিল ইহা ছাড়া উপায়ই বা কি আছে। আমরা যে গরীব, নিতান্ত গরীব। আমরা যে গরীব এই কথাটাই একটা বেদনার মতো সমস্ত সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। অশ্বিনীর বাড়িতে আমাদের বাড়ির সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমি আমাদের বাড়ির পিছনকার সরু গলিটা দিয়া অন্ধকারে বাবার বাসার দিকে চলিয়াছিলাম। বাবা এবং বিষুণপ্রসাদ এই সময়ে সেতার বাজাইতেন! আমার মতলব ছিল বাবার ঘরের পাশের ঘরে বিষুণপ্রসাদের যে বিছানাটা আছে তাহাতেই গিয়া লুকাইয়া থাকিব। এই সময় বাবা বিষুণপ্রসাদকে সেতার শিখাইতেন। আমি আস্তে আস্তে গিয়া উঠানে উপস্থিত হইলাম। পাশের ঘরে বাজনা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। বাবা বাজাইতেছিলেন, বিষুণপ্রসাদ সঙ্গত করিতেছিলেন। আমি আস্তে আস্তে ঢুকিয়া বিষুণপ্রসাদের বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে হইল আমি যেন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, যে রাজ্যে হিংসা, মলিনতা, দারিদ্র্য কিছুই নাই, আছে কেবল সুর আর ছন্দ যাহা ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকেই আনন্দিত করে। সুরের পরিবেশে আমার মনের গ্লানি ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না। বিষুণপ্রসাাদর ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি গান-বাজনা থামিয়া গিয়াছে।

"ও সুরজুবাবু, চলো চলো। ওস্তাদজি তোমাকে ডাকছেন।"

পাশের ঘরে বাবা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে এসে শুয়েছ যে"

আমি কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

"কি হয়েছে বল না"

"আমার আজ অশ্বিনীদের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু আমি সেখানে যাই নি, তাই এখানে এসে শুয়েছি। ও বাড়িতে শুলে দিদিমা জোর করে পাঠিয়ে দিতেন"

"অশ্বিনী তো তোমার বন্ধু, গেলে না কেন"

আমি আনতনয়নে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আমার বড় লজ্জা করছিল। অশ্বিনী ভালো করে পাস করেছে, কলকাতায় পড়তে যাবে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে যাব"

"তুমিও তো পাস করেছ। তোমার লজ্জা পাবার কি আছে? এবার তুমি কি করবে ঠিক হয়েছে কি?"

"মামা বলছেন গোলার খাতা লিখতে—"

আমার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল, চোখেও বোধহয় জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

"গোলার খাতা লিখবে কেন। তুমিও পড়বে"

"মামা বলছেন আমাকে আর পড়াবেন না"

"আমি পড়াব। বিষুণ, পারব না?"

"খুব পারব। আপনার পাসবুকে পাঁচশ পঁচিশ টাকা জমিয়ে রেখেছি আমি"

বিষুণপ্রসাদের এই উক্তি শুনিয়া বাবাও একটু অবাক হইয়া গেলেন। আমার বিস্ময় তো সীমা ছাড়াইয়া গেল। সেকালে পাঁচশ পঁচিশ টাকা যে অনেক টাকা! বাবার কাছে এত টাকা সঞ্চিত আছে ইহা যে কল্পনাতীত।

বাবা বলিলেন, "এত টাকা তুমি কোথায় পেলে বিষুণ?"

"আপনার শাগরেদ-শিষ্যরা মাঝে মাঝে যে টাকা আপনাকে প্রণামী পাঠায় সে টাকা তো সবই জমে। আমি আপনাকে সে কথা জানাইও না, তার থেকে একটি পয়সা খরচও করি না, চুপচাপ পোস্টাফিসে জমিয়ে রাখি—"

"তার থেকে কিচ্ছু খরচ কর না? আমার সংসার চলে কি করে' তাহলে—"

বিষুণপ্রসাদ এই প্রশ্নটির জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত তাহার পর বলিল, "আপনি মাইনে পেয়ে সব টাকাই তো আমার কাছে দিয়ে দেন। তার থেকে যে টাকা আপনি নানীকে (দিদিমাকে) দিয়ে আসেন, তাই খরচ হয়। বাকিটাও আমি পোস্টাফিসে জমিয়ে রাখি—"

"কি মুশকিল, আমার সংসার চলে কি করে? বাজারে ধার জমাচ্ছ নাকি"

"না। বাজারে এক ছিদাম ধার নেই। আপনি যদি অভয় দেন সব কথা খুলে বলি। আমার কিছু ক্ষেতি গিরস্তি আছে। আমার জমিতে ভালো বাসমতী ধান হয়। সেই ধান থেকেই আমাদের চাল হয়। বছরে একশ মণ। আমি সেই চাল আপনার জন্যে নিয়ে আসি। আপনি তো মাত্র একবেলা খান। বছরে তিন চার মণ চাল হলেই যথেষ্ট। আমি গুরুদছ্ছিনা (দক্ষিণা) হিসাবে পাঁচ মণ চাল আপনার জন্যে আলাদা করে রাখি। আপনি যদি রাগ করেন এই ভয়ে কিছু বলি নি। অযোধ্যাবাবুর মন্দির থেকে আপনার সেবার জন্যে মহাপ্রসাদ আর 'কারণ' আসে। ওর জন্যে এক পয়সা খবচ হয় না আর সবজি তো এই বাড়ির আংনাতেই (উঠোনে) যা হয় তাই যথেষ্ট। আমার বাড়ি থেকে ঘি-ও আমি আপনার জন্যে নিয়ে আসি—"

বাবা মাথা হেঁট করিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোমার পোষ্য হয়ে থাকতে চাই না বিষুণপ্রসাদ। তোমার চালের আর ঘিয়ের দাম তুমি ওই জমানো টাকা থেকে কেটে নাও"

"আপনি যা হুকুম করবেন তাই হবে। কিন্তু আপনি যে আমাকে এত মেহনত করে সেতার শেখাচ্ছেন, তার একটা—"

"আমি বিদ্যা বিক্রয় করি না"

"না, আমি দাম দিচ্ছি না। আমি জানি ওর দাম দেওয়া যায় না। সে তাগতও আমার নেই। আমি কিছু দছ্ছিনা দিতে চাই শুধু—"

"তোমার শিক্ষা শেষ হলে দক্ষিণা দিও। এখনও তো তুমি কিছুই শেখনি। এর মধ্যেই দক্ষিণার কথা ভাবছ কেন। আচ্ছা কে কে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছে তাদের নাম কি মনে আছে তোমার? মনি-অর্ডার তুমিই সই করে নিতে"

"জি হাঁ। ফর দিয়ে সই করতাম। পিওন আমাকে চেনে। চুপ্‌সে সই করে চুপ্‌সে পোস্টাফিসে দিয়ে আসতাম নামগুলো আমি টুকে রেখেছি—"

বিষুণপ্রসাদ পাশের ঘরে গিয়ে ছোট একটি হিসাবের খাতার মতো খেরো-বাঁধানো খাতা লইয়া আসিল। তাহা খুলিয়া অনেকগুলি নাম পড়িল। কয়েকটা নাম আমার এখনও মনে আছে। হীরা বাঈ, শিউলাল, শ্যাম দুবে, নুরুদ্দিন, কুসুমকুমারী, শাহী খাতুন....

বাবা বিস্মিত হইলেন।

"নুরুদ্দিন? কাশ্মীরের নুরুদ্দিন? তাকে তো আমি গান শেখাই নি। সে আমার দোস্ত—"

"তিনি এখানে মাঝে মাঝে শাল বিক্রি করতে আসেন। কিছু দিন আগে এসেছিলেন একদিনের জন্য। সেদিন আপনি মুঙ্গেরে গিয়েছিলেন সংগীত-বৈঠকে। আমি তাঁর কাছ থেকে শাল কিনেছি একটা। কথায় কথায় আপনার কথা উঠে পড়ল। তিনি আপনার কথা শুনে বললেন— কিদারবাবু! উয়হ্ তো ফকীর হ্যাঁয়, শাহান্সা ভি হ্যাঁয়। তারপর আপনি নাকি পাহাড়ে ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। বলে গেছেন আবার এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন একদিন। মাস দুই আগে পঁচিশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—"

বাবা ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া সবিস্ময়ে বিষুণপ্রসাদের কথা শুনিতে ছিলেন।

"তুমি তো এসব কথা কিছুই বল নি এতদিন"

"ভয় ছিল, যদি আপনি ফিরিয়ে দেন। তাই চুপ্‌সে ফর দিয়ে সই করে চুপ্‌সে পাসবুকে জমা করে দিতাম"

বাবার চোখের দৃষ্টি হাস্যদীপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি বলিলেন, 'অন্যায় করেছ তুমি। ওরা আমার ঠিকানাই বা জানলে কি করে'!"

"আপনার কাছে তো অনেকে আসে। অনেকদিন আগে সেই যে এক আওরাৎ এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে, তার কাছে অনেকে হয়তো শুনেছে। বেশী মনি-অর্ডার লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী থেকেই এসেছে"

বাবা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমি কারও দান বা অনুগ্রহ কখনও নেব না ভেবেছিলাম। মা আমার সে অহংকার চূর্ণ করে দিলেন। কোনও অহংকারই শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। মা টিঁকতে দেন না।"

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। কাল সকালে গিয়ে অশ্বিনীর কাছে খোঁজ নাও, সে কোন্ স্কুলে ভরতি হবে। তোমাকেও সেই স্কুলে ভরতি করে দেব—"

আমি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সত্যই মনে হইতেছিল ইহা স্বপ্ন না সত্য।

.....আমি যখন বাড়িতে ফিরিয়া গেলাম তখনও দিদিমা জাগিয়া ছিলেন। অশ্বিনীর বাড়ি হইতে চন্দর, নকুল, সুধীর ফিরিয়া আসিয়াছিল। দিদিমা তাহাদের মুখে খবর পাইয়াছিলেন আমি সেখানে যাই নাই। দিদিমার আশঙ্কা হইয়াছিল আমি হয়তো মন্মথর সঙ্গে সংগীত সমাজে গিয়া জুটিয়াছি। সংগীতসমাজে গান-বাজনা, থিয়েটার রিহার্সাল এবং তাস খেলা হইত। শহরের বখা ছেলেদের আড্ডা বলিয়া সংগীতসমাজের বদনাম ছিল। নকুলই মিথ্যা করিয়া দিদিমার কাছে লাগাইয়াছিল যে আমি সংগীতসমাজে গিয়াছি। দিদিমাকে অনর্থক ভাবাইয়া নকুল ভারী আনন্দ পাইত। আর একদিন চন্দরের বাড়ি ফিরিতে দেরি হইতেছিল, তাহাকে গিরীন মাস্টার স্কুলে বসাইয়া অঙ্ক কষাইতেছিলেন, নকুল বাড়ি আসিয়া রটাইয়া দিল

চন্দর কুয়ায় পড়িয়া গিয়াছে। একটু পরেই চন্দর বাড়ি ফিরিল তখন নকুল বলিল একটা কুলির মুখে সে কুয়ায় পড়ার কথাটা শুনিয়াছিল।

দিদিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোথা ছিলি এতক্ষণ? অশ্বিনীদের বাড়ি যাস নি?" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "সংগীতসমাজে গিয়েছিলি নাকি? তোর মামা শুনলে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করবে—"

"আমি বাবার বাসায় ছিলাম। বিযুণপ্রসাদের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম"

"নকুলটা আচ্ছা পাজি তো। তুই ওখানে শুয়ে ঘুমুতেই বা গেলি কেন। শরীর ভাল আছে তো। সরে' আয় এদিকে—"

দিদিমা আমার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন।

"গা-টা একটু ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে—"

দিদিমা যখনই আমার বা চন্দরের গায়ে হাত দিতেন, তখনই তাঁহার মনে হইত গা-টা ছ্যাঁকছ্যাঁক করিতেছে।

কপাল হইতে দিদিমার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "না, আমার কিচ্ছু হয় নি"—তাহার পর সহসা তাঁহার গলা জড়াইয়া আবদারের সুরে বলিলাম, "দিদিমা আমিও অশ্বিনীর মতো কোলকাতায় পড়তে যাব। নুনের গোলায় খাতা আমি লিখব না।"

নুনের গোলায় খাতা লিখিবার কথাটা দিদিমাও শুনিয়াছিলেন। তাঁহার ভালো লাগে নাই। কিন্তু ইহাও তিনি জানিতেন মামা আমাকে টাকা খরচ করিয়া কোলকাতায় পড়িতে পাঠাইবেন না। হয়তো তাহা তখন তাঁহার সামর্থ্যেই কুলাইত না। তিনি রোজগার ভালোই করিতেন, কিন্তু তাঁহার খরচও অনেক ছিল। মামা, আত্মীয়—প্রতিপালক ছিলেন, বাহিরের অনেক দরিদ্র অনাত্মীয়কেও খাইতে দিতেন। তাই তাঁহার সঞ্চয় বেশী হইত না। নুনের গোলাতেও অনেক টাকা আটকাইয়া থাকিত। দিদিমা একথা জানিতেন।

"শক্তি কি তোর কোলকাতায় খরচ চালাতে পারবে? ওর তো কিছুই বাঁচে না"

"বাবা আমার খরচ দেবেন বলেছেন"

দিদিমা আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলেছে নাকি! কিন্তু ওই বা টাকা পাবে কোথায়"

আমি তখন সব কথা খুলিয়া বলিলাম।

কাসির শব্দ শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল একটি বৃদ্ধ কিছুদূরে উবু হইয়া বসিয়া আছে। গায়ের রং ঘোর কালো, মাথার চুল ধপধপে শাদা। দেখিলেই মনে হয় লোকটি এককালে খুব শক্তিমান ছিল। কুমার শনিচরাকে চিনিতে পারিল। কয়েকদিন আগে সে বাবার অসুখের খবর লইতে আসিয়াছিল। শনিচরা বহুকাল আগে সূর্যসুন্দরের ঘোড়ার সহিস ছিল। সে জাতিতে সাঁওতাল এবং এই অঞ্চলেই কোথাও চাষবাস করে। হীরু মহলদারের বিলে জাল পড়িলেই আসিয়া হাজির হয় সে। খাজনা আদায় করিতে আসে। এই অঞ্চলটাই পূর্বে নাকি সাঁওতালদের রাজত্ব ছিল। সাঁওতালদের রাজার নাম ছিল তিল্‌কা মাঝি এবং রানীর নাম ছিল টিক্‌রি মেঝেন। নবাবী আমলে সাঁওতালদের সহিত নবাবীফৌজের নাকি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে টিক্‌রি মেঝেন নাকি ভল্ল হস্তে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে অনেক শত্রু নিধন করিয়া অবশেষে নিজেও

নিহত হয়। তাহারই স্মৃতিরক্ষার জন্য সাঁওতালরা এই বিরাট পুষ্করিণী নিজেরাই খনন করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল টিক্‌রি তালাও। ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। টিক্‌রি তালাও নাম পরিবর্তিত হইয়া টিক্‌রি বিল নামে পরিচিত হইল। তাহার পর মোতি মহলদার যখন ইহার ইজারা লইলেন তখন নামটা একেবারে বদলাইয়া গেল। টিক্‌রি মেঝেনের নামটাও আর রহিল না। ইহা লইয়া সাঁওতালেরা গোলমাল করিয়াছিল, মকদ্দমাও হইয়াছিল। কিন্তু সাঁওতালরা মকদ্দমায় জিতিতে পারে নাই। আন্দোলন চলিতে লাগিল। মোতি মহলদার তখন একটা আপোষ করিলেন। তিনি বলিলেন সাঁওতালরা যদি আন্দোলন বন্ধ করে তাহা হইলে তিনি মাছ ধরা হইলেই প্রতিবার সাঁওতাল সর্দারকে কিছু মাছ উপহার দিবেন। প্রথম জালে যত মাছ উঠিবে সবটাই সাঁওতাল সর্দারের প্রাপ্য হইবে। সাঁওতালরা ইহাতে রাজী হইল। প্রতিবার তাহারা প্রায় এক মণ দেড় মণ মাছ পাইত এবং তাহা লইয়া বনভোজন করিত। ইহার নাম তাহারা দিয়াছিল টিক্‌রি পরব। মোতি বিলের এই মাছ পাওয়াটাকে তাহারা 'খাজনা' বলিয়া গণ্য করিত। সর্দার শনিচরা এই খাজনা লইতে আসিয়াছিল।

শনিচরা আবার জিজ্ঞাসা করিল ডাক্তারবাবু কেমন আছেন। ভালো আছেন শুনিয়া খুব খুশী হইল এবং কুমারকে বলিল, 'তাহলে তুই আমাদের টিক্‌রি পরবে আয় না কেনে''

কুমার উত্তর দিল, ''কাল যে আমাদের বাড়িতেও ভোজ। আমাদের বড়বৌমার সাধ দিচ্ছি আমরা। তুমিই বরং এস আমাদের বাড়িতে। বাবা খুব খুশী হবেন তাহলে''

শনিচরা স্মিতমুখে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কালই ডাক্তারবাবুর বড় নাতবৌয়ের সাধ? আর সে যাইতে পারিবে না? তা কি কখনও হয়! অথচ— ।

হঠাৎ সমস্যাটার সমাধান করিয়া ফেলিল সে।

''আমাদের টিক্‌রি পরব কাল তুদের বাড়িতেই করব আমরা। সবাইকে নিয়ে যাব। তুদের বাড়ির সামনের মাঠে আমাদের পরব হবে। মেয়েরা নাচবে, আমরা মাদল বাজাব, শোনু গনু বাঁশি বাজাবে—''

কুমার এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

''সে তো চমৎকার হবে। কিন্তু তোদের পরব আমাদেব বাড়িতে কবলে কেউ কিছু বলবে না তো—''

''আমি সরদার। আমি যেখানে পরবের জায়গা ঠিক করব সেইখানেই পরব হবে। কেউ আপত্তি করবে না। ডাক্তারবাবুকে সবাই ভালবাসে যে। উ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, জানিস?''

কুমার জানিত না।

''তোর তখন জনম হয় নি''

ইহার পর শনিচরা যে গল্পটি বলিল তাহা অদ্ভুত। সূর্যসুন্দর একবার নাকি ঘোড়ায় চড়িয়া রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন মাঠের মধ্যে ভিড় দেখিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন। একটু আগেই একটা বুনো শুয়োর শনিচরার পেট চিরিয়া দিয়াছিল। পেটের সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। শনিচরার জ্ঞান ছিল। কেহ আশা করে নাই যে সে বাঁচিবে। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নাড়ি দেখিলেন। বলিলেন, বাঁচতেও পারে। গ্রাম হইতে ডুলি যোগাড় করিয়া তিনি শনিচরাকে হাসপাতালে লইয়া গেলেন। নাড়ি-ভুড়ি পেটে ঢুকাইয়া পেট সেলাই করিয়া দিলেন। শনিচরা বাঁচিয়া গেল। তাহার পেটে দাগটা এখনও আছে। শনিচরা

সেটা কুমারকে দেখাইল। প্রকাণ্ড দাগ—সমস্ত পেটটা জুড়িয়া। এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

শনিচরা হাসিয়া বলিল, আমি "ডাক্তারবাবুকে এক পয়সা ফিস দিই নি। প্রাণের দাম কি টাকায় শোধ হয়? আমি তুদের বাড়ি এক বছর সহিস হ'য়ে ছিলাম। কোন মাইনে নিই নি। ডাক্তারবাবু যেখানে যেখানে ঘোড়ায় করে যেত আম্মিও সঙ্গে থাকতাম। ই চত্বরের সব জায়গা ঘুরেছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। তুদের তখন জনম হয় নি"

কুমার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়ার সঙ্গে যেতে? ছুটতে ছুটতে?"

"হঁ গো! ছুটতে ছুটতে। সব সময় ছুটতম না। ঘোড়া আস্তে আস্তেও চলত। অনেক সময় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে হত। একবার একটা বাঘের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম"

"বাঘের মুখে!"

"হঁ গো! রেতের বেলা। ডাক্তারবাবু যাচ্ছিল হাঁসুয়ায়। মাঝে ছিল টালের জঙ্গলটা। এখন সেটা আর নাই, সব সাফ করে দিয়েছে। তখন বড় জঙ্গল ছিল। আমরা যাচ্ছিলাম বিছু মোড়লের বাড়ি। তার বিটির পেটে ছেলা আটকে গিয়েছিল। সাত দিন কুঁথাকুঁথি করেও যখন বেরল না, তখন ডাক পড়ল ডাক্তারবাবুর। ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল, আমি পেছনে ছিলাম ওষুধের বাক্স মাথায় নিয়ে। টাল জঙ্গলে ঢুকে কিছুদূরে গিয়ে ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে গেল। কিছুতেই আর আগাতে চায় না। তখন ডাক্তারবাবু বললে, শনিচরা তু দেখত, সামনে কি আছে। ঘোড়াটা আগাতে চাইছে না কেন। জঙ্গলের সরু রাস্তা। চারদিকে বড় বড় গাছগাছালি। সঙ্গে আমার শালাই (দিয়াশালাই) ছিল। আমি ওষুধের বাক্সটা নামায়ে শুকনা খড় আর ডালপালা দিয়ে একটা মশালের মতো বানালাম। তারপর সেটাতে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি একটা বকনা গরু মরে পড়ে আছে, তার নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আর ঘাড়টা মটকানো। বুঝলাম বাঘে মেরেছে। কাছেই নিশ্চয় বাঘটা লুকিয়ে আছে কোথাও। মানুষের সাড়া পেয়ে ঝোপে-ঝাপে গা ঢাকা দিয়েছে। ভয়ে আমার পায়ে কাঁপুনি লেগেছে তখন। ডাক্তারকে সব বললাম এসে। ডাক্তার বললে—আমাকে বিছু মোড়লের বাড়ি যেতেই হবে। ঘোড়াটা কিছুতেই এগোল না। তখন ডাক্তার নেমেই পড়ল ঘোড়া থেকে। বললে, ঘোড়া যখন যাবে না, তখন এখানেই থাক। তুই ওষুধের বাক্সটা নিয়ে চল আমার সঙ্গে। আমার তখন কাঁপুনি লেগেছে। বললাম, বাঘের মুখে আমি যেতে লারব। ডাক্তার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে। তারপর বললে, তুই আচ্ছা ভীতু তো। আমাকে কিন্তু যেতেই হবে। তুই তাহলে ঘোড়াটা নিয়ে ফিরে যা, কিম্বা জঙ্গলের বাইরে গিয়ে থাক কোথাও। আমি একাই যাই। বিছু মোড়লের ঘোড়াতেই আমি ফিরব। ওষুধের বাক্স থেকে কয়েকটা ওষুধ আর যন্ত্রপাতি বের করে নিয়ে মশালটা হাতে করে একাই এগিয়ে গেল বাঘের মুখে। সেই রাতে গিয়ে বিছু মোড়লের বিটির পেট থেকে বার করলে ছেলাকে। সে ছেলা কে জান—ওই জগো পালোয়ান গো—লাঠি খেলায় ওস্তাদ"

শনিচরা সহসা চুপ করিয়া গেল। ভাবাবেগের আতিশয্যে সম্ভবতঃ সে আর কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার উদ্ভাসিত চোখ-মুখ যাহা প্রকাশ করিল তাহা সে কথা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হঁ, ডাক্তার একটা বীর লোক বটে।" এটুকু বলিয়া তাহার

যেন তৃপ্তি হইল না। মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আবার বলিল, "বীর লোক, মানী লোক, দাতা লোক। অনেক লোকের প্রাণ বাঁচাইছে। অনেক লোককে ভাত খাওয়াইছে"

শনিচরা হয়তো আরও কিছু বলিত কিন্তু তাহার দৃষ্টি সহসা জলকরের দিকে আকৃষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল সে। কুমার দেখিল, বড় বড় মাছ জল হইতে লাফাইয়া অনেক দূর পর্যন্ত উঠিতেছে। বড় বড় রুই, শোল, চিতল। মনে হইল আকাশ হইতে মাছ-বর্ষণ হইতেছে বুঝি। অদ্ভুত দৃশ্য। শনিচরা বলিল, "আমার ভাগের মাছগুলো তুই নিয়ে যা। আমরা তুর বাড়িতে গিয়েই ভোজ খাব"

ঠিক এই সময়ে আর একটা কাণ্ড ঘটিল। একটা খোক্‌না ছোঁ মারিয়া শূন্য হইতেই একটা ছোট মাছ লইয়া পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় 'খোক্‌নাটা'টাও তাড়া করিল তাহাকে। ইহা দেখিয়া শনিচরাও লাফাইয়া উঠিল। হা রে রে রে রে হা রে রে রে রে চীৎকার করিতে করিতে বিলের ধার দিয়া ছুটিল সে। পলিতকেশ শনিচরার এই বালকসুলভ আচরণে কুমারও উত্তেজিত হইয়া বন্দুকটা তুলিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—আমরা তো এখান হইতে মণ মণ মাছ লইয়া যাইব, ও বেচারার মুখের গ্রাসটুকু কাড়িবার দরকার কি। তাছাড়া, কাড়িতে পারিব কি? দেখিতে দেখিতে 'খোক্‌না'টা দূরে মিলাইয়া গেল। শনিচরার বন্যপ্রকৃতি কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হইল না, সে উর্ধ্বমুখে চীৎকার করিতে করিতে 'খোক্‌না'টার পিছু পিছু মাঠ ভাঙিয়া ছুটিতে লাগিল। যে লোক একটু আগে তাহার প্রাপ্য সমস্ত মাছ কুমারকে দান করিয়া গিয়াছে সামান্য একটা ছোট মাছের জন্য তাহার এ কি কাণ্ড। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া মাঠামাঠি ছুটিতেছে! আশ্চর্য মানুষের স্বভাব।....সহসা কুমারের মনে পড়িল ছোটদি আমবাগানে সভা করিতেছে, চামরুর বউকে লইয়া যাইতে হইবে।

।। উনিশ।।

পুকুরের ধারে সদানন্দ একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কুমার তাঁহার জন্য পুকুরপাবে যে ব্যবস্থাটা করিয়াছিল তাহা প্রায় রাজকীয়। পুকুরের ভিতর পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মের মতো একটি বাঁশের মাচা পূর্ব হইতেই ছিল। কুমার তাহার উপর পাতিয়া দিয়াছিল বেশ ভালো একটি বিছানা এবং বিছানার উপর দামী একটি সুজনী। ঠেস দিবার জন্য ছিল তিনটি তাকিয়া পিছনে এবং দুইটি দুই পাশে। মাথার উপর ছায়া করিবার জন্য একটি খড়ের ছাউনিও করিয়াছিল। যদিও সদানন্দ সিগারেটই খান এবং যে ব্রাণ্ডের খান তাহা প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে আনিয়াছেন, এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ধূমপানের জন্য কুমার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিল তাহা সদানন্দের অতি মনোরম লাগিল। একট গড়গড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল সে। গড়গড়াটা স্বর্গীয় মামাবাবুর। গুদামঘরের এক কোণে এতদিন অবহেলিত হইয়া পড়িয়া ছিল। কুমার সেটিকে বাহির করিয়া মাজাইয়াছে। ভালো জরির কাজ করা একটি নল এবং উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাকও সে কাল শহর হইতে আনাইয়াছে। একটা ছোঁড়া চাকর সদানন্দের ফরমাশমতো তামাক সাজিয়া দিতেছে। সদানন্দ বড় খুশী। ছোঁড়া চাকরটা বঁড়শিতে কেঁচোও গাঁথিয়া দিতেছিল। প্রকাণ্ড একটা ছিপ ফেলিয়া সদানন্দ ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু

তাহার মনোযোগ বার বার ক্ষুণ্ণ করিতেছিল কয়েকটা পাখী। পুকুরপাড়ের ঝোপে টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া একটা ছটফটে ছোট পাখী লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছিল। শিমূলগাছের মাথায় একটা নীলকণ্ঠ ধীরে ধীরে পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া শব্দ করিতেছিল—ড্যা, ড্যা ড্যা। সুমিষ্ট সূক্ষ্মকণ্ঠে টি-টি-টিঁই, টি-টি-টিঁই করিতে করিতে একদল তালচোঁচ উড়িতেছিল মাথার উপর। কুলগাছের ডালে ডালে কয়েকটা বুলবুল বার বার বলিতেছিল—কৃষ্ট প্রিয়। সদানন্দ ফাতনার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিতেছিল না। বার বার তাঁহাকে চোখ তুলিয়া চাহিতে হইতেছিল। চাহিলেই চোখে পড়িতেছিলেন নির্মল নীল আকাশের খানিকটা। আরও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। জীবু শিবু আসিয়াছিল তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য। কিন্তু তাহাদের তিনি কাছে থাকিতে দেন নাই। একাই তাঁহার খুব ভাল লাগিতেছিল। তাঁহার নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়িতেছিল। বৈঁচির নিকট এক গ্রামে তাঁহার মামার বাড়ি। সেখানেও একটা তালপুকুর ছিল, মাছ ধরিবার ব্যবস্থা ছিল। সদানন্দ খুব ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়িতে যাইতেন সেখানে মাছ ধরিতেন। তাঁহার সঙ্গী ছিল গোবিন্দ। হঠাৎ আর একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। গোবিন্দর সঙ্গে আসিত তাহার ছোট বোন প্রমীলা। সাত আট বছরের ফুটফুটে মেয়ে। মাথার চুল বেড়া-বিনুনি করা। ঘন কালো চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যাশাভরা হাসির ছটা। সদানন্দ যখন মাছ ধরিতেন প্রমীলা তখন মাঝে মাঝে তাঁহাকে খাবার দিয়া যাইত। কখনও বেগনী, মোরব্বা, কখনও বা দুটো কুল বা পেয়ারা। বলিত, মা পাঠিয়ে দিয়েছে। পরে কিন্তু সদানন্দ জানিয়াছিলেন প্রমীলা সেগুলি নিজেই আনিত, লুকাইয়া চুরি করিয়া আনিত। কারণ ছিল। প্রমীলার সহিত সদানন্দের বিবাহের কথাবার্তা উঠিয়াছিল। কিন্তু ওই কথাবার্তা পর্যন্তই, সদানন্দের বাবা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ....হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সদানন্দ চোখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন পুকুরের ওপারে উশনা এবং আর একটি লম্বা লোক দাঁড়াইয়া আছেন। লোকটিকে সদানন্দ চিনিতে পারিলেন না। চিনিবার কথাও নয়। লছমন পাঠক এই গ্রামেরই লোক, জমিদারী সেরেস্তায় আমিনের কাজ করেন। উশনার সহপাঠী ছিলেন। উশনা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পৈত্রিক সম্পত্তি পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে—আমি তো বরাবর বিদেশেই থাকি, বাবার জমি কোথায় কি আছে, কিছু জানি না, এবার যখন এসে পড়েছি তখন ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। চক্ষুলজ্জাবশতঃই বোধহয় কুমারকে তিনি কথাটা বলিতে পারেন নাই। তাছাড়া বাড়িতে ভোজকাজের হাঙ্গামায় কুমারের অবসরও নাই। তাই তিনি খুঁজিয়া লছমন পাঠককে বাহির করিয়াছেন। সে আমিন, সে সব জানে।

"ও এইখানে কুমার পুকুরটা করিয়েছে বুঝি—"

"হাঁ—"

দুইজনে মিলিয়া পুকুরটা পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গড়গড়াটার জন্য সদানন্দের অস্বস্তি হইতে লাগিল। ফাতনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকাটাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন তিনি। তাঁহাতে দেখিয়া উশনা এবং লছমন পাঠক নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহারা বেশীক্ষণ রহিলেনও না। যাইবার সময় উশনা শুধু একবার ভ্রূ নাচাইয়া স্মিতমুখে বলিয়া গেলেন, "কি ভাই মাছ ধরা হচ্ছে, বেশ বেশ।"

উত্তরে সদানন্দ একটু মুচকি হাসিলেন শুধু। তাঁহারা যখন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলেন

তখন গড়গড়ায় একটি সুদীর্ঘ টান দিলেন তিনি। নাক মুখ দিয়া প্রচুর সুগন্ধি ধূম ছাড়িয়া আবার ফাতনার দিকে চাহিলেন। ফাতনাটা নড়িতেছে! যথারীতি হ্যাঁচকা টান মারিয়া তুলিয়া ফেলিলেন ছিপটা। মাছ উঠিল না। সদানন্দ দেখিলেন টোপটি খাইয়া মাছ সরিয়া পড়িয়াছে।

"ওরে—"

ছোঁড়া চাকরটা পাশের ঝোপে ফড়িং ধরিতেছিল। ডাক শুনিয়া আসিয়া হাজির হইল।

"বঁড়শিতে আর একটা কেঁচো লাগিয়ে দে। ভাল করে লাগাস। এবার খেয়ে পালিয়ে গেছে—"

অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গা আসিয়া হাজির। তাহার হাতে অ্যালুমিনিয়মের একটা ঢাকা কৌটা, কাঁধে থার্মোফ্লাস্ক ঝোলানো। পিছনে আর একজন চাকর—তাহার হাতে এক কুঁজা জল।

"জামাইবাবু, খাবার আর চা এনেছি"

"এ সময়ে খাবার আর চা!"

ঊষাদি চিঠিও দিয়েছেন—"

গঙ্গা ফতুয়ার পকেট হইতে চিঠিটি বাহির করিয়া দিল। ঊষা লিখিয়াছে—"খেতে অনেক বেলা হবে। তোমার জন্যে তাই চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলাম। খেয়ে নিয়ে গঙ্গার হাতে বাসনগুলো পাঠিয়ে দিও। বড় জামাইবাবু এখনও শিকার থেকে ফেরেন নি। দিদি তাঁর জন্যেও খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। মাছ ধরেছ নাকি একটাও? ধরে থাকলে গঙ্গার হাতে পাঠিয়ে দিও, খাবার সময় ভেজে দেব। টাটকা মাছ গরম গরম ভাজা তো তুমি ভালবাস। ওখানে বেশ মজা লাগছে নিশ্চয়। আমিও যেতুম, কিন্তু সন্ধ্যা আমাদের বাগানে এক সভার ফরকট্ তুলেছে। এক দুই তিন সেখানে আবৃত্তি করবে। তুমি সে সভায় এলে খুব ভালো হ'ত। কিন্তু সন্ধ্যা কোনও বয়স্ক পুরুষকে সে সভায় থাকতে দেবে না। জানই তো ওর মাথায় হরদমই নানরকম উদ্ভট বুদ্ধি গজায়। বৌদি নানারকম রান্নার আয়োজন করেছেন। চিড়ে আর মটরশুঁটি দিয়ে পোলাও হচ্ছে। রান্না বৌদি নিজেই করছেন। তুমি আর ঘণ্টাখানেক পরে চলে এস। তোমাকে তো আবার তেল দিয়ে দলাইমলাই করতে হবে। তাই বেশী দেরি কোরো না। বাবা বেশ ভালো আছেন। আজ যেন তাঁর ফুর্তি বেড়েছে। মাথায় জবাকুসুম মেখেছেন। তুমি খাবারটা খেয়ে নিয়ো। বেশী দিই নি, খান ছয়েক লুচি, আলুছেঁচকি আর আমলেট। খেয়ে নিও। আর দেখো, জলের খুব ধার ঘেঁষে বোসো না। পুকুরটায় অনেক জল।—ঊষা" ছোট একটা কাগজের আষ্ঠেপৃষ্ঠে ছোট ছোট অক্ষরে চিঠিখানা লিখিয়াছে। একজায়গায় একটু ফাঁক ছিল সেটাও 'পুনশ্চ' দিয়া ভরাইয়াছে। পুনশ্চ—গঙ্গাকে বলে দিও থার্মোফ্লাস্কটা যেন সাবধানে আনে। ভেঙে গেলে এখানে আর পাওয়া যাবে না।

গঙ্গার দিকে চোখ তুলিতেই সে বলিল, "আপনি এবার খেয়ে নিন জামাইবাবু। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—।"

সদানন্দ বলিলেন, "চা-টা খাবো। খাবারটা ওই ছোঁড়াটাকে দিয়ে দাও"

"ঊষাদি বলেছেন খেতে দেরি হবে"

"খিদে পায় নি। সকালে প্রচুর খেয়েছি যে"

ছোঁড়া চাকরটার কিন্তু বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। কোন্ সকালে বেচারা চারটি মুড়ি খাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে।

"লে রে তোরই মজা হ'ল--

গঙ্গা হাসিয়া খাবারের কৌটাটা তাহাকে দিয়া দিল। কৌটাটা লইয়া তৎক্ষণাৎ একটা ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল সে। কাহারও সামনে সে খাইতে পারে না।

গঙ্গা তাহাকে নির্দেশ দিল।

"খাবারটা খেয়ে কৌটোটা মেজে আনিস"

"আচ্ছো"

তাহার সব কথাই ওকারান্ত।

গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সদানন্দ নূতন টোপ লাগাইয়া আবার ছিপটি ফেলিয়া ফাতনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। নীলকণ্ঠ এবং বুলবুলি পাখী উড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঝোপের ভিতর সেই ছোট পাখীটি টিক্‌টিক্ করিয়া বেড়াইতেছিল তখনও। সদানন্দ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন আর একজনও তাঁহার মনের ভিতর ঘুরঘুর করিতেছে—সেই প্রমীলা। মাথায় বেড়া-বিনুনি-করা, চোখে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি।

।। কুড়ি।।

বাগানের মহিলা-সভায় জনসমাগম মন্দ হয় নাই। সবাই আসিয়াছিল, এমন কি চামরুব বউও। সন্ধ্যা তাহাকে একটি ফরসা শাড়ি পরাইয়া, তাহার মাথায় তেল দিয়া, চিরুনি দিয়া চুলের পরিপাটি করিয়া, তাহার সর্বাঙ্গ একটি লাল রঙের র‍্যাপার দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল, যাহাতে-সভানেত্রী হিসাবে তাহাকে বেমানান না দেখায়। সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে সন্ধ্যা একটি গাঁদা ফুলের মালাও তাহাকে পরাইয়া দিয়াছিল। চামরুর বউ প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে নাই। এত লোক কেন, এত হইচই কিসের, ডাক্তারবাবু ভালো আছেন তো! সে প্রথমে আসিয়াই সূর্যসুন্দরের ঘরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। মুখে কিছু বলে নাই। কিন্তু তাহার ঈষৎ-বিস্ফারিত ভয়-চকিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যে অনির্বচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছিল তাহার বক্তব্য কি। সে যেন বলিতেছিল—"তুমি এমনভাবে শুইয়া আছ? তোমার সোনার সংসার যে চারিদিকে উথলিয়া পড়িতেছে, চারিদিকে এত লোক, এত আনন্দ, তুমিই যে সকলের উৎস, তুমি শুইয়া আছ! তুমি বনস্পতি মহীরুহ, তোমার শাখায় কত পাখী বাসা বাঁধিয়াছে, কত ফুল ফুটিয়াছে, কত ফল ধরিয়াছে, আমার প্রবল প্রতাপ মালিক কত লোককে তুমি আশ্রয় দিয়াছ, কত প্রবল ঝড়কে তুমি তুচ্ছ করিয়াছ, আজ তুমি রোগশয্যায় শায়িত, উত্থানশক্তিরহিত।" এই সব কথাই তাহার মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে নাই। ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়াছিল শুধু। উর্মিলা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। বিশেষ লক্ষ্যও করে নাই। কারণ কত লোকই তো ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা পরিচয় করিয়া দিবার পর তবে বুঝিতে পারিল। তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বড় ভালো লাগিল তাহাকে। চামরুর বউয়ের রং কালো, মুখে একটি দাঁত নাই, চুল রুক্ষ, কাপড় ময়লা কিন্তু তাহার চোখ মুখ হইতে যে স্নেহ বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহা অনবদ্য। চামরুর বউ সূর্যসুন্দরের ঘরে দাঁড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার মাইজী! তাহার পর সেটিকেও

প্রণাম করিল। তাহার পর খোঁজ করিল—জংলীবাবু কোথা। বিরুবাবু সকাল হইতে অসহায়ের মতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আসন্ন ভোজের ব্যাপারে সবাই মাতিয়া উঠিয়াছিল, নিখিলবাবু চরকির মতো চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সহসা তিনি বিরুকে দেখিয়া বলিলেন, "বড়বাবু, তুমি একটা কাজ কর। ওদিকের ওই লম্বা ঘরটায় অনেক শালপাতা, কলাপাতা, মাটির খুরি, গেলাস এসে জমেছে। তুমি গোটা দুই কুলি নিয়ে ওগুলো ধুইয়ে আলাদা আলাদা করে রাখাও দিকি। ওই ঘরটার পেছন দিকে দুটো বড় বড় টবে জল ভরিয়ে রেখেছি। তুমি ওইখানেই চলে যাও একটা মোড়া নিয়ে। চামরুর বউ যখন বিরুর খোঁজ করিল তখন তিনি সেই লম্বা ঘরের ভিতর বসিয়া পাতা ধোওয়াইতেছিলেন। বিরুবাবু একটু নিস্পৃহ স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। ভিড় গোলমাল হৈ-হল্লা তেমন পছন্দ করেন না। পুঁথির জগতে নিজেকে লইয়া থাকিতে ভালবাসেন তিনি। বর্তমানের সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র ঔৎসুক্য বা কৌতুহল নাই। তিনি বাস করেন অতীতে। তাঁহার মতে অতীতে বাস করার একটা প্রধান সুবিধা এই যে সে-জীবনের ঝড়ঝাপটা ঝামেলা হইতে দূরে থাকিয়াও সে-জীবনের সমস্ত রূপ-রস-আনন্দ দুঃখ কষ্ট সব উপভোগ করা যায়, অনেকটা যেন থিয়েটার দেখার মতো। ইজিপটের ফারাওরা বাস করিতেন ভবিষ্যতে। তাহারা মনে করিতেন অনন্তকালের অসীমতার মধ্যে এ জীবনের সীমা কতটুকুই বা ভবিষ্যৎ জীবনের অধিকাংশ সময়ই তো কাটাইতে হইবে সেই অদৃশ্য মহাব্যাপ্তির মধ্যে যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি। তাই তাঁহারা সারাজীবন ধরিয়া নিজেদের কবরখানা নির্মাণ করাইতেন এবং মনে করিতেন ওইটাই জীবনেব প্রধান কাজ। ইতিহাসের ছাত্র বিরুবাবু বর্তমানের প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া অতীতের এইসব নাট্যলীলা উপভোগ করিতে ভালবাসেন। বর্তমানের মানব-মানবী, বর্তমানের সভ্যতা, বর্তমানের জীবন তাঁহার মনকে তেমন নাড়া দেয় না। তিনি মনে করেন যতটুকু দেখিতেছি তাহা সম্পূর্ণ চিত্র নয়, বিজ্ঞাপনের আড়ালে, ভণ্ডামির মুখোশের তলায়, বিভিন্ন পরিবেশের ক্ষণিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে সত্য কথাটা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, একমাত্র মৃত্যুই তাহাকে অনাবৃত করিয়া খাঁটি সতরূপে প্রকাশ করিতে পারে। মহাকালের নির্মম নিকষে যাচাই না হইলে কোনও যুগের বা মনুষ্যের সত্য মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। যাহা অনাবশ্যক, যাহা মূল্যহীন, যাহা মিথ্যা মহাকাল তাহাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল খাঁটি সোনাটুকু, কেবল আসল রত্নগুলি সে ইতিহাসের অক্ষয় ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া রাখে। বিরুবাবুর এরূপ মনোবৃত্তির আর একটা কারণও সম্ভবতঃ ছিল। বিরুবাবু কল্পনাবিলাসী। ইতিহাসের একটা যুগ বা চরিত্র লইয়া কল্পনার জাল বয়ন করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বর্তমান প্রত্যক্ষদর্শী, তাহার প্রত্যক্ষদর্শনও পরস্পরবিরোধী ঘটনার সংঘাতে আলোড়িত। সুতরাং রসটা ঠিক যেন জমে না, এরকম ধাক্কাধাক্কিতে জমা সম্ভবও নয়। তাই বিরুবাবু অতীতেই বাস করেন। তাঁহার প্রতিবেশী হেমবাবু অপেক্ষা হাম্মুরাবি তাঁহার নিকট বেশী সত্য। হাম্মুরাবির স্থির-চিত্র তাঁহাকে অনেক রকম কল্পনার খোরাক যোগায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে বিরুবাবু বর্তমানকেও একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বর্তমানে যে সত্যই তাঁহাকে বাস করিতে হয়! কিন্তু সে বর্তমানে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বাস করেন, তাঁহার মন পড়িয়া থাকে অতীতে যেখানে বর্তমানের রূপ অতীতের রসায়নে শাশ্বত মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

চামরুর বউ যখন খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি অপটুভাবে গোটাচারেক ফাঁকিবাজ কুলিকে কাজে প্রবৃত্ত করাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন।

"তুই বেটা এখানে—?"

বিরুবাবু যেন অকূলে কূল পাইলেন।

"এদের ধমকে একটু ঠিক করে' দে তো। এরা বড় ফাঁকি দিচ্ছে কাজে—"

চামরুর বউ কুলিদের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মতো গর্জন করিয়া উঠিল। 'ছেকাছিনি' ভাষায় বলিল, "কাজ না করিস তো দূর হ'য়ে যা। তোদের মতো নিমকহারাম কুত্তাদের এখানে থাকবার দরকার নেই। ম্যানেজার সায়েবকে তোদের কথা গিয়ে বলব? জুতো খাবার জন্য পিঠ সুড়সুড় করছে, না? ওই রকম করে গেলাস ধোবার ঢং? ওই রকম করে পাতা ধোয়?"

চামরুর বউ নিজেই পাতা ধুইতে বসিয়া গেল। বুড়ী চামরুর বউয়ের এই মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল কুলিগুলো। কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল তাহাদের।

"ওরাই করুক, তুই আর জল ঘাঁটিস নি। ঠাণ্ডা লেগে যাবে"

"লাগুক না। তোদের সেবা করতে করতে তোদের রেখে যেতে পারলেই তো বাঁচি এখন। ঠাণ্ডার কি পরোয়া করি—"

চামরুর বউ ফোকলা দাঁতে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া আঁচলে হাত মুছিতে লাগিল। তাহার পর বিরুর পাশে বসিয়া তাঁহার জুলফির কাছের কাঁচা-পাকা চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে সক্ষোভে বলিল, "তোর চুলও পেকে গেল? দাঁত ঠিক আছে তো"

"আছে—"

"তোদের জন্যে কিছু চূড়া আর মুড়ির লাড়ু এনেছি। খাস। ক্ষীর দিয়ে খাস, খুব ভালো লাগবে"

হন্তদন্ত হইয়া সন্ধ্যা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"দাদা তুমি আর ওকে আটকে রেখ না। আমাদের সভার সময় যে হ'য়ে গেল। একে এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, অনেক কাজ—"

"আমি তো আটকে রাখি নি। ও নিজেই এসেছে—"

"চল চল আর দেরি কোরো না"

চামরুর বউকে লইয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল।

সভায় ফরসা কাপড়-জামা পরা র‍্যাপার-গায়ে চামরুর বউকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাইতেছিল। সে একটি কথা বলে নাই। সে কেবল ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া হাসিমুখে ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার ইহাও মনে হইতেছিল, ইহা সত্য না স্বপ্ন। তাহার গলায় ফুলের মালা দিয়া 'সনঝামণি' তাহাকে চেয়ারে বসাইয়াছে। কি কাণ্ড! সভার কাজ কিরণই করিতেছিল। সন্ধ্যা একটা কাগজে পরিষ্কার করিয়া 'প্রোগ্রাম' লিখিয়া আনিয়াছিল। কিরণ তদনুসারে সভার কাজ চালাইতেছিল গম্ভীর মুখে। প্রথমেই ছিল চিত্রার বেহালা। সে দেশ রাগিণী এমন চমৎকার বাজাইল যে মুগ্ধ হইয় গেল সকলে। সমস্ত সভা রুদ্ধশ্বাসে সে বাজনা শুনিল। তাহার পর স্বাতীর বক্তৃতা। স্বাতী গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি বক্তৃতা দিতে জানি না। এর অগে কখনও দিই নি। ছোটপিসির জেদেই আজ আমাকে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে ছোটপিসির অনেক বড় বড় উঁচু ধারণা আছে, আমার সে সব কিছু নেই। আমি সোজাসুজি বুঝি খেয়ে পরে পাঁচজনকে নিয়ে আনন্দে

দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই জীবন সার্থক, তা সে স্বাধীনভাবেই হোক বা পরাধীনভাবেই হোক। কিন্তু আমাদের সমাজের যা নিয়ম তাতে সব ঝক্কি মেয়েদের ঘাড়ে এসেই পড়ে। এ অবস্থায় আমার মতে সব দিক রক্ষে করে যতটা ফাঁকি দিতে পারা যায় দেওয়া উচিত। ফাঁকি দিতে না জানলে খাটতে খাটতে প্রাণান্ত হ'য়ে মারা পড়তে হবে। আর আমার কিছু বলবার নেই।''....এই বলিয়াই স্বাতী ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল এবং মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল। উষা স-কোপ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, ''কি পাজী মেয়ে দেখেছ!'' ইহার পর সন্ধ্যার বান্ধবী সীতিয়ার ছেলে হিন্দী কবিতা আবৃত্তি করিল একটি—'সিয়ারন পাঁড়ে'। এক শেয়ালের গল্প। শেয়াল রোজ মকাই ক্ষেতে ঢুকিয়া মকাই চুরি করিয়া খাইত। কিন্তু একদিন সে ফাঁদে ধরা পড়িয়া গেল। গল্পটি ছন্দে লিখিত। আবৃত্তি শুনিয়া খুব হৈ হৈ করিয়া হাসিয়া উঠিল সবাই। সীতিয়ার চোখের দৃষ্টি পুত্রগর্বে ঝলমল করিতে লাগিল। ইহার পর লীলার সেতার। সে সেতারে ঝঙ্কার দিবামাত্র চতুর্দিকে গমগম করিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল যে লীলা অসাধারণ প্রতিভাময়ী। তাহার বোন সঙ্গত করিল সেতারের সঙ্গে। তাহারও বাজনা শুনিয়া সকলে অবাক। তাহার পর সে গান ধরিল। ওস্তাদী গান, ইমনের আলাপ। লীলা তাহার সহিত সেতার বাজাইতে লাগিল। দুই বোন অনেকক্ষণ জমাইয়া রাখিল সভাকে। উশনার মেয়েদের গ্রামের লোকেরা ভাল করিয়া চিনিত না। তাহাদের লইয়া সভায় গুনগুন করিয়া আলোচনা হইতে লাগিল। বাদপ্রতিবাদও শুরু হইল। সন্ধ্যা চামরুর বউয়ের কানে কানে বলিল, ''গোলমাল হচ্ছে। তুমি সবাইকে চুপ করে থাকতে বল।'' চামরুর বউ সঙ্গে সঙ্গে ছেকাছিনি ভাষায় বলিয়া উঠিল, ''তোরা সে নি চুপ রহিনি গে। কচ্ কচ্ কর হিঁ কাহে—'' গোলমাল থামিয়া গেল। তখন কিরণ উঠিয়া বলিল, ''এবার সন্ধ্যা প্রবন্ধ পড়বে।'' সন্ধ্যা সকলকে অবাক করিয়া দিল। সে প্রবন্ধ পড়িল হিন্দীতে। আরম্ভ করিল, 'মেরে বহিনিও' বলিয়া। প্রবন্ধে সে যাহা বলিল তাহা সকেল ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তাহা যে সারগর্ভ ইহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। সে সংক্ষেপে নারী-জাগরণের ইতিহাসটাই বিবৃত করিযা ফেলিল এবং সর্বশেষে বলিল—''নারীরা যদি নিজেরা সচেষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল কেহ করিতে পারিবে না। নিজেদের কল্যাণ নিজেদেরই অর্জন করিতে হয়, ভিক্ষা করিয়া তাহা পাওয়া যায় না। পুরুষরা নারীদের স্বাভাবিক সঙ্গী, প্রভু নয়, একথাও নাবীদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।'' তাহার পর সে গ্রামে একটি নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিল। তাহাতে তিনটি বিভাগ থাকিবে। প্রথম নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা, নাইট স্কুল। দ্বিতীয়, নারীদের উপার্জনের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প। তৃতীয়, দুঃস্থ নারীদের সাহায্যের ব্যবস্থা জীবনবীমা এবং কো-অপারেটিভের উপযোগিতা। রুশদেশে প্রবর্তিত কম্যুনের কথা উল্লেখ করিল। সন্ধ্যার চিন্তাশীলতায় সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পর উষা গাহিল রবীন্দ্রনাথের সেই অতি পুরাতন গানটা—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক—'। উষা যদিও মাঝে মাঝে বেসুরো হইয়া যাইতেছিল তবু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে তাহার সব দোষ ঢাকিয়া গেল। তাহার গলার স্বর পাখীর স্বরের মতো স্বাভাবিক। খুব ভালো লাগিল সকলের। ইহার পর হইল এক দুই তিন-এর আবৃত্তি। এক আবৃত্তি করিল, 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে'। দুই—'আমি যখন বাবার মতো হবো' আর তিন—'ঝরণা, ঝরণা, সুন্দরী ঝরণা'। প্রত্যেকের আবৃত্তিই চমৎকার হইয়াছিল। কিন্তু তিনের আধ-আধ কণ্ঠের 'ঝন্‌না, ঝন্‌না, ছুনদলী

ঝন্‌না, তললিত চন্দিকা চন্দন বন্‌না।' সকলের হৃদয় বেশী হরণ করিল। উষা তো পুত্রগর্বে একেবারে ডগমগ। ইহার পর গান গাহিল তুরীটোলার তিলিয়া। কালোকোলো হাসিমুখী মেয়েটি নবোদ্ভিন্নযৌবনা। হলুদ রঙের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। মাথার সিঁথায় একধ্যাবড়া মেটে সিঁদুর। কপালে উলকি, নাকে নাকছাবি। মাথায় খোঁপায় ফুল। সে কানে হাত দিয়া এক পল্লী সংগীত করিল—হে গে ননদী, ফুটলো রাহারকি ফুলোয়া। অড়হরের ফুল দেখিয়া বধূর বিরহ জাগিয়াছে, সে ননদিকে মনের ব্যথা জানাইতেছে। তিলিয়ার গান শুনিয়া অনেকেই মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তিলিয়ার সম্বন্ধে নানাকরম কানাঘুষা আছে। তুরী-সমাজে সে নাকি একটা রাধিকা। গানে সে একেবারে প্রাণ ঢালিয়া দিল। তাহার গান শেষ হইলে সন্ধ্যা কিরণের কানে কানে বলিল—"বড়দি, তুমি এবার কিছু বল। আচ্ছা, ছোটবউ কোথা গেল বল তো।" সকলের অনুরোধে উর্মিলা সভায় আসিয়াছিল। বসিয়াছিল একেবারে শেষপ্রান্তে। খোঁজ করিয়া জানা গেল বর্ষাতিয়ার মায়ের সঙ্গে সে বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। সূর্যসুন্দরের নিকট হইতে উঠিয়া আসা অবধি সে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তারপর তাহার হঠাৎ মনে পড়িল পাঁচটার সময় বাবকে 'ভিটামিন' খাওয়াইতে হইবে' সে কথাটা দিদিকে বলিয়া আসা হয় নাই। তাই সে বর্ষাতিয়ার মাকে সঙ্গে লইয়া মাঠামাঠি হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা একটু দুঃখিত হইল ইহাতে। বলিল, 'মনে করেছিলাম ছোটবউকে দিয়ে ক্যারিকেচার করাব একটা। এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম সুন্দর ক্যারিকেচার করে। চলে গেল কেন হঠাৎ? বাবার কাছে তো পিসিমারা আছেন।" কিরণেরও আর ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মন পড়িয়া ছিল অন্যদিকে, কৃষ্ণকান্তের কোন খবর আসিল কি না। সন্ধ্যার কথায় সে বলিয়া উঠিল, "সবাই তোমার মতো হৈ হৈ ভালবাসে না। সভা তো হয়ে গেল, এইবার চল, বাড়ি যাই।"

"তুমি কিছু বলবে না?"

"আমি! আমি আবার কি বলব"

"যাহোক কিছু বল"

হঠাৎ চামরুর বউও ধমকের সুরে বলিয়া উঠিল—"হাঁ, কুছ্ বোল্‌নি। আংনাযে তো কেত্তা বাত বোলৈছ্"

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চটিয়াছিল, চুটাইয়া বক্তৃতা দিল। বলিল, "আমি বক্তৃতা করতে পারি না। হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই বাংলায় বলছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। আমি যা বুঝেছি তাই বলব। সন্ধ্যা তোমাদের এতক্ষণ স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলছিল। সে যা বলেছে তা খুবই ভালো। কিন্তু আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্ম এখনও ঠিক বুঝি নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, নিজের খুশি মতো পাগলামি করা নয়। সমাজের সংসারের যাতে মঙ্গল হয় সেইটে করবার অধিকারই স্ত্রী-স্বাধীনতা। কিন্তু সমাজে বা সংসারের কিসে ঠিক মঙ্গল হয় তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। নানা মুনির নানা মত। আর তাই নিয়ে পৃথিবীতে নানারকম দলাদলিও হয়েছে। যুদ্ধও হচ্ছে অনেক জায়গায়। এর ফলে শান্তি লোপ পাচ্ছে সমাজ থেকে। আমি নিজের শান্তির পক্ষপাতী। আমি মনে করি সংসারে যদি শান্তি না থাকে তাহলে সবই অনর্থক। আমাদের সাবেক সমাজে ঘরের শান্তি, ঘরে, সৌন্দর্য রক্ষার ভার ছিল স্ত্রীলোকদের উপর। যদিও মনুর বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকেরা বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে পুত্রের—কিন্তু অধীন থেকেও তারাই ছিল ঘরের

মালিক ঘরের কর্ত্রী। তারা সংসারকে যেমনভাবে চালাত, সংসার তেমনিভাবে চলত। পিতা স্বামী বা পুত্র তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, উপার্জন করে তাদের হাতে টাকা এনে দিতেন বলে কখনও তাদের অসম্মান করতেন না। বাড়ির মেয়েরাই সংসারের আসল কর্ত্রী ছিলেন। সমাজের মঙ্গল করবার জন্যে সংসারের বাইরে থেকে একদল মেয়ে চিরকাল যুদ্ধ করতে চান, হয়তো আত্মোৎস্বর্গ করেন, তা তাঁরা করুন, তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু ঘরের ভিতরে থেকে ঘরের মঙ্গল, ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা যারা ভাববে, সংসারে তাদের সংখ্যাই বেশী। আমার মনে হয় তারাও কম নমস্য নয়। তাদের প্রতিমুহূর্তের আত্মোৎসর্গের কাহিনী খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় না বলেই যে তা কম মহৎ একথা আমি মনে করি না। ছোট ছোট গৃহস্থালীর সমষ্টিই সমাজ, এই সব গৃহস্থালীর যার কর্ত্রী, তারাই সমাজেরও কর্ত্রী। তারা প্রত্যেকে যদি নিজেদের গৃহস্থালীর কর্তব্য ঠিক করে করে তাহলেই সমাজের কল্যাণ করা হয়। পিতা মাতা পুত্র এদের অধীনে থাকাটা অনেক আধুনিক মহিলা আত্মসম্মানহানিকর মনে করেন। আমি তাঁদের দলে নই। আমার মনে হয় তাঁরা ঠিকমতো পিতা মাতা বা পতি পুত্রকে ভালবাসেন না। বাসলে একথা তাঁদের মনেই হত না। ভালবাসা নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়, তুচ্ছ আত্মসম্মানের পতাকা আস্ফালন করার কথা মনেই হয় না তার। আমি যা বললাম তা আমার নিজের মনের কথা। অপরের মনের সঙ্গে তার মিল হয়তো না-ও হ'তে পারে। কিন্তু আমি নিজের মনেরই কথাই বলতে পারি, পরের ধার-করা কথা বলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কামনা করি তোমরা সবাই বাবা-মা স্বামী ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে সুখী হও! সুখী হবার জন্যে বিদ্যা বুদ্ধি ধন দৌলত কিছুরই দরকার নেই। সবাইকে ভালবাসতে পারলেই সুখী হওয়া যায়, ভগবানে বিশ্বাস থাকলেই কষ্টকে কষ্ট বলে আর মনে হয় না। আমাদের আজকের সভানেত্রী চামরুর বউ সুখী। জীবনে ওর অনেক দুঃখ কষ্ট এসেছে, কিন্তু সে সব ও গ্রাহ্য করে নি। সকলের সেবা করেছে, সকলকে ভালবেসেছে। তাই ওর মুখে শিশুর সারল্য, তাই ওর হাসি ফুলের হাসির মত নির্মল"—কিরণ হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটাতে হৈ হৈ করিয়া সভা ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ সভার একপ্রান্তে এক বিরাট হাতী আসিয়া উপস্থিত, হাতীর পিঠে কৃষ্ণকান্ত, তাঁহার হাতে বন্দুক।

হাতী হইতে কৃষ্ণকান্ত নামিয়া পড়িলেন। প্রথমেই সন্ধ্যার সহিত মুখোমুখি হইতেই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি ব্যাপার! আমার মৃত্যুসংবাদ রটে' গেছে নাকি! এখানে কি শোকসভা হচ্ছে?"

কিরণের মুখ কৃষ্ণকান্তকে দেখিবামাত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে বলিল, "কি আক্কেল তোমার—"

"আমার আক্কেল অভিজ্ঞতা সব তো তোমার বাক্সে বন্ধ। তুমি কিছু দিলে তবে তো আমার কাছে থাকবে, সব তো তোমার কাছে—"

ঊষা ছোট খুকীর মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"আসল কথাটা বলুন এবার। তিতির পেয়েছেন?"

"প্রচুর। কিন্তু 'কালো' নয় 'গ্রে'। গোটা তেইশ মেরেছিলাম। তিনটে রামপ্রসাদকে দিয়ে দিয়েছি—"

"কোথায় সেগুলো—"

"সেগুলো তো সরফুদ্দিনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি অনেকক্ষণ আগে। সে ঘোড়ায় করে' এসেছে, দিয়ে যায় নি?"

"গেছে বোধহয়। আমরা তো কেউ বাড়ি ছিলাম না। এখানে সভা করছিলাম।"

"সভা? কিসের সভা?"

"সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা কর। ওই নাটের গুরু"

সন্ধ্যা গম্ভীরভাবে বলিল, "আমরা এখানে একটা নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করলাম"

"বাঃ আমি তোমাদের কিছু লাঠি দেব"

"লাঠি!"

উষা আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"এতগুলি উন্মত্তা নারী একত্র হলে মারপিট তো অনিবার্য। তোমাদের সহকর্মিণী কারা? এরা না কি? এরা তো তোমাদের ঠেঙিয়ে লাশ করে দেবে"

সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমাদের অস্ত্র লাঠি নয়—"

"তোমাদের ওই হাসি আর বাঁকা চাউনি আমাদের মতো হাঁদাদের ঘায়েল করতে পারে, কিন্তু মেয়েদের পারবে না। একটি মেয়ে আর একটি মেয়েরে সুন্দর মুখ দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে আর বাধা না থাকলে দৌড়ে গিয়ে আগেই মুখটা খামচে ক্ষতবিক্ষত করতে চেষ্টা করে—"

"চল, চল, ঢের ভাঁড়ামি হয়েছে"— কিরণ ধমকাইয়া উঠিল—"খুব খিদে পেয়েছে তো?"

কৃষ্ণকান্ত মুচকি হাসিয়া চাহিয়া রহিলেন তাহার দিকে। তাহার পর বলিল, " পেয়েছে বললেই তুমি খুশী হও। কিন্তু পায় নি। তুমি সরফুর হাতে যা খাবার পাঠিয়েছিলে তা তিনটে লোকের খোরাক। সরফুর কড়া পাহারায় তার সবটা খেতে হয়েছে। তাছাড়া একটা কুলের জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। অনেক কুল খেয়েছি। অসময়ে এরকম কুল দেখি নি কখনও আগে। ইয়া বড় বড়। তোমাদের জন্যও এনেছি কিছু। তাছাড়া গৌরবাবুও প্রচুর খাইয়েছেন—"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল—"হাতী কোথায় পেলেন?"

"হাতী গৌরবাবুর"

"তুমি সেখানে গেলে কি করে?" রীতিমত জেরা শুরু করিল কিরণ। সন্ধ্যা এমন একটা মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যেন তাহার বিস্ময় থৈ পাইতেছে না।

"সে অনেক কথা। চল যেতে যেতে বলছি। সভা শেষ হ'য়ে গেছে তো? না, আরও হবে?"

সন্ধ্যা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—"আর একটু হ'ত কিন্তু আপনিই তো হুড়মুড়িয়ে এক হাতী নিয়ে এসে ভেঙে দিলেন সভাটা—"

চামরুর বউ সবিস্ময়ে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতেছিল। সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া আধ-ঘোমটা টানিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কির্নিকে দুলহো ছে?"

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহার অনুমান ঠিক। তাহার পর চামরুর বউয়ের দিকে কৃষ্ণকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, "জামাইবাবু ইনি আজ আমাদের সভানেত্রী হয়েছিলেন"

কৃষ্ণকান্ত নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'ইনি কে"

"দাদার দুধ-মা। দাদা ছেলেবেলায় এর দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে। এরা তখন আমাদের চাষের কাজ করত"

"বাঃ! এঁকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল—"

হঠাৎ হাতীর মাহুতটা হাতীর উপর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "দাদী তু কি ঘর যাইভি?"

সকলে মাহুতের দিকে চাহিতেই চামরুর বউ হাসিয়া বলিল, "ওকে তোরা চিনতে পারলি না? ও রমজানিয়ার বড়া বেটা মিরচানিয়া। আমি ওর সঙ্গে চলে যাই। কাল আবার আসব ভোজ খেতে'

মিরচানিয়া হাতীকে বসাইয়া তাহার দাদীকে তুলিয়া লইল। যতক্ষণ দেখা গেল চামরুর বউ ইহাদের দিকেই হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। সভা ভাঙিয়া যাওয়াতে গ্রামের মেয়েরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারাও ক্রমশঃ নিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

"চল এবার আমরাও বাড়ি যাই—"

যাইতে যাইতে কিরণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে পড়লে যে—"

"এইটেই তো বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। ভিড় দেখে থেমে গেলুম।"

"গৌরবাবুর ওখানে গিয়েছিলে কেন"

"গরুর গাড়ির চেষ্টায়—"

"হঠাৎ গরুর গাড়ির কি দরকার পড়ল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়। তা তো হবেই। চার ক্রোশ পথ কি সোজা! এখান থেকেই তোমার গরুর গাড়িতে যাওয়া উচিত ছিল।"

কৃষ্ণকান্ত ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

"তারপর?"

"তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে? তাহলে শোন। গরুর গাড়ি নিজের জন্য চাইতে যাইনি। চাইতে গিয়েছিলাম একটা কুমীরের জন্য"

"কুমীরের জন্য? তার মানে?"

সকলেই বিস্মিত হইল।

"তিতির মেরে ফিরছি। একটা প্রকাণ্ড বিলের ধার দিয়ে রাস্তা! হঠাৎ দেখতে পেলুম বিলের জলে একটা কুমীরের নাক দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে রাইফেল ছিল, বুলেটও ছিল। লোভ সামলাতে পারলাম না, দিলাম একটা ফায়ার করে। টুপ করে নাকটি ডুবে গেল। ঠিক লেগেছে কি না বুঝতে পারলাম না। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম দূরে জেলেদের একটা ডিঙি রয়েছে। ডিঙি ঠেলবার লগিও রয়েছে একটা ডিঙির উপর কিন্তু লোক নেই। কেউ কোথাও নেই। রামপ্রসাদ আর আমি গিয়ে চড়লাম সেই ডিঙিতে, লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সেটাকে নিয়ে এলাম যেখানে কুমীরের নাক দেখা গিয়েছিল। গিয়ে দেখি সেখানকার জল রক্তে লালে লাল হ'য়ে রয়েছে। বুঝলাম লেগেছে গুলিটা। তারপর লগিটা এদিক ওদিক চালিয়ে কুমীরটাকেও পেলাম, দেখলাম জলের ভিতরই সেইখানে মরে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেবে পড়লাম আমি জলে, রামপ্রসাদও নাবল। ও ছোকরার বেশ সাহস আছে দেখলাম—"

"জলে লাফিয়ে পড়লে কুমীরের মুখে! সে কি গো! কি কাণ্ড যে করে বেড়াও তুমি। কুমীরের মুখে লাফিয়ে পড়লে কি বলে!"

"দুগ্‌গা বলে! তারপর দু'জনে মিলে টানতে টানতে তুললাম সেটাকে ডাঙায়। It was stone dead ! বিরাট কুমীর।"

স্বাতী হঠাৎ বলিল, "কই আপনার কাপড় তো একটুও ভেজে নি। কাদাও লাগে নি—"

"এ কাপড়টা গৌরবাবু দিয়েছেন। আমার কাপড় গাড়িতে কুমীরের সঙ্গে আসছে"

"তারপর—" রুদ্ধশ্বাসে কিরণ প্রশ্ন করিল।

"কুমীরটা ডাঙায় তুলেই আমার মনে হল এতো বড় কুমীব তো এখানে ফেলে যাওয়া চলবে না, নিয়ে যেতে হবে। গরুর গাড়ি চাই। রামপ্রসাদ বললেন গৌরবাবুর কাছারি ছাড়া এখন আর কোথাও গরুর গাড়ি পাওয়া যাবে না। দূরে দেখলাম একটা রাখাল ছোঁড়া যাচ্ছে। ডাকে ডাকলাম—তোকে আট আনা পয়সা দেব তুই এই কুমীরটাকে পাহারা দে। আমরা গাড়ি নিয়ে আসছি। কাছারিতে গিয়ে গৌরবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। তিনি শ্বশুরমশায়ের নাম শুনে মহাখাতির করে বসালেন আমাকে। বললেন, তুমি ডাক্তারবাবুর জামাই মানেই আমার জামাই। ডাক্তারবাবুর নাতবৌয়ের সাধে আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব। মহাব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন তারপর। প্রথমেই খাওয়ার ব্যবস্থা। সংক্ষেপে গরম গরম লুচি আর আলুর দম। পেটে খুব বেশী জায়গা ছিল না। তবু খেলাম কিছু। মানে খেতে হল। তারপর উনি বললেন, আমি হাতী কষিয়ে দিচ্ছি, তুমি হাতীতে যাও। আব কুমীর গাড়িতে যাক। তার সঙ্গে একটা সিপাহীও যাক। গরুর গাড়ি, বাঁশ, দড়ি, তিন চারজন জোয়ান লোক সব দিয়ে দিলেন। আমাব খাওয়াদাওয়া করতে একটু দেরি হয়ে গেল। কুমীর বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে। কি বিরাট কুমীর দেখবে চল—"

"কি হবে বিরাট কুমীর নিয়ে। সত্যি তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি"

কিরণ তর্জন করিয়া উঠিল। যদিও তাহার বুক স্বামীগর্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

"বিরাট কুমীর নিয়ে কি হবে বলছ? আমার বিশ্বাস অন্তত গোটা দুই ব্লাউস কেস হবে"

"কি করব বুড়ো বয়সে ওসব নিয়ে"

"বুড়ো বয়সকে অমন উপেক্ষার চক্ষে দেখো না। সার্ভেনটিস তাঁর বিখ্যাত বই 'ডন্ কুইকসোট' বুড়ো বয়সে লিখেছিলেন। ইতিহাস ওলটালে দেখতে পাবে আরও অনেক বুড়ো লোক অনেক গোঁয়ারতুমি করেছেন। এমন কি যুদ্ধও করেছেন, আকবর জাহাঙ্গীর শাজাহান, না ছোট গিন্নী? তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী"

সন্ধ্যা কিল তুলিয়া বলিল, "ফের আমাকে ছোটগিন্নী বলবেন তো ভালো হবে না"

"কোদালকে কোদাল বলাই তো ভালো"

উষা হঠাৎ অনুযোগের সুরে আবদার-মাখা কণ্ঠে বলিল, "জামাইবাবু আমাদের দিকে আর ফিরেও চান না। দিদির দিকে তো নয়ই, আমার দিকেও না!"

"আহা, বুঝতে পারছ না। তোমরা হচ্ছ আমার রিজার্ভ ফরেস্ট। সন্ধ্যারানী বিলকুল রঙ্গনাথের। ওখানে একআধবার পোচিং করতে লোভ হয় মাঝে মাঝে"

হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটার মোড় ঘুরিয়া গেল এক মিলিটারি-পোশাক পরা যুবকের আবির্ভাবে।

"কে আসছে বল তো"—উষা মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

"এ কি ! ও যে ঘণ্ট! ঘণ্ট এসেছে!"

উচ্ছ্বসিতা কিরণ আত্মহারা হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘণ্ট আসিয়া প্রমাণ করিল সকলকে।

"কি লম্বা হয়েছিস রে তুই। একেবারে তালগাছ হচ্ছিস যে"

কৃষ্ণকান্ত একবার পুত্রের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন।

ঘণ্টু বলিল, "বাবা তোমার কুমীরটা এসে পৌঁছে গেছে। এতবড় কুমীর আমি দেখি নি। বিরাট!"

কৃষ্ণকান্ত কিছু না বলিয়া কিরণের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ নিজের ছেলের মুখ থেকেই শোন, কি কাণ্ডটা করিয়া আসিয়াছি।

উষা বলিল, "তুই এসেছিস, এবার দিদির মুখে একটু হাসি ফুটবে। ছেলে ছেলে করে অস্থির একেবারে। শুনেছিলাম ছুটি পাবি না, হঠাৎ পেয়ে গেলি কি করে"

"পেতাম না। বাবা কর্নেল জেফারসনকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ছুটিব। মিলিটারিতে ছুটি পাওয়া শক্ত"

কিরণ কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি যে চিঠি লিখেছ একথা তো আমাকে বল নি"

এবারও কৃষ্ণকান্ত কিছু বলিলেন না, কেবল মুচকি হাসিলেন।

সন্ধ্যা একধারে দাঁড়াইয়া তাহার বান্ধবী সীতিয়ার সহিত কথা বলিতেছিল। সীতিয়া যেই শুনিল ওই মিলিটারি সাহেব কিরণের ছেলে সে অবাক হইয়া গালে হাত দিল। সন্ধ্যা বলে কি! ওই জোয়ান লম্বা সাহেব ওই অতটুকু কির্নিদির ছেলে! তাহার পর হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া বলিল—"আপসোস যে তোর একটাও ছেলে হ'ল না। আমার শ্বশুরবাড়িতে 'ধরমবাবার থান' আছে। সেখানে মানত করলে ছেলে হয়। মানত করবি?"

"চুপ কর"—হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল সন্ধ্যা।

তাহার পর ও প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য কৃষ্ণকান্তের কাছাকাছি আসিয়া বলিল, "আপনার বুঝি মিলিটারি সাহেবদের সঙ্গে আলাপ আছে জামাইবাবু--"

"কে বললে—"

"ওই যে ঘণ্টু বলছে কর্ণেল জেফারসনকে আপনি চিঠি দিয়েছিলেন বলে ওর ছুটি হয়েছে—"

"কর্ণেল জেফারসন যখন মেজর ছিল তখন আমরা একসঙ্গে শিকার করেছি এককালে। মিলিটারিতে ঢোকবার ইচ্ছে আছে নাকি তোমার"

"আমার একটা ঘোড়া কেনবার খুব শখ। শুনেছি মিলিটারি লোকেরা ঘোড়া ভালো চেনে"

"তা চেনে। কিন্তু যে ঘোড়াটি তোমার আছে সেটিও তো বেশ ভালো—"

"আমার আবার ঘোড়া কোথা!"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন ঘণ্টু চিত্রা স্বাতী লীলা নীলা—অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গিয়াছে। তখন তিনি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "কেন, রঙ্গনাথ—"

সন্ধ্যা তাঁহার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল।

কিরণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "কি যে অসভ্যতা করিস-

উষা খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

।। কুড়ি।।

সূর্যসুন্দরের ঘরে খুব আড্ডা জমিয়াছিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল লীলা নীলা চিত্রা। একটু আগে উষাও ছিল, সে তাঁহাকে সালংকারে এবং সবিস্তারে বাগানের মিটিংয়ের বর্ণনা শুনাইয়া ছেলেদের খাওয়াইতে গিয়াছে। সে বাগানে যে গানটা গাইয়াছিল সেটাও সূর্যসুন্দরকে শুনাইয়া দিয়াছে। লীলা নীলা চিত্রা সেই উদ্দেশ্যে আসিয়া বসিয়াছিল। মীটিংয়ে তাহারা যে গানবাজনা করিয়াছে তাহা দাদুকে শুনাইবে। কিন্তু বাধা পড়িয়া গেল, আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে নানাবয়সের ও নানা জাতের স্ত্রী পুরুষ সূর্যসুন্দরের খবর লইতে আসিয়াছিল। ভোজের বাড়িতে কেহই শুধুহাতে আসে নাই। চাল ডাল তরিতরকারি দুধ মাছ যে যাহা পারিয়াছে আনিয়াছে। সূর্যসুন্দরের ঘরের প্রকাণ্ড মেঝেতে প্রকাণ্ড একটা শতরঞ্জি পাতাই ছিল। সকলে তাহার উপর আসিয়া বসিল। সকলেরই দৃষ্টি ভক্তি-নম্র এবং ভয়-বিহ্বল। কেহই একটিও কথা বলিতেছিল না। অনেকে হাতজোড় করিয়া বসিয়া ছিল।

সূর্যসুন্দরই কথা বলিলেন—"তোমরা এসেছ এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমরা সবাই এখানে খেয়ে যেও। এ তোমাদেবই বাড়ি। এ তিনটি আমার নাতনী। পৌত্রী। এরা আমাকে গানবাজনা শোনাবে বলে বসছে। তোমরাও শোন।—"

পেট-পচা কবিরাজও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"বাঃ এখানে বেশ সভা বসে গেছে দেখছি। চন্দরবাবুর ওখানেও সভা বসেছে। ধর্ম আলোচনা চলছে। এখানে কি হচ্ছে?"

"গানবাজনা হবে। নাতনীরা গাইবে বাজাবে—"

"বাঃ বাঃ বাঃ । একে গানবাজনা, তায় নাতনীরা করছে। সোনায় সোহাগা। এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। আমিও বসলুম একধারে।"

"হ্যাঁ বসুন না—"

প্রথমেই চিত্রা বেহালাতে রবীন্দ্রনাথের একটা গান বাজাইল—"না, না গো না, ক'রো না ভাবনা।" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাহবা দিয়া উঠিলেন কবিরাজ মশাই।

বলিলেন, 'ইনি যদি এস. পি. সাহেবের আপিসে বসে বেহালা বাজান তাহলে চোর বদ্‌মায়েশের' আপনি এসে ধরা দেবে, তাদের নামে আর ওয়ারেন্ট ইসু করতে হবে না!"

সংগীতচর্চায় কিন্তু বাধা পড়িয়া গেল।

নিখিলবাবু একটি টেলিগ্রাম লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"গগনের শ্বশুর শাশুড়ী আসছেন। স্টেশনে গোটা চারেক পালকি পাঠিয়েছি। বিরুকে নিয়ে আমি স্টেশনে যাচ্ছি। গগনকে যেতে বললাম কিন্তু ও যেতে চাইছে না। দিগন্তকে নিয়ে যাচ্ছি অগত্যা—"

"ওঁদের থাকবার ব্যবস্থা কোথা হবে—"

"আমাদের চোয়ারিতে। অত বড় বাংলো রয়েছে। শোবার ঘর বাথরুম সব ঠিক আছে। জলটল তুলিয়ে রেখেছি, বিছানটিছানাও রেডি। চোয়ারি বাড়িতে মাছ মাংসও রান্না করছে দুনিয়ালাল।"

"চারটে পালকি পাঠাচ্ছেন কেন? আরও কেউ আসবে নাকি?"

"হ্যাঁ ধনুকধারীবাবু আর সোমেন্দ্রবালাও আসছে যে। তাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি—"

"ও, সোমেন আসছে? বাঃ। সে কি করে খবর পেলে—?"

"কলকাতাতেই ছিল বোধহয়—"

"ওর শ্বশুরবাড়ি তো রংপুর—"

"সেখান থেকে অনেকদিন আগেই চলে এসেছে। ওর স্বামী সীতানাথও চলে এসেছে!"

"মনু আর টুনু কোথা আজকাল বলুন তো—"

"মনু তীর্থ করতে বেরিয়েছে। টুনু আছে বোম্বেতে তার স্বামীর কাছে। ট্রেনের সময় হল, আমি স্টেশনে চললুম—"

নিখিলবাবু চলিয়া যাইবার পরই ঘণ্টুকে লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল। ঘণ্টুর চেহারাটি চমৎকার। রাজপুত্র যেন।

"বাবা, ঘণ্টুর সঙ্গে আলাপ করলে? ছেলে কি কাণ্ড করেছে জান? দশখানা শাড়ি এনেছে। আর আপনার জন্যে এনেছে ভালো একটা পাঞ্জাবির কাপড়। খুব ভালো ভায়েলা। আজকাল পাওয়া শক্ত। ও মিলিটারি স্টোর থেকে এনেছে—"

"কেন এত খরচ করতে গেলে দাদু—"

"আমাদের বংশের ধারাই যে ওই। এক টাকা আয় হতে না হতেই দু'টাকা খরচ করবার ফন্দী মাথায় এসে যায়। টাকা ধার করে এনেছে, জান?"

"কি যে তুমি কর মা!"—ঘণ্টু বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল। '

কবিরাজ মশাই মুখে হাত দিয়ে খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—"চালুনি বলে ছুঁচ তোর চোখে কেন ছ্যাঁদা—!'

সূর্যসুন্দর প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"বড়বৌমা কোথা? চম্পা কোথা? গগনের শ্বশুর শাশুড়ী এই ট্রেনে আসছেন। নিখিলবাবু তাঁদের আনতে স্টেশনে গেলেন।"

"তাই না কি! বাঃ কি মজা!"

কবিরাজ মশাই নীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন--"আমাদের গানের আসরটা কিন্তু মাটি করে দিলে পাঁচজনে মিলে! চিত্রা দিদির বেহালা যা শুনলাম—সেরেফ্ হেভেন্‌লি! না ভুল বললাম—হেভেনের কোন অভিজ্ঞতা নেই আমার—বলতে পারি লাভ্‌লি, সুপার্ব"

"ঘণ্টুও চমৎকার ইংরেজী গান গাইতে পারে কবিরাজ কাকা। শুনুন না, মনে হবে ঠিক সায়েব গাইছে—"

"গাও না ঘণ্টুদা।"—চিত্রা অনুরোধ করিল।

"দুৎ, মায়ের কথা শুনিস কেন—"

ঘণ্টু উঠিয়া চলিয়া গেল।

যাহারা দূরের গ্রাম হইতে সূর্যসুন্দরকে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা উসখুস করিতেছে দেখিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন—"কিরণ এদের খাবার ব্যবস্থা করে দে—"

"এস—"

কিরণ তাহাদের লইয়া পশ্চিমদিকের বারান্দায় চলিয়া গেল। কবিরাজ মশাই লীলা নীলার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের বাজনা শোনাও এবার—"

"এত গোলমালে ভাল হবে না"

তাহারাও উঠিয়া পড়িল। প্রবেশ করিল স্বাতী মুচকি হাসিতে হাসিতে।

"কাকীমা আপনাকে মা ডাকছেন। আপনি চা খেয়ে আসুন। আমি দাদুর কাছে বসছি—"

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার দিকে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, সে যে একধারে বসিয়া আছে ইহা কেহ যেন লক্ষ্যই করে নাই। স্বাতীর কথায় একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া ঊর্মিলা উঠিয়া পড়িল এবং স্বাতীর কানে কানে বলিল—"সাড়ে সাতটার সময় বাবাকে ওই মিকশ্চারটা খাওয়াতে হবে। আর দশ মিনিট বাকি আছে। খাওয়াবার সময় গলায় তোয়ালেটা ভাল করে দিয়ে দিও। কেমন?"

ঊর্মিলা চলিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় স্বাতীর দিকে চাহিয়া ভুরু নাচাইয়া বলিলেন—"দিদি তুমি না কি আজ খুব ভাল বক্তৃতা দিয়েছ শুনলাম"

"আমি!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ তুমি। রিপোর্টাররা যা বলছে তা শুনে তো অবাক হ'য়ে গেছি!"

"কে রিপোর্টার? কি বলছে?"

"দোসাদটোলার লেংড়িকে বললুম এক ছিলিম তামাক সেজে দে তো বেটী, সে হেসে বললে স্বাতী দিদি আজ কি বলেছে জান? প্রত্যেকের উচিত কাজে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু আপনার কাজে আমি ফাঁকি দেব না। এখনই সেজে এনে দিচ্ছি। বলে হেসে চলে গেল। একটু পরে এনেও দিলে এক ছিলিম তামাক—"

স্বাতীও খুব হাসতে লাগল।

"আমি কি করি বলুন। আমি কি বক্তৃতা করতে পারি? কিন্তু ছোটপিসি একেবারে না-ছোড়, করতেই হবে। তাই কি করি—উঠে যা মনে এল বলে দিলুম—"

"দিদি তুমি যা বলেছ তা মস্ত একটা দার্শনিক তত্ত্ব। বড় বড় সাধকরা বলেছেন যে সংসারের তুচ্ছ কাজে যতটা সম্ভব ফাঁকি দেবে। শারীরিক মেহনত কমাবার জেন্যে বিজ্ঞানীরা বড় বড় আবিষ্কার করছেন। এখন কুয়া থেকে জল তুলতে হয় না, কল ঘোরালেই জল পড়ে। বড় বড় সাধুরা সব চোখ বুজে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকেন, কেউ কুটোটি নাড়েন না। মানুষ যত সভ্য হয় ততই সে দৈহিক মেহনত করা কমিয়ে দেয়। ওইটেই হ'চ্ছে সভ্যতার লক্ষণ। তুমি মস্ত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছ দিদি—"

"আমাকে অত বোকা ভাববেন না যে ঠাট্টা বুঝতে পারি না!"

স্বাতী মৃদু হাসিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে গিয়া উপবেশন করিল।

"তাহলে আমার তো সেই গল্পের বাঁদরের মতো দশা হ'ল দেখছি। পারস্যদেশের এক রাজকুমারী পশুপক্ষীর কথা বুঝতে পারতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একটা বুড়ো

বাঁদর তাঁর জানলার নীচে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে আছে। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বাঁদরটা বললে—দেবি, আপনি বেহেস্তের হুরীর চেয়েও সুন্দরী, আশা করি আপনার মনটাও মাখনের মতো নরম, আপনি কি দয়া করে আমাকে একটা কলা দেবেন? শুনেছি আপনার জন্যে লবঙ্গ দ্বীপ থেকে কলা আসে। রাজকুমারী বললেন—তুই মিথ্যুক খোশামুদে বাঁদর, তোকে কিছু দেব না, তুই দূর হয়ে যা। বাঁদর চলে গেল। তার পরদিনই রাজকুমারী দেখলেন বাঁদরটা আবার এসেছে। চোখাচোখি হতেই সে হেসে বললে—দেবী, কাল আমি সত্যিই আপনার রূপের কথা বাড়িয়ে বলেছিলাম। আপনি বেহেস্তের হুরী নন, আপনি সাধারণ মানবীও নন। আমার এক দিদিমা ছিলেন তাঁর সঙ্গে আপনার প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে দয়া করে একটা লবঙ্গ দ্বীপের কলা দিন। দ্বিতীয়বার বাঁদরটা সত্যি কথাই বলেছিল কিন্তু তবু রাজকুমারী তাকে দূর করে দিলেন, একটা কলাও দিলেন না।"

কবিরাজ মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিলেন না। তিনি বোধহয় কবিরাজ মহাশয়ের গল্পটাও শোনেন নাই। তিনি অন্য জগতে ছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি সম্মুখে যেন সিংজির সেই টাট্টু ঘোড়াটা দেখিতে পাইতেছেন। ঘোড়াটার সামনের দুটো পা বাঁধা। ঘোড়াটা লাফাইয়া লাফাইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে। যেন ঘোড়া নয়, বড় একটা ফড়িং। নদীর ঘাটে সিংজি বসিয়া ঘটি মাজিতেছেন। তাঁহার কানে হলদে পৈতা জড়ানো। পরনে হলুদ রঙের কাপড়। শুধু গা। খুব কম লোকই সিংজিকে তাঁহার বাড়িতে দেখিতে পায়। এক তাঁহার বৃদ্ধ চাকর বৈজু ছাড়া। সিংজি বাড়ি ফেরেন রাত্রিতে। আসিয়াই নিজের দড়ির খাটিয়াতেই শুইয়া পড়েন। খাটিয়া বারান্দায় বিছানোই থাকে। বৈজু টাট্টু ঘোড়াটির সামনের পা দুইটি ছাঁদিয়া ছাড়িয়া দেয়, সে ফড়িংয়ের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া চড়িয়া বেড়ায়। সিংজি আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া শুইয়া পড়েন। মশারি খাটান না। আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শোন। রাত্রে তিনি খান না। ভোরে টাট্টুর পিঠে চড়িয়া বাহির হন পাঁচটার সময়। কাজিগ্রামের নিকট গিয়া গঙ্গার ঘাটে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করেন। ঘাটের কাছেই বুলাকি সাহের দোকানে দহি-চূড়া এবং একটি লাড্ডু খান। তাহার পর এক ঘটি জল। টাটকা গঙ্গাজল। তাহার পর বুলাকি সাহের খাতায় সেদিনকার খাবারের দামটা উসুল কবিয়া দেন। বুলাকি সাহ বহুকাল পূর্বে তাঁহার নিকট যে টাকা লইয়াছিল এইভাবে তাহা ধীরে ধীরে শোধ হয়। তাহার পর সিংজি টাট্টুর পিঠে চড়িয়া আবার বাহির হন। সমস্ত দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। সিংজি কুসীদজীবী। প্রায় দশ ক্রোশ জুড়িয়া নানা গ্রামে তাঁহার খাতক আছে। তিনি সমস্ত দিন তাগাদা করিয়া বেড়ান। যেখানে যতটুকু সুদ আদায় করিতে পারেন সেটুকু বটুয়াতে পুরিয়া লইয়া আসেন। বটুয়াতে তিনটি খোপ আছে। একটিতে থাকে একটি ছোট জাঁতি কয়েকটি সুপারি এবং খইনিপাতা। দ্বিতীয়টিতে থাকে টাকা পয়সা। তৃতীয়টিতে নোট। টাকা পয়সা বা নোট বেশীক্ষণ তাঁহার বটুয়ায় থাকিতে পায় না। হয় সেগুলি অন্য কোনও ঋণ-প্রার্থীকে দিয়া দেন না হয় পোস্টাপিসে জমা করেন। তাঁহার দৈনিক পরিক্রমার মধ্যে দুইটি পোস্টাপিস পড়ে। তিনি বা তাঁহার ঘোড়া ক্লান্ত হইলে তাঁহাকে সাধারণতঃ মাঠের মাঝে বা নদীর ধারে কোন গাছতলায় বিশ্রাম করিতে দেখা দেয়। তখন তিনি বসিয়া স্বহস্তে সুপারি কুঁচাইয়া চিত্তবিনোদন করেন। কখনও ক্বচিৎ তাঁহাকে নিদ্রিত

অবস্থাতেও দেখা যায়। যে শতরঞ্চিটি তিনি ঘোড়ার পিঠে চার পাট করিয়া দিয়া 'জিন' করেন সেইটিই গাছতলায় পাতিয়া উপবেশন এবং শয়নও চলে। কাহারও বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করা বা কাহারও সহিত অকারণে ঘনিষ্ঠতা করা সিংজি পছন্দ করেন না। ঘনিষ্ঠতা করিবার মতো আপনজনও তাঁহার কেহ নাই। সংসারে তিনি একা। স্ত্রী-পুত্র বহুপূর্বে মারা গিয়াছে। প্রথম জীবনে দুই একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দুই একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই সিংজি ঠকিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন সকলেই তাঁহার টাকা হাতাইবার জন্যই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসে। দুই একবার ঠকিয়া আর ও ফাঁদে তিনি পা দেন নাই। পরে নিঃসঙ্গ থাকাটাই তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। যদিও তিনি সুদখোর মহাজন ছিলেন তবু তাঁহার মনে একটা বৈরাগ্যের ভাব ছিল। যখন নদীতীরে একাকী তিনি দূরদিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন তখন তাঁহাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দার্শনিক বলিয়া মনে হইত। তিনি কি যে ভাবিতেন তাহা কেহ জানে না। তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ ঔৎসুক্যও ছিল না। কেহ তাঁহার নাম করিত না পাছে হাঁড়ি ফাটিয়া যায় বা আহারে অন্য কোন বিঘ্ন হয়। লোকে তাঁহার মুখ দেখিলেও অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িত। সিংজিও কাহারও মুখ দেখিতে চাহিতেন না। ইহার একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছিল। ডাক্তার সুরযুবাবু। এই লোকটিকে তিদি শ্রদ্ধা করিতেন। সূর্যসুন্দরও শ্রদ্ধা করিতেন সিংজিকে। তাঁহার এই নিস্পৃহতা সূর্যসুন্দরের ভালো লাগিত। কাহারও সাতে-পাঁচে থাকিতেন না সিংজি। নিজেকে লইয়াই থাকিতেন। সিংজির সহিত সূর্যসুন্দরের প্রথম পরিচয় হয় একটি দুরারোগ্য দাদের মাধ্যমে। দাদটি সিংজির কোমরে ছিল। উপর্যুপরি তিনদিন একবার করিয়া একটি ঔষধ লাগাইয়া সূর্যসুন্দর দাদটি সারাইয়া দিয়াছিলেন। খুব জ্বালা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সারিয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য সূর্যসুন্দর কোন প্রকার ফি লন নাই। ঔষধের দাম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই হইতে সূর্যসুন্দরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। সূর্যসুন্দরকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহার সহিত গলাগলি ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তাঁহাদের দেখা হইত মাঠে, ঘাটে বা গাছতলায়, ক্বচিৎ কখনও। অনেক সময় তাঁহার সহিত দেখা হইবার পূর্বেই তাঁহার টাট্টু ঘোড়াটাকে তিনি দেখিতে পাইতেন। ঘোড়াটা দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন সিংজি আশেপাশে কোথাও আছেন। সেই ঘোড়াটিকে সূর্যসুন্দর এখন দেখিতে পাইলেন। তিনি যেন নদীর উপর নৌকায় রহিয়াছে, ঘোড়াটা নদীর ধারে চরিয়া বেড়াইতেছে। একটু পরে সিংজিকে দেখিতে পাইলেন। কানে পৈতা জড়াইয়া ঘটি মাজিতেছেন। বহুকাল পূর্বে তাঁহার সহিত যে সব কথা হইয়াছিল তাহাও যেন তিনি শুনিতে পাইলেন।

"ডাক্তারবাবু যে। নমস্কার। কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে—"

"ত্রিপুরাবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছি। তাঁর একটি মেয়ে হ'ল"

"ও। তাহলে তো অনেক টাকা কামিয়ে ফিরলেন—"

"তা পেয়েছি কিছু। কিন্তু আমার সবচেয়ে আনন্দ হ'চ্ছে ত্রিপুরাবাবু স্কুলের জন্য পাঁচশ' টাকা দিয়েছেন—"

"কোন্ স্কুলের জন্য—এ অঞ্চলে তো কোন স্কুল নেই"

"আমাদের গ্রামে একটা মাইনর স্কুল হ'চ্ছে। তারই জন্যে একটা বাড়ি তৈরি করতে হবে। তাই ভিক্ষে করছি সকলের কাছে—"

"স্কুল? স্কুল করে কি করবেন? ইংরেজী লেখা পড়া শিখলে তো সবাই বাবু হয়ে যাবে! সব ফুটানি করে বেড়াবে"

"ইংরেজী পড়ে ভাল লোকও অনেক হয়েছে। জাত হিসেবে ইংরেজরা খুব বড়। আমরা সত্যি যদি তাদের মতো হ'তে পারি তাহলে আমাদের উন্নতিই হবে"

"হাঁ?—"

সিংজির সপ্রশ্ন ভ্রূকুঞ্চিত-দৃষ্টিটা সূর্যসুন্দর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য ব্যাপার! যে ঘরে যে পরিবেশে তিনি বসিয়া আছেন তাহা যেন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হইয়া গেল। যে অতীত কবে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে সেই অতীত সহসা সম্মুখে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল কেন? তবে কি অতীত কোথাও বাঁচিয়া আছে? আজ কাল মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁহার এরকম হয়। অতীতের একটা তুচ্ছ ছবি হঠাৎ মনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া দেখা দেয়। আরও দুইটি কথা তাঁহার মনে পড়িল। ওই স্কুলের জন্য সিংজিও তাঁহাকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু একটি শর্তে। তাঁহার নাম যেন প্রকাশিত না হয়। সূর্যসুন্দর সিংজির নিকট চান নাই, তিনি নিজেই রাত্রে আসিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দুই হাত ধরিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাঁহার নামটা যেন কেহ জানিতে না পারে। তাঁহার হাতের স্পর্শ তিনি যেন আবার অনুভব করিলেন। দ্বিতীয় যে কথাটা মনে পড়িল সেটা এই যে সেদিন তিনি ত্রিপুরাবাবুর যে কন্যাটিকে ফরসেপ্‌স-এর সাহায্যে মাতৃজঠর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ছিলেন, যাহার বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না, সেই সোমেন্দ্রবালা এই ট্রেনে আসিতেছে তাঁহাকে দেখিতে। কতদিন আগে সোমার জন্ম হইয়াছিল? সালটা কিছুতেই তিনি মনে করিতে পারিলেন না। সিংজিই বা কবে মারা যান? তাহাও মনে নাই। এইটুকু শুধু মনে আছে তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল সুখপুরিয়ার মাঠে। আবার সমস্ত যেন অবলুপ্ত হইয়া গেল। দিগন্তবিস্তৃত প্রকাণ্ড মাঠ যেন চতুর্দিকে। মাঠের বুক চিরিয়া একটি সরু পায়ে চলার পথ দূরে আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। সেই পথে তিনি যেন একা চলিয়াছেন। যেন অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছেন। সারা জীবন। পথের অপর প্রান্তে—আকাশের গায়ে যেখানে পথটা গিয়া মিশিয়াছে—সেখানে আর একটা মূর্তি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। সেটা যেন তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কে ও?

বাহিরের পদশব্দে এবং কথাবার্তায় সূর্যসুন্দরের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। নিখিলবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে কয়েকজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গগনের শাশুড়ী, ধনুকধারী, সোমেন্দ্রবালা এবং সকলের শেষে জগাই। সন্তোষের ছেলে জগাই। তাহাকে কেহই চিনিতে পারিল না, এমন কি সূর্যসুন্দরও নয়। জগাইয়ের অদ্ভুত চেহারা। মাথায় বাবরির মতো লম্বা লম্বা চুল, একমুখ গোঁফ দাড়ি। চোখ দুইটি বিড়ালের চোখের মতো কটা এবং গোল। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া ছিল। সে একধারে একটু দূরে ছিল বলিয়া সূর্যসুন্দর হয়তো তাহাকে দেখিতেও পাইলেন না। সকলে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। গগনের শ্বশুর সাহেবী পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে একটু বেমানান দেখাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার মুখে যে ভদ্রতা এবং সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়াছিল তাহা অনুপম। গগনের শাশুড়ীর মুখে গালে, বিশেষ করিয়া গলার কাছে পাউডারের বাহুল্য একটু দৃষ্টিকটু হইয়াছিল। তাঁহার মুখের হাসিটাও মনে হইতেছিল মেকী, যেন বাহির হইতে কে মুখের উপর লাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তখন সমস্ত

ছবিটাই যেন বদলাইয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত দেখাইতেছিল সোমেন্দ্রবালাকে। শ্যামবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, হরিণের মতো বড় বড় কালো চোখ। মুখখানি অতি সুকুমার। ঠোঁট দুটি খুব পাতলা। মুখের ভাব বালকের মতো। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে তাহার বয়স ত্রিশ পার হইয়া গিয়াছে। মনে হয় পনের ষোলো বছরের এক বালক মেয়েমানুষের পোশাক পরিয়া রহিয়াছে। মাথায় ঘোমটা নাই। মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো এবং ভ্রমরকৃষ্ণ। খুব বেশী চুলও নাই। সিঁথায় সিঁদুর হইতেই চেনা যায় সে পুরুষ নয় নারী।

"কাকাবাবু, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সোমা—

প্রণাম করিয়া হঠাৎ সে আঁচলের ভিতর হইতে এক জোড়া মোজা বাহির করিল।

"আপনার জন্যে মোজা বুনে নিয়ে এসেছি। পরিয়ে দিই?"

সূর্যসুন্দরের পায়ে মোজা ছিল। তাহার উপরই সোমা আবার মোজা পরাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—"ঠিক হয়েছে। আন্দাজে করেছি তো, আমার ভয় ছিল পায়ে হবে কি না—"

গগনের শ্বশুর সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"বাইরে তো মেলা বসে গেছে। দেখে আমাদের ভয়ই হয়েছিল। আপনাকে সুস্থ দেখে ভারী নিশ্চিন্ত হলাম"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"আমি ভালো আছি। তোমাদের সবাইকে দেখে আমার অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু মনে হ'চ্ছে এই ভিড়ে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে খুব"

"কিছু না, কিছু না, কোন কষ্ট নেই। আপনাকে এত লোক ভালবাসে, এত লোক শ্রদ্ধা করে, এ দেখে আমাদের নয়ন সার্থক হয়ে গেল"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না। তাহার চোখের কোণে জল ছলছল করিতে লাগিল কেবল।

নিখিলবাবুর অনেক কাজ। তিনি বলিলেন—"আপনাদের ব্যবস্থা চোয়ারিতে করেছি। সমস্ত দিন ট্রেনে কেটেছে, চলুন এবার একটু বিশ্রাম করবেন। তারপর আবার না হয় আসবেন, একটা পালকি আপনাদের জন্যে হাজির থাকবে—"

ধনুকধারী বলিলেন—"কাকাবাবুর কাছে ভিড় করে থাকাও ঠিক নয়। চলুন আমরা যাই, পরে আসা যাবে—"

বাবা মার সাড়া পাইয়া চম্পাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"গগনের মা কোথা?" গগনের শাশুড়ী প্রশ্ন করিলেন।

"মা ভিতরে আছেন। আসুন—"

চম্পা মা বাবাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সোমাও উঠিয়া পড়িল—"কাকাবাবু, আমিও কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এখনি আসছি। একে চিনতে প'রছি না তো—"

স্বাতীর দিকে চাহিয়া সোমা মুচকি হাসিল।

"ও বিরুর বড় মেয়ে—"

"বাঃ, কি সুন্দর। আমি আসছি এখুনি। সকলের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। অনেক নতুন লোক এসেছে বাড়িতে—"

ধনুকধারীর সঙ্গে সোমা চলিয়া গেল। নিখিলবাবুও গেলেন।

"এরা কে দাদু?"—স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"জমিদার ত্রিপুরা সিংয়ের ছেলে মেয়ে। তুমি ভিতরে যাও, গগনের শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম কর গিয়ে"

"হ্যাঁ যাও—" কবিরাজ মশায়ও সায় দিলেন।

স্বাতী উঠিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিল আবার।

"দাদু তোমাকে মিকশ্চারটা খাওয়ানো হয় নি। গেলেই ছোটকাকী জিগ্যেস করবে—"

"ওষুধ খেতে আর ইচ্ছে করে না—"

"ওসব ছোটকাকীকে বোলো। আমি যদি ওষুধ না খাইয়ে যাই আমাকে বলবে ফাঁকিবাজ"

"দাও তাহলে—"

নিপুণভাবে সূর্যসুন্দরের গলায় তোয়ালে জড়াইয়া স্বাতী তাঁহাকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর সে যাহা করিল তাহা অদ্ভুত। যে গ্লাসে করিয়া সে ঔষধ খাওয়াইল তাহাতে যে ঔষধটুকু লাগিয়া ছিল তাহা সে নিজের মুখে ঢালিয়া দিল। ফোঁটা দুই ঔষধ তাহার মুখে পড়িল। তাহার পর সবিস্ময়ে বলিল—"দাদু, এমন সুন্দর ওষুধ তুমি খেতে চাইছ না! এতো চমৎকার খেতে! এইবার সত্যি দুষ্টুমি আরম্ভ করেছ তুমি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

"দুষ্টুমি না করলে কি অমন সুন্দর মুখের বকুনি পাওয়া যায়!"

স্বাতী ঘাড় বাঁকাইয়া তির্যকদৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—"আপনাকে কলা এনে দিচ্ছি!" বলিয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় একটি দার্শনিক মন্তব্য করিলেন।

"পৃথিবীতে ফুল অনবরত ফুটে যাচ্ছে আর ঝরে যাচ্ছে। আমরা সবাই ফোটা ফুল আর ঝরা ফুলের মেলায় বসে আছি। আমরা যদিও ঝরা-ফুলেরই দলে তবু বেশ মজা লাগছে—"

কবিরাজ মশায়ের বক্তব্য শেষ হইল না জগাই কুণ্ঠিতভাবে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ সসংকোচে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, বুঝিতে পারিয়াছিল যে সূর্যসুন্দর বুঝিতে পারেন নাই যে সে আসিয়াছে। সে পুনরায় প্রণাম করিয়া আনতনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার সূর্যসুন্দর চিনিতে পারিলেন।

"কে, জগু? তুই কখন এলি—"

সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তাহার দিকে।

"আমি এই এঁদের সঙ্গে এলাম—"

"আজকাল কোথা আছিস তুই—"

"ব্যাণ্ডেল—"

"কি করিস সেখানে—"

জগাই কবিরাজ মশায়ের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে যে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে কুলির কাজ করে তাহা আর ব্যক্ত করিতে পারিল না। কবিরাজ মহাশয়ও তাহার বাবাকে চিনিতেন, তাহাকেও চিনিতেন। তিনিও নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিলেন।

জগাই বলিল, "এমনি একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছি"

"আমার অসুখের খবর কি করে পেলি?

"মধু মোড়লের সঙ্গে পরশু ট্রেনে দেখা হয়েছিল, সেই বললে"

"ভাল আছিস তো?"

এই কথায় জগাই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল এবং চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"ভিড়ে আপনার কষ্ট হ'চ্ছে। এখন একটু খালি হয়েছে। চোখ বুজে একটু শুয়ে থাকুন। আমিও আর বসব না, উঠি। ওই যে ছোটমাও এসে গেলেন"

কবিরাজ মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন। ঊর্মিলা আসিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে বসিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিল রামটহল। তাহার পিছনে আর একটি ভৃত্য। তাহার এক হাতে প্রকাণ্ড একটি রূপার পরাত এবং আর এক হাতে একটি হাঁড়ি। রামটহলের হাতে ছোট একটি থলি। থলিটি লাল রেশমের এবং কারুকার্যময়।

সঙ্গে সঙ্গে গগনও আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কি রামটহল, এসব কি—"

"মালিক কুছ ভেট ভেজ দিহিন হ্যাঁয়"

রামটহলের মুখ গর্বে আনন্দে উদ্ভাসিত। সে একটি পত্রও গগনকে দিল। ধনুকধারী সিং লিখিয়াছে।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, বৌমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার পাঠাইলাম। আমি একটি শাড়ি ও কুড়িটি মোহর আনিয়াছিলাম। সোমাও একটি শাড়ি এবং দশ সের সন্দশ আনিয়াছে। গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। প্রণাম লইবেন। ইতি

প্রণত ধনুকধারী

গগন দেখিল দুইটিই বেশ মহার্ঘ শাড়ি।

সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন—"কি ওসব?"

"ধনুকধারীবাবু আর সোমা চম্পার জন্য শাড়ি, সন্দেশ আর মোহর পাঠিয়েছেন—"

"ভিতরে নিয়ে যাও। বড়বৌমাকে দাও গিয়ে—"

সূর্যসুন্দর ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন। চোখ বুজিয়া রহিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না। চোখের সম্মুখে রাজলক্ষ্মীর ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ঠিক যেন জীবন্ত মূর্তি। পরনে টকটকে লালপাড় শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করিতেছে। মনে হইল সে যেন কি বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, বলি-বলি করিয়া থামিয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তাহার পায়ে কে যেন হাত বুলাইতেছে। চোখ খুলিয়া দেখিলেন, জগু। জগু যখন এখানে স্কুলে পড়িত তখন সে তাঁহার পা টিপিত। রবিবার দ্বিপ্রহরে জগুকে দিয়া পা না টিপাইলে তাঁহার ঘুম আসিত না। সেই জগু এতদিন পরে আবার আসিয়াছে। সন্তোষের ছেলে। দেখিতে দেখিতে সব কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

।। একুশ।।

চম্পার সাধের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। কত লোক যে খাইয়াছিল তাহা কেহ গণনা করে নাই। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্ত অবিরাম লোক খাইয়াছে। নিখিলবাবুর কর্মতৎপরতা দেখিয়া যুবকের দল অবাক হইয়া গেল। বৃদ্ধবয়সেও যে তিনি এত খাটিতে পারিবেন, এমন নিখুঁত নিপুণ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। রমেশবাবু আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে সব ছেলে-ছোকরাদের উপর পরিবেশনের ভার থাকিবে তাহারাই শেষ পর্যন্ত কাজ পণ্ড করিয়া দিবে। কারণ রমেশবাবুর ধারণা আজকালকার প্রত্যেকটি ছোকরাই বাক্যবাগীশ এবং ফাঁকিবাজ। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ঠিক উল্টা। তাহারা এমন সুশৃঙ্খলার সহিত এমন আন্তরিকভাবে কাজ করিল যে রমেশবাবুকে ধারণা বদল করিতে হইল। কিন্তু এই ছোকরার দলও হার মানিয়াছে বৃদ্ধ নিখিলবাবুর কাছে। তিনি চরকির মতো সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং সুদক্ষ সেনাপতির মতো সমস্ত ব্যাপারটার রাশ এমন দৃঢ়হস্তে টানিয়া রাখিলেন যে কোথাও ছন্দপতন হইল না। সুবাতালী তহসিলদার, গোবিন্দ মণ্ডল, চমকলাল সিং, ওঝাজি প্রভৃতি মাতব্বরগণও নিখিলবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রমেশবাবু বলিলেন—"আমার মনে হ'চ্ছে কোন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব এসে কাজ করে গেল। ওই বখা ছোঁড়াগুলো যে অমনভাবে কাজ করল এতে আমি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেছি। পচা ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে গেল, তাজ্জব ব্যাপার!"

"এর আর তাজ্জব কি আছে! মোহাব্বত সে সব কুছ্ হোতা হ্যায়। ডাক্তারবাবুকে সবাই ভালবাসে। তাই জান দিয় সবাই খেটেছে। খাটনাই চাহিয়ে!"—সুবাতালী বলিলেন।

"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সীয়ারাম।"

গোবিন্দ মণ্ডল মাথায় হাত বুলাইয়া যখনই 'সীয়ারাম' উচ্চারণ করেন তখনই বোঝা যায় তিনি হয় কাহারও বাক্য সমর্থন করিতেছেন অথবা কাহারও বাক্যের প্রতিবাদ করিতেছেন। এক্ষেত্রে মনে হইল তিনি সুবাতালীর উক্তির সমর্থন করিলেন। চমকলাল সিং একটি বিষয়ের জন্য মনে মনে উৎসুক ছিলেন। তিনি ওঝাজির সহায়তায় যে হারটি কলিকাতা হইতে আনাইয়া চম্পাকে উপহার দিয়াছেন তাহা চম্পার মনোমত পছন্দ হইয়াছে কি না তাহা তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারেন নাই। গোবিন্দ মণ্ডলের উপর টেক্কা দিবার জন্যই তিনি হারটি কলিকাতা হইতে আনাইয়াছেন। গোবিন্দ মণ্ডল মুখে যতই 'সীয়ারাম' করুন চমকলালের বিশ্বাস আসলে তিনি একটি গ্রাম্য ঘুঘু। কুমারকে যে তিনি প্রথম দিন আসিয়াই দুই শত টাকা দিয়াছেন ইহা তিনি গোপন করিতে চাহিলেও চমকলাল সিং জানিতে পারিয়াছেন। জানিতে পারিয়া মনে মনে হাসিয়াছেন—"গাঁওয়ার লোক কিনা! তাই নগদ টাকা দিতে গিয়াছে। ডাক্তারবাবুর যেন টাকার অভাব!" ওঝাজি তাঁহাকে যে হারটি আনাইয়া দিয়াছেন সেটির দাম পড়িয়াছে পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা সাড়ে ছ আনা। হারের নাম 'পুষ্পহার'। হার দেখিয়া তাঁহার তো চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছে, এখন 'বহুমায়ী'র পছন্দ হইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিয়াছেন এই ভিড়ে তাহা জানিবার উপায় নাই। ঠিক করিলেন পরে কোনও এক সময়ে আসিয়া জানিয়া লইবেন। সুবাতালী তহসিলদার খুব দামী রেশমী শাড়ি, রেশমী ওড়না এবং নগদ একশ এক টাকা দিয়াছেন। ভোজের দুধ দই এবং ঘিও বিনামূল্যে

সরবরাহ করিয়াছেন তিনি। ধনী দরিদ্র সকলেই কিছু-না কিছু উপহার আনিয়াছে। এতো উপহার আসিয়া জুটিয়াছে যে ঘরে রাখিবার স্থান নাই।

সুবাতালী তহসিলদার মজলিসে বসিয়া সূর্যসুন্দর সম্বন্ধে যে গল্পটি করিলেন তাহা অদ্ভুত। সূর্যসুন্দর প্রথমে আসিয়া নাকি প্রিয়গোপালের বাবা হকরু চৌধুরির গোয়ালঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁহার কোন প্র্যাকটিসই হয় নাই। তখন ভৈরোঁ দুবে, নিগম পাঠক আর কানু কছুয়ার খুঁব প্র্যাকটিস। তিনজনই কবিরাজ। ডাক্তারবাবুকে তখন কেউ চিনিতই না। কোট প্যাণ্ট পরিয়া উনি গঙ্গার ধারে সকাল সন্ধ্যা আপনমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইভাবে রোজই বেড়ান, একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন গঙ্গার ধারে একটা লোক পড়িয়া আছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল কোনো মাতাল বুঝি। কাছেই একটা নৌকা ছিল, তাহার মাঝি বলিল মাতাল নয়, মড়া। সূর্যসুন্দর কাছে গিয়া দেখিলেন। প্রথমে তাঁহারও মড়া বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন লোকটা তখনও মরে নাই। তাহার নিকটে গিয়া বমি এবং পায়খানর চিহ্ন দেখিয়া তিনি আন্দাজ করিলেন লোকটার সম্ভবতঃ কলেরা হইয়াছিল চিকিৎসা করিলে হয়তো বাঁচিতে পারে। তিনি গ্রামে ঢুকিয়া চেষ্টা করিলেন যদি একটা খাটিয়া এবং লোকজন জোগাড় করিয়া লোকটাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কেহই রাজী হইল না। তখন তিনি যাহা করিলেন তাহা একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। লোকটাকে কাঁধে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া আসিলেন। তাহার চিকিৎসা করিয়া সেবা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। তাহার পর হইতেই একটা রব উঠিয়া গেল ডাক্তারবাবু মড়া বাঁচাইয়াছেন। তখন হইতেই তাঁহার প্র্যাকটিস শুরু হইয়া গেল। কিছুদিন পরে ভৈঁরো দুবে, নিগম পাঠক এবং কানু কছুয়াও তাঁহাকে রোগী দিতে লাগিল। উহারা নিজেরাও শেষ পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর রোগী হইয়া পড়িয়াছিল। গল্পটি শেষ করিয়া সুবাতালী তহসিলদার বলিলেন, ডাক্তারবাবুর ভিতর একটা 'জাদু' আছে, যাহার সহিত তাঁহার একবার আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত আর ছাড়াছাড়ি হয় নাই। একেবারে আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছে! তাহার পর চক্ষুর ইশারায় গোবিন্দ মণ্ডলকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন—মড়রজি তো ইহার সাবুত্ (সাক্ষী) দিতে পারেন। গোবিন্দ মণ্ডল চক্ষু বুজিয়া ছিলেন, তিনি হঠাৎ সীয়ারাম সীয়ারাম করিয়া উঠিলেন, সুবাতালীর কথায় তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিল মাত্র, কিন্তু তিনি চোখ খুলিলেন না। প্রথম যৌবনে গোবিন্দ মণ্ডল ত্রিপুরারী সিংহের বিরুদ্ধ পক্ষ নীলকর জমিদার টেলার সাহেবের পক্ষে ছিলেন। সূর্যসুন্দরকে অন্যান্য জমিদাররা সকলেই মনে করিত ত্রিপুরা সিংহের বন্ধু। ত্রিপুরা সিংহ প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। অন্যান্য জমিদাররা তাঁহার ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। ত্রিপুরা সিংহের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া সূর্যসুন্দর প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। কারণ ত্রিপুরা সিংহের বন্ধু বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। গোবিন্দ মণ্ডলও এই দলে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র যখন টাইফয়েডে পড়িল এবং কানু কছুয়া, ভৈরোঁ দুবে দুইজনেই যখন জবাব দিয়া গেল তখন অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল সুরযুবাবুকে ডাকিয়া দেখাইতে। গোবিন্দ মণ্ডল প্রথম প্রথম সাহস করেন নাই। অবশেষে তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল, তিনি গিয়া টেলার সাহেবের পরামর্শ চাহিলেন। সাহেবের হাঁটুতে বাত ছিল। তিনি বলিলেন ডাক্তার মুখার্জির মতো ভালো ডাক্তার এ অঞ্চলে নাই, আমিও তাঁহাকে দিয়া বাতের চিকিৎসা করাইব ভাবিতেছি। এতো লোক যখন তাঁহার

সুখ্যাতি করে তখন লোক নিশ্চয় খারাপ নয়। যে ত্রিপুরা সিংহ কাহারও বশীভূত নন তিনিও যখন ডাক্তারবাবুকে অত খাতির করেন তখন বুঝিতে হইবে লোকটি সত্যই ভালো। গোবিন্দ মণ্ডল দ্বিধা ত্যাগ করিয়া অবশেষে সূর্যসুন্দরকে একদিন 'কল' দিলেন। 'কল' দিয়াই বুঝিলেন সূর্যসুন্দর কি জাতের মানুষ। তিনি আসিয়াই কি বলিয়াছিলেন তাহা এখনও গোবিন্দ মণ্ডলের মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঁচাইবার বা মারিবার মালিক ভগবান, তিনি নহেন। তিনি চেষ্টা মাত্র করিতে পারেন। তিনি আরও একটা কাজ করিয়াছিলেন, যাহা অদ্ভুত। কানু কছুয়া এবং ভৈঁরো দুবেকেও ডাকাইয়া আনাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে যদিও ইহারা কবিরাজী মতে চিকিৎসা করেন কিন্তু ইঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, কারণ ইঁহারা প্রবীণ চিকিৎসক। ইঁহাদের উপদেশ সর্বদাই শিরোধার্য। ইঁহাদের সঙ্গে লইয়াই তিনি তাঁহার ছেলের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একষট্টি দিনের পর জ্বর ছাড়ে। আর একটা আশ্চর্য কথা, যতদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন এক পযসা 'ফি' লন নাই। ফি দিতে গেলেই বলিতেন আগে ছেলে ভালো হোক, তাহার পর ওসব কথা হইবে। ছেলেকে যেদিন পথ্য দিলেন সেদিন প্রচুর সিধা, কাপড়-চাদর এবং দুইশত টাকার একটি থলি তিনি উপহার দিতে গেলে ডাক্তারবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও আশ্চর্যজনক। বলিয়াছিলেন, সিধা এবং কাপড়-চোপড় আমি লইলাম। কিন্তু টাকাটা লইব না। উহার বদলে আরও বেশী মূল্যবান জিনিস আমি চাই। বিস্মিত গোবিন্দ মণ্ডল যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সে জিনিস, ডাক্তারবাবু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, আপনার দোস্তি। পৃথিবীতে প্রেমই সর্বাপেক্ষা দামী জিনিস, তাহাই আমাকে দিন। ত্রিপুরারি সিংহের কথাও সেই সময় আলোচিত হইয়াছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে যে গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস্য। অন্য কেহ বলিলে তিনি বিশ্বাসই করিতেন না, কিন্তু সুরযুবাবুর কথা অবিশ্বাস করা যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন যখন তিনি এখানে আসেন তখন মাত্র বারো আনা পয়সা তাঁহার সম্বল ছিল। তাঁহার মামা সাহেবগঞ্জে ডাক্তারী করিতেন। তিনি ত্রিপুরাবাবুর দেওয়ান হকরু চৌধুরীকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়র থাকিবার একট ব্যবস্থা তিনি যেন করিয়া দেন। সেই সময় হকরু চৌধুরি তাঁহার গোয়ালের ঠিক পাশেই গরুর চাকরদের শুইবার জন্য মাটির একটি ঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই ঘরটিই তিনি ডাক্তারবাবুকে থাকিতে দিলেন। প্রথম প্রথম কোন রোগীই জুটিত না। ওই বারো আনা পয়সায় ডাক্তারবাবু এক মাস চালাইয়াছিলেন। তখন টাকায় বত্রিশ সের দুধ পাওয়া যাইত। ডাক্তারবাবু প্রত্যহ দুই পয়সার দুধ কিনিতেন। তাহাতেই তাঁহার দুইবেলার খাওয়া হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে দেওয়ানজির বাড়ি হইতেও তাঁহার জন্য খাবার আসিত। এক মাস পরে ডাক্তারবাবু একেবারে নিঃস্ব হইয়া গেলেন। সুবাতালী তহসিলদার কলেরা রোগীর যে কাহিনীটি বলিলেন তাহা পরের ব্যাপার। স্বয়ং ডাক্তারবাবুর মুখ হইতে গোবিন্দ মণ্ডল আসল 'কিস্‌সা' (গল্প) আগেই শুনিয়াছেন। সুবাতালী আসল কথাটি জানেন না, একটা ভুল খবর শুনাইয়া দিলেন। প্রতিবাদ করা গোবিন্দ মণ্ডলের স্বভাব নয়। কিন্তু তিনি মনে মনে আসল 'কিসসা'টি রোমন্থন করিয়া নিমীলিতনয়নে ডাক্তারবাবু বর্ণিত চিত্রটি মনে মনে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। নিঃস্ব ডাক্তারবাবু ক্ষুধার্ত অবস্থায় ত্রিপুরা সিংহের কাছারির সামনে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। কাছারির সামনে প্রচুর ভিড়। ত্রিপুরা সিংহের ম্যানেজার রায় মহাশয় আসিয়াছেন। টেলার সাহেবের সহিত একটা সংঘর্ষ আসন্ন। চারিদিকে সাজ সাজ পড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দ মণ্ডলের মনে পড়িল

তিনি তখন বৈরিঁয়া অঞ্চলে টেলার সাহেবের জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। কেহই ত্রিপুরা সিংহের বিরুদ্ধে লড়িতে রাজী নয়, পূর্বেই রায় মহাশয় সকলকেই নিজের দলভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন কাছারির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কোথাও বড় বড় পালোয়নেরা কুস্তি করিতেছে, কোথাও তরবারি-খেলা হইতেছে, কোথাও লাঠি খেলা হইতেছে। রায় মহাশয় বসিয়া এইসব দেখিতেছেন। তাঁহার পাশেই টাকার থলি লইয়া গোমস্তা বসিয়া আছে, বিজয়ী বীরদের বকশিস দিবে। রায় মহাশয়ের এক চোখ কানা ছিল। একবার বিদ্রোহী সাঁওতাল প্রজাদের দমন করিতে গিয়াছিলেন, সাঁওতালের তীর লাগিয়া একটি চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আর একটু বেশি বিঁধিলে প্রাণও যাইত। রায় মহাশয়ের চক্ষু একটি ছিল বটে কিন্তু ওই একটি চক্ষু দিয়াই তিনি যাহা দেখিতেন দুইটি চক্ষু দিয়াও অনেক লোক তাহা দেখিতে পাইত না। একটি অপরিচিত বাঙালী যুবক যে তাঁহার কাছারির সামনে পায়চারি করিতেছে ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। একজন লোক পাঠাইয়া তিনি ডাক্তাববাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন পরিচয় পাইলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ এবং পাস-করা ডাক্তার (পাস-করা ডাক্তার তখন ও অঞ্চলে ছিল না) তখন সমাদর করিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইলেন এবং রাত্রে খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন ডাক্তারবাবুর আশঙ্কা হইয়াছিল হয়তো অনাহারে কাটিবে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভূরিভোজন হইল। শুধু তাহাই নয়, রায় মহাশয়ের সহিত সেদিন তাঁহা যে পরিচয় হইল তাহার ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হইয়া পরে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। রায় মহাশয় এবং তাঁহার পরিবারবর্গ পরে ডাক্তারবাবুর পরিবারের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর সম্পূর্ণ পরিচয় অবশ্য রায় মহাশয় প্রথম দিন পান নাই। পাইয়াছিলেন প্রায় মাসখানেক পরে যখন টেলার সাহেবের সহিত দাঙ্গা হইয়া গেল। টেলার সাহেবের একজন লোক খুন হইয়া গিয়াছিল এবং পুলিশ ত্রিপুরা সিংহের সদর নায়েব ত্রিলোকনাথ পাণ্ডেকে আসামী হুলিয়া বাহির করিয়াছিল। রায় মহাশয় ত্রিলোকনাথবাবুকে বাঁচাইবার জন্য ডাক্তারবাবুকে একটি মিথ্যা সার্টিফিকেট দিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন যে লিখিয়া দেন যে গত দুই মাস হইতে ত্রিলোকনাথ আমারই চিকিৎসায় আছেন। ইহার জন্য ডাক্তারবাবুকে তিনি হাজার টাকা পর্যন্ত 'ফি' কবুল করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু রাজী হন নাই। যদিও তিনি তখন নিঃস্ব, যদিও তিনি জানিতেন যে রায় মহাশয়ের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করা বিপজ্জনক তবু তিনি রাজী হন নাই। রায় মহাশয় এ প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁহার মোক্ষম অস্ত্রটিও শেষ পর্যন্ত ছাড়িলেন। বলিলেন—ত্রিপুরা সিংহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি আপনি এখানে থাকিতে পারিবেন? ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, আমি এখানে থাকিব না। যত শীঘ্র সম্ভব এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব। সত্যই তিনি একদিন চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া স্বয়ং ত্রিপুরা সিং আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাও অপ্রত্যাশিত। বলিলেন, মিথ্যা সার্টিফিকেট দুর্লভ নহে। মাত্র একশত টাকা খরচ করিয়া তিনি সিভিল সার্জনের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া আসিয়াছেন। সাঁচ্চা লোকই দুর্লভ। আপনার মতো সাঁচ্চা লোককে যখন আমরা পাইয়াছি তখন ছাড়িব না। আপনাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আমি ম্যানেজারবাবুকে বলিয়া দিতেছি, আপনার থাকিবার সব সুব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। সেই হইতে ডাক্তারবাবু

এখানে থাকিয়া গেলেন। গোবিন্দ মণ্ডল আর একবার সীয়ারাম সীয়ারাম বলিয়া হাঁই তুলিলেন। তাঁহারও এই মজলিসে ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কারণ তাঁহার ধারণা ডাক্তারবাবুর স্বরূপ তিনিই সকলের চেয়ে ভালো করিয়া চেনেন, তাঁহার বিষয়ে 'বহুত্ কিস্‌সা'ও তাঁহার জানা আছে, কিন্তু এই বাক্যবাগীশ ফপবদালালদের সহিত পাল্লা দিয়া গল্প বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ডাক্তারবাবুকে ইহারা কেহ চেনে কি? সব উপর-উপর দেখিয়াছে। চিনি ত বটে কানা রায় মহাশয়। টেলার সাহেব চলিয়া যাইবার পর ডাক্তারবাবুর সুপারিশে গোবিন্দ মণ্ডল রায় মহাশয়ের সুনজরে পড়িয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, আপনি যদি চান আপনাকেই মনিহারি কুঠির নায়েব করিয়া দিব। কিন্তু গোবিন্দ মণ্ডল রাজী হন নাই, কোথাও চাকবি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। অতবড় একটা দুর্দান্ত লোক তাঁহাকে যে নেকনজরে দেখিতেছেন ইহাই তিনি যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে আর একবার মাথায় হাত বুলাইলেন।

চমকলাল সুবাতালীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি ডাক্তারবাবুর জাদুর কথা যাহা বলিলেন তাহা খুবই ঠিক। কিন্তু ওই জাদুর মন্ত্রটি কি তাহা জানেন? তিনি সকলের মুখের দিকে একটা স্পর্ধিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন আসল সত্যটি তিনি ছাড়া আর কেহ জানেন না, জানিতে পারেন না, যদি কেহ জানেন তাহা হইলে তিনি তাহা এই মজলিসে ব্যক্ত করুন। কেহই কিছু ব্যক্ত করিল না, সকলেই তাঁহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চমকলাল বলিলেন, ডাক্তারবাবুর আসল জাদু কেবল তাঁহার উদারতাই নয় সে উদারতার জন্য বিপদকে তুচ্ছ করিবার আগ্রহ এবং জিদ। আজ বহুকাল আগেকার একটা কথা মনে পড়িতেছে। তখন অমি বুত্রু (ছোট বালক), ডাক্তারবাবুর প্র্যাক্‌টিস তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রপুরে আমার এক নানী ছিল। নানী খবর পাঠাইল যে তাহাদের এক 'পড়োশী' (প্রতিবেশী) ঠাণ্ডা লাগিয়া বড়ই বেহালত্ (অসুস্থ) হইয়া পড়িয়াছে। কানু কছুয়া বলিয়া গিয়াছে বুকে কফ বসিয়া নিমোনিয়ায় দাঁড়াইয়াছে। সুরযুবাবু ডাক্তার আসিয়া যদি হাল ধরেন তবেই নৌকা পারে লাগিতে পারে। কিন্তু বেচারী বড়ই গরীব, সুরযুবাবুর ফিস্ দিবার সামর্থ্য নাই। সেদিন আমাদের জলকর হইতে মাছ আসিয়াছিল। বাবা একটা বড় দশ-সেরী রহু (রুই) ডাক্তারবাবুকে ভেট পাঠাইলেন সঙ্গে আমি গেলাম। তখন বর্ষাকাল, বড় মাছ পাওয়া যায় না, ডাক্তারবাবু মাছটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া আমি নানীর পড়োশীর কথা পাড়িলাম। ইহাও বলিলাম যে সে বড় গরীব, ফিস্ দিতে পারিবে না। ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, বেশ আমি গিয়া দেখিয়া আসিব। তুমি একটা নৌকা লইয়া এস। আমি ইহা প্রত্যাশা করি নাই। বাবাকে গিয়া বলিলাম, তিনি একটা নৌকা ঠিক করিয়া দিলেন। আমিই ডাক্তারবাবুর সহিত গেলাম। নৌকা যখন গ্রামের সীমানা পার হইয়া গেল তখন আমার মনে হইল এ কোথায় চলিয়াছি, চারিদিকেই জলে জলময়। গ্রামের কাছেই সমুন্দর (সমুদ্র) আসিয়া গেল না কি। অমন বান আমি আর কখনও দেখি নাই। মাঝিটা ভয় পাইয়া গেল। আমরা তখন মেদিনীপুরের কাছাকাছি গিয়াছি। সে বলিল কোথাও কিছু ঠাহর হইতেছে না, আমি যাইতে পারিব না। ডাক্তারবাবু বলিলেন, বেশ তুমি না যাইতে চাও তো ভগ্‌গু মাঝিকে ডাকিয়া আন, তাহার বাড়ি কাছেই। মাঝি একটা নৌকা বাঁধিয়া ভগ্‌গু মাঝিকে ডাকিতে গেল। আমরা ভগ্‌গুর জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু এ সুযোগের অজুহাতে অনায়াসেই

বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, কিন্তু আসিলেন না। ভগ্‌গুর আগমন প্রতীক্ষায় সেই নৌকার উপর বসিয়া রহিলেন। আমারও ভয় করিতে লাগিল, আমিও ডাক্তারবাবুকে বলিলাম, চলুন বাড়ি ফিরিয়া যাই। তখন ডাক্তারবাবু আমাকে একটি কথা বলিয়াছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। বলিয়াছিলেন, রোগীটি গরীব, আমাকে ফিস্ দিতে পারিবে না একথা না জানিলে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু ওকথা শুনিয়া আর ফিরিতে পারি না, আমাকে যাইতেই হইবে। ভগ্‌গুও আসিয়া দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চাহিয়া ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল, ডাক্তার বাবু, কাল থেকে আমার পেটে খুব 'দবদ', আমি এ মেহনতের কাজ গছতে পারব না। ডাক্তারবাবু বুঝিলেন ভগ্‌গু 'মক্‌ড়া' (ভান) করিতেছে। বলিলেন, তুমি 'ঝুট বাত' (মিথ্যা কথা) বলিতেছ কেন। তোমার যে কিছু হয় নাই তাহা তো তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। আমি এখন না গেলে একজন লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে। তুমি থাকিতে আমি সেখানে পৌঁছাইতে পারিব না, ইহা বড়ই আপসোসের কথা। মাস দুই আগে তোমার বেটী জ্বরে বেহোঁশ (অজ্ঞান) হইয়া গিয়াছিল তখন অন্ধকার রাত্রে তুমি আমার নিকট ছুটিয়া গিয়ছিলে। আমি যদি তখন না আসিতাম তোমার কি রকম মনে হইত? ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া ভগ্‌গু একটু নরম হইল। কিন্তু তবু মিথ্যাটাকে ছাড়িল না। বলিল, তাহা হইলে আমাকে একটা দরদের দাবাই দিন। সত্যই দরদ এখনও একটু একটু আছে। ডাক্তারবাবু ঔষধ দিলেন। ভগ্‌গু নৌকায় উঠিয়া বৈঠায় বসিল। ভগ্‌গুর মতো অভিজ্ঞ মাঝিকে সঙ্গী পাইয়া আমাদের মাঝিটাও যাইতে রাজী হইয়া গেল। অমন প্রবল বন্যা আমি আমার জীবনে কখনও দেখি নাই। যতদূর দেখা যায়, কেবল জল আর জল, মাঝে মাঝে কেবল বড় বড় গাছের মাথা, কোথাও কোথাও বা নিমজ্জিত গ্রামের ঘরগুলি। আমাদের চেনা পথ-ঘাট যেন একাকার হইয়া অচেনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ্‌গুর মুখ প্রশান্ত, ডাক্তারবাবুও নির্বিকার। বান কেন হয় তিনি আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়াই ভগ্‌গু বলিল হাওয়ার গতি, পাখীর ওড়া এবং মেঘের 'লছ্‌ছন' দেখিয়া তাহার মনে হইতেছে যে কিছুক্ষণ পরেই আবার দুর্যোগ নামিবে। সুতরাং রাত্রের মতো হাঁসবর গ্রামে আশ্রয় লওয়াই উচিত, সেখানের ভেজু তেওয়ারির বাড়িটা ডোবে নাই। ডাক্তারবাবু রাজী হইলেন না। বলিলেন, শক্ত রোগী দেখিতে যাইতেছি। অত ভবিষ্যৎ ভাবিলে চলিবে না। বিপদ উপস্থিত হইলে তখন যাহা হয় করা যাইবে। ডাক্তারবাবুর জিদ দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। নৌকা চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু ভগ্‌গুকে গান গাহিতে বলিলেন। এমন কি কোন্ গানটি গাহিতে হইবে. তাহাও বলিয়া দিলেন। ভগ্‌গু গাহিতে লাগিল, "পম্পাতীরমে শোভত হ্যায় সীয়ারাম লছমনজী"। ভগ্‌গুর সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর জ্ঞান দেখিয়া আমি তাজ্জব বনিয়া গেলাম। আমিও ভগ্‌গুকে অনেকদিন হইতে চিনিতাম কিন্তু সে যে এমন ভালো গান গাহিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। গান গাহিয়া এবং গল্প করিয়া অনেকখানি সময় কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম হাওয়ার বেগ বাড়িতেছে। ভগ্‌গু অভিজ্ঞ মাঝি, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। একটুপরেই তুমুল দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। ঝড় ও বৃষ্টি। ভগ্‌গু বলিল আর নৌকা চালানো

যাইবে না। সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিল। কাছেই বেশ একটি বড় জিওল গাছ ছিল। ভগ্‌গু তাহারই গুঁড়িতে বেশ শক্ত করিয়া নৌকাটা বাঁধিল। আমরা সকলে নৌকার ছইয়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। ডাক্তারবাবু অনেক মজার মজার গল্প বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঝড়ের বেগে নৌকাটা দুলিতেছিল, তাহাতে ঘুম শীঘ্রই আসিয়া গেল। ভগ্‌গু সমস্ত রাত ঘুমায় নাই, জাগিয়া বসিয়াছিল। সমস্ত রাত ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি চলিল। ভগ্‌গু নৌকার পিছন দিকে ও দুই পাশে বাঁশের লগি পুঁতিয়া কখন যে নৌকাটাকে আবার বাঁধিয়াছিল তাহা আমি জানি না। আমি তখন বুত্‌রু ছিলাম, এমন অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম যে সমস্ত রাত আর জাগি নাই। সকালে ডাক্তারবাবু আমাকে জাগাইলেন। বলিলেন, দেখ দেখ একটা মজার জিনিস দেখ। এমন জিনিস আর দেখিতে পাইবে না। দেখিয়া সত্যই তাজ্জব বনিয়া গেলাম। গাছের উপর তিনটি বড় বড় সাপ এবং অনেক ব্যাঙ একত্রে রহিয়াছে। কেহ কাহাকেও কিছু বলিতেছে না। দেখিলাম একটা সাপের মুখের কাছেই একটি ব্যাঙ নির্ভয়ে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু বলিলেন একই বিপদে পড়িয়া ইহারা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্য নাগাদ আমরা হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছিলাম। সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর ঘাটে দেখিলাম কয়েকজন লোক লণ্ঠন এবং ছাতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুনিলাম ত্রিপুরারি সিং অসুস্থ। তাঁহার জন্য চাঁচল হইতে ডাক্তার আনিবার জন্য লোক গিয়াছিল। আমাদের নৌকা দেখিয়া উহারা মনে করিয়াছিলেন যে চাঁচলের ডাক্তারই বুঝি আসিলেন। আমাদের ডাক্তারবাবুকে লইয়া আমি নানীর বাড়ি চলিয়া গেলাম। ডাক্তারবাবু গিয়াই রোগী দেখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা 'সুই' (ইনজেক্‌শন) দিলেন। তাহার পর খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থাও করিলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটি কাঠের বাক্স থাকিত, আপনাদের মনে আছে বোধহয়, সেইটিই ছিল তাঁহার ডিস্‌পেনসারি। সেখান হইতে নিজে হাতে তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এক দাগ 'দাবাই' নিজে হাতে তিনি রোগীটিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন এখন 'বাচ্' (ওয়াচ্) করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি আবার একটা 'সুই' দিবেন। এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি হাত মুখ ধুইয়া 'নাস্তা' (জলখাবার) খাইতে যাইতেছিলেন এমন সময় ত্রিপুরা সিংয়ের বাড়ি হইতে মুকুনবাবু (মুকুন্দবাবু) আসিয়া হাজির। ত্রিপুরা সিংহের শালা মুকুনবাবুর কথা ডাক্তারবাবু খুব মানিতেন। মুকুনবাবু বলিলেন চাঁচল হইতে ডাক্তার আসে নাই, ত্রিপুরা সিংয়ের চিকিৎসার ভারও আপনাকে লইতে হইবে। ত্রিপুরাবাবু আপনার কথাই বারবার বলিতেছিলেন, কিন্তু আপনি এই বানের সময় অতদূর হইতে আসিতে পারবেন কি না সে সন্দহ সকলেরই হইতেছিল। আমাদের নৌকাটাও তত মজবুত নয়, তাই আমরা চাঁচলেই লোক পাঠাইয়াছিলাম। চাঁচল কাছেই কিন্তু সেখান হইতে ডাক্তারবাবু আসিতে পারিলেন না, ভগবান আপনাকেই শেষ পর্যন্ত পাঠাইয়া দিলেন। আপনিই চলুন, চিকিৎসার ভারটা নিন। ডাক্তারবাবু মুকুনবাবুর কথা ঠেলিতে পারিলেন না, 'নাস্তা' না করিয়াই চলিয়া গেলেন। ত্রিপুরা সিংয়ের পেটে ব্যথা হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর এক খোরাক ঔষধেই তাহা অনেকটা কমিয়া গেল। ডাক্তারবাবু হরিশচন্দ্রপুরে সাত দিন ছিলেন এবং দুটি

রোগীকেই পথ্য দিয়া তবে বাড়ি ফিরিয়াছিলেন। ত্রিপুরাবাবু তাঁহাকে নগদ তিনশত টাকা, প্রচুর সিধা, এক হাঁড়ি ঘি, এক হাঁড়ি দই, ও কাপড় চাদর দিয়াছিলেন। নানীর 'পড়োশী' শিবু ধুন্‌কর টাকা দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে একটি সুন্দর 'রেজাই' (লেপ) উপহার দিয়াছিল। ডাক্তারবাবু এটি লইতে চান নাই, কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন যে না লইলে শিবু দুঃখিত হইবে তখন লইলেন। এত সব কথা আমি বুঝি নাই, কারণ তখন আমি 'বুতরু' ছিলাম, পরে বড় হইয়া বুঝিয়াছি।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, চমকলাল, তোমার চুলে পাক ধরিয়াছে বটে কিন্তু তুমি এখনও বুতরুই (শিশু) আছ। তাহা না হইলে মামুর (মামার) কাছে মৌসির (মাসীর) কিস্‌সা শুনাইতে না। যাহা হউক যাহা বলিলে তাহা শুনিতে ভালই লাগিল।

গোবিন্দ মণ্ডল আর একবার সীয়ারাম সীয়ারাম বলিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া নিমীলিত চক্ষু দুইটিকে আর একটু কুঞ্চিত করিলেন।

বাহিরের একটা আটচালায় মজলিস বসিয়াছিল। চমকলালের চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল সে সুবাতালীর কথার জবাবে আরও কিছু বলিবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, বাধা পড়িয়া গেল। ঘণ্টু এবং তাহার পিছনে কয়েকটি চাকর প্রবেশ করিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে খাবারের থালা। গগনের শ্বশুর শাশুড়ী যে মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন তাহাই তাহারা আনিয়াছে। ঘণ্টুর বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুবাতালী তহসিলদারের সহিত তাহার পূর্বেই আলাপ হইয়াছিল। তিনি সকলের সহিত ইহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"কিরণিকে বেটা ছে—"

যে কিরণকে তাহারা সকলেই কোলে-পিঠে করিয়াছে, যে কিরণ এই সেদিন পর্যন্ত বেণী দুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার ছেলে এত বড় হইয়া গিয়াছে ইহা দেখিয়া বৃদ্ধের দল সকলে অবাক হইয়া গেল।

রমেশবাবু ঘণ্টুর মুখের দিকে এমন ভাবে চাহিয়া ছিলেন যেন তিনি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাহার পর সহসা তিনি ঘাড় নীচু করিয়া চমকলালের কানে কানে বলিলেন, "কিরণের ছেলে মিলিটারিতে বড় অফিসার। ওর ভয়ে দেরাদুনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।" কথাটা অবশ্য সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু আড্ডায় বা মজলিসে এরূপ মিথ্যা বেশ ফলপ্রদ। চমকলালের চক্ষু দুইটি ছানাবড়ার মতো হইয়া গেল। মিলিটারিকে তাঁহার বড় ভয়। একবার তাঁহার জমিদারিতে পিউনিটিভ পুলিস বসিয়াছিল। মিলিটারির যথেচ্ছাচার যে কি জিনিস্ এবং সরকারের দরবারে মিলিটারির খাতির যে কত তাহার একটা সত্য-মিথ্যা-পূর্ণ ধারণা তাঁহার আছে। ঘণ্টু সেই মিলিটারির বড় অফিসার ইহা শুনিয়া বুকটা গর্বে এখন ফুলিয়া উঠিল যেন ঘণ্টু তাঁহারই ছেলে। ঘণ্টুর সঙ্গে একটু আলাপ করিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিতেছিল। একজন মিলিটারি অফিসারকে গেঞ্জি গায়ে এমন ঘরোয়াভাবে এত সন্নিকটে মিষ্টান্ন-পরিবেশকরূপে পাওয়া যাইবে তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা

মনেই মিলাইয়া গেল। বাহিরে সাঁওতালী মাদলের শব্দ শোনা গেল—ধিতাং তাং ধিতাং তাং। একটু পরেই সাঁওতালের সরদার শনিচরিয়া আসিয়া আদা-হিন্দী আধা-বাংলা ভাষায় বলিল যে কাল ভোজের হাঙ্গামায় তাহারা বহুমায়ীকে 'নাচ' দেখাইতে পারে নাই, আজ দেখাইবে।

ঘণ্টু এই খবর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

।। বাইশ।।

হাটের উপর সাঁওতাল নাচ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। বড় গাম্‌হার গাছটার নীচে যে প্রশস্ত জায়গাটা ছিল সেখানেই কয়েকটা চেয়ার ইজিচেয়ার এবং শতরঞ্জির উপর বাড়ির মেয়েরা এবং আত্মীয়স্বজনেরা সমবেত হইয়াছিলেন। চম্পা মাঝখানে বসিয়া ছিল। অদ্ভুত সুন্দর দেখাইতেছিল তাহাকে। সে যে আসন্নপ্রসবা তাহা মনেই হইতেছিল না। তাহার দুই পাশে বসিয়া ছিলেন গগনের শ্বশুর শাশুড়ী। তাঁহারা দুইজনেই মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহারা একটু সাহেবী মেজাজের মানুষ, এই গ্রাম্য উৎসব তাঁহাদের খুব খারাপ লাগিতেছিল না বটে, কিন্তু উৎসবটা কক্‌টেল পার্টি বা ওইজাতীয় কিছু একট হইলে তাঁহাদের বেশী ভালো লাগিত। ইংরেজীতে যাহাদের 'স্নব' বলে তাঁহারা ঠিক ততটা অদ্ভুত না হইলেও তাঁহাদের চাল-চলন কথাবার্তা অনেকটা সেইরকম। কোন্ স্যুটের কত দাম পড়িয়াছে, কোন্ দরগীর কত মজুরি, কম মজুরি লইয়াও কোন্ গলির দরজী সাহেববাড়ির দরজীর মতো কাজ করে এই ধরনের আলাপেই তাঁহারা বেশী খুশী হন। সাঁওতাল নাচ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্যই খুশিই হইতেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করিবার জন্য নিম্নকণ্ঠে দিগন্তের কানে কানে বর্মার লোকনৃত্যের সহিত সাঁওতাল নাচের তুলনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন আগে তিনি রেঙ্গুনে গিয়া পোয়ে নৃত্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং পোয়ে নৃত্য দেখিবার জন্য তাঁহাকে কি পরিমাণ কষ্ট এবং ব্যয় করিতে হইয়াছিল সেইটাও ফলাও করিয়া বলিতেছিলেন। দিগন্ত স্মিতমুখে সব শুনিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখন নাচটা ভালো করে" দেখা যাক পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।" গগনের শ্বশুর জানিতেন না বিভিন্ন দেশীয় নৃত্য সম্বন্ধে দিগন্ত একটি ভালো প্রবন্ধ লিখিয়া এলাহাবাদ কলেজের এক সাহিত্যসভায় খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। গগনের শ্বশুর চুপ করিয়া গেলেন, তাঁহার মনে হইল নিজের বিদ্যা বা 'কালচার' 'ফ্লারিশ' করাটা সত্যই এখন অশোভন। তিনি ভবিষ্যৎ কোন সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এক উষা ছাড়া বাকি মেয়েরাও সব চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। উষা যদিও চোখ রাঙাইয়া এক দুই তিনকে চুপ করিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়েছিল কিন্তু নিজে চুপ করিয়া ছিল না। সে নৃত্যপরা সাঁওতাল মেয়েদের সম্বন্ধে স্বাতীর কানে কানে ফিসফিস করিয়া যাহা বলিতেছিল তাহা প্রায় সকলেই শুনিতে পাইতেছিল।

"ওই বাঁদিকের মেয়েটার ফিগার কি চমৎকার দেখেছিস? কেন যে আমাদের ওরকম ফিগার হয় না, গাদা গাদা চর্বি চাপ চাপ হয়ে আমাদের সর্বাঙ্গে বসেছে খালি। ওমা, মাঝখানের

ওই মেয়েটার মুখ ঠিক আমাদের ঘোষবাবুর মেয়ে শিউলির মতো নয়? শিউলির রংটা খালি ফরসা, চোখ মুখ নাক হুবহু এক—আশ্চর্য মিল তো”

হঠাৎ দিগন্তর চোখের দিকে চাহিয়া ঊষা থামিয়া গেল। দিগন্ত মুখে যদিও কিছু বলিতেছিল না কিন্তু তাহার চোখে যাহা ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহা ভয়ংকর। কপাল হইতে চুলগুলাও সে যে ভঙ্গিতে সরাইতেছিল তাহা দেখিয়া ঊষা বুঝিতে পারিল তাহার ভিতর ঝড় ঘনাইয়া আসিতেছে। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ভালো মানুষের মতো বসিয়া রহিল। স্বাতীও মুচকি হাসিয়া নাচ দেখিতে লাগিল, যেন সে এসব ব্যাপারের কিছুই জানে না।

উশনার স্ত্রী জগন্ময়ী একধারে আধঘোমটা দিয়া নিজের মেয়ের দুটিকে লইয়া বসিয়া ছিলেন। মেয়ে দুটি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নাচ দেখিতেছিল। চোখ বড় বড় করিয়া নাচ গিলিতেছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এসব ব্যাপারে তাহাদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। জগন্ময়ী চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি বৈষ্ণববাড়ির মেয়ে। তাঁহার বাপের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। সেখানে রাসের সময় পাড়ার ছেলে-মেয়েরা নাচিত। সেই কথাই তাঁহার মনে পড়িতেছিল। তাঁহার বাপের বাড়ির পরিবেশ শ্বশুরবাড়িতে নাই। বাপের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই সংসারের সব-কিছু হইত। মাংস বাড়িতে ঢুকত না। তাহার ভাই গজু লুকাইয়া অন্য বাড়িতে মাংস খাইয়া আসিত। মাছ অবশ্য আসিত, কিন্তু ক্বচিৎ। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে মাছ-মাংসেরই হুল্লোড়। জগন্ময়ীর প্রথম প্রথম খারাপ লাগিত, কিন্তু পরে সবই সহিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার নিজেরই মাছ-মাংস না থাকিলে খাওয়াটা অপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েমানুষেব, স্বভাবটা অনেকটা জলের মতো, যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এবং ধারণ করিয়া সুখ পায়।

সন্ধ্যাও একাগ্রচিত্তে একধারে বসিয়া নাচ দেখিতেছিল। ‘ফোক ডান্স’ সম্বন্ধে সে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছে, দিগন্তের রচনাটাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাহার। সে ভাবিতেছিল যে নারী-সমিতি সে এখানে স্থাপন করিয়াছে তাহার সহিত ওই সাঁওতাল মেয়েগুলিকেও যুক্ত করা যায় কি না। সে যখন খুব ছোট শনিচরা তখন তাহাদের বাড়িতে সহিস ছিল, সে কি কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে?

পুরসুন্দরী আসেন নাই। তিনি রান্নাঘরে ছিলেন। বহুলোকের বহুরকম খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে—তাঁহার কি নাচের আসরে আসিলে চলে? সূর্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরের খাবার তিনি নিজের হাতে প্রস্তুত করেন। চন্দ্রসুন্দরের নিরামিষ খাবার আলাদা করিয়া শুদ্ধাচারে করিতে হয়। নাচ দেখিবার অবসর তাঁহার নাই।

বিরুবাবু পীরপাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানকার খড়ির দেওয়ালগুলি হইতে অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেগুলির বয়স কত হইতে পারে। খানিকটা খড়ি কুড়াইয়া দুই আঙ্গুল দিয়া চাপ দিতেই তাহা ভাঙিয়া গেল, মনে হইল যেন বেশী ময়ান দেওয়া নিমকির মতো সেগুলি বড় বেশী ভঙ্গুর। মানুষের মন বড় বিচিত্র, স্মৃতির লীলাও আশ্চর্যজনক। এই ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ অন্য একটি ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বহুকাল আগে একবার তিনি গুজরাটে গিয়াছিলেন তাঁহার এক প্রফেসর বন্ধুর নিমন্ত্রণে। সেখানে তাঁহার দাঁতে ব্যথা হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুপত্নীকে বলিয়াছিলেন যে রাত্রে যদিও আমি হাতে-গড়া রুটিই খাই কিন্তু দাঁতে ব্যথা হইয়াছে, রাত্রে আমি দুধে ভিজাইয়া পাঁউরুটিই খাইব। বন্ধুপত্নী বলিলেন, আমি

আপনাকে এমন রুটি বানাইয়া দিব যাহা মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যাইবে। সত্যই তিনি সেরকম রুটি বানাইয়া দিলেন। অথচ তিনি মোটেই ঘি দেয় নাই। ইহার রহস্যটি বিরুবাবু জানিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। বন্ধুপত্নী বলিয়াছিলেন, ঘিয়ের নয় রেড়ির তেলের ময়ান দিয়াছিলাম। সকালে রেড়ির তেলের ময়ান দিয়া ময়দার তালটি একবেলা রাখিয়া দিতে হয়। আট দশ ঘণ্টা রেড়ির তেলে ভিজিলে রুটি খুব নরম হয়, অথচ রেড়ির তেলের কোনও গন্ধ পাওয়া যায় না। এ রুটি খাইলে কোষ্ঠও বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। হঠাৎ বিরুবাবুর মনে হইল বাবাকে এরকম রুটি খাওয়াইলে কেমন হয়। তাঁহার তো পেটের মল ভালো পরিষ্কার হইতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্নতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বাড়ির দিকে রওনা হইলেন। পুরসুন্দরীকে কথাটা বলিতে হইবে। বেশ দ্রুতপদেই ফিরিতেছিলেন। পথে কুমারের সহিত দেখা হইল, সে মাঠে যাইতেছিল। মাঠে খানিকক্ষণ না থাকিলে কুমারের মনে হয় যেন সমস্ত দিনটা বৃথাই গেল। বাবা বেশ ভালো আছেন এবং বাড়ির সকলে সাঁওতাল নাচ লইয়া মাতিয়াছে তাই এই সুযোগে সে মাঠে চলিয়াছে। বাগানের খানিকটা জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে। সে যদি না যায় চাকরগুলো ফাঁকি দিবে। সাঁওতাল নাচ দেখিতে তাহার ভালোই লাগে, কিন্তু শনিচরার দলের নাচ সে অনেকবার দেখিয়াছে।

বিরুবাবুকে সে বলিল, "দাদা বাড়িতে শনিচরার দল সাঁওতাল নাচ দেখাচ্ছে। তুমি তো অনেকদিন দেখনি, তোমার হয়তো ভালো লাগবে।"

বিরুবাবুর গতিবেগ বাড়িয়া গেল।

কিরণও নাচ দেখিতেছিল, সে কিন্তু হাটে বসে নাই। বারান্দার উপর বসিয়া ছিল, পাশে ছিল ঘণ্টু। ঘণ্টুর সহিত গল্প করাই উদ্দেশ্য। অকারণে বকিয়া চলিয়াছিল সে। ঘণ্টুর রং খারাপ হইয়া গিয়াছে (ঘণ্টু কোনও কালে ফরসা ছিল না), ঘণ্টুর গলার হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে (অন্য কাহারও চোখে পড়ে নাই), ঘণ্টু সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কখন কি করে, কখন খায়, কি কি খায় এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া ঘণ্টুকে সে অনর্গল প্রশ্ন করিতেছিল। ঘণ্টু প্রকাণ্ড শান্ত 'গ্রট ডেন' কুকুরের মতো চুপ করিয়া বসিয়াছিল এবং মায়ের সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে কেবল মৃদু হাসিয়া বলিতেছিল, 'তুমি কি যে বল মা!"

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে উর্মিলা বাহির হইয়া আসিল! কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "নাচ দেখতে যাচ্ছিস না কি; বাবার কাছে কে আছে—

"ভাসুর ঠাকুরপো এখনি এলেন। তিনি বাবার সঙ্গে কি কথা কইবেন, আমাকে বাইরে যেতে বললেন"

উর্মিলা ধীরে ধীরে হাটের দিকে অগ্রসর হইল। উশনার আদেশে সে বাহিরে আসিয়াছিল বটে কিন্তু বাবার বিছানা ছাড়িতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। নবজাত শিশুকে ঘরে রাখিয়া নবপ্রসূতির বাহিরে কোথাও গেলে যেমন অস্বস্তি হয় উর্মিলারও সেইরূপ হইতে লাগিল। তবু সে পিছনে একধারে গিয়া বসিল। নাচ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

উশনা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া আপাং, কণ্টিকারি, ঘল্‌ঘলে প্রভৃতি কয়েকটি বন্য গাছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশী গাছগাছড়ার ভেষজ গুণের অনেক তথ্য তিনি জানেন তাই পাইলেই সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

সূর্যসুন্দরের বিছানায় উপবেশন করিয়া উশনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছেন—"

"বেশ ভালো আছি। তোমাদের দেখে আমার সব অসুখ সেরে গেছে। সাঁওতালরা হাটে নাচছে তুমি যাও নি?"

"না, আমি আর গেলাম না। ও নাচ অনেক দেখেছি। ভাবলাম তার চেয়ে আপনার কাছে একটু বসি"

উশনা একটু ভালো করিয়া বসিলেন। তাহার পর একটু উসখুস করিয়া আসল কথাটি বলিলেন।

"আচ্ছা বাবা, আপনি কি কোন উইল করেছেন?"

"করেছি"

"সেটা দেখতে পারি কি"

"কুমারের কাছে আছে, তার কাছ থেকে নিয়ে দেখো। আমি চন্দরকে দুশ' বিঘে জমি দিয়েছি। একশ' বিঘে কুমারকে দিয়েছি, ওই তো জমিজমা নিয়ে বাড়ি আগলে এখানে থাকবে। বাকি জমি তোদের তিন ভাইকে সমান ভাগে করে দিয়েছি। এই বাড়িটাতে তোমাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। তোমার বোনেদেরও। বাগানটাতেও তোমাদের চার ভাইয়ের সমান অধিকার। ও আর তোমরা এক এক বছরে একজন করে পাবে। বাগানের আয় থেকে চার বছর অন্তর অন্তর বাড়িটাও মেরামত হবে। অর্থাৎ পঞ্চম বছরে তোমরা কেউ কিছু পাবে না। সে বছর বাগানের আয় বাড়ি মেরামতে খরচ হবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সূর্যসুন্দর আবার বলিলেন, "উইল একটা করতে হয় তাই করেছি। আমার করবার ইচ্ছে ছিল না, নিখিলবাবু জোর করে করিয়েছেন। যা হবার তাই হয়। জমিদারদের সম্পর্কে থেকে অনেক জিনিসই তো দেখলাম। জাল উইল আসল বলে চলে গেল। আসল উইল নাকচ হয়ে গেল হাইকোর্টের বিচারে। তবে তোমাদের একটা কথা আমি বলতে চাই—বিষয়ের জন্যে মনুষ্যত্ব কখনও নষ্ট কোরো না। মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে যে বিষয় পাওয়া যায় তাও থাকে না। শেষ পর্যন্ত দুদিকেই নষ্ট হ'য়ে যায়—"

উর্মিলা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে উপবেশন করিল।

"তুমি চলে এলে যে—"

"ও নাচ তো আগে আমি দেখেছি—"

সূর্যসুন্দরকে ছাড়িয়া সে যে অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল তাহা আর প্রকাশ করিল না।

উশনা সূর্যসুন্দরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন, তবে আমার দুটো কথা বলবার আছে তা পরে বলব। এখন উঠি—"

উশনা চলিয়া গেলেন। গেলেন হাটের দিকে, সেখানে নাচ হইতেছিল। সেখানে সকলের পিছনে গিয়া তিনি বসিলেন, বসিয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। যে কথাটা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল কি করিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন তাহাই তাঁহার অন্তরকে তোলপাড় করিতে লাগিল।

।। তেইশ।।

কুমার মাঠে গিয়া দেখিল জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে। কয়েকটা বক লাঙলের পিছনে পিছনে চলিয়াছে। উদ্দেশ্য, কর্ষিত মাটি হইতে পোকা বাহির হইলে সেগুলি ধরিয়া উদরস্থ করিবে। কুমার সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটি সঙ্গে আনিয়াছিল, মাঠের মধ্যে তাহার ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া, সে তাহাই খুলিয়া বসিল। এতক্ষণ সে ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই, এইবার পারিল। সে মাঠে আসিয়াছিল নির্জনে বাবার ডায়েরিটা পড়িবে বলিয়াই, জমির কাজ দেখাটা উপলক্ষ মাত্র। বাড়িতে অসম্ভব ভিড়, সেখানে ডায়েরি পড়িবার কোন সুযোগ নাই। ডায়েরিটা শেষ করিবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কুমারের মাঠের ঘরটি সুন্দর। সব ব্যবস্থাই আছে। সে ক্যাম্পচেয়ারটি পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

‘‘যদিও আমার বাবা আমার কলিকাতায় পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিলেন তবু কিন্তু গোল মিটিল না। বাবার ইচ্ছা ছিল অশ্বিনীর মতো আমিও গিয়া হেয়ার স্কুলে পড়ি। কিন্তু অশ্বিনী কলিকাতায় গিয়া আমাকে জানাইল যে হেয়ার স্কুলে এবার আর ছেলে লওয়া হইবে না। সব সীট ভরতি হইয়া গিয়াছে। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। মনে মনে যে আকাশ-কুসুম মালা গাঁথিয়াছিলাম তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চিঠিখানা হাতে লইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সকলেই আমার কলিকাতায় গিয়া পড়িবার আশা ত্যাগ করিলেন। আমি যে কি করিব, কে যে আমাকে সৎপরামর্শ দিবে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। হেয়ার স্কুলে হয়তো সীট নাই, কিন্তু অন্য স্কুলে থাকিতে পারে! কিন্তু কে সন্ধান করিবে। ভাবিলাম অশ্বিনীকেই আর একটা চিঠি লিখি। কিন্তু অশ্বিনীর ঠিকানা যোগাড় করিতে পারিলাম না। অশ্বিনী আমাকে যে পত্র দিয়াছিল তাহাতে কোন ঠিকানা ছিল না। অশ্বিনীর বাবা মাও অশ্বিনীকে ভরতি করিবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অশ্বিনীর ঠিকানা আমি যোগাড় করিতে পারিলাম না। মনে হইল শেষ পর্যন্ত মামার নুনের গোলাতে বসিয়াই আমাকে খাতা লিখিতে হইবে। আমার হতাশায় কার্তিকমামা আমাকে খুব সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—‘গোলায় খাতা লেখাটাও খুব খারাপ কাজ নয়, ওতেও যদি লেগে থাকতে পারিস, উন্নতি হবে। নুনের গোলার কাজ মোটেই ফেল্‌না নয়। ভালো করে যদি কাজ শিখিস আর তোর মামার সুনজের পড়ে যাস তাহলে তোকে উনি ব্যবসার অংশীদারও করে নিতে পারেন। তা যদি হয় তাহলে তো দু’দিনেই ফেঁপে উঠবি। কি হবে বেশি ইংরিজি মিংরিজি পড়ে। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস। তুই খাতা লিখতেই লেগে যা।’ এ সান্ত্বনায় আমার কিন্তু দুঃখ ঘুচিল না, আমি রোজই দিদিমার কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে দিদিমারও খুব ইচ্ছা ছিল না। তিনি বার বার বলিতেছিলেন—‘ভালই হয়েছে স্কুলে সীট পাওয়া যায় নি। পনের বছর তো মোটে বয়স। এই বয়সে কলকাতার মতো শহরে গিয়ে কি করবি। সে কি সোজা শহর। কত রাস্তা, কত গলি, কত লোক। যত বদমাইশ গুণ্ডা ছেলে-ধরার দল ঘুরে বেড়ায় সেখানে। আমার বাপের বাড়ির আন্নাকালীর ছেলে কলকাতায় গিয়ে আর ফিরল না। সীট পাওয়া যায় নি, ভালোই হয়েচে। এখানেই যা হয় কর।’ এসব তিনি বলিতেছিলেন বটে কিন্তু আমার কান্নাও তাঁহাকে বড়ই বিচলিত করিতেছিল। তিনি মা

মঙ্গলচণ্ডীকে বার বার ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'মা, একটা উপায় করে দাও। ওর কান্না আমি আর সহ্য করতে পারছি না'

পঞ্চুমামা একদিন দিদিমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পঞ্চুমামা মামার খুড়তুতো ভাই। তিনি কলিকাতায় ব্যাংকে কাজ করিতেন। তখন নাম ছিল বেঙ্গল ব্যাংক, পরে তাহাই ইম্‌পিরিয়াল ব্যাংক হয়। এখন স্টেট ব্যাংক। পঞ্চুমামা সেই ব্যাংকে বড় কর্মচারী ছিলেন। তিনি বছরে একবার ছুটি লইয়া আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতেন। ছুটিতে তিনি দিদিমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পরই আমার প্রসঙ্গ উঠিল। দিদিমা বলিলেন, 'কলকাতার স্কুলে সীট পায় নি বলে ও তো কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। পঞ্চুমামা একটু ভাবিয়া বলিলেন, ওকে ডাক্তারি পড়ান না। ক্যাম্পবেল স্কুলে বোধহয় এখনও সীট পাওয়া যেতে পারে। ক্যাম্পবেলের একজন কেরানীর সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। আমি বোধহয় ভরতি করিয়ে দিতে পারব। আমি আজ শঙ্করায় যাচ্ছি। কলকাতায় ফিরব দিন দশেক পরে। কলকাতায় আমার বাসা আছে। বাসাব ঠিকানা রেখে যাচ্ছি দশ দিন পর ওকে পাঠিয়ে দেবেন, তখন আমি সব ব্যবস্থা করব।' দিদিমা বলিলেন, 'ও কি তোমার বাসা খুঁজে বার করতে পারবে? ছেলেমানুষ তো?' পঞ্চুমামা একথা আমলের মধ্যেই আনিলেন না। বলিলেন, 'খুব পারবে। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বলবে আমাকে নেবুতলায় নিয়ে চল।' সেখানে গিয়ে বাড়ির নম্বর দেখালেই কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবে বাড়িটা। সে কিছুই শক্ত নয়। নেবুতলায় গেলে ও নিজেই খুঁজে নিতে পারবে।' আমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'পারবি না?' আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'পারব।' আমি তখন মনে মনে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলাম। কোন কিছুই অসম্ভব মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল—সবই পারিব। শঙ্করা গ্রামে আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিনও এই পঞ্চুমামা মামার বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আজ আমার নবজন্মের ক্ষণেও তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্চুমামা একদিন মাত্রই ছিলেন। তাঁহার কলিকাতায় বাসার ঠিকানা দিদিমাকে দিয়া পরদিনই চলিয়া গেলেন তিনি। তিনি যতক্ষণ ছিলেন মামা বা মামী কেহ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। পঞ্চুমামার স্পষ্টভাষণকে সকলেই ভয় করিত। পঞ্চুমামা চলিয়া গেলে মামা বলিলেন—'তোমরা যে ওকে কলকাতা পাঠাব বলে নাচাচ্ছ কিন্তু অত টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? জামাইবাবু কি অত খরচ চালাতে পারবেন? খাওয়ার খরচ আছে, ভরতির খরচ আছে,স্কুলের মাইনে আছে, ওখানে মাসে মাসে বাসা খরচ আছে, এত খরচ টানবে কে? আমি পারব না। জামাইবাবু পারবেন কি? আমি মাসে বড়জোর দু' টাকা করে দিতে পারি। বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে?'

দিদিমা বলিলেন—'সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। ওর পৈতের সময় ও পনের টাকা ব্রতভিক্ষা পেযেছিল, সে টাকা আমার কাছে আছে। সে টাকা আমি দেব। তাছাড়া ওর বাবা বলেছে ওকে মাসে মাসে পড়ার খরচ দেবে। তোমাকে টাকা দিতে হবে না। ওর বাবা রোজগার করছে সেই দেবে—'

মামা বলিলেন—'জামাইবাবুর রোজগার আর কত? মাসে মাত্র আঠারো টাকা। ওঁর বাসাখরচ তো আছে, নিজের হাতখরচ তো আছে। সে সব খরচ করে কত টাকা উনি পাঠাতে পারবেন?'

'সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি ওকে আশীর্বাদ কর ওর মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। ছেলে ক'দিন থেকে খায় নি ভালো করে, কেঁদে কেঁদে শরীর আধখানা হ'য়ে গেল।'

মামা আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মামীমা দালানে ছিলেন তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, 'কত সাধ যায় রে চিতে মলের আগে চুটকি দিতে!'

দিদিমা পালকি আনাইয়া বরদাবাবুর বাড়ি চলিয়া গেলেন। তিনি শুনিয়া খুব খুশী হইলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন, 'ডাক্তারির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। সূয্যিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন। টাকার জন্যে আটকাবে না। আমি কেদারবাবুর মাইনে আরও দু'টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। মাস দশ টাকা করে দিলেই কলকাতার বাসা-খরচ কুলিয়ে যাবে। তার ওপর শক্তিবাবু যদি আরও দু' টাকা করে দেন খুব ভালভাবে চলে যাবে।' আমার বাবা যে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে টাকা পাইতেন এবং বিষুণপ্রসাদ যে তাহা পোস্টাফিসে জমাইয়া রাখিত এ সংবাদ বাহিরের কেহ জানিত না। বাবা এবং বিষুণপ্রসাদ ছাড়া আমি কেবল এ খবরটি জানিতাম। কিন্তু আমি ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেমন যেন ভয় হইল। খরচের সমস্যা মিটিয়া গেলেও আরও নানরকম সমস্যা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিল। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। মামার জনাকয়েক খোশামুদে পার্ষদ ছিল। তাহারা নানা ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে আমার ডাক্তারি পড়া না হয়। একজন নাকি চুপিচুপি মামাকে বলিয়াছিলেন— 'খবরদার ওকে ডাক্তারি পড়তে দেবেন না। ও যদি ডাক্তার হয়ে এখান এসে বসে তাহলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনার 'রাইভাল' হয়ে দাঁড়াবে। জানি না মামা এ সংবাদে বিচলিত হইয়াছিলেন কি না, কিন্তু তিনি দিদিমাকে আসিয়া যাহা বলিলেন তাহা নূতন বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। বলিলেন—'তোমরা ওকে ডাক্তারি পড়তে পাঠাচ্ছ, কিন্তু ও যেরকম ভীতু ও পারবে কি! শুনছি গিয়েই পচা মড়া কাটতে হবে। কার্তিক বলছিল অ্যানাটমি হলে নাকি ভূতেরও দৌরাত্ম্য আছে। ওদের গ্রামের একটা ছেলে ক্যাম্পবেলে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল সে নাকি ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি কার্তিককে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি তার মুখেই সব শুনো।' কার্তিকমামা আসিয়া ভয়ানক বর্ণনা দিলেন। বলিলেন অ্যানাটমি হলে যে মড়ারা রাত্রে হুটোপাটি করে একথা কে না জানে। মড়াদের হা হা হাসি এবং খট্ খট্ নাচ রাত্রে তো রোজই শোনা যায়, অনেক সময় দিনের বেলাতেও যায়। একবার একটা মড়া নাকি লাফাইয়া উঠিয়া একটা ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। এসব কাহিনী শুনিয়া দিদিমা রীতিমত ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার উৎসাহ মন্দীভূত হইল। আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—'যা শুনছি তা তো ভয়ানক। ওখানে তোমাকে আমি পাঠাতে পারব না।' এসব শুনিয়া আমারও যে একটু ভয় না করিতেছিল তাহা নয়, ছেলেবেলায় ভূতের ভয় আমারও ছিল, কিন্তু তবু আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম এ সুযোগ যদি আমি ত্যাগ করি তাহা হইলে আমার জীবনে দুরপনেয় অন্ধকার নামিয়া আসিবে। মামার নুনের গোলায় নড়বড়ে চৌকিতে বসিয়া সারাজীবন ওই অসভ্য ব্যাপারীদের সাহচর্যে খেরোর খাতায় হিসাব লিখিতে হইবে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কি করিব? দিদিমার মতের বিরুদ্ধে তো কিছু করা যায় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, সত্যসত্যই যদি বাঁকিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সে বাধা তো অতিক্রম করা যাইবে না। ঠিক করিলাম ব্যাপারটা বাবাকে বলিব। এতদিন মামাকেই নির্ভরযোগ্য আশ্রয় মনে করিয়ছিলাম কিন্তু হঠাৎ যেন অনুভব করিলাম, আমার অসহায় জীবনে ঠিক যে স্থানটিতে

তাঁহাকে পাইব প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সে স্থানে তিনি নাই। সে স্থানে আমার বাবা রহিয়াছেন, হউন তিনি উদাসীন, হউন তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনি আমার বাবা। তাঁহার কাছেই যাওয়া স্থির তো করিলাম, কিন্তু বাবার কাছে যাওয়াই যে শক্ত। তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এত কথা বলিবার সাহসই যে আমার ছিল না। অবশেষে বিষুণপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলাম! বিষুণপ্রসাদ বাবার সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, 'চল তোমাকে গুরুজি ডাকছেন।' আমি যাইতেই বাবা বলিলেন, 'ভয় করা মহাপাপ। কোন ভয় নেই। ভয় মাত্রেই অলীক। তুমি কিচ্ছু ভয় পেও না। পঞ্চুবাবু তোমাকে যেদিন কলকাতা যেতে বলে গেছেন ঠিক সেই দিনই তুমি কলকাতা রওনা হবে। আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। আজই তাঁর ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে দাও। তোমার দিদিমার সঙ্গে আজই আমি দেখা করে সব বুঝিয়ে বলে দেব। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি যাবার জন্যে তৈরী হও।' সেই দিনই তিনি দিদিমার সহিত দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আপনারা ভূতের ভয় দেখাচ্ছন কেন ছেলেটাকে! যা শুনেছেন তা সব গুজব। যদি সত্য হ'ত তাহলে কি কোন ছেলে ডাক্তাবি পড়তে যেত? কেউ যেত না। যারা আপনাকে ওসব কথা বলেছে জানবেন হয় তার মিথ্যাবাদী, না হয় বোকা। ক্যাম্পবেল গভর্নমেন্ট স্কুল, সেখানে যদি ওরকম ভূতের উপদ্রব হ'ত তাহলে হইচই পড়ে যেত, কাগজে সে খবর বেরুত, গভর্নমেণ্ট স্বয়ং তার প্রতিবিধান করত। কিন্তু সে সব তো কিছুই হয় নি। আপনারা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন কেন। ওর জামা কাপড় সব গুছিয়ে দিন, পঞ্চুবাবু যেদিন ওকে কলকাতা যেতে বলেছেন সেদিন ও চলে যাক। তারপর ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে। আপনি ভয় পাবেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।....সমস্ত বাধা কুয়াশার মতো মিলাইয়া গেল।

যেদিন আমি কলিকাতা যাই সেদিনের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বাবার দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাইয়া সমস্ত বাড়িটাই যেন থমথমে হইয়া গিয়াছিল। একটা নীরব বিরুদ্ধতা যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল সারা বাড়িটাতে। কাহারও মুখে কোনও কথা ছিল না। এমন কি দিদিমা পর্যন্ত নীরব হইয়া গিয়াছিলেন। নেত্য কেবল আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'কলকাতায় আমার দেওরের শ্বশুরবাড়ি শুনেছি চেতলায়। তোর যদি কোন বিপদ হয় তাদের খবর দিস। আমার নাম শুনলে তারা সাহায্য করবে। কেমন?' প্রতিশ্রুতি দিলাম বিপদে পড়িলে উক্ত দেবরের শ্বশুরবাড়িতে সাহায্য প্রার্থনা করিব। চেতলা কলকাতার কোন্ অংশে অবস্থিত তাহা আমার জানা ছিল না। সম্ভবতঃ নেত্যরও ছিল না। তাহার দেবরের বা শ্বশুরের নাম কি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। কলিকাতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই তখন ছিল না। ভাবিয়াছিলাম চেতলায় গিয়া নেত্যর দেবরের শ্বশুরবাড়ি কোন্‌টা জিজ্ঞাসা করিলেই সকলেই দেখাইয়া দিবে।

তখন শীতকাল। আমার ট্রেন রাত্রি বারোটার পর। সন্ধ্যার সময় মামা দিদিমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দিদিমার হাতে দশটি টাকা দিয়া বলিলেন—'তোমরা যখন গোঁয়াতুমি করে ওকে পাঠাবেই তখন আমার আর কি বলবার আছে। এই দশটা টাকা ওকে দিয়ে দিও। মাসে মাসে ওকে দু'টাকা করে আমি দেব। লোকে যেন না বলতে পারে আমি আমার কর্তব্য করি নি।'

দিদিমা বলিলেন, 'তুই জামাইবাবুকেই দিয়ে আয় না টাকাটা। কত খুশী হবে।'

'সে আমি পারব না। খামখেয়ালী মানুষ, কি ভাবতে কি ভেবে বসবেন। প্রতি মাসেও আমি টাকা তোমারই হাতে দেব তুমি জামাইবাবুকে দিয়ে দিও।'

মামা চলিয়া যাইবার একটু পরেই বাবা আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি কুলি এবং কুলির মাথায় একটি ট্রাঙ্ক।

দিদিমাকে বলিলেন, 'বিষুণ সূয্যিকে এই ট্রাঙ্কটা কিনে দিলে। এতে সূয্যির জামা কাপড় যা আছে তা গুছিয়ে দিন। আর রাত্রেই তো ওকে কলকাতা রওনা হ'তে হবে। রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে ওর ট্রেন। আমি গিয়ে ওকে তুলে দিয়ে আসব।'

দিদিমা টাকা দশটা বাবাকে দিয়া বলিলেন, 'শক্তি এই টাকাটা সূয্যিকে দিয়েছে। আর মাসে মাসে দু'টাকা করে দেবে বলেছে'

বাবা কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'ভাল'

দিদিমা বলিলেন—'আমার কাছেও ওর পনের টাকা আছে, পৈতের সময় ভিক্ষে পেয়েছিল। সেটাও ওর সঙ্গে দিয়ে দাও।'

বাবা বলিলেন—'না, অত টাকা ওর সঙ্গে দেব না। ছেলেমানুষ একা যাচ্ছে। টিকিটটা কেটে দেবে। আর সঙ্গে গোটা পাঁচেক টাকা দেব। তারপর বিষুণ পঞ্চুবাবুর নামে যেমন দরকার হবে মনি-অর্ডারি করে পাঠিয়ে দেবে টাকা।'

রাত্রি বারোটার সময় সাহেবগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। বাবা স্টেশন প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া গুনগুন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছিলেন। বিড়ি খাইবার জন্য বিষুণপ্রসাদ একটু আড়ালে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। স্টেশন প্লাটফর্মে কেরোসিন আলো জ্বলিত। একটা আলোর নীচে আমি আমার নূতন-কেনা ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া শীতে কাঁপিতেছিলাম। হু হু করিয়া উত্তরে হাওয়া বহিতেছিল। আর শীতবস্ত্র তেমন কিছু ছিল না। গায়ে সামান্য একটা গেঞ্জি এবং তাহার উপর একটা সুতার কোট ছিল। মামীমার একটা ছেঁড়া র‍্যাপার আমি গায়ে দিতাম। সেইটাই গায়ে দিয়া আসিয়াছিলাম। তবু শীত করিতেছিল। বিষুণপ্রসাদ একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু মোজা কিনিয়া দেয় নাই। আগে জুতা পরা অভ্যাস ছিল না, নূতন জুতা পরিয়া খুব অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। নবজীবনের পথে প্রথম যাত্রা আমার পক্ষে মোটেই সুখকর হয় নাই। শীত করিতেছিল খুব। রুদ্যমানা দিদিমার মুখটা বার বার মনে পড়িতেছিল, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটাও রহস্যময় অন্ধকারে আবৃত হইয়া আমাকে যেন ভয় দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল কালো কি একটা যেন দূরে ঘাপটি মারিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কার্তিকমামা যে সব ভূতুড়ে গল্প বলিয়াছিলেন সেগুলোও মাঝে মাঝে মনে পড়িতেছিল। বাবা যদিও বলিয়াছিলেন ওসব মিথ্যা বানানো গল্প তবু সেগুলি কায়াহীন ছায়ার মতো মনের প্রত্যন্তপ্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম বাবা বেঞ্চি হইতে কখন উঠিয়া গিয়াছেন। আমার আরও ভয় করিতে লাগিল। স্টেশনে বেশী প্যাসেঞ্জার ছিল না। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাবাকে দেখিতে পাইলাম না। বিষুণপ্রসাদকেও না। অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। এ কথাও মনে হইল বাবা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন না তো! তখনও বাবার সম্বন্ধে আমার আস্থা অনড় হয় নাই। তখনও মনে হইত বৈরাগ্যের জোয়ার আসিলে তিনি অনায়াসে আমাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। মাকে ফেলিয়া তিনি তো চলিয়াই গিয়াছিলেন। খেয়ালের বশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আবার

খেয়ালের টানে চলিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। এইসব ভাবিতেছিলাম এমন সময় দেখি বাবা ও বিষুণপ্রসাদ ফিরিয়া আসিতেছেন। বাবার হাতে একটি বড় ঠোঙা।

কাছে আসিয়া বলিলেন, 'সেই তো সন্ধ্যের সময় খেয়েছ। আর তো কিছু খাও নি। পশুপতির দোকান থেকে কিছু গরম লুচি ভাজিয়ে আনলুম, তরকারি আর মিষ্টিও আছে। খানিকটা এখনি খেয়ে নাও, আর খানিকটা সঙ্গে নিয়ে যাও। সকালের দিকে হয়তো খিদে পাবে, তখন খেও। বিষুণ জলের কুঁজোটা কোথা'

বিষুণ বলিল—'পশুপতির চাকর সেটা ধুয়ে জল ভরে আনছে।'

আমাব গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করিতে লাগিল, তাহার পর আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ফেলিলাম।

'কাঁদছ কেন, দিদিমায়ের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি—'

বাবা সস্নেহে আমর মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

'আসবার সময় সবাইকে প্রণাম করে এসেছিলে তো?'

'হ্যাঁ—'

'পুরানো জায়গা ছেড়ে যাবার সময় একটু মন কেমন করে, তারপর সব ঠিক হ'য়ে যায়। কেঁদ না—

এই কথায় আর একটা কথা মনে পড়িল। প্রণাম করিবার সময় মামা বলিয়াছিলেন—'ভগবান তোমার বাসনা পূর্ণ করুন।' মামীমা কিন্তু কিছুই বলেন নাই। তাঁহার মুখে যেন একটা ছায়া নামিয়াছিল। যখন প্রণাম করিলাম তখন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর একটা কথাও মনে হইল—তাঁহাদের আশ্রয়ে জন্মাবধি আছি, আজ সে আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছি, কিন্তু কই তাহারা কেহ তো আমাকে আগাইয়া দিতে আসেন নাই। মামাকে অনেক রাত্রে রোগীর বাড়ি যাইতে দেখিয়াছি, তিনি ইচ্ছা করিলে কি স্টেশনে আসিতে পারিতেন না? যদিও আমার এ বাসনা স্পর্ধাসূচক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু তবু একথা আজ না লিখিয়া পারিতেছি না যে মামা সেদিন স্টেশনে আসেন নাই বলিয়া সত্যই মনে মনে দুঃখিত হইয়াছিলাম।

.....একটু পরেই ট্রেন আসিয়া গেল। আমি একটি থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়িয়া বসিলাম। চড়িবার আগে বাবাকে এবং বিষুণপ্রসাদকেও প্রণাম করিলাম। বিষুণপ্রসাদ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। ট্রেনে খুব ভিড় ছিল না। বাবা বলিলেন, 'তুমি পৌঁছেই একখানা চিঠি দিও। তারপর ভরতি হয়ে আর একখানা দিও। মনে কোন ভয় রেখো নো, মায়ের ইচ্ছায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

ট্রেন ছাড়িবার একটু আগে যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি মর্মান্তিক। কাতির্কমামা হন্তদন্ত হইয়া আমাব গাড়ির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি তোমার মামীমার র‍্যাপারটা নিয়ে এসেছ? দাও, খুলে দাও, উনি ভয়ানক রাগারাগি করছেন!' র‍্যাপারটা খুলিয়া দিলাম, কার্তিকমামা চলিয়া গেলেন। বাবা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—'তুমি যেদিন পাস করে আসবে সেদিন তোমাকে শাল কিনে দেব। আজ এইটে নিয়ে যাও।' বাবার গায়ে একটা লুই ছিল, সেইটে তিনি আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিবার পরমুহূর্তেই আমার মনে ঠিক কি ভাব জাগিয়াছিল তাহা এখন মনে নাই। তবে আমার চোখে জলের ধারা বহিতেছিল এবং তাহা দেখিয়াই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক

আমার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ভদ্রলোকের সৌম্যমূর্তি, কথাবার্তাও খুব স্নেহপূর্ণ। জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কাঁদিতেছি কেন, কোথায় যাইব। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আত্মীয়তার সুর বাজিয়া উঠিল যে আমি আমার সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিতে দ্বিধা করিলাম না। তিনি বলিলেন, তা কাঁদছ কেন। এইটুকু বয়সে ডাক্তারি পড়িতে যাচ্ছ, এ তো মহাসৌভাগ্যের কথা। তোমার কোন ভয় নেই, হাওড়ায় আমি তোমাকে গাড়ি ভাড়া করে দেব। সে সোজা তোমাকে নেবুতলা নিয়ে যাবে। কোন ভয় নেই। হাওড়া স্টেশনেই আমার কাজ, কাজ সেরে আবার পরের ট্রেনে আমাকে ফিরে আসতে হবে। তা না হলে সঙ্গে করে, আমি তোমায় পৌঁছে দিতাম। কিন্তু তার উপায় নেই। হাওড়াতেই সব ব্যবস্থা করে দেব আমি।' অপরিচিত লোকের মুখে এ কথা শুনিয়া খুব আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষা বেশী আপন মনে হইতে লাগিল। তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিলাম। তিনিও আর একটু সরিয়া আমার শুইবার স্থান করিয়া দিলেন। তাঁহার কোলের কাছে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙিল তখন ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সেই ভদ্রলোকই আমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন।

'ওঠ, ওঠ, ওঠ। এস গেছি আমরা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—। এই কুলি, এই কুলি—'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এত লোক! একটা মেলায় যে এত লোক হয় না? এত বিরাট প্ল্যাটফর্ম! অবাক হইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

ভদ্রলোক একটা কুলি ডাকিয়া আমার জিনিসপত্র তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ সব জিনিস নেওয়া হয়েছে তো।' দেখিলাম সব জিনিসই তিনি গুছাইয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার জিনিস কই?'

'আমার কোন জিনিস নেই। কিছু আনি নি। পরের ট্রেনেই তো ফিরে যাচ্ছি—'

ভদ্রলোক আমাকে স্টেশনের বাহিরে লইয়া গিয়া একটা গাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন। গাড়িওয়ালা বলিল সে নেবুতলায় গিয়া ঠিকানা খুজিয়া আমাকে পৌছাইয়া দিবে।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ থামাইয়া দিলেন। তাহার পর দূরের দিকে তাকাইয়া ডাকিতে লাগিলেন—'নগেন, নগেন, শোন। কলকাতা যাচ্ছ নাকি?'

কালো কোট প্যাণ্ট পরা একটি টিকিট কালেকটর আসিল।

'হ্যাঁ। ডিউটি হয়ে গেছে। বাড়ি যাচ্ছি—'

'তাহলে এই গাড়িতে যাও। এই ছেলেটিকে নেবুতলায় পৌঁছে দিও। তোমার তো ওই কাছেই বাড়ি—। ট্রামে না গিয়ে গাড়িতেই যাও—'

'বেশ'

ভদ্রলোক গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

পঞ্চুমামা বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, 'এখনই চল তোমাকে ক্যাম্বেলে নিয়ে যাচ্ছি। আগে ভরতিটা হ'য়ে যাক তারপর অন্য কথা। এখন প্রায় নটা বাজছে। আমার আবার সাড়ে দশটায় আপিস আছে। আমি একেবারে আপিসের জন্যেই তৈরী হয়ে যাই। ওখান থেকেই আপিসে চলে যাব। চল।'

ক্যাম্বেলে গিয়া তিনি আপিস ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। যে কেরানীটির সহিত তাঁহার আলাপ ছিল সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'আসতে বড় দেরি করে ফেলেছেন। সীট তো আর খালি নেই। পনেরো দিন আগেই সব ভরতি হয়ে গেছে। এখন ক্লাস হচ্ছে—'

পঞ্চুমামা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—'আপনি যে তারিখে আনতে বলেছিলেন সেই তারিখেই তো এনেছি—'

'এবার ভয়ানক rush, দেখতে দেখতে সব ভরে গেল। কি করব বলুন। আমি ভাবতে পারি নি যে এত তাড়াতাড়ি সব ভরে যাবে।'

আমি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রপাত হইল। মনে হইল ভরাডুবি হইয়া আমি যেন সর্বস্বান্ত হইয়া গেলাম। পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল।

পঞ্চুমামা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'শুনলে তো সীট নেই? আসতে দেরি করে ফেলেছ। এবার আগেই সব সীট ভরে গেছে। যাই হোক তুমি বাসায় ফিরে যাও। আমি আপিস থেকে ফিরে আসি, তখন ভেবেচিন্তে দেখা যাবে এ অবস্থায় কি কর্তব্য। তুমি বাসায় ফিরে যাও।'

পঞ্চুমামা আপিস চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু বাসায় ফিরিলাম না। ক্যাম্বেল স্কুলের পাকা সিঁড়ির একধারে বসিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি বেশ বুঝিতেছিলাম এইবার আমাকে গিযা মামাব নুনেব গোলায খাতা লিখিতে হইবে। সকলে ঠাট্টা করিবে, বলিবে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গেলে যাহা হওযা স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে। কেবলি মনে হইতেছিল—এ কি হইল, আমার এ কি হইল! ভগবান আমার এ সর্বনাশ কেন করিলেন। কতক্ষণ এভাবে বসিয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখিলাম একজন সাহেব খটখট করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে সেলাম করিলাম। আমি তখন জানিতাম না যে তিনিই ক্যাম্বেল স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট মেকেন্‌জি সাহেব। সাহেব আমাকে ইংরেজীতেই প্রশ্ন করিলেন—Boy, what do you want ? আমি ইংরেজি জানিতাম না, বাংলাতেই তাঁহাকে আমার সর্বনাশের কথা বলিলাম। মনে হইতেছিল তিনি বোধ হয় আমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—Come with me, আমাকে লইয়া তিনি আপিস ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং হেডক্লার্ককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—Admit this boy. তাঁহার কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হইল। যে হেডক্লার্ক একটু আগে বলিয়াছিল সীট নাই সেই এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ইয়েস সার। এবং অবিলম্বে আমাকে ভরতি করিয়া লইল। মুহূর্তের মধ্যে সব পরিবর্তিত হইয়া গেল। একটু আগে আমি হতাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিলামে, মুহূর্তের মধ্যে মেকেন্‌জি সাহেব আমাকে টানিয়া তুলিলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাব আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন। আরব্য উপন্যাসে আলাদিনের মাযা-প্রদীপের গল্প শুনিয়াছি। মায়া-প্রদীপের সহায়তায় আলাদিন অসম্ভবকে সম্ভব করিত, কিন্তু আমার কাছে তো কোন মায়া-প্রদীপ ছিল না, আমি হতাশ-অন্তঃকরণে ভগ্নহৃদয়ে কেবল ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। মনে হয় সেদিন ভগবানই আমার ডাক শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। আমি মেকেন্‌জি সাহেবকে মুখে আর কিছুই বলিতে পারি নাই। কেবল জোড়হস্তে নীরবে তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছিলাম। তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, Be a good boy and become a good doctor.

ভরতি হইয়া যাইবার পর আমি নেবুতলায় পঞ্চুমামার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পূর্বে একটা দোকানে কিছু খাইয়া লইয়াছিলাম। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছিল। পঞ্চুমামার বাসায় গিয়া দেখিলাম, তিনি আপিস হইতে ফিরিয়াছেন। মেকেন্‌জি সাহেবের কৃপায় আমি ভরতি হইয়া গিয়াছি শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, 'তবে তো কেল্লা ফতে করেছ। এইবার চল তোমার একটা বাসার ঠিক করে দি। নিয়োগী পুকুর লেনে আমার জানা একটা ক্যাম্বেলের মেস আছে সেইখানেই থাকবে। চল তোমাকে রেখে আসি। আগে কিছু জল খেয়ে নাও।' আমি বলিলাম, 'আমার জল খাওয়া হয়ে গেছে। আমি এক্ষনি যেতে পারি।' আমি বাজারে জলখাবার খাইয়াছি শুনিয়া পঞ্চুমামা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, 'পয়সাগুলো অমন নয়ছয় করে নষ্ট করো না। সামনে এখন অনেক খরচ—'

নিয়োগী পুকুর লেনে গিয়া প্রথমেই পালিতবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। পালিতবাবু একটা ঘর লইয়া আলাদা থাকিতেন। তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র তাঁহার উপর আমার কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা হইল। গম্ভীর লোক, মুখে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্মিত হাসি। খুব কম কথা বলেন এবং কথা বলিবার পূর্বে বাম হাতের তর্জনীটি ওষ্ঠের উপর ধীরে ধীরে স্থাপন করেন। মুখে সমান্য গোঁফ দাড়ি উঠিয়াছে। চোখে সর্বদাই একটা শান্ত নীরব হাস্য দেদীপ্যমান। তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল আমাকেও তাঁহার ভালো লাগিয়াছে। বলিলেন, 'এইটুকু ছেলে ডাক্তারি পড়বে? বাঃ। আমার দ্বারা যতটা সাহায্য হয় আমি নিশ্চয় করব। এই মেসে আরও একজন ক্যাম্বেলের ছাত্র আছে। তারই ঘরে ও থাকবে।' পালিত বাবুর পুরা নাম তারকনাথ পালিত। তিনি কোনও বিদ্যালয়ে পড়িতেন না, এক সওদাগরী আপিসে চাকরি করিতেন। কিন্তু তাঁহার ঘরে দেখিলাম সারিসারি আলমারি এবং তাহাতে নানা রকম মোটা মোটা বই। তিনি দশটা পাঁচটা আপিস করিতেন এবং বাকি সময়টা পড়িতেন। নানরকম বিষয়ে পড়িতেন। উত্তরকালে তিনি একজন বড় হোমিওপ্যাথ হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তখন তিনি চাকুরি করিতেন। নিয়োগী পুকুর লেনের সমস্ত বাড়িটা তিনিই ভাড়া করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একটা বড় ঘর লইয়া থাকিতেন এবং বাকী ঘরগুলিতে ছাত্রদের থাকিতে দিতেন। আমাকে বলিলেন, 'তুমি বিপিন দত্তের ঘরে থাকবে। সে-ও এবার ক্যাম্বেলে ভরতি হয়েছে। তোমার সীট রেণ্ট লাগবে মাসে দু' টাকা বারো আনা। সেটা মাসের প্রথমে দিতে হবে। আর এখানে অন্য ছেলেরা মেস করে থাকে। নিজেরাই বাজার করে এনে দেয়, ঠাকুরে রাঁধে। মাসে টাকা ছয়েক করে পড়ে। আমি মেসে খাই না, আমি স্বপাক খাই। ভাতে-ভাত ফুটিয়েনি, আর দুধ খাই। এখানে মেসের ঠাকুর রাঁধে ভালো। মাঝে মাঝে তার রান্না চেখে দেখেছি। বেশ রাঁধে।' তাঁহার চক্ষু দুইটি আবার নীরব হাসিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম—আমাকে স্কুলের বেতন তিন টাকা, সীট রেণ্ট দু'টাকা বারো আনা, এবং খাওয়ার খরচ ছয় টাকা, অর্থাৎ মাসে মাসে এগারো টাকা বারো আনা দিতে হইবে। বাবা আমাকে দশ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন এবং মামা দুই টাকা। সুতরাং সব খরচ দিয়া আমার হাতে মাত্র চার আনা পয়সা থাকিবে। উহাতেই সারামাস কোনরকমে চালাইয়া লইব স্থির করিলাম। বাবাকে লিখিলে হয়তো তিনি আরও দু'এক টাকা বেশী পাঠাইতে পারিতেন, কিন্তু স্থির করিলাম লিখিব না। কেমন একটা জেদ চাপিয়া গেল। ওই চার আনাতেই সমস্ত মাস চালাইয়া লইব। সত্যই ওই চার আনতেই আমার সমস্ত মাসের

জলখাবার কুলাইয়া যাইত। লুচি সন্দেশ খাই নাই। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, চার পয়সার ছোলা কিনিতাম। তাহাই দুই মুঠা করিয়া ভিজাইয়া দিতাম, তাহাতেই আমার আট দশ দিনের জলখাবার হইয়া যাইত।

কিন্তু ভরতি হইয়াই আর একটা যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল তাহা আরও ভয়ানক। তখন ক্যাম্বেলে নিয়ম ছিল যে প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের ডাকিয়া Anatomy এবং Physiology—তে মৌখিক পরীক্ষা লওয়া হইত। প্রতি ছাত্রকে সবসুদ্ধ চার বা পাঁচ বার ডাকিত। এ পরীক্ষায় ফেল করিলে আর নিস্তার ছিল না—স্কুল হইতে নাম কাটিয়া দূর করিয়া দিত। আমি যেদিন প্রথম ক্লাসে গেলাম সেই দিনই Anatomyর শিক্ষক ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ আমাকে ডাকিয়া একটি হাড় দিয়া সেটি বর্ণনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—'সার আমি আজ নূতন ভরতি হয়েছি। এখনও বই বা হাড় কিনতে পারিনি।' চন্দমাধব ঘোষ খুব কড়া রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আমাকে Zero (শূন্য) দিয়া বলিলেন—'ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। যাও।' ম্লান মুখে মেসে ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারী বই এবং হাড়ের অনেক দাম। সে সব কিনিবার পয়সা কোথায় পাইব? চিন্তার সমুদ্র চারিদিকে উত্তাল হইয়া উঠিল। মেসে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার ঘরে আর একটি সীটে থাকিত বিপিন দত্ত। সে-ও ক্যাম্বেলে পড়িত। আমার সহপাঠী ছিল। সে বলিল—'মুখপোড়া কাঁদছিস কেন? আমার তো বই আর হাড় আছে তাই দুজনে মিলে পড়া যাবে। তোর ওসব কেনবার দরকারই নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। কেঁদে মরছিস কেন? নে খা' বিপিন দত্ত একঠোঙা তেলে-ভাজা কিনিয়া আনিয়াছিল তাহাই আমার দিকে আগাইয়া দিল। সেই মুহূর্তেই বিপিন দত্ত আমার পরম আত্মীয় হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে যে বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইলাম সে বন্ধন সারাজীবন অটুট ছিল। বিপিনের বই এবং হাড় লইয়া পড়াশোনা আরম্ভ করিলাম। দুইজনে প্রথমে একসঙ্গে পড়িতাম। তাহার পর বিপিন ঘুমাইলে তাহার বই হইতে মুখস্থ করিতাম। কয়েকদিন সময় পাইলে হয়তো পরের পরীক্ষাটা পাস করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু সে সময় পাইলাম না, তাহার পরের দিনই আবার আমার ডাক পড়িল। ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ আবার আমাকে Zero দিলেন। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমাকে আর দুইবার কি বড়জোর তিনবার ডাকিবে। এই পরীক্ষাগুলিতে ফুল মার্কস না পাইলে পাস করিতে পারিব না এবং পাস না করিতে পারিলে আমার নাম কাটিয়া আমাকে দূর করিয়া দিবে। সকলেই বলিতে লাগিল আর আশা নাই। চন্দ্রমাধব ঘোষের নিকট হইতে ফুল মার্কস পাওয়ার আশা নিতান্তই দুরাশা। বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। তীরের নিকট আসিয়া কি তরী ডুবিয়া যাইবে? হাতে পয়যসা ছিল না, যাহা আনিয়াছিলাম তাহা 'ফি' এবং মেসে অ্যাডভান্স দিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে ফিরিয়া যাইবার পয়সাও নাই। পঞ্চুমামার নিকট ধার করিয়া রেলভাড়াটা হয়তো যোগাড় হইতে পারে, কিন্তু বাড়িতে গিয়া মুখ দেখাইব কেমন করিয়া। কুব্জের পক্ষে চিৎ হইয়া শুইবার আকাঙ্ক্ষাটা যে অতীব হাস্যকর তাহা তো এইবার নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যাইবে। কি করিব, কে আমাকে এই অন্ধকারে পথের নির্দেশ দিবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সেদিন আর কিছু খাইলাম না, রাত্রে ঘুমও হইল না। বিনিদ্রনয়নে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে করিতে অবশেষে একটা কথা মনে হইল—ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ি গিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলি তাহা হইলে তিনি কি দয়া

করিবেন না; তাঁহাকে বলিব যে আমাকে অপরের বই ও হাড় লইয়া পড়িতে হয়। অন্ততঃ পনের দিন আমাকে সময় দিন, তাহার পর আমাকে বেশীবার পরীক্ষা করুন তাহা হইলে আমার পাস নম্বরটা হইয়া যাইবে। একটু সময় পাইলে আমি নিশ্চয় পড়া তৈয়ারি করিয়া ফেলিব। মেসের ছেলেরা কিন্তু আমাকে বারণ করিল। বলিল, গেলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। চন্দ্রমাধব ঘোষ ভয়ানক রাগী লোক, সকলে তাঁহাকে হিরণ্যকশিপু বলে। বাড়িতে তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতে চান না। তাছাড়া বাড়িতে তাঁহার ভীষণ একটা বুলডগ আছে। তুমি গেলে তোমাকে সে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিবে। চন্দ্রমাধব ঘোষের দৈত্যের মতো চেহারাটা মনে পড়িল। প্রকাণ্ড মুখ, প্রকাণ্ড মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল। সত্যই বড় ভয় করিতে লাগিল। একমাত্র বিপিন দত্তই আমাকে সাহস দিয়া বলিল—'চল, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। দুগ্‌গা বলে' সমানে গিয়ে হাজির তো হ, তারপর যা হয় হবে। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি।'

বিপিন দত্ত আমাকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়িতে লইয়া গেল। গিয়া দেখি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা ঠিক, ভীষণদর্শন একটা বুলডগ তাঁহার ঘরের ঠিক সামনেই বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের দেখিয়াই সেটা ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। কুকুরটা ডাকিতেই একটা চাপরাসী ছুটিয়া আসিল। চাপরাসীকে বলিলাম, অত্যন্ত জরুরী দরকারে ডাক্তার ঘোষের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। বিপিন দত্ত বলিল, যদি দেখা করাইয়া দাও তোমাকে বকশিস দিব। ডাক্তার ঘোষ দয়া করিয়া দেখা করিতে সম্মত হইলেন। আমি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই? আমি তখন তাঁহাকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলাম। বলিলাম, আমি অত্যন্ত গরীব, বই বা হাড় কিনিবার পয়সা নাই। যাহার বই আর হাড় লইয়া পড়িব সে ঘুমাইয়া পড়িলে তবে রাত জাগিয়াআমাকে পড়িতে হইবে। আমাকে পনের দিন পরে ডাকিলে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। তাহার পর আমাকে দয়া করিয়া বেশীদিন ডাকিবেন, তাহা হইলে আমার পাস নম্বরটা উঠিয়া যাইবে। বলিতে বলিতে আমার চোখে বোধহয় জল আসিয়া গিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর দয়া হইল। বলিলেন, অল রাইট। আমি যেন আকাশে উড়িতে উড়িতে মেসে ফিরিলাম। সেদিন হইতে অ্যানাটমি ধ্যানজ্ঞান হইল। স্কুল হইতে ফিরিয়া ভিজা ছোলার জলখাবার খাইয়া অ্যানাটমি লইয়া বসিতাম। বিপিন সে সময় বেড়াতেই যাইত। বিপিন সন্ধ্যার পর ফিরিলে তাহার পর বিপিন যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন রাত জাগিয়া তাহার বই হইতে পাঠ্য বিষয়টি একটি খাতায় নকল করিয়া লইতাম। আট দিনের মধ্যে যতটুকু অ্যানাটমি পড়ানো হইয়াছিল ততটুকু আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। আট দিন পরে আমি নিজেই একদিন ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষকে গিয়া বলিলাম, স্যার আমার পড়া এবার তৈয়ারী হইয়াছে। আপনি আমার পরীক্ষা লইতে পারেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া আমাকে ফুল মার্কস দিলেন। সেইদিন হইতে আমি তাঁহার সুনজরে পড়িলাম। ক্লাসে কোন ছেলে পড়া না পারিলে তিনি আমাকে ডাকিতেন। আমি ঠিক উত্তর বলিয়া দিতাম। তাহার পর আরও চারবার তাঁহার কাছে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। প্রতিবারই ফুল মার্কস পাইয়াছি। মেটিরিয়ামেডিকাতেও ভালনম্বর পাইতাম। ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষাটা অনায়াসে পাস করিয়া গেলাম। ইহার পর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। পঞ্চুমামাকে সঙ্গে লইয়া মামা নিজে একদিন আমার মেসে আসিয়া হাজির হইলেন। বলিলেন,

তোমার বিবাহের সব ঠিক করিয়াছি, তুমি ছুটির জন্য দরখাস্ত কর। আকাশ হইতে পড়িলাম। আমার বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। অবশ্য সেকালে এই বয়সে অনেকেরই বিবাহ হইত। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার মতো চাল চুলাবিহীন পাত্রকে কে কন্যাদান করিতে চাহিতেছে এই ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়টা কিন্তু মনের ভিতর চাপিয়া রাখিতে হইল। সেকালে গুরুজনদের কোনও আচরণের প্রতিবাদ করা, বা সে বিষয়ে প্রশ্ন করিবার রেওয়াজ ছিল না। গুরুজনেরা যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন তাহা নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইত। মামা বলিলেন, বিবাহের কথাটা লিখিয়া দিও তাহা হইলে ছুটি পাওয়া সহজ হইবে। তাহাই দিলাম। এ বিবাহে বাবার মত আছে কি না সে কথাটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ট্রেনে যাইতে যাইতে মামা এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিলেন। বলিলেন, তোমার দিদিমার জেদেই এ বিবাহ হইতেছে। তাঁহার সই বরদাবাবুর স্ত্রী সম্বন্ধটি আনিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ তোমার দিদিমার পক্ষে—আমাদের পক্ষেও—উপেক্ষা করা শক্ত। সুতরাং তিনি জেদ ধরিয়াছে ওইখানেই বিবাহ দিতে হইবে। তোমার বাবারও মত আছে, তিনি বলিয়াছেন বিবাহ সকাল সকাল দেওয়াই ভালো। তাছাড়া আর একটা কথা। তোমার মামীমার শরীর ক্রমশ ভাঙিয়া পড়িতেছে। সংসারের ভার তিনি একা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সংসারে তাঁহার একজন সাহায্যকারিণী দরকার। তাহার পর একটু থামিয়া মামা বলিলেন, শুনিলাম মেয়েটি দেখিতেও ভালো। কার্তিক আর তারাপদ দেখিয়া আসিয়াছে। গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। এই সব শুনিয়া তখন আমার কি মনে হইয়াছিল তাহা এতকাল পরে আর স্মরণে নাই। শুধু একটুকু বলিতে পারি, ভালোই লাগিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ভালো লাগিয়াছিল এইজন্য যে মামার সংসারে আমি এখন আর উপেক্ষিত নগণ্য পোষ্য মাত্র রহিলাম না, আমার বউ আসিয়া মামীমার সহকারিণী হইবে, মামা নিজে আমাকে লইতে আসিয়াছেন, ভবিষ্যতে ডাক্তার হইয়া হয়তো মামাকে অর্থসাহায্য করিতে পারিব—এই সব চিন্তাই মনকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। অর্থাৎ পদোন্নতি হইলে সাধারণতঃ যে রকম মনোভাব হয় আমার তাহাই হইয়াছিল। বিবাহ-প্রসঙ্গে সাধারণতঃ যে রোম্যান্টিক ভাব মনে জাগা স্বাভাবিক তাহা প্রথমে আমার জাগে নাই। আমি যে নিতান্ত তুচ্ছ প্রাণীমাত্র নই, আমিও যে অবশেষে সংসারের কাজে লাগিলাম এই ধরনের একটা সূক্ষ্ম গর্বে আমার মন ভরিয়া উঠিয়ছিল। বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু অবাক হইতে হইল। যাঁহার ছেলের বিবাহ তিনিই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিষুণপ্রসাদ বলিল বাবা কাশীতে একটা সংগীত-সভায় গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন ঠিক নাই। বিষুণপ্রসাদ চুপচুপি আরও একটি সংবাদ দিল। বাবার নাকি এবিবাহে মত ছিল না। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন ডাক্তারি পাস করিবার পূর্বে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু মামাবাবু বলিলেন যে তিনি পাত্রীর বাবাকে পাকা কথা দিয়া ফেলিয়াছেন। কথার নড়চড় করিলে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে। তাছাড় বুড়ি মাঈও (আমার দিদিমা) খুব জেদ করিতে লাগিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত বাবার আপত্তি টিকিল না। বিষুণপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে আর একটি সংবাদও আমাকে দিল। মামা পাত্রী-পক্ষের নিকট হইতে পণস্বরূপ কিছু টাকাও নাকি অগ্রিম লইয়াছেন। দিদিমা দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁর চোখে অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে। আমার মায়ের কথাই তাহা সর্বদা মনে পড়িতেছে। বার বার বলিতেছেন, আহা, এমন সুখের দিনে সে হতভাগী যদি থাকিত। সারাজীবন সে দুঃখের ঝড়ঝাপটাই সহ্য করিয়া গেল। এইবার সুখের

দিন আসিতেছে, কিন্তু সে কোথায়। মা বাঁচিয়া থাকিলে আজ কি করিতেন তাহারই একটা আনুমানিক চিত্র তিনি আঁকিতে লাগিলেন। দিদিমায়ের দৃঢ় ধারণা বাবা মাকে যে রঙীন শাড়ীখানা কিনিয়া দিয়ছিলেন সেইখানা পরিয়াই মা বধূবরণ করিতেন। মামীমা তখন আসন্নপ্রসবা। শরীর ভালো নাই। দেখিলাম তিনিও খুব খুশী হইয়াছেন। আমি প্রণাম করিতেই যে ভাবে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন আন্তরিকতার সুরই ফুটিয়া উঠিল।....."

কুমার এই পর্যন্ত পড়িয়াছিল এমন সময় বাধা পড়িল। গঙ্গা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত।

"তুই এখানে! শীগ্‌গির বাড়ি চল। মেজদা এসে গেছেন—"

"মেজদা! কোন ট্রেনে এলো?"

"তা তো জানি না। কখন এসেছেন তা-ও জানি না। হঠাৎ দেখি সামনের চৌতাটার উপর বসে' বেহালা বাজাচ্ছেন। বাড়িতে খুব হইচই পড়ে' গেছে। তুই চল।"

"বাবা কি করছেন?"

"কিছু করছেন না। চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করছে খালি। খুব খুশী হয়েছেন। এখন মেজদা তাঁর ঘরের ভিতর গিয়ে বাজনা শোনাচ্ছেন তাঁকে। সবাই ঘিরে বসেছে। তুইও চল।"

কুমার খানিক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ সংবাদের জন্য সত্যই সে প্রস্তুত ছিল না। মেজদা কি ভাবে ফিরিয়াছেন, সন্ন্যাসীর বেশে কি?

"মেজদার চেহারা কেমন দেখলি?"

"খুব সুন্দর। মনে হ'চ্ছে বয়স একটুও বাড়ে নি।"

"গেরুয়া পরে আছে?"

"না কিচ্ছু না। শাদা কাপড়, শাদা পাঞ্জাবি। তা-ও আড়ময়লা! চল চল আর দেরি করিস নি"।

"চাকরগুলোকে তাহলে ছুটি দিয়ে দে। মেজদার অনারে ওদেরও আজ ছুটি হোক। এই রোদে আজ আর লাঙল দিতে হবে না। বাড়ি চলুক!"

গঙ্গা চীৎকার করিয়া আদেশটি জারি করিল।

সদলবলে কুমার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ সে গঙ্গাকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁরে, পায়রার বাচ্চা যোগাড় করতে পারবি!"

"পায়রার বাচ্চা কি হবে এখন।"

"হঠাৎ মনে পড়ল মেজদা পায়রার মাংস খেতে খুব ভালোবাসত"

"চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না কেন।"

।। চব্বিশ।।

কুমার আসিয়া অবাক হইয়া গেল। বাবার ঘরে লোকে লোকারণ্য, শুধু বাড়ির লোকজন নয়, বাহিরের লোকও অনেক আসিয়াছে। পৃথ্বীশ ঘরের মেজেতে বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে তন্ময় হইয়া বেহালা বাজাইয়া চলিয়াছেন। কি সুর বাজিতেছে তাহা কুমার ধরিতে পারিল না, কিন্তু

তাহার মনে হইল মর্মস্পর্শী একটা কান্না যেন সুরে সুরে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল, কুমারও নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, তাহার চোখের কোণ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার ঠোঁটও কাঁপিয়া উঠিতেছিল মাঝে মাঝে। তিনি মনে মনে তাঁহার বাবাকেই দেখিতে ছিলেন। বহুকাল পূর্বে শোনা সেতারের আলাপই যেন আবার তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। বেহালা আর সেতার অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাঁহার কাছে। তিনি কেবল একটা অবিচ্ছিন্ন রূপময় রোদন শুনিতেছিলেন, যে রোদনের ভাষা কথা নয় সুর। কুমার লক্ষ্য করিল পৃথ্বীশের পোষাক পরিচ্ছদে সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ নাই, সাধারণ বাঙালীর পোষাক পরিয়াই সে আসিয়াছে। মুখে গোঁফ দাড়িও নাই। পরিষ্কার কামানো। মাথার চুলও সুবিন্যস্ত, জটা নাই আর মুখখানি কি সুন্দর, যেন প্রফুল্ল কমলের মতো। মেজদা তাহা হইলে এতদিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, এই সব প্রশ্নই বার বার তাহার মনে জাগিতে লাগিল।

.....খানিকক্ষণ পরে বাজনা যখন থামিয়া গেল তখনও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখনও যেন সুরে সুরে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া ছিল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।

কবিরাজ মহাশয় একধারে একটা মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে কথা বলিলেন।

"মেজবাবু, আপনি তো আমাদেব সবাইকে বেকুব বানিয়ে ছেড়ে দিলেন।"

"বেকুব? কেন!"

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া পৃথ্বীশ প্রশ্ন করিলেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"বেকুব ছাড়া আর কি। যাকে ভ্যাগাবণ্ড নিষ্কর্মা ভেবেছিলুম এখন আবিষ্কার করলুম সেই সবচেয়ে কাজের লোক। যাকে ভিখারী মনে হয়েছিল, দেখছি সে মহারাজ! লজ্জিত করে' দিয়েছ তুমি আমাদের।"

পৃথ্বীশ নতমস্তকে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—"আমি ভ্যাগাবণ্ড এবং ভিখারী। ওর চেয়ে বেশী আর কিছু নই। আপনারা ঠিকই ধরেছেন।"

কবিরাজ হটিবার পাত্র নহেন। অকৃত্রিম আনন্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, বাঃ, শুনে খুব খুশী হলাম। তোমার মতো মহারাজেরা ছদ্মবেশেই থাকে। বিনয়ই তাদের অলংকার, মণি-মাণিক্য নয়। যাক্ খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম কর। তারপর আলাপ হবে। আমি এখন উঠি গঙ্গাস্নান করব আজ।"

কবিরাজ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সুরের যে মায়ালোকে সৃষ্ট হইয়াছিল সেটা সহসা যেন ভাঙিয়া গেল। বাড়ির মেয়েরা তখন আগাইয়া আসিল। সুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "বাড়িতে সবাই এসেছে কেবল তুমি ছিলে না। সুখ ছিল না কারো মনে। কতদিন পরে যে তোমাকে দেখলুম। চল, বাড়ির ভিতর চল।"

পৃথ্বীশ উঠিয়া পুরসুন্দরীর সহিত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও অনুসরণ করিল তাঁহাকে। বাড়ির অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। স্বাতী চিত্রা তাঁহাকে দেখেই নাই উশনার ছেলেমেয়েরাও নয়। ইহাদের জন্মের পূর্বেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বিরু, উশনা, কুমার, কিরণ, ঊষা তাঁহাতে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যা পারে নাই পৃথ্বীশ যখন

চলিয়া যান তখন খুব ছোট ছিল সে। সন্ধ্যা সকলের সঙ্গে পৃথ্বীশের পিছু পিছু গেল না। দূর হইতে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—কত বয়স হইয়াছে মেজকাকার? ষাটের কাছাকাছি নিশ্চয়। কিন্তু মনে হয় যেন চল্লিশ। যেন ছোটকাকারই সমবয়সী। মুখে কি স্নিগ্ধ শুচি শান্ত ভাব। সন্ধ্যা মুখে কিছু বলিল না বটে, কাছেও গেল না, কিন্তু দূর হইতে সে শ্রদ্ধার ডালি নীরবে উজাড় করিয়া দিল তাহার মেজকাকার পায়ে, তাহার মেজকাকা অথচ সে অপরিচিত আগন্তুক, যাহার কথা সে একদিনও ভাবে নাই।

সেদিন বহুলোক প্রথমে পৃথ্বীশকে একটি মাত্র প্রশ্নই করিল—তুমি এতদিন কোথা ছিলে। পৃথ্বীশও একটিমাত্র উত্তবই সকলকে দিলেন—আমি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা সময়ে ছিলাম। কখনও একস্থানে বেশীদিন থাকি নাই। কিন্তু লোকে একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহার পর নানারূপ প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। এসব প্রশ্ন অবশ্য বাড়ির লোক করে নাই, গ্রামের চেনাশোনা লোকেরাই বেশী কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নলিখিত ধরনের

"তুমি কি সন্ন্যসী হয়েছিলে?"

"না।"

"শুনেছিলাম তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছ।"

"তাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দেখলাম সন্ন্যাসী হবার যোগ্যতা আমার নেই। ভালো গুরুও কোথাও পাই নি।"

"কি করতে তাহলে—"

"এমনি ঘুরে ঘুবে বেড়াতাম। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

"ঘুরতে হলে তো পয়সা চাই। পয়সা কোথায় পেতে?"

যেখানে থাকতাম সেখানে কোন না কোন কাজ জুটে যেত। যে কাজ হাতের কাছে পেতাম তাই করতাম। পয়সার অভাব হয় নি কখনও।"

"কি কাজ করতে?"

"অনেক রকম। টিউশনি করেছি অনেক জায়গায়, গান-বাজনা শিখিয়েছি অনেককে, স্কুলে মাস্টারিও করেছি কিছুদিন, বড় বড় সাধুদের শাগরেদি করেছি। কুলির কাজ, ফেরিওলার কাজ, চাকরের কাজ সব রকম কাজই করেছি। মানে, যখন যা হাতের কাছে পেয়েছি তাই করেছি। কাজের কোন বাছ-বিচার করি নি। অভাবে পড়ি নি কখনও।"

এই সব শুনিয়াই সবাই মোটামুটি সন্তুষ্ট হইয়া গেল। একটু হতাশই হইল বরং। তাহারা আশা করিয়াছিল পৃথ্বীশ যদি কোন দিন ফেরে জটাজুটধারী বিরাট সন্ন্যাসীরূপেই ফিরিবে, এক হাতে ত্রিশূল অন্য হাতে কমণ্ডলু, মুখে হর-হর-ব্যোম-ব্যোম-ধ্বনি। সে যে আধময়লা একটা লংক্লথের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া এবং মলিন কেডস পরিয়া ফিরিয়া আসিবে একথা সকলের কল্পনাতীত ছিল। বিরাট পর্বত যেন একটা মূষিক প্রসব করিল শেষকালে।

কুমার তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করেন নাই প্রশ্ন করিবার সাহসই হয় নাই তাহার। বিরুবাবুও প্রথম দিন তাঁহাকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বলিলেন, চল একটু বেড়িয়ে আসি। পীরবাবার পাহাড়ের দিকে যাই চল। দুজনে ছেলেবেলায় ওখানে কতদিন গেছি, মনে আছে সে সব কথা?"

"মনে আছে বইকি।"

"চল তাহলে ওইখানই যাওয়া যাক।"

বিরুবাবু বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর হনহন করিয়া হাঁটিয়া গেলেন তাহার পর হঠাৎ দেখিলেন পৃথ্বীশ একটু পিছাইয়া পড়িয়াছেন। বিরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন পৃথ্বীশ কাছে আসিলে বলিলেন—"তুমি এতদিন কি করেছ জানি না। জানবার কৌতূহলও নেই তেমন। গগন দিগন্তও নিজের মনে যা খুশি করে, অমি খবর রাখি না। তবে ভালো কাজ করেছ দেখতে পাচ্ছি। বেহালা বাজানোটা ভালো করে' শিখেছ আব শরীটাকে ভালো রেখেছ। জোরে হাঁটতে পারছ না কেন?"

"জোরে হাঁটতে পারি। কিন্তু হেঁটে লাভ কি? বেড়াতে বেরিয়েছি যখন আস্তে আস্তে যাই চল না।"

"বেশ তাই চল।"

কিন্তু বিরুবাবু ছটফটে লোক, হনহন করিয়া হাঁটাই অভ্যাস, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া মাঝে মাঝে আগাইয়া পড়িতেছিলেন। এবং আবার তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত পৃথ্বীশকেও তাঁহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে হইল।

পীরপাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পৃথ্বীশ একটু অবাক হইয়া গেলেন।

"এখানটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না? মনে পড়ছে এখানে ছোট একটা বাগানের মতো ছিল। প্রকাণ্ড জামগাছ ছিল একটা। গোলাপজামের গাছও ছিল, আমগাছ ছিল, লিচু ছিল—"

"সব কেটে ফেলেছে। শুনছি ওখানে বাড়ি হবে একটা। চারদিক ইঁটে আব সিমেন্টে ছেয়ে গেল, গাছরা জীবনযুদ্ধে হটে যাচ্ছে—"

তারপর হঠাৎ আবার বলিলেন—"মানুষ অতীতকে খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় বর্তমানের রূপকে নষ্ট করতে ইতস্তত করে না। আমরাই কবর আর পুরোনো ইমারত খুঁজতে গিয়ে কত জায়গা খুঁড়ে খেঁড়ে তছনছ করেছি—"

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—পীরপাহাড় খুঁড়লেও আমার বিশ্বাস অতীতের অনেক কিছু পাওয়া যাবে। চল তোমাকে দেখাই চল—"

বিরুবাবু পৃথ্বীশকে লইয়া সোৎসাহে আগাইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস এবং মতিগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীশের নিজের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই করিলেন না তিনি। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কথার ফাঁকে সেটাও জানিয়া লইবেন, কিন্তু কথার ফাঁক পাওয়া গেল না।

পৃথ্বীশের আকস্মিক আবির্ভাবে উশনা যদিও আনন্দিত হইয়াছিলেন কিন্তু এ আবির্ভাবটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। প্রত্যাশা করেন নাই বলিয়া তাঁহার হিসাবেও গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। পৃথ্বীশ আর আসিবে না ইহা ধরিয়া লইয়াই তিনি মনে মনে বাবার বিষয়ের একটা ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন কুমারের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কিন্তু পৃথ্বীশ ফিরিয়া আসাতে হিসাবে গোলমাল হইয়া গেল। এখন পৃথ্বীশকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হইবে না ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সুতরাং পৃথ্বীশের সহিত নির্জনে একটু আলাপ করিবার জন্য মনে মনে তিনি ওৎ পাতিয়া রহিলেন। পৃথ্বীশকে কিন্তু একা পাওয়া শক্ত হইল! পৃথ্বীশকে বাড়ির ছেলে

মেয়েরা—বিশেষ করিয়া উষা, স্বাতী, চিত্রা, জীবু, শিবু, লীলা, ইলা,—সুযোগ পাইলেই ঘিরিয়া বসিতেছে। ঘিরিয়া বসিতেছে গল্প শুনিবার জন্যে। তাহারা টের পাইয়া গিয়াছিল যে পৃথ্বীশ বহু দেশ ঘুরিয়াছে, তাহাব গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। কবিরাজ মহাশয়ও তাহাদের দলে যোগ দিতেন। সেদিন উশনাও একটু দূরে একধারে বসিয়াছিলেন। ঠিক গল্প শুনিবার জন্যই বসেন নাই, বসিয়াছিলেন যে গল্পটা শেষ হইলেই মেজদাকে ধরিয়া বাহিতলার দিকে লইয়া যাইবেন এবং সেই সময় বৈষয়িক আলোচনাও করিবেন। পৃথ্বীশের গল্প শুনিয়া কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন তিনি, বৈষয়িক আলোচনার কথা মনে রহিল না। পৃথ্বীশ যমুনোত্রী তীর্থের গল্প বলিতেছিলেন। তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল সকলে। মুখর কবিরাজ মহাশয়ও নীরব হইয়া গিয়াছিলেন।

"যম আর যমুনা সূর্যের ছেলেমেয়ে। আমরা ভাই-ফোঁটার সময় এঁদের স্মরণ করি। এই যমুনারই মন্দির আছে যমুনোত্রীতে। যমুনা নদী এই যমুনোত্রী থেকেই বেরিয়েছে, আর হৃষিকেশ প্রয়াগে এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। এই যমুনা নদীর তীরে অনেক বড় বড় শহর আর তীর্থ।। হৃষিকেশ, প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবনের কথা তো আপনারা সবাই জানেন। হিমালয়ের উপর আরও অনেক তীর্থ আছে। আমি হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী গিয়েছিলাম। এখন যাওয়ার অনেক সুবিধা হয়েছে, বাস অনেক দূর পর্যন্ত যায়। আমি পাকদণ্ডীর হাঁটাপথ দিয়েই গিয়েছিলাম। পথের আশ্রয় মাঝে মাঝে কালীকম্‌লিওয়ালার চটি আর ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলি। সেসব দোকানে দুধ আর খাবারও পাওয়া যায়। দোকানীরা প্রাই পাহাড়ী গাঢ়োয়ালি। খুব ভদ্র আর সস্নেহ ব্যবহার তাদের। ধরাসুরে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ধরাসুরে গঙ্গা যমুনা দুইই দেখা যায়। সেখানে আমার সম্বল গেল ফুরিয়ে। ধরাসুর ধর্মশালায় একটি ধনী ভদ্রলোক দেখলাম মালপত্র নিয়ে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। সঙ্গে চাকর নেই। আমি গিয়ে তাঁকে বললাম, আমি আপনার সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার মোটও আমি বয়ে' নিয়ে যাব। যে দোকানে চা খেয়ে আমার শেষ পয়সাগুলি দিয়েছিলাম সেই গাঢ়োয়ালী দোকানদারটি কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, বাবু, সামনে অনেকখানি খাড়াই, মনে হ'চ্ছে আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, মালের বোঝা নিয়ে চড়তে পারবেন কি? কেন এ কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন। বললাম, পয়সা ফুরিয়ে গেছে। রোজগার করতে হবে। এখানে রোজগারের আর অন্য কি উপায় আছে। সে বললে, আপনি কি ইংরেজি জানেন? বললাম, জানি। দোকানদার বললে, তাহলে আজ যাবেন না। আমি আপনাকে কাজ দেব। আমি থেকে গেলাম। সবাই যখন চলে' গেল তখন কতকগুলো ছেঁড়া খাতা বার করে' বললে মহারাজার যে কর্মচারীটি আমার গাঁয়ের দেখা-শোনা করে সে ইংরেজি-জানা লোক। খাজনার দায়ে সে আমার জমি আটক করে' বসে' আছে, মাঝে মাঝে ভয় দেখাচ্ছে যে নীলাম করে' দেবে। অথচ আমি খাজনা দিয়েছি, এই দেখুন আমার খাতায় সব লেখা আছে। জিজ্ঞাসা করলাম রসিদ নেই? সে বললে, না রসিদ দেয় নি। আমার এই খাতায় সব লেখা অছে। ওদের লোকই আমার খাতায় লিখে দিয়েছে। আমি তো লিখতে পড়তে জানি না। ওদের লোকেরাই লিখে দিয়েছে। আপনি ইংরেজীতে বেশ ভাল করে গুছিয়ে লিখে দিন যে আমার খাতায় সব লেখা আছে, হুকুম পেলে আমি গিয়ে সব দেখিয়ে আসব। লিখে দিলাম ইংরেজীতে একটা দরখাস্ত। এর বদলে আমাকে সে দশটা টাকা দিলে। অবাক

হ'য়ে গেলুম, অত টাকা পাব আশা করিনি। দোকানদার আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মনে হ'ল আমাকে টাকা দেওয়াটাই তারা মূল উদ্দেশ্য। দরখাস্ত-লেখানোটা ছুতো। অবশ্য কথাটা সে আমাকে খুলে বলে নি। কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'তে লাগল। মনে হ'তে লাগল আমি অন্যায়ভাবে ওর কাছে থেকে এ টাকাটা নিচ্ছি। বললাম সে কথা। তা শুনে সে আরও দশটা টাকা আমাকে দিয়ে বললে—বাবুজি, বিদেশে হাতে কিছু টাকা থাকা দরকার। তুমি আমার কাজ করে' দিয়েছ, আমি তার মজুরি দিলাম। বেশী দিয়েছি কি কম দিয়েছি তা নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না। যদি বেশী মনে হয় বাড়ি ফিরে গিয়ে বাড়তি টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দিও। এখন যাও। বেরিয়ে পড়লাম। বেশ খাড়া চড়াই। পাইন বনের ছায়া না থাকলে পথচলা অসম্ভব হ'ত। কল্যাণী পার হ'য়ে কুমরারী চটিতে এসে যখন পৌঁছলাম তখন আমি প্রায় আধমরা। সেইখানে থেকে গেলাম একদিন। সেখানে একটি চা-ওলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে দেখলাম ধরাসুর চা-ওলাকে চেনে। কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ধরাসুর চা-ওলার এক ছেলে নাকি যমুনোত্রী দেখতে গিয়ে আর ফেরে নি। জনশ্রুতি সে নাকি পয়সার অভাবে পড়ে' একজনের মোট বইছিল। চড়াই উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে' মারা যায়। একথা শোনার পর আমার মনে হয়েছিল আমাকে টাকা দেওয়ার সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে কি! যোগ আছে কিনা তা নির্ণয় করা যায় নি। কিন্তু মন বলছিল, আছে। যমুনোত্রী থেকে যখন ফিরলুম, ধরাসুতে সেই বুড়োকে কিন্তু আর দেখতে পেলাম না। শুনলাম সে হঠাৎ মারা গেছে। তার কাছে আজও ঋণী হ'য়ে আছি।"

পৃথ্বীশ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন নিজের মনের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন।

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল—"যমুনোত্রী কেমন দেখলে মেজদা?"

পৃথ্বীশ চোখ খুলিয়া আরও কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকদিন পূর্বে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাই যেন মনে মনে আবার দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চারিদিকে বরফ আর বরফ। আকাশ থেকেও বরফ ঝরে পড়ছে পালকের মতো, পেঁজা তুলোর মতো। দূর থেকে যমুনাকে মনে হয় অতি শান্ত, অতি স্বচ্ছ একটি রূপোলি পাড় যেন লেগে আছে তুষার-শুভ্র হিমানীর বুকে। কাছে গেলে দেখা যায় ভীষণা এক নদী বরফ ভেদ করে বেরুচ্ছে। প্রতিটি ঢেউয়ের উপর ভাসছে বরফের কুচি, মনে হয় যেন একরাশি অভ্র প্রবল বেগে এগিয়ে আসছে ভীষণ গর্জন করতে করতে। দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। মুখে কথা সরে না। মথুরা-বৃন্দাবনে যে যমুনাকে দেখা যায় এ যেন সে নয়। মথুরা-বৃন্দারবনের যমুনা যেন প্রৌঢ়া গৃহিণী আর যমুনোত্রীর যমুনা যেন উন্মত্তা যুবতী, কলকলরবে হেসে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে সমতলের দিকে। কোন উপমা দিয়েই ঠিক বোঝানো যায় না কি অনুপম তার রূপ।"

"মন্দির আছে সেখানে?"

"আছে বৈকি। অতি সাধারণ একটি মন্দির। সে মন্দিরে কোন জাঁকজমক নেই। মানুষের জাঁকজমকপ্রিয়তা সেখানে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে মন্দির গড়েছিল যেন সে বুঝতে পেরেছে এই বিরাট পরিবেশের পটভূমিকায় তার যে কোনও জাঁকজমকই হাস্যকর হবে তাই বোধহয় মন্দিরটিকে কোন রকম অলংকারের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত করেনি। মন্দিরটি নিতান্ত নিরাভরণ। বিনয়ের প্রতিমূর্তি যেন।"

"কিসের মূর্তি আছে—"

"গঙ্গা-যমুনার।"

উশনা বলিলেন, "জীবন সার্থক করে এসেছ তুমি মেজদা। আমরা আর পারব না। চল এখন একটু বেড়িয়ে অসি—"

"কোথা যাবে—"

"চল, আমাদের বাগানের দিকে যাই।"

"চল।"

পৃথ্বীশ উঠিয়া পড়িলেন।

পৃথ্বীশ উঠিয়া পড়িবার পরই সভা ভাঙিয়া গেল। তাহার পর চন্দ্রসুন্দর আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে। পৃথ্বীশ আসিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ কথা হয় নাই চন্দ্রসুন্দরের ইচ্ছা তাহার সহিত একান্তে বসিয়া একটু আলাপ করেন। সে যখন তীর্থে তীর্থে এতদিন ঘুরিয়াছে তখন নিশ্চই কোন সাধু-মহাত্মার দেখা পাইয়াছে সে এবং মন্ত্রও লইয়াছে যদিও সে নাকি বলিতেছে যে কোন সাধুর নাগাল সে পায় নাই, কিন্তু ওসব কথা চন্দ্রসুন্দর বিশ্বাস করিতে চান না। তিনি জানেন এবং অনুমোদনও করেন যে এসব গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করা উচিত নয়। পৃথ্বীশ এতদিন যে বাহিরে ছিল নিশ্চয় কোন অবলম্বন ছিল তাহার। কি সে অবলম্বন? নিশ্চয় ধর্ম। ধর্মই মানুষের একমাত্র সত্য অবলম্বন যাহা ধরিয়া সে সুখে থাকিতে পারে। অধর্ম-পথে মানুষ বেশীদিন থাকিতে পারে না। অধার্মিকদের চেহারাতেও এমন একটা শ্রীহীন ভাব ফুটিয়া ওঠে যে দেখিলেই তাহাদের চেনা যায় পৃথ্বীশের মুখে দিব্যকান্তি, মনে হয় তাহার অন্তরে দীপ জ্বলিতেছে। সে দীপ কে জ্বালিয়াছেন? নিশ্চয়ই কোন গুরু। সে গুরুর খবর শুনিবার জন্য চন্দ্রসুন্দর উৎসুক। কিন্তু তিনি অসিয়া দেখিলেন পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে।

"পৃথ্বীশ কোথা গেল?"

উষা বাহির হইয়া আসিল। সে বলিল—"সেজদার সঙ্গে বেড়াতে গেলেন। কাকাবাবু আপনি ভিতরে চলুন, বৌদি আপনার জন্যে তোলা উনুনে একটা নতুন ধরনের জলখাবার করেছেন। গরম গরম খেতে ভালো লাগবে। আমি আপনাকে ডাকতেই যাচ্ছিলুম।"

"নতুন ধরনের কি খাবার করছে আবার বৌমা।"

"ছানার পাকৌড়ী। বৌদি ওটি শিখেছে মেজাদর কাছে। দিল্লীতে নাকি খুব পাওয়া যায়। পাতলা ব্যসনে ডুবিয়ে ছানা ভাজা। জাম কাকাবাবু মেজদা একটু আগে যমুনোত্রীর গল্প করেছিল—সে যে কি অপূর্ব তা আর কি বলব। মেজাদা নাকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে—সব তীর্থ দেখা হয়ে গেছে।"

"পৃথ্বীশ তোদের গল্প বলছিল বুঝি—"

"হ্যাঁ, সবাই তো ছিল। তুমি পুজো করছিলে বোধহয়।"

"হ্যাঁ। মহিম স্তোত্রটা রোজ পড়ি। ওটা খুব লম্বা তো—"

"চল, পাকৌড়ি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে ভালো লাগবে না।"

ভিতরে যাইবার মুখে কিন্তু আবার একটা বাধা পড়িয়া গেল।

"ঊষা, ঊষা, শোন, শোন—"

ঊষা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল রাধানাথ গোপ হনহন করিয়া আসিতেছন। তাঁহার পিছনে একটা কুলি। কুলির মাথায় একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি, ঝুড়িতে কিছু পাকা কলা, কিছু কাঁচকলা, দুইটা মোচা এবং কিছু থোড়।

"আমাব বাগান থেকে মাস্টার মশায়ের জন্য এসব নিয়ে এলাম।"

চন্দ্রসুন্দর প্রথমে অবাক, পরে পুলকিত হইলেন। গর্বে স্নেহে তিনি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। রাধানাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এখনও মনে আছে যে আমি থোড় মোচা ভালবাসি?"

"সব মনে আছে। আপনি যে ডুমুব ভালবাসেন তা-ও ভুলি নি। ডুমুরও এনেছি কিছু!"

"বাঃ! খুব খুশী হলুম। সুখে থাক বাবা, দীর্ঘজীবী হও।"

চন্দ্রসুন্দর আবেগভরে রাধানাথের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

"তুমি কোথা যাচ্ছ এখন?"

"বাইরে থেকে অনেক লোক এসেছে। কুমারবাবু একা সামলাতে পাচ্ছেন না। আমিও যাই।"

রাধানাথ বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই সূর্যসুন্দরের ঘরে গেলেন।

রোজই পূজার পর দাদার ঘরে তিনি কিছুক্ষণ বসেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। তিনি ঘুমাইতেছেন কি না ঠিক বোঝা গেল না। মনে হইল তিনি যেন ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে একটা আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজকাল প্রায়ই ফুটিয়া ওঠে।

চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ঊর্মিলা অনড় হইয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে বসিয়া ছিল। ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না সূর্যসুন্দর জাগিয়া আছেন না ঘুমাইতেছেন।

খুব আস্তে সে একবার ডাকিল—"বাবা—"

সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"ফলের রস দেব একটু?"

"এখন থাক।"

ঠিক সেই সময় গগনের শ্বশুর এবং শাশুড়ী শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিছু পিছু গগনও। গগনের শ্বশুর শাশুড়ী দুজনেই একটু উত্তেজিত বলিয়া মনে হইল। গগনের মুখে মৃদু একটা হাসি চিকমিক করিতেছে।

গগনের শ্বশুর বলিলেন, "মহা মুশকিল হয়েছে একটা। গগনের ব্লাড প্রেসার মাপবার যন্ত্রটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। স্প্রিংটা খারাপ হয়েছে বোধহয়। চম্পার আজ ব্লাড প্রেসার নেওয়াই হল না।"

শাশুড়ী বলিলেন, 'অথচ ওখানকার ডাক্তাররা বলেছেন সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই যেন ব্লাড প্রেসার নেওয়া হয়।"

গগন বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। Pulse থেকেও খানিকটা আন্দাজ করা যায়। Pulse তো দেখলুম, প্রেসার বেড়েছে বলে মনে হল না।"

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া নির্নিমেষে ইহাদের দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ তিনি যে লোকে ছিলেন তাহা অতীত লোক। সেখানে রাজলক্ষ্মী, বামুন দিদি, ত্রিপুরারি সিং, রায় মহশয়, এবং আরও অনেকে ভিড় করিয়া ছিল। চোখ খুলিয়া দেখিলে না তাহারা কেহ নাই, নূতন লোকেরা ভিড় করিয়া আছে। তাহাদের কথাবার্তা নূতন রকম। কিন্তু তিনি নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন, ''হাসপাতালের যন্ত্রটা নিয়ে এস না।''

''সেটাও খারাপ হ'য়ে গেছে''—গগন উত্তর দিল।

''ও। তাহলে এক কাজ কর তোমরা, যন্ত্রটা কাটিহারে পাঠিয়ে দাও। সেখানে রাজু বলে' এক ঘড়িওলা আছে, সে স্প্রিংটা ঠিক করে' দিতে পারবে। কুমারকে বল রাজুকে একটা চিঠি লিখে দিক। আর চম্পাকে আমার কাছে নিয়ে এস দেখি তার Pulse—''

তারপর গগনের শ্বশুর শাশুড়ীর ভীতচকিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ''তোমরা বস।''

ঘরের একধারে দুইটি চেয়ার ছিল তাহাতেই তাহারা বসিয়া পড়িলেন। তাহাদের চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তাঁহারা যেন নৌকাডুবি হইয়া একটি দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছেন।

একটু পরে ধীর পদক্ষেপে আনতমস্তকে গগনের পিছু পিছু চম্পা আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মুখে যদিও কিছু বলিতেছিল না, কিন্তু তাহার গমনভঙ্গিমা হইতে বোঝা যাইতেছিল যে এসব তাহার ভালো লাগিতেছে না। তাহাকে লইয়া বাবা মা কী যে অনর্থক হইচই করিতেছেন! তাহার শরীর তো বেশ ভালো অছে। ধীরে ধীরে সে গিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানার উপর বসিল। সূর্যসুন্দর তাঁহার সুস্থ হাতটি দিয়া তাহার নাড়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ''ভয়ের কোন কারণ নেই, ভালো আছে—''

প্রবীণ ডাক্তারের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়াও কিন্তু গগনের শ্বশুর শাশুড়ী নিশ্চিন্ত হইলেন না। যন্ত্রেই উপরই তাঁহাদের বেশী বিশ্বাস। গগনকে বলিলেন, ''তুমি বাবা তোমার instrumentটা এখনই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

''হ্যাঁ দিচ্ছি।''

গগন বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছু পিছু তাহার শ্বশুর শাশুড়ীও গেলেন। গগন কি করে না তাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে চান। যন্ত্রটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের স্বস্তি নাই। কিন্তু বাহিরে গিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন তাঁহারা। কুমারের সহিত দেখা হইয়া গেল। সে একটা বড় রুই মাছ ঝুলাইয়া বাড়ির দিকে যাইতেছিল। মাছটি প্রায় দশ সের হইবে। একজন মহলদার মাছটি ভেটস্বরূপ পাঠাইয়াছে।

গগনের মুখে সব কথা শুনিয়া বলিল, ''আমি এখুনি কাটিহারে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যাবেলা নাগাদ সব ঠিক হ'য়ে যাবে। হয়তো রাজু নিজেই চলে' আসবে।''

গগনের শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন, ''রাজু কি তোমার পরিচিত?''

''সে আমার বন্ধু। আমার জমির পাশে তার জমি।''

''রিলায়েব্‌ল্‌ লোক তো?''

''খুব রিলায়েব্‌ল্‌। ও সব ঠিক করে দেবে।''

তবু গগনের শ্বশুরের মুখভাব প্রফুল্ল হইল না। তিনি তাঁহার গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন, সে মুখও মেঘাচ্ছন্ন।

।। পঁচিশ ।।

উশনা পথে যাইতে যাইতেই পৃথ্বীশকে তাঁহার নিজের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। বক্তব্যটা বৈষয়িক।

"তুমি বোধহয় জানা না বাবা এক্টা উইল করেছেন। সে উইলে তিনি কাকাবাবুকে দু'শ বিঘে জমি দিয়েছেন; একশ বিঘে দিয়েছেন কুমারকে, আর বাকিটা আমাদের মধ্যে ভাগ করে' দিয়েছেন। অবশ্য আমাদের বাগান আর বাড়িটা আমাদের থাকবে। বাগানের আয় আমরা সবাই এক এক বছর পাব। প্রতি পঞ্চ বছরে সেই আয় থেকে বাড়ি সারানো হবে। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘে জমি পড়েছে। আমি তো এখানে থাকব না। তাই ঠিক করেছি আমার অংশের জমিটা বিক্রি করে' দিয়ে মায়ের নামে যা হোক কিছু একটা করব। কি করব তা অবশ্য এখনও ঠিক করি নি। কুমারের সঙ্গে সেটা পরামর্শ করতে হবে। তোমার প্ল্যান কি? তুমি কি এখানেই থাকবে? যদি না থাক তাহলে তোমার জমিটাও ওই একই কাজে লাগাতে পারো। সকলে মিলে আলোচনা করে' প্ল্যানটা তাহলে এখনই ঠিক হ'য়ে যেতে পারে। আমার যতদুর মনে হয় দাদা বোধহয় এখান ফিরে আসবে এখনও পর্যন্ত তো কোথাও বাড়িটাড়ি করে নি। দাদার সঙ্গে ও পরামর্শ কবতে হবে তার প্ল্যান কি। তুমি কি এতদিন কেবল ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছ? আমাদের সকলের ধারণা হয়েছিল সন্ন্যাসী হয়েছ তুমি। কিন্তু তোমাকে দেখে তা তো মনে হ'চ্ছে না। অবশ্য অনেক প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসীও থাকেন। বাইরে গেরুয়া নেই, ভেতরে গেরুয়া, সংসারে থেকেও সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কিন্তু তুমি তো বললে এখনও পর্যন্ত কারে কাছে দীক্ষা নাও নি। তোমার ফিউচার প্ল্যান কি?"

পৃথ্বীশ মৃদু হাসিলেন একটু। কোন জবাব দিলেন না।

"বিয়ে করবার ইচ্ছে আছে?"

"পৃথ্বীশ আর একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। আমার কোন ফিউচার প্ল্যানও নেই। প্রতিদিনই আমি নূতন প্ল্যান করি, যেদিন যেরকম সুবিধে হয়। আমার অংশের জমিটা তুমি নিয়ে মায়ের নামে কোনও কিছু করতে পার, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি দেখেছি এ ধরনের স্মৃতিচিহ্ন শেষ পর্যন্ত টেকে না। পরবর্তী বংশধরদের কাছে সেগুলো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মন্দির, লাইব্রেরী, যাই কর তা নিয়ে পরে একটা ঝগড়া আর দলাদলি হয়। ওসব রক্ষা করাই একটা দায়। বিশেষত আমাদের দেশে"

উশনা চুপ করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তাহার পর বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম মায়ের নামে একটা শিবমন্দির করিয়ে দেব।"

"আমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছি, দেখেছি অনেক শিবমন্দির বেওয়ারিস হ'য়ে পড়ে' আছে। কেউ তার দেখাশোনা করে না। শিবমন্দিরে জন্তুজানেয়ার আর বদমায়েশ লোকের আড্ডা হয়েছে। পাথরের শিব পালাতে পারে না, দেখেছি কুকুরে তার মাথায় পেচ্ছাপ করছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উশনা বলিলেন, "তাহলে কি করব বল। আমরাতো এখানে থাকব না, আমদের জমিগুলোর কি হবে তাহলে—"

"কুমারের কাছেই থাক না। সেই ভোগ করুক। কিম্বা সে যা ভাল বোঝে তাই করুক।"

"তাহলে তুমি বলছ—"

"হ্যাঁ যেমন চলছে তেমনি চলুক না। ওই যে দাদাও আসছে এদিকে। দাদার পিছনে একটা চাকর কি যেন মাথায় করে' আছে। কি ওটা—"

"পাথর। দাদা এখন পীরপাহাড়ের চারদিকে যেসব পাথর পড়ে' আছে সেইগুলো নিয়ে মেতে আছে। একটা পাথরই আনছে বোধহয়"

দেখিতে দেখিতে বিরুবাবু আসিয়া পড়িলেন। দেখা গেল তিনি খুবই অন্যমনস্ক এবং একটু উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন। পৃথ্বীশ উশনার সামনে আসিয়া তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য জিনিস দেখিলেন।

"ও তোমরা! এখানে হঠাৎ?"

পৃথ্বীশ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উশনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এই মেজদার সঙ্গে গল্প করছিলাম একটু। অনেক দিন পরে দেখা হল ত।"

"ওর পেটের কথা বার করতে পারলে কিছু? ও তো এখনও মিস্ট্রিম্যানই হ'য়ে আছে। কি করছিল ও এতদিন টের পেলে?"

"না—"

"কোন দিকে যাচ্ছিলে তোমরা?"

"বাগানের দিকে—"

"চল আমিও যাই। 'বাহির-কেলুয়া' গাছটাকে একবার দেখে আসি। ওর আম আমার বড় প্রিয়—"

চাকরটার দিকে ফিরিয়া বিরুবাবু বলিলেন—"ওটা বাড়িতে নিয়ে যা।"

তাহার পর বলিলেন—"এখানে যে সব পাথরটাথর দেখি, সেগুলো মনে হচ্ছ বুদ্ধযুগের। এই পাথরটা সঙ্গে করে' নিয়ে যাব ভাবছি—"

তাহার পর হঠাৎ উশনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা বোধহয় মনে করছ এসব বাজে ব্যাপারে মেতেছি। কিন্তু মোটেই বাজে নয়। এসব ফার-রিচিং অবশ্য ধরতে পারা চাই।"

এভাবে আক্রান্ত হইয়া উশনা একই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। মুখে যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন, "না আমি সে সব কিছু ভাবছি না তো"—কিন্তু সত্যই তিনি মনে ভাবিতেছিলেন, দাদা কি যে সব বাজে ব্যাপার লইয়া মাতিয়া আছে। পৃথ্বীশ একটু মুচকি হাসিলেন শুধু। বিরুবাবু কথাটা বলিয়াই এমনভাবে মাথানীচু করিয়া হনহন করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন যেন মাটিতে তিনি কিছু খুঁজিতেছেন। দুইজনেই অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাঁহার।

একটু পরেই আমবাগেন পৌঁছিয়া গেলেন তাঁহারা। বাহর-কেলুয়া গাছটার তলায় একটা বিছানা ছিল।

"বাঃ, এখানে চৌকি পাতলে কে?"

গাছের পিছন হইতে একটি কালো লম্বা যুবক আসিয়া প্রণাম করিয়া কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইল।

"আমিই পেতেছি বাবু। কুমার আমাকে এই ক্ষেতটা আধি দিয়েছে।"

"তুমি কে—"

"আমি জিতুর ছেলে। কুমার আমার সঙ্গে পড়ত।"

জিতু নামটা যেন বিরুবাবুর স্মরণপথে উদিত হইল।

"জিতু মহলদার?"

"জি হাঁ।"

"ভাল ফানুস বানাত?"

"জি হাঁ।"

বিরুবাবুরর মনে পড়িল ছেলেবলোয় কালীপূজার সময় জিতু মহলদার তাঁহাদের আকাশ-প্রদীপ তৈয়ারি করিয়া দিত। নানা রঙের কাগজ দিয়া বৃহৎ এক আকাশ-প্রদীপ-ফানুস। জিতু মহলদার জেলে ছিল, মাছ ধরিত। কিন্তু জিতুর মাছের কোন চিত্র বিরুবাবুর মনে আঁকা নাই। তাঁহার মনে জিতু মহলদারের যে ছবিটি আঁকা অছে তাহার পাশে দুলিতেছে একটি বিচিত্র রঙের ফানুস।

বিরুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ফানুস তৈরি করতে পার?"

"না।"

"মাছ ধর?"

"না, মাছের ব্যবসা করি না।"

"কি কর তাহলে—"

"ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে' রেলের একটা চাকরীতে ঢুকেছিলাম, কিন্তু স্টেশন মাস্টারকে ঘুষ দিতে পারলাম না বলে' সে চাকরি চলে' গেল। সংসার বড় কষ্টে চলছিল, তাই কুমার বললে—এই দশ বিঘে ক্ষেত তুই আধিতে কর। তাই করছি—"

"তোমার কি নাম?"

"কার্তিক।"

কার্তিকের দশ-আনা-ছ-আনা-চুল-কাটা মাথার দিকে চাহিয়া বিরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। এমন সময় কুমারকে দূরে দেখা গেল। সে বেশ দ্রুতপদেই আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অসিয়া পড়িল।

"কার্তিক তুই এখানে। তুই এই চিঠিটা নিয়ে আর গগনের কাছ থেকে একটা যন্ত্র নিয়ে এখুনি কাটিহারে রাজুর কাছে চলে' যা। রাজুকে বলিস যন্ত্রটা ঠিক করে' যেন সন্ধ্যার ট্রেনে চলে' আসে। চলে যা এখুনি, ট্রেনের বেশী দেরি নেই!"

কার্তিক চলিয়া গেল।

উশনা বলিলেন, "তুই এসে গেছিস ভালই হয়েছে। এই সময়েই পরামর্শটা করে' ফেলা যাক।"

"কিসের পরামর্শ"—বিরুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমাদের বিষয়ের সম্বন্ধে।"

"আমাদের বিষয়ের সম্বন্ধে!"

বিরুবাবু ভ্রূবুঞ্চিত করিয়া উশনার দিকে চাহিলেন এবং উশনা যতক্ষণ ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন ততক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন, যেন উশনা একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। উশনার কথা শেষ হইলে তিনি কেবল

বলিলেন, "পাগল হয়েছে! কোন স্মৃতিচিহ্ন টেকে না। বাপ মার স্মৃতি-চিহ্ন আমরা আর আমাদের বংশধরেরা। আমরা যতদিন টিকে থাকতে পারব আমদের বাবার মার স্মৃতি ততদিন থাকবে। তারপর সব শেষ। বাবার বিষয়-আশয় কুমার দেখছে, কুমারই তার ব্যবস্থা করুক আমরাকেউ যদি কখনও বিপদে পড়ি এখানে সব থাকব। আমি তো এই সোজা বুঝি।"

এই বলিয়া তিনি পৃথ্বীশের মুখের দিকে চাহিলেন।

পৃথ্বীশ বলিলেন—"আমরাও তাই মত।"

উশনা হাত উলটাইয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে, আমারও তাই।"

কুমার পৃথ্বীশের দিকে চাহিয়া বলিল—"মেজদা, এখানে গ্রামে কয়েকজন বাজিয়ে আছে। string instrument দুটো সেতার, তিনটে এস্রাজ, একটা বেহালা, একটা গীটার আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা ওদের একদিন কম্পিটিশন হোক—ও একশ টাকা প্রাইজ দেবে। তোমাকে judge হ'তে হবে"

"সন্ধ্যাটা এত হুজুকে—ছ্যা ছ্যা"—বিরুবাবুর সমস্ত মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

।। ছাব্বিশ।।

কুমারের স্বভাবে একটা নির্লিপ্ততা আছে। যদিও বাড়ির এত রকম কাজকর্মের সব ব্যবস্থা সেই করিতেছে কিন্তু কোন কাজেই সে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে নাই। সব ব্যাপারে মধ্যে থাকিয়াও নিজের জন্য একটু নির্জনতা আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা তার আছে। বাড়ির কাছে বাগান এবং বাগানের মধ্যে একটি ছোট ঘর থাকাতে তাহার সুবিধাও হইয়াছে। একটু ফাঁক পাইলেই সে বাগানে আসিয়া ছোট ঘরটিতে আশ্রয় লয়। সেদিনও খাওয়াদাওয়ার পর সে সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা লইয়া বাগানে চলিয়া গিয়া ছিল। বাবার প্রথম জীবনের এই কাহিনীটা তাহার উপন্যাসের মতো মনোরম মনে হইতেছিল। নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল সে।

"মামার জেদে আমার বিবাহ হইয়া গেল বটে, কিন্তু দেখা গেল বিধাতার অভিপ্রায় অন্য রূপ ছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই আমার বালিকা পত্নীটি মারা গেল। বিবাহের পর তাহার সহিত কিছু আলাপ পরিচয় হইয়াছিল বইকি। নব-বধূকে কেন্দ্র করিয়া যে সব মোহ জীবনকে রঙীন করিয়া তোলে সে মোহ আমার জীবনকেও রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু রঙীন বুদ্বুদ ফাটিয়া গেল। সেই ফাটা বুদ্বুদের শোক স্মৃতিও আমার জীবনে বেশী দিন থাকে নাই। কবে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আজ লিখিতে বসিয়া তাহার কথা মনে পড়িল। জীবন নদীর স্রোতের মত, কত কিছু ভাসিয়া আসে আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। যাহা ভাসিয়া চলিয়া যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না। কিছুদিন পরে তাহাদের স্মৃতিটাও ভাসিয়া চলিয়া যায়। এই নিয়ম। কিছুদিন পরে পত্নী-শোক ভুলিয়া আবার পড়শুনায় মন দিলাম। বস্তুত পড়াশুনাই তখন আমার জীবনে ধ্যানজ্ঞান ছিল। ভাল ছেলে বলিয়া আমার সুনাম হইয়াছিল, ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষের মতো দুঁদে দুর্মুখ ভয়ংকর হিরণ্যকশিপুও আমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমার এই মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য আমার চেষ্টার অন্ত ছিল না। আমার এ চেষ্টা সফল হইত না

যদি বিপিন এবং পালিতবাবু আমার সহায় না হইতেন। বিপিন আমার সহপাঠী ছিল, দুইজনেই একঘরে থাকিতাম। রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার বই লইয়া রাত জাগিয়া আমি সেগুলি টুকিতাম। এইভাবেই বেশ চলিতেছিল। কিন্তু যেদিন আমি ক্লাসে ফার্স্ট হইয়া জয়টিকা লাভ করিলাম সেদিন বিপিনের মনোভাবও একটু পরিবর্তিত হইল। যেদিন আমাদের পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইল সেদিন বিপিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সন্ধ্যাবেলায় সে প্রকাণ্ড একটা ঠোঙায় অনেক খাবার কিনিয়া আনিয়া আমার সামনে সেটা ধরিয়া দিল।

" নে রে নেপো আরও দই খা!"

"তার মানে!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম।

বিপিন বলিল—"তুই তো একটি ফার্স্টক্লাস নেপো দেখছি। বই কিনে মলুম আমি। আর তুই হলি ফার্স্ট। খাবারগুলাও খা--"

দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঈর্ষ্যার আগুন ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে। তখনই বুঝিতে পারিলাম সে মদও খাইয়াছে। কাহারও সহিত ঝগড়া করা আমার স্বভাব ছিল না। আমি গরীবভাবে মামার বাড়িতে মানুষ হইয়াছিলাম, স্বভাবটাই ভীতু-গোছের হইয়া গিয়াছিল।

বলিলাম, 'কেন রাগ করছিস ভাই। ফার্স্ট হয়েছি সেটা কি আমার দোষ। তোর ঋণ কি আমি জন্মে শোধ করতে পারব ভাই। খাবার এনে ভালই করেছিস, ক্ষিধে পেয়েছে। আয় দুজনে মিলে খাই—"

বিপিনের হাতে একটা শিঙাড়া তুলিযা দিলাম। আবার ভাব হইয়া গেল। কিন্তু যে ফাটলটা হইয়াছিল তাহার দাগ মিলায নাই। সেদিনের পর হইতে প্রায়ই বিপিনকে মদ খাইতে দেখিতাম। সে সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া যাইত। যখন ফিরিত তখন তাহার মুখে মদের গন্ধ পাইতাম। প্রচুর এলাচ দারচিনি খাইয়াও এ গন্ধ সে ঢাকিতে পারিত না। তাহাকে কিন্তু কোনদিন মাতাল হইতে দেখি নাই। মদ খাইলে তাহার চোখের কোণ দুইটা লাল হইয়া যাইত। একটু উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা বলিত এবং ঘনঘন এলাচ দারচিনি চিবাইত। বিপিনের স্বভাবটাই একটু রাগী ধরনের ছিল। রাগিয়া গেলে চাকর ঠাকুরদের চড়টা চাপড়টা মারিয়া বসিত। তাহার এই রাগের একটা গল্প হঠাৎ মনে পড়িল। আমাদের মেসের জন্য রোজ সকালে বাজার করিতে হইত। একদিন বিপিন আর আমি নাপতে বাজারে মাছ কিনিবার জন্য গিয়াছিলাম। এক মেছুনীর কাছে গিয়া বিপিন কাটা রুই মাছের দর করিতে লাগিল। তখন কাটা রুই মাছের দর ছিল চার আনা সের। সেদিন মেছুনী বলিল-পাঁচ আনা সেরের কম দিতে পারব না আজ। কালো কালো মোটাসোটা বলিষ্ঠ গড়নের মেয়েটি। নাকে প্রকাণ্ড নথ, নথে টানা দেওয়া। বিপিন বলিল—আমাদের দু'সের মাছ লাগবে। সঙ্গে তো আট আনার বেশী আনি নি। মেছুনী চোখ ঘুরাইয়া বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—আজ তাহলে মাছের আঁশ নিয়ে যাও। কাল বেশী পয়সা এনে মাছ নিয়ে যেও। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিল। বিপিনের বুড়ো আঙুলটা তাহার নথের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল। এক টানে সেটাকে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া নাক কাটিয়া নথটা নাসিকাচ্যুত হইল। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। বিপিন চড় মারিয়াই চম্পট দিয়াছিল। আমি ভিড়ের মধ্যে ধরা পড়িয়া গেলাম। আমি বিপিনের সহিত ছিলাম বটে কিন্তু আমি একটি কথাও বলি নাই, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

সেই মেছুনীই আমাকে ভিড় হতে হইতে উদ্ধার করিল। সে বলিল, "ও কিছু করে নি। সে অন্য একটা ছোঁড়া।" আমি ছাড়া পাইয়া গেলাম। ভিড় হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম বিপিন বড় রাস্তার মোড়ে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে এক ধমক দিয়া বলিল, কি হাঁদারাম, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি। বেগতিক দেখলেই সরে' পড়তে হয় এটা জানিস না? পরবর্তী জীবনেও দেখিয়াছি বিপিন আবেগের মুখে কিছু একটা করিয়া বেগতিক দেখিলে শেষ পর্যন্ত সরিয়া পড়িয়াছে। বিপিন ডাক্তারি পাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্ভবত তাহার এই মেজাজের জন্য শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি করিতে পারে নাই। ডাক্তারি করিতে হইলে যে মনের জোর অবিচলিতভাবে শেষ পর্যন্ত হাল ধবিয়া থাকিবাব যে শক্তি থাকা প্রয়োজন বিপিনের তাহা ছিল না। সে উদ্ধত প্রকৃতির ছিল বলিয়া কোথাও চাকরিও করিতে পারে নাই। সে অবশেষে এক মাড়োয়ারির সহিত জুটিয়া ব্যবসা করিয়া বড়লোক হইয়াছিল। অনেকদিন পরে এই সময় তাহার সহিত আমার একবার দেখা হয়। তখন বিরুর মায়ের খুব অসুখ, তাহাকে ডক্তার বিধান রায়ের দ্বারা চিকিৎসা করাইব বলিয়া কলিকাতায় লইযা গিয়াছিলাম। কোথাও বাড়ি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সেওড়াফুলিতে মামার বাড়িতে ছিলাম। মামা তখন সেওড়াফুলিতেই থাকিতেন। হঠাৎ খবব পাইলাম বিপিন খুব বড়লোক হইয়াছে, কলিকাতায় বেশ বড় বাড়ি করিয়াছে। সে বাড়ি খালিই পড়িয়া থাকে, বিপিন তাহার হাওড়ার বাড়ি হইতে যাতায়াত করে। যিনি খবর দিলেন তিনি বিপিনের ব্যবসারই একজন দালাল। তাঁহার নিকট হইতে বিপিনের কলিকাতার বাড়ির ঠিকানা লইয়া তাহার সহিত দেখা করিলাম। আমাকে দেখিয়া বিপিন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং সব শুনিয়া বলিল, আমার বাড়ি তো তোরই বাড়ি। এখনই সবাইকে নিয়ে আয়। তাহাব উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া গেলাম। দুই দিন পরেই সপরিবারে তাহার বাসায় আসিয়া উঠিলাম। আমার স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হইল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সন্ধ্যাও অসুখে পড়িয়া গেল। বিধানবাবু আসিয়া বলিলেন টাইফয়েড হইয়াছে। সেকালে টাইফয়েড দূরারোগ্য ব্যাধি ছিল। আরোগ্য হইয়া সুস্থ হইতে প্রায় মাস তিনেক লাগিত। ব্যাপার দেখিয়া বিপিন ঘাবড়াইয়া গেল। উচ্ছ্বাসের মুখে সে যদিও আমাকে আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাহার উদারতা বজায় রাখিতে পারিল না। আমাকে একদিন বলিল এ বাড়িতে তাহার এক আত্মীয়ের মেয়েব বিবাহ হইবে, সুতরাং আমার আর সেখানে থাকা চলিবে না। পরে শুনিয়াছিলাম তাহার সে আত্মীয়ও এমন কিছু নিকট আত্মীয় নহে। সইয়ের মায়ের বকুল ফুলগোছের আত্মীয়। সে নিজেও বিপিনের বাড়িতে তাহাব মেয়ের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করে নাই। বিপিনই নাকি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আহ্বান করে। সম্ভবত ফন্দি করিয়া আমাকে তাড়াইবার জন্য। এসব পরে আমি তাহার ওই আত্মীয়ের নিকট হইতেই শুনি। বিপিন কোন ব্যাপারেই শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তাহার ব্যবসাও গুটাইতে হইয়াছিল। ঠিক কি ঘটিয়াছিল জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি অংশীদার মারোয়ারীই নাকি তাহার সব কিনিয়া লইয়াছিল, এমন কি বাড়িটা পর্যন্ত। আসল কারণ বোধহয়, ঋণ। বিপিনের শেষ জীবনটা নাকি বড়ই দুঃখে কাটিয়াছিল।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এবার গোড়ার কথায় ফেরা যাক। আমি যখন ফার্স্ট হইয়া ক্লাস প্রমোশন পাই তখন বিপিনের একটু বিরূপ মনোভাব দেখিয়াছিলাম একথা আগেই বলিয়াছি। যদিও বিপিনের সহিত আমার পরে ভাব হইয়া গিয়াছিল কিন্তু আমি আর

তাহার বই লইয়া কখনও পড়ি নাই। আমি লাইব্রেরি হইতে যতটা পারিতাম পড়িয়া আসিতাম। কিছুদিন পরে আর একটা সুবিধাও হইয়া গেল। পালিতবাবুর কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি আলাদা একটি ঘর লইয়া থাকিতেন। চাকরির অবসরে পড়াশোনা করিতেন। তাঁহার ঘরে আলমারিতে অনেক বই থাকিত। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিলাম তিনি বগলে করিয়া কিছু বই লইয়া বাহিরে যাইতেছেন। সিঁড়িতে আমাদের মুখামুখি হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এত বই নিয়ে কোথা যাচ্ছেন? পালিতবাবু বলিলেন, এগুলো একমাসের জন্য ভাড়া নিয়ে এসেছিলাম। মাস শেষ হ'য়ে গেছে এবার ফেরত দিতে যাচ্ছি। শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বই ভাড়া পাওয়া যায় তাহা জানিতাম না। জিজ্ঞাসা কবিলাম—ভাড়া কত? তিনি বলিলেন—ভাড়া খুব বেশী নয়, বই পিছু মাস চার আনা। তবে দোকানে কিছু টাকা জমা রাখতে হয়। কেন, তোমার কোনও বই চাই? বলিলাম—বই পেলে ভালো হ'ত। আমি চার আনা ভাড়া দিতে পারব। কিন্তু দোকানে জমা রাখবার মতো টাকা তো আমার নেই। পালিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আমি দোকানে পঞ্চাশ টাকা জমা রেখেছি। তুমি যে বই নেবে তা আমার নামেই নিতে পার। জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে ডাক্তারি বইও পাব তো? পালিতবাবু বলিলেন—দোকানটি পুরাতন পুস্তকের, সেখানে সব রকম বই পাওয়া যায়। সেইদিনই পালিতবাবুর সহিত গিয়া দোকান হইতে দুইটি বই লইয়া আসিলাম। আমার বইয়ের সমস্যার সমাধান হইল। ভাবিয়া দেখিলাম মাসে চারখানি করিয়া বই লইতে পারিলে আমাব পড়াশোনা বেশ ভালভাবে হয়। কিন্তু আমি যে টাকা পাইতাম তাহাতে আমার কোনক্রমে চলিত। চিন্তা হইল তাহা হইতে একটা টাকা বাঁচাইব কি করিয়া? মরিয়া হইয়া বাবাকে একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম। সেই বোধহয় বাবাকে আমার প্রথম চিঠি লেখা। লিখিলাম—ডাক্তারী বইয়ের দাম অনেক বেশী। তাহা কিনিবার সামর্থ্য আমদের নাই। এখানে একটি দোকানে বই ভাড়া পাওয়া যায়। আপনি যদি আমাকে মাসে এক টাকা বেশী পাঠান অমি বই ভাড়া লইয়া পড়িতে পারি। বাবা কোনও উত্তর দেন নাই, কিন্তু পরের মাস হইতে আমাকে আরও দুই টাকা করিয়া বেশী পাঠাইতে লাগিলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে আমি পড়াশুনা শুরু করিলাম। এই সময় পালিতবাবুকে আমি ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম। তাঁহার মতো মহৎ এবং পণ্ডিত লোক আমি আমার জীবনে আর দেখিয়াছি বলিয়া আর মনে পড়ে না। সব সময়ে তাঁহাকে পড়িতে দেখিতাম। বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাহার পরই আবার বই লইয়া বসিতেন। তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল মনে পড়িতেছে। তিনি ছাতা ছাড়া কখনও বাহির হইতেন না। তাঁহার একটি রেলির ছাতা ছিল। ছাতার উপর একটি সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন করাইয়া লইয়াছিলেন। সেটি বগলে করিয়া তিনি সব সময়ে বাহির হইতেন। কোন রকম বিলাসিতা ছিল না। একজোড়া কমদামি স্যুট ছিল, তৈরী করানো নয়, চাঁদনী হইতে 'রেডি-মেড' কেনা। তাহাই পরিয়া তিনি আপিসে যাইতেন। আপিস হইতে ফিরিয়াই সেগুলি নিপুণভাবে পাট করিয়া বিছানার নীচে রাখিয়া দিতেন। বাড়িতে পরিতেন থান ধুতি ও লংক্লথের ফতুয়া। তাঁহার একটি লংক্লথের কামিজও ছিল, সেটি বেড়াইতে যাবার সময় পরিতেন। বাহিরে যাইবার জন্য তাঁহার কালো রঙের প্যানেলার ফিতাহীন স্প্রিং-দেওয়া জুতা ছিল। ইহা ছাড়া তাহাকে অন্য জুতা পরিতে দেখি নাই। এরকম জুতা আজকাল আর দেখি না। অমিও পরে ওই ধরনের জুতা ব্যবহার করিয়াছি। খুব

আরামপ্রদ জুতা। পালিতবাবু যখন বাসায় থাকিতেন তখন খড়ম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার একটি তোলা উনুন ছিল, ঠিকে ঝি সেটি দুবেলা ধরাইয়া দিয়া যাইত। তাহাতেই তিনি সংক্ষেপে ভাতে-ভাত ফুটাইয়া লইতেন। দুধটাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে জানিয়াছিলাম তিনি অনেক গরীব ছেলের স্কুলের বেতন দিতেন। আমি যে চারখানি করিয়া বই লইতাম তাহার ভাড়াও তিনি নিজে দিয়া দিতেন। আমি টাকাটা পরিশোধ করিতে গেলে বলিতেন, ব্যস্ত কি, পরে দিলেও চলত। আমি কখনও টাকা বাকি রাখি নাই। মনে পড়িতেছে একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন ভগবানের কাছে প্রর্থনা করি তোমার এ আত্মসম্মানবোধ যেন চিরকাল এমনি অম্লান থাকে।

আমার ক্যাম্বেলে পড়ার সময় আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিযাছে বলিয়া মনে পড়ে না। একটা ঘটনা কেবল মনে পড়িতেছে। খোঁড়া অশ্বিনী একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বলিল—তাহার বাবা হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মাবা গিয়াছে। তাই তাহার পড়াশোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাবার মৃত্যুর পর সে আপিসের বড় সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিল। তিনি তাহাকে একটা চাকরীতে বহাল করিয়া লইয়াছেন। ভাল করিয়া কাজ করিলে চাকরিতে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। পরে অশ্বিনীর উন্নতিও হইয়াছিল। উচ্চপদস্থ রেলোয়ে কর্মচারী হইয়া সে রিটায়ার করে। আমি যখন পাস করিয়া মণিহারিতে ডাক্তারি আরম্ভ করি তখন অশ্বিনী আমার কাছে ছুটি পাইলেই আসিত। অশ্বিনীর অনেক গুণ ছিল। যখন সে চাকুরিতে কিছু উন্নতি করিয়া বড়ো পোস্ট পাইল তখন অনেক গরীবেব ছেলের সে চাকরি করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার মেজাজটা সাহেবী ছিল। বাঙালী-চরিত্রের ঢিলাঢালা ভাব সে মোটেই পছন্দ করিত না। নিয়ামানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা, স্পষ্টভাষণ, সততা তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কাহারও মধ্যে এসব জিনিসের অভাব দেখিলে সে চটিয়া যাইত। সাধারণত বাঙালী-চরিত্রে এসবের বড়ই অভাব। এজন্য তাহার বাঙালী বন্ধু খুব কম ছিল। এক আমি ছাড়া তাহার বাঙালী বন্ধু বোধহয় ছিলই না। সাহেব বন্ধু অনেক ছিল। তাহার চারিত্রিক গুণের জন্যে সাহেবরা তাহাকে ভালবাসিত। সেই জন্য জীবনে সে উন্নতিও করিয়াছিল। যে বড় পোস্ট পাইয়া যখন অনেকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিল তখন তাহার আপিসের সকলে তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। খুব কড়া অফিসার ছিল। কাহারও চারিত্রিক কোন ত্রুটি সহ্য করিত না। সে অনেকের যেমন চাকরি করিয়া দিয়াছিল তেমনি আবার অনেকের চাকরি খাইয়াও ছিল। ছুটি পাইলে সে আমার নিকট মাঝে মাঝে আসিত এবং আমার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া আমাকে নানারূপ উপদেশ দিত। তখন আমার বাড়িতে অনেক বেকার লোকের আড্ডা ছিল। তাহাদের বেকার বলিতেছি বটে, তাহারা নিজেরা তেমন অর্থোপার্জন করিতে পারিত না এ হিসাবে তাহাদের অবশ্য বেকার বলা চলে, কিন্তু তাহারা আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ছিল না। তাহার না থাকিলে একা ওই অজ পাড়াগাঁয়ে আমি হয়তো টিকিতেই পারিতাম না। তখনও অমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করি নাই, তখন ওই বেকার লোকগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আমর সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাই নয়, তাহাদের উৎসাহ তাহাদের স্বতোৎসারিত আনন্দ তাহাদের ভালবাসা তাহাদের ভক্তি আমার জীবনের স্বাদ ফিরাইয়া দিয়া আমাকে আমার নবজীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল, একথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। তাহাদের জন্যই আমার মনিহারির একক জীবনে অমি স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছি।

আমি যখন ক্যাম্বেল হইতে পাস করিয়া বাহির হইলাম তখন আমার বয়স কুড়িও হয় নাই। আমি পরীক্ষায় ভাল ফল করিয়াছিলাম বলিয়া আমার শিক্ষকগণ আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং মেকেন্‌জি সাহেব। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন আমি যেন তাঁহাদেরই কীর্তি। মেকেন্‌জি সাহেব বলিলেন, তোমাকে এখনই একটা ভাল চাকরি দিচ্ছি, তুমি কাজে লাগিয়া যাও। ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ কবিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার বয়স কম, কষ্ট করিবার শক্তি তোমার আছে, লেখাপড়াও ভাল করিয়া শিখিয়াছ, তুমি সাহেবদের দাসত্ব করিবে কেন, তুমি কোন গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়া দাও। দেশের সেবা কর। আমাদের দেশে অনেক গ্রামে মাইলের পর মাইল কোন ডাক্তার নাই, সর্বত্র বিনা চিকিৎসায় হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে রোগীরা বেঘোরে প্রাণ হারাইতেছে, তুমি গিয়া তাহাদের বাঁচাও। তাহাদের আপন লোক হও। সেখানে উপার্জনও কম হইবে না। খাইয়া পরিয়া শুধু সুখেই থাকিবে না, দশজনের একজন হইয়া থাকিবে।

'হিরণ্যকশিপু'র মুখে একথা শুনিব প্রত্যাশা করি নাই। দেশে তখনই জাতীয় জাগরণের সুর ধীরে ধীরে গুঞ্জরিত হইতেছিল, ইংরেজরা যে আমাদের মিত্র নহেন, শত্রু, একথা সাহিত্যিকরা, নেতারা নানাভাবে আমাদের বুঝাইতে শুরু করিয়াছেন। ধর্মজগতে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে বিদ্রোহের অরুণাভায ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা যে ডাক্তার ঘোযের মতো সাহেবিভাবাপন্ন লোককেও এতটা নাড়া দিয়েছে তাহা ভাবিতে পারি নাই।

পালিতবাবুকে আসিয়া সব কথা বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন ডাক্তার ঘোয যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই। চাকরি করিলে ক্রমশ মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। মনুয্যত্ব বজায় রাখিয়াও চাকরি করা যায়, কিন্তু তাহাতে চাকরির উন্নতি হয় না। মনিবরা খোশামোদ চায়। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে হইলে কিন্তু গোড়ায় কিছু টাকার দরকার। তাহা যদি যোগাড় করিতে পার তাহা হইলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করাই ভালো। তুমি তোমার অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার যাহা বলেন তাহাই কর।

আমি সাহেবগঞ্জ যাইবার আগে একটি পত্র বাবাকে, একটি পত্র মামাকে এবং একটি পত্র দিদিমাকে দিলাম। জানিতাম দিদিমা আমার লেখা চিঠি পড়িতে পারিবেন না কিন্তু তাঁহার নামে চিঠি আসিয়াছে এই সংবাদেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইবেন। অমি কবে কোন্ ট্রেনে ফিরিব পত্রে সে কথা লেখা ছিল। একটা সূক্ষ্মগর্বে আমার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যদিও সামান্য একটা ডাক্তারী পরীক্ষা পাস করিয়াছিলাম কিন্তু আমার মনে হইতেছিল যেন একটা দিগ্বিজয় করিয়া বাড়ি ফিরিতেছি সকলে ঠিক করিয়াছিল আমি মামার নুনের গোলায় খাতা লিখিব, আমার মতো গবেট ছেলের আর কিছু হওয়ার আশা নাই কিন্তু ভগবানের বিধান অনুরূপ ছিল না। আমি কিন্তু সেদিন ভগবানের কথা ভাবি নাই, মনে হইয়াছিল কৃতিত্বটা বুঝি আমারই। পঞ্চুমামার কথা অবশ্য একদিনও ভুলি নাই। তিনি আমার জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে যদি উপস্থিত না হতেন তাহা হইলে আমি ডাক্তার হইতে পারিতাম না। ক্যাম্বেল স্কুলের খবরই আমার নিকট অজ্ঞাত থাকিত। সময় পাইলেই তাঁহার বাসায় আমি গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম। তিনিও একটা মেসে থাকিতেন। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বেলা পাঁচটার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি তখন আপিস

হইতে ফিরিয়া মুড়ি খাইতেছিলেন। সামনে একটি রেকাবিতে দুইটি রসগোল্লা ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জলখাবার খাইয়া আসিয়াছি কি না। উত্তর দিলাম, আসিয়াছি। প্রশ্ন করিলেন, বিকালে কি জলখাবার খাই। বলিলাম, ছোলা-ভিজে আর গুড়। তখন তিনি একটি রসগোল্লা তুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এটিও খাও। দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই তিনি বদান্যতার এ অভিনয়টি করিতেছেন। রসগোল্লাটি খাইয়া ফেলিলাম বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে আর কখনও পাঁচটার সময় তাঁহার কাছে যাই নাই। সময় পাইলে সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে যাইতাম। তখন দেখিতাম তিনি তাঁহার এক বন্ধুর সহিত দাবাখেলায় নিমগ্ন আছেন। আমার সহিত হুঁ হাঁ করিয়া দুই একটা কথা বলিতেন মাত্র। আমারও বলিবার মতো কথা বিশেষ থাকিত না, কর্তব্যবোধে মাঝে মাঝে যাইতাম। বাড়ি ফিরিবার পূর্বে তাঁহার সহিত গিয়া দেখা করিলাম। আমি পরীক্ষার ফল ভাল করিয়াছি শুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, তোমার জন্মদিনে আমি তোমাব মামার বাড়ির উঠানে উপস্থিত ছিলাম। ঘটনাচক্রে তোমার ডাক্তারি পড়ার সময়ও আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পরিয়াছি। আহা, তোমার মা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত! সে হতভাগিনী চিরকাল কষ্ট করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো সুখের মুখ দেখিতে পাইত। ছাত্রজীবনে তোমাব মামা তোমার বিবাহ দিযা অন্যায় করিয়াছিল। শুনিয়াছি তোমাব সে বউও অকালে মারা গিয়াছে। একহিসাবে ভালই হইয়াছে। নিজের পাযে না দাঁড়াইয়া বিবাহ করিলে প্রায়ই দুঃখভোগ করিতে হয়। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজেব ঘর বাঁধ, তাহার পর বিবাহের কথা চিন্তা করিও। তোমার মামা হয়তো আবার এখনই তোমার বিবাহের চেষ্টা করিবে। মামাব কথা শুনিও না। আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। পঞ্চুমামা বলিলেন, একটু দাঁড়াও। পৈতায় তাঁহার বাক্সের চাবিটি বাঁধা থাকিত। তিনি সেই চাবি দিয়া নিজের বাক্সটি খুলিলেন এবং বাক্স হইতে পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই টাকা দিয়া তুমি একটি স্যুট করাইয়া লইও। চাকরিই কর বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস কর আমার দেওয়া স্যুটটি পরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে ইহাই আমার অনুরোধ। অমি টাকাটা হাতে করিয়া নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পঞ্চুমামা কৃপণ বলিয়া বদনাম ছিল। এখন আবিষ্কার করিলাম রুক্ষ বালির নীচে ফল্গুধারা বহিতেছে। পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করি নাই। তাঁহার টাকা দিয়া একটি ভালো স্যুট তৈয়ারি করাইয়া তাহা পরিয়াই প্র্যাক্‌টিস শুরু করি।

আমি যেদিন সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া যাই সেদিন খুব দুর্যোগ । একে শীতকাল, তাহার উপর ঝড় জল। সাহেবগঞ্জে ট্রেন রাত্রি দুইটার সময় পৌঁছিত। আমি স্থির করিয়াছিলাম যে বৃষ্টি যদি না কমে তাহা হইলে রাতটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটাইয়া ভোরে বাড়ি যাইব। কিন্তু ট্রেন হইতে নামিয়া অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম বাবা আমার জন্য একটি শাল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গে বিষুণপ্রসাদ। আমি প্রথম যেদিন কলিকাতায় যাই সেদিন বাবা কি বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল। আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম, প্রণাম করিতেই বাবা শালটি আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। আর কোন কথা বলিলেন না। বিষুণপ্রসাদের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া যেন একটি পরম রমণীয় এবং অতি-প্রত্যাশিত দৃশ্য উপভোগ

করিতেছিল। একটি কথাও বলে নাই। আমি যখন তাহাকে প্রণাম করিতে গেলাম তখন সে আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আরে কর কি কর কি। তুমি ব্রাহ্মণ, অমি কায়স্থ। আমি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলাম—আপনি আমার দাদা। বাবা কোন মন্তব্য করিলেন না। দেখিলাম তাঁহার চোখে মুখে একটা অপূর্ব দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। জিনিসপত্র নামানো হইলে বাবা প্ল্যাটফর্ম্মের গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি বিষুণপ্রসাদকে বলিলাম—এত বৃষ্টিতে আমরা যাব কি করে'? বিষুণপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে বলিল—হরিদাস মাড়োযারির গাড়িটা এনেছি। হরিদাস মাড়োয়ারি সাহেবগঞ্জের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার একটি সুদৃশ্য বড় বিলাতী জুড়ি গাড়ি ছিল। প্রকাণ্ড একজোড়া ঘোড়া সেটা টানিত। সেই গাড়ি আমার জন্য স্টেশনে আসিয়াছে এই অবিশ্বাস্য সংবাদে আমার চোখে মুখে সম্ভবত বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিষুণপ্রসাদ মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইয়া বলিল—"হরিদাসবাবু এখন গুরুজির মস্ত বড় ভ্‌কত্‌! আমার কাছে খবরটা শুনে নিজেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। গুরুজি গাড়িতে আসতে চাইছিলেন না, আমি অনেক বলে' কয়ে' রাজী করিয়েছি। চল, চল তাড়াতাড়ি যাই তা না হলে উনি হয়তো হেঁটেই চলে' যাবেন।' বাহিরে গিয়া দেখিলাম বাবা নাই। কোচোয়ান বলিল, গুরুজি মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন। চলুন আপনাদের পৌঁছাইয়া দিতেছি। বাবা হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বিষুণপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বৃষ্টির বেগ কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও একেবারে থামে নাই। সে বলিল, ডাক্তার তুমি গাড়িতে চলে' যাও, আমি দেখি গুরুজি কোন্ দিকে গেলেন। হন্তদন্ত হইয়া বিষুণপ্রসাদও চলিয়া গেল। আমি একাই গাড়িতে চড়িয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলিতে লাগিল। এতো ভালো গাড়িতে আমি ইতিপূর্বে আর চড়ি নাই। স্প্রিংয়ের গদির উপর বসিয়া সর্বাঙ্গ দুলিতে লাগিল। মনেও একটা নূতন ধরনের উন্মাদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। নৈশ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া ওয়েলার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ নির্জন পথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ খপ্। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম। মামার বাড়ি স্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়, অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছিয়া গেলাম। মামার বাড়িটা অন্ধকারে প্রেতের মতো দাঁড়াইয়া আছে মনে হইল। সহিসের সহায়তায় জিনিসগুলা নামাইয়া লইলাম। যদিও আমি আসিব বলিয়া পূর্বেই চিঠি লিখিয়াছিলাম কিন্তু বাড়িতে কেহ যে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা মনে হইল না। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম দ্বিতলের একটি ঘরের জানালা হইতে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাইতেছে বুঝিলাম দিদিমা জাগিয়া আছেন। আর কেহ না করুক তিনি আমার প্রত্যাশা করিতেছেন। সহিস আমার বাক্স বিছানাটা রাস্তায় নামাইয়া দিয়াছিল। সে আমাকে প্রশ্ন করিল—"বাবু এবার আমরা যাই?" আমার পক্ষে বাক্স বিছানা বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাহাকে বলিলাম—"তুমি একটু অপেক্ষা কর। এদের ওঠাই। বাক্স বিছানাটা তুমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাও।" নীচের তলায় কার্তিক মামা থাকিতেন। তাঁহার কপাটহে গিয়া ধাক্কা দিলাম। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর কপাট খুলিল। যিনি কপাট খুলিয়া বাহির হইলেন তিনি কার্তিক মামা নন। প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই, কপাট খুলিতেই বলিলাম, কার্তিক মামা কেমন আছ? এদিকে এস, প্রণামটা করি। সসংকোচে আর এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, কার্তিকবাবু নেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে, গেছেন। আমি নগেন, ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার। একটু অবাক হইয়া গেলাম, কার্তিক মামা যে কখনও চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন ইহা

আমার কল্পনাতীত ছিল। নগেনবাবুর ঘরেই আমার বাক্স বিছানাটা সহিসের সহায়তায় রাখাইলাম। তাহার পর যাহা করিলাম তাহা আমার মতো দরিদ্রের হয়তো করা উচিত ছিল না। কিন্তু তখন আমার দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কাছে তখন দুইটি টাকা মাত্র ছিল। সে দুইটিই আমি সহিস কোচোয়ানকে দিয়া দিলাম। তাহারা যখন সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল তখন যে আনন্দ আমার সারা মনকে প্লাবিত করিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়।

"কে রে সুয্যি এলি নাকি—"

নেত্যর কণ্ঠস্বর। ছাতের আলিসা হইতে সে মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

"হ্যাঁ আমি। যাচ্ছি—"

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দিদিমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দিদিমা অন্ধ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছেন।

"সুয্যি এলি—?"

আমি গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। চোখের জল যেন বাঁধ ভাঙিয়া আমার সমস্ত সত্তাকে বিগলিত করিয়া দিদিমার নিকট নিজেকে নিবেদন করিল। অনুভব করিলাম দিদিমাও কাঁদিতেছেন। তিনি আমার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন। একটি কথাও বলেন নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম তিনি কঁদিতেছেন। একটু পরে তিনি কথা বলিলেন।

"মুখ হাত ধুয়ে কিছু খা। তোর জন্যে দুধ রেখেছি। নেত্য সেটা গরম করে' দিক।"

আমি উঠিয়া দেখিলাম নেত্যও ঘরের মেজেতে এক কোণে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। আমি উঠিয়া বসিতেই নেত্য হাঁটুব ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। তাহার চোখ দুটিও হাসিতে লাগিল। হাসি-কান্না মাখা তাহার সে দৃষ্টি আমি এখনও ভুলি নাই।

"তুমি বস অমি এখনই দুধ গরম করে' দিচ্ছি—"

"চিনি একটু বেশী করে' দিস। সমস্ত রাত খায় নি বোধহয় কিছু।"

"আমি দুখান রুটিও রেখে দিয়েছি। দুধ রুটি খাবি?"

"খাব না কেন। তুই এনে দেনা পোড়ারমুখী। অনুমতি নেবার দরকার কি—"

আমি ট্রেনে কিছু খাই নাই। কিন্তু তবু এই ভোরে দুধ রুটি খাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু সে কথা বলিতে পারিলাম না। জানিতাম বলা বৃথা, খাইতেই হইবে।

খাওয়া শেষ হইলে দিদিমা বলিলেন—"আয়, আমার কাছে ব'স।"

দিদিমার কাছে বসিতেই দিদিমা আমার মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন—"খুব রোগা হ'য়ে গেছিস দেখছি।" আমি রোগা হই নাই, বরং একটু মোটাই হইয়াছিলাম। কিন্তু জানিতাম দিদিমাকে সে কথা বোঝানো শক্ত। চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর দিদিমা বলিলেন, "তোর মামা এখনও ওঠে নি। এই ফাঁকে তোকে একটা কথা বলে' নি।" দিদিমা বলিলেন আমি পাস করিয়াছি এই খবর এখানে আসাতে অনেকের মনে, বিশেষত মামীমার মনে একটা অশঙ্কা হইয়াছে যে আমি যদি এখানে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করি তাহা হইলে মামার প্র্যাকটিস হয়তো কমিয়া যাইবে। ইহা লইয়া অনেকেই নানরকম জল্পনা-

কল্পনা করিতেছে। এ শহরে বাবার নাকি খুব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হরিদাস মাড়োয়ারি প্রভৃতি বড় বড় ধনী লোকরা বাবাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বাবা যদি একটু ইঙ্গিত করেন তাহা হইলে তাহার বাজারে এখনি আমার জন্য বড় ডিসপেন্সারি করিয়া দিবে। মামা যদিও মুখে কিছু বলেন নাই, কিন্তু সম্ভবত মনে মনে তাঁহারও ভয় হইয়াছে। দিদিমা হঠাৎ বলিলেন "তোকে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—এখানে তুই প্র্যাকটিস করতে বসবি না।" আমি বলিলাম, "তোমাকে কথা দিচ্ছি এখানে আমি প্র্যাক্‌টিস করতে বসব না। মামা যা বলবেন যেমন বলবেন আমি তেমনি করব। ও নিয়ে তুমি কিচ্ছু ভেব না।'

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

দিদিমার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনুভব করিলাম তাঁহার বুক হইতে চিন্তার একটা গুরুভার নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবতার পব দিদিমা বলিলেন, "ওরা এখন আর কেউ উঠবে না। এই দুর্যোগে কি কারো ঘুম ভাঙে। তুই আমার বিছানাতেই শুয়ে পড়। নেত্যর ঘরের তাকে আমার একটা পুবানো লেপ আছে সেইটা বরং নিয়ে আসুক। আমার লেপটা ছোট, দু'জনের কুলুবে না।"

"লেপ আনবার দরকার নেই। বাবা আমাকে একটা শাল দিয়েছেন, গায়ে দিয়েই শুয়ে পড়ছি—"

"তোর বাবা আবার তোকে শাল দিলে কবে?"

"এখনি। বাবা শাল নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন যে। হরিদাস মাড়োয়ারির জুড়ি গাড়িও আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।"

"তাই নাকি!"

দিদিমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"কই শাল কই?"

"এইযে অমি গায়ে দিয়ে আছি।"

"সরে' আয় দেখি ভাল করে'।"

দিদিমার দৃষ্টি ছিল না, তিনি কম্পমান হাত দুইটি দিয়া সাগ্রহে শালটাকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া দেখিতে লাগিলেন।

"খুব নরম তো দেখছি, কি রং—"

"শাদা—"

নেত্যও অবাক হইয়া শালটা দেখিতেছিল।

সে বলিয়া উঠিল—"শালের সারা গায়ে কি সুন্দর কাজ করা। এমন জমকালো আঁচলা আমি আর দেখি নি।"

দিদিমা শালের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "হতভাগী তোর সুখের দিন এতদিন পরে এল, আর তুই অকালে কোথা চলে' গেলি"।

সম্ভবত আমার মাকে স্মরণ করিয়াই কথাগুলি বলিলেন। আমারও কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। আমি দিদিমার পাশেই শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া মামার সহিত দেখা হইল। প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা করিলেন।

"এস বাবা এস। কাল রাত্রে কখন এসেছ আমি টেরই পাই নি! আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ তুমি বাবা। বেঁচে থাক। জীবনে উন্নতি কর। অহো, আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকত—" মামার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম তাঁহার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছে। বাম হাত দিয় তিনি চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

"তোমার মামীমার সঙ্গে দেখা করেছ?"

"না, কই তিনি?"

"এখনও ওঠে নি বোধহয়। ওকে ভাল করে দেখ দিকি ওর তলপেটে একটা ব্যথা অনেকদিন ধরে' হ'চ্ছে। ওষুধপত্র দিলে কমে, আবার হয়। তুমি একটু দেখ দিকি—"

মামা ফুলের সাজিটি লইয়া খড়ম চট চট কবিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ির পিছনে ছোট একটি বাগান করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফুল তুলিয়া রোজ তিনি পূজা করিতেন। মামা চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম মামীমার ঘরে যাইব কিনা। তাঁহার ঘরের কপাট বন্ধ দেখিয়া ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার কপাট বেশীক্ষণ বন্ধ রহিল না সুধীর কপাট খুলিয়া উঁকি দিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর চিনিতে পারিবামাত্র আনন্দে তাহার সব দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল। ছুটিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল সে। তাহার পর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—'সুশীল নন্‌তি আয়, দেখ, কে এসেছে।" মামার চারটি ছেলে মেয়েই আমাকে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে যেন নূতন একটা ভাব জাগিয়া উঠিল। এ ভাব আগে কখনও আমার মনে জাগে নাই। হঠাৎ মনে হইল ইহারা যদিও আমার মায়ের পেটের ভাইবোন নয় তবু আমি উহাদের দাদা। উহাদের অকৃত্রিম ভালবাসার জোরেই আমি উহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছি। সেখান হইতে আমাকে কেহ নড়াইতে পারিবে না। একথা আগে কখনও আমার মনে হয় নাই। সেদিনই প্রথম মনে হইল।

"মামীমা উঠেছেন?"

"হাঁ, উঠেছে তুমি এসো না।"

নন্‌তি আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

মামীমার ঘরে গিয়া দেখিলাম মামীমা উঠিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু আমার ভাল লাগিল না। মুখটা কেমন ফোলা ফোলা ফ্যাকাসে। প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনার চেহারাটি তো ভাল লাগছে না মামীমা। জ্বর হয়েছে নাকি—"

"কি হয়েছে জানি না বাবা। শরীর মোটে ভাল নেই। জ্বর হয় মাঝে মাঝে। আর তলপেটে একটা ব্যথা লেগেই আছে।"

"আচ্ছা আমি দেখব পরে।"

মামীমার ঘর হইতে বাহির হইয়া সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চন্দর কোথা? সে কোন্ ঘরে শোয়?"

"ছোটদা পিসেমশায়ের বাড়িতে শোয়। চল না—"

বাবার বাসায় গিয়া দেখিলাম বাবা নাই, মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র ঘরের কোণে বসিয়া

সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছে। আগেই বলিয়াছি বাল্যকাল্য হইতেই চন্দর একটু সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। জানি না, হয়তো বাবার প্রভাব উহার উপর পড়িয়াছিল। বাবাই উহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। আমার উপনয়ন দিয়াছিলেন মামা। গঙ্গার ধারে শিবমন্দিরের চত্বরে ব্যাপরটা নিস্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষ কোন ধুমধাম হয় নাই। দিদিমার আগ্রহে নমো নমো করিয়া মামা নিয়মরক্ষামাত্র করিয়াছিলেন। তাই আমার মনে ওই ধরনের লোক-দেখানো আধ্যাত্মিকতা কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আমাকে মাথা ন্যাড়া করিয়া কান বিঁধাইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল এইটুকু শুধু মনে আছে। মামার ভয়ে এবং মামাকে দেখাইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিতাম। সে কথাও এখন ভুলিয়া গিয়াছি, এখন দিনান্তে একবারও গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করি না। এজন্য বিশেষ অসুবিধাও ভোগ করি নাই। হঠাৎ পদ্মাসনে আসীন নিমীলিত নয়ন আমার অনুজকে দেখিয়া আমি একটু ঘাবড়াইয়া গেলাম। কি করিব ভাবিতেই এমন সময় দেখিলাম বিষুণপ্রসাদ রান্নঘর হইতে খানিকটা গরম দুধ লইয়া প্রবেশ করিল।

"আরে ডাক্তারবাবু যে। তোমার জন্যেও দুধ গরম গরম করব নাকি। এটা চন্দরবাবুর জন্যে।"

"না, আমি দুধ খেয়ে এসেছি দিদিমায়ের কাছে। চন্দর রোজ সকালে পূজা করে নাকি—"

বিষুণপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, রোজ।" তাহার পর উচ্চকণ্ঠে হিন্দীতে বলিয়া উঠিল—"হো চন্দরবাবু, পহলে দুধঠো খা লেও, পিছে পূজা করিও। দুধ ঠাণ্ডা হো রহা হয়। আউর দেখো, কৌন আঁয়ে হেঁ।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চন্দর উঠিয়া পড়িল এবং হাসিমুখে বাহিরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। সহসা যেন সেদিন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম চন্দ্র রূপবান। ধপধপে ফরসা রং দিব্যকান্ত এই কিশোর যে আমার ভাই ইহাতে আমি সেদিন এটু গর্ব অনুভব করিয়ছিলাম।

"কি রকম পড়াশোনা হ'ছে—"

চন্দ্র লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "ভালই—"

বিষুণপ্রসাদ বলিল, "চন্দরবাবু এবার তো ফার্স্ট হয়েছে। সকলে আশা করছে ও এবার স্কলারশিপ পাবে।"

"ও, তাই নাকি!"

সত্যই তখন ভ্রাতৃগর্বে আমার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখনই মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলাম চন্দরকে ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। আমি অর্থাভাবে যে কষ্ট পাইয়াছি চন্দরকে তাহা পাইতে দিব না। চন্দর যতদূর পড়িতে পারে আমি পড়াইব। তাহাকে মানুষ করাই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য হোক।

সুধীর বলি, "দাদা, আমরা একটা টিয়া পুষেছি। কি সুন্দর যে টিয়াটা—দেখবে?"

চন্দর দুধ খাইতেছিল। সে খানিকটা দুধ খাইয়া সুধীরকে বলিল 'আমি এত খেতে পাচ্ছি না, তুই খেয়ে নে।"

হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল বিষুণপ্রসাদ।

"আরে সুধীরকে দুধ আমি দিচ্ছি। তুমি ওটুকু খেয়ে নাও না—"

সুধীর সাগ্রহে বাকি দুধটুকু খাইয়া ফেলিল। চন্দ্র মুচকি হাসিয়া বিষুণপ্রসাদের দিকে চাহিতেই সে বলিল, "গুরুজি আসুন, আমি বলে' দিচ্ছি, তুমি দুধ খাও না। কালও খাও নি।"

বিষুণপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা কখন ফিরবেন?"

"তিনি দুপহরের আগে ফিরবেন না। মন্দিরে পূজা সেরে আফিসে যান আজকাল। অফিসের কাজ শেষ করে' এখানে আসেন। এসে নিজের হাতে রান্না করে' খাবেন। একটু পরে মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ নিয়ে আসবে। হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তুমি আজ দুপুরে এখানেই খেও, গুরুজি বলে' গেছে। উনি মহাপ্রসাদ নিজেই রাঁধেন রোজ, খেয়ে দেখো কি ফার্স্ট ক্লাস রান্না। পেঁয়াজ দেন না। খালি রসুন, গোলমরিচ, লঙ্কা জিরা, আদা। কোন কোন দিন রসুন না দিয়ে হিং দেন, চমৎকার খেতে হয়। চন্দরবাবু মাংস খেতে পারে না। বদনসিব—"

ইহার পর বিষুণপ্রসাদ যাহা করিল তাহাতে একটু বিস্মিত হইয়া গেলাম। বিষুণপ্রসাদ পকেট হইতে তামাকপাতা বাহির করিয়া কুচি কুচি করিয়া বাঁ হাতের তালুতে রাখিল এবং তাহার পর একটি ছোট কৌটা হইতে চুন বাহির করিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া চুনের সহিত তামাকপাতাগুলিকে দলিতে লাগিল।

"এসব কি হ'চ্ছে?"

"খইনি ধরেছি। ওতে দাঁত ভাল থাকে। দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ত, গুরুজি বললেই খইনি ধর। খৈনি খাবার পর থেকে আর রক্ত পড়ে না।"

তামাক পাতার সহিত চুন যখন বেশ মিশিয়া গেল তখন বিষুণপ্রসাদ ডান হাত দিয়া তাহার উপর একটি চাপড়া মারিয়া সেটি নীচের ঠোঁটে পুরিয়া ফেলিল।

"দাদা, টিয়াটা দেখবে না?"—সুধীর আবার তাগাদা করিল।

"চল—"

সকলে আমরা বাড়ি চলিয়া গেলাম।

প্রথমে মাস তিনেক হৈ হৈ করিয়া কাটিয়া গেল। আমি উহার পর কি করিব, কোথায় বসিব, কোথায় বসা উচিত সে সব কিছুই ঠিক হইল না। অমি আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের দলে গিয়া ভিড়িলাম। সাহবেগঞ্জে তখন পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মন্মথই মাতব্বর হইয়া উঠিয়াছিল। সে খোলাখুলিভাবে থিয়েটারের পাণ্ডাগিরি করিতেছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই নবযুবকদের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল একটা। আমরা যখন পাঠশলায় পড়িতাম তখনই তাহার কাপ্তেনী করার একটা সহজ প্রবণতা ছিল। দেখিলাম তাহাই এখন ফুলেফলে বিকশিত হইয়াছে। রেলের ছোকরা কমর্লচারীরা তাহাকে দেবতার মতো মান্য করে। তাহার কথায় ওঠে বসে। রেলের এই কর্মচারীদের লইয়াই নবনাট্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। মন্মথর বাবা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। আমি গিয়াই মন্মথদের বাড়িতে গেলাম মন্মথর মাকে প্রণাম করিবার জন্য। কি অকৃত্রিম স্নেহভরে তিনি যে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন তাহা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। মনে হইল আমিই যেন তাঁহার একমাত্র পুত্র, বহুদিন বিদেশবাস করিবার পর বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছি! আমাকে লইয়া যে কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন, কি খাইতে দিবেন তাহা যেন তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। গরম শিঙাড়া খাইতে ভালবাসিতাম, দেখিলাম সেকথাটা তিনি ভোলেন নাই, চাকরকে ছুটাইয়া দিলেন ভগবতীর দোকান হইতে শিঙাড়া আনিবার জন্য। তখন ভগবতীই সাহেবগঞ্জে শ্রেষ্ঠ শিঙাড়া-শিল্পী ছিল। শিঙাড়ার পুরে

বাদাম দিত। তাহার মোটা কালো চেহারাটা এখনও মনে আছে। খুব উদার লোক ছিল সে। কোনও ছোট ছেলে তাহার দোকানের সামনে গিয়া দাঁড়াইলে সে তার হাতে ডাকিয়া খাবার দিত, কখনও পয়সা চাহিত না। ছেলেটি যখন খাইত তখন সে তার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিত কেবল। কোন ছেলে তাহাকে পয়সা দিতে গেলে তাহাও সে ফিরাইয়া দিত না, তাহা লইয়া আরও কিছু খাবর দিত তাহাকে।

বরদাবাবু—মন্মথর বাবা—আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার হ'য়ে তো বেরুলে, এবার কি করবে? চাকরি?"

"না, চাকরি করব না।"

"তবে? প্রাইভেট প্র্যাকটিস?"

"হ্যাঁ, তাই করতে হবে।"

"কোথায় বসবে ঠিক করেছ? এই খানেই ব'স না, তোমার মামার সাহায্য পাবে।"

"মামা যা বলবেন তাই করব। দিদিমাব ইচ্ছে নয় যে আমি এখানে বসি।"

"ও তাই নাকি! তোমার বাবার কি মত?"

"বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কোনও কথা হয় নি।"

সত্যই বাবা এ বিষয়ে আশ্চর্যরকম উদাসীন হইয়া রহিলেন। মনে হইতে লাগিল আমাকে ডাক্তারি পাস করাইয়া তিনি যেন তাঁহার কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহার পর যেন তাঁহার করণীয় আর কিছ নাই। চন্দর তাঁহার বাসায় থাকিত বটে, কিন্তু তাহার প্রতিও তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। তাঁহাব পোষা হরিণটাই তাঁহার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাকে তিনি স্বহস্তে খাওয়াইতেন। খুব ভোরে উঠিয়া তাহার জন্য কচি ঘাস স্বহস্তে তুলিতেন। যখন আশেপাশে ঘাস পাওয়া যাইত না তখন বিষুণপ্রসাদ কোন ঘাসওয়ালীকে বলিয়া ঘাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিত। সে ঘাসগুলি বাবা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া তবে খাইতে দিতেন তাহাকে। মন্দির হইতে ফিরিবার সময় মাঝে মাঝে তাহার জন্য কুলপাতা আনিতেন। মন্দিরের চাকর চিতুয়া সেটি সংগ্রহ করিয়া দিত। বাবা দিকে নখনও ঘুমাইতেন না। আহারাদির পর সেতার লইয়া উঠানে বসিতনে। হরিণটাকেও খুলিয়া দিতেন। হরিণটা তাঁহার আশেপাশেই ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও বাহিরে যাইত না। কপাট খোলা থাকিলেও বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত না সে। বাবাই তাহার জগৎ ছিল। বাবার কাছাকাছিই সে ঘুরিত এবং মাঝে মাঝে তাহার বিশাল চোখ দুটি তুলিয়া বাবার দিকে চাহিয়া থাকিত। বাবা যখন সেতার বাজাইতেন তখন সমঝদার শ্রোতার মতো সে বাবার সামনে আসিয়া বসিত এবং কান নাড়িয়া নাড়িয়া সেতার-বাজনা উপভোগ করিত। তাহার বড় বড় কালো চোখ দুইটি ভাষাময় হইয়া উঠিত, ওই দুইটিই ছিল তাহার মনের দর্পণ। আমিও ঘাস খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া তাহার সহিত ভাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী বশ করিয়াছিল মামার ছোট মেয়ে নন্তি। তাহার সাড়া পাইলেই হরিণের কান দুইটা খাড়া হইয়া উঠিত এবং তাহাকে দেখিতে পাইলেই সে দাঁড়াইয়া উঠিত। নন্তি প্রায়ই রান্নাঘর হইতে শাক-পাতা আনিয়া তাহাকে খাওয়াইত। মাঝে মাঝে তাহার গলা জড়াইয়া আদরও করিত খুব। হরিণের শিং গজাইতেছিল, তাহার গলা জড়াইয়া আদর করা একটু বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু নন্তি তাহা গ্রাহ্য করিত না।

সন্ধ্যার সময় আমাদের আড্ডা বসিত জগন্নাথবাবুর বাড়িতে। ডি. টি. এস. আফিসে অশ্বিনীর বাবার জায়গায় তিনি আসিয়ছিলেন। অকৃতদার পুরুষ ছিলেন তিনি। সংসারে অন্য কোন ঝামেলা ছিল না। থিয়েটারই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল। থিয়েটার লইয়াই থাকিতেন। যাহারা থিয়েটার করিতে পারিত তাহারাই তাঁহার আত্মীয় ছিল। তাঁহার বাড়িতে ফটোর অনেক অ্যালবাম ছিল। তাহাতে যাহাদের ফোটো তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই তাঁহার আত্মীয় নন, সকলেই থিয়েটার শিল্পী। অথচ আর একটা মজার ব্যাপার এই যে নিজে তিনি কোনও দিন থিয়েটার করেন নাই কারণ কোন ভূমিকায় অবতরণ করিয়া হাততালি কুড়াইবার লোভ তাঁহার ছিল না। তিনি নেপথ্যে থাকিয়া মুরুব্বিগিরি করিতে ভাল বাসিতেন। কে কোন পার্টের উপযুক্ত, অনিচ্ছুক কোন ছোকরাকে কি ভাবে প্রভাবিত করিলে সে থিয়াটারে নামিয়া ফিমেল পার্ট লইবে, কোন দোকানে ভাল সাজপোশাক পাওয়া যায় সস্তায়, কি করিয়া সিন্ উইংস প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্ভব, এইসব সমস্যাই তাঁহাকে বেশী আকর্ষণ করিত। এবং এইসব সমস্যা সমাধান করিয়া তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহার বাড়িটাই থিয়েটারের আখড়া হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সেইখানেই রিহার্সল হইত। সে বাড়িতে অনেক গৃহহীন বেকার থিয়েটার-শিল্পীকে তিনি আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলেই তাহাদের চাকরীতে ঢুকাইয়া দিতেন। মন্মথ জগন্নাথবাবুর হৃদয় হরণ করিয়ছিল। সে ভাল গান গাহিতে পারিত, ভাল অভিনয় করিতে পারিত। এসব ছাড়াও অভিনয় শিখাইব্যার ক্ষমতাও সে অর্জন করিয়াছিল। দেখিতে সুন্দর তো ছিলই। এক ব্যক্তির মধ্যে একগুলি গুণের সমাবেশ দেখিয়া জগন্নাথবাবু মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার চেষ্টায় ও বিশেষ সুপারিশে মন্মথর একটি ভালো চাকরি জুটিয়া গিয়াছিল। চাকরিটির বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাতে ফাঁকি দিবার প্রচুর অবসর ছিল। মন্মথ থিয়েটারের ব্যাপার লইয়াই মাতিয়া থাকিত, কাজ কিছুই করিত না। জগন্নাথবাবু তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কাগজে-কলমে জগন্নাথবাবুই মন্মথর মনিব ছিলেন বলিয়া কোন অসুবিধাই হইত না, মন্মথ বুঝিয়াছিল থিয়েটার করাই তাহার চাকরি। আমিও কয়েকদিন পরে মন্মথর সহিত জগন্নাথবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইলাম। গিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল যে ঘরটায় রিহার্সাল হয় সেখানে রাসবিহারীবাবুর একটা বড় ফটো টাঙানো রহিয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছেন। সাহেবগঞ্জের থিয়েটারের তিনিই স্থাপয়িতা এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছে দেখিয়া খুব ভালো লাগিল। যাইবামাত্র জগন্নাথবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই ভালো লাগিয়া গেল। হৃষ্টপুষ্ট, হাস্যমুখ, গোঁফদাড়িকামানো, মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড বর্মা-চুরুট, অত শীতেও সাধারণ ফতুয়া গায়ে ভদ্রলোককে দেখিয়াই অনুভব করিলাম যেন কোনও সহৃদয় আত্মীয় সন্নিধানে আসিয়াছি। তাঁহার চোখ মুখ দিয়া একটা অন্তরিক প্রসন্নতা বিচ্ছুরিত হইতেছিল, আমার পরিচয় পাইয়াই তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মন্মথ হাসিয়া বলিল—"আমাদের একটা ভাবনা ঘুচে গেল। রাম পাওয়া গেছে।"

"কোথা?"

"এই যে আপনার সমানেই। নাদুসনুদুস চেহারা, লম্বাও আছে, খাসা মানাবে।"

জগন্নাথবাবু একটু পিছাইয়া গিয়া আমাকে আপাদমস্তক পিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"তা মানাবে। বেশ মানাবে।"

উহারা তখন 'সীতার বনাবাস' বইখানা নামাইবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু মনোমত 'রাম' পাওয়া যাইতেছিল না। আমি সেইদিনই রামের ভূমিকায় সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হইয়া গেলাম এবং সেইদিনই আমার একটা নূতন জীবন আরম্ভ হইল যেন। মনে কিন্তু একট ভয় ছিল। প্রকাশ্য থিয়েটারে নামিলে মামা কিংবা বাবা যদি রাগ করেন। জগন্নাথবাবুকে সেকথা বলিতেই তিনি বলিলেন—"সে ভার আমার। তোমার মামা বাবা দুজনকেই আমি রাজী করাব, সে ভার আমার। তাঁরা আপত্তি করবেন না।"

তাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন কি না জানি না, আপত্তি করিয়া থাকলেও জগন্নাথবাবু কিভাবে তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন তাহাও আমার অজ্ঞাত কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আমি নিয়মিতভাবে রিহার্সালে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি বরাবরই একটুকুনো লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। থিয়েটারের দলে জুটিয়া আমার স্বভাবের এই আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গেল। দিনকতক পরেই প্রথম শ্রেণীর আড্ডাধারী হইয়া উঠিলাম আমি।

আড্ডাটা অবশ্য সন্ধ্যার পর জমিত। দিনের বেলা আমি মামার ডিসপেন্সারিতেই বসিতাম এবং মামারই নির্দেশ অনুসারে মামার রোগীদের দেখিতাম। পাকাপাকিভাবে আমি যে কোথায় বসিব তাহা মামাও প্রথমে ঠিক করিতে পারেন নাই। মামার বয়স হইতেছিল, তিনি সব রোগী দেখিয়া উঠিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক রোগী হাতছাড়া হইয়া যাইতেছিল। আমি আসাতে মামার সুবিধাই হইল। রোগী দেখিয়া আমি যে ফি পাইতাম তাহা মামাকেই দিয়া দিতাম। মামার ডিসপেন্সারির আয়ও কিছু বাড়িল। মামা এইসব দেখিয়া হঠাৎ একদিন আমাকে বলিলেন, "তুই এখানেই বসে যা। ঘরের খেয়ে এখানেই প্র্যাকটিস কর। কোথায় আর যাবি। আজকাল ক্যাপিটেল না হ'লে কোথাও বসা যায় না। আমিও একা আর এখানে রোগীর ভিড় সামলাতে পাচ্ছি না।" আমাব তখন যাইবার ইচ্ছাও তেমন ছিল না, মামার কথাগুলি বেশ ভাল লাগিল। দিদিমাকে গিয়া বলিলাম। আশা করিয়াছিলাম দিদিমা শুনিয়া খুশী হইবেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "না, তোমার এখানে বসা চলবে না। এখানে বসলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হ'য়ে যাবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আলাদা সংসার গড়তে হবে তোমাকে। ভাইকে মানুষ করতে হবে। মামার তলপি বয়ে বেড়ালে তা কোনও দিন হবে না। মামার সঙ্গে সদ্ভাবও নষ্ট হ'য়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এখানে তোমার বসা চলবে না। অন্যও কোথাও স্বাধীনভাবে যদি বসতে না পার, তাহলে চাকরি নাও।" সুরথবাবু তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত একদিন গিয়া দেখা করিলাম। আমাকে প্রথমে তিনি চিনিতে পারেন নাই। মামার পরিচয় দেওয়াতে চিনিতে পারিলেন।

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ শক্তিবাবুর বড় ভাগনে ডাক্তারি পড়ছিল শুনেছিলাম।"

চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন। সম্ভবত নিজের পুত্রদের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার তিন ছেলের মধ্যে একজনও মানুষ হয নাই। একজনও তাঁহার কাছে ছিল না। বড়টি জাহাজের খালাসী হইয়া জাঞ্জিবরে চলিয়া গিয়েছিল। সেখানেই নাকি বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। একটা চিঠি দিয়াও খবর লয় না। মেজো ছেলেটি বেশীদূর লেখাপড়া করে নাই। বরদাবাবুর অনুগ্রহে তাহার রেলের একটি চাকরি হইয়াছিল। সুরথবাবুর সামাজিক সম্ভ্রমকে পদদলিত করিয়া সে একটি নীচবংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। বউকে লইয়া কর্মস্থলে থাকে। তাহার সহিতও সুরথবাবুর কোনও সম্পর্ক

নাই। তৃতীয় ছেলেটি গাঁজাখোর। বিরজাপণ্ডিত তাহার মস্তকটি চর্বণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সে কখন কোথায় থাকে ঠিক নাই। সুরথবাবু বিপত্নীকও হইয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। বাড়িতে আছেন একটি বিধবা বোন। সেই এখন তাঁহার দেখাশোনা করে। সুতরাং আমি পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়াছি এ খবর সুরথবাবুর কর্ণে মধুবর্ষণ করিল না। যাহাদের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ তাহারা প্রায়ই অপরের সুখের সংবাদে অনন্দিত হয় না। অনেক সময় সে সংবাদটাকে বাকাইয়া তাহার কুৎসিত দিকটা দেখাইবার চেষ্টা করে। মনে হয় যাহা বলিতেছে তাহা বিরাট দূরদর্শিতার ফল কিন্তু আসলে তাহা পরশ্রীকাতরতা ছাড়া আর কিছ নয়।

সুরথবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রতিবছরই তো দলে দলে ডাক্তার পাস করে বেরুচ্ছে। মাছির মতো ভন ভন করছে চতুর্দিকে। আজকাল পাসকরা ডাক্তারদের চেয়ে কোয়াক্ ডাক্তারের প্রতিপত্তিই তো বেশী। অনর্থক অতগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি! তোমার মামাকেই দেখ না, উনিও পাস করেন নি, লেখাপড়াও তেমন জানেন না, অথচ ওঁর প্র্যাকটিসের বহরটা দেখ।"

কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

"এখন কি করবে ঠিক করেছ?"

"ঠিক করি নি কিছু।"

"চাকরি পেলে চাকরি নাও। আমরা বাঙালী জাত, গোলামি ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।"

অনুভব করিলাম সুরথবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়া ভুল করিয়াছি। তিনি এখানকার একজন প্রবীণ চিকিৎসক বলিয়াই মনে হইয়াছিল তাঁহার সহিত দেখা না করিলে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে, বিশেষত তিনি যখন আমাদের পরিবারের সহিত এককালে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম ঘনিষ্ঠতার মাধুর্য অবলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মন এখন পরশ্রীকাতরতার গরলে পরিপূর্ণ।

"আচ্ছা, এবার উঠি।"

আসিবার সময়ও সুরথবাবু আর একবার দংশন করিতে ছাড়িলেন না।

"শুনলাম এখানে এসেই মন্মথর দলে ভিড়ে গেছ।"

সুরথবাবু যে এ সংবাদটাও জানেন তাহা প্রত্যাশা করি নাই।

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ সন্ধ্যের সময় ওখানেই যাই।"

"আমার ছোটছেলে জগুও ওখানে যেত। ছোটখাটো পার্টিও দিত তাকে ওরা। তার কি হয়েছে জানো?"

আমি জানিতাম, কিন্তু কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

সুরথবাবু নিজেই সেটা ব্যক্ত করিলেন, "সে এখন গাঁজাখোর চোর হয়েছে।"

আমি তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। সুরথবাবুর কথা একটু বিশদ বলিলাম কারণ সুরথবাবুর মতো লোক আমাদের সমাজে অনেক আছেন। ইঁহাদের কাছে আসিলে সমস্ত মন অপ্রসন্ন হইয়া ওঠে, কারণ ইঁহাদের অন্তর বিষে পরিপূর্ণ। ইঁহাদের কথা-বার্তা, আচরণ সমস্তই বিষাক্ত। ইঁহাদের সান্নিধ্য পীড়াদায়ক, ইঁহাদের দেখিলে রাগ হয়। কিন্তু ইঁহাদের উপর রাগ হওয়া উচিত নয়, কারণ ইঁহারা প্রায়ই বড় দুঃখী, কিন্তু সে কথা অনেক

পরে বুঝিয়াছি। তোবড়ানো, ফাটা বা ছ্যাঁদা বাসনের উপর রাগ করা হাস্যকর। তোবড়ানো, ফাটা বা ছ্যাঁদা বাসন মেরামত করিয়া ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তোবড়ানো, ফাটা বা ছ্যাঁদা মানুষের মেরামত হয় না। সেইজন্য তাহা আরও বেশী করুণ।

আমি কোথায় প্র্যাকটিস কবিতে বসিব এই প্রশ্নটা সবাই যখন এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মামা এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না, দিদিমাও একদিন বলিলেন, "যতদিন পারিস আমার কাছে থাক, তারপর তো দূরে চলে যেতে হবেই। তোর মামার কাছে হাতে-কলমে কাজকর্ম না হয় শিখে নে কিছুদিন। শক্তি ডাক্তারি করেই তো এত বড় সংসারটাকে খাড়া রেখেছে। ওর কাছে থাকলে অনেক কিছু শিখতে পারবি। তোর বাবাকে জিগ্যেস করেছিস এ বিষয়ে?'

"বাবার সঙ্গে কথা কইবার অবসরই তো পাই না। সমস্ত দিন তো ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যের সময় 'কারণ' পান করেন আর সেতার বাজান। ওঁর কাছে এসব কথা পাড়তেও ভয় করে"

"চন্দর বলছিল তুই রোজ বিকেলে ওখানে মাংস খেতে যাস"

"হ্যাঁ যাই। বাবা আমার জন্যে রোজ খানিকটা মাংস তুলে রেখে দেন। বিকেলে গিয়ে সেটা খেয়ে আসি"

"শুধু মাংস খাস? না, তার সঙ্গে ভাতও?"

"বিষুণপ্রসাদ পরোটা করে দেয়"

"খুব মজায় আছিস তাহলে"—খবরটা শুনিয়া দিদিমা বেশ খুশী হইলেন। "যখন মাংস খেতে যাস তখন তোর বাবা কোথায় থাকে"

"বাবা তখন গঙ্গার চরে হাঁটতে বেরিয়ে যান। হরিণের জন্যে ঘাস নিয়ে আসেন রোজ"

"তুই তোর বাবাকে একদিন জিগ্যেস কর। ওর মতটাও তো জানা দরকার"

"বাবার সঙ্গে কথা কইতে আমার বড় ভয করে"

"বাপের সঙ্গে কথা কইবি তাতে আবার ভয় কি"

চুপ করিয়া রহিলাম।

"আজ সন্ধ্যেব পর কোথাও বেরুস নি। বাবাকে গিয়ে জিগ্যেস কর এখন আমি কি করব—"

চুপ করিয়া রহিলাম।

'কি রে কথার জবাব দিচ্ছিস না যে"

"আচ্ছা বলব একদিন"

বাবার ঘরে মা কালীর একটি ছবি টাঙানো থাকিত। বাবা সেই ছবির সামনে রোজ সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতেন এবং 'কারণ' পান করিতেন। সে সময় বাবার নিকট কেহ যাইতে সাহস করিত না। এমন কি বিষুণপ্রসাদও নয়। ছবির নীচেই একটি প্রদীপ জ্বলিত এবং প্রদীপের পাশেই কয়েকটি ধূপকাঠি। স্বল্পালোকিত ধূপধূমাচ্ছন্ন সেইঘরে পরিবেশ রহস্যাবৃত মনে হইত। মনে হইত সমস্ত পরিবেশটাই যেন গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছে। বাবা এবং মা কালীর সেই ছবি উভয়ই যেন সে গানের শ্রোতা। কম্পিতশিখা প্রদীপটাও মনে হইত সে গানের সুরে অচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই রহস্যময় পরিবেশকে বিঘ্নিত করিবার সাহস আমার ছিল না। আমি যেদিন বাবার সহিত কথা বলিবার জন্য গেলাম সেদিন ঘরের ভিতর

ঢুকিতে পারিলাম না। ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। চন্দরও সন্ধ্যার সময় এখানে পড়িত না। সে সুধীর ও সুশীলের সহিত গিরীন মাস্টারেরর বাড়িতে পড়িতে যাইত। বিষুণপ্রসাদও এইসময় থাকিত না। থানার সিপাহীদের একটি আড্ডা ছিল, সেই আড্ডায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঢোলক ও খঞ্জনী বাজাইয়া 'রামা হো' 'রামা হো' গান হইত। বিষুণ এই আড্ডার একজন সম্মানিত সভ্য ছিল। সেখানে গানের পর সেতার বাজাইয়া সে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিত। বাবার নিকট যাহা শিখিত তাহা এইখানে আস্ফালন করিত সে। আমি জানিতাম বাবার এই অদ্ভুত পূজা শেষ হইবার পর বাবাও বাগচি মহাশয়ের বাসায় চলিয়া যাইবেন। সেখানে তিনি বাবার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বাবা গেলে নিজের সেতারের তারগুলি আলগা করিয়া দিয়া আবার সেগুলি বাঁধিতেন। তিনি যতক্ষণ সুর মিলাইয়া মিলাইয়া তারগুলি বাঁধিতেন বাবা ততক্ষণ নীরবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন। মনে হইত তিনি যেন ধ্যান করিতেছেন। সুর মিলিয়া গেলেই বাবার চোখ খুলিয়া যাইত এবং চোখের দৃষ্টি হইতে মৃদু হাসি বিকীর্ণ হইত। বাগচি মশাই সুর মিলাইতে মিলাইতে বাবার নিমীলিত নয়নের দিকে মাঝে মাঝে সাগ্রহে চাহিয়া দেখিতেন চোখ খুলিল কি না। তিনি জানিতেন সুরটি মিলিয়া গেলেই বাবার চোখ খুলিবে। দুই বৃদ্ধ মিলিয়া প্রত্যহ এই সুরের খেলা খেলিতেন। সুর মিলিয়া গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাগচি মশাই সেতারটি বাবার দিকে ঠেলিয়া দিতেন। বাবা তখন আলাপ করিতেন তাহাতে। রিটায়ার্ড টিকিট কালেকটার গুপীবাবু তবলায় সঙ্গৎ করিতেন। গুপীবাবু লোকটি কুদর্শন ছিলেন। কালো রং, সমস্ত মুখে জরার চিহ্ন। মনে হইত মানুষের মুখ নয়, যেন বেগুনপোড়া। আজানুলম্বিত কোট গায়ে দিতেন। সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ময়লা ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়ে কাঁধে একটা ভাঙা ছাতা লইয়া যখন তিনি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন তখন কেহ বুঝিতে পারিত না যে উনি অতি বড় গুণী লোক। বাবা গুপীবাবুকে খুব খাতির করিতেন।

আমি ঠিক করিয়াছিলাম বাবা যখন বাগচি মহাশয়ের বাড়িতে যাইবার জন্য বাহির হইবেন তখনই তাঁহাকে ধরিব।....একটু পরেই বাবা বাহির হইলেন। আমি বারান্দার চৌকিতে চপ করিয়া বসিয়া ছিলাম।

"কে—"

"আমি সূয্যি।"

"এখানে বসে আছ কেন। থিয়েটারের রিহার্সালে যাও নি আজ?"

কথাটা শুনিয়া আমি একটু ঘাবড়াইয়া গেলাম! আমি থিয়েটারের রিহার্সাল দিতেছি এ খবর যে বাবা জানেন এবং তাহা বাবার মুখ হইতে শুনিব তাহা কল্পনা করি নাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"কি কথা?"

"আমি এখন কি করব, কোথায় প্র্যাকটিস করতে বসব, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি। তাই—"

"সে দু'দিন পরে আপনিই ঠিক হ'য়ে যাবে। এখন দু'দিন আমোদ-প্রমোদ করছ কর।"

বাবা চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি তাঁহার পিছু পিছু যাইতে যাইতে আবার মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "অনেকে বলছেন চাকরি নিতে—"

"চাকরি নিলে নিজের ভাগ্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। তা করবার দরকার কি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাই ভালো।"

আমি কোন মন্তব্য না করিয়া তাঁহার পিছু পিছুই চলিতে লাগিলাম। বাবার বাড়ির সামনে যে সরু গলিটা ছিল বাবা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও করিলাম। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল। পূর্ণিমার চাঁদ নয়, শুক্লা সপ্তমীর বা অষ্টমীর চাঁদ। এক ফালি জোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছিল সেই অন্ধকার গলিটাতে। মনে হইতেছিল এক অবাস্তব রূপকথা লোকের অজানা পথ বাহিয়া আমরা দুইজনে চলিয়াছি। মুখে কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলাম না। নীরবেই চলিতেছিলাম। কিছুদুর গিয়া বাবা হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং যে প্রশ্ন করিলেন তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

"শুনলাম তুমি রামের ভূমিকায় অভিনয় করবে। রামের চরিত্র সম্বন্ধে পুরো ধারণা আছে তোমাব?"

"কিছু কিছু আছে।"

"কিছু কিছু থাকলে ভালো অভিনয় করতে পারবে না। রাম যে ভগবানের অবতার, তিনি যে সমাজে একটা মহৎ আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে মর্তে অবতরণ হয়েছিলেন এটা ভালো করে' উপলব্ধি করতে হবে, তবে অভিনয় ভালো হবে"।

আবার তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। আর কোন কথা বলিলেন না। আমিও আর কোন কথা বলিতে সাহস কবিলাম না। আমি সোজা জগন্নাথবাবুর বাড়িতে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম রিহার্সাল বেশ জমিয়া উঠিযাছে। জগন্নাথবাবু একটা মোটা বর্মা চুরুট ধরাইয়া এককোণে মোড়ার উপর বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"কি ডাক্তার এত দেরি যে। কোনও কলে বেরিয়েছিলে না কি?"

"না। অন্য একটা দরকারে আটকে পড়েছিলুম।"

বাবার সহিত যে কথা হইয়াছিল তাহা আমি কাহাকেও বলি নাই।

সেইদিনই জগন্নাথবাবুও আমাকে প্রশ্ন করিলেন "ডাক্তার তুমি রেলের চাকরি করবে? তাহাতে তোমাকে চেষ্টাচরিত্র ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারি। মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের দু' একজন ওপরওলার সঙ্গে আমার খাতির আছে।"

বলিলাম, "না আমি চাকরি করব না ঠিক করেছি।"

জগন্নাথবাবু মুখ হইতে চুরুটটি নামাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন।

"বাঙালীর ছেলে, চাকরি করবে না! কি করম কথা হ'ল এটা! চাকরিই আমাদের লক্ষ্মী। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাবে।"

ইহার পর আর একটি ঘটনা ঘটাতে আমার প্র্যাকটিস-প্রসঙ্গ কিছুদিনের মতো চাপা পড়িয়া গেল। মামার দুই মেয়ে সুশীলা এবং কুসুমের বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। মামা পাত্র দুইটি নাকি পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুইজনেই সদ্বংশজাত কুলীন পাত্র, দুইজনেরই গ্রামে বাড়ি আছ, পুকুর আছে, গাই আছে। সেকালে ইহার বেশী আর কিছু কাম্য ছিল না। পাত্রেরা গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিল, তাহাদের চেহারাও নিন্দনীয় ছিল না। মামার

সৌভাগ্যে সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগিলেন। সুশীলার বয়স তখন দশ বৎসরের বেশী নয়। কুসুমের বোধ হয় আট। সাধারণতঃ ওই বয়সেই তখন ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েদের বিবাহ হইত। মেয়ের বয়স এগারো বৎসর হইয়া গেলেই সমাজপতিদের টনক নড়িত, মেয়ের মা-বাপেরা দুশ্চিন্তায় ঘুমাইতে পারিতেন না। মামা একসঙ্গে দুইটি মেয়েকে পার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মামার হিতৈষীদের আনন্দের সীমা রহিল না, মামার শত্রুদের মনে ঈর্ষা জাগিল। এখন ব্যাপারটা অশোভন মনে হইতেছে, কিন্তু তখন ইহা মোটেই অশোভন ছিল না, খুব স্বাভাবিক ছিল। গৌরীদান করিতে পারিলে তখন সজ্জনরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিতেন।

এই বিবাহে শঙ্করা হইতে মামার অনেক জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা আসিয়ছিলেন। মামীমার বাপের বাড়ি হইতেও আসিয়াছিলেন কয়েকজন। মামীমার নিজের পিসীকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। অমন লম্বা স্ত্রীলোক আমি তো আর কখনও দেখি নাই শুধু লম্বা নয়, বেশ শক্ত সমর্থ। প্রত্যহ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গা আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় দুই মাইল দূর ছিল তখন। একবেলা আহার করিতেন, স্বপাক হবিষ্যান্ন। কিন্তু একবেলাতেই তিনি যে পরিমাণ খাইতে পারিতেন তাহা আমরা তিনবেলাতেও পারিব কি না সন্দেহ। সে সময় তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়ছিলাম। নকুলই গল্পটি বলিয়াছিল। হ্যাঁ নকুলের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নকুলকে দেখিতে পাই না। তাহার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া মামা তাহাকে নাকি দূর করিয়া দিয়াছিলেন। সে পড়াশোনা তো করিতই না, কেবল বদমাইশি করিয়া বেড়াইত। একদিন সে মামার এক রোগীর ঘোড়ায় চড়িয়া উধাও হইয়া গিয়ছিল। একবেলা বাড়ি ফেরে নাই। সেইদিনই মামা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের ভিড়ে সকলের সঙ্গে আবার মামার সংসারে আসিয়া জুটিয়া গেল এবং এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন কিছুই হয় নাই। আমাকে বলিল, "আমি ভাই চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। লেখাপড়া আর ভালো লাগে না। গিরীন মাস্টারের বেত কাঁহাতক আর খাওয়া যায়।"

এই নকুলের মুখেই পিসীমার গল্পটি শুনিয়াছিলাম। নকুল আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—'পিসীমাকে ঘাঁটাতে যাস নি। ওঁর গায়ে ভয়ানক জোর। যদি একটি চড় মারেন তাহলে আর উঠে পথ্যি করতে হবে না। উনি যখন বিধবা হন তখন সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সবাই যখন জোর করে ওঁকে স্বামীর চিতায় চড়াতে যায় তখন এক ঝটকায় উনি হাত ছিনিয়ে নিয়ে চিতা থেকে একটা জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ তুলে ছিরু ভট্টচাজের মুখে মেরেছিলেন। সেই থেকে তার নামই হয়ে গেল মুখপোড়া ভট্টচাজ। তারপর সেই জ্বলন্ত কাঠ ঘোরাতে ঘোরাতে উনি একটা জঙ্গলে পালিয়ে যান। সেখানে তিন চার দিন কাটিয়ে তারপর বাড়ি ফেরেন। আমি তো ওঁর ত্রিসীমানায় কখনও যাই না।'

বিবাহ উপলক্ষে আরও দুইজন আসিয়াছিলেন, পটল-কর্তা ও পটল গিন্নী । আমি খুব ছেলেবলোয় ইঁহাদের শঙ্করাতে দেখিয়াছিলাম। তখন কেবল পটল-কর্তার পায়েই গোদ ছিল, এখন দেখিলাম পটল-গিন্নীর ডান পাটাও বেশ ফোলা। ইঁহারা সসম্পর্কে মামার কাকা-কাকী ছিলেন, সম্পর্কটা অবশ্য দূর, কিন্তু মামা ইঁহাদের খুব খাতির করিতেন। মামা যদিও কখনও স্টেজে নামেন নাই কিন্তু এখন মনে হয় তিনি বেশ অভিনয়-পটু ছিলেন। তিনি এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন পটল-কর্তা পটল-গিন্নীই তাঁহার অভিভাবক এবং তাঁহাদের

হুকুমমতোই তিনি চলিতেছিলেন। অনেক লোক বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বরযাত্রীদের খাওয়া হইবার পর দেখা গেল দই, সন্দেশ এবং মাছ ফুরাইয়া গিয়াছে। মামা বলিলেন, তোমরা ইহা লইয়া আর গোল করিও না। কাকা নিজেই সব ফর্দ করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ লোক, জগদ্ধাত্রী-পূজার সময় প্রতি বছরই অনেক লোক খাওয়ান, তিনি নিজেই যখন সব ভার লইলেন তখন আমি আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। যাই হোক ব্যাপারটা এখন চাপিয়া যাও, কাকা-কাকীর কানে যেন না যায়। কাকা রগ-চটা লোক, শুনিলে কি যে করিবেন তাহা বলা যায় না। হয়তো পরের ট্রেনেই চলিয়া যাইবেন। কাকী হয়তো উপবাস শুরু করিয়া দিবেন। পটল-কর্তা পটল-গিন্নী নিমন্ত্রিত অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ ভোজের ব্যাপারে ফর্দ করিতে গেলেন কেন এবং মামাই বা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলেন কেন তাহা ঠিক স্পষ্ট হইল না। তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া কিন্তু একবারও মনে হয় নাই যে তাঁহারা ভোজের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতেছেন। মামা কিন্তু সকলকে সাবধান করিয়া বেড়াইতে লাগলেন, কাকা-কাকী যেন ব্যাপারটা জানিতে না পারেন।

পটল-কর্তা যে খুব বদরাগী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার দুই একটা গল্প আগে বলিয়াছি। যদিও তিনি বেঁটে এবং ঈষৎ মোটা ছিলেন, পায়ে গোদ থাকাতে দেহটাও ভারী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাগিয়া গেলে তিনি দ্রুতবেগে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা কিছু করিয়া ফেলিতেন যাহা তাঁহার দেহেব এবং বয়সের সহিত খাপ খাইত না। এসময় তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন একটা ক্রুদ্ধ বোলতা। রাগিয়া গেলে তাঁহার গলার ভিতর হইতে একটা গুন্ গুন্ গুন্ শব্দও হইত। বিবাহ বাড়িতে আসিয়াও তিনি একদিন এইরূপ একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

রেলের এক বাবু মামার রোগী ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার লোক। বিবাহ উপলক্ষে তিনি দেশ হইতে প্রায় এক বোরা মুড়ি আনাইয়া মাকে উপহার দিয়াছিলেন। ধপধপে শাদা বড় বড় মুড়ি। মুড়ি দেখিয়া দুইজন বৃদ্ধ যুগপৎ প্রলুব্ধ হইলেন, খেতু মামা এবং পটল-কর্তা। খেতু মামা বলিলেন তিনি ঘৃতসহযোগে চিনি মাখিয়া মুড়ি খাইবেন, পটল-কর্তা বলিলেন তাঁহার তেল-নুন-লঙ্কা চাই। কিন্তু কি করিয়া জানি না এই সরল ব্যাপারটাও জটিল হইয়া গেল। ভুলক্রমে পটল-কর্তার কাছে ঘি-চিনি-মাখা মুড়ির বাটি পৌঁছিয়া যাইতেই তিনি রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, গলার ভিতর হইতে গুন্ গুন্ গুন্ শব্দ বাহির হইল। মুড়ির বাটিটাতে তিনি তো একটা লাথি মারিলেনই কিন্তু তাহার পর যাহা করিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। বাড়ির বুড়ী ঝি প্রভা ছাদের একধারে বসিয়া চুল শুকাইতেছিল। তাহার পিঠটা খোলা ছিল, পটল-কর্তা ছুটিয়া গিয়া তাহার পিঠে কামড়াইয়া দিলেন। প্রভা হাউমাউ! করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

পটল-কর্তা আমার জীবনেও কিছুকাল পরে একটা বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব। বিবাহ উপলক্ষে সন্তোষের মা এবং হাবুর মাও আসিয়াছিলেন। সন্তোষের মা আমার মায়ের বান্ধবী ছিলেন। তিনি দেখিলেন বেশ বুড়া হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিযা আমার মনে হইল আমার মা বাঁচিয়া থাকিলেও নিশ্চয় এইরূপ বুড়া হইয়া যাইতেন। মায়ের যে অপরূপ তরুণী মূর্তি আমার মনে আঁকা আছে তাহা আর থাকিত না। মায়েরও হয়তো ওইরূপ চুল উঠিয়া যাইত, মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিত, নানা ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তিনিও

হয়তো সংসারের অবাঞ্ছনীয় আপদরূপে গণ্য হইতেন। সেই দিনই মনে হইল প্রথম মনে হইল, মায়ের অকালমৃত্যু হইয়া ভালই হইয়াছে। যে সংসারে সর্বদাই অভাব, অপমান এবং লাঞ্ছনা পুণ্যবতীরা সে সংসারে বেশী দিন থাকেন না। মা আমার পুণ্যবতী ছিলেন তাই তাঁহার অকালমৃত্যু হইয়াছে।

সন্তোষের মায়ের মাথায় টাক পড়িয়াছিল, চুল পাকিয়াছিল, গালের চামড়াতে চোখের কোলে বলি-রেখা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার দাঁত চিড় নাই। আগে যেমন তিনি সমানে পান চিবাইতেন এখনও দেখিলাম তেমনি চিবাইতেছেন। আরও দেখিলাম তাঁহার দেহটা বুড়া হইয়াছে বটে কিন্তু মনটা আগেকার মতোই সতেজ এবং সবুজ আছে। আগেকার মতোই তিনি রসিকতা করিয়া, হাসিয়া, হাসাইয়া চতুর্দিকে আনন্দ বিকিরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিলাম বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একত্র করিয়া এখনও তিনি প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথার আসর বসাইতেছেন। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হইতেই তিন বলিলেন, "তোব সইমাকে চিনতে পারছিস? চিনতে না পারবারই কথা। চেহারার আর সে জুলুস নেই।" প্রণাম করিতেই বলিলেন, "বড্ড লম্বা হ'য়ে গেছিস। ব'স দেখি, একটা চুমু খাই, সেই সেকালে যেমন খেতাম।" বসিতেই তিনি আমার দুই গালে সত্যই চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "সেই ছেলেবেলায় তোকে যেমন কোলে করে' নিয়ে ঘুম পাড়াতুম এখনও ইচ্ছে করছে সেই রকম করি। কিন্তু এখন তো তা আর হয় না। অনেক বড় হ'য়ে গেছিস যে। গল্প শুনতে ভালবাসিস এখনও? সন্ধের সময় আসিস গল্প বলব।"

"সন্ধ্যের সময় আমি থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে যাই।"

"আমাকে তোদের রিহার্সালে নিয়ে যাবি? দেখতাম তুই কেমন কচ্ছিস। ভুলটুল হ'লে শুধরে দিতে পারতাম। কি সাজবি তুই?"

"রাম।"

"ওরে বাবা তাহলে পারব না। একদিন রিহার্সালে না গেলে কি হয়? জানিস, তোকে দেখতেই আমি এসেছি, নেমন্তন্ন খেতে নয়। কালইতো চলে' যাব।"

"কালই? কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন!"

"কুটুম বাড়িতে আর কতদিন থাকব বাবা। তাছাড়া সোডাওয়াটারের বোতল কাল যাচ্ছে, ওর সঙ্গেই চলে' যাই। পরে আবার সঙ্গী পাব কোথা!"

"সোডাওয়াটারের বোতল আবার কে—"

মুচকি হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে সন্তোষের মা বলিলেন, "ওই তোমরা যাকে পটল-কর্তা বল!"

পটল-কর্তার এমন লাগসই নাম সন্তোষের মা ছাড়া অর কেহ দিতে পারিত না। জিজ্ঞেস করিলাম—'সন্তোষের কি খবর? সে কি করছে—"

"সে-ও রিহার্সালি দিচ্ছে।"

"কিসের রিহার্সালি?"

"ডাক্তারির।"

"কার কাছে থেকে ডাক্তারি শিখলে ও? স্কুলে তো পড়ে নি।"

"বাড়িতে বাংলা বই পড়ে নিজে-নিজেই দিগ্‌গজ হয়েচে।"

"রুগী হয় বেশ?"

"হয় বৈকি। সব বিনা-পয়সার রুগী। ঘরের খেয়ে বনের মোষ কি করে তাড়াতে হয় তা যদি দেখতে চাও, তোমার বন্ধুটিকে একবার গিয়ে দেখে এসো।"

তাহার পর কণ্ঠস্বরে মিনতি ফুটাইয়া আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "শঙ্করায় তো অনেকদিন যাস নি। আয় না একবার—"

"আমি এখন কোথায় কি করব, কোথায় বসব তা ঠিক হয় নি। ঠিক হলেই যাব শঙ্করায় একবার।"

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। বারহীর একখানা শাড়ি আমার কাছে আছে। তোকে দিয়ে দেব। তোর বউ এলে তাকে দিস। সম্বন্ধ কোথাও ঠিক হয়েছে?"

"আমি এখন বিয়ে করব না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই, তারপর ওসব ভাবা যাবে।"

"কিন্তু শুনছি তোমার মামা নাকি দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন। বলেছে মোটা পণ নিয়ে তোর বিয়ে দেবেন। কয়েক জায়গায় নাকি দর কষাকষি চলছে।"

"কই, আমি শুনি নি তো।"

"ঠিক হ'য়ে গেলেই শুনবি। তোর মতো সোনার চাঁদ ছেলের তো মোটা পণ পাওয়াটাই উচিত। সন্তোষের জন্যেই সাদাসিধে করছে কৈঁকালার মুখুজ্জেরা পাঁচশো টাকা নিয়ে।"

"সন্তোষের এখন বিয়ে দেবে না কি। ওর রোজকার কি রকম।"

"রোজকার কিছুই নয়। জমিজমা থেকেই সংসার চলে। তবু বিয়ে দিতে হবে, ওর বিয়েতে যা পাব ভেবেছি তাই নিয়ে রাজুর বিয়ের যোগাড় করব। ওরও তো দশ বছর পেরিয়ে যাবে এই পৌষে।"

সেদিন সন্ধ্যার সময় রিহার্সালে যাই নাই। সন্তোষের মায়ের গল্পের আসরে গিয়া বসিয়াছিলাম। আসর বসিয়াছিল একতলায় গুদোম ঘরে। ঘরটা লম্বাগোছের ছিল এবং তাহার একদিকটা বাড়ির ভাঙাচোরা জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই ঘরে মেজেতে গোটা দুই কম্বল পাতিয়া বসিয়াছিলাম আমরা। ঘরের এককোণে মিটমিট করিয়া রেড়ির তেলের বাতি জ্বলিতেছিল। স্বল্পালোকে পরিবেশটা বেশ স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সন্তোষের মা সেদিন যে গল্পটা বলিয়াছিলেন তাহা অন্য কোন পরিবেশে বেসুরো মনে হইত। গল্পের সবটা আমি শুনিতে পাই নাই। গোড়ার দিকটা যতটুকু শুনিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি।

"পিতামহ ব্রহ্মার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একবার মর্ত্যে পালিয়ে এসেছিলেন। এসে আমাদের বেগমপুরের মাঠের মাঝখানে যে বড় বটগাছটা আছে তার উপর লুকিয়ে বসেছিলেন। কতদিন যে ছিলেন তা বেগমপুরের লোকেরা জানতেই পারেনি প্রথমে। জানবে কি করে। রাত্তিরে তো কেউ ওই মাঠে বেরুত না। বেরুলে বুঝতে পারত ইন্দ্রের ছোঁয়া লেগে রাত্তির বেলা ওই গাছের কি অপরূপ চেহারা হয়েছে। দিনে কিন্তু যেমনকার গাছ তেমনি থাকত। দিনের বেলা ইন্দ্র ওই গাছে থাকতেন না, ভোর হ'তে না হ'তেই পাখী হ'য়ে উড়ে যেতেন গাছ থেকে। কোন দিন টিয়া হতেন, কোনদিন ময়না, কোনদিন চড়ুই, কোনদিন কাঠঠোকরা। যেদিন যেমন খুশি। রাত্রে কিন্তু তিনি ইন্দ্র হ'য়ে গাছটিতে বসে থাকতেন। আর গাছের প্রত্যেকটি পাতা ঝলমল করত। মনে হ'ত প্রত্যেকটি পাতা যেন সাঁচ্চা জরি দিয়ে তৈরী আর প্রত্যেকটি পাতায় যেন জ্যোৎস্না ঝলমল করছে। আকাশে যেদিন চাঁদ থাকত সেদিন তো করতই, যেদিন না থাকত সেদিনও করত। গাছ হ'য়ে উঠত যেন বিরাট এক সিংহাসন আর সেই সিংহাসনে বসে'

থাকতেন দেবরাজ ইন্দ্র। রাত্তির বেলা আর এক কাণ্ড হ'ত। দিনের বেলা তিনি পাখী হ'য়ে ফলটা পাকড়টা খেয়ে থাকতেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কি তাতে তৃপ্তি হয়? স্বর্গে খবর পাঠিয়ে ছিলেন লুকিয়ে, শচী দেবী রোজ রাত্রে দু'জন অপ্সরা পাঠিয়ে দিতেন, তাদের হাতে থাকত সুধাভাণ্ড। ইন্দ্রকে সুধা পান করিয়ে আবার স্বর্গে ফিরে যেত তারা। অপ্সরীরা যখন আসত তখন সেই বটগাছের শোভা আরও বেড়ে যেত। মনে হ'ত দুটো অদ্ভুত ইন্দ্রধনু যেন জড়িয়ে ধরেছে গাছটাকে। সে এক আশ্চর্য শোভা। কিন্তু বেগমপুরের লোকরা তা দেখতে পেত না, তারা ঘুমুত তখন। কিন্তু একদিন তারা দেখতে পেয়ে গেল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর ছেলে আর বৌয়ের কল্যাণে।

অনেক দূরের এক গাঁয়ে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর ছেলের বিয়ে হয়েছিল। বরযাত্রীরা আগেই চলে এসেছিল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর বেয়াই বললেন এক গরুর গাড়িতে যেতে হবে তো বর-ক'নেকে, কাল-রাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে যাও। তাই হল। কাল-রাত্রি কাটিয়ে তারপর দিন ছেলে-বউ নিয়ে বেরুল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। একটার বেশী গরুর গাড়ি পাওয়া গেল না গ্রামে। পালকি তো পাওয়াই গেল না। অজ-পাড়াগাঁ একেবারে। যে গরুর গাড়িটা জুটল সেটাও অমজবুত গোছের। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী বলল, কুছ পরোয়া নেই, আমি হেঁটেই যাব। ছেলে-বউকে এখনি রওনা করে' দাও। আজ ফুলশয্যা, সকাল-সকাল রওনা করে না দিলে সময় পৌঁছতে পারবে না। তাই হ'ল। গরুর গাড়ি ছই বেঁধে মেঠো-পথে রওনা হ'ল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখা যেতে লাগল নতুন বউয়ের চেলির আঁচল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী পাগড়ি বেঁধে ছাতা ঘাড়ে করে হাঁটতে লাগল গাড়ির পিছু পিছু। গাড়ির গরু দুটো যদি ভাল হ'ত তাহলে তারা ঠিক সময় পৌঁছে যেত। কিন্তু গরুদুটো ভাল ছিল না, বুড়ো গরু, টিকিস্ টিকিস্ করে চলতে লাগল। গাড়োয়ান গরু দুটোকে দমাদ্দম মারছিল। বউটি গাড়োয়ানকে বললে, তুমি অমন করে মেরো না বাপু গরু দুটোকে। বউটির নরম মনের সুযোগ নিয়ে গরু দুটো আরও আস্তে আস্তে চলতে লাগল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী অবশ্য চেঁচামেচি করতে লাগল খুব, কিন্তু গাড়োয়ান বউমার কথা অগ্রাহ্য করে' গরু দুটোকে আর মারতে রাজী হ'ল না। খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগল তারা।

আস্তে আস্তে চলেও রাত্রি এগারোটা নাগাদ তারা বেগমপুরে পৌঁছে যেত, কিন্তু বেগমপুরের মাঠে সেই বটগাছটার তলায় এসে গরুর গাড়ির একটা চাকাই গেল ভেঙে। একেবারে অচল অবস্থা হ'য়ে পড়ল তখন। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী গাড়োয়ানকে বকতে যাচ্ছিল কিন্তু গাছটার দিকে চেয়ে নির্বাক হ'য়ে গেল সে। সমস্ত গাছ যেন জড়োয়ার গয়না পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছ নয় যেন জুয়েলারির দোকানের বিরাট শো-কেস—এমন বিরাট শো-কোস কোন জুয়েলারির দোকানেও দেখা যায় না। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী হাঁ করে চেয়ে রইল গাছটার দিকে। বউটা কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আজ ফুলশয্যার রাত্রি, এ কি হ'ল আজ। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী নিমেষে মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক তো, তার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এই অন্ধকার রাত্রে তেপান্তর মাঠের মাঝখানে সারা গাছ জুড়ে যে কাণ্ডটা হ'চ্ছে তা অলৌকিক কাণ্ড। হয় দেবতা, না হয় উপদেবতা ভর করেছেন ওই গাছে। গরুর গাড়ির চাকা ভেঙে ফেলাটাও হয়তো তাঁরই কীর্তি। দেবতা-উপদেবতার সঙ্গে জোরজবরদস্তি চলে না, চোখ রাঙিয়ে কাজ আদায় করা যায় না তাদের কাছ থেকে। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী হাতজোড় ক'রে গাছের

দিকে চেয়ে ভেউ-ভেউ করে' কাঁদতে কাঁদতে বলল—দোহাই বাবা, রক্ষা করো। আমি গরীব ব্রাহ্মণ রক্ষা করো আমাকে। গাছের ভিতর থেকে গম্ভীরকণ্ঠে আওয়াজ এল, 'কে তুমি?' মহেন্দ্র গাঙ্গুলী করুণকণ্ঠে বলিল—'আমি বেগমপুরের মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরছি, আজ ফুলশয্যা। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে গরুর গাড়ির চাকাটা ভেঙে গছে। কি করে' যে কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।' গাছের ভিতর থেকে আবার গম্ভীর গলায় আওয়াজ এল— 'সব ঠিক হ'য়ে যাবে। চুপ করে চোখ বুজে বসে থাক সবাই।' তাই হ'ল।

মহেন্দ্র গাঙ্গুলী, তার ছেলে, তার বউ, গাড়ির গাড়োয়ান—সবাইচোখ বুজে বসে' রইল। চোখ বুজে না থাকলে তারা দেখতে পেত দুটি ধপধপে শাদা পরী ডানা মেলে উড়ে গেল গাছ থেকে আর দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল আকাশে। আকাশের নক্ষত্ররা সরে' সরে' তাদের পথ করে' দিতে লাগল। চোখ বুজে বসে রইল ওরা। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর অস্বস্তি হচ্ছিল একটু। এক একবার লোভ হচ্ছিল চোখটা একটু ফাঁক করে দেখে গরুর গাড়ির চাকাটা আপনা-আপনি গোটা হ'য়ে যাচ্ছে কি না। কিন্তু ভয়ে সে চোখ খুলতে পারল না। কি জানি কিছু যদি হ'য়ে যায়। খামখেয়ালী দেবতা ভালও যেমন করতে পারেন, সর্বনাশও তেমনি করতে পারেন। ভুরু কুঁচকে চোখ বুজে বসে' রইল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর মনে হল কুলকুল করে' একটা শব্দ হ'চ্ছে যেন। শব্দটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর সন্দেহ রইল না যে একটা নদী এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। জোলো ঠাণ্ডা হাওয়াও এসে গায়ে লাগতে লাগল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলে মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। হঠাৎ সানাই বেজে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর থেকে ইন্দ্র হুকুম দিলেন—'চোখ খোল।' অবাক হ'য়ে গেল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী চোখ খুলে। চারদিক আলোয় আলো, সামনে সত্যিই একটা নদী আর নদীর উপর ভাসছে একটা ময়ূরপংখী। নদীর জল যেন গলানো সোনা, ময়ূপংখীর সারা গায়ে জ্বলছে মণি-মাণিক্য আর তাকে ঘিরে দুলছে নানা রঙের ফুলের মালা। ময়ূরপংখীর ছাদের উপর বসে যারা সানাই বাজাচ্ছে তাদের মতো অদ্ভুত সুন্দর লোক মহেন্দ্র গাঙ্গুলী আর কখনও দেখে নি। তারা যে কিন্নর, দেখবে কি করে'। গাছ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ইন্দ্র আবার আদেশ দিলেন—'স্বর্গ থেকে স্বয়ং মন্দাকিনী ময়ূরপংখী নিয়ে এসেছেন তোমার ছেলে-বউকে বেগমপুরে পৌঁছে দেবেন বলে'। তোমরা ওই ময়ূরপংখীতে চড়ে চলে যাও।"

ঠিক এই সময়ে মন্মথ আসিয়া হাঁকাহাঁকি করতে লাগিল। আমার জন্য নাকি রিহার্সাল আটকাইয়া গিয়াছে। জগন্নাথবাবু খুব রাগারাগি করিতেছেন। গল্পের আসর ছাড়িয়া আমাকে উঠিতে হইল। জানি না, সন্তোষের মা ওই কিন্নরদলকে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর বাড়িতে লইয়া গিয়া লুচি-মণ্ডা খাওয়াছিলেন কি না। সন্তোষের মা তাহার পরদিন ভোরেই পটল-কর্তাব সহিত চলিযা গেলেন। যাইবার পূর্বে তাঁহাকে কথা দিতে হইল আমি আমার বসিবার একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া শঙ্করায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিব। সন্তোষের মায়ের সহিত হাবু মামারও যাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্টেশনে যাইবার সময় আবিষ্কৃত হইল হাবু মামা নাই। সে নাকি রেলের ডি. টি. এস. এবং কয়েকটি ছোকরার সহিত গঙ্গা পার হইয়া পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছে। আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম মামা ইহা লইয়া রাগারাগি করিবে। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন, না, বরং বলিলেন, "ওর পেটে তো বিদ্যে এক ছটাকও নেই, শিকারটিকার করে' যদি ডি. টি. এস.-এর নজরে পড়ে' যায় তাহলে চাকরি হ'য়ে যাবে। একটা।" আমি

কিন্তু বলিতে পারি হাবু মামা চাকরি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই সেদিন শিকারপার্টিতে যোগদান করে নাই। হাবু মামার অত বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না। যে কোনও হুজুকে মাতিবার জন্য হাবু মামা সর্বদা পা বাড়াইয়া থাকিত। সে হুজুকে অজানার আহ্বান, অনিশ্চয়তাজনিত কষ্ট এবং পরোপকার করিবার সুযোগ থাকিলে হাবু মামার আগ্রহের আর সীমা থাকিত না। এই শিকারের গল্প পরে আমি শুনিয়াছিলাম। শিকারপার্টিতে ডি টি. এস. এবং তাঁহার মেমেসাহেবও গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল রেলের কয়েকটি ছোকরা এবং হাবু মামা। ডি. টি. এস.-এর জন্য আলাদা তাঁবু পড়িয়াছিল।

বলা বাহুল্য সে তাঁবুতে কোন 'নেটিভ' ছোকরার স্থান হয় নাই তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল এক গোয়ালা-বাড়ির চালাঘরে। শীতকালে গঙ্গার চরে চারিদিক-খোলা চালাঘরে থাকা বেশ কষ্টকর। শুকনো গোবর এবং শুকনো কাঠের টুকরা একজায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া গোয়ালারা তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ইহাকে তাহারা 'ঘুর' বলে। এই ঘুরের চারিদিকে কম্বল পাতিয়া হাবু মামারা সেদিন রাত কাটাইয়াছিলেন। আমি জানি এই কষ্ট করিয়া থাকাটাই হাবুমামার প্রধান আনন্দের কারণ হইয়াছিল। শুধু ইহাই নয়, ইঁট পাতিয়া উনুন করিয়া, গোয়ালাদের নিকট হইতে 'বাঁটলোই' এবং চাল-ডাল-আলু লইয়া রান্নাও করিতে হইয়াছিল হাবু মামাকে। পশ্চিমে গোয়ালারা যদিও দাঙ্গাবাজ, কিন্তু তাহারা খুব অতিথিসেবক। তাহারা তাহাদের যথাসাধ্য করিতেছিল। কিছু দুধ এবং কিছু খাঁটি 'ঘি' ও দিয়েছিল তাহারা। হাবু মামা তাহা লইয়া নাকি 'সুফেদ পোলাও' (শাদা পোলাও) প্রস্তুত করিয়াছিল। হাঁড়িতে চাল-ডাল-আলু-দুধ-ঘি সব একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়ছিল। অতিশয় উপাদেয় হইয়াছিল নাকি। খাইবার সময় কিন্তু মুশকিল হইয়াছিল একটু।

হাবু মামার সহিত জন ছয়েক রেলের ছোকরা ছিল। গোয়ালারা অতগুলি লোকের জন্য থালা যোগাড় করিতে পারিল না। বাড়িতে কলাগাছ ছিল, কিন্তু রাত্রে কলাগাছের পাতা কাটিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন হাবু মামা প্রশ্ন করিল—"কাছেপিঠে কোনও দোকানে শালপাতা পাওয়া যাবে না?" একজন গোয়ালা বলিল, একটি দোকান আছে, কিন্তু সেটি প্রায় এক মাইল দূরে। গোয়ালাদের বাড়ির কেহ গেলে তাহারা হয়তো পাতা দিবে না। কারণ সম্প্রতি গোয়ালাদের সহিত উক্ত দোকানদারের ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। তবে কোনও বাবু যদি যান 'বুলাকি' (গোয়ালার বড় ছেলে) তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দূর হইতে দোকানটা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারে।

হাবু মামাকেই যাইতে হইয়াছিল, অন্য কোন বাবু যাইতে সম্মত হন নাই। আমি জানি হাবু মামা সোৎসাহে এবং সানন্দে গিয়াছিল। সারা-জীবনই সে এই ধরনের কাজে আনন্দ পাইয়াছে। শিকারের অংশ স্বরূপ হাবু মামা সেদিন ছোট একটি হাঁস পাইয়াছিল। তাহা লইয়াও মুশকিল কম হয় নাই। আমাদের বাড়িতে বৃথা মাংস রান্না হইবে মামীমা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন। হাবু মামা তখন কেলনারের রহিম বাবুর্চির সহিত একটা প্যাকট্ করিতে উদ্যত হইল। চার আনা পয়সা লইয়া সে হাঁসটি রাঁধিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া শেষে বলিল তাহাকে মাংসেরও একটু ভাগ দিতে হইবে। ইহা লইয়া দরদস্তুর চলিতেছে এমন সময় মন্মথ আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, কুছ পরোয়া নেই, আমাদের বাগানে চল, সেইখানেই আমরা রান্না করব। মা সব ব্যবস্থা করে দেবে। মন্মথর মা এসব কাজে বেশ উৎসাহী ছিলেন। তিনিই বলিলেন—ওইটুকু মাংসে তোদের এতগুলো লোকের কুলুবে কি করে! দাঁড়া, আমি কিছু আলু ভেজে দিচ্ছি।

হাবু মামাই সেদিন রান্না করিয়াছিল। প্রচণ্ড ঝাল দিয়াছিল এইটুকু শুধু মনে আছে। আর মনে আছে সেদিন তরকারিতে আলুর ভিড়ে মাংস হারাইয়া গিয়াছিল। মন্মথর ভাষায়—বিরাট আলুর ক্ষেতের উপর দিয়ে ছোট্ট হাঁসটা কখন কোন্ দিক দিয়ে যে উড়ে গেল, টেরই পেলাম না। এই প্রসঙ্গে আর এটা কথাও মনে পড়িল। আমাদের মাংস-লোলুপতা দেখিয়া মন্মথ র মা আমাদের মঙ্গলার্থে কালীবাড়িতে একটি কুচকুচে কালো পাঁঠা পরে অমাবস্যাতে বলি দেওয়াইয়াছিলেন এবং নিজের হাতে সে মাংস রান্না করিয়া ভুরিভোজন করাইয়াছিলেন আমাদের। সেখানে পূজার মাংসে পেঁয়াজ দেওয়া চলিত না। মাংসে হিং দিয়া মন্মথর মা যে চমৎকার রান্না করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। বহুকাল পরে এইসব স্মৃতির কণিকা আহরণ করিতে বসিয়া সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া যাইতেছে।

হাবুমামার কথাই বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে আজ। হাবুমামা বিদ্বান ছিল না, বড় চাকরি কখনও করে নাই, যে সব ছোটোখাটো চাকরি মাঝে মাঝে পাইত তাহাতেও টিকিয়া থাকিতে পারিত না, তাহার এমন একটা স্বাধীন বেপরোয়া খামখেয়ালী স্বভাব ছিল যে কোনও চাকরিব খাঁচায় সে বেশী দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। মামা তাহাকে নিজে নুনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এজন্য তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইত। এইসময় নানারকম লোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল তাহার অনেকের সহিত খুব বন্ধুত্বও হইয়াছিল। যাহার সহিত আলাপ হইত তাহার সহিতই বন্ধুত্ব হইয়া যাইত তাহার। তাহার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা উদার মন-খোলা আহ্বান ছিল যে তাহাতে সকলেই সাড়া দিত। তাহার বন্ধুদের সংখ্যা এবং পরিচয় সব আমি জানি না। একবার তাহার সহিত হাওড়া হইতে মোকামা পর্যন্ত অসিবার সুযোগ আমাব হইয়াছিল। তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম প্রায় সব স্টেশনেই তাহার একটা-না-একটা চেনা লোক বাহির হইয়া যাইতেছে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ,—হিন্দু, মুসলমান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বাঙালী, বিহারী—সব রকম লোকই হাবুমামার বন্ধু। হাবুমামাকে দেখিয়া সকলের মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত। এই ধরনের বন্ধুত্বের জন্যই হাবুমামা শেষ পর্যন্ত মামার কাজে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। ব্যাপারটা ভাবিলে এখন অবাক লাগে। হাবুমামা তখন তিন পাহাড়ে ছিল। মামা তাহাকে লিখিলেন—তুমি চলিয়া এস। এখানে অনেক কাজ আছে। উত্তরে হাবুমামা জানাইল, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। আমার বন্ধু রঞ্জনবাবুর মেয়ের বিয়ে। রঞ্জনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বাসায় কাজ করিবার লোক কেহ নাই। তাই তাঁহার দায়টি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমি যাইতে পারিব না। বলাবাহুল্য মামা খুব চটিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লিখিয়া দিলেন—তোমাকে আর আসিতে হইবে না। তোমার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হতভাগাকে দিয়া আমার কাজ চলিবে না। হাবুমামার নিকট অনিশ্চিতের কোনও মূল্য ছিল না, সুনিশ্চিত বর্তমানকে লইয়াই সে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিত। হাবুমামার যখন কোথাও কিছু জুটিত না তখন সে আমার নিকট চলিয়া আসিত। আমি তাহাকে কম্পাউণ্ডারি কিছু কিছু শিখাইয়া ছিলাম, ডাক্তাবিও একটু আধটু শিখিয়াছিল, মন দিয়া টিকিয়া থাকলে কোনও গ্রামে বসিয়া অনায়াসেই সে বেশে কিছু উপার্জন করিতে পারিত। কিন্তু জীবনে কোথাও টিকিয়া থাকিতে সে পরিল না। তাহার মতো লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। কিন্তু সেকালে অবিবাহিত থাকিবার উপায় ছিল না। সময়ে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়া প্রত্যেকে পিতামাতা সামাজিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিতেন। সময়ে ছেলেমেয়ের বিবাহ না দিলে সমাজে মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইত

আর একটা কারণেও হাবুমামাকে তাড়াতাড়ি বাবাহ করিতে হইয়াছিল। হাবুমামার এক দিদি ছিল। সে দিদির বয়স বারো পার হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহার বিবাহ দিতে পারা গেল না, হাবুমামার মা পদ্মদিদি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সে অন্ধকারে আলো আনিলেন হাবুমামার যিনি শ্বশুর হইয়াছিলেন তিনি। তাঁহার একটি কুৎসিত কন্যা এবং একটি মূর্খ পুত্র ছিল। তিনি পদ্মদিদিকে বলিলেন, তুমি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দাও তাহলে তেমার মেয়েটিকে আমার পুত্রবধূ করে নিতে পারি। তাহাই হইল। হাবুমামার প্রথম জীবনে কোনও ছেলেমেয়ে হয় নাই, তাই সে বেপরোয়া হইয়া যখন যেখানে খুশি থাকিতে পারিত। তাহার বউ থাকিত তাহার মায়ের কাছে। কিন্তু মা যখন মরিয়া গেল তখন দেশে গিয়া বছর পাঁচেক থাকিতে হইল হাবুমামাকে। এই সময়ই হাবুমামার একটি ছেলে এবং দুইটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হাবুমামা এতদিন মুক্ত বিহঙ্গম ছিল, এইবার সে লোহার শিকলে বাঁধা পড়িল। ইহার পর কলিকাতার সদাগরী আপিসে যে চাকরিটি সে পাইয়াছিল সেটি আর ছাড়ে নাই। বালিতে এটি ঘর ভাড়া লইয়া সেইখানেই পরিবারকে আনিয়াছিল। সেখান হইতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিত সে। চাকরিটি সে পাইয়াছিল তাহার এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বন্ধুর সুপারিশে। এক বড় সাহেব কোম্পানীর গুদামঘরে রক্ষণাবেক্ষণ করিত সে। তাহার নাম ছিল গোডাউন মাস্টার। সে আপিসে আমি একবার গিয়াছিলাম। বিরাট এক চারতলা বাড়ির চতুর্থতলায় সে আপিস। চারিদিকে বড় বড় বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে কলিকাতা শহরেরর অনেকটা অংশ ছবির মতো দেখা যাইত। মনে পড়িতেছে সেখানে দাঁড়াইয়া আমি মনুমেন্ট এবং গড়ের মাঠে দেখিয়াছিলাম। ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ি খেলা-ঘরের ট্রাম ঘোড়ার গাড়ির মতো দেখাইতেছিল। সেই চারতলার উপর হাবুমামা একা থাকিত। তাহার একমাত্র সঙ্গী ছিল উড়ে চাকর বাঞ্ছারাম। সে-ও কোম্পানীর চাকব ছিল। ক্লাইভ স্ট্রীটের হেড আপিস হইতে বড়সাহেব যখন মাল ছাড়িবার অর্ডার দিতেন তখন বাঞ্ছারাম গুদামঘরের চাবি খুলিয়া দিত, হাবুমামার কাজ ছিল গণিয়া গণিয়া মালগুলি বাহির করিয়া দেওয়া এবং যাহারা মাল লইতে আসিত তাহাদের নিকট হইতে রসিদ লওয়া। ঘড়ি ধরিয়া ঠিক তিনটার সময় হাবুমামা চা খাইত। চা তৈরি করিবার সমস্ত সরঞ্জাম ওই চারতলার আপিসঘরেই রখিয়াছিল সে। বাঞ্ছারাম জল দুধ গরম করিয়া চায়ের জিনিসপত্র ধুইয়া ঠিক করিয়া দিত সব, হাবুমামা ঘড়ি ধরিয়া পাঁচ মিনিট চা ভিজাইয়া তাহার পর স্বহস্তে চা ছাঁকিত। চা করা তাহার বিলাস ছিল একটা। ওই একটিমাত্র 'হবি'ই সে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়ছিল। ভাল দার্জিলিং চা ছাড়া কিনিত না। আর কিনিত ভাল কনডেনসড্ মিল্ক। তাহার আপিসে গিয়া আমি চা খাইয়াছিলাম। ছোট ছোট কাচের গ্লাসে সকলকে চা দিত হাবুমামা। নিজেও কাচের গ্লাসেই খাইত। একটি সুদৃশ্য দামী-চীনেমটির পেয়ালা ছিল। সেটি বড়সাহের জন্য রিজার্ভড থাকিত। বড়সাহেব মিঃ মরিসন মাঝে মাঝে আসিয়া হাবুমামার সহিত চা খাইতেন। শুনিয়াছিলাম হাবুমামাকে বড়সাহেব খুবই স্নেহ করেন। ঠিক পাঁচটার সময় হাবুমামার আপিস হইতে ছুটি হইত। তখন আর এক ধরনের কাজ শুরু হইত তাহার। বাজার করা। নিজের জন্য নহে, পরের জন্য। কলিকাতায় কোথায় কোন জিনিস সস্তা পাওয়া যায় তাহা তাহার জানা ছিল। চাঁদনির কোন বিশেষ দোকানটিতে, পোস্তার কোন বিশেষ গলিতে, চীনেবাজারের কোন্ বিশেষ লোকের কাছে গেলে ভালো জিনিস সস্তায় পাওয়া যাইবে তাহার খবর রাখিত হাবুমামা এবং তাহার এই

বিস্ময়কর জ্ঞানের খবর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদেরও অবিদিত ছিল না। সকলেই জানিত কাহারও কোন জিনিস কলিকাতা হইতে আনিবার দরকার হইলে হাবুমামার কানে কথাটা তুলিয়া দিলেই চলিবে। সস্তায় ভালো জিনিস আসিয়া যাইবে। হাবুমামাকে ফরমাশ করিবার আর একটা সুবিধা ছিল। অনেক সময় জিনিসের দাম সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইত না। হাবুমামা নিজের পয়সা খরচ করিয়া বা দোকান হইতে ধারে কিনিয়া আনিত জিনিসপত্র। পছন্দ না হইলে জিনিস ফেরত দিয়াও আসিত। অনেক দোকানদারের সহিত হৃদ্যতা ছিল হাবুমামার। বড়বাজারের, কলেজ স্ট্রীটের, এমনি কি হগ সাহেবের বাজরেরও অনেক দোকানদার হাবুমামাকে খাতির করিত। তাহারা ভাবিতেও পারিত না যে হাবুমামার মতো লোক তাহাদের ঠকাইবে। হাবুমামা তাহাদের কাহাকেও কখনও ঠকায় নাই, নিজেই ঠকিয়াছে। যে সব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা জিনিসপত্তর আনিবার জন্য তাহাকে অকাতরে ফরমাশ করিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে দাম দিবার বেলায় কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে ইহা আমি নিজে জানি। তাহাদের মধ্যে অনেককে গোপনে এ আলোচনা করিতেও শুনিয়াছি যে হাবুমামা সস্তায় কোনো জিনিস কিনিয়া আনিযা বেশী দাম আদায় করে। কলিকাতা হইতে পরের জন্য জিনিসপত্র বহিয়া আনা তাহার একটা ব্যবসায়, দোকানদারগণের নিকট হইতে সে নাকি কমিশন পায়। হাবুমামার কানেও এসব কথা নিশ্চয় ঢুকিত, তবু তাহাকে কখনও নিরস্ত হইতে দেখি নাই। তাহাকে এই কিছুদিন আগেও একবার হাওড়া প্ল্যাটফর্মে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। লম্বা কোট পরা, কোটের মাঝে মাঝে উঁচু হইয়া আছে। হাবুমামা অনেক-পকেটওয়ালা কোট ফরমাশ দিয়া প্রস্তুত করাইত—সেই সব পকেটে ফরমায়েশী জিনিস আনিবার সুবিধা হইত। তাহার দুইহাতে দুইটি লম্বা থলিও থাকিত। বলা বাহুল্য থলি দুইটি নানারকম জিনিসপত্রে ভরতি। আমি যেদিন তাহাকে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে দেখিয়াছিলাম, সেদিন তাহার চেহারা আর অদ্ভুত দেখাইতেছিল। তাহার এক কাঁধে একটা কোরা শাড়ি আর এক কাঁধে একটা পাটকরা কোরা চাদর ঝুলিতেছিল। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। হাবুমামাকে ফেরিওলা বলিয়া মনে হইতেছিল। আমার সহিত দেখা হওয়াতে হাবুমামা যেন অকূলে কূল পাইল। বলিল, এ দুটো আমার কাঁধ থেকে নাবিয়ে নাও তো। বার বার পড়ে' পড়ে' যাচ্ছে। তুমিও এই ট্রেনে যাচ্ছ নাকি। ভালই হল। জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব কি এত নিয়ে যাচ্ছ? হাবুমামা হাসিয়া বলিল, আর বোলো না। পাড়ার লোকের কত ফরমাশ! হাবুমামাকে একটু জ্ঞানদান করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম, কেন এসব ভূতের ব্যাগার খেটে মর। লোকে কি বলে জান? লোকে কি বলে তাহা বিবৃত করিয়া বলিলাম। সব শুনিয়া হাবুমামা দুইবার ঘনঘন নিশ্বাস টানিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, সব জানি। আর একটা কথাও জানি, বলিয়া হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি সেটা? হাবুমামা অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, ওরা ভারী গরীব। এই সমান্য কথা কয়টি সহসা সেদিন হাবুমামার চরিত্র-মাহাত্ম্য আমার নিকট উদঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। হাবুমামার নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, প্রচলিত অর্থে সেও গরীব ছিল, কিন্তু তাহার মুখে সেদিন ওই কথা কয়টি শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম হাবুমামা সত্যই বড়লোক। তাহার মতো ভদ্রলোকও আমি খুব বেশী দেখি নাই। সে সকলের সহিত ভদ্র আচরণ করিত। ভালো লোকের আর একটা লক্ষণ থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। হাবুমামা মাঝে মাঝে যখন আমার

কাছে আসিয়া থাকিত তখন আমার ছেলেমেয়েদের সহিতই তাহার ভাব হইত বেশী। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখা খুব একটা ফ্যাসন হইয়াছিল। একবার হাবুমামা যখন কলিকাতা হইতে আসিল তখন দেখি তাহার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। গ্রামের লোকেরা তাহার দিকে একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আমার বড় ছেলের বিরুর বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর। তখন সপ্তম এডওয়ার্ড আমাদের সম্রাট। খামে পোস্টকার্ডে, ডাকটিকিটে তাঁহার ছবি। বিরু একদিন একাট পোস্টকার্ডে সপ্তম এড্ওয়ার্ডের ছবি দেখিয়া হাবুমামাকে বলিয়াছিল—তোমার দাড়ি ঠিক এইরকম। নয়? হাবু সঙ্গে সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল—চুপ, চুপ। ঠিক ধরেছিস তুই। কাউকে বসি না, আমি ছদ্মবেশী সপ্তম এড্ওযার্ড। তোকেই আমি আমার প্রাইম মিনিস্টার করব ঠিক করেছি। বিরুর বয়স তখন খুব কম। 'প্রাইম মিনিস্টার' কি ব্যাপার তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তবে সে এটা বুঝিয়াছিল যে হাবুমামা তাহাকে একটা কিছু করিয়া দিবে। কয়েকদিন পরেই হাবুমামা হঠাৎ একদিন সকালে কাটিহারে চলিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা ফিরিল দুইটি 'সেলার স্যুট' লইয়া। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির মতো সেকালে ছোট ছেলেদের জন্য 'সেলার স্যুট'-এরও খুব প্রচলন হইয়াছিল। হাবুমামা কাটিহার হইতে বিরু এবং পৃথ্বীশের জন্য দুইটি সেলার স্যুট লইয়া হাজির হইল সন্ধ্যার সময়। পরদিন সকালে দুইজনকে সেই সেলার স্যুট পরাইয়া বলিল—বিরু আমার বড় প্রাইম মিনিস্টার, পৃথু ছোট প্রাইম মিনিস্টার। উশনার তখন জন্ম হয় নাই। এড্ওয়ার্ড দি সেভেন্‌থ্‌ তাঁহার দুই প্রাইম মিনিস্টারকে লইয়া রাজকীয় মর্যাদায় রোজ বেড়াইতে বাহির হইত। ছবিটা আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি...জীবনকাহিনী লিখিতে বসিয়া কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। পরের কাহিনী আগেই লিখিয়া ফেলিতেছি। আমার প্র্যাকটিস আরম্ভ এবং দ্বিতীয়বার বিবাহের কথাটা না বলিয়াই বিরু এবং পৃথ্বীশের ছেলেবেলার কথাটা উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, এ লেখা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে সে আশাও কম, তাই সন তারিখের পারম্পর্য লইয়া আমি তেমন মাথাও ঘামাইতেছি না। স্মৃতির স্রোতে যখন যে কথাটা মনে আসিতেছে তাহাই লিখিযা যাইতেছি......"

কুমার একাগ্রচিত্রে পড়িয়া যাইতেছিল। পশ্চিমগগনে সূর্য অস্তোন্মুখ। মেঘের অপূর্ব বর্ণ বিন্যাস চক্রবালরেখায় যে দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। মাঠের ফসলের উপর, গাছের সর্বাঙ্গে, আকাশে, বাতাসে, চতুর্দিকে যে স্বর্ণ-রক্তাভ কিরণ মালা প্রসারিত হইয়াছিল তাহারও তুলনা মেলা ভার। কিন্তু কুমার এসব কিছুই দেখিতে ছিল না। তাহার মনের আকাশে সূর্যসুন্দরের জীবনকাহিনীও অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল সে।

"অত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছ কুমারবাবু?"

কুমার মুখ তুলিয়া দেখিল রাজু দাঁড়াইয়া আছে।

"ব্লাড্‌প্রেসারের যন্ত্র ঠিক করে এনেছি। বউদির প্রেসার মাপা হ'য়ে গেছে। গগন বললে ভয়ের কোন কারণ নেই, ঠিক আছে।"

"ট্রেন কতক্ষণ হ'ল এসেছে? টেরই পাইনি।"

"চল বাড়ি চল। আজ এখানে থেকে যাব ভাবছি। দাবাবড়েগুলো হারায় নি তো?"

"না, সব আছে।"

"অনেকদিন তোমার সঙ্গে খেলি নি। আজ খেলব ভাবছি।"

"বেশ।"

রাজু খুব ভালো দাবাখেলোয়াড়। কাটিহারের সমস্ত দাবাখেলায়াড়কে সে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু কুমারকে সে হারাইতে পারে নাই। কুমার তাহার চেয়েও ভালো খেলোয়াড়।

।। সাতাশ।।

চম্পার সাধ উপলক্ষে যে ভোজ হইয়া গেল তেমন ভোজ সম্প্রতি আর হয় নাই, ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। বছর দুই আগে তহশিলদার সাহেবের নাতির বিবাহ উপলক্ষে একটা বড় ভোজ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এত বড় নহে। কারণ তাহা প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাহাতে অনাহূত বরাহূতের সংখ্যাও এত অধিক হয় নাই। নিখিলবাবু আসিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানায় বসিয়াছিলেন এবং সূর্যসুন্দরকে ভোজের একটা আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব দিয়া বলিতেছিলেন—"আমাদের দু'শো টাকার বেশী খরচ হয় নি। লোকে এত জিনিস দিয়েছিল যে তাতেই সব কুলিয়ে গেছে। ওই দু'শো টাকা বিরু আমাকে দিয়ে দিতে চাইছিল। আমাদেব মালিক তখন সেখানে বসেছিলেন, তিনি বাঁ চোখ কুঁচকে ইশারায় আমাকে টাকাটা নিতে বারণ করলেন। বিরুবাবু চলে গেলে তিনি বললেন—ও টাকাটা বিরুবাবুর কাছ থেকে নেবেন না। ওটা মনু আর টুনুর নাম করে' আমাদের স্টেট থেকেই দিয়ে দিন। মনু টুনু যদি এসে শোনে তাদের নাম করে' কিছু দেওয়া হয় নি তাহলে তারা বড়ই রাগারাগি করবে। সোমাও সেই কথা বলছে। মুশকিলে পড়েছি কিন্তু বিরুকে নিয়ে। তার সঙ্গে এখুনি দেখা হ'ল একটু আগে। সে বলছে আমি আমার বৌমার সাধে দু'শো টাকা খরচ করব ঠিক করেছিলাম। সে টাকাটা আপনাকে নিতেই হবে। তা না নিলে গগনের মায়ের মনে একটু দুঃখ হবে। অনেকদিন থেকে টাকাটা ও জমিয়ে জমিয়ে রেখেছিল। আমি বললাম বড়বৌমা তো চম্পাকে একটা ভাল হার দিয়েছে, আবার খরচ করার কি দরকার। তাছাড়া ভোজের ব্যাপার তো মিটেই গেল, আর কিসে খরচ করব আমরা। বিরু বলছে যাহোব কিছু একটা করুন। কি করা যায় বলুন তো।"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "সেটা আপনারাই ঠিক করুন, আমি আর কি বলব। আপনার হাতে ওই খাতাটা কিসের?"

নিখিলবাবুর হাতে একটা ছোট খাতা ছিল। তিনি বলিলেন, "এটা কুমারকে দেব। এতে ভোজের সমস্ত বিবরণ লেখা আছে। কত লোক খেয়েছে, কোন কোন গ্রাম থেকে তারা এসেছিল, কে কি কি জিনিস দিয়েছে। আমরা কি কি জিনিস কিনেছি, আর তার দাম কত। কারা কারা খেটেছে তাদের নাম—সব টোকা আছে ওতে।"

"আপনি সব টুকেছেন?"

"আমার কাছে ফিগারগুলো ছিল, কিন্তু ওটা লিখেছে দিগন্ত।"

"দিগন্ত?"

"হ্যাঁ, ভোজের সময় দিগন্ত বললে দাদু আমাকেও কিছু একটা কাজ দিন। সবাই কাজ করছে, আমার চুপচাপ বসে থাকেত ভাল লাগছে না। তখন অমি তাকে বললাম তাহলে

তুমি এই ভোজের বিবরণটা লিখে ফেল। আমার কাছে সব ফিগার আছে। ওটা একটা ফ্যামিলি রেকর্ড হয়ে থাকবে। লেখ দিকি ভাল করে'। সুন্দর করে' গুছিয়ে লিখেছে। কুমার এটা ভাল করে রেখে দিক।"

"কই আমাকে দিন তো—"

সূর্যসুন্দর সাগ্রহে খাতাটি লইয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলেন।

"আপনি কি পড়তে পারবেন?"

"দেখব চেষ্টা করে।"

কবিরাজ মহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিযা ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বউমা বাড়িতে বলে' দাও বড়বৌমাকে আজ আমার জন্যে যেন বার্লি ছাড়া আর কিছ না করেন।"

"কি হ'ল"—নিখিলবাবু প্রশ্ন করিলেন।

"মরা পেটে ক্রমাগত 'রিচ্ ফুড' খচ্ছি তো। সহ্য হ'চ্ছে না।"

"খাচ্ছেন কেন?"

"কেন আর, লোভ।"

অকৃত্রিম আনন্দে কবিরাজ মশাই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"এই তৃতীয় রিপুটাই মাঝে মাঝে বড়ই বিপন্ন করে' ফেলে আমাকে।"

নিখিলবাবু বলিলেন, "বার্লিই বা খাবেন কেন, আজ উপবাস করুন!"

"ওরে বাবা, তা পারব না। আমি যে আছি, মরে' যাই নি, এই ধারণাটা নিজের কাছে জাগ্রত রাখবার জন্যে সামান্য কিছু খেতে হবে। আর সবই তো গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, অরণ্যের আর বাকি কি! ওই লোভটুকুই আছে ওইটেকে আঁকড়ে ধরে' আর অতীত জীবনের সুখ স্মৃতিটাকে লবেঞ্চুসের মতে চুষে চুষে বেঁচে আছি! আপনার তো খুব খাটুনি গেল, শরীর কেমন আছে—"

সূর্যসুন্দরই উত্তর দিলেন।

"খাটলে নিখিলবাবুর শরীর খারাপ হয় না। হাঁটাহাঁটি করলে উনি ভালই থাকেন।"

নিখিলবাবু বলিলেন, 'তাছাড়া, আমি ভোজের একটি জিনিসও খাই নি। আমি রোজ যেমন কম মসলা দেওয়া মাছের ঝোল আর পুরেনো চালের ভাত খাই ভোজের দিনও তাই খেয়েছিলাম।"

কবিরাজ মহাশয়ের মুখ ঈষৎ ফাঁক হইয়া গেল, তিনি বিস্ফারিত-নয়নে নিখিলবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন একটা অবিশ্বাস্য সত্যর সম্মুখীন হইয়াছেন।

"বলেন কি? আপনি কিছু খান নি?"

"কিচ্ছু না। এমন কি জল পর্যন্ত না। আমাকে ইউনান সাহেব ডিস্টিলড্ ওয়াটার (distilled water) খেয়ে থাকতে বলেছেন। আমার 'স্টোন' হয়েছিল কিনা"।

কবিরাজ মহাশয় দুইহাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি মহাপুরুষ। আমি অতি সাধারণ দুর্বল মানুষ। আমারও স্টোন আছে, বাত আছে, দাঁত নড়ে, হজম হয় না, মাথা ঘোরে তবু আমি প্রাণ তুচ্ছ করে'সব খেয়েছি, কারণ জানি এমন সুযোগ জীবনে আর পাব না। অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের এই মেলায় দু'হাত তুলে ধেই ধেই

করে নাচছি, যদিও আমি নাচের কিছুই জানি না। এবং যদিও ভয় আছে মুখ থুবড়ে পড়ে' যেতে পারি—"

কবিরাজ মহাশয় সত্যই দুই হাত তুলিয়া নাচিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বাধা পড়িল। গগনের শ্বশুরশাশুড়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

নিখিলবাবুর মুখে নিখুঁত ভদ্রতা ফুটিয়া উঠিল।

"কোনও অসুবিধা হ'চ্ছে না তো? বাবুর্চিটা কেমন রান্না করেছিল কাল?"

"না আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। রান্নাও বেশ চমৎকার হয়েছিল। তবে রাত্রে চারিদিকে শিয়াল ডাকছিল তো, গিন্নীর ভয় করেছিল একটু। মফঃস্বলে এমন বাবুর্চী আপনারা পেলেন কোথা? অনেকদিন অমন 'ক্লিয়ার সুপ' খাই নি।"

"এককালে এখানে নীলকুঠির সাহেবরা থাকত। যে বাড়িতে আপনারা আছেন, সেই বাড়িতেই থাকত তারা। যে আপনাদের রান্না করেছে তোর বাবা টেলারসাহেবর পেয়ারের বাবুর্চী ছিল, তাকে টেলার সাহেব বিলেত পর্যন্ত নিয়ে যেত চয়েছিল, কিন্তু দেশ ছেড়ে সে যেতে চায় নি। নিজের ছেলেকে সে রান্না শিখিয়ে গেছে কিছু কিছু। মাছ রাঁধে না। আমাব ভয় ছিল আপনাদের ও খুশী করতে পারবে কি না।"

"না অখুশী হবার কিছু নেই। He is tolerably a good cook".

গগনের শ্বশুর শাশুড়ী ইংরেজিভাবাপন্ন বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাদের জন্য জমিদারের কুঠিতে আলাদা ইংরেজি খানার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তুরিকুলোদ্ভব ত্রিলোকী রান্না করিয়া তাঁহাদের খুশি করিতে পারিয়াছে জানিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

গগনের শাশুড়ী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "রান্নাটান্না সবই ভালো, ঘরগুলিও বেশ বড় বড়, চমৎকার। কিন্তু আপনাদের ওই শিয়ালগুলোর জ্বালায় কাল ভাল করে ঘুমুতে পারি নি"

কবিরাজ মহাশয় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আমাদের গ্রামের ওই অসভ্য জানোয়ারদের অভদ্র ব্যবহারের জন্য আমরা খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে ওদের কাছে ঋণী, তাই ওদের উপর খুব বেশী রাগ করতে পারি না।"

"শেয়ালের কাছে ঋণী? ঠিক বুঝতে পারলাম না"

গগনের শ্বশুর স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করিলেন।

"গল্পটা বলছি। আপনারা একালের শহুরে লোক, এ গল্প হয়তো আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি যেমন বিদূষক, বড়লোকের দববারে দরবারে ভাঁড়ামি করে বেড়াই, আমার ঠাকুরদাও তেমনি এক বিদূষক ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দরবারে দরবারে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না। একটি রাজার দরবার আঁকড়েই তাঁর সংসারের সমস্ত অভাব ঘুচেছিল। সপরিবারে খেতে পরতে পেতেন, বেশ ভালো একটি থাকবার বাড়ি পেয়েছিলেন, জমিজমাও কিছু করে' দিয়েছিলেন তাঁকে রাজাসাহেব। এ ছাড়া বুদ্ধিবলে কিছু উপরি রোজগাও করতেন আমার ঠাকুরদা। দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শীতকালে এক রাত্রে শিয়ালের ডাক শুনে রাজাসাহেবের হঠাৎ মনে হ'ল—ওরাও তো আমার প্রজা, নিশ্চয়ই ওরা আমার কাছে কিছু বলতে চাইছে। আমি বুঝতে পারছি না। আমার ঠাকুদাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কিছু বুঝতে পারছ? ঠাকুরদা বললেন, পারছি বইকি। রোজই ওরা এই এককথা বলে, কিন্তু ইচ্ছে করেই আপনাকে সেকথা শোনাই নি। কারণ শুনলেই অপনি এখনি হু হু করে টাকা খরচ করে ফেলবেন।

পরের দুঃখের কথা শুনলে আপনার তো আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। রাজাসাহেব উৎসুক হ'য়ে উঠলেন। জিগ্যেস করলেন—কি ব্যাপার খুলেই বল না। আমার ঠাকুরদা তখন বললেন—ও কিছু নয় হুজুর। শেয়ালগুলো রোজই বলে এত বড় রাজার আশ্রয়ে আমরা বাস করচি, কিন্তু শীতে মরে'গেলুম। রাজাসাহেব বললেন তখন, কি করলে ওদের শীত নিবারণ হবে? ঠাকুদা বললেন, কম্বল কিনে দিন। অন্তত হাজার পাঁচেক কম্বল লাগবে। 'বেশ কিনে দাও কম্বল'—তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়ে দিলেন রাজসাহেব তাঁর ম্যানেজারকে। ম্যানেজার আর ঠাকুর্দা কম্বলের দামটা ভাগাভাগি করে' নিয়ে নিলেন। শুনেছি, আমি এখন যে বাড়িটাতে থাকি সে বাড়িটা ওই টাকায় কেনা হয়েছিল। আবার যখন শেয়ালগুলো ডাকতে লাগল তখন রাজাবাহাদুর জিগ্যেস করলেন—কম্বল কিনে দেওয়ার পরও ওরা আবার ডাকছে' কেন? ঠাকুর্দা বললেন, ওরা আপনার জয়ধ্বনি করছে হুজুরের কম্বল পেয়ে। রাজাসাহেব খুব খুশী হলেন। এইসূত্রে আর একটা গল্পও মনে পড়ল, সেটাও শুনুন।, অগেকার বড়লোকেরা ব্যাংকে বা পোস্টাফিসে টাকা রাখতেন না, মাটির নীচে পুঁতে রাকতেন সব। ঠাকুর্দা একদিন রাজাসাহেবকে বললেন, হুজুর খবর পেলাম জিনাবাদের রাজার সমস্ত টাকায় ঘুণ ধরেছে। রাজাসাহেব শুনে চিন্তিত হয়ে বললেন, সর্বনাশ, আমারও যে অনেক টাকা পোঁতা আছে! সেগুলোকে কি করে' বাঁচা যায়। ঠাকুদা পরামর্শ দিলেন—রোদে দিন হুজুর। তাই হ'ল। অনেক টাকা ছিল রাজাসাহেব। মাটির তলা থেকে সেগুলো বার করে' ওজন করে' রোদে দেওয়া হ'ল টাকা। অত টাকা গুনবে কে। রোদ থেকে যখন সেগুলো তোলা হ'ল দেখা গেল কয়েক সের কম পড়েচে। ঠাকুর্দা রাজাসাহেবকে বোঝালেন—কম তো হবেই হুজুর, শুকতি বাদ যাবে না? রাজাসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন—ও হ্যাঁ, তাতো বটেই। আপনারা ভবছেন রাজাটা বোধহয় অত্যন্ত গাড়োল ছিল। ঠাকুদাও তাই ভাবতেন, কিন্তু রাজসাবের মৃত্যুকালে যা দেখা গেল তাতে থ হ'য়ে গেল ঠাকুরদা। রাজাসাহেব মৃত্যুশয্যায় ঠাকুর্দাকে ডেকে বললেন, 'দেখ সিংজি, আমার আয়ু শেষ হ'য়ে এসেচে। মরবার আগে তোমাদের একটা কথা বলে' যেতে চাই। আমাকে তোমরা যত বোকা মনে করতে করতে আমি তত বোকা ছিলাম না। শীতকালে শিয়ালরা যে জমিদারের কাছে কম্বল চায় না, অথবা কম্বল পেয়ে জয়ধ্বনি করে না এটা আমি বুঝতুম। টাকায় ঘুণ ধরে, টাকা রোদে দিলে সে ঘুণ চলে' যায়, শুক্তির জন্য টাকার ওজন কমে' যায় এসব আজগুবী কথা আমি কোনওদিনই বিশ্বাস করিনি। আমি বোকা সেজে থাকতুম তোমরা কিছু পাবে বলে। আমি যতদিন মালিক ছিলাম ততদিন তোমরা দু'হাতে টাকা লুটেছ আমি কোনও বাধা দিই নি, কারণ তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত তোমরা আমার যে খোশামোদ করতে যদিও তা অনেক সময় বেশ মোটা বলে' মনে হ'ত তা আমার কানে মধুবর্ষণ করত—এই সব কারণে তোমাদের আমি সহ্য করেছি এবং তোমরা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পার তার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আর তো আমি থাকব না, তাই তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি আমার সঙ্গে তোমরা যে সব চালাকি খেলতে চেষ্টা করেছ, আমার ছেলের সঙ্গে তা যেন কোর না, তাহলে মুশকিলে পড়ে যাবে। সে একালের ছেলে, ভিক্ষা দেওয়াকেও অন্যায় বলে মনে করে। অর্থশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেচে, কম কথা বলে, নেশা ভাং করে না, তার কাছে মোটা খোশামোদ বা মিথ্যে ভাঁওতা একদম চলবে না। আমার পরামর্শ, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আর এ দরবারে থেকো না। কারণ এখানে আর তোমরা

টিকতে পারবে না। তোমাদের বাড়ি জমিজায়গা সবই করে দিয়েছি তাই নিয়েই তোমার থাক গিয়ে।" এই কথা বলে' রাজ অযোধ্যানারায়ণ চক্ষু বুজলেন এবং তাঁর শ্রাদ্ধাদি হ'য়ে যাবার পর আমার ঠাকুরদাও চলে' এলেন সেখান থেকে। এখন সবই শেষ হ'য়ে গেছে। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। আমি জগদীশবাবুর পৌত্র এখন কবরেজি করবার ছুতোয় গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে' বেড়াই আর রাজা অযোধ্যানারাণের পৌত্র এম. এল. এ. হবার জন্যে গ্রামে গ্রামে ভোট ভিক্ষা করে'বেড়ান। দুজনেই ভিখারী হয়ে গেছি। কিন্তু ওই শিয়ালগুলোর কল্যাণে আমাদের যে বাড়িটা ঠাকুর্দা কিনেছিলেন সেটা এখনও আছে আর সেটা আছে বলেই মাথা গোঁজবার একটা জায়গা আছে আমার। শিয়ালগুলো রাত্রে ডাকলেই তাই আমার মনে হয় যে আমি ওদের কাছে ঋণী—"

নিখিলবাবু মুচকি হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

"কবিরাজ মশাই, আপনার ঝুলিতে এরকম আষাঢ়ে গল্প আর কত আছে।"

"তা কি আমিই জানি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে এক একটা। আপনি উঠছেন কেন?"

"মালিকদের একটু তত্ত্বাবধান করি গিয়ে। ওঁদের আজকের প্রোগ্রাম কি তা জানা নেই—"

গগনের শ্বশুর বলিলেন, "কুঠির ওদিকটায় যাঁরা আছেন তাঁরা কে বলুন তো—"

"তাঁরা এ অঞ্চলের জমিদার—"

"ওই যে মেয়েটি রয়েছে। তিনি কে?"

"তিনি জমিদারের মেয়ে। ওর স্বামীও জমিদার। ডাক্তারবাবুকে দেখতে এসছেন ওঁরা।"

"মেয়েটি খুব ভদ্র। নিজে এসে ভোরে আমাদের চা তৈরি করে' খাইয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে। মুচকি হেসে বললেন, আমি সম্পর্কে আপনাদের বেয়ান হই।"

কবিরাজ মহাশয় এ সংবাদে খুবই পুলকিত হইলেন।

"এ ধরনের শিয়ালও যেমন শহরে পাবেন না, এ ধরনের বেয়ানও তেমনি শহরে কম মিলবে। এখানে আমরা এখনও মধ্যযুগে বাস করছি।"

নিখিলবাবু চলিয়া গেলে গগনের শ্বশুর বলিলেন, "নিখিলবাবু আমদের খাওয়া দাওয়ার প্রচুর আয়োজন করেছিলেন, তার উপর বেয়ানও অনেক রকম রান্না করে পাঠিয়েছিলেন এখান থেকে। অত কি খাওয়া সম্ভব! বেয়ানকে একটু অনুরোধ করতে হবে অত খাবার আমাদের পাঠাবেন না। অপচয় করে' লাভ কি!"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—অনুরোধ করতে চান করুন, কিন্তু ফল হবে না। কারণ এ বাড়ির সবাই পদ্মা নদীর মতো, দুই কুল প্লাবিত না করতে পারলে এদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। হিসাবের বাঁধ দিয়ে এদের বাঁধতে পারবেন না। আপনার বেয়াই বিরুবাবুর পৈতের সময় এত মাছ হয়েছিল যে বেড়াল কুকুরেরও মাছে অরুচি হয়ে গিয়েছিল। বিশ মণ মাছ পুঁতিয়ে দিতে হয়েছিল.."

সূর্যসুন্দর সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল তাঁহার স্মৃতিপটে। বিরুর পৈতার সময় বৃদ্ধ যোগম্বর রায় নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। গাড়িতে আসেন নাই, হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে একজোড়া নূতন জুতা দেখিয়া সবাই অবাক হইয়া গিয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ জুতা পায়ে দিতেন না। খাইবার সময় তিনি আর কাহারও সহিত বসিতে চাহিলেন না। তাঁহাকে আলাদা জায়গায় খাবার দেওয়া

হইল। সূর্যসুন্দরের মনে তাঁহার পায়েস খাওয়ার ছবিটা আবার ফুটয়া উঠিল। প্রচুর লুচি তরকারি মাছ প্রভৃতি খাওয়ার পর তিনি প্রকাণ্ড এক পরাৎ পায়েস অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন—এখন বুড়ো হয়েছি, আর আগেকার মতে খেতে পারি না। খাওয়ার পর সূর্যসুন্দর বলিলেন, আপনাকে একটা গাড়ি করে দি, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। রায় মহাশয় প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—আরে না, না, গাড়ির দরকার কি। হেঁটে গেলে হজম হ'য়ে যাবে। মেদিনীপুরে মোয়ারদের বাড়িতে এক ছিলিম তামাক খাব, তারপর সন্ধে নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব। গাড়ির দরকার কি। কিন্তু দেখা গেল তিনি বাড়ির সামনে কিছুদূর গিয়াই বসিয়া পড়িয়াছেন। সূর্যসুন্দর তাড়াতাড়ি গেলেন সেখানে। গিয়া দেখিলেন তিনি নূতন জুতার ফিতাগুলি খুলিয়া ফেলিতেছেন। সূর্যসুন্দরকে দেখিয়া বলিলেন—নাতির উপনয়ন উপলক্ষে একজোড়া নতুন জুতো পরে এসেছিলাম। কিন্তু দেখেছি নতুন জুতো পরে ভাল চলতে পাচ্ছি না। জুতাজোড়া খুলিয়া তিনি গামছায় বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইলেন, তারপর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। ...সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া বিরুর উপনয়ন-উৎসবের স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রাজলক্ষ্মী এই উপলক্ষে বেগুনে রঙের বেনারসী শাড়িটা পরিয়াছিল। তখন বেনারসী শাড়ির পাছাপাড় থাকিত। শাড়িটা বেনারসের একজন নিপুণ কারিগর বিশেষ করিয়া রাজলক্ষ্মীর জন্যই নিজের হাতে করিয়া দিয়াছিল। শাড়ির উপর আসল জরির বড় বড় সোনালী ফুল ছিল। ফুলগুলা সূর্যসুন্দরের চোখের সামনে জ্বলিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল নিখিলবাবুকে। সে ভোজের ভারও নিখিলবাবু লইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অনেক কম ছিল। চমৎকার গোঁফ ছিল একজোড়া। নিখিলবাবুর স্ত্রী মাছ রান্না করিয়াছিলেন। মামাও আসিয়াছিলেন। সন্দেশ পরিবেশন করিয়াছিলেন নিজে হাতে। হাবুমামাও ছিল হঠাৎ মোহন ঝার কথা মনে পড়িল। মৈথিল ঠাকুর মোহন ঝা। ধপধপে ফরসা রং। বিড়ালের মতো কটা চোখ। গোঁফও লালচে। মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। স্নান করিয়া এক বিচিত্রকৌশলে দুই হাত দিয়া যখন টিকির জল ঝাড়িত তখন পত্ পত্ পত্ পত্ করিয়া শব্দ হইত একটা। ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ কৌতুকের ব্যাপার ছিল এটা। মোহন ঝার কথাই ভাবিতে লাগিলেন সূর্যসুন্দর। মনে পড়িল তাঁহার চাকুরি জীবনে কিছুদিনের জন্য তিনি পূর্ণিয়াতেই বদলী হইয়াছিলেন। সেখানে অল্পদিনের জন্য গিয়াছিলেন বলিয়া রাজলক্ষ্মীদের লইয়া যান নাই। আমেদেবাদ কুঠির নায়েব চৌবেজি মোহন ঝাকে পাচকরূপে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, দেহাতি লোক, ভাল রাঁধিতে পারিবে না, কোনরূপে চাল ডাল সিদ্ধ করিয়া দিবে, দুই একটা ভাজাভুজিও বানাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু লোকটি সরল, চোর ছ্যাঁচড় নয়। মোহন ঝা সত্যই খুব সরল লোক ছিল। শহরে গিয়া অবাক হইয়া গেল সে। আগে সে কখনও পাকা বাড়ি দেখে নাই। সূর্যসুন্দরের পাকা কোয়ার্টারটার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ কি রকম বাড়ি! খড় নাই, বাঁশ নাই, খাপরা নাই, সমস্তই বিলাতী মাটি দিয়া বানানো, অদ্ভুত কাণ্ড তো। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উর্ধ্বমুখে ছাদের দিক চাহিয়া রহিল। হাবুমামারও সঙ্গে ছিল। হাবুমামার দিকে ফিরিয়া ঝা বলিল—এ তো আজব কিসমের বাড়ি দেখছি বাবু। বর্ষাকালে জল আটাকায়? হাবুমামা উত্তর দিয়াছিল—এ বাড়িতে কখনও জল পড়ে না। একবার এরকম বাড়ি করিয়া ফেলিতে পারিলে—বাস, নিশ্চিন্ত! দ্বিতীয়বার আর ছাওয়াইবার দরকার হয় না। সত্যি? ভারি তাজ্জবের ব্যাপার তো! মোহন ঝার শতজীর্ণ খড়ের বাড়ি ছিল। সম্ভবতঃ সেই

চিত্রটাই তাঁহার মেনে জাগিয়াছিল তখন। সেদিন আর এক কাণ্ডও হইয়াছিল—মোহন ঝা ভাতে ধরাইয়া ফেলিয়াছিল, তরকারিতে নুন দিতে ভুলিয়াছিল, ডালটা ভাল সিদ্ধ করে নাই, আলুর ভাজিগুলি কয়লার টুকরা বলিয়া মনে হইতেছিল। পরদিন এক সাহেব ও মেমসাহেব রোগী সূর্যসুন্দরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজেদের রোগবিষয়ে নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। মোহন ঝা ইতিপূর্বে সাহেব মেমও দেখে নাই। সে রান্নাঘর হইতে সন্তর্পণে বাহির হইয়া অদ্ভুত পোশাকপরা প্রাণী দুইটিকে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সাহেব মেম যখন চলিয়া গেলেন তখন মোহন ঝা হাবুমামাকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—উহারা কে। হাবুমামা বলিয়াছিল, উহারা সাহেব মেম। মোহন ঝা সাহেব মেম দেখে নাই বটে, কিন্তু সাহেব মেমের নাম শুনিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে একটা আতঙ্কও ছিল তাহার। নীলকুঠির এক সাহেব নাকি তাহার ঠাকুরদাকে ঠেঙাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। মোহন ঝা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—সাহেব মেম? কেন আসিয়াছিল উহারা? হাবুমামা বলিল, তোমারই খোঁজে। শহরে তোমার রান্নার খ্যাতি এমন রটিয়া গিয়াছে যে ওই সাহেব তোমাকে বাবুর্চী হিসাবে বাহাল করিতে ইচ্ছুক হইয়াচে। খাওয়া পরা ছাড়া বেতন পঁচিশ টাকা দিবে। মোহন ঝা বিশ্বাস করিল কথাটা। সরলভাবে বলিল, বেশ তো ডাক্তারবাবুর যদি আপত্তি না থাকে আমি সাহেবের নিকট চাকরি করিতে পারি। হাবুমামা হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল—ডাক্তারবাবুর কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সাহেবদের ওখানে চাকরি করিতে হইলে তোমাকে টিকি কাটিয়া ফেলিতে হইবে, হলদে কাপড় পরা চলিবে না, পরিতে হইবে প্যাণ্টালুন আর বুট জুতা। খইনি খাওযাও চলিবে না, তাহার বদলে চুরুট খাইতে পার। আর মাঝে মাঝে শিস দিতে হইবে। এমনি করিয়া—। হাবুমামা শিস দিয়া দেখাইয়া দিল। সূর্যসুন্দর পাশের ঘর হইতে সমস্ত দৃশ্যটা উপভোগ করিতেছিলেন। এতদিন পরে সেই ছবিটা তাঁহার মনে আবার ফুটিয়া উঠিল যেন। মোহন ঝার পরবর্তী ইতিহাসও মনে পড়িল তাঁহার। মোহন ঝা শহর হইতে আর ফেরে নাই। পূর্ণিয়া হইতে সে এক বাবুর সহিত কলিকাতা চলিয়া যায়। বাবু গভর্নমেণ্টের চাকুরি করিতেন। তিনি মোহন ঝাকে নিজের আপিসে চাপরাসীরূপে বাহাল করিয়া লইয়াছিলেন, বাড়িতে রাঁধিবার জন্য আলাদা বেতনও দিতেন। বেশী টাকার লোভে মোহন ঝা বলিকাতায় চলিয়া যায়। বছর তিনেক পরে মোহন ঝা যখন সূর্যসুন্দরের কাছে ফিরিয়া আসিল তখন সূর্যসুন্দর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। রূপের সে জুলুস ছিল না। জরাজীর্ণ চেহারা, কোটরগত চক্ষু, মাথায় টিকি নাই দশ-আনা-ছ'-আনা চুল, গালের হাড় দুইটা উঁচু, ক্রমাগত কাসিতেছে। মোহন ঝার যক্ষ্মা হইয়াছিল। বেশী দিন বাঁচে নাই।...সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া সেকালের ছবি দেখিতেছিলেন। বর্তমান তাঁহার নিকট অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কবিরাজ মহাশয়ের উচ্চহাস্যে তাহার স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। কবিরাজ মহাশয় বাহিরের বারান্দায় কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। উর্মিলা মাথার শিয়রেই বসিয়া ছিল।

"বৌমা, বাইরের বারান্দায় আর কে আছেন?"

"গগনের শ্বশুর।"

"বেয়ান কোথা?"

"তিনি ভিতরে গেছেন। আপনার ফলের রস খাওয়ার সময় হ'য়ে গেছে, যাই দিদির কাছ থেকে আপনার ফলের রসটা নিয়ে আসি।"

ঊর্মিলা চলিয়া গেল। ফলের রস খাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি মানা করিলেন না, জানেন মানা করিলে ইহারা শুনিবে না এবং বেশী জেদ করিলে সকলে হইচই করিয়া উঠিবে। অশান্তির সৃষ্টি হইবে একটা। তাই তিনি আজকাল নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়াছেন। ইহাদের ইচ্ছার স্রোতেই ভাসাইয়া দিয়াছেন নিজেকে। হঠাৎ তাঁহার কানে গেল কবিরাজ মহাশয় গগনের শ্বশুরকে বলিতেছেন—"আজ অবশ্য খাব না, কিন্তু ঘন গাঢ় দুধই আমি পছন্দ করি। কারণ এখনও ওটা পাওয়া যায়।"

"তার মানে?"

"মানে সব চেয়ে উপাদেয় হ'চ্ছে ঘন গাঢ় প্রেম। কিন্তু তা তো দুর্লভ। গাঢ় প্রেমের স্বাদ আমি গাঢ় দুধ দিয়ে মেটাই—যদিও হজমের গড়বড় হয় মাঝে মাঝে—"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন কবিরাজ মহাশয়। কবিরাজ মহাশয়ের মানসিক তারুণ্য এখনও অম্লান আছে একথা মনে হওয়া মাত্র সূর্যসুন্দর ইহাও অনুভব করিলেন তাঁহার মনের নবীনতাও বোধহয় লুপ্ত হয় নাই। হইলে প্রেমের কথায় তাঁহর রাগ হইত। কিন্তু তাহা তো হইতেছে না, কথাটা শুনিয়া ভালেই লাগল বরং। কবিরাজ মহাশয়কে তিনি বলিতে চাহিলেন যে গাঢ় দুধ যখন হজম হইতেছে না, তখন গাঢ় প্রেমেরই সন্ধান করুন, গাঢ় প্রেম একেবারে দুর্লভ নয়। আমার জীবনে আমি অনুভব করিয়াছি—কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল, পুরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন, মাথায় ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কই' বেয়াইকে তো এখানে দেখছি না।"

"তোমার বেয়াই বাইরে বারান্দায় বসে' গল্প করছেন কবরেজ মশায়ের সঙ্গে।"

বাহিরে গিয়া ডাকাটা সমীচীন হইবে কি না ভাবিয়া পুরসুন্দরী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গঙ্গা আসিয়া প্রবেশ করাতে সমস্যাটার সমাধান হইয়া গেল।

"গগনের শ্বশুরকে ডেকে দাও তো। বল, মা ভিতরে ডাকছেন।"

খবর পাইয়াই ভিতরে আসিলেন তিনি।

"চলুন, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে—"

"চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম।"

"চা, দুবার খেলে দোষ কি। আসুন—"

গগনের শ্বশুর আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, পুরসুন্দরীর পিছুপিছু অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ও ভিতরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"বৌমা, আজ আমাকে একটু বার্লি দেবেন শুধু নেবু দিয়ে। এবেলা আর কিছু খাব না।"

পুরসুন্দরী মাথা ঈষৎ কাৎ করিয়া জানাইলেন, "তাই দেব। ঊর্মিলা বলেছে আমাকে—।"

গগনের শ্বশুরকে লইয়া পুরসুন্দরী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কবিরাজ মহাশয় হাসিমুখে বলিলেন, "কাচপোকা যেমন আরশোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায় বড়বউমা বেয়াইকে ঠিক তেমনি যেন টেনে নিয়ে গেলেন। একটু আগেই উনি বলেছিলেন আজ আর জলস্পর্শ করব না। কিন্তু বৌমা ডাকা মাত্রই সুট সুট করে' চলে' গেলেন দেখলেন?"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"ওটা হল শিভ্যলরি। আজকালকার ইংরেজীনবীশ লোকরা স্ত্রীলোকদের খুব খাতির করেন।"

"খাতির করুক আপত্তি নেই, কিন্তু বেশী খেয়ে শেষকালে অসুখে না পড়ে যায়।"

কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গা অকারণে আসে নাই। সে সূর্যসুন্দরকে বলিল—"কাজিগ্রামের ধনপতিয়ার ছেলে এসেছে। সে আপনাকে আজ ভালুক নাচ দেখাতে চায়। ওদিকের জানলাটা খুলে দিলে আপনি শুয়ে শুয়েই দেখতে পাবেন।"

"ধনপতিয়ার ছেলে তো পালিয়ে গিয়েছিল"

"হ্যাঁ। সে এক মাদারির সঙ্গে ছিল এতদিন। ফিরেছে কাল। তার মা তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার মা-ও আসবে একটু পরে।"

যাহারা বাজি দেখায় তাহাদের এদেশের লোক মাদারি বলে। ইংরেজী ভাষায় ইহাদের 'ম্যাজিশিয়ান' বলা চলে। এক একজন মাদারির অলৌকিক সম্মোহনী শক্তি থাকে। যে মাদারি ধনপতিয়ার ছেলে তুনকাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সূর্যসুন্দর দেখিয়াছিলেন তাহার চেহারাটা মনে পড়িল। কুচকুচে কালো রং বড় বড় চোখ। অদ্ভুত সে চোখের দৃষ্টি, যেদিবে চাহিয়া থাকিত সেদিক হইতে সহজে চোখ ফিরাইত না। মনে হইত তাহার দৃষ্টি যেন সেখানে গাঁথিয়া গিয়াছে। চোখের শাদা অংশটা একটু বেশী ছিল, কুচকুচে কালো রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার আরও বেশী শাদা মনে হইত। তাহা ছাড়া ছিল একমাথা কাল বাবরি চুল এবং একজোড়া প্রকাণ্ড জুলফি। শুধু কালো নয়, তৈল-চিক্কণ। গায়ে একটা কালো রঙের আলখাল্লা, গলায় নানারকমের স্ফটিকের মালা, কানে দুইটি বড় বড় পিতলের কুণ্ডল, সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো চেহারা ছিল তাহার। এখানে যখন হাটের উপর সে প্রকাণ্ড একটা ভালুক লইয়া আসিয়াছিল তখন চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল কাজিগ্রামের ধনপতিয়া। হীরু দোসাদের মেয়ে। তুনকার জন্মের তিন চার বছর পরে তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। তুনকার শৈশবে নানারকম অসুখ হইয়াছিল, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, পেটের অসুখ, এমন কি ডিপ্থিরিয়া পর্যন্ত। সূর্যসুন্দরের চিকিৎসাতেই জীবনরক্ষা হয় তাহার। সূর্যসুন্দর তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নিজের পয়সা খরচ করিয়া ডিপ্থিরিয়া অ্যান্টিটক্সিনও কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার বয়স যখন দশ বছর তখন তুনকা সূর্যসুন্দরের বাড়িতে 'চরবড়হা' (রাখাল) রূপে বাহাল হইল। ধনপতিয়ার নিদারুণ দারিদ্রের জন্যই সূর্যসুন্দর তাহার ছেলেকে বাহাল করিয়াছিলেন। বেতন অবশ্য তেমন বেশী দিতে হইত না, মাসে মাত্র আট আনা, কিন্তু সিধা দিতেন। রোজ এক সের করিয়া গম, মকাই বা বুট—যখন যেটা সুবিধা হইত। ধনপতিয়া কাজ করিতে পারিত না, কারণ তাহার হাঁপানি ছিল। সূর্যসুন্দরই তাহাকে কাজ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। সে মাঠে বসিয়া ফসল পাহার দিত। এজন্য সে কোন বেতন লইতে চাহিত না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে পুরাতন শাড়ি, জামা, র‍্যাপার প্রভৃতি দিতেন মাঝে মাঝে মাদারি হাটের উপর যখন ভালুক লইয়া জনারণ্যের মাঝখানে মূর্তিমান বিস্ময়ের মতো আবির্ভূত হইল তখন ধনপতিয়া ক্ষেপিয়া গেল। তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল যে তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী রামদাসই মাদারি-বেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। যদিও বাবরি চুল এবং জুলফি রাখিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে, কিন্তু ধনপতিয়ার চোখে

ধুলা দেওয়া শক্ত। একদিন মাদারি যখন হাটের উপর ভালুক নাচাইতেছিল তখন ধনপতিয়া পাগলিনীর মতো তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—তোমাকে ভালুক নাচাইতে হইবে না, তুমি ঘরে এস। আমি তোমার বিবাহিত বউ, তুনকা তোমার ছেলে, ডাক্তারবাবু এতদিন আমাদের অন্নসংস্থান করিয়াছেন, তুমি যদি এখানে থাক তোমারও করিবেন। ডাক্তারবাবুর অনেক জমি, তোমার কাজের ভাবনা হইবে না। মাদারি জনতার দিকে চাহিয়া বলিল—তোমরা এই বাউরা মৌগীকে (পাগলী মাগীকে) এখান হইতে হটাইয়া দাও। আমি কামরূপ মুলুকের লোক, কামাখ্যাদেবীর চেলা, আমি কোথাও বিবাহ করি নাই। ধনপতিয়া কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ওই আমার স্বামী। মিথ্যা ছলনা করিতেছে। উন্মত্তা হইয়া সে একদিন মাদারির কেশাকর্ষণও করিয়াছিল। তাহার পরদিনই মাদারি চলিয়া গেল, দেখা গেল তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুনকাও চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে সেই তুনকার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে সূর্যসুন্দর বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

"সত্যি সে ভালুক এনেছে?"

"প্রকাণ্ড ভালু। জানলাটা খুলে দিলেই দেখতে পাবেন। খুলে দেব?"

"সে তো দিতেই হবে। ওদিকের বারান্দায় তাহলে বসবার জায়গা করে' দাও, বাড়ির ছেলেমেয়েরাও দেখবে তো।"

সকালবেলা কাজের সময় ভালুক আনাতে গঙ্গা তুনকার উপর মনে মনে চটিয়াছিল। অনর্থক এ কি ঝামেলা! সূর্যসুন্দরের উৎসাহ দেখিয়া সে আরও বিপন্ন বোধ করিল। ওদিকের বড় বারান্দা পরিষ্কার করাইয়া সেখানে বাড়ির এতগুলি লোকের বসিবার ব্যবস্থা করা কি সোজা কথা! কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। গঙ্গা বাহিরে গিয়া দেখিল চাকরেরা সব মাঠে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ির চাকরদের ফরমাশ করিলে বড়বৌমা রাগিয়া আগুন হইয়া যাইবে। অতবড় বারান্দাটা ঝাড়ু দিয়া তাহার পর শতরঞ্জি মাদুর চেয়ার পাতা কি সোজা কথা। হঠাৎ গঙ্গার নজরে পড়িল বাগানের দিক হইতে পার্বতী আসিতেছে। তাহার হাতে কলাপাতায় মোড়া কিছু ফুল।

"পারু দিদি কোথায় যাচ্ছ? হাতে ও কি?"

"ছোটদাদু পূজো করবেন, তাঁর জন্যে ফুল তুলতে এসেছিলাম।"

"ভালুক নাচ দেখবে?"

"কোথায় ভালুক নাচ হ'চ্ছে?"

"এইখানে এখুনি হবে। ওদিকের বারান্দায় তোমরা গিয়ে গুছিয়ে বস। আমি ডেকে নিয়ে আসছি ভালুকওলাকে।"

পার্বতী বোকা মেয়ে নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বসব মানে?"

"বারান্দাটা পরিষ্কার করে' শতরঞ্জি মাদুর চেয়ার এইসব পাততে হবে তো।"

"সে কি আমি পাতব? চাকররা কোথা?"

"সব মাঠে গেছে। চল না আমরা দুজনে মিলে—"

"'আমার এখন সময় নেই ছোটদাদুর পুজোর যোগাড় না করে' দিয়ে কিছু করতে পারব না। আমি স্বাতীকে খবর দিয়ে দিচ্ছি, সে মহা হুজুগে, এখনই সব করে' ফেলবে—"

পার্বতী চলিয়া গেল। গঙ্গা কিন্তু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্বাতীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে,

সঙ্গে জমাইবাবু আছেন তাহাকে দিয়া এসব কাজ করানো কি শোভন হইবে? তাহকে বলিলেই সে লাফাইয়া চলিয়া আসিবে তাহা গঙ্গা জানে, কিন্তু জামাইবাবু সঙ্গে আছেন, সেটা কি উচিত? কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। গঙ্গা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল ধনপতিয়া আসিতেছে। আর তাহার কিছু পিছু আসিতেছে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের চুমানা করা স্বামী কেশোলাল। ধনপতিয়া দীর্ঘকাল তাহার স্বামী পুত্রের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার আশা ছিল তুনকা অন্ততঃ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু অনেক দিন কাটিয়া যাইবার পরও কেহ যখন আসিল তখন সে বাধ্য হইয়া কেশোলালকে চুমানা করিয়াছে একা আর কতদিন থাকিবে। কেশোলাল একটা কমবয়সী ছোঁড়া মাত্র, তাহাকে ধনপতিয়ার ছেলে বলিয়া মনে হয়। তাহার মুখভাবে কিশোর বালকের রূপ পরিস্ফুট। ধনপতিয়াকেও দেখিয়া মনে হয় না যে তাহার খুব বেশী বয়স হইয়াছে। তাহার আসল বয়স বত্রিশ বছর, কিন্তু দেখিয়া মনে হয় কুড়ি পঁচিশ। সে এককালে রূপসী ছিল, তাহাকে দেখিয়া থানার এক জাঁদরেল হাবিলদার সাহেব বহুপূর্বে নাকি প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন, ধনপতিয়ার সে রূপ এখনও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ওই রূপের শিখাতেই বয়ঃকনিষ্ঠ কেশোলাল তাহার পাখা দুইটি পুড়াইয়াছে। ধনপতিয়াকে দেখিয়া গঙ্গা নিশ্চিন্ত হইল।

"ধনপতিয়া, বাড়ির সবাই ভালুক নাচ দেখবে, তুই পশ্চিমদিকের বারান্দাটা পরিষ্কার করে' দে তো।"

ধনপতিয়া কেশোলালকে দেখাইয়া বলিল—"ওকে ঝাড়ু দাও, ওই সব ঠিক করে' দেবে। আমি বাবুর সঙ্গে আগে কথা বলব একটু। বাবু জেগে আছেন, না ঘুমুচ্ছেন?"

"জেগে আছেন—"

ধনপতিয়া সূর্যসুন্দরের শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। ধনপতিয়া সূর্যসুন্দরের কাছে বসিয়া বকবক করিবে ইহা গঙ্গার ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু কি করিবে, ধনপতিয়াকে রুখিবার সাধ্য তাহার নাই। কিছু বলিলে এখনি হয়ত চেঁচামেচি করিয়া একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। কেশোলালের দিক চাহিয়া গঙ্গা বলিল—"পশ্চিমদিকের বরান্দাটা পরিষ্কার করে' ওখানে বসবার জন্য শতরঞ্জ কম্বল চেয়ার পেতে দিতে হবে। পারবি তো?"

"হাঁ, জরুর।"

অনুগত ভৃত্যের মতো কেশোলাল গঙ্গার অনুসরণ করিল।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধনপতিয়া দেখিল সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। মাথার শিয়রে উর্মিলা বসিয়া একটা বই পড়িতেছে।

ধনপতিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌমা, বাবু কি ঘুমুচ্ছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেলে।

"কে, ধনপতিয়া?. তোরা ছেলে তো ফিরে এসেছে শুনলাম। সে-ও ভালুক নাচাচ্ছে গঙ্গা বলছিল—"

"হ্যাঁ, ওর বাপই ওকে সব শিখিয়েছে। ভালুকও সেই দিয়েছে—"

"সেই ভালুকওলাই ওর বাপ?"

"তাতে সন্দেহ নেই।"

"সে কোথা?"

"সে তুনকাকে শিখিয়ে পড়িয়ে একটা ভালুক এনে দিয়ে আবার সরে' পড়েছে। তুনকা বললে আসামের জঙ্গলে আবার ভালুকের বাচ্চা ধরতে গেছে সে। ভালুকের বাচ্চা ধরে'বিক্রি করাও তার একট রোজকার নাকি।"

সূর্যসুন্দর মানসচক্ষে বালিকা ধনপতিয়াকে দেখিতে লাগিলেন যে রাজলক্ষ্মীর নিকট অসিয়া মুড়ির মোয়া খাইত।

ধনপতিয়া বলিল, "আমি এখন কি করব তা বলে' দিন—তুনকা বলেছে চলে' যাব। বলেছে সৎ-বাপের সঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না"

"কেশোলাল কি বলে।"

"ওর কিছুতেই আপত্তি নেই। বলছে—হলে বা কাঠ-ব্যাটা—তোমার যদি সুখ হয় অমি ওর সঙ্গেই থাকব। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু তুনকাই থাকতে চাইচে না। আপনি যদি ওকে বলেন ও থাকবে। ও আমাদের এখনি ভালুক নাচ দেখাবে, তারপর আপনি ওকে ডেকে বলে দিন তুমি তোমার মাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

"তুই আবার বিয়ে করেছিস, ও যদি তোমার কাছে না থাকতে চায়, কারো কিছু বলবার নেই। ও এখন তো আর ছেলেমানুষ নেই।"

"ছেলেমানুষই আছে বাবু, দেখতে বড়সড় হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও এখনও খুব ছেলেমানুষ। তা না হ'লে নিজের মাকে ছেড়ে চলে' যেতে চায়! আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি—আমি তোর জন্যে এতদিন পথ চেয়ে বসে' ছিলাম—এতদিন অপেক্ষা করে' তবে বিয়ে করেছি—ছেলেমানুষ বলেই বুঝতে চাইছে না, আপনি একটু ধমকে দিলে ঠিক বুঝবে। আপনাকে ছাড়া ও আর কাউকে ভক্তি করে না, ওর বিশ্বাস আপনি বেঠিক কথা বলবেন না—আপনি বললেই ও আপনার কথা মেনে নেবে।"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সেইজন্যেই তো কিছু বলা মুশকিল। এসব ব্যাপারে জোর করলে কোনও লাভ হয় না"।

হঠাৎ ধনপতিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সূর্যসুন্দরের মনে হইল পুতুল হারাইয়া ফেলিয়া একটা ছোট মেয়ে যেন কাঁদিতেছে। আবার তাঁহার মানসপটে বালিকা ধনপতিয়ার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল—রাজলক্ষ্মীর নিকট হইতে মুড়ির মোয়া পাইয়া লোভীর মতো একটু একটু করিয়া খাইতেছে। তাহার বাবা বধুকেও মনে পড়িল। সে শীতাকলে ভোরে অসিয়া খেজুররস খাওয়াইত সকলকে। ধনপতিয়ার কান্না কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু হঠৎ সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে একটা পালকী আসিয়া থামিয়াছিল। পালকি হইতে সোমা নামিয়া আসিল। আসিয়া সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন কাকাবাবু?"

"ভালই।"

"গগনের শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। খুবই ভাল লাগল।"

"তুমি ওদের চা করে' খাইয়েছ নাকি।"

সোমার মুখে একট সলজ্জ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"বেয়াই বেয়ান তো, সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার"—তাহার পর হঠাৎ সে যেন উর্মিলাকে আবিষ্কার করিল।

"ছোট বউদি না?"

উর্মিলা মৃদু হাসিল শুধু। সূর্যসুন্দর বলিলেন, "হ্যাঁ, তুই একে দেখিস নি। কুমারের বিয়ের সময় তুই জেলে ছিলি।"

গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে সোমা জেল খাটিয়াছিল। তাহার চোখে মুখে সর্বদা যে বালকসুলভ উৎসাহ ও পবিত্র সততার দীপ্তি আভাসিত হয় তাহা অন্যের চোখে মুখে সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে তাঁহার যে মুখভাব আমরা দেখি এ যেন অনেকটা সেই ধরনের মুখভাব।

উর্মিলার দিকে চাহিয়া সোমা বলিল, "আমি কুমারদার চেয়ে মাত্র একমাসের ছোট। তুমি সম্পর্কে আমার চেয়ে বড় কিন্তু মনে রেখ আমি তোমার স্বামীর বয়সী।"

দুষ্টু ছেলের মতো সে হাসিতে লাগিল।

"বাড়িতে অনেক সব নতুন লোক এসেচে আলাপ করে' আসি।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে ডুগডুগ করিয়া ভালুক নাচের বাজনা বাজিল।

"ও কি"—সোমা ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

"কাজিগাঁয়ের তুনকা পালিয়ে গিয়েছিল। শুনছি সে ভালুক নাচাতে শিখে ফিরে এসেছে। আমাদের দেখাবে আজ তার কৃতিত্বটা। ওদিকে বারান্দায় বসে' তোমরা দেখ—"

সোমা মুচকি হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গঙ্গা আসিয়া সূর্যসুন্দরের চোখেব সমানে যে বড় জানালাটা ছিল সেটা খুলিয়া দিল। দেখা গেল তুনকা আসিয়া সামনের মাঠে দাঁড়াইয়া ডুগডুগি বাজাইতেছে আর সেই বাজনার তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতেছে প্রকাণ্ড একটা ভালুক। সূর্যসুন্দর লক্ষ্য করিলেন তুনকার চেহারাও অনেকটা তাহার বাবার চেহারার মতো হইয়াছে। তাহার মাথাতেও বাবরি চুল। চুল তেমনি তৈল-চিক্কণ। তাহার ভালুক নাচাইবার নিপুণতা দেখিয়াও সূর্যসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। চোখ ঘুরাইয়া ভালুককে যাহা আদেশ করিতেছে ওই প্রকাণ্ড হিংস্র জানোয়ারটা তাহাই করিতেছে। তুনকার চোখও অনেকটা তাহার বাবার চোখের মতো। বেশ বড় বড় এবং চোখের শাদা অংশটা বেশী। যে তুনকা গরু চরাইত, যে ভয়ে তাহাদের জংলী গাইটার কাছে ভিড়িত না, সেই এখন অনায়াসে ভালুক নাচাইতেছে! ভালুক তাহার কথায় উঠিতেছে, বসিতেছে, জ্বরে কাঁপিতেছে, থাবা তুলিয়া সেলাম করিতেছে, সে একটা লাঠি ঘাড়ে রাখিয়া তাহার উপর ছোট বাঁখারি ঘষিয়া বেহালা বাজাইতে লাগিল আর তুনকার গলা দিয়া বাহির হইতে লাগিল বেহালার সুর। তাহার পর সে লাঠিটার উপর একটা পুঁটুলি ঝুলাইয়া শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিল। তাহার চলিবার ভঙ্গী এবং মুখভাব দেখিয়া মনে হইল সে যেন ভালুক নয়, বিদূষক। একটু পরে তুনকা হাঁকিয়া বলিল—ভালুক এবার ঘোড়া হবে। কে ওর পিঠে চড়তে চাও চলে' এস। উষার ছেলে তিনটি—এমনি খুব দুষ্ট যদিও, কিন্তু তাহারা কেহ সাহস করিয়া ভালুকের কাছে যাইতেই পারিল না, পিঠে চড়া দূরে থাক। কিন্তু উষার মনে একটি কুসংস্কার বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ভালুকের পিঠে ছেলে চড়াইলে সে ছেলে নাকি খুব বলবান এবং শত্রুজিৎ হয়। কিন্তু নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া সে ছেলেদের ভালুকের কাছে লইয়া যাইতে পারিল না তাহার মনে হইল এ সুযোগ হারাইলে আর পাওয়া যাইবে না। কি করা যায় তাহাও তাহার

মাথায় আসিতেছিল না, এমন সময় স্বাতী এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে গাছ-কোমর বাঁধিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—"আমি চড়ব। তুনকা নিয়ে আয় ভালুকটাকে এদিকে।"

তুনকা ভালুটাকে বলিল—"ঝমরু, মাইজিকে সেলাম কর।"

ঝমরু সেলাম করিল। তাহার পর স্বাতী মুচকি হাসিতে হাসিতে তাহার পিঠের উপর গিয়া চড়িয়া বসিল। আনন্দে হততালি দিয়া উঠিল সকলে। স্বাতী বেশ নির্ভয়ে ভালুকের পিঠের উপর বসিয়া রহিল। ভালুক তাহাকে পিঠে করিয়া চারিদিকে 'চক্কর' দিতে লাগিল। এদিকের বারান্দায় পুরুষরা বসিয়াছিল। ভালুক সেদিকে আসিতে কবিরাজমহাশয় স্বাতীকে কড়জোড়ে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"এতদিন জানতাম শক্তি সিংহবাহিনী, আজ তাঁর ভাল্লুকবাহিনী মূর্তি দেখে কৃতার্থ হলাম।" ইহারা উত্তরে স্বাতী নাক মুখ কুঁচকাইয়া তাহাকে একটু ভেংচাইয়া দিল। স্বাতীকে নির্ভয়ে ভালুকের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া এক দুই তিনেরও ভয় ভাঙিল। তুনকা একে একে তাহাদেরও ভালুকের পিঠে চড়াইতে লাগিল।

সূর্যসুন্দর পুনরায় দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তুনকার ভালুক ঝমরু তাঁহাকেও অনেক দূর লইয়া গিয়াছিল। সেখানে ঝমরু অর ঝমরু ছিল না, মটরু হইয়া গিয়াছিল। দারোগা চন্দ্রভান সিংয়ের কাশ্মীরি ভেড়া মটরু। বদলী হইয়া যাইবার সময় উশনাকে তিনি ভেড়াটি উপহার দিয়া গিয়ছিলেন। চমৎকার ভেড়া, গাভরা শাদা লোম, লোম মাটিতে লুটাইয়া পড়িত। সকলেই তাহার পিঠে চড়িত। এমন কি মধুয়া চাকরটা পযর্ন্ত। তাহার পিঠে চড়িয়া তাহা গলাটা দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিতে হইত, না ধরিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভবনা ছিল। পিঠে চড়িলেই ঘোড়া মতো ছুটিত সেটা। বোনু মিস্ত্রী কোরোসিন কাঠের বাক্স দিয়া একটি গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল উশনাকে। ভেড়াটা সেই গাড়ি টানিত। ভেড়ার শিং দুইটাতে রঙীন দড়ি দিয়া লাগামও করিয়া দিয়ছিল বোনু। প্রকৃত শিল্পী ছিল সে, খুটুর খুটুর করিয়া ধীরে ধীরে কাজ করিত, কিন্তু যে কাজটি করিত তাহা নিখুঁত। তাহার কানে একটা ছোট আব ছিল। সূর্যসুন্দর সেটা কটিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে আপত্তি করিয়া বলিল—কাটিয়া দিলে সকলে তাহাকে কানকাটা বলিবে। যেমন আছে থাক।

"সেলাম হুজুর—"

সূর্যসুন্দরের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। তিনি খোলা জানলাটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন সামনের মাঠটা ফাঁকা, তুনকা চলিয়া গিয়াছে। কেহ নাই, কোনও কলবরবও শোন যাইতেছে না। তিনি কি ঘুমাইয়া পড়িয়ছিলেন? পাছে তাঁহর ঘুম ভাঙিয়া যায় তাই কি সকলে চলিয়া গিয়াছে? যেঘুম কখনও ভাঙিবে না সেই ঘুম যখন তাঁহার চোখে নামিবে তখনও কি সকলে তাঁহাকে ফেলয়া চলিয়া যাইবে? তাঁহার কেমন যেন একটু ভয় হইল।

"বউমা?"

"কি বলছেন বাবা—"

"এরা সবাই কোথা গেল? তুনকার ভালুকের খেলা হ'য়ে গেছে?"

"অনেকক্ষণ, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাবা। তাই ভিতরে গিয়ে বসেছে সবাই।"

গঙ্গা অসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি চিঠি।

"থানার নতুন দারোগাবাবু একট চিঠি পঠিয়েছেন হাবিলদার সাহেবের হাতে। হাবিলদার সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"সেলাম হুজুর"—বাহিরে হাবিলদার সাহেবের গম্ভীরা কণ্ঠ আবার শোনা গেল।

হাবিলদারসাহেব ভিতরে আসিয়া আর একবার মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। হাবিলদার রামনগিনা সিং ভক্ত লোক। প্রত্যহ সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ করেন। তিনি অসিয়া বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিলেন যে তিনি প্রত্যহ কুমারবাবুর নিকট হইতে সূর্যসুন্দরের খবর লইয়া যান। তাঁহার মতে সূর্যসুন্দরের এই অসুখ ইন্দ্রপাতের সহিত তুলনীয়। এ 'দিগরের' (অঞ্চলের) সমস্ত লোক—আপামর ভদ্র সকলেই তাঁহার এই অসুখে অনাথ হইয়া পড়িয়াছে তাঁহারই শুধু পক্ষাঘাত হয় নাই এ প্রদেশটারই পক্ষাঘাত হইয়া গিয়াছে। তবে সবই রামজীর ইচ্ছা, তাঁহার বিধান মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। সূর্যসুন্দর রামনগিনাকে চিনিতেন, জানিতেন একবার রামজী প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে রামনগিনা সহজে থামিতে পারিবেন না। ক্রমাগত তুলদীদাস আবৃত্তি করিয়া শ্রীরমচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে শেষে অশ্রুমোচন পর্যন্ত করিবেন।

সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা সাহেব কিসের চিঠি পাঠিয়েছেন—"

রামনগিনা বলিলেন, "আপনাদের 'দামাদ' (জামাই) সুব্রতবাবু, তাঁহার এলাকার কলেকটারসাহেবকে কি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু সেই পত্রের ফলে সেখানকার দারোগা এক কনেস্টবলের সঙ্গে সুপর্ণ সিংহ নামে এক বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমাদের থানায় আসিয়াছে। এই খবরটি দারোগাবাবু সুব্রতবাবুকে জানাইয়াছেন। যদি বলেন সুপর্ণবাবুকে এখানেই লইয়া অসিতে পারি।"

সূর্যসুন্দর সুপর্ণবাবুর কোনও খবর জানিতেন না। তিনি গঙ্গাকে বলিলেন—"হাবিলদার সাহেবকে সুব্রতর কাছে নিয়ে যাও।"

।। আঠাশ।।

ঠিক হইল সুব্রত আমবাগানে গিয়া সুপর্ণ সিংহের সহিত দেখা করিবে। সঙ্গে থাকিবে গগন আর কুমার। সুব্রত অনুকেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে যাইতে রাজী হইল না। গগনের শ্বশুর ও শাশুড়ীর নিকট হইতেও অনুর অনুরোধে ব্যাপারটা গোপন রাখা হইল। চম্পা এবং পার্বতী ছাড়া বাড়ির আর কেহ ব্যাপারটা জানিত না। সুপর্ণ সিংহ যে আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহারা কিন্তু পায় নাই। গগন তাহাদের নিকটও ব্যাপারটা আপাততঃ প্রকাশ করিতে চাহিল না। সুপর্ণবাবু যে আসিয়া পড়িবেন তাহা গগনও প্রত্যাশা করে নাই। তাহারই চেষ্টায় যে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে এ কথা সে যতই ভাবিতেছিল ততই অপরিসীম আত্মপ্রসাদে তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো আকাশে উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। বারবার তাহার মনে হইতেছিল এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করা গেল। দিগন্ত দাদার প্রফুল্ল মুখভাব এবং চোখের উদ্ভাসিত দৃষ্টি দেখিয়া আন্দাজ করিতেছিল দাদা একটা কিছু লইয়া মনে মনে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি তাহা সে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিল না। চশমার লেন্স দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া সে দাদার মুখের দিকে দুই একবার চাহিল মাত্র। কোনও প্রশ্ন করিল না। সে জানে দাদা যথাসময়ে তাহাকে সব বলিবে। সে

গঙ্গার ধারে টেবিল চেয়ার লইয়া গিয়া সেইখানেই বসিয়াই 'থীসিস' রচনা করিতেছিল। তাহাতেই পুনরায় মন দিল।

কুমার কয়েকখানা চেয়ার আগেই বাগানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। শুধু চেয়ার নয়, চায়ের সরঞ্জাম এবং কিছু বিস্কুটও। নার্সটিকে কেন্দ্র করিয়া যে ভিতরে ভিতরে এত সব কাণ্ড প্রকাণ্ড হইয়া আছে তাহা সে ঘুণাক্ষরেও জানিত না। গগনের নিকট সব শুনিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। প্রেমিকপ্রবর সুপর্ণ সিংহ যে এখানে আসিয়া থানায় বসিয়া আছেন এ খবরটাও ভারি মনোরম। একটা চাপা উত্তেজনা লইয়া বাগানে চেয়ার টেবিল সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল সে। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল বড় জামাইবাবু কৃষ্ণকান্তকেও দলে টানিতে। তিনি যদি তাঁহার রাইফেলটা লইয়া একটা চেয়ারে কেবল বসিয়া থাকিতেন তাহা হইলেও অনেক কাজ হইত। কিন্তু গগন সুব্রতকে না জানাইয়া কৃষ্ণকান্তকে কিছু বলাটা উচিত হইবে কিনা তাহা সে স্থির করিতে পারে নাই। তাহাদের যদি আপত্তি না থাকে কৃষ্ণকান্তকে সে সহজেই ডাকিয়া আনিতে পারিবে। তিনি পাশেই 'বাহি' নদীর ধারে রাইফেল লইয়া বসিয়া আছেন। কিছুদিন পূর্বে বাহি নদীতে একটা কুমীর ঢুকিয়াছে। অনেকের ছাগল বাছুর তাহার পেটে গিয়াছে। তাহাকেই খতম করিবার আশায় নদীর ধারে বসিয়া আছেন কৃষ্ণকান্ত। প্রয়োজন বুঝিলে কুমার তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে ডাকিয়া আনতে পারিবে। তিনি এখন একাগ্র হইয়া 'বাহি' নদীর জলে সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া আছেন, কখন কুমীরের নাকটি জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে এই আশায়।

কুমার দেখিতে পাইল গগন ও সুব্রত আসিতেছে। সুব্রত একেবারে 'ফুল' মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত। তাহার কোমরের বেল্ট্ হইতে একটা রিভলভারও দুলিতেছে। হাতে একটি পাতলা বেতের ছড়ি। গগন তাহাকে লইয়া বাগান দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু পরেই থানার দারোগা সাহেব, হাবিলদার সাহেব, দুইজন কনেস্টবল এবং তাহাদের পিছু পিছু সুপর্ণ সিংহ আসিয়া হাজির হইলেন। সুব্রতকে দেখিয়া দারোগা সাহেব, হাবিলদার সাহেব এবং কনেস্টবল দুইজন মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন করিতেই সুব্রত আগাইয়া গিয়া সুপর্ণ সিংহকে নমস্কার করিয়া বলল—"আপনি আমার চিঠি পেয়ে এসেছেন এতে খুবই আনন্দিত হলাম। বসুন। আচ্ছা চলুন, আগে আপনার সঙ্গে কথাটা সেরেই আসি, তারপর চা খাওয়া যাবে, দারোগা সাহেব আপলোক বৈঠিয়ে, ইন্‌সে প্রাইভেট মে থোড়া বাত করনা হ্যায়। ছোটকাকা, আসুন—"

সকলে বাহি নদীর দিকেই গেলেন।

কিছুদূর গিয়াই সুব্রত আসল কথাটি পাড়িল।

"মিস্টার সিনহা, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি অনুপমা বসু বলে কোনও মেয়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কখনও?"

মিস্টার সিনহা কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "ছিল। কেন বলুন তো?"

"আপনি কি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?"

"চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিজেই পিছিয়ে গেলেন। তাঁর বাবারও এতে মত ছিল না।"

"বাবুল কি আপনারই ছেলে?"

এ প্রশ্নের জন্যে সুপর্ণ সিংহ প্রস্তুত ছিলেন না। এ সব খবর ইঁহারা কি করিয়া টের পাইলেন তাঁহাও তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না। একটু ভয় পাইয়া গেলেন।

"এ সব খবর আপনারা কোথা থেকে পেলেন? তা ছাড়া, আমার নিতান্ত প্রাইভেট ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথাই বা ঘামাচ্ছেন কেন, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। এইজন্যেই কি আপনারা এখানে আমাকে টেনে এনেছেন?"

সুব্রত গম্ভীরভাবে বলিল "হ্যাঁ। মিস বোস এখানে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর কাছে আমরা সব কথা শুনেছি। তিনি আপনাকে বিয়ে করতে চাননি, নিজেই পিছিয়ে গেছেন, আপনার এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না, মাপ করবেন। তিনি আপনাকে সর্বদাই বিয়ে করতে চেয়েছেন, এখনও তাঁর আপত্তি নেই।"

"অনু এখানে এসেছে?"

"হ্যাঁ। এখনই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখাও হবে। এখনই তাঁকে এখানে আনতে পারতাম। কিন্তু এমনিই তিনি নানাভাবে অপমানিত হয়েছেন, তাঁকে নিয়ে টানাটানি করবার ইচ্ছে নেই আমাদের। I appeal to your sense of honour."

"অনু নানাভাবে অপমানিত হয়েছে? কে তাকে অপমান করেছে?"

গগন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার কথা কহিল।

বলিল, "আপনি। আপনি তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করে সরে পড়েছেন। এখন আপনাকেই এর প্রতিকার কবতে হবে।"

সুপর্ণ সিংহ গগনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

কুমার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "উনি যখন আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছেন তখন এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে। আমরা আশা করি, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।"

কাছেই দুম করিয়া একটা বন্দুকের অওয়াজ হইল।

সিংহ মহাশয় বিহ্বল দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, বন্দুকের আওয়াজে চমকাইয়া উঠিলেন। বন্দুকের আওয়াজটা যেন একট প্রচণ্ড ধমকের মত শুনাইল।

"আমাকে কি করতে হবে বলুন?"

সুব্রত বেতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "একটি মাত্র কাজই আছে যা করলে সব ব্যাপার মিটে যায়। মিস বোসের উপর অবিচার করে আপনি যে সাংঘাতিক ভুলটা করেছিলেন সেটা অবিলম্বে সংশোধন করে ফেলুন। অনায়াসেই পারেন সেটা।"

"আমি ঠিক বুঝতে পাছি না!"

"বিয়ে করে ফেলুন মিস বোসকে"—গগন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল।

"বেশ, ফিরে যাই। তারপর সে ব্যবস্থা করব।"

"আপনাকে যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি তখন আপনাকে ছেড়ে দেব না আমরা। বিয়ে করে তবে যাবেন"—গগনের কণ্ঠস্বরে এবার ভদ্রতার লেশমাত্র রহিল না।

"কোথায় বিয়ে হবে?"

কুমার শান্তকণ্ঠে বলিল—"এইখানে, এই বাগানে। আমরা সব ব্যবস্থা করব। আজ রাত্রেই বিয়ের একট লগ্ন আছে। কালও আছে। আপনি রাজী হোন। বাকি ব্যবস্থা আমি করব।"

মিস্টার সিংহ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। হাসিটা ঠোঁট হইতে যেন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।

"আপনারা সবাই শিক্ষিত লোক, আপনাদের জানা উচিত এরকম জোর করে বিয়ে দেওয়া নিতান্ত অসভ্য সমাজেও আজকাল প্রচলিত নেই। আফ্রিকার বর্বর সমাজে আছে শুনেছি কোথাও কোথাও।"

গগনের কণ্ঠস্বরে এবার বেশ উত্তাপ দেখা দিল।

"আপনি শিক্ষিত হয়ে যা করেছেন তা আফ্রিকার বর্বর সমাজের কেউ করে কি না আমাদের জানা নেই। জোর করে বিয়ে দিলে তার ফল যে ভালো না-ও হতে পারে তা আমরা জানি। বিয়ে করেও আপনি মিস বোসকে ছেড়ে পালাবেন এ সম্ভাবনাও অস্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। তবু আমরা বিয়ে দিতে চাইছি কেবল বাবুলের জন্য। ওই নিরপরাধ শিশুর ললাটে যে কলঙ্ক আপনি লেপন করে দিয়েছেন সেটা আপনাকে মুছে দিতে হবে। এ বিষয়ে আপনি মনঃস্থির করে ফেলুন।"

সুব্রত সবিস্ময়ে গগনের দিকে চাহিল। সে যে এমন শুদ্ধ বাংলা অনর্গল বলিতে পারে তাহা সে জানে না। মিস্টার সিংহের দিকে চাহিয়া সে মৃদুকণ্ঠে ইংরেজিতে বলিল—"We appeal to your sense of honour Mr. Sinha."

সুবর্ণ সিংহ মরিয়া হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ধরুন যদি অমি বিয়ে না করতে চাই তাহলে কি করবেন আপনারা?"

"The law will be after you. আপনার বিরুদ্ধে অনেক চার্জ আছে। ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনাকে arrest করবার জন্যে ওয়ারেন্ট বার করেছেন একটা। আপনি বাসরঘরে যদি যেতে না চান আপনাকে জেলে যেতে হবে।"

ঠিক এই সময় কৃষ্ণকান্ত পিছন দিকের জঙ্গল হইতে বাহির হইলেন।

"একি তোমরা এখানে কি করছ?"

"কুমীরটাকে মারতে পারলেন"—কুমার জিজ্ঞাসা করিল।

"মারতে পেরেছি কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখনও। একটা নৌকো পেলে গিয়ে দেখতাম জলটা লাল হয়েছে কি না। গুলিটা লেগে থাকলে রক্ত বেরুবেই। নৌকো নেই?"

"না, নৌকো তো নেই।"

তাহলে যতক্ষণ না ভেসে ওঠে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এ ভদ্রলোক কে!"

কুমার সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিল, "জামাইবাবুকে বলি ব্যাপারটা?"

"বলুন।"

সব শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত ঊর্ধ্বমুখ হইতে গলার সমানের দিকটা চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার পর সুপর্ণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি শিকারী লোক। পশু-পাখিকে ঘায়েল করাই আমার কাজ। কিন্তু ওদের আমি মনে মনে খাতিরও করি। আপনাকেও করছি। মাঝে মাঝে ওদের দেখে হিংসেও হয়, মনে হয় আমরাও যদি ওদের মতো নিরঙ্কুশ, ওদের মতো নির্ভীক, ওদের মতো ক্ষিপ্র, ওদের মতো লীলাময় হতে পারতুম। কিন্তু ওদের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম করি বলে ওদের ছেড়ে কথা কই না। বাগে পেলেই গুলি ছুঁড়ি। অনেক সময় গুলি ফসকে যায়, তখন ওদের প্রতি শ্রদ্ধাটা বাড়ে, কিন্তু গুলি যখন লাগে তখন ওদের ছেড়ে দিই না, বা

চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডাকি না। সুন্দরবনের একটা বাঘকে আমি খুব খাতির করতুম, সে চারবার আমার গুলি এড়িয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চমবার সে ধরা পড়ল একটা ফাঁদে। এখন এক মহারাজার চিড়িয়াখানায় বেচারা সীমাবদ্ধ সভ্য জীবন যাপন করছে। আপনিও ফাঁদে ধরা পড়ে গেছেন, আর এ ফাঁদ এমন ফাঁদ যে পালাবার উপায় নেই, এবার আপনাকে দাম্পত্যজীবনের খাঁচায় ঢুকতেই হবে। আমার পরামর্শ হ'চ্ছে প্রসন্নমনে ঢুকে পড়ুন।"

সুপর্ণ সিংহ কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনারা আমার দিকটা শুনবেন না? অনুকে কেন বিয়ে করিনি তার নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কারণ আছে। এবং সে কারণ যে বাজে কারণ নয় তা প্রমাণ করবার জন্যে অনেক সাক্ষীও আমি হাজির করতে পারি।"

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই পারেন। সমস্ত মৌমাছিরা আপনার স্বপক্ষে এসে সাক্ষী দেবে। কিন্তু অনুর বিরুদ্ধে যত গুরুতর অভিযোগই আপনি করুন না কেন, আমরা তা বিশ্বাস করব না। হাজার হাজার সাক্ষী এসে বললেও তা করব না, কারণ আমাদের বিশ্বাস অনু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। আমাদের এ বিশ্বাস আপনি টলাতে পারবেন না। বিয়েটা করেই ফেলুন। ব্যাপারটা গোপনে গোপনেই সেরে ফেলব আমরা। বুঝতে পারছি আপনার চক্ষুলজ্জা হচ্ছে। সে লজ্জার আবরণ আমরা দেবো। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।"

কুমার বলিল, "আজ রাত্রেই তাহলে ব্যবস্থা করে ফেলি? রাত দুটোর সময় লগ্ন আছে একটা।"

"সত্যিই জোর করে বিয়ে দেবেন আপনারা!"—সুপর্ণ সিংহ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবীতে জোরেরই জয়। ওকেই আমরা শক্তি নাম দিয়ে পূজা করেছি নানা রূপে যুগে যুগে। আপনি শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন এতে লজ্জার কি আছে। আমরা সবাই তো তাই করছি। আপনি নিজে যদি জোর দেখাতে পারতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আপনার হুকুম মেনে নিতুম। হনুমান একা লঙ্কায় গিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে এসেছিল, অতগুলো জাঁদরেল রাক্ষস তার কিচ্ছু করতে পারেনি, বাল্মীকি শতমুখে তার জয়ধ্বনি করেছেন। আপনি ওই রকম কিছু একটা করুন না। এই কুমারই তখন আপনাকে নিয়ে কাব্য করবে। আমরা সবাই করব। আসুন তো দেখি আপনার পাঞ্জায় কিরকম জোর? আরে আসুন না, লজ্জা কি—"

সুপর্ণ সিংহ অনিচ্ছা সহকারে কৃষ্ণকান্তের পাঞ্জা ধরিলেন এবং পরমুহূর্তেই "উহু ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন" বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আমি ছেড়ে দিলুম, কিন্তু এরা ছেড়ে দেবে না। এদের পাঞ্জা আমার চেয়েও শক্ত। আমার বিবেচনায় রাজী হয়ে যাওয়াই এখন আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। জোরটোরের কথা আর তুলবেন না।"

একটা চাকর আসিয়া খবর দিল চা প্রস্তুত হইয়াছে।

"চল হে, চা খেতে খেতে বাকি কথাটা শেষ করে ফেলা যাবে। সুপর্ণবাবু চলুন—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া পড়াতে গগন, সুব্রত এবং কুমার নির্বাক হইয়া গিয়াছিল। গুরুজনের সম্মুখে বাচালতা করাটা অশোভন, তাহারা কৃষ্ণকান্তের অদ্ভুত যুক্তি খুব উপভোগও করিতেছিল।

চা-পানান্তে দারোগাসাহেব, হাবিলদার সাহেব এবং কনেস্টবলরা চলিয়া গেল। সুপর্ণ সিংহকে কেন এখানে আনা হইয়াছে তাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখাই সংগত মনে করিল সুব্রত। তাহার পর স্থির হইল সুপর্ণবাবুকে সুব্রতর একজন বন্ধু বলিয়া বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইবে। বাড়ির পিছন দিকে যে ছোট ঘরটায় কুমার নিজের ছোটখাটো একট লাইব্রেরি করিয়াছে সেইখানে সে সুপর্ণবাবুর শুইবার ব্যবস্থাও করিয়া দিবে। অনুপমা যে তাঁবুতে থাকে সেটাও ওই ঘরের পাশে। সুতরাং অনুপমার সহিত দেখা করাও বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

সুব্রত প্রশ্ন করিল—"বিয়েটা তাহলে কবে হবে? কাল না আজ? আমি পরশুদিন চলে যাব, আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। যাবার আগে শুভকার্যটা সমাধা করে যেতে চাই।"

সুপর্ণ সিংহ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর যে জবাবটা দিলেন সেটাও একটু বাঁকা গোছের।

"অনুর সঙ্গে আগে দেখা হোক, তারপর সেটা ঠিক করা যাবে।"

সুব্রতর মুখ ভ্রূকুটি কুটিল হইয়া উঠিল। গগনের চোখের দৃষ্টিও অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিল আবার। কুমারও মনে মনে খুব চটিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখভাবে তাহা ফুটিয়া ওঠে নাই। সে শান্তকণ্ঠেই বলিল, "দেখুন সুপর্ণবাবু, একটি কথাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি, আজ হোক কাল হোক আপনি বিয়ে করতে প্রস্তুত কি না। সেইটেই সোজা করে বলুন। অনুপমার ইচ্ছা অনুসারেই আমরা আপনাকে এখানে আনিয়েছি। সুতরাং আপনি বিয়ে করবেন কি না তা ঠিক করবার জন্যে অনুপমার সঙ্গে দেখা করবার দরকার নেই। দেখা করবার আগেই সেটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বিয়ে যদি আপনি না করতে চান তাহলে অনুপমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।"

গগন বলিল, "আমাদের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আপনি যেরকম ব্যবহার করছেন তাতে আমাদের ভদ্রতার বাঁধ কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না। আর সে বাঁধ যদি একবার ভেঙে যায় তখন যা হবে তার জন্যে কিন্তু আমরা দায়ী হবো না।"

সুব্রত কিছু বলিল না। সে উঠিয়া পড়িল এবং ছড়ি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল সে অবিলম্বে একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিতে চায়।

হঠাৎ থামিয়া সে গগনকে বলিল, "বড়দা, আপনি আর একবার থানায় চলে যান, দারোগাবাবুকেই ডেকে আনুন। সুপর্ণবাবু যতক্ষণ না মনঃস্থির করতে পারছেন ততক্ষণ উনি থানায় দারোগাবাবুর হেপাজতেই থাকুন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে ওয়ারেন্টটা আমাকে পাঠিয়েছেন সেটাও ওকে দিয়ে আসুন, এতক্ষণ আমি ওটা ওঁকে দিইনি। কিন্তু দেখছি সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বেঁকাতে হবে।"

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া গগনকে দিল।

কুমার বলিল, "আমার সাইকেলটা নিয়েই যাও।"

বাগানের ঘরে কুমারের সাইকেলটি ছিল, গগন সেটি আনিবার জন্য যাইতেছিল এমন সময় কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একটু দাঁড়াও।"

তাহার পর তিনি উঠিয়া গিয়া সুব্রতকে একটু দূরে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিসের ওয়ারেন্ট?"

"এখন যিনি ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁকে আমি সব কথা খুলে লিখেছিলাম আর অনুরোধ করেছিলাম সম্ভব হলে একজন পুলিসের সঙ্গে সুপর্ণবাবুকে পাঠিয়ে দিন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটা ওয়ারেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। চার্জ হচ্ছে abduction. আমাকে লিখেছেন যদি He is willling to rectify his mistake তাহলে আর ওয়ারেন্টটা ব্যবহার করবেন না। কিন্তু আমি দেখছি শেষ পর্যন্ত ওটা ব্যবহার করতেই হবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "উনি গভীর জলের মাছ। টোপ গিলেছেন, এবার খেলিয়ে খেলিয়ে ওকে তুলতে হবে। হড়বড় করলে উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে, অবশ্য অনুপমার সঙ্গেই বিয়ে দেওয়ার যদি উদ্দেশ্য হয়, ওঁকে জেলে পুরে আমাদের লাভ কি? তুমি আর গগন যেমন রেগেমেগে চলে যাচ্ছ, তেমনি চলে যাও, আমি একটু বেয়ে চেয়ে দেখি।"

"আপনি নতুন আর কি বলাবেন ওকে—আমরা তো যথেষ্ট বললাম।"

"আমি বলব যে আমি তোমাদের কাছে দু'ঘণ্টার সময় চেয়ে নিয়েছি। আমি যেন ওর হিতৈষী এইরকম একটা অভিনয় করব। আমার মনে হয় তাতে কাজ হবে। কুমার এখানে থাক, তোমরা বাড়ি যাও। কিরণকে বলো আমার ফিরতে যদি একটু দেরি হয় সে যেন ব্যস্ত না হয়। আমি ভাল আছি, আমার ক্ষিদেও পায়নি"

"বেশ"

সুব্রত ও গগন চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত সুপর্ণবাবুর নিকট গিয়া বসিলেন এবং কুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ছোটবাবু, কুমীরটার খবর একটু নিয়ে এস না। এত তাড়াতাড়ি ভাসবে না, তবু দেখে এস একবার। অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়।"

কুমারও উঠিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণকান্ত নিম্নকণ্ঠে সুপর্ণবাবুকে বলিলেন, "দেখুন মশাই, আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্রীলোকদের পারতপক্ষে এড়িয়ে চলাই উচিত। নিজের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝেছি। কিন্তু আপনি যে রকম প্যাঁচে পড়েছেন তাতে কি করে যে উদ্ধার পাবেন তা তো ভেবে পাচ্ছি না। এরা সবাই গোঁয়ার। এরা হয় আপনার বিয়ে দেবে, না হয় আপনাকে জেলে দেবে। এখনই ওরা ওয়ারেন্টটা নিয়ে থানায় যাচ্ছিল, আমি অনেক বলে কয়ে ওদের কাছ থেকে দু'ঘণ্টা সময় নিয়েছি। এর মধ্যে ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বার করুন, যাতে দুকূল বজায় থাকে।"

"কিসের ওয়ারেন্ট?"

কৃষ্ণকান্ত একটু কল্পনার আশ্রয় লইলেন।

"অনুপমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন যে আপনি তাঁর মেয়ের সর্বনাশ করে সরে পড়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেইজন্যই আপনাকে এখানে পুলিশের সঙ্গে পাঠিয়েছেন। অনুপমার সঙ্গে যদি আপনার মিটমাট হয়ে যায় তাহলে তো চুকেই গেল, আর তা না হলে ওই ওয়ারেন্টের জোরে আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। জেল-আদালত করতে হবে আপনাকে। আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি—দেখুন সেটা যদি আপনার মনোমত হয়।"

"কি বলুন?"

"আমি বলছি আপনি বিয়েটা করে ফেলুন। দুটো কারণে এ কথা বলছি। প্রথমত, পুলিশের

ফাঁড়াটা কেটে যাবে; দ্বিতীয়ত, আপনার একটি ছেলে আছে শুনেছি, তার প্রতিও একটা সুবিচার করা হবে। তারপর আপনার বিবাহিত জীবন যদি ভালো না লাগে অনায়াসেই ফের কেটে পড়তে পারেন। অনুপমা ভালো রোজকার করে শুনেছি, সুতরাং সেদিকে আপনার কোন ভাবনা থাকবে না। আর তার সঙ্গে যদি আপনার ভাব হয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে। স্ত্রী-পুরুষের রোজকারে সংসার আরও সচ্ছল হয়ে উঠবে। সেটা বড় কম কথা নয়। আপনি কি করেন?"

"আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার।"

কৃষ্ণকান্তের মুখে হাসির মৃদু আভা ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি বলিলেন—আপনার মতো সোশ্যাল ওয়ার্কার আরও আছে নাকি। সর্বনাশ!

সুপর্ণ সিংহ শুধু বিব্রত হয় না, বেশ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ভদ্রলোকেরা অনুপমার সম্বন্ধে এত দরদ দেখাইতেছেন কেন। অনুপমা কায়স্থ, ইঁহারা ব্রাহ্মণ। যোগাযোগটা কিরূপে হইল!

"অনুপমার সঙ্গে আপনাদের কতদিনের আলাপ? ওকে নিয়ে আপনারাই বা এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"অনুপমার সঙ্গে আমাদের আলাপ মাত্র কয়েকদিনের। আমার শ্বশুর ডাক্তার সূর্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় এ অঞ্চলে খুব নামজাদা এবং সম্মানিত লোক। তাঁর অসুখের খবর পেয়ে আমরা সবাই এখানে এসে পড়েছি। আমি হচ্ছি ওঁর বড় জামাই। গগন ওঁর পৌত্র। সুব্রত ছোট জামাই। গগনের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, তার সঙ্গে অনু নার্স হয়ে এসেছে গগনের শ্বশুরবাড়ি থেকে। গগনের শ্বশুর শাশুড়ীও এসেছেন। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরতি। আমার শ্বশুরমশায় এখন একটু ভালো আছেন। অনুর ইতিহাসটা সম্ভবত গগন তার বউ চম্পার কাছ থেকে শুনেছে। শোনাবামাত্রই তার আর্যরক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস ও-ই সুব্রতকেও উত্তেজিত করেছে। বাড়ির আর কেউ এ খবর জানে না। আমিও তো জানতাম না, এখনই শুনলাম। কুমারও বোধহয় আপনি আসার পর শুনেছে। আপনি জিগ্যেস করছিলেন আমরা একটা নার্সকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন। খুবই সংগত প্রশ্ন । কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন আমাদের মাথাই একটু ঘর্মপ্রবণ, মানে আজব রকম। কখন পট্ করে যে কি কারণে ঘেমে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। এ অঞ্চলের সবাই জানে আমরা খামখেয়ালী, একগুঁয়ে। আর শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তা সত্ত্বেও সবাই আমাদের খাতির করে খুব। এ অঞ্চলের যত অফিসার, যত জমিদার, যত ধনী লোক সবাই শ্বশুরমশাইকে ভক্তি করে। গরীবরা এদের বলে 'মাই বাপ'। আজই সকালে এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। সবাই এ বাড়ির আপন লোক। তাই অনুপমাও এদের আপন লোক হয়ে গেছে অনায়াসে। তার জন্যে they will fight tooth and nail, move heaven and earth. আপনি যদি বিয়ে করতে রাজী না হন সহজে রেহাই পাবেন না। তাই বলছি, আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখুন।"

"বেশ তবে তাই হোক।"

সুপর্ণ সিংহ হাত দুইটি উল্টাইয়া ঈষৎ হাসিয়া এমন একটা ভাব প্রকাশ করিলেন যেন অযৌক্তিক জানিয়াও তিনি নিতান্ত ভদ্রতাবশে তাঁহাদের এই অসংগত আবদারটা রক্ষা করিতেছেন।

"গুড, ভেরি গুড"—কৃষ্ণকান্ত সানন্দে বলিয়া উঠিলেন। "আজ রাত্রেই লাগিয়ে দেওয়া যাক তাহলে—কি বলুন?"

"আজ রাত্রে থাক। আপনাদের আর একটা অনুরোধও করব। বেশী লোকজন যেন জানতে না পারে।"

"কেউ জানতে পারবে না। গগন, কুমার, সুব্রত আর আমি ছাড়া আর কাউকে জানাবার দরকার নেই।"

"পুরোহিত?"

"আমিই হব। দু'একটা বিয়ে আমি দিয়েওছি ইতিপূর্বে। বইটই অবশ্য একটু দেখেই নিতে হবে, তা সে কুমার যোগাড় করে দিতে পারবে। শালগ্রাম শিলাও চাই একটা। সেটাও কুমার ব্যবস্থা করবে। ওই হচ্ছে এ বাড়ির দক্ষিণহস্ত। অদ্ভুত ছেলে। চলুন শুভসংবাদটা ওকে দেওয়া যাক।"

দুইজনে বাহি নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল কুমার আসিতেছে। তাহার মুখ উদ্ভাসিত। তাহার পিছুপিছু আসিতেছে সর্বাঙ্গ-সিক্ত একটা ছোঁড়া।

"জামাইবাবু, কুমীরটা যদিও এখনও ভেসে ওঠেনি, কিন্তু ওর গায়ে গুলি লেগেছে ঠিক।"

"কি করে জানলে?"

"ফাগুয়া সাঁতরে গিয়ে দেখে এল। জল লালে লাল হ'য়ে গেছে।"

ফাগুয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আগাইয়া আসিল এবং সামনের সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া বলিল, "হাঁ বাবু, পানি একদম লাল সুরুক ছে।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছোঁড়াটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ মহাপুরষটি কে?"

"ভজুয়া বলে আমাদের একটা চাকর ছিল, এ তারই নাতি। এ এখন প্রিয়গোপালদের গরু চরায়। নদীর ধারে গরু চরাচ্ছিল, ওকে বললুম, তোকে দু'আনা পয়সা দেব, সাঁতরে দেখে আয় নদীর জল লাল হয়েছে কি না।"

কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে মানি-ব্যাগ বাহির করিলেন।

"আমি ওকে পয়সা দিয়ে দিয়েছি।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার মতে খুব কম দিয়েছ। এমন একজন মহাপুরুষের জীবনের দাম দু'আনার চেয়ে অনেক বেশী। মহাপুরুষ ছাড়া অমন নির্ভয়ে একটা আহত কুমীরের কাছে কেউ যেতে পারত না।"

কৃষ্ণকান্ত ফাগুয়াকে একটি দশ টাকার নোট দিলেন। ফাগুয়া হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর যখন বুঝিতে পারিল যে ইহা স্বপ্ন নয় সত্য, তখন ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"তুই নদীর ধারেই থাকবি তো? একটু লক্ষ্য রাখিস, কুমীরটা ভেসে উঠলেই খবর দিবি, বুঝলি?"

ফাগুয়া সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে নদীর তীরে সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবে, বলিয়া একছুটে চলিয়া গেল। একটুদূর গিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ গে মাইও—"

কুমার হাসিয়া বলিল, "ওর মা পাশের ক্ষেতে ঘাস কাটছে, তাকেই টাকাটা দিতে গেল। যাক কুমীরটার ভবলীলা এতদিন পরে সাঙ্গ হল। আমি দুবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। মাত্র নাকের ডগাটুকু ভেসে থাকে তো, লক্ষ্য ভেদ করা শক্ত।"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আর একটা লক্ষ্যও ভেদ করেছি। ইনি বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেছেন। আজ হবে না, কাল হবে। এঁর একটা অনুরোধ আমরা চারজন ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ যেন না জানতে পারে।"

"পুরুত আর নাপিত চাই।"

"পুরুতের কাজ আমি করব। নাপিতের কাজটা না হয় তুমি কর। মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এ তো শাস্ত্রেরই বিধান। তা ছাড়া, নাপিতের দরকারই বা কি। Safety razor আর nail cutter তো রয়েছে। আচ্ছা, সে সব বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করা যাবে। আমি সেই ভোরে বেরিয়েছি, তোমার দিদি এতক্ষণে হয়তো হাঙ্গার স্ট্রাইক করে বসে আছে। চল, আর দেরি করা ঠিক নয়।"

তিনজনেই বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

।। ঊনত্রিশ।।

নিস্তব্ধ অপরাহ্ন। একটু আগে খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। এই সময়টা সকলেই একটু বিশ্রাম করে। সূর্যসুন্দরও চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। আজকাল তিনি প্রায়ই চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম হয় না। তিনি ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন এই অসুখই তাঁহার জীবনের শেষ অসুখ। তাঁহার পক্ষাঘাত আর সারিবে না। কাহাকেও তিনি জানিতে দেন না যদিও, তবু নিরন্তর মনে মনে তিনি একটি প্রার্থনাই করিতেছেন, ভগবান এবার আমাকে মুক্তি দাও। এভাবে বেশী দিন আর পরাধীন করিয়া রাখিও না। পরাধীন হইয়া এত লোকের সেবা আমি ভোগ করিতেছি, এতলোক সাগ্রহে আমার খবর লইতেছে, আমার সামান্য কষ্ট দূর করিবার জন্য এত লোক ব্যগ্র—ইহাও একটু সুখ বটে। অসুখ হইয়াছে বলিয়াই আত্মীয়স্বজন সবাই ভিড় করিয়া আসিয়াছে, ইহাও কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু তিনি জানেন এ সুখ এ আনন্দ বেশী দিন থাকিবে না, একটু পরেই অনিবার্যভাবে রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা নামিয়া আসিবে। হঠাৎ তাঁহার জগদল পাঁড়ের কথা মনে পড়িল। জগদল পাঁড়েরও পক্ষাঘাত হইয়াছিল। তাহার পক্ষাঘাতের খবর পাইয়া তাহারও পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনরা আসিয়া তাহার বাড়িতে ভিড় করিয়াছিল দিন কতক। তিনি যখন তাহাকে চিকিৎসা করিতে যান তখন তাহার বাড়িতে বিরাট হৈ-হৈ কাণ্ড। কিন্তু কিছুদিন পরে সব থামিয়া গেল। সবাই চলিয়া গেল, বাড়িতে রহিল কেবল তাহার তৃতীয়পক্ষের যুবতী স্ত্রী। তিনি জগদলকে বুড়াবয়সে বিবাহ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। জগদল বলিয়াছিল—ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেমেয়েরা কেহ এখানে থাকে না, সবাই বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আমার অসুখ হইলে আমাকে দেখিবে কে? এক ঘটি জল আগাইয়া দিবার মতো লোকও তো বাড়িতে নাই। তাই, নিরুপায় হইয়া বিবাহ করিতেছি। কিন্তু দেখা গেল শেষপর্যন্ত তাহার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী সুমিত্রা তাহার কোনও কাজে লাগিল না। সে তাহার বিছানায় তো বসিতই না, ঘরেও কম ঢুকিত। ঘরে ঢুকিবার আগে একটা চাকরকে দিয়া প্রথমে ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিত, তাহার পর নাকে কাপড় দিয়া

ঢুকিত। জগদলকে সেবা করিয়াছিল তাহার বৃদ্ধ চাকর ছোনু সিং আর এতবারিয়া মেথর। সে দুই বেলা আসিয়া জগদলের মলমূত্রমাখা কাপড় বিছানা বদলাইয়া দিয়া যাইত। এতবারিয়া যতক্ষণ না আসিত ততক্ষণ মলমূত্র মাখিয়াই পড়িয়া থাকিতে হইত জগদলকে। সে তারস্বরে চীৎকার করিত, অশ্রাব্য ভাষায় স্ত্রীকে গালাগালি দিত, কিন্তু সুমিত্রা তাহার কাছে আসিত না। অনেকের ধারণা ছিল সুমিত্রা চরিত্রহীনা। জগদলের কামতের বলিষ্ঠ চাকর মুন্সীর সহিত তাহার নাম জড়াইয়া অনেকে তাহার দুর্নাম রটাইত। একদিন সূর্যসুন্দর গিয়া দেখিয়াছিলেন জগদল মলমূত্র মাখিয়া শুইয়া শুইয়া চীৎকার করিতেছে, কাছে কেহ নাই। বাহিরে গিয়া দেখিলেন সুমিত্রা একটি শৌখিন শাড়ি পরিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতেছে। সূর্যসুন্দর তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, মেথরের কাজ কখনও করি নাই। আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আমি ওই সব ময়লা স্পর্শ করিতে পারিব না। উহার ঘরে ঢুকিলেই আমার 'ওকি' (বমি) আসে। আপনি এত্‌বারিয়া মেথরকে বলুন সে দিনরাত এখানে আসিয়া থাকুক। আমার জেবর (গহনা) বিক্রয় করিয়া আমি তাহার বেতন দিব। সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ছোনু সিং কোথায়। সুমিত্রা বলিল, তাহাদের শত্রুপক্ষ রাবণ মিশির তাহাদের সমস্ত মহিষগুলিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে হাঁকাইয়া লইয়া গিয়া আড়গড়ায় (খোঁয়াড়ে) দিয়া আসিয়াছে, ছোনু সিং সেই মহিষগুলি ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছে। সূর্যসুন্দর নিজেই সেই জগদল পাঁড়েকে যতটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। জগদলকে তিন বৎসর এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর একটা কৌতূহলজনক ঘটনাও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িয়া গেল। জগদলের মৃত্যুর পূর্বেই সুমিত্রার মৃত্যু হইয়াছিল। 'বউ-খেকো' জগদল তাহাকে ছাড়ে নাই। হঠাৎ কলেরা হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে ইহলীলা সংবরণ করে। জগদলকে সূর্যসুন্দর চেষ্টা চরিত্র করিয়া পূর্নিয়া সদর হাসপাতালে ভরতি করাইয়া দেন। সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। সূর্যসুন্দর জানিতেন জগদলের মতো শোচনীয় অবস্থায় তিনি কখনও পড়িবেন না, তবু তাঁহার ভয় হইল। আবার তাঁহার মনে হইল, এবার তো গেলেই হয়, সকলের সহিতই তো দেখা হইয়া গেল। সকলেই তো আসিয়াছে, এমন কি পৃথ্বীশও। জীবনের সমস্ত কামনা কাহারও কখনও পূর্ণ হয় না, তাঁহারও হয় নাই। কিন্তু যতটুকু হইয়াছে তাহাই কি যথেষ্ট নয়, তাহাই বা কয়জনের হয়। তাঁহাকে যে এত লোক ভালবাসে এই ধারণাটা অটুট থাকিতে থাকিতেই তো বিদায় লওয়া ভালো।

"বউমা—"

উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়া ছিল।

"কি বাবা।"

"নিখিলবাবু তখন দিগন্তর লেখা যে খাতাটা দিয়ে গেলেন সেটা কোথায় রেখেছ?"

"এই যে এখানেই আছে।"

"কোন্ কোন্ গ্রাম থেকে কারা কারা এসেছিল তাদের নামগুলো পড়ে যাও তো।"

উর্মিলা মৃদুকণ্ঠে পড়িতে লাগিল।

দিয়াড়া—রহমতুল্লা, কাজি রমজান, মিঞাজান, জনাব আলী। কাজিগ্রাম—শিবু মিস্ত্রী, খেতু পাঠক, গহর, গহরের মা, বিলাতি মণ্ডল। মেদিনীপুর—নগেন মৌয়ার, সুরেন মৌয়ার, জিতু মণ্ডল, যোগেশ সাহা, বসন্ত সাহা। দিলারপুর—গোপী চৌধুরী, সুবাদর সিং, শেখাওৎ আলী।

মাদারিচক—বিশ্বেশ্বর সিং, দেবেন সিং, কুলাই মণ্ডল, খেতরা, মিনিয়া, সরবতিয়া। পাটনী—সুবাতালী তহশিলদার, রেয়াজৎ আলী, সরফুদ্দিন, আরসদ আলী। হাঁসুয়ার বোচন মিশির, ভগণ্ডমাঝি, বুধলাল। দোশাদ পাড়ার ভাগিয়া, লেংড়া, বোধিয়া, মাদারি—ইহাদের বউ ছেলেমেয়েরা। নবাবগঞ্জের তুত্‌তু বাবু ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা, প্রিয়লাল সিং, মাধব রায়, গোবিন্দ মণ্ডল। বৈরিয়া—মোফিল, শোফিল, আবিদ, মকুই মণ্ডল, শনিচরা মাঝি ও তাহার দলের প্রায় শতাধিক সাঁওতাল সাঁওতালনী। আমদাবাদ—যোগীন সাহা, বিছন মাঝি, কলাবতী, বেদবতী, নিরঞ্জন ঝা, বিরোচন ঝা, রামজোরাবর সিং, বোরা মহাবীর....

ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে পড়িয়া যাইতেছিল। সূর্যসুন্দর সাগ্রহে শুনিতেছিলেন। তাঁহার চোখের সামনে বিরাট একটা মিছিল চলিয়াছিল যেন, নানা বয়সের নানা জাতের নর-নারীর মিছিল—ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই এতদিন তাঁহার এই নশ্বর জীবন আবর্তিত হইয়াছে। আশ্চর্য, এত লোক তাঁহাকে ভালবাসিত! অথচ ইহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে! বোরা মহাবীরের নামটা শুনিয়া তাঁহার মনে বেঁটে মোটা বলিষ্ঠ একটা লোকের ছবি ফুটিয়া উঠিল। এখন মহাবীর যদিও বুড়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এককালে সে বেশ বলিষ্ঠ ছিল। খুব খাইতে পারিত। তাহার বোরা মহাবীর নামটার একটা ইতিহাস আছে। 'সার' বা 'রায়বাহাদুর' উপাধির ন্যায় 'বোরা' উপাধিটাও মহাবীর সগর্বে তাহার নামের পূর্বে ব্যবহার করে। একবার গঙ্গার চরে একটা নৌকা আটকাইয়া গিয়াছিল। ভীষণ দুর্যোগের জন্য মাঝি নৌকা খুলিতে সাহস করে নাই। নৌকাতে ছিল মহাবীর এবং একটা বুড়ী মুড়িওয়ালী। মুড়িওয়ালীর সঙ্গে একবোরা মুড়ি ছিল। ক্ষুধিত মহাবীর নাকি সেই একবোরা মুড়ি নিঃশেষ করিয়া বোরা উপাধিটি অর্জন করে। বোরা মহাবীরের আর একটা গল্পও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। কিরণের তখন সবে বিবাহ হইয়াছে. নূতন জামাই কৃষ্ণকান্ত প্রথম আসিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত মাংস ভালবাসে, কিন্তু তখন গ্রামে কোন কসাই ছিল না, সুতরাং মাংস পাওয়া দুষ্কর হইল। ফরিদ বলিয়া একটা চাকর ছিল, সে বলিল যদি খাসি একটা যোগাড় হয় সে কাটিয়া সব ঠিক করিয়া দিতে পারে। কিন্তু খাসিও পাওয়া গেলে না। বিরু তখন বোরা মহাবীরকে গিয়া বলিয়াছিল যে জামাইবাবুকে মাংস খাওয়াইতে না পারিলে আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। বোরা মহাবীর অবিলম্বে ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বেশ বড় একটা খাসির কান ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া হাজির করিল। বিরু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কাহার খাসি কত দাম দিতে হইবে বল, বোরা মহাবীর নাকি উত্তর দিয়াছিল—আমি সে সব জানি না। মাঠে খাসিটা চরিতেছিল ধরিয়া আনিলাম। তোমরা কাটিয়া ফেল! তাহার পর খাসির মালিক আসিলে তাহার সহিত দরদস্তুর করা যাইবে। সূর্যসুন্দর এসব কিছুই জানিতেন না। কিন্তু একটু পরেই যখন তুরীটোলার ঢেঙিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে আসিয়া হাজির হইল এবং বলিতে লাগিল যে বোরা মহাবীর তাহার খাসিটা লুট করিয়া আনিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে তখন ব্যাপারটা আর গোপন রাখা গেল না। বোরা মহাবীর বলিল, ও তো খালি বেচিবার জন্যই পুষিয়াছে আর একটু বড় করিয়া বেচিলে হয়তো দু'পয়সা বেশী পাইত। বাজারে ও খাসির দাম এক টাকার বেশী নয়, যাই হোক আমরা উহাকে দেড় টাকা দিব। সূর্যসুন্দর বলিলেন, না তাহা হয় না। তোমরা যখন উহার বিনা অনুমতিতে খাসিটা কাটিয়াছ তখন ও যে দাম চাহিবে তাহাই তোমাদিগকে দিতে হইবে। ঢেঙিয়া পাঁচ টাকা দাম চাহিল এবং সূর্যসুন্দর তাহাকে পাঁচ টাকাই দিয়া কলে বাহির

হইয়া গেলেন। ইহার পর বোরা মহাবীর নাকি যাহা করিয়াছিল তাহা আরও অদ্ভুত। তাহার মাথায় যে গামছাটা পাগড়ির মতো বাঁধা থাকিত সেটা হঠাৎ খুলিয়া নিজের দুই চোখে বাঁধিয়া সে নাকি ঢেঙিরাকে বলিয়াছিল, তুই আমার চোখের সামনে আর থাকিস না। টাকা পাইয়াছিস চলিয়া যা। আমি আর তোর মুখ দেখিব না। যে কিরণিকে (কিরণকে) তুই কোলে করিয়া খেলাইয়াছিস তাহারই দুল্‌হার (বর) জন্য তোর খাসিটা আমরা কাটিয়াছি আর সেই খাসির দাম তুই পাঁচ টাকা লইলি! আর তোর মুখ দেখিব না, তুই যক্কিণ্‌ (যক্ষিণী) তুই পিশাচীন (পিশাচিনী)। তখন ঢেঙিয়া গালে হাত দিয়া বলিল কিরণির দুল্‌হার জন্য খাসি কাটা হইয়াছে এ কথা তাহাকে তো কেহ বলে নাই। তাই যদি হয় সে খাসির দাম লইবে না। এই বলিয়া টাকা পাঁচটা ঝনঝন করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল সে। কিন্তু মহাবীর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমরা থুতু ফেলিয়া আবার সেটা চাটিয়া লই না। ডাক্তারবাবু টাকা আর কিছুতেই ফেরত লইবেন না। তোর সত্যই যদি অক্‌কিল (আক্কেল) জাগিয়া থাকে তাহা হইলে কিরণির দুলহার জন্য তুই ওই পাঁচ টাকার ভালো মিষ্টান্ন কিনিয়া পাঠাইয়া দে। ও টাকা আমরা ছুঁইব না। ঢেঙিয়া তাহার পর দিন সত্যই পাঁচ টাকার টিকরি (বালুসাই) কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। বোরা মহাবীরও প্রত্যুত্তর দিয়াছিল ইহা। পরের রবিবারের হাটে ঢেঙিয়াকে একখানা খুব সৌখিন পাছা-পাড় শাড়ি কিনিয়া দিয়াছিল সে। বোরা মহাবীর নামটার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মনের ঘুড়ি অতীতের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ তাঁহার কানে গেল ঊর্মিলা পড়িয়া চলিয়াছে—ভালুকা—গৌরকিশোর চৌবে, হরদৎ সিং, ভোলা রায়...। মনে হইল একটা মৌমাছি যেন গুন গুন করিয়া চলিয়াছে।

"আর কত আছে।"

"এখনও পনেরো পাতা আছে।"

"থাক আর পড়তে হবে না"

সূর্যসুন্দর মনে মনে একটা ছবি দেখিতেছিলেন, একটা বিরাট মেলার মাঝখানে তিনি যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সকলেই তাঁহার চেনা, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া হাসিমুখে নমস্কার করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে আর একজন অতি-চেনা যেন মেলায় হারাইয়া গিয়াছে, সে যে কে তাহাও তাঁহার ঠিক মনে পড়িতেছে না, অথচ ইহাও মনে হইতেছে তাহাকে না পাইলে এই মেলার আনন্দ বৃথা, মেলাও বৃথা। কে সে? রাজলক্ষ্মী কি? না রাজলক্ষ্মী তো কখনও এমনভাবে মেলার মধ্যে আসে নাই মেলার মধ্যে তাহাকে সূর্যসুন্দর কোনদিন তো প্রত্যাশা করেন নাই। যেখানে তাহাকে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন সেখানে সে তো অক্ষুণ্ণ মহিমায় আজ বিরাজ করিতেছে। না, মেলার মধ্যে তিনি আর একজনকে খুঁজিতেছেন সে কে? প্রশ্ন যেন রহস্যাবৃত কুয়াসার রূপ ধরিয়া তাঁহার মনের দিগন্তে প্রহেলিকার মতো সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"আমাদের এবার বিদায় দিন—"

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া দেখিলেন গগনের শ্বশুর শাশুড়ী দাঁড়াইয়া আছেন। গগনের শাশুড়ী প্রণাম করিয়া বলিলেন: "আমরা এইবার যাচ্ছি। তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম। খুব আনন্দ পেয়ে গেলাম এখানে এসে। এ যুগে আপনারা যে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।"

গগনের শ্বশুরও প্রণাম করিলেন।

তাহার পর ইংরাজীতে বলিলেন, "Really we are proud to see that you are an uncrowned king here. এতটা দেখব প্রত্যাশা করিনি। চম্পার জন্যে আমাদের মনে একটু অস্বস্তি ছিল, এ পাড়াগাঁয়ে তার ঠিকমতো ব্যবস্থা হবে কি না, এ নিয়ে আমার স্ত্রী বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের ব্যবস্থা দেখে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি আমরা। আমার স্ত্রী অবশ্য এখনও একটু খুঁতখুঁত করছেন, ব্লাডপ্রেসার মাপবার যন্ত্রটা মাঝে খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা—"

গগনের শাশুড়ী খুকীর মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখে দিয়া বলিলেন, "আমি ভারি ভীতু আর সর্বদাই ভয় করে, কখন কি হয়ে যাবে—"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা এত শিগগির যাচ্ছেন কেন ট্রেনের তো এখনও অনেক দেরি।"

গগনের শাশুড়ী বলিলেন, "আমি যে তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে পারি না। আমার প্যালপিটেশনের ব্যারাম আছে। নিখিলবাবু তাই বললেন আপনারা তাহলে একটু আগে থাকতে ঘাটে চলে যান। সেখানে খালি স্টীমারে গুছিয়ে বসে থাকুন। তাই আমরা পালকি করেই ঘাটে যাচ্ছি একটু আগে থাকতে। খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম এখানে। চম্পার খবরটা আমরা রোজ যেন পাই, একটু বলে দেবেন গগনকে।"

"আচ্ছা।"

তাঁহারা নিখুঁত সৌজন্যসূচক হাসি মুখে ফুটাইয়া পুনরায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। সূর্যসুন্দরের মনে হইল এইবার চলিয়া যাইবার পালা শুরু হইল।

।। ত্রিশ ।।

রাত্রি কত হইয়াছে তাহা সুপর্ণ সিংহ আন্দাজ করিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার হাত-ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঘড়িটিতে দম দিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কুমার তাঁহাকে সুব্রতর বন্ধু হিসাবে বাড়িতে আনিয়াছিল। তাঁহার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই। তবু অপমানে ক্ষোভে তাঁহার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। অনুপমা তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিয়া এখানে টানিয়া আনিয়াছে জোর করিয়া বিবাহ করিবে বলিয়া? অনুপমার চরিত্রের এদিকটা তাঁহার জানা ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল অনুপমা অত্যন্ত লাজুক, অত্যন্ত ভীতু। সে যে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে পারে তাহা তিনি কল্পনাই করিতে পারেন নাই। ইহাও তাঁহার মনে পড়িল যে বাবুলের যখন জন্ম হয় তখন অনুপমা তাঁহাকে লিখিয়াছিল যে সে তাঁহাকে স্বামী কল্পনা করিয়াই মাথায় সিঁদুর পরিয়াছে এবং হাসপাতালে স্বামী বলিয়া তাঁহারই নাম লিখাইয়াছে। সুপর্ণ সিংহ এ চিঠি পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই। কল্পনার স্বর্গে অনুপমা যদি সতী সাজিয়া থাকিতে চায়, থাক না, তিনি আপত্তি করিবেন কেন। কিন্তু আজ হঠাৎ এ কি বিষম পরিস্থিতিতে পড়িয়া গেলেন তিনি! অবশ্য যে বড়লোকের মেয়েটির মোহে পড়িয়া তিনি অনুপমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সে-ও তাঁহাকে ছাড়িয়া বহুদিন আগে জাপানে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে সে একজন ধনী জাপানীকে বিবাহ করিয়া ওদেশেই বসবাস

করিতেছে। সুপর্ণ সিংহের হৃদয়সিংহাসন এখন খালি, অনুপমা সেখানে এখন অনায়াসেই আরোহণ করিতে পারে, হয়তো তিনি শেষ পর্যন্ত অনুপমাকে খবরও দিতেন, কিন্তু অনুপমা এ কি করিয়া বসিল। সে কি ভাবিয়াছে জোর করিয়া তাহাকে এভাবে আটকাইয়া ফেলিবে? সুব্রতবাবু তাঁহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা খুব ভদ্র চিঠি। তাহাতে ছিল একটি বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে এখানে আসিতে হইবে। ভয়ের কোনও কারণ নাই। না আসিলেই বরং বিপদ হইবার সম্ভাবনা। সুপর্ণবাবু স্থানীয় একটি কো-অপারেটিভের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে কিছু টাকার গোলমাল হইয়াছিল এবং অডিটার এজন্য তাঁহাকেই দায়ী করিয়াছিলেন। অডিটারের সহিত সুব্রতবাবুর আলাপ ছিল। তাই তাঁহার মনে হইয়াছিল সুব্রতবাবু সম্ভবতঃ ওই ব্যাপারের জন্যই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিয়া একটি ওয়ারেণ্টও আনাইয়া লইয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন না। এখানে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন সবটাই অনুপমার চক্রান্ত। কৃষ্ণকান্তবাবুই ঠিক পরামর্শ দিয়াছেন মোগলের হাতে যখন পড়া গিয়াছে তখন তাহার সাথে খানা খাইতেই হইবে। তাহার পর নিরাপদ দূরত্বে গিয়া গলায় আঙুল দিয়া খানাটা বমি করিয়া দিলেও চলিবে। তখন আর বাধা দিবে কে। সুপর্ণ সিংহ কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঝিল্লীধ্বনি, মাঝে মাঝে দুই একটা পেচকও ডাকিতেছে। মানুষের কোনও সাড়াশব্দ নাই। কত রাত হইয়াছে কে জানে। অনুপমা নাকি নিকটে একটি তাঁবুতে থাকে। গগনবাবু বলিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত এখনই দেখা হইবে। কিন্তু কই? কাহারও তো সাড়াশব্দ পর্যন্ত নাই। সুপর্ণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল নিজেই যদি অনুপমার তাঁবুটা কোথায় খোঁজ করি, তাহাতে ক্ষতি কি। নিজেই যদি যাই অশোভন হইবে কি? এমনভাব চুপচাপ একা বসিয়া থাকাও তো অসম্ভব। কপাটটা খুলিয়া বারান্দায় তো বাহির হওয়া যাক। কপাটের খিলটা খুলিয়াই কিন্তু তাঁহাকে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। কপাট বাহির হইতে বন্ধ! তবে কি তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে? কপাটটা ধরিয়া টানাটানি করিলেন, তাহার পর তাহাতে লাথি মারিলেন একটা। বারান্দায় ল্যাং ল্যাং ঘুমাইতেছিল। ঘুম ভাঙিয়া সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সুপর্ণ সিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর গিয়া বিছানায় বসিলেন, তিনি বুঝিলেন এ অবস্থায় চীৎকার চেঁচামেচি করা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। তিনি নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ল্যাংল্যাং সমানে ডাকিতেই লাগিল। একটু পরে ছুঁচকিও আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল তাহার পর কাহার যেন তাড়া খাইয়া তাহারা ডাকিতে ডাকিতে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। কপাট খুলিল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। কপাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল অনুপমা নয় গগন।

"মাপ করবেন, আমি কপাটে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিনি। অনুপমাকে আমরা সব খুলে বলেছি। সে বলছে আপনার যখন বিয়ে করবার মোটেই ইচ্ছে নেই, তখন এমন প্যাঁচে ফেলে সে আপনাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে না। আপনার মনের ভাবটা কি তাই জানবার জন্যে সে আপনাকে এখানে আনিয়াছিল। আপনি আপনার মনের ভাব গোপন করেন নি বলে সে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে, আর সেই জন্যে সে আপনার সঙ্গে আর দেখা করতেও চাইছে না। তবে একটা জিনিস সে চাইছে। সে বলছে—আপনি আমাদের ক'জনকে সাক্ষী রেখে একটা কাগজ লিখে সই করে স্বীকার করুন

যে আপনি বাবুলের বাবা। বাবুল মাঝে মাঝে তার বাবার কথা জিগ্যেস করে। অনুপমা তাকে এতদিন বলে' এসেছে তোমার বাবা বিদেশ গেছেন, ফিরে এলে তোমার কাছে আসবেন। তাই অনুপমা এ অনুরোধও জানিয়েছে যে তিনি যদি মাঝে মাঝে এসে বাবুলের সঙ্গে দেখা করেন তাহলেই তার আর কোন নালিশ থাকবে না।"

সুপর্ণ সিংহ বলিলেন, "তারপর?"

"এসব যদি করতে রাজী থাকেন তাহলেই আপনার ছুটি। অনুপমা আপনাকে ছেড়ে দিতে বলেছেন।"

"আমাকে কি লিখতে হবে?"

"এই যে অনু সেটা ছকে দিয়েছে।"

গগন পকেট হইতে একটি শক্ত নীল রঙের কাগজ বাহির করিয়া দিল। সুপর্ণ সিংহ দেখিলেন তাহাতে গোটাগোটা অক্ষরে এই কথাগুলি লেখা রহিয়াছে :—আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে শ্রীমতী অনুপমা বসু আমার ধর্মপত্নী এবং বাবলু আমারই পুত্র। আমরা পরস্পরের ইচ্ছা অনুসারেই এখন পৃথক জীবন যাপন করিতেছি।

সুপর্ণ সিংহ খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "অনুপমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয়নি। তাকে আমি ধর্মপত্নী বলে কি করে স্বীকার করব?"

"আমাদের শাস্ত্রে অনেকরকম বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহও ধর্মবিবাহ দুই পক্ষের যদি তাতে সম্মতি থাকে। দুষ্মন্ত শকুন্তলারও এই ব্যাপার হয়েছিল। আশা করি পৌরাণিক এ গল্পটা আপনি জানেন। বাবুলের পিতৃত্ব আশা করি আপনি অস্বীকার করেন না।"

"না।"

"তাহলে সই করে' দিন।"

গগন পকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া বাড়াইয়া ধরিল।

"বেশ।"

সুপর্ণ সিংহ সত্যই সহি করিয়া দিলেন।

"গুড"—গগনের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—"এইবার আমরা এতে সাক্ষী হিসেবে সই করব। আপনি এইখানে যদি একটা লাইন লিখে দেন তাহ'লে আরও ভালো হয়। লিখে দেন—আমি নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে স্বেচ্ছায় এই স্বীকৃতিপত্রে সহি করিলাম। এর নীচে সুব্রত, ছোটকাকা, বড় জামাইবাবু, আর আমি নাম সই করে দেব।"

সুপর্ণ সিংহ ইহাতেও আর আপত্তি করিলেন না। গগন যাহা বলিল তাহা লিখিয়া দিলেন তিনি। গগন কাগজটি আর একবার পড়িল, তাহার পর বলিল, "বাস্, এইবার আপনার ছুটি। You may go wherever you like. কাল্ সকালেই ওপারে যাওয়ার জাহাজ পাবেন। সুব্রত কাল আপনার ফিরবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।"

গগন কাগজটি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল সুপর্ণ সিংহ বাধা দিলেন। বলিলেন, 'একটা কথা দয়া করে বলে যান।"

"কি বলুন।"

"আপনারা অসুখের বাড়িতে এত সব হাঙ্গামা করতে গেলেন কেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আর কেউ করেনি আমিই করেছি। আমি কখনও অন্যায় সহ্য করতে পারি না। অনুপমার কাহিনীটা আমি জানতাম। সে যখন আমাদের বাড়িতে এল তখন তার মুখ দেখে বড়ই কষ্ট হত আমার । লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই নাকি সে কাঁদে এ খবরও পেলাম। আমাদের সংসার সুখের সংসার। আমার দাদুর অসুখ সত্ত্বেও রোজ এখানে আনন্দ উথলে পড়ছে চারিদিকে। এর মধ্যে অনুপমাকে কেমন যেন বেমানান মনে হত। তারপর জানতে পারলুম সুব্রত এখন যে জেলার এস. পি. আপনিও নাকি সেখানে আছেন। সুব্রত বলল চেষ্টা করলে সে আপনাকে এখানে আনাতে পারে। অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেও সাগ্রহে রাজী হল। ওর মনে অশান্তির আসল কারণটা ছিল বাবুলকে নিয়ে। আপনি আজ সে কাঁটাটা তুলে দিলেন। ভালই হল। অনুপমার সঙ্গে আপনার ফর্মালি বিয়েটাও হয়ে যেতে পারত, কিন্তু সব শুনে অনুপমা তাতে রাজী হল না। হ্যাঁ, আর একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। অনুপমা বলেছে আপনি যেখানেই থাকুন কখনও যদি অর্থকষ্টে বা অন্য কোনও কষ্টে পড়েন অনুপমাকে স্মরণ করবেন। তাকে খবর দিলেই সে তার ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, গুড নাইট।"

গগন চলিয়া গেল।

সুপর্ণ সিংহ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

।। একত্রিশ ।।

কুমার রাত্রে বাগানের সেই ছোট বাড়িটাতেই ছিল। সে প্রত্যাশা করিতেছিল কৃষ্ণকান্ত, সুব্রত এবং গগন সুপর্ণ সিংহ ও অনুপমাকে লইয়া বাগানে আসিবেন এবং সকলে মিলিয়া ঠিক করিবেন কাল বিবাহ কোথায় কিভাবে হইবে। বাড়িতে তাহার শুইবার স্থানও ছিল না, কারণ সুপর্ণ সিংহকেই সে নিচের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়াছিল। একা এই বাগানে সে আগেও অনেক রাত কাটাইয়াছে, বিশেষতঃ আমের সময়ে। ঘরটির ভিতর একজনের উপযুক্ত সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। খাট, বিছানা, ইজি-চেয়ার, টেবিল, খান দুই টিনের ফোলডিং চেয়ার, টুল, স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম, বন্দুক, একটা পেট্রোম্যাকস্, একটা সাধারণ লণ্ঠন, প্রয়োজনীয় সব জিনিসই ছিল সেখানে। কুমার রাত্রির খাওয়া শেষ করিয়াই আসিয়াছিল। কেবল সে উর্মিলাকে গোপনে বলিয়া আসিয়াছিল, "এখানে তো শোবার জায়গা নেই। আমি বাগানে শুতে চললাম। যদি কোনও দরকার হয় সেইখানেই খবর দিও। সুব্রতর বন্ধু সুপর্ণবাবু আমার ঘরটাতে শুয়েছেন।" ইহার বেশী সে আর কিছু বলে নাই।

.....কুমার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বন্দুকটা খুলিয়া দেখিল সেটা ঠিকমতো 'লোডেড' আছে কি না। টর্চটা একবার জ্বালিল। সব ঠিক আছে। তাহার পর হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল সে। নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া শব্দ হইল—হুম্ হুম্ তাহার পর আর একটু দূর হইতে কে যেন প্রত্যুত্তর দিল—'হুম্ হুম্'। কুমারের মুখে একটা স-স্নেহ হাসি ফুটিল। একজোড়া হুতোম প্যাঁচা গভীর রাত্রে এই বাগানে আসিয়া আলাপ করে তাহা কুমার জানিত। অনেক দিন পরে তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে আনন্দিত হইল। তাহার পর সে হঠাৎ লক্ষ্য করিল লণ্ঠনের আলোটা কমিয়া যাইতেছে। উঠিয়া নাড়িয়া দেখিল তেল নাই।

"বোধিয়া—"

বোধিয়া চাকরটা বাহিরের বারান্দায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া ছিল।

"জি—"

"লণ্ঠনটায় তেল নেই। তেল ভরে দে। টিনে তেল আছে তো?"

"জি—"

বোধিয়া লণ্ঠনটা ঠিক করিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। বোধিয়ার একটা অসাধারণ শক্তি আছে। তাহার ঘুম যত গভীরই হউক না কেন এক ডাকে সে উঠিয়া পড়ে এবং কাজকর্ম সারিয়া শুইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে। কুমার একটু পরেই তাহার নাসিকা ধ্বনি শুনিতে পাইল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার শোনা গেল—'গুম্ গুম্'। এবার কুমারের মনে হইল—গুম্ গুম্। মনে হইল কোনও রহস্যময় অন্ধকার দুর্গের চিররুদ্ধ কপাটে কে যেন অধীরভাবে করাঘাত করিতেছেন—এ তাহারই শব্দ। কুমার আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা করিবার ছিল কিন্তু কাজের চাপে করা হয় নাই। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল। বাবার ডায়েরিটা এখনও শেষ করিতে পারে নাই সে। ডায়েরিটা এখানেই সে রাখিয়া গিয়াছিল। ইহার কথা কাহাকেও সে বলে নাই, কাহাকেও দেখায় নাই। ভয় ছিল জানাজানি হইয়া গেলে সবাই কাড়াকাড়ি করিবে। আগে তাহার পড়া হইয়া যাক তাহার পর সে দাদাকে বলিবে। দাদার হাতেই খাতাটা দিয়া দিবে সে। কারণ দাদাই একদা বাবাকে স্মৃতিকথা লিখিবার জন্য এই খাতাটা দিয়াছিলেন। খাতাটা বাহির করিয়া সে পড়িতে শুরু করিল।

"ইহার পর মামীমার অসুখের কথাটা মনে পড়িতেছে। হঠাৎ একদিন প্রচুর 'হেমারেজ' হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ভাগলপুর হইতে ডাক্তার আসিল। দুইজন ডাক্তার। একজন সাহেব সিভিল সার্জন এবং আর একজন পাগলা যোগেন। পাগলা যোগেন নামে যে ডাক্তারটি তখন ভাগলপুরে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সত্যই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। বিলাতফেরত ডাক্তার ছিলেন তিনি। লোকে তাঁহাকে 'পাগলা' আখ্যা দিয়াছিল তাঁহার মহত্ত্বের জন্য। তিনি সেই সব কলেই আগে যাইতেন যেখানে পয়সা পাওয়া যাইবে না। তাহার পর সময় থাকিলে এবং প্রয়োজন বুঝিলে তিনি বড়লোকের বাড়ি যাইতেন। আমি যখন তাঁহাকে ডাকিতে গেলাম তখন মফস্বলের আর একটি বড়লোকও তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছিল। কিন্তু পাগলা যোগেন যেই শুনিলেন যে আমি ডাক্তার, মামী অসুস্থ এবং আমার মামাও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী তখনই তিনি সেই বড়লোককে বলিলেন, "আমাকে আজ এখানে যেতে হবে। কারণ এঁরা আমার আত্মীয়। আপনার ওখানে কাল যাব। আজ যেতে পারব না।" বড়লোকটি মনে করিল ফিস বাড়াইয়া দিলে হয়তো তিনি মত পরিবর্তন করিবেন। বলিলেন, "হুজুর, আমি ডবল ফিস দেব। আজই চলুন আমার ওখানে।" পাগলা যোগেন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তাহলে আপনার ওখানে আর যাওয়াই হবে না দেখছি। আপনার টাকা বেশী আছে। আপনি কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসুন। আমি বড়লোকের বাড়ি যাই না। আমি গরীবের ডাক্তার।" তিনি আরও কয়েকটি কল প্রত্যাখান করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। সিভিল সার্জন ছাড়া আমাদের সঙ্গে লেডি ডাক্তারও আসিয়াছিলেন একজন। যোগেনবাবুই তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা মামীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মামীমার

জরায়ুতে (uterus) cancer হইয়াছে। অপারেশন করিলে সারিবে এ আশ্বাসও দেওয়া যায় না, কারণ রোগ বেশ পুরাতন হইয়াছে। মামীমা ওই রোগেই মারা যান। মামীমা যতদিন অসুস্থ ছিলেন ততদিন আমার অন্য কোথাও প্র্যাকটিস করিতে বসার কল্পনাও কেহ করে নাই, আমিই মামীমার সেবার ভার লইয়াছিলাম। পয়সা দিয়াও মামীমাকে সেবা করিবার কোন লোক পাওয়া যায় নাই। পচা ক্যানসার হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হইত, সে দুর্গন্ধে সমস্ত ঘর এমন কি ঘরের সামনের বারান্দা পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া থাকিত। কেহ সেখানে যাইতে চাহিত না। মামা ছেলেমেয়েদের সেখানে যাইতে দিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল রোগটা ছোঁয়াচে। আমি দিনে তিনবার তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিতাম। জরায়ুর ভিতর হইতে রোজ খানিকটা পচা মাংস ও রক্ত বাহির হইত। আমিই তাহা পরিষ্কার করিয়া 'ড্রেস' করিয়া দিতাম। তাঁহার মলমূত্রও আমাকে পরিষ্কার করিতে হইত। অন্য সময়ে মামার ডিসপেন্সারিতে বসিতাম। সন্ধ্যার সময় থিয়েটারের রিহার্সালে যাইতে হইত। যতদূর মনে পড়িতেছে ইহাই তখন আমার দৈনন্দিন কর্মসূচী হইযাছিল। মামাও নাকি আমার অভিনয় দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা ইহার পরের বই 'আলিবাবা' করিব ঠিক করিয়াছিলাম। একটু হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম বলিয়া আমাকে দস্যুসর্দারের ভূমিকায় সকলে মনোনীত করিয়াছিলেন। এই সব ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিই তখন আমার জীবনের প্রধান ঘটনা। আজ এগুলিকে কত সামান্য, কত অকিঞ্চিৎকর মনে হইতেছে। এই সময় আমার জীবনের যে প্রধান ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল সে বিষয়ে কিন্তু আমার স্মৃতি খুব স্পষ্ট নয়। যতদূর মনে হয় নরসিং পাঁড়ে নামক একজন ভোজপুর সিপাহী আমাকে বলিয়াছিল যে আপনি যদি গঙ্গার ওপারে মনিহারী গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন তাহা হইলে আপনার প্র্যাকটিস ভাল হইবে। আপনার হাতযশ আছে। নরসিং পাঁড়ের ক্রনিক্ ব্রংকাইটিস ছিল। আমার ঔষধ খাইয়া কাসি সারিয়া গিয়াছিল তাহার। সে বলিয়াছিল আমি যদি যাইতে চাই সে আমাকে বসিবার সাহায্য করিবে। ওপারে 'অংরেজি দবাই' দিবার কোনও ডাক্তার নাই। ওপারের সকলের জীবন-মরণ কবিরাজদের হাতে। আমার মামার কাছে মাঝে মাঝে ওপারের রোগী আসে। সেই সূত্রে ওপারের দেওয়ানজির সহিত মামার বেশ খাতির আছে। মামা যদি দেওয়ানজিকে একটা চিঠি লিখিয়া দেন তাহা হইলে তো কোন ভাবনাই থাকিবে না। দেওয়ানজি থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। দেওয়ানজি নিজে অবশ্য 'অংরেজি দবাই' করেন না—নীলকণ্ঠ মিশির নামক কবিরাজের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তবু মামার চিঠি লইয়া গেলে কাজ হইবে। আমি তখন অসুস্থ মামীমাকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম তাই এ বিষয়ে তেমন গা করি নাই। ছয় মাস নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মামীমা মারা গেলেন। মরিবার আগে তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, "যদিও তোমাকে পেটে ধরিনি, কিন্তু তুমিই বাবা আমার ছেলের কাজ করেছ। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজরাজেশ্বর হবে। আমি নিশ্চিন্তে মরছি, সুশীলা আর কুসুমের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দুটো ছোট, ভগবানই ওদের রক্ষা করবেন।" মামার পদধূলি মাথায় দিয়া হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গোদক পান করিয়া সজ্ঞানে তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর আশ্চর্য মহিমা। মামীমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার প্রতি আমার একটা বিরূপ মনোভাব ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরূপতা অন্তর্হিত হইয়া গেল। মনে হইল আমি যেন দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম। মামার ছেলেমেয়েরা আমাকেই

ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আমাকে দাদা বলিত, দাদার সম্মান ও ভালবাসা দিতে তাহারা কোনদিন কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু তবু একটু যেন পার্থক্য ছিল। আমি যে মাতৃহীন, আমি যে মামার বাড়িতে অনুগৃহীত পোষ্যমাত্র আমার নিজের মনে এই ভাবটা ছিল বলিয়া আমি এতদিন প্রসন্নমনে তাহাদের ভালবাসার অর্ঘ্য লইতে পারি নাই। মামীমার মৃত্যুর পর আমার মনের সে ভাবটা কাটিয়া গেল, মনে হইল উহারাও আজ মাতৃহীন, উহারাও আজ আমারই মতো অসহায়, এই বিশাল সংসার-সমুদ্রে উহারাও আজ আমার নৌকায় আসিয়া উঠিয়াছে। উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব এখন আমারই। ভগবান জানেন, আমার এ দায়িত্ব পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। না পারিবার প্রধান কারণ আমি আইনতঃ উহাদের অভিভাবক ছিলাম না। এসব বিষয়ে আমার পরামর্শ মামা কখনও শোনেন নাই। মামীমাই যে মামার ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর বোঝা গেল। মামার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার পর হইতেই ক্রমশঃ মামার ভাগ্যোদয় হয়। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন মামার উন্নতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই অবনতি শুরু হইল। মৃত্যুর মাস দুই পরেই শুনিলাম মামার নুনের ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান হইয়াছে। বাঙালীদের অনেক ব্যবসায়ে লোকসান হইতে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ বাঙালী ব্যবসায়ী একটানা ব্যবসা করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছেন, এরকম উদাহরণ আমার জানা-শোনার মধ্যে বড় একটা নাই। অল্প মূলধন লইয়া যাহাদের ব্যবসা করিতে হয় তাহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি সদগুণ থাকা প্রয়োজন যাহা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। সাধারণতঃ যে সব বখা বাঙালী ছোকরা অন্য অন্য সব ক্ষেত্রে বিফলমনোরথ হইয়া ব্যবসার নামে প্রহসন করে তাহাদের উন্নতি হইলেই আশ্চর্য বোধ করিতাম। মামার কিন্তু মূলধন অল্প ছিল না, মামার চারিত্রিক গুণও অনেক ছিল, কিন্তু মামা ব্যবসার কিছু দেখিতেন না। তাঁহার ব্যাপারীদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন তিনি। দুই নৌকায় একসঙ্গে পা দিয়া চলা শক্ত। মামা ভাবিয়াছিলেন ডাক্তারি করিতে করিতে ফাঁকতালে ব্যবসা করিয়া কিছু অর্থোপার্জন করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি ব্যবসায়ের হিসাবপত্র দেখিবার সময় পাইতেন না, আমার মনে হয় ব্যবসার বিশেষ কিছু বুঝিতেনও না। তাই যাহা কিছু হইয়াছিল তাহা কর্মচারীদের পেটেই গেল। মামা তখনই যদি ব্যবসা উঠাইয়া দিতেন তাহা হইলে ব্যাপারটা চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না, করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল ব্যবসা উঠাইয়া দিলে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, তাঁহার শত্রুপক্ষ আড়ালে ব্যাপারটা লইয়া হাসাহাসি করিবে, ব্যবসাটাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি লোকের অন্নসংস্থান হইতেছিল, ব্যবসা হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিলে তাহারাও মুশকিলে পড়িবে। এই ব্যবসার জন্য সত্যই অনেক লোক বাসায় আহার করিত। তাহাদের জন্য পৃথক একটা রন্ধন ব্যবস্থাই ছিল। শুদু ব্যাপারীরা নয়, অনেক দুঃস্থ আত্মীয়ও সেখানে দুইবেলা দুই মুঠো খাইয়া চাকরির চেষ্টা করিত। এই জন্যই মামা বিশেষ করিয়া ব্যবসাটা উঠাইয়া দিতে পারিলেন না। হরিদাস মাড়োয়ারির নিকট ঋণ করিয়া ব্যবসার ক্ষতিপূরণ করিলেন। তিনি বাহিরে এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন কিছুই হয় নাই।

জগন্নাথবাবুর চেষ্টায় আমাদের থিয়েটারের বেশ সুনাম হইয়াছিল। আমরা মাঝে মাঝে অন্য স্টেশনেও রেলের বাবুদের নিমন্ত্রণে থিয়েটার করিতে যাইতাম। কহলগাঁ, মিরজাচৌকি, তিনপাহাড় প্রভৃতি স্টেশনে আমরা 'সীতার বনবাস' অভিনয় করিয়া বহুলোকের মনোরঞ্জন

করিয়াছিলাম। সে যুগে রেলের কর্মচারীরা অতি সহজেই একটা স্টেজ খাড়া করিতে পারিত। মোটা রেলের স্লীপার দিয়া, বাঁশ যোগাড় করিয়া বেশ ভালো স্টেজ করিত তাহারা। আমরা আমাদের 'সীন' ও পোশাক লইয়া যাইতাম। লইয়া যাইবার কোনও খরচ ছিল না। মালগাড়িতে বিনা খরচায় চলিয়া যাইত। অন্য স্টেশনে থিয়েটার করিবার একটা বিশেষ আমোদ ছিল। যে স্টেশনে আমরা থিয়েটার করিতে যাইতাম সেখানে প্রচুর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন তো থাকিতই খাতিরও খুব পাওয়া যাইত। যাইবামাত্র আমাদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেওয়া হইত, বাড়ির মেয়েরা আমাদের জন্যে স্বহস্তে বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন। বয়স্থা বৃদ্ধারা আমাদের স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। সম্মানিত অতিথির সমাদর পাইতাম আমরা। থিয়েটার করিবার জন্য আমরা কোনও পয়সা লইতাম না। থিয়েটারের জন্য কোনও টিকিটও বিক্রয় করা হইত না। একটা বিরাট পিকনিক করিবার যে আনন্দ আমরা সকলে মিলিয়া উপভোগ করিতাম আজকালকার দিনে তাহার তুলনা মেলা ভার। সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরিয়া থাকিতেন জগন্নাথবাবু। আমাদের কাহারও কোনও বেচাল তিনি সহ্য করিতেন না। একটা কথা মনে পড়িতেছে। ফটিক সীতা সাজিত। সেবার আমরা পীরপৈঁতি স্টেশনে থিয়েটার করিব বলিয়া গিয়াছি। হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল ফটিক লুকাইয়া এক বোতল মদ আনিয়াছে। জনন্নাথবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া হাজির হইলেন। বলিলেন, "শুনলাম তুমি মদ নিয়ে এসেছ?" ফটিক নিরুত্তর।

"বোতলটা কোথায়, আমাকে দাও।"

আমতা আমতা করিয়া ফটিক বলিল, "আমি সামান্যই খাব। একটু না খেলে শরীরে জুৎ পাই না।"

"না এখানে ওসব চলবে না। বোতলটা দাও আমাকে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমাকে আমি একদিন ছুটি দেব, এক বোতল মদও দেব। ঘরে খিল দিয়ে যত ইচ্ছে খেও। এখানে ওসব বদচাল চলবে না। সীতা মদ খাচ্ছে একথা প্রকাশ পেলে আর থিয়েটার জমবে না। লোকে গায়ে থুতু দেবে।"

ফটিক জগন্নাথবাবুর আপিসে কাজ করিত। আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। মদের বোতলটি বাহির করিয়া দিল। সেদিন আমাদের অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম জগন্নাথবাবু তাঁহার কথা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সত্যই ফটিককে একদিন ছুটি এবং এক বোতল মদ দিয়াছেন। সেকালে এসব অসম্ভব সম্ভব হইত।

বাবার সহিত আমার আন্তরিক যোগাযোগ কোনদিনই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে ভক্তি করিতাম, অনুভব করিতাম তিনি ভিন্ন জগতের লোক এবং আমার চেয়ে অনেক বড়। তাঁহার মতো নিস্পৃহ এবং নির্বিকার লোক আমি অন্ততঃ দেখি নাই। তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষুণপ্রসাদই বাবার সংসার চালাইত। বাবা যাহা কিছু রোজগার করিতেন তাহাকেই দিতেন। সেই সব করিত। আমি বাবার বাসায় রোজ একবার বৈকালের দিকে যাইতাম। বাবা তখন থাকিতেন না। বিষুণপ্রসাদ থাকিত—সে আমাদের জন্য গরম পরোটা করিয়া দিত। বাবার হাতের রান্না মাংসও থাকিত খানিকটা। আমি মাংস আর পরোটা খাইয়া রোজ রিহার্সালে চলিয়া যাইতাম। বাবার সহিত প্রায়ই দেখা হইত না। চন্দরও রোজ বৈকালে বাবার বাসায় জলখাবার খাইতে যাইত। সে মাংস খাইতে চাহিত না বলিয়া

বিষুণপ্রসাদ তাহার জন্য প্রত্যহ আলুর দম বানাইয়া দিত। একদিন আমি খাইয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় বিষুণপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "সুরযুবাবু, আজ তো বড় একটা তাজ্জব কাণ্ড হয়ে গেল। গুরুজি কাল আমাকে বললেন পোস্টাপিসে আমার যত টাকা জমা আছে সব বার করে নিয়ে এস। পোস্টাফিসে সাড়ে তিনশ' টাকা সাড়ে ছ' আনা ছিল। আজ সব বার করে এনে দিলাম। কেন টাকা বার করতে চাইছেন তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হল না আমার। টাকা বার করে আনবার পর তিনি বললেন একটা মনিঅর্ডার ফর্ম নিয়ে এস। ফর্ম নিয়ে এলাম। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের এক ঠিকানায় রামরতন বাইয়ের নামে সব টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন। মনিঅর্ডারে ফর্মের কুপনে হিন্দীতে লিখলেন, 'বেটি, আজকাল আমার গুরুজির আখড়া কোথায় তা আমি জানি না। আশা করি তুমি ঠিকানাটা জান। সেই ঠিকানায় এই টাকা জমা করে দিও।'—বাস, আর কিছু লেখেননি। টাকাটা আজ আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। পোস্টাফিসের রসিদটা যখন তাঁকে এনে দিলাম তখন তিনি সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ওই দেখ, এখনও পড়ে আছে।" দেখিলাম সত্যই কুচিকুচি-করা রসিদটা উঠানে পড়িয়া আছে। বিষুণপ্রসাদ সভয়ে বলিল, "ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারছি না।" আমিও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে কিন্তু বেশী দেরি হয় নাই। তাহার পর দিনই গিয়া একটু অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম বাবা গঙ্গার চরে বেড়াইতে বাহির হন নাই, বাড়িতে বসিয়া তাঁহার হরিণটিকে কচি ঘাস খাওয়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি আজ রাত্রে কোথাও বেরিও না। এখানেই থাকো। আজ ভোরে আমাকে যেতে হবে—"

বাবা মাঝে মাঝে সংগীতের আসরে নিমন্ত্রিত হইয়া বাহির যাইতেন। আমার মনে হইল সেইরূপ কোনও আসরে যাইবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

"কোথায় যাবেন?"

"একেবারে চলে যাব। তোমার মা ক'দিন থেকে রোজ আসছে। বলেছে আর একা থাকতে পাচ্ছে না সে। তাকে কথা দিয়েছি আজ ভোরে যাব।"

বাবা এমনভাবে কথাগুলি বলিলেন যেন তিনি অতি সাধারণ কথা সহজভাবে বলিতেছেন। কথাগুলি বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে হইল বাবার কারণের মাত্রাটা আজ বোধহয় একটু বেশী হইয়া গিয়াছে। তাই এলেমেলো কথা বলিতেছেন। সেদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া আবার খবর লইলাম। শুনিলাম বাবা বাগচি মহাশয়ের বাড়িতে যান নাই। সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছেন। পরদিন ভোরে বাবার বাসায় চলিয়া গেলাম। বিষুণপ্রসাদ বলিল, "গুরুজি এখনও ওঠেননি। অন্যদিন এ সময়ে উঠে গঙ্গাস্নানে চলে যান। শরীরটা বোধহয় ভালো নেই।" কপাট ঠেলিয়া আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম বাবা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। যে কালীর পটটাকে রোজ তিনি পূজা করিতেন, দেখিলাম সেটা তাঁর পূজার জায়গায় নাই, সেটাকে তিনি মাথার শিয়রে টাঙাইয়া দিয়াছেন। ডাকিয়া তাঁহার সাড়া পাইলাম না। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া চাদর সরাইয়া গায়ে হাত দিলাম। গা বরফের মতো শীতল। নাড়ি নাই। সত্যই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। বাবার এই অদ্ভুত মৃত্যুর কথা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিষুণপ্রসাদ বাবার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। একটু পরেই সে কিন্তু উঠিয়া পড়িল। বলিল, "একটা মহাত্মা চলে গেল। মহাত্মাকে মহাত্মার মতোই বিদায়

দিতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা করছি।" একটু পরেই লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। দুই দল কীর্তনীয়া আসিয়া হাজির হইল। প্রচুর ফুল, ফুলের মালায় বাবার দেহকে ঢাকিয়া রাজকীয় মর্যাদায় বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাতীরে বহু নরনারী আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিতে লাগিল। মামা হাপুসনয়নে কাঁদিতেছিলেন। সুধীর ও চন্দ্রও খুব কাঁদিতেছিল। আমি নির্বাক হতভম্ব হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই আমি কাঁদিতে পারিতেছিলাম না। বুকের মধ্যে একটা অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বিষুণপ্রসাদ কোথা হইতে বেলকাঠ যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। হরিদাস মাড়োয়ারি কিছু চন্দনকাঠও লইয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম হরিণটা উৎসুকনেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে। ঘাস জল কিছুই খায় নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর খাওয়াইতে পারি নাই। বাবার মৃত্যুর আট দিন পরে সে-ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। যতক্ষণ বাঁচিয়া ছিল দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া ছিল, চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতেছিল। এমন নীরব গম্ভীর শোকের দৃশ্য আমি আর দেখি নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহাকেও গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দাহ করিলাম। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহার সিং দুটি রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাহা এখনও আমার নিকট আছে।

বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পরে আরও দুইটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিল। সুশীলা এবং কুসুম দুজনেই বিধবা হইয়া গেল। সুশীলার স্বামী মারা গেল কলেরায়, কুসুমের স্বামী—যক্ষ্মায়। মামাব সংসারে এবং আমাদের জীবনে একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। দিদিমা দিবারাত্রি কাঁদিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা মঙ্গলচণ্ডী, এবার আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

নানারকম অশান্তির মধ্যে এক বৎসর কাটিয়া গেল।

হঠাৎ মামা একদিন আমাকে বলিলেন, "তোমার বিয়ের ঠিক করেছি একজায়গায়। তারা লিখেছে তোমাকে দেখতে আসবে।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। তাহার পর মনে পড়িল কে যেন আমাকে বলিয়াছিল যে মামা মোটারকম পণ দাবি করিয়া এক বড়লোকের মেয়ের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। মামার প্রস্তাব শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আমি নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না।"

মামা বলিলেন, "সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি ওপারে মনিহারিতে গিয়ে বসবে। আমি দেওয়ানজিকে চিঠি লিখে দেব। নরসিংহ পাঁড়ে আমাকে এ কথা বলেছিল। ভেবে দেখলাম, সে ঠিক কথাই বলেছে। ওপারে বসলে প্র্যাকটিস ভালই হবে। আমি দেওয়ানজিকে চিঠি লিখে দিলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। ওদের তাহলে কবে আসতে লিখব?"

"এখন কিছু লিখবেন না। আমি আগে মনিহারিটা দেখে আসি। আপনি একটা চিঠি লিখে দিন।"

"বেশ। কালই চলে' যাও তাহলে। তুমি ফিরে এলেই চিঠি লিখব ওদের। ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কন্যাদায় তো ওদের। ওরা এসে একেবারে আশীর্বাদ করে যাবে তোমাকে।"

ইহার উত্তরে তখন আর কিছু বলিলাম না।

দিদিমার কাছে গেলাম। আমি যাইতেই তারাপদ পুরোহিত সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন

দেখিলাম। তারাপদ পুরোহিত মামার একজন পারিষদ ছিলেন। মামার খোশামোদ করিয়া মামার নিকট হইতে তিনি নানারকম সুখ-সুবিধা আদায় করিতেন। শঙ্করায় মামার যে বিষয়সম্পত্তি ছিল খেতুমামার উপরই এতদিন তাহার দেখাশোনার ভার ছিল। কিন্তু খেতুমামা বৃদ্ধ হইয়া চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছিলেন না। তাই শঙ্করায় বিষয়সম্পত্তি দেখিবার ভার তারাপদ পুরোহিতের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। এই ছুতায় তিনি কিছুদিন শঙ্করায় এবং কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিতেন। শিবু নামে তাঁহার একটি বখাটে ছেলে ছিল। সেই ছেলেটিকেও তিনি মামার নুনের ব্যবসায়ে ব্যাপারীরূপে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। মামার শালা নকুলের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। নকুলও মামার নুনের ব্যবসায়ে ব্যাপারীর কাজ করিতে শুরু করিয়াছিল। এই সময়টা তারাপদ পুরোহিতই মামার প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারাপদ পুরোহিত উঠিয়া গেলে দিদিমাকে আমি সব কথা বলিলাম। সব শুনিয়া দিদিমা যাহা বলিলেন তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমার মনে হইয়াছিল দিদিমার সম্মতিক্রমেই মামা বোধহয় আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দিদিমা বলিলেন, "তুই এখন কিছুতেই বিয়েতে মত দিস্ নি। আগে তুই নিজের পায়ে দাঁড়া তারপর বিয়ে করিস। বিয়ে করে বউকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখিস। এই ভাঙা সংসারে আর তোর বউ এনে কাজ নেই।"

"কিন্তু মামা যে বলছেন।"

"কেন বলছে জানিস? ও আবার বিয়ে করবে। ওই তারাপদ পুরুত কোথা থেকে এক সম্বন্ধ এনেছে। দ্বিতীয়পক্ষের বউ তো আর রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলবে না। তোর বউকে দিয়ে সেই কাজটা করাবে। তুই খবরদার এখন বিয়ে করবি না। ওর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, যা খুশি করুক!

খবরটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়া কোনও কথা সরিল না।

দিদিমা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুই যত শিগগির পারিস এখান থেকে পালা।"

লক্ষ্য করিলাম তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা নামিয়াছে।

পরদিনই মামার নিকট হইতে চিঠি লইয়া মনিহারীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। মামা তখনও জানিতেন না যে আমি শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহ করিব না। জানিলে হয়তো তিনি হরুরু চৌধুরীকে চিঠি দিতেন না।

হরুরু চৌধুরী কালা ছিলেন। খুব আস্তে কথা বলিতেন। আমি গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মামার চিঠিখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতে পারি নাই, কারণ তখন তিনি মহাসমারোহে একটা জলচৌকির উপর বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। আমি গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম বেলা দশটায়। অত বেলায় কেন মুখ ধুইতেছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। সাধারণতঃ লোকে খুব ভোরেই মুখ ধোয়। কিন্তু পরে জানিয়াছিলাম দেওয়ানজির দৈনন্দিন জীবনধারা একটু স্বতন্ত্র। তিনি খুব ভোরে উঠিয়া একটা 'কুল্লা' করিয়া (কুলকুচা করিয়া) পদব্রজে গ্রামের বাহিরে গিয়া একটা মাঠে যান। সেখানে জমিদারের একচক্ষু ম্যানেজার এবং বধির দেওয়ান জমিদারি-সংক্রান্ত গোপন পরামর্শে লিপ্ত হন। খুব চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে হরুরু চৌধুরী শুনিতে পান না। কাছারিতে বসিয়া চীৎকার করিয়া পরামর্শ করিলে তাহা আর গোপন থাকে না। তাই চতুর রায় মহাশয় এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

খুব ভোরে মাঠের মাঝখানে কোন লোক থাকে না। সেইখানেই নিশ্চিন্ত মনে উঁহারা পরামর্শ করেন। রায় মহাশয় যাহা বলিবার তাহা চীৎকার করিয়া বলেন, চৌধুরী মহাশয় সব শুনিয়া খুব আস্তে আস্তে তাহার উত্তর দেন। পরামর্শ হইয়া গেলে সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া চৌধুরী মহাশয় বেলা প্রায় নয়টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন এবং মুখ ধুইতে বসেন। বারান্দার উপর একটি জলচৌকি পাতাই থাকে আর থাকে তাহার দুই ধারে দুই বালতি জল। একটি গামছা এবং দুইটি দাঁতন লইয়া তাঁহার 'খাওয়াশ্' (ভৃত্য) অপেক্ষা করে তাঁহার জন্য। তিনি আসিয়া প্রথমে নিমের দাঁতন লইয়া মুখ ধুইতে আরম্ভ করেন। নিমের দাঁতন দিয়া প্রত্যেকটি দাঁতের সামনে পিছনে ঘষিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রথম বালতির জলে বহুবার 'কুল্লা' করেন। তাহার পর দ্বিতীয় দাঁতন। সেটি বাঘাণ্ডির, অর্থাৎ বাঘভেরেণ্ডার। তাহা নিয়াও অনেকক্ষণ দাঁত এবং বিশেষ করিয়া দাঁতের মাড়ি মাজেন। তাহার পর জিব পরিষ্কার করিবার পালা। প্রথমতঃ আঙুল দিয়া, তাহার পর দাঁতন দিয়া। এ ব্যাপারটা শব্দবহুল এবং দৃষ্টিকটু। মনে হয় যেন বমি করিতেছেন। পাড়ার সমস্ত লোক বুঝিতে পারে দেওয়ানজি মুখ ধুইতেছেন, এইবার আহারে বসিবেন। পাড়ার দুই তিনটি ছোট ছোট গরীব ছেলেকেও এই সময় তিনি খাইতে দেন। তাঁহার জিব-ছোলাব শব্দ পাইলেই তাহারা আসিয়া হাজির হয়। আমি যখন গেলাম তখন দ্বিতীয় বালতির জলও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি আমার পরিচয় দিলাম, কিন্তু তিনি কিছু শুনিতে পাইলেন না। আমার দিকে শুধু একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। তাঁহার 'খাওয়াশ্' বলিল, "হুজুর, বৈঠিয়ে" এবং আমাকে একটি মোড়া আগাইয়া দিল। মুখ ধোয়া শেষ করিয়া দেওয়ানজি হাত মুখ মুছিয়া আর একটি মোড়ায় যখন বসিলেন তখন আমার চিঠিটি তাঁহাকে দিলাম। চিঠিটি একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন তাহার পর সেটি তাঁহার খাওয়াশের হাতে দিয়া বলিলেন, "ছত্তিস্ বাবুকো বোলাও।"

গোমস্তা সতীশবাবু ও অঞ্চলে 'ছত্তিস্ বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দেওয়ানজির দক্ষিণ হস্ত। দেওয়ানজি লেখাপড়া কতদূর জানিতেন তাহা কখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। বরাবর দেখিয়াছি সেরেস্তার যাবতীয় লেখাপড়ার কাজ ছত্তিস্‌বাবুই চালাইতেন। বাংলা হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় কিছু কিছু জ্ঞান ছিল সতীশবাবুর। চিঠি আসিলে তিনিই তাহা পড়িয়া তাহার মর্মার্থ দেওয়ানজিকে শুনাইয়া দিতেন। কিন্তু সতীশবাবু বেশী চীৎকার করিতেন না। দেওয়ানজির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গুন গুন করিয়া কথা বলিতেন। দেওয়ানজিও চিঠির উত্তরটা মুখে মুখে বলিয়া দিতেন এবং সতীশবাবু তদনুসারে উত্তরটা লিখিয়া পাঠাইতেন। উত্তর সতীশবাবুর নামে লেখা হইত। দেওয়ানজি তাহাতে সহি পর্যন্ত করিতেন না। কেবল উপরে লেখা থাকিত—মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীত্রিপুরারি সিংহের দেওয়ান শ্রীহরুরু চৌধুরীর আদেশ অনুসারে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। পত্রের নীচে সহি থাকিত সতীশবাবুর। ত্রিপুরারি সিংহ নাকি 'শতং বদ, মা লিখ' এই নীতি অনুসরণ করিতেন। তাঁহার ম্যানেজার এবং দেওয়ানরা যেন সহসা কোনও লিখিত ব্যাপারের মধ্যে না ঢোকেন ইহাই তাঁহার নির্দেশ ছিল।

তাঁহার 'খাওয়াশ্' সতীশবাবুকে ডাকিতে যাইবার একটু পরেই ভিতর হইতে আর একটি চাকর আসিয়া খবর দিল যে 'জলা খৈ' দেওয়া হইয়াছে। চাকরটি আমাকেও আহ্বান করিল।

দেওয়ানজিও মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "চলুন, কিছু খাবেন।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দুইটি আসন পাতা হইয়াছে। একটিতে আমি গিয়া বসিলাম আর একটিতে দেওয়ানজি। খাবার যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা আজকাল হয়তো অনেকের বিস্ময় কিংবা হাস্য উদ্রেক করিবে। চা, বিস্কুট, কেক বা লুচি কচুরি নয়, ছিল কয়েক প্রকার লাড়ু এবং অনেকটা ক্ষীর। লাড়ুগুলি বেশ শক্ত, দাঁতের জোর না থাকিলে সে লাড়ুকে কায়দা করা যান না। দেওয়ানজি অবলীলাক্রমে সেগুলি খাইয়া ফেলিলেন। আমিও খাইয়া ফেলিলাম, কারণ আমারও তখন দাঁতে বেশ জোর ছিল।....

.....আহারান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সতীশবাবু আসিয়াছেন। কালো বেঁটে মোটা মানুষটি। চোখে মুখে হাসি চিকমিক করিতেছে। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ভালো লাগিয়া গেল। মামার চিঠিটা পড়িয়া তাহার ভাবার্থ তিনি দেওয়ানজির কানে গুন গুন করিয়া জানাইলেন।

দেওয়ানজির ভাব-লেশহীন চোখের দৃষ্টি একটু যেন প্রদীপ্ত হইল। বলিলেন, "আপনি শক্তিবাবুর ভাগনে, আপনি এখানে প্র্যাকটিস করতে আসবেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আমি আমার গোয়ালের পাশে একটা মাটির নতুন ঘর করেছি। ভেবেছিলাম ওটাতে গাই গরুর জন্যে গমের ভুসো রাখব। তা আপনিই এসে ওখানে থাকুন এখন। আমি আলাদা একটা ভুসকার করিয়ে নেব। কি বল ছত্তিস্?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো অনায়াসে হতে পারে।"

"তাহলে আপনি চলে আসুন একদিন। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।"

সতীশবাবু সেদিন আমাকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। দেখিলাম তিনি স্বপাক আহার করেন। সাধারণতঃ ভাতে ভাতই খান। দুধটাই প্রধান খাদ্য। তিনি বীরভূম জেলার লোক। মনে পড়িতেছে সেদিন আমার জন্য আলু পোস্ত ও টক ডাল করিয়াছিলেন। খুব তৃপ্তি-সহকারে খাইয়াছিলাম সেদিন।

সতীশবাবু সেদিন আমাকে একটি অমূল্য উপদেশও দিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি করব? আপনি স্বপাক খান দেখে একটু ভাবনায় পড়েছি। আমাকেও কি রেঁধে খেতে হবে? আমি তো আগে কখনও রাঁধিনি।"

"আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে আপনার খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। আমাদের ম্যানেজার রায় মশায় কিংবা দেওয়ানজি নিজেই হয়তো আপনাকে বলবেন ওদের কাছারিতে খেতে। কাছারিতে আমলাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনিও সেখানে খেতে পারবেন। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনেন, খাবেন না। কোথাও অন্নদাস হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতা থাকে না। ত্রিপুরারিবাবু দাঙ্গাবাজ জমিদার, আপনার মতো একজন ডাক্তারকে নিজেদের বশীভূত করে রাখলে ওদের সুবিধে হবে। তার মানে ওদের কাছারিতে যদি আপনি খান তাহলে আপনাকে ওদের কথায় উঠতে বসতে হবে। তা আপনি করবেন কেন? ভাতে ভাতে চড়িয়ে দিয়ে নাবিয়ে নিতে কিই বা বিদ্যেবুদ্ধি দরকার হয়? তা ছাড়া দুধ এখানে খুব সস্তা। টাকায় বত্রিশ সের খাঁটি দুধ। দু'পয়সার দুধ কিনলেই যথেষ্ট। আমি ওদের চাকরি করি, কিন্তু আমি ওদের অন্নদাস হইনি। নিজেই রেঁধে খাই। পরিবারকে আনতে পারতুম, কিন্তু পরিবার আনতে সাহস হয় না। এদের রোজই একটা-না-একটা দাঙ্গা লেগে আছে। টেলার সাহেবের জমিদারি কিনেছে এরা, কিন্তু সাহেব দখলদারি দিচ্ছে না। রোজই একটা-না-একটা হুজ্জৎ লেগেই আছে। তাই পরিবার আর আনিনি। কাঁটাক্রোশের

ফৌজিলালের ঘরে সাহেবের লোকেরা আগুনই ধরিয়ে দিয়েছিল একদিন। আপনি আসুন, এলেই সব বুঝতে পারবেন হালচাল। চলে আসুন, এখানে ভালো ডাক্তার একেবারে নেই। টিকে থাকতে পারলে এখানে প্র্যাকটিস হবে।"

সেই দিনই আমি সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। হাতে পয়সা কম ছিল। ফিরিবার সময় ট্রেনে-স্টিমারে ফিরি নাই। পারঘাটায় পার হইয়া গঙ্গার চরের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম। মনে আছে সেইদিনই পারঘাটার মাঝি ভগ্‌গুর সহিত আলাপ হইয়াছিল। আমি যে নৌকায় পার হইয়াছিলাম সে নৌকায় দর্জী দুলারনও ছিল মনে পড়িতেছে। আমি মনিহারীতে আসিয়া ডাক্তারি করিব এ কথায় সে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল সে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। আমি ডাক্তার শুনিয়া নৌকার অন্যান্য যাত্রীরাও উৎসুক নেত্রে আমার দিকে চাহিতে লাগিল—আমি যেন একটা অদ্ভুত অসাধারণ প্রাণী। গঙ্গার চরে শির্সাবাদিয়া নামে একদল মুর্শিদাবাদী মুসলমান চাষী বাস করিত। তাহারা গ্রামই পত্তন করিয়াছিল একটা। এদেশের লোক সংক্ষেপে তাহাদের নামকরণ করিয়াছিল 'বাধিয়া'। সেই নৌকায় 'বাধিয়া'দের মোড়ল রমজান আলী ছিলেন। বেশ শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তি। একমুখ কস্‌কসে কালো দাড়ি। গোঁফটি কামানো। তিনি আদাব করিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার পায়ে যে চুলকানি হইয়াছে তাহার কোন ব্যবস্থা আমি করিতে পারি কি না জানিতে চাহিলেন। আমার পকেটে ছোট একটা 'নোটবুক' এবং পেন্সিল ছিল। আমি নোটবুক হইতে পাতা ছিঁড়িয়া নৌকাতে বসিয়াই তাঁহাকে একটি প্রেসকৃপশন লিখিয়া দিলাম। ও অঞ্চলে সেখ রমজান আলীই আমার প্রথম রোগী। পরে তাঁহাদের সহিত গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি যে গ্রামের মোড়ল ছিলেন সে গ্রামের সমস্ত রোগীর চিকিৎসা আমিই পরে করিতাম।

সাহেবগঞ্জে ফিরিয়াই শুনিলাম আমাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য লোক আসিয়া গিয়াছে। তারাপদ পুরোহিত পাঁজি দেখিয়া দিনক্ষণ সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। পরদিন সকাল নটার সময় আমার হবু শ্বশুর আমাকে নাকি আশীর্বাদ করিবেন। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটিবে তাহা প্রত্যাশা করি নাই। একটু ভয় পাইয়া গেলাম। দিদিমার কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন—"তুই গা ঢাকা দিয়ে সরে পড় এখান থেকে। এ বিয়ে তোকে করতে হবে না। নেত্য নাকি খবর পেয়েছে মেয়ে শুধু কালো নয়, খোঁড়াও।"

গা ঢাকা দিয়া চোরের মত সরিয়া পড়িতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। মামাকে গিয়া বললাম, "আমি এখন ওখানে বিয়ে করব না। ওঁদের যেতে বলুন।"

তারাপদ পুরোহিত নিকটেই বসিয়া ছিলেন।

"বেশ তো বাপু, বিয়ে পরেই কোরো। আশীর্বাদটা হয়ে থাক না, তাতে ক্ষতিটা কি! আশীর্বাদের এক বছর পরেও বিয়ে হতে পারে"

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "আমি নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না। সেটা কবে হবে তার ঠিক নেই। ভদ্রলোকদের অনর্থক আশায় আশায় রাখতে চাই না।"

মামা নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। এইবার বলিলেন।

"আমি ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছি। পণের কিছু অগ্রিম টাকাও ওঁরা নিয়ে এসেছেন, এ

অবস্থায় তাঁদের ফিরিয়ে দেব কি করে! তুমি মনিহারীতে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছ, ওই টাকাটা পেলে তোমারই সুবিধে হবে। বিয়ে তো করবেই একদিন।"

"আমি পণ নিয়ে বিয়ে করব না। আপনি ওঁদের যেতে বলুন।"

"এটা যে আমার পক্ষে কত বড় অপমান তা কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ না? আমার বাড়িতে থেকে তুমি আমাকে অপমান করবে?"

"বেশ, আপনার বাড়িতে আর আমি থাকব না, চললুম।"

তৎক্ষণাৎ আমি মামার বাড়ি ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সাহেবগঞ্জে কোথাও থাকিতে আর সাহস হইল না। সেই রাত্রেই সোজা গঙ্গার পারঘাটায় চলিয়া গেলাম। সেখানে যখন পৌঁছিলাম তখন কত রাত্রি হইয়াছিল জানি না, আমার ঘড়ি ছিল না। পারঘাটায় গিয়া দেখিলাম চাঁদ অস্ত যাইতেছে। অস্তমান চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় গঙ্গায় জল ঝলমল করিতেছে। সেই আশ্চর্য শোভার দিকে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙিল গান শুনিয়া। কে যেন গান গাহিতে গাহিতে এইদিকে আসিতেছে। লোকটি তীরে আসিয়া ঝপাৎ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। আমি আর একটু আগাইয়া গেলাম। অন্ধকার ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। আমি গঙ্গার ধারে বালুর উপরই বসিয়া পড়িলাম! লোকটি স্নান সারিয়া উঠিল। অন্ধকার আর একটু স্বচ্ছ হইল। পূর্বদিগন্তে ঊষার অরুণাভা দেখা দিল। লোকটি স্নান সারিয়া উঠিতেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম। ভগ্‌গু মাঝি। ভগ্‌গু মাঝিও আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

"আরে, ডাক্তারবাবু, এত সকালে?"

"ওপারে যাব।"

"নৌকো ছাড়তে তো এখনও দেরি আছে।"

"অপেক্ষা করি।"

"চলুন, আমার বাসায় চলুন—ওই যে আমার বাসা—এখানে কোথা বসবেন?"

একটু দূরে খড়ের একটা কুটির দেখা গেল।

কুটিরে ঢুকিয়াই প্রথমে নজরে পড়িল ভগ্‌গুর উলকি-পরা বউ হুঁকায় তামাক খাইতেছে। আমাদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

"ডাক্তারবাবু এসেছে, ডাক্তারবাবুর জন্যেও একটু দুধ গরম কর।"

তখন চায়ের ব্যাপক প্রচলন হয় নাই। দেখিতে পাইলাম ভগগুর কুটিরের ওপাশে একটি কালো গাই বাঁধা আছে। ভগ্‌গু নিজেই গাইটি দুহিয়া ফেলিল।

"আপনি চূড়া খাবেন?"

"না।"

"ছাতু?"

"না, আমার কিছু দরকার নেই।"

"না, দুধ আপনাকে একটু খেতে হবে! আমি কোনও বাহানা শুনব না।"

বলা বাহুল্য, ভগগুর সহিত আমার হিন্দীতেই কথাবার্তা হইয়াছিল, আমি সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

এক গ্লাস টাটকা গরম দুধ খাইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিলাম। সাড়ে পাঁচটায় নৌকা ছাড়িল।

আমিই একক যাত্রী। মনিহারীতে পৌঁছিয়া যখন দেওয়ানজির বাসায় গেলাম তখন আমার কাছে মাত্র এগারো আনা পয়সা ছিল। উহাই আমার ক্যাপিট্যাল। উহারই সাহায্যে নূতন জীবন আরম্ভ করিলাম। দেওয়ানজির সহিত দেখা হইল না। শুনিলাম তিনি আর ম্যানেজার রায় মহাশয় সদরে মালিকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে টেলর সাহেবের লোকদের সহিত একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সেই সম্পর্কে যে মকদ্দমা হইতেছে তাহারই তদ্বিরে সকলে ব্যস্ত। সতীশবাবুর কাছে গেলাম। তিনি সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আজই চলে এলেন? ভালো দিনেই এসেছেন। আজ আমাদের কাছারিতে মা কালীর বিশেষ পূজা হচ্ছে একটা। আপনার জিনিসপত্র কই?"

"আমার জিনিসপত্র কিছু নেই। এখানেই সব সংগ্রহ করতে হবে।"

"কি রকম?"

"সব বলছি।"

প্রথমে আমার একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত সতীশবাবুকে সব কথা খুলিয়া বলিব কি না। বলিলে আমার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হইবে না তো? আমার মতো সহায়সম্বলহীন দরিদ্র লোককে তিনি গলগ্রহ বলিয়া মনে করিবেন না তো? কিন্তু আমার গত্যন্তর ছিল না। আমি একটা জায়গায় প্র্যাকটিস করিতে আসিয়াছি অথচ আমার সঙ্গে কোনও বিছানাপত্র নাই, ঔষধ নাই, আছে মাত্র সাড়ে এগারো আনা পয়সা, এই হাস্যকর ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা না দিলে সতীশবাবু আমার সম্বন্ধে যে ধারণা করিবেন তাহা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হইবে।

তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। এমন কি আমার মামা অগ্রিম পাঁচশত টাকা পণ লইয়া আমার যে বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন তাহা ভাঙিয়া দিয়া আমি যে গোপনে এখানে চলিয়া আসিয়াছি সে কথাও বলিলাম তাঁহাকে। লক্ষ্য করিলাম সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত হইতেছে। বুঝিলাম সতীশবাবু উত্তেজিত হইয়াছেন। কিন্তু এ উত্তেজনাটা আমার প্রতি ক্রোধবশতঃ না সহানুভূতিজনিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার একটু ভয় হইল। সতীশবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর ধমকের সুরে রাগতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই, হয়েছে কি। সব ঠিক হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই।"

তাহার পর তিনি হাঁক দিলেন—"চৌবে জি—"

একটি বলিষ্ঠকায় সিপাহী আসিয়া দাঁড়াইল।

"বেচন মিশির কেমন আছে?"

সতীশবাবু সকলের সহিত বাংলাতেই কথাবার্তা বলিতেন।

চৌবেজি অবশ্য উত্তর দিলেন হিন্দীতে। বলিলেন মিশিরজির জ্বর এখনও ছাড়ে নাই। লছমন কবিরাজ বলিয়াছেন যে তাঁহার 'হালৎ' আশাপ্রদ নহে, কারণ বায়ু পিত্ত এবং কফ তিনটাই নাকি কুপিত হইয়া উঠিয়াছে। সতীশবাবু তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বেচন মিশির আমাদের একজন বিশ্বাসী কর্মচারী। কাঁটাক্রোশে তিনি থাকেন। কয়েকদিন থেকে খুব অসুস্থ হয়ে আছেন। আপনি গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ভারটা নিন। স্টেট থেকেই আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনার 'ফি' আমরাই দেব।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং ভিতর হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন।

"এই নিন আপনার ফি। কাঁটাক্রোশ বেশী দূর নয়। চৌবেজি, আমাদের পালকিটা ঠিক করতে বল। আর তুমি ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে মিশিরজির বাড়ি নিয়ে যাও—"

'জি হুজুর' বলিয়া চৌবেজি বাহির হইয়া গেলেন।

আমি এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কখন যে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ যখন তাহা টপটপ করিয়া গালের উপর গড়াইয়া পড়িল তখন আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সতীশবাবুকে টাকা পাঁচটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"এখন আমি ফি নেব না। আগে মিশিরজিকে দেখে আসি, ভগবানের দয়ায় আমার চিকিৎসায় উনি আগে ভাল হয়ে উঠুন তারপর ফিয়ের কথা ভাবা যাবে।" আমি উঠিয়া পড়িলাম। সতীশবাবু নাসারন্ধ্র আবার বিস্ফারিত হইতে লাগিল।

সহসা তিনি উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বাস, আর আপনার ভাবনা নেই। এইবার আপনি আমাদের আপন লোক হয়ে গেলেন।"

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে স্টেথোসকোপ আছে, কিন্তু ওষুধ তো কিছু নেই।"

সতীশবাবু বলিলেন, "আমি সাহেবগঞ্জ থেকে ওষুধ আনিয়ে নেব। আপনি আগে গিয়ে দেখে আসুন।"

আমি গিয়া দেখিলাম মিশিরজির ম্যালেরিয়া হইয়াছে। আশা হইল দুই তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিব। সেইদিনই ফিরিয়া আসিয়া বিষুণপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখিলাম। যে লোক মিশিরজির ঔষধ আনিতে গেল সেই চিঠিটি লইয়া গেল। আমি কাঁটাক্রোশ হইতে ফিরিবার একটু পরেই এক হাঁড়ি দই, এক কাঁদি পাকা মর্তমান কলা এবং কিছু চিড়া লইয়া তিনজন লোক আসিয়া উপস্থিত। তাহারা বলিল, মিশিরজি আমার জন্য কিছু 'ভেট' পাঠাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র আবার বিস্ফারিত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাস্, এইবার তো সব হয়ে গেল। আপনার ঘরে আমি একটা নতুন চৌকি আর কিছু বিছানাও পাঠিয়ে দিয়েছি। রামকিষণ এক কলসী জল, একটা ঘটি আর গেলাসও রেখে এসেছে। আপনার উনুনও করিয়ে দেব কাল। কাল হাটও আছে, সেখান থেকে এক পয়সার মাটির বাসন কিনলেই আপনার চলে যাবে আপাতত। আজ আসুন ফলার করা যাক, মিশিরজি তো সব ব্যবস্থা করে পাঠিয়েই দিয়েছেন। আমিও আজ রাঁধব না। বাস্, সব ঠিক হয়ে গেল। এইবার চলুন একটু গল্প করা যাক। না, না, আপনিই ওই ইজি-চেয়ারটায় বসুন। আমি সোজা হয়ে বসতে ভালবাসি। ইজি-চেয়ারে খানিকক্ষণ বসলেই কোমরে ব্যথা হয়। আপনি বসুন—"

সেদিন ইজি-চেয়ারে বসিয়া সতীশবাবুর সহিত অনেক গল্প হইল। আমার জীবনের প্রায় সব ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম। সব শুনিয়া সতীশবাবু বলিলেন, "আপনার বাবার কথা যা বললেন তাতে মনে হয় জীবনে আপনি কোনও কষ্ট পাবেন না। তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর বুকটা কি লাল ছিল?"

"খুব লাল ছিল। কেন বলুন তো?"

"ওটা একটা সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ।"

সতীশবাবু শূন্যে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। কাহাকে করিলেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ বাবাকেই।

বৈকালে বেচন মিশিরের ঔষধ আসিয়া গেল। বিষুণপ্রসাদও আসিয়া পড়িল। দেখিলাম সে আমার বিছানাপত্র ট্রাঙ্ক সব লইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম মহাখুশী হইয়াছে সে।

"এ তো তাজ্জব কাণ্ড করলে তুমি সুরযুবাবু। বাড়িতে তোমাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে লোক বসে আছে আর তুমি ফট্‌সে গায়েব হয়ে গেলে! পাঁচ শ'টাকার দিকে ফিরেও তাকালে না।"

তাহার বড় বড় চোখ দুইটি হইতে বিস্ময় এবং হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর তাহাকে আমার ঘরটি দেখাইলাম। বিষুণপ্রসাদ নিজেই আমার বিছানা পাতিয়া দিল। রামকিষাণ এক কলসী জল ভরিয়া রাখিয়া ছিল। দেখিলাম কলসীর নিকট একটি পিতলের ঘটি এবং একটি কাঁসার গ্লাসও রহিয়াছে। সতীশবাবুই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সম্ভবতঃ। ঘরের একধারে দেখিলাম একটি দড়ির আলনাও টাঙানো রহিয়াছে এবং তাহাতে ঝুলিতেছে একটি নূতন গামছা, এক জোড়া নূতন কাপড় এবং একটি কম্বলের আসন। বুঝিলাম এ সমস্তই সতীশবাবুই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও এ সমস্তই আমার প্রয়োজন, তবু সতীশবাবুর এই বদান্যতায় মনে মনে একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। তাঁহার একটা উক্তি মনে পড়িল— "এইবার আপনি আমাদের আপন লোক হয়ে গেলেন। আর ভাবনা নেই"—তাঁহার এই কথাগুলি মৌখিক না আন্তরিক তাহা নির্ণয় করিবাব উপায় তখন ছিল না। কিন্তু একটা বিষয় আমি মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, কাহারও অনুগ্রহ আমি লইব না, নিজের জোরেই নিজের পায়ে আমাকে দাঁড়াইতে হইবে। জীবনের সম্বন্ধে তখন অভিজ্ঞতা কম ছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই যে সমাজে বাস করিতে হইলে অনুগ্রহের আদান-প্রদান না করিলে চলে না। ইহা প্রায় অনিবার্য। একমাত্র সন্ন্যাসীরাই কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষা না করিয়া নিজের পায়ের উপর সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শক্তিই তাঁহাদিগকে বলবান করে। প্রখর আত্মসম্মান আস্ফালন করিয়া যে সব লোক সাধারণতঃ সমাজে বিচরণ করেন তাঁহারা প্রায়ই অহংকারী। অহমিকার মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই তাঁহারা আত্মসম্মানের আড়ম্বর করেন। আত্মজ্ঞান না হইলে প্রকৃত আত্মসম্মানী হওয়া যায় না। কিন্তু তখন আমার এ জ্ঞান হয় নাই তাই সতীশবাবুর অনুগ্রহে বিপন্ন বোধ করিতেছিলাম। অথচ সতীশবাবুর উপহার প্রত্যাখ্যান করিবার সাহসও হইতেছিল না। বিষুণপ্রসাদও আমাকে আর একটা বিপদে ফেলিয়া দিল। সে আমার বিছানা পাতিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিল। ফিরিয়া বলিল, "আমি গ্রামটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। বেশ ভালো গ্রাম। এখানকার পোস্টমাস্টার বলরামবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। অত্যন্ত ভালো লোক। এখানে আমি একটা সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট খুলব ভেবেছি।"

আমি শুনিয়া একটু অবাক হইলাম। এখানে সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট খুলিয়া বিষুণপ্রসাদ কি করিবে?

"এখানে অ্যাকাউণ্ট খুলবেন কেন?"

"এখানে কিছু ব্যবসা করবার ইচ্ছা আছে। আজ রাত্রে এখানে থাকব।"

সেদিন রাত্রে বিষুণপ্রসাদই স্বহস্তে পরোটা এবং আলুর দম প্রস্তুত করিয়া আমাদের খাওয়াইল। সতীশবাবু যদিও স্বপাকে অভ্যস্ত এবং রাত্রে দুধ ছাড়া কিছু খান না, তবু তিনি বিষুণপ্রসাদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না। সন্ধ্যার পর বিষুণপ্রসাদ রামায়ণের গান গাহিয়া

মুগ্ধ করিয়া দিল সকলকে। সে যে এমন সুন্দর গান করিতে পারে তাহা আমিই জানিতাম না। বাবার কাছে সে সেতার শিখিত এইটুকুই শুধু জানা ছিল। বিষুণপ্রসাদ সেদিন হঠাৎ আসিয়া আমার সহিত সকলের পরিচয় যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া দিল। আমার বাবা যে কত বড় সাধক এবং গুণী ছিলেন, আমি যে কিরূপ কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারি পাস করিয়াছি, আমি যে কিরূপ চরিত্রবান ভালো ছেলে, আমি যে কত ভালো অভিনয় করিতে পারি এসবের বিশদ বর্ণনা সকলের নিকট করিয়া বিষুণপ্রসাদ একরাত্রির মধ্যেই আমাকে যে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল তাহা আমি এক বৎসরেও করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। পরদিন বিষুণপ্রসাদ পোস্টাফিস হইতে কয়েকটি উইথড্রয়াল ফর্ম আনিয়া আমাকে বলিল—"তুমি এগুলোতে এখানে সই করে' দাও।"

সেভিংস ব্যাংক সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

"আমি সই করব কেন!"

"আরে যা বলছি কর না।"

ধমক খাইয়া আমি তিনটি ফর্মে সহি করিয়া দিলাম। আমার মনে হইল সেভিংস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলিতে বোধহয় একজন সাক্ষীর দরকার হয়। একটু পরে বিষুণপ্রসাদ সেভিংস ব্যাংকের খাতা এবং উইথড্রয়াল ফর্মগুলি আনিয়া আমার ট্রাঙ্কে রাখিয়া দিয়া বলিল, এগুলো এখানেই থাক। যখন দরকার হবে টাকা বার করা যাবে। তখন আমি ভাল করিয়া দেখি নাই। বিষুণপ্রসাদ চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে দেখিয়াছিলাম। বিষুণপ্রসাদ পোস্টাফিসে তিনশত টাকা জমা করিয়া গিয়াছিল এবং উইথড্রয়াল ফর্মগুলিতে নিজে সহি করিয়া এবং আমাকে দিয়া সহি করাইয়া এমন ব্যবস্থা করিয়াছিল যাহাতে আমি তিন কিস্তিতে টাকাটা বাহির করিতে পারি। প্রতি কিস্তিতে একশত করিয়া টাকা বাহির করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিষুণপ্রসাদ চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে তাহার একটি চিঠি পাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। খামের চিঠি। জীবনে সেই প্রথম খামের চিঠি পাইলাম। চিঠিটা খুলিবার পূর্বেই বেশ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। খামে কে চিঠি লিখিল! খুলিয়া দেখি বিষুণপ্রসাদের দীর্ঘ পত্র। নূতন বাংলা শিখিতেছিল সে। বাংলাতেই বড় বড় অক্ষরে চিঠি লিখিয়াছিল। মনে হইতেছিল কোনও ছোট ছেলে চিঠি লিখিয়াছে। চিঠির ভাষা আমার এখন মনে নাই, ভাবটি মনে আছে। লিখিয়াছিল—আমি সেদিন তোমার সহিত ছলনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এজন্য আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার সামনে সব কথা বলিবার সাহস হইল না সেদিন। তুমি যদি বিগড়াইয়া ওঠ এই ভয়ে আসল কথা বলিতে পারি নাই। কৌশলে তোমার জন্য মনিহারী পোস্টা ফিসে তিনশত টাকা জমা করিয়া আসিয়াছি। যে তিনটি উইথড্রয়াল ফর্ম রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার সাহায্যেই তুমি অনায়াসে টাকা বাহির করিতে পারিবে। তুমি যখন স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিতেছ তখন তোমার টাকার দরকার হইবেই। তাই অনেক ভাবিয়া এই কৌশল করিলাম। তুমি হয়তো ভাবিবে, টাকাটা কাহার, আমি লইব কেন। আমি বলিতেছি টাকাটা তোমার। তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। ব্যাপারটা তাহা হইলে খুলিয়া বলি। গুরুজি আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে এতদিন আমি যাহা পাইয়াছি তাহা অমূল্য। মূল্য দিয়া সে মহত্ত্বের দাম শোধ করা যায় না। তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণীই থাকিতে হইবে। কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা ছিল—প্রণামীস্বরূপ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা দিব। তাঁহাকে দুই একবার

একথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই। কিন্তু আমি তাঁহার জন্য প্রতিমাসে কিছু কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতাম। ভাবিয়াছিলাম যখন তিনি রাজী হইবেন তখন তাঁহাকে দিব। কিন্তু আমাকে তিনি সে সুযোগ দিলেন না, হঠাৎ একদিন চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাইবার পূর্বে তিনি আমাকে একটা ইঙ্গিত (বিষুণপ্রসাদ লিখিয়াছিল 'ইশারা') দিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজে তিনি তাঁহার সমস্ত টাকা বাহির করিয়া তাঁহার গুরু-দক্ষিণা দিয়া গিয়াছেন। রমারতন বাঈয়ের নামে মনি-অর্ডার আমিই করিয়াছি। পরে খবর লইয়া জানিয়াছি রমারতন বাঈ ওঁর গুরুজির নাতনী। আমিও তাঁহার পথ অনুসরণ করিলাম। আমার সামান্য গুরু-দক্ষিণা তোমাকেই দিয়া আসিলাম। যাহা গুরুজির জন্য রাখিয়াছিলাম তাহা যদি তোমার কাজে লাগে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি গুরুজির বড় ছেলে, তোমাকে আমি আপনার ভাই বলিয়া মনে করি। যতদিন বাঁচিব ততদিন আমাদের এই সম্পর্ক অটুট থাকিবে।.....বিষুণপ্রসাদের এই চিঠি পাইয়া আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা শক্ত। এ চিঠি পাইবার পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথাও আর ভাবিতে পারিলাম না। বিষুণপ্রসাদকে লিখিয়া দিলাম তুমি এখানে আর একবার এস, তখন এ বিষয়ে কথা হইবে। কিন্তু বিষুণপ্রসাদ আর আসে নাই। মাসখানেক পরে খবর পাইলাম সে মারা গিয়াছে। সে নাকি ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছিল, সেখানেই কলেরা হইয়া একদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। খবরটা শুনিয়া অযৌক্তিকভাবে মনে হইয়াছিল বাবাই বোধহয় তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন। বিষুণপ্রসাদের টাকাটা অনেকদিন আমি পোস্টাফিস হইতে তুলি নাই। প্রায় বছর দুই পরে খবর পাইলাম অর্থাভাবে তাহার পরিবার নাকি বড় কষ্টে আছে। সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারীই আমাকে খবরটা দিল একদিন। তাহারই সহায়তায় বিষুণপ্রসাদের দেশের ঠিকানাটা যোগাড় করিয়া তাহার স্ত্রীর নামে টাকাটা পাঠাইয়া দিলাম। বিষুণপ্রসাদের পরিবারের সহিত আমার কোন যোগাযোগ হয় নাই শুনিয়াছিলাম কাশীরই লোক। আমার জীবনে বিষুণপ্রসাদ কিন্তু আজও অমর হইয়া আছে। তাহার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। অধিকাংশই মোটামুটি ভালো লোক, কিন্তু মহৎ লোকের সংখ্যা কম। আমি যে কয়জন মহৎ লোক দেখিয়াছি বিষুণপ্রসাদ তাহার মধ্যে একজন।......"

হঠাৎ ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ঘেউঘেউ করিয়া বাহিরে ডাকিয়া উঠিল। তাহারা কুমারের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং ঘরের পিছন দিকে পোয়ালগাদার পাশে ঘুমাইতেছিল। তাহাদের ডাক শুনিয়া কুমারের মনে হইল সুব্রত গগনের আসিবার কথা ছিল, তাহারাই বোধহয় আসিতেছে। কুমার টর্চ লইয়া বাহির হইল। দেখিল কে যেন টর্চ জ্বালিতে জ্বালিতে আগাইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে চিনিতে পারিল, গগন। গগনের সঙ্গে একটি চাকর এবং তাহার মাথায় একটি বিছানা।

কুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার?"

গগন হাসিমুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বিয়ে হবে না। অনু বিয়ে করতে চাইছে না। সে বললে আমি ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে বিয়ে করতে চাই না। বাবুল যে ওর ছেলে ও যদি কেবল এইটুকু মেনে নেয় তাহলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।"

"ভদ্রলোক মেনে নিয়েছেন?"

"এই দেখ। এতে তোমাকেও সই করতে হবে।"

গগন পকেট হইতে সুপর্ণ সিংহের সই-করা কাগজটি বাহির করিয়া দিল।

"চল ভিতরে যাই—"

ভিতরে গিয়া কুমার কাগজটি পড়িয়া বলিল—"অনুপমা মেয়েটি তো অসাধারণ দেখছি।".....

"গ্রেট। অথচ আমি জানি ও সত্যিই সুপর্ণকে ভালবাসে। তুমি কাগজটায় সই করেই দাও। কাল সুব্রত আর পিসেমশাইকে দিয়েও সই করিয়ে নেব।"

"তুই বিছানা আনলি কেন?"

"ভাবলাম এখানে তুমি একা আছ। তোমার কাছে এসে শুই।"

"ক'টা বেজেছে, আমি ঘড়িটা আনিনি।"

গগন নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল—"বেশী রাত হয়নি। পৌনে একটা। চায়ের ব্যবস্থা আছে এখানে তো। একটু চা করি?"

"এত রাত্রে চা খাবি।"

"Let us celebrate our victory—টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীসে কুটুজভ্ এই কথা বলেছিল। ওয়ার এণ্ড পীস পড়েছ?"

"না।"

"পোড়ো। আমার কাছে আছে, দিয়ে যাব। দিগন্তই পড়িয়েছিল আমাকে বইটা। অনেক বাজে বক্তৃতা আছে, কিন্তু 'গ্রেট বই।"

"বাবাকে দেখে এসেছিস?"

"হ্যাঁ। একটু আগে দাদুকে ওভালটিন করে' খাওয়ালাম। তারপর চম্পার একটা গান হল। গান শুনতে শুনতে দাদু ঘুমিয়ে পড়লেন। সবই ভালো আছে, তবে pulseটা একটু weak মনে হল।"

"তাই নাকি? ভয়ের কিছু নেই তো।"

"না আপাতত কিছু নেই। খাওয়াটা কম হচ্ছে যে। দাদু কিছু খেতে চান না। কাল থেকে মনে করছি খাওয়াটা একটু বাড়িয়ে দেব। দাদুর খাওয়ার গল্প শুনছিলাম কবরেজ মশাইয়ের কাছে। দাদু 'কল' থেকে ফিরে এসে আট দশখানা আটার রুটি, একবাটি ছোলার ডাল আর ক্ষীর খেতেন। এই ছিল জলখাবার। তারপর মাছটাছ দিয়ে ভাত। একটা বড় মুড়ো রোজ বরাদ্দ ছিল। তার সঙ্গে একবাটি ঘন দুধ। এখন খেতে হচ্ছে হরলিকস্, ফ্রুট জুস, সুকতো, চচ্চড়ি, যতসব ভুসিমাল। নাড়ি তো দুর্বল হবেই। কাল থেকে ভাবছি 'জাগ্‌সুপ' করে দেব। চিকেন পাওয়া যাবে? কিংবা পায়রার বাচ্চা?"

"পাওয়া সবই যাবে। কিন্তু বাবা খাবেন না। ওসবে ওঁর রুচি নেই এখন—"

"দেখি কাল বলে কয়ে যদি রাজী করাতে পারি।"

গগন স্টোভ জ্বালিতে বসিল। কুমার সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা তুলিয়া এমন জায়গায় রাখিল যাহাতে গগন সেটা দেখিতে না পায়।

কুমার এবং গগন পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ আগেই ঘুমটা আসিয়াছিল। কিন্তু সেদিন কুমারের অদৃষ্টে বিশ্রাম ছিল না। ল্যাংল্যাং ছুঁচকি আবার চীৎকার করিতে লাগিল। কুমারের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার কানে গেল দূরে একটা কলরব হইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখিল একদল লোক লাঠি, সড়কি, পেট্রোম্যাক্স লইয়া বাগানে

ঘোরাফেরা করিতেছে। বোধিয়া চাকরটারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। কুমার তাহাকেই পাঠাইয়া দিল ব্যাপার কি জানিবার জন্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুম দুম করিয়া বন্দুকেরও আওয়াজ হইল। কুমার আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। নিজেই তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল। কিছুদুর গিয়াই দেখিল সকলে তাহার কাছেই আসিতেছে। সকলের পুরোভাগে কৃষ্ণকান্ত। তাঁহার হাতে বন্দুক।

"ব্যাপার কি জামাইবাবু?"

"ভালুক। সংস্কৃতে যার নাম ঋক্ষ।"

"কি রকম?"

"তোমাদের ধনপতিয়া এমন একটা কাণ্ড করেছে যে সেটা তোমাদের এই গ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সত্যিই বীরাঙ্গনা—"

কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিতে লাগিল—"ধনপতিয়ার ছেলে তুনকা তার মায়ের কাছে থাকতে চাইছিল না। বলেছিল তোমার চেয়ে ভালুকই বড় আমার বড় জীবনে। ধনপতিয়া একথা মানেনি। সে অতবড় জোয়ান ছেলেটাকে মেরে ঘায়েল করে ফেলেছে। তারপর তাকে বেঁধে রেখেছে খুঁটিতে। তারপর যা করেছে তা আরও বীরত্বব্যঞ্জক। ওই প্রকাণ্ড ভালুকটার বাঁধন খুলে দিয়ে ঝাঁটা-পেটা করে' তাড়িয়ে দিয়েছে সেটাকে। ওদের ছেকা-ছেনি ভাষায় যা বলেছে তার বাংলা অনুবাদ—পোড়ামুখো, আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিবি তুই? দেখি তোর কত বড় হিম্মৎ। মারের চোটে পালিয়েছিল ভালুকটা। একটু পরেই শোনা গেল বন্ধনমুক্ত পশুটা গ্রামে ঢুকে জখম করেছে একটা মেয়েকে। সকলে বলছে মেয়েটা নাকি ধনপতিয়ার মতোই দেখতে। হৈ-হৈ পড়ে' গেছে গ্রামে। সবাই লাঠি সড়কি বার করে ঘেরাও করেছিল ভালুকটাকে। কিন্তু ভালুক সবেগে বুহ্য ভেদ করে একটা লোককে আঁচড়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকেছে তোমাদের বাগানে। ঢুকে উঠে পড়েছে বড় কাঁঠাল গাছটায়। আর সেখান থেকে তর্জনগর্জন করছে। কেউ কাছে যেতে সাহস করছে না, যদি মাথার উপর লাফিয়ে পড়ে! তখন রামপ্রসাদ আমার কাছে গিয়ে হাজির হল। আমিও ছুটে চলে এলাম। হার্ডল্ রেস করে' বলতে পার। তোমার দিদিকে চেনো তো!—"

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হাসিয়া চুপ করিলেন।

"তারপর? ভালুকটার কি হল?"

"যা হবার তাই হল! গাছতলায় পড়ে' আছে। যদি দেখতে চাও দেখে আসতে পার।"

"গগনটাকেও ওঠাই—"

"সে এখানে ঘুমুচ্ছে বুঝি! এত গোলমালেও ওর ঘুম ভাঙেনি? দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ দেখছি! ওঠাও ওকে—"

অনেক ডাকাডাকির পর গগনরে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

"ব্যাপার কি!"

"ভয়ানক কাণ্ড!"

সমস্ত শুনিয়া গগন বলিল, "অমন সুন্দর ভালুকটাকে মেরে ফেললেন!"

কৃষ্ণকান্ত হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন, "এ অবস্থায় আর

কি করা সম্ভব ছিল বল। একটা লোককে ঘায়েল করেছে, না মেরে ফেললে আরও দু'একজনকে করত। গ্রামে একটা 'প্যানিক' হয়ে গেছে। তোমার মনে হঠাৎ করুণার সঞ্চার হল কেন।"

"আমার দুঃখ হচ্ছে ভুনকার জন্য। মনে পড়ছে ছেলেবেলায় একটা টিয়াপাখি পুষেছিলাম। সেটা যেদিন মরে গেল সেদিন কি যে কষ্ট হয়েছিল আমার—"

"টিয়াপাখি সাধারণত মরে না। কি হয়েছিল তার?"

"দোষ আমারই। আমি বাজার থেকে রং কিনে এনে খাঁচায় লাগিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রঙিন খাঁচায় পাখিটাকে আরও সুন্দর দেখাবে। পাখিটা যে কাঁচা রং চেটে চেটে খাবে তা ভাবতে পারিনি। স্কুল থেকে এসে দেখি পাখিটা খাঁচার ভিতর মরে পড়ে আছে। মা বললে সারা দুপুর রং খেয়েছে—"

"বাংলা রং, ইংরেজী wrong হয়ে গেল।"

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হাসিয়া মন্তব্য করিলেন।

রামপ্রসাদ বাহির হইতে উঁকি মারিয়া বলিল, "জামাইবাবু, ভালুকটাকে এখানে আনব? সবাই ওর লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।"

"আমরা ভালুক নিয়ে কি করব? ওটা ভুনকার মাকে দিয়ে দাও। সে যা খুশি করুক। কী বল কুমার?"

"বেশ তো। ধনপতিয়াকে বলিস চামড়াটা যেন নষ্ট না করে। বিক্রী করলে ভালো দাম পাবে।"

"আচ্ছা।"

রামপ্রসাদ সদলবলে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে দেখছি। ভোরও তো হ'য়ে এল—"

"হ্যাঁ, এখুনি করে দিচ্ছি। একটু আগেই চা খেয়েছি আমরা। বোধিয়া কাপগুলো ধুয়ে ফেল।"

সহসা চতুর্দিকে পাখিরা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। আনন্দকাকলীতে ভরিয়া গেল সারা বাগানটা। দ্বারপ্রান্তে বাতায়নপথে দেখা দিল ভোরের শুচি স্নিগ্ধ আলো। অপ্রত্যাশিতভাবে আর একজনও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুপর্ণ সিংহ।

তাঁহাকে সোচ্ছ্বাসে অভ্যর্থনা করিলেন কৃষ্ণকান্ত।

"আসুন, আসুন, তারপর কি ঠিক হল শেষ পর্যন্ত।"

গগন বলিল, "আপনাকে সব এখনও বলা হয়নি। কাগজটা আমার কাছেই আছে। আপনাকেও এতে সই করতে হবে।"

"কি কাগজ।"

গগন কাগজটা বাহির করিয়া দিল। কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িলেন সেটা, তাহার পর বলিলেন, "ও, তাহলে তো আপনি ছাড়া পেয়ে গেছেন দেখছি। ভালই হল, সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না।"

সুপর্ণ সিংহ এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। কৃষ্ণকান্তের কথা শুনিয়া একবার গলাখাঁকারি দিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আমি ছাড়া পেতে চাই না। আমি ওই কাগজটায় সই করবার পর সমস্ত রাত আর ঘুমোইনি। আমার কেবলি মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা

ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। একটা কাগজে সই করে দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয় না। অনু যদি রাজী থাকে তাকে আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। সে বিয়ে এখানে আজই হতে পারে কিংবা পরে অন্য কোথাও হতে পারে। সেটা অনু ঠিক করুক। আপনারা শুধু দয়া করে তাকে এই কথাটা জানিয়ে দিন যে এখন আমি যা করতে চাইছি তা বাইরের চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে করতে চাচ্ছি না। নিজের মন থেকেই ঠিক করেছি এটা। অনু যখন আমায় মুক্তি দিলে তখন আমার মনে হল এ মুক্তি অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে আমার জীবনে। আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। অনুকে আমার জীবনের সঙ্গিনী করতেই হবে। তাকে আর আমি ছেড়ে থাকতে পারব না।"

সুপর্ণ সিংহ চুপ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত লক্ষ্য করিলেন কথা বলিতে বলিতে তাঁহার গলার স্বর শেষের দিকে বেশ কাঁপিয়া গেল। হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া নির্নিমেষে তিনি চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন—'আপনি যা করলেন তা মানুষ ছাড়া আর কেউ পারে না।"

সুপর্ণ সিংহ কথাটার তাৎপর্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি যা বলছি তা অন্তর থেকেই বলছি।"

"তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি মানুষ বলেই একথা বলতে পারলেন। মাছ হলে কখনই বলতেন না, আমি টোপটি গিলেছি এবং গিলেই থাকব আপনারা আমাকে টেনে তুলুন।"

সকলেরই মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন চা খান, তারপর একটু ঘুমুন। আমরা এখান থেকে এখনই চলে যাব। এই ঘরেই শুয়ে পড়ুন আপনি। একটু ঘুমুলে মাথাটা সাফ হয়ে যাবে তখন যা হয় করবেন। তাড়াহুড়ো করে' কিছু করাটা ঠিক নয়।"

"অমি তাড়াহুড়ো করছি না। সমস্ত রাত ভেবেছি—"

"কেবল ভাবলে এসব ব্যাপারের কুলকিনারা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় আপনাকে কূল থেকেই আরম্ভ করতে হবে আবার। পরে গভীর জলে গিয়ে হাবুডুবু খাবেন—"

"ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না কি বলতে চাইছেন আপনি। কূল থেকে মানে?"

"গোড়া থেকে। অর্থাৎ অনু দেবীকে সত্যিই যদি পেতে চান আবার নতুন অভিযান করতে হবে। একবার পেয়ে তাকে হারিয়েছেন, আবার যদি পেতে চান নতুন করে খুঁজতে হবে। এসব ব্যাপারে পুরোনো দলিল অচল। আমার মতে আপনি এখন লম্বা একটি ঘুম দিয়ে নিন। তারপর অনুর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করুন। অবশ্য তিনি যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন। না-ও হতে পারেন। যদি না হন তাহলে আপনার এখন এখান থেকে চলে' যাওয়াই ভালো। পরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

সুপর্ণ সিংহ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। গগনের চোখে মুখে একটা নিস্তব্ধ হাসি চিকমিক করিতেছিল। জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল সে। কুমার চালের বাতা হইতে একটা নিমের দাঁতন পাড়িয়া সেটা চিবাইতে লাগিল। চালের বাতায় তাহার জন্য নিমের দাঁতন রাখাই থাকে। সে বাগানে আসিলেই নিমের দাঁতন চিবাইয়া মুখটা ধুইয়া ফেলে। অনেকদিনের অভ্যাস। কুমারের মুখে দাঁতন দেখিয়া বোধিয়া ইঁদারা হইতে জল তুলিতে গেল।

।। বত্রিশ ।।

সূর্যসুন্দর সত্যই একটু দুর্বল বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার ভিতবটা কেমন যেন খালি-খালি মনে হইতেছিল। কিন্তু তবু যখন জগাই আসিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইল, তখন তিনি যেন একটু ভালো বোধ করিতে লাগিলেন। আসিয়া অবধি জগাই একটু সসংকোচে দূরে দূরে সরিয়াছিল, এত কাছে আসিয়াও নিজের স্থানটিতে সে যেন ঠিক বসিতে পারিতেছিল না। তাহার দুঃখ সূর্যসুন্দর অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিতেছিলেন ইহা লইয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলে জগাইয়ের দুঃখ আরও বাড়িবে। সন্তোষের ছেলে জগাই। অনেকদিন আগে যখন ছোট ছিল সে, তখন এখানে যখন আসিত রাজলক্ষ্মীর পাশে শুইত। আর একটু যখন বড় হইল তাঁহার বিছানায় শুইত। পরে তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিত। এখন তাঁহার বিছানায় আসিয়া বসিতেও তাহার সংকোচ হইতেছে। অর্ধনিমীলিত নয়নে জগাইকে তিনি দেখিতেছিলেন। জগাই মানুষ হয় নাই এজন্য কি তিনিই দায়ী? না, তিনি দায়ী নন। জগাই, মাধাই, বিলুর ভার তিনি যখন লইয়াছিলেন, ইহাদেব সকলকে লইয়া সন্তোষ যখন তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তখন জগাইয়ের বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর, গোঁফ দাড়ি উঠিয়া গিয়াছিল, তখনই নানারকম নেশাভাঙে অভ্যস্ত হইয়াছিল সে। সূর্যসুন্দরের আর কিছু করিবার ছিল না। মাধাই এবং বিলুকে তিনি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া চাকরি করিতেছে। একজন রেলে আর একজন ব্যাংকে। তাহারা তাহার অসুখের খবর পাইয়াছে কি? সূর্যসুন্দর ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। মাধাই এবং বিলুর চেহারা তাঁহার মনে পড়িল। দুইজনেই খুব ভালো ছেলে। যতদিন এখানে ছিল সর্বদা যেন সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। চাকরের মতো সর্বদা খাটিত। তাহাবা যেন বুঝিতে পারিয়াছিল এ বাড়িতে তাহাদের সত্য অধিকার নাই। রাজলক্ষ্মীও ব্যাপারটাকে সহজভাবে লইতে পারে নাই। তাহার ভাই তিনটি ছেলে লইয়া সম্পূর্ণভাবে তাহাদের গলগ্রহ হইয়া চিরকাল থাকিবে ইহাতে তাহার আত্মসম্মান যেন আহত হইয়াছিল। তাহার উঁচু মাথা যেন বার বার নিচু হইয়া যাইত। সে কিছুতেই এ মর্মান্তিক ব্যাপারের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। সে বরাবর বিরু পৃথ্বীশ উশনা কুমারের সহিত ইহাদের একটা পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিত। কখনও সমান মর্যাদা দেয় নাই। তাহার ভাবটা ছিল যখন উহারা অনিবার্যভাবে এ সংসারে আসিয়াই পড়িয়াছে তখন এটোকাঁটা খাইয়াই মানুষ হোক। সূর্যসুন্দর ইহার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু রাজলক্ষ্মী মুখঝামটা দিয়া বলিত, "ভগবান যাদের দুঃখে রাখতে চান আমরা তাদের ভালো করতে চাইলে দুঃখ আরও বাড়বে। ওরা দুঃখেই মানুষ হোক। ওরা যেখন দেশে ছিল তখন এইভাবেই থাকত। চাল বাড়িয়ে আর দরকার নেই।" সূর্যসুন্দর কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনে হইত অন্যায় হইতেছে। তাঁহার মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইয়াছে সন্তোষকে এখানে আনিয়া তিনিই কি ব্যাপারটাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন? কিন্তু ইহা ছাড়া গত্যন্তরও তো ছিল না। ধারে সন্তোষের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বাঁধা পড়িয়াছিল। বিষয় অবশ্য বেশী ছিল না। কয়েক বিঘা ধেনো জমি আর ভদ্রাসনটুকু। কিন্তু ওটুকুও থাকিত না যদি সূর্যসুন্দর সে সময় গিয়া উপস্থিত না হইতেন। ধারের দায়ে সব বিকাইয়া যাইত, সন্তোষকে ছেলেদের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইত। সন্তোষের স্ত্রী কিছুদিন পূর্বে প্রায় বিনা চিকিৎসায়

বেঘোরে মারা গিয়াছিল। ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা সন্তোষের ছিল না। নিজেই সে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়াছিল। কোন ফল হয় নাই। সূর্যসুন্দরের তখন মনে হইয়াছিল সে পুণ্যবতী তাই আগেই মারা গিয়াছে। সূর্যসুন্দব সন্তোষের সমস্ত ধার শোধ করিয়া দিয়া বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর নামে কিনিয়া লইয়াছিলেন। না লইলে সন্তোষ আবার সেটা বাঁধা দিয়া ধার করিত। কারণ সন্তোষের উপার্জনের কোনও পথ ছিল না। সেই পথ করিয়া দিবার জন্য সন্তোষকে তিনি এখানে আনিয়াছিলেন। কাঁটাক্রোশ গ্রামে তাহার ছোট একটি ডিস্‌পেনসারিও করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি দুই রকমই ঔষধ থাকিত। কিছুদিন সন্তোষের ভালো রোজগারও হইয়াছিল, কিন্তু সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। সন্তোষকে এখানে আনিয়াছিলেন বলিয়া জগাই, মাধাই, বিলুকেও আনিতে হইয়াছিল। তিনি যাহা করিয়াছিলেন ভালোর জন্যই করিয়াছিলেন। তিনি আর একটা কাজও করিয়াছিলেন। তিনি বিরু, পৃথ্বীশ, উশনা, কুমার সকলকে একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন যে সন্তোষের বিষয়টা তিনি রাজলক্ষ্মীব নামে কিনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদি কোনওদিন সন্তোষের ছেলেরা বড় হইয়া বিষয়টা ফেরত চায় তাহা হইলে সেটা ফেরত দিতে হইবে। বিষয়টা কিনিবার জন্য তিনি দেড় হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তাহারা বড়জোর সেই টাকাটা দাবি করিতে পারে। তিনি আশাও করিয়াছিলেন সন্তোষের ছেলেরা দেড় হাজার টাকা দিয়া বিষয়টা আবার ফিরাইয়া লইবে, আবার তাহাদের বাস্তুভিটায় গিয়া ঘর বাঁধিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। জগাইকেও তিনি হাসপাতালে অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসারের কাজে ভরতি করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁহাকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। জগাইকে তিনি অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসারের কাজে বহাল করিয়াছিলেন তাহাকে মাসে মাসে কিছু পয়সা পাওয়াইয়া দিবার জন্য। রাজলক্ষ্মী একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল—জগাই মাঝে মাঝে পয়সা চুরি করিতেছে, উহাকে দূর করিয়া দাও। একদিন নিজেই তিনি তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। জগাই ভয়ে ভয়ে বাড়ির বাহির হইয়া হাটতলায় অশ্বত্থগাছটার নীচে একা চুপচাপ বসিয়াছিল। সূর্যসুন্দর সেদিন ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহাকে। বলিয়াছিলেন, 'তোমার যখন পয়সার অভাব হবে চেয়ে নিও, চুরি কোরো না। ভদ্রলোকের ছেলে কি চুরি করে?' জগাই কিন্তু কিছুদিন পরে আবার চুরি করিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দর শেষে অনুভব করিলেন জগাই বড় হইয়াছে, সিগারেট-বিড়ি ধরিয়াছে, উহার কিছু হাত-খরচ না থাকিলে ও সৎপথে থাকিতে পারিবে না। এই জন্যেই তিনি সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করিয়া অ্যাপ্রেণ্টিস্ ড্রেসারের পদে তাহাকে বহাল করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বোঝা গেল জগাই হাসপাতালে ঢুকিয়াও চুরি করিতেছে। একদিন দেখা গেল ব্র্যাণ্ডির বোতলটা শূন্য। একজন মুসলমান কম্পাউণ্ডার ছিল, সে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। বলিল, 'আমি বলিতে পারিব না, জগাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।' জগাই বলিল সে কিছু জানে না। হাসপাতালের স্টক হইতে রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটও কমিয়া যাইতে লাগিল। একদিন মত্ত অবস্থায় জগাই ধরা পড়িল। সেদিন রাগের মাথায় সূর্যসুন্দর তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছিলেন। চড় খাইয়া জগাই যাহা বলিয়াছিল তাহা সূর্যসুন্দরের আজও মনে আছে। বলিয়াছিল, পিশেমশাই এই চড়টা যদি আরও বছর দশেক আগে মারতে পারতেন তাহলে হয়তো কিছু উপকার হত। এখন আর কিছু হবে না। ইহার পর জগাই আর সূর্যসুন্দরের বাড়িতে আসে নাই, সেই দিনই গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল স্টেশনের

কুলি ছট্টুর বাড়িতে। তাহার বাড়িতেই থাকিত এবং জাহাজঘাটের কুলির কাজ করিত। যাহা রোজগার করিত সবই ছট্টুর হাতে দিত। জাহাজঘাটের কুলি-কন্ট্রাকটার ছিলেন ওঝাজি। তাঁহাকে বলিলে তিনি জগাইকে দূর করিয়া দিতেন। তিনি একদিন আসিয়া জগাইয়ের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন যে জগাইকে রাখিবেন কি না। জগাই কাজ ভালোই করিতেছে, কিন্তু উহাকে কুলি রাখিলে ডাক্তারবাবুর মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে না তো? ওঝাজিকে সূর্যসুন্দর সব কথাই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। ইহাও বলিয়াছিলেন যে আমার মানসম্ভ্রম ইহাতে নষ্ট হইবে এ আশঙ্কা আমার নাই। জগাই যদি আপনার কাজ ভালো করিয়া করে আপনি উহাকে রাখুন না। ওই কাজ হইতেই সে হয়তো একদিন উন্নতি করিতে পারিবে। আপনিই তো তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ওঝাজিও একদিন স্টেশনে কুলির কাজ করিতেন। পরে চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসায় করিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছেন। সূর্যসুন্দরের কথা শুনে ওঝাজি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। জগাইকে কুলিদের সর্দার করিয়া দিয়াছিলেন। জগাইকে আর মোট বহিতে হইত না, কুলি খাটাইতে হইত, কুলিদের হাজিরা রাখিতে হইত। ইহাতে তাহার আয়ও বাড়িয়াছিল। কিন্তু সে যাহা রোজগার করিত সবই যাইত তাড়ির দোকানে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় সে আর ছট্টু তাড়ির দোকানে বসিয়া তাড়ি খাইত। ক্রমশঃ জগাইয়ের যে অবস্থা হইল তাহাতে তাহাকে ভদ্র সমাজে স্থান দিবার কথা আর কেহ ভাবিতে পারিল না। তাহার চেহারাও বদলাইয়া গিয়াছিল। চোখের কোলে কালি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে গালপাট্টা দাড়ি; তাহাকে সহসা দেখিয়া চেনা যাইত না। রাজলক্ষ্মী বা সন্তোষ তাহার নাম পর্যন্ত মুখে আনিত না। তাহার পর একদিন ছট্টু হঠাৎ রেলে কাটা পড়িল। রেললাইনের উপর বসিয়াই তাড়ি খাইতেছিল রাত্রে। জগাইও পাশে ছিল। জগাই বাঁচিয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা আরও মর্মান্তিক। কিছুদিন পরে শোনা গেল জগাই ছট্টুর বিধবাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহার পর সে আর মনিহারিতে থাকে নাই। অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। বাড়িতে কেহ তাহার নামোচ্চারণ পর্যন্ত করিত না। সূর্যসুন্দর তাহাকে কিন্তু ভোলেন নাই। তাহার মুখটা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে পড়িত। যদিও তিনি স্পষ্টভাবে কাহাকেও বলেন নাই কিন্তু একথা তাঁহার মনে হইত যে জগাইয়ের এই শোচনীয় পরিণামের জন্য সন্তোষ তো দায়ী বটেই, তিনিও অংশত দায়ী। দেশে সে যদি তাহাদের গ্রামে থাকিতে পাইত, নিজেদের জমির দেখাশোনা করিবার সুযোগ পাইত তাহা হইলে হয়তো সে এত খারাপ হইত না। জগাই সসংকোচে বিছানার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বস"! মাধাই আর বিলুর খবর কি?"

"মাধাই কলকাতায় আছে, চাকরি করে। তার খবর মাঝে মাঝে পাই। তার একটি ছেলে, দুটি মেয়ে হয়েছে। বিলুর কোন খবর পাই না। শুনেছি যে বম্বেতে থাকে।"

"তুই আজকাল কি করিস?"

"আগে যা করতাম তাই করছি। একটা ছোট তেলেভাজার দোকানও করেছি।"

জগাই সসংকোচে থামিয়া গেল। তাহার মনে হইল এইবার বোধহয় ছট্টুর বিধবার কথা উঠিয়া পড়িবে। ছট্টুর বিধবাই যে তেলে-ভাজার দোকানটি চালায়, তাহার গর্ভেই যে সে তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, ছট্টুর দুইটি পুত্র সমেত সবসুদ্ধ পাঁচটি সন্তানের ভরণপোষণ যে তাহাকে করিতে হয় এসব সূর্যসুন্দরের কাছে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। ঠিক করিয়াছে আজই সে চলিয়া যাইবে। চন্দ্রসুন্দর, হাবুমামা, বিরু, উশনা সকলেই তাহার দিকে যে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিতেছে তাহা অস্বস্তিজনক। অপমানজনক কোন কথা কেহ বলে নাই। কেহ মুচকি হাসিয়াছে, কেহ বলিয়াছে, "আরে তুমি যে! হঠাৎ!" কেহ আবার তাহাকে লক্ষ্যের মধ্যেই আনে নাই। কবিরাজ মশাই হাসিমুখে তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আরে আরে তুমি এসে গেছ। বাঃ, বাঃ, বাঃ! তাই ভাবছিলাম এই কংগ্রেসে সন্তোষবাবুর বংশের কোনও রিপ্রেজেনটেটিভ এলো না কেন? তুমি এসে গেলে, ভালোই হয়েছে; বাঃ! কৃষ্ণকান্ত তাহাকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ জগাই বুঝিতে পারে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—হ্যালো মিস্টার ইউলিসিস্, খবর সব ভালো তো? বাড়ির মেয়েদের মধ্যে অনেকে চিনিতেই পারে নাই। যাহারা পারিয়াছিল তাহারা শোভন ভদ্রতা রক্ষা করিয়াছে, কেহই উচ্ছ্বসিত হয় নাই। পুরসুন্দরী তাহাকে রান্নাঘরের বারান্দাতেই খাইতে দিয়াছিলেন, কিন্তু কাঁসার বাসনে দেন নাই। দিয়াছিলেন মাটির বাসনে। হয়তো বাড়িতে কাঁসার বাসন ধোয়া ছিল না, হয়তো বা আর কিছু, কিন্তু একটা কথা মনে পড়াতে জগাইয়ের মনটা খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনে পড়িয়াছিল বাড়িতে যখন কোন মুসলমান বা খ্রীশ্চান অতিথি আসিত তখন রাজলক্ষ্মী তাহাদের চিনে-মাটির বাসনে খাইতে দিতেন। সে-ও আজ ইহাদের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এ বাড়িতে কাঁসার বাসনে খাইবার অধিকার আর তাহার নাই। গগন তাহাকে দেখিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিল, ও জগুকাকা! আপনাকে চিনতেই পারিনি। ভালো আছেন তো? একটা প্রণামও করিয়াছিল, কিন্তু জগাইয়ের মনে হইয়াছিল দায়সারা প্রণাম। দিগন্তর কাছে সে যায় নাই। দিগন্ত একটা ঘরে বসিয়া একমনে কি যেন লিখিতেছিল, তাহাকে গিয়া বিরক্ত করিতে সাহস হয় নাই তাহার। ঊষা সন্ধ্যাকে সে ছেলেবেলায় কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এখন তাহারা যেন নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ঊষা আসিয়া অনেকক্ষণ বকবক করিল, তাহার ছেলেমেয়েদের কথা জানিতে চাহিল, তাহাদের জামাকাপড় কিনিবার জন্য কিছু টাকাও দিয়াছে সে, কিন্তু তবু জগাইয়ের মনে হইল ঠিক যেন আন্তরিকতা নাই, তাহারা যাহা করিতেছে সবই যেন ভদ্রতারক্ষা করিবার জন্য করিতেছে, দয়া করিয়া করিতেছে। সন্ধ্যা ছট্টুর বউয়ের সম্বন্ধে নানারকম খুঁটিনাটি খবর জানিতে চাহিল। সে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কি কি করে, ওখানে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য নাইট স্কুল আছে কি না, কুটির-শিল্প শিখাইবার কোনও ব্যবস্থা আছে কি না—এইসব খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া সে একটা খাতায় টুকিয়া রাখিল সব। তাহাদের ঠিকানাটাও টুকিয়া রাখিয়াছে, শেষ পর্যন্ত কি করিবে কে জানে। দুইখান রঙিন শাড়িও সে দিয়াছে ছট্টুর বউয়ের জন্য। সবাই যেন কৃপা করিতেছে তাহাকে। স্বাতী আর চিত্রা তাহাকে প্রণাম করিল বটে, কিন্তু প্রণাম করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, যেন কোনও একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর একটু দূরে গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুচকি হাসিয়া কি যেন বলাবলি করিল। সে বিরু, পৃথ্বীশ, উশনার কাছে যায় নাই, তাহাদের এড়াইয়া চলিতেছিল সে। কুমার তাহাকে বলিয়াছে, আপনি জগুদা বাগানের ঘরটাতে গিয়ে থাকুন, সেখানে আরামে থাকবেন। জগাইয়ের মনে হইল কুমার তাহাকে বাড়ির পরিবেশ হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেছে। ভাবিল সত্যই তো সে এখানে বেমানান। এখানে আর না থাকাই উচিত। সে সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি এই ট্রেনে চলে যাচ্ছি—"

"এই ট্রেনেই?"

"হ্যাঁ।

সূর্যসুন্দরের মনে হইল তাঁহার প্রথম যৌবনের সহিত যে-সব স্মৃতি জড়িত হইয়াছিল সেগুলি একে একে মুছিয়া যাইতেছে। সন্তোষ অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। তাহার ছেলেরা দূরে দূরে চলিয়া গিয়াছে। জগাই হঠাৎ আসিয়াছিল, সে-ও চলিয়া যাইতে চায়। চলিয়া যাইবেই, পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সূর্যসুন্দরের একবার ইচ্ছা হইল জগাইকে আরও দুই-চারিদিন থাকিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারও মনে হইল জগাই এখানে বেমানান। থাকিতে বলিলে তাহারই হয়তো অসুবিধে হইবে।

"বউমা—"

উর্মিলা মাথার শিয়রেই চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া ছিল। দিগন্ত তাহাকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই দিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল, দাদুর ঘুম ভাঙলে তাঁকে পড়ে' শুনিও যদি শুনতে চান। গগন বলিয়াছিল খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতে। কিন্তু সূর্যসুন্দর খবরের কাগজ শুনিতে চান নাই। চন্দ্রসুন্দর গীতা আর রামায়ণের কথা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর তাহাতেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। দিগন্তের কথায় তিনি কিন্তু রাজী হইয়াছেন। উর্মিলা 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতা বাছিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সূর্যসুন্দরের ঘুম ভাঙিলেই তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবে।

সূর্যসুন্দর আবার ডাকিলেন, "বউমা—"

"কি বাবা?"

"জগাইকে কুড়িটা টাকা এনে দাও।"

উর্মিলা উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে কুড়িটি টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। জগাইয়ের হাতে টাকাগুলি দিয়া সে আবার নিজের স্থানটিতে গিয়া বসিল। জগাই নোট দুইখানা হাতে করিয়া নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। সূর্যসুন্দর অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" তাহার পর চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন। উর্মিলা ভাবিয়াছিল কবিতা পড়িয়া শুনাইবে। কিন্তু সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। পাখাটি তুলিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল সে। সূর্যসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঠিক ঘুম নয়, তাঁহার সমস্ত সত্তা যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই তন্দ্রার ঘোরে তিনি প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন। অতীতের স্বপ্ন। সন্তোষকেই স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন তিনি। ছিপছিপে লম্বা ধপধপে ফরসা সন্তোষ যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পরিধানে সিমলার ফিতা-পাড় ধুতি, ভেলভেটের পাম-শু। হাতে সিগারেট। হঠাৎ যেন সূর্যসুন্দর দেখিতে পাইলেন তাহার অনামিকায় যে আংটিটা ছিল তাহা নাই।

"তোর হাতে আংটিটা দেখছি না?"

"ওটা বেচে দিয়েছি। নতুন প্যাটার্নের করাব একটা। ওসব সেকেলে আংটি আজকাল আর কেউ পরে না।"

'টাকাগুলো কি করলি?"

সন্তোষ এমনভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল যেন সে কিছুই শুনিতে পায় নাই। সূর্যসুন্দর বুঝিতে পারিলেন টাকাটা সে কোনও বাজে ব্যাপারে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। একটু পরেই সে

নূতন একটা সিগারেট হোল্‌ডার বাহির করিয়া তাহাতে সিগারেট পরাইতে লাগিল। তাহার পর একটা রঙিন চশমা পরিয়া আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটি নিরীক্ষণ করিল খানিকক্ষণ। দেখিতে দেখিতে সন্তোষের এ চেহারাটা মিলাইয়া গেল। ফুটিয়া উঠিল আর একটা ছবি। বারান্দায় বসিয়া সন্তোষ নির্বিকারভাবে কানে একটি দিয়াশালাইকাঠি ঢুকাইয়া কান চুলকাইতেছে। রাজলক্ষ্মী আসিয়া একবার তাকে বকিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন বামুনদিদি। তিনিও বকিলেন। সন্তোষ কিন্তু নির্বিকার। বকুনির ঝড় থামিয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কোঁচা দিয়া পা দুইটি ঝাড়িল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সন্তোষ পারতপক্ষে কাহারও কোন উত্তর দিত না। ঘুমের ঘোরেই সূর্যসুন্দরের কিন্তু মনে পড়িল মাঝে মাঝে ছোটখাটো রসিকতা করিত সে। সূর্যসুন্দরের বন্দুকটা লইয়া এক একদিন সে শিকারে বাহির হইত। মনে পড়িল একদিন সে খুব সকালে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্যসুন্দর যখন 'কল' সারিয়া ফিরিলেন তখন প্রায় বেলা দুইটা। তখনও সন্তোষ ফেরে নাই। সূর্যসুন্দরের স্নানাহার হইয়া গেল, তবু সন্তোষের পাত্তা নাই। বামুনদিদি সপ্তমে সুর চড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সন্তোষকে যে ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিলেন তাহা রাজলক্ষ্মীর আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করিল। সে বলিল—'আমার দাদাকে অমন করে গাল দিচ্ছ কেন তুমি। তোমার যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তুমি খেয়ে নাও। আমি দাদার জন্যে বসে থাকব।' ইহাতে বামুনদিদি চামুণ্ডার মতো উঠানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমশ তাঁহার রোষের পরিধি আরও বাড়িয়া গেল সূর্যসুন্দরকেও তিনি হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া হাড়-বোকা, পর-ভোলানে ঘর-জ্বালানে প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া শেষে নিজেরই দুরদৃষ্টকে এবং দুরদৃষ্টের জন্য দায়ী ভাগ্যদেবতাকে ঝাঁঝালো ভাষায় সম্বোধন করিতে করিতে উঠানময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় উঠানের আর এক প্রান্তে আবির্ভূত হইল সন্তোষ। হাতে কেবল বন্দুক। একটিও পাখি নাই। সূর্যসুন্দর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আগাইয়া গেলেন।

"কিরকম শিকার হল?"

"পেয়েছিলাম চারটে হাঁস। গরুর গাড়ির পিছনে ছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। বামুনদিদির গলার আওয়াজ পেয়ে মরা হাঁসগুলো ঝটপট করে' উড়ে গেল।"

সন্তোষ কখনও জোরে হাসিত না। তাহার চোখে মুখে একটা হাসির আভা ফুটিয়া উঠিত শুধু। তন্দ্রার ঘোরে সূর্যসুন্দর সন্তোষের সেই হাসিটি দেখিতে লাগিলেন। আর একটা ছবিও তাহার পর ফুটিয়া উঠিল ধীরে ধীরে। সন্তোষের ছেলে মাধাই-এর বিবাহের ছবিটা। বিবাহের দিন কন্যাপক্ষের বাড়িতে সন্তোষের নতুন পাম-শু জোড়া হারাইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। একটু পরে কন্যার পিতাও হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'আমারও জুতোজোড়া পাওয়া যাচ্ছে না'। সন্তোষ মৃদু হসিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার জুতো তো মানুষ নেবে না। কুকুরপাড়ায় খোঁজ কর গে।' মাধাই-এর বিবাহপ্রসঙ্গে সূর্যসুন্দরের আর একটা কথাও মনে পড়িল। মন্মথর ছোটভাই বসন্ত তাঁহাকে দাদা বলিত এবং দাদার মতো খাতিরও করিত। সেও ডাক্তার হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদে বেশ ভালো প্র্যাক্‌টিস হইয়াছিল তাহার। সূর্যসুন্দরের অনুরোধে মাধাইকে নিজের বাড়িতে রাখিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইয়াছিল সে। মাধাই যখন প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া রেলে চাকুরি পাইল (এ চাকুরিটিও করিয়া দিয়াছিল তাঁহার বন্ধু খোঁড়া অশ্বিনী) তখন সসংকোচে একটা অনুরোধ করিয়াছিল সে।

তাহার ছোট মেয়েটি কালো এবং ঈষৎ ট্যারা ছিল। বসন্ত অনুরোধ করিয়াছিল সন্তোষ যদি মাধাই-এর সহিত তাহার বিবাহ দেয়—সন্তোষ এ অনুরোধ রক্ষা করে নাই। কৃতজ্ঞতা বলিয়া সন্তোষের কিছু ছিল না। বসন্তের নিকট কোন পণ দাবি করিতে পারিবে না বলিয়াই সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যে মাধাই-এর ও মেয়ে পছন্দ নয়। মাধাই যদি এ মিথ্যার প্রতিবাদ করিত তাহা হইলে হয়তো বিবাহ হইয়া যাইত। কিন্তু মাধাই চুপ করিয়া রহিল, যাহারা তাহাকে মানুষ করিল, যাহাদের সাহায্য না পাইলে তাহাকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইত (কারণ তাহাকে বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া পড়াইবার সামর্থ্য সন্তোষের ছিলই না, সূর্যসুন্দরেরও ছিল না। সূর্যসুন্দর নিজের তিনটি ছেলেকে বোর্ডিং-এ পাঠাইয়া তখন হিমশিম খাইতেছিলেন)—বসন্ত বাড়িতে স্থান না দিলে মাধাই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিতে পারিত না—বসন্তর মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে তাহার নিজেরও সামাজিক মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যাইত, কারণ বসন্ত পরে একজন নামজাদা কংগ্রেসী হইয়াছিল—কিন্তু মাধাই শেষ পর্যন্ত চুপ করিয়াই রহিল। পরে শোনা গেল সন্তোষ জনৈক ভদ্রলোকের নিকট কিছু টাকা আগাম লইয়াছিল। প্রথমে ধার বলিয়াই লইয়াছিল। সুদে আসলে সে টাকা বাড়িয়া নাকি তিন হাজার টাকায় দাঁড়ায়। তখন সন্তোষ বলে টাকা আমি আর ফেরত দিতে পারিব না, আপনি আমার পালটি ঘর, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনার মেয়েটিকে পুত্রবধূ করিয়া লইতে পারি। মেয়েটি দেখিতে মোটেই ভালো ছিল না। অনেকেই নাকি তাহাকে দেখিয়াছিল। কিন্তু কেহই পছন্দ করে নাই। সন্তোষ তাহারই সহিত মাধাইয়ের বিবাহ দিল। যদিও সন্তোষ সূর্যসুন্দরের বাড়িতেই থাকিত তবু তাহার নিজের হাতে কিছু টাকা না থাকিলে সে স্বস্তি পাইত না। বাবু লোক ছিল সে, যখন তখন টুকি-টাকি শৌখিন জিনিস কিনিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, এসব কারণেই হাতে কিছু টাকা না থাকিলে সে স্বস্তি পাইত না। টাকা সংগ্রহ করিবার প্রধান উপায় ছিল অবশ্য ধার। সূর্যসুন্দরের খাতিরে অনেকে তাহাকে ধার দিত। নিজের পুরাতন শৌখিন জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনেক সময় সে ধার শোধও করিয়া দিত। পুরাতন ঘড়ি, পুরাতন আংটি, পুরাতন শাল সবই একে একে বিক্রয় করিয়াছিল সে। দেশে তাহার বিঘা দেড়েক ধেনো জমি ছিল যাহা সূর্যসুন্দর কিনিয়া লইতে পারেন নাই এবং যাহা তাহার ঋণের আওতাতে পড়ে নাই। এ জমির অস্তিত্ব সূর্যসুন্দর জানিতেনও না। সন্তোষ সে জমিটুকুও বিক্রয় করিয়া দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল এবং কিছুদিন স্ফূর্তিতে ছিল। পরিষ্কার জামা-কাপড়, পরিষ্কার বিছানা, সুন্দর জুতা, রঙিন চশমা, চমৎকার একটি হাত-আয়না, শীতকালে মুর্শিদাবাদের বালাপোশ, একটু এসেন্স, ভালো রুমাল এসব না থাকিলে সন্তোষ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। এসবের জন্য সে সূর্যসুন্দরের নিকট টাকা চাহিতে পারিত না। তাই নানাস্থানে ধার করিতে হইত তাহাকে। কোথাও ভিক্ষা করিতে পারিত না। যদিও সে সর্বস্বান্ত হইয়াছিল তবু তাহার আত্মসম্মানবোধ প্রবল ছিল। তাহার মনোভাব ছিল ওমর খৈয়ামের মতো। আর তাহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইত সে যেন কোনও নির্বাসিত রাজা। ঘটনাচক্রে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু সিংহাসনের আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। তাহার মনের এই আভিজাত্যকে সূর্যসুন্দর সম্মান করিতেন। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িত সন্তোষের বাড়িতে একদিন কি প্রাচুর্যই না ছিল। বাড়ির পিছনে হাঁসের ডিমের খোলার একটা ছোটখাটো পাহাড়ই হইয়া গিয়াছিল। মাছ দুধ কোন কিছুরই অভাব ছিল না। বাড়ির খিড়কিতে বেশ বড় পুকুর ছিল, উঠানে গাই বাঁধা

থাকিত। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুবই খুঁতখুঁতে ছিল সন্তোষ। তরকারির নানারকম বাছ-বিছার ছিল। এখানে আসিয়া সেই ব্যক্তি বামুনদিদির বকুনি শুনিতে শুনিতে যাহা পাইত তাহাই খাইয়া ফেলিত। কোনও মন্তব্য করিত না। স্বভাবতঃ নীরব প্রকৃতির লোক ছিল সে। নিজেকে লইয়া আনমনে থাকিতেই ভালবাসিত। রায়মহাশয়—ত্রিপুরারি সিংহের প্রবলপরাক্রান্ত ম্যানেজার চন্দন রায়, সন্তোষের এই স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের একজন সমঝদার ছিলেন। সন্তোষের সহিত তাঁহার একটা মধুর সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে শুধু যে নানরকম পরিহাস বিনিময় হইত তাহা নয়, রায়মহাশয় সন্তোষের আভিজাত্যকে সম্মানও করিতেন। একটা ছবি সূর্যসুন্দরের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। সন্তোষ হাতি হইতে নামিয়া যাইতেছে। বহুকাল আগে একবার সন্তোষকে লইয়া সূর্যসুন্দর ত্রিপুরারি সিংহের অসুস্থ স্ত্রীকে দেখিতে তাঁহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথ হইলে অনেক সময় সূর্যসুন্দর সন্তোষকে সঙ্গী হিসাবে লইতেন। হাতিতে চড়িয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা। কিন্তু ত্রিপুরারি সিংহের স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া সূর্যসুন্দর অনুভব করিলেন যে তাঁহাকে দুই একদিন থাকিতে হইবে। নিউমোনিয়া হইয়াছে, ক্রাইসিসের সময় থাকা দরকার। তখন তিনি চন্দন রায়কে বলিলেন, "আমি থাকিব। আপনি সন্তোষকে বরং পাঠিয়ে দিন। বাড়িতে না হলে ভাবিবে।" চন্দন রায় বলিলেন, "বেশ তো হাতিটাই দিয়ে আসুক ওকে। সঙ্গে একটা সিপাহীও দিয়ে দিচ্ছি।" হুকুম দিয়া দিলেন। সন্তোষ হাতিতে চড়িল। সিপাহীটা হাতির পিছনে হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। চন্দন রায় বারান্দার চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁহার ভ্রূদুইটি কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"কিছুদূর গিয়ে হাতিটা বসল কেন?"

খবর জানিবার জন্য আর একটা সিপাহীকে বাইকে করিয়া ছুটাইয়া দিলেন। সে খবর লইয়া আসিল যে সিপাহীটা সন্তোষবাবুর সহিত যাইতেছিল সে হাতির লেজ ধরিয়া হাতির পিঠে চড়িয়া সন্তোষবাবুর পাশে গিয়া বসিয়াছিল। ইহাতে সন্তোষবাবু বোধহয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি হাতি থামাইয়া নামিয়া গিয়াছেন। চন্দন রায়ের এক চক্ষু হইতে আগুন ছুটিয়া বাহির হইল। তিনি সিপাহীটিকে বলিলেন, "তুমি আবার যাও। ওই রামদৎ সিংহকে কান ধরে হাতি থেকে নামিয়ে এখানে নিয়ে এস। আর মাহুতকে বল সে যেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সন্তোষবাবুকে আবার তুলে নেয়।" একটু পরেই রামদৎ সিং আসিল এবং চন্দন রায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

চন্দন রায় সন্তোষকে খুব ভালবাসিতেন। উভয়ের মধ্যে হাস্য পরিহাসের একটা দ্বন্দ্বও চলিত। চন্দন রায় খাইতে বসিয়া কথা বলিতেন না। একদিন চন্দন রায় খাইতে বসিয়াছেন। পাচক ক্ষীরের বাটিটা থালার নিকট হইতে একটু দূরে রাখিয়া গিয়াছে। সন্তোষ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"রায় মশায়, ক্ষীরের বাটিটা সরিয়ে রেখেছেন যে। খাবেন না বুঝি? আমি তাহলে খেয়ে ফেলি, কি বলেন?"

রায় মহাশয় খাইতে সুরু করিয়াছিলেন, কথা বলিতে পারিলেন না। নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন সন্তোষ মহানন্দে সমস্ত ক্ষীরটি নিঃশেষ করিতেছে। খাওয়া শেষ করিয়াও তিনি সন্তোষকে কিছু বলিলেন না। তাঁহার চক্ষুটি কেবল হাসিতে লাগিল। সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "কেমন ঠকিয়েছি আপনাকে। বলেছিলাম না, খেতে বসে নির্বাক হয়ে থাকেন, একদিন ঠকবেন?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "মানুষ কিসে ঠকে কেমন করে ঠকে এসব বিষয়ে তোমার জ্ঞান তো টনটনে দেখছি। আচ্ছা, দেখা যাবে—"

"আমাকে আপনি ঠকাতে পারবেন না।"

রায় মহাশয় কিছু বলিলেন না। তিনি অযথা বাক্যব্যয় করিতেন না।

মাসখানেক পরে রায় মহাশয় একদিন বারান্দায় বসিয়া কাজ করিতেছেন। একজন মিস্ত্রী একটি খাটিয়ার ফ্রেম বারান্দায় রাখিয়া গেল এবং বলিল যে সে মধুয়াকে বলিয়াছে, কাল আসিয়া দড়ি দিয়া খাটটি বুনিয়া দিয়া যাইবে। খাটটি বারান্দায় পড়িয়া রহিল, রায় মহাশয় কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর চাকরকে বলিলেন, "এই খাটটার উপর একটা চাদর ভালো করে পেতে দাও তো।" চাকরটা একটু বিস্মিত হইল, খাটের ফ্রেমে কি করিয়া চাদর বিছাইবে! রায় মহাশয় বলিলেন, "ফ্রেমের উপরই বিছিয়ে দাও, মোটা ভারী চাদরটা নিয়ে এস।" তাহাই হইল। চাকর চাদরটি খাটের উপর টান করিয়া বিছাইয়া দিয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল দ্বিপ্রহরের প্রথম রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে সন্তোষ আসিতেছে। রায় মহাশয় তাহাকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সন্তোষ যখন বারান্দায় উঠিল তখন রায় মহাশয় কেবল মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এস। রোদে বড্ড কষ্ট পেয়েছ মনে হচ্ছে?"

"বাঃ, সুন্দর বিছানা পেতে রেখেছেন দেখছি। একটু শোয়া যাক।"

ধপাস্ করিয়া বিছানায় বসিতেই সঙ্গে সঙ্গে চিৎপাত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল সে।

রায় মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "লাগে নি তো? দেখে শুনে বসতে হয়।"

"একটা খাটের ফ্রেমে চাদর বিছিয়ে রাখবার মানে?"

সন্তোষ সত্যই খুব অপ্রস্তুত হইয়াছিল। রায় মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আর একটা ঘটনাও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। রায় মহাশয় কলিকাতা গিয়াছিলেন। তখন কলিকাতায় বেলুন ওড়া এবং বেলুন হইতে প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়া আসা লইয়া খুব একটা হইচই হইতেছিল। রায় মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া ফলাও করিয়া এ বিষয়ে গল্প করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—"আমি আর একটা জিনিসও দেখে এলাম। তা খবর কাগজে এখনও বেরোয়নি। সম্ভবত বেরুবেও না, কারণ গর্ভমেণ্ট মানা করে দিয়েছে। জাপানীরা আবিষ্কার করেছে সেটা।"

আমরা সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম।

জাপানীরা? কি বলুন তো।"

"খুবই সহজ, অথচ খুবই অদ্ভুত। বেলুনের সাহায্য না নিয়েও আকাশে ওড়া যায়। কেবল দুটি ছাতা চাই।"

"কি রকম?"

"কি রকম তা বলে বোঝাব কি করে। হাতে নাতে করে' তাহলে দেখিয়ে দিতে হয়। দুটো বড়ো ছাতা চাই কেবল। আর একটা বড় লাঠি আর কিছু লাকলাইনের মজবুত দড়ি। ব্যস্ আর কিছুই চাই না।"

"সবই তো এখানে পাওয়া যাবে।"

"বেশ তাহলে যোগাড় করে' ফেল। আমাদের কাছারিতে আমার বাসায় করব প্রথমে। বাইরের লোক থাকবে না সেখানে। উড়বে কে? মোটা লোককে ওড়াতে পারব না। পাতলা লোক চাই। সন্তোষ উড়বে? তুমি বেশ ছিপছিপে আছ। সোঁ করে উড়ে যাবে।"

"উড়ে গিয়ে তারপর নামব কি করে'?"

"লাকলাইনের সুতো বাঁধা থাকবে। অনায়াসে নামিয়ে নিতে পারব।"

বিকালবেলা রায়মহাশয়ের বাসায় আমরা সবাই সমবেত হইলাম। রায় মহাশয় প্রকাণ্ড লাঠিটা সন্তোষের পিঠের দিকে লম্বা করিয়া ধরিলেন। তাহার পর সন্তোষকে বলিলেন, "এইবার হাত ছড়িয়ে দাও দু'দিকে বেশ লম্বা করে। এইবার দড়িটা দাও।" পিছন দিক হইতে সন্তোষের দুই হাতের সহিত লাঠিটি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন তিনি।

"ঠিক হয়েছে। এইবার ছাতা দুটো খোল্। খোলা ছাতা দুটো দু'হাত দিয়ে শক্ত মুঠো করে' ধর এবার সন্তোষ।"

মুঠোর উপরও দড়ি দিয়া তিনি ছাতা দুইটিকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর রায় মহাশয় যাহা করিলেন তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা আঁতকাইয়া উঠিলাম। ফস্ করিয়া তিনি সন্তোষের পরনের কাপডটা খুলিয়া দিলেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া সন্তোষ ঘরময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"উড়ছে, উড়ছে, ওই দেখ উড়ছে!"

মৃদু হাসিয়া রায়মহাশয় বাহির হইযা গেলেন। আর ফিরিলেন না। শুনিলাম বাহিরে তাঁহার জন্য ঘোড়া অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি বৈরিয়া কাছারিতে চলিয়া গিয়াছেন। দিন সাতেক পরে ফিরিলেন। ফিরিয়া সন্তোষকে একজোড়া ভালো ফরাসডাঙার ধুতি, জরিপাড় দেওয়া চাদর এবং পাঞ্জাবি করাইবার জন্য উৎকৃষ্ট আদ্দি উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট চিঠিও ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ 'ভাই সন্তোষ, আমাকে মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জমিদারির কাজ বড়ই কঠোর ও শুষ্ক। এই মরুভূমিতে তুমিই একমাত্র ওয়েসিস। তাই তোমার উপর মাঝে মাঝে অত্যাচার করি। ক্ষমা করিও। তুমি ক্ষীর ভালবাস। কাল তোমার জন্য এক হাঁড়ি ক্ষীরও পাঠাইয়া দিব।' ইহার পর সন্তোষের রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। রায় মহাশয় সত্যই সন্তোষকে খুব ভালবাসিতেন। বাহিরের লোকের কাছে তিনি গম্ভীর রাশভারী লোক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে যমের মতো ভয় করিত। একমাত্র সন্তোষের কাছেই তিনি মাঝে মাঝে প্রগল্‌ভ হইতেন। সন্তোষকে নানাভাবে তিনি আর্থিক সাহায্য করিবারও চেষ্টা করিতেন। সন্তোষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিত। সন্তোষের কাছে মাঝে মাঝে তিনি রোগী পাঠাইয়া দিতেন। দূরের রোগী হইলে সন্তোষ সহজে যাইতে রাজী হইত না। সন্তোষের হাতে যতক্ষণ টাকা থাকিত ততক্ষণ উপার্জনের কোনরূপ প্রয়াস করিত না সে। একবারের একটি ঘটনার কথা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। মনিহারী হইতে প্রায় মাইল দশেক দূরে আমদাবাদ বলিয়া একটি গ্রাম আছে, সেখান হইতে একদিন একটি লোক আসিয়া বলিল---"আমার ছেলের অসুখ হয়েছে অনেকদিন থেকে। পেটের গোলমাল। কিছুতেই সারছে না। রায়জী আমাকে বললেন সন্তোষবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাও। তাঁর ওষুধই খাওয়াও। আমি গাড়ি এনেছি।" সন্তোষ যাইতে রাজী হইল না। বলিল গরুর গাড়ি চড়িয়া অতদূরে সে যাইতে পারিবে না। লোকটি কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। বলিল, তাহার গরুর গাড়িতে ভালো বিছানা আছে। গরু দুটিও ভালো, ঘোড়ার মতো দৌড়াইতে পারে। নগদ কুড়ি টাকা ফি দিতেও সে রাজী। তবু সন্তোষ ইতস্তত করিতে লাগিল। বলিল একা অতদূর যাইতে মন সরিতেছে না। সূর্যসুন্দরের একটা 'কল' ছিল আমদাবাদের কাছেই। তিনিও সন্তোষের সহিত যাইতে

চাহিলেন। বলিলেন, "একসঙ্গে যাওয়া যাক চল। আমার গাড়িটা পিছনে পিছনে আসুক।" তখন সন্তোষ আর 'না' বলিতে পারিল না। একবার শুধু বলিল, "তুমি যখন ওই দিকে যাচ্ছ, তখন তুমিই দেখে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস। আমাকে আর টানছ কেন।" তখন সে লোকটি বলিল, "রায়জী সন্তোষবাবুকে নিয়ে যেতে বলেছেন। সন্তোষবাবু যদি না যান তাহলে আমার উপর উনি ভয়ানক চটে যাবেন। আর রায়জী চটলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনি চলুন দয়া করে।" তখন যাইতেই হইল। প্রায় মাইলখানে যাইবার পর গাড়িটি রাস্তার একটা গর্তে পড়িয়া কাৎ হইয়া যাইতেই সন্তোষ হিন্দি ভাষায় যাহা বলিয়াছিল তাহা সূর্যসুন্দরের এখনও মনে আছে। বলিয়াছিল—"আনেকা বখৎ তো আকাশকা চাঁদ পাড়কে হাত মে দিয়া থা! আভি ক্যা হুয়া।" গাড়োয়ান বিহারী, কিন্তু সন্তোষের এ হিন্দী সে বুঝিতে পারিল না, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "হুজুর হামরা নাম চাঁদ নেহি হ্যায়! হামরা নাম রঘুবীর।" সন্তোষের নানা কথা টুকরো টুকরো ভাবে মনে পড়িতে লাগিল সূর্যসুন্দরের। একবার বাড়িতে খাসি কাটা হইয়াছিল। সেজন্য পশ্চিমদিকের বারান্দায় মধুয়া চাকর মসলা বাটিতেছিল। একটু দূরে সন্তোষ বসিয়া কানে কাঠি ঢুকাইয়া ধীরে ধীরে সেটি ঘুরাইতেছিল। আরামে চোখ দুইটি বুজিয়া আসিয়াছিল তাহার। পাশের ঘর হইতে সূর্যসুন্দর তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ মধুয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু দেখুন তো, আবও মসলা কি বাটতে হবে?" সন্তোষ কান হইতে কাঠিটি বাহির করিয়া মসলাগুলির দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার পর বলিল, "বাটতে হবে বইকি। ওটুকুতে কিচ্ছু হবে না। অতবড় একটা জানোয়ারকে খাব আমরা, অনেক মসলা দরকার। কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু কথাগুলি সূর্যসুন্দরের মনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল যেন এখনই শুনিয়াছেন। মনে হইল সন্তোষ যেন পাশেই আছে। তাঁহার চোখ দুইটি খুলিয়া গেল। গোড়া হইতেই তাঁহার একটা চোখ ভাল করিয়া খুলিতেছিল না। এখনও তাহার মনে হইল ওটা যেন আরও বেশী বুজিয়া আসিতেছে। তবু তিনি সামনের দেয়ালে রাজলক্ষ্মীর ছবিটি দেখিতে পাইলেন। অনেকক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন সেদিকে। আবার যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন যাহা ছিল তাহা আর নাই, যাহা আছে তাহাও আর থাকিবে না। অস্ফুটকণ্ঠে আবার বলিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। আবার তাঁহার চোখ দুইটি বুজিয়া গেল। আবার তিনি সন্তোষেরই নানা ছবি দেখিতে লাগিলেন মনে মনে। অতীত মরিয়াও মরে না। নানা বেশে বার বার ফিরিয়া আসে সে। তিনি দেখিতে লাগিলেন সন্তোষ যেন নিজের বিছানাটি পাতিতেছে। প্রতিদিন খাইবার পূর্বে নিজের বিছানাটি সে নিজে হাতে পাতিত। অপর কাহারও পাতা বিছানা পছন্দ হইত না তাহার। ধপধপে শাদা চাদরটি টান করিয়া পাতিয়া, তাহার উপর বালিশগুলি ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া রাখিবার পর একটু দূরে দাঁড়াইয়া সে দেখিত, লোকে যেমন ভালো ছবি দেখে অনেকটা সেইরকম। বিছানায় বা বালিশে সামান্য ময়লা বা কোঁচ থাকিতে দিত না সে। বিছানাটি করিয়া তামাক সাজিতে বসিত। ভাল অম্বুরী তামাক বড় কলিকায় অনেকক্ষণ ধরিয়া সাজিত। কলিকায় তামাক দিবার আগে ঠিকরেটা পরিষ্কার করিত দুই আঙুল দিয়া। তাহার পর তামাকটা গুঁড়া গুঁড়া করিয়া তাহার উপর দিত। তাহার পর দিত তাওয়া। তাহার পর টিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাওয়ার উপর সাজাইয়া দিত নিপুণভাবে। তাহার পর টিকেতে আগুন দিয়া কালিকাটি বসাইয়া দিত গড়গড়ার মাথায়। একটি শৌখিন গড়গড়া ছিল তাহার। গড়গড়াটি বিছানার একধারে রাখিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিত সে। তাহার পর হাত দুইটি মুছিত একটি

ফরসা তোয়ালেতে। এইসব করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় যাইত। বামুনদিদি খাবার দিয়া ডাকাডাকি করিতেন। দেরি হইলে বকিতেন। সন্তোষ কিন্তু সে সময় গ্রাহ্য করিত না। সমস্ত নিপুণভাবে শেষ করিয়া তবে খাইতে বসিত। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় বসিয়া গড়গড়ার নলটি তুলিয়া ধীরে ধীরে টান দিত সে। আরামে তাহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিত। সন্তোষের ভাগ্যহত ছন্নছাড়া জীবনে এইটুকুই ছিল একমাত্র বিলাস। কিন্তু এটুকুও কেহ যেন সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য সবাই রাগ করিত তাহার উপর। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আলাদা সাবান দিয়া কাচাইত সে, কিন্তু সেজন্য লোক চাই, সাবান চাই, রাজলক্ষ্মী এজন্য প্রসন্ন ছিল না। গড়গড়াটা ধারে কিনিয়া আনিয়াছিল বলিয়া সূর্যসুন্দর বকিয়াছিলেন তাহাকে। তাহার পর ধার শোধ করিয়া দিবার জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। সন্তোষ টাকা লয় নাই। বলিয়াছিল, আমার ধার আমি শোধ করব। ও নিয়ে চিন্তিত হয়ো না তুমি।' সন্তোষের বাক্সে যে একটা রূপার পানের ডিবা ছিল তাহা একা রাজলক্ষ্মী ছাড়া আর কেহ জানিত না। কিছুদিন পরে নিখিলবাবুর জামাইকে যখন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ালে হইল তখন রাজলক্ষ্মী বলিল, "দাদা, আমাদের সেই রূপোর ডিবেটা বার করে দাও না। জামাইকে পান দেব।" দেখা গেল ডিবেটি নেই। সন্তোষ নির্বিকারভাবে বলিল, "সে ডিবে তো অনেকদিন আগেই বিক্রী হয়ে গেছে।" সূর্যসুন্দর বুঝিলেন ডিবা গড়গড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সন্তোষ সম্বন্ধেই এলেমেলো নানাকথা মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই তো কিছুদিন, সন্তোষের মৃত্যুর বছরখানেক পূর্বে বোধহয়, সে ভারী একটা মজার কথা বলিয়াছিল। সূর্যসুন্দর তখন দাঁত বাঁধাইয়াছেন। কি একটা ব্যাপার লইয়া খুব রাগারাগি করিতেছিলেন তিনি। সন্তোষ বারান্দার একধারে বসিয়া সন্তর্পণে কানে কাঠি দিয়া কান চুলকাইতেছিল। কাঠিটি কান হইতে বাহির করিয়া বলিল, "বেশী দাঁত কড়মড় করো না, বাঁধানো দাঁত ভেঙে যাবে। খরচায় পড়ে যাবে—।"......দেখিতে দেখিতে সব ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল। সূর্যসুন্দর সত্যই এবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে আশ্চর্য একটা স্বপ্নলোকে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন যেন। অতীত সেখানে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী, দিদিমা, মামা, সন্তোষ, রায় মহাশয়, বামুনদিদি, মন্মথ, ত্রিপুরারি সিং সকলেই সেখানে রহিয়াছেন। এমন কি হাতকাটা দুখনাথ পাঁড়েও রহিয়াছে সেখানে। তাঁহাকে দেখিয়া এক হাতেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল সে, আগে যেমন করিত।

।। তেত্রিশ।।

সুব্রত এবং সোমনাথ দুইজনেরই ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছিল। এইবার তাহাদের যাইতে হইবে। চিত্রা এবং স্বাতী কিন্তু এত শীঘ্র যাইতে রাজী নয়। তাহারা আরও কিছুদিন থাকিতে চায়। কুমার আশ্বাস দিয়াছে যে সে যথাসময়ে তাহাদের পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং ঠিক হইয়াছে সুব্রত এবং সোমনাথ একা একাই যাইবে। উশনাও থাকিতে পারিবে না। সে নাকি কয়েকটা জরুরী কাজ ফেলিয়া আসিয়াছে। দুই একদিনের মধ্যে তাহাকেও সপরিবারে ফিরিতে হইবে। চন্দ্রসুন্দর একটা ভালো দিন দেখিবার জন্য পাঁজি বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু উশনা তাহাতে বাধা দিল। বলিল, "আমাদের যখন যেতেই হবে, কামাই করবার যখন কোনও

উপায় নেই তখন আপনি আর পাঁজির ফরকট্ তুলবেন না কাকাবাবু। দুর্গা বলে' বেলপাতা শুঁকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমিও ভাবছি সুব্রত আর সোমনাথের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। দাদার এ জামাই দুটির সঙ্গে আমার তেমন আলাপ হয়নি। যেতে যেতে আলাপ করা যাবে। সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত অনেক সময় পাব।"

সূর্যসুন্দর খবরটা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কোনও মন্তব্য করিলেন না। কেবল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

উশনা বলিল, "আমার কয়েকটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছি, তাই চলে যেতে হচ্ছে। তবে আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে থেকে যাব। কিছু টাকা না হয় লোকসান হবে।"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "না, কাজ ক্ষতি করে' থাকতে হবে না। দেখা তো হয়ে গেল। এই যথেষ্ট—"

সূর্যসুন্দর আর কিছু বলিলেন না। অর্ধনিমীলিত নয়নে রাজলক্ষ্মীর ছবিটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল রাজলক্ষ্মী যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—"ওদের আর কিছুদিন থাকতে বললে না কেন। ওদের চাকরি বা ব্যবসা কি তোমার চেয়েও বড়। ওরা কি কিছুদিন ছুটি নিতে পারে না? ওদের তুমি থাকতে বল।"

সূর্যসুন্দরের মনে হইল রাজলক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকিলে এই কথাই বলিত। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন উশনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি হয়তো কিছু বলিতেন, সেটা আর বলা হইল না। আর একবার অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

"বাবা, ঘুমিয়েছেন?"

ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া রাজলক্ষ্মীর কথাই ভাবিতেছিলেন। চোখ খুলিয়া দেখিলেন চম্পা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটি ফিডিং কাপ এবং রঙিন তোয়ালে।

পাশের ঘর হইতে গগনও আসিয়া প্রবেশ করিল। সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "কত আর খাব। এইতো একটু আগে কি যেন একটা খেলাম।"

"সামান্য একটু আঙুরের রস খেয়েছেন"—গগন বলিল—"ও তো আপনার কাছে কিছুই নয়। ওভালটিনটা খেয়ে নিন। আমি আপনার জন্য পায়রার বাচ্চা আনতে দিয়েছি, বিকেলে 'জগ্ সুপ' করে দেব—"

সূর্যসুন্দরের ওসব খাইবার—কোন কিছু খাইবারই—বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গগন তাঁহার জন্য এই সব ব্যবস্থা করিতেছে ইহাতে তাঁহার সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া গেল। চম্পা নিপুণভাবে তাঁহার গলার চারিধারে রঙিন তোয়ালে জড়াইয়া ওভালটিন খাওয়াইতে লাগিল। সূর্যসুন্দর আর আপত্তি করিলেন না। ওভালটিন খাওয়া হইয়া গেলে তিনি উদ্ভাসিত চক্ষে গগনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জগ্ সুপ? সে তো চমৎকার হবে। তোর বাবার ছেলেবেলায় নিউমোনিয়া হয়েছিল, তখন পূর্ণিয়া থেকে সাহেব সিভিল সার্জন দেখতে এসেছিলেন। তিনি বিরুকে চিকেনের জগ সুপ করে দিতে বলেছিলেন। তোর দিদি নিজে হাতে সেটা তৈরি করতেন। তারপর বিরুকে সেটা খাইয়ে গঙ্গাজলে স্নান করে ফেলতেন। ডাকবাংলায় পচ্না বলে একটা খানসামা ছিল সে কেটেকুটে সব ব্যবস্থা করে দিত।

"আমিও ছোটকাকাকে চিকেন আনতে বলেছিলাম। কিন্তু চিকেন পাওয়া গেল না। কালীপদ পণ্ডিতের বাড়ি থেকে পায়রার বাচ্চা নিয়ে এসেছে।"

"ওতেও চমৎকার সুপ হবে। তুই নিজে করবি নাকি?"

"হ্যাঁ। আমি আলাদা একটা তোলা উনুন আনিয়েছি। মদ্‌ধু কুটে দিলেই চড়িয়ে দেব। ও আপনি এসেছেন? আজই যাচ্ছেন নাকি।"

সুপর্ণ সিংহ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিলেন।

গগন বলিল, "ইনি আমার একজন বন্ধু। অনুর আত্মীয়। আজই যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ আজই যাব।"

সুপর্ণ সিংহ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন। গগনও তাঁহার পিছু পিছু গেল।

"অনুর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?"

'হয়েছে। গঙ্গার ধারে এতক্ষণ আমরা ছিলাম।"

একটু ইতস্তত করিয়া সুপর্ণ সিংহ বলিলেন, "আমি এখনই ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি। কিন্তু অনু বলছে সে ওর বাবাকে আগে চিঠি লিখবে। তিনি যা বলবেন তাই হবে। বাবাকে লুকিয়ে ও আর কিছু করতে রাজী নয়। আমিও বললাম, বেশ তাই হোক।"

বাগানের বেড়ার কাছে পার্বতীকে দেখা গেল। মুচকি হাসিয়া সে সুপর্ণ সিংহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "জামাইবাবু, আসুন, অনুদির ঘরে আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।"

পার্বতী গগনের দিকে চাহিয়াও আর একবার হাসিল। তাহার পর এক ছুটে চলিয়া গেল। দূর হইতে আবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"শীগগির আসুন, ট্রেনের আর বেশী দেরি নেই।"

সুপর্ণ সিংহের কানের ডগা দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজের হাতঘড়ির দিতে চাহিয়া বলিলেন, "ট্রেনের তো দেরি নেই। আমি বরং সোজা স্টেশনেই চলে যাই। তা না হলে ট্রেন পাব না।"

"খেয়ে যান। ট্রেন আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি ব্যবস্থা করছি।"

গগন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিতে পাইল গঙ্গা বাগান হইতে এক ঝুড়ি তরকারি লইয়া আসিতেছে।

"গঙ্গাকাকা, শোন একবার—"

গঙ্গা দ্রুতপদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার আবার কি হুকুম? পায়রা তো এসে গেছে। মদধু একটু পরে আসছে, বানিয়ে দেবে।"

"তুমি ছুটে একটু স্টেশনে যাও। স্টেশনমাস্টারকে বোলো আমাদের বাড়ি থেকে একজন লোক যাবে। যদি তাঁর স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয় ট্রেনটা যেন একটু ডিটেন করেন।"

গঙ্গা চলিয়া গেল।

সুপর্ণ সিংহ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"ট্রেন ডিটেন করবে?"

"করবে। আপনি যান খেয়ে নিন।"

সুপর্ণ সিংহকে পাঠাইয়া দিয়া গগন আবার সূর্যসুন্দরের কাছে গেল।

"উনি এখনই চলে যাচ্ছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"দিগন্ত কোথায়, তাকে দেখছি না।"

"সে তার থীসিস নিয়ে ব্যস্ত।"

"কি সম্বন্ধে লিখছে।"

"সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে। সে প্রমাণ করতে চাইছে যে সংস্কৃত সাহিত্য মরেনি, এখনও প্রবলভাবে বেঁচে আছে। গ্রীক সাহিত্য যেমন য়ুরোপে, সংস্কৃত সাহিত্য তেমনি উত্তর ভারতবর্ষের সব সাহিত্যকে রূপ দিয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবধারা আজও পুরোনো হয়ে যাননি, তা চির-আধুনিক চির-উজ্জ্বল।"

"বাঃ! সতীশবাবু বলে একজন সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনিও এই কথা বলতেন। সংস্কৃতে খবু বড় পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজিতেও। খুব রসিক লোক ছিলেন ভদ্রলোক। কাউকে খোশামোদ করতেন না। বাঙালী অফিসারদের মধ্যে ওরকম লোক বেশী দেখিনি আমি।"

গগনের আশঙ্কা হইল বেশী কথা বলিয়া দাদু হয়তো ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন।

"বেশী কথা বোলো না দাদু। একটু ঘুমোও।"

সূর্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ঘুমের প্রতীক্ষাই তো করছি ভাই।"

"চোখ বুজে শুয়ে থাক। কাকীমা ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দাও, দাদুর চোখে আলো লাগছে।"

সূর্যসুন্দর বাধা দিলেন—"না থাক। আলো ভালোই লাগছে—তোমার যখন হুকুম তখন চোখই বুজে ফেলছি।"

গগন বাহিরে চলিয়া গেল। সূর্যসুন্দর জানালা দিয়া আর একবার নারিকেল গাছটার দিকে চাহিলেন। এ জানালাটা সূর্যসুন্দর বন্ধ করিতে দেন না, কারণ এই জানালা দিয়া তরুণ নারিকেল গাছটা দেখা যায়। এদেশে নারিকেল গাছ ভালো হয় না। রাজলক্ষ্মীর শখ হইয়াছিল বাড়ির উঠানে একটি নারিকেল গাছ করিতেই হইবে। তখন আশুবাবু ছিলেন। তিনিই তখন চাষবাস দেখাশোনা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় নারিকেল গাছটি পোঁতা হয়। অনেক দূর পর্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া প্রায় দশ বারো সের নুন দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর চারাটি লাগানো হয়। নারিকেল গাছ এখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সবুজ চিক্কণ পাতা হইতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার সর্বাঙ্গে আজ যৌবনের মহিমা। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আশুবাবু কেহই বাঁচিয়া নাই। তাঁহারও যাইবার সময় আসন্ন। সূর্যসুন্দর আজকাল গাছটিকে বার বার দেখেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ বুজিয়া আসিল। যে সতীশবাবুর কথা একটু আগে গগনকে বলিতেছিলেন, তাঁহারই কথা মনে পড়িল। এই প্রসঙ্গে সন্তোষের ছেলে জগাই এবং পাঁচকড়িবাবু উকিলের কথাও স্মরণ করিলেন তিনি। সত্যই অদ্ভুত লোক ছিলেন সতীশবাবু। ছিপছিপে ফরসা নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব লোকটির ছবি তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। সিভিল সার্জন রূপেই প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ। আগে সাহেবরাই সিভিল সার্জন হইতেন। সতীশবাবু স্বীয় যোগ্যতার জোরেই অ্যাসিটেন্ট সার্জনের পদ হইতে সিভিল সার্জনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। মেডিসিন, সার্জারি এবং গাইনিকলজি তিনটি বিষয়েই তাহার সমান পারদর্শিতা ছিল। তিনি যেদিন প্রথম মনিহারী ডিসপেন্সারি ভিজিট করিতে আসেন সেদিনের কথা সূর্যসুন্দরের আজও মনে আছে। তাঁহার আগে যে সব সাহেব সিভিল সার্জন আসিতেন তাঁহারা একটু দূরে দূরে থাকা পছন্দ করিতেন। ডাক্তারের নিকট হইতে কোনওরকম ব্যক্তিগত

উপকার বা সুবিধার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের ছিল না। পূর্নিয়া হইতে আগে একটি ট্রেন সকালে আসিত এবং আর একটি ট্রেন সন্ধ্যায় যাইত। সমস্ত দিন আর কোনও ট্রেন ছিল না। সুতরাং সিভিল সার্জনরা আসিলে তাঁহাদের সমস্ত দিন থাকিতে হইত। তখন ডাকবাংলো ছিল না, তখন তাঁহারা ডিসপেন্সারির বারান্দাতেই সমস্ত দিন কাটাইতেন। স্বভবতঃই তাঁহাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন সূর্যসুন্দর। সাহেব সিভিল সার্জনরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেন, কিন্তু কখনও কোন খাবার বা অন্যায় সুবিধা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। চায়ের জন্য সামান্য দুধটুকু পর্যন্ত কেহ কখনও লন নাই। তাঁহাদের সঙ্গে খাবারের বাস্কেট থাকিত, একটি চাপরাসীও থাকিত। বাস্কেট হইত পাঁউরুটি, মাখন, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি, সিদ্ধ মাংস এবং নানারকম ফল বাহির হইত। স্টোবে জল গরম করিয়া চাপরাসী 'কনডেন্সড্ (Condensed) মিল্ক দিয়া চা প্রস্তুত করিয়া দিত। এইসব খাইয়াই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতেন তাহারা। প্রয়োজনের বেশী কোন কথা বলিতেন না। তাঁহাদের ভদ্রতা নিখুঁত ছিল, কিন্তু তাহারা মাখামাখি করিতে চাহিতেন না। কেহ সমস্ত দিন বই পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন। নীল সাহেব বলিয়া একটি সাহব আসিয়াছিলেন, তিনি তো একবার একটা ভিমরুলের চাক লইয়াই সমস্ত দিন তন্ময় হইয়া রহিলেন। বাগানের একধারে একটা ভিমরুলের চাক হইয়াছিল। নীল সাহেব আগ্রহভরে ভিমরুলদেরই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভিমরুলরা উড়িয়া উড়িয়া যাওয়া আসা করিতেছে, নিপুণভাবে চাক প্রস্তুত করিতেছে ইহা দেখিয়াই সাহেবের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। তিনি একটি ছোট ক্যামেরা বাহির করিয়া চাকের এবং ভিমরুলদের কয়েকটা ফোটোও তুলিয়াছিলেন। আর একজন সাহেবের কথা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তিনি আউটডোরের রোগীদের ভিতর হইতে তিন চারটি রোগী বাছিয়া লইতেন এবং সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাদের ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতেন। প্রত্যেক রোগীর নাম, ধাম, বংশপরিচয়, রোগের বিবরণ, পরীক্ষা করিয়া কি কি পাইলেন তাহার ফর্দ, অসুখের ডায়াগনোসিস এবং ঔষধের প্রেসকৃপসন কাগজে লিখিয়া যাইবার সময় সূর্যসুন্দরকে দিয়া যাইতেন।

সাহেব সিভিল সার্জনদের কথা ভাবিতে ভাবিতে সূর্যসুন্দরের হঠাৎ রেট সাহেবের কথা মনে পড়িল। রেট সাহেবকে লোকে পাগলা সাহেব বলিত। নানারকম পাগলামি ছিল তাঁহাব। ভারতবর্ষে আসিবার আগে খুব সম্ভবত তিনি মেকলে সাহেবের লেখা বাঙালী-চরিত পাঠ করিয়াছিলেন। তখন অধিকাংশ ডাক্তারই বাঙালী, রেট সাহেব নানা কৌশলে তাঁহাদের দোষ ধরিবার চেষ্টা করিতেন এবং দোষ পাইলে প্রায়ই কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই দুইজন বাঙালী ডাক্তার সাস্‌পেণ্ডেড হইলেন। সাধারণ সিভিল সার্জনরা কোন ডিসপেন্সারি 'ভিজিট' করিবার পূর্বে একটা খবর দিয়া আসিতেন। কিন্তু রেট সাহেব হঠাৎ আসিতেন বিনা খবরে। 'সারপ্রাইজ ভিজিট' দেওয়াই তাঁহার নিয়ম ছিল। সূর্যসুন্দরের বাড়িতে নকুল, যোগেশ, বিধু প্রভৃতি কয়েকজন আশ্রিত পোষ্য ছিল। পরগাছা-জাতীয় বেকার উপকৃত আত্মীয়েরা প্রায়ই প্রচ্ছন্ন শত্রু হয়। সূর্যসুন্দরের প্রতাপ প্রতিপত্তি তাহাদের অন্তরে শূল বিদ্ধ করিত। তাহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া উপরে একটি বেনামী দরখাস্ত পাঠানো যে সূর্যসুন্দর কেবল প্র্যাকটিস করিয়াই বেড়ান, হাসপাতালের কাজ কিছুই দেখেন না। তখন সিভিল সার্জনরাই ডাক্তারদের হর্তাকর্তাবিধাতা ছিলেন। অন্য সিভিল সার্জন থাকিলে হয়ত এরকম বেনামী দরখাস্ত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। কিন্তু রেট সাহেব জো পাইয়া গেলেন। হঠাৎ একদিন

অপ্রত্যাশিতভাবে হানা দিলেন তিনি। তখন সকালের ট্রেন সাড়ে সাতটায় আসিত। রেট সাহেব সেই ট্রেনেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ট্রেন হইতে নামিয়া সোজা ডিসপেন্সারিতে গেলেন না। ডিসপেন্সারির ঠিক পাশেই একটা অড়হরের ক্ষেত ছিল, তিনি তাহার ভিতর আত্মগোপন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ডিসপেন্সারির কাজ ঠিকমতো চলিতেছে কি না। ডিসপেন্সারির কাজ ঠিকমতোই চলিতেছিল, ডিসপেন্সারির বারান্দায় রোগী-পরিবৃত হইয়া সূর্যসুন্দর বসিয়া ছিলেন। ঘণ্টাখানেক অড়হর ক্ষেতের জঙ্গলের মধ্যে কষ্টভোগ করিয়া রেট সাহেব অবশেষে হঠাৎ রোগীর ভিড়ের মধ্যে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। সূর্যসুন্দর প্রথমে রেট সাহেবকে দেখিতেই পান নাই, তাঁহার সামনে পিছনে এবং দুই পাশে রোগীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সাহেব দেখিয়া রোগীরাই সরিয়া গেল এবং রেট সাহেব নিজের হ্যাট তুলিয়া বলিলেন, গুড্ মর্নিং ডক্টার! আই অ্যাম ইওর সিভিল সার্জন। সূর্যসুন্দর তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। রেট সাহেব বলিলেন, তুমি ব্যস্ত হইও না, কাজ কর। আমি এখানেই বসিতেছি। কাছেই একটা চেয়ার ছিল রেট সাহেব সেইটার উপরই বসিয়া পড়িলেন। মেয়ে পুরুষ সব রোগীই সূর্যসুন্দরকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েদের বসিবার জন্য আলাদা কোনও ঘর ছিল না। থাকিলেও তাহারা সেখানে বসিত না। রেট সাহেব দেখিলেন একটি যুবতী মেয়ে সকলের সামনে বারান্দার একপাশে বসিয়া নিজের কোলের ছেলেটিকে স্তন্যদান করিতেছে। তাহার বুকের কাপড় অসংবৃত। রেট সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন শুনিলেন যে সূর্যসুন্দর সকলের সামনেই একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তাহার পায়খানা প্রত্যহ পরিষ্কার হয় কি না তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্ষুদ্র একটি শিস দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সূর্যসুন্দরকে ডাকিয়া রোগীর ভিড় হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে গিয়া সূর্যসুন্দরকে বলিলেন, ডাক্তার, তুমি এ কি করিতেছ! লেডিজ্‌রা (Ladies) পুরুষদের সহিত এমনভাবে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াইয়া আছে, একটি লেডি দেখিলাম সকলের সামনে বসিযা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে, শুনিলাম তুমি একটি লেডিকে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পায়খানা পরিষ্কার হয় কি না—এসব তো বড়ই অসংগত কাণ্ড। বিলাতে সভ্যসমাজে এ কথা কেহ ভাবিতেই পারে না। সূর্যসুন্দর উত্তর দিলেন—এদেশ তো বিলাত নয়, এদেশের লজ্জাবোধ এবং সামাজিক আইনকানুনের মানদণ্ড আলাদা। ইহারা ডাক্তারকে পিতৃতুল্য মনে করে এবং তাহার কাছে তাহাদের কোনও লজ্জাই নাই। এদেশে 'বাথরুম' নাই. একটু পরে দেখিতে পাইবেন, ওই গঙ্গার ধারে বালুর চরকেই উহারা 'বাথরুম' করিয়াছে। ব্যাপারটা আপনার কাছে যতটা অশোভন মনে হইতেছে উহাদের কাছে ততটা মনে হয় না। এসব লইয়া উহারা মাথাই ঘামায় না।

"ইজ্ ইট সো"—রেট সাহেব আর একবার ছোট্ট একটি শিস দিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তবু, শোভনতা ও আইন রক্ষার জন্য একটি ফিমেল ওয়েটিং রুম থাকা উচিত। রেট সাহেবের ইচ্ছা অনুসারেই কিছুদিন পরে একটি ফিমেল ওয়েটিং রুম করা হয়। কিন্তু কোনও 'ফিমেল' সেখানে বসিত না। ডিসপেন্সারির চাকর পচনারই সুবিধা হইয়াছিল, সে সেখানে রাত্রে শুইত। রেট সাহেব প্রথম যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিন সূর্যসুন্দরকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আশা করি তুমি সত্য কথা বলিবে।"

সূর্যসুন্দর তৎক্ষণাৎ উত্তব দিলেন, "নিশ্চয় বলিব, আমি ব্রাহ্মণ, কখনও মিথ্যা কথা বলি না।"

"ভেরি গুড্। তোমার নামে এখান হইতে দরখাস্ত গিয়াছে। দরখাস্তকারীরা লিখিয়াছে যে তুমি নাকি সকালে ডিসপেন্সারি ছাড়িয়া প্র্যাকটিস করিয়া বেড়াও।"

'ইমারজেন্সি কল' আসিলে আমাকে যাইতে হয়। কারণ আমি এখানে একমাত্র ডাক্তার। কিন্তু সাধারণত আমি সকালে বাহির হই না। আপনাদের আইন অনুসারে আমি দশটার পর বাহিরে যাইতে পারি। কারণ ডিসপেন্সারির সময় সকাল ছয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু আমি রোজ বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত থাকি। এখানে বেলা আটটার আগে রোগী আসে না। বারোটা পর্যন্ত ভিড় থাকে। তাহার পর আমি প্র্যাকটিস করিতে বাহির হই।"

"তুমি এখানে কতদিন আছ?"

"সাত আট বছর।"

"এতদিন একজায়গায় আছ?"

"এখানে আগে আমার নিজেরই ডিসপেন্সারি ছিল। সে সময় কমিশনার সাহেব এ অঞ্চলের টাল জঙ্গলে শিকার করিতে আসেন। টাল জঙ্গলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন তিনি। আমি গিয়া তাঁহার চিকিৎসা করি এবং তিনি সুস্থ হন। তাঁহার চেষ্টাতে এখানে সরকারী ডিসপেন্সারি হয়। কমিশনার সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি এখানে চাকুরি করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু একটি শর্তে। শর্তটি এই যে আমি স্বেচ্ছায় যাইতে না চাহিলে আমাকে এখান হইতে বদলি করা হইবে না। সেজন্য আমি গোড়া হইতে বরাবরই এখানে আছি।"

"তুমি এখান হইতে অন্য কোথাও যাইতে চাও না?"

"না।"

"কিন্তু গভর্নমেন্টের আইন অনুসারে একজায়গায় এক লোককে বেশী দিন রাখা যায় না। কমিশনার সাহেবরাও এই আইন অনুসারে বদলি হন।"

"আমাকে যদি বদলি করা হয়, আমি চাকরি ছাড়িয়া দিব।"

রেট সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর আপিসের খাতাপত্র তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। এমনকি টুলের উপর চড়িয়া আলমারির মাথাগুলিও উঁকি মারিয়া দেখিলেন সেখানে ময়লা জমিয়া আছে কি না। সেদিন রেট সাহেব ভিজিটার্স বুকে যে সব মন্তব্য লিখিলেন তাহা তিনি আর কোথাও লেখেন নাই। লিখিলেন এই ডিসপেন্সারি পরিদর্শন করিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এখানকার মেডিকাল অফিসার শুধু যে ডাক্তার ভালো তাহাই নয়, লোকও খুব ভালো, এখানকার পাবলিক তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। এই ডিসপেন্সারির আরও উন্নতি হওয়া উচিত। একটি ফিমেল ওয়েটিং রুম অবিলম্বে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

রেট সাহেব সূর্যসুন্দরের প্রতি কত প্রসন্ন হইয়াছেন তাহার প্রমাণ কিছুদিন পরে পাওয়া গেল। কিছুদিন পরেই মনিহারী ঘাটে যে অর্ধোদয় যোগের বিরাট মেলা হয়, সেই মেলা লইয়া রেট সাহেব মাতিয়া উঠিলেন। আগের বার অর্ধোদয় যোগের মেলায় কলেরা হইয়া বহুলোক মারা গিয়াছিল। রেট সাহেব বলিলেন বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতির যুগে কলেরায় রোগী মারা যাইবে কেন? সুবন্দোবস্ত করিলে একটি রোগীও মারা যাইবে না। সুবন্দোবস্ত করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। গঙ্গার ঘাটে খড় ও দরমা দিয়া আড়াইশত রোগীর জন্য ঘর

প্রস্তুত হইল। বাঁশ, দরমা এবং খড় দিয়া আড়াইশত বিছানাও প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিলেন তিনি। বলিলেন যে বিছানায় কলেরা রোগী ভরতি হইবে সে বিছানা আর দ্বিতীয় রোগীর জন্য ব্যবহৃত হইবে না। সে বিছানার খড়, দরমা এবং প্রয়োজন হইলে কম্বলও পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। গঙ্গার ধারেই ঔষধাদির জন্য প্রকাণ্ড ডিসপেন্সারিও নির্মিত হইল—এটিও খড়ের। দশ জন ডাক্তার, কুড়ি জন কম্পাউণ্ডার এবং পঁচিশ জন পুরুষ-নার্সও নিযুক্ত হইল এজন্য। এবং এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটার শীর্ষদেশে তিনি স্থাপন করিলেন সূর্যসুন্দরকে। সূর্যসুন্দরই ইন্-চার্জ হইয়া সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরিয়া রহিলেন। প্রত্যেক ঘাটের কাছে বাংলা হিন্দী উড়িয়া ও আসামী ভাষায় সাইনবোর্ড টাঙাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন রেট সাহেব। প্রত্যেক ভাষায় লেখা ছিল—গঙ্গায় ডুব দিয়া স্নান কর, কিন্তু গঙ্গার জল এক বিন্দুও যেন পেটে না যায়। গেলে কলেরা হইবার সম্ভাবনা। পানের জন্য ফুটানো-জল জ্বালা করিয়া রাখা আছে। সে জলও গঙ্গাজল। পুলিসকে বলিলেই সে জল পাওয়া যাইবে। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল অত লোকের জন্য গঙ্গাজল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া বড় বড় জ্বালায় ঢালিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে মেলায় তিন চারদিন আগে হইতেই প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। এজন্য স্থানীয় জমিদারদের সিপাহী এবং চাকরদের সহায়তা না পাইলে তাঁহাকে মুশকিলে পড়িতে হইত। প্রতি ঘাটে দুইজন করিয়া পুলিস মোতায়েন ছিল। তাহারা প্রত্যেক গঙ্গাস্নানার্থীকে স্নান করাইয়া খাবারের দোকানে পৌঁছাইয়া দিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। খাবারের দোকানে দোকানে স্যানিটারি ইন্‌স্‌পেকটাররা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা দেখিতেছিলেন কোনও খাবারে যেন মাছি না বসে, বা কোনও পচা খাবার যেন বিক্রয় না করা হয়। সন্দেহ হওয়াতেই দুই একটি দোকানের সমস্ত খাবার তাঁহারা মাটিতে পোঁতাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মোটকথা রেট সাহেব পুলিস এবং ডাক্তারের দল লইয়া সমস্ত মেলায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া কলেরার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা জমিদার, পুলিস, গঙ্গাস্নানার্থী, মেলার দোকানদার কাহারও সমর্থন লাভ করে নাই। দুই একজন হিতৈষী উপরে কমিশনার সাহেবকে টেলিগ্রামও করিয়াছিলেন যে রেট সাহেব অনর্থক কড়াকড়ি করিয়া হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। শোনা যায় কমিশনার সাহবের আপিস হইতে একজন লোকও নাকি চিঠি লইয়া রেট সাহেবের কাছে আসিয়াছিল। তাহার উত্তরে রেট সাহেব নাকি কমিশনার সাহেবকে জানান যে জেলার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি পাবলিকের নিরাপত্তার জন্য বিজ্ঞানসম্মত যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে ধর্মহানির কোনও আশঙ্কা নাই। যাহারা ইহা লইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতেছে সম্ভবত ইহাতে তাহাদেরই স্বার্থহানি ঘটিয়াছে। তাহারা পাবলিকের শত্রু, তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিস কেস করা উচিত। কমিশনার সাহেব ইহা লইয়া আর রেট সাহবেকে কোনও চিঠি লেখেন নাই। নিজেই একদিন মেলা পরিদর্শন করিবার জন্য আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন এবং রেট সাহেবের ব্যবস্থা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় রেট সাহেব সূর্যসুন্দরের সহিত কমিশনার সাহেবের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—এই ইয়ং ডাক্তারটির সাহায্য না পাইলে আমি এসব ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না। সমস্ত প্রশংসা ডাঃ মুখার্জিরই প্রাপ্য। এই পরিচয় পরে কাজে লাগিয়াছিল। কিছুদিন পরে যখন স্কুল কলেজে ভরতি হইবার জন্য বা চাকুরির জন্য ডোমিসাইল (domicile) সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইতে লাগিল তখন এই কমিশনার সাহেব তাঁহাকে জোর-কলমে একটি সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। এই

প্রসঙ্গে আর একটি মর্মান্তিক কথাও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। অর্ধোদয় মেলার পূর্বে রেট সাহেব তাঁহার অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জনকে সাত দিনের ছুটি দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি পূর্নিয়া জেল হইতে পাঁচশত কম্বল লইয়া মেলার ঠিক আগের দিন মনিহারী ঘাটে উপস্থিত থাকিবে। সেখানে আড়াইশত বেডের (bed) ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বেডের জন্য দুইটি কম্বল চাই। মেলার ঠিক আগের দিন রেট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন ভদ্রলোকও আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র রেট সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কম্বল কই।"

"কম্বল গুড্‌স্ ট্রেনে (goods train) বুক (book) করে দিয়েছি। এখনও এসে পৌঁছে নি।"

আশ্চর্য কাণ্ড, শুনিবামাত্র রেট সাহেব সকলের সামনে অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জনের গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিলেন। তাহার পর গর্জন করিয়া উঠিলেন—"আমার চাপরাসী গিয়াও গুডস্ ট্রেনে কম্বল 'বুক' করে দিতে পারত। তোমাকে সাত দিনের ছুটি দিয়েছিলাম তুমি কম্বল সঙ্গে করে আনবে বলে! কই কম্বল?"

অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর দিলেন, "আমি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এসেছি। আমার সঙ্গে কম্বল আনলে অনেক খরচ হত।"

"খরচ গভর্নমেণ্ট দিত। তুমি দিতে না। গো অ্যাণ্ড ব্রিং দি ব্ল্যাংকেট্‌স অ্যাট ওয়ান্স। (Go and bring the blankets at once.) যেমন করে হোক কম্বল অবিলম্বে এসে পৌঁছানো চাই।"

সূর্যসুন্দরের সঙ্গে স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবুর খুব খাতির ছিল। তিনি বলিলেন, একটি খালি ইনজিন একটু পরে কাটিহার যাইবে, অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন সেই ইনজিনে কাটিহারে গিয়া খোঁজ করুন। সম্ভবত কম্বল এতক্ষণ কাটিহারে পৌঁছিয়াছে। আমি কাটিহারের স্টেশন মাস্টারকে চিঠি লিখিয়া দিতেছি মালগাড়িটি যদি অবিলম্বে মনিহারিতে না আসে তাহা হইলে কম্বলের গাড়িটি যেন সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে জুড়িয়া দেওয়া হয়। তাহাই হইল, অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন ইনজিনে চড়িয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কম্বল আসিয়া পড়িল।

অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জনের মুখচ্ছবিটাই সূর্যসুন্দরের মনে বার বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সূর্যসুন্দরের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রেট সাহেবের বর্বর আচরণের পর তিনি সূর্যসুন্দরের বাহিরের ঘরে বসিয়া অধোবদনে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন। এই ছবিটা আবার তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। সূর্যসুন্দর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি চাকরি ছেড়ে দিন এবং রেট সাহেবের নামে মকদ্দমা করুন। আমরা আপনার হয়ে সাক্ষী দেব।" এ প্রস্তাবে অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "তিন ফিগারের চাকরি ছাড়া অত কি সহজ মশাই! দশ বৎসর চাকরি করছি। ঘরে এক পাল ছেলে-মেয়ে আত্মীয়স্বজন। বুড়ো বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন। সকলেরই ভরসা আমি। হঠাৎ চাকরি ছাড়লে চলে? এ বয়সে কোথায় প্র্যাকটিস করতে বসব, প্র্যাকটিস হবে কি না, সবই অনিশ্চিত। চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতেই পারি না। রেট সাহেবের ব্যবহারটা একটু অভদ্র হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভেবে দেখলাম আমারও দোষ ছিল। কম্বলগুলো সঙ্গে করে' আনাই উচিত ছিল আমার।" কম্বল অসিয়া পৌঁছিবার পর তিনি রেট সাহেবের নিকট গিয়া নিজের কর্তব্যচ্যুতির জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনাও

করিয়াছিলেন। চড়টা মারিয়া রেট সাহেবও অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন মনে মনে। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন কাজটা অশোভন, অনুচিত এবং অভদ্র হইয়া গিয়াছে। অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন তখন রেট সাহেবের আর এক মূর্তি দেখা গেল। তিনি অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জনের হাত দুইটি ধরিয়া বিনয়-নম্র কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "O, doctor, I am myself so sorry for my rude and unpardonable conduct of yesterday. I could not check my temper, which I should have done. Please pardon me."

("ডাক্তার, আমি গতকল্য তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি তাহা অভদ্র এবং অমার্জনীয়। তজ্জন্য নিজেই আমি খুব লজ্জিত হইয়াছি। আমার রাগটা সামলানো উচিত ছিল, কিন্তু তাহা আমি পারি নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।")

সূর্যসুন্দর পরে জানিতে পারেন রেট সাহেব তাঁহাকে একটি ভালো 'পেইং' ডিসপেন্সারিতে (যে ডিসপেন্সারিতে প্র্যাকটিস খুব ভাল হয় সে ডিসপেন্সারি-কে 'পেইং' বলা হইত) বদলি করিয়া দেন এবং তাঁহার সার্ভিস বুকে এমন প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন যে তাহার জোরেই তিনি পরে সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সতীশবাবুর কথা ভাবিতে গিয়া প্রথমে সূর্যসুন্দরের সাহেব সিভিল সার্জনদের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সাহেবদের বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র, পারতপক্ষে তাঁহাদের অধীনস্থ ডাক্তারদের সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। বাঙালী সিভিল সার্জন সতীশ মিত্র আসিয়াই কিন্তু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতার সুর বাজিয়াছিল, বুঝা গিয়াছিল তিনি বাঙালী, বাঙালী-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁহার সঙ্গেও একজন আরদালী আসিয়াছিল। আরদালীর সঙ্গে একটি বেতের বাস্কেটও ছিল। সে বাস্কেটের ভিতর খাবারও ছিল নানারকম। কিন্তু সতীশবাবু আসিয়াই নমস্কার করিয়া সূর্যসুন্দরকে বলিয়াছিলেন—"প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ। এখানে টুর প্রোগাম করেই একটি বাসনা মনে জেগে ছিল, যদি অভয় দেন নিবেদন করি।"

সূর্যসুন্দর একথা শুনিয়া মনে মনে একটু শশব্যস্ত হইয়াছিলেন। সিভিল সার্জনের মুখে এ কি কথা! মৃদুহাস্য করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিয়াছিলেন, "কি বলুন।"

"গঙ্গার তীরে আপনার বাড়ি। ইচ্ছা আছে, দুপুরে গঙ্গায় অবগাহন স্নান করে আপনার বাড়িতে চারটি প্রসাদ পাই। সাহেবী খানা খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে! স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বাঙালী খাবার কপালে জোটে না। খানসামারাই ভরসা।"

"বেশ তো, বেশ তো, এ আর বেশী কথা কি।"

"মাকে বলবেন বেশী কিছু যেন না করেন। আলুভাতে, ঘি, একটু সুক্তো, একটু মোচার ঘণ্ট, দু'একটা ভাজাভুজি, একটু মুগের ডাল আর বাঙালী ধরনের রান্না মাছের ঝোল বা ঝাল। সামান্য একটু চাটনি বা অম্বল, তারপর দই আর একটা মিষ্টি। এর বেশী আর কিছু করবেন না যেন। মাংস খাব না। রোজ মাংস খাই।"

"বেশ তাই হবে।"

নিখুঁত সাহেবী স্যুট পরা সতীশ মিত্রের দিকে সূর্যসুন্দর একটু অবাক হইয়াই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা হইতে যে আলোর ছটা সেদিন বিকীর্ণ হইতেছিল সেটাও আজ যেন সূর্যসুন্দর দেখিতে পাইলেন।

সতীশবাবু আর একটি কথাও বলিয়াছিলেন।

"আমি আপনার কাজের খুঁত বা দোষ ধরতে আসিনি। আমি পুলিস নই, ডাক্তার। আমরা ডিটেকটিভগিরি অবশ্য করি, কিন্তু তা চোর ধরবার জন্য নয়, রোগ ধরবার জন্যে। আপনি কাজ করুন, ডাক্তারি ব্যাপারে আমার যদি কোনও সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন বলবেন, আমি যথাসাধ্য করব।"

সাধারণ সিভিল সার্জনরা আসিয়া যে সব খাতাপত্র দেখিতেন তাহা তিনি দেখিলেন না। একটি উদরী রোগী আসিয়াছিল তাহাকে লইয়াই আলোচনা করিলেন খানিকক্ষণ। কি কি কারণে পেটে জল জমিতে পারে এবং কি কি লক্ষণ দ্বারা তাহা বোঝা যায় সে সম্বন্ধেই তিনি চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া সূর্যসুন্দর বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন সেদিন।

সতীশ মিত্রের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হইয়াছিন সূর্যসুন্দরের। পরে যখন তিনি আসিতেন, সন্ধ্যার ট্রেনে আসিতেন। সমস্ত রাত সূর্যসুন্দরের বাড়িতে থাকিতেন। সকালের ট্রেনে ফিরিয়া যাইতেন। তখন সূর্যসুন্দরের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় গানের আসর বসিত, থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। সে আসরে তবলা বাজাইত সন্তোষ এবং গান গাহিত সন্তোষের ছেলে জগাই। জগাই বেশ সুকণ্ঠ এবং সুরজ্ঞ ছিল। জগাইয়ের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সতীশবাবু। মুগ্ধ হইবার আর একটা কারণও ছিল। কিছুদিন পূর্বে সতীশবাবুর বড়মেয়েটি মারা গিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত মন তখন শোকে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। জগাই তাঁহাকে যে গানটি শুনাইয়াছিল তাহার প্রথম দুই কলি সূর্যসুন্দরের এখনও মনে আছে। 'কেমন মাটি এদেশের মা, যাহা গড়ি ভেঙে যায়। যতই গড়ি সযতনে কিছুতে থাকে না হায়।' বেহাগ সুরে এই গানটি অপরূপ একটি ভাবলোক সৃষ্টি করিয়াছিল। বিরু তখন কলেজে পড়িত, কবিতাও লিখিত। গানটির সেই নাকি রচয়িতা। গানটি শুনিয়া সতীশবাবু মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যে চাকরি জগাই পরে নিজের দোষে রাখিতে পারে নাই সেই ড্রেসারির চাকরিটি সতীশবাবুই করিয়া দেন তাহাকে।

সতীশবাবুর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। তিনি খুব বাবুলোক ছিলেন। পোষাকপরিচ্ছদে সর্বদা ছিমছাম 'টিপ্‌টপ্‌' হইয়া থাকিতেন। আপিসের কাজে যখন বাহির হইতেন তখন নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরিতেন। টাইয়ের 'নট' বা ট্রাউজারের ক্রিজ্ (Crease) নিখুঁতভাবে ঠিক থাকিত। আপিসের বাহিরে কিন্তু তাহা পুরা বাঙালি। কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেন্ট লেদারের দামী পাম্‌শু। হাতে বেশ দামী একটি ছড়ি। এসেন্স পছন্দ করিতেন না। আতর তাঁহার প্রিয় ছিল। প্রত্যহ পোশাক পরিয়া বাহির হইতে তাহার অনেক সময় ব্যয় হইত। এই প্রসঙ্গে সূর্যসুন্দরের পাঁচকড়িবাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি একজন বিদ্বান নামজাদা অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন। বেশ ঘন ভ্রূ ছিল তাঁহার, কিন্তু তাহা তিনি কাঁচি দিয়া 'ক্লিপ্' করিতেন। গোঁফও ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতেন। দাড়িটা কামাইতেন প্রত্যহ। ঘাড়ের চুলও খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা থাকিত। এত ছোট যে মনে হইত ক্ষুর দিয়া চাঁছিয়া ফেলিয়াছেন। বেশ ভারী চর্বিবহুল মুখ ছিল তাহার। চোখ দুইটি কিন্তু ছোট ছোট। হাসিলে চোখ বুজিয়া যাইত। খুব ভালো ইংরাজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল একবার তিনি এক ফাঁসির আসামীকে বাঁচাইয়াছিলেন, সে সময় কোর্টে যে ওজস্বিনী বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন তাহা সূর্যসুন্দরকেও শুনাইয়া গিয়াছিলেন

একদিন। ছবিটি সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। পিছনে দুই হাত রাখিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন। খুব বিদ্বান লোক ছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, শেলী, কীট্‌স, ব্রাউনিং গড়গড় করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারও। কিন্তু তাহার মস্ত দোষ ছিল অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ এবং রগচটা লোক ছিলেন তিনি। মনিহারীতে আসিয়া সূর্যসুন্দরেরই আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিতেন। আসিতেন নিজের জমি তদারক করিবার জন্য। মনিহারী হইতে দুই ক্রোশ দূরে তাহার কিছু জমি ছিল। জমিদার তাহার মক্কেল ছিলেন, নিখিলবাবুই তাহাকে পঞ্চাশ বিঘে জমি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিলেন। এই জমি তিনি 'আধি'তে চাষ করাইতেন এবং মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন আধি-দার ঠিক মতো চাষ করিতেছে কি না, কত ফসল পাইবার সম্ভবনা, জমির আল ঠিক আছে কি না, এইসব। মাঠে যাইবার সময় তিনি জমিদারদের গোমস্তা উপেনবাবুকে প্রায়ই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি আসিবার আগে টেলিগ্রাম করিতেন, চিঠিও লিখিতেন। তিনি আসিলে রাজলক্ষ্মীর একটু মুশকিল হইত। কারণ তিনি সকাল আটটার সময় আসিয়াই ভাতে-ভাতে খাইয়া গরুগাড়ি চড়িয়া জমি দেখিতে যাইতেন। রাজলক্ষ্মীকে ভোরে উঠিয়া তাঁহার জন্য রান্না করিয়া রাখিতে হইত। বামুনদিদি তখনও ছিলেন, কিন্তু তিনি ভোরে উঠিতে চাহিতেন না। আটটার সময় উঠিয়া তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন। বেলা দশটার আগে রান্নাঘরে ঢুকিতে পারিতেন না। সুতরাং পাঁচকড়িবাবুর জন্য রাজলক্ষ্মীকেই রান্না করিতে হইত। শুধু ভাতে-ভাত ভদ্রলোককে দেওয়া যায় না, রাজলক্ষ্মী দুই একটা তরকারিও করিতেন। পাঁচকড়িবাবু ফিরিতেন বেলা দুইটা আড়াইটা নাগাদ। তাঁহার ট্রেন সন্ধ্যা সাতটায়। কিন্তু বেলা তিনটা হইতেই তিনি বাড়ির ভিতর খাবারের জন্য তাগাদা দিতেন। অবশ্য ভদ্রভাবে। ধরনটা ছিল অনেকটা এইরকম। বিরু বা পৃথ্বিশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেন, খোকা, মা কি করছেন এখন? বিরু বা পৃথ্বীশ হয়তে বলিল, মা ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছেন? ও, তাহলে এখন বিরক্ত কোরো না। এখন তিনটে বেজেছে। একটু পরে কিন্তু উঠিয়ে দিও, বোলো পাঁচকড়িবাবুকে সন্ধ্যের ট্রেনে যেতেই হবে। কাল কোর্টে একটা জরুরী কেস আছে। আধ ঘণ্টা পরে আবার তাগাদা পাঠাইতেন। মা উঠেছেন? মাকে এবার উঠতে বলো। দিনে বেশী ঘুমানো ভালো নয়। আমাকে আজ সন্ধ্যের ট্রেনটা ধরতেই হবে। বিকালে সাধারণত তিনি গরম লুচি ও তরকারি খাইয়া যাইতেন। কিন্তু পাঁচটা নাগাদ সে খাবার প্রস্তুত না হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন তিনি। অনেক সময় নিজেই উঠানের দরজায় গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, কই বউমা, হল? বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। আমি না হয় বালগোবিন্‌ হালুয়াইয়ের দোকানেই খেয়ে নিচ্ছি। রাজলক্ষ্মীকে তখন বলিয়া পাঠাইতে হইত, এখনই খাবার হয়ে যাবে। লুচি বেলচি। তখন পাঁচকড়িবাবু একটু আগাইয়া উঠানের ভিতর ঢুকিয়া উঁকি মারিয়া স্বচক্ষে দেখিবার চেষ্টা করিতেন সত্যই লুচি বেলা হইতেছে, না বউমা তাঁহাকে স্তোক দিতেছেন। পাঁচটা নাগাদ গরম গরম লুচি তরকারি খাইয়া স্টেশনে চলিয়া যাইতেন এবং বার বার স্টেশন মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন—ট্রেন ঠিক রাইট টাইমে আসছে তো? স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু তাঁহাকে চা খাওয়াইয়া এবং নানারূপ গল্পগুজব করিয়া অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব ছিল। চিঠি লিখিয়া নিজে মোটরে করিয়া পোস্টাপিসে যাইতেন এবং স্বহস্তে চিঠিগুলি পোস্টমাস্টার মহাশয়কে দিয়া আসিতেন। একবার পূর্নিয়ার

পোস্টামাস্টার তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন তাহা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তখন এক পয়সা দামের ছোট পোস্টকার্ড ছিল। পাঁচকড়িবাবু একটি পোস্টকার্ডে ঠিকানা লিখিতে গিয়া এমনভাবে 't'—এর মাথা কাটিয়াছিলেন যে টিকিটে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মুখেও কলমের খোঁচা লাগিয়াছিল। পোস্টমাস্টার সবিনয়ে জানাইয়াছিলেন এ চিঠি বেয়ারিং হইয়া যাইবে। পাঁচকড়িবাবু নামজাদা উকিল, সহজে একথা মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, কোন্ আইন অনুসারে ইহা বেয়ারিং হইবে তাহা আমাকে ছাপার অক্ষরে দেখান। না দেখাইলে I shall move heaven and earth. তুলকালাম্ কাণ্ড করিব। পোস্টমাস্টার তাড়াতাড়ি বলিলেন, ঠিক আছে। আমারই ভুল হইয়াছিল। তিনি পাগলকে আর ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। নিজের পকেট হইতে টিকিট কিনিয়া চিঠিটিতে সাঁটিয়া দিয়াছিলেন। পাঁচকড়িবাবুর আর একটা গল্পও মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। সেবার তিনি আসিবার আগে সূর্যসুন্দরকে নয়, কুঠির গোমস্তা উপেনবাবুকেও টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, চিঠিও লিখিয়াছিলেন। উপেনবাবুকে জানাইয়াছিলেন তিনি আসিয়াই তাঁহার জমির উদ্দেশে যাত্রা করিবেন, সাতটার সময় গরুর গাড়ি যেন প্রস্তুত থাকে। আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখন সূর্যসুন্দরকে বলিলেন, আমি এবার না খেয়েই যাব। আমার মক্কেল চন্দর সিংয়ের জমি আমার জমির পাশেই। সে আজ পিকনিক করছে সেখানে। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সেখানেই খাব। কিন্তু গরুর গাড়ি তো নেই দেখছি। উপেনবাবুকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। একটু পরেই দেখা গেল উপেনবাবু আসিতেছেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। চন্দর সিং আমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে। এলাহী কাণ্ড কবেছে শুনলাম—দুটো খাসি কাটা হয়েছে। পাঁচকড়িবাবু অধীর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু গাড়ি কই? আপনাকে আগে থাকতে টেলিগ্রাম করেছিলাম। উপেনবাবু উত্তর দিলেন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আপনাব টেলিগ্রাম পেয়েই ঝকসু গাড়োয়ানকে ঠিক ছ'টার সময় গাড়ি নিয়ে আসতে বলেছিলাম, সে আসবে বলেওছিল, কিন্তু আসেনি। রামপীরিত আসিয়া খবর দিল যে ঝক্‌সু গাড়োয়ানের একটি বলদ কাল রাত্রে দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে। সেইজন্য সে আসে নাই, তাহার ছেলে ভাগিয়া সেটা খুঁজিতে গিয়াছে। আমি গিয়া দেখিলাম ভাগিয়া ফেরে নাই। তখন আমি ঝকসুকে বলিলাম তুমি তোমার লাঙলের একটি 'বয়েল' (বলদ) গাড়িতে জুড়িয়া অবিলম্বে চল। সে এখনই আসিতেছে। একটু পরেই দেখা গেল ঝকসু সত্যই আসিতেছে। পাঁচকড়িবাবু উপেনবাবুকে লইয়া অবিলম্বে গাড়িতে উঠিলেন। কিন্তু হাট পর্যন্ত যাইতে না যাইতে নব-নিয়োজিত বয়েলটি বাঁকিয়া দাঁড়াইল এবং জোয়াল হইতে কাঁধ সরাইয়া লইয়া দড়ি ছিঁড়িবার উপক্রম করিল। পাঁচকড়িবাবু গাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন। ঝকসু বলিল—এ বয়েলটা খচ্চর। লাঙল টানিবার সময়ও নানারকম বদমাইশি করে। মনে হইতেছে এ গাড়ি টানিবে না পাঁচকড়িবাবু তখন উপেনবাবুর দিকে তর্জনী আস্ফালন করিয়া বলিলেন, বাংলা ভাষায় যাকে বলে ওয়ার্থলেস, আপনি তাই। আমি হেঁটেই চললুম। এই বলিয়া তিনি হনহন করিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। সূর্যসুন্দর বহুকাল পূর্বে ডিসপেন্সারির বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। এতকাল পরে আবার সেটি দেখিতে পাইলেন। পাঁচকড়িবাবু, উপেনবাবু, ঝকসু কেহই এখন বাঁচিয়া নাই। স্মৃতিরোমন্থন করিবার জন্য তিনিই কেবল আছেন এখনও। তাঁহারও দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। পাঁচকড়িবাবুর অতি-ব্যস্ততার জন্য সতীশবাবু সিভিল সার্জনের নিকটও তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন। সূর্যসুন্দর

চোখ বুজিয়া স্মৃতিরোমন্থনই করিতে লাগিলেন আবার। পাঁচকড়িবাবু একবার সতীশবাবুকে 'কল' দিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। সতীশবাবু বলিয়াছিলেন, এখন যেতে পারব না, ঠিক চারটের সময় যাব। পাঁচকড়িবাবু তিনটার আগেই গিয়া হাজির। চাপরাসী বলিল, এখন সাহেব ঘুমাইতেছেন। সাহেব তিনটার আগে উঠিবেন না। পাঁচকড়িবাবু খানিকক্ষণ ড্রইংরুমে বসিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দুই হাত পিছনে রাখিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তাঁহার ধৈর্যের সীমা যখন অতিক্রান্ত হইল তখন তিনি আবার চাপরাসীকে গিয়া বলিলেন, দেখ সাহেব উঠিয়াছে কি না। চাপরাশি ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেব উঠিয়াছেন, গোসলখানায় আছেন এখন। পাঁচকড়িবাবু আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বলিল—এইবার দেখ তো। চাপরাসী বিরক্ত হইতেছিল, তবু সে আবার গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেব তো পাশের ঘরেই আছেন, পোশাক পরিতেছেন। পাশের ঘরের জানালাটা খোলা ছিল, পাঁচকড়িবাবু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, আগাইয়া গিয়া জানলার ভিতর মুণ্ড গলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন সত্যই সতীশবাবু পোশাক পরিতেছেন কি না। সতীশবাবু তখন অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় প্যাণ্টালুনের ভিতর পা গলাইতেছিলেন, পাঁচকড়িবাবুর মুণ্ড দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধ ফাটিয়া পড়িল। তিনি চাপরাসীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—বাবুকো নিকাল দেও, হাম উনকা ঘরমে নেহি যায়েংগে। পাঁচকড়িবাবু তাঁহার নামে মকদ্দমা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সতীশবাবু ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন মকদ্দমা করিলে পাঁচকড়িবাবুই বিপদে পড়িবেন, কারণ তিনি যে চোরের মতো আমার বাথরুমের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন আমার চাকররা দিবালোকে তাহা দেখিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে হলফ করিয়া কোর্টে সাক্ষীও দিবে। শেষ পর্যন্ত কিছু হয় নাই! সতীশবাবুর সহিত পরে তাঁহার ভাবও হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্রের চিকিৎসা করিয়া তিনি তাহাকে নিরাময়ও করিয়াছিলেন। সতীশবাবু নির্ভীক লোক ছিলেন। কাহারও খোশামোদ করিতেন না। সতীশবাবুর সম্বন্ধে আর একটা গল্পও মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। তখন বিহার ও বাংলা একই প্রদেশ ছিল। আলাদা হইয়া যায় নাই। একবার সেক্রেটেরিয়েটের জনাকয়েক বাবুর সহিত সতীশবাবুর দেখা হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে বাবুরা এমন ভাব দেখাইলেন যে তাঁহারাই যেন গভর্নমেণ্টের মালিক। সতীশবাবু হাসিয়া বলেন, তাতে আর সন্দেহ কি। আপনারা হচ্ছেন গভর্নমেণ্টের পুত্র, গভর্নমেণ্টের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কিসে গভর্নমেণ্টের আয় বাড়বে তা নিয়ে মাথা ঘামান। আর আমরা হচ্ছি গভর্নমেণ্টের জামাই। নানাভাবে গভর্নমেণ্টের অর্থ শোষণ করি। আমাদের সামান্য একটা ছুরির দামও পাঁচ ছ'টাকা। এ কথা শুনিয়া একজন বাবু বলিলেন, তা ঠিক, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমাদের কলমের এক খোঁচায় আপনার চাকরিও চলে যেতে পারে। সতীশবাবু উত্তরে বলিলেন, একটা কথা জেনে রাখবেন, আমরা চাকরি করে নিজেদের যোগ্যতার জোরে। কারো কলমের জোরে নয়। আমাদের চাকরি না করলেও অনাহারে মরবার ভয় নেই। কিন্তু আপনাদের প্রভুপাদপদ্মে ভোমরার মতো বরাবর গুনগুন করে যেতে হবে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে গভর্নরের দার্জিলিং অধিবেশন শেষ হইল। আর একটি ঘটনা ঘটিল ঠিক এই সময়ে। পূর্নিয়া হাসপাতালে একটি রোগী মারা গেল, সতীশবাবু সন্দেহ করিলেন

তাহার প্লেগ হইয়াছিল। সতীশবাবু কাটিহারে গিয়া গভর্নরের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, এখানে একটি প্লেগ কেস হইয়াছে। আপনার পরিবারের সকলে ভালো আছেন তো? গভর্নর বলিলেন, আমাদের শরীর ভালোই আছে। থ্যাঙ্কিয়ু। সতীশবাবু বলিলেন, বেশ আপনারা তাহা হইলে কলিকাতা ফিরিয়া যান। কিন্তু আমি আপনার সেক্রেটেরিয়েটের সকলকে পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিতে চাই না। মনিহারী ঘাটে তাহাদের সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আপনি সেইরূপ আদেশ দিয়া যান। গর্ভনর তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন। সাহেবরা প্লেগকে বড় ভয় করিতেন। মনিহারী ঘাটে বালির চড়ায় সেক্রেটেরিয়েটের কেরানীকুলকে নামিতে হইল। তখন বিহারের বিখ্যাত 'পছিয়া' হাওয়া প্রবল প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধূলাবালি উড়াইয়া বালি-চড়ায় তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। তাহার মধ্যেই সেক্রেটেরিয়েটের বাবুদের নামিতে বাধ্য করিলেন সতীশবাবু। সদর হাসপাতাল হইতে কয়েকজন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, লেডী ডাক্তার আসিয়া পড়িল। তাহাদের লইয়া সতীশবাবু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিতে শুরু করিলেন প্লেগের কোনও চিহ্ন কাহারও অঙ্গে আছে কি না। প্রত্যেকের টেম্পারেচার লওয়া হইল, প্রতেক্যের শরীরের গ্লাণ্ডগুলি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যে ভদ্রলোক কলমের জোরের বড়াই করিয়াছিলেন তিনিও সে দলের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার নিকট আসিয়া সতীশবাবু বলিলেন—"আসুন, আপনাকে পরীক্ষা করি। আশঙ্কা করছি, আমার উপর খুব চটেছেন। আপনার তো কলমের খুব জোর, হয়তো পরে কলেমর এক খোঁচায় আমাকে কাৎ করে দেবেন। এখন আপনি ওই টেবিলের উপর কাৎ হোন, আমি আপনার শবীরের গ্ল্যাণ্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখি। বিশ্বাস করুন যা করছি, আপনার ভালোর জন্যেই করছি।"

সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল শেষ জীবনে সতীশবাবু অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। পারিবারিক নানা শোক দুঃখ তাঁহার জীবন-অপরাহ্নকে বড়ই বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। ডায়াবিটিস রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া শেষে তিনি মারা যান। সেকালে ডায়াবিটিসের ভালো চিকিৎসা ছিল না। অনেকে অহিফেন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সতীশবাবু অহিফেন সেবন করিয়া তাঁহার সদা-জাগ্রত সদা-তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে চাহেন নাই। ডায়াবিটিসের আর একটা চিকিৎসা খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে সাবধান হওয়া। সতীশবাবু তাহাও করেন নাই। সূর্যসুন্দর তাঁহার এক আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলেন সতীশবাবু নাকি বলিতেন—সারাজীবন নানরকম নিয়ম মেনে পরাধীনতার জেলখানায় কাটিয়েছি। শেষ জীবনটা একটু স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। আমি যে রোগে ভুগছি তার নাম ক্যানসার, কর্মফলের ক্যানসার। এর কোনও ওষুধ নেই। প্রায়শ্চিত্তই এর একমাত্র ওষুধ। তাই করছি। আমাকে তোমরা বিরক্ত কোরো না।

সতীশবাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতেই সূর্যসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যেও সতীশবাবু নানাবেশে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। একবার যেন মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "সবই কর্মফল। এ বেড়াজাল থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই।"

উর্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া 'গীতাঞ্জলি' পড়িতেছিল, সহসা সে চোখ তুলিয়া দেখিল দিগন্ত দাঁড়াইয়া আছে। সে কখন প্রবেশ করিয়াছে উর্মিলা বুঝিতে পারে নাই। তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই সে ঠোঁটের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া ইঙ্গিত করিল—কথা বলিও না। তাহার পর কপালের উপর বিলম্বিত ঝাঁকড়া চুলের গোছা সরাইয়া উর্মিলার কানে

কানে ফুসফুস করিয়া বলিল, শুনলাম দাদু আমাকে খুঁজছেন তাই এলাম। উঠলে আমাকে খবর দিও। আমি চললুম। আবার সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

।। চৌত্রিশ।।

দিগন্ত পিছনের দিকে একটা ঘরে বসিয়া লিখিতেছিল। সামনে খোলা জানালা। জানালার সামনে একটা পেয়ারাগাছের কয়েকটা ডাল দুলিতেছে। সেই ডালে ল্যাজঝোলা বাদামী রঙের একটা পাখি মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছে এবং সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো দুই পায়ে ছোট একটা ডাল ধরিয়া নানাভাবে শরীরটাকে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া পোকা ধরিতেছে। মুখটি কালো। চোখ দুটি লাল এবং বুদ্ধিদীপ্ত। দিগন্তকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আপনমনে পোকা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ দিগন্ত লক্ষ্য করিল তাহার লম্বা ল্যাজটিও সুন্দর। কালো রঙের ধারে ধারে শাদা বর্ডার দেওয়া। দিগন্তের মনে হইল এই পাখিটার নামই ল্যাজঝোলা। যে ল্যাজঝোলার কথা ছড়ায় আছে—'আয় রে পাখী ল্যাজঝোলা খোকাকে নিয়ে কর খেলা'। হঠাৎ দেখিতে পাইল ভাগিয়ার ছেলেটা একটু দূরে ফড়িং ধরিতেছে। তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল সে। কাছে আসিতেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওই পাখিটার নাম কি রে?"

"কোট্রি"

শুনিয়া দিগন্ত হতাশ হইল। বাংলা নাম 'হাঁড়িচাঁচা' শুনিলে আরও হতাশ হইত।

"তুই ফড়িং ধরছিলি কেন।"

সে তাহার ছেকো-ছিনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্থার্থ—একটু আগে হাস্নাহানা ঝোপের ভিতর হইতে যে পাখির ছানাটি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, পার্বতী দিদি সেটি লইয়া একটি খাঁচায় রাখিয়াছেন। সেই পক্ষিশাবকের জন্যই সে ফড়িং সংগ্রহ করিতেছে। দিগন্তর হঠাৎ মনে হইল বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট হইতেছে। আবার সে লিখিতে শুরু করিল। খানিকক্ষণ একটানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িল সেটা। হাওয়ায় একগোছা চুল উড়িয়া তাহার চশমার উপর খেলা করিতে লাগিল। মনে হইল তাহারা আনন্দে যেন নাচ জুড়িয়া দিয়াছে। দিগন্তর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পড়িয়া খ্যাঁচ করিয়া সমস্ত কাটিয়া দিল সে। পছন্দ হইল না। আবার নতূন করিয়া লিখিতে শুরু করিল।

"ছোটবাবু এখানে আছ নাকি?"

কৃষ্ণকান্ত প্রবেশ করিলেন। দিগন্ত সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল, ভাবটা যেন কিছু একটা অন্যায় কাজ করিতেছিল ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

"একটা দরকারের জন্য তোমার তপোভঙ্গ করলাম। গগন বললে, আসবার সময় তুমি মোগলসরাই স্টেশনে নাকি খুব ভালো একটি ছুরি কিনেছ। কোথায় সেটা?"

"আমার স্যুটকেসে আছে। আপনার চাই?"

"হ্যাঁ। সদানন্দের জন্য কয়েকটা ফাৎনা করে দেব। পুকুরে নাকি বড় বড় রুই কাৎলা রয়েছে কিন্তু ভালো ফাৎনার অভাবে সদানন্দ তাদের ধরতে পারছে না। আমি কয়েকটা 'কুইল' কিনে আনিয়েছি। কিন্তু বাড়িতে ভালো ছুরি নেই। কুডুল আছে, দা আছে, খাঁড়া আছে, হাঁসুয়া আছে, ছুরি নেই। ব্লেড দিয়ে চেষ্টা করলাম হল না। তোমার ছুরিটা যদি দাও—"

"এক্ষুণি দিচ্ছি।"

"লিখছ নাকি কিছু।"

"সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছি।"

কথাটা বলিয়া দিগন্ত আরও যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"বাংলা ভাষায় লিখছ তো? অর্থাৎ আমাদের মতো লোক বুঝতে পারবে কি না?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ইংরেজী আছে। আপনি শুনবেন? একজন কাউকে না শোনালে ঠিক বুঝতে পারছি না কেমন হচ্ছে। আপনার সময় নেই হয়তো।"

"আমাকে শোনাবে! আমাকে শোনানোও যা ওই পেয়ারাগাছটাকে শোনানোও তাই। তবু শুনব। আগে ফাৎনাটা তৈরি করে ফেলি। ছুরিটা দাও আমাকে।"

যাইতে যাইতে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"এখানে কবিরাজ মশাই খুব রসিক লোক। তাঁকেও ডেকে নেব। ডাকবাংলোটা খালি আছে, সেখানে গিয়েই বসা যাবে।"

দিগন্ত যখন ছুরিটি বাহির করিয়া দিল তখন কৃষ্ণকান্ত অবাক হইয়া গেলেন।

"ও বাবা, এ তো শুধু ছুরি নয়, একেবারে ওয়ার্কশপ্! সব রকম আছে দেখছি।"

"এতে কাজ হবে আপনার?"

"খুব হবে। চমৎকার জিনিসটি কিনেছ।"

শিশুসুলভ হাসিতে দিগন্তর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দাদা প্রথমে কিনতে চাইছিল না। বলছিল কি হবে ওই জবড়জং জিনিসটা কিনে। আমি তোর পেন্সিল বাড়াবার জন্য ভালো একটা 'স্ক্যালপেল' দেব। তারপর শেষ মুহূর্তে কি মনে হল, বললে—আচ্ছা কেন। ভাগ্যে কিনেছিলুম, দেখুন কেমন আপনার কাজে লেগে গেল।"

"তুমি কি দাদার মত নিয়েই সব কেনাকাটা কর নাকি?"

"না—তা নয়।"

লজ্জিত হইয়া পড়িল দিগন্ত।

তাহার পর বলিল—"আমি তো অন্য জায়গায় থাকি। তবে দাদাই আমাকে নানা জিনিস কিনে পাঠিয়ে দেয়। দাদার মতের বিরুদ্ধে কিছু করলে দাদা বড্ড রেগে যায় যে।"

"হ্যাঁ, ওকে আমারও ভয় করে।"

কৃষ্ণকান্ত ছুরি লইয়া ফাৎনা বানাইতে চলিয়া গেলেন। দিগন্ত আবার আসিয়া লেখার টেবিলে বসিল।

।। পঁয়েত্রিশ।।

ডাকবাংলোর বারান্দায় কবিরাজ মহাশয় ও কৃষ্ণকান্ত ছাড়া দিগন্তর আর একটি শ্রোতা জুটিয়াছিল। জগদম্বা ডাকবাংলোর নূতন চাপরাসী। কৃষ্ণকান্ত আসিয়াই তাহার সহিত ভাব করিয়াছিলেন। যাহাদের আমরা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া দূরে দূরে রাখি কৃষ্ণকান্ত তাহাদের সহিতই আগে ভাব করিয়া ফেলেন। কারণ তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে এমন সব খবর পান যাহা তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দিতে পারে না। জগদম্বার নিকট হইতে তিনি জানিয়েছেন 'পানচাক্কা' নামক বিলে ডাহুক পাখি আছে। জগদম্বা আরও খবর দিয়াছে গভীর

রাত্রে বাখরপুর দিয়ার চরে ভালো ভালো হাঁস নাকি নামে। শৌখিন বন্দুকধারীরা এখনও তাহাদের সন্ধান পায় নাই। জামাইবাবু যদি বাখরপুরে গিয়া তাহার সম্‌ধি (বেয়াই) রামসঙ্গমের বাড়িতে রাত্রিতে থাকেন তাহা হইলে সে অনুগৃহীত হইবে, কারণ ডাক্তারবাবু (সূর্যসুন্দর) একবার রামসঙ্গমের জাং (উরু) চিরিয়া অনেক পিপ্ (পুঁজ) বাহির করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। সে কৃষ্ণকান্তর খাইবার শুইবার এবং শিকার করিবার 'পুরা বন্দোবস্ত্' করিয়া দিবে। কৃষ্ণকান্ত এখনও 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা আছে ঘণ্টুকে লইয়া তিনি একদিন বাখরপুরে যাইবেন। অবশ্য সবই নির্ভর করিতেছে কিরণের মেজাজের উপর। কিন্তু একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি 'পানচাক্কা'য় যাইবেনই তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। একটা ডাহুক মারিয়া সেটাকে 'স্টাফ্ করাইতে হইবে। একটি বড় সোনাব্যাঙ আগেই তিনি স্টাফ্ করাইয়া রাখিয়াছেন। একটি হার্টের ছবিও তাঁহার কাছে আছে। এই হার্টের ছবি, সোনাব্যাঙ এবং ডাহুক সহ তিনি বিদ্যাপতির বিখ্যাত কবিতার বিখ্যাত কলিটি—'মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকি, ফাটি যাওত ছাতিয়া' একজন আর্টিস্টকে দিয়া লিখাইয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু চৌধুরীকে পাঠাইবেন অনেক দিন আগেই ঠিক করিয়াছিলেন। আর্টিস্ট বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পটভূমিকায় কবিতার লাইনটি অশ্রু-ঝাপসা করিয়া লিখিয়াছে। এতদিন ডাহুকের অভাবে ওটি পাঠানো হয় নাই। ঝণ্টু মিস্ত্রী বলিয়াছে ডাহুক আসিয়া গেলে সে সমস্ত জিনিসগুলি চমৎকার একটি সেগুনকাঠের কেসের ভিতর কাচ দিয়া ফিট করিয়া দিবে। ঝণ্টু মিস্ত্রী শিকার লাইনে কৃষ্ণকান্তের শিষ্য। মিস্ত্রীও ভালো। শিকারীও ভালো। সে-ও নিম্নশ্রেণীর লোক, কিন্তু কৃষ্ণকান্তর বন্ধু। কৃষ্ণকান্ত এই ধরনের লোক লইয়া তাঁহার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে প্রিয় বন্ধু চৌধুরীকে তিনি এই উপহারটি পাঠাইতে চান তিনিও আসাম জঙ্গলের একজন ফরেস্ট অফিসার। ভদ্রলোকের বিশেষত্ব তিনি উড়ন্ত পাখি মারিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু জীবনে যে রঙিন পক্ষিণীটিকে তিনি ঘায়েল করিতে চাহিয়াছিলেন সে তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাই চৌধুরী চিরবিরহী। বিবাহ করেন নাই। অবসর পাইলেই কবিতা লেখেন। জগদম্বার মধ্যেও একজন কবিকে আবিষ্কার করিয়াছেন। জগদম্বা নাকি যৌবনে 'লৌণ্ডা' নাচের একজন পাণ্ডা ছিল, নিজে স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া নাচিত। এখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় তুলসী রামায়ণ গান করে। মুখে মুখে কবিতাও নাকি বানাইতে পারে। দিগন্ত যখন খুব ছোট ছিল তখন কিছুদিন পুরসুন্দরী অসুস্থ হইয়া পড়েন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে তখন নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন কিছুদিন। সেই সময় জগদম্বা দিগন্তের 'রাখোয়ালি' অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করিয়াছিল। সেই হিসাবে দিগন্তের উপর তাহার একটু পক্ষপাতিত্বও আছে জগদম্বা যখন কৃষ্ণকান্তের নিকট শুনিল যে দিগন্ত নাকি বিরাট পণ্ডিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত কবিতার উপর যে প্রবন্ধ লিখিয়া সে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিবে সেই প্রবন্ধটি সে তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে চায় তখন প্রথমে সে বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া পরে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। ছেলেবেলায় বিরক্ত করিত বলিয়া যাহার নাম সে 'দিক্' বাবু রাখিয়াছিল, যাহাকে সে সিকন্দর খাঁর ভাই দিকন্দর খাঁ বলিত সেই দিগন্ত দিগগজ পণ্ডিত হইয়াছে এবং তাহাকে প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে চায়—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বড়া জামাইবাবু যখন বলিতেছেন তখন নিশ্চয়ই 'ঝুট বাত্' নয়। কৃষ্ণকান্ত আগেই দিগন্তকে বলিয়াছিলেন—"তোমার আর একটি শ্রোতা জুটেছে। তোমার বাহন জগদম্বা—"

"জগদম্বা? সে কি বুঝতে পারবে?"

"পারবে। সে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবে না, হৃদয় দিয়ে বুঝবে। তুমি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তার দিকে চেও, তাহলেই হবে। আর গিয়েই বোলো—জগু আমার থীসিস্‌টা কেমন হয়েছে একবার শোনো তো—তাহলেই সে কৃতার্থ হয়ে যাবে।"

দিগন্ত পড়িতেছিল। বারান্দার এক কোণে জগদম্বা উবু হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ভ্রূকুঞ্চিত ললাট এবং দমবন্ধ ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল সে যেন কোনও দুরূহ তপস্যা করিতেছে। কবিরাজ মহাশয় এবং কৃষ্ণকান্ত দুইটি ইজি-চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। দিগন্ত বার বার তাহার অবাধ্য চুলগুলাকে কপাল হইতে সরাইয়া দিতে দিতে টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

"সংস্কৃত কাব্যকে যাঁহারা আধুনিক মনে করেন না, যাঁহাদের বিশ্বাস যে বিশেষ একটা আধুনিক ছাঁচে বা আঙ্গিকে লেখা না হইলে বুঝি কাব্যকে আধুনিক বিশেষণে ভূষিত করা যাইবে না, যাঁহাদের মতে যাহা আধুনিক-কালোদ্ভব, তাহাই বুঝি আধুনিক। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত বলা দরকার 'আধুনিক' বিশেষণটি কাব্যের ক্ষেত্রে অবান্তর। কাব্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য তাহা রসোত্তীর্ণ কাব্য কি না। ফুল আধুনিক কি না সে বিচার কেহ করে না। ফুল যদি রূপে রসে গন্ধে বর্ণে পুষ্পত্ব লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। সে কোন্ সময়ে ফুটিয়াছে অথবা তাহার প্রসাধনে আধুনিক উপাদান আছে কি না ইহা লইয়া রসিকেরা মাথা ঘামান না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিকতার অর্থ আছে। গরুর গাড়ির তুলনায় বর্তমানের আকাশচারী মহাযান নিশ্চয়ই আধুনিক, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, গতির সাধনায় সে অবশ্যই অধিকতর কৃতিত্বের দাবি রাখে—কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয়। কাব্য পাঠ করিয়া রসিকেরা যে পরমানন্দে অভিভূত হন তাহার উৎস প্রত্যেক রসোত্তীর্ণ কাব্যেই আছে। রসের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের কবিতে আর রবীন্দ্রনাথে বিশেষ তফাত নেই। উভয়েব কাব্য পাঠ করিয়া রসিক পাঠক একই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ প্রাচীনকালে লিখিত বলিয়া রসিকের কাছে অবজ্ঞেয় নয়। ঋগ্বেদের উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী প্রেমের চিরন্তন কাহিনী। ঋগ্বেদের কবি উর্বশীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'প্রাক্র-মিষমুষসামগ্রিয়েব' 'দুরপনা বাত, ইবাহমস্মি'—আমি ঊষার মতোই চিরন্তনী, বায়ুর মতোই অধরা। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাতেও সেই ঊষার আলো পড়িয়াছে, সেই একই অধরা, অবন্ধনা, অকুণ্ঠিতা সৌন্দর্যপ্রতিমা রঙে রসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে আবার। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ওই বৈদিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার শিল্প-সুষমা, তাহার বাক্যবিন্যাস, তাহার ছন্দ-নিক্কণ রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। একই মাটি লইয়া দুইজন মৃৎশিল্পী যেন দুইটি প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলিতেছেন—"পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী প্রথম পাওয়া গেল ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১০৯৫)। তাহার পর ব্রাহ্মণে, মহাভারতে ও কালিদাসের নাটকে এই কাহিনীর কালানুসারী ও ভাবানুযায়ী রূপান্তর ও বিকাশ দেখিয়াছি। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উর্বশী চিরন্তন মানুষের সৌন্দর্য পিপাসার প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই কালানুসারী ও ভাবানুযায়ী রূপান্তর ও বিকাশই হয়তো যুগে যুগে 'আধুনিক আখ্যা লাভ করিতেছে। ছন্দ, শব্দ, বাক্যবিন্যাস, অলঙ্কার, উপমার নূতনত্ব কবি-কৃতিত্বের নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাব্য বিচারে গোড়ার কথাটা ভুলিলে চলিবে না—কাব্য রসোত্তীর্ণ হওয়া চাই। কাব্যের আঙ্গিক অনেকটা পোশাকের মতো। যুগে যুগে পোশাকের চেহারা বদলায়। কিন্তু যে পোশাক পরিবে সেই মানুষটার কথাই কাব্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ বস্তু। দোকানের 'শো-কেসে'

ঝোলানো কতকগুলো পোশাক দেখিয়া রসিকের মন ভরে না। পোশাকের অন্তরালে সে রক্তমাংসের মানুষকে দেখিতে চায়। আর সে মানুষের মূল প্রবৃত্তি ও অনুভূতি সব যুগেই প্রায় একরকম। প্রেম, ঘৃণা, হিংসা, লোভ, কাম, নিতান্ত-মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষা—সুখ-দুঃখের সমারোহ, অতীন্দ্রিয় লোকের উদ্দেশে ভূমার সন্ধানে কল্পনার রথে চড়িয়া অভিযান—এই সমস্তই সবকালের সর্বযুগের সর্বদেশের মানবের হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে। ইহাই কাব্যের উপাদান, সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে। সুতরাং কাব্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতার দাবি তেমন জোরালো নয়। আঙ্গিকের দাবি অর্থাৎ পোশাকের দাবি অবশ্য আছে। কারণ যুগে যুগে আঙ্গিক বদলাইয়াছে। আমার এই প্রবন্ধে তাহাই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ডঃ সুকুমার সেন আর একটি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছেন। বৈদিক যুগের পরই কালিদাসই প্রথম কবি যিনি সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশিষ্টরূপে অলংকৃত করিয়াছেন। অবশ্য বৈদিক যুগের পর উপনিষদের যুগ ঃ বৈদিক যুগের কথা বলিতে গিয়া ডঃ সেন উপনিষদের কথাও বলিয়াছেন। উপনিষদেও অনেক কাব্যগুণ আছে। 'কেন' উপনিষদের

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈ তদনুশিষ্যাৎ।

নয়ন, বাক্য, মন যেখানে যাইতে পারে না, যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানি না, তাহা অপরকে কেমন করিয়া জানাইব, তাহাও জানি না।

কঠোপনিষদের
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হও। কবিরা বলেন ক্ষুরের তীক্ষ্ণকৃত অগ্রভাগ যেমন দুর্গম ওই পথও তেমনি দুর্গম।

অশব্দম্ অর্শস্পন্ অরূপম্ অব্যয়ম্
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।

যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহৎ, পরম এবং ধ্রুব তাঁহাকে অবগত হইলেই মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

কঠোপনিষদের ঋষি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিয়াছেন, কিন্তু 'কেন' উপনিষদ বলিতেছেন ব্রহ্মের স্বরূপ কেমন তাহা বলিতে পারিব না।

উপনিষদের এরূপ অনেক শ্লোক আছে যাহার উদাত্ত ভাব পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে নানাভাবে নানা সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমরা—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"একটু থাম। আমার একটা অসুবিধা হচ্ছে প্রথমেই সেটা বলি। যতটুকু শুনলাম তাতেই তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু তুমি বয়সে ছোট বলে পাচ্ছি না। মনে মনে একটা টাগ্-অব্-ওয়ার চলছে। দ্বিতীয় অসুবিধা—আমার মূর্খতা। ফুলের গন্ধে বর্ণে অবশ্য মুগ্ধ হচ্ছি, কিন্তু ফুলের তত্ত্ব কিছু জানি না বলে আপসোস হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"আমারও খুব ভালো লাগছে। আমারও মনে হ'চ্ছে তোমার এ

থীসিস বিচার করবার অধিকার আমার নেই। আমার মতো মোল্লার দৌড় কলেজ রূপ মসজিদ পর্যন্ত। তারপর আর বেশীদূর এগোতে পারিনি। প্রবন্ধ কিন্তু তোমার বেশ ভালো হচ্ছে। লিখে যাও। আর একটা কাজ কোরো—সংস্কৃত সাহিত্যে পশু বা পাখির নাম পেলে সেটা টুকে রেখো। যেখানে পাবে টুকবে। বর্ণনা যদি পাও তাও সংগ্রহ করবে। ডক্টর লাহার 'কালিদাসের পাখি' বইটা পড়েছি। কিন্তু ওতে সব পাখির কথা নেই।......"

গাছকোমর বাঁধিয়া পার্বতী আসিয়া হাজির হইল।

"তুমি এখানে! আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—গগন তোমাকে ডাকছে। এই নাও চিঠি"

পার্বতী একটি চিঠি দিগন্তর হাতে দিল।

গগন লিখিয়াছে—"দিগন্ত তুই চলে' আয়। দাদুকে আপেলকোরা আর নারকোলের দুধ দিয়ে চিকেনের মালাই কারি করে দেব। বাড়িতে নারকোল আর আপেল কোরবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। মা সবাইকে একটা-না-একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। তোমার বৌদিকে দাদু নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছেন—কোথাও নড়তে দেবেন না। অনেক কষ্টে একটা কুরুনি যোগাড় করেছি। তুই চলে' আয়। আমরা দু'জনে মিলেই যা পারি করব।"

দিগন্ত উঠিয়া পড়িল।

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন—"কি হল?"

"দাদা ডাকছে।"

লেখার ফাইলটি বগলে করিয়া দিগন্ত পার্বতীর অনুগমন করিল।

"এরকম লক্ষ্মণ তো এ যুগে দেখা যায় না।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"লক্ষ্মণ সূর্যবংশেই জন্মেছে। ওরা সব যুগেই জন্মায়। আমরা কখনও দেখতে পাই, কখনও দেখতে পাই না। প্রবন্ধটি খুবই ভালো লাগছিল। যদিও বুঝতে পারছিলাম না মাঝে মাঝে। আমি উঠি। চন্দরবাবুর গলায় ব্যথা হয়েছে, রাধানাথ গোপ ওঁর জন্যে তেজপাতা লবঙ্গ, বচ আর বড়এলাচ সিদ্ধ করে' তাতে চা দিয়ে একটা কবিরাজী চা তৈরি করছে আমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন অনুসারে। দেখে আসি সেটার কতদূর হল।"

"আপনিও খাবেন না কি?"

"আমি তো খাবই। আমার তো সর্বদাই গলায় ব্যথা। কিন্তু ওরকম চা খাবার পয়সা নেই। এখানে পেয়ে গেছি খেয়ে নি একটু।"

হাসিতে হাসিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

জগদম্বা স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া বসিয়া ছিল। কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া যাইতেই সে প্রশ্ন করিল—"দিক্ বাবু তুলসীদাস কি লৌণ্ডা নাচের বিষয় কিছু বলিল কি?"

প্রশ্ন করিল অবশ্য হিন্দীতে।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"তুলসীদাস বা লৌণ্ডা নাচ সংস্কৃত কাব্যের এলাকায় পড়ে না।"

জগদম্বা ইহাতে বিস্মিত হইল। ভ্রূযুগল কপালে উত্তোলন করিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মন্তব্য করিল—"লিখাপঢ়িমে ভি ইলাকাকা বাত ছে?"

"জরুর"—কৃষ্ণকান্ত এমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত বাক্যটি উচ্চারণ করিলেন যে জগদম্বা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাহার পর বলিল—"হম্ তো কুচ্ছু নেই সমঝ্লিয়ে!"

"পানচাক্কায় কবে যাবি? ডাহুক আমার একটা চাইই।"

"যব্ খুশি চলো।"

এমন সময় গঙ্গা আসিয়া উপস্থিত।

"জামাইবাবু বড়দি আপনাকে ডাকছেন। আজ ঘণ্টুর জন্মতিথি যে। বড়দি তাকে নিয়ে পীরবাবার ওখানে যাচ্ছেন। আপনিও চলুন।"

"ও তাই নাকি! চল।"

।। ছত্রিশ।।

কুমার আমবাগানে গিয়াছিল সেই চালাঘরটিতে বসিয়া আবার সূর্যসুন্দরের ডায়েরি পড়িবে বলিয়া। গিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সামনের মাঠে প্রকাণ্ড একটা হাড়গিলা পাখি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে Adjutant Stork—চরিয়া বেড়াইতেছিল। পড়িতে পড়িতে কুমার মাঝে মাঝে সেটার দিকে চাহিতেছিল। তাহার গম্ভীর চালচলন, তাহার জঙ্গী পোশাক কুমারের মনে সম্ভ্রম উদ্রেক করিতেছিল। হাড়গিলা পাখিকে সাধারণতঃ লোক কুৎসিত মনে করে কেন এ প্রশ্নও মাঝে মাঝে জাগিতেছিল তাহার মনে। দূরে তালগাছটাকে কেন্দ্র করিয়া একঝাঁক তালচোঁচ উড়িতেছে। কুমারের মনে হইতেছিল ওই পাখিগুলার সদা-চঞ্চলতা যেমন সুন্দর এই হাড়গিলার ধীর স্থির গম্ভীর চালচলনও তেমনি সুন্দর। আরও দূরে মুনিয়া মহিষটাও চরিতেছিল। সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কুমারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সামনের আমগাছে বসিয়া কয়েকটা ফিঙা কি মিষ্ট সুরে মাঝে মাঝে ডাকিতেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় কয়েকটা শকুনি ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। অনেক উঁচুতে উড়িতেছে তাহারা। মনে হইতেছে কয়েকটা কালো বিন্দু যেন। ঘরের ভিতর প্রাইমাস স্টোভটা জ্বলিতেছিল হঠাৎ তাহার শব্দটা বন্ধ হইয়া গেল। মদ্‌ধু ঘরের ভিতর চা করিতেছে। একটু পরেই সে একটি ছোট টেবিল আনিয়া কুমারের পাশে রাখিয়া গেল। কুমার তাহাকে বলিল, "তুই আমাকে চা-টা দিয়েই চলে যা হীরু মহলদারের কাছে। আমার সাইকেলটা নিয়েই যা। একটা পাঁচ ছসের ওজনের রুই মাছ চাই। ঘণ্টুর আজ জন্মদিন। বড় মাছের মুড়ো দরকার।"

মদ্‌ধু নীরবে ভিতরে চলিয়া গেল। সে কথাবার্তা কম বলে। একটু পরেই এক পেয়ালা চা আনিয়া সে টেবিলের উপর রাখিল।

"কলসীতে জল আছে তো?"

"আছে।"

"আমি চায়ের পেয়ালা ধুয়ে রেখে দেব। তুই হীরুর কাছে চলে' যা।"

"আমি ভোরে হীরু মহলদারের কাছ থেকে মাছ এনেছি।"

"কোথায় মাছ?"

"এই যে এখানেই আছে।"

মদ্‌ধু ঘরের ভিতর হইতে বড় একটি লাল রুই বাহির করিয়া দেখাইল।

"তুই তো এতক্ষণ কিছু বলিস নি?"

মদ্‌ধু একথার কোন জবাব নি দিয়ে বলিল—"বড়দি কাল রাত্রেই আমাকে বলেছিল। নিখিলবাবুও মাছ পাঠাবেন।"

"তুই তাহলে এখন কি করবি?"

"আমাকে কিছু কলাপাতা কেটে নিয়ে যেতে হবে।"

"বেশ।"

কুমার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"মামা অবশেষে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। সকলকে তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে আমি যদি বিবাহ করিতাম তাহা হইলে আমার বউ আসিয়াই সংসারের হাল ধরিতে পারিত। তাঁহাকে আর বুড়া বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইত না। কিন্তু আমি স্বার্থপর কুলাঙ্গার, চিরকাল তাঁহার খাইয়া পরিয়া মানুষ হইয়াছি, সামান্য একটা বিবাহ করিয়া তাঁহার উপকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু বাড়িতে একটা গৃহিণী না থাকিলে সংসারই যে ভাসিয়া যায়, মায়ের যে বড় কষ্ট হইতেছে, মা-হারা ছেলেমেয়েদের যত্ন করিবে কে—তাঁহারই যখন সংসার তখন তাঁহাকেই ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যবস্থা মানে বিবাহ। সুতরাং অবশেষে তিনি বিবাহই করিয়া ফেলিলেন। তারাপদ পুরোহিত অনেকদিন আগেই একটি মেয়ে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবাহে কোন ধুম হয় নাই। আমাকে কোন খবরই দেওয়া হয় নাই।

আমার তখন প্র্যাকটিস বেশ ভালই জমিয়া উঠিয়াছিল। দেওয়ানজির গোয়ালঘর হইতে দেওয়ানজি গরু-মহিষ সরাইয়া লইয়াছিলেন। আমার রোগীরাই সেখানে ভিড় করিত। আমাকে একটি ঘোড়াও কিনিতে হইয়াছিল। সকালে আমার রোগীদের ঔষধপত্র দিয়া আমি ভাতে-ভাত আর আধ সের খাঁটি গরুর দুধ খাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া যাইতাম। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমার একটা কাঠের বাক্স ছিল। তাহাতেই প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং ঔষধ মাপিবার যন্ত্রপাতি থাকিত। ছোটখাটো অপারেশন করিবার মতো একটা সার্জিকাল কেসও থাকিত তাহার ভিতর। প্রসব করাইবার একটা ফরসেপসও। খালি শিশিও লইয়া যাইতাম কয়েকটা। রোগীর বাড়িতে বসিয়া নিজে হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতাম। আমার ঘোড়ার সহিসই বাক্সটি মাথায় করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। এজন্য রোগীর বাড়ি হইতে তাহাকে চার আনা পয়সা দেওয়া হইত। পচনা সহিস আমার কাছে বহুদিন ছিল। সে-ও নানারকমে আমাকে সাহায্য করিত। কাঁচি দিয়া সে সুনিপুণভাবে মিকশ্চারের শিশিতে কাগজের দাগ বানাইয়া আঁটিয়া দিত। মলম তৈরি করিতে পারিত। ছোট অপারেশনে একটু আধটু সাহয্যও করিতে পারিত সে। জাতে সে তুরী ছিল। আকারে ছিল খর্ব। কিন্তু খুব কাজের লোক ছিল সে। সে মারা যাইবার পর শনিচরা সাঁওতালও কিছুকাল ছিল আমার কাছে। প্রথমে আমি কম্পাউণ্ডার রাখিতে পারি নাই ঘোড়ার সহিসদের সাহায্যেই সব কাজ চালাইতাম। পরে অবশ্য সন্তোষ, হাবুমামা এবং আরও অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু যাহাদের আমি আশ্রয় দিয়াছিলাম (দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) আমার কম্পাউণ্ডাররূপে কাজ করিয়াছিল এবং আমার নিকট হইতে মোটামুটি ডাক্তারিও শিখিয়াছিল। কিন্তু এ বিদ্যাটা এক দুর্যোধন মণ্ডল ছাড়া আর কেহ বড় একটা কাজে লাগায় নাই। এই সময় সতীশবাবু প্রায় প্রত্যহই গুনগুন করিয়া একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাজারের প্রান্তে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মাটির বাড়ি বিক্রী ছিল। বাড়ির মালিক জমিদারী সেরেস্তারই একজন কর্মচারী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে দেশে গিয়াছিলেন, আর ফেরেন নাই। সেখানে তাঁহার একটি চাকুরি জুটিয়াছে, আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। এখানকার এই বাড়িটি তিনি বিক্রয় করিয়া দিতে চান, সতীশবাবুকে বার বার পত্র লিখিতেছেন। সতীশবাবুর ইচ্ছা বাড়িটি আমিই কিনি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম আমি এখানে বরাবর থাকিব কি না তাহা কিছুদিন না গেলে স্থির

করিতে পারিব না। বছর দুই কাটুক তখন ও বিষয়ে চিন্তা করিব। সতীশবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন—"আপনাকে এখানে থাকিতেই হইবে। মালিকের ইচ্ছা আপনি এখানে বসবাস করুন। কাল আমি সদরে গিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন ওই বাড়িটা আপনিই স্টেট হইতে কিনিয়া লউন এবং ডাক্তারবাবুকে বলুন তিনিই যেন ওটাতে বসবাস করেন। একটা ডাক্তারের পক্ষে কাহারও গোয়ালঘরে থাকা সম্মানজনক নয়।" সতীশবাবু খবরটি দিয়া কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। তাহার পর বলিলেন, "বাড়িটা আমরা কিনে নেব দু'শ টাকায়। আজই টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার মতটা শুনবেন? আপনি এখন ও বাড়িতে যাবেন না। যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে দু'শ টাকা আমাকে দিয়ে দেবেন আমি বাড়ি আপনার নামে লেখাপড়া করে দেব। মালিককে একথা এখনও বলিনি অবশ্য। রায়মশায়ের মারফত মালিককে বলব, তিনি খুশীই হবেন মনে হয়। তিনি নিজে আত্মসম্মানী লোক, যাদের আত্মসম্মান আছে তাদের তিনি খাতির করেন। বাড়িটা না কিনে ওখানে যাওয়া উচিত হবে না আপনার। আপনি আমাকে বলেছিলেন হাজার টাকা না জমলে আপনি বাড়ি কেনার কথা চিন্তাই করবেন না। আজ বলরামবাবুর কাছে খবর নিয়ে এলাম আপনার অ্যাকাউন্টে বারশো সাতাশি টাকা তিন আন জমেছে। আমি বলিলাম, "আচ্ছা ভেবে দেখি।" সতীশবাবু চলিয়া গেলেন। হয়তো সেইদিনই কিছু ঠিক করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। সাহেবগঞ্জ হইতে দিদিমার দূতস্বরূপ মন্মথ আসিয়া হাজির হইল। বলিল, "দিদিমা আমাকে পাঠিয়েছেন তোকে নিয়ে যেতে। জগন্নাথবাবুও তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমাদের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' হচ্ছে। তোকে ভীম সাজতে হবে। তাছাড়া তোর নতুন মামীর সঙ্গে দেখা করবি না?"

"নতুন মামী, মানে?"

"শক্তিবাবু আবার বিয়ে করেছেন যে। তুই জানিস না?"

"না। কোনও খবর পাই নি তো।"

"কাউকেই খবর দেননি। বউভাত টউভাত সব শঙ্করায় সেরে এসেছেন।"

নির্বাক হইয়া রহিলাম। মন্মথ বলিল- -"শুনলাম বউ আসবার আগে কমলা আর ননতিকে নাকি ঘরে শিকল তুলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ওরা বিধবা, পাছে ওদের মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়। তোদের ফুলমামী বিচক্ষণ লোক!"

"ফুল মামী? খেতু মামার বউ? তিনি এসেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। বউ আসবার আগেই তিন চারজন 'এয়ো'কে নিয়ে তিনি এসে গিয়েছিলেন। ওঁরাই তো সব করছেন।"

"কি করছেন?"

"সবই করছেন। রান্নাবান্না, ভাঁড়ার বার করা, নতুন বউকে উপদেশ দেওয়া, এইসব আর কি! তোর দিদিমা ব্যাকগ্রাউণ্ডে পড়ে গেছেন। নতুন বউ তাঁকে দু'বেলা ভক্তিভরে প্রণাম করছে কেবল। তোর মামার ভক্তিও বেড়ে গেছে দেখলাম। একদিন তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখলাম তোর মামা পুজো সেরে এসে দিদিমার ঘরে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, কই মা চরণ দাও। তোর দিদিমা জানিসই তো ঠাণ্ডাকে বড় ভয় করেন, লেপটেপ মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন আরামে। কিন্তু তোর মামা সেই লেপের ভিতর তাঁর ঠাণ্ডা হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে চরণ-বন্দনা করলেন। তোর দিদিমার মুখখানা যা হল তা অবর্ণনীয়। তোর নতুন মামীও দু'বেলা এসে চরণ-

বন্দনা করছেন। আমি আজকাল প্রায় রোজই একবার যাই তোদের বাড়িতে। কাল তোর দিদিমা চুপিচুপি বললেন—তুই যা, একবার সূয্যিকে ডেকে নিয়ে আয়। তাই চলে এলাম। চল তুই—''

মনে হইল পুরাতন নাটকের যবনিকা-পতন হইয়া গিয়াছে। এবার নূতন নাটকে নূতন দৃশ্য। সাহেবগঞ্জে গিয়া দেখিলাম শুধু খেতু মামা এবং ফুল মামী নয় পটলকর্তা ও পটলগিন্নীও আসিয়া গিয়াছেন এবং মামার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মামা এমন একটা ভাব করিতেছেন যেন তাঁহারই বাড়ির মালিক, মামা আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। নূতন মামীটিকে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগিল। তের চোদ্দ বছরের কালো রোগা মেয়ে একটি। বড় বড় চোখ। সারা মুখে একটি স্নেহকাঙাল ভাব। আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট—একটু বেঁটে বলিয়া আরও ছোট দেখাইতেছিল—কিন্তু সম্পর্কে তিনি আমার মামীমা, আমার গুরুজনস্থানীয়া। দেখা হইতেই আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়া হাত বাড়াইয়া অঙ্গুলি দিয়া আমার থুতনি স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন। তাহার পর সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন—''তুমি আমার বড় ছেলে বাবা। তোমাকে আমি বাবা বলেই ডাকব। আমি নিজের বাবাকে কখনও দেখিনি। তিনি আমাব জন্মের আগেই মারা গেছেন। তুমিই আমাব বাবা হও, কেমন?'' কেন জানি না, আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বলিলাম—''আমার যথাসাধ্য নিশ্চয় আমি করব।'' কথাটা বলিযাই মনে হইয়াছিল কথাগুলো কেমন যেন থিয়েটারি-গোছের হইয়া গেল। হঠাৎ চোখে পড়িল মামীমা একটি সুতীর লাল ডুরে পরিয়া আছেন। কাপড়টা কেমন যেন খেলো মনে হইল। শুনিলাম তাঁহার মা খুব গরীব। মেয়েকে কিছুই দিতে পারেন নাই। মামাই নাকি বিবাহের খরচ নির্বাহ করিবার জন্য তাঁহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছেন। নকুল—মামার আগের পক্ষের শালা—আমাকে গোপনে সব খবর বলিল। মামার এ বিবাহ নকুল সুচক্ষে দেখে নাই। সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার যে দিদি এতদিন তাহাব সব দোষ ঢাকিয়া তাহাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার অবর্তমানে সে এ সংসারে টিকিতে পারিবে না। যদিও নূতন মামীমা নকুলকে দাদা সম্বোধন করিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নকুল তেমন আমল দেয় নাই। সে সরিয়া সরিয়া বেড়াইতেছিল। সে আমাকে বলিল—''কি রকম ঢঙী অভিনেত্রী দেখেছিস। সবাইকে তেল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অতি হা-ঘরের মেয়ে। ওর মা তারাপদ পুরুতকে দু'কাঠা ধেনো জমি ঘুষ দিযে এই কাণ্ডটি করলে। কিচ্ছু দেয়নি। হাওড়া-হাটের খানকয়েক জ্যালজেলে শাড়ি। আর ওর মায়েরই হাতের খওয়া (ক্ষইয়া যাওয়া) চুড়ি আর লিকলিকে সরু একটা হার। চাটুজ্যে মশাইয়ের (আমার মামার) কাছ থেকে তারাপদ পুরুত ওদের দেবে বলে' দু'শো টাকা নিয়ে গিয়েছিল। দিয়েছে ভেবেছিস? একটি পয়সা দেয়নি। সব নিজে গাপ করেছে। অত্যন্ত কুচক্কুরে লোকটা।''—এই বলিয়া নকুল ঘোঁৎ করিয়া একটা শব্দ করিল। দেখিলাম এটি তাহার একটি নূতন মুদ্রাদোষ হইয়াছে। সেদিন আমি অদ্ভুত একটি কাণ্ড করিয়া বসিলাম। আমার কাছে পঞ্চাশটি টাকা ছিল। তাহা দিয়া আমি একটি ভালো বোম্বাই শাড়ি কিনিয়া আনিয়া মামীকে দিলাম।

''এ কি!''—মামী তো অবাক। এতো ভালো শাড়ি পরা দূরে থাক তিনি কখনও চোখেও দেখেন নাই। দাম শুনিয়া তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন।

''এতো টাকা খরচ করে' শাড়ি কেনবার কি দরকার ছিল বাবা!''

"বাবা কি কখনও মেয়েকে খেলো জিনিস দিতে পারে?"

মামীমা মাথা হেঁট করিলেন, দেখিলাম তাঁহার চক্ষে অশ্রু উদগত হইয়াছে।

নূতন মামীমা সেইদিন হইতেই আমার বন্ধু হইয়া গেলেন। মামীমা যখন আমাব কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন তখন পটলকর্তা হঠাৎ আসিয়া পড়িলেন।

"তুমি এখানে কি করছ? ভেতরে যাও। ওটা কি?"

"বাবা আমাকে এই শাড়িটা কিনে দিয়েছে।"

"তুমি কিনে দিয়েছ!"—আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন পটলকর্তা—"হঠাৎ এত দামী শাড়ি কিনে দেবার মানে?"

মানে কি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না। বলিবার প্রবৃত্তিও হইল না।

পটলকর্তা বলিলেন—"ভালোই হয়েছে। আমার এক ভাইপোর বিয়ে হবে। এই শাড়িখানাই আমার বউমাকে দিয়ে মুখ দেখব আমি। রেখে দাও, পাট ভেঙো না।"

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলাম—"আপনি নিজে শাড়ি কিনে আপনার বউমার মুখ দেখুন, এ শাড়ি মামীর জন্যে কিনেছি, মামীই পরবেন। এ শাড়ি এখন আমার কাছে থাকবে, মামীকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে এই শাড়ি দিয়ে প্রণাম করব তাঁকে।"

পটলকর্তা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। তাঁহার গলা দিয়া সেই গুনগুন শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুক্তকচ্ছ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন তিনি।

"কি! এত বড় আস্পর্ধা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। পেচ্ছাপ করে দিই তোর শাড়িতে। তুই নিজে থাকিস তো একজনেব গোয়ালঘরে, মামীকে সেইখানে নিয়ে যাবি? চাল নেই, চুলো নেই, মামার অন্নে মানুষ—এত লম্বা লম্বা কথা তোর মুখে। দূর হয়ে যা এখান থেকে—"

একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। পটলগিন্নী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিযা আসিলেন। সব শুনিয়া বলিলেন—"রাঙা কাপড়-পরা ডবকা ছুঁড়ী দেখে মাথা ঘুরে গেছে মুখপোড়ার। নিজে একটা বিয়ে কর না। বিয়ে কবে যত খুশি শাড়ি দে না তাকে। বিয়ের সম্বন্ধ তো এসেছিল, পালিয়ে গেলি কেন! এ সব তো ভালো লক্ষণ নয়।"

পটলকর্তা আবার বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন—"দূব হ' এখান থেকে।"

আমি দিদিমার কাছে গিয়া শাড়িটা তাহাকে দিয়া বলিলাম, "এই শাড়ি আমি মামীকে কিনে দিয়েছি। পটলকর্তা তার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে। তোমার কাছে এটা রইল। আর কাল তুমি যা বলেছিলেন, তাতে আমি রাজী আছি। আজই তাদের খবর পাঠাও।

আমি আসিবামাত্র দিদিমা একটি প্রস্তাব কবিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"আমার কিছু সেকেলে গয়না আছে। কিছু সোনার, কিছু রূপোর। তোকেই সব দেব। ওগুলো বিক্রি করলে হাজারখানেক টাকা হবে। শুনছি এখানে মাড়োয়ারীদের একটা বাড়ি বিক্রি আছে। ভালো দোতলা বাড়ি। গয়না বিক্রি করে ওই বাড়িটা তুই কিনে নে। তারপর বিয়ে করে ওইখানেই সংসার পাত তুই। আমি তোর বউয়ের কাছেই থাকব ও বাড়িতে। এখানে আমার একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করছে না—বাড়িটা কিনে ফেল তুই। আজই দেখে আয় বাড়িটা। মন্মথকে বললেই সে নিয়ে যাবে" দিদিমাকে তখন বলিয়াছিলাম, "এখানে বাড়ি কিনে কি করব। আমি তো প্র্যাকটিস করছি অন্য জায়গায়। তা ছাড়া তোমার গয়না মাথায় করে রাখব!" দিদিমা বলিলেন—"তাহলে তোকে গয়না দেব না, বিক্রি করে টাকাটাই দেব। আমি মরবার আগে

দেখে যেতে চাই, তোর নিজের একটা বাড়ি হয়েছে। শহরের বাড়ি একটা সম্পত্তি, তুই যদি সেখানে না-ও থাকতে পারিস, ভাড়া পাবি। তোর একটা আয় হবে।" তখন দিদিমার এ কথার কোনও প্রত্যুত্তর দিই নাই। দিদিমা অত্যন্ত জেদী লোক ছিলেন। যাহা ঠিক করিতেন তাহাই করিতেন। মামার বিবাহের পরই তিনি নাকি মামাকে বলিয়াছিলেন—'আমাকে তুই শঙ্করায় আমার স্বামীর ভিটেতে রেখে আয়। এখানে আমি থাকব না।' মামা নাকি তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন। নূতন মামীও। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, 'মা, আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন কেন। আমার কি দোষ। আপনি যদি শঙ্করায় যান আমিও শঙ্করায় যাব। আপনি যেখানে থাকবেন আমিও সেখানে থাকব। আপনি আমাকে কথা দিন আমাকে ফেলে কোথাও চলে যাবেন না।' মামী নাকি তাঁহার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিলেন। দিদিমার নিকট হইতে কথা আদায় করিয়া তবে উঠিয়াছিলেন তিনি। এ সবই অবশ্য নকুলের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছিলাম। ইহার কতটা সত্য, কতটা অতিরঞ্জিত তাহা জানি না।

দিদিমার গহনা বিক্রয় কবিয়া বাড়ি কিনিতে যদিও আমি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু পটলকর্তার নিকট অপমানিত হইয়া আমি মত পরিবর্তন করিলাম। পৃথিবীতে আমার যে মাথা গুঁজিবার মতো নিজের একটা বাড়ি নাই পটলকর্তার মন হইতে এ কথাটা মুছিয়া দিতে হইবে। তাঁহার ওই ব্যঙ্গোক্তি সত্য বলিয়াই আমার মনে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। ঠিক করিলাম তিনি থাকিতে থাকিতেই বাড়িটা কিনিয়া ফেলিতে হইবে। সেই দিনই গিয়া বাড়িটা দেখিয়া আসিলাম। বড় রাস্তার মোড়ের উপর বেশ ভালো বাড়িটি। আমার বেশ পছন্দ হইল। হরেরামবাবু বলিয়া একজন ভদ্রলোক সে বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন। তাঁহার একটি ছোটখাটো দোকান ছিল। জগন্নাথবাবুর থিয়েটার পার্টির লোক ছিলেন। নারী-ভূমিকায় অভিনয় করিয়া জগন্নাথবাবুর মনোহরণ করিয়াছিলেন তিনি। রিজিযার ভূমিকায় এমন অভিনয় করিয়াছিলেন যে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরিবার বড় ছিল না। একটি মাত্র ছেলে কমলাকান্ত। বেশীদূর লেখাপড়া শেখে নাই। গোলোক পণ্ডিতের মারের চোটে অনেকদিন আগেই পাঠশালা ছাড়িয়া বাড়িতে বসিয়া ছিল। ভালো দাবা খেলিতে পারিত। জগন্নাথবাবু চেষ্টা করিয়া তাহাকে রেলের একটা ছোটখাটো কাজে ঢুকাইয়া লইয়াছিলেন। সে-ও থিয়েটারে ছোটখাটো পার্ট করিত। কখনও দূতের, কখনও দৌবারিকের। একবার লব সাজিয়াছিল। আমার সঙ্গে উহাদের পরিচয় ছিল। হরেরামবাবুর স্ত্রী, কমলাকান্তের মা পরিচিত মহলে মা ডালিম নামে খ্যাত ছিলেন। বয়স ত্রিশের কোঠায়। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত ষোড়শী। টকটক করিতেছে গায়ের রং। মাথার চুল এবং চোখের তারা 'মিশ' কালো। আমি বাড়িটা কিনিব এ কথায় হাররামবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া বসাইয়া বলিলেন—"বাড়িটা ভালো। আমার পয়সা থাকলে আমিই কিনতুম। কিন্তু আমার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। আপনি কিনেছেন এ তো খুব আনন্দের কথা।" হঠাৎ পাশের দুয়ার ঠেলিয়া ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া মা-ডালিম প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আমাদের কি বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে?"

"না, না, উঠে যাবেন কেন। আমি তো এখানে থাকব না। আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। যা ভাড়া দিচ্ছিলেন তাই দেবেন।"

"আমরা মাসে কুড়ি টাকা ভাড়া দিতাম।"

"তাই দেবেন। আমার দিদিমাকে পাঠিয়ে দেবেন টাকাটা। তাঁর টাকাতেই বাড়ি কিনছি, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন টাকাটা।"

মা-ডালিম একটু মৃদু হাসিয়া চোখ নিচু করিয়া বলিলেন, "একটা অনুরোধ করব"

"কি বলুন?"

"কুড়ি টাকা ভাড়া আমরা টানতে পাচ্ছি না। যদি কিছু কমিয়ে দেন।"

"কত হলে আপনাদের সুবিধে হয়।"

"পনেরো টাকা।"

"বেশ তাই হবে। তবে গৃহপ্রবেশের দিন আমি কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করব। পুজোটুজো হবে। আপনারাও থাকবেন। আপনাদের অসুবিধে হয়তো হবে একটু। তবে মাত্র এক দিন।"

"আমাদের কি আবার অসুবিধে হবে। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।"

মুচকি হাসিয়া মা-ডালিম ভিতরে চলিয়া গেলেন। পরে শুনিয়াছি যখনই কোনও কঠিন কার্যোদ্ধারের প্রয়োজন হয় হরেরামবাবু মা-ডালিমকেই সামনে আগাইয়া দেন। কমলাকান্তের চাকরিটিও নাকি মা-ডালিমের অনুরোধে জগন্নাথবাবু করিয়া দিয়াছিলেন।

বাড়ি-কেনা নির্ঝঞ্ঝাটে হয় নাই। পটলকর্তা বাধা দিয়াছিলেন। আইনের প্রশ্ন তুলিয়া তিনি দাবি করিয়াছিলেন দিদিমার গহনা নাকি মামারই প্রাপ্য। পটলকর্তা অবশ্য আইনবিশারদ ছিলেন না। পরদিনই একজন মোক্তার তাঁহার কাছে ব্যাপারটা স্বচ্ছ করিয়া বলিয়া দিলেন—স্ত্রীধনে কাহারও অধিকার নাই। দিদিমা তাঁহার গহনা লইয়া যাহা খুশি করিতে পারেন। পটলকর্তা তবু নিরস্ত হন নাই। মামাকে দিদিমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মামা দিদিমাকে গিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার নুনের ব্যবসায়ে বড় লোকসান হইয়াছে। হরিদাস মাড়োয়ারীর নিকট বাড়ি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে প্রচুর ঋণ করিতে হইয়াছে। সে আর ধার দিবে না। কেহই দিবে না। সকলেই বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে চায়। দিদিমা যদি তাঁহার গহনাগুলো দেন তাহা হইলে তিনি টালটা সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন। দিদিমা উত্তর দিয়াছিলেন, কেন বউমার গয়নাগুলো তো আছে। সেগুলো যদিও ওর ছেলেমেয়েরই প্রাপ্য, তবু আপাতত এইগুলো বন্ধক দিয়েই কাজ চালাও। আমার গয়না আমি সূয্যিকে দিয়ে দিয়েছি। তা দিয়ে ও বাড়ি কিনবে। সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন ও কথার আর নড়চড় হবে না। মামা বলিতে পারিলেন না যে প্রথম মামীর সব গহনা বিক্রয় করিয়া দিয়া তিনি দ্বিতীয় মামীর বাপের বাড়িতে কিছু জমি এবং একটা বাগান তাঁহার নামে কিনিয়া দিয়াছেন। তারাপদ পুরোহিত এ বিষয়েও মধ্যস্থতা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শিবু নাকি সেখানে একটি বাড়িও করাইবার আয়োজন করিতেছে। একটি ইঁটের ভাটা নাকি পোড়ানো হইতেছে। এ সব খবর অবশ্য নকুলই আমাকে বলিয়াছিল। পরে জানিয়াছিলাম সে মিথ্যা বলে নাই। পটলকর্তার চক্রান্ত সফল হইল না। আমি বাড়িটি কিনিয়া ফেলিলাম। বাড়ি কিনিবার দুই দিন পরে একটা শুভদিন দেখিয়া গৃহপ্রবেশও হইল। মা-ডালিমই সমস্ত ভার লইয়াছিলেন। আমাকে কিছুই করিতে হয় নাই। পূজার আয়োজন, খাওয়ার আয়োজন তো করিয়াছিলেনই বাড়িটিকে নানারকম ফুল-লতা-পাতা রঙিন কাগজ দিয়া সাজাইয়াও ছিলেন। চারিদিকে বেশ একটা উৎসবের আবহাওয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন মা-ডালিমের কর্মতৎপরতা এবং শিল্পবোধ আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহারই নির্দেশে আমি বাবার খড়মজোড়া এবং হরিণের শিং তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিলাম। তিনি সেগুলি বৈঠকখানায় একটি বেদীর মতো করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন। আমি মামাকে গিয়া বলিয়াছিলাম—

আপনার পায়ের ধুলো না পড়লে আমার বাড়ি পবিত্র হবে না। আপনিই আমার বাবার মতো। সবাইকে নিয়ে আপনি যাবেন। মামা গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, "দিদি আর জামাইবাবুর কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে। দিদি আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন। সারাজীবন দুঃখকষ্ট সহ্য করেই গেলেন। সুখের মুখ আর দেখতে পেলেন না।" পটলকর্তা আর পটলগিন্নীকেও আমি নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা দুইজনেই গুম্ হইয়া রহিলেন। একটি কথা পর্যন্ত বলিলেন না। শুধু যে তাঁহারা আমার ওখানে গেলেন না তাই নয় সেইদিনই তাঁহারা সাহেবগঞ্জও ত্যাগ করিলেন। গৃহপ্রবেশ-উৎসবে মন্মথর বাড়ির সকলে আসিয়াছিল। দিদিমাকে সেখানে পালকি করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। মা-ডালিম দিদিমার জন্য চমৎকার একটি বিছানাও পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। গালিচা-পাতা সেই বিছানায় বসিয়া দিদিমাও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা-ডালিম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এমন সুখের দিনে তুমি কাঁদছ কেন ঠাকুমা!" দিদিমা সেদিন যে উত্তরটা দিয়াছিলেন তাহা অদ্ভুত। বলিয়াছিলেন, "আমি কাঁদছি না। আমার চোখ দিয়ে ওর মা কাঁদছে। আমার ভিতর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। তাই কাঁদছে। এ কান্নার অর্থ তোমরা বুঝবে না।" তাহার পর মা-ডালিম যখন পূজার ফুল তাঁহার হাতে দিলেন তখন তাহা মাথায় ঠেকাইয়া আমাকে ডাকিয়া তিনি আমার মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন—"জয়ী হও, সুখী হও।" থিয়েটারের জগন্নাথবাবুকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া পরিবেশন করিতে শুরু করিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'এবেলা শুধু একটা মিষ্টি খাব। ওবেলা খাব পেট ভরে'। আমাদের ক্লাবে একটা ফিস্টের আয়োজন করেছি। তোমাকেই তার খরচ দিতে হবে। লুচি পাঁঠা আর রাবড়ি। কোন বাজে জিনিস করিনি। লুচি ভাজবে রামধন হালুয়াই, মাংস রাঁধবে গোপীচরণ। রাবড়ি ভাগলপুর থেকে আনাচ্ছি। সর্বসাকুল্যে তোমার খরচ পড়বে পনেরো টাকা। রাজী তো?" বলিলাম, "আপনার আদেশ কি অমান্য করতে পারি?" জগন্নাথবাবু বলিলেন, "আর একটা পরামর্শ তোমার সঙ্গে করতে চাই। তোমার ওখানে আমাদের থিয়েটার পার্টির একটা ব্রাঞ্চ খুললে কেমন হয়! ওখানে গিয়েও আমরা মাঝে মাঝে থিয়েটার করব।" বলিলাম, "একদিন গিয়ে থিয়েটার করে আসতে পারেন। সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারব। কিন্তু ওখানে আপাতত ব্রাঞ্চ খুলবেন কি করে'? আমি তো একজনের গোয়ালঘরে থাকি।" জগন্নাথবাবু দমিবার পাত্র নন। বলিলেন, "তবু আমরা যাব একদিন। দেখে আসব হালচাল। ওখানে বাঙালী আর কে আছেন?"

"সতীশবাবু আছেন। বলরামবাবু পোস্টমাস্টার আছেন। শ্যামবাবু স্টেশন মাস্টার আছেন—"

"শ্যাম সেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তো ভাবনাই নাই। তাঁরই ওখানে উঠব আমরা। তোমার সঙ্গে ভাব হয়েছে তাঁর?"

"আলাপ হয়েছে। তবে ভাব হয়নি। সময় পাই না।"

"সর্বাগ্রে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব কোরো। দেবতুল্য লোক।"

মনিহারিতে ফিরিবার পূর্বে হরেরামবাবুকে বলিয়া গেলাম তিনি যেন বাড়িভাড়া দিদিমাকেই পাঠাইয়া দেন। আমি প্রতিমাসেই আসিব এবং তাঁহাকে রসিদ দিয়া যাইব। মনিহারিতে ফিরিয়া শুনিলাম আমার অবর্তমানে অনেক রোগী ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের বাড়ি হইতে প্রতিদিনই

না। বলুন সাহবেগঞ্জে একটা বাড়ি কিনেছি। এখন হাতে আর টাকা নেই। আর ওই মৈথীল বামুনটাকে আপনি রাখবেন না। ওরা সাধারণত 'স্পাই' হয়। আপনার গতিবিধি সব লক্ষ্য করবে আর যথাস্থানে সেগুলি রিপোর্ট করবে। আমিই তিন চারটে ওইরকম স্পাই বাহাল করে রেখেছি। পরে আমি ঠাকুর দেখে দেব আপনাকে। এখন আপনি মালিককে গিয়ে বলুন আপনার একটা ব্রত আছে সেটা উদ্‌যাপন না করা পর্যন্ত আপনাকে স্বপাক খেতে হবে।" শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আমি তো মিথ্যে কথা বলতে পারব না। রাঁধুনী বামুনও আমি রাখব না। রাখবার ক্ষমতা নেই।"

সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া রাগতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "দেখুন যুধিষ্ঠির টুধিষ্ঠির মহাভারতের গল্পেই মানায়। বেশ, যা খুশি করুন। কিন্তু একটি কথা বলে দিচ্ছি—ওই ত্রিপুরারি সিং সোজা লোক নন। তিনি সিংহও বটেন আবার গভীর জলের মাছও বটেন। ওঁর জমিদারিতে যদি থাকতে চান তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হবে। কারণ লুকোনো গর্ত অনেক আছে। ওঁর পারিষদদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা আপনাকে সুনজরে দেখছে না। মালিক যে আপনার উপর এতটা ঝুঁকেছেন এতে গাত্রদাহ হয়েছে অনেকের। অনেকেরই রাতে ঘুম হচ্ছে না। সুতরাং হুঁশিয়ার থাকতে হবে।"

সেই দিনই ত্রিপুরারি সিংহের সহিত বৈকালে গিয়া দেখা করিলাম। তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, শুনিলাম তিনি আধ সের মহিষের দুধের সহিত আধ সের সাবুদানা সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার সহিত কিছু কিসমিস মোনাক্কা দিয়া আমার নির্দেশ অনুসারেই চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আপনার হুকুম মতো দুধ সাবু দুইই খেয়েছি। কিছু মেওয়াও ওতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আর একটু কর্পূর। হজম হয়ে গেছে। রাত্রে কি খাব বলুন তো?"

"আপনার জ্বর যখন ছেড়ে গেছে তখন রাত্রে সাধারণত যা খান তাই খাবেন। কিন্তু একটু কম করে। কি খান রাত্রে?"

"লুচি।"

"বেশ লুচিই খান। কিন্তু খান ছয়েকের বেশী নয়। লুচির সঙ্গে কম মসলা দিয়ে আলুর তরকারি হোক। বেগুন ভাজাও খেতে পারেন দু'একটা।'

"অত কম খেলে রাত্রে ঘুম হবে কি। আমি বিশ পঁচিশখানা লুচি খাই।"

না, অত আজ খাবেন না। ঘুম যদি না হয় আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব। ঘুম হবে।"

"বড় তেতো আপনার ওষুধ। আর খাব না।"

"আপনাকে আমার একটা কথা বলবার আছে।"

"বলুন।"

"সকলের সামনে বলব না।"

ত্রিপুরা সিং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পারিষদদের উঠিয়া যাইতে বলিলেন।

আমি অকপটে তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "ঠিক আছে। শুনে খুশী হলাম খুব। কিন্তু আপনার জন্যে দুশো টাকার কল আমি ঠিক করে রেখেছি। চাঁচলের রাজার বাড়িতে কয়েকটি রোগী আছে। তাঁর ইচ্ছে এবং আমারও ইচ্ছে আপনি ওখানে গিয়ে দিন কয়েক থেকে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসুন। তিনি আপনাকে দুশো টাকা দেবেন আমি বলে গিয়েছি। আর আপনি যখন স্বপাক

লোক আসিয়া খোঁজ করিয়া যাইতেছে আমি কবে ফিরিব। ভিন্ন গ্রাম হইতে ডুলিবাহিত হইয়া দুইটি শক্ত রোগী আমার অপেক্ষা করিতেছে। শুনিলাম জমিদার ত্রিপুরা সিংও কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া কাছারিতে আসিয়াছেন এবং গরম জল ছাড়া আর কিছুই খাইতেছেন না। বলিতেছেন, ডাক্তার আগে আসুক, সে যদি ওষুধ খেতে বলে তারই ওষুধ খাব। স্বয়ং রায় মহাশয় আসিয়া আমাকে খবরটি দিলেন। বলিলেন, "আমাকে মহালে বেরুতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি মালিককে সারিয়ে তুলুন। ওঁকে অসুস্থ রেখে কোথাও যেতে পারব না।" কাছারিতে গিয়া দেখিলাম সিংয়ের সামান্য একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথাটা ধরিয়া আছে। তিন দাগ মিকশ্চার করিয়া দিয়া বলিয়া আসিলাম—আজ আপনি দুধ সাবু খান। কাল নাগাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। কাছারিতে গিয়া দেখিলাম অনেকগুলি বড় বড় ঝুড়ি বসানো রহিয়াছে প্রত্যেকটি ঝুড়ি নানারকম খেলনায় ভরতি। জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব কি? ত্রিপুরা সিং হাসিয়া উত্তর দিলেন—রায় মশাইকে জিগ্যেস করুন। আমরা টেলার সাহেবের একটা মহাল কিনেছি। কিন্তু ব্যাটা সেটা আমাদের দখল দিচ্ছে না। রায় মশায়ের মতে লাঠালাঠি করবার আগে প্রজাদের মনোরঞ্জন করা দরকার। তিনি তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ওই খেলনা কিনে এনেছেন। বিতরণ করবেন ওগুলো। আর প্রচার করে দেবেন তাদের একবছরের খাজনা মাপ করে' দেওয়া হয়েছে। জমিদারি এখন টেলার সাহেবের নয়, আমাদের। টেলার সাহেবের লোক যদি খাজনা চাইতে আসে তারা যেন না দেয়। জোরজবরদস্তি করলে আমাদের খবর দিলেই আমরা সিপাহী পাঠিয়ে ওদের রক্ষা করব। টেলার সাহেবের একটা পাকা কাছারি আছে সেখানে। সায়েব কেতার কাছারি। ফায়ার প্লেস আছে। চেয়ার টেবিলে বসে খানা খান সাহেব, যখন যান ওখানে। ফজলু মিঞা ওখানকার দেওয়ান। নবাব একটি। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন রায় মশায়। সঙ্গে থাকবে পঞ্চাশজন বরকন্দাজ আর পালকি। উনি কারো বাড়িতে উঠবেন না। পালকিতে শোবেন। গাছতলায় স্বপাক রেঁধে খাবেন। আমি বলছি কোর্টের মারফত আইনত আমরা দখলদারি নেব গভর্নমেণ্ট পুলিসের সাহায্যে। কিন্তু রায় মশায় তাতে রাজী নন। রায় মশায় কাছেই একটা মোড়ায় বসিয়া মালিকের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। বলিলেন—টেলার সাহেব আর ফজলু মিঞা আইনকে টাকা দিয়ে কিনে ট্যাঁকে পুবে ফেলেছেন। আজকাল যে ম্যাজিস্ট্রেট—ওই লালমুখো বাঁদরটা—মদ খাবার জন্যে আর টেলার সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নাচবার জন্যে প্রায়ই টেলার সাহেবের বাংলোয় যায়। এ খবর গর্ভুর মুখে পেয়েছি। গর্ভু ওখানে কাজ করে কিন্তু সে আমাদের লোক। সে নাকি শুনেছে যে টেলার সাহেব ফজলু মিঞাকে বলেছেন এ ম্যাজিস্ট্রেট যতদিন আছেন ততদিন কাউকে ও মহালে নাক গলাতে দেব না। দেখি কতদূর কি করতে পারি।

আমি আমার বাসায় ফিরিয়া রোগী দেখিতে লাগিলাম। একটু পরে সতীশবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, মালিক বলছেন আপনি ওই বাড়িটাতে চলে যান। আমাকে বললেন তুমি ডাক্তারবাবুর ও বাড়িতে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এস। আর এই মৈথীল ঠাকুরটাকে পাঠিয়েছেন আপনার রান্না বাড়া করবার জন্যে। আপনি নিজে রান্না করে খাচ্ছেন এ শুনে মালিক আমাদের উপরই রাগ করছেন। একটি দিব্যকান্তি মৈথীল ঠাকুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সতীশবাবু তাহাকে বলিলেন—"তুমি এখন যাও, ওবেলা এস।" সে চলিয়া গেলে সতীশবাবু চুপি চুপি আমাকে বলিলেন—"আপনি গিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করুন। দেখা করে বলে আসুন যে আমি যতক্ষণ নিজের টাকা দিয়ে ও বাড়িটা কিনতে না পারছি ততদিন ওখানে যাব

খাওয়াই পছন্দ করেন তখন তাই খান। তবে চলে যান ওই বাড়িতে। টাকা চাঁচলের রাজা দেবেন। বউমাকে আনছেন কবে?''

''এখনও বিয়ে করিনি।''

''করে ফেলুন!''

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম—''ও বাড়িতে যেদিন উঠে যাব সেদিন আপনি সে বাড়িতে আগে যাবেন। পুজোর ব্যবস্থা করবেন। তারপর আমি যাব।''

ত্রিপুরারি সিং ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—''ডাক্তার, তুমি শুধু সজ্জন নও, বুদ্ধিমান লোকও বটে। বেশ তাই হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন সব ব্যবস্থা হবে।''

সতীশবাবু সব শুনিয়া গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ''আপনি যা করলেন, আখেরে তাতে ভালো হবে কি না বুঝতে পারছি না। আমার মতে বড়লোকদের সঙ্গে লপ্‌টে থাকা বিপজ্জনক। মাখামাখি করলেই সম্ভ্রম নষ্ট হয়, এই আমার বিশ্বাস। আর সম্ভ্রমই তো আপনাদের মূলধন। ওটা গেলে তো সব গেল।''

''উনি নিজে প্রস্তাবটা করলেন আমি কি করে আপত্তি করি বলুন। ভালবাসার দান কি প্রত্যাখ্যান করা উচিত?''

''বড়লোকের ভালবাসা মুসলমানের মুরগী পোষার সামিল। এটা সর্বদা মনে রাখবেন। চাঁচল থেকে যদি ডাকতে আসে যাবেন। না ডাকতে এলে যাবেন না। আমি যতদূর জানি তাঁদের বাড়িতে মালদা থেকে ডাক্তার আসে। আমাদের মালিক হয়তো জোর করে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তো। আপনার ওই দু'শ টাকা ফী নিজেই দেবেন। অর্থাৎ আপনাকে ওই বাড়িটা নিয়ে নিতে বলবেন। ওঁর নানারকম ছলনা আছে। তবে একটা কথা বলব গুণী লোকের উনি সমজদার। আর সেই গুণী লোককে নিজের তাঁবে রাখবার জন্যেও উনি বদ্ধপরিকর। আপনাকে ওঁর ভালো লেগেছে তাই আপনাকে উনি রাখবেনই এখানে। যেমন করে হোক রাখবেন। তাই আপনাকে সাবধান করছি যেন শিলু হালদার বা রঞ্জিত নাপিত হয়ে যাবেন না। থাকলে ইজ্জতের উপর থাকবেন, তাই এত কথা বলছি আপনাকে। আপনি বড় বংশের ছেলে, দুনিয়ায় যেখানে যাবেন ডঙ্কা মেরে প্র্যাকটিস করবেন। কারো তোয়াক্কা করবার দরকার কি আপনার?''

''শিলু হালদার কে?''

ওই যে উটমুখো কালো সুঁটকো গলার-সাঁকি-বার করা এক ছোকরা ওঁর কাছে ঘুরঘুর করে দেখেননি? ফিনফিনে ফিতেপাড় কাপড় পরে? সহিসের মতো চুল ছাঁটা?''

''দেখেছি।''

''না দেখেননি। ওর আসল রূপ দেখেননি। দেখাচ্ছি—''

সতীশবাবু হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। হাতে একখানি ছবি।

''এই দেখুন।''

দেখিলাম চমৎকার একটি ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের ছবি। মনে হইল যেন জীবন্ত, এখনি কথা কহিবে।

''এই ছবি ওর আঁকা। নগদ এক টাকা দিয়ে ওর কাছ থেকে কিনেছি আমি। দ্রৌপদীর

বস্ত্রহরণ বলে ওর কাছে খুব বড় ছবি ছিল একটা। অপূর্ব ছবি সেটা। একশ' টাকা দাম চাইলে! খুব বড় অবশ্য। এখানে শ্যাম সেনের আগে হলধর বোস বলে এক স্টেশন মাস্টার ছিলেন। আমরা তাঁকে হলুবাবু বলতাম। ওই শিলু হলুবাবুর ভাগ্নে। মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। ছবি এঁকে বিক্রি করত। দিনরাত ছবিই আঁকত। আমার দুর্বুদ্ধি হল, তাকে একদিন মালিকের কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম, এ ছোকরা ছবি এঁকে বিক্রি করে। হুজুর যদি কিছু ছবি কেনেন তাহলে আপনাকে এনে দেখাবে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখে তাক লেগে গেল মালিকের। তৎক্ষণাৎ একশ' টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন ছবিখানা। আর বললেন, তুমি এখানেই থাক। তোমার সব ছবিই আমি কিনব। কাছারির একটা ঘরে ওর বাসা করে দিলেন। কাছারি থেকে খাওয়ার পরবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাতখরচ হিসেবে বরাদ্দ হল মাসে দশ টাকা। খাতায় নাম লেখা হল শিলাদিত্য হালদার—মালিকের ব্যক্তিগত কেরানী। হাতের লেখাটি চমৎকার। মালিক যখন কাউকে কোনও ব্যক্তিগত চিঠি লিখতেন তখন মুখে সেটা বলে যেতেন, শিলু লিখত। এসব হল দশ বছর আগের ঘটনা। এখন শিলু আর ছবি আঁকে না, দলিল জাল করে। এটা অবশ্য সঠিক জানি না। আপিং খায়, মালিকের খোশামোদ করে। শুনছি মেঘাপুরে তফিয়া নামে একটা রাঁড়ও রেখেছে। বড়লোকের সংস্পর্শে এসে পচে গেল অমন একটা প্রতিভাবান ছোকরা। তাই বলছি, এখানে আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। শিলু, রঞ্জিত বা চোখন হয়ে যাবেন না।"

"রঞ্জিতই বা কে, চোখনই বা কে?"

"রঞ্জিত নাপিত। চমৎকার দাড়ি কামায়। বোঝাই যায় না যে গালের উপর ক্ষুর চলছে। আর এমন গা হাত পা টেপে যে তার তুলনা নেই। আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। মালিক ওকে নিস্কর দশ বিঘে জমি দিয়ে ক্রীতদাস করে রেখেছেন। চোখনকেও তাই। চোখন মালিকের মহিষের গাড়ি চালায়। গাড়ি চালাতে চালাতে খাসা গল্প বলতে পারে নানারকম। পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। মালিক সাধারণত পালকিতে ঘোড়ায় বা হাতিতে যাতায়াত করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে বর্ষার সময় তাঁর মোষের গাড়ি চড়বার শখ হয়। কিছুদিন আগে শোনপুরের মেলা থেকে প্রকাণ্ড দুটো মোষ নিজে গিয়ে কিনে এনেছেন। তাদের নাম নিয়েছেন 'মহাকাল' আর 'কালভৈরব'। কালো মুষকো একজোড়া সাক্ষাৎ যম যেন। ওই চোখন ছাড়া কেউ আর তাদের সামলাতে পারে না। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে, গুরগুর করে মেঘ ডাকছে, ব্যাং ডাকছে ডোবায় ডোবায়, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারিদিকে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মালিক চলেছেন মোষের গাড়ি চড়ে, চোখন ভূতের গল্প বলছে। পিছনে পিছনে কিছু দূরে মালকাইন অবশ্য পালকিটা পাঠিয়ে দেন, রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায়, কিন্তু মালিককে মানা করতে পারেন না। অত্যন্ত খামখেয়ালী জেদী লোক তো। তাই বলছি এখানে আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে আর ইজ্জতের সঙ্গে থাকতে হবে—ক্রীতদাস হয়ে যাবেন না।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন? আপনার সঙ্গে কোনও ঠোকাঠুকি লাগে নি তো?"

"আমার বাবা এখানে আগে কাজ করতেন, মালিকের বাবার আমলে। বাবার মৃত্যুর পর মালিক আমাকে দুশো টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন—এ টাকাটা আমি স্বর্গীয় ললিতবাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পাঠাচ্ছি। ললিতবাবু আমাদের স্টেট থেকে কিছু টাকা পাবেন। আপনি এলে আপনাকে হিসাব করে দিয়ে দেব। আর আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনার বাবার জায়গায় আপনাকেই নিযুক্ত করতে পারি। আমি এলাম। 'নিকাশ' হল। এদের জমিদারী সেরেস্তায়

'নিকাশ' একটা ভয়ংকর জিনিস। 'নিকাশ' হচ্ছে হিসাব নিকাশের সংক্ষেপ। বাবা স্টেট থেকে কত টাকা নিয়েছেন এবং খাজনা আদায় করে কত টাকা জমা দিয়েছেন, তাঁর হাত দিয়ে জমিদারী স্টেটের জন্য কত খরচ হয়েছে—এই সবের জটিল হিসাব পঁচিশ বছরের। বাবার মাইনে ছিল মাসে পাঁচ টাকা। অনেক উপরি রোজগার করতেন। উপরি মানে অসদুপায়ে রোজগার। আমি এসে বললাম—আমি অত হিসবাপত্র করতে পারব না। বাবার যদি কিছু পাওনা থাকে আমাকে দিয়ে দিতে পারেন। দেখলাম বাবা এই পঁচিশ বছরে এক পয়সাও মাইনে নেননি। তিনি যে স্টেট থেকে কিছু নিয়েছেন তারও লিখিত কোন প্রমাণ নেই। অথচ এই চাকরি করেই আমাকে তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, দেশে পাকা বাড়ি করেছেন, পঁচিশ বিঘে ধানের জমি কিনেছেন। কোথায় তিনি টাকা পেলেন ভগবানই জানেন। মালিক আমার সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করলেন। বাবার মাইনে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দিলেন আমাকে। আমি তখন বললাম, একটা কথা কিন্তু আপনাকে না বললে অন্যায় হবে। এই চাকরি করেই বাবা আমাকে পড়িয়েছেন, আমার বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন, দেশে বিষয়-আশয় করেছেন—অথচ আপনি বলছেন তিনি স্টেট থেকে একটি পয়সা নেননি। একথা শুনে মালিক কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আমার বাবার নাম ছিল ছত্রপতি সিং। বিরাট ছত্র ছিল তাঁর। তাঁর ছত্রের তলায় অনেকেই আশ্রয় পেয়েছিল। বাবা ললিতবাবুকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই 'খেলাত' (বকশিস) দিতেন তাঁকে। অনেক টাকা দিয়েছেন। তাঁকে এখানেই পঞ্চাশ বিঘে জমি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন এখানকার পঞ্চাশ বিঘের চেয়ে দেশের পঁচিশ বিঘে বেশী কাজে লাগবে তাঁর। সে জমিও বাবা কিনে দিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি বিশ্বাসী মিত্র ছিলেন বাবার, কেবলমাত্র স্টেটের নায়েব ছিলেন না। আপনি যদি তাঁর জায়গায় কাজ করেন আমরা খুশী হব। কিন্তু দেওয়ানজীর কাছ থেকে আগে আপনাকে কাজ শিখতে হবে কিছুদিন। আমি উত্তর দিলাম—আমিও খুব খুশী হব যদি বাবার চাকরিটি পাই। কিন্তু চাকরি নেবার আগে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই, শুনুন সেটা। আমি মাসিক পঁচিশ টাকার কমে থাকতে পারব না। কারণ গ্রামের স্কুলে ওই বেতনই আমি পাচ্ছি। তা ছাড়া, রোজ আমার খাওয়ার সিধা আর কিছু দুধ দিতে হবে। আমি স্বপাক খাব। আর আমি দুটি নিয়ম প্রবর্তিত করতে চাই। আমি ছাপা রসিদের প্রবর্তন করব। এক কপি রসিদ সেরেস্তায় থাকবে, আর একটি প্রজাদের কাছে আর তৃতীয়টি আমার কাছে। তিনটি রসিদেই আমার সই এবং প্রজার সই বা টিপ-সই থাকবে। আর আপনি আমার কাছে যখন কিছু টাকা নেবেন তখন আপনাকে লিখিত আদেশ দিয়ে সেটা নিতে হবে আর টাকাটা পেলে সেই চিঠির উপর 'পাইলাম' লিখে সই করে দিতে হবে। মালিক হাসিমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু বজ্র আঁটন ফসকা গেরো বলে একটা কথা আছে সেটা মনে রাখবেন। আপনার বিবেককে খুশী রাখবার জন্যে যা ইচ্ছে হয় তাই করবেন। আমি বাধা দেব না। আমি আপনাকে বিশ্বাস করব খালি। আপনি দেওয়ানজীর কাছে কাজ শিখুন। তাঁর কাজও কিছু করে দিতে হবে আপনাকে। তিনি বধির লোক। লেখাপড়া বিশেষ জানেন না। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। বাবার আমলের লোক। বাবা বলতেন ফ্রান্স দেশে জন্মালে উনি নেপোলিয়ন হতেন। আমাদের স্টেটের সব চিঠিপত্রের জবাব উনি দেন। জবাবটা মুখে বলে দেন অন্য লোকে সেটা লিখে দেয়। আপনার বাবা এতদিন এ কাজ করতেন। এখন আপনি করুন। আপনাকে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনেই বাহাল করলাম। এ টাকাটা আপনি

মাসে মাসে নিয়ে নিতে পারেন। বছরে এক টাকা করে আপনার মাইনে বাড়বে। পঞ্চাশ টাকার পর আর বাড়বে না। তখন বছরে আপনার মাইনে ছাড়া হয় নগদ টাকায় না হয় জমি দিয়ে আপনাকে কিছু 'উপরি' আমরা দেব। তার পরিমাণটা নির্ভর করবে জমিদারির লাভ লোকসানের উপর। এই ছককাটা বাঁধাধরা নিয়মে আমি আজ দশ বছর চাকরি করছি। এখনও পর্যন্ত তো কোনও ঠোকাঠুকি লাগেনি। মালিক অবশ্য দু'একবার আমাকে 'ঝুল' ব্যাপারে ঢোকাতে চেয়েছিলেন। একবার গঙ্গার ধারে মাঘী পূর্ণিমার মেলায় খাজনা আদায় নিয়ে দাঙ্গা হয়ে যায়, বিপক্ষদের সিপাহী খুন হয়ে যায় একজন। নিখিলবাবু তখন এসেছেন, তিনিই মেলার চার্জে ছিলেন, তাঁকে আসামী করে পুলিস ধরে' নিয়ে গেল। আমার একটা চেনাশোনা লোক মেলায় মিষ্টির দোকান করেছিল, তার দোকান লুট হয়ে যায়। মালিক বললেন, আপনি ওর হয়ে একটা মকোদ্দমা করুন যে বিপক্ষদল গুণ্ডা লাগিয়ে ওর দোকান লুটপাট করেছে আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন সেটা। আমি রাজী হলাম না। বললাম, হুজুর, আমি ওসব ব্যাপারে নাক গলাতে অনিচ্ছুক। তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। মালিক এদিকে লোক খুব ভালো। কাউকে যদি তাঁর ভালো লেগে যায় তাহলে তাঁর মতেই মত দিয়ে চলত চান তিনি। কিন্তু মাঝে সন্তর্পণে টোপ ফেলে চেষ্টা করেন যদি তাকে ক্রীতদাস করে ফেলতে পারেন। ওই শিলাদিত্য হালদারকে লোকে আজকাল কি বলে ডাকে জানেন? শিলুয়া! আপনাকে আমি বার বার সাবধান করছি 'শিলুয়া' হয়ে যাবেন না। এখানেই থাকুন, কিন্তু 'ডাঁটসে' থাকুন।"

কয়েকদিন পরে চাঁচল হইতেই একজন লোক আমাকে লইতে আসিলেন। সসম্মানে আমাকে লইয়া গেলেন তিনি। ট্রেনেই গেলাম। আমাকে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিয়া দিলেন। সেই প্রথম ফার্স্ট ক্লাসে চড়িলাম। তখন খুব বড়লোকরা ছাড়া কেহ ফার্স্ট ক্লাসে চড়িত না। সাহেবরাই বেশী চড়িত। মনিহারী স্টেশনে অনেক দিন ফার্স্ট ক্লাস টিকিটই বিক্রয় হয় নাই। আমার টিকিট-কাটা উপলক্ষে বেশ একটু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি হইল। সেই দিনই স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবুর সহিতও আলাপ হইল আমার। শ্যাম সেন ছিলেন মোটাসোটা ঈষৎ খর্বাকৃতি লোক। রেলের কালো কোট-প্যান্ট পরিয়া যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেন মনে হইত একটি কালো রংয়ের চওড়া বেঁটে তক্তা যেন ঘোরাফেরা করিতেছে।

আমাকে বলিলেন, "আপনার অনেক কথা শুনেছি লোকমুখে। কিন্তু সাহস করে যেতে পারিনি কোনও দিন। যদি অভয় দেন এবার যাব। সন্ধ্যের পর কাটিহারের ট্রেনটা 'পাস' করেই আমার ছুটি। তারপর যাব। সন্ধ্যের পর কি করেন আপনি?" বলিলাম, "কিছুই করি না। রুগীটুগী দেখে এসে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ি। শোওয়ার আগে পড়ি একটু।" "গান বাজনার শখ আছে?" শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, "শখ আছে। আমার বাবা খুব বড় একজন গায়ক ছিলেন। আমি সাহেবগঞ্জের থিয়েটার পার্টির মেম্বার একজন। কিন্তু এখানে তো কোনও সুযোগ নেই। আমি নিজে অবশ্য গান গাইতে জানি না। কিন্তু শুনতে ভালোবাসি।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামবাবু হাসিমুখে নীরবে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—"অ্যাই দেখুন, মিল হয়ে গেছে। আমার হার্মোনিয়ম আছে, বাঁয়া তবলা আছে, বেয়ালা আছে, গ্রামোফোন আছে, রেকর্ডও আছে প্রচুর। কিন্তু আমি গান গাইতে পারি না, শুনতে ভালোবাসি। এখানে ফটিক বলে এক টালি ক্লার্ক ছোকরা আছে, চমৎকার গান গায়। তার এক মামা আছে কেশ মশাই তিনি চমৎকার বেয়ালা বাজান। তাদের নিয়েই সন্ধ্যেটা

কাটাই। আপনি ফিরে আসুন। তারপর সদলবলে আপনার ওখানে যাব। হার্মোনিয়ম, বাঁয়া তবলা' বেয়ালা, গ্রামোফোন, রেকর্ড সব আপনার ওখানে চালান করে দেব। গিন্নী ওসব হইচই পছন্দ করেন না। পিঠে পুলি, বড়ি, আমসত্ত্ব, ছেঁচকি, সুকতো—এই সব নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন। আপনার শুনেছি এখনও বিয়ে হয়নি, সুতরাং আপনার ওখানেই আড্ডাটা ভালো জমবে। কি বলেন?"

"বেশ—"

চাঁচলে আমাকে প্রায় দশ দিন থাকিতে হইয়াছিল। রাজবাড়ির তিনটি পুরাতন রোগী (তাহার মধ্যে একটি রোগিণী) এবং গ্রামের নানাবয়সের বহু লোকের চিকিৎসা করিলাম। রাজবাড়ির রোগীদের রোগ বিশেষ ছিল না। অমিত আহারই তাঁহাদের বাত ও বহুমূত্রের হেতু। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর তাঁহারা প্রচুর আহার করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন, মাঝে মাঝে ঢেঁকুর তোলা এবং পেট চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করিতেন না। আমি তাঁহাদের খাওয়া কমাইয়া দিয়া, কিছু ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলাম। যিনি অন্তঃপুরিকা তাঁহাকে বলিলাম ছাতে রোজ ঘড়ি ধরিয়া এক ঘণ্টা পায়চারি করিতে হইবে। পুরুষ দুইজনকে আমি সঙ্গে করিয়া বাহির হইতাম এবং সমস্ত গ্রামটা চষিয়া বেড়াইতাম। সকলেরই রাত্রে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। বাবু দুইজন ইহাতে প্রথমে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম, তাহা হইলে আমাকে বিদায় দিন, এ ছাড়া অন্য চিকিৎসা আমি কিছু করিব না, তখন তাঁহারা রাজী হইলেন। দশ দিনে একটু উপকারও হইল। কয়েকটি গরীব লোকের পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া জ্বর, সর্দিকাসি প্রভৃতির চিকিৎসা করিয়া কিন্তু বেশী আনন্দ পাইয়াছিলাম। গরীব লোকেদের চিকিৎসা করিয়া বরাবরই আনন্দ পাইয়াছি। বড়লোকদের পয়সা আছে, তাঁহারা মনে করেন বড় ডাক্তার দেখাইলেই বুঝি তাঁহাদের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলি সারিয়া যাইবে, ফ্যাশনের খাতিরেও অনেক সময় তাঁহারা খ্যাতিমান ডাক্তারদের দ্বারস্থ হইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন, তাই বড়লোক রোগীদের চিকিৎসা করিয়া সুখ নাই। তাঁহাদের ভগবানের উপরে নিয়তির উপরে বা ভালো লোকের উপরে বিশ্বাস কম, তাঁহারা মনে করেন টাকার জোরে বুঝি সব হইয়া যাইবে। চাঁচলের বাবুরা কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তাঁহারা, কেন জানি না, আমার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রহিলেন। আমি তাঁহাদের বলিলাম—আমি যাহা বলিতেছি তাহা করলে আপনারা ভালো থাকিবেন। এ সব রোগ সারাইবার ঔষধ আমাদের অ্যালোপ্যাথিতে নাই, নানারকম পেটেন্ট ঔষধ আছে তাহাতে আপনারা নিরাময় হইবেন না, আপনাদের পয়সা খরচ হইবে কেবল। তাই তাহা খাইবার পরামর্শ দিলাম না।

যেদিন আমি চাঁচল হইতে চলিয়া আসি সেদিন অনেক গরীব লোক আমাকে স্টেশনে বিদায় দিবার জন্য আসিয়াছিল। বাবুদের গোমস্তা আমার টিকিট কাটিয়া একটি থলি আমার হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহাতে কি আছে? তিনি বলিলেন—আপনার ফী তিনশত টাকা। আমি বলিলাম, এখন আমি ফী লইব না। ওঁরা আগে একটু সুস্থ হোন তখন ও কথা ভাবা যাইবে। যেদিন ফিরিলাম সেইদিনই সন্ধ্যার পর সতীশবাবু আসিয়া বলিলেন—"আপনি এইবার নতুন বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। দলিলপত্র সব ঠিক হয়ে গেছে, কাল সই করে বাড়িটার দখলদারি নিতে হবে। কত টাকা রোজগার করে আনলেন?" সতীশবাবুকে সব কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি গুম হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনার কাজকর্মই আলাদা দেখছি। আমি এদিকে ওদের বলে বসে আছি যে আপনিই নগদ টাকা দিয়ে

দেবেন কাল ওদের।'' আমি বলিলাম, ''বেশ দিয়ে দেব, পোস্টাফিস থেকে তুলে। ভেবেছিলাম হাজার দুই টাকা জমিয়ে তবে ওতে হাত দেব, কিন্তু আপনি যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন তখন আর উপায় কি। টাকা তুলতে হবে।'' সতীশবাবু তবুও গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ''এখানে পোস্টাফিস থেকে টাকা তোলা অত সহজ নয়। বলরামবাবুকে আগে খবর দিতে হবে। তারপর তিনি হেড আপিসে খবর দেবেন। তারা টাকা পাঠালে তবে আপনি টাকা পাবেন। আমি আমার টাকা থেকেই তাহলে দিয়ে দিই আপাতত। আপনি আজই দরখাস্ত করে দিন। বলরামবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে? নেই? মহা কুঁড়ে লোক। দরখাস্ত করবার পর ক্রমাগত তাগাদা দিতে হবে। এখুনি দরখাস্তটা লিখে দিয়ে দিন আমাকে। বিকেলে গিয়ে তাগাদা করবেন, পাঠালে কি না। দুটো বাঘ ওকে ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একটা হল ওর বউ, আর একটা হল মুদি জগগু। জগগুর দোকানে অনেক দেনা করেছেন ভদ্রলোক।'' আমি চারিশত টাকা তুলিতে চাই এই মর্মে একটি দরখাস্ত লিখিয়া সতীশবাবুকে দিলাম। সতীশবাবু বলিলেন, ''চারশ' টাকা তুলছেন কেন। অত টাকা তো লাগবে না। আড়াইশ' টাকাই যথেষ্ট।'' বলিলাম, ''চারশই তুলুন, খরচ না হয় আবার জমা দিয়ে দেব!'' সতীশবাবু আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ''আপনাকে আমি বাজে খরচ করতে দেব না। আপনি যে গৃহপ্রবেশের হুজুকে মেতে জলের মতো অর্থব্যয় করবেন, তা হবে না বলছি। গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান যা কিছু আমি করব। গোটা দশেক টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। সে-ও ওই আড়াইশ' টাকার মধ্যে ধরেছি। বাড়াবাড়ি কিছু করবেন না। লোকের চোখ টাটাবে। যতটুকু না করলে নয় আপাতত ততটুকুই করুন। সব কিছু রয়ে সয়ে করাই ভালো।'' আমি কোনও প্রতিবাদ করিলাম না। সতীশবাবু আমার দরখাস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার প্র্যাকটিসের মোটামুটি একটা বর্ণনা আমি দিতেছি। আমার প্র্যাকটিস ভালোই হইয়াছিল। সকালবেলা হইতেই আমার বাড়ির বারান্দায় এবং সামনের মাঠে অনেক রোগী আসিয়া জমিত। তাহাদের দেখিয়া আমি প্রথম প্রথম নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতাম। যখন রোগীর সংখ্যা কম ছিল তখনই ইহা করা সম্ভব ছিল আমার পক্ষে। রোগীর সংখ্যা বাড়িলে আর এক জনের সাহায্য প্রয়োজন হইত। প্রথম প্রথম আমার সহিস পচনাই আমাকে সাহায্য করিত। পরে আমি গ্রামেরই একটি ছোকরাকে শিখাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন কাজ করিবার পর সে আর থাকিতে চাহিল না। মনে করিল ডাক্তারির যাহা কিছু শিক্ষণীয় তাহা তো সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে এইবার কোথাও গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিলে সে বেশী রোজগার করিতে পারিবে। আমি তাহাকে বাধা দিই নাই, বরং সাহায্য করিয়া কোনও দূর গ্রামে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছিলাম। এইভাবে অনেক 'কোয়াক্' ডাক্তার আমার সাহায্যে অনেক গ্রামে প্র্যাকটিস শুরু করিয়া পরে বেশ উন্নতি করিয়াছিল। আমার ইহাতে ক্ষতি হয় নাই। লাভই হইয়াছিল বরং। কারণ তাহারা যেখানে হালে 'পানি' পাইত না আমাকে ডাকিত। তাহাদের মাধ্যমেই অনেক দূর দূর গ্রাম হইতে আমার 'ডাক' আসিত। আমার 'ফী' ছিল গ্রামের ভিতর এক টাকা। গ্রামের বাহিরে গেলে ক্রোশ পিছু এক টাকা করিয়া বাড়িত। যাহারা দিতে পারিত না, তাহাদের কিছু লইতাম না। আমাকে ছোটখাটো সার্জিকাল অপারেশন, হাড় ভাঙিয়া গেলে তাহার ব্যবস্থা করা—সবই করিতে হইত। অনেক সময় ধাত্রীর কাজও করিয়াছি, সুপ্রসব না হইয়া যদি কাহারও পেটে ছেলে আটকাইয়া যাইত, তখন আমারই ডাক পড়িত

ছেলে 'খালাস' করিবার জন্য। এজন্য অনেক দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসিক কাজ করিতে হইয়াছে। না করিয়া উপায়ও ছিল না। ভগবানের দয়ায় অনেক প্রসূতি এবং শিশু আমার সাহায্যে বাঁচিয়াও গিয়াছে। ত্রিপুরা সিংহের কন্যা সোমাকে আমিই প্রসব করাইয়াছিলাম। ট্রান্সভার্স প্রেজেন্‌টেশন্‌ (transverse presentation) ছিল। ইহার পর সোমার মা আর একবার সন্তানসম্ভবা হন। সেবার তিনি কলিকাতায় ছিলেন। প্রসব-বেদনা ধরিলে ডাক্তার কেদার দাসকে ডাকা হইল। সোমার মা কিন্তু জেদ ধরিয়া বসিলেন—ঠাকুরপোকে খবর দাও। সে না এলে আমি অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখতে দেব না। সোমার মা আমাকে ঠাকুরপো বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরপোর মত ব্যবহারও করিতেন আমার সঙ্গে। টেলিগ্রাম পাইয়া আমাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। গিয়া দেখিলাম তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখিতে দেন নাই। আমি গিয়া তাঁহাকে বকিলাম। বলিলাম, কেদার দাস জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার। আপনি করেছেন কি? আবার ডাকুন তাঁকে। কেদার দাস আসিয়াই প্রসব করাইলেন। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিলাম। প্রসূতি বাঁচিল কিন্তু শিশুটি বাঁচিল না। দুই দিন পরে মারা গেল। বউদি বলিলেন—"আপনি আমার সোমাকে বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার আমার ছেলেটিকে বাঁচাতে পারলেন না। আপনি যদি প্রসব করাতেন বাঁচত। প্রকাণ্ড সাঁড়াশি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বার করলে কি ছেলে বাঁচে। ফরসেপ্‌স্‌ ডেলিভারি হইয়াছিল, এজন্য শিশুটির মাথায় একটু আঘাতও লাগিয়াছিল। ইহার পর হইতে আর কোনও ডাক্তারকে তিনি কখনও কাছে ঘেঁষিতে দেন নাই। সাধারণ অসুখে তিনি কোনও ঔষধই খাইতে চাহিতেন না। বাড়াবাড়ি কিছু হইলে আমারই ডাক পড়িত। তাঁহার শেষ অসুখের চিকিৎসাও আমি করিয়াছিলাম। তিনি অন্য কোন ডাক্তার দেখিতে দেন নাই। যখন বলিলাম—বউদি, আমার বিদ্যেতে আর কুলুচ্ছে না। অনুমতি দেন তো সিভিল সার্জনকে ডাকি। বউদি হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোমার হাতে যদি না সারে আমার এ অসুখ সারবে না। তোমার বিদ্যে যদি ফুরিয়ে থাকে তাহলে আমার পরমায়ুও ফুরিয়েছে। বিদ্যে ছাড়া তোমার আর যা আছে তা অফুরন্ত। তাতেই আমার এ ক'টা দিন কেটে যাবে। বউদির জরায়ুতে ক্যানসার হইয়াছিল। আমাব ডাক্তারী জীবনের কথা মনে করিতে গিয়ে কত লোকেরই কথাই যে মনে পড়িতেছে। আগে মনে হইত আমি হয়তো অনেককে রোগমুক্ত করিয়াছি কিন্তু আজ মনে হইতেছে আমি কিছুই করি নাই, আর কেহ করিয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র ছিলাম। ইহাও মনে হইতেছে অনেক ভুল করিয়াছি, অনেকের মনে কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু তবু সকলে আমাকে ক্ষমা করিয়াছে, ইহাই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়িতেছে। কর্পূরা গোয়ালার তখন জোয়ান বয়স ছিল। শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। সে একদিন আমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। মাথার উপর প্রকাণ্ড ফোড়া একটা। বলিলাম এ ফোড়া চিরিতে হইবে, ঔষধে সারিবে না। তখন হুসেন আলি বলিয়া এক ছোকরা আমার নিকট শিক্ষানবিসি করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম, ফোড়ার আশপাশের চুলগুলা কামাইয়া, ভাল করিয়া টিঞ্চর আইয়োডিন লাগাইয়া দাও। ইহার বেশী কোনওরকম অ্যান্টিসেপটিক সাবধানতা লইতাম না। ছুরি কাঁচি প্রভৃতি ফুটাইয়া লইতাম। সব ঠিক করিয়া হুসেন বলিল—সব ঠিক হো গিয়া। আমি অপারেশন করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রোগীর ভিড় ছিল। তাহারা সবাই গোল হইয়া কর্পূরাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যেন কোন ম্যাজিক বা ওই জাতীয় কিছু হইবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ফোড়ায় ছুরি বসাইবামাত্র কর্পূরা লাফাইয়া উঠিল এবং আমাকে ঠেলিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। আমি আদেশ দিলাম—পকড়কে লে আও। আট দশজন লোক তাহার পিছু পিছু ছুটিল তৎক্ষণাৎ। একটু পরে তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল তাহারা। মাথা দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, তারস্বরে চীৎকার করিতেছে সে। লাফাইয়া ওঠাতে ছুরিটা অন্য কোথাও লাগিয়া গিয়াছে কিনা কে জানে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রিরি করিতেছিল। কাছাকাছি আসিবামাত্র তাহাকে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিলাম। চড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তবু আমার রাগ কমিল না। পায়ের জুতা খুলিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাকে পিটাইলাম। ভিড়ের ভিতর হইতে তাহার মা-ই আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিল—'খুব পিটো বাবু, বড়া বদমাশ ছে।' তাহার পর তাহাকে কয়েক জনের সাহায্যে উপুড় করিয়া শোয়াইলাম। চারজন হাত ধরিল, চারজন পা, এবং একজন তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া রহিল। আমি তখন ফোড়াটি অপারেশন করিলাম। মাথার চামড়া মোটা হয় পুঁজটাও বেশ নীচে ছিল। অপারেশন করতে একটু সময় লাগিল। যতক্ষণ অপারেশন চলিতেছিল ততক্ষণ কর্পূরা কিন্তু টুঁ শব্দটি করে নাই। অনেক পুঁজ বাহির হইল। ভিড়ের মধ্যে হইতে অনেক লোক আমাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সামান্য একটা ফোড়া কাটিয়া আমি দিগ্বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করিলাম। কর্পূরার মাথায় নিজেই বেশ ভালো করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। তাহাকে একটা গালপাট্টাবাঁধা দস্যুর মতো দেখাইতে লাগিল। এত কাণ্ডের পর যাহা ঘটিল তাহা আরও আশ্চর্যজনক। কর্পূরা আসিয়া হেঁট হইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, হামারা কসুর মাপ কিজিয়ে ডাক্তারবাবু। হামকো আওর ভি দো জুতা মারিয়ে, মগর মাপ কর দিজিয়ে। (আমার অপরাধ মাপ করুন ডাক্তারবাবু। আমাকে আর দু'ঘা জুতা মারুন কিন্তু আমাকে মাপ করিয়া দিন)। সেইদিন হইতে কর্পূরা আমার আপন লোক হইয়া গেল। যতদিন বাঁচিয়া ছিল আপনার লোকই ছিল। এইরূপ নানা ঘটনা মনে পড়িতেছে, সব লিখিতে গেলে মহাভারত হইয়া যাইবে।

আমার বাড়ি কেনার ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে সতীশবাবুর হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তিনি সেইদিনই একটু পরে আসিয়া আমাকে খবর দিলেন—'দরখাস্ত আমি বলরামবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে এসেছি। আপনি আজ বিকেলে গিয়ে তাগাদা দেবেন। লোকটা গেঁতো, সকাল-বিকাল তাগাদা মারতে হবে। তা না হ'লে দরখাস্ত যাবেই না।'

বৈকালে বলরামবাবুর কাছে গেলাম। দূর হইতে আগে দেখিয়াছিলাম তাঁহাকে। রোগা বেঁটে লোকটি। একটু কোলকুঁজো। গায়ে আড়ময়লা কামিজ। পায়ে ছেঁড়া চটি। ভীরু-ভীরু চোখ। কাহারও দিকে চোখ তুলিয়া বড় একটা তাকাইতেন না। যখনই দেখিয়াছি, রাস্তার একধার দিয়া ছেঁড়া ছাতাটি ঘাড়ে করিয়া হেঁটমুণ্ডে চলিয়াছেন। কোন অসুখ-বিসুখ উপলক্ষেও আমার কাছে আসেন নাই কখনও। বাড়িতে ছোটখাটো একটা হোমিওপ্যাথীর বাক্স ছিল তাহাতেই ছোটাখাটো অসুখ সারিয়া যাইত—এ খবরটা অবশ্য অনেক পরে জানিয়াছিলাম। আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার অনেক পরে যখন তাঁহার বড় মেয়ের টাইফয়েড হয় তখন বলরামবাবু আমাকে ডাকিয়া চিকিৎসার ভার দিলেন এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ছোটখাটো অসুখে আপনাকে আর কষ্ট দিইনি, হোমিওপ্যাথীর ফোঁটা দিয়েই চালিয়ে নিয়েছি। কিন্তু এই বিষমজ্বরে হোমিওপ্যাথী চালাতে ভরসা হচ্ছে না। আপনিই এর ভার নিন।"

সেদিন আমি যখন পোস্টাফিসে গেলাম তখন দেখিলাম বলরামবাবু আটহাতি একটি আড়ময়লা কাপড় পরিয়া খালি গায়ে টুলের উপর বসিয়া আপিসের কাজকর্ম করিতেছেন।

টেবিলের উপর চতুর্দিকে কাগজপত্র ছড়ানো। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন বটে, আসুন, আসুন—কিন্তু বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বসুন, এই টুলটাতেই বসুন। শিউযতন ভিতর থেকে চেয়ারটা এনে দাও। শিউযতন পিওন, ভিতরে ঢুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। নারীকণ্ঠে শোনা গেল—চেয়ার এখন দেব কি করে ওর ওপর মসলাপাতি, তরিতরকারি সব রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বলিলাম, না আমি এখন বসব না। আমার দরখাস্তটা পাঠিয়েছেন কি না তাই কেবল জানতে এসেছি। বলরামবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, সতীশবাবু এই একটু আগেই ওটা দিয়ে গেছেন। আজই পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাগজপত্র হাঁটকাইতে লাগিলেন। মনে হইল দরখাস্তখানি কোথায় রাখিয়াছেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন, দেখিলাম তাঁহার চোখের কোণে বলিচিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বড়ই অসহায় বোধ হইতে লাগিল ভদ্রলোককে। বলিলাম, 'আর একটা দরখাস্ত লিখে দেব? একটা কাগজ দিন তাহলে।' আর একটা কাগজে দরখাস্ত লিখিতে গিয়া দেখিলাম কলমের নিব খুব খারাপ। খরখর করিতেছে। তবু কোনক্রমে দরখাস্তটা আবার লিখিয়া দিয়া বলিলাম, 'এটা এখনই পোস্ট করে দিন আমার সামনে।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই দিচ্ছি'—আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন বলরামবাবু। আমার সামনেই দরখাস্তটা পোস্ট করাইয়া আসিলাম। শুনিলাম তাঁহার স্ত্রীই তাঁহার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। মাঝে মাঝে আপিসে ঢুকিয়া তাঁহার টেবিলের কাগজপত্রও গুছাইয়া দিয়া যান। তাই অনেক সময় কাগজপত্র গোলমাল হইয়া যায়। স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করিবার সাহস নাই। সারাজীবন তিনি নাকি স্ত্রীর আদেশে উঠ-বোস করিতেছেন। পরে কিন্তু যখন বলরামবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল তখন কিন্তু আমার ধারণা বদলাইয়া গেল। মনে হইল এরূপ নিঃস্বার্থপর মহৎ লোক খুব বেশী দেখি নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে তাঁহার মতো স্বল্পবিত্ত লোকের পক্ষে বিবাহ করা অনুচিত হইয়াছে। তাঁহার বেতন মাত্র কুড়ি টাকা, অন্য কোন প্রকার আয়ের সম্ভাবনাও নাই, লেখাপড়াও বেশী জানেন না যে চাকুরিতে উন্নতি হইবে—এ অবস্থায় কি তাঁহার উচিত ছিল গোলাপরানীর মতো মেয়েকে বিবাহ করা? সত্য বটে গোলাপরানীর বাবা ভঙ্গ কুলীন এবং তিনি নৈকষ্য, সত্য বটে গোলাপরানীর সামনের দাঁতগুলি বড় এবং মুখটা প্রকাণ্ড, কিন্তু ইহাও তো সত্য যে তাহার বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, ইহাও তো সত্য সে বাপ মায়ের আদরিণী কন্যা ছিল, ইহাও তো সত্য যে তিনি—বলবাম চট্টোপাধ্যায়—নৈকষ্য কুলীনবংশোদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও রূপে গুণে অর্থে সামর্থ্যে সব দিক দিয়াই তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ উহাকে বিবাহ করিতে গেলেন কেন? তাঁহার বাবা মা মামা—অর্থাৎ জোর করিয়া বিবাহ দিবার মতো অভিভাবক কেহই ছিল না। তাঁহার বন্ধু ফটিক ছাড়া কেহ তাঁহাকে জোরও করে নাই। গোলাপরানীর বাবা অবশ্যই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত, মেয়ের বয়স এগারো পার হইয়া গিয়াছিল, তিনি তো করিবেনই—কিন্তু বলরামবাবু কোন্ সাহসে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিলেন? কি সম্বল ছিল তাঁহার? এইসব চিন্তা করিবার পর বলরামবাবু বুঝিয়াছিলেন গোলাপরানীকে বিবাহ করিয়া তিনি ঘোর অন্যায় এবং একটি মহাপাপ করিয়াছেন। তাই ঠিক করিয়াছিলেন মুখটি বুজিয়া সারাজীবন ধরিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ তাহাই তিনি করিতেছিলেন। মাহিনা পাইলেই সমস্ত টাকা গোলাপরানীর হাতেই আনিয়া দিতেন এবং তিনি যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন তাহাই হইত। বলরামবাবু একটুও আপত্তি করিতেন না। সংসার-পরিচালনায়

গোলাপরানীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি আসিয়াই পোস্টাফিসের চারিপাশে নানারকম তরিতরকারি লাগাইয়া দিয়াছিলেন। পোস্টাফিসের আশেপাশে বেশ খানিকটা জায়গা ছিল। শাকসব্জি, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, ছাঁচি-কুমড়ো, শসা প্রভৃতি তো লাগাইয়াছিলেন কয়েকটা। পেঁপেগাছও ছিল। গোলাপরানী নিজে খুব কুঁড়ে ছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে যে চারটি সন্তান দিয়াছিলেন তাহারা বেশ করিতকর্মা এবং পরিশ্রমী ছিল। বড় ছেলেটির বয়স প্রায় বারো বৎসর, তাহার পরেরটি মেয়ে দশ বছরের, তাহার পরও দুইটি পুত্রসন্তান। ছোট ছেলেটির বয়স বছর ছয়েকের বেশী নয়। তাহারই সংসারের সব কাজ চালাইত। রান্নাবান্না, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় কাচা, এমন কি বাগানের সমস্ত কাজও উহারাই করিত। পাশেই একটা পুকুর ছিল সেই পুকুর হইতে বালতি করিয়া জল টানিয়া বাগানে জল দিত তাহারা। প্রচুর তরিতরকারি ফলিত। গোলাপরানী হাটে সেগুলি বিক্রয় করিতেন। তরকারিওয়ালীরা নিজেরাই বাড়িতে আসিয়া লইয়া যাইত। মাহিনা পাইলেই গোলাপরানী মাসের চাল ডাল কিনিয়া ফেলিতেন। দুই টাকার মধ্যেই তাহা হইয়া যাইত সেকালে।

মাসের প্রথম দিকটায় সকালে তিনি রান্নাই করিতেন না। গোবিন হালুয়াইয়ের দোকান হইতে লুচি জিলাপি কিনিয়া আনিয়া খাইতেন। গোবিন্ কিছু তরকারিও দিয়া দিত। গোলাপরানীর মত ছিল হাতে যতক্ষণ পয়সা থাকিবে ততক্ষণ দুই বেলা রান্না করিতে যাইব কেন। এক বেলা লুচি জিলাপি খাইব। জিলাপিটা তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। রাত্রে খিচুড়ি খাইতেন, খিচুড়ির ভিতর কিছু তরকারি ফেলিয়া দিতেন। খিচুড়িটা ছেলে মেয়োরাই রাঁধিত। রান্না হইয়া গেলেই সকলকেই খিচুড়ি খাইয়া লইতে হইত, এমন কি বলরামবাবুকেও। বলরামাবাবু নিড়বিড়ে লোক ছিলেন। রাত্রি দশটার আগে আপিসের কাজ শেষ করিতে পারিতেন না। আপিসের কাজের মধ্যেই গোলাপরানীর তাড়ায় উঠিয়া গিয়া খিচুড়িটি খাইয়া আসিতেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গোলাপরানী ছেলে মেয়েদের লইয়া পড়াইতে বসিতেন। তিনি বাল্যকালে নাকি কোন পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিছুদিন। সেই বিদ্যার জোরেই তিনি ছেলেমেয়েদের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক, পাটীগণিত প্রভৃতি শিখাইতেন। পড়া না পারিলে ছেলেদের বেদম মারিতেনও। প্রায়ই তাহাদের কোলাহল ক্রন্দনে সন্ধ্যার অন্ধকার বিঘ্নিত হইত। এই পরিস্থিতিতে পাশের ঘরে বলরামবাবু নীরবে বসিয়া আপিসের কাজে ক্রমাগত ভুল করিতেন, আবার সেগুলি সংশোধন করিতেন, আবার ভুল হইলে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। কিন্তু টুঁ শব্দটি করিতেন না। বেশী বিরক্ত হইলে ডান হাঁটুটি ঘনঘন নাচাইতেন। আর মাঝে মাঝে বিকৃত মুখে টেবিলের কাগজগুলির উপর চাহিয়া থাকিতেন। আর বেশী কিছু করিবার সাহস ছিল না তাঁহার। তিনি যতদূর সম্ভব গোলাপরানীকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রের জন্মের পর তিনি রাত্রে আলাদা ঘরে শয়ন করিতেন। আপিসের কাজ হইয়া গেলে আপিসের টেবিল হইতে খাতাপত্র নামাইয়া সেই টেবিলের উপরই শুইয়া পড়িতেন তিনি। আপিসের চেয়ার বেঞ্চি শেলফ্ সমস্তই গোলাপরানী দখল করিয়াছিলেন। সেগুলিতে তিনি তরিতরকারির মসলা প্রভৃতি রাখিতেন। একটি ছোট টুল আর টেবিল ছাড়া বলরামবাবুর আপিসে আর কিছু আসবাব ছিল না। ইহাতেও বলরামবাবুর কোনও আপত্তি করেন নাই। তিনি সব মানিয়া লইয়াছিলেন। তবু কিন্তু তাঁহার রেহাই ছিল না। গোলাপরানীর পরিষ্কার বাতিক ছিল। মাঝে মাঝে তিনি ঝাঁটা হস্তে পোস্টাফিসের ভিতর হানা দিতেন, দেওয়ালের কোণের ঝুল ঝাড়িয়া, স্তূপীকৃত কাগজের ধূলা পরিষ্কার করিয়া,

বলরামবাবুর আপিসের কাগজপত্রও গুছাইয়া দিতেন। কাজের সময় বলরামবাবু দরকারী কাগজগুলি আর খুঁজিয়া পাইতেন না। তা ছাড়া, আর একটা বিপদও ঘটিত। যেদিন এই সব ধুলা ঝাড়াঝাড়ি হইত সেই দিনই বলরামবাবুর পুরাতন হাঁপানিটা মাথা চাড়া দিত। তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিতেন না। গোলাপরানীর আর একটা বাতিকও ছিল। তিনি পুরাতন কাপড়, পুরাতন বিছানার চাদর প্রভৃতি দিয়া ছেলে মেয়েদের জামা, এমনকি বলরামবাবুর ফতুয়া পর্যন্ত প্রস্তুত করিতেন। করিতেন বলিলে ভুল হইবে, করাইতেন, গোলাপরানীর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল একটা, যেখানে যাহার কাছে স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভবনা থাকিত সেইখানেই গিয়া তিনি আত্মীয়তা জমাইবার চেষ্টা করিতেন। পোস্টাফিসের পাশেই গহর নামে একটা দরজীর দোকান ছিল। সে বিনামজুরিতে গোলাপরানীর পুরাতন শাড়ি ও চাদর হইতে জামা ফ্রক প্রভৃতি সেলাই করিয়া দিত। গোলাপরানী তাহাকে 'বাপজান' বলিতেন এবং মাঝে মাঝে কিছু খাবারটাবারও পাঠাইয়া দিতেন। একদিন দেখিয়াছিলাম বলরামবাবু একটি ডুরে ফতুয়া পরিয়া কাজ করিতেছেন। বলরামবাবুর একখানা দশহাতি পোশাকী কাপড় ছিল, যখন ক্বচিৎ কখনও বাহিরে যাইতেন, তখন গোলাপরানী সেটা বাহির করিয়া দিতেন। বাড়িতে তাঁহাকে ছোট একটি আটহাতি বা নহাতি কাপড় পরিয়া থাকিতে হইত। বলরামবাবুর সহিত পরে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাই এত কথা জানিয়াছি। আমি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া বউকে লইয়া মনিহারিতে বসবাস সুরু করি, তখন গোলাপরানী আমার স্ত্রীর সহিত গোলাপ পাতাইয়াছিলেন। সেই সুবাদে প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়িতে আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিতেন। মাসের প্রথম দিকে আমাদের জন্যও গোবিনের দোকান হইতে গরম কচুরি ও জিলাপি পাঠাইয়া দিতেন। ঘনিষ্ঠতা হইবার পর আবিষ্কার করিয়াছিলাম গোলাপরানীর মধ্যে শিল্প-প্রবণতা আছে। নানারকম বড়ি দিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের প্রস্তুত বড়ি খাইয়া বহুবার তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুরাতন শাড়ির পাড় হইতে রঙিন সুতা বাহির করিয়া এবং তদ্দ্বারা শাদা কাপড়ের উপর ফুল লতা পাতা চাঁদ সূর্য ময়ূর প্রভৃতি আঁকিয়া তিনি একবার আমার জন্য সুদৃশ্য একটি বালিশের ওয়াড় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি যখন দূরের 'কলে' গরুর গাড়ি করিয়া যাইতাম তখন গাড়িতে বিছানা বালিশ থাকিত। নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কালো অয়েলক্লথ দিয়া বালিশের ওয়াড় করিয়া দিয়াছিলাম। গোলাপরানী তাহার উপর ওই রঙিন ওয়াড়টি পরাইয়া দিয়াছিলেন। অনেক টুকরো টুকরো ছবি মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে তাঁহার উঁচু দাঁত সত্ত্বেও তাঁহার হাসির মধ্যে একটা অকৃত্রিম মাধুর্য ছিল। অর্থাৎ অত বড় বড় দাঁত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেঁতো হাসি হাসিতে পারিতেন না। যখন হাসিতেন তখন খুব জোরে হো হো করিয়া হাসিতেন, তাঁহার চোখে মুখে সর্বাঙ্গে অকৃত্রিম আনন্দ যেন উথলাইয়া পড়িত। যখন রাগিতেন তখনও তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না। বেশী রাগিয়া গেলে বলরামাবুর চুলের ঝুঁটি খামচাইয়া ধরিয়া ঝাঁকানিও দিতেন। বলরামবাবু সেদিন আপিস বন্ধ করিয়া আমার কাছে চলিয়া আসিতেন। 'এ সময়ে চলে এলেন যে। আজ ছুটি নাকি'—জিজ্ঞাসা করিলে বলরামবাবু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিতেন—'উনি একটু টেম্‌পার লুজ করেছেন। ঝড়টা বয়ে' যাক, তারপর আমি যাব। বলরামবাবু প্রায়ই আমার নিকট টাকা ধার করিতেন। বেশী নয়—দু'পাঁচ টাকা। আমি জানতাম ও টাকা তিনি আর ফেরত দিবেন না। কত দিয়াছিলাম তাহার হিসাবও রাখি নাই, তাগাদাও দিই নাই। কিছুদিন পরে তিনি রিটায়ার করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। তাহারও কিছুদিন পরে

আমার নামে বাহাত্তর টাকার একটি মনি অর্ডার আসিল। কুপনে লেখা ছিল—টাকাটা ফেরত দিতে বিলম্ব হইল। ক্ষমা করিবেন। আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করা যাইবে না। শ্যামবাবুর ঋণও না। আপনারা আমার নমস্কার জানিবেন। শ্যামবাবুকেও জানাইবেন। তাঁহার দেওয়া মাছের স্বাদ এখনও মুখে লাগিয়া আছে। জীবনের বাকি দিনগুলি আপনাদের স্মৃতি লইয়াই এই অজ পাড়াগাঁয়ে কাটাইয়া দিব।

মাসখানেকেব মধ্যে বাড়ি কেনা হইয়া গেল। সতীশবাবুই গৃহপ্রবেশের একটা শুভ দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম—"দিদিমা, মামা মামীকে লইয়া আসিতে চাই।" সতীশবাবু রাজী হইলেন না। বলিলেন—"আগে একটু থিতু হয়ে বসুন, তখন ওদের আনবেন। এখন আপনার খাট বিছানা চেয়ার মোড়া কিচ্ছু নেই—ওঁদের এনে শুতে দেবেন কোথা! গুরুজনদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি! আগে একটু থিতু হোন। জাহাজের মিস্ত্রী কাল্লুকে বলে দিয়েছি আপনার জন্যে একটা পালঙ্ক, তিনটে চৌকি, একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার করতে। বলেছি একশ' টাকায় সব কবে দিতে হবে, মায় কাঠ, পালিস সব সমেত। জিনিস ডেলিভারি দিলে আমি তাকে টাকা দেব—আপনি কিছু দেবেন না যেন। ফার্স্ট ক্লাস মিস্ত্রী। জাহাজের সব ফার্নিচার ওই করে। আগে কলকাতায় সাহেববাড়িতে কাজ করিত। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ আর গপ্পে। আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন তো ওর স্বরূপ জানতুম না, মজুরিতে বাহাল করেছিলাম আমার ওই খাটটার জন্যে। দেখলাম ওরে বাবা, এ তো আমাকে ফতুর করে দেবে। বারো দিনের মজুরি তিন টাকা দেওয়াব পরও দেখলাম খাটের কিচ্ছু হয়নি। নিজে তো কাজ করেই না, উপরন্তু আপনারও কাজ ভুলিয়ে দেবে গল্প করে করে। ওর সঙ্গে 'ঠিকে' ব্যবস্থা করাই ভালো। তবু মাঝে মাঝে আপনার কাছে 'খরচি' চাইবে। চাইলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন আমি কিছু জানি না, সতীশবাবুর কাছে যাও।"

গৃহপ্রবেশের দিন সতীশবাবু প্রচুর মুড়ি-মুড়কি ও বাতাসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুবেজি—স্থানীয় বৃদ্ধ পুরোহিত—গৃহপ্রবেশের আনুষ্ঠানিক পূজা করিয়া আট আনা দক্ষিণা, একটি লাল গামছা এবং পূজার জন্য ক্রীত ফলমূলাদি পাইয়াছিলেন। ইহাতেই খুব খুশী হইয়াছিলেন তিনি। সতীশবাবুকে আড়ালে বলিলাম—ওঁকে মাত্র আট আনা দক্ষিণা দিয়েছেন? পুরো একটা টাকা দিলেই পারতেন! সতীশবাবু উত্তর দিলেন—"উনি সাধারণত দু'আনা পান। আমি চারগুণ দিয়েছি। তা ছাড়া একটা গামছা, পুজোর অত জিনিসপত্র—কেউ দেয় নাকি অত! বেশী বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়। পট্ করে লোকের চোখ টাটিয়ে যাবে।"

সেইদিন আর এক কাণ্ড হইল। ত্রিপুরারি সিং অশ্বারোহণে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—"ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য আপনার মৌখিক একটা নিমন্ত্রণ করে আসা উচিত। না করলে অন্যায় হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম—"ওঁকেও কি মুড়ি মুড়কি বাতাসা দেবেন?" চোখ বড় বড় করিয়া সতীশবাবু উত্তর দিলেন—"তাতে ক্ষতিটা কি আছে! অখাদ্য তো নয়।" গেলাম ত্রিপুরারি সিংকে নিমন্ত্রণ করিতে। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"আপনার গৃহপ্রবেশের খবর পেয়েই তো এসেছি আমি। আপনি তো কোনও খবর দেননি। রায় মহাশয় খবরটা পাঠিয়েছেন আমাকে। তাঁর চর তো চারিদিকেই ঘুরছে। তিনিও আসতেন, কিন্তু তিনি গ্রামে গ্রামে খেলনা বিতরণ করে বেড়াচ্ছেন। তা ছাড়া. সায়েবের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন আপনার গৃহপ্রবেশটা ভালো করে হয়। তাই আমি চলে এলুম—"

"সতীশবাবুর উপরই সব ভার। তিনিই যা করবার তাই করছেন।"

'দেখি কি করেছেন তিনি।"

হাঁটিয়াই ত্রিপুরারি সিং আমার বাড়িতে আসিলেন। তখনও কয়েকজন লোক মুড়ি-মুড়কি ও বাতাসা চিবাইতেছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেক জুটিয়াছিল। ত্রিপুরারি সিং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন। মুখে মৃদু হাসি। একটি কথা বলিলেন না। আমার একটি মাত্র চেয়ার ছিল সেইটিতেই তাঁহাকে বসিতে দিলাম। সসংকোচে বলিলাম, "খাওয়াদাওয়ার বিশেষ কোন আয়োজন করতে পারি নি। সতীশবাবু মুড়ি-মুড়কি আর বাতাসা কিনেছেন।'

"তিনটেই তো উৎকৃষ্ট জিনিস। দিন একটু খাই।"

সতীশবাবু কিছু মাটির থালা কিনিয়াছিলেন। তাহারই একটাতে মুড়ি মুড়কি ও বাতাসা আনিয়া দিলাম। ত্রিপুরারি সব খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর এক গ্লাস জল পান করিয়া বলিলেন—"আ—হ্—'

সতীশবাবু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"খুব চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। এইবার আমাদের তরফ থেকে কিছু করতে হবে। গ্রামের যে কটা হালুয়াই আছে তাদের ডেকে পাঠান। তারা এইখানে এসে ভিয়ান চড়াক। আর সমস্ত গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তারা রাত্রে খাবে এখানে এসে। প্রচুর লুচি, বুটের ডাল, কয়েক রকম তরকারি আর মিষ্টি। আর দই। আর সাঁওতালটোলায় খবর দিন তারা এখানে এসে মাদল বাজিয়ে নাচ গান করুক। আর রঘুঘু পাশমানকে খবর পাঠান, তার লৌণ্ডা নাচের দল এখানে রাত্রে এসে নাচবে। সানাই পাওয়া যাবে?"

"মুচিদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। জিতুর ঢোল আর খঞ্জনিও আছে।"

"সবাই আসুক। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সরগরম করে ফেলুন জায়গাটা। আর ওই ছেলেগুলোকে লাগিয়ে দিন রঙিন কাগজ কিনে এনে শিকল তৈরী করে বাড়িটার চারধারে টাঙিয়ে দিক। আমাদের ডাক্তার চুপিচুপি গৃহপ্রবেশ করবেন, তা কি কখনও হয়!"

টিপুবাবু (ত্রিপুরারি সিংহকে লোকে আড়ালে টিপু সুলতান বলিত) এই সব ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলে সতীশবাবু বলিলেন—'দেখলেন লোকটার কাণ্ড! ভাবছিলাম সন্ধ্যের পর নিরিবিলিতে বসে গল্প সল্প করব, ঝড়ের মতো এসে সব তছনছ করে দিলে!"

একটু পরেই একজন সিপাহী আসিয়া সতীশবাবুকে খবর দিল আপনাকে মালিক এখনই ডাকিতেছেন। সতীশবাবু বিরক্তমুখে চলিয়া গেলেন। আমার বাহিরের গ্রামে একটা 'কল' ছিল, আমিও চলিয়া গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া দেখি আমার বাড়ির সামনে একদল লোক বসিয়া বাজনা বাজাইতেছে। দুইটা ঢোল, একটা কাঁসি এবং একটা সানাই তুমুল কোলাহল তুলিয়া প্রচুর লোকজন জমাইয়া ফেলিয়াছে। সতীশবাবু বাহির হইয়া আসিলেন।

বলিলেন, "মালিকের হুকুম অনুসারে প্রতি ঘরে একটা করে চৌকি বিছিয়ে দিয়েছি আর আপনার ঘরে একটা পালঙ্ক। মাঝের ঘরটায় শতরঞ্জি পেতে একটা টেবিল আর খানচারেক চেয়ারও দিতে বলেছেন। আমাদের গুদোমে এসব ছিল। মালিক বললেন এখন ওগুলো ডাক্তারের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। ওঁর সব ফার্নিচার তৈরী হয়ে এলে ফেরত নিয়ে এস, ডাক্তারের যদি তাই অভিপ্রায় হয়। মোট কথা যতদিন খুশি উনি ওগুলো ব্যবহার করতে পারেন।" সতীশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনোভাবটা কি তাহাই সম্ভবতঃ জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার মুখে কি ভাব ফুটিয়াছিল জানি না,

কিন্তু সতীশবাবু উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ ঠিক। ও ফার্নিচার একটিও আমরা রাখব না, আমাদের ফার্নিচার হয়ে গেলেই ফেরত দেব। এখন দিয়েছেন থাক, ওঁকে চটিয়েও তো লাভ নেই।"

সেইদিনই আমার বাড়ির সব ঘরে শতরঞ্জি বিছানা প্রভৃতি আসিয়া গেল। বৈঠকখানা ঘরটি চেয়ার টেবিলে সুশোভিত হইল। সেইদিনই সতীশবাবু হাট হইতে হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি কিনিয়া আমার সংসার গুছাইয়া দিলেন এবং সীতাপতি নামে একটি ঠাকুরও বাহাল করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "এখন ভগবানের দয়ায় আপনার নামডাক হয়েছে, রোজগারও হচ্ছে মা লক্ষ্মীর কৃপায়, এখন আর আপনার হাত পুড়িয়ে রান্না করাটা ভালো দেখায় না। ঠাকুর একটা রেখে দিলাম, ছোকরা ভালো লোক, সিপাহীতে বাহাল হয়েছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু দৌড়ঝাঁপের কাজ ভালো পারে না, তাই ওকে বরখাস্ত করেছিলেন মালিক। একে আমি জানি—স্পাই নয়। ও বলছে রান্নার কাজও ভালো পারে। দেখুন কেমন পারে। মাইনে এখন মাসে এক টাকা, দু'বেলা খাওয়া, জলখৈ (জলখাবার)—তা ছাড়া পূজা আর ফাগুয়াতে কাপড় গামছা নেবে। বলেছি যদি ভালো করে কাজ কর তাহলে কিছুদিন পরে তোমার মাইনে সওয়া টাকা করে দেব। তাতেই ও রাজী আছে। আপনার জন্যে একটা চাকরও দেখেছি। জাতে নাপ্‌তে। মধুয়া নাম। ওর বোনটাকে নিয়ে গ্রামে নানা কেলেঙ্কারি, তাই ওকে কেউ রাখতে চায় না। আমি বলেছি মাসে আট আনা করে পাবি, আর খেতে পাবি, ডাক্তারবাবুর ওখানে বহাল হয়ে যা। ওর মায়ের নিমোনিয়া আপনি সারিয়েছেন। সেজন্য কি কৃতজ্ঞতা আছে ব্যাটার? কিছুমাত্র নেই। দাঁত বার করে বললে—মাসে এক টাকা না পেলে পারব না হুজুর। বারো আনায় রফা করেছি। যদি ভালো কাজ করে এক টাকাই করে দেবেন।"

সীতাপতির চেহারাটি সুন্দর। রাজপুত্রের মতো। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ। বাসন্তীরঙে ছোপানো কাপড় পরা। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। গলার উপবীতটিও হলুদরঙের।

আমাকে বলিল—"কাম বাতা দিজিয়ে—"

"আজ তো ভোজ হবে। সতীশবাবু যা করতে বলেন তাই কর। কাল থেকে আমার রান্না করো।"

"জি—"

"তুমি ভাত ডাল তরকারি মোটামুটি তৈরি করতে পারবে তো?"

হঠাৎ সীতাপতি বাংলায় উত্তর দিল—"সোব পারি ডাকটারবাবু, চাঁপ, কাটলিস ভি।"

"বেশ।"

সেদিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া হইচই কাণ্ড চলিল। ত্রিপুরারি সিং স্বয়ং আসিয়া সেই হুল্লোড়ে মাতিয়া গেলেন। শিলু হালদার প্রকাণ্ড একটা গামলায় খুব ভালো করিয়া সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিবেশন করিতে ছিলেন। ত্রিপুরারি প্রকাণ্ড একটা গ্লাসের দুই গ্লাস পান করিলেন। ত্রিপুরারিবাবুর পারিষদবর্গের মধ্যেও অনেকেই দেখিলাম এ রসের রসিক। শিলু হালদার আমাকেও অনেক পীড়াপীড়ি করতে লাগিলেন। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম ত্রিপুরারিবাবু ভুরুর ইশারা দ্বারা শিলুবাবুকে প্ররোচিত করিতেছেন যাহাতে তিনি আবার আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি করিলেন। তখন আমাকে হাতজোড় করিয়া বলিতে হইল—"আমি ওসব কখনও খাইনি। আমাকে মাপ করুন আপনারা। খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ব।" শ্যামবাবু আসিয়াছিলেন—সেই দিনই তিনি প্রথমে আমার বাড়িতে আসিলেন। মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। তিনি নিমন্ত্রণ পাইয়া সন্ধ্যার পর আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত

আসিয়াছিল রেলের একচক্ষু-লণ্ঠন-হাতে একটি কুলি। ইহার পর প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার বাড়িতে আসিতেন। সঙ্গে থাকিত ওই একচক্ষু-লণ্ঠন-হাতে কুলি ফাগুয়া। শিলু হালদার তাঁহাকেও সিদ্ধি খাইবার জন্য সাধাসাধি করিতে করিতে লাগিলেন। শ্যামবাবু বলিলেন, "দেখুন, আমি মশাই মোটাসোটা মানুষ। সিদ্ধি খেয়ে যদি বে-এক্তার হয়ে পড়ি তাহলে কি যে করব তার ঠিক নেই। ছেলেবেলায় সিদ্ধি খেয়ে একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে কান মলেছি ওসব আর স্পর্শ করব না"—শ্যামবাবু আর একবার কান মলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লৌণ্ডা নাচও সেইদিন আমি প্রথম দেখিলাম। কিশোর দুইটি ছেলেকে মেয়ে সাজাইয়া রঘু্ঘু পাশমান সেদিন আসর জমাইয়া তুলিয়াছিল। আয়োজন বিশেষ কিছু ছিল না, সে নিজে ঢোলক বাজাইতেছিল আর একজন বাজাইতেছিল খঞ্জনি। তিন চার জন লোক আসরে বসিয়া গান গাহিতেছিল, একজনের গলা খুব সরু, আর বাকি তিনজনের বেশ মোটা। তাহাদের গানের সহিত মেয়েলী পোশাক পরা ছেলে দুইটি অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতেছিল। বেশ জমিয়াছিল। ত্রিপুরারি সিং রঘু্ঘু পাশমানকে নগদ দশ টাকা বখশিস দিয়াছিলেন। আমরা সেদিন রাত্রে যখন খাইতে বসিলাম তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ত্রিপুরারি সিংও স-পারিষদ আমাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিলেন। সকলের জন্য যাহা ব্যবস্থা হইয়াছিল আমাদের জন্যও তাহাই হইল। লুচি, কয়েক রকম নিরামিষ তরকারি, দই এবং কয়েক রকম মিষ্টান্ন। তবে আমাদের জন্য লুচি গরম ভাজিয়া দেওয়া হইল। দেখিলাম ত্রিপুরারি সিং বেশ 'খাইয়ে' লোক। প্রায় খান তিরিশেক লুচি ও সেরখানেক দই একাই খাইয়া ফেলিলেন। শিলু হালদারও দেখিলাম তাঁহার যোগ্য সহচব। তবে তিনি নীরব কর্মী। ত্রিপুরারি সিং প্রতিটি তরকারি, প্রতিটি মিষ্টান্ন তারিফ করিয়া খাইতেছিলেন, শিলু হালদার একটি কথা বলেন নাই। নিঃশব্দে মুখ চালাইতেছিলেন।

সেইদিনই সাড়ম্বরে আমার গৃহপ্রবেশ হইয়া গেল। সকলে যখন চলিয়া গেল, শেষ রাত্রে একা আমি যখন ত্রিপুরারি সিংহের দেওয়া পালঙ্কে শয়ন করিলাম তখন প্রথমে মনে পড়িল মাকে, তাহার পর বাবাকে। মায়ের কথাই বেশী মনে হইতে লাগিল। তখনই মনে হইল তাঁহারা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে আমার এই বাড়িতে আসিয়া সুখী হইতেন কি? যে আবহাওয়ায় যে পরিবেশে তাঁহারা বিচরণ করিতেন তাহা তো এখানে নাই। বাবা নিশ্চয়ই এখানে থাকিতে পারিতেন না। মা কি পারিতেন? দাদার বাড়িতে দাসীবৃত্তিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, এ বাড়িতে সর্বময়ী কর্ত্রী হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল কি? আর সেই লাল চেলি-পরা নববধূটি? যে শুভদৃষ্টির সময় একবার তাহার ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার পর মহাকালের নিষ্ঠুর বিধানে সে অকালে চিরতরে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। সকালে নব-নিয়োজিত পাচক সীতাপতির ডাকে ঘুম ভাঙিল। সে জিজ্ঞাসা করিল কি রান্না করিব। বলিলাম, "কালকের তরকারি কিছু আছে কি? সে বলিল, অনেক আছে। আলু, পটল, কুমড়ায় একটা ঘর নাকি ভরতি। বলিলাম, ভাত, ডাল আর আলু পটলের ডালনা বানাও, আর কুমড়োর ভাজি। মাছ যদি পাও, মাছেরও ভাজা আর ঝাল কোরো।" ঠাকুর চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

"বাইরের ঘরে অনেক রুগী এসেছে। আপনি আজ উঠতে অনেক দেরি করলেন দেখছি। টোপরা থেকে আর আমাদাবাদ থেকে কলও এসেছে দুটো। সমস্ত রাত মাতামাতি করে

মালিকের শরীরটাও একটু বিগড়েছে। আপনি টোপরা যাওয়ার আগে ওঁকে একটু দেখে যাবেন। খবর পাঠিয়েছিলেন।"

বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলাম অনেক রোগী বসিয়া আছে। আমার পুরাতন ডিসপেনসারি তখনও দেওয়ানজির গোয়ালঘরেই ছিল। তাহাদের লইয়া সেখানে গেলাম। রোগদের ঔষধও তখন আমাকেই প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। সুতরাং ফিরিতে দেরি হইল। টোপরা এবং আমদাবাদের রোগীদের বলিলাম আমি খাওয়াদাওয়া সারিয়া যাইব। তখনও ঘোড়া কিনি নাই, সাইকেল চড়িতেও জানিতাম না তাই গরুর গাড়ি করিয়াই যাইতে হইত। টোপরার রোগীর বাড়ি হইতে গরুর গাড়ি আসিয়াছিল। আমদাবাদের রোগী একটি ঘোড়া আনিয়াছিল। আমি ঘোড়ায় যাইব ঠিক করিলাম। টোপরার গাড়িতে আমার ঔষধের বাক্সটি লইয়া আমার নবনিয়োজিত চাকর মধুয়া গেল। মধুয়া খুব বুদ্ধিমান ছিল। প্রথম প্রথম আমার কম্পাউণ্ডারি ব্যাপারেও সে সাহায্য করিত। শিশি ধোয়া, দাগ কাটা, লেবেল মারা, পুরিয়া তৈরি করা, ইমালশান তৈরি করা প্রভৃতি কাজে পরে সে বেশ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার একমাত্র দোষ ছিল বড় কামাই করিত। সতীশবাবু যদিও তাহার মাহিনা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন মাসে বারো আনা, কিন্তু প্রায়ই সে আমার নিকট অগ্রিম কিছু লইত। তাহার পরই কামাই করিতে আরম্ভ করিত। লোক পাঠাইয়াও বাড়িতে তাহাকে পাওয়া যাইত না। তাহার পর হঠাৎ একদিন ফিরিয়া আসিত আবার। সমস্ত বকুনি নীরবে সহ্য করিয়া আবার কাজে লাগিয়া যাইত। কিছুদিন কাজ করিয়া ঘাড় চুলকাইয়া পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রিম চাহিত আবার। এইভাবেই সে আমরণ আমার কাছে কাজ করিয়া গিয়াছে। আমিই তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম, বিরু পৃথ্বীশ হওয়ার পর যে বছর প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিক হয় সেই বছরই মধুয়া সপরিবারে মারা যায়। তাহার অভাব বহুদিন অনুভব করিয়াছি। আজ জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছেন সেকালে মধুয়া আমার জীবনে কত অপরিহার্য ছিল। আজ তাহার কথা ক্বচিৎ মনে পড়ে। রোগীদের বিদায় করিযা ত্রিপুরা সিংকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম তেমন বিশেষ কিছু হয় নাই বলিলাম, ওযুধ খাবার দরকার নেই, আজকের দিনটা আপনি উপবাস করুন। বিছানায় শুয়ে বিশ্রামও করুন, কোথাও বেরুবেন না।" ত্রিপুরা সিং বলিলেন, "না খেলে তো ঘুম হবে না। চুপচাপ বিছানায় বসে থাকাও তো কঠিন। শিলুর সঙ্গে দাবা খেলি তাহলে। খুব যদি ক্ষিদে পায় মাছের ঝোল ভাত খেতে পারি?" আমি রাজী হইলাম না। বলিলাম, "আজ সমস্ত দিন জল ছাড়া আর কিছু খাবেন না। দাবা খেললেও বিশ্রাম হবে না। আপনি একটা ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন চোখ বুজে।" ত্রিপুরা সিং মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ডাক্তার না দারোগা? বেশ তাই হবে। চোখন তাহলে এসে গা হাত পা টিপুক আর গল্প বলুক। এতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।" চলিয়া আসিতেছিলাম এমন সময়ে ত্রিপুরা সিং বলিলেন, "নতুন বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এখন আপনার আর দেওয়ানজির গোয়ালঘরে বসে রোগী দেখা শোভা পাচ্ছে না। আপনার ঘরের লাগোয়া অনেকখানি জমি পড়ে আছে। ওইখানেই দু'খানা বড় বড় ঘর করিয়ে নিন। আমি দেওয়ানজিকে বলে দিয়েছি। বাঁশ খড় কাঠ যা লাগে তা আমরাই দেব। পাশেই পুকুর আছে, তার পাড় থেকে মাটি খুঁড়িয়ে চওড়া দেওয়াল উঠিয়ে ফেলুন। সতীশবাবুকে বলে দেব আমি, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" শুনিয়া অস্বস্তিবোধ করিয়াছিলাম। ধনী জমিদারের কোনও সাহায্য লইব না ইহাই মনে মনে ঠিক ছিল, কিন্তু ত্রিপুরা সিংকে বাধা দিব কি করিয়া? সতীশবাবুও চটিবেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়

হইয়া বাড়িতে ফিরিলাম। বাড়িতে গিয়া স্নান করিয়া ফেলিলাম তাড়াতাড়ি। বাড়ির উঠানেই একটি কুয়া ছিল। মধুয়া ঘড়ায় করিয়া জল তুলিয়া দিল। বলিল, গোটা দুই বড় বালতি সাহেবগঞ্জ হইতে আনাইতে হইবে। দেখিলাম একটি বড় জালা এবং কয়েকটি কলসী সে সকালেই কুমোরবাড়ি হইতে কিনিয়া আনিয়াছে। স্নান করিয়া খাইতে বসিলাম। সীতাপতি কিছু ন্যাকোট ভাত এবং একগাদা কুমড়োভাজা দিয়া গেল। মনে হইল একটা গোটা কুমড়াই সে ভাজিয়া ফেলিয়াছে। একটা বাটিতে খানিকটা গরম ঘি-ও দিয়া গেল। বলিলাম, ডাল আন। সে বলিল—আনছি। আজ তো ডাল নেই বাবু, ডালনা হয়েছে। একটু পরেই সে ডালনা লইয়া আসিল। দেখিলাম মসুর ডালেব ভিতর সে আলু পটল কুচাইয়া ছাড়িযা দিয়াছে। ডালনা বাক্যটির সহিত 'ডাল' যখন যুক্ত আছে তখন তাহা যে আব কিছু হইতে পাবে ইহা সীতাপতিব মাথায় আসে নাই। তাহাকে বলিলাম, বাঙালী ডালনা এরকম হয না। তবে খাইতে বেশ ভালোই হইয়াছে। তাহার পর সীতাপতি মাছভাজা এবং মাছের ঝোল লইয়া আসিল। বলিল, টিশন মাস্টার শ্যামবাবু বড় একটি রুইমাছ পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডুগি, তবলা, হার্মোনিযম এবং বেয়ালাও আসিয়াছে। শ্যামবাবু সন্ধ্যার পব আসিবেন। 'গানা বাজানা' হোবে।

আমি টোপরা এবং আমদাবাদ সারিয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন প্রায় রাত্রি দশটা। আসিয়া দেখি আসর গুলজাব। একজন হার্মোনিয়ম বাজাইতেছেন, আর একজন বেয়ালা, ডুগি তবলায সঙ্গত করিতেছেন সতীশবাবু। গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছেন আর একজন— "মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি"। শ্যামবাবু একধারে স্মিতমুখে তাঁহার বিরাট অস্তিত্ব লইযা বসিয়া আছেন। আমি প্রবেশ করিতেই হৈ-হৈ কবিয়া উঠিলেন সকলে। গান থামিযা গেল। সকলেই প্রায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলাম, একি আপনারা সব দাঁড়িয়ে উঠলেন কেন। গান চলুক। আমি কাপড়চোপড় বদলে আসছি। যেমন চলছে চলুক।

সেইদিনই সকলের সহিত পরিচয় হইল। যিনি বেহালা বাজাইতেছিলেন, তিনি কেশ মশাই। শ্যামবাবু বলিলেন, উনি সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারেন, এমনকি কর্নেট পর্যন্ত। তা ছাড়া নাচতে পারেন, গাইতে পারেন। আগে এক সার্কাসে জোকার ছিলেন, যাত্রাব দলেও ছিলেন কিছুদিন। কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখি স্টেশনের মুসাফিরখানায় বসে বেয়ালা বাজাচ্ছেন। সামনে একটা কাপড় বিছানো রয়েছে, আর লোক ঘিরে রয়েছে চারদিকে। কাপড়টার উপব পয়সা পড়েছে অনেক, কিন্তু সেদিকে কেশ মশায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমিও দাঁড়িয়ে শুনলাম কয়েক মিনিট। তারপর একটা আধুলি ফেলে দিয়ে আপিসে এসে বসলুম আর মোতায়েন করে দিলুম পয়েন্টসম্যান মথুরাকে যে ওঁর বাজনা শেষ হলে আমার কাছে যেন নিয়ে আসে ওঁকে। নিয়ে এল একটু পরে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললেন আমি মুসাফির। আমাদের দেশের লোক গুণের সমাদর করে। বেয়ালা বাজিয়েই আমার দিন চলে যায়। কাল রাত্রের ট্রেনে এখানে নেবেছিলাম গঙ্গা আর কুশীর সঙ্গমে স্নান করব বলে। আজ চলে যাব। আমাকে ডেকেছেন কেন? বললাম, আপনার বেয়ালা-বাজনায় মুগ্ধ হয়ে। আজই চলে যাবেন কেন? থেকে যান না দু'একদিন। আমরাও একটু-আধটু গানবাজনা চর্চা করি। আমি নিঃসন্তান, আমার বাসায় সন্ধ্যের সময় সবাই জমায়েত হয়ে একটু আনন্দ করি আমরা। আপনি আমার বাড়িতে থাকুন, যদি আপত্তি না থাকে। কেশ মশাই সেই থেকেই আছেন আমার বাসায়। কেশ মশাই হাসিয়া বলিলেন, আমার পুরো পরিচয়টা উনি দিলেন না। শুধু গানবাজনায় নয়, নেশাভাঙেও আমি ওস্তাদ। তবে পয়সা জোটে না। সন্ধ্যাবেলায় এক গুলি কালাচাঁদ সেবা করি আর সকালে এক

ছিলিম বড় তামাক। বলিয়া তিনি মিটিমিটি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছু দাড়ি গোঁফ ছিল। ঠোঁটের হাসিটা দেখা যাইত না। চোখ দুটি কেবল হাসিতে থাকিত। সে হাসি অপরূপ। গান গাহিতেছিলেন টিকিট কলেক্টার সুরেশ্বরবাবু। হার্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন শ্যামবাবুর দূর সম্পর্কের শ্বশুর জলধর গুপ্ত। সুরেশ্বরবাবু বেশ হাসিখুশী লোক। পরে জানিয়াছিলাম তাঁহারও কিঞ্চিৎ পানদোষ আছে। জলধর গুপ্ত গম্ভীর লোক। শ্বশুরোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। হাসির কথা উঠিলেই মাঝে মাঝে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিতেন। তিনি শ্যামবাবুর শুধু পোষ্য ছিলেন না, শ্যামবাবুর সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। হাটবাজার সমস্ত তিনিই করিতেন। তিনি নাকি শ্যামবাবুর স্ত্রীর মাসতুতো বোনের কাকা হইতেন। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিতেন না, বিবাহও করেন নাই। তাঁহার নিকটতম আত্মীয়স্বজনরা কেহই তাঁহকে আমোল দেন নাই। শ্যামবাবুরই স্ত্রীই তাঁহাকে ডাকিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভালো হার্মোনিয়ম বাজাইতে পারিতেন। যৌবনে শখের থিয়েটারের বাতিক ছিল বলিয়াই লেখাপড়া হয় নাই। সেই সময়েই হার্মোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। অদ্ভুত হার্মোনিয়ম বাজাইতেন। সীতাপতি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিয়া প্রশ্ন করিল, "ই বেলা ভি একঠো বড় মছলি এসেছে। আমি ভেজে রেখেছি। কিছু ঝোল করব কি?" শ্যামবাবু অপ্রতিভমুখে বলিলেন, "মহলদার এবেলাও একটা বড় রুই দিয়েছিল। এখানেই পাঠিয়ে দিলুম।" আমি বলিলাম, আমি একা কত খাব? ঠাকুর এক কাজ কর তাহলে। মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিয়ে এস। সবাই ভাগ করে খাওয়া যাক।" সতীশবাবু উঠিয়া পড়িলেন—"আমার কাছে মুড়ি আছে টাটকা। আজই কিনেছি। নিয়ে আসি সেটা তাহলে।" সেদিন স-তৈল মুড়ি সহযোগে গরম মাছভাজা তাহাই করিল যাহা অনেকদিনের চেষ্টাতেও হয় না। সকলেই আমার অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া গেলেন। হার্মোনিয়ম এবং ডুগি তবলার উপর মুড়ির বাটি রাখিয়া কলাপাতার উপর স্তূপীকৃত মাছভাজা হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া লইয়া সেদিন অনাড়ম্বর যে ভোজটা শুরু হইয়াছিল তাহা সেইদিনই শেষ হয় নাই। ইহার পর রোজই আমার বাড়িতে সান্ধ্য-আড্ডা জমিত। আমি বাড়িতে না থাকিলেও আড্ডাধারীরা ঠিক আসিয়া হাজির হইতেন, ঠাকুরকে ফরমাশ করিয়া আহারে ব্যবস্থাও তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লইতেন। কোনদিন মুড়ি, কোনদিন চিঁড়েভাজা, কোনদিন বেগনী, কোনদিন হালুয়া হইত। একদিন সীতাপতি আলুর 'চাঁপ'ও বানাইয়াছিল। ঢিপি ঢিপি আলু-পোড়া গোছের। প্রচুর ঝাল এবং পেঁয়াজ দিয়াছিল বলিয়া খাইতে খুব খারাপ হয় নাই। কেশ মশাই অনেকগুলি খাইয়াছিলেন এবং হাসিয়া বলিয়াছিলেন, সীতাপতি তুমি রাবণ বধ করেছ, কিন্তু আমাদের কিছু করতে পারবে না।

।। সাঁয়ত্রিশ।।

বিরুবাবু কয়েকদিন হইতে প্রত্যহ পোস্টাফিসে যাতায়াত করিতেছিলেন; অবশেষে তাঁহার প্রত্যাশিত চিঠিটি আসিল। লম্বা খামটি হাতে লইয়া তিনি হনহন করিয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেছিলেন। বাড়ির সামনে আসিয়া হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন এবং খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আর একবার পড়িলেন। তাহার পর আবার সেটা খামে পুরিয়া সূর্যসুন্দরের ঘরে

ঢুকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। আজকাল জাগিয়া থাকিলেও সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়া ছিল। সে মাথার কাপড়টা টানিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

"বাবা ঘুমুচ্ছেন না কি"—মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন বিরুবাবু।

সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"কে, বিরু, কিছু বলবে?"

বিরু সূর্যসুন্দরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন বিছানার উপর।

"হ্যাঁ, আমি বাবা চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।"

"ছেড়ে দিলে?"

"হ্যাঁ। আরও তিন বছব কাজ করতে পারতুম। পুরো কাজ করলে আমার পেন্সন কিছু বেশী হত। এখন রিটায়ার করলে শ তিনেক টাকা করে পাব। ভেবে দেখলুম ওতেই [illegible] চলে যাবে। তোমার কাছেই থাকি। চাকরি না ছাড়লে এখুনি গিয়ে আমাকে জয়েন করতে হবে। আমাব ছুটি পাওনা আছে অনেক, আমি রিটায়ার করবার আগে সেই ছুটিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। এক বছর ছুটির পর রিটায়ার করব এই লিখেছিলাম। আমার সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারব না এখন!"

সূর্যসুন্দর নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন বিরুর মুখের দিকে। ধীরে ধীরে একটা দুর্দান্ত বালকের ছবি তাঁহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে বালকের নাম ছিল [illegible], যে বোগীদের ঘোড়া চড়িয়া প্রায়ই পলাইত এবং সেজন্য শাস্তি ভোগ করিত.. ।

"উশনা বিজ্‌নেসম্যান (businessman), তার আমরণ ছুটি নেই। সে চলে গেল। সুব্রত সোমনাথও চলে গেছে, ওদের নতুন চাকরি বেশী ছুটি নেওয়া চলবে না। কেষ্ট-রঙ্গনাথ-সদানন্দও যাই-যাই করছে। ওদেরও বেশী দিন আটকে রাখা যাবে না। পৃথ্বীশ আছে বটে, কিন্তু থেকেও নেই। গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তাই ভাবলুম আমিই তোমার কাছে থাকব। আর চাকরি না-ই করলাম!"

"চাকরি ছেড়ে কি নিয়ে থাকবে?'

"নিজেকে নিয়েই থাকব। আমার বিশ্বাস এখানে পীবপাহাড়ের চারিদিকে যদি 'এক্‌স্‌ক্যাভেশান' (excavation) করা যায় তাহলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। আমি ওই নিয়েই লেখালেখি করব গভর্নমেণ্টের সঙ্গে। গভর্নমেণ্ট যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হন তাহলে আমি বিনা-বেতনে ওদের সাহায্য করব।"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"পীরপাহাড়ের চারদিকে খোঁড়াখুঁড়ি করলে এখানকার হিন্দু মুসলমান সবাই অসন্তুষ্ট হবে। তুমি তো জানই তোমার মা পীরবাবাকে কত মানতেন। পীরবাবার উপর খুব বিশ্বাস ছিল তাঁর। সকলেই এখানে পীরবাবাকে জাগ্রত দেবতা মনে করে। ওখানে কিছু করতে যেও না।"

বিরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিলেন। মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিয়া ফেলিলেন বাবা যখন বারণ করিতেছেন তখন ওকাজে হাত দেওয়া চলিবে না। মা সত্যিই পীরবাবাকে খুব ভক্তি করিতেন। একটা চিত্র সহসা তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিল। বিরু পাস করার পর মা পীরবাবাকে শিন্নি দিয়াছিলেন। গোবিন হালুয়াই সওয়া দশ টাকার জিলাপি ভাজিয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী সকলকে লইয়া পীরপাহাড়ে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল টকটকে লাল পাড়

গরদ। পিছু পিছু বাড়ির ছেলেমেয়েরা তো ছিলই, আর ছিল পাড়ার ছেলেমেয়েরা। রাজলক্ষ্মী মাঠ হইতে রাখালদের এবং চাকরবাকরদেরও ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। বিরুবাবু কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইলেন—রাজলক্ষ্মীর পিছু পিছু একটা বিরাট মিছিল চলিয়াছে। মিছিলের পিছনে গোবিন হালুয়াইয়ের বড়ছেলে রামকিষুণ। তাহার মাথায় জিলাপির ঝুড়ি। বিরাট ঝুড়ি। সেকালে সওয়া দশ টাকায় অনেক জিলাপি পাওয়া যাইত। পীরপাহাড়ের উপর পীরবাবার কবরেব কাছে একটি ছোট কুঁড়েঘরে বাস করিত একজন শীর্ণকায় ফকির। তাহার গলায় রুদ্রাক্ষেব এবং বহুবর্ণের পাথরের নানারকম মালা থাকিত। রাজলক্ষ্মী বহুপূর্বে তাহাকে একটি বদনা এবং গেরুয়া আলখাল্লাও কিনিযা দিয়াছিলেন। তাই রাজলক্ষ্মী 'শিরণি' দিতে আসিলে সে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিত। খুব ঘটা করিয়া 'উজু' করিত, তাহার পর নামাজ পড়িত। তাহার শীর্ণ মুখে সত্যই একটা পবিত্র ভক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিত। রাজলক্ষ্মী তাহাকে আট আনা পয়সা এবং কিছু জিলাপি দিতেন। তাহার পর সকলের হাতে একটি একটি করিয়া জিলাপি দেওয়া হইত। পীরপাহাড়ে গিয়াই সকলকে রাজলক্ষ্মীর নির্দেশে হাঁটু গাড়িয়া পীরবাবাকে প্রণাম করিতে হইত। এই ছবিটা বিরুবাবুব মনে আসিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিক করিয়া ফেলিলেন পীববাবা প্রোজেক্ট (project) তাঁহাকে বর্জন করিতে হইবে। আর একটা 'প্রোজেকট'ও তাঁহার মাথায় আছে। কিছু জমি লইয়া মসলার চাষ করা। সাধারণতঃ লোকে ধান, গম, যব, ছোলা, মটব প্রভৃতি চাষ করে, বিরুবাবাব ইচ্ছা কালোজিরা, ধনে, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি মসলা আবাদ করিবেন। অল্প জমিতে বেশী লাভ হয় নাকি তাহাতে। কিন্তু এসব ব্যাপারে কুমাবের পবামর্শ লইতে হইবে। অনেক দিন আগে এসব বিষয়ে তিনি কিছু বই কিনিয়া কুমারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কুমার সেগুলি পড়িয়াছে কি? বিরুবাবু আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত কবিয়া রহিলেন। হঠাৎ খুব আনন্দ হইল তাঁহার। মনে হইল বাবার ব্রেন (brain) তো বেশ ক্লিয়ার (clear) আছে। বলিলেন, "তাহলে ওসব ব্যাপারে আর যাব না। কুমারের সঙ্গে চাষই করব—"

ইহার উত্তবে সূর্যসুন্দব যাহা বলিলেন তাহাতে বোঝা গেল তাঁহার ব্রেন সত্যই বেশ ক্লিয়ার আছে।

"চাষ করবে? চাষের তো তুমি কিছু জান না। সব জিনিসেরই একটা ট্রেনিং চাই। আমাব মতে তুমি এখন চাকরি ছেড়ো না। ছুটি নাও।"

"ছুটি নিতে হলে এখনই গিয়ে জয়েন করতে হবে। তারপর ছুটি পাব। এখন এখান থেকে যাবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি আপিসে খবর নিয়েছিলাম। তাই ঠিক করেছি আর কাজে জয়েন করব না। আমার যতটা পাওনা ছুটি আছে ওরা দিয়ে দিক। আজ চিঠি এসেছে ওরা তাতে রাজী আছে—।"

বিরু আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সূর্যসুন্দব বুঝিলেন বিরু আপিসের সহিত ঝগড়া করিয়াছে। আর কাজে যোগদান করিবে না। হঠাৎ তিনিও খুব আনন্দিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে। হঠাৎ যেন একটা ভরসা পাইলেন। আর কেউ না থাকুক বিরু শেষ পর্যন্ত থাকিবে। একবার মনে হইল না-ও যদি থাকিত, কি হইত তাহা হইলে? মৃত্যুর পর কে মুখাগ্নি করিবে, কে শেষ সময় মুখে গঙ্গাজল দিবে, কে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইবে এই ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিয়া বিরুর চাকরির ক্ষতি করাটা কি সমীচীন? কিন্তু বিরু তো কাহারও কথা শুনিবে না! হঠাৎ তাঁহার আবার মনে হইল শেষ

সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে মুখাগ্নি না পাইলে তাঁহার আত্মা কি তৃপ্ত হইবে? তৃপ্তি অতৃপ্তি ভোগ করিবার মতো কোনও অনুভূতিশীল মন কি মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকে? এ প্রশ্নের নির্ভুল সুনিশ্চিত উত্তর কেহ জানে না। সূর্যসুন্দর নিজের মনের গহনে তলাইয়া গেলেন। এক সাধুর কথা মনে পড়িল—তিনি বলিয়াছিলেন আত্মার মৃত্যু নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে আত্মা সুখ-দুঃখে বিচলিত হয় না। তবে? কিন্তু এসব দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি এক অপরূপ মাধুর্যের সমুদ্রে ধীরে ধীরে যেন তলায়িা গেলেন। বিরু শেষ পর্যন্ত থাকিবে—এই পরম আশ্বাসের আনন্দ তাঁহার চেতনাকে প্লাবিত করিয়া দিল। তিনি অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—বেঁচে থাকো, সুখী হও'।

ঊর্মিলা একটা গল্পের বই পড়িতেছিল।

সে একটু ঝুঁকিয়া প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বাবা কিছু বলছেন?"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

।। আঠত্রিশ।।

যেদিন ঘণ্টুর জন্মতিথি উৎসব হইয়া গেল তাহার পরদিনই সে ফিরিয়া যাইতে চাহিল। বলিল, "আর তিন দিন মাত্র ছুটির মেয়াদ। পথেই সে তিন দিন কেটে যাবে। আমাদের ছুটি দেয় না, বাবা চিঠি না দিলে ছুটি পেতাম না।"

কিরণ জানিত না যে কৃষ্ণকান্ত ছেলের ছুটির জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া কিরণ বলিল—"তুমি তো ঘুণাক্ষরে এ কথা বলনি আমাকে।"

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি ছুটি না পেত, তাহলে আমি বেকুব বনে যেতাম। মন্ত্রগুপ্তি বুদ্ধিমানরাই করে থাকে—"

"তোমাকে সায়েব যখন অত খাতির করে তখন লেখ না তাকে ছুটি বাড়িয়ে দিক আরও দু'চার দিন।"

"দড়ি বেশী টানলে ছিঁড়ে যায়। চল ঘণ্টু, দেখি তোর হাতের টিপটা কেমন হয়েছে! চল বেরোনো যাক। বেলা বেশী হয়নি, মোটে দশটা— "

"এখানে চাঁদমারি কোথাও আছে নাকি।"

"হাতের টিপ দেখবার জন্যে চাঁদমারির দরকার হয় না। চল বেরিয়ে পড়ি, লক্ষ্যবস্তু একটা-না-একটা পাওয়া যাবেই।"

কিরণ বলিল, "কোথায় যাচ্ছ ওকে নিয়ে এখন আবার।"

"কোথাও যাচ্ছি না। এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াব একটু।"

"চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।"

"চল আপত্তি নেই।"

তাহারা তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুদুর গিয়া দেখা গেল গঙ্গার ধারে যে বড় শিমুল গাছটা আছে তাহার মগডালে একটা রঙিন ঘুড়ি আটকাইয়া আছে।

"ওই তো চাঁদমারি। উড়িয়ে দাও দিকিন ঘুড়িটাকে!"

কৃষ্ণকান্ত ঘণ্টুর হাতে নিজের রাইফেলটা দিলেন। ঘণ্টু অনেকক্ষণ ধরিয়া 'তাক' করিয়া ফায়ার করিল। ঘুড়িটা শাখাচ্যুত হইয়া গেল বটে, কিন্তু পড়িল না। হাওয়ায় উড়িতে লাগিল।

"বাঃ! জীবন্ত 'কাইট' হলে পড়ে' যেত। মারবে নাকি একটা জীবন 'কাইট'? ওই তো উড়ছে"

কিরণ যে দৃষ্টি মেলিয়া ঘণ্টুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল তাহা অবর্ণনীয়। এ কথা শুনিয়া কিরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"শুধু শুধু জীব-হত্যে করে কি হবে।"

"দরকার নেই তাহলে। চিল খাওয়া যায় না, সত্যিই তো। চল তাহলে বাগানের দিকে যাওয়া যাক, যদি খাদ্য কিছু সংগ্রহ করতে পারি।"

"খাদ্যের অভাব আছে নাকি বাড়িতে। আজ ভালো মাছ পায়নি, কুমার তাই খাসির মাংস আনিয়েছে। কত খাবে!"

"ও বাবা, আজ মাছ নেই নাকি। আমরা 'মচ্ছিখোর' বাঙালী আমাদের মাছ না হলে চ'লে? চল মাছেরই চেষ্টা করা যাক—"

"তুমি আবার মাছ কি করে পাবে এখন?"

"বাহুবলে। চল কুমারের পুকুরটার দিকে যাওযা যাক। সেখানে সদানন্দ বসে' আছে নিশ্চয় ছিপ নিয়ে।"

"হ্যাঁ। ও তো একগাদা বাটা ট্যাংরা পুঁটি ধরে নিয়ে যায় রোজ। আর উষা তাই দিয়ে ঝাল করে। ও সব কাঁটার কুণ্ডু মাছ আমি খেতে পারি না বাপু। উষা কিন্তু খুব তারিয়ে তারিয়ে খায়। ও একটা বেরাল!"

কুমারের পুকুরের দিকে তাহারা হাঁটিতে লাগিল।

হঠাৎ কিরণ বলিল—"তোর সঙ্গে যদি ভালো ঘি দিয়ে দিই আলাদা খেতে পারবি?"

"আমরা মেসে খাই। সেখানে আলাদা আমি খাব কি করে? তা ছাড়া সঙ্গে ঘি নিয়ে যাওয়া কি সোজা বখেড়া?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "জননীর অন্তরে শান্তিদান করবার জন্যে বখেড়া সহ্য করা উচিত। মাকে খুশী করবার জন্যে বিদ্যাসাগর দামোদর সাঁতবেছিলেন। তুমি ঘি-টা নিয়ে যাও, বাক্সে বন্ধ করে রোখো আর যখন কেউ থাকবে না, তখন একটা চামচে দিয়ে একটু বার করে নিয়ে চিনি দিয়ে চট্ করে খেয়ে নিও। কি বল, বুদ্ধিটা ভালো দিই নি।"

ঘণ্টু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিরণ বেরসিক নয়। সেও হাসিয়া ফেলিল। কেবল মন্তব্য করিল—"সব তাতেই ইয়ার্কি!"

হঠাৎ ঘণ্টু দাঁড়াইয়া পড়িল।

"বাবা, দেখ দেখ কি সুন্দর শাদা ঘুঘু এক জোড়া।"

"হ্যাঁ। ওব নাম হচ্ছে ধাবাল। ধবল থেকে হয়েছে বোধহয়। তোমার মা ওর খুব ভালো রোস্ট করত এককালে। দিল্লী থেকে আগরা যাওয়ার রাস্তায় প্রচুর আছে। খাবি রোস্ট?"

"না, না, এখন ওসব থাক। বাড়িতে এত লোকজন দু'একটা ঘুঘুতে কি হবে।"

পুকুরের কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইল পুকুরপাড়ে সদানন্দ তো আছেই—উষাও আছে।

সদানন্দের দৃষ্টি ফাতনায় নিবদ্ধ। উষা বকবক করিতেছে।

"মাসীমা আমরাও এসে গেছি—"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "সদানন্দ কি রকম অবতার-নিধন করছে দেখতে এলুম।"

"অবতার-নিধন মানে?"—ঊষা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল।

"ভগবান যে মৎস্য অবতার হয়েছিলেন তা বুঝি জানা নেই ঠাকরুনের! তাই তো খেতে অত ভালো।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও আমরা ভগবানকে খাই?"

"শ্রদ্ধাস্পদকে খাওয়াই তো প্রাচীন নিয়ম। ক্রীশ্চানদের ইউক্যারিস্ট (Eucharist) উৎসবে তাঁরা যখন মদ খান তখন সেটাকে যীশু খ্রিস্টের রক্ত মনে করে খেতে হয়। বড়দা এ বিষয়ে অনেক জ্ঞানদান করতে পারবেন, তিনি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র। এখন থাক ওসব কথা—কি মাছ পেয়েছ দেখি?"

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"সব চুনো পুঁটি। এ পুকুরে বড় বড় রুই কাতলাও আছে, কিন্তু তারা কেমন যেন বুনো গোছের। টোপ গিলতে চায় না। ল্যাজটা দেখিয়ে চলে যায় শুধু। অথচ, বাংলা দেশে আমাদের পুকুরে বড় বড় রুই কাতলা ধরেছি। এরা কেমন যেন বুনো গোছের!"

"তাই নাকি?"

"তাই তো দেখছি। ওই দেখুন, বুড়বুড়ি কাটছে, ওটা খুব বড় মাছ।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন সেদিকে। তারপর রাইফেলটা তুলিয়া হঠাৎ ফায়ার করিয়া দিলেন একটা। অপ্রত্যাশিত শব্দে চমকাইয়া উঠিল সকলে।

"ওটা কি হল!"

"বুনো জানোয়ারকে যেভাবে ঘায়েল করি বুনো মাছকে সেভাবে ঘায়েল করা যায় কি না দেখলাম।"

হঠাৎ পুকুরের জলে একটা আলোড়ন হইল। প্রকাণ্ড বড় একটা রুই লাফ দিয়া উঠিয়া আবার জলের তলায় তলাইয়া গেল।

"মনে হচ্ছে লক্ষ্য ভেদ করেছি। একটু পরেই ভেসে উঠবেন বাছাধন। কিন্তু জল থেকে মাছটাকে আনবে কে! কেউ সাঁতার জানে?"

কুমার যে ছোঁড়াটাকে সদানন্দের কাছে থাকিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল সে আগাইয়া আসিল।

"হ্যাঁ, জানেইছি।"

"তবে বসে লক্ষ্য কর মাছটা ভাসল কি না—ভাসলেই টানতে টানতে নিয়ে আসবি। জল থেকে তুলিস না যেন বেশী ভারী লাগবে।"

ছোঁড়াটা পুকুরপাড়ে ছুঁচলো মুখে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে জানে মাছটা তুলিয়া আনিতে পারিলে জামাইবাবু বখশিশ দিবেন।

কৃষ্ণকান্ত তখন সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ঘণ্টুর ছুটি ফুরিয়ে গেল, সে চলে যাচ্ছে। আমারও ছুটি ফুরিয়েছে, আমিও দিন চারেক পরে রওনা হব। তুমি তো কারো চাকরি কর না, থেকে যাও এখানে ক'দিন আরও। আমি গিয়ে তোমাকে মাছ-ধরা সম্বন্ধে ভালো বিলিতী বই পাঠিয়ে দেব একখানা। ভালো ছাপা, অনেক ছবি আছে—"

"বিলিতী মাছ—কার্প, স্টারলিং, মেকেরেল আমি ধরেছি। ওদের হ্যাবিটস্ (habits) কিন্তু আলাদা রকম—এদেশের মাছ বিলিতী বই পড়ে ধরা যাবে না।"

"আরে না না। এদেশের রুই কাতলা মিরগেল, বাটা এদের সম্বন্ধেই বইটা লিখেছেন এক সাহেব। মাগুর, শিঙি, আড়, চিতল সব রকম মাছের কথাই আছে তাতে। কাছিমের সম্বন্ধেও একটা চ্যাপটার আছে। সাহেবের নামটা মনে পড়ছে না। একটা কথা জেনে রাখ, এদেশের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য জিনিস আমরা সাহেবদের মারফতই পেয়েছি। পশু-পাখি, গাছপালা, পোকামাকড়, দেব-দেবী, বেদ-পুরাণ, এদেশের আধিবাসীদের পরিচয়, এদেশের ভাষা-বিজ্ঞান সব জেনেছি আমরা ওদের কাছ থেকেই। সেদিন দেখলাম একটা দেশী রান্নার বইও বেরিয়েছে, তাতে আমাদের সুক্তোর কথাও আছে।"

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "সবই মানছি দাদা। কিন্তু ওরা আমাদের এত অত্যাচার করেছে, মনে মনে ওরা আমাদের এত ঘৃণা করে যে ওদের হাতে মোওয়া খাবার প্রবৃত্তি হয় না। ওদের লাথি জুতো ঝাঁটার সঙ্গে ওদের তথাকথিত সংস্কৃতির মিল দেখতে পাই না। তাই ঘেন্না ধরে গেছে!"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"তোমার কথা শুনে সুখী হলাম। কিন্তু তবু বইটা তোমায় পাঠিয়ে দেব। উলটে পালটে দেখো একবার। কিন্তু যে কথা তোমায় বলছিলাম কথায় কথায় তার থেকে সরে এসেছি। তোমার বড় শালীটিকে একটু সদুপদেশ দাও দিকি। ও তোমাকে খুব ভক্তি করে। আমি ওকে বলছি—তুমি তো চাকরি কর না, তুমি বাবার কাছে থাক না কিছুদিন। আমার সঙ্গে তোমার ফিরে যাবার দরকার কি। সেটা কি ভালো দেখাবে? রঙ্গনাথও আমার সঙ্গে যাবে বলছে, কিন্তু কই সন্ধ্যা তো তার সঙ্গে যাচ্ছে না। সে বলছে এখানে গ্রামে সে যে নারীকল্যাণ সমিতি করেছে তার একটা পাকা বনিয়াদ না করে সে যাবে না। কিরণ তো ওদের সভায় মস্ত বক্তৃতা করেছিল। প্র্যাকটিক্যালি ওই প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, ওর কি উচিত এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ ফেলে স্বামীর পিছু পিছু উদ্বাহু হয়ে ছোটা? তা ছাড়া বাবার চেয়ে স্বামী বড় প্রকাশ্যভাবে সেটা ডেমনস্ট্রেট (demonstrate) করা কি শোভন?"

কিরণ বলিল—"যেতে চাইছি সাধে? ঘণ্টুকে ছেড়ে আমি বরং নিশ্চিন্ত থাকতে পারি কিন্তু ওঁকে ফেলে পারি না। উনি ঘণ্টুর চেয়েও ছেলেমানুষ। তা ছাড়া খামখেয়ালী, জেদী আর হুজুকে। এখনও জোর করে নাওয়াতে হয়, খাওয়াতে হয়। আমি যদি সঙ্গে না যাই নাওয়া-খাওয়াই ভুলে যাবেন। গায়ের গেঞ্জি পর্যন্ত ছাড়বেন না। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন খালি!"

"জঙ্গলে ঘোরাই তো আমার চাকরি। দিনরাত খুঁটোয় বাঁধা থাকলে কি চলে?"

ঊষা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। সে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"কি হল—হঠাৎ হাসবার কারণটা কি?"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া ঊষার দিকে চাহিলেন।

ঊষা হাসিতে হাসিতেই জবাব দিল—"দিদিকে খুঁটি বললেন কি বলে! দিদির মতো নরম মানুষ কি আর আছে?"

"আমি তো শক্ত খুঁটি বলিনি, খুঁটি নরমও হতে পারে। ইল্যাস্টিকও হতে পারে। কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না, যতদূর যাও যেখানে যাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সাবিত্রী এ বিষয়ে রেকর্ড রেখেছেন,

তিনি যমের পিছু পিছুও ধাওয়া করেছিলেন। শক্ত খুঁটি এক হিসেবে ভালো, তা উপড়ে ফেলা যায়, কিন্তু নরম খুঁটি না-ছোড়! কি বল সদানন্দ, তোমার অভিজ্ঞতা—"

"আমার অভিজ্ঞতা স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখাই ভালো। দূরে দূরে থাকলেই ঝামেলা বেশী হয়।"

"তুমিও তাহলে যখন যাবে উষাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

"উষা যা বলবে তাই করবো। আমার মটো (motto) হচ্ছে—'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন' গোছের। রেজিস্ট (resist) করে লাভ নেই—"

"আমাকে নইলে ওর চলে নাকি একদণ্ড"—উষা ফোঁস করিয়া উঠিল—"তাই ওই 'মটো'! আমাকে দিয়ে পা টেপায়, তামাক সাজায়, পান সাজায়। অপরের হাতের সাজা পছন্দ হয় না। রাত্তিরে ঘুম না হলে তাস খেলতে হয় ওর সঙ্গে বসে। দোকানে লোক-দেখানো যান একবার দশটা নাগাদ। আবার একটা নাগাদ ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগান চারটে পর্যন্ত। আপিসে গিয়ে ফোন করে রান্নার ফরমাশও দেওয়া হয়। আজ সুক্ত কোরো, আজ পোস্ত কোরো, আজ পলতা দিয়ে ব্যাসন কোরো। বিকেলে পাঁচটায় দোকানে গিয়ে আবার আটটা নটা নাগাদ ফিরে এসে বলেন—চলো যাত্রা দেখে আসি আজ। খুব ভালো একটা পালা নাবিয়েছে পাঁচু। উনি সিনেমা দেখতে চান না, যাত্রা পছন্দ করেন, আর আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে হয়। কারণ বাড়ির আর কেউ যেতে চায় না—"

কিরণ বলিল—"ভগবান তোকে সুখ দিয়েছেন ভোগ করে নে। আমার মতো একটা দুর্দান্ত লোককে যদি সামলাতে হ'ত তাহলে বুঝতিস—"

কৃষ্ণকান্ত উর্ধ্বমুখ হইয়া চিবুকের নিম্নভাগটা চুলকাইতে লাগিলে। সদানন্দের চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থির হাস্য নীরবে চিকমিক করিতে লাগিল।

হঠাৎ সেই ছোঁড়াটা চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবু মছলি ভাসলো।" পরমুহূর্তেই সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এবং আরও কয়েক মিনিট পরে প্রকাণ্ড একটা রুই মাছকে টানিতে টানিতে ডাঙায় তুলিয়া ফেলিল। রুই মাছটা ডাঙায় উঠিয়াও একটা লাফ দিয়া পাশের ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। সেখান হইতে সেটাকে কৃষ্ণকান্তই টানিয়া বাহির করিলেন।

"এই নাও। সের পাঁচেক হবে—"

"এ তো আপনি আশ্চর্য কাণ্ড করলেন দাদা। আমি দিনের পর দিন এসে ধন্না দিয়ে বসে খালি চুনো পুঁটি তুলে যাচ্ছি, আপনি একটা ফায়ারেই পাঁচ সের একটা রুই ঘায়েল করে ফেললেন। বাঃ!"

স্বামীগর্বে কিরণের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বলিল, "তুমি একবার আমাদের ওখানে এস না। বড় বড় হরিণ মেরে খাওয়াবেন তোমাকে। একবার কি প্রকাণ্ড একটা হরিণ মেরে এনেছিলেন—শহরসুদ্ধ সবাইকে মাংস বিলিয়ে শেষ করতে পারি না। না রে ঘণ্টু, তুই তো তখন ছিলি। হরিণের জিবটা দিয়ে উনি কি একটা বিলিতী খাবার তৈরী করলেন বই দেখে। ঘণ্টু কোথা গেলি তুই।

ঘণ্টু একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছিল।

মায়ের ডাকে সেটা ফেলিয়া দিয়া কাছে আসিল।

"কি বলছ? বাঃ, চমৎকার মাছটা তো। দমপোক্ত কর মা আজকে—।"

"বেশ, চল এবার ফেরা যাক তাহলে তাড়াতাড়ি। এত বেলায় দমপোক্তর ফরকট্ তুললে বউদি আবার রাগ না করে। ঘণ্টু তুইই তোর পিসিকে বলিস। তোকে বড্ড ভালবাসে ও।"

ঘণ্টু বলিল—"রাঁধবে কিন্তু তুমি। ও রান্নাটা তোমার হাতে চমৎকার ওতরায়।"

ঊষা ফোড়ন কাটিল—"দমপোক্ত বল আব যাই বল—কাঁচা লঙ্কা সরষেবাটা দিয়ে গরগরে ঝালের কাছে কেউ দাঁড়াতে পাবে না। আমি মাছের ঝাল করব। খেয়ে দেখিস—"

কৃষ্ণকান্ত ছোঁড়াটাকে নগদ এক টাকা বখশিস দিলেন।

"তুইও আজ খাবি চল আমাদের সঙ্গে। মাছটা নিয়ে যেতে পারবি?"

"হাঁ।"

মাছটা সে কাঁধেব উপর তুলিয়া লইল।

সদানন্দ ঊষাকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—কড়কড়ে কবে ভাজাও কোরো খানকয়েক। আমি কলকাতার লোক, ভাজাটাই আমার বেশী পছন্দ।"

ঊষা মুখ টিপিয়া বলিল, "তুমি না বললেও সেটা আমি করতাম!"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

।। ঊনচল্লিশ।।

চন্দ্রসুন্দর পূজা কবিতেছিলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার উদ্দাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শিব-স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন তিনি। রাধানাথ গোপ একটি চিঠি হাতে করিয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কাজ কমিয়া গিয়াছে। সূর্যসুন্দরের অসুখের সংবাদে বিচলিত হইয়া যে সব লোক বাহিরের নবনির্মিত চালা-ঘরগুলিতে সমবেত হইয়াছিল তাহাদের ভিড় কমিয়া গিয়াছে। যাহারা সত্যসত্যই চিন্তিত বা শঙ্কিত হইয়া আসিয়াছিল তাহারা আসিয়া খবর লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন মুশকিল হইয়াছে একদল বেকার লোককে লইয়া। দশ বারোজন লোক সর্বদাই ওখানে বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে ভিখারীও আছে দুই চারিজন। রাধানাথ গোপ হয়তো তাহাদের ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিতেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, উহারা যতক্ষণ বসিয়া থাকিতে চায় থাক। উহারা আমার আপন লোক বলিয়াই আসিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকের সহিত ভদ্র ব্যবহার কবিতে হইবে। সুতরাং কুমারকে আরও কিছু চিঁড়া এবং গুড় যোগাড় করিতে হইয়াছে। চিঁড়া-গুড় বিতরণ করিবার সময় গঙ্গার মেজাজ ক্ষণে ক্ষণে বিগড়াইয়া যাইতেছে। এজন্য সে দায়ী করিয়াছে রাধানাথ গোপকে। বলিতেছে—ওই লোকটা যদি এখানে 'ধরমশালা' না বানাইত তাহা হইলে এ উৎপাত হইত না। কুমার আড়ালে তাহাকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বার বার বলিতেছে এসব কথা যেন রাধানাথবাবুর কানে না যায়। গঙ্গা যদি চিঁড়া-গুড় পরিবেশন করিতে ক্লান্তি বোধ করে, খন্তা বা শান্তার উপর সে ভার দিলেই হয়। গঙ্গা ইহাতেও রাজী নয়। সে বলিতেছে—তাহলে তোমার ওই আধমণ চিঁড়া দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। খন্তা বা শান্তার বাড়িতে গিয়া হাজির হইবে সে সব। আমি ওদের চিনি না? সুতরাং গঙ্গাই গজগজ করিতে করিতে চিঁড়া-গুড় লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। একটা লোক চিঁড়া-গুড়

গামছায় বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। গঙ্গা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, এখানে বসিয়াই খাইতে হইবে। সে লোকটি গামছায় গিঁটের পর গিঁট বাঁধিতে লাগলি, কয়েক মিনিট কোনও উত্তর দিল না। তাহার পর বলিল, ডাক্তারবাবুকে বলিয়া দিও আমি কিষুণপুরের ঠাকুর সা। পূজা না করিয়া খাই না। আজ সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছি—পূজা করিতে পারি নাই। গঙ্গা বিরক্ত সুরে প্রশ্ন করিল—আজ সকাল সকাল আসিবার এত তাড়া কি ছিল? পূজা করিয়া আসিলেই পারিতে। ঠাকুর সা উত্তর দিল, আজ ভোরে স্বপ্ন দেখিলাম যেন সূরজ (সূর্য) অস্ত যাইতেছে। ডাক্তারবাবু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাই আজ উঠিয়াই ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া আসিয়াছি। ডাক্তারবাবু আমার দিলি দোস্ত (অকৃত্রিম বন্ধু) তোমার বাবা আমাকে চিনিত। তুমি চেন না। তাই এ কথা বলিবার মতো সাহস তোমার হইয়াছে। আমার ঘরে চিঁড়া মুড়ি ধান চাল ছাতুর অভাব নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবুর বাড়ির অন্ন আমার কাছে অমৃততুল্য। তাই বহিয়া লইয়া যাইতেছি। এ সূরজ (সূর্য) অস্ত গেলে আর উঠিবে না। তাই যতক্ষণ আছে একবার করিয়া খবর লইয়া যাই। লোকটি এই কথাগুলি বলিয়া গঙ্গার প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিল। তাহার পর উঠিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে মেদিনীপুর গ্রামের ছেদি বলিল, গঙ্গা তুমি আমাদের মতো 'হরহরা' সাঁপকে (হেলে সাপকে) অপমান করিয়া পার পাইয়া গিয়াছিলে, কিন্তু আজ তুমি গহুম্‌নার পুঁছড়িতে (গোখরোর ল্যাজে) পা দিয়াছ। আমরা গরীব মানুষ ডাক্তারবাবুর দৌলতে যদি দু'চার দিন খাইতে পাই তোমার তাহাতে এত রাগ কেন। গঙ্গা কোন উত্তর না দিয়া চিঁড়া ও গুড়ের ঝুড়িটা তাহাদের মাঝখানে নামাইয়া দিল—খাও খাও, যার যত খুশি খাও। আমি চলিলাম। দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাধানাথ গোপ বারান্দায় বসিয়া চন্দ্রসুন্দরের উদাত্ত কণ্ঠে নানা দেবতার মহিমা-কীর্তন শুনিতেছিলেন। বড় ভালো লাগিতেছিল তাঁহার। চন্দ্রসুন্দর খুব ভালো আবৃত্তি করিতে পারেন। এ অঞ্চলের সমস্ত ছাত্রদের আবৃত্তি তিনিই শিখাইয়াছেন। তাঁহারই শেখানো আবৃত্তি বিরুকে একদা এই জেলায় প্রসিদ্ধ করিয়াছিল। পরীক্ষকরাও তাহার আবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'ফুল মার্কস্' দিয়াছিলেন। সেকালে মাইনর প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় আবৃত্তিও একটা বিষয় ছিল। চন্দ্রসুন্দরের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে রাধানাথ গোপ অতীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সেকালের সেই ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্টার বিভুধন মণ্ডলকে তিনি যেন আবার দেখিতে পাইতেছিলেন। একটু বেঁটেখাটো মোটাসোটা হাস্যমুখ বিভুধন মণ্ডল ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চান ছিলেন। রাধানাথ শুনিয়াছিলেন বিভুধন মণ্ডলরা নাকি সাঁওতাল ছিলেন আগে। ক্রীশ্চান মিশনারিদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা খ্রিস্টধর্ম বরণ করেন। কিন্তু অতিশয় ভালো লোক ছিলেন তিনি। তাঁহার হাস্যময় উদার সদ্ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় রাধানাথকে নির্বাচন করেন নাই, তবু কিন্তু রাধানাথ তাঁহার সুমিষ্ট স্নেহময় ব্যবহারের জন্য আজও তাঁহাকে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রাধানাথ অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার স্কুল-জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু এবং চন্দ্রবাবুর চেষ্টায় এখানে মাইনর স্কুল হয়, কিন্তু ইঁহারা কখনও স্কুলের গায়ে নিজের নামের লেবেল লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। দুই একজন ডাক্তারবাবুর নাম প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাতে রাজী হন নাই।

......হঠাৎ চন্দ্রসুন্দরের স্তবপাঠ বন্ধ হইয়া গেল। রাধানাথ বুঝিলেন পূজা সমাপ্ত হইয়াছে।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রসুন্দরও বাহিরে আসিলেন। পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপালে চন্দনের টিপ। রাধাকান্তকে দেখিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন।

"কি, রাধানাথ যে! কি খবর?"

"আমি আপনার ছেলের চাকরির চেষ্টায় পূর্ণিয়া গিয়েছিলাম। আমার জামাই বললেন তাকে ব্যাংকের একটা কেরানী করে' তিনি আপাতত ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের এজেন্টের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে।"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন—কাল তার চিঠি পেয়েছি। সে আসবে না। যেখানে আছে সেখানে এক ওস্তাদের পাল্লায় পড়েছে। সেই ওস্তাদের বাড়িতেই পেটভাতায় চাকরি করছে আর ধ্রুপদ শিখছে। আমার বাবাও বড় ওস্তাদ ছিলেন—বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সংসার করেননি। গানের আসরে আসরেই ঘুরে বেড়িয়েছেন চিরকাল। এ-ও হয়তো তাই করবে।"

দুই এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া চন্দ্রসুন্দর বলিলেন—"তোমরা চেষ্টা করলে কি হবে, সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বিরূপ হলে সৎপরামর্শও কেউ শোনে না। আমার দাদা আমার জন্যে কম করেননি। আমাকে পোস্টাফিসের একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। সে চাকরি নিলে এতোদিনে আমি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব পোস্টাফিস হতে পারতাম। প্রথম পোস্টিং হয়েছিল সাঁওতাল পরগনার এক নির্জন পাহাড়ী জায়গায়। আমার মনে হল পোস্টাফিসে তো টাকা থাকবে, যদি ডাকাতটাকাত পড়ে—তাহলে তো প্রাণ যাবে। ভয়ে আমি গেলুম না। যিনি গেলেন তিনি দিব্যি রইলেন, ডাকাতটাকাত কেউ এল না। এখন তিনি মোটা পেনশন নিয়ে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পোস্টাফিস-এব পোস্ট থেকে রিটায়ার করেছেন। সবই বাবা অদৃষ্ট, বুঝলে। দাদা আমার ভালো করবার চেষ্টা বরাবরই করেছেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা শুনিনি। তাই কষ্ট ভোগ করছি। সবই অদৃষ্ট, বুঝলে।"

আর একটু থামিয়া বলিলেন—"দাদা তো ভালো আছেন। আমি কাল চলে যাব ভাবছি। ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখি—যদি কিছু হয়। তোমার বাড়িতে আগে ভাল চিঁড়ে হত। এখনও কি হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি দশ সের চিঁড়ে আর কিছু ভালো ব্যাসন আর মুড়িও দিয়ে দেব আপনার সঙ্গে। আপনি ব্যাসনের ভাজা খেতে খুব ভালবাসতেন মুড়ির সঙ্গে, তা আমার মনে আছে।"

"বেঁচে থাক বাবা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এমন সময় দূরে দেখা গেল একজন কুলি সমভিব্যহারে একজন ভদ্রলোক আসিতেছেন। একটু কাছে আসিয়াই সে ভদ্রলোক বলিলেন—"কি রে চন্দর, চিনতে পারছিস? আমি নকুল"

"কি রে তুই কোথা থেকে?"

"আমি দিনাজপুরে কন্ট্রাক্‌টরি নিয়েছি। শুনলাম সূর্যর পক্ষাঘাত হয়েছে, তাই চলে এলাম। খবর কি?"

"খবর ভালো। দাদা বেশ ভালো আছেন। তুমি আর ওদিকে যেও না, এইখানেই থাকো। ওখানে তো সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড হচ্ছে। তুমি এখানেই পুজোআচ্চা করে নাও। কুমারকে বলে আমি আমার ঘরে খাটিয়া পাতিয়ে নিচ্ছি।"

"এখনই সে ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি আমি"—রাধানাথ গোপ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

।। চল্লিশ ।।

সাত দিন পরে।

মেয়েরা জামাইরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা ছিল, অন্তত সে তাহাই প্রকাশ করিয়াছিল, যে সে থাকিয়া যাইবে। রঙ্গনাথও আপত্তি করেন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হইল ঠিক বোঝা গেল না। সন্ধ্যা আসিয়া সূর্যসুন্দরকে বলিল, "আমি থাকব মনে করেছিলাম। উনিও আপত্তি করেননি। কিন্তু উনি বলছেন গিয়েই গাছের খোঁজে নানা জায়গায় যাবেন। উনি যদি বাড়িতে থাকতেন তাহলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু উনি একা একা ঘুরে বেড়াবেন এটা আমার ভাল লাগছে না। তাই ভাবছি—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"তুমি যাও। ওর সঙ্গেই তোমার থাকা উচিত। ও একটু অগোছালো মানুষ—"

ঊষা পাশের ঘরে ছিল। ঠোঁট উলটাইয়া স্বগতোক্তি করিল, "ঢঙ্গী! স্বামীর সঙ্গে তো আমরা সবাই যাচ্ছি। তুইও যা না। অত ঢং করবার দরকার কি!"

সবাই চলিয়া গিয়াছে। বাড়িটা খাঁ খাঁ করিতেছে। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন—পরের ঘরকে আপন ঘর করিয়াই মেয়েদের জীবন সার্থক হয়। তাঁহার মেয়েদের জীবন সার্থক হইয়াছে ইহাতে তিনি আনন্দিত। তবু কিন্তু কষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া ঊষার জন্য। মেয়েটা ভারি সরল। উহার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এ সরলতার মূল্য দিয়াছে কি না কে জানে। উশনা নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়া গিয়াছে—টেলিগ্রাম আসিয়াছে কাল। চন্দ্রসুন্দরেরও চলিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু নকুল আসাতে সে কয়েকদিন থাকিয়া গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"চন্দরবাবু নকুলবাবুর সঙ্গে দিনরাত কি যে এত ফুসফুস গুজগুজ করেন জানি না। নকুলবাবুর ভুরু কোঁচকানো, কপাল কোঁচকানো, চন্দরবাবু তন্ময়—ব্যাপারটা কি!"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "ছেলেবেলার বন্ধু যে—"

পৃথ্বীশ এখনও যায় নাই। কিন্তু সে সূর্যসুন্দরের কাছে কদাচিৎ আসে। সে কখনও গঙ্গার ধারে, কখনও পীরপাহাড়ে, কখনও বাঘাড় বিলের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রোজ সকালে খাইয়াই বাহির হইয়া পড়ে। ফেরে রাত্রে। পশ্চিমের দিকের বারান্দায় একটা খাটিয়া পাতা থাকে। তাহাতেই ঘুমায়। কাহারও সহিত বড় একটা কথা বলে না। গগন তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমল পায় না। গগন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ দিগন্তও চলিয়া গিয়াছে। কলেজ খুলিয়াছে তাহার। থীসিসটাও দাখিল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দিগন্ত কাছে থাকিলে গগন মনে মনে জোর পায়। সে জানে যে কোনও জটিল পরিস্থিতি হইতে দিগন্তই তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে। তাহার চিকিৎসায় এবং শুশ্রূষায় সূর্যসুন্দর ভালো আছেন ইহাতে সকলেই তাহার তারিফ করিতেছে বটে, কিন্তু সে নিজে খুব উল্লসিত হইতে পারিতেছে না। দাদুর নাড়ীটা ক্রমশঃ যেন দুর্বল হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত soft pulse। অথচ দাদুকে বেশী খাওয়ানো যাইতেছে না। প্রদীপে তৈল কমিয়া গেলে প্রদীপের শিখা যেমন নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসে এ যেন অনেকটা তেমনি। সূর্যসুন্দর বাহিরে বেশ প্রফুল্ল আছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন নিবিয়া যাইতেছেন এ খবর গগন ছাড়া আর কেহ জানে না।

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন।

"সূর্য ঘুমুচ্ছ নাকি?"

নকুল মামা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"এস। চোখ বুজেই শুয়ে থাকি আজকাল। ঘুম বড় একটা হয় না।"

একথা সেকথার পর নকুল আসল প্রসঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। একটু গলাখাঁকারি দিয়া বলিলেন, "চন্দবের কোনও একটা ব্যবস্থা করেছ তো?"

"কি ব্যবস্থা?"

"আইনত সে তোমার অর্ধেক সম্পত্তির মালিক, একান্নবর্তী পরিবার তো ছিল তোমাদের। সে হিসেবে—"

সূর্যসুন্দর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ওকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি। কিন্তু বিয়ে হবার পর ও বরাবরই বাইরে কাটিয়েছে। এখানে স্কুলে কিছুদিন চাকরি করেছিল, কিন্তু সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছিল। আমরা এক-অন্ন ছিলাম না। আমার বিষয়-সম্পত্তি সবই আমার স্বোপার্জিত। চন্দর রোজগার শুরু করবার বহু আগেই সেবিষয় আমি কিনেছি। স্টেটের খাতাপত্র থেকে তা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

মাথায় হাত বুলাইয়া নকুল বলিলেন—"না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম। যাক, তুমি আছ কেমন বল।"

"দিন গুনছি।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন—"অনেক দিন পরে এখানে এলে। কোন কাজে এসেছ নাকি। তুমি তো আজকাল বড় ব্যবসাদার।"

"হ্যাঁ। এখানে একজনকে টাকা ধার দিয়েছিলাম। সুদে আসলে সে টাকা প্রায় পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সে বলছে শোধ করতে পারব না। একশ' বিঘে জমি বন্ধকী দিয়ে টাকা নিয়েছিল। বলছে—ওই জমিটাই আপনি নিয়ে নিন। আমি এখানে জমি নিয়ে কি করব বল তো? বাংলাদেশে ধেনো জমি পেলে বরং কাজ হত। দেখি কি হয়—"

"তুমি খাবে এইখানেই তো?"

"না। কালীবাড়ির পুরুত রামঝলক ঝা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। পাঁটার মুড়িঘণ্ট খাওয়াবে বলেছে। যাকে টাকা দিয়েছিলাম সে ওই রামঝলকেরই আত্মীয়। রামঝলকই জমিটা নগদ দাম দিয়ে কিনে নিতে চাইছে। বলছে তিন হাজার টাকা নগদ দেবে। কি করব ঠিক করতে পাচ্ছি না। কি করব বল তো?"

সূর্যসুন্দর কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন—"আমি যা বলব তা তুমি শুনবে না। সুতরাং বলে লাভ নেই। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু তুমি বড্ড বেশী কথা বলছ!"

আড়নয়নে গগনের দিকে চাহিয়া নকুল বলিলেন—"আমি উঠি এবার—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"গগন প্রণাম কর। ইনিও তোমার দাদু হন।"

গগন প্রণাম করিল।

"আমি এবার উঠি। সন্ধ্যাহ্নিক হয়নি এখনও।"

নকুল চলিয়া গেলেন।

গগন বলিল—"তুমি চোখ বুজে শুয়ে থাকো। চম্পাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সে তোমাকে গল্প পড়ে শোনাক। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' পড়েছ?"

"না"

"চম্পার কাছে 'নিষ্কৃতি'টা আছে। সে পড়ে শোনাক তোমাকে। তুমি কিন্তু বেশী কথা বোলো না।"

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া ফেলিলেন।

।। একচল্লিশ।।

চন্দ্রসুন্দর অবশেষে অনেক লটবহর লইয়া সকালের ট্রেনে চলিয়া গেলেন। কুমার তাঁহার সহিত সব রকম ডাল এবং বাগানের তরিতরকারি প্রচুর দিয়াছিল। রাধানাথ গোপও অনেক জিনিস আনিয়াছিলেন। স্টেশন হইতে কুমার সোজা বাগানে চলিয়া গেল। বাগানে কয়েকটি 'জন' লাগানো হইয়াছে। সামনে বসিয়া কাজ না করাইলে তাহারা ফাঁকি দিবে। ভালো ঘি আনিবার জন্য গঙ্গা হাঁসুয়ারে তিলক গেয়ালার কাছে গিয়াছে। সে কুমারকে পই-পই করিয়া বলিয়া গিয়াছে কুমার যেন বাগানে গিয়া 'জন' খাটায়। কুমার বাগানে গিয়া দেখিল 'জন'রা কাজ করিতেছে। কুমারকে দেখিয়া একটি 'জন' (মজুর) উঠিয়া আসিয়া 'ছেকাছেনি' ভাষায় বলিল—"তুরীটোলার বর্ষাতিয়ার মা তার লোক পাঠাইয়া বাগান হইতে দুব্‌রি ঘাস (দুর্বা ঘাস) কাটিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি মানা করিলাম কিন্তু সে শুনিল না। তাই আমি তাহার 'খুরপি' এবং কাচিয়া (কাস্তে) কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছি। সে একটু পরে হুজুরের কাছে আসিবে।" বলিয়া সে খুরপি ও কাস্তেটি বারান্দার উপর রাখিল। কুমার ইহাতে খুশী হইল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"তুমি নিজের কাজ ছেড়ে বর্ষাতিয়ার মায়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কেন। এত দুব্‌রি রয়েছে, বর্ষাতিয়ার মা বকরির জন্য চারটি নিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি।" লোকটার গাঁজাখোরের মতো চেহারা। ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল—"হাম্ সমঝলিয়ে—।" কুমার এক ধমক দিল—"তোমাকে আর সমঝাতে হবে না। তুমি যা করছ তাই কর গিয়ে। শিশুগাছের নীচটা আজ সাফ করে ফেলা চাই।"

কুমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ক্যাম্প চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল। চুপ করিয়া শুইয়া রহিল খানিকক্ষণ। চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে শিশুর মতো কাঁদিতেছিলেন। সেই ছবিটা মনে পড়িল। স্টেশনে যাইবার পূর্বে সূর্যসুন্দরের পায়ে বার বার মাথা কুটিয়া বলিতেছিলেন—দাদা আমি মহাপাপী। আমাকে ক্ষমা কর। সূর্যসুন্দরের চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল। তিনি একটি কথাও বলেন নাই কিন্তু তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলে ক্ষমা যেন মূর্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অব্যক্তই যেন তাঁহার মুখের ভাবে ভাষাময় হইয়া উঠিয়াছিল। সে অব্যক্ত যেন বলিতেছিল, আমি সব ক্ষমা করিয়াছি। এই চিত্রটাই কুমারের চোখের সামনে ভাসিতেছিল। হঠাৎ একটা সুমিষ্ট তরল সুরে কে যেন বলিয়া উঠিল—'খোকা হোক খোকা হোক'। সেই হলদে পাখিটা আসিয়াছে। কুমার উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পাখিটাকে দেখিতে পাইল না। পাখিটা

কোন্ গাছে কোন্ শাখার আড়ালে যে লুকাইয়া থাকে বোঝা যায় না। আর একবার বলিল—'খোকা হোক'। কুমার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নাঃ—উহাকে দেখা যাইবে না। তাহার পর হঠাৎ দেখিতে পাইল পাখিটা এক গাছ হইতে উড়িয়া আর একট গাছে গিয়া অন্তর্ধান করিল। সোনার স্বপ্ন যেন উড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই শোনা গেল—বউ হলুদ কোট!

কুমার বাবার ডায়েরি পড়িতেছিল। সে সেই যুগে চলিয়া গিয়াছিল যে যুগে কন্যাদায় সত্যই একটা বিষম দায় ছিল। যখন মেয়ের বাবা মা কোথাও কোনক্রমে মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে পারিলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত তখন সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু কুমারীদাহ তখনও চলিতেছিল। মেয়ের মা বাপের জাতিকুলমান রক্ষা করিবার জন্য কুলীনরা শত শত বিবাহ করিতেন। সময়ে বিবাহ দিতে না পারিলে সমাজে একঘরে হইতে হইত। ধোপা নাপিত বন্ধ হইত। বাড়িতে কেহ মরিলে শবদাহ করিবার লোক জুটিত না। সূর্যসুন্দর ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—

"অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন শঙ্করা হইতে একটি পত্র পাইলাম। অপরিচিত হাতের লেখা। অসংখ্য বানান ভুলে পরিপূর্ণ। দীর্ঘ খামেব চিঠি। উলটাইয়া দেখিলাম চিঠির নীচে লেখা—সন্তোষের মা। একটু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সন্তোষের মা তো কখনও চিঠি লেখে নাই আমাকে। লিখিয়াছেন,—'বাবা সূর্য, নিরুপায় হয়ে তোমাকে এই চিঠি লেখাচ্ছি ছিরু চৌধুরীর ভাইপোকে ধরে। আমি তো লিখতে জানি না তাই ওকে দিয়ে লেখাচ্ছি। আমি বাবা বড় আতান্তরে পড়েছি। তোমার বন্ধু সন্তোষের বিয়ে দিয়েছি কয়েক বছর হল। তোমাদের খবর দেবার অবসর পাইনি। পাশের গাঁয়ের মেয়ে, সাতদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। বৌমাটি আমার খুব ভাল। একটি মেয়ে দুটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি সন্তোষকে নিয়ে। তার রোজগারপত্র কিছু নেই। ডাক্তারির একটা ঢং করে বসে আছে। সব বিনি পয়সার রোগী। অথচ তোমার বন্ধুটির নবাবী কিছু কম নেই। শান্তিপুরী ধুতি ছাড়া পরবে না। রোজ ডিমের ডালনা আর লুচি চাই। ভাত পাতে মাছ নইলে চলবে না। সব হচ্ছে জমি বাঁধা দিয়ে দিয়ে। সন্তোষের বাবা পঞ্চাশ বিঘে ধেনো জমি কিনেছিলেন। শুনছি সন্তোষ তার থেকে কুড়ি বিঘে বিক্রি করে দিয়েছে। এইভাবে যদি চলে তাহলে বাকি জমিগুলোও বিক্রি করে ফেলবে। তারপর যে কি হবে তা ভাবতেও ভয় হয়। আমাদের জ্ঞাতিরা কেউ বন্ধু নয়, সবাই শত্রু। তারা ওকে টাকা ধার দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বিষয়টা হস্তগত করবে বলে। আমার মুখ চাইবার কেউ নেই। তারপর মুশকিল হয়েছে রাজুকে নিয়ে। এগারো বছর বয়স হল। সন্তোষের বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, উনি আমার আর দুটি মেয়েকে গৌরীদান করেছিলেন। রাজুর গৌরীদান তো দূরস্থান বিয়ে দিতে পারব কি না, সৎপাত্র পাব কি না এই দুর্ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না। তোমার মামা আমাদের জ্ঞাতি। তাঁকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। তিন মাস আগে। কোনও জবাব পাইনি। শুনলাম তিনি দ্বিতীয়পক্ষ নিয়ে খুব ব্যস্ত । শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি কিছু জমিজমাও কিনেছেন স্ত্রীর নামে। গুজব ওইখানেই নাকি শেষে গিয়ে বাস করবেন। তুমি যেন এসব কথা আবার বোলো না কাউকে। আমাদের সমাজে সব গুজব সত্যি হয় না। পরশ্রীকাতর লোকেরা মিথ্যে গুজব রটায়। এখানকার শ্রীনাথ চৌধুরী বড়লোক। কলকাতায় কারবার, সেখানেই থাকে। হঠাৎ তার নামে গুজব রটে গেল সে নাকি কলকাতায় লুকিয়ে আর একটা বিয়ে করেছে। সন্তোষের জগুকাকা একের নম্বর বেকার। তাকে শ্রীনাথ চৌধুরীর

বউ টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠালে সঠিক সংবাদটা আনতে। জগুকাকা মাসখানেক কলকাতায় কাটিয়ে ফিরে এসে বললে—খবরটা সর্বৈব মিথ্যা। শ্রীনাথ চৌধুরীর বাসায় যে সুন্দরী মেয়েটি থাকে সে নাকি তার কাকার শালী, সম্পর্কে শ্রীনাথের কাকীমা। বালবিধবা। গ্রামে কষ্ট পাচ্ছিল বলে শ্রীনাথ তাকে কলকাতার বাসায় এনে রেখেছে। মেয়েটির বয়স নাকি পঞ্চাশের কাছাকাছি। শ্রীনাথ যখন কলকাতায় থাকে রান্নাবান্না ঘরের কাজ সবই করে। আমাদের সমাজ পরনিন্দা, পরচর্চা নিয়েই আছে। কেউ কারো ইষ্ট করতে পারে না, অনিষ্ট করবার জন্যেই সবাই ব্যস্ত। তাই সমাজ ভেঙে যাচ্ছে। সেদিন গাঙুলী বাড়ির বউটা একটা দুলে ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। না গিয়ে কি করবে। তার স্বামীটা বদ্ধ পাগল। ওরা লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটাকে নাকি কামড়ে দিত। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচল। লোকে বলছে কুলে কালি দিয়ে গেছে। কিন্তু যারা পাগল ছেলের লুকিয়ে বিয়ে দেয় তাদের কুলে শাদা কি কিছু ছিল যে কালি দিয়ে সেটা কলঙ্কিত করবে? এই পাষণ্ড সমাজে আমরা বাস করছি বাবা। রাজুকে নিয়ে আমার সর্বদা ভয়। ওকে কোনও সৎপাত্রের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এখন মরা ছাড়া আর কিছু করবার নেই—কিন্তু রাজুকে কার কাছে রেখে যাব? সন্তোষের যা গতিক দেখছি ওর উপর ভরসা নেই। যা করবার আমাকেই করতে হবে। কিন্তু কি করে করব বাবা। আশেপাশে আপনজন কেউ নেই। সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, মেয়ের বিয়ে দিতে পারবি না এ নিয়ে ভণ্ডের মতো দুশ্চিন্তা প্রকাশও করে কেউ কেউ। কিন্তু আসলে সবাই মনে মনে মজা উপভোগ করছে। আমাদের সমাজ বন্ধুর সমাজ নয়, শত্রুর সমাজ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু। ছিঁচকে চোরের জ্বালায় বাড়িতে লাউ কুমড়ো করবার জো নেই। আমাদের 'আনারসী' আমগাছটার কথা তোর মনে আছে? প্রতিবছর তাতে অজস্র ফল ধরে। এক বছরও বাদ যায় না। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের জন্যে একটি আম চোখে দেখতে পাই না। কষি থাকতে থাকতেই ক্রমাগত ঢিল মেরে মেরে সাবাড় করে ফেলে সব। অথচ কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই। সব জ্ঞাতি-গুষ্টির ছেলে। সন্তোষ একদিন একটা ছেলেকে ধরে চাবকেছিল। সে নিয়ে কি হইচই। থানা পুলিস পর্যন্ত হল। সন্তোষকে মারবে বলে ওরা শাসাল দিনকতক। সন্তোষের একটা বন্দুক আছে (ধার করে কিনেছে সেটা)—সেইটে হাতে করে ও ঘুরে বেড়াত। তুই ভাবছিস বোধহয় সন্তোষ বন্দুক নিয়ে কি করে? বন্দুকেব কি দরকার ওর? ঘুঘু আর শরাল হাঁস মারে। সব দিন অবশ্য মারতে পারে না। যেদিন পারে সেদিন সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে রাত্রি দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরে একটা হাঁস কিংবা ঘুঘু নিয়ে এসে হাঁকডাক। বউটার ভোগান্তি। সেগুলো তখনই ছাড়িয়ে পরিস্কার করে রেঁধে দিতে হবে। তা না হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে। সবই মানিয়ে যেত যদি পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু একটি পয়সা রোজগার করতে পারে না বাবা। জমির ধান, তালপুকুরের মাছ (তা-ও রোজ নয়, ধরবে কে?) আর ঘরের কটা হাঁস আছে, তাদের ডিম। আব উঠোনে কিছু শাক-সবজি লাগিয়েছে বউমা—তাই দিয়ে সংসার চলে। আর বুদী গাইটা আছে, বউমা তার খুব সেবা করে। নিজে হাতে খড় কেটে, জাব মেখে দেয়। যখন দুধ দেয় তখন দু'বেলায় প্রায় সের তিনেক দুধ হয়। সন্তোষ তখন ক্ষীর খায়। যখন দুধ দেয় না তখন গোবর্ধন ভরসা। গোবর্ধন গোয়ালা দুধ টাকায় দশ সের করে দেয়। কিন্তু সে দুধ নয় জল। সে আমাদের জমি করে। ধান বা খাজনা কিছু দেয় না। সবই ওই দুধের দামে কাটা যায়। বড়ই কষ্টে আছি বাবা। তোর কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে এত কথা কেন বলছি তা তুই নিশ্চয় ভাবছিস। তুই আমার সই বারাহীর ছেলে—হঠাৎ, কেন জানি না, সেদিন মনে হল

তোর কাছে সব দুঃখের কথা বলবার অধিকার আমার আছে। অনেকের কাছে দুঃখের বোঝা নামিয়েছি বাবা—তারা সবাই আপন জন, রক্তের সম্পর্ক—কিন্তু কেউ সে বোঝার দিকে ফিরেও তাকায়নি। নিজের বোঝা আবার মাথায় তুলে পথ চলতে হয়েছে। তুইও হয়তো তাই করবি। পরের দুঃখের অংশ নেওয়া সোজা কাজ নয়। আমার ছেলেই সে সম্বন্ধে উদাসীন। শুনেছি তুই বড় ডাক্তার হয়েছিস, পসারও বেশ ভালো হয়েছে। তোর নিশ্চয়ই অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, তুই রাজুর জন্যে একটি সৎপাত্রের খোঁজ করিস বাবা। সৎপাত্র মানে ধনী লোক নয়, ভালো বংশের ছেলে। আর যেন রোজগেরে ছেলে হয়। অনেক বড় বংশের ছেলে দেখেছি—তারা রোজগার করে না কিছু—তাই ক্রমশ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বংশও খুব বড়, আমাদের পূর্বপুরুষদের অতিথিশালা, নাটমন্দির, দুর্গাপুজো এখনও তার সাক্ষী দিচ্ছে। বারো মাসে তের পার্বণ কোনটা বাদ যেত না। কিন্তু ওই বংশের ছেলে সন্তোষ একটা অমানুষ হয়েছে। আসল কারণ বিদ্যের অভাব, অর্থের অভাব। অথচ বিলাসিতাটি পুরোমাত্রায় আছে। নবাবী করবার সামর্থ্য নেই অথচ নবাবী করা চাই। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান তোমাকে আর বেশী কি লিখব। অভাগিনী সই-মায়ের কথাটা মনে রেখো—এই শুধু অনুরোধ। তোকে অনেকদিন দেখিনি। আমার পক্ষে যাওয়া তো অসম্ভব। কে আমাকে নিয়ে যাবে? টাকাই বা কে দেবে? তুই যদি পারিস একবার আসিস। সন্তোষের পরশু থেকে জ্বর হয়েছে ঠাণ্ডা লেগে। শীতকালে নদীর চরে নাকি হাঁস আসে, তাই তিনটের সময় ওঠে। হাঁস একটিও মারা পড়ে নি, মাঝ থেকে ঠাণ্ডা লেগে গেল। এইখানেই থামলুম। কত আর লিখি, যদিও থামতে ইচ্ছে করছে না। মনের ভিতর কত কথাই যে জমে আছে। সবই দুঃখের কথা। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও নিজেকে ভুলিয়ে রাখি। নাতি-নাতনীদের নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় রূপকথা বলি তোদের যেমন বলতাম সেই অনেকদিন আগে। আর নয়, এইবার থামি, ছেলেটাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে দীর্ঘায়ু হয়ে দশজনের উপকার কর, দেশের মুখোজ্জ্বল কর। আমার যে সাধ সন্তোষ পূর্ণ করতে পারেনি, তুমি সেই সাধ পূর্ণ কর। তুমিও আমার ছেলে। আমার বুকের দুধ তুমিও খেয়েছ।"

সন্তোষের মায়ের এই চিঠিটা আমার কাছে ছিল। সবটাই আমার ডায়েরিতে টুকিয়া দিলাম। সন্তোষের মা অনেকদিন আগে মারা গিয়াছেন। আমার নিজের মা কখনও আমাকে চিঠি লেখেন নাই। তাই এ চিঠিখানি আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। আমার জীবনে এ চিঠিখানির কিছু গুরুত্বও আছে। চিঠিখানি পাইয়া আমি স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে শঙ্করায় গিয়া সন্তোষের মাকে একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু হাতে একটা শক্ত রোগী ছিল তাই ঠিক কবে যাইব দিনস্থির করি নাই। চিঠি আসিবার চার পাঁচ দিন পরে এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। 'সন্তোষের অসুখ, খুব বাড়াবাড়ি, অবিলম্বে চলিয়া এস।' অবিলম্বেই চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সন্তোষের ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছে। অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাশের গ্রামের যে হাতুড়ে চিকিৎসকটি তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছিল সে অবশ্য যথাসাধ্য করিতেছে দেখিলাম। কিন্তু নিউমোনিয়া অসুখটা সে ধরিতে পারে নাই। সাধারণ সর্দিজ্বরের ঔষধই দিয়া চলিয়াছে। সেকালে নিউমোনিয়ায় বুকে পিঠে গরম গরম তিসির পুলটিস দেওয়া হইত। তাহা দেওয়া হয় নাই। ব্র্যাণ্ডি এবং স্ট্রিকনিন দেওয়ার রীতি ছিল। তাও সে দেয় নাই। আমার কাছে অন্য সব ঔষধ ছিল কিন্তু ব্র্যাণ্ডি আনি নাই। শুনিলাম গ্রামের জমিদার মহাশয়

রোজ সন্ধ্যায় নাকি ব্র্যাণ্ডি পান করেন। তাঁহাকে গিয়া বলিলাম—"সন্তোষের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, শুনলাম আপনার কাছে ব্রাণ্ডি আছে, যদি আউন্স চারেক দয়া করে দেন!" ভদ্রলোক এ কথা শুনিয়া যেন আঁতকাইয়া উঠিলেন। "দেব? ব্রাণ্ডি? বলেন কি! এক ফোঁটা ব্রাণ্ডি আমি কাউকে দিই না। দেবও না। ব্রাণ্ডি আমার প্রাণ। ব্রাণ্ডি নইলে আমি বাঁচব না। সন্ধ্যের পর ঘরের দেওয়াল বেয়ে সাপ নাবে—চন্দ্রবোড়া, গোখরে, ময়াল, করেত—যতক্ষণ না ব্রাণ্ডি খেয়ে চুর হয়ে যাই ততক্ষণ নাবতে থাকে। ভয়ে চীৎকার করতে করতে ব্রাণ্ডি খাই, না ভাই ব্রাণ্ডি আমি এক ফোঁটা হাতছাড়া করতে পারব না। এখানে ব্রাণ্ডি পাওয়া যায় না। কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আনাতে হয়। আপনিও কলকাতায় কাউকে পাঠান। আমি বরং দোকানের ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। এরা খাঁটি ভালো মাল দেবে।"

কলিকাতাতেই লোক পাঠাইতে হইল। জমিদার মহাশয়কে বলিলাম—"আপনি এখন চার আউন্স আমাকে দিন, তার বদলে আমি আপনাকে পুরো এক বোতল ফেরত দেব। আমি দু বোতল আনতে দিচ্ছি।" অতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি চার আউন্স বাহির করিয়া দিলেন যখন আলমারি খুলিলেন দেখিলাম সারি সারি ছয় বোতল মজুত রহিয়াছে। বলিলেন, এটা আমার স্টক। এক বোতল ফুরুলেই আনিয়ে রাখি। জীবন-মরণ ব্যাপার তো। কলিকাতা হইতে যখন দুই বোতল ব্রাণ্ডি আসিল তখন কথা মতো এক বোতল তাঁহাকে দিলাম। তিনি সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া সেটি লইয়া আলমারিতে পুরিয়া ফেলিলেন। সন্তোষ দিন সাতেক পরে ভালো হইল। তাহাকে পায়রার বাচ্চার 'জগ্‌সুপ' বানাইয়া রোজ খাইতে দিতাম। ইহাতে সে তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিতে লাগিল। শুধু চিকিৎসা নয় সন্তোষের সেবার ভারও আমাকে খানিকটা লইতে হইয়াছিল। কারণ বুকে পিঠে মালিশ করা পুলটিস দেওয়া অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব ছিল না। আমি আসিবামাত্র হাতুড়ে ডাক্তারটি সরিয়া পড়িয়াছিল (বেশ প্রবীণ লোক) এবং রটাইয়া বেড়াইতেছিল যে একটা ছোঁড়া ডাক্তারের পাল্লায় পড়িয়া সন্তোষের প্রাণ-পক্ষীটি এইবার খাঁচা-ছাড়া হইবে। আমরা শাক-চচ্চড়ি-খেকো বাঙালী আমাদের ধাতে কি ব্রাণ্ডি সহিবে? শুধু পরীক্ষা পাস করিলেই ডাক্তার হয় না, অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, দেশকালপাত্র বিচার করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। সন্তোষের বউ ঘোমটা টানিয়া দূরে সরিয়া থাকিত। তা ছাড়া, তাহার সংসারে কাজও ছিল প্রচুর। রান্না করিত, ঘরদ্বার পরিষ্কার করিত, গরুর সেবা করিত, ছেলেমেয়েদের সামলাইত, তাহার উপর এক মাইল দূরের একটা পুকুর হইতে এক কলসী খাবার জল লইয়া আসিত। অবসর পাইলে সন্তোষের ঘরের দ্বারের সামনে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইত দুই এক মিনিটের জন্য, একটু ইতস্ততঃ করিত, তাহার পর চলিয়া যাইত। অনুভব করিতাম ঘোমটার ফাঁকে সশঙ্ক দৃষ্টি মেলিয়া সে তাহার রুগ্‌ণ স্বামীকে একবার দেখিয়া গেল। এতদিন তাহার সম্বন্ধে একটি কথাই মাত্র মনে আছে। খুব ভাল রাঁধিতে পারিত। হাঁসের ডিমের ডালনা, আলুর দম এসব তো চমৎকার রাঁধিতই, থোড়ের ডালনা, মোচার ঘণ্ট, পালংশাকের ঘণ্ট প্রভৃতি সাধারণ তরকারিও তাহার হাতের গুণে অমৃতবৎ মনে হইত। সে সংসারের কাজই জানিত, সংসার লইয়াই থাকিত। রোগীর সেবার ভার আমাকেই লইতে হইয়াছিল। নিয়মিত টেম্পারেচার লওয়া, ঔষুধ প্রস্তুত করা, ঔষুধ খাওয়ানো সব আমিই করিতাম। একটা তোলা-উনুনে তাহার পথ্য আমি করিয়া দিতাম। জগ্‌সুপ, পোরের ভাত, চা, ফলের রস সবই আমার তত্ত্বাবধানে হইত। আমার সহকারিণী ছিল রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর মতো অমন সুন্দরী মেয়ে বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। ঠিক মনে হইত সাহেবের মেয়ে। চোখের

তারা যদিও কুচকুচে কালো ছিল, কিন্তু মাথার চুল ছিল লাল। সর্বদাই গাছ-কোমর বাঁধিয়া থাকিত। পাড়ার লোকে বলিত দস্যি মেয়ে। দৌড়ে, সাঁতারে এমন কি হাডুডু খেলায় সে ছিল অদ্বিতীয়। বড় বড় গাছে চড়িতে পারিত। যদিও মাত্র এগারো বছরের মেয়ে, কিন্তু পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের সেই নেত্রী ছিল। তাহার প্রতাপে নাকি সবাই তটস্থ হইয়া থাকিত। রাগিয়া গেলে তাহার নাকি জ্ঞান থাকিত না, মেয়েদের উপর তো বটেই ছেলেদের উপরও হাত চালাইত। শুনিলাম রাগিলে সমস্ত মুখটা সিঁদুরের মতো রাঙা হইয়া ওঠে। আমি প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন সন্তোষের মা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাকে লইয়া কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। সন্তোষের ছেলেমেয়েরা সন্তোষের বউ আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। সন্তোষের মা ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন—রাজু কোথা গেলি, দেখ কে এসেছে। তখন গ্রীষ্মকাল। বাড়ির উঠানে একটা মস্ত বড় আমগাছ, অনেক আম ধরিয়াছিল। হঠাৎ সেই আমগাছ হইতে ধুপ করিয়া মেয়ে লাফাইয়া পড়িল। বাঁ হাতে একটি পাকা আম, নীচের দিকে ছ্যাঁদা করিয়া চুষিয়া চুষিয়া রস খাইতেছে। আমার দিকে সপ্রতিভভাবে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল, পরমুহূর্তেই মুখটা ফিরাইয়া লইল। দেখিলাম লজ্জায় কানের কাছটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর মাথা হেঁট করিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষ যখন সুস্থ হইল তখন তাহার সহিত কিছু বৈষয়িক আলোচনা করিলাম। বলিলাম, "তোমার রোজগার কিছু হয় না শুনলাম। জমি বিক্রি করে ধার কর্জ করে নবাবী করছ—এটা তো ভাল নয়।"

সন্তোষ বলিল—"আমি ইতিহাসের নবাব না হতে পারি কিন্তু সত্যই আমি নবাব। আমার বাবা মা আমাকে নবাবের মতো মানুষ করেছেন। কখনও আমার পান থেকে চুন খসতে দেন নি। যখন যা চেয়েছি তাই দিয়েছেন। ছেলেবেলায় চৌধুরীদের ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজোর সময় আমিও ভেলভেটের জুতো, ভেলভেটের জামা গায়ে দিয়েছি। চৌধুরীরা জমিদার কিন্তু তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়েই বরাবর চলেছি। বাবা আমাকে ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। মাথায় ফুলেল তেল ছাড়া কিছু মাখতাম না। খারাপ খাওয়া কখনও খাইনি। মা বাবাই আমার এ অভ্যাস করিয়েছেন। অথচ লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেননি। গ্রামের ওই কসাই পণ্ডিতের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে পড়াত না, কেবল ঠাঙাত। বিদেশে ভালো ইস্কুলে যদি আমাকে পড়াতেন, হয়তো কিছু লেখাপড়া শিখতে পারতাম। তুই যেমন শিখেছিস। কিন্তু মা আমাকে বিদেশ যেতে দিলে না। পঞ্চুমামা একটা স্কুলের ব্যবস্থাও করেছিলেন। মাসে মাত্র পনেরো টাকা খরচ—থাকা খাওয়া স্কুলের মাইনে সব। বাবা টাকা দিতে রাজী ছিলেন, মা কিন্তু কিছুতেই আমাকে যেতে দিলেন না। বললেন—তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। হয়তো তোর মতো আমিও ক্যাম্বেল থেকে পাস করে ভালো ডাক্তার হতে পারতাম। এ অঞ্চলে প্র্যাকটিসও খুব হত। ওই হাতুড়েটা নাইবার খাবার সময় পায় না। ক্যাম্বেলপাস হরিচরণবাবু দশঘরায় প্র্যাকটিস করেন। তাঁকে সাতদিন আগে 'কল' দিলে তবে পাওয়া যায়। ওখানে এসে পঁচিশ টাকা 'ফি' নেন—তা ছাড়া পালকি-ভাড়া। আমিও ওরকম হতে পারতুম। হরিচরণবাবুর বাবার অবস্থা আমার বাবার অবস্থার চেয়েও খারাপ ছিল। এখন তে-তলা বাড়ি হাঁকড়েছে। আমিও পারতুম। কিন্তু আমার মা আমাকে কাছ-ছাড়া করলেন না। ঘরে বসিয়ে বসিয়ে নবাব তৈরি করলেন। তাই নবাবীই করে যাচ্ছি। বাবার বিষয় যতক্ষণ আছে নবাবীই করে যাব। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। অদৃষ্টই সব, বুঝলে।...."

সন্তোষ একটানা এতক্ষণ কথা আর কখনও বলিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সাধারণতঃ সে স্বল্পভাষী। সেদিন যেন সোডা-ওয়াটারের বোতলটা সহসা খুলিয়া গিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিয়া তাহার উপর রাগ হইল না। তাহাকে ভাল লাগিয়া গেল। মন্মথও সন্তোষের মতো বেপরোয়া, সন্তোষের মতো অসহায়। গান-বাজনা লইয়া মাতিয়া থাকে। সে-ও বিবাহ করিয়াছে তাহারও একটি ছেলে, একটি মেয়ে। কিন্তু কোনও রোজগার সে করে না। তাহার দাদাই তাহার পরিবারের ভার লইয়াছেন। মন্মথ বিলাসীও। ধারে দোকান হইতে তেল, সাবান, এসেন্স, রুমাল কেনে। দাদা ধার শোধ করেন। কেন জানি না বেপরোয়া বেহিসেবী লোককেই বেশী ভালো লাগে। মহৎ লোককে ভক্তি করি। মন্মথর দাদাকে ভক্তি করিতাম। একান্নবর্তী পরিবারের তিনি আদর্শ কর্তা ছিলেন। তাঁহার নিজের কোন বাহ্যাড়ম্বর বা বিলাসিতা ছিল না। সমস্ত সংসারটা তিনি মাথায় করিয়া থাকিতেন। মন্মথর বাবা বরদাবাবু যখন সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ মারা গেলেন তখন মন্মথর দাদা এন্ট্রান্স পাস করিয়াছেন। সেই অবস্থায় গলায় কাছা লইয়া তিনি একটি দরখাস্ত লিখিয়া ডি. টি. এস.-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মন্মথর বাবা ডি. টি. এস. আপিসের বড়বাবু ছিলেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল তাঁর। বস্তুতঃ তিনিই আপিস চালাইতেন। তিনি যেদিন মারা গেলেন সেদিন সাহেবগঞ্জে একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। শহরসুদ্ধ লোক শ্মশানঘাটে গিয়াছিল। মন্মথর দাদা শ্রাদ্ধের পর দিনই গিয়া ডি. টি. এস. সাহেবের সঙ্গে দরখাস্ত লইয়া দেখা করেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হইয়া যায়। মাহিনা কম, তবে উন্নতির আশা আছে। এই মাহিনা লইয়াই তিনি সমগ্র সংসারের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। এই টানাটানির মধ্যেও তিনি দূরসম্পর্কীয়া একটি বিধবা ভগিনীর ভারও লইয়াছেন। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী-দেবীর মর্যাদাতেই আনুদার সংসারে আছেন। তাঁহার লোকলৌকিকতা পূজাপার্বণ খাবার করা সবই আগের মতন আছে। বাজারে ধার হইতেছে। আনুদা গ্রাহ্য করেন না। তবে একটা সুরাহা, মন্মথর ছোট ভাই বসন্ত ডাক্তার হইয়াছে এবং একটা চাকরি পাইয়াছে। সে এখনও বিবাহ করে নাই। সমস্ত বেতনটি দাদাকে পাঠাইয়া দেয়। সে-ও বড় ভালো ছেলে। ইহাদের আমি মনে মনে ভক্তি করি। কিন্তু ভালবাসি মন্মথকে। মন্মথ চাকরিবাকরি কিছুই করে না। থিয়েটার করিয়া, গান গাহিয়া বেড়ায়। সংসারের কোনও দায়িত্ব বহন করিতে চায় না। অনুদা দুই তিনবার তাহার চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, রাখিতে পারে নাই। এক জায়গায় সাহেবের সঙ্গে ঘুষাঘুষি করিয়া পুলিস কেসে পড়ে। কিন্তু তাহার গান এবং অভিনয়ের জন্য সে অঞ্চলে বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই চেনে, খাতির করে, ভালও বাসে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব (একজন বাঙালী ছিলেন তখন) মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। সন্তোষের কথা বলিতে বলিতে মন্মথর কথা মনে পড়িল। দুইজনেই প্রায় এক প্রকৃতির লোক। বেপরোয়া, বেসাহেবী, দায়িত্বজ্ঞানহীন। তফাতের মধ্যে মন্মথর মাথার উপর দাদা আছে, সন্তোষের মাথার উপর আকাশ ছাড়া কেহ নাই। হাবু মামাও অনেকটা ওই জাতের লোক। স্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানকে লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যতের ভাবনা নাই। কেন জানি না, আমার ইহাদের ভালো লাগে। ইহারা অসহায়, আবার বিদ্রোহীও। ভবিষ্যৎকে কলা দেখাইয়া ইহারা নিজের মতে নিজের পথে চলিয়া বর্তমানকে উপভোগ করিতেছে। সন্তোষ যেদিন পথ্য পাইল তাহার দিন তিনেক পরে সতীশবাবুরও একটি পত্র পাইলাম। তাঁহাকে ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম। সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"আপনি ওখানে বড়ই বিলম্ব করিতেছেন। অবিলম্বে চলিয়া আসুন। আশা করি এতদিনে আপনার বন্ধুটি সুস্থ হইয়াছেন।

আপনার অনেক রোগী ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের অনুরোধেই এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। মালিকও আপনাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে বলিতেছেন। ফিরিয়া আসিলে আবার আপনাকে চাঁচল যাইতে হইবে। সেখানে আপনার রোগীরা অনেক সুস্থ আছেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা, আপনি আর একবার তাঁহাদের দেখুন। চাঁচলের একটি অতিসার ব্যায়রামের রোগীও আপনার পথ চাহিয়া আছে। আপনি যখন চাঁচলে গিয়াছিলেন তখন সে মালদহে চিকিৎসার জন্য গিয়াছিল। সে চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই। তিনি আপনাকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দুইবার লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আপনার অবর্ত্তমানে হাবু মামাই আপনার ডিসপেন্সারির হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভাল লোক। কিন্তু খাম-খেয়ালী। যেদিন মাছ ধরিবার খেয়াল হইল ডিসপেন্সারি বন্ধ করিয়া ছিপ লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আপনি আর দেরি করিবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব চলিয়া আসুন। এখানে আপনার বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডা বেশ ভালোভাবেই জমিতেছে। জগন্নাথবাবু বলিতেছেন এবার 'জনা' নামাইবেন। প্রবীরের পার্টটা আপনাকে লইতে হইবে। হাবু মামা 'জনা' সাজিবেন। ছিপছিপে চেহারা, বেশ মানাইবে।''—আরও বার কয়েক 'আপনি আর দেরি করিবেন না' লিখিয়া সতীশবাবু পত্র শেষ করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর সহিত ভাব হইয়া গিয়াছিল। পত্র দেখিয়া রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিল—কার চিঠি? বলিলাম—মনিহারী থেকে সতীশবাবু লিখেছেন। এইবার আমাকে যেতে হবে। রাজলক্ষ্মী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—এরই মধ্যে চলে যাবেন? বলিলাম—না গিয়ে উপায় নেই। অনেক রুগী ফিরে যাচ্ছে। কালই চলে যাব!

''কাল কি করে যাবেন? কাল তো তেরোস্পর্শ। মা কাল আপনাকে যেতে দেবে না। তা ছাড়া, এখানে এসে তো আপনি দাদাকে নিয়েই দিনরাত কাটালেন। আসল কাজটাই তো করলেন না।''

''কি আসল কাজ?''

''তালপুকুরের মাছ ধরা। বিকেলের দিকে ছিপ ফেলে বসুন একবার। টপটপ সরল পুঁটি উঠবে। সে যে কি মজা!''

''আমি তো মাছ ধরতেই জানি না। কখনও ধরিনি।''

''ও আবার জানতে হয় নাকি। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপটি ফেলে ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকবেন, ফাৎনাটি ডুবে গেলেই এক হ্যাঁচকা টান। সঙ্গে সঙ্গে মাছ উঠে আসবে। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব। আজ বিকেলে যাব—কেমন?'

''ছিপ কোথা?''

''দাদার ছোট বড় নানারকম ছিপ আছে।''

সেদিন বৈকালে বাড়ির সকলে যখন ঘুমাইতেছিল তখন আমি বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলাম। রাজলক্ষ্মী পা টিপিয়া আসিয়া আমার গায়ে একটা ঠেলা দিল। চোখ চাহিতেই ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল বাইরে আসুন। উঠিয়া তাহার পিছু পিছু তালপুকুরে গেলাম। বাড়ির খিড়কিতেই তালপুকুর, সেখানে দেখিলাম ঘাটের ধারে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য একটি ছিপ রাখিয়াছে একটা ভাঁড়ে কিছু কেঁচোর টোপও আছে।

''আমি চার আগেই ছড়িয়ে দিয়েছি। আপনি ছিপটা নিয়ে এইভাবে বসুন।''

কিভাবে বসিতে হইবে তাহা নিজেই দেখাইয়া দিল।

"আমি বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে দিচ্ছি। আপনি ছিপটা ফেলে ফাৎনাটির দিকে চেয়ে থাকুন। ফাৎনা ডুবলেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিপটা তুলে নেবেন।"

এই উপদেশ সত্ত্বেও কিন্তু আমি তেমন সুবিধা করিতে পারলাম না। কয়েকবারই ফাৎনা ডুবিল, আমি হ্যাঁচকা টানও মারিলাম, কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখা গেল মাছে টোপটি খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

"আপনি কোনও কাজের নয়, ঠিক সময় ছিপটা তোলেন না। সরুন আমি বসছি—"

সেদিন রাজলক্ষ্মী পাঁচটি পুঁটি এবং দুইটি বাটা মাছ ধরিয়াছিল। আমি একটিও পারি নাই।

সেদিনের সন্ধ্যার সময় সন্তোষের মা বলিলেন, "রাজু মুখপুড়ি তোকে তালপুকুরে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল বুঝি? ও ওই সব নিয়েই তো আছে। ঘরে একদণ্ড থাকে না, দিনরাত দুদ্দাড় করে বেড়াচ্ছে। ও মেয়ে যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি করবে তাই ভাবছি। বিয়েই হবে না বোধহয়, কে খুঁজে পেতে ওর বিয়ে দেবে বল। আমার তো অর্থসামর্থ কিছুই নেই।"

রাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া প্রদীপ জ্বালাইতেছিল ঠাকুরঘরের জন্য।

বলিলাম, "আমি ওর জন্যে একটি পাত্র ঠিক করেছি। তবে আপনার পছন্দ হবে কি না জানি না।"

রাজলক্ষ্মী প্রদীপটির শিখাটিকে বাঁ হাত দিয়া আড়াল করিয়া আস্তে আস্তে ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল। দেখিলাম তাহার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপের আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। মুখে একটা রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা রাগের, না লজ্জার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিছুদূর গিয়া সে পিছন ফিরিয়া আমার দিকে চাহিল এবং হঠাৎ জিব বাহির করিয়া আমাকে ভেংচি কাটিল।

সন্তোষের মা বলিলেন—"তোর যদি পছন্দ হয়ে থাকে আমার হবে না কেন। কি রকম দিতে থুতে হবে—"

"এক পয়সাও না।"

"তাই নাকি। ছেলের বয়েস কত?"

"ছাব্বিশ। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে একটু বেমানান হবে। ওর বয়েস তো এগারো—"

"বলিস কি তুই! বেমানান হবে, সেদিন জানকী ভট্চায তার দশ বছরের মেয়েকে এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। মোটে ছাব্বিশ বছর? এ তো জোয়ান ছেলে। তোর মামা যে মেয়েকে বিয়ে করেছে তারও বয়েস তো দশ বারোর বেশী নয়। আমাদের সমাজের ছেলের বয়েস দেখে নাকি কেউ। সবাই কুল দেখে, আর ছেলের রোজগার দেখে। ছেলে কি করে?'

"ডাক্তার। কিন্তু দোজবরে। তার প্রথম পক্ষের বউটি বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই মারা যায় ছ বছর আগে।"

"গোত্র কি?"

"ভরদ্বাজ।"

"বাপ-মা বেঁচে আছে?"

"না।"

"কোথায় আছে সে?"

"তোমার সামনেই বসে আছে।"

বিস্ময়ে সন্তোষের মায়ের মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল। তাহার পর তিনি আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন।

"সত্যি বলছিস্?"

"আমি পারতপক্ষে মিথ্যা কথা বলি না। কিন্তু একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। মামাকে আগে একটা চিঠি লিখুন। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকেই চিঠি লিখতে বলতুম। এখন মামাই অভিভাবক, ছেলেবেলা থেকে উনিই আমাদের মানুষ করেছেন। তা ছাড়া, দিদিমা এখনও বেঁচে।

"লিখব কিন্তু এখানে চিঠি লেখানোই মুশকিল। অপরকে দিয়ে লেখাতেও চাই না। কথাটা পাঁচকান হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়। তোমার বন্ধুটিকে বলে যাও, সে যদি লিখে দেয়। তারই লেখা উচিত—"

"বেশ, তাকে দিয়ে লিখিয়ে চিঠি পোস্ট করে তবে আমি যাব। আজই চলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু হল না। কাল যেতেই হবে। ওখান থেকে জরুরী চিঠি এসেছে।"

"কালই চলে যাবি।"

"যেতেই হবে।"

"কাল রাত্রে আমি কিছু পিঠে পায়েস করব ভেবেছিলাম।'

"সকালে করুন তাহলে। আমাকে বিকেলে হরিপালে গিয়ে ট্রেন ধরতেই হবে।"

খোঁজ করিয়া দেখিলাম সন্তোষের কাছে চিঠি লিখিবার কোনও সরঞ্জামই নাই। কয়েক রকম ছিপ আছে, হুইল আছে, টোটা বন্দুক আছে, আয়না, সাবান, এসেন্স আছে, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, অ্যালোপ্যাথির কয়েকটা বাংলা বই আছে, শৌখিন জুতা আছে কয়েক জোড়া, চিরুনি, বুরুশ এবং ফুলেল তেল আছে, কিন্তু চিঠি লিখিবার কাগজ, কলম নাই, কালিও নাই। একটা জাবদা খাতা এবং একটা ভোঁতা পেন্সিল আছে দেখিলাম। সন্তোষ ওই খাতায় রোগীদের নাম, কি ঔষধ দিল, কোন্ তারিখে দিল তাহা পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখে। ঔষধের কত দাম পাইল তাহাও ওই খাতায় পেন্সিল দিয়া লেখা থাকে। দেখিলাম দামের অঙ্ক প্রায় শূন্যের কোঠায়। চাটুয্যে পাড়ার কাছে ছোটখাটো একটি মনিহারী দোকান ছিল। সেখান হইতে চিঠি লিখিবার জন্য কাগজ, কলম, কালি কিনিয়া আনাইলাম। তাহার পর সন্তোষকে বলিলাম—"এইবার মামাকে একটা চিঠি লিখে ফেল।"

সন্তোষ কথাটা শুনিয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"একটা সিগারেট ধরাতে পারি? তুমি তো সব বন্ধ করে দিয়েছ।"

"না, এক মাস এখন সিগারেট চলবে না।"

তখন সে দিয়াশলাই-বাক্স হইতে একটি কাঠি বাহির করিয়া কানে ঢুকাইল এবং বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বেশ খানিকক্ষণ কান চুলকাইল। তাহার পর কাঠিটি বাহির করিয়া বলিল—তোমার মামা আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে কাকা। এ যাবৎ আত্মীয় হিসাবে তিনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় না, তাঁকে চিঠি লিখে বিশেষ কোনও ফল হবে। বিয়ের বাজারে তুমি সুপাত্র, অনেক টাকা পণ নিয়ে অনেক বড় ঘরে দিতে পারবেন। আমাদের মতো গরীবের কথা শুনে গলে যাবেন এ কথা বিশ্বাস করতে ভরসা পাই না। চিঠি লিখে মাঝথেকে অপমানিত হব খালি।"

"যাতে অপমানিত না হও তার ব্যবস্থা আমি করব।"

সন্তোষ আরও খানিকক্ষণ কান চুলকাইল। তাহার পর বলিল—"বেশ, কি লিখব তাহলে বল, তুমি যা বলবে তাই লিখব। সব দায়িত্ব তোমার উপরই থাক। যদি কিছু না হয় খুব সম্ভব হবে না—তখন যেন তোমরা বোলো না চিঠি লেখার দোষে সব ভেস্তে গেল। তুমি বলে যাও, আমি লিখে যাচ্ছি—"

রঙিন চশমা পরিয়া সন্তোষ বাগাইয়া বসিল। আমি ডিকটেশন দিলাম।

শ্রীচরণেষু,

কাকা, আশা করি আপনি ও বাড়ির সকলে ভালো আছেন। আমার ছোটবোন রাজলক্ষ্মীর এখনও বিবাহ দিতে পারি নাই। আমাদের অর্থ-সামর্থ্যের কথা আপনি সবই জানেন। ভালো পাত্র জুটাইবার সাধ্য আমাদের নাই। সূর্যের সহিত রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দেন তাহা হইলে এই দায় হইতে সহজে উদ্ধার পাইতে পারি। আপনি আমার সম্পর্কে কাকা, তাই এ দায় আপনারও দায়। নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছি বলিয়া আপনাকে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিলাম। আশা করি, আপনি দয়া করিয়া সম্মতি দিবেন। সূর্যের ইহাতে আপত্তি নাই। তাহার নিকট মত লইয়াছি। সে-ই আপনাকে পত্র লিখিতে বলিল। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন। অন্যান্য গুরুজনদের দিবেন। বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ জানাইতেছি। ইতি সেবক—

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষের হাতের অক্ষর বড় বড়। দাগড়া দাগড়া করিয়া লিখিয়াছে। এইটুকু চিঠিতেই দুই পাতা ভরাইয়া ফেলিয়াছে, বানান ভুলও অনেক। দেখিলাম কনিষ্ঠ বানান 'কোনিস্ট' লিখিয়াছে। সেটি কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিতে বলিলাম। সেইদিনই চিঠিটি পোস্টাপিসে গিয়া রেজেস্ট্রিযোগে মামার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম। পোস্টাপিস হইতে ফিরিবার সময় একটা সজনে গাছের উপর রাজলক্ষ্মীর দেখা পাইলাম। সজনে ফুল পাড়িতেছিল। আমাকে দেখিয়াই গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং এক ছুটে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মনিহারীতে ফিরিয়া দেখিলাম আমার বাড়ি সরগরম। দূর হইতে চারটি শক্ত রোগী আমার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে। দুইটি রোগী জমিদারের কাছারিবাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। একজন আমার নব-নির্মিত ডিসপেন্সারি ঘরেই আছে। চতুর্থটি আছে গোলাদার প্রয়াগ সার বাসায়। কিছুদিন আগে প্রয়াগ সার সহিত আমার হৃদ্যতা হইয়াছিল। লোকটি গোলাদার বটে, কিন্তু তাঁহার মন কেবল গোলাদারিতেই আবদ্ধ নহে। রাধেশ্যাম তাঁহার হৃদয় হরণ করিয়াছেন। গলায় একটি তুলসীর মালা, হাতেও একটি তুলসীর মালা। প্রতিবৎসর এক কোটি রাধেশ্যাম নাম জপ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। গোলার গদিতে বসিয়া ক্রমাগত নাম জপ করেন এবং তাঁহার ব্যবসার দক্ষিণহস্ত বুলাকি সাহাকে চোখের ইঙ্গিতে বা ঠারেঠোরে যে আদেশ দেন তাহাতেই তাঁহার ব্যবসা সুচরুরূপে চলিয়া যায়। বুলাকি সাহার ভাগ্নেই হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রয়াগ সার গোলায় আশ্রয় লইয়াছে। আমি নাই দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল, প্রয়াগ সা-ই তাহাকে যাইতে দেন নাই। আমার উপর সা-জির খুব বিশ্বাস। তাঁহার নিজের কানে একবার নিদারুণ ব্যথা হইয়াছিল। রাধেশ্যাম নামে তিনি মন বসাইতে পারিতেছিলেন না, আমার ঔষধে তাঁহার ব্যথা সারিয়া গিয়াছিল। সেই হইতেই তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব। মাঝে মাঝে রাধেশ্যাম বিষয়েই আমার সহিত তিনি আলাপ করেন। যদিও এ বিষয়ে আমি বিশেষ আলোকপাত করিতে পারি না, কিন্তু তিনি এই আলোচনা করিয়া আনন্দ পাইতেছেন ভাবিয়া

চুপ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ি। প্রয়াগ সা-র নামে অনেকে অনেক কুৎসা রটায়, আমি কিন্তু সে কুৎসার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার জন্য ব্যগ্র হই না। প্রয়াগ সা আমার সহিত ভদ্র ব্যবহার করেন ইহাই আমি যথেষ্ট মনে করি। প্রয়াগ সা-র কথা এখানে লিখিয়া তৃপ্তি পাইলাম। লোকটি বরাবর আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে পরে যখন স্কুল করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে চাঁদা চাহিয়া বেড়াইতেছিলাম তখন ওই প্রযাগ সা-ই আমাকে নগদ পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়া 'বউনি' করেন। ইহাও বলিয়াছিলেন স্কুলের নাম যদি রাধেশ্যাম স্কুল রাখিবার ব্যবস্থা আমি করি তাহা হইলে স্কুল-ঘর করিবার সব খরচ তিনিই দিতে প্রস্তুত আছেন। গ্রামের লোক ইহাতে রাজী হয় নাই। অনেকে বলিয়াছিল স্কুলটা আপনার নামেই হোক। আমি তাহাতে রাজী হইতে পারি নাই। গ্রামের নামে স্কুলের নাম রাখাই সাব্যস্ত হইয়াছিল। প্রয়াগ সা কিন্তু স্কুলের চাঁদার খাতায় সর্বপ্রথমে পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন একথা আজও আমার মনে আছে। ত্রিপুরারি সিং একশ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন নিতান্ত আমার খাতিরে। আমাকে বলিয়াছিলেন—"স্কুল করছেন করুন, কিন্তু ভবিষ্যতে চাকর পাবেন না। স্কুলে দু পাতা পড়ে সবাই বাবু হয়ে যাবে। কুলকর্মও করতে পাববে না, বড় উঁচু কাজও করতে পারবে না। দুয়ের বার হয়ে যাবে। তবে আপনার ঝোঁক হয়েছে করুন, কিছু চাঁদা আমি দেব। অক্ষর পরিচয় হলেই শিক্ষা হয় না, নিরক্ষর হলেই মূর্খ হয় না। আমার মা নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু সমস্ত জমিদারিটা তিনিই চালাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এম. এ. পাস নন, কিন্তু তা বলে কি তাঁকে মূর্খ বলবেন? সোমেনও গ্রামে গ্রামে ইস্কুল করে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে বলেছি—চাষা, ছুতোর, কামাব, ভাল মিস্ত্রী এইসব যাতে হয় তাই কর। এ বি সি ডি পড়ে হবে কি! বিদ্যাসাগবেব প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ আর শিশুবোধ পড়লে যে জ্ঞান হয় তাই যথেষ্ট।"—এই বক্তৃতাটি দিয়া তিনি সতীশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারকে একশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিন। ওঁকে চটাতে চাই না।

শংকরা হইতে ফিরিয়া ত্রিপুরারির কাছে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—আপনাকে চাঁচল যেতে হবে। সেখান থেকে দুবার লোক ফিরে গেছে। সেখানে গতবার আপনি ফী নেননি। সে ফী তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে, এবারের ফী-ও আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। আপনার বাড়ির কাছে হরিবোল সা-র যে বাগানটা আছে সেটা শুনছি বিক্রি হবে। সাতশ টাকা দাম চাইছে। আমি ছশ টাকা বলেছি। মনে হয় ওতে রাজী হয়ে যাবে। তাহলে আপনার ওই চাঁচলের টাকা থেকেই হয়ে যাবে বাগানটা। ভাল ভাল আম আছে বাগানটাতে। কাঁটালও আছে। যখন এখানে বাসই করছেন তখন ভালভাবে বাস করুন। গ্রামের কিছু জমিও বন্দোবস্ত করে নিন। কলাই মটর ছোলা বুট গম আখ খুব হবে। মকাইও খুব হবে। যখন এখানে বাসই করছেন, ভালভাবে করুন। নেশরা থেকে ধান পাবেন, এখান থেকে ডালটালগুলো পাবেন। গাইগরু পুষুন, মোষও পুষুন। সব আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

বলিলাম—"কিন্তু আমি একা মানুষ, এ সবের দেখা শোনা করবে কে!"

"সব আধিতে বখরাতে লাগিয়ে দিন। কিছু কিছু চুরি যাবে অবশ্য, তবু যা পাবেন তাতেই আপানার যথেষ্ট হবে। গোয়ালারা আপনার বাড়িতে এসে দুধ আপনার সামনে দুয়ে নিয়ে যাবে। দশ সের দুধের বদলে এক সের খাঁটি ঘি দেবে। সামান্য পয়সা দিলে দই ক্ষীর পেতে দেবে। সে সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি চাঁচল যাচ্ছেন কবে?"

"এখানকার রুগীগুলোকে একটু সামলে নিই—সেখানে তো তাড়া তেমন নেই।"

"কিছুমাত্র না। তাঁরা বেশ ভালো আছেন। মোটা মধুবাবু শুনছি হাডুডু-খেলার পাণ্ডা হয়েছেন। চর্বি ঝরে গেছে!"

"তাহলে আমার যাওয়ার দরকার কি?"

"তাঁরা আপনাকে দেখতে চান। গ্রামে আরও কয়েকটা রোগীও জমা হয়েছে। মোটকথা যেতেই হবে আপনাকে। কবে যাবেন, দিন ঠিক করে ফেলুন তারপর আমি তাঁদের চিঠি লিখব।"

"আচ্ছা।"

কাছারি হইতে ফিরিয়া দেখিলাম আমার বাড়ির সম্মুখে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। শুনিলাম একটি মেয়েকে নাকি ভূতে ধরিয়াছে। ভিড়ের মধ্যস্থলে দেখা গেল একটি বুড়ি একটি মেয়েকে জাপটাইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে, এত হাল্লা করিতেছ কেন? বুড়ি কিছুতেই থামিতে চায় না। অনেক ধমকধামক দিয়া বলিলাম, কি হইয়াছে ব্যাপারটা আগে বল। সে বলিল, আমার বেটীকে ভূতে ধরিয়াছে। এ ভূত আমাদের গ্রামেরই একটা চামাইয়েনের (চামারনী) ভূত। সে বড়ই গরীব ছিল, তাহার পরনে কাপড় পর্যন্ত ছিল না। মরিবার সময় কাপড় কাপড় করিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মারিয়াছিল। তাহারই ভূত ইহাকে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি করিয়া জানিলে? বুড়ি বলিল—ও চামাইন যখন যাহাকে ধরে সেই তখন ঘরের লেপ কাঁথা কাপড়চোপড় টানিয়া গায়ে দেয়, আর ঠকঠক করিয়া কাঁপে। আমার ছেলেকেও একদিন ধরিয়াছিল। আমাদের পাড়ার আর দুইচারিজনকে ধরিয়াছে। এই ভূতের জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। আপনি ডাক্তারবাবু অনেক ভূত জব্দ করিয়াছেন, দয়া করিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমরা অনেক ওঝা ডাকিয়াছি কেহ কিছু করিতে পারে নাই। আমার মনে হইল মেয়েটির ম্যালেরিয়া হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক দাগ কুইনিন মিকশ্চার খাওয়াইয়া দিলাম। বলিলাম—আমার এখানেই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাক। আরও দুই দাগ ঔষুধ খাইতে হইবে। তাহার পর তিনদিনের ঔষুধ লইয়া বাড়ি চলিয়া যাও। আর উহাকে ভূতে ধরিবে না। যাহাদের আগে ধরিয়াছিল তাহাদেরও এই দাবাই দিতে হইবে। ম্যালেরিয়াই হইয়াছিল, কুইনিনের দাপটে চামাইয়েনের ভূত পলাইয়া গেল। এ দেশের লোকজন প্রায় আদিবাসীদের মতো। শিক্ষাদীক্ষা তো কিছুই নাই, তাহার উপর নানারকম কুসংস্কারের জালে জড়িত। ভাবিলাম ইহাদের জন্য কিছু যদি করিতে পারি তাহা হইলে আমার এখানে ডাক্তারি করা সার্থক হইবে। কিন্তু অনেক সময় আমার সামর্থ্যে কুলাইত না। সবাই প্রায় গরীব। ফী তো দিতে পারেই না, ঔষধও অনেক সময় বিনামূল্যে দিতে হয়, অনেক সময় সাগু, বার্লি, পুরাতন চাউল পর্যন্ত দিতে হইয়াছে। এই ধরনের আরও দুই একটি অদ্ভুত রোগীর কথা মনে পড়িতেছে। একবার দিল্লী দেওয়ানগঞ্জে সেখানকার জমিদারদের বাড়ি গিয়াছি। জমিদার গৃহিণী অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি এমন সময় একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—দেওয়ানজির স্ত্রীকে সাপে কামড়াইয়াছে আপনি শীঘ্র চলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতক্ষণ আগে কামড়াইয়াছে, এখন কেমন আছেন তিনি? সে বলিল—একেবারে শেষ অবস্থা, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, কোনও জায়গায় সাড় নাই। ছুঁচ ফুটাইলেও বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কুইনিন বা চিনি দিলেও স্বাদ পাইতেছেন না। একেবারে চৈতন্যহীন। বলিলাম—তাহা হইলে আমি গিয়া কি করিব। কতক্ষণ আগে

কামড়াইয়াছে, জান? সে বলিল—ঠিক বলিতে পারি না। তবে ভোরে তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় কামড়াইয়াছে। জমিদারবাবু এ খবর পাইয়া নিজে গেলেন, আমাকেও বলিলেন—চলুন। হয়তো শেষ অবস্থা, তবু আমাদের যাওয়া কর্তব্য। গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য। বাড়ির মধ্যে চারজন লোকে উঠানে বসিয়া খোল করতাল বাজাইতেছে। কাছেই দুটি পায়রা বাঁধা আছে। মা মনসার কাছে বলিদান দেওয়া হইবে। খোল করতাল বাজাইয়া উহারা মা মনসার স্তব-গান করিতেছে শুনিলাম, যদিও গানের ভাষা কিছু বুঝিলাম না। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি সেখানে আরও ভিড়। দমবন্ধ হইবার যোগাড়। মনে হইল লোক না সরাইলে 'সাফোকেশনেই' রোগী মরিয়া যাইবে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া রোগিণীর কাছে গিয়া তাহার 'পাল্‌স'(Pulse) দেখিলাম। নাড়ী বেশ ভালোই চলিতেছে, তবে একটু মন্দগতি। কয়েক জায়গায় চিমটি কাটিলাম। কোন সাড়া নাই। তবে মনে হইল ভিতরে জ্ঞান আছে। দেখিলাম দুটি লোক খুব জোরে জোরে অবিচ্ছেদে মন্ত্র পড়িতেছে, পাছে মন্ত্রপাঠে কোনও ফাঁক পড়িয়া যায় এই জন্যে দুইজনে একই মন্ত্র পড়িয়া চলিয়াছে। যে স্থানে সাপে কামড়াইয়াছে সেখানে 'জহর-মহরা' নামক একটা দ্রব্য দিয়াছে। সেটা লাগিয়া আছে। পিঠে থালা লাগাইয়া আর একজন মন্ত্র পড়িতেছে, পিঠে থালাটা লাগিয়া আছে। যেখানটা বাঁধিয়া দিয়াছে সেখানে দুই তিনটি ভেন্ (Vein) খুব প্রমিনেণ্ট (prominent) হইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। আমাকে সকলে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল আপনি ইহার চিকিৎসার ভার লউন। আমি বলিলাম, ইহার আর কি করিব, এ তো প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহারা তবু ছাড়িল না। স্বয়ং দেওয়ানজি অশ্রুকণ্ঠে আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু আপনি যা করবার করুন। এরা সকাল থেকে কেবল হাল্লা করছে, ফল তো কিছুই হচ্ছে না!" ভাবিলাম আসিয়াছি যখন, একটা কিছু করি। ব্যাগ হইতে স্ক্যালপেল (Scalpal) বাহির করিয়া একটি prominent vein এ দুই একটা ইনসিস্‌ন (incision) দিলাম। গলগল করিয়া কালো রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সেই কাটার উপর খানিকটা কারবলিক এসিডও (Carbolic Acid) লাগাইয়া দিলাম। দেওয়ামাত্র রোগিণী একটা বিকট চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। ইহাতে আমিও বেশ ঘাবড়াইয়া গেলাম। রোগিণীর বড় মেয়ে তাহার বুকে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতে লাগিল ডাক্তার আসিয়া আমার মাকে মারিয়া ফেলিল। ওঝা দুইজন তারস্বরে বলিল—আমরা বিষ প্রায় নামাইয়া আনিয়াছিলাম ডাক্তার আসিয়া সব পণ্ড করিয়া দিল। এখন আর রোগীকে বাঁচানো শক্ত। ঘরের মধ্যে নারীকণ্ঠে একটা তুমুল ক্রন্দনরোল উঠিল। আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মনে হইল একটা দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে আমি যেন একটা দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া আছি। পালাইবার উপায় নাই, দরজা দিয়া ক্রমাগত পাড়ার মেয়ে-পুরুষ ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে।

ভাবিলাম আর একবার নাড়ীটা দেখি। বুকের উপর হইতে মেয়েটাকে সরাইয়া অতিকষ্টে নাড়ীটা পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম নাড়ী ভালোই আছে, আগে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার চেয়েও ভালো। তখন আমি জোর দিয়া বলিলাম, তোমরা সরিয়া যাও, ঘরে হাওয়া আসিতে দাও, দেওয়ানজির স্ত্রী মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু তোমরা না সরিলে আমি চিকিৎসা করিতে পারিব না। সকলে বাহিরে চলিয়া যাও। দেওয়ানজি তখন শশব্যস্ত হইয়া নিজেই সকলকে বাহির করিয়া দিলেন। দেখিলাম রোগিণীর দাঁত-কপাটি লাগিয়া গিয়াছে, ফিটের ঘোরে

আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। চোখে মুখে জোরে জোরে জলের ছিটা দিয়া খুব জোরে জোরে হাওয়া করিতে বলিলাম। দাঁতের উপর দাঁত কিন্তু বসিয়া রহিল, কিছুতেই খোলে না। স্মেলিং সল্টের শিশি খুলিয়া নাকে ধরিলাম। তখন জ্ঞান হইল। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি তো ভালো হইয়া গিয়াছ, ছুরি দিয়া কাটিয়া আমি সমস্ত বিষ বাহির করিয়া দিয়াছি। 'ভেন' (vein) কাটিয়া দিতে প্রচুর কালো রক্ত বাহির হইয়া চাপ বাঁধিয়া মেঝেতে পড়িয়াছিল। সকলেই বলিতে লাগিল আর ভয় নাই, সত্যই বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে। অমন কালো রক্ত! তখন আমি দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার পূর্বে কখনও হিস্টিরিয়া হইয়াছিল কি না। তিনি বলিলেন—আমার একটি মেয়ে কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে তাহার পর হইতে উহার মাঝে মাঝে 'ফিট' হয়। তখন আমি রোগিণীকে বলিলাম—মা তুমি তো ভালো হইয়া গিয়াছ, এইবার উঠিয়া বস। রোগিণী উঠিয়া বসিল। আরও কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ ঘরের দরজায় আসিয়া ভিড় করিয়াছিল, আমি জবরদস্তি সকলকে উঠানে বাহির করিয়া দিলাম। তাহার পর রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি সাপটাকে সত্যই কামড়াইতে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, না কামড়াইতে দেখি নাই। আমি ভোরে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলাম। নদীর উঁচু পাড় হইতে সরু রাস্তা দিয়া আমি নদীর দিকে নামিতেছিলাম এমন সময় একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ ফণা বিস্তার করিয়া পাশের ঝোপ হইতে বাহির হইল এবং আমার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া যাই এবং পায়ে কিসের একটা আঘাত অনুভব করি। সকলে ধরাধরি করিয়া আমাকে বাড়িতে লইয়া আসে। তাহার পর আমি আর কিছুই জানি না। যেখানটায় 'জহর-মহরা' বসাইয়াছিল সেখান হইতে জহর-মহরা তুলিয়া স্থানটা পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম সেখানে কামড়াইবার কোন চিহ্ন নাই, একটা খোঁচা-লাগা ক্ষতের মতো রহিয়াছে। বোধহয় যখন তিনি ঘাটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান তখনই কোনও পাথরের খোঁচা লাগিয়াছিল। ক্রমশঃ তাঁহার অনুভূতি সজাগ হইয়া উঠিতে লগিল। ক্রমশঃ তিনি চিনি ও কুইনিনের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন, চিমটি কাটিলে 'উঃ' করিয়া উঠিলেন।

হিস্টিরিয়া রোগীরা অনেক সময় যাহা মনে করে সেই সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। যেই তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন যে রক্তের সঙ্গে বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে অমনি তিনি সুস্থ হইলেন। অনেক সময় 'শক্' (shock)-এই হিস্টিরিয়া রোগীদের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ভগবানের কৃপায় দেওয়ানজির স্ত্রী বাঁচিয়া গেলেন। আমারও খুব নাম হইয়া গেল। ক্রমশঃ এই অঞ্চলেও আমার প্র্যাকটিস প্রতিষ্ঠিত হইল। দেওয়ানজি আমার একজন পরম হিতৈষী হইয়া উঠিলেন।

আর একটি এরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। হঠাৎ একদিন মেদিনীপুরের বল্লভ মৌয়ার ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি একজন বড় গৃহস্থ, কিছু জমিদারিও কিনিয়াছিলেন। একটি পালকি আসিয়া আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া গেল। বল্লভ মৌয়ারের কিন্তু দেখা পাইলাম না। শুনিলাম তিনি অন্দরে আছেন। আমাকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইয়া রাখিলেন। তাঁহার এক গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাহার অসুখ? তিনি বলিলেন—বাবুসাহেবের গাড়োয়ানের স্ত্রী কাল রাত্রে একটি মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে, তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইতেছে না। আমি বলিলাম—তাহা হইলে এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা তো অনুচিত, আমাকে সেই গাড়োয়ানের বাড়ি লইয়া চলুন। এমনিতেই অনেক দেরি হইয়াছে, আর দেরি করিলে তাহাকে বাঁচাইতে পারিব না। এই বলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। গোমস্তাটি একটি চাকর সঙ্গে দিলেন, সেই আমাকে সঙ্গে করিয়া গাড়োয়ানের বাড়িতে লইয়া গেল। বাড়িটি

একেবারে গ্রামের প্রান্তে। হাঁটিয়া যাইতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগিল। পথে নেকি মাড়োয়াড়ির সহিত দেখা। কিছুদিন পূর্বে সে তাহার পুত্রের সর্দিজ্বরের ঔষধ আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল। পুত্রটি ভালো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও দুর্বলতা কাটে নাই। তাই সে একটি 'টনিক' লইবার জন্য আমার কাছে যাইবে ভাবিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখানেই যখন আমার সহিত দেখা হইয়া গেল তখন আমি যদি দয়া করিয়া—। তাহাকে বলিলাম—আমি একটি শক্ত রোগী দেখিতে যাইতেছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, সেখানেই আপনাকে একটা প্রেসক্রিপসন্ (prescription) লিখিয়া দিব। নেকি মাড়োয়ারিও আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। ভাগ্যে আসিয়াছিল। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া দেখি দুইজন 'চামাইন' (চামারনী) রোগিণীর পেট মলিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। দেখিলাম ঘরের মেজে রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, কাপড়চোপড়ও রক্তে ভিজা। রোগিণীর নাড়ি অতি ক্ষীণ। অবিলম্বে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে বাঁচিবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বাক্স হইতে রক্ত বন্ধ করিবার একটা ইন্‌জেকশন দিলাম। সহসা একটা দুর্গন্ধ উঠিল—মাংস পোড়া গন্ধ। জিজ্ঞাসা করিলাম—গন্ধ কিসের? একজন বলিল যে 'চামাইন' ইহাকে প্রসব করাইয়াছে সে একটা 'তুক্' করিতেছে। কি তুক্ ? ও ঘরে বসিয়া নাকি রোগিণীর 'ফুল'টা—ডাক্তারি নাম প্লাসেণ্টা (placenta)—একটা কড়ায় চড়াইয়া তেলে ভাজিতেছে। ইহাতে নাকি রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। অবাক হইয়া গেলাম। আমি তো ইন্‌জেকশন দিয়াইছিলাম, মনে হইল এইবার ভালো করিয়া 'প্লাগ' (plug) করিয়া দেওযা উচিত। কিন্তু অত স্টেরাইল (sterile) ব্যাণ্ডেজ বা 'গজ' (gauge) তো আমার সঙ্গে আনি নাই। তখন নেকি মাড়োয়ারিকে কাজে লাগাইলাম। বলিলাম—আপনি এখনি ছুটিয়া গিয়া আপনার দোকান হইতে পাতলা একথান ব্যাণ্ডেজের কাপড় পাঠাইয়া দিন। সে বলিল—ব্যাণ্ডেজের কাপড় আমার দোকানে নাই। আমি তখন বলিলাম, যে কোনও প্রকার পাতলা কাপড়েই কাজ চলিবে। এমন কি পরনের কাপড় হইলেও চলিবে। আপনি তাড়াতাড়ি চলিয়া যান। কাপড়ের দাম যা লাগে আমি দিব। শীঘ্র চলিয়া যান। নেকিরাম চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ছুটিতে ছুটিতে কিছু পাতলা কাপড় আনিয়া হাজির করিল। তখন আমি কাপড়গুলি ফালা ফালা করিয়া চিরিয়া ফেলিলাম। বাড়ির লোকেদের বলিলাম, একটা পরিষ্কার হাঁড়ি নাই? নেকিরামই ছুটিয়া গেল এবং আমার ফরমাশ মতো একটি বড় পিতলের ডেকচি এবং একটা বড় চামচ লইয়া আসিল। পাশের ঘরে 'চামাইন' ফুলটা ভাজিতেছিল। তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার আর কত দেরি? সে বলিল, হইয়া গিয়াছে। এইবার রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, আমাকে উনুনটা খালি করিয়া দাও, আমি গরম জল চড়াইয়া দিব। আমি ভাবিয়াছিলাম সে আমার বিরোধিতা করিবে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া হঠাৎ সে গড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, আপনি ডাক্তারবাবু আমার মুখ-রক্ষা করুন। আপনি আমার মেয়েকে বাঁচাইয়াছিলেন। কবে বাঁচাইয়াছিলাম, তাহা মনে পড়িল না। গরীব চামাইনটার মুখে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে দেখিলাম। এ রোগিণীটি যদি মারা যায়, তাহা হইলে আর কেহ তাহাকে ছেলে প্রসব করিতে ডাকিবে না। বল্লভ মৌয়ার এ অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং এই গাড়োয়ানটি তাহার অতি প্রিয়-জন। বল্লভ মৌয়ার ইহার সেবায় এবং বাক্‌পটুতায় এমন বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন যে ইহার কথাতেই ওঠেন বসেন। নিমু গাড়োয়ানই তাঁহার বন্ধু ও পরামর্শদাতা। ভাই ভাইপো গৃহিণী কাহারও কথায় ইনি কর্ণপাত করেন না, কিন্তু নিমু গাড়োয়ানের কথায় করেন। নিমু গাড়োয়ানের স্ত্রী মরিয়া গেলে,

'চামাইন'টি সত্যই বিপদে পড়িয়া যাইবে। তাহাকে বলিলাম, তুমি ভালো করিয়া উনুনটা ধরাইয়া তাড়াতাড়ি জল চড়াইয়া দাও, আব তাহাতে এই কাপড়ের টুকরোগুলা ও চামচেটো ফুটাইয়া দাও। এখনও আশা আছে। এগুলো গবম জলে অন্ততঃ আধঘণ্টা ফুটিবে। তুমি উনুনটা ভাল করিয়া ধরাইয়া ফেল দিকি। চামাইন তৎপর হইয়া উঠিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাঁড়ির জল ফুটিতে আরম্ভ করিল। আধঘণ্টা ফুটাইয়া তাহার পর সেটি ঠাণ্ডা করিতেও বেশ কিছু সময় লাগিল। আমাব বাক্সে খানিকটা ব্যাণ্ডেজ ছিল, আমি সেটাকেই স্পিরিট ভিজাইয়া আঙুলের সাহায্যে যতটা পারিলাম ভিতরে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহাতেই একটু কাজ হইল। তাহার পর ফোটানো কাপড়গুলি ঠাণ্ডা হইলে চামচের বাঁট দিয়া খুব ঠাসিয়া 'প্লাগ' (plug) করিয়া দিলাম। রোগিণীর নাড়ী বড় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে ব্রাণ্ডি সহযোগে গরম দুধ একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম। নিমু গাড়োয়ান একটি কথাও বলে নাই। সে সারাক্ষণ হাতজোড় করিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে বলিলাম—তোমার স্ত্রী যদি বাঁচে তাহা হইলে তাহার পুর্নজন্ম হইল বুঝিতে হইবে। এই চামাইন অনেক মেহনত করিয়াছে। এ না থাকিলে আমি একা সামলাইতে পারিতাম না। বেচারী যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে। চামাইনটির চোখে সভক্তি কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। সে আবার আমার পদধুলি লইল। ভবিষ্যতে আমার নিজের ছেলে-মেয়ে হইবার সময় বরাবর এই চামাইনকে আমি ডাকিয়াছি। প্রসব অবশ্য আমি নিজে করাইতাম, কিন্তু আঁতুড়ের সব ভার উহার উপরই থাকিত। কাপড়চোপড় কাচা, ছেলেকে তেল মাখানো, পোয়াতীর পায়ে কোমরে পিঠে তেল মালিশ করা সব সে-ই করিত। পুরা এক মাস ধরিয়া আঁতুড়ঘরে থাকিত সে। একমাস পরে আঁতুড় তুলিয়া দুই সের চাল একটি শাড়ি এবং দুইটি টাকা লইয়া সে বাড়ি ফিরিয়া যাইত। অবশ্য একমাসের খাওয়া আমিই তাহাকে দিতাম। আঁতুড়ঘরের একধারেই সে শুইত। মাঝে মাঝে মাসে অন্ততঃ দুইবার করিয়া সে হাসিমুখে আসিত নুনু (শিশু) কেমন আছে দেখিবার জন্য। তখনও দুই চারি আনা বকশিশ পাইত সে। সে আমাদের ঘরের লোক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে আমরা দাই আখ্যা দিয়াছিলাম।

নিমু গাড়োয়ানের বাড়ি হইতে ফিরিয়া দেখিলাম বল্লভ মৌয়ার তখনও অন্দর হইতে সদরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুব নিড়বিড়ে লোক ছিলেন তিনি। কোথাও যাইবার জন্য বা কাহারও সহিত দেখা করিবার জন্য চট্ করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের মনোমতভাবে ভদ্রপরিবেশে সাজিয়া বাহির হইতে বেশ দেরি হইত। কোথাও বাহির হইবার আগে তিনি সুগন্ধি সাবান যোগে গরম জলে স্নান করিতেন। তাহার পর গা মুছিয়া মাথায় ফুলেল তেল এবং শরীরে বিশেষ স্থানে গোলাপী আতর লাগাইতেন। তাহার পর তাঁহার তৃতীয় পত্নী কেয়ারি-করা বাবরী চুলগুলি সুন্দর করিয়া আঁচড়াইয়া দিত। তাহার পর তিনি কিছু ক্ষীর খাইতেন: কোথাও যাইবার পূর্বে—এমন কি অন্দর হইতে সদরে আসিবার সময় তিনি কিছু 'জল্খই' (জলখাবার) খাইয়া তবে বাহির হন। ক্ষীরের সহিত লাড়ু তাঁহার প্রিয় খাদ্য। আমি গিয়া পৌঁছিবার প্রায় মিনিট পনেরো পরে বল্লভ মৌয়ার বাহিরে আসিলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ তিনি। মাথাটা প্রকাণ্ড। কেয়ারি-করা বাবরি চুল সিংহের কেশরের মতো। একটি চুনোট-করা আদ্দির পাঞ্জাবি ও গোলাপী রঙের একটি শৌখিন কাপড় পরিয়াছেন দেখিলাম। পায়ে কার্পেটের পাম্‌শু। তাঁহার পিছু পিছু প্রকাণ্ড এবং সুদৃশ্য একটি রূপার পানের ডিবা বহন করিয়া তাম্বুলকরঙ্ক বাহিনীর মতো যে রূপসী কিশোরীটি আসিল শুনিলাম সে নাকি বল্লভ

মৌয়ারের কনিষ্ঠ শ্যালিকা। বল্লভ মৌয়ার আমাকে ঝুঁকিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমার প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইল, সেজন্য ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে ডাকিয়াছিলাম নিমুর স্ত্রীর জন্য। তাহাকে একবার দেখিয়া আসুন। গতরাত্রে একটা মরা ছেলে প্রসব করিবার পর হইতে সে কেমন যেন বেহালত্ (অসুস্থ) হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়ি যাহা লাগে সব আমি খরচ করিব। আমি বলিলাম—আমি তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি এবং সব ব্যবস্থা করিয়াছি। অবস্থা খুব ভাল নয়, কিন্তু ভগবান দয়া করিলে বাঁচিয়া যাইবে। আমার এখন আর কিছু করিবার নাই। কয়েকটি ইন্‌জেকশন লিখিয়া দিতেছি। সেগুলি কাটিহার বা সাহেবগঞ্জ হইতে আনাইয়া রাখুন। ঔষুধ আসিলে আমি ইন্‌জেকশন দিয়া যাইব। বল্লভ মৌয়ার বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। বলিলেন, ইহার মধ্যেই আপনি সব কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছি। আমাদের 'কিসমত্ (ভাগ্য), খুব ভালো যে আপনার মতো 'ডাকটার' আমাদের এখানে প্র্যাকটিস করিতে বসিয়াছেন। আমাকে কুড়ি টাকা ফী দিতে গেলেন। আমি বলিলাম, রোগী আগে বাঁচুক তখন ফীয়ের কথা ভাবিব। পুলকিত বল্লভ মৌয়ার বলিলেন—বেশ তাহাই হইবে। এখন একখিলি পান খান তাহা হইলে। কিশোরীটিকে ইঙ্গিত করতেই সে বাটা খুলিয়া এক খিলি সুগন্ধি পান বাহির করিয়া দিল। বল্লভ মৌয়ারের বাটাতে তিন চার রকম ভালো পান, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ, কিমাম জরদা ও খৈনি থাকে। একটি ছোট সুদৃশ্য জাঁতিও আছে দেখিলাম। নিজের হাতে সুপারি কুঁচাইয়া খাওয়া তাঁহার আর একটি বিলাস। পান খাইয়া উঠিতে যাইতেছি এমন সময় বল্লভ মৌয়ার হাত জোড় করিয়া বলিলেন, সামান্য কিছু ভেট আপনার সঙ্গে পাঠাইতেছি এটা দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। প্রশ্ন করিলাম, কি ভেট? বলিলেন, এখনি আমার 'কামত্' (চাষ বাড়ি) হইতে কিছু ভালো দই ও ঘি আসিয়াছে। আপনি কিছু লইয়া যান। আমার পালকির পিছনে একজন লোক দই ও ঘি লইয়া আসিতে লাগিল। হাতে ঘিয়ের ভাঁড়, মাথায় দইয়ের হাঁড়ি। এ ধরনের ঘটনা এখন বিরল হইয়া আসিয়াছে, আগে কিন্তু মোটেই বিরল ছিল না। তখন সম্পন্ন গৃহস্থরা এবং জমিদাররা আশপাশের ভদ্রলোকেদের এবং অফিসারদের প্রচুর উপঢৌকন দিতেন। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু মহলদারদের নিকট হইতে এত মাছ পাইতেন যে আমার বাড়িতে প্রত্যহ একটা করিয়া পাকা মাছ পাঠাইয়া দিতেন। আমিও সকলকে বিতরণ করিতাম। আজকাল দেশের সে ঐশ্বর্য আর নাই । এখন অধিকাংশ লোকেরই নুন আনিতে পান্তা ফুরাইয়া যায়। হৃদয়ের প্রসারতাও কমিয়া গিয়াছে। যন্ত্রসভ্যতাই বোধহয় ইহার কারণ। এখন প্লেনযোগে পূর্ণিয়ার মাছ-দুধ-ঘি কলিকাতা বোম্বাই তো বটেই আরও দূরদূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে। আগে আমরা ডাকাত পড়িলে তাহাদের লাঠিসোঁটা বন্দুক লইয়া ঠেকাইতাম, কিন্তু ট্রেন, বাস বা এরোপ্লেনরূপী ডাকাতদের তাড়াইবার সামর্থ্য আমাদের নাই। বর্গীরা নূতন রূপে দেশে দেশে হানা দিয়া ফিরিতেছে। ইহাদের কেন্দ্র করিয়া কতরকম কালো-বাজার, কতরকম আঙুল-ফুলিয়া-কলাগাছ-হওয়া, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা। এই ডাকাতদের আমরা মানিয়া লইয়াছি। সুতরাং আমাদের দরিদ্র দেশের দুর্দশা বাড়িতে থাকিবে। আমাদের গঙ্গার ইলিশ—যাহা টাকায় আটটা করিয়া পাওয়া যাইত—তাহা এখন বহুমূল্যে ক্রীত হইয়া বিদেশে রেফ্রিজারেটারে শোভা পাইতেছে। ধনীরাই এখন ভোক্তা, দরিদ্রেরা বঞ্চিত। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স (Charles Dickens) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনকে ব্যঙ্গ করিয়া 'হার্ড টাইমস্' নামে একটি পুস্তক

লিখিয়াছিলেন। আমি বইটি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাদৃশ পটু ছিলাম না বলিয়া বইটির সম্পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু যতটুকু পারিয়াছিলাম ততটুকুতেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে টাকা, আনা, পয়সার দিকে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য-ষোল আনা লোভ, তথাকথিত যুক্তির (reason) দিকে প্রবল প্রবণতা, হৃদয়াবেগকে বর্জন করিয়া কেবল স্বার্থের পিছনে ছোটা—এসব করিলে শেষ পর্যন্ত সুখও হয় না, মঙ্গলও নাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দানবের শোষণ হইতে সনাতন মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়া উঠিবেই। কিন্তু কবে উঠিবে কে জানে! আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীরা কি এ ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারিবে? আমরা কিন্তু তখন যে যুগে বাস করিতাম তাহা স্বর্ণযুগ ছিল। মনুষ্যত্ব একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই, শ্রদ্ধা-প্রেম-ভালোবাসাকে লোকে মূল্য দিত, খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর ছিল।

ভগবানের কৃপায় নিমু গাড়োয়ানের স্ত্রী ভালো হইয়া গেল। একটি antitetanic serum এবং গোটা তিনেক streptccoccal serum দিতে হইয়াছিল।

এ ধরনের বিচিত্র রোগী আমার প্রায়ই জুটিত। ডাক্তারি বিদ্যার সহিত প্রত্যুৎপন্নমতি এবং প্রচুর সহৃদয়তাই ছিল আমার সম্বল। আমি রোগীকে প্রচুর আশ্বাস দিতাম এবং বলিতাম ভগবানকে ডাক, পীরবাবাকে মানত কর, সব ঠিক হইয়া যাইবে। অধিকাংশই ঠিক হইয়া যাইত।

আমার বাড়িতে এদিকে থিয়েটারের রিহার্সাল খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত গান-বাজনা রিহার্সাল চলিত। আমি কিন্তু তাহাতে বড় একটা যোগ দিতে পারিতাম না। এই সময়কার দু একটি ঘটনা কিন্তু এখনও মনে আছে। আমি শঙ্করা হইতে ফিরিবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই থিয়েটার-পার্টি একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করিলেন। সে প্রহসন খুব জমিয়া উঠিল সুখলাল পাঁড়ে বলিয়া একটি রেলের পয়েণ্টসম্যানের জন্য। সুখলাল ভোজপুরবাসী। ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলিতে পারিত। ছোকরার তাগড়া চেহারা। এই জন্যই জগন্নাথবাবু তাহাকে একটি ক্ষত্রিয় দূতের ভূমিকা দিয়াছিলেন। দূতের ব্যক্তব্যও বিশেষ কিছু ছিল না। কেবল বলিতে হইবে—

'রাজা এখুনি আসছেন'। কিন্তু সুখলাল স্টেজে হতভম্ব হইয়া বলিয়া ফেলিল—'রাজা কাঁহা গিয়া চলি'। বলিয়াই মুচকি হাসিয়া পলায়ন করিল।

ত্রিপুরারি সিং থিয়েটার দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, সুখলালের অভিনয় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে আমি মেডেল দিব।

ত্রিপুরা সিংহের থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া জগন্নাথবাবু আর এক কাণ্ড করিলেন। একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। 'জয় জয় জয় জয় ত্রিপুরারি, জয় জয় মুকুন্দ মুরারি। আমরা এসেছি মনিহারি, সাহায্য কর কিছু হে শক্তিধারী'। মন্মথ গলায় হার্মোনিয়ম ঝুলাইয়া তাঁহার কাছারির সামনে গিয়া মধুর কণ্ঠে গানটি গাহিতে লাগিল। কেশ মশাই হাতে একটি একতারা লইয়া পায়ে নূপুর বাঁধিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। চারদিকে ভিড় জমিয়া গেল।

ত্রিপুরারি সিংহ জোড়হস্তে তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি সাহায্য চান আপনারা?"

জগন্নাথবাবু বলিলেন—"আমাদের একটি স্টেজ করিয়ে দিন। আপনার অনেক তক্তা আর 'স্লীপার' পড়ে আছে। আপনি অনুমতি দিলে ওগুলোর সাহায্যে আমরাই স্টেজ বানিয়ে নেব। কাল আমরা স্টেশনের স্লীপার নিয়ে অভিনয় করেছিলাম। শুনছি এজন্য নাকি শ্যামবাবুর নামে -

ওপরে রিপোর্ট চলে গেছে। একটি বাঙালী ছোকরাই নাকি রিপোর্টটি করেছে। সে পার্ট চেয়েছিল, আমরা দিতে পারিনি। শ্যামবাবু ভদ্রলোক, তাঁকে আমরা আর বিপন্ন করতে চাই না।" ত্রিপুরারি সিংহ বলিলেন—"এ আর বেশী কথা কি। তৈরি করুন আপনারা স্টেজ। রায়মশায়ও এসে গেছেন, তাঁকে বলে দিচ্ছি।" ডাকিবামাত্র একচক্ষু রায়মশায় বাহিরে আসলেন। ত্রিপুরাবাবু তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—"এদের ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখুন। দেশে গমের ফলন ভালো হয়নি সে চিন্তা না করে ওরা থিয়েটার করতে যাচ্ছেন। ওঁদের একটা স্টেজ করিয়ে দিন। এবার কি বই নাবাচ্ছেন?" জগন্নাথবাবু সগর্বে বলিলেন—'জনা', ডাক্তারকে প্রবীরের পার্ট দিয়েছি আমরা।"

ত্রিপুরা সিংহ পাঁচটি টাকা বাব করিয়া জগন্নাথবাবুকে দিলেন।

"এই নিন, সুখলালকে একটা মেডেল কিনে দেবেন।"

একচক্ষু রায়মহাশয় কোনও মন্তব্য করিলেন না, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ত্রিপুরারি এই মাথায়-হাত-বোলানোর অর্থ কি তাহা জানিতেন।

"আপনার কি আপত্তি আছে কোন?"

রায়মশায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন,"আমাব আপত্তি নেই। আমিও কাল পিছনের দিকে বসে ওঁদের থিয়েটার দেখেছি। ওঁরা খুব উঁচুদরের অভিনেতা। আমি আইনের দিক দিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করছি। এখানকার জমিদারিতে আরও দুজন জমিদারের অংশ আছে। বল্লভ মৌয়ার অবশ্য কিছু বলবেন না। কিন্তু টেলার সাহেব বলতে পারেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের টক্কা-টক্কি চলছে এবং আরও কিছুদিন চলবে।"

ত্রিপুরা সিংহ প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু ছিলেন।

বলিলেন, "আমার যে খাস জমি তাতেই ওঁরা স্টেজ তৈরি করুন। তাতে তো কোন বাধা হবে না।"

"আজ্ঞে না।"

"তাহলে সেই ব্যবস্থাই করে দিন। গঙ্গার ধারে আমার অনেক খাস জমি আছে। যেটা ওঁদের পছন্দ সেইখানেই ওঁরা স্টেজ বাঁধুন।"

পনেরো দিনের মধ্যে গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর স্টেজ বাঁধা হইয়া গেল। ত্রিপুরা সিংহই সব খরচ বহন করিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একটি সিপাহী মোতায়েন করিয়া স্টেজটা পাহারা দিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন।

আমি প্রশ্ন করিলাম—পাহারা দিবার প্রয়োজন কি? ত্রিপুরাবাবু বলিলেন—খুব প্রয়োজন। এখানকার লোকরা ভয়ানক চোর। পাহারা না থাকিলে ওই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হইতে স্লীপার তক্তা সব একে একে সরিয়া যাইব। আমার এত সিপাহী কাছারিতে বসিয়া বসিয়া ডাল-রুটি খাইতেছে, একজন ওখানে পাহারা দিক না। আমার প্রকাণ্ড বড় একটা "তিরপল" আছে, স্টেজের ওপরটায় একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিব। সিপাহীটা রাত্রে স্টেজের উপর শুইতে পারিবে। উহাকে বলিয়া দিয়াছি, একটি জিনিস যদি হারায় তাহা হইলে তোমাকে আস্ত রাখিব না।

সুন্দর স্টেজ হইয়া গেল। সেখানে বর্ষাকালে আমরা অবশ্য অভিনয় করিতে পারিতাম না। অন্যান্য ঋতুতে অভিনয় বেশ জমিত। অভিনয় প্রায় রবিবার হইত। কারণ সাহেবগঞ্জের

পার্টি আসিয়া অভিনয়ে যোগ দিত। তাহাদের অধিকাংশই চাকুরে। সোমবার সকালের স্টীমারে তাহারা ফিরিয়া যাইত।

আমাকে অবশেষে একদিন চাঁচল যাইতে হইল। তাঁহাদের সাগ্রহ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। চাঁচলের যিনি বড়বাবু তাঁহার সহিত ইতিপূর্বে আমার দেখা হয় নাই। গতবারে আমি যখন গিয়াছিলাম তখন তিনি কাশীতে ছিলেন। শুনিয়াছিলাম লোকটি ঘোর মদ্যপ। সব সময়েই মদ খান। এবার আমি যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দেড়টা। ট্রেন 'লেট' ছিল। স্টেশনে আমার জন্য ম্যানেজারবাবু পালকি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। জমিদারবাবুর প্রাসাদতুল্য ভবনে নীচের তলায় আমার জন্য একটি ঘর আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে দেখিলাম আমার জন্য একটি সুসজ্জিত শয্যা এবং একটি চাকর অপেক্ষা করিতেছে। আমি শুইতে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় ম্যানেজারবাবু আসিয়া বলিলেন, বড়বাবু আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য জাগিয়া আছেন। আপনার খাবার লইয়া ঠাকুর এখনি আসিতেছে। আপনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলুন। হাত মুখ ধুইবার প্রায় রাজকীয় ব্যবস্থা করাই ছিল। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, ভাল সুগন্ধি সাবান, লোমওয়ালা তোয়ালে সবই ছিল। মুখ হাত ধোয়ার পরই একটি চাকর দুইটি দামী কার্পেটের আসন বিছাইয়া দিয়া গেল। তাহার পরই একটি কার্পেটের সামনে প্রকাণ্ড বড় থালায় গরম লুচি এবং অনেকগুলি বাটিতে নানারকম তরকারি লইয়া জন কয়েক মৈথীল ঠাকুর হাজির হইল। ম্যানেজারবাবু আসিয়া বলিলেন, "আপনি এবার খেতে বসে যান। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

আমি বলিলাম, "এত রাত্রে আমি আর কিছু খাব না ভেবেছিলাম—কিন্তু এত খাবার করিয়েছেন! ম্যানেজার সংক্ষেপে বলিলেন,"বড়বাবুর হুকুম! ওই যে উনি আসছেন—।"

একটি নাতিদীর্ঘ কৃষ্ণকায় লোক প্রবেশ করিলেন। গায়ে জামা নাই। মাথার চুল কদম-ছাঁট। আসিয়া তিনি সসম্ভ্রমে আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন."আপনার অন্তরের পরিচয় আমি অনেকদিন আগে পেয়েছি। আজ বাইরের চাক্ষুষ পরিচয় করব। খেতে বসে যান। ঠাকুর একটি একটি করে গরম লুচি ভেজে নিয়ে এস।" খাইতে বসিলাম। তিনিও আসনটা আমার আর একটু কাছে আগাইয়া আনিলেন। তখন টের পাইলাম তিনি মদ খাইয়া রহিয়াছেন। দেখিলাম চক্ষু দুইটি বেশ লাল। কিন্তু চক্ষুর দৃষ্টি ভয়ংকর নহে, দুষ্ট বালকের দৃষ্টির মতো। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, "আপনি যে মোটা দুজনকে সারিয়েছেন এতে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি। প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন আপনি। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে আছে। আমাদের বাড়ির সামনে একবার প্রকাণ্ড একটা গাছ ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। গাছটা পড়েই ছিল। হঠাৎ একদিন একটা গাঁট্টাগোঁট্টা গোছের বেঁটে লোক বাবার কাছে এসে বলল—হুজুর গাছটা আমাকে যদি দান করেন তাহলে গরীবের বড় উপকার হয়।

বাবা বললেন—গাছটা দিতে তোমাকে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যখন গরীব তখন ওটাকে নিয়ে যাবে কি করে? ওর ডালগুলো কাটতে হবে, তারপর গাড়ি করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে সব পারবে কি? আমি ভেবেছিলাম নিজেই ওটাকে কাটিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। তুমিও এসে সে সময় কিছু নিয়ে যেও।

গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটা বলল—হুজুর যদি হুকুম দেন আমি দাঁতে করে টেনে সমস্ত গাছটা নিয়ে যেতে পারি। শুনে বাবা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তা যদি পার নিয়ে যাও। তার পরদিন লোকটা একটা মোটা শক্ত দড়ি এনে গাছটার গুঁড়িতে বাঁধল। তারপর দাঁত দিয়ে টেনে

টেনে নিয়ে গেল প্রকাণ্ড গাছটাকে। বাবা তাকে এর জন্য দশ টাকা বকশিশও দিলেন। আপনিও প্রায় সেইরকম অসাধ্যসাধন করেছেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে দুষ্ট বালকসুলভ দৃষ্টিটি চকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—আমার অসুখটি সারাতে পারেন? জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার আবার কি সুখ?

তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—"মদ। ভূতের মতো চব্বিশ ঘণ্টা ঘাড়ের উপর চড়ে আছে, কিছুতে নাবাতে পাচ্ছি না।" আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম,"চেষ্টা করলেই পারবেন। মানুষের শক্তি অসীম, সে ইচ্ছা করলে সব করতে পারে। আপনি কাল থেকেই যদি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন যে কিছুতেই আর মদ খাবেন না তাহলেই হয়ে গেল। প্রথম প্রথম একটু হয়তো কষ্ট হবে। বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন—কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নেই। সেই হয়েছে মুশকিল। ঘোড়ার মুখে লাগাম টেনে ধরতে পারি, নিজের মনের মুখে লাগাম দিতে পারি না। ব্যাধি ওইখানেই। আবার তাঁহার চোখে সেই দষ্টু-দুষ্টু দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—বেশ আমি আপনাকে একটা মিকশ্চার তৈরি করে দিয়ে যাব, যখন খুব কষ্ট হবে এক দাগ খাবেন। তাতেই অনেকটা ভালো বোধ করবেন। মদ কিন্তু কাল থেকে খাওয়া বন্ধ করে দিন।

অত রাত্রে সেদিন ভূরিভোজন হইল। বড়বাবু আমাকে খাওয়াইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া নিজে দাঁড়াইয়া মশারিটি ভালো করিয়া গুঁজাইয়া তবে গেলেন। যাইবার আগে প্রশ্ন করিলেন, আপনার ওষুধের প্রেসক্রিপসনটা কাল দেবেন? বলিলাম, না আমি প্রেসক্রিপসন দেব না। নিজে হাতে ওষুধ বানিয়ে দেব। প্রেসক্রিপসন দিলে আপনি বার বার ওই ওষুধ বানিয়ে আনবেন। তখন মদের বদলে ওই প্রেসক্রিপসনই আপনার ঘাড়ে চড়বে। সেটি হতে দিচ্ছি না। আমি কুড়ি দাগ ওষুধ নিজে আপনাকে বানিয়ে দেব। দরকার হয় তো আবার আমার কাছে লোক পাঠাবেন। আবার তাঁহার চোখে সেই দুষ্টু-দুষ্টু হাসি ফুটিয়া উঠিল। খনিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন—বেশ, তাই হবে।

সকালে উঠিয়া দেখিলাম বাড়ির সামনে একটা ভিড় জমিয়া আছে। কিন্তু অন্দর হইতে একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল—আপনি আগে ভিতরে চলুন। আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। ভিতরে গিয়া দেখিলাম আমার পুরাতন রোগী-রোগিণীর সত্যই আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। যে স্থূলকায় ভদ্রলোকটি স্থবির চর্বির স্তূপ ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমি চিনিতেই পারি নাই। তিনি সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবকের চেহারা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমাকে চিনতে পারছেন? আমি এখন রোজ দশ মাইল হাঁটি। ভাত রুটি চিনি ছেড়েছি। কেবল তরকারি, মাছ আর দুধ খাই।"

একটি বৃদ্ধা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার অসুখটি বাবা তোমাকে সারিয়ে দিতে হবে। অসুখের ইতিহাস ও বিবরণ শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল তাঁহার জরায়ুতে ক্যানসার হইযাছে। বলিলাম—আপনি কলিকাতা চলিয়া যান, সেখানে কেদার দাসকে দেখান। আমি ও অসুখের ভার লইতে পারিব না। কারণ যে অসুখ বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে তাহা সারাইবার ঔষধ আমার কাছে নাই। কলিকাতার বড় ডাক্তার হয়তো অপারেশন (operation) করিয়া কিছু করিতে পারেন। আপনার কলিকাতায় যাওয়াই উচিত।

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি কোথাও যাব না। তোমারই চিকিৎসায় থাকব। তুমি যা ওষুধ দেবার দাও, ভগবানের যদি দয়া হয় ওতেই ভালো হব, তা না হলে মরে যাব। মরতে আমার ভয় নেই। এই ধরনের অতি-বিশ্বাসী রোগী লইয়া মাঝে মাঝে

বিপন্ন হইয়াছি। বলিলাম, ওষুধপত্র কিনবার জন্য কয়েকদিন পরে হয়তো আমাকে কলকাতা যেতে হবে, তখন আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। সেখানে বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করব। ততদিন একটা ওষুধ দিচ্ছি, খান। সেই ওষুধ খাইয়াই বুড়ি ভালো হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে আর কলিকাতা যাইতে হয় নাই। আমার ডাক্তারি-জীবনে এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার চিকিৎসার কৃতিত্বের নমুনা হিসাবে এগুলিকে কখনও ধরি নাই। এগুলি সেই সব রহস্যময় ঘটনা যাহার কোন অর্থ নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত।

ভিতরে প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল। তাহার সদগতি করিয়া বাহিরে আসিলাম। ম্যানেজারবাবু বলিলেন, বড়বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন আপনার ঘরে। রাত্রে যে ঘরে শুইয়াছিলাম সেই ঘরে গেলাম। গিয়া দেখি বড়বাবু ছয় বোতল ব্রাণ্ডি লইয়া বসিয়া আছেন। পাঁচটি বোতল সীল্‌ড (sealed), যষ্ঠটি অর্ধেক খালি। বড়বাবু বলিলেন—আমার যা কিছু স্টক ছিল আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার মিকশ্চার আজ তৈরী করে দিন। মদ খাবার ইচ্ছা হলে মিকশ্চার এক দাগ খেয়ে ফেলব। এই তো? ম্যানেজারবাবু, ওগুলো আনতে বলুন। একটি মুণ্ডিত-মস্তক প্রকাণ্ড-শিখাসমন্বিত পুরোহিত একটি প্রকাণ্ড তাম্রকুণ্ডে কিছু গঙ্গাজল এবং গঙ্গাজলের ভিতর কিছু তুলসীপাতা লইয়া প্রবেশ করিল এবং বড়বাবুর সামনে সেগুলি রাখিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। বড়বাবুকে সবাই যমের মতো ভয় করিত। বড়বাবু আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া সেই তাম্রকুণ্ড স্পর্শ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—তামা তুলসি গঙ্গাজল স্পর্শ করে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি আর স্বেচ্ছায় মদ স্পর্শ করব না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন সত্যই আর মদ স্পর্শ করেন নাই। অবশ্য তাঁহার আয়ু বেশী ছিল না। বড় শিকারী ছিলেন। শিকার করিতে গিয়া বাঘের হাতে প্রাণ দেন। বাঘটাকেও রেহাই দেন নাই। শিকার-শিকারী উভয়েই মৃত্যুর ক্রোড়ে পাশাপাশি শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন।

চাঁচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম খুব শোরগোল করিয়া জনার রিহার্সাল হইতেছে। জগন্নাথবাবু বলিলেন, ডাক্তার তোমার রিহার্সাল দেওয়া হয়নি। এবার কিন্তু সাত দিন অন্ততঃ সন্ধ্যার পর তোমাকে ছুটি দেব না। ঘণ্টাখানেক আমাদের জন্যে দিও। তাতেই হয়ে যাবে।

সাত দিন খুব রিহার্সাল চলিল এবং আরও সাত দিন পরে মহাসমারোহে 'জনা' অভিনীত হইল। সকলেই খুব সুখ্যাতি করতে লাগিলেন। উৎফুল্ল ত্রিপুরা সিং ভালো পোশাক কিনিবার জন্য কিছু টাকা দিয়া বলিলেন, নতুন পোশাক পরে আর একবার অভিনয় করতে হবে। জগন্নাথবাবু নিজে পোশাক আনিবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গেলেন। খুব ধুমধাম করিয়া দ্বিতীয়বার অভিনয়ও হইয়া গেল। ও অঞ্চলের সমস্ত বাঙালী তো বটেই কাটিহার পূর্ণিয়া সাহেবগঞ্জ এমন কি রামপুরহাট হইতেও অনেক বাঙালী ভদ্রলোকরা থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রামেই যেন একটা উৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পরই বর্ষা নামিল। আমাদের থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। অডিটোরিয়মে বানের জল ঢুকিয়া মৎস্যকুল নূতন অভিনয় শুরু করিয়া দিল। আমাদের স্টেজের চারিধারে বসিয়া গ্রামের মৎস্য-শিকারীরা ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিতে লাগিল।

সেবার চারিদিকে প্রবল বান হইয়াছিল। নৌকা ছাড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার উপায় ছিল না। কিছুদিনের জন্য আমার রোগীর ভিড়ও কমিয়া গেল। কারণ অন্য গ্রামের মানুষ সহজে আসিতে পারিত না, আমি সহজে কোথাও যাইতে পারিতাম না।

ত্রিপুরারি সিংহও স্বগ্রাম হরিশচন্দ্রপুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ম্যানেজার একচক্ষু পীতাম্বর রায়ের বাড়িও হরিশচন্দ্রপুর। তিনি একদিন আমার বাড়িতে আসিয়া বলিলেন, তোমার তো এখন রোগীর তেমন ভিড় নাই, চল আমার সঙ্গে হরিশচন্দ্রপুরে। কাল পূর্ণিমা, আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা হইবে। চল আমার সঙ্গে। মালিকও ওখানে আছেন। গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গেও তোমার পরিচয় করাইয়া দিব। তা ছাড়া, বড় তরফ অর্থাৎ মালিকের দাদা কংসারি সিংহও অতি মহৎ লোক। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াও সুখী হইবে।

তিনি নিজের জমিদাবির ভার সব ছোটভাইয়ের উপর দিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্রও কাকার উপদেশ অনুসারে চলে। বড়ছেলেটি বোধহয় তোমার বয়সী। তাহার সহিত আলাপ করিলেও খুব খুশী হইবে। শৌখিন মার্জিত রুচি ছোকরা। বাংলা সাহিত্যের সহিত সবিশেষ পরিচয় আছে। উহাদের সহিতও তোমার আলাপ হওয়াটা দরকার। কাছেই দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ। সেখানেও একজন অতিশয় বিদ্বান জমিদার আছেন—নিত্যানন্দ রায়। তাঁহার সহিত যদি আলাপ কর মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু, মৈথিলী এবং হিন্দী ভাষা জানেন। শিল্পী লোক। সংগীত-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য। চল, সকলের সহিত আলাপ করাইয়া দিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবে যাইবেন? ট্রেনে? রায় মহাশয় বলিলেন, না, নৌকায়। এখানে আহারাদির পর নৌকা চড়িব। সন্ধ্যা নাগাদ হরিশচন্দ্রপুরে পৌঁছিয়া যাইব। চারিদিক বানে ডুবিয়া গিয়াছে। কোনও অসুবিধা হইবে না।

তাহাই হইল, আহারাদির পর রায় মহাশয়ের নৌকায় দুর্গা বলিয়া চড়িয়া বসিলাম। ইতিপূর্বে বানের এমন বিরাট দৃশ্য আমি দেখি নাই। সে অপরূপ শোভার বর্ণনা করিতে পারি তেমন শক্তি আমার কোথায়।

গঙ্গার গৈরিক তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া বড় একটা বিলে ঢুকিলাম। বিলের জল নিকষকালো। মহানন্দার কালো জলে চতুর্দিক ডুবিয়া গিয়াছে। প্রান্তর বলিয়া কোথাও কিছু নাই। নীলাভ কালো জলের মধ্যে কেবল বড় বড় গাছগুলি জাগিয়া রহিয়াছে। পরে এরূপ দৃশ্য অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু সেইদিন প্রথম দেখিলাম। প্রকাণ্ড টাল জঙ্গল জলমগ্ন। জলের উপরই যেন বিশাল একটা অরণ্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় হিজল গাছ। প্রত্যেক গাছে বহুরকম পাখি। অনেক ডালে সাপও জড়াইয়া আছে দেখিলাম। কিন্তু পাখিদের তাহারা কিছু বলিতেছে না। পাখিরাও নির্ভয়। মাঝে মাঝে ব্যাঙও আছে। বাদুড়ও ঝুলিতেছে। এক একটা গাছে দেখিলাম বহু পিপীলিকা বর্তুলাকারে গুচ্ছ গুচ্ছ হইয়া গাছের ডাল হইতে ঝুলিতেছে। নানাজাতীয় পানা। পানার ফুলও অপরূপ। দূরে দূরে মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো গ্রামগুলি দেখা যাইতেছে। গ্রামের ভিতর হইতে কোথাও কোথাও ধুঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া আকাশে উঠিতেছে। মাঝে মাঝে বন্য পাখির চীৎকার নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত করিতেছে। একটা কর্কশ খক্ খক্ খক্‌র শব্দ প্রায়ই শুনিতেছিলাম।

একজন মাঝি বলিল উহা এক প্রকার মৎস্যশিকারী পাখির ডাক। দুই একটা দেখিলাম। দেখিতে অনেকটা গোদা চিলের মতো। অনেক উঁচুতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আর একটি অদ্ভুত জিনিস দেখিলাম যাহা আগে কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে এক একটা নৌকায় চারকাটি করিয়া মাছ ধরিতেছে দেখিলাম। চারকাটি আগে দেখি নাই। দেখিলাম একটা বাঁশ খড় দিয়া জড়াইয়াছে। শুনিলাম তাহার সহিত অনেক কেঁচোও নাকি জড়াইয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। সেই কেঁচো ও খড়-জড়ানো বাঁশটা জলের মধ্যে পোতা আছে। এই বাঁশটিই চারকাটি। নৌকার

উপর কয়েকজন বসিয়া ছিপ ফেলিয়া সেই বাঁশের আশেপাশে ক্রমাগত নাড়িতেছে। ছিপের বড় বড় বঁড়শিতে কেঁচোর টোপ। সেই খড়-জড়ানো চারকাটির চারিপাশে বড় বড় মাছ কেঁচোর লোভে আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু খড়ের ভিতর হইতে কেঁচো খাইতে পারিতেছে না। নিকটেই কেঁচোর-টোপ-দেওয়া বঁড়শি দেখিয়া তাহাই তাহারা গপ্ করিয়া গিলিয়া গিলিয়া ফেলিতেছে এবং ধরা পড়িতেছে। দেখিলাম বড় বড় রুই কাতলা ছিপের মুখে উঠিয়া আসিতেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এক একটা নৌকায় নাকি আধমণ পর্যন্ত মাছ ওঠে।

একটি নৌকার মাঝি রায়মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল। তাহার পর নিজের নৌকা আমাদের নৌকায় ভিড়াইয়া চারটি বড় রুই মাছ উপহার দিয়া গেল।

রায় মহাশয় বলিলেন—ডাক্তার, মৎস্যযাত্রা শুভ। তোমার এই সফর হয়তো নিষ্ফল হইবে না।

আর একটু দূরে গিয়া দেখিলাম অসংখ্য পদ্ম। লাল, শাদা দুই রকম পদ্মই অজস্র ফুটিয়া আছে। গ্রামের পুষ্করিণী আর বানের জল একাকার হইয়া মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অনেকটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মতো। অনেক মধুকর পদ্মের উপর উড়িয়া উড়িয়া মধুসংগ্রহে ব্যস্ত। প্রাকৃতিক এই বিরাট বিপর্যয়কে সকলেই যেন মানিয়া লইয়াছে। মনে হইল অনিবার্যকে পশু-পক্ষী গাছপালারাই সহজে মানিয়া লইতে পারে। মাঝে মাঝে জেলেরা চারকাটি ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। তাহারা নাকি দৈনিক দশ পনেরো সের এমন কি আধ মণ পর্যন্ত মাছ এইভাবে ধরে এবং বাড়ি পাঠাইয়া দেয়। এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম।

রায় মহাশয় সঙ্গে প্রচুর খাবার লইয়াছিলেন, সমস্ত দিন বেশ আনন্দে কাটিল। কত রকম জলচর পাখি যে দেখিলাম তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক জায়গায় দেখিলাম সারস-জাতীয় প্রকাণ্ড কয়েকটি পাখি জলের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝিরা বলিল—ইহাদের নাম গগন-ভেড়। ক্রমশঃ সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমাকাশে মেঘেদের মধ্যে স্বর্ণোৎসব শুরু হইল। সোনা-রূপো-হলুদ-আলতা-নীল-কালো নানা রং নানা ছন্দে মিশিয়া যে বর্ণসংগীত সৃষ্টি করিল তাহা সত্যই অবর্ণনীয়। আকাশের এই স্বর্গীয় ছবি জলেও প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করিল। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ধকার নামিতে লাগিল।

রায় মহাশয় স্বল্পভাষী লোক। সমস্ত দিন বসিয়া জমিদারির কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। কয়েকটি পত্রও লিখিলেন। তাহার পর যখন দিনের আলো নিভিয়া গেল তখন কাগজপত্র গুটাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'ডাক্তার ওদিকের খেলা শেষ হল এবার এদিকে দেখ!'

দেখিলাম পূর্বাকাশে চাঁদ উঠিতেছে। চর্তুদশীর প্রায়-পূর্ণচন্দ্র। দেখিতে দেখিতে ঘনকালো জল জ্যোৎস্নার আলোয় অপরূপ হইয়া উঠিল। জলমগ্ন গাছগুলি ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সেই পাখির খক্ খক্ খকর শব্দ তো ছিলই কিছুদূর গিয়া হুমো পাখির ডাকও শুনিলাম। দুই গাছে দুই পাখি হুম হুম শব্দ করিয়া যেন উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেছে। কোন কোন গাছে অসংখ্য জোনাকি। মনে হইতেছে গাছেরা মাথায় হীরার মুকুট পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে ঝিল্লীধ্বনি। মনে হইতে লাগিল রাজসভায় কনসার্ট বাজিতেছে। চারিদিকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জল। গ্রামের কোন চিহ্ন নাই। হাওয়া পড়িয়া গিয়াছে। দাঁড়ের জোরে নৌকা চলিতেছে। আরও কিছুদূর গিয়া কয়েকখানা লম্বা ধরনের নৌকা দেখিলাম। সেসব নৌকার ভিতর হইতে গানবাজনার শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। কোনও নৌকা হইতে কীর্তন, কোন নৌকা হইতে থিয়েটারি গান। একটা নৌকা হইতে সমবেত নারীকণ্ঠের গানও শুনিতে পাইলাম।

রায় মহাশয় বলিলেন—ওই নৌকার দাঁড়ি মাঝিও মেয়েমানুষ। আশপাশের গ্রাম হইতে সকলে বাইচ খেলিতে বাহির হইয়াছে। নৌকাগুলি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত লম্বা—এদেশে উহাদের নাম 'ছিপ'। গানে বাজনায়, ঝিল্লীধ্বনীতে, জ্যোৎস্নায় আর প্রকৃতির রহস্যময় গাম্ভীর্যে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হইল। আমি নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। রায় মহাশয় নৌকার একধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। একটু পরেই হরিশচন্দ্রপুরের ঘাট দেখা গেল। দেখিলাম ঘাটে আলো লইয়া কয়েকটি লোকও দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়া গেল। রায় মহাশয়েরই লোকজন আলো লইয়া তাঁহার জন্য ঘাটে অপেক্ষা করিতে ছিল। আমরা নৌকা হইতে নামিয়া একটি দুঃসংবাদ শুনিলাম। ত্রিপুরারি সিংহের দাদা কংসারি সিংহ নাকি খুবই অসুস্থ। চাঁচল হইতে ডাক্তার আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। অগত্যা দুইজন কবিরাজকে ডাকা হইয়াছে। রায় মহাশয় একনজর আমার দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। রায় মহাশয়ের বাড়িতে যখন পৌঁছালাম তখন রায় মহাশয় বলিলেন, ডাক্তার তুমি হাত মুখ ধুইয়া জলটল খাও, আমি একবার কংসারিবাবুর খোঁজ লইয়া আসি। বাহিরে ঘরে একটা খাটে আমার জন্য বিছানা করা ছিল। জলখাবার খাইয়া আমি তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। যদিও দীর্ঘ নৌকাযাত্রায় কোনও দৈহিক পরিশ্রম হয় নাই তবুও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিছানায় শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রায় মহাশয় যখন আসিয়া আমার ঘুম ভাঙাইলেন তখন বেশ রাত হইয়াছে। বলিলেন, তুমি খাইয়া আমার সঙ্গে চল। তুমি আসাতে মালিক খুব খুশী হইয়াছেন। তোমাকেই বোধহয় কংসারিবাবুর চিকিৎসার ভার লইতে হইবে। চাঁচলের ডাক্তারবাবুর আসিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ সেখানে রাজার ছেলে অসুস্থ। তাহাকে ছাড়িয়া তিনি আসিতে পারিবেন না। আমাদের সঙ্গে যে চারিটি রোহিত মৎস্য আসিয়াছিল, খাইতে বসিয়া দেখিলাম, তাহারাই নানা ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার উপর 'ক্ষীরসা' এবং আম প্রচুর খাওয়া হইল। চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সবরকম।

আহারাদির পর ত্রিপুরারি বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম।

আমি আসাতেই সত্যই তিনি খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিলেন, প্রবীরকে এবার নূতন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং তাহার বিশ্বাস এ যুদ্ধে প্রবীর বিজয়ী হইবে। আমি গিয়া কংসারিবাবুকে দেখিলাম। তিন দিন একজ্বরী। আমি যখন গেলাম তখন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর। প্রলাপ বকিতেছেন। ঘরের মেজেতে দুইজন কবিরাজ বসিয়া আছেন। একজন শাকলদ্বীপি ব্রাহ্মণ—নাম কাঞ্চন মিশ্র। কপালে তিলক-কাটা, মাথায় পাগড়ী, সৌম্য চেহারা। ইনি এ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কবিরাজ। আর একজনের নাম জগদ্দল মিশ্র। ইনিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু চেহারাটি নামেরই অনুরূপ। বিরাট চেহারা, কালো রং, মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম। কংসারিবাবুর দুই পাশে দুই চাকর বড় বড় পাখা দিয়া ক্রমাগত হাওয়া করিয়া চলিয়াছে। কংসারিবাবু চোখ বুঝিয়া আছেন এবং বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতেছেন। নাড়ী দেখিলাম। প্রবল জ্বরের সবলা নাড়ী, কোন দুর্বলতা নাই। আমার মনে হইল টাইফয়েড জাতীয় জ্বর। যদি প্যারাটাইফয়েড হয়—কাল চতুর্দশ দিবস—হয়তো কালই জ্বর কমিয়া যাইবে।

আমি বাহিরে গিয়া ত্রিপুরারিবাবুকে বলিলাম—চাঁচলের এম. বি. ডাক্তার ইহার চিকিৎসা করিতেছেন। আমি ছোট ডাক্তার, তাঁহার রোগীকে হাতে লইতে আমার ভয় করিতেছে। যদি

কিছু হইয়া যায়। তা ছাড়া, দুজন বিখ্যাত বাঘা-বাঘা কবিরাজ আসিযা বসিয়া আছেন এ অবস্থায় আমি উহার চিকিৎসার ভার লইতে ভয় পাইতেছি। তবে আপনারা যদি বলেন, অবশ্যই লইব এবং আমার যথাসাধ্য করিব।

ত্রিপুরারি বলিলেন—আচ্ছা বউঠানকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি যাহা বলেন তাহাই হইবে। আপনি রোগীর কাছে গিয়া বসুন।

ভিতরে গিয়া বসিতেই কাঞ্চন মিশ্র প্রশ্ন করিলেন, আপনি বৈদ্য না চিকিৎসক? আমি প্রশ্নটির তাৎপর্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। তিনিই ব্যাপারটা ভাঙিয়া বলিলেন—আপনি শতমারী, না, সহস্রমারী?

কথাটা শুনিয়া আমায় একটু হাসি পাইল। বলিলাম, আমি বৈদ্য নই, চিকিৎসকও নই। আমি সেবক মাত্র। রোগীর দেখিলাম খুবই তৃষ্ণা। কিন্তু কবিরাজরা জল খাইতে দিবে না, মৌরির একটা ছোট পুঁটুলি জলে ডুবাইয়া তাহাই চুষিতে দিতেছে। রোগী জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে আমি বাহিরে আসিতেই রায় মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে বলিলাম, এ কঠিন রোগীর দায়িত্ব লইতে আমার ভয় হইতেছে।

রায় মহাশয় হঠাৎ আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন । বলিলেন, কঠিন রোগীর দায়িত্ব লইতে যদি ভয় পাও তাহা হইলে ডাক্তারি শিখিয়াছিলে কেন। এমন সময় বাড়ির ভিতর হইতে রানীজির খাস চাকরানী আসিয়া প্রবেশ করিল। রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, রানীজি কবিরাজি চিকিৎসা করাইতে চান না, রায় মহাশয় যে ডাক্তারবাবুকে আনিযাছেন তিনিই এখনই ঔষধ দিন। মনে হইতেছে প্রলাপ বাড়িতেছে। কাল পর্যন্ত যদি কোন উপকার না হয় মালদহ হইতে সিভিল সার্জনকে আনিবার জন্য নৌকা যাইবে।

রায় মহাশয় বলিলেন—যাও, তুমি রোগীর ভার লও আর দ্বিধা করিও না। আমি বলিলাম—আমি সমস্ত রাত রোগীর কাছে থাকিব এবং নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইব। আমি যাহা যাহা বলিব তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে। কবিরাজরা নাড়ী দেখিতে পারেন। তাঁহারা রাজী হইলেন। তখন আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এক খোরাক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। মাথায় গোলাপজল ও ওডিকোলন দিয়া জলপটি দিলাম, মাথাটি তাঁহার কামানোই ছিল। দুই ঘণ্টা পরে টেম্পারেচার ১০২ হইয়াছে, দেখিলাম রোগীও একটু ঘুমাইতেছে। প্রলাপটা কিছু কমিয়াছে। আর এক খোবাক ঔষধ খাওয়াইলাম। রাত্রি তিনটার সময় টেম্পারেচার ১০০ হইয়া গেল। দেখিলাম ঘাম হইতেছে এবং রোগী নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। কবিরাজ দুইজন নাড়ী দেখিলেন এবং আমাকে ইশারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কাঞ্চন মিশির হিন্দীতে বলিলেন—কেয়া দেখতে হ্যঁয় নাড়ী যে সরদ হোনে লাগা। ইনি মুঙ্গের জেলার লোক। জগদ্দল মালদহ জেলার। 'ন' উচারণ করিতে পারেন না। 'নাড়ি' কে লাড়ী বলেন। বলিলেন, লাড়ী বে শিটাং মেরে গেছে, এর পর সামলাবেন ক্যামনে। কফ বাড়ছে, আধঘণ্টার মধ্যে একেবারে সরদ হয়ে যাবে। বাঁচাতে পারবেন না। আমার ভয় হইল, আমি গিয়া নাড়ী দেখিলাম, ভালই মনে হইল। জ্বর 'রেমিশন' হইতেছে। এদিকে কবিরাজরা মকরধ্বজ মৃগনাভি মাড়িয়া প্রস্তুত, খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় ও রানীমা পাশের ঘরে ছিলেন, আমি তাঁহাদের বলিলাম আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মতো রোগীর অবস্থা খুবই ভালো। জ্বর ছাড়িতেছে, নাড়ীর অবস্থাও ভালো। সকাল নাগাদ রোগী বিজ্বর হইবেন। এখন আমি ওই সব উগ্র

কবিরাজী ঔষধ খাইতে দিতে চাই না। তাঁহারা ভজমোহনবাবুকে খবর দিলেন। তাঁহার নাড়ীজ্ঞান নাকি খুব ভালো। তিনি নাকি রোজই আসিয়া একবার নাড়ী দেখিয়া যান।

খবর পাইয়া তিনি আসিলেন। শুকচঞ্চু-নাসা খর্বাকার ব্যক্তি। বকের মতো পা ফেলিয়া ফেলিয়া হাঁটেন। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, কোনও ভয় নাই, এখন নাড়ী খুব ভালো আছে, জ্বর ছাড়িতেছে। যে ঔষধ চলিতেছে তাহাই চলুক, কবিরাজী ঔষধ দিতে হইবে না। শুনিলাম তিনি একজন উঁচুদরের পাখোয়াজী। কংসারিবাবু খুব ভালো ওস্তাদী গান গাহিতে পারেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার গান এবং ভজমোহনবাবুর পাখোয়াজ নাকি পাড়া সরগরম করিয়া তোলে। যাহা হউক তখন কবিরাজরা আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

সকালবেলা জ্বর ছাড়িয়া একেবারে সাবনরম্যাল (subnormal) হইয়া গেল। খুব ঘাম হইতেছিল, কবিরাজরা বলিলেন এ কালঘাম, এইবার সর্বনাশ হইয়া যাইবে। মৃগনাভি এবং মকরধ্বজ না দিলে শেষ রক্ষা হইবে না। আবার ভজমোহনবাবুকে খবর দিলাম। কবিরাজদের বলিলাম তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। জগদ্দল ভ্রূকুটি করিয়া রহিলেন, তাহার পর মন্তব্য করিলেন—বেশ তাহলে মারিয়া ফেলান। ভজমোহনবাবু আসিয়া আবার নাড়ী দেখিলেন, বলিলেন, কোন ভয় নাই, নাড়ী বেশ সুস্থ, কবিরাজী ঔষধ দিতে হইবে না। রানীজি ঘোমটা দিয়া তাঁহার পায়ের দিকে বসিয়া ছিলেন।

খানিকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং স্ত্রীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমি খুব ভালো আছি। এমন ঘুম আমি তেরো দিনে মধ্যে একদিনও ঘুমাই নাই। আমার ঘুমের ঘোরে মনে হইতেছিল কে একটি ছোকবা আমাকে ঔষধ খাওযাইতেছে। কে সে? কোথা হইতে আসিল? উহাকে তো আগে দেখি নাই।

তখন রানীজি চুপিচুপি তাঁহাকে বলিলেন মনিহারী হইতে রায়জীর সহিত একজন ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন, গতরাত্রি হইতে তিনিই আপনার চিকিৎসাব ভার লইযাছেন এবং সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া আছেন। চাঁচলের ডাক্তাব আসিতে পারেন নাই।

কংসারিবাবু তখন বলিলেন, ডাক্তারবাবু কোথায়? আমি কাছেই ছিলাম। তিনি বলিলেন, আমাব কাছে এস। আরও কাছে গেলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আর্শীবাদ করিলেন—বাঁচিয়া থাক। তেরো দিন বড় কষ্ট পাইয়াছি, তোমার চিকিৎসায় সুস্থ হইলাম। তেরো দিন পরে কাল ঘুমাইয়াছি। আমি তাঁহার পদধূলি মাথায় লইলাম। তাহার পর নাড়ী দেখিলাম, নাড়ী প্রায় স্বাভাবিক। রোগী বলিলেন, ক্ষুধা পাইয়াছে। দুধ সাগুর ব্যবস্থা করিলাম। ঔষধের সহিত একটু ব্রাণ্ডিও দিলাম। বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বেশ ভালো বোধ করিতে লাগিলেন। দিন চারেক পরে তাঁকে পথ্য দিলাম---পুরাতন চালের ভাত ও মাগুব মাছের ঝোল। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন ক্রমশঃ। আমি জানি ইহাতে আমার বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নাই। প্যারাটাইফয়েড জ্বর সাধাবণতঃ চৌদ্দ দিনের দিন আপনিই ছাড়িয়া যায়। আমার ভাগ্য ভালো তাই আমি তেরো দিনেব দিন গিয়া কয়েক দাগ ঔষধ দিয়াছিলাম। ঔষধ না দিলেও ও র্জ্বর সেদিন ছাড়িয়া যাইত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে ওইরূপই হয়। আকাশ নির্মেঘ হইয়া যায়, অনুকূল বাতাস বহিতে থাকে।

কংসারিবাবুর পুত্র হংসমোহনের সহিত আলাপ হইল, এ আলাপ পরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। হংসমোহন বাংলা ইংরেজী এবং সংস্কৃত বাড়িতে বসিয়াই ভালোভাবে শিখিয়াছিলেন। গানের সমঝদাব ছিলেন, কিন্তু গান গাহিতে পারিতেন না। মৃদুকণ্ঠে, প্রায়

চুপিচুপি কথা বলিতেন। গাছপালা ফুল ফলের খুব শখ ছিল। বিদেশ হইতে নানারকম গাছপালা আনাইয়া বেশ বড় একটি বাগান করিয়াছিলেন। আম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শুধু যে নানারকম আমের নাম জানিতেন তাহা নয়, কোন্ আম কখন গাছ হইতে পাড়িতে হইবে, এবং কতক্ষণ 'জাগ' দিলে তাহা 'তৈয়ার' অর্থাৎ খাইবার যোগ্য হইবে তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার বাগানেই আমি বিলাতী নানারকম ফার্ন এবং ক্যাক্টাস দেখিয়াছিলাম, নানাবিধ বন্য পরগাছারও তাঁহার একটি সংগ্রহ ছিল চমৎকার। চমৎকার 'অর্কিড' ছিল তাহাতে। তিনি শুধু যে বিদেশী 'অর্কিড' আনাইয়াছিল তাহা নয় এদেশেরও জঙ্গল হইতে নানারকম অর্কিড যোগাড় করিয়াছিলেন। তিনি নানারকম শাক, কাঁচা ফল, সরিষার গুঁড়া ও ভিনিগার দিয়া আমাকে কয়েক রকম 'স্যালাড'ও খাওয়াইলেন। ইহা আমি পূর্বে কখনও খাই নাই। প্রশংসা করিলে হংসবাবু বলিলেন, যত ভালোই হোক আমাদের দেশের শাকের ঘণ্ট এবং সুক্তোর কাছে সবাই হার মানে।

কংসারিবাবু যখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন তখন আমি মনিহারী ফিরিয়া যাইতে চাহিলাম। কিন্তু দেখিলাম কেহই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিতে চান না। কংসারিবাবু বলিলেন—তুমি এইখানেই প্র্যাকটিস কর। তুমি যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। আমি রাজী হইলাম না। বলিলাম, মনিহারীতে বাড়ি-ঘর করিয়াছি, সেখানেও আপনাদেরই আশ্রয়ে আছি। ত্রিপুরারিবাবু আমাকে অনেক সাহায্য করিযাছেন, তিনি আমাকে স্নেহও করেন খুব। ও অঞ্চলে আমার প্র্যাকটিসও আপনার আশীর্বাদে জমিয়া গিয়াছে সেজন্য আর স্থান পরিবর্তন করিব না।

ইহার পরই দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ হইতে সেখানকার জমিদার নিত্যানন্দ রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি কৃষ্ণকিশোরবাবু খুব অসুস্থ। আমি যাইব কি যাইব না ইতস্তত করিতেছিলাম। রায় মহাশয় বলিলেন—যাও, এ সুযোগ ত্যাগ করিও না। মৎস্য-যাত্রা করিয়া আসিয়াছ তোমার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। নিত্যনন্দ রায় শুধু বড় জমিদার নন একজন প্রতিভাবান শিল্পী, তাঁহার সহিত আলাপ হইলে খুশী হইবে। আমিও তোমার সহিত যাইতাম, কিন্তু আমাকে ছুরি সংগ্রহ কবিবার জন্য বৈরিয়া যাইতে হইবে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিলাম না। এতবড় জমিদারের ম্যানেজার ছুরি সংগ্রহের জন্য বৈরিয়া যাইতেছেন কেন। ছুরির কি দরকার? একটা লোক পাঠাইয়া দিলে কি চলিত না? তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কিন্তু কোনও জবাব পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু (আগেই বলিয়াছি, তিনি একচক্ষু ছিলেন) কেবল একটু হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা নাগাদ দিল্লী দেওয়ানগঞ্জে পৌছিয়া গেলাম। ঘাটে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক ছিল। নিত্যনন্দ রায়ের বাড়িতে পৌছতেই দেখিলাম একটি খর্ব গৌরবর্ণ ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। গায়ে কোন জামা নাই, কাঁধে শুভ্র উপবীত, পরিধানে শাদা থান, পায়ে খড়ম। কানে একটি রূপোর খড়কে গোঁজা রহিয়াছে। যে লোকটি আমার সঙ্গে আসিয়াছিল সেই নিম্নস্বরে বলিল, ইনিই নিত্যানন্দবাবু। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি নিজের উপবীতগুচ্ছ অঙ্গুষ্ঠসহযোগে প্রলম্বিত করিয়া আমার মাথায় রাখিলেন, তাহার পর কি একটা সংস্কৃত শ্লোক বলিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর বাংলায় বলিলেন—আপনার যশের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনাকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হলাম। আমার ভগ্নীপতি খুব অসুস্থ, চলুন আগে তাঁকে দেখে আসি। কাছেই বাড়ি।

কৃষ্ণকিশোরবাবুকে দেখিলাম অদ্ভুত লোক। মাথা ন্যাড়া, মাথায় প্রকাণ্ড একটা টিকি। তিনিও নগ্নমাত্র এবং প্রায় উলঙ্গ। একটা কৌপীনের মতো পরিয়া বাহিরের ঘরে খাটিয়ায় শুইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছেন। চোখ দুইটি বোজা, ভুরু কোঁচকানো, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। চীৎকারটা অত্যন্ত বেসুরা এবং বীভৎস। মনে হইল যেন একটা রুষ্ট ষাঁড় ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে। দুইটি চাকর দেখিলাম তাঁহার পেট ও পা দলাইমলাই করিতেছে। শুনিলাম চব্বিশ ঘণ্টাই তাহারা এজন্য নিযুক্ত আছে। তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া কৃষ্ণকিশোরবাবু মধ্যে মধ্যে উচ্চতর গ্রামে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন। শুনিলাম তিন প্রত্যহ দুই গ্লাস করিয়া সিদ্ধি খান। মনে হইল খুব সম্ভবতঃ তাঁহার রেনাল (renal) কলিক্ হইয়াছে। আমি একটা ঘুমের ঔষধ দিয়া বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলাম। সেখানে অনেক মাতব্বর প্রজা এবং ভদ্রলোকরা বসিয়া ছিলেন। নিত্যনন্দবাবু তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছে এমন সময় উলঙ্গ কৃষ্ণকিশোরবাবু হুঙ্কার করিতে করিতে বৈঠকখানায় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ডাক্তার তোমার ওষুধে কিছু হল না। তুমি ছুবি দিয়ে পেটের এইখানটায় ভুঁকে দাও, অনেক বেসুর বদ সুর ভুল সুর ওখানে জমে আছে সেগুলো বেরিয়ে যাক—তাহলেই আমি সুস্থ হব। সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আবার ঘরে লইয়া গেল। আমি তখন তাঁহাকে একটা মরফিন্ (morphine) ইনজেকশন দিলাম। তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাহার পর যেখানে তিনি ছুরি ভুঁকাইয়া দিতে বলিতেছিলেন সেইখানে একটা ব্লিস্টার (blister) দিয়া দিলাম। তখন কলিকের এইসব চিকিৎসাই ছিল।

নিত্যানন্দবাবু আমাকে জনান্তিকে বলিলেন—উনি একজন সুরেলা লোক। সর্বদাই গুনগুন করিয়া রাগরাগিণী আলাপ করেন। ভাল হইলেই ইহার কণ্ঠে গান জাগিবে। উহার ধারণা হইয়াছে শরীরে বেসুর জমিয়াছে তাই এই কষ্ট।

আমি বলিলাম—আমি উহার কাছেই রাত্রে থাকিতে চাই।

নিত্যানন্দ রায় বলিলেন—পাশের ঘরেই আপনার শুইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আসুন—। গিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে অদ্ভুত রঙিন একটি খাট রহিয়াছে। নিত্যনন্দবাবু হাসিয়া বলিলেন—এটি বাঁশ আর বেত দিয়া আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। মশারি পর্যন্ত বাঁশ এবং বেতের চমৎকার হাওয়া ঢোকে, কিন্তু মশা ঢুকিতে পারে না। অনেকটা জাপানী ধরনের এই অপরূপ খাটটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল ঘরের ভিতর ছোট্ট রঙিন আর একটি ঘর। অনেকটা বড় পালকির মতো দেখিতে। বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুইদিকে দুইটি কারুকার্যমণ্ডিত বাঁশও রহিয়াছে। দরজা আছে। তাহা খুলিয়াই খাটের ভিতর ঢুকিতে হয়। কৃষ্ণকিশোরবাবু অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, আমি নিত্যনন্দবাবুর বাড়িতে খাইবার জন্য গেলাম। দেখিলাম খাওয়ার আয়োজন প্রচুর। তাহার আর বর্ণনা করিব না। একটি জিনিস কেবল মনে আছে, অন্যান্য নানাবিধ খাবারের সঙ্গে আলাদা একটি থালায় বিরাট একটি রোহিত মৎস্যের মুড়া ছিল। সবই আমি অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিলাম দেখিয়া নিত্যানন্দবাবু খুশী হইলেন। বলিলেন—আজ আপনি আমার গৃহিণীকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এসব রান্না তাঁহারই। সুরসিক পাইলে কবি কৃতার্থ হন, সমঝদার পাইলে গায়ক বাদক পুলকিত হইয়া ওঠেন আর ভালো 'খাইয়ে' পাইলে রাঁধুনীর আনন্দের সীমা থাকে না।

পাশের ঘরের দ্বারে একটি পরদা টাঙানো ছিল। তাহার ওপার হইতে চুড়ির শব্দ পাওয়া গেল।

নিত্যানন্দবাবু হাসিয়া বলিলেন—পরদার ওপারে উনি বসিয়া আছেন। খাওয়াদাওয়ার পর আমি বলিলাম—যদি অনুমতি দেন মাকে প্রণাম করি।

নিত্যানন্দ-গৃহিণী মাথায় আধঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে চওড়া লাল-পাড় শাড়ি। হাতে একগোছা সোনার চুড়ি। একটু মোটাসোটা গোছের ভারিক্কী চেহারা। প্রণাম করিলাম। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—বেঁচে থাকো, সুখী হও।

খাওয়াদাওয়া সারিয়া কৃষ্ণকিশোরবাবুর বাসায় গেলাম, দেখিলাম তিনি তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছেন। যে চাকরটি তাঁহার পা টিপিতেছিল তাহাকে বলিলাম—এখন পা টিপিবার দরকার নাই। পেটে হাত দিও না, ওখানে ওযুধ লাগাইয়া দিয়াছি। যদি বাবুর ঘুম ভাঙে তখন আমাকে জাগাইয়া দিও। আমি গিয়া নিত্যনন্দবাবুর সেই অভিনব খাটিয়ায় ঢুকিয়া পড়িলাম। সমস্ত দিন ক্লান্ত ছিলাম, ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না। খুব ভোরে চাকরটা আসিয়া আমার ঘুম ভাঙাইল। বলিল—বাবু জেগেছেন। সমস্ত রাত ঘুমিয়েছেন খুব। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া শুনিলাম মধুর কণ্ঠে তিনি গান করিতেছেন 'কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই'—। আমাকে দেখিয়াই তাঁহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, ক্ষমা চাইছি, কাল অসুরের প্রভাবে পড়ে আপানাকে হয়তো কটু কথা বলেছি। অসুখ মানেই তো অসুর, সুরের অভাব। আপনার চিকিৎসাগুণে সে এবার জব্দ হয়েছে, সুর এসে গেছে মনে। কিছুক্ষণ আমার দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন তাহাব পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আরে তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমাকে আপনি বলব কেন। বলিয়াই আবার গান ধরিলেন—'আপনজনারে 'আপনি' বলিয়া ঠেকায় রাখিনু দূরে। সে গেল না, এল ফিরে ফিরে বাঁশরীর সুরে সুরে।' আবার নীরব হাসিতে তাঁহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, পেটের উপর একটা বড় ফোস্কার গারদে অসুরগুলোকে বন্দী করে রেখেছ দেখছি। এখন ওখান থেকে ওদের তাড়াবে কি করে। বলিলাম—সব ঠিক হয়ে যাবে। কৃষ্ণকিশোরবাবু কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হইয়া উঠিলেন। আমি যেদিন চলিয়া আসব সেদিন পাখোয়াজী ভজমোহন বাবুও আসিয়া হাজির হইলেন। সঙ্গে পাখোয়াজ। বলিলেন—কৃষ্ণকিশোর আজ গান করবে, আমি পাখোয়াজ বাজাব। যদি ঠিক ঠিক সমে এসে থামতে পারে তাহলে বুঝব ওর অসুখ সেরেছে। তার আগে ডাক্তার তোমার ছুটি নেই। সন্ধ্যার সময় সংগীতের আসর বসিল। কৃষ্ণকিশোরবাবু চমৎকার গান গাহিলেন। পাখোয়াজী ভজমোহনবাবু আমার পিঠে চাপড়াইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, এইবার তোমার ছুটি। ওর অসুখ সেরে গেছে, আর বেতালা বেসুরো কিছু নেই।

কংসারিবাবু আমাকে নগদ তিনশত টাকা, একথান কাপড় (সেকালে একথান কাপড়ে চার জোড়া পরিবার ধুতি হইত), একটি চাদর এবং দশ সের ঘি দিলেন। কৃষ্ণকিশোরবাবুও আমাকে নগদ দুইশত টাকা দিয়া বলিলেন—মনিহারীতে আমার ছোট একটা আমবাগান আছে। বহুদিন আগে ওটা নিলামে কিনেছিলাম। কিন্তু ওর আম এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না। ওই বাগানটাও তোমাকে দিলাম। আমার নায়েব মশাই গিয়ে লেখাপড়া করে দিয়ে আসবেন।

রায় মহাশয়ের সহিত আসিয়া শুধু যে আমার অর্থলাভ হইল তাহা নয়। আমি এমন কয়েকটি গুণী লোকের স্নেহলাভ করিলাম যাঁহাদের জোড়া আমি অন্ততঃ আর দেখি নাই। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়ের সংস্রবে আসিয়া আমি বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের দিকে আকৃষ্ট হই। তাঁহারই উৎসাহে আমিও পরে ক্রমশঃ একটি ভালো বাংলা লাইব্রেরী নিজের বাড়িতে করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনেক বই এবং পুরাতন মাসিকপত্র দানও করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই বইগুলিই আমার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। দূরের 'কল' আসিলে গরুর গাড়িতে কিংবা নৌকায় যাইতে হইত তখন ওই বইগুলিই আমার প্রধান সঙ্গী ছিল।

মনিহারীতে ফিরিয়া দেখিলাম শঙ্করা হইতে খেতু-মামা আসিয়াছেন এবং আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। খেতুমামা আমার মামার সম্পর্কে জ্ঞাতি-ভাই ছিলেন। মামার শঙ্করার বিষয়পত্রের দেখাশোনা তিনিই করিতেন একথা আগেই লিখিয়াছি। যদিও নিজে তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে মাতব্বরি মোড়লি করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। সন্তোষের বাবাও তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। সন্তোষের মাকে তিনি বউদি বলিয়া ডাকিতেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল। তাহাকে তিনি 'ছোট বুড়ী' বলিয়া ডাকিতেন। একটু গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি যে স্পষ্টবাদী, কাহারও তোয়াক্কা করেন না এই অহঙ্কারও তাঁহার ছিল, তাই যখন মানী লোককেও অপমান করিয়া বসিতেন। বলিতেন—আমি বাপেব কুপুত্তুর (কুপুত্র), উচিত কথা বলতে ডরাই না। আমার সহিত দেখা হইতেই তিনি ডালকুত্তার মতো খাঁ খাঁ করিয়া উঠিলেন।

"ব্যাপার কি তোমার? তুমি বড় বংশের ছেলে, তোমার বাবাকে আমরা দেবতার মতো খাতির করতুম, তোমার কাছে এ ব্যবহার তো প্রত্যাশা করিনি। তুমি সোনোর মাকে গাছে তুলে দিয়ে মইটি বগলে করে প্র্যাকটিস করে বেড়াচ্ছ! তোমার কথামত সোনো (সন্তোষ) তোমার মামাকে একটি চিঠি লিখেছিল, কোনও উত্তর আসেনি। কিছুদিন পরে সোনোর মা নিজের জবানিতে অনেক কাকুতিমিনতি করে আর একটি চিঠি লেখে। তারও কোনও জবাব আসেনি। তোমার মামাটি তো চণ্ডাল। দুটো পয়সা হাতে এসেছে তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এদিকে পাশের গাঁয়ের এক বুড়ো শীতল চক্রবর্তী ছোট বুড়ীকে তৃতীয় পক্ষ করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। সে পণ তো নেবেই না, উপরন্তু সোনোর মাকেই এক হাজার টাকা দিতে চাইছে। ছোট বুড়ীকে সোনায় মুড়ে দেবে বলছে। শালার আট দশটা ছেলে-মেয়ে। মুখে একটি দাঁত নেই। আমি বউদিকে বলে দিয়েছি আমাব প্রাণ থাকতে আমি ছোট বুড়ীকে হাত-পা বেঁধে ওই পচা ডোবায় ফেলে দিতে পারব না। আমার বিঘে-পাঁচেক জমি আছে, তাই বিক্রি করেই আমি ওর ভাল পাত্র খুঁজে বিয়ে দেব। বউদি তখন আমাকে বললেন—সূর্য যখন কথা দিয়ে গেছে তখন তাকে জিগেস না করে কিছু করা উচিত নয়। তাই আমি তোমাকে জিগেস করতে এসেছি, তুমি যে কথা দিয়ে এসেছ তা মরদ কা বাত কি না। হাতির দাঁতের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে কি না।"

সতীশবাবু নিকটে বসিয়া ছিলেন। খেতুমামার কথাবার্তা শুনিয়া তিনি আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি খেতুমামাকে বলিলাম—"সতীশবাবু আমার একজন হিতৈষী বন্ধু। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি আপনাকে এখনি জানাচ্ছি আমি কি করব।

সতীশবাবুকে লইয়া আমি পাশের ঘরে গেলাম এবং তাঁহাকে আনুপূর্বিক সব খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। সব শুনিয়া সতীশবাবু বলিলেন—"আপনি যখন কথা দিয়ে এসেছেন তখন ওখানে আপনাকে বিয়ে করতেই হবে। তবে তার আগে আপনার মামার মতটা নেবার চেষ্টা করা উচিত। উনি যখন চিঠির জবাব দেননি, তখন ওঁর সামনা-সামনি কথাটা পাড়া উচিত। আমার মনে হয় খেতুবাবু যদি মেয়ের মাকে নিয়ে সাহেবগঞ্জে চলে আসেন তাহলে ভালো হয়। আপনার মামার মতটা জেনে তারপর যা হয় করা যাবে। আপনার মামা যখন মেয়ের মায়ের জ্ঞাতি তখন স্বচ্ছন্দে উনি আপনার মামার বাসায় আসতে পারেন। তা ছাড়া, আপনার দিদিমা বেঁচে আছেন, তাঁরও মতের একটা গুরুত্ব আছে।"

তাহাই ঠিক হইল। খেতুমামাকে আসিয়া তাহাই বলিলাম এবং পরে সসংকোচে আর

একটি প্রস্তাবও করিলাম।

যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে আপনাদের যাতায়াতের খরচ বাবদ পঞ্চাশটি টাকা আমি প্রণামী দিতে চাই। প্রণামী না বলে জরিমানাও বলতে পারেন। দোষ আমারই। মামা যে এরকম ব্যবহার করবেন তা আমি বুঝতে পারিনি—"

খেতুমামা কয়েকটি হলদে দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন—"শোলায় যখন জল ঢোকে, তখন শোলা মনে করে সে লোহা হয়েছে। বউদিকে নিয়ে আসতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মামা যদি আমাদের অপমান করে তাহলে খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাবে।

আমি বাপের কুপুত্তুর—"

বলিলাম—"আপনি সাহেবগঞ্জে আসবার আগে আমাকে একটা চিঠি দেবেন। আমি ঠিক সেই সময় সাহেবগঞ্জে উপস্থিত থাকব। কোনও গোলমাল হবে না।"

খেতুমামা সেই দিনই চলিয়া গেলেন। টাকা লইতে আপত্তি করিলেন না। বরং টাকাটা লইয়া আশীর্বাদ করিলেন—"তোমার উঁচু বংশ, উঁচু মন, উঁচু নজর—আশীর্বাদ করি রাজরাজেশ্বর হও।

ইহার পর প্রায় দশ দিন অতীত হইয়া গেল কিন্তু খেতুমামা বা সইমার কোন পত্র আসিল না। আমি মনে মনে যখন বেশ অস্থির হইয়া উঠিয়াছি তখন হঠাৎ একদিন সকালে মন্মথ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "তুমি আজই সাহেবগঞ্জে চল। তোমার বিয়ে নিয়ে খুব হাঙ্গামা হচ্ছে। শঙ্করা থেকে সন্তোষের মা এবং খেতুমামা এসেছেন। তোমার মামা খুব রাগারাগি করছেন। তোমার দিদিমা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" ইহার একটু পরেই শঙ্করা হইতে সন্তোষের মায়ের চিঠিটাও আসিল। দেখিলাম চিঠিটি ঠিক সময়েই লেখা হইয়াছিল, কিন্তু ডাকের গোলমালে ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই। পরের স্টিমারেই সাহেবগঞ্জে চলিয়া গেলাম। গিয়াই প্রথমে মামার সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "তোমার ষড়যন্ত্রেই এরা এখানে এসেছে। আমি তোমার জন্যে অন্য জায়গায় ভালো পাত্রী দেখেছি, তারা পণের কিছু টাকা অগ্রিমও দিয়েছে, আমি তাদের কথাও দিয়ে ফেলেছি, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে তুমি হঠাৎ এই কাণ্ড করবে। তুমি ডাক্তারি পাস করেই এমন লায়েক হয়ে গেছ? ভুলে গেছ যে আমি তোমার অন্নদাতা, আমি না থাকলে কোন অতলে তুমি তলিয়ে যেতে? তোমার অধঃপতন হয়েছে, কিন্তু এখনও নিজেকে সামলে নিতে পার। ওদের ডেকে এনেছ, বিদেয় করে দাও। আমি যেখানে বিয়ে ঠিক করেছি সেখানেই বিয়ে হবে, এখানে কিছুতেই আমি মত করব না। ওরা কোন্ সাহসে এখানে এসেছে বুঝতে পারছি না। ভিতরে ভিতরে তোমার সায় আছে। ওদের আজই চলে যেতে বল। আজই। যেখানে আমি বিয়ে ঠিক করেছি তাঁরা পরশু দিন আশীর্বাদ করতে আসবেন।" আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্তোষের মা ও খেতুমামা দিদিমার ঘরে ছিলেন। মামার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন।

সন্তোষের মা বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমরা তোমার জ্ঞাতি। সন্তোষের বাবা তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন। কিন্তু তিনি আজ নেই; আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, অর্থবলও নেই। তাই আজ তোমার দ্বারস্থ হয়েছি, তুমি আপন লোক বলেই হয়েছি। আমার মান তুমি যদি না রাখো তো কে রাখবে।"

খেতুমামার চক্ষু দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল।

মামা বলিলেন, "বউদি, তুমি তোমার মেয়ের অন্যত্র সম্বন্ধ কর। আমি কিছু টাকা সাহায্য করব। কিন্তু তোমার মেয়ে আমার এই দোতলা বাড়িতে আসবে না।"

খেতুমামা এই কথায় ক্ষেপিয়া গেলেন।

বলিলেন, "আমি পেচ্ছাপ করে দিই তোমার টাকায়। সোনোর মাকে তুমি টাকা দেখাচ্ছ। ও আজ গরীব হয়ে গেছে, কিন্তু ওরও একদিন ছিল যখন ওর জমির ধান চাল খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছিলে। তুমি হয়তো টাকাব গরমে এ কথা ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার মা আশা করি ভোলেননি। তোমার বাবা যখন মারা গেলেন তখন তুমি নাবালক, তোমার দিদি বারাহীব বয়স তখন পনেরো ষোলো। তোমাদের জমি তখন বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হবার দাখিল হয়েছিল, তখন সন্তোষের ঠাকুর্দাই তোমাদের ভরণপোষণের ভার নিয়েছিলেন, তোমাদের জমির বিলিব্যবস্থা করেছিলেন। টাকার গরমে তুমি এসব কথা ভুলেছ। তারপর তুমি যখন গ্রামের বাড়িতে মা বোনকে ফেলে সদ্য-বিয়ে-করা বউকে নিয়ে সাহেবগঞ্জে মজা ওড়াচ্ছিলে তখনও তোমার জমিব রক্ষণাবেক্ষণ করেছে এই খেতু চাটুজ্যে। আমি না দেখলে কিচ্ছু থাকত না। আজ আমি একটি কথা বলে যাচ্ছি, আমি যদি সদব্রাহ্মণ হই তাহলে আমার এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। তোমার এই দোতলা বাড়ি, তোমার এই এত বাড়বাড়ন্ত কিছুই থাকবে না। অত বড় রাবণ রাজাব থাকেনি, তুমি তো কোন ছাব। তোমার নিজের দেমাক আর দুর্মতির আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে—এই বলে গেলুম। চল বউদি—এখানে আর একদণ্ড থাকব না।"

অভুক্ত অবস্থাতেই তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দিদিমা বারবার তাঁহাদের ডাকিযা ফিবাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আর ফিরিলেন না। আমিও তাঁহাদের অনুসরণ কবিলাম। কিন্তু আমি যে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছি ইহা তাঁহারা সম্ভবত বুঝিতে পারেন নাই।

রাত্রি তখন দশটা, মিউনিসিপ্যালিটিব বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারেই তাঁহারা স্টেশনের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন। একটু দূরে আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম খেতুমামা বলিতেছিন—"ট্রেনের এখনও দেরি আছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটাও বেশ বড়—ওইখানেই ঘণ্টা দুই বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে ফাঁকা হাওয়ায়। শক্তির বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পাষণ্ড, পাষণ্ড—!"

সই-মা বলিলেন, "কিন্তু ঠাকুরপো আমি শঙ্করায় মুখ দেখাব কি করে! আমি যে সবাইকে বড়মুখ করে বলে এসেছি সূয্যির সঙ্গে রাজুর বিয়ে হয়ে যাবে। এখন সবাই হাসবে। পাড়ার লোকেদের চেনো তো! এর জন্যেই আমি আসতে চাইনি। সূয্যি আমাদের আসতে লিখেছিল কিন্তু মামার সামনে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথা বলল না। অথচ ওর ভরসাতেই আমরা এতদূর ছুটে এলাম।"

খেতুমামা রূঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "ওই মামারই ভাগ্নে তো। শাস্ত্রে বলেছে—নরাণাং মাতুলক্রম' শক্তির মা-ও তো গুম হয়ে রইল। আগেই আমাদের অনুমান করা উচিত ছিল যে ঘেঁটুগাছে গোলাপফুল ফুটবে না।"

আমি উহাদের অলক্ষ্যে পিছু পিছু স্টেশনে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সই-মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মামার মত হল না, কিন্তু আমার কথার নড়চড় হবে না। আপনারা ফিরে গিয়েই প্রথম যেটি বিবাহের দিন আছে ঠিক করবেন, আমি গিয়ে বিয়ে করে আসব।"

সই-মা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না বাবা, তুমি এ কাজ কোরো না।"

আমি উত্তর দিলাম, "যদি আমার এখানে বিয়ে না হয় তাহলে আমি আর বিয়েই করব না। আমার জন্যেই আপনারা এমনভাবে অপমানিত হয়েছেন, মামা যে এতটা নিষ্ঠুর হবেন তা বুঝতেই পারিনি। যাই হোক আপনারা আর অন্য মত করবেন না, গিয়েই বিয়ের দিন ঠিক করে আমাকে টেলিগ্রাম করবেন, আমি গিয়ে বিয়ে করে আসব। হয়তো একাই যাব—সঙ্গে কেউ যাবে না।"

সই-মা বলিলেন, "কিন্তু বাবা—"

এক ধমক দিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন খেতুমামা।

"থাম না, ঘ্যানর ঘ্যানর করছ কেন! সূর্য যে দেবতুল্য কেদারনাথের আর দেবীতুল্য বারাহীর যোগ্য পুত্র এতক্ষণে তার প্রমাণ পেলাম। ওর কথা শুনে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। ছোট বুড়ীর ভাল নাম রাজলক্ষ্মী, আমি আশীর্বাদ করছি তুমিও রাজরাজেশ্বর হবে— আমরা গিয়েই বিয়ের দিন ঠিক করে মনিহারীর ঠিকানায় তোমাকে চিঠিও লিখব, টেলিগ্রামও করব। দেখি এবার শক্তি কি করে বিয়ে আটকায়। যদি আর বাগড়া দিতে আসে রক্তারক্তি হয়ে যাবে।"

বিজয়ী বীরের মতো খেতুমামা আমাদের পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন এ ব্যাপারের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁহারই।

তাঁহাদের ট্রেনে চড়াইয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন রাত বেশ হইয়াছে। দিদিমার ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গেলাম। সন্তর্পণে তাঁহার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া শুনিলাম তিনি বলিতেছেন—"খেতু ওরকম করে শাপশাপান্ত করে গেল, সন্তোষের মা না খেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল—আমার বুক কাঁপছে বাবা। মা মঙ্গলচণ্ডীর মনে, কি আছে জানি না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তুমি আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছ, আমি তোমার মা আর গুরু। তাই আমি তোমাকে জোর করে কিছু বলতে পারি না, মনে হয় আমার কথা যদি না শোন তাহলে তোমার অমঙ্গল হবে। ঘরে বিধবা মেয়ে থাকতে তুমি জোর করে দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করলে এটা আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমি জোর করে আমার কাছে মত আদায় করে নিলে। এ ব্যাপারেও আমি তোমাকে জোর করে কিছু বলতে পারলাম না। আমার সর্বদাই ভয় হয় আমার কথা তুমি যদি না শোন তাহলে তোমার অমঙ্গল হবে কারণ আমি তোমার মা আর গুরু। তাই তোমাকে জোর করে কিছু বলি না। কিন্তু এ কাজটা তোমার অন্যায় হল বাবা। মনে রেখো ন্যায়ত ধর্মত ওদের কাছে আমরা ঋণী। তোমার ছেলেবেলায় তোমার বাবা যখন চলে গেলেন তখন সোনোর বাবা, সোনোর ঠাকুরদা না থাকলে তোমাকে আমি মানুষ করতে পারতাম না। খেতু ঠাকুরপো ঠিক্ই বলেছে। ওদের দেওয়া ধানই তখন আমার একমাত্র সম্বল ছিল। ওরা তোমাদের বংশের ছেলে, সোনোর বোনটিও শুনেছি সুন্দরী—ওর সঙ্গে সূয্যির বিয়ে হলে আমি খুবই খুশী হতাম বাবা। তুমি কথাটা আর একবার বিবেচনা করে দেখ।

বুঝিলাম মামাকেই তিনি কথাগুলি বলিতেছেন।

মামা বলিলেন—"কিন্তু মা আমি যে ওদের কথা দিয়েছি। ওরা অগ্রিম কিছু টাকাও

দিয়েছে, এখন তো পিছোবার উপায় নেই। আমি বরং সন্তোষের মাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি—ওরা অন্য পাত্র দেখুক—"

দিদিমা বলিলেন—"ওরা ভিকিরি নয় বাবা—"

হঠাৎ পিছন দিক হইতে জামায় টান পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মামার বড় মেয়ে কমলা দাঁড়াইয়া আছে। সে চুপিচুপি বলিল—"মা তোমাকে ডাকছেন।"

গিয়া দেখিলাম মামীমা জাগিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে একটা উৎকণ্ঠা ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন—"বাবা, এস বস আমার কাছে। সবে এসে কাছে বস। তোমাকে একটা কথা চুপিচুপি বলছি।"

তাঁহার কাছে বসিতেই তিনি চুপিচুপি বলিলেন—"তুমি তোমার মামার কথা শুনো না বাবা। তোমার সই-মার মেয়ে রাজুকেই বিয়ে কব তুমি।"

আমি এটা প্রত্যাশা করি নাই।

বলিলাম—"আপনি একথা বলছেন কেন?"

"শুনলাম তুমি বিয়ে না করলে এক থুড়থুড়ে বুড়ো নাকি ওকে বিয়ে করবে। এ মহানরক থেকে ওকে বাঁচাও তুমি বাবা।"

মামার খড়মের শব্দ শোনা গেল।

মামীমা ফিসফিস করিযা বলিলেন—"আমি একথা বলেছি তা বোলো না যেন।"

মামীমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গেলাম। মামাব সহিত মুখোমুখি হইবাব সাহস হইল না। মামাকে চিরকালই ভয় করিয়াছি। নীচে গিয়া নির্জন রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল—যদিও আমি আমার বিবেক অনুসারে ঠিক কাজই করিয়াছি, তবু—। ওই 'তবু'টা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। মনে হইল, যে মামা আমাকে মানুষ করিয়াছেন আমার বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার কোনই হাত থাকিবে না, আমি নিজের খুশিমতো যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিব—এটাই কি উচিত হইতেছে? আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মামা ওই অন্য মেয়েটির বাবাকে কথা দিয়েছেন আমি সে বিশ্বাসের কোন মর্যাদাই দিব না, এটাই কি ন্যায়সংগত? নিজেকে মামার স্থলাভিষিক্ত কবিয়া আমি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম মামা কোনও অন্যায় করেন নাই। কিন্তু আমি যখন কথা দিয়েছি তখন—। সহসা ঠিক করিলাম দিদিমার কাছে গিয়া সব খুলিয়া বলি। তিনি যদি বলেন আমি ঠিক কাজ করিয়াছি তাহা হইলে আমার মনের গ্লানি কাটিয়া যাইবে।

রাস্তা হইতে আবার সন্তর্পণে দিদিমার ঘরের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম।

"দিদিমা—"

"কে?"

"আমি সূয্যি। নেত্য কপাটটা খুলে দে ত।"

দিদিমার ঘরের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নেত্য কপাট খুলিয়া দিল। দিদিমার ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন কমানো থাকিত। নেত্য সেটা বাড়াইয়া দিল।

"দিদিমা ঘুমিয়েছে?"

"না দাদু, ঘুম আসছে না। সোনোর মায়ের কথাগুলো কেবল কানে বাজছে। তুই এখনও ঘুমুসনি?

"না। আমি ওদের তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিলাম।"

তাহার পর তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম।

তিনি সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

"তুই একথা বলে এসেছিস? খুব ভাল করেছিস, খুব ভাল করেছিস। আমি বাঁচলুম!"

"সোনোর মা কিন্তু বারবার আমাকে বলছিল তোমার মামা তোমার পিতৃতুল্য, তাঁর মতের বিরুদ্ধে এ কাজ কোরো না। তবু আমি বলেছি যে আমি এখানেই বিয়ে করব। এখানে যদি বিয়ে না হয় আমি আর কোথাও বিয়ে করব না।"

"তুমি এখানেই বিয়ে করবে। আমি আর্শীবাদ করছি, সুখী হবে তুমি।"

দিদিমার আর্শীবাদ লাভ করিয়া আমি মনে অনেক বল পাইলাম। পরদিনই শঙ্করায় চিঠি লিখিয়া দিলাম—আপনারা কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি আজ মনিহারী চলিলাম। বিবাহের দিন ঠিক করিয়া আপনি আমাকে টেলিগ্রাম করিবেন, আমি ঠিক সময়ে গিয়া হাজির হইব। আমি কোনও পণ লইব না, বরাভরণ প্রভৃতির জন্যও অর্থব্যয় করিবেন না। যেটুকু না করিলে নয়, তাহাই কেবল করিবেন। ইহার সহিত আমি একশত টাকাও মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলাম সন্তোষের নামে। আমি মনিহারী আসিবার পরদিনই মন্মথ আসিয়া হাজির হইল এবং তাহার সহিত এমন একজন আসিলেন যাঁহার আগমন আমি প্রত্যাশা করি নাই। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। মামার বয়সী এবং মামার বন্ধু। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার ভয় হইল—মনে হইল ইনি মামার দূত হইয়া বিবাহ পণ্ড করিতে আসিয়াছেন। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িও শঙ্করায়। তাঁহার মতো কুচকুচে কালো এবং লম্বা লোক সাহেবগঞ্জে তখন আর ছিল না। তিনি রেলির গুদামের বড়বাবু ছিলেন। প্রথম যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ হওয়ার পর আর বিবাহ করেন নাই।

অজুহাত ছিল, কারণ তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, সুযোগও ছিল, কারণ এদেশে আবার পাত্রীর অভাব কি। কিন্তু তিনি আর বিবাহ করেন নাই। একটি প্রৌঢ়া দাই তাঁহার ঘরকন্না সামলাইত। এমন কি তাহাকে সাহেবগঞ্জের পাহাড়ে চড়িয়া তাঁহার জন্য কুলও পাড়িয়া আনিতে দেখিয়াছি। অনেকে বলিত দাইটি মুকুজ্যে মশাইয়ের রক্ষিতা। অনেকে বলিত মুকুজ্যে মশাইই দাইটির রক্ষিত। মুকুজ্যে মশাই আসিয়াই যাহা বলিলেন তাহাতে আমি আরও অবাক হইয়া গেলাম। বলিলেন, "তোমার সৎসাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার মামাকে বরদাবাবু, সুরথবাবু, আমি—সবাই অনুরোধ করেছি এই বিয়েতে মত দিতে। কিন্তু কিছুতেই সে মত দিচ্ছে না। যাই হোক আমরা তোমার পক্ষে আছি এই কথাটা বলতেই আমি এলাম। তোমার বিয়েতে আর কেউ যাক আর না যাক আমি বরযাত্রী যাব। রাজুর বাবা যেদিন মারা যায় সেদিন আমি শঙ্করাতে ছিলাম। তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম রাজুর বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব। একটি পাত্রের সন্ধান আমি করেছিলাম, কিন্তু পাত্রের বাবা একটি চামার, নগদ দু'হাজার টাকা পণ চায়। এমন সময় সুখবরটি শুনলাম তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। শুনে যে কি আহ্লাদ হল তা আর কি বলব। এখন এই পুঁটুলিটা খুলে দেখ তো। মাগী তোমাদের জন্য কি যেন খাবার তৈরি করে দিয়েছে। মাগী পুয়া আর খাবৌনি চমৎকার করে।" মাগী মানে অবশ্য সেই প্রৌঢ়া দাইটি। পুঁটুলি খুলিতেই একটি লাল-নীল রঙের বেতের কৌটা বাহির হইয়া পড়িল। দেখিলাম তাহার ভিতর সত্যই অনেক পুয়া খাবৌনি থরে থরে সাজানো। তাহার চেহারাটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। মোটাসোটা, কালোকোলো, দাঁতে মিসি, তালের মত মুখখানা। তাহার সহিত কোনদিন তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, সে হঠাৎ এত খাবার পাঠাইতে গেল কেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম।

বাড়ির ভিতর হইতে মধুয়া আসিয়া খবর দিল ঠাকুরটি সরিয়াছে। আমার বাড়িতে তখন অনেক লোক খাইত। ঠাকুরটি চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম।

যদু মুকুজ্যে সোৎসাহে বলিলেন—"কুছ পরোয়া নেই। এবেলাটা আমি চালিয়ে দেব। যখন ভাল চাকরি জোটেনি তখন আমি রাঁধুনীগিরি করতাম। সব রকম রাঁধতে পারি আমি।"

কেশ মশাই পাশের ঘরে ছিলেন। সেখান হইতেই বলিলেন—"আমিও পারি। আপনি আমাদের অতিথি, এবেলা অন্ততঃ আপনাকে রাঁধতে দেব না। এবেলা আপনি ফরমাশ করুন, আমি রাঁধি—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লাল রোহিত মৎস্য লইয়া সতীশবাবু প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—"ডালাবিরের মাছ। মালিক পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য।" ঠাকুর অন্তর্ধান করিয়াছে শুনিয়া তিনি গুম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"ও বিয়ে করতে গেছে। মৈথীলদের কনে' পাওয়া তো শক্ত। ও একটি ন'বছরের মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, মেয়েকে দুশো টাকা পণ দিতে হবে। এখানকার হরিবোল সা চড়া সুদে টাকাটা ওকে ধার দিয়েছে ওদের দেশের জমি বন্ধকে রেখে, কিন্তু এখানে রান্নার কি ব্যবস্থা হবে—"

কেশ মশাই বলিলেন—"সে ভার আমি নিয়েছি। আমি বেয়ালায় জয়জয়ন্তীটা বাজিযে তারপর রান্নাঘরে ঢুকব। আপনি বাঁয়া তবলাটা বার করুন। আপনিও আজ এখানে খাবেন—মধুয়া ততক্ষণ মাছটা কুটে ফেলুক—"

জযজয়ন্তী শুরু হইয়া গেল।

জয়জয়ন্তী শেষ হইলে সতীশবাবু বলিলেন, "একটা কথা মনে পড়ল। আমাদেব দেওয়ানজী শ্বশুরবাড়ি থেকে এক অনাথা বুড়ীকে এনেছিলেন। এনে রাঁধুনী করে বাহাল করেছেন তাকে। রাঁধুনীটি নাকি দূর সম্পর্কে দেওযানজীর মাসশাশুড়ী হন। মুশকিল হয়েছে বুড়ী এখন কেবলমাত্র আর রাঁধুনী হয়ে থাকতে চাইছে না, মাসশাশুড়ীব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। দেওয়ানজী একটু বিপদে পড়েছেন। সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা হয়েছে তাঁর। আপনি রাখবেন তাঁকে? বুড়ী কিন্তু খুব দজ্জাল, খুব দুর্মুখ।—"

কেশ মশাই বলিলেন, "নিয়ে আসুন তাঁকে। পায়ে ধরব তাঁর, তাতেও যদি তিনি প্রসন্ন না হন পাঞ্জা ধরব। পাঞ্জা লড়তে পাবে বুড়ী?"

"গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।"

"আমরা কেউ ভূত নই, আমবা রসিক। নবরসের যে কোন রস আমরা বরদাস্ত করতে পারব। আনুন আপনি বুড়ীকে।"

তাহার পরদিনই বামুনদিদি আমার বাড়িতে ছোট এক পুঁটুলি লইয়া প্রবেশ করিলেন। ইঁহার পরিচয় আগেই দিয়াছি। আমরণ তিনি আমার কাছে ছিলেন।

যথাসময়ে সন্তোষের টেলিগ্রাম ও পত্র আসিল—২৭শে শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। ২৫শে শ্রাবণ আমি মনিহারী হইতে রওনা হইয়া গেলাম। সতীশবাবুরও বরযাত্রী যাইবার ইচ্ছা ছিল। আমি বলিলাম আপনি এখানেই থাকুন। ওই অনিশ্চয়তার মধ্যে আপনাকে লইয়া যাইতে চাই না। বিবাহ করিয়া বধূকে এখানে যদি লইয়া আসিতে হয় আপনাকে টেলিগ্রাম করিব। আপনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। এখানেই আপনার থাকা দরকার। সতীশবাবু রাজী হইলেন। সাহেবগঞ্জে গিয়া আমি গোপনে দিদিমার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বলিলাম, বিবাহ করিতে যাইতেছি। কলিকাতায় গিয়া আমার পুরাতন মেসে

পালিতবাবুর বাসায় উঠিব। তাহার পর সেখান হইতে শঙ্করায় যাইব। মন্মথ ও যদু মুকুজ্যে বরযাত্রী যাইতেছে। দিদিমাকে সব বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দিদিমা প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকত কি খুশীই না হত সে। দিদিমাকে বলিয়া আসিলাম—আমি এখন বউ আনব না। পরে আনব।

কলিকাতায় পালিতবাবুর বাসায় গিয়া শুনিলাম শঙ্করা হইতে আমার এক জ্ঞাতিভ্রাতা আমার খোঁজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মামার দূর সম্পর্কের খুড়া পটলকর্তাও নাকি ছিলেন। তাঁহারা আমার বিবাহের খবর শুনিয়াছেন। শুধু তাই নয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞও হইয়াছেন যে আমাকে তাঁহারা বিবাহের দিন শঙ্করায় পৌঁছিতে দিবেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা গুণ্ডার সাহায্যও লইবেন। পালিতবাবুকে তাঁহারা বলিয়াছেন, "ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও যাতে এতবড় একটা অকর্তব্য না করে তা আমাদের দেখা উচিত। আপনি ওকে বিকেল পর্যন্ত আটকে রাখবেন। আমরা বিকেলে আবার আসব।"

পালিতবাবু বলিলেন, "তুমি এখানে এসে পড়েছ। চাট্টি খেয়েই অন্যত্র চলে যাও। তোমার বঙ্কুমামার বাসায় যাওয়াই নিরাপদ। তিনি শক্ত লোক, তোমাকে ভালও বাসেন।" বঙ্কু মামা মামার এক জ্ঞাতিভাই। বঙ্কু মামার বাসায় গিয়া দেখিলাম মামার আর এক জ্ঞাতিভ্রাতা উদয় চাটুজ্যে বসিয়া আছেন। পাশেই একটি ছিপ। দীর্ঘকান্তি গৌরবর্ণ পুরুষ তিনি। আমার কথা আগেই শুনিয়াছিলেন, পরিচয় পাইয়া আনন্দে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "তোর মা বারাহী আমার ছোট বোনের মতো ছিল। কলকাতা থেকে ফিরবার সময় প্রতিবারই তার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হত। কখনও চুলের ফিতে, কখনও রঙিন শাড়ি, কখনও গন্ধতেল। না নিয়ে গেলে ভারি অভিমান হত তার। তুই ডাক্তারি পাস করছিস এ খবর পেয়েছি, কিন্তু তোর সঙ্গে দেখা আর হয়নি। তা এখানে কবে এসেছিস?"

তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। "কারও সাধ্য নেই তোকে আটকাতে পারে। আমরা নিজে গিয়ে তোকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। আজ আমি আর বঙ্কু ছুটি নিয়েছিলাম একজায়গায় মাছ ধরতে যাব বলে। সেটা দেখছি আজ আব হল না। রামতাকৎ সিং—"

একজন বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কু মামার আপিসের চাপরাসী।

উদয় মামা বলিলেন, "তুমি আমার বাসায় গিয়ে বোনোয়ারি সিংকে ডেকে নিয়ে এস।"

"জি হুজুর—"

উদয় মামা বলিলেন, "বোনোয়ারি আমার ঠাকুর, সে-ও খুব তাগড়া লোক। এই দুই সিংহ তোমাকে পাহারা দিবে। ওরা যদি গুণ্ডা আনে তাহলে তাদের মহড়া নিতে পারবে ওরা।"

মন্মথ তাহার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়াছিল। যদু মুকুজ্যেও তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমি যাই নাই—কারণ আমি পুরাতন শ্রদ্ধেয় বন্ধু পালিতবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পালিতবাবুর বাসাতেই আসিয়া উঠিয়াছিলাম। মন্মথ বলিয়া গিয়াছিল সে ঠিক সময়ে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

উদয় মামা ও বঙ্কু মামা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিলেন। ঘোড়ার গাড়ির পিছনে বিশাল গুম্ফধারী বোনোয়ারিলাল এবং গাড়োয়ানের পাশে শালপ্রাংশু-মহাভুজ রামতাকৎ সিং গাড়িটির শোভা বৃদ্ধি করিল। উদয় মামা, বঙ্কু মামা এবং আমি গাড়ির ভিতরে বসিলাম।

বঙ্কু মামা বলিলেন—তুমি ভালয় ভালয় বিয়ে করে এস। তারপর আমি আর উদয় তোমার মনিহারীর বাড়িতে যাব একবার।

হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিলাম মন্মথ যদু মুকুজ্যেকে লইয়া স্টেশনের গেটে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেন ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে পালিতবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার হাতে একটি ছোট রঙিন বাক্স দিয়া সসংকোচে বলিলেন—বউমার জন্য সামান্য আশীর্বাদ এটা। দেখিলাম এক ছড়া সোনার হার আনিয়াছেন তিনি। মনে পড়িতেছে সহসা আমার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। মনে হইয়াছিল বিবাহ করিতে যাইবার সময় সেদিন যাঁহারা স্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত আমার রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না—সে হিসাবে তাঁহারা সবাই পর। পরে বহুবার প্রমাণ পাইয়াছি রক্তের সম্পর্ক লোককে আপন করে না, প্রাণের সম্পর্কই আত্মীয়তার একমাত্র বন্ধন। ভগবানের দয়া না থাকিলে সে সম্পর্কও হয় না। ভগবান আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

অনাড়ম্বরে এবং নির্বিঘ্নে আমার বিবাহ হইয়া গেল। যদু মুকুজ্যে বিবাহের পর কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। মন্মথ রহিল। আমি সই-মাকে বলিলাম—এখন আমি একাই ফিরিয়া যাই। ওখানকার কি ব্যাপার সব বুঝিয়া তাহার পর যাহা হয় ব্যবস্থা করিব। সই-মাও এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। খেতু মামা বলিলেন—তুমি সোজা ওকে মনিহারী নিয়ে চলে যাও। সেখানে তো শক্তি চাটুজ্যের জাবিজুরি খাটবে না। যা দেখে এলাম সেখানে তো তুমি একাই একশ'। বাড়িটিও চমৎকার করেছ। লোকজনও সবাই তোমাকে খাতির করে। সেইখানেই নিয়ে যাও সোজা। আমি চুপ করিয়া রহিলাম ক্ষণকাল। তাহার পর বলিলাম—মামার রাগটা পড়ুক, তারপর যা হয় করব। মামা আমার পিতৃতুল্য, তাঁর আশীর্বাদ না পেলে আমার সংসার সুখের সংসার হবে না। খেতু মামা উত্তর দিলেন—কিন্তু তোমার মামা কি এরপর তোমায় আশীর্বাদ করবেন? মনে তো হয় না। ওর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। এইসব আলোচনা চলিতেছে এমন সময় একটা টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত। সাহেবগঞ্জ হইতে দিদিমা টেলিগ্রাম করিতেছেন—বউকে লইয়া এস। আমার মনে হইল দিদিমা বোধহয় মামার মত করাইয়াছেন। খুব আনন্দ হইল। খেতু মামার মুখও হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বারবার বলিতে লাগিলেন—বাছাধন এইবার পথে এসেছেন মনে হচ্ছে। এতক্ষণে বোধহয় বুঝেছেন নিজের মান নিজের কাছে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিলাম রাত্রি বারটায়। আকাশে ঘন-ঘোর মেঘ। বৃষ্টি পড়িতেছে। নববধূকে ওয়েটিং রুমে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহার পর দেখিলাম মামার দুইজন গোমস্তা স্টেশনে ঘোরাফেরা করিতেছে। ভাবিলাম বুঝি আমাদেরই লইতে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলাম। তারপরই বজ্রপাত। তাহারা বলিল মামা বলিয়া দিয়াছেন আমি যেন বউ লইয়া তাঁহার বাড়িতে না যাই, গেলে জুতা মারিয়া গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। ভাবিলাম শঙ্করাতে আবার ফিরিয়া যাই। দুই ঘণ্টা পরেই ফিরিবার ট্রেন আছে। কিন্তু মনে হইতে লাগিল—কি লজ্জা! কি লজ্জা! নববধূর কাছে এ প্রস্তাব করিব কোন্ মুখে! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। মন্মথর বাবা বরদাবাবু তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ের মধ্যে দেখিলাম আনুদা—মন্মথর দাদা—আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। চোখাচোখি হইতেই তিনি হাসিমুখে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—বউ কই। বাবা আমাকে পালকি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। শক্তি কাকা নাকি তোমাদের

বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। তোমার দিদিমা আমাদের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন। তাই আমি এসেছি। গোমস্তা দুজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। চল, আমাদেব বাড়ি চল। আমার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না, চোখে জল আসিযা পড়িয়াছিল, গলা খাঁকারি দিয়া বলিলাম -- এত রাত্রে বউ নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। মন্মথ বলিল—খুব ঠিক হবে। তুই আমাদেব পর মনে করিস নাকি। আনুদা হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার সে নীরব হাসির অর্থ, কোন আপত্তি টিকিবে না। অবশেষে যাওয়াই স্থির হইল। বউ ওয়েটিং রুমে ছিল, সে কিছুই জানিতে পারিল না, ভাবিল শ্বশুর বাড়িতেই বুঝি যাইতেছে। বরদাবাবুর গৃহদ্বারে পৌঁছিতেই ভিতর হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। আনুদার কিছুদিন আগে বিবাহ হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রী আসিয়া নববধূকে পালকি হইতে নামাইলেন এবং জলের ঝারা দিতে দিতে প্রথামতো তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ন্যাটা মাছ ও দুধ ওতলানোর ব্যবস্থাও তাঁহারা রাখিয়াছিলেন। বরদাবাবু সকালে উঠিয়াই মামার কাছে গেলেন। কোন ফল হইল না। শুনিলাম মামা সাড়ে আটটার ট্রেনে পীরপৈতিতে 'কলে' চলিয়া যাইবেন, ফিরিবেন রাত্রি নটায়। আমি এ সুযোগ ত্যাগ করিলাম না। দিদিমার কাছে চলিয়া গেলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বলিলাম—আপনি টেলিগ্রাম করতে গেলেন কেন। কি মুশকিলে ফেলেছেন দেখুন তো। দিদিমা কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—তুই রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে আয়। আমি তো চোখে দেখতে পাই না, তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেখি একবার। আমি ইহাতে রাজী হইলাম না। বলিলাম এ বাড়িতে আসিলে কেহ যদি তাহাকে অপমান করে। সে আশা করিয়া আছে এইবার বউভাত হইবে খুব ধুমধাম হইবে সে সব তো হইবেই না, বরং উপরন্তু অপমানের ভয় আছে। আমি বউকে লইযা আজই মনিহারীতে চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা আমি যাইব না, কারণ তাহা হইলে মামার সহিত চিরকালের মতো বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। আমি ওকে শঙ্করায় রাখিয়া আসি, তাহার পর নিজেই মামার সহিত বোঝাপড়া করিব। আজকালকার ছেলেরা হয়তো এই আচরণে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আসল কথা— মামাকে আমি ভক্তি করিতাম, ভয়ও করিতাম। আমার বিবেক বারবার আমাকে বলিতেছিল তুমি অন্যায় করিয়াছ। যে মামা তোমাকে মানুষ করিয়াছেন ভদ্রসমাজে তাহাকে তুমি অপদস্থ করিয়াছ। যেমন করিয়া হোক মামাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। দিদিমা বলিলেন--তবে তাই রেখে আয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। শক্তি আর কতদিন রাগ করে থাকবে। আমি সেই দিনই বউকে লইয়া শঙ্করায় ফিরিয়া গেলাম। মন্মথ তাহাকে একটা মিথ্যা গল্প বানাইয়া বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় হঠাৎ মারা গেছে। তাই এখন বউভাত হল না। পরে হবে। রাজলক্ষ্মী বহুকাল পর্যন্ত জানিত না যে মন্মথর বাবা ও মা তাহার শ্বশুর শাশুড়ী নয়। তাঁহারা পূজার সময় রীতিমতো তত্ত্বও করিয়াছিলেন। উঁহাদের ঋণ জীবনে শোধ করিতে পারিব না। উঁহাদের স্মৃতি আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। মন্মথ আজ নাই, আনুদাও মারা গিয়াছে। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও সাহেবগঞ্জে নাই—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িযাছে। তাহারা তাহাদের নূতন জীবনে নূতন সমস্যা লইয়া ব্যস্ত। আমাদের কথা হয়তো তাহারা একবারও ভাবে না। আমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের সহিত দেখা হইলে তাহারা সেই মনোভাব লইয়া স্মরণ করিবে, যে মনোভাব লইয়া আমরা ইতিহাস পড়ি বা গল্পের বই পড়ি। যে রামধনু আমাদের আকাশকে রঞ্জিত করিয়াছিল

তাহা ঝরিয়া গিয়াছে, যে পাখির সুরলহরীতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে পাখি উড়িয়া গিয়াছে।

শঙ্করা হইতে ফিরিয়া আমি মামার সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিলাম—"আমি অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমা না পেলে আমি নতুন সংসার পাততে পারব না।"

মামা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু একটি শর্তে। ও বউকে ত্যাগ করে আমি যেখানে বিয়ে ঠিক করেছি সেইখানে তোমাকে বিয়ে করতে হবে।"

"ত্যাগ করব? তার কি অপরাধ?"

"অপরাধ কিছু নেই! কুলীনের ছেলেরা একাধিক বিয়ে হামেশাই করে। তোমার ঠাকুরদার তিনটি বিয়ে ছিল। তিনজনকে নিয়েই তিনি ঘর করতেন। তুমি আমার মান বাঁচাবার জন্যে এখন ওকে ত্যাগ করতে পার, পবে এ বিয়ে হয়ে যাবার পর আবার ওকে ঘরে নিও। তখন আমি আপত্তি করব না।"

মামার কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

তুচ্ছ মানের জন্য তিনি একটা নিরপরাধিনী বালিকার জীবন বিষময় করিয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না—অথচ সম্পর্কে তিনি তাঁহার কাকা হন! বলিলাম—"আমাকে কি করতে হবে?"

"আমি যে রকম ভাবে বলব সেই রকম ভাবে ওদের একটা চিঠি লিখে দাও আগে।"

"দিদিমাকে জিগ্যেস করব না?"

"কিছু দরকার নেই।"

"কি লিখব—"

"সন্তোষকে লিখে দাও যে দুর্বুদ্ধিবশে আমি আমাব মামার মতের বিরুদ্ধে তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলাম। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। মামা আগে যেখানে আমার সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন সেখানেই আমাকে বিয়ে করতে হবে। বাস্, এইটুকু লিখলেই হবে। চিঠিটা লিখে এনে আমার কাছে দিয়ে যাও আমি পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা।"

মামা 'কলে' বাহির হইয়া গেলেন। মামার জন্য আমার সত্যই দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম মামা কতদূর যান শেষ পর্যন্ত আমি দেখিব। মামার নিষেধ সত্ত্বেও দিদিমাকে গিয়া সব কথা বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম তিনি বুঝি আবার কান্না শুরু করিবেন। কিন্তু তাঁহার মুখভাব—কঠিন হইয়া উঠিল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, মা মঙ্গলচণ্ডী, ওকে রক্ষে কর। আমাকে বলিলেন—"যে রকম বলছে সেই রকম লিখে দে। আর সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষকে আলাদা একখানা চিঠি লিখে দে তুই। তাতে লেখ, যে বাধ্য হয়ে মামার পীড়াপীড়িতে তোমাকে ওরকম চিঠি লিখেছি। আমি অন্য কোথাও বিয়ে করব না। তুমি রাজলক্ষ্মীকে সাহেবগঞ্জে নিয়ে এস। নিয়ে এসে বল যে তোমাদের বউ তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম। আমি আর ওর ভার নিতে পারব না। যে অগ্নিসাক্ষী করে ওকে বিয়ে করেছে সেই ওর ভার নিক। আমি চললুম। এই বলে তুমি চলে যেও। তারপর সব ঝক্কি আমি বইব। চিঠির সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দে। গাড়িভাড়ার অভাবে যেন আসা বন্ধ না হয়ে যায়।

তাহাই হইল। ইহার পরই নাটকটা জমিয়া গেল। আমার লেখা চিঠিটা মামা রেজিস্ট্রি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দিদিমার ফরমায়েশি চিঠিও আমি রেজেস্ট্রি করিলাম। মনি-অর্ডার যোগেও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিলাম। সন্তোষকে ইহাও লিখিয়া দিলাম দিন পনেরো পরে আমি সাহেবগঞ্জে আসিব। সেই সময়ই সে যেন আসে।

অবশেষে সন্তোষের চিঠি একদিন আসিল। কোন্ তারিখে কোন্ ট্রেনে সে সাহেবগঞ্জে পৌঁছিবে তাহা জানাইয়াছে এবং লিখিয়াছে আমি যেন সে সময়ে সাহবেগঞ্জে নিশ্চয় উপস্থিত থাকি। সাহেবগঞ্জে গিয়া দেখিলাম পটল কর্তা এবং পটলগিন্নী আসিয়াছেন এবং মামা খুব সমারোহ করিয়া তাঁহাদের খাতির যত্ন করিতেছেন। আমার দিকে একনজর চাহিয়া পটলকর্তা বলিলেন—"তুই খুব তুখোড় ছোকরা দেখছি। নিজে লুকিয়ে একটা বিয়ে করেছিস, আবার মামার জেদ বজায় রাখবার জন্যে আর একটা বিয়ে করতে যাচ্ছিস। মানে, দুটো ছুঁড়ী নিয়ে ফুর্তি করবি একসঙ্গে। তোর মামা বলছে বটে যে সোনোব বোনকে তুই ত্যাগ করবি। কিন্তু বিয়ে-করা বউকে ত্যাগ করা কি সহজ? সাত পাকের বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন।"

আমি কোনও উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করিলাম না।

পটলকর্তা বলিয়া চলিলেন, "তোর অদৃষ্টটা ভালো। এবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে-ও অপূর্ব রূপসী। আমি দেখে এসেছি। ষোলয় পা দিয়েছে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। মেয়ের বাপ দারোগা, অনেক দেবে থোবে। খাট-পালঙ্ক, রূপোর বাসনপত্র, সোনার ঘড়ি—"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। দিদিমাকে কেবল গোপনে বলিলাম, "সন্তোষ আজ বউকে নিয়ে রাত্তিরের গাড়িতে আসবে। আমি বউকে তোমার কাছে রেখে যাব, না মনিহারী নিয়ে যাব?"

"এখানেই দিন কতক থাকুক আমার কাছে। দেখি হাওয়া কোন্ দিকে বয়। পটলকর্তা এসেছে বলেই ভয় হচ্ছে, ও ক্রমাগত বাগড়া দিতে থাকবে। সম্বন্ধটি ওই এনেছে তো—হয়তো পাত্রীপক্ষ থেকে কিছু টাকাও খেয়েছে—"

আমি স্টেশনে যাই নাই। সন্তোষকে লিখিয়া দিয়াছিলাম আমি স্টেশনে যাইব না। তুমি সোজা বাড়িতে চলিয়া আসিও। রাতদুপুরে সন্তোষ আসিয়া হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। মামা নিজেই উঠিয়া সিঁড়ির দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?"

"আমি সন্তোষ, রাজুকে নিয়ে এসেছি। সূয্যিকে পাঠিয়ে দেন। তার স্ত্রী তার হাতে দিয়ে আমি এই ট্রেনেই ফিরে যাব। সে নিজের স্ত্রীকে মারতে হয় মারুক, রাখতে হয় রাখুক। আমি আর ওর দায়িত্ব বইতে পারব না।"

"তুমি উপরে এস না—"

"না, আমি আপনার বাড়িতে ঢুকব না।"

আমি জাগিয়াই ছিলাম, তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম। দিদিমা কমলাকেও পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের পিছু পিছু আড়ময়লা-কাপড়-পড়া রাজু ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। সন্তোষ স্টেশনে চলিয়া গেল। মামা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজু মামাকে যখন প্রণাম করিতে গেল তখন তিনি পা সরাইয়া লইলেন এবং রাগে গরগর করিতে করিতে নিজের ঘরে গিয়া দড়াম্ করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজু দিদিমার ঘরে গিয়া দিদিমাকে প্রণাম করিতেই দিদিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহার মাথার উপর মুখটা রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মাথায় কি তেল মাখিস?"

"নারকেল তেল"—অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল রাজু।

"তাই এরকম গন্ধ হয়েছে। কমলি আমার ফুলেল তেলের শিশিটা নিয়ে আয় তো।"

কমলি ফুলেল তেলের শিশি লইয়া আসিতেই বলিলেন—"এর মাথায় ভালো করে' মাখিয়ে দে।"

"এত রাত্তিরে তেল মাখিয়ে কি হবে। কাল বরং চানের সময়।"

"যা বলছি, তাই কর। ফাজিল কোথাকার।"

নেত্যও উঠিয়া আসিয়াছিল। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"দাও আমাকে দাও, আমি মাখিয়ে দিচ্ছি।"

দিদিমা আদেশ করিলেন—"তার আগে আমার কুলুঙ্গি থেকে দুটো সন্দেশ বার করে' বউকে খেতে দে। আর শাঁখ বাজা। নতুন বউ বাড়িতে এল।"

নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তাহার পরদিন ভোরেই আমি মনিহারী চলিয়া গেলাম। অনুভব করিলাম দিদিমা যখন আছেন তখন ভয়ের কোনও কারণ নাই।

মনিহারীতে চলিয়া গেলাম বটে, কিন্তু সেখানে কিছুতেই মন বসিল না।

সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন—"বউমা কোথা?"

"মামার কাছেই আছে এখন।"

"এখানে কবে আসবেন?"

"দেখি?"

সতীশবাবুকে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না। হাবু মামা আমাকে আড়ালে একদিন বলিলেন—"তোমার মামার কাছে বউমাকে রেখে আসার মানেটা কি বুঝতে পারছি না। এত অপমানের পরও তুমি মনে করছ উনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। সে লোকই উনি নন—। তুমি যাও ওকে নিয়ে এস গিয়ে—"

কি করিব, কি করা উচিত, যে মামা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহাকে সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিয়া আমার নূতন সংসার পাতিব? মামার আশীর্বাদ না পাইলে আমার সংসার কি সুখের সংসার হইবে? এই সব চিন্তার দোলায় মন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। ত্রিপুরারি সিং ভালুকা চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সমস্যার কথা ভোলেন নাই। কারণ কয়েকদিন পরেই রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সাধারণতঃ জমিদারির বিভিন্ন কাছারিতে কাছারিতে ঘুরিয়া বেড়ান, একজায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আমকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ডাক্তার তুমি আমাকে বন্দী করে আর কতদিন রাখবে? মহালে মহালে ঘুরে বেড়ানোই আমার স্বভাব। কখনও নৌকোতে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও হাতির পিঠে, কখনও গরুর গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছি আমি সারাজীবন। না বেড়ালে আমার ভালো হজম হয় না, রাত্রে ঘুমও হয় না। তা ছাড়া, যদিও আইনত জমিদারির মালিক ত্রিপুরারি সিং, কিন্তু জমিদারির আসল মালিক আমি। চারদিকে চারটে বাঘা বাঘা জমিদার ওত পেতে আছে, কি করে আমাদের বিপদে ফেলবে। তাদের নানরকম কুচক্রী মন্ত্রীও আছে, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে জমিদারি রক্ষা করবার সামর্থ্য মালিকের নেই। আমিই তাঁর জমিদারি রক্ষা করি। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রক্ষা করিতেন—আমি ত্রিপুরারি সিংকে রক্ষা করি। চাণক্যের দুটো চোখ ছিল,

আমার মাত্র একটা চোখ। তাই আমাকে খাটতে হয় বেশী। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। কিন্তু তুমি আমার পায়ে দড়ি বেঁধে দিয়েছ।"

অবাক হইয়া গেলাম।

"আমি আপনাকে বেঁধে রেখেছি! কি রকম?"

"মালিক হুকুম দিয়ে গেছেন—বউমাকে এখানে এনে তবে যেন আমি বাইরে বেরুই। বউমাকে কবে আনতে যাবে?"

"এখন তো ঠিক করিনি।"

"ঠিক করে ফেল। আমি আমাদের একজন কর্মচারীকে পাঠিয়েছি সাহেবগঞ্জে। সে তোমার বন্ধু মন্মথর সঙ্গে দেখা করে আসবে। মন্মথবাবুকে একটা চিঠিও দিয়েছি আমি। লিখেছি তোমার মামার বাড়ির হাওয়া কোনদিকে বইছে তার একটু আভাস যেন আমাদের দেন। আর কথাটা গোপন রাখেন। আশা করি এটুকু সাহায্য তিনি করবেন। খবর যদি খারাপ হয় তাহলে আমার বিবেচনায় তুমি আর কালবিলম্ব না করে বউমাকে নিয়ে এস। এখান থেকে গোটা দশেক সিপাহী তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। কোনও অসুবিধা হবে না।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলাম—"মামার বাড়ি থেকে বউকে লুট করে আনতে বলছেন? তা আমি পারব না।"

রায় মহাশয় আমার দিকে তাঁহার একচক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন -"তোমার মাতুল-প্রীতি অসাধারণ দেখছি। ভালো। দেখা যাক কি খবর আসে ওখান থেকে—তারপর ঠিক করা যাবে-"

সেদিন সন্ধ্যায় স্টীমারে মন্মথ নিজেই আসিয়া পড়িল।

বলিল—"তুমি চল। সন্তোষের মা-ও এসে পড়েছেন। পটলকর্তা আর পটলগিন্নীর পায়ে ধরাধরি চলছে এখন। নাটক খুব জমে' উঠেছে-"

"কি রকম?"

"তোমার মামা খুব খলিফা লোক। তিনি বলছেন পটলকর্তা আমার পূজনীয় কাকা, তিনিই অন্য জায়গায় তোমার ভালো সম্বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে লুকিয়ে সন্তোষের বোনকে বিয়ে করে ফেলাতে তাঁর মানহানি হয়েছে। তিনি অতবড় একটা মাননীয় লোক, তিনি পৈতে ছিঁড়ে শাপ-শাপান্ত করছেন। বলছেন সন্তোষের বোনকে দূর করে দিয়ে তুমি ওর মনোনীত মেয়েকে বিয়ে কর। তোমার বউ তাঁর আর তার গিন্নীর পায়ে ধরে কাঁদছে আর বলছে আমাকে ক্ষমা করুন। তোমার মামা বলছেন আমার কাকা যদি ক্ষমা করেন তাহলেই সব মিটে যাবে। কিন্তু তোমার মামার কাকা কিছুতেই ক্ষমা করছেন না। তোমার দিদিমা লুকিয়ে টেলিগ্রাম করে তোমার শাশুড়ীকে আনিয়েছেন। পটলকর্তারা একদিন তাঁদের বাড়িতেই খেয়ে মানুষ হয়েছেন। তোমার দিদিমার বিশ্বাস তিনি নিজে এসে বললে হয়তো কাজ হবে। তিনি কাল এসেছেন। আমার বিশ্বাস কিছু হবে না। তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে এস এখানে।"

আমি সেই দিনই মন্মথর সহিত সাহেবগঞ্জে চলিয়া গেলুম।

গিয়া দেখিলাম অবস্থা জটিল। পটলকর্তা আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। পটলগিন্নীও গম্ভীর হইয়া রহিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। রাজলক্ষ্মী দিদিমার বিছানায় শুইয়া ছিল, আমাকে পাইয়াই সে উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইল। সন্তোষের মা বলিলেন—"বাবা এত নাকাল হতে

হবে জানলে তোমার সঙ্গে রাজুর বিয়ে দিতাম না। গুরুজনের প্রতি ভক্তি থাকা ভালো, কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে। তুমি যাকে ধর্মসাক্ষী করে' বিয়ে করেছ—"

দিদিমা তাঁহাকে এক ধমকে থামাইয়া দিলেন।

"এই থাম! সব ঠিক হয়ে যাবে—"

একটু পরে আমি নীচে নামিয়া গেলাম মামার সহিত দেখা করিবার জন্য। মামা কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রাস্তা হইতে সতীশবাবুর ডাক শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সতীশবাবু দেখিলাম একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম স্টেটের কোন কাজে হয়তো সাহেবগঞ্জ আসিয়াছেন।

"কি ব্যাপার, আপনি এখানে!"

"একটু কাজে এসেছি। এদিককার খবর কি? বউমাকে নিয়ে কবে ফিরছেন?"

"তার এখনও ঠিক নেই। মামার এক কাকা এসে জুটেছেন, তিনি নাকি আমার জন্যে অন্যত্র একটি সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন। তিনি ভয়ানক রাগারাগি করছেন। মামা বলছেন তিনি যদি ক্ষমা করেন তাহলেই সব মিটে যাবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষমা করছেন না, আমার বউ তাঁর পায়ে ধরেছিল তিনি লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছেন। আমার শাশুড়ীও এসে পড়েছেন। তাঁর অনুরোধও রাখেননি তিনি। অথচ ওঁদের যখন খুব দুরবস্থা ছিল আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেই ভরণপোষণ হত ওঁদের। এখন উনি সে সব কথা ভুলে গেছেন। ওই যে ওই ভদ্রলোক—"

পটলকর্তা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না। দোতলায় উঠিয়া গেলেন। দেখিলাম সতীশবাবু নীচের ঠোঁটটিকে উপরের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া পটল কর্তাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। মনে হইল এখনই যেন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। তাঁহার এরূপ হিংস্র মুখভাব আগে কখনও দেখি নাই।

"উনি রোজ গঙ্গাস্নান করেন?"

"রোজ।"

"হুঁ। আচ্ছা, আজ তো সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার আপনি বউমাকে নিয়ে আসুন। লক্ষ্মীবারেই গৃহলক্ষ্মী গৃহপ্রবেশ করুন, আমরা সেই রকম বন্দোবস্ত রাখব। আশা করি, ক্ষমা-চাওয়া-চাইর ব্যাপার ততদিনে মিটে যাবে।"

"যদি না যায়!"

"আমি বলছি, যাবে। আর যদি না যায় আপনি বউমাকে নিয়ে চলে আসুন। একটা নিরপরাধ বালিকাকে এভাবে কতদিন নির্যাতন করবেন আপনি? এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমি এখন চলি। বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যার স্টীমারে ঘাটে লোকজন থাকবে—নিশ্চয় যাবেন সেদিন—"

সতীশবাবু পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মামার সহিত সেই দিন বৈকালেই আমার কথাবার্তা হইল।

বলিলাম —"আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

"কেন?"

"আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমি আপনার কথামতো সন্তোষকে চিঠি লিখেছিলাম যে আমি এ বউকে পরিত্যাগ করে আপনাদের মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করব। কিন্তু ভেবে দেখলাম তা আমি করতে পারব না। আমিই সন্তোষকে চিঠি লিখেছিলাম তার

বোনকে এখানে দিয়ে যেতে। এখন আপনি আমাদের ক্ষমা করে আশীর্বাদ করুন। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার আশীর্বাদ না পেলে—"

আবেগবশে আমি মামার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিলাম।

মামা শান্তকণ্ঠে বলিলেন—"আমি ক্ষমা করবার মালিক নই। মালিক কাকা। তিনিই এ সম্বন্ধ এনেছিলেন—এখন তুমি যদি বিয়ে না কর তিনি অপমানিত হবেন। তিনি যদি তোমাদের ক্ষমা করেন আমার কোনও আপত্তি নেই! তুমি যদি সন্তোষের মাকে বল তিনি যদি পায়ে ধরে' ওঁর ক্ষমা চান তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"উনি তো কোন দোষ করেননি, উনি ক্ষমা চাইবেন কেন। তাছাড়া এ-ও শুনেছি পটলকর্তা নাকি ওঁদের বাড়ি খেয়ে মানুষ হয়েছেন, উনি কি করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন! আর চাইবেনই বা কেন, তা-ও তো বুঝতে পাচ্ছি না।"

মামার সম্মুখে এ ধরনের বাচালতা আর কখনও প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মামা একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, বেশ, যা খুশি কর। এখন তোমার ডানা গজিয়েছে এখন মনের আনন্দে উড়ে বেড়াও। আমার মান-সম্ভ্রমের দিকে চাইবার দরকার যদি না বোঝ চেও না।"

মামা রাগিয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর পাইলাম না। এক হিসাবে ভালোই হইল। পাইলে হয়তো একটা অশোভন বচসা হইয়া যাইত।

সন্তোষের মাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এ অবস্থায় কি করতে বলেন? মামার অমতেই রাজুকে নিয়ে মনিহারী চলে' যাব?"

"আমার কথায় মামার অমতে তুমি কিছু কর এটা আমারও ইচ্ছে নয়। আমি মুখ ফুটে তা তোমাকে করতে কখনও বলব না। তবে মনে হচ্ছে তোমার মামা কিছুতেই মত দেবেন না। ওই পটলকর্তাকে তিনি শিখণ্ডী খাড়া করেছেন। বলছেন উনি কিছুতেই মাপ করবেন না। সন্দেহ হয় এর জন্যে উনি টাকাও খেয়েছেন। অনেকে বলছে আমি যদি ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাই তাহলে হয়তো উনি ক্ষমা করবেন। যে লোকটা একদিন আমাদেব রান্নাঘরের বারান্দায় দিনের পর দিন ভাত খেয়েছে উবু হয়ে বসে—আমিই যাকে রোজ ভাত বেড়ে দিয়েছি – তার পায়ে ধরতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—তবু তুমি যদি বল—তাও না হয় করব, কিন্তু আমর মনে হয় তাতেও কোন ফল হবে না—উনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না—"

"না আপনাকে তা করতে হবে না—দেখি কি হয়—আমি নিজে ওঁকে আর একবার বলি"।

একটু পরেই পটলকর্তার সহিত দেখা হইল। তিনি তখন পূজা শেষ করিয়া জলযোগ করিতেছিলেন। নূতন মামীমা (মামার দ্বিতীয় পক্ষেব স্ত্রী) সামনে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন তাঁহাকে। আমিও তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলাম।

ক্রুর দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া মুখে একটা মেকী হাসি ফুটাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন-- 'কি হে নবাব সাহেব মাটিতে বসে পড়লে কেন!"

"নবাব তো আমি নই, নবাব তো দেখছি আপনি। সবাই আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছে, আপনার খোশামোদ করছে, কিন্তু আপনি অটল হয়ে রয়েছেন—"

পটলকর্তা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।

"কাকে আমি ক্ষমা চাইবার জন্যে সেধেছি, কাকেই বা বলেছি আমার খোশামোদ কর—যে

যা করছে নিজের গরজে করছে। নিজেরা পাপী—মনে করছে আমি ক্ষমা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা কি কখনও যায়। বিষ্ঠাকে চন্দন করা যায় না—"

"তা জানি। তবু আপনি একবার বলুন না, আমি ক্ষমা করলাম, তাতে আর ক্ষতিটা কি, আপনি তো পবিত্রই থাকবেন, আপনি তো আর বিষ্ঠা হয়ে যাবেন না—"

"কী—আমাকে এতবড় অপমান—'

জলখাবারের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। সবাই হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

আমি উঠিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম সত্যই বিষ্ঠাকে চন্দন করা যাইবে না। মামীমা এবং মামার দুই মেয়ে আবার অনেক খোশামোদ করিয়া পটলকর্তাকে আর এক প্রস্থ জলখাবার খাওয়াইলেন।

আমার মামীমা একটু পরে আমাকে আড়ালে ডাকিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

"তুমি এদের মন কখনও পাবে না। রাজুকে নিয়ে তুমি মনিহারী চলে যাও। এদের মতামতের তোয়াক্কা কোরো না।"

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তারপর একদিন এসে আমাকেও নিয়ে যেও। তোমার সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসব। বেশ বেড়িয়েও আসব, কেমন?"

"মামা তোমাকে কি যেতে দেবেন?"

"ইস, দেবেন না আবার! আমি কারও তোয়াক্কা করি নাকি। তুমি ব্যবস্থা কোরো, আমি ঠিক চলে যাবো—রাজুকে আমার ভারী ভালো লেগেছে। কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ তো, কিচ্ছু বোঝে না, ওর মাথার উপর এমন তুমুল মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তবু ফিক-ফিক করে হাসছে কেবল, আর মায়ের কাছে বকুনি খাচ্ছে। ও কি সংসার করতে পারবে? আমি গিয়ে সব গুছিয়ে দিয়ে আসব—"

মামী রাজুর অপেক্ষা বড়জোর বছর দুই বড়। তাঁহার 'গিন্নীপনা' দেখিয়া মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করিলাম। তিনি যে আমার পক্ষে এ কথাটা জানিয়া কিন্তু বড় ভালো লাগিল। একটু আশ্চর্যও হইলাম।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটিল তাহার পরদিন। সকালবেলা পটলকর্তা গঙ্গাস্নান করিবার জন্য দ্বিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। সেই সময় সন্তোষের মা নিজের মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া তাঁহার পায়ে ধরিতে গিয়াছিলেন, পটলকর্তা তাঁহাকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দেন। লাথিটা বোধহয় জোরেই মারিয়াছিলেন, কারণ সন্তোষের মা সিঁড়ি হইতে গড়াইয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মাথার খানিকটা কাটিয়া রক্তে কাপড়চোপড় ভিজিয়া গেল। তাঁহার আর্তনাদ শুনিয়া আমরা সবাই ছুটিয়া গেলাম। পটলকর্তা কিন্তু দাঁড়াইলেন না, তিনি হনহন করিয়া সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকেই চলিয়া গেলেন। আমি সন্তোষের মায়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলাম।

"কেন আপনি এ কাজ করতে গেলেন?"

"আমি ভাবলুম—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, ক্রন্দনাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমারও কান্না

পাইতে লাগিল। অবশেষে মনঃস্থির করিয়া ফেলিলাম। সন্তোষেব মাকে বলিলাম—"কাল বৃহস্পতিবার। কালই আমি আপনাদেব মনিহারী নিয়ে চলে যাব। আজকের দিনটা কোনও রকমে এখানে কাটান।"

আশ্চর্য ঘটনাটির কথা কিন্তু এখনও লিখি নাই। পটলকর্তা সেই যে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন আর ফিরিলেন না। প্রথম ঘণ্টা দুই তাঁহার অনুপস্থিতি কেহ তেমন লক্ষ্য করেন নাই। যদিও পটলগিন্নি বার বার বলিতে লাগিলেন—এত দেরি তো কোনও দিন হয় না, আজ এত দেরি হচ্ছে কেন—কিন্তু তাঁহার কথা কেহ তেমন গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু যখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল পটলকর্তা ফিরিলেন না, তখন সকলে বেশ চিন্তিত হইয়া লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সেখানে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। পটলগিন্নী কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহাব আশঙ্কা হইল হয়তো তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। মামা কয়েকজন জেলে ডাকাইয়া গঙ্গার ঘাটে ঘাটে জাল ফেলাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। পটলকর্তাব কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। পটলগিন্নীর ফিট হইতে লাগিল। অ্যামোনিয়া শুঁকাইয়া তাঁহার ফিট ভাঙাইতে হইল। ফিট ভাঙিতেই তিনি দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া তারস্বরে বলিতে লাগিলেন--"সতী লক্ষ্মীর অভিশাপ লেগেছে। নিরপরাধ মেয়েটাব উপব গঞ্জনা—সে কি ভগবান সইতে পারেন? পইপই করে বারণ করেছিলাম টাকার লোভে এসব ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না তুমি—। সতীলক্ষ্মীর চোখের জল, জল নয়, আগুন—পুড়িয়ে ছারখাব কবে দেবে সব—।"

তাহার হাহাকারে সকলেই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মামা থানায খবর দিলেন। তখন থানার একজন কনেস্টবল বলিল যে সে এখনই বুড়া বাবুর একটি চিঠি লইয়া আমাদের বাড়ি আসিতেছিল। সকরিগলি হইতে একটি কুলি আসিয়া তাহাকে চিঠিটি দিয়া গিয়াছে। দেখা গেল চিঠিটি পটলকর্তাই লিখিয়াছেন। কাহাকে লিখিয়াছেন তাহা বোঝা গেল না। কারণ চিঠিতে কোন পাঠ বা ঠিকানা ছিল না। কেবল লেখা ছিল---তোমবা আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমি মনিহারী চলিলাম। সেখানে সূর্যসুন্দরের বাড়িতে উঠিব। বধূমাতাকে লইয়া সূর্যসুন্দর বৃহস্পতিবার যেন মনিহারী পৌঁছায়। আমি স্বয়ং তাহাদের অভ্যর্থনা করিব। সূর্য যেন রাগ ন' করে। আমি এতদিন শুধু একটা অভিনয় করিতেছিলাম মাত্র। ইতি পটল--

এই পত্র পাওয়ার পর সমস্ত ব্যাপারটার রঙই বদলাইয়া গেল। মামা সম্ভবত মনে মনে মুষড়াইয়া পড়িলেন—বাইরে কিন্তু তাঁহাকে প্রফুল্লভাব দেখাইতে হইল। আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পটলকর্তা এরূপ মারাত্মক অভিনয়ে কেন লিপ্ত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পটলগিন্নী জিদ ধরিলেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে মনিহারী যাব।' মামীমাও যাইতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু মামা সম্মত হইলেন না।

বৃহস্পতিবার যখন স্টীমার হইতে নামিলাম তখন দেখি এক তুমুল কাণ্ড। ত্রিপুবা সিংহ বধূকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঘাটে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। হস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং আসিয়াছেন তিনি। স্টীমার ঘাটে ভিড়িবামাত্র দুমদুম করিয়া কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিল অনেক ঢাল, ঢোল, বাঁশী ও রামশিঙা। দেখিলাম দশজন সশস্ত্র সিপাই সুসজ্জিত দশটি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে। দেখিলাম বাজিও পুড়িতেছে। আকাশে নানা রঙের তারা-বাজি ছুটিতেছে, অনেক তুবড়ি পুড়িতেছে। তাহার পর ত্রিপুরারি সিংহ হাতি হইতে নামিয়া

রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলেন। আমি বলিলাম—"এ কি করছেন আপনি। ও যে আপনার চেয়ে অনেক ছোট, তা ছাড়া সম্পর্কে ভ্রাতৃবধু।" ত্রিপুরারি সিংহ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কিন্তু উনি ব্রাহ্মণী, তা ছাড়া উনি আমার মা।" কিংখাবে মোড়া একটি পালকি রাজলক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, ত্রিপুরারি সিংহ স্বয়ং রাজলক্ষ্মীকে সেই পালকিতে চড়াইয়া দিলেন। আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে হাতিতে আসুন।"

বলিলাম—"পটলকর্তার স্ত্রী এসেছেন। তিনি কিসে যাবেন?"

"আরও পালকি এসেছে।"

ভিড়ের মধ্য হইতে আর একখানা পালকি আসিয়া পড়িল।

পটলগিন্নী তাহাতেই চড়িলেন।

মহাসমারোহে শোভাযাত্রা আমার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

একটু পরেই আমরা যখন বাড়ির কাছে পৌঁছিলাম তখন উলুধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া সতীশবাবু নিজেই একটা শাঁখ বাজাইতেছেন দেখিলাম। গ্রাম হইতে অনেক মেয়েও আসিয়া শাঁখ বাজাইতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল ভিড়ের মধ্যে পটলকর্তা দাঁড়াইয়া আছেন। বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ, চোখের দৃষ্টি হইতে যেন রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। চিঠিতে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার চেহারাতে ও ভাবভঙ্গীতে তাহার কোন আভাস পাইলাম না। চিঠিতে লিখিয়াছিলেন তিনিই আমাদের অভ্যর্থনা করিবেন কিন্তু তিনি গুম হইয়া একাধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি হাতি হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি একটি কথাও বলিলেন না।

সতীশবাবু দেঁতো হাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন—"কর্তার শরীরটা আজ ভালো নেই। চলুন আপনি ভিতরে একটা ঘরে শুয়ে পড়বেন চলুন।"

"আমি আজই দেশে ফিরে যেতে চাই। দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে' দিন।"

"আপনার গিন্নীও তো এসে গেছেন। দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। ভোজটোজ খেয়ে তারপর যাবেন।"

"না, আমি আজই যেতে চাই।"

"মালিকের সঙ্গে দেখা করুন তাহলে। তিনি যা বলেন তাই হবে। এখানে তাঁর হুকুম ছাড়া চলবার উপায় নেই। আসুন—"

পটলকর্তাকে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার দিকে ফিরিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। আমার নিকট ব্যাপারটা ক্রমশঃ রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল।

বহুকণ্ঠের উলুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম গ্রামের মেয়েরা রাজলক্ষ্মীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতেছে। সে অপরূপ দৃশ্য আজও মানসপটে আঁকা আছে। রাজলক্ষ্মী একটি প্রকাণ্ড দুধে-আলতায় ভরতি থালার উপর নতনয়নে দাঁড়াইয়া ছিল। নায়েব মহাশয়ের স্ত্রী, দেওয়ানজির স্ত্রী, স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, দারোগা সাহেবের স্ত্রী, গ্রামের আরও অনেক বর্ষীয়সী মহিলা সকলেই একে একে রাজলক্ষ্মীকে বরণ করিতেছিলেন। বরণ করিয়া প্রত্যেকেই একটি করে ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছিলেন তাহাকে। মালার স্তূপের মধ্যে তাহার মুখটি প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। সন্তোষের মা একটু দূরে একধারে উদ্ভাসিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অবিরলধারে জল

পড়িতেছিল। আমি গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"সই-মা, আমি আমার কথা রেখেছি। আপনি আশীর্বাদ করুন রাজলক্ষ্মী যেন সুখী হয়। শত চেষ্টা করেও তো মামার আর্শীবাদ পেল না। পটলকর্তা এসেছেন কিন্তু তাঁর চিঠির সঙ্গে ভাবভঙ্গী মিলছে না—"

সন্তোষের মায়ের চোখে একটা হাসির ঝলক খেলিয়া গেল।

"ওকে কিছু টাকা দাও, ও তোমার পা চাটবে—"

ঠিক এই সময় খুব জোরে জোরে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল বাহিরে। ঢাক ঢোল সানাইও বাজিয়া উঠিল। ত্রিপুরারি সিংহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাব পিছু পিছু রায় মহাশয়, তাঁহার পিছনে তাঁহাদের পুরোহিত বশিষ্ঠ নারায়ণ এবং তাঁহারও পিছনে কয়েকজন ভৃত্য কয়েকটি রূপার পরাত বহন করিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলাম প্রত্যেক পরাতে নানাবিধ উপহার সজ্জিত রহিয়াছে। ত্রিপুরারি সিংহ পুনরায় রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছি। তাড়াতাড়িতে ভালো জিনিস পাওয়া গেল না"—তাঁহার চোখে মুখে একটা কুণ্ঠিত ভাব ফুটিয়া উঠিল।

পরাতগুলি রাজলক্ষ্মীর সামনে নামাইয়া দিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। বহুকণ্ঠের উলুধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পিত হইতে লাগিল। সেদিন সেই উৎসব-কোলাহল মুখরিত সন্ধ্যায় রাজলক্ষ্মী সগৌরবে যে সংসারে প্রবেশ কবিযাছিল সে সংসারের মর্যাদা সে আমরণ রক্ষা করিয়াছে। সেদিনের সেই ছবিটাই—তাঁহার সেই শরম-শঙ্কিত-মাল্য-বিভূযিত-রূপটাই এখন আমার চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে।

তাহার পর আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু সে সব আমি লিপিবদ্ধ করিব না। মনিহারীতে আমার পারিবারিক জীবন স্থাপনের দিনটিই এই ডায়েরিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক।

পটলকর্তা ও পটলগিন্নীও শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন হইয়া রাজুকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এজন্য অবশ্য একটু কৌশল করিতে হইয়াছিল। সন্তোষের মায়ের কথাই ঠিক হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত। কিছু টাকা পাইয়াই পটলকর্তা নরম হইয়া গেলেন এবং সোচ্ছ্বাসে আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। টাকা দিয়া আশীর্বাদ কিনিবার বাসনা আমার ছিল না, কিন্তু যখন সতীশবাবুর মুখে শুনিলাম যে তাঁহার সিপাহীরা পটলকর্তাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল তখন বড়ই কষ্ট হইল। নিজেকেই অপরাধী মনে হইতে লাগিল। পটলকর্তা যখন গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন তখন গঙ্গাব ঘাটে আর কেহ ছিল না। একজন সিপাহী ডুব-সাঁতার কাটিয়া আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে জলের ভিতর লইয়া যায়। কিছুদূরে সতীশবাবুর নৌকাটি বাঁধা ছিল। সেই নৌকায় তুলিয়া পটলকর্তাকে মুখ বাঁধিয়া মনিহারীতে আনা হয়। তাহার পর জোর করিয়া তাঁহাকে দিয়া চিঠিটি লেখানো হয়। প্রথমে তিনি নাকি লিখিতে চান নাই, সিপাহীর হাতের একটি চপেটাঘাত খাইবার পর লিখিয়াছিলেন।

ব্যাপারটা শুনিয়া খুব খারাপ লাগিল—নিজের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল যেন। কিন্তু বলিবার কিছু ছিল না। সতীশবাবু ত্রিপুরা সিংয়ের আদেশে যাহা করিয়াছেন তাহা আমারই হিতার্থে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীশবাবুকে বলিলাম—"আমাকে কুড়িটি মোহর যোগাড় করে দিতে পারবেন?"

"তা পারি। কেন, মোহর নিয়ে কি করবেন?"

নতুন বউ পটলকর্তা আর পটলগিন্নীকে প্রণাম করবে।"

সতীশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ভস্মে ঘি ঢালবেন?"

"ভস্ম হোক, যাই হোক ওঁরা আমার আত্মীয় এবং গুরুজন। ওঁদের অভিশাপ নিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারব না। ওঁদের প্রসন্ন করতে হবে।"

সতীশবাবু একটি মোড়ার উপর বসিয়া ছিলেন। আমার কথা শুনিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পা দোলাইয়া তাহার পর বলিলেন, "বেশ তাই হবে।"

পরদিন রাজলক্ষ্মী পটলকর্তার ও পটলগিন্নীর পায়ের কাছে দশটি করিয়া মোহর রাখিয়া প্রণাম করিল। আমার ভয় হইতেছিল পটলকর্তা হয়তো মোহরে লাথি মারিয়া উঠিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সহসা তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সোচ্ছ্বাসে বলিলেন – "দিদি তুমি রাজরাজেশ্বরী হও। একটা কথা মনে রেখো, তোমাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছি তা অভাবের তাড়নায়। আমরা বড় দুঃখী, বড় অসহায়। আশীর্বাদ করছি তুমি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর—তোমার সংসারে সুখ উথলে পড়ুক। আমাদের ক্ষমা কর তুমি—"

পটলগিন্নীও অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—"সুখী হও, সুখী হও তোমরা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

আজ অনুভব করিতেছি তাঁহাদের আশীর্বাদ নিষ্ফল হয় নাই।

এইখানেই ডায়েরি শেষ হইয়াছে।

ডায়েরী শেষ করিয়া কুমার স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। যে মা আজ নাই তাঁহার নববধূরূপটি চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিল যেন। বিস্মিত পুলকে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল সে। তাহার পর সহসা সে চমকাইয়া উঠিল—হাঁসের ডাকে। আকাশে হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। মহাশূন্য হইতে কলকণ্ঠের একটা কোলাহল সহসা ভাসিয়া আবার সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। কুমারের মনে হইল একটা অট্টহাসি সহসা মূর্ত হইয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল যেন।

ইহার পর গঙ্গা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল।

"কুমার কুমার শীগগির বাড়ি চল—বাবা মারা গেছেন—"

"সে কি!"

"হ্যাঁ হঠাৎ! মেজদা একটু আগে এসেছিলেন। বাবার পায়ের কাছে বসে ছিলেন। বাবা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—তুই ছেলেবেলায় তোর মাকে যে গানটা শোনাতিস সেটা বেহালায় বাজাতে পারবি? কোন্ গানটা? জিগ্যেস করলেন মেজদা। বাবা বললেন—"আমায় নিয়ে চল হাত ধরে—এই গানটা। মনে নেই তোর? মেজদা বললেন—আছে। তারপর মেজদা নিজের বেহালায় সেই গানটা বাজাতে লাগলেন। বাবা চোখ বুজে শুনতে লাগলেন। মেজদাও চোখ বুজে বাজাচ্ছিলেন। এর মধ্যে কখন যে বাবার নিশ্বাস থেমে গেছে তা কেউ টের পায়নি। ছোটবউমাই প্রথম টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। হইচই পড়ে গেছে চতুর্দিকে। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য।......"

।। একচল্লিশ ।।

বাড়িতে সত্যই লোকে লোকারণ্য। গ্রামের সবাই আসিয়াছে। দূরের গ্রাম হইতেও ক্রমাগত লোক আসিতেছে। বাড়ির সামনে একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে যেন।

বৃহস্পতি সূর্যসুন্দরের বুকের উপর মুখ রাখিয়া শিশুর মতো কাঁদিতেছিলেন। সুবাতালি তহসিলদার নীরবে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

স্টেশন হইতে একটি ছোকরা আসিয়া বলিল—"স্টেশন মাস্টারমশাই বড়দাকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন—"

নূতন যে স্টেশন মাস্টারটি আসিয়াছিলেন তিনি কলেজে বিরুর সহপাঠী ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই আসিয়াছেন এখানে।

বিরু চিঠিটি খুলিয়া পড়িলেন।

ভাই বিরু,

এইমাত্র দুঃসংবাদটি পেয়ে মর্মাহত হলাম। ভগবানই শোক দেন, তিনিই আবার সান্ত্বনাও দেবেন। তোমার বাবা মহৎ লোক ছিলেন, তাঁর মহত্ত্বের জন্যে তিনি মানুষের মনে অনেক দিন বেঁচে থাকবেন। এখান থেকে হাঁটা পথে গঙ্গা অনেক দূর। মাঝে কুশী নদী পেরিয়ে যেতে হয় বলে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছানো মোটেই সহজসাধ্য নয়। আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি। সন্ধ্যার ট্রেনটা বেরিয়ে গেলে এখান থেকে একটা বগি গাড়ি এবং ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি সেই ব্যবস্থা করে দেব। তোমার যদি মত থাকে তাহলে আমি কাটিহারে টেলিগ্রাম করে D. T. S.-এর অনুমতি নেব।

ইতি অনিল।

সুবাতালি তহসিলদার জানিতে চাহিলেন স্টেশন মাস্টার কি লিখিয়াছেন। বিরুব মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া তিনি গোবিন্দ মণ্ডলেব দিকে, চমকলালের দিকে এবং নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। তাহার পর ধীরকণ্ঠে হিন্দীতে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই—আমার ইচ্ছা ডাক্তারবাবুকে আমরা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইব। তিনি যে পথ দিয়া মনিহারী গ্রামে হাঁটিয়া ঢুকিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া গ্রামের লোকের কাঁধে চড়িয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। আপনাদের কি মত?"

সকলেই তহসিলদার সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চমকলাল বলিলেন—"ডাক্তারবাবু ট্রেনে যাবেন না, আমাদের কাঁধে চড়েই যাবেন। তাঁকে আমরা রাজার মতো নিয়ে যাব—।"

নিখিলবাবু তখন বিরুবাবুকে বলিলেন, "তুমি স্টেশন মাস্টারমশাইকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লিখে দাও। লিখে দাও—গ্রামের লোকেরা কাঁধে করেই নিয়ে যাবে, ট্রেনের দরকার নেই। তিনি যদি কষ্ট স্বীকার করে আমাদের সঙ্গে যান আমরা খুব খুশী হব।"

উত্তর লইয়া ছোকরাটি চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিল সোমেন্দ্রবালা। সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"কাকাবাবু চলে গেলেন! এমন করে হঠাৎ যাবেন তা ভাবিনি। আমার সঙ্গে শেষ দেখাটা আর হল না।"

সোমেন্দ্রবালাব সঙ্গে একটি চাকর একটি বড় ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ঝুড়িতে ফুল ছিল। ফুলের ভিতব হইতে একটি তামার ছোট ঘটি বাহির করিয়া সোমা বিছানার উপর বসিল। উর্মিলা কাঁদিতেছিল। তাহাকে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "কাঁদছিস কেন? ওঠ। খানিকটা চন্দন ঘষে নিয়ে আয়। কাকাবাবুকে ভালো করে সাজিয়ে দিই। আর একটা চামচও আনিস। অনেক তীর্থ থেকে জল এনেছিলাম এই ঘটিতে। এই জল কাকাবাবুর মুখে দিয়ে দিই একটু—"

উর্মিলা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

বাহিরের বারান্দায় কবিরাজ মহাশয় মাটিতে লুটাইয়া শিশুর মতো কাঁদিতেছিলেন। পৃথ্বীশ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা কান্না থামাইয়া উঠিয়া পড়িলেন তিনি। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সূর্যসুন্দরেরব পায়ে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল। এখন সব অন্ধকার। আমি শ্মশানে চললুম। সেইখানেই অপেক্ষা করব—"

কবিরাজ মহাশয় চলিযা গেলেন। বাহিরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভিড়েব ভিতর হইতে ক্রন্দনরোল উঠিতেছিল। একটু পরে কীর্তনীয়ার দল মাদল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। ক্রমাগত লোক আসিতে লাগিল। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বৃহস্পতি, পৃথ্বীশ এবং কুমার তিনজনেই বুঝিতে পারিল শুধু তাহাদেরই পিতৃবিয়োগ হয় নাই—এ অঞ্চলটারই পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। সূর্যসুন্দরের শেষকৃত্য কিভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা ইহারাই ঠিক করিবে, তাহাদের কোন মতামত এখানে চলিবে না।

নানাদিক হইতে প্রচুর ফুল আসিয়া পড়িল। আর একদল কীর্তনীয়া আসিল। শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে গ্রামের একদল মেয়ে আসিয়া সূর্যসুন্দরের ঘরের সম্মুখে ফুল, খই ও বাতাসা ছড়াইতে লাগিল।

নিখিলবাবু বাহির হইয়া আসিয়া একজন সিপাহীকে আদেশ দিলেন দুইটি গরুর গাড়ি করিয়া শুকনো কাঠ এখনই যেন শ্মশানের দিকে পাঠানো হয়। মাঝে কুশী নদী আছে, নৌকায় করিয়া কাঠ ওপারে লইয়া যাইতে হইবে। গাড়ির বলদরা খালি গাড়ি লইয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে পারিবে। তিনি আরও আদেশ দিলেন—হাতির পিঠেও একবোঝা কাঠ লইয়া মাহুতটা রওনা হইয়া যাক। হাতি অনায়াসেই কাঠ লইয়া নদী পার হইতে পারিবে।

দেখিতে দেখিতে কয়েকটা নূতন বাঁশ আসিয়া পড়িল। গ্রামের পুরাতন ছুতার মধু মিস্ত্রী নিজেই করাত্ 'বাসুলা' লইয়া বসিয়া গেল সূর্যসুন্দরের শেষযাত্রার শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য। তাহার চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চুলগুলি সব সাদা।

রমেশবাবু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"মধু, তুমি পারবে তো?"

"পারব। আমিই বরাবর ডাক্তারবাবুর বসবার চেয়ার বানিয়েছি। এখনও উনি যে খাটে শুয়ে আছেন তা আমারই বানানো। এ খাটিয়াও আমি বানাব।"

'মনে রেখো এটা মামুলী খাটিয়া হবে না। পুষ্পকরথ হবে। দেবতা যাবেন ওতে চড়ে।"

"জানি।"

হঠাৎ মধু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর বাঁশ চিরিতে শুরু করিল। পুষ্পকরথ কেমন তাহা কেহ দেখে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পবে শালু দিয়া, পতাকা দিয়া, ফুলের মালা দিয়া মধু যাহা গড়িয়া তুলিল তাহা সত্যই অপরূপ।

ধনুকধারী সিংয়ের আদেশে কয়েকজন ধুনকর নূতন তোশক তৈয়ারি করিয়া দিল। তোশকের উপর একটি সুদৃশ্য রেশমী চাদব বিছানো হইল। চাদরটি সোমন্দ্রেবালা কাশ্মীর হইতে আনিয়াছিল। ধনুকধারী সিং একজোড়া নূতন গরদও আনিয়া দিলেন। সোমেন্দ্রবালাকে বলিলেন—"এইটে পবে কাকাবাবু যাবেন।"

একটু পরেই বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল।

বিরুবাবু, পৃথ্বীশ এবং কুমার প্রথমে 'কাঁধ' দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কাঁধে সূর্যসুন্দর পাঁচ মিনিটও থাকেন নাই। বিরাট জনতাব কাঁধের উপব দিয়াই তিনি ফুলের নৌকার মতো ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

।। বেয়াল্লিশ।।

গঙ্গার কলকলধ্বনির পটভূমিকায় সূর্যসুন্দরেরর চিতা জ্বলিতেছিল। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল বিরাট জনতা। কীর্তনীয়ারা পর্যন্ত থামিয়া গিয়াছিল। সকলে যেন অনুভব করিতেছিল অনিবার্যের, এই সুমহান সমুজ্জ্বল প্রকাশকে শ্রদ্ধা করিবার ভাষা মানুষের নাই। নীরবতাই সে শ্রদ্ধার ভাষা। লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া ছিল সকলে। প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। বায়ুবেগে গঙ্গাব কলকলধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশঃ। মনে হইতেছিল মা গঙ্গাই স্বয়ং যেন স্তোত্রপাঠ করিতেছেন। ঘিয়ের এবং চন্দনের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত।

একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা কয়লার উনুনে লুচি ভাজা হইতেছিল।

বিরুবাবুর ইচ্ছা যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছেন তাহাদের সকলকে এখানেই তিনি গরম লুচি তরকারি খাওয়াইয়া দিবেন। কয়েক বোঝা শালপাতা এবং প্রচুর মিষ্টান্নও আনানো হইয়াছিল।

রমেশবাবু প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন —"এত লোককে এত রাত্রে এই গঙ্গার চরে খাওয়ানো কি সম্ভবপর হবে?"

বিরুবাবু উত্তর দিলেন—"কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, বাবার আত্মার এতে ভারী তৃপ্তি হবে। তিনি সবাইকে খাওয়াতে এতো ভালবাসতেন। সম্ভবপর হবে না বলছেন?"

"নিশ্চয়ই হবে।"

রাধানাথ গোপ ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

"আমি এখুনি যাচ্ছি—সব ব্যবস্থা করে আনছি—"

তিনিই হাতি করিয়া চলিয়া গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চিতা যখন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল তখন সকলেই তাহাতে একে একে জল ঢালিয়া গঙ্গায় স্নান করিল। সেই শেষকৃত্যে শুধু বিরু, পৃথ্বীশ, কুমার নয় সকলেই যোগ দিল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া সকলে যখন ফিরিলেন তখন পূর্বদিগন্ত ঊষারাগে রঞ্জিত।

বাড়িতে ফিরিয়া বিরু একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

শাঁখ বাজিতেছে কেন?

গঙ্গা বাড়িতেই ছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"গগনের ছেলে হয়েছে। কি সুন্দর ছেলে। বাবাই যেন ছোট হয়ে ফিরে এসেছেন আবার!"

